"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

গল্প-লহরী

সচিত্র-মাসিক-পত্র

সম্পাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু
৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক—সাড়ে তিন টাকা মাসিক—পাঁচ আনা

"ব্রেক অফ হার্টস" পুস্তকের একটী দৃশ্যে ক্যাথারিন হেপবার্ণ।

একাদশ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪২ | প্রথম সংখ্যা

পাহাড়ী মেয়ে

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"ওই টিলায়।" বলিয়া দুইজনেই ছুটিত, কিন্তু অর্দ্ধেক পথ উঠিতে-না-উঠিতেই হুন্নি যখন চাহিয়া দেখিত, হন্হু অনেক দ্রুত, নব নব উদ্ভাবিত পন্থায় ঊর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতেছে, তখন আপনা-আপনি পরাজয়-লজ্জা ঢাকিতেই বুঝি সে বলিয়া বসিত, "বারে, ওটা বুঝি, এইটে না!"

কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই কিন্তু সে আপনার চলাপথ পিছনে ফেলিয়া হরিণীর নৃত্যতালে কথিত স্থানটীর অধিকার নিজস্ব করিতে ছুটিয়া যাইত। ঘাড় বাঁকাইয়া আড় চোখে দৌড়াইয়া চলিত বটে, মুখ কিন্তু উদ্বেগ আশঙ্কায় পূর্ণই থাকিত ; মনে জানিত—না, এ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ; দুষ্ট ছেলেটা কোন্ তালে ঝড়ের গতিতে যে তাকে অতিক্রম করিয়া চলিবে, কে জানে!

ভাবা কথাটা কিন্তু শেষ আর হইত না, হন্হুর বাদল-প্রবল গতি কানের নিকট দিয়া শুধু অনুভব করাই যাইত, ঠিক্ ঠিক্ লোকটীকে কিন্তু এক কল্পনার ভিতর ছাড়া আর অস্তিত্বের গণ্ডীতে ধরা যাইত না।

কিন্তু তথাপি হুন্নিরই জয় হইত। একটা আড় খাড়া পাথরের পাশে গিয়া সে যখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপেই লুকাইয়া ফেলিত, তখন ওই বন্য বাইষণ কিন্তু অগ্র-গমনের গমন-পথ আর নয়ন সম্মুখে খুঁজিয়া পাইত না, সহসা জগতের সমস্ত আলোক বুঝি নিভিয়া যাইত, ধীরপদে চিন্তা-বিজড়িত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে তখন নামিতেই বাধ্য হইত ; সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে ডাকিত, "হুন্নি, হুন্নি কোথা গেলি রে?"

শিখরচূড়ার বড় পাথরখানায় পা ঝুলাইয়া হুন্নি তত-ক্ষণে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে থাকিত ; হন্হুর চোখের

সম্মুখের আলোক রেখা আবার উজ্জলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিত। সে সেই আলোকে সাম্‌নে রাখিয়া পরাজয়ের এতটুক বেদনা গায়ে মাখিত না, বেশ আনন্দ উদ্ভাসিত-মুখেই অ-চলা পথটুকুর শেষ করিয়া লইত। ঝুম্নি কিন্তু একটু অভিমানের স্বরে বলিত, "না, তোকে নিয়ে আর মোটেই চলে না রে! হেরে গেলেও তোর মুখ শুকোয় না, এমন মানুষকে নিয়েও কি আবার খেলা চলে!"

অমর্য্যাদার গ্লানি যা' করিতে না পারে এবারকার এই সামান্য কথার ঘায়েই কিন্তু তার ত্রিগুণ কার্য্য হইয়া যাইত। হনুহুর ব্যথা-কাতর ছলছল নয়ন কৃপাপ্রার্থী হইয়া শুধু চাহিয়াই থাকিত; বাদল মেঘের উদ্দামধারা বুঝি জোর করিয়াও আর ধরিয়া রাখা যায় না। ঝুম্নির নারী-হৃদয় জাগিয়া উঠিত, সে বলিত, "না, তোকে নিয়ে কি করি বল ত! একটু মিছে করেও কি রাগ্‌তে দিবি না! এমন কর্‌লে কি করি? জানিস তুই ছাড়া আমার খেলার সঙ্গী এখন আর কেউ নেই—"

এবার সহানুভূতির অশ্রু তাহারও চোখে গড়াইয়া আসিতে চাহিত। হনুহু কিন্তু তা' বুঝিত না, চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিত, "কি আমায়, আমায় ছেড়ে তুই অপর কাউকে খেলুড়ি করবি? কই কর্ দেখি নি? আমি, আমি তাকে খুন করব।"

ঝুম্নি ময়ূরীর ভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকাইয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিত, "তা' করিস, পেলে ত! এখন চ' ওই বাঁকা লোহার গাড়ীর দৌড় ওই উঁচুটায় বসে' দেখে আসি গে। ঘোড়া নেই, বয়েল নেই, একটা উট, না, তাও নেই। সেই জানোয়ারের পাহাড় হাতীটাও নেই। একটা বখরী পর্য্যন্ত কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? কে টানে বল্ ত?"

হনুহু মুহূর্ত্তে সব তাপ ভুলিয়া গিয়া হাসিয়া বলিত, "তুই কেমন বোকা রে, এটাও জানিস না! 'গোঁসাই', 'গোঁসাই',—ভূত, ভূত রে! শুনেছি, এক গাদা ভূত তারা কয়েদ করেছে; দরকারমত তাদের দিয়ে নিজেদের অনেক কাজ তারা করিয়ে নেয়। নানা জমরু সেদিন তাই ত বল্‌ছিল, শুনিস নি? আর শুন্‌বি কোথা থেকে তোর যে ঘুম, গল্প শুন্‌তে বসলেই ঢুলে পড়্‌বি!"

ঝুম্নি মিনতি করিয়া বলিত, "সে খিস্‌সাটা আমায় শোনাবি না, আচ্ছা—"

"শোনাব, শোনাব, বড় মজার কথা! কিন্তু গোঁসাই আলো হ'য়ে জ্বলে, পাখা হ'য়ে ঘোরে—"

"না না এখানে নয়, চ' ওই লোহার ভূতের দৌড় দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুন্‌ব, বড় মানানসই হবে সে! চ'।"

দুই

সেদিন তারা দু'জনে পাশাপাশি আসিয়া উচ্চ পাহাড়ের শিখর হইতে যা' দেখিল, তা'তে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল; চণ্ডালিনীর বাঁ কোণ ঘেঁসিয়া যে ঘের চলিয়া গিয়াছে তাহার বাঁ দিক্‌টায় উঃ, ও কি কাণ্ড! লোহার ভূত বিদ্রোহী হইয়া গতিশীল গাড়ীগুলাকে লইয়া ও কি করিতেছে!

রাবণ নদীর উপরের ঝুল্লাটা কোথায় যে গিয়াছে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই শূন্য গহ্বর-পথে গাড়ীগুলাকে ক্রমান্বয়ে ফেলিয়া দিতে দিতে গোঁসাইয়ের সে কি অদ্ভুত অট্টহাস! দিগন্তব্যাপী মৃত্যু চীৎকারের মধ্যে তার সে কি উল্লাসের তাণ্ডব নৃত্য! চণ্ডালিনীর নাম সার্থক রাখিতেই যেন অদৃশ্য গোঁসাইয়ের এই প্রচণ্ড অভিযান।

নাঃ, সাক্ষীর স্বরূপ শুধু দাঁড়াইয়া দেখিবার ক্ষমতাও আর তাহাদের রহিল না। কি জানি কুপিত গোঁসাই যদি তাহাদেরই উপর ধাওয়া করে? তাহারা ছুটিয়া পলাইল। দুই চার ছয় পা গিয়া আবার ফিরিয়া চাহিল; আবার অদ্ভুত ভূতের প্রচণ্ড লীলা-ভঙ্গীমায় বিমূঢ় হইয়া শুষ্ককণ্ঠে ভীতি-বিহ্বল-নেত্রে ঘটনা-স্থলটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক সেই রুদ্র-লীলার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হনুহু বলিল, "হয় ত ওর ভেতর মানুষ থাকৃতে পারে ঝুম্নি।"

ঝুম্নির নারী-প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "আহা চ', হনুহু, যদি কারুকে বাঁচাতে পারি।"

হনুহু বিষণ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু ঝুম্নি, ও মরদের কাজ, তোর গিয়ে কাজ নেই।"

ঝুম্নি হাসিল। হনুহুর কাঁধে হাত দিয়া শুধু পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিল, কথা কহিল না।

ততক্ষণে জোয়ান সব আসিয়া হাজির হইয়াছিল, তারা এ মৃত্যুপথের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র বালক-বালিকা দুইটিকে আসিতে দেখিয়া ফিরিয়া চাহিল। প্রবীণ জমরু গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "সরে যা' বাচ্ছালোক। গোঁসাই মরণ-ক্ষ্যাপন ক্ষেপেছে এখানে, এ জায়গা তোদের নয়।"

বৃদ্ধের কথার সমর্থন দুই সন্তানের পিতাদের মুখেও যখন একই ভাষায় বাহির হইয়া আসিল, তখন পিছাইয়া আসা ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। কিন্তু চুপে চুপে দু'জনে পরামর্শ করিল, ছুটীর বখত যখন সবাই ঘরে খেতে যাবে, তখন তারা দু'জনে এসে একবার দেখ্‌বে।

সন্ধ্যার মলিনত্ব অতি শীঘ্রই কালো যবনিকায় সে দৃশ্য ঢাকিয়া দিল। তখন চুপে চুপে তারা দুইটী প্রাণী অহেতুক অন্বেষণে বাহির হইয়া আসিল। রাবণের উঁচুপাড়ে আসিয়া হনুহু বলিল, "বড় পিছল হয়েছে মুন্নি। তুই বোস, আমি নীচে গিয়ে দেখে আসি।"

মুন্নির মুখে কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষার হাসি। সে সঙ্গীর হাত ধরিয়া সেই পূর্ব্বেরই মত অটল পদে অগ্রগমন সুরু করিয়া দিল। হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে একটা কি যেন কি চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। মুন্নি হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "বেশ জিনিষ হনুহু, নিবি?"

বালক হাত পাতিয়া সাগ্রহে তা' চাহিয়া লইল। তারপর চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল, "সত্যই এ বেশ জিনিযরে! এসে নেহাত মন্দ হ'ল না, কি বল্?"

মুন্নি শুধু ঠোঁট উল্টাইয়া হাসিল, বলিল, "মন্দ হবে কেন? এ আসার পরামর্শটা কার বল্?"

প্রাপ্ত জিনিষটা সামান্য একটা ভোজালী। কিন্তু এর প্রাপ্তি-সংবাদ গাঁয়ে পৌছিল। তিরস্কার নির্য্যাতন কেবল এইটির জন্যই কতটা যে বাঁচিয়া গিয়াছে, দু'জনেই তা' বুঝিল, তবু হনুহুর পিতা গম্ভীর-মুখে বলিল, "আমি মানা করে দিয়েছিলুম না হনুহু।"

ছেলে মাথা তুলিয়া জবাব দিল, "কিন্তু আমায়ও ত মরদ হ'তে হবে বাপ্‌জী!"

সবার সপ্রশংস-দৃষ্টির মধ্যে বাপ ছেলেকে কোলে তুলিয়া বলিল, "ঠিক বাৎ!"

তিন

মুন্নির হাতের পাওয়া উপহারের বদলে একটা কিছু তাকে দিতে হইবে, তাই অনেক ভাবিয়া খাঁটি ইস্পাতের টুকুরা কুড়াইয়া আনিয়া নিজের হাতে টাঙ্গি প্রস্তুত করিতে হনুহু উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। দিন দুই মুন্নির দেওয়া অবকাশের অবসরে, বড় গোপনে আবার ততোধিক যত্নে তৈয়ারী করিয়া নদীগর্ভের উঁচু পাথরখানির উপর সান দিতেছে, এমন সময় মুন্নি নিকটে আসিয়া বলিল, "বা বা, কি সুন্দর টাঙ্গিরে! দিবি আমায় ওটা?"

মন বলিতে চাহিল, তোর জন্যেই ত; কিন্তু মুখ বেফাঁস উচ্চারণ করিয়া বসিল, "ইস্, তাই আর কি! এতে কত মেহনৎ পড়েছে তা' জানিস্?"

মুন্নি কিন্তু চোখ নামাইয়া বলিল, "তা' লাগুক্। ওটা আমারি জানিস্। তোর নিজের যদি দরকার থাকে, আর একটা বানিয়ে নিস্।"

এর উপর আর প্রতিবাদ চলে না; কাজেই হাসিয়া প্রার্থিত জিনিসটা যাচকের হাতে দিতে দিতে হনুহু বলিল, "তা' নে না, এ তোর জন্যেই ত!"

মুন্নি সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "তবে, এতক্ষণ যে চালাকী করছিলি?"

হনুহু মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "দেখ্‌ছিলুম তুই কি করিস্।"

ঈপ্সিত দ্রব্যটী দেবতার নিবেদন অর্ঘ্যরূপে অর্পিত এবং সাদরে গৃহীত হইলেও মন কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, কেমন যেন খস্‌খস্ করিতে লাগিল। কেবলি মনে হইতে লাগিল, আমার দেওয়া আর ওর ডাকাতি করে' নেওয়া এর মাঝে তফাৎ যে অনেক। এ ঠিক বদল দেওয়া হ'ল কি? কিন্তু আপাততঃ হাতের কাছে কিছুই আর সে খুঁজিয়া পাইল না।

দু'জনে একত্রে জঙ্গলের পথে চলিতে চলিতে পরস্পরের দেওয়া অস্ত্রের ব্যবহার রীতিমতই করিতেছিল। হঠাৎ

দাঁড়াইয়া পড়িয়া ঝুম্নি মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "আচ্ছা, কত ছুট্তে পারিস্ তুই, দেখি ; ওই হরিণটার সঙ্গে পাল্লা দে ত।"

বলিবার অপেক্ষা মাত্র ; হনুহুর কর্ম্মঠ চরণ ততক্ষণ তীরের বেগেই ছুটিয়াছে। পাথরের পর পাথর, ঝরণার পর ঝরণা, টিলার পর টিলা তাদের কুর্দ্দন তালে যেন সজীব হইয়া উঠিতে লাগিল ; হাতে হাতে তালি দিয়া ঝুম্নি নীচে হইতে কেবলি তাকে উৎসাহিত করিতেছে, ঠিক্ এমনি সময় পিছন হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "ওটার নিশ্চয় একটা মাথার ছিট আছে, নারে ঝুম্নি ?"

ঝুম্নি ফিরিয়া দেখিল সর্দ্দারের ছেলে কন্। বলিল, "তোর যদি অমনি ছিট্ থাক্‌ত বেঁচে যেতিস্। পারিস ত তার কাছে কিছু ধার করে নে।"

কন্ হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ধার করার অভ্যেস সর্দ্দারের ছেলের হয় না ঝুম্নি, কাজেই ধারের ধার আমি মোটেই ধারি না। তোকে বলি, এখন সাবধান হ' ; নইলে পাগলের সঙ্গে থেকে তুইও পাগল হ'য়ে যাবি !"

ঝুম্নি রাগিল, বলিল, "হই হবো, তা'তে তোর ক্ষেতি কি ! তুই তোর বৌকে গিয়ে সাম্‌লা।"

কন্ তার রাগ দেখিয়া কিন্তু কৌতুক অনুভব করিল, "তাই ত সামলাচ্ছি। দেখ্‌গে যা' জোড়া মোরগের ভেট এতক্ষণে তোদের বাড়ী পৌঁছে গেছে।"

ঝুম্নি আরও রাগিল, বলিল, "কি বল্‌লি ! বিয়ে কর্‌ব আমি, আমি, তোকে ? তার চেয়ে ওই পাহাড়ের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়ব ; পারিস যদি গুঁড়ো হাড়গোড়গুলো কুড়িয়ে নে গে সাদি করবার সাধ মেটাস !"

"আচ্ছা, দেখা যাবে ! ওই হনুহুটার জন্যে তোর এত ত ? ও মরবে !" বলিয়া হাসিতে হাসিতে কন্ চলিয়া গেল।

চার

একহাতে মহুয়া গাছের শিকড় এবং অন্যহাতে হরিণের পিছনকার পা ধরিয়া হনুহু একটা প্রকাণ্ড খাড়ির মুখে খুব খানিক ভীষণ সংগ্রাম চালাইল—মৃত্যু-সংগ্রাম। অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে প্রতি মুহূর্ত্তেই সুগভীর খাদের অতল অন্ধতম তলে তলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অন্যদিকে হস্তলব্ধ শিকার ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা মোটেই নাই ; অপর পক্ষে স্বাধীন বন্যজন্তুটীও মানবের হাতে আপন স্বাধীনতা ধন বিক্রয় করিতে নারাজ। মধ্যের ব্যবধান সেই করালরূপী মৃত্যু খাদ। গাঢ় অন্ধকার পথে দৃষ্টি চলে না, প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে।

শেষ চেষ্টায় হরিণ এবার প্রবল উল্লম্ফন প্রদান করিল। তাল সাম্‌লাইতে গিয়া হনুহু সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু অন্য হাতের শিকড় সে যত্ন করিয়াই চাপিয়া রাখিল। মুখ দিয়া রক্তের ঝলক বাহির হইয়া আসে বুঝি ! হাত বুঝি দেহ হইতে দুই দিকে দুইখানি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ! সঙ্গে সঙ্গে মূল দেহ-লতার অন্ধকারের অসীম তলস্পর্শ লাভ অনিবার্য্য। এ যে এক স্মরণীয় ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত !

হনুহু পড়িয়াও লব্ধবস্তুতে বিমুখিত হইল না, কি জানি কি ভাবিয়া হরিণ এবার তার বশ্যতা স্বীকার করিল। আকাঙ্ক্ষিত রত্নের মত তাহাকে টানিয়া বুকে তুলিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে হনুহু ফিরিয়া চলিল। সম্মুখের গহ্বর অতিক্রম ছাড়া কিন্তু এ ভার লইয়া চলিবার উপায় নাই। গহ্বরের মুখে কতকটা শিকড়ের জাল ; সেই জালে পা দিয়া অতি সন্তর্পনে চলিলে হয় ত পরপারে পৌঁছান যায়। নিঃশঙ্ক হনুহু অসঙ্কোচে পা বাড়াইয়া দিল।

ভারে লতার জাল দুলিয়া উঠিল। ছোট লতার বাঁধন-কষণ দু'-একটা ছিঁড়িয়াও পড়িল বুঝি ! ঊর্দ্ধে ধরিয়া চলিবার মত আশ্রয়-দণ্ড একটিও নাই ; আর থাকিলেও ধৃত বস্তুটীকে বন্ধন মুক্ত করিতে কামনা মোটেই জাগে না—শুধু হাতে ফিরিয়া গিয়া কি বলিবে ঝুম্নিকে ? "হাতে পাইয়াও আমি রাখিতে পারি নাই ঝুম্নি, কেবল প্রাণের ভয়ে—জীবনে আমার বড় মায়া !"

একথা এ ভাবে স্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যু অনেক গুণে ভাল !

কিন্তু নীচে ও কি ! কন্ ঝুম্নির নিকট কি চায় ? দু'-

একটা দুষ্ট কথা শুনাইয়াছে নিশ্চয়—নচেৎ অমন ফণিনীর মত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া হুন্নি কখনই দাঁড়াইত না। এ ভঙ্গীটী তার বড় সুন্দর! হোক্! কিন্তু পাষণ্ডটার কি প্রয়োজন হুন্নিকে? একবার কাছে পৌছিতে পারিলে হয়। এ অবিমৃষ্যকারিতার সাজা তাহাকে দিবেই দিবে!

উত্তেজনায় নিজের উপস্থিত বিপদের কথা ভুল হইয়া গেল। ঠিক্ সেই সময় হরিণটাও একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। পায়ের তলার শিকড়ের দোলনা ভীষণবেগে দুলিতে লাগিল। নিম্নে মৃত্যু মুখব্যাদন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই গ্রাসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একদিকের একটা মোটা শিকড় কড়কড় করিতেছে—ছিঁড়িবে না কি?

পায়ের পাথর বড় সম্মুখে। হন্হু লাফাইয়া আশ্রয় দোলা ছাড়িয়া দিল, একখানা ঢিলা পাথর সশব্দে নিম্নের দিকে গড়াইয়া গেল। আসন্ন-মৃত্যু জানিয়া হন্হু চক্ষু মুদিল। কিন্তু না, জীবনের জ্যোতি মলিন হইবার সময় এখনও আসে নাই, তাই মাথার খানিকটা রক্ত এবং হাঁটুর একপুরু ছাল দিয়া মৃগ কোলে সে নিরাপদ আশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাঁচ

ঘাড়ের হরিণটা নামাইয়া হন্হু বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটীর সাহায্যে শ্রমজল মুছিতে মুছিতে বলিল, "তোর চাওয়া হরিণ বুঝে নে হুন্নি। না, দম্ থাক্‌তে ও আমায় ধরা দেয় নি। আস্‌তে হয় ত পার্‌তুম ঢের আগে; কিন্তু হাত-পা ভেঙ্গে ওটাকে জড়পিণ্ড তৈরী করে' আন্‌লে তুই যে মোটেই খুসি হ'তে পারতিস্ না তা' জানি—আর জানি বলেই নিজের খুন দিয়ে ওর খুন বাঁচিয়েছি।"

হুন্নি চঞ্চল-কাতর-চক্ষে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু আমি কি তাই বলেছি? তোর চেয়ে কি আমার কাছে হরিণ বড়! চাই না তোর ও জানোয়ার! ছেড়ে দে; ও বনের জন্তু বনে চলে' যাক্।"

এ কথার ভিতরের মাধুর্য্যটুকু উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা এখন হন্হুর ছিল না। সে উল্টা বুঝিয়া রাগিল, সরোষ-কণ্ঠে বলিল, "সত্যিই ত, আমি দিলে তুই নিবি কেন? দিত কন্, তখন আর কথা বল্‌বার অপেক্ষা থাকৃত না!"

কথাটা বলিয়াই সে কিন্তু বুঝিল, অন্যায় করিয়াছে। পরন্তু ছোঁড়া ঢিলের পিছনে ছুটিয়া যখন কোন লাভই নাই, তখন— ?

হুন্নির উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি-বল্‌লি!"

হন্হু দেখিল এখন কথা ফিরাইয়া কোন লাভ নাই—বিশেষ, পাহাড়ের উপর হইতে কনের সহিত হুন্নির মিলন দৃশ্য দপ্‌দপ্ করিয়া তার মাথার ভিতটায় হাতুড়ীর ঘা দিতেছিল। তাই স্বরের কিছুমাত্র শমিত ভাব না দেখাইয়া সে বলিল, "বল্‌ছি কনের অধিকার দেওয়ার। আমায় তা' তুই ছেড়ে দিবি কি করে'?"

হুন্নি বেশ বিরক্তির সহিত বলিল, "সত্যিই তাই! তা' ছাড়া আরও আছে জানিস্—ওর বাপ আমাদের বাড়ীতে আজ জোড়া মোরগ ভেট পাঠিয়েছে; কাজেই তোর সঙ্গে লাফালাফির আমার এইখানেই শেষ! আর সেই শেষ কথাটা জানাব বলেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।"

হন্হু চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, "বেশ, জানান হয়েছে ত? আর দাঁড়িয়ে কেন, যা'! আর তুইও যা'!"

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সে পার্শ্বের দণ্ডায়মান হরিণটাকে এক লাথি কষাইয়া দিল। সেটা ডাকিতে ডাকিতে ক্রোধান্ধ হুন্নির গমন-পথের অনুসরণ করিল। হন্হুও আর দাঁড়াইল না; নিজেদের আবাসভূমির দিকে চঞ্চল চরণ চালনা করিল।

বাড়ীতে আসিয়াই বাপকে বলিল, "কোন্ দেশে নিয়ে যাবে বল্‌ছিলে বাপুজী, আমি তৈরী।"

গণ্‌পার চিন্তা ছিল, অশান্ত এ ছেলেটীকে যাইবার পূর্ব্বাহ্নে কার হাতে সঁপিয়া যাইবে। এখন অস্বস্তির বেদনার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া সে বলিল, "আঃ, বাঁচালি বাছা! তোর রোজগারের এক পয়সাও আমি নেব্ না রে, তোর যা' যা' কিন্‌তে ইচ্ছে হয় কিনে নিস্।"

সারাদিন অপেক্ষার মধ্য দিয়া কাটাইয়া হুন্নি বৈকাল-ভ্রমণের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটিতে আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না; পায়ে পায়ে বাঘাদীঘির পাড়টী ঘুরিয়া বুড়া কটহর গাছটীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে

গণ্পার বাড়ীর উঠান পর্য্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু ও কি! ও বাড়ীর দরজায় আজ কুঞ্জি লাগাইল কে?

পিছন হইতে পরিহাসভরা একটা সরোষ কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল, বলিল, "যাকে খুঁজছ রাই, সে নেই, সে নেই গো! বিদেশ বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছে। পণ করে গেছে— দস্তরমত ধনিক হ'য়ে তবে সে ফিরবে। তোমার ওপর কনের মৌরসীপাট্টা ষোলআনা বজায় করে' দিয়ে গিয়েছে —তোমাদের এখন পোয়া বার!"

ঝুম্নি ফিরিয়া চাহিল, দেখিল বিজ্‌লী। হন্হুর উপর এ মেয়েটীর লোভ তার নিজের চেয়ে কিছু কম ছিল না। ত্যক্ত মন আরও বিষাইয়া উঠিল; কিন্তু আপাততঃ সে ভাব দমন করিয়া সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।

অন্য মেয়েটী আপন-মনে খুব খানিক হাসিল, বুড়া কটহর বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিল, তারপর চলিত একটা গান ধরিয়া বাঁশের বাঁশিটায় সুর ফুটাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

ছয়

কন্ আসিয়া বলিল, "আমি তোর অপেক্ষায় থাকব ঝুম্নি, রণপুরে অসময়ের মরণ শুধুই তোকে নয়, গাঁয়ের সবাইকে মুষড়ে দিয়েছে। আর হাঁা, বাপুজী বলে' পাঠালে, আজ তিনদিন গেল, শোর, কবুতর, মোরগা:যা'যা' দরকার, সব আমাদের ওখান থেকে নিয়ে লোক আস্‌ছে। তুমি এখন আমাদের ঘরেরই হয়েছ, কাজেই—"

হঠাৎ তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝুম্নি বলিয়া উঠিল, "তুমি—তোমরা করতে চাও কি শুনি? জীবনে আমার 'বাড়ম' ফুঁকে দিয়েছ, তার জালায় অস্থির হ'য়ে একটা কোণ খুঁজে মুখ ঢাকবার চেষ্টায় আছি, তা'তেও শান্তি দেবে না! আর বাপুজী—আমরা গরীব, আমাদের গরীবের কাজ গরীব মতেই হবে! বড়মানুষী দেখাতে এ দান নয়— ভিক্ষে দিয়ে নিজেদের নাম কেনার ফিকির! জেনো, এতে তোমাদের যতখানি আনন্দ, আমাদের ঠিক্ ততখানি লজ্জা, ঠিক ততখানিই অমর্য্যাদা! বরং কাজ পণ্ড হোক্ ক্ষতি নেই—তবু হাত পেতে—না পারব না!"

কন্ উত্তরে আর কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঝুম্নি হঠাৎ উত্তেজিতা হইয়া বলিয়া উঠিল, "শোনো, আমি বলে' দিচ্ছি, আজ থেকে আমার গণ্ডীর বাইরে বাইরে থাকবে, নইলে—"

কথাটা শেষ না করিয়াই সে ঘরের এককোণ হইতে হন্হুর দেওয়া ধারাল টাঙ্গীখানা হাতে লইয়া উন্মত্তবেগে ছুটিয়া আসিল। সভয়ে দু'-চারপদ পিছনে হটিয়া গিয়া কন্ বলিল, "হন্হুর গরবে এ গরব তোর, সে ত মুখে লাথি মেরে চলে' গেছে, তবু এখন কিসের 'গুমান' শুনি?"

ঝুম্নি মুক্তকণ্ঠে বলিল, "কাছে থাক্, দূরে থাক্, ত্যাগ করুক বা রাখুক, আমার 'গুমান' বল্‌তে যা' কিছু তাকে নিয়ে—এতে ভুল নেই, নেই, নেই! এর ভেতর মাথা ঢোকাতে দয়া করে' তোমরা এস না! তোমাদের সবার ঠেলা হ'য়ে এই কুঁড়ের একধারে আমায় পড়ে' থাক্‌তে দাও!"

কন্ পরিহাসভরা-কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এ অপেক্ষায় লাভ?"

ঝুম্নি বিরক্তি-চঞ্চল-কণ্ঠে বলিল, "সে মহাজনীর হিসাব-নিকাশ তোমার কাছে দিতে হবে না কি? বেশ, শোনো, আমার সোয়ামী বল্‌তে যে অধিকার, এ জীবনের মত আমি তাকেই দিয়েছি! সে ফিরে আসুক, নিক্ না নিক্, আমি তার! ওপারের আঁধার ঘুনিয়ে না আসা পর্য্যন্ত তারই থাক্‌ব! তারপর কি হবে, সে ভাবনা আমার নয়। যাও, শেষ বলে' দিচ্ছি, আর বিরক্তি কর্‌তে এস না, এলে—"

হাতের টাঙ্গিটা ঘুরাইয়া রোষ-কলুষিত নয়নে সে সর্দ্দারের ছেলের মুখের দিকে চাহিল। সে বেচারী ভয়ে পায়ে পায়ে পিছু হটিয়া পিছাইয়া গেল; আর সম্মুখের দিকে চাহিতেও ভরসা করিল না।

ঠিক্ এই সময় দূরদেশে হাতের কাজ ফেলিয়া হন্হু একখানি অতি পরিচিত মুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। বাপ ছেলেকে সাবধান করিতে বলিল— "বাপজী, কাজ ছাড়িস না রে! স্বহেবের হাতে বেত, হয় ত এখনই মারবে।"

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভৌতিক গল্প

আধলা বৃষ্টি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল, বি-এ

মাত্র তিনদিন হইল, আমি দুইমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। শ্বশুর-বাড়ীতেই উঠিয়াছি। দিন পনের সেখানে থাকিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইব, এই স্থির করিয়াই ছুটি লইয়াছিলাম। কিন্তু সব ওলট-পালট হইয়া গেল। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। আমার একমাত্র মামা, বর্দ্ধমান জেলার একটী ছোটখাট জমিদার। বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক প্রায় বিশ হাজার টাকা। মাস ছয়েক হইল তিনি বিপত্নীক হইয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার নিকট হইতে এক জরুরি তার পাইলাম,—"আমি অত্যন্ত অসুস্থ। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় কলিকাতায় পৌছিব, আমার জন্য একটী বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিবে। ষ্টেশনে থাকিবে।"

তখন বেলা প্রায় নয়টা। আমার বড় শ্যালক পাশেই বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে তারখানি আগাইয়া দিয়া কহিলাম, "এখনই বাড়ীর খোঁজে বেরুতে হবে দেখ্‌ছি।"

শ্যালক তারখানি পড়িয়া কহিলেন, "আমাদের পাড়ায় হরিবাবুর বাড়ী কাল খালি হয়েছে—তবে বাড়ীটি ছোট, কুলুবে কি না বল্‌তে পারি না।"

আমি কহিলাম, "বড় বাড়ীর দরকার নেই,—মামার দু'টি ছোট ছেলেমেয়ে, লোকজন বেশী কেউ নেই। চলো, একবার দেখে আসি। আমি ত ভাবনায় পড়ে গেছলাম, এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে বাড়ী খুঁজে বের করব।"

তখনই আমরা দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাড়ীটি দেখিলাম। উপরে একখানি বড় এবং আর দুইখানি ছোট ঘর;—নীচেও তাই—তাহার মধ্যে একটী রান্নাঘর। মামার কুলাইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া বাড়ীতে আলো-বাতাস বেশ পাওয়া যাইবে। বাড়ীর মালিকের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া ভাড়া লইয়া ফেলিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে ষ্টেশনে গিয়া পৌছিলাম। ট্রেণ থামিলে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর মামাকে দেখিতে পাইলাম। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। মাস ছয়েক পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি বেশ সুস্থ, সবল, হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন। ইতিমধ্যে কোন কঠিন পীড়ার সংবাদও পাই নাই। মামার সহিত

আমার নিয়মিত পত্র-বিনিময় চলিত। ছুটী লইবার মাস খানিক পূর্ব্বেও তাঁহার পত্র পাইয়াছি। সে পত্রে কোন পীড়ার কথা ছিল না। এই অল্প কয়দিনের মধ্যে এমন কি কঠিন পীড়া হইয়াছে যে, মামাকে এতটা শীর্ণ এবং রক্তহীন করিয়া ফেলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া মামা টানিয়া টানিয়া বলিলেন, "এসেছ-বাবা, দেখ্‌ছ ত আমার অবস্থা। কোন রকমে পালিয়ে এসেছি,—এখানে এসে যদি রক্ষে পাই।" এই বলিয়াই তিনি সভয়ে কামরার চারিদিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন।

আমি আর কিছু না বলিয়া কামরার ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং তাঁহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্মের উপর নামাইলাম।

ছেলেমেয়েরা সঙ্গে ছিল না, মামার এক মাসী আমার ছোড়দিদিমা সঙ্গে ছিলেন। তিনিও নামিলেন।

মামা এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন, "আঃ, আজ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! বাড়ী পৌছেই সব বল্‌ব। বড় বিপদে পড়েছি বাবা।"

বাড়ী পৌছাইয়া মামা একটু সুস্থ হইয়া বসিলে, আমি বলিলাম, "একজন ডাক্তার আনি।"

মামা যেন একটু 'কিন্তু' হইয়া বলিলেন, "ডাক্তার? তা' আন।" তারপর একটু থামিয়া আপন-মনে বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তার? ডাক্তার কি করবে? চিকিৎসা, চিকিৎসা—কি চিকিৎসা করবে আমার? আসুক, আসুক, দেখুক একবার।"

অন্তরালে ছোড়দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মামার কি হয়েছে দিদিমা? যেন মাথা খারাপের লক্ষণ,—চেহারাও কি হ'য়ে গেছে, হঠাৎ দেখ্‌লে চেনা যায় না।"

দিদিমা ব্যথিত-কণ্ঠে কহিলেন, "আর ভাই কি বল্‌ব! এখনও যে একেবারে উন্মাদ হয়ে যায় নি,—সেইটাই ভাগ্য বলে মেনে নিতে হবে। সে যে কি কাণ্ড! কবে থেকে এখানে আস্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, কিছুতে আস্‌তে পারে না, আজ যে কি করে বেরিয়েছি তা' ভগবান জানেন।"

কি যে হইয়াছে, তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু বুঝিলাম, একটা গুরুতর কিছু কাণ্ড ঘটিয়াছে। হয় ত তাঁহার কোন নির্য্যাতিত প্রজা তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সে যাহাই হউক, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই আর কিছু না বলিয়া আমি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার আনিবার জন্য তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম।

ডাক্তার আসিলেন। বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া রোগের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে এই মত প্রকাশ করিলেন, "হ্যাঁ, এঁর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল, কঠিন কিছু রোগ হয়েছে, কিন্তু হার্ট বা লাঙ্‌স্ বেশ আছে, কোথাও এতটুকু দোষ পেলাম না। এ মনঃ ব্যাধি। কোন ওষুধ দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এঁকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন।" তারপর মামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি ভালই আছেন, দেহে আপনার কোন রোগ নেই। নিয়মিতভাবে প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করবেন, প্রচুর ফল খাবেন, বেশী করে দুধ খাবেন,—মোটের ওপর যা' যখন ইচ্ছে হবে খাবেন।

মামা বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ এবার খাব। এখানে আর তারা আসবে না,—এইবার খাব, এইবার ভাল হ'য়ে উঠ্‌ব।"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনি ত সত্যই ভাল আছেন। খাবেন বৈকি। অসুখ আপনার কিছু নেই।"

মামা বলিলেন, "তা' আমি জানি,—কিন্তু আমার কি হয়েছে তা' আপনি বুঝ্‌বেন না। আপনার বিদ্যেতে তা' কুলোবে না। আপনি এখন যেতে পারেন।"

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলে দিদিমা আমায় অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার দেখিয়েছ, ভালই করেছ। কিন্তু ডাক্তার কি কর্‌বে? রোজার দরকার।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "রোজা! কিসের রোজা?"

দিদিমা বলিলেন, "ওকে যে ভূতে পেয়েছে।"

হাসিয়া ফেলিলাম; বলিলাম, "এ সব কি বল্‌ছ দিদিমা, ভূতে পেয়েছে কি রকম?"

দিদিমা বলিলেন, "তোমরা ত হাসবে ভাই। তোমরা চারটে পাশ করেছ—বড় চাকরী করছ—"

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "তার সঙ্গে ভূতে পাবার কি সম্পর্ক।"

দিদিমা বলিলেন, "সম্পর্ক না থাক্‌লে, অমন করে হাসবে কেন ভাই। এই একটা মাস ভূতে কি উপদ্রবটাই না করেছে! যদি সে সময় কাছে থাক্‌তে তা' হ'লে বুঝতে পারতে।"

আমি বলিলাম, "উপদ্রব যে হয়েছে, তা' মামার চেহারা দেখে অনুমান করে নিয়েছিলুম,—এখন বুঝলুম, আমার অনুমানই ঠিক্। তবে ভূতে যে উপদ্রব করেছে, সে কথাটা আমার মাথায় আসে নি।"

দিদিমা বলিলেন, "তোমাদের তা' ত আসবে না, আগেই বলেছি। তোমরা ভাই, কিছুই ত বিশ্বাস কর না,—তোমাদের আর কি বল্‌ব। যদি তোমার মামাকে বাঁচাতে চাও, রোজার ব্যবস্থা কর।"

আমি বলিলাম, "এ কোলকাতা সহর, এখানে রোজা কোথায় পাব। সহরের লোকের কাছে তোমাদের ভূত-প্রেত বড় ঘেঁষে না, কাজেই—"

কথা শেষ হইল না। মামার চীৎকারে আমার কথা বন্ধ হইয়া গেল।

"এসেছে, এখানেও এসেছে,—রেহাই দিলে না, আমার প্রাণ না নিয়ে ছাড়বে না,—গেলুম গেলুম, রক্ষে কর রক্ষে কর!"

মামার এই কথাগুলো আমাদের কানে গেল। আমি দ্রুতপদে পাশে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলাম। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি, কি হয়েছে মামাবাবু?"

মামা তখন দুই হাত উঁচু করিয়া কি যেন ঠেকাই-তেছেন। কাতরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ও আমায় ঢিলিয়ে মারবে—ঐ দেখ না, কতগুলো ঢিল আমার বিছানার ওপর পড়েছে।"

সত্যই ত, আট-দশটা বড় বড় ঢিল মামার চারিপাশে বিছানার উপর পড়িয়া আছে। তাই ত এ ঢিলগুলা কোথায় হইতে আসিল?

এমন সময় একখানি আধলা ইট সশব্দে মেজের উপর আসিয়া পড়িল।

মামা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দেখো দেখো একবার কাণ্ডটা, ঐ ইট মাথায় পড়লে কি আর রক্ষে ছিল। খুব বাঁচিয়েছে। ক'দিন আর বাঁচাবে।"

দিদিমা মামাবাবুর গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "ভয় কি বাবা,—সে ত ঠিক সময়ে বাধা দিচ্ছে, ঢিল তোমার গায়ে পড়তে দিচ্ছে না।"

মামাবাবু বলিলেন, তা' ত দিচ্ছে না মাসীমা,—কিন্তু যদি ফস্‌কে এসে মাথায় পড়ে তা' হ'লেই গেছি। সেই ভয়ে ত অর্দ্ধেক প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

দিদিমা বলিলেন, "তা' ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ভয় পেলে ত চল্‌বে না বাবা,—যত ভয় পাবে, ততই সে চেপে ধরবে।"

এমন সময় পর পর তিন-চারিটি ঢিল বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। তার মধ্যে যেটা বড়, সেটা মামাবাবুর একেবারে রগ ঘেঁসিয়া গেল। মনে হইল, কে যেন ঢিলটাকে লুফিয়া লইয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিল।

আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মিয়াছিল, ইহা মামাবাবুর কোন শত্রুর কাজ। সে নিশ্চয় তাঁহার অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছে এবং ইট ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। যেমন করিয়াই হউক, এই দুর্ব্বৃত্তকে ধরিতে হইবে এবং তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, এটা কলিকাতা সহর, পল্লীগ্রাম নহে, এখানে এ সব চলিবে না।

প্রকাশ্যে মামাবাবুকে বলিলাম, "আপনি ভাববেন না মামাবাবু। এখানে ও সব বদমায়সী চল্‌বে না, এ পাড়ায় অনেকেই আমায় চেনে, এখনই আমি পাড়ার ছেলেদের খবর দিচ্ছি—তাকে পালাতে দেওয়া হবে না, ধরে আপনার সাম্‌নে হাজির কর্‌ব। বজ্জাতির আর জায়গা পায় নি।"

মামাবাবু হতাশভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কা'কে ধরবে বাবা, সে যে তোমার আমার মত মানুষের হাতের বাইরে। না হ'লে আমিই কি—"

তাঁহার কথা শেষ হইল না,—একখানি বড় ইট 'ধপ্' করিয়া তাঁহার কোলের উপর আসিয়া পড়িল।

গভীর আতঙ্কে মামাবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এই রে গেছি! গায়ের ওপর ইট পড়তে আরম্ভ করেছে,—সে কি ওর সঙ্গে পারে।"

সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কে যেন ব্যথিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সত্যি আর ঠেকাতে পার্‌ছি না, কি হবে, কি করব। না না, চেষ্টা করতে ছাড়ব না। রাক্ষুসীর হাত থেকে বাঁচাতে হবে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম—এ যে মৃতা মামীর কণ্ঠস্বর! আমি এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলাম। দিদিমা আর মামাবাবু ছাড়া আর কাহাকেও কক্ষমধ্যে দেখিতে পাইলাম না। যাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, তিনি ত ছয়মাস পূর্ব্বে স্বর্গগতা হইয়াছেন। কিন্তু—

মৃতা মামীর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চাহিয়া মামাবাবু বলিলেন, "তুমি আর কত পারবে, আমার আর রক্ষে নেই, তুমি ফিরে যাও। ও বেটীর সঙ্গে তুমি পারবে কেন? ও ছোটলোকের মেয়ে, আর তুমি—"

অপরিচিতা নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বটে!"

সঙ্গে সঙ্গে মামার চারিদিকে ঢিলের পর ঢিল পড়িতে লাগিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঢিলগুলো মামার দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না, গায়ের গাছে আসিয়াই বিছানার উপর ঝুপঝাপ করিয়া পড়িতে লাগিল।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আবার সেই অপরিচিতা নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "আজও পারলুম না,—দেখি ক'দিন আর সে আমায় ঠেকিয়ে রাখে। একটা আধলা লাগাতে পারলেই শেষ! সে যে ধরে ফেলছে, না হ'লে কবে তোমায় শেষ করে ফেলতুম। আজ সময় হ'য়ে গেছে, যাচ্ছি, আবার আসব। বিনা অপরাধে আমায়—"

হঠাৎ তাহার কণ্ঠস্বর থামিয়া গেল। মনে হইল, কি যেন বলিতে গিয়া গভীর বেদনায় তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

মামাবাবু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

দিদিমা তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বাষ্পজড়িতকণ্ঠে ডাকিলেন, "দাশু, বাবা!" তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নিমু ভাই,—শীগ্‌গির এদিকে এস, দাশু মূর্চ্ছা গেছে।"

আমি ছুটিয়া মামার শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দিদিমা ঠিকই বলিয়াছেন, মামা মূর্চ্ছা গিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল আনিয়া তাঁহার মাথায় এবং মুখে-চোখে ঝাপটা দিতে লাগিলাম।

মিনিট দুই তিন পরে মামা চোখ চাহিলেন। "আঃ, বাঁচলুম! কিছুক্ষণের জন্যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচব।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একমাস থেকে এই ব্যাপার চলছে—কিছুক্ষণ রেহাই পাই, তাই কোনরকমে বেঁচে আছি; না হ'লে কবে শেষ হ'য়ে যেতুম। আর পারি না! সেই জীবন যাবে, দু'দিন আগে গেলেই ছিল ভাল।"

তাঁহার ভয়-কাতর অন্তরে শক্তি সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "কেন ও সব কথা মনে আন্‌ছেন, মামাবাবু—আপনি যখন এখানে এসে পড়েছেন, আর আপনার কোন ভাবনা নেই,—এ কোলকাতা সহর, এখানে ভূতের ভয় দেখান বড় শক্ত; যে লোকটা আপনার ওপর এই রকম অত্যাচার করছে—তাকে আমরা ধরবই।"

মামা হাসিলেন,—কি হতাশাব্যঞ্জক সে হাসি!

মৃতা মামীর এবং এক অপরিচিতা নারীর কণ্ঠস্বর—আমার অন্তরে তখন যে বিমূঢ়ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গিয়াছিল। এখন বুঝিলাম, উহাও সেই শয়তান লোকটার কারসাজি। অলক্ষ্যে থাকিয়া ইটও ছুঁড়িয়াছে, এবং বিভিন্ন নারীকণ্ঠে কথাও বলিয়াছে। মামীর কণ্ঠস্বর ইহার নিশ্চয়ই শোনা ছিল।

মামা বলিলেন, "আমি আর ক'দিন, সে ক'টা দিন আমায় ফেলে কোথাও যেও না বাবা! ছেলেমেয়ে দুটোকে তাদের মামাবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি,—

তাদের এখানে আস্‌তে লিখে দি'—একবার শেষ দেখা দেখে নি।"

আমি বলিলাম, "তাদের আনান, কিন্তু ও সব কথা বারবার কেন বল্‌ছেন মামাবাবু,—ডাক্তারবাবু বলে গেলেন শুন্‌লেন ত, আপনার শরীরে কোন রোগ নেই—মিথ্যে ভয় পেয়ে আপনি অত রোগা হ'য়ে গেছেন—আপনি মন থেকে এই ভয়টা দূর করে ফেলুন দেখি।"

মামা আবার হাসিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি এত নির্ব্বোধ নই নিমু, যে, মিথ্যে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ব। আমি কি রকম দুর্দ্দান্ত ছিলাম, তাও ত তুমি জান,—ভয় কা'কে বলে তা' আমি জানতুম না। বড় বড় বিপদের মধ্যে আমি ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছি,—আমার মত লোককে গোটাকতক ইট ছুঁড়ে একজন ভয় দেখাবে এও তুমি বিশ্বাস কর। তা' নয় নিমু, তা' নয়।"

আমি বলিলাম, "কোলকাতায় এসে পড়েছেন, দু'দিন থাকুন, তারপর সব ব্যবস্থা করা যাবে। রাত হয়েছে এইবার কিছু খান,—ঘুমুলেই দেহটা অনেকটা সুস্থ হ'য়ে যাবে। আপনি ভাল না হওয়া অবধি আমি কোথাও যাব না। আপনার কাছেই থাকৃব মামাবাবু।"

মামা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তাই থেকো।"

আর কোন কথা হইল না। মামার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে বেশী কথা বলা উচিত নহে। বিশ্রামেরই বিশেষ প্রয়োজন।

মামার ঘরটা বেশ বড়। তাহারই আর একপাশে আমি শয়ন করিলাম। ঠিক্ পাশের ঘরেই দিদিমা রহিলেন। ক্লান্তিবশতঃ মামা অতি সত্বর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আমার একটু দেরীতে ঘুম আসে। মামার কথাই শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম। ইট ফেলার সহিত ভূতের যে কোন সম্পর্ক আছে এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। 'ভূত' বলিয়া যে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে, ইহা আমি একেবারেই স্বীকার করি না। যে কাণ্ড প্রত্যক্ষীভূত করিলাম, অন্য লোকে সহজেই ইহা ভৌতিক কাণ্ড বলিয়াই ধরিয়া লইবে। নিজের চোখে দেখিয়াছি, নিজের কানে শুনিয়াছি, ইহাই তাহারা জোর-গলায় প্রচার করিয়া বেড়াইবে। এমনই ভুল দেখা-শোনার উপরই যত ভৌতিক-কাণ্ডের ভিত্তি গড়িয়া উঠে। ধড়িবাজ শয়তান লোকের অসাধ্য কিছুই নাই, একথাটা লোকে একবার ভাবিয়া দেখে না। যাক্,—কাল এই ভৌতিক-রহস্যের জাল ছিন্ন করিয়া ইহার আসল মূর্ত্তি মামার কাছে ধরিয়া দিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। কাল প্রত্যুষেই ঐ দুর্ব্বৃত্তের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান বাহির করিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন ফর্সা হইয়াছে।

চোখ মেলিয়া দেখিলাম, মামা তখনও নিদ্রা যাইতেছেন। আমি অতি সন্তর্পণে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। দিদিমা শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দার কোণে চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তিনি বলিলেন, "এই যে উঠেছ। আর দেরী করো না ভাই, আজই সন্ধান করে একজন রোজা আন। কোলকাতার সহরে রোজা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হয় ত পাওয়া যেতে পারে। তোমাদের মত ভূত-বিশ্বাসী লোকও ত এখানে ঢের আছে। তবে অন্য রোজা খোঁজবার আগে আজ আমি নিজেই রোজাগিরি করে দেখ্‌ব দিদিমা।"

দিদিমা বলিলেন, "তোমরা পাশ করা ছেলে, তোমাদের কোন বিদ্যেয় ত ঘাট নেই। দেখো একবার চেষ্টা করো। আমরা মূর্খ, তায় মেয়েমানুষ; আমাদের কথা ত তোমরা তুচ্ছ করবেই। তবে আর একটা কথা জেনে রাখ, যদি রোজা এনে ইট ফেলা বন্ধ করতে পার, তা' হ'লেই দাশু এ যাত্রা রক্ষে পাবে, নচেৎ নয়, ভূতেই তাকে মেরে ফেলবে।"

আমি বলিলাম, "দিদিমা, তুমি কিন্তু বড্ড রেগে গেছো।"

দিদিমা বলিলেন, "রাগ আর কি করব ভাই,—দাশুর জন্যে বড্ড ভাবনা হয়েছে, কি করে সে রক্ষা পাবে। নিজের চোখে দেখেও যখন তোমার বিশ্বাস হ'ল না, তখন তোমায় আর বল্‌বার কিছু নেই। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, একজন রোজা এনে দাশুকে দেখাও।"

আমি বলিলাম, "বেশ, রোজা আনাবারই চেষ্টা করি,—রোজার সন্ধান ত আমি জানি না দিদিমা, আর পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে দেখি।"

দিদিমা উৎসাহভরে বলিলেন, "পাঁচজনের কাছে খোঁজ নিলেই রোজার সন্ধান পাওয়া যাবে। তুমি আর দেরী করো না,—এখনই বেরিয়ে পড়। সন্ধ্যার আগে যাতে রোজা আসে, তাই কর ভাই।"

"আচ্ছা" বলিয়া আমি তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম। শ্যালকদের নিকট রোজার কথা তুলিতেই তাহারা সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্যাপারটা তাঁহাদের নিকট ভাঙিয়া বলিলাম।

বড় শ্যালক বলিলেন, "বল কি হে! এ রকম গল্প ত মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাই, তবে নিজে দেখেছে এ কথা ত কেউ বলে নি। সবাই বলে, অমুকের কাছে শুনেছি—সে খুব ভাল লোক, তাঁর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না, আর তুমি নিজের চোখে দেখেছ,—নিজের কাণে মরা মানুষের কথা শুনেছ! আমাদের কিন্তু দেখাতে হবে,—এখনই যাব তোমার সঙ্গে?"

আমি বলিলাম, "গেলেই যে দেখ্‌তে পাবে তা' কি করে বল্‌ব। কখন পড়বে তা' ত জানি না।"

মেজ শ্যালক হাসিয়া বলিলেন, "আমরা যখন দেখ্‌তে চেয়েছি, তখন হয় ত ইট আর পড়বে না, মরা মানুষও আর কথা বল্‌বে না।"

আমি বলিলাম, "বেশ ত কথা রইল, যখন ইট পড়তে আরম্ভ হবে, তখন তোমাদের ডেকে পাঠাব। কিন্তু যাতে ইট পড়া বন্ধ করতে পারি, সে ব্যবস্থা আগে করতে হবে।"

এ সম্বন্ধে আমার কি বিশ্বাস তাহা জানাইয়া দিলাম।

আমার বড় শ্যালক বলিলেন, "ও সবই ত আমাদের জানা বাড়ী। চলো, একবার খোঁজ নিয়ে দেখা যাক্‌।"

অল্পক্ষণ পরে আমরা তিনজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমেই মাতুলের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্যালকদের বাহিরের ঘরে বসাইয়া আমি উপরে গেলাম। দেখিলাম, মামা বালিসের উপর ভর দিয়া বসিয়া কি যেন লিখিতেছেন। তিনি এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আমার উপস্থিতি তিনি জানিতে পারিলেন না। বুঝিলাম, মামা আজ অনেকটা সুস্থ আছেন। আমি নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়া দিদিমার সহিত দেখা করিলাম।

দিদিমা বলিলেন, "রোজার খোঁজ পেলে ভাই?"

বলিলাম, "খোঁজ করছি দিদিমা।"

দিদিমা বলিলেন, "দেরী করো না ভাই। সন্ধ্যার পর থেকে আবার সেই কাণ্ড আরম্ভ হবে। তার আগে যেন রোজা আসে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোজই কি একই সময় ভূত ইট ছোঁড়ে।"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, এই একমাস ধরে সইতে হচ্ছে।

বলিলাম, "মামাবাবু এখন ভালই আছেন, তা' হ'লে আমি রোজার সন্ধানে বেরুই।"

আমি নীচে গিয়া শ্যালককে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহির হইলাম। চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, একটা বাড়ীর ছাদ হইতে ঢিল ছুঁড়িলে, আমার ঘরের মধ্যে পড়িতে পারে। আমি বড় শ্যালককে সে কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "এ যে জীবনবাবুর বাড়ী। তিনি অতি ভদ্রলোক, আমাদের সঙ্গে বিশেষ খাতিরও আছে। তাঁর বাড়ীর ছাদ থেকে কিছুতেই ইট পড়তে পারে না।"

আমি বলিলাম, "হয় ত তাঁর বাড়ী সেই লোকটা এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে এই কাজ করছে।

বড় শ্যালক বলিলেন, "এস না জীবনবাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি', তা' হ'লেই সব জান্‌তে পার্‌বে।"

জীবনবাবুর সহিত পরিচয় হইল। তিনি সত্যই অতি ভদ্র। তাঁহার নিকট সন্ধান লইয়া জানিলাম, কোন নূতন লোক তাঁহার বাড়ী আসে নাই। তাঁহার ছাদে আলিসা নাই বলিয়া তিনি ছাদের দরজা চাবিবন্ধ করিয়া রাখেন। ছাদে তিনি কাহাকেও উঠিতে দেন না। চাবিটি সর্ব্বদা তাঁহার নিজের কাছেই থাকে। তাই ত, ঘরের মধ্যে ঢিল পড়িবার আর কোনও পথ নাই ত। তাহা হইলে আমার অনুমান মিথ্যা? ভাবিতে ভাবিতে জীবনবাবুর গৃহ হইতে বাহির হইলাম। এক-একবার মনে হইতে লাগিল, জীবনবাবু কি মিথ্যা বলিলেন? তাও কি সম্ভব? সম্ভব নয়ই বা কেন? হয় ত সেই দুর্ব্বৃত্তের সহিত জীবন-বাবুর কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতে পারে। মনে মনে স্থির করিলাম, যদি আজ সন্ধ্যার পর আবার ঢিল পড়ে, তাহা হইলে গোপনে জীবনবাবুর ছাদের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্যালকদের নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

বড় শ্যালক বলিলেন, "বেশ ত, আজ সন্ধ্যার আগেই আমরা তোমার মামার বাড়ীতে গিয়ে বস্‌ব। ঢিল যদি পড়ে, তখন দেখা যাবে। কিন্তু জীবনবাবু ত মিথ্যে কথা বল্‌বার লোক নন্‌।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু ঢিল মানুষেই ফেলে, ভূতে ফেলে না। যেমন করে হোক্ লোকটাকে ধরতেই হবে।

মেজশ্যালক বলিলেন, "তা' ত হবেই। আমাদের এ পাড়ায় ভয়ে কোন গুণ্ডা আসে না, আর একটা বাহিরের লোক এসে এখানে একজনের বাড়ী ঢিল ছুঁড়ে আমাদের চোখে ধূলো দেবে, তা' কিছুতেই হবে না। আমার বিশ্বাস আজ আর ঢিল পড়বে না।"

বড় শ্যালকও সেই কথায় সায় দিলেন। মাতুলের গৃহের দিকে আমরা অগ্রসর হইলাম। মামাকে দেখিয়া তাঁহাদের সহিত ফিরিব। আহারের ব্যবস্থা সেখানেই ছিল। তাঁহাদের নীচের বৈঠকখানায় বসাইয়া আমি মামাকে দেখিতে উপরে গেলাম।

আমাকে দেখিয়া মামা বলিলেন, "শুন্‌লুম তুমি আর একবার এসে ঘুরে গেছ। সারাদিনটা আমি ভালই থাকি। সন্ধ্যে থেকে আমি যেন কেমন হ'য়ে যাই,—যখন ঢিল মারতে আরম্ভ করে, তখন—কি আর বলব বাবা, তুমি ত নিজের চোখে সব দেখেছে। কোলকাতায় পালিয়ে এলুম, তাও ছাড়্‌লে না।"

আমি বলিলাম, "ও সব কথা আর মনেই আন্‌বেন না মামাবাবু। আজ সন্ধ্যের সময় আমার শালারা আস্‌বেন, তাঁরাও থাক্‌বেন—এ পাড়ায় তাঁদের সবাই খাতির করে, ভয়ও করে। যা' ব্যবস্থা করবার তাঁরাই করবেন, আপনি কিছু ভাববেন না।"

মামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না বাবা, ভাব্‌ব আর কি!"

আমি ধীরে ধীরে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। ঐ ত জীবন-বাবুর বাড়ীর ছাদ। ছাদে সত্যই ত আলিসা নাই। দরজাও ত বন্ধ রহিয়াছে। তবে? ছাদের দরজা খুলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে কেহ ছাদে আসিয়া লুকাইয়া থাকাও ত অসম্ভব নহে। নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল। ছি ছি, এইরূপ সন্দেহই বা কেন মনে আসে। ঢিল পড়ে, মানুষেই ফেলে যায়। 'ভূতে ঢিল ফেলে' শেষে একথাও আমার বিশ্বাস করিতে হইবে না কি!

মামা বলিলেন, "কি দেখ্‌ছ, কোন্ দিকে ঢিল পড়ে, না?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ মামাবাবু। তবে আজ আর ঢিল পড়বে না।"

মামা হাসিলেন, বলিলেন, "বৌমার ভায়েদের ভয়ে?"

আমি বলিলাম, "আমার তাই মনে হয়।"

মামা আবার হাসিলেন, বলিলেন, "তাই যদি হয়, ভালই। কিন্তু তা' হবার যো নেই।"

হঠাৎ তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, তুমি! এখন, এ সময়?"

বেদনা-ভারাক্রান্ত-কণ্ঠে উত্তর হইল, "সে যে এসেছে।" কি সর্ব্বনাশ, এ যে মৃতা মামীর কণ্ঠস্বর!

মামা কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "এখনই মেরে ফেল্‌বে, ছেলেমেয়ে দুটোকে আর দেখ্‌তে দিলে না।"

মৃতা মামী উত্তর দিলেন, "আমাকে ফাঁকি দিয়ে আস্‌ছিল, পারে নি, আমি এসে পড়েছি। আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে। পারব কি ?"

এ কি কাণ্ড! আমি কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

আমার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে একখানা আধ্‌লা ইট সজোরে মামার শয্যার উপর গিয়া পড়িল, কিন্তু মামার গায়ে লাগিল না।

তীব্রকণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠিল, "দেখি কি করে আজ তুই ওকে বাঁচাস। কতক্ষণ ঠেকাবি।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা আধলা বিছানার উপর আসিয়া পড়িল।

বড় শ্যালকের নাম করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম, "ইট পড়ছে, ইট পড়ছে। শীগ্‌গির ওপরে আসুন।"

দিদিমা কোথায় ছিলেন, তিনি ত্রস্তভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্যালকেরাও ছুটিয়া আসিলেন।

তখন মামাকে ঘিরিয়া আধলা বৃষ্টি চলিতেছিল।

বড় শ্যালক দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, এ কি ব্যাপার!"

মামার দিকে যেন চাওয়া যায় না। মাথার চুলগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ—ঠেলিয়া যেন কোটর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। তাহার শীর্ণ দেহ বেতসপত্রের মত কম্পিত হইতেছে।

দিদিমা ছুটিয়া গিয়া দুই বাহু দিয়া তাঁহার কম্পিত দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কেবল বলিতে লাগিলেন, "দাশু, দাশু, অমন করো না বাবা, অমন করো না।"

মেজ শ্যালক ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইট পড়া তখন সমানভাবে চলিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে জীবনবাবুর ছাদ হইতে মেজ শ্যালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"চাবি খুলে আমি ছাদে এসেছি—এখানে কেউ নেই। শীগ্‌গির জানালা বন্ধ করে দাও। আমি চারিদিক খুঁজে দেখ্‌ছি।"

তাই ত, জানালা বন্ধ করার কথা ত আমার একবারও মনে পড়ে নাই! যেখান থেকেই ঢিল ফেলুক, জানালা বন্ধ করিলে ঘরের মধ্যে ত আর ঢিল আসিয়া পড়িবে না। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে আমি জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

হিহিহি! মনে হইল, কে একজন নারী উপেক্ষাভরে যেন হাসিয়া উঠিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। একবার দিদিমার দিকে চাহিলাম। তিনিই কি হাসিয়া উঠিলেন? কই, তাঁহার মুখে ত হাসির কোন চিহ্ন নাই। গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাঁহার সমস্ত মুখ ভরিয়া আছে।

অপরিচিতা নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "তোরা ইট ফেলা বন্ধ কর্‌বি ?"

বড় শ্যালক বলিয়া উঠিলেন, "এই ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বের কর।"

ঘরে কোন আসবাব-পত্র নাই, মেজের উপর মামার শয্যা পাতা হইয়াছে। এখানে লুকাইয়া থাকিবার ত কোন স্থান নাই।

তবুও ঘরের এদিক-ওদিক বারকতক চাহিয়া দেখিয়া বলিলাম, "কেউ ত নেই।"

এতক্ষণ কি জানি যেন কেন ইট পড়া বন্ধ ছিল। আবার ইট পড়িতে আরম্ভ হইল। মামার তখন কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ত যাইবেই, আমারই কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

বড় শ্যালক জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "নিমাই, এ ত মানুষের কাজ নয়।"

আমি আর কি বলিব! কিন্তু ভূতের অস্তিত্ব যে আমার মন কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহে না। তাই আমার মনে হইল, সেই লোকটা নিশ্চয়ই যাদুবিদ্যা জানে, এবং সেই বিদ্যার প্রভাবে সে অদৃশ্য অবস্থায় ঘরের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে!

সেই অপরিচিতা নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "নাই বা লাগ্‌ল গায়ে ইট, ভয়ে দম বন্ধ হ'য়ে তুই মরবি। আজ এ দশা আমার কে করেছে? তুই। আমি স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করছিলুম, তুই জোর করে ধরে এনে আমার সর্ব্বনাশ করেছিস—আত্মহত্যা করতে আমায় বাধ্য

করেছিস। এই তার প্রতিফল। আমিও তোর স্ত্রীর মতই সতীসাধ্বী ছিলুম—দেখ্‌লি ত তোকে বাঁচাবার জন্যে কি চেষ্টাই না সে করেছে! পার্‌বে কেন্‌?"

আবার সেই হিহি হাসি!

আমার সারাদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় মেজ শ্যালক দ্রুতপদে কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কোথায় লুকিয়েছে ধরতে—আঁ্যা, এখনও যে ইট পড়ছে! তা' হ'লে এই ঘরেই কেউ আছে।"

তিনি ঘরময় চরকীর মত ঘুরিতে লাগিলেন।

আমার যে তখন কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। আমি জানালার গরাদে হেলান দিয়া কোনরকমে দাঁড়াইয়াছিলাম।

হঠাৎ মৃতা মামীর করুণ ক্রন্দন আমার কানে আসিয়া বাজিল—"চলে গেল, চলে গেল! পারলুম না. পারলুম না!"

আবার সেই হাসি! হিহিহি!

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "কি আনন্দ, কি আনন্দ! আমার কাজ শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে!"

দিদিমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িলেন, "বাবা দাশু রে!"

সভয়ে শয্যার দিকে চাহিলাম। মামার শীর্ণ দেহ আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। সে কি বীভৎস দৃশ্য! জিবটা কে যেন টানিয়া বাহির করিয়াছে, চোখ দু'টা কোটর হইতে প্রায় অর্দ্ধেক বাহির হইয়া আসিয়াছে!

যখন মামার শবদেহ ধরিয়া তুলিলাম, শয্যার উপর একখানি ভাঁজকরা কাগজ দেখিতে পাইলাম। মামার সেই পত্র লেখার কথা মনে পড়িল। আমি কাগজখানি তুলিয়া লইলাম।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া একটু সুস্থ হইয়া কাগজখানি পড়িলাম। দেখিলাম, মামার স্বীকারোক্তি। কি করিয়া একজন নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, নিজে তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

এখন কেহ ভৌতিক-ব্যাপারের কথা উল্লেখ করিলে, তাহা আর অবিশ্বাস করি না। আমার মন তাহা সহজে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লয়।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

রসরঙ্গ

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

গর্ব্বিত মা—"শুনেছ যতীন, রেবা এখন ইংরিজি, এ্যাল্‌জেব্রা দুই পড়ছে।"

যতীন—"তাই না কি?"

মা—"রেবা, অ রেবা, তোর মামা এসেছেন, একবার এ্যাল্‌জেব্রাতে কথা বলে' যা' না মা।"

* * *

অফিসের বড়বাবু—"আপনার দরখাস্ত পড়ে' দেখ্‌লুম আপনি গেল মাসেই চার জায়গায় কাজ করেছেন—"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আমাকে কত জায়গায় চায়।"

* * *

অফিসের ছোঁড়া চাকরকে বড়বাবু বললেন—"চুলটাকে ভারি নোংরা করে' রাখিস্—আমি ছেলেবেলা থেকেই চুলে বুরুস দিচ্ছি।"

প্রভুর মাথার দিকে চেয়ে চাকর বল্‌লে—"আজ্ঞে তাই বুঝি আপনার মাথা থেকে সব চুল উঠে গেছে।"

* * *

হাবু—"বাক্সর রঙটা কি রকম চটে গেছে দেখ্ খোকা।"

খোকা—"পালিয়ে যাই বাবা; একে ত চটে গেছে, শেষে মেরে দেবে।"

* * *

একজন অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞকে ধরে'-বেঁধে 'প্যারাডাইস লষ্ট' পড়ে' শোনান হ'ল। পড়া শেষ হ'লে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"হুঁ, সবই শুন্‌লাম; কিন্তু কি প্রমাণ হ'ল?"

* * *

পুরোদমে বিজ্ঞানের ক্লাস চলেছে। প্রোফেসার জিজ্ঞাসা করলেন—"জল যখন জমে বরফ হ'য়ে যায়, সব চেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন কিসে ঘটে?"

সাম্‌নের বেঞ্চ থেকে একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"স্যার, দামে।"

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

বিশ্ব-বৈচিত্র্য

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

—ষাট্ টাকায় মোটর গাড়ী—

বিলাতের ইঞ্জিনিয়ার বয়েস্-সাহেব এক নূতন রকমের মোটর গাড়ী তৈরী করেছেন। সবশুদ্ধ খরচ পড়েছে প্রায় ষাট্ টাকা। একটা পুরানো মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন দিয়ে এটা তৈরী। গাড়ীটাকে দেখ্‌তে এরোপ্লেনের মত—সমস্তটা হাল্কা কাঠের তৈরী। বয়েস্-সাহেব তাঁর গাড়ীতে প্রায় দেড় লক্ষ মাইল ঘুরেছেন।

*　　*　　*

—প্রার্থনার শক্তি—

দিনরাত প্রার্থনা করে' লণ্ডনের এক সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ সাহেব উইলিয়ম নরম্যান সাহেব তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। ডাক্তারেরা তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি চোখের দীপ্তি আর ফিরে পাবেন না; কিন্তু কোনোরকম অস্ত্রোপচার না করে' তাঁর চোখের পর্দ্দা দূরীভূত হয়েছে। তিনি কি করলেন জিজ্ঞাসা করায় বলেন—"কিছুই না, দিনরাত শুধু প্রার্থনা করেছি, আবার যেন দেখ্‌তে পাই।"

*　　*　　*

—কয়লা-চালিত মোটর—

আমাদের দেখা সব মোটর গাড়ীই পেট্রোলে চলে। জনৈক ইটালীয় এক মোটর বাস তৈরী করেছেন—তার ইঞ্জিন কয়লায় চলে। সাধারণ বাসের চেয়ে এতে খরচ কম্ পড়ে। কর্ত্তৃপক্ষেরা ইটালীতে কয়লা-চালিত বাসের প্রচলন করবেন স্থির করেছেন।

*　　*　　*

—বেতার কুকুর—

লণ্ডনের প্রদর্শনীতে এক অভিনব রেডিও সেট্ দেখান হয়েছে। এতে আছে দশটী লাউড স্পিকার। বড় বাড়ীর এক একটী ঘরে এক একটী লাউড স্পিকার লাগান হয়। ঘরে চোর প্রবেশ করে' যে কোনো আলোর রশ্মি সেখানে ফেল্‌লেই প্রত্যেক ঘরের লাউড স্পিকার থেকে কুকুরের ডাকের মত শব্দ বেরুতে থাকে, আর মানুষের গলায় কে যেন বলে—"কে? কে?"

*　　*　　*

—সব চেয়ে জ্ঞানী বিড়াল—

বিলাতের জনৈক রমণী পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে জ্ঞানী বিড়ালের অধিকারিণী বলে' গর্ব্ব অনুভব করেন। বিড়ালটীকে যে জিনিষ আন্‌তে বলা হয়, ঠিক্ সেই জিনিষই নিয়ে আসে। একদিন উক্ত রমণী বিড়ালটীকে দোতলা থেকে তাঁর স্বামীর মোজা আন্‌তে বল্‌লেন। বিড়ালটী মোজা নিয়ে এল, আর তারপর মোজা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল ধোবার বাড়ীর দিকে।

*　　*　　*

—আমরা কত কথা বলি—

সাধারণ লোকে বছরে এক কোটী আঠার লক্ষ কথা বলে।

*　　*　　*

—তৃতীয়বার দাঁত—

আমেরিকার রাইট্-সাহেবের পঁচাশী বছর বয়সে আবার দাঁত উঠতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন আগে তাঁর মাড়ীতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। ডাক্তার দেখে বলেছেন যে, তাঁর আবার দাঁত বেরুচ্ছে।

*　　*　　*

—অদ্ভুত কারণ—

ভিয়েনার এক নর্ত্তকী আত্মহত্যা করেছে—আত্মহত্যার কারণ এই যে, তার পায়ে আঘাত লেগে সে একটু খোঁড়া হ'য়ে গিয়েছিল।

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

দুঃস্বপ্ন

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গাগর্ভ থেকে রাত্রি বারোটার সময় অজয় যে সুন্দরী তরুণীটিকে উদ্ধার করে' নিজের বাসায় নিয়ে এলো, সে সুন্দর কি কুৎসিত এতক্ষণ তা' তার দেখ্‌বার সুযোগ হয় নি; কিন্তু এইবার ম্লান প্রদীপালোকিত সল্লান্ধকার কক্ষে তার মুখের দিকে ভাল করে' চাইতেই অজয় বিস্ময়ে দু' পা পেছিয়ে গেল। সে প্রাণপণে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো—না, এ সে নয়, সে নয়! একে সে কোনদিন দেখে নি—কোনদিন পরিচয় ছিল না এর সঙ্গে—এ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা দুঃস্থা যুবতী। কিন্তু এই রকম আত্ম-স্তোকে নিজেকে ভোলান দুরূহ তপস্যার বিষয়—আর সে তপস্যা অজয়ের নেই।

তরুণীটি এতক্ষণ ঘরের এককোণে ঘাড় গুঁজে চুপ করে' বসেছিল। বাহ্যিক চেতনার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই তার সর্ব্ব অবয়বে। অবিন্যস্ত বেশ-বাস আর জলসিক্ত চূর্ণ কুন্তলে ওকে মানিয়েছে ভাল এ কথা শঙ্করাচার্য্যকে পর্য্যন্ত স্বীকার কর্‌তে হবে। অজয় আর একবার আত্মদমন করে' প্রশ্ন কর্‌লে—কাপড়-জামাটা ছেড়ে ফেলুন। আপনার নাম কি?

—আমার নাম মায়া। মেয়েটি অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে জবাব দিলে।—কিন্তু আমাকে আপনি কেন বল্‌ছো অজয় দা'—আমি তোমাকে চিন্‌তে পেরেছি।

অজয় বিস্মিত হ'ল না; কারণ, বিস্মিত না হবার মত মানসিক বল সে ইতিমধ্যেই অর্জ্জন করেছে। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে জবাব দিলে—তোমার দৃষ্টি-শক্তির প্রশংসা করি মায়া। পৃথিবীতে এত জায়গা থাক্‌তে—ঠিক্ আমারই চোখের সাম্‌নে রাত্রি বারোটার সময় তোমার আত্মহত্যা কর্‌বার কি কারণ ঘট্‌লো—এ সব কথা পরে না হয় শুন্‌বো, কিন্তু আগে কাপড়টা তো ছেড়ে ফেলো। ওঠো, বাক্স খোল—এই নাও চাবি। আমার একখানা কাপড় আর বৌদি'র জন্যে নতুন তৈরী করানো বেনারসী সিল্কের ব্লাউস তোমার গায়ে ভালই 'ফিট্' কর্‌বে আশা করি। আমি বাইরে আছি। কাজ শেষ হ'লে আমাকে ডেকো।

মায়া যেন কী একটা বল্‌তে যাচ্ছিল—কিন্তু তার আগেই অজয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অজয় রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে বসে' কপালের ঘাম মুছলো। কাশীর সঙ্কীর্ণ গলিপথ গভীর নির্জ্জনতার ঘুমে আচ্ছন্ন। অন্ধকার আকাশ তারায় ভরা। ঝিরঝির করে' একটা বাতাস বইছে দক্ষিণ দিক্ থেকে।

আশ্চর্য্য যোগাযোগ! বিস্মৃত-প্রায় শৈশবের মহারাণী মায়া—কেমন করে', কোন্ অপরিচিত গ্রহের আকর্ষণে আজ আবার তারই জীবনে এসে দেখা দিল? এর আনন্দ আর এর বেদনা দুটোই অজয়ের মনকে প্রবল-ভাবে নাড়া দিলো। জীবন-যাপনের বিচিত্রতম বিস্ময়!

অনেকদিন আগেকার কথা। নদীয়ার কোন এক পল্লীপ্রান্তে ছিল মায়া আর ছিল অজয়। দু'জনের প্রেম ছিল নিবিড়। দুই পরিবারের মধ্যে ছিল অসম্ভব সৌহার্দ্দ্য। বয়সে সাত আট বছরের ছোট হ'লেও এই মায়াই ছিল তখন তার খেলার সাথী।

তারপর আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে। কোলকাতায় পড়তে এসেছিল মায়া আর অজয়। মায়া থাক্‌তো মেয়েদের বোর্ডিংয়ে, আর অজয় তার এক দূর-সম্পর্কের কাকার বাড়ীতে। তাদের সেই ক্ষুদ্র পল্লী-প্রান্তের প্রেম এই জন-যান-উদ্বেল সহরেও কিছুমাত্র

প্রশমিত হ'ল না। প্রত্যেক দিনের সহস্র কাজের মধ্যেও তারা মিলতে লাগ্‌লো পার্কে, সিনেমায় এবং পরস্পরের বাড়ীতে আর বোর্ডিংয়ে।

জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ। সারাদিনের রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার শেষে কোলকাতার বুকে নেমেছে সন্ধ্যার স্বচ্ছ অন্ধকার। মধুর একটি বাতাস উঠেছে, আধ তন্দ্রানত নয়নের উপর প্রিয়ার ক্লান্ত করস্পর্শের মত। সেই সন্ধ্যায় পার্কের এককোণে রেলিং ধরে' দাঁড়িয়ে আছে মায়া, প্রতীক্ষা করছে অজয়ের।

অজয় এলো, মায়া এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলো। বল্‌লে—অজয় দা', আজ এত দেরী কর্‌লে কেন তুমি?

—কাজ ছিল মায়া।

—কাজ? এখানে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসার চাইতে প্রিয়তর কাজ আর আছে না কি কিছু তোমার?

—না নেই। তোমার চেয়ে প্রিয়তর আর আমার কিছু নেই, আর থাকাও উচিত নয় মায়া, কিন্তু—

—রাখো তোমার কিন্তু। আমি যে বিপদে পড়েছি।

—কী বিপদ? অজয়ের স্বরে সামান্য একটু উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেলো।

—বাবা আসছেন পরশু এখানে।

—বাবা আসার মধ্যে বিপদটা কোথায়?

—বিপদ বাবা আসার মধ্যে নেই তা' জানি। কিন্তু তাঁর এই আসা যে কী আসা, সে তো আমি ছাড়া আর বেশী কেউ জানে না অজয় দা'!

—কথাটা খুলে বলো মায়া। তোমরা মেয়েরা লেখা-পড়া শিখে মার্জ্জিত কথার নামে যে রকম ধোঁয়া সঞ্চার কর—তা'তে আমার মত যুবকের চোখও জ্বালা করে' ওঠে।

—বাবা আস্‌ছেন আমাকে নিতে। সামনের তেরোই না কি বিয়ের খুব একটা ভাল দিন আছে, তাই—

—বিয়ে দেবেন না কি তোমার? কই একথা তো আগে—

—জান্‌তে না? কিন্তু কি করে' জান্‌বে বলো তো? আমিই কি জান্‌তাম আগে একথা? কাল এসেছে চিঠি আমার ছোট বোনের কাছ থেকে—তা'তেই সব জান্‌তে পার্‌লাম।

অজয় কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে প্রশ্ন কর্‌লে—ছেলেটি কি করে?

—কে জানে কি করে! মায়া চেঁচিয়ে উঠলো। —শুনছি না কি এম-এ, বি-এল; মুন্সেফ্‌ হবার চেষ্টায় আছে।

—ভাল। একটা নিশ্বাস ফেলে অজয় চুপ করে' গেল।

রাত্রি গাঢ়তর হ'য়ে উঠ্‌লো। দু'জনে চুপ করে' বসে' রইল পার্কের একটা বেঞ্চিতে। দু'জনেরই কথার অফুরন্ত উৎস যেন নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে। পার্ক প্রায় জনশূন্য হ'য়ে পড়েছে—এতবড় উল্লেখযোগ্য ঘটনাও তাদের চোখে পড়্‌লো না।

অনেকক্ষণ পরে কথা কইল মায়া—এ বিপদে তুমি আমাকে বাঁচাবে না অজয় দা'?

অজয়ের যেন চমক ভাঙ্‌লো। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত মায়ার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে শুধু বল্‌লো—কি করে'?

—কেন? চলো আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে অন্য কোথাও। যেখানে বাঙালী মোটে নেই, এমন দেশেও আমি যেতে রাজী আছি। তারপর সেখানে দু'জনে একটি ছোট্ট বাড়ীভাড়া করা যাবে অজয় দা'!

—না। পরিষ্কার কণ্ঠে অজয় জবাব দিলো।

—না! কেন?

—পাগলামী করো না মায়া। বাঙলা দেশের মেয়ের কথা এ নয়। তোমার বাবা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন—তা'কে অমান্য করায় বাহবা হয় তো কিছু মিল্‌তে পারে, কিন্তু সম্মান নেই।

—সম্মান! মায়া কেঁদে ফেল্‌লো!—কে চায় তোমার ওই দু' পয়সা দামের ঠুন্‌কো সম্মান? আমি যাকে ভাল-বাসি—তা'কে আমি পাবো না, একথা কিছুতেই স্বীকার কর্‌বো না!

—কা'কে তুমি ভালবাস ?

—জানি না।

—বল্‌তে চাও না ? বেশ ! এবার যাই আমি—রাত্রি হ'য়ে গেছে, কেমন ?

—মায়া চুপ করে' বসে' রইল। উত্তেজনায় তার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

—রক্ষা করতে চাও না তুমি আমাকে ?

—ঐ তো বল্‌লাম মায়া, জীবনের সব চেয়ে দরকারী জিনিষ নিয়ে নাটক তৈরী করো না। তা'তে মঙ্গল নেই। ...বেশ তো, ভালো যদি তুমি কাউকে সত্যিই বেসে থাকো, তোমার বাবাকে সে কথা জানাও—দেখো, তিনি কি বলেন ? যাকে ভালবেসেছ, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'তে পারে কি না—এ কথা ভেবে দেখেছ ?

—না। মায়া অন্যদিকে চেয়ে জবাব দিলে।

—নেহাৎই বাড়াবাড়ি ! অজয় হেসে উঠ্‌লো।—ভালবাসবার সময় এটুকু কর্ত্তব্যবুদ্ধি তোমার কাছ থেকে আশা করা অন্যায় নয় ? যদিও ইংরেজী মতে প্রেমের দেবতা অন্ধ ! আচ্ছা গুড্ নাইট ! চল্‌লাম আজকে। কাল দেখা হ'লে আশা করি তোমার কাছ থেকে ভারতবর্ষের সনাতন লক্ষ্মী-মেয়ের মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি শুন্‌তে পাবো।

অজয় চলে' গেল।

নাঃ, এরপর আর তার সঙ্গে মায়ার দেখা হয় নি। যদিও কিছুদিন পরে দেশ থেকে বোনের চিঠিতে জান্‌তে পেরেছিল, মায়া তার কুড়ি-একুশ বছরের দেওরকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। সেই মায়া আজ সুদীর্ঘকাল পরে কাশীতে এলো আত্মহত্যা করতে, আর তা'কে রক্ষা কর্‌লো কি না অজয় !

ভেতর থেকে মিষ্টি একটী স্বর ভেসে এল—ভেতরে এস অজয় দা' !

অজয় ভেতরে গিয়ে দেখলো, তারই একখানা কালো পাড় ধুতি পরে মায়া বসে' আছে। বাস্তবিক সত্যি বল্‌তে গেলে মায়ার আজও কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি—তেমনি হাস্যমুখী—যৌবনদীপ্তা—মনোহারিণী মায়া। এই কয়েক বৎসরের ব্যবধানে মাত্র সে কয়েক ইঞ্চি মাথায় বেড়েছে।

—কি খাবো অজয় দা' বড্ড খিদে পেয়েছে যে। মায়া বল্‌লে।

—তাই তো ! অজয় ভাবতে লাগ্‌ল।—আচ্ছা এক কাজ কর—ওই ষ্টোভ রয়েছে, খানিকটা চা আর মোহনভোগ তৈরী করে' নাও।

মায়া ষ্টোভ জ্বাল্‌তে বস্‌লো। এই কর্ম্মনিরতা মায়ার মূর্ত্তি অজয়ের মনে আজ একটি গভীর ছাপ এঁকে দিলো। পিঠময় একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে, হাতের চারগাছি সোণার চুড়ীর আওয়াজ আজ এই একক ঘরে যেন কোন অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতের মাধুর্য্য সঞ্চার কর্‌ছে।

—মায়া !

—উঁ।

—কোথায় ছিলে এতদিন ?

—ভারতবর্ষেই।

—ভারতবর্ষেই ছিলে তা' জানি। কিন্তু ঠিক্ কোন জায়গায়।

—বিশেষ কোন একটা জায়গায় নয় অজয় দা'। কোন্‌টার নাম কর্‌বো ?

অজয় চুপ করে' গেল। মায়া কিছু বল্‌বে না। আর বল্‌বারই বা আছে কী ? কুলত্যাগিনী নারীর বল্‌বার কথা সত্যিই আমরা তো কিছু রাখি নি। কিন্তু মায়া কেন ওর স্বামীকে ত্যাগ কর্‌লে ! সে কি ওর সাংসারিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ? স্বামী-প্রেমের অভাব ? কী জানি !...

মায়া চা আর মোহনভোগ তৈরী করে' অল্পক্ষণের মধ্যেই খেয়ে নিলে। আহা বেচারী ! হয় তো এ ক'বছর কত কষ্টই পেয়েছে জীবনে ! নিন্দা, কলঙ্ক, সময় সময় হয় তো বা অনাহার। নইলে আত্মহত্যা করা তো সোজা কাজ নয়। কতখানি আত্মগ্লানিতে মানুষ এ কাজ করে, অজয় তা' জানে।

—মায়া !

—কি অজয় দা' ?

—কেন তুমি তোমার স্বামী ত্যাগ করলে মায়া? কিসের অভাব ছিল তোমার?

মায়া খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠ্‌লো!—জীবনের সব চেয়ে অ-দরকারী জিনিষ নিয়ে নাটক তৈরী করো না অজয় দা' তোমার মত সাধুপুরুষের মুখে ও কথা মানায় না।

অজয় চম্‌কে উঠ্‌লো। হঠাৎ তার মনে পড়ে' গেল—ঠিক্ এই কথাটাই সে উচ্চারণ করেছিলো মায়াকে উপদেশ দিতে, যেদিন পার্কে মায়া তার সাহায্য-প্রার্থনা করে।

—থাক্ তবে স্বামীর কথা। কিন্তু আত্মহত্যা কেন কর্‌তে যাচ্ছিলে—সে কথাও কি আমায় বল্‌বে না।—অজয় মৃদুস্বরে বল্‌লা।

—না। কিন্তু ওকে আত্মহত্যা বলে না অজয় দা'! ওকে বলে আত্মবিলোপ! আত্মহত্যার চেয়ে ওটা উঁচু-দরের।

—অদ্ভুত তোমার ছেলেমানুষি যুক্তি মায়া! আচ্ছা, এ প্রশ্নও থাক্! এইবার বল তো কে তোমার সেই ভালবাসার পাত্রটি,—যার প্রেমে তুমি বিয়ে বন্ধ কর্‌তে আমার সাহায্য চেয়েছিলে? তার নাম বল্‌তে আপত্তি আছে কিছু?

—কিছু না। আজ আমি তোমাদের সমস্ত সামাজিক ভদ্রতা-রক্ষা আর আপত্তির বাইরে বাস করি।—তার নাম অজয়।—চেন তাকে তুমি?

—অ-জ-য়! হঠাৎ ঘরের মধ্যে ভূত দেখ্‌লেও অজয় এত আশ্চর্য্য হ'ত না। তুমি বল্‌ছো কি মায়া? আমাকে।

—হ্যাঁ, তোমাকেই।—তোমার মত অন্ধ মানুষকে আমি যে একদিন কেন ভালবেসে ছিলাম—সেই কঠিন প্রশ্নের জবাব আমি আজ এই পাঁচ বছর ধরে' প্রতিদিনের অনাহার আর দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে দিয়েছি। আর শুধু কি তাই? যে কঠিন বিদ্রূপের আঘাতে আমার ব্যাকুল কান্না তুমি শুকিয়ে ফেলেছ, তা' কি আমি কখনো ভুল্‌বো ভাবো?

—না ভাবি নে। অজয় বিমূঢ়ভাবে বল্‌লো।—কিন্তু আমাকেই—আচ্ছা, তাই যদি হয় তবে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'তে পারে,—এ ধারণাও তোমার ছিল?

—নিশ্চয় ছিল। শুধু কি আমার? আমার মা আর তোমার মা দু'জনেই এ কথা ঠিক্ করেছিলেন। বিয়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার মা আশা করেছিলেন—তোমার কাছ থেকে প্রতিবাদ আসার। কিন্তু এ নিয়ে কথা কাটাকাটি কর্‌বার মত সময় ও ধৈর্য্য আমার নেই অজয় দা'। আমি ক্লান্ত।

আঁচল বিছিয়ে মায়া মাটিতে শুয়ে পড়লো।

আলোটা কমিয়ে দিয়ে অজয় নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌লো। এমনি সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে যে, মায়ার সঙ্গে এক ঘরে শোয়া যে তার চলে না—এ কথাটা তার একবারও মনে পড়্‌লো না।—শুন্‌তে পেলো মায়া নিজের মনেই বল্‌ছে—আজ তুমি জানতে চাইছ—আমি স্বামীত্যাগ কর্‌লাম কেন? কেন ত্যাগ করবো না—এই কথাটার কি তুমি কোনও জবাব দিতে পারবে? ছেলেবেলা থেকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে যাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন রচনা কর্‌লাম,—একজন এম-এ, বি-এল-এর গোটাকতক ডিগ্রী আমাকে তার থেকে বঞ্চিত কর্‌বে—এ অহঙ্কার আমার সইবে না। বেশ করেছি! আত্মহত্যা কর্‌বোই তো—কেন কর্‌বো না,—একশোবার কর্‌বো! মায়া চুপ করলো।

সারারাত নিদ্রাহীন চিন্তার পর ভোরের দিকে অজয় ঠিক কর্‌লো,—সকালে উঠেই মায়ার কাছে সে বিয়ের প্রস্তাব কর্‌বে। যে মায়া শৈশবে দিয়েছে তাকে উৎসাহ, কৈশোরে প্রেম, আর যৌবনে মোহ,—তাকে যদি পেয়েছে আজ মুঠোর মধ্যে, আর তা'কে যেতে দেবে না সে।—লোকনিন্দা? পিতা-মাতার ক্রোধ? তা' হোক্, তবু এরাও একদিন ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে, কিন্তু এই অক্লান্ত প্রেমকে আর সে কাছছাড়া করবে না। মায়া! হ্যাঁ, তা'কে বিয়ে করে' অপরিচিত কোন নগরে গিয়ে নীড় সে বাঁধবে। আমি তোমাকে চিনেছি মায়া, কাল সকালেই তার মহিমময় পরিচয় তুমি পাবে!—

সকাল সাড়ে সাতটা। চট্ করে' অজয়ের ঘুমটা ভেঙে যেতেই সে ধড়মড় করে' বিছানার ওপর উঠে বসে' ডাক্‌লো—মায়া!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দ্রুতবেগে নীচে নেমে অজয় তন্নতন্ন করে' সব জায়গা খুঁজে দেখ্‌লো, কিন্তু কোথাও মায়ার চিহ্নমাত্র নেই। কাল যে কাপ-প্লেটে মায়া চা আর খাবার খেয়েছিল—তা' যথাস্থানে গুছোনই আছে। ঘরটির কোনোখানেই কোনো এক হতভাগিনীর রাত্রি-যাপনের ইতিহাসের কোনোরকম স্বীকৃতি নেই।

স্তম্ভিত হ'য়ে খাটের ওপর বসে' পড়ে' অজয় ভাবতে লাগ্‌লো—তবে বোধ হয় রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে কোন-রকম দুঃস্বপ্ন দেখে থাক্‌বে। নইলে এতদিন পরে—! হ্যাঁ, দুঃস্বপ্নই দেখেছে সে!

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

হীরকাঙ্গুরীয়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ

রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় বিমান ক্লান্তদেহে মেট্রোপলিট্যান বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেলে ফিরিয়া আসিল। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সে পশ্চিমাঞ্চলে কার্য্যানুরোধে গিয়াছিল। সপ্তাহ তিনেক পূর্ব্বে সে ফিরিবে না এইরূপ কথা ছিল, সুতরাং তাহাকে অসময়ে অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ম্যানেজার বরদাবাবু কিছু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাহার একটু কারণও ছিল। বিমান তাঁহার একজন সম্মানিত অতিথি। হোটেল-ভবনের দ্বিতলের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহখানি সে কয় মাস যাবৎ অধিকার করিয়া আছে, টাকা আদায় করিতে কিছুমাত্র গোলযোগ হয় না—বরঞ্চ সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই সে অগ্রিম টাকা দিয়া থাকে। এ হেন ব্যক্তির প্রতি তিনি কিছু অবিচার করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপায়ই বা কি ছিল ?

অর্থাৎ, বিমান চলিয়া যাইবার পর একদিন একজন ধনী বিহারী জমীদার অকস্মাৎ এই হোটেলে পদার্পণ করিয়া সপ্তাহখানেকের জন্য একখানি ভাল ঘর চাহিলেন। কোন ঘরই তাঁহার মনঃপূত হইল না, অবশেষে চারিগুণ অতিরিক্ত ভাড়ায় বরদাবাবু বিমানের ঘরখানি পুনরায় ভাড়া দিলেন। পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিমান প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই বিহারী জমিদার রায়-সাহেব হুজুরীমল ঘরখানি ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন।

ম্যানেজার-মহাশয় ঘরখানি খুলিয়া দিলে বিমান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার জিনিষ-পত্র একটু অগোছান হইয়া আছে,—গৃহমধ্যে কয়দিনের ধূলি ও ছেঁড়া কাগজ-পত্র সঞ্চিত হইয়া আছে। বরদাবাবু অসাধু ছিলেন না। একজন মার্কিন মনীষী বলিয়াছেন—"যখন কি বলা উচিত সে বিষয়ে সংশয় জন্মিবে, তখন সত্য কথা বলাই নিরাপদ।" তিনি সমস্তই বিমানকে খুলিয়া বলিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—যে কয়দিন ঘরখানি ব্যবহৃত হইয়াছিল, সে কয়দিনের ভাড়ার টাকাও বিল হইতে বাদ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিহারী জমিদারটীর উদ্দেশে নানা কটূক্তি করিয়া তিনি বলিলেন যে,—সে যেরূপ অভদ্র ব্যক্তি, পূর্ব্বে জানিলে কখনও তাহার মত লোককে তিনি থাকিতে দিতেন না। তাহার দ্বারা তিনি যথেষ্ট অপমানিত ও অপদস্থ হইয়াছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, সেইজন্য এখন ভৃত্যদিগের দ্বারা ঘর ঝাঁট দেওয়াইতে পারিলেন না, তজ্জন্য যেন বিমান কিছু মনে না করে।

অগত্যা বিমান স্বয়ং তাহার বিছানা বিছাইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিল। শ্রান্ত হইলেও আজ নানা কারণে তাহার মন সুপ্রসন্ন ছিল। যে কার্য্যের জন্য সে পশ্চিমে গিয়াছিল তাহাতে সে সাফল্যলাভ করিয়াছে। "আল্‌ফা এণ্ড ওমেগা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী"র জন্য সে অনেক টাকার জীবন-বীমার প্রস্তাব সই করাইয়া আনিয়াছে। একটা মোটা থোক্ টাকা পাওয়া যাইবে। কোম্পানীতেও দেড়শত টাকা বেতনের চাক্‌রীটা পাকা হইবে। তাহা হইলে সে ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া লইতে পারিবে। সরসীকে বিবাহ করিয়া তাহার জীবনের স্বপ্ন সফল করিতে পারিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুই

উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় যেমন মানুষের নিদ্রা হয় না, আনন্দাতিশয্যেও সেইরূপ হয় না। বিমানেরও নয়নে নিদ্রা নাই। বিশেষতঃ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার সৌভাগ্যের কথা সরসীকে জানাইতে পারিতেছে ততক্ষণ তাহার স্বস্তি নাই। বিবাহের ত একপ্রকার সব ঠিকই আছে, কেবল হাতে হাজার দুই-আড়াইটাকা

জমিলেই সে সরসীকে লইয়া সংসার পাতিবে। সে টাকার ত এইবার যোগাড় হইল।

ক্রমে রাত্রি সাড়ে বারোটা, একটা বাজিয়া গেল। বিমানের নিদ্রা আসিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বারাণ্ডা দিয়া কে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। বিমান জিজ্ঞাসা করিল—"কে ?"

—"আমি বিমান দা', আমি হরি।"

—"এত রাত্রে কি দরকার ?"

—"দাদা, দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছি না, তাই এলাম এখানে, যদি পাই।"

নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিমান বলিল—"দেখো ঐ দেরাজটার ওপর।"

হরিচরণ কিন্তু দেরাজটার উপর না দেখিয়া দেরাজের নীচে ইতস্ততঃ হাতড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমান তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল—"ওখানে কি দেখ্‌ছো ? বল্‌লাম না যে, দেরাজের ওপর দেশলাই আছে।"

—"শুন্‌তে পাই নি দাদা।" বলিয়া একটু থতমত খাইয়া হরিচরণ প্রস্থান করিল।

বিমানের নিদ্রা আর হয় না।

রাত্রি তিনটার সময় আবার গৃহমধ্যে খট্‌খট্‌ শব্দ শুনিয়া বিমানের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। "কে ? কে ?" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল—দেরাজটার নীচে কে কি খুঁজিতেছে। বিমান পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কে ?"

—"আমি যদু, চিন্‌তে পারছ না দাদা।"

—"ওখানে কি করছ ?"

—"কিছু না, কিছু না। একটা সিগারেট নিতে এসেছিলাম।"

—"হাসালে যদু, সিগারেট কি দেরাজের তলায় থাকে না কি ?"

—"না না, সিগারেট নয়—একটা জিনিষ হারিয়েছে।" বলিয়া অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করিতে করিতে যদু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিয়া গেল। সাড়ে চারটাও বাজিল। নাঃ, ঘুম আর হবে না। রেলে দীর্ঘপথ আসিয়া গ্রীষ্মকালের রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া শরীরে ভয়ানক অস্বস্তি হইতেছিল। বিমান মনে করিল, উঠিয়া স্নান করা যাউক। হোটেলের এই সুবিধাটুকু ছিল, ইলেক্‌ট্রিক পাম্পে জল তুলিয়া ছাদে একটি ট্যাঙ্ক পরিপূর্ণ করিয়া রাখা হইত, সুতরাং জলের কষ্ট ছিল না।

বিমান স্নান সমাপনান্তে ঘরে ঢুকিবে, এমন সময় দেখিল একটী যুবতী ত্রস্তপদে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কে এ যুবতী ? সরসীই ত! এ কি সম্ভব ? সে কেন তাহার গৃহে এই অসময়ে ঢুকিয়াছিল ?

বিমান আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ দেরাজের নীচে দেখিল কি একটা জিনিষ চক্‌চক্ করিতেছে। সে কুড়াইয়া লইয়া দেখিল—সেটা একটি হীরকাঙ্গুরীয়। ইহারই জন্য কি হরি, যদু ও রমণী তাহার গৃহে ঢুকিয়াছিল ?

তিন

হোটেলের দ্বিতলে দক্ষিণ পশ্চিমকোণের ঘরটী যে ভাড়া লইয়াছিল—তাঁহার নাম ছিল মিস্ সরসীবালা দেবী, বি-এ, বি-টি। সে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। হোটেলের অধিকাংশই গভর্ণমেণ্ট বা মার্চ্চেন্ট অফিসের কেরাণী, তেমন উচ্চশিক্ষিত কেহ ছিল না। এম-এ উপাধিধারী বিমানবিহারী এই হোটেলের একমাত্র অধিবাসী, যাহার সহিত সাহিত্য ও অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে আলোচনা করিয়া কোন শিক্ষিতা মহিলা তৃপ্ত হইতে পারিত। সুতরাং বিমান ও সরসীর মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় এবং এই বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনিষ্ঠতর আকার লাভ করে। বিমান কিছু টাকা জমাইয়া লইতে পারিলে এবং চাকুরীতে পাকা হইলেই বিবাহ করিবে এইরূপই স্থির হইয়াছিল। বিমানও সেইজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

প্রাতে নীচে হলঘরে সকলে প্রাতঃরাশের জন্য সমবেত হইত। কেবল বিমান ও সরসী নিজ নিজ কক্ষে গ্রীষ্ম-

কালে কখন কখন কক্ষ-সংলগ্ন দক্ষিণের বারাণ্ডায় তাহারা চা-পান করিত।

বিমান বারাণ্ডায় চা-পান করিতে আসিয়া দেখিল, সরসীও বারাণ্ডায় বসিয়া চা-পান করিতেছে। বিমানকে দেখিয়া সরসী স্মিতমুখে কহিল—"কাল রাত্রে এলেন বুঝি? এখানে কি হয়েছে, শুনেছেন?"

বিমান বলিল—"কি করে শুনব আর? কাল ত রাত্রি সাড়ে এগারটায় এসেছি, এসেই শুয়েছি।"

সরসী তখন বলিল—"আপনি যাবার পর, একটা বেঁটে মোটা বিহারী ভদ্রলোক হোটেলে এসে উপস্থিত। বরদাবাবু কিছুতে রাজী হবেন না, অনেক কাকুতি-মিনতি করে আপনার ঘরটা ত সে দখল করে নিলে। তার-পর দু'দিন হ'ল চলে গেছে। কাল এক চিঠি এসে হাজির বরদাবাবুর কাছে। এখানে থাকবার সময় না কি তার একটা দশহাজার টাকার হীরার আংটী হারিয়ে গেছে। আংটীটি না কি তার মাতামহ কোথাকার এক রাজাসাহেব তাকে দিয়েছিলেন। লিখেছে, যদি কেউ আংটী খুঁজে দেয় ত তা'কে সে দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। আর যদি আংটী না পাওয়া যায় ত পুলিশদ্বারা বরদাবাবুকে যত-দূর পারে অপদস্থ ও অবমানিত করবে। বরদাবাবু ক্রোধে ও লজ্জায় আত্মহারা হয়েছেন; কারণ, তাঁর হোটেলের যে সুনাম আছে তা' যেতে বসেছে। আজ সকালে তিনি আপনার ঘরখানি নিজের সুমুখে ঝাঁট দেওয়াবেন বলে ঘরখানি নোংরা অবস্থাতেই ফেলে রেখেছেন।"

বিমান এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না সরসীকে। সে কেন তাহার ঘরে ভোররাত্রে ঢুকিয়াছিল। আংটীটি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে? তাহার মন কি এত নীচ? না পুরস্কারের প্রত্যাশায়? আংটীটি বিমান পাইলে পাছে সে পুরস্কার লাভ করে এবং অর্থপ্রাপ্তির পর বিবাহের প্রস্তাব করে সেইজন্য কি বিমান যাহাতে আংটীটি না পায় সেই চেষ্টায় আংটীটি সরাইতে গিয়াছিল। তাহার কি বিমানকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই? রমণীর হৃদয় রহস্য বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয়। বিমান এতদিন তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। আজিকালিকার শিক্ষিতা মেয়েরা যেরূপ হইয়া থাকে—সরসীও তাই। এতদিন তাহাকে মিথ্যা প্রলোভনে নাচাইয়াছে। বেশ তাহাই হউক। সরসীই পুরস্কারের টাকা লউক। বিমান তাহার সৌভাগ্যের কথা আর প্রকাশ করিবে না—নিজমুখে আর বিবাহের প্রস্তাব করিতে যাইবে না।

চার

প্রাতঃরাশ সমাপনান্তে সরসী প্রথামত পার্কে বেড়াইতে গেল। শরীর সুস্থ নহে বলিয়া বিমান কোথাও গেল না। সরসী বাহির হইয়া গেলে সে নীরবে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। সরসীর টয়লেট টেবিলের একটি ড্রয়ারে ধীরে ধীরে হীরকাঙ্গুরীয়টি স্থাপন করিয়া সন্তর্পণে নিজ কক্ষে প্রত্যাগমন করিল।

সন্ধ্যার সময় হোটেলে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিল। বিহারী জমিদারটি একটা মোটা লাঠি হস্তে ম্যানেজারবাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া মহা হাঁকডাক আরম্ভ করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ বরদাবাবু ক্রোধ ও লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে অনভ্যস্ত হিন্দীতে বলিতে লাগিলেন—"হাম্ কি আপনার হীরার আংটী চুরি করা হ্যায়? সমস্ত ঝাঁট দিয়ে দেখা হ্যায়, হীরার আংটী কোথাও নেই হ্যায়। হিঁয়া সব ভদ্র ভদ্র লোক থাক্‌তা হ্যায়, চোর ছ্যাঁচোড়কা জায়গা নেই হ্যায়।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে! রায়সাহেব হুজুরীমল স্বয়ং সমস্ত অনুসন্ধান করিবেন এবং হারাণো আংটীটি না পাওয়া গেলে পুলিশে খবর দিবেন জানাইলেন।

যখন এদিক ওদিকে অনুসন্ধান চলিতেছে, তখন সরসী বিমানকে বলিল—আপনি কি আপনার দেরাজের নীচেটা খুঁজে দেখেন নি? আমার বিশ্বাস, ঐখানেই আছে; কারণ, হুজুরীমল বলেছিল—পাছে আংটী পরে থাক্‌লে রেলে চুরি যায়, সেজন্য সে তার ট্রাঙ্কে তুলে রাখ্‌বে মনে করেছিল। ট্রাঙ্কটি দেরাজের কাছে খুলে সে ওটা তার মধ্যে রেখেছিল। কিন্তু প্যাক বার করবার সময়, দু'-তিনবার জিনিষ-পত্র ট্রাঙ্ক হ'তে বার করবার ও পুনরায় পোরবার সময় নিকটেই কোথাও পড়ে যাবার সম্ভাবনা। আপনি যদি না দেখে থাকেন, এখনই নিজে গোপনে দেখুন। আংটীটা

পেলে আপনি পুরস্কারেরর টাকাটা পাবেন। তা' হ'লে—" বলিতে বলিতে সরসীর গণ্ড দু'টী লজ্জায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

বিমান বলিল—"না, আমার দেবরাজের ভেতর নেই। হয় ত তোমার টয়লেট টেবিলের ড্রয়ারে আছে। তুমি বরঞ্চ একবার খুঁজে দেখ।"

সরসী বলিল—"আপনি ঠাট্টা কচ্ছেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি ওটা আপনার দেরাজের নীচেই আছে।"

বিমান বলিল—"আমিও নিশ্চয় বল্‌তে পারি ওটা তোমার টেবিলের ড্রয়ারে আছে। দেখো দেখি—"

বিমান ড্রয়ারটা টানিল। সরসী সবিস্ময়ে দেখিল—তাহার ভিতর দশহাজার টাকা মূল্যের হীরার আংটীটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

সরসীর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে বলিল—"কোনও শত্রু আমাকে চোর অপবাদ দেবার জন্য এই কাজ করেছে। কে এমন কাজ কর্‌লে? আমি ত কারও কোন অপরাধ করি নি!" সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমান বলিল—"চোর হবে কেন? তুমি এই আংটী নিয়ে ঐ বিহারীটার কাছে গিয়ে বলো না যে, ওটা তুমি আমার ঘরের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছ। তা' হ'লেই ত তুমি প্রতিশ্রুত দু' হাজার টাকা পাবে। সে টাকায় তুমি সংসার পেতে মনোমত বিবাহ করে নব জীবনের সূত্রপাত কর্‌তে পার্‌বে। তুমি ত এই পুরস্কারের লোভেই শেষ রাত্রে আমার ঘরে গিয়ে দেরাজের তলাটা হাতড়াচ্ছিলে?"

সরসীর ক্রন্দনের বেগ থামিল না। সে বলিল—"আপনি, আপনি এমন কথা বল্‌তে পারেন—এমন ধারণা পোষণ কর্‌তে পারেন আমার ওপর? তবে শুনুন, আংটী আমিই পেয়েছিলাম, একদিন ভোরের সময়—আপনার ঘরের সাম্‌নে বারান্দায়। আমি ভেবেছিলাম যে, এই আংটীটা যদি আপনার দেরাজের তলায় রেখে আসি, আপনি খুঁজ্‌লেই আংটীটা পাবেন এবং তার সঙ্গে পুরস্কার, তা' হ'লে—"

"তা' হ'লে আমরা দু'জনে সংসার পেতে বস্‌ব। বেশ, তাই হবে। কিন্তু তার দরকার ছিল না।" বলিয়া বিমান তাহার পশ্চিম-যাত্রার সাফল্য বর্ণনা করিল।

এই সময়ে বরদাবাবু বিমানকে ডাকিলেন। বলিলেন—"বিমানবাবু, এত অপমান আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কখনও কারও নিকট ভোগ করি নি। আমি আজই কেশব-বাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব—আদালতে এর কোন প্রতিকার আছে কি না? এইবার বেটা আপনার ঘর অনুসন্ধান কর্‌তে যাচ্ছে। আমি আর ঘুরতে পারি না। আপনি দাঁড়িয়ে একটু দেখুন।"

বিমান ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যে,—সেই মোটা বেঁটে বিহারী জমিদার মহাশয় মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া দেরাজের নীচে হাত ঢুকাইয়া আংটীটি খুঁজিতেছেন। বিমান আংটীটি পকেটে করিয়া আনিয়াছিল। এক্ষণে সেটা ধীরে ধীরে তক্তাপোষের একদিকে রাখিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখিয়ে ত ইধার, চৌকীকা নীচে কেয়া একঠো চিজ ঝক্‌ঝক্ কর্‌তা।"

জমিদার-মহাশয় তখন দেহটাকে বিপরীত দিকে ফিরাইয়া চৌকীর নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার দন্তগুলি বিকশিত হইয়া উঠিল।

বরদাবাবু উকীল বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে আর একবার বিমানের ঘরে দেখা করিতে আসিলে হুজুরীমল আংটী প্রাপ্তি-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং অনর্থক কটু-কাটব্যের জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বরদাবাবু এই সর্ত্তে তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন যে,—প্রতিশ্রুত পুরস্কারটী বিমানকে দিতে হইবে; কারণ, তাহার সাধুতার জন্যই তিনি উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে বিমান ও সরসীর বিবাহোপলক্ষে যে প্রীতিভোজ হয়, মেট্রোপলিট্যান বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেলের ম্যানেজার বরদাবাবুই তাহার সমুদয় আয়োজনের ভার লইয়াছিলেন এবং বিহার হইতে বিখ্যাত জমিদার রায়-সাহেব হুজুরীমল নব-দম্পতীকে শুভাশিস্ সহ এক বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ সংবাদ-পত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

ভ্রমণ

জৈনতীর্থের পথে

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দে

পরদেশ, নিজেদের বাড়ী-ঘর নাই ; অথচ, মাথার উপর আচ্ছাদন না হইলে চলে না, কাজেই আমরা গিরিডির উশ্রীনদীর ধারে 'রোজ কটেজ' বাড়ীখানি ভাড়া লইয়াছিলাম। এই বাংলোটী বড় সুন্দর, সম্মুখেই ক্ষীণধারায় প্রবাহিতা উশ্রীনদী, তাহার পরপার দিগন্ত-প্রসারিত শ্যামল ক্ষেত্র, কত সুন্দর সুন্দর বনবীথি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে সুশোভিত—দেখিলে মনে হয় দূর আকাশের কোলে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আমরা প্রায় আড়াই মাস কাল এখানে আসিয়াছি। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে গোবিন্দবাবু পল্লী-মাতার মুক্তবায়ু উপভোগের নিমিত্ত দিনকয়েকের জন্য গিরিডিতে আসিলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে আমরা সকলে মিলিয়া গল্প-গুজব করিতেছি, এমন সময় গোবিন্দবাবু বলিলেন : এত কাছে থেকে পরেশনাথ যাবেন না ? চলুন, একদিন পরেশনাথ অভিযানে যাওয়া যাক্।

প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য ; কাজেই ঠিক হইল পাঁচই ফাল্গুন রবিবার যাত্রা করা যাইবে। শুক্রবার দিন গিরিডির বার্গাণ্ডা বাজারে গিয়া দুলালবাবু (আলি হোসেনের) মোটরখানি ঠিক্ করিয়া আসিলেন। ভাড়া ধার্য্য হইল, আট টাকা। রবিবার প্রত্যূষে পাঁচটার সময় আমাদের যাত্রা করিতে হইবে। শনিবার বিকালে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন কিনিয়া ঠিক্ করিয়া রাখা হইল। পরদিন ভোর চারিটায় আমরা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বিশেষ আনন্দ ছেলেদের। সন্তোষ, মণ্টু, গীতা ইহারা সকলে ক্রমাগত সদরে গিয়া দেখিয়া আসে, আর বলে : গাড়ী এখনও এলো না কেন ?

সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা রওনা হইলাম। কুয়াসাচ্ছন্ন আঁধারের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী চলিল। নীরব নিস্তব্ধ পথের বুকের উপর দিয়া মোটর ইঞ্জিনের শোঁ শোঁ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই বোধগম্য হইতেছিল না। ক্রমে অন্ধকারের মসীরেখা আলোর সাথে মিশিয়া ঘোলাটে হইয়া আসিল। তখন আমরা গিরিডির সীমানা ছাড়াইয়া কয়লা খাদের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। দূর হইতে দেখিলাম, বামদিকে কয়লা খাদের অফিস-বাড়ীগুলি বৈদ্যুতিক আলোকের তারার মালায় বিভূষিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোলিয়ারী গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আমরা হাজারীবাগ রোডে পড়িলাম। এই পথের দু'দিকে দু'টী নেড়া পাহাড়। তাহাদের মধ্য দিয়া সরু পথটী চলিয়া গিয়াছে বরাকরের দিকে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এ স্থানটীর নাম জোড়া পাহাড়।

তখন নব অরুণালোক উদ্ভাসিত প্রভাতের আলো ঘন

জঙ্গলের দৃশ্যাবলী আমাদের সম্মুখে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিল। হঠাৎ সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বৃহদাকার বৃক্ষলতাদিশোভিত গগনস্পর্শী পরেশনাথ পাহাড। ক্রমে আমরা বরাকর নদীর সেতুর ধারে আসিয়া পড়িলাম। এই নদীতে জল খুব কম। বালুর চড়ার মধ্যে মধ্যে রূপালি ধারার ক্ষীণস্রোত বহিয়া চলিয়াছে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে! বরাকর নদীর সেতু পার হইয়া যাইতেই গাড়ী 'ফুল মোসনে' ছুটিয়া চলিল। তারপরই আসিল সাত চড়াই। এ রাস্তাটি আঁকিয়া-

বরাকর ব্রিজ

বাঁকিয়া সর্পাকৃতিতে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। এখানে বেশী জোরে গাড়ী চালাইলেই বিপদ। কাজেই বেগ কমাইয়া দিতে হইল। বামদিকের রাস্তায় একখানি ফলকে লেখা আছে—পরেশনাথের পথ। গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের সহিত যে রাস্তাটা মিলিত হইয়াছে, তাহাকে পশ্চাৎ করিয়া আমরা পরেশনাথের পথে অগ্রসর হইয়া মধুবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গিরিডি হইতে মধুবন আঠার মাইল। দু'মাইল মধুবনের পথ চলিয়া আমরা একেবারে গিরিরাজের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে তিনটী ধর্ম্মশালা আছে, এগুলি জৈনদের। প্রথম শ্বেতাম্বর, দ্বিতীয় দিগম্বর, তৃতীয় তেওড়া পন্থী। গাড়ী হইতে নামিয়া ধর্ম্মশালাগুলি দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, এগুলি আয়তনে খুব প্রশস্ত। এককালীন বহুলোক থাকিতে পারে। এখানে অনেকগুলি মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে হীরা-জড়োয়া-শোভিত পরেশনাথজীর মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ। গিরিডি হইতে আসিবার সময় 'হারমিটেজে'র মতিবাবু পরেশনাথজীর পূজা চড়াইতে দিয়াছিলেন। দেবদর্শন করিয়া মতিবাবুর পূজা শ্বেতাম্বরের ম্যানেজার চাঁদমলবাবুর নিকট জমা করিয়া দিলাম। এই ধর্ম্মশালায় অনেকগুলি ডুলি আছে। যাঁহারা পদব্রজে উঠিতে অক্ষম, তাঁহারা এই ডুলি ভাড়া লইয়া পর্ব্বত চূড়ার উপর মন্দিরে আরোহণ করেন। দুইজন বাহক লইলে তিন টাকা, চারিজন লইলে পাঁচ টাকা ডুলি ভাড়া দিতে হয়।

এই স্থান হইতে একজন সাঁওতাল কুলী গীতাকে কোলে লইবার জন্য লইলাম। যখন আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম, তখন বেলা সাড়ে সাতটা। এই পাহাড়ের উচ্চতা 'সি লেবেল' হইতে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। চড়াই পথে সমস্ত পাহাড়টা ছয় মাইল। ক্রমশঃ এই গগনচুম্বী পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করা গেল। কিয়দ্দূর আসিয়া একটা উপত্যকা পাইলাম। এখানে একটা বস্তী আছে। একটা বৃদ্ধা কয়েকগাছি লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া গোবিন্দবাবু আমাদের সকলের জন্য এক একগাছি লাঠি লইলেন। ঘনসন্নিবিষ্ট ছায়াশীতল অরণ্যের মধ্যে সকলেই পার্ব্বত্য-পথের বন্ধু যষ্ঠীর উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে দু'ধারের গভীর জঙ্গল দৃষ্টিগোচর হইল। বনের ভিতর হইতে তখন নানা-প্রকার পক্ষীর কলকাকলী ভাসিয়া আসিতে লাগিল। দেখিলাম, বন্যবিড়াল, হরিণ, ময়ূর, ও নানারংয়ের বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী অরণ্যের মধ্যে চরিয়া বেড়াইতেছে। দু'ধারে অসংখ্য বৃহদাকার পাহাড়ী গাছ ও মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর পুষ্পশোভিত বৃক্ষ। বনফুলের মিষ্ট সৌরভে বনভূমি আমোদিত করিয়াছে। একরকম গাছ দেখিলাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছসমেত বেগুনীর ছিটে দেওয়া শ্বেতপুষ্প—অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে পার্ব্বত্য বনপথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। আমরা ইহার কয়েকটী

গুচ্ছ ভাঙ্গিয়া লইলাম। জঙ্গলে অনেক রকম ফলের বৃক্ষও আছে। প্রায় আড়াই মাইল আসিবার পর একটী নবনির্ম্মিত পান্থশালা পাইলাম। এখানে পথের দু'ধারে দু'টী ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। এই ঝরণার নাম সীতানালা। আমাদের বেশ একটু ক্লান্তি আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পান্থশালায় বসিয়া পরে পাহাড়ের ঢালুপথে ঝরণায় নামিলাম। অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর স্বচ্ছজলের আছাড়ি-পিছাড়ি লীলা, সে বড় মধুর!

এই পান্থশালার একটু উপরে টিনের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে কয়েকটী যাত্রী-পথিক বসিয়া আছে দেখিলাম। এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া উঠিব মনে করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, নীচে হইতে চা প্রস্তুতের সরঞ্জাম লইয়া দুইজন লোক উপরে আসিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহারা উঠিতে দিল না; নিকটে আসিয়া বলিলঃ আপনারা একটু চা পান করে যান্।

ক্লান্ত হইয়াছিলাম, চা পানে উপকার হইবে ভাবিয়া সম্মত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে পিতলের পাত্রে তাহারা প্রত্যেককে এক এক গেলাস গরম চা দিয়া আপ্যায়িত করিল। এমন সময় খুব এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল। শীতের দিনে বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে আবার আমরা পথশ্রান্ত, এ সময় গরম চা ভারী আরামপ্রদ হইল। তখন কেবলি মনে হইতে লাগিল, কি সেবাপরায়ণ এই জৈনজাতি! আমরা আবার যাত্রা সুরু করিলাম। একটী পাহাড়ী রমণী একটী বালকের হাত ধরিয়া আমাদের সাথী হইল। আমাদের দেখিয়া বলিলঃ মাঈজী, এহিবার বহুত জবর চড়াই মিলেগি!

সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, পথটী সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের মত গৃহী-যাত্রীর পক্ষে এই জবর চড়াই অতিক্রম করা মোটেই সহজসাধ্য নহে। এবার পথের কষ্ট বেশ বুঝিতে পারা গেল। একটু আগাইয়া যাইতে-না-যাইতেই দাঁড়াইয়া দম্ লইতে হয়। এই অবস্থায় কিছু পথ গিয়া দেখি পথটী দু'দিকে গিয়াছে। বামদিকের পথ জল-মন্দিরের দিকে, দক্ষিণদিকের পথ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় পরেশনাথজীর মন্দিরে গিয়া মিশিয়াছে। বামদিকের রাস্তা ধরিয়া আমরা উঠিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে দেখি দু'টী সাধু আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ঠিক্ মধ্যস্থলে তাহাদের দণ্ড-কমণ্ডলু পার্শ্বে রাখিয়া বসিয়া আছেন। আমরা ত মহা সমস্যায় পড়িলাম! তাঁহাদের সরিতে বলিতে পারিতেছি না, পাছে সাধুর কোপে পড়িতে হয়; অথচ, যাইবার পথও নাই। কোনরকমে পাশের জঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইবার রাস্তা করিয়া লইয়া আমরা জল-মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের পথটী স্বল্প-

জল-মন্দির
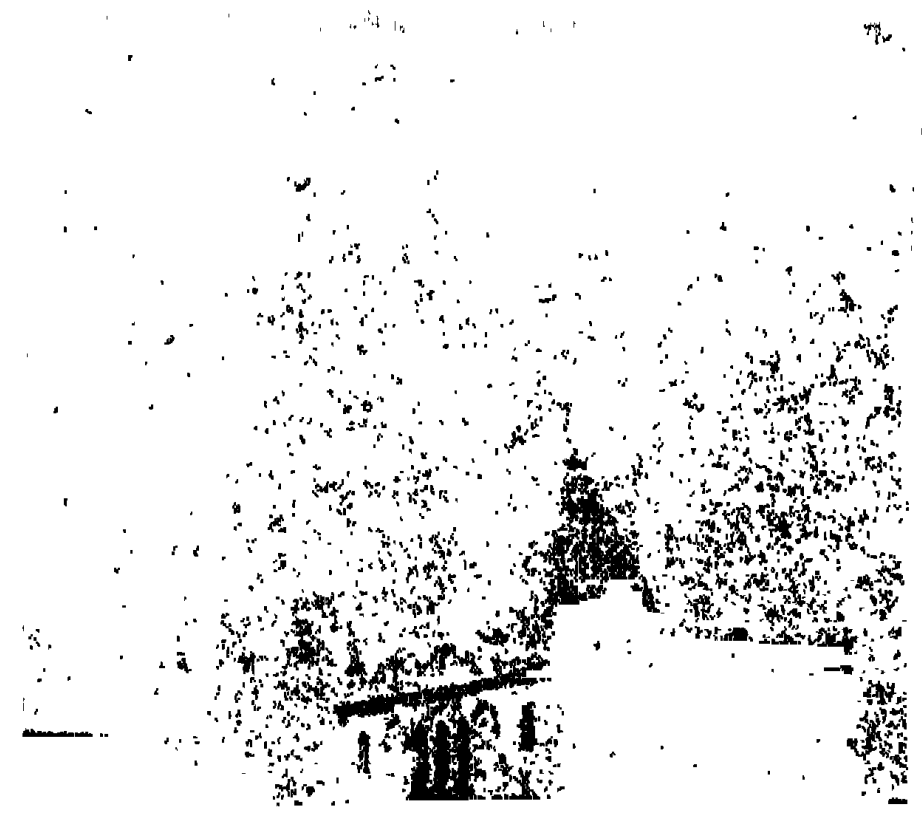
পরিসর। একটী বাঁকের মুখে রাস্তা খুব সরু, ও পাশেই প্রায় দু'হাজার ফিট্ নীচু খাত। নীচের দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। জল-মন্দিরের দিকে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে, ও পরেশনাথজীর সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এই পরেশনাথ পাহাড়ে জল পাওয়া যায় না। কিন্তু এই জল-মন্দিরের বৃহৎ জলাধারটীতে পর্ব্বত নিঃসৃত জল পড়িয়া চৌবাচ্চাটী ভর্ত্তি হয়। সেই জল লোকে তৃপ্তির সহিত পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। সেইজন্য এই স্থানটীর নাম জল-মন্দির। আমরা এখানে দর্শন ও বিশ্রাম করিয়া উপরের মন্দিরের পথে উঠিতে লাগিলাম। কিছুদূরে আসিতেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আশীটা সিঁড়ি মিলিল।

এগুলি গিয়া একেবারে মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন হইয়াছে। মন্দিরে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা সাড়ে বারোটা। বহুদূরে হাজারীবাগ রোডের ডাকগাড়ী যাইতেছে। আমরা দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলাম, যেন একখানি ছেলেদের খেলার গাড়ী চলিয়া গেল। দারুণ তৃষ্ণায় আমাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই যে পথশ্রান্তি, তাহা মন্দিরের ভিতর গিয়া বসিতেই এক নিমেষে দূর হইয়া গেল। ভিতরে বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। মর্ম্মর-মণ্ডিত হর্ম্মতল যেন বরফের রাজ্য! এখানে সিংহাসন মধ্যে পরেশনাথজীর চরণ দু'খানি
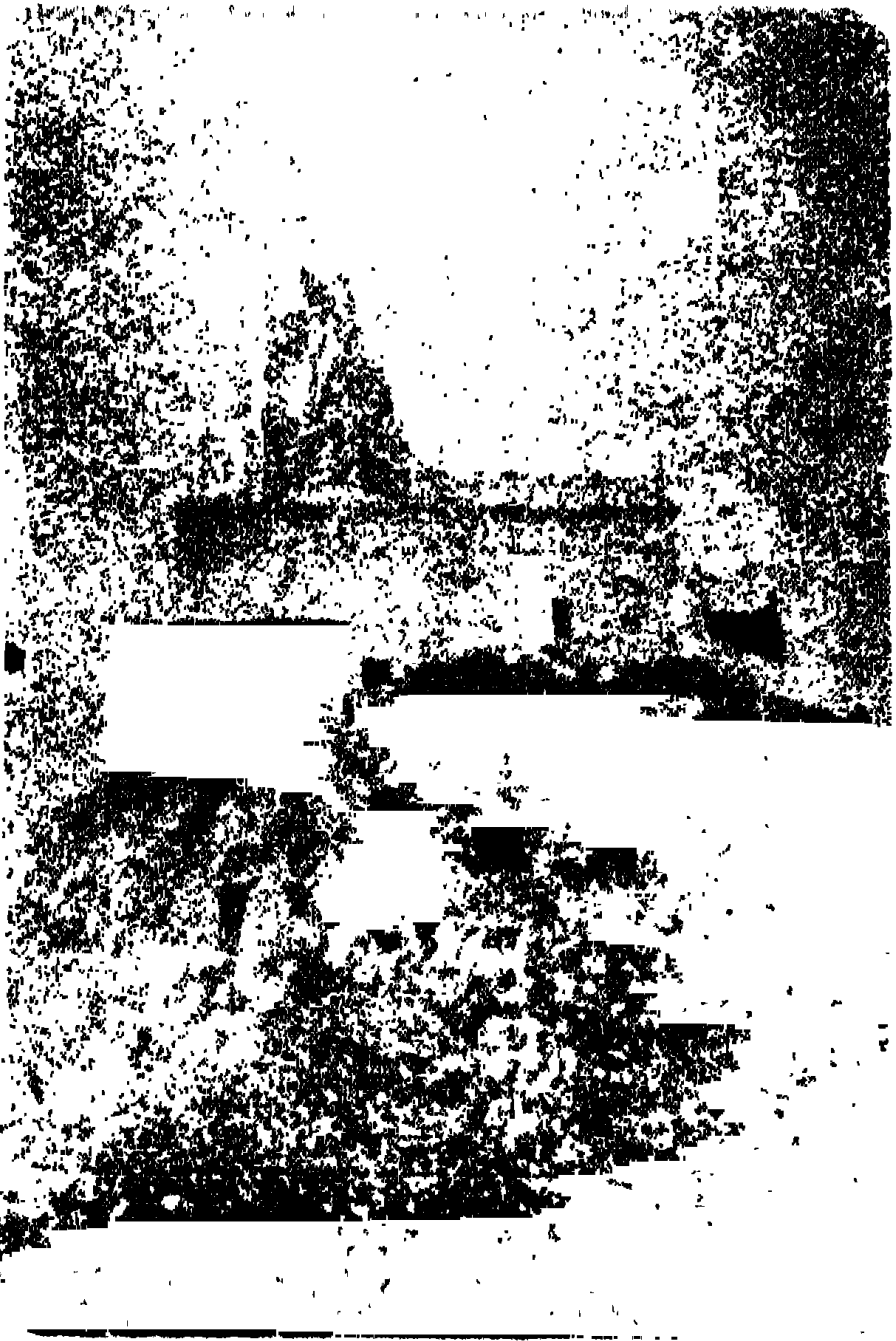
পরেশনাথের মন্দির

বিরাজিত। আর জল-মন্দিরে মূর্ত্তি আছে। আমরা যাইবার পর পরেশনাথজীর পূজা শেষের আরতি আরম্ভ হইল। এক হস্তে পঞ্চ-প্রদীপ, অপর হস্তে ঘণ্টা লইয়া ঐ দেশীয় পূজারী ব্রাহ্মণ আরতি ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ভাষায় বেদগান আরম্ভ করিলেন। মন্দিরের দ্বারবান দামামা বাজাইতে লাগিল। পর্ব্বত কন্দরে শঙ্খ ও ঘণ্টার সহিত পূজারী কণ্ঠনিঃসৃত বেদগান আমাদের মনে কল্পনার এক স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিল। পরে আমরা বাহিরে বারান্দায় আসিয়া মন্দিরের দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মন্দিরের গঠনটী অতি সুন্দর। উপরে অসীম নীলাকাশ। সেই অফুরন্ত নীলের কোলে শ্বেত মর্ম্মরমণ্ডিত মন্দির। নিম্নে দিগন্তপ্রসারিত সবুজের মেলা! চোখের সম্মুখে সে এক শ্বেত ও নীলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সমাবেশ! এরূপ অভিনব দৃশ্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। আমরা এখানে জলযোগ সারিয়া লইলাম। মন্দিরের পূজারী পানীয় জল দিলেন। আড়াইটার সময় আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। যে পথে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে নহে; যে রাস্তায় ডাকবাংলো আছে, সেই পথে অবতরণ করিতে লাগিলাম। এদিকের রাস্তাটা খুব সরু হইয়া গিয়াছে। দেড়হাত আন্দাজ চওড়া—নীচের দিকে চাহিলে ভয় হয়। নামিবার পথে পাহাড়ের গা বাহিয়া বামদিকে একটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে একেবারে পর্ব্বতের পদনিম্নে। রাস্তার মুখে ফলকে লেখা আছে—নিমিয়াঘাটের পথ। আমরা নামিয়া সেই তুমুখো রাস্তায় পড়িলাম। এখান হইতে পথ একটা হইয়া গিয়াছে। উঠিবার সময় যেমন দমের কষ্ট হয়, পদব্রজে নামিতে গেলে তেমনই খুব সতর্ক হইয়া অবতরণ করিতে হয়, একটু অন্যমনস্ক হইয়া কাহারও নামিবার উপায় নাই। আমরা উঠিয়াছিলাম পাঁচ ঘণ্টায়, আর নামিলাম তিন ঘণ্টায়। 'রোজ কটেজে' ফিরিলাম রাত্রি সাড়ে আটটায়।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দে

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী
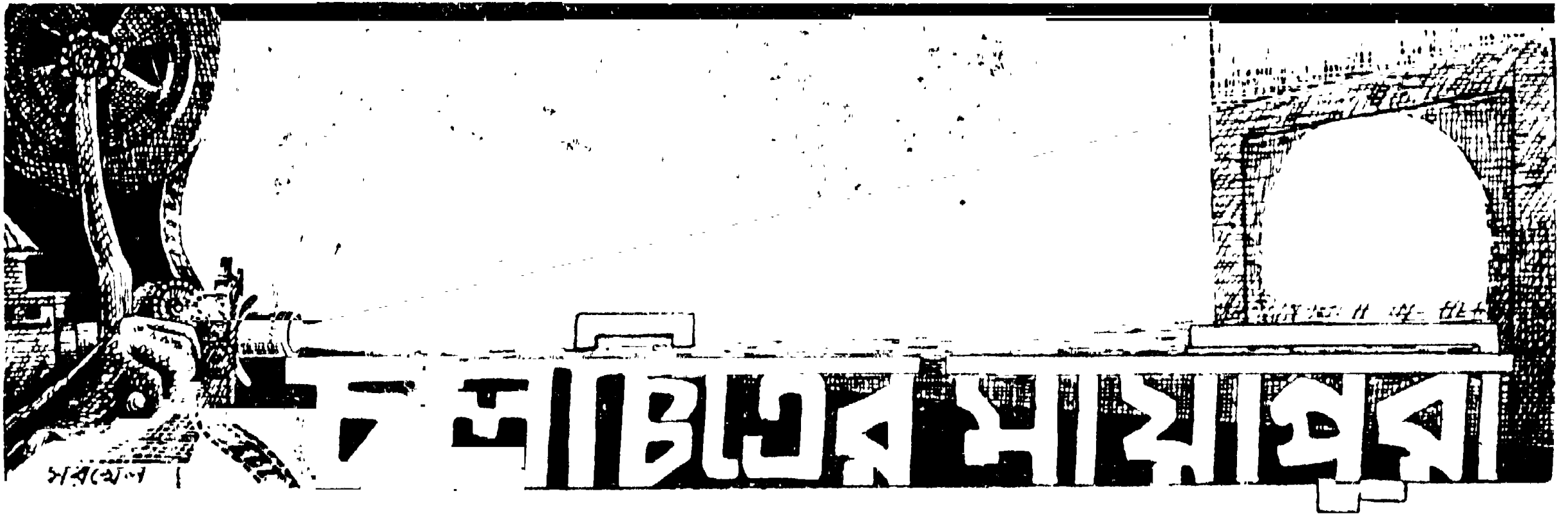
ভবঘুরে চার্লি

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভাবতে পারো একটা ভবঘুরের ছবি—পরণে তার ঢিলে ছেঁড়া প্যাণ্ট—বুকে এটে-বসা একটা কোট—মাথায় গোল টুপি—পায়ে দোমড়ান লম্বা একজোড়া বুট, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সে চলেছে পা ফাক্ করে', মুখে তার লেগে আছে করুণ একটুকরো হাসি। ভাবতে পারো এমন একজন ভবঘুরের ছবি—চোখ বুজে একটুও না ভেবে বল্‌তে পারো তার নাম?

চার্লি চ্যাপ্‌লীন—।

হয় তো ভাবছো ওর সম্বন্ধে আর নতুন কি শোনাবে। চার্লি এই টকির যুগে কথা কইবে না—এ কথা জানে না পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে। চার্লির নতুন ছবির নাম—তাও আর কারুর জান্‌তে বাকী নেই। চার্লিকে তুমি আমি—সকলেই জানি তার কথা—সকলেই শুনেছি। কিন্তু আমি জানি চার্লি চ্যাপ্‌লীনকে চেনে এমন লোকের সংখ্যা আঙুলে গুণে শেষ করা যায়। চার্লির অন্তরকে চেনা—আর গভীর অতলস্পর্শী সমুদ্রকে কল্পনা করা—দুটো প্রায় সমানই। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চার্লি, 'হলিউডে'র শ্রেষ্ঠ ধনী চার্লি,—তাকে আজও পৃথিবী ভাল করে' বুঝ্‌লে না—বা বুঝ্‌তে চাইলে না। তার বিকৃত অঙ্গভঙ্গীতে মানুষ হাস্‌লে—তার চোখের করুণ দৃষ্টি দেখে ফেল্‌লে দু' ফোটা চোখের জল, কিন্তু কেউ জান্‌লে না জীবনে কত কঠোর মূল্য দিয়ে তবে তাকে

চার্লি চ্যাপ্‌লীন

অর্জন কর্‌তে হয়েছে মানুষকে হাসাবার ওই প্রতিভা—অন্তরের কত পুঞ্জীভূত বেদনার প্রতীক চোখের ওই করুণ দৃষ্টিটুকু।

বিভারলি হিল্‌সের সাদা মার্কেল পাথরের প্রাসাদোপম বাড়ীতে বাস করে যে চালি—যশ, অর্থ আর সম্মান যার পায়ের তলায় লুটিয়ে আছে—কেউ জানে না সেই চালির অভাব কোথায়। কেউ জানে না চালির ক্ষুধিত আত্মা আজও কেঁদে বেড়ায় কিসের আশায়—চালির ভবঘুরে মন আজও আত্মভোলা কিসের সম্মোহন স্পর্শে।

Nigel Bruce

প্রেম—।

চালি প্রেমিক এ কথা বিশ্বাস করতে পারো। 'সিটি লাইট্‌সে'র সেই ভবঘুরে—কালা মেয়েটীর জন্যে যে জেল পর্যন্ত খাটতে একটুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলে না, সেই চালিকে বাস্তব জীবনে ঠিক অমনিভাবে কল্পনা করতে পারো। কল্পনা করতে পারো চালির জীবন-পথে অভিসার করেছে কত নারী—চালির যৌবনের পাত্র ভরে' দিয়েছে কত যুবতী তাদের রূপ দিয়ে—তাদের হাসি দিয়ে—তাদের প্রেম দিয়ে। চালির প্রতিভার মত অতলস্পর্শী এই চালির প্রেম। চালির আত্মার ক্ষুধার শেষ নাই।

চালির জীবন-পথ ভরে' গেছে সুন্দরী নারীর পদরেখায়—একজনের পর অপরজন করেছে অভিসার। অদম্য চালির প্রেম প্রত্যেককে ধরেছে জড়িয়ে—প্রত্যেকের যৌবনের হোমশিখায়—চেয়েছে নিজের যৌবনের শুদ্ধি—প্রতি নারীর মনের মুকুরে সে দেখ্‌তে চেয়েছে নিজেকে—কিন্তু সেইখানেই চালি অতৃপ্ত। প্রতিটী দিনের অবসানে চালির স্বপ্নের হয়েছে পরিবর্ত্তন—কিন্তু তার সঙ্গে পা ফেলে চল্‌তে পারে নি কোনও নারী।

তাই লিটা গ্রে আর মে রিভ্‌স্ আর জর্জ্জিয়া হেল তার জীবনে একদিন বহু উৎসব, বহু আনন্দ নিয়ে এসেছে—কিন্তু তাদের সেই ফেনায়িত যৌবনের পানপাত্রে চালির অতৃপ্ত অদম্য তৃষ্ণাকে দিতে পারে নি শান্তি। কে জানে চালি এদের ভালবেসেছিল কি না—কে জানে চালির মনের মণিকোঠায় এরা অধিকার করে' আছে কতটুকু স্থান! কিন্তু চালির জীবন-পথ থেকে তাদের একদিন যেতে হয়েছে সরে'—চালির আত্মা ক্ষণেকের জন্যে এসেছে নিভে। কিছুদিন সে কাটিয়েছে বিভারলি হিল্‌সের নির্জ্জন বাড়ীতে—গত-স্মৃতির বোঝা হ'য়ে—কিছুদিন সে হারানো প্রেমের করেছে তপস্যা। কিন্তু এই কিছুদিনই, তারপরই আবার জড়িয়ে ধরেছে নতুন কোনও অবলম্বন—আবার হাসি—আবার উৎসব—কিন্তু সেও এই কিছুদিন। ক্রমশঃ আবার নিরাশা—স্মৃতির সমাধির মাঝখানে আবার কাঁদিন দিন-যাপন। এইভাবে বিভারলি হিল্‌সের বাড়ীতে ক্রমান্বয়ে একবার জলেছে আলো—বাগানে ফুটেছে ফুল—আবার তারপরই নেমেছে আঁধার—সারাবাড়ী ভরে' উঠেছে বিরহী আত্মার দীর্ঘশ্বাসে।

Madge Evans

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভবঘুরে চালি ঘুরেছে ইউরোপের সহরে সহরে—মনে তার বহু বিচ্ছেদের অবসাদ—নয়নে তার জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতার ছবি। এই ইউরোপে চালি পেয়েছে নীল-নয়না সারি মারিজার দেখা। কিছুদিনের জন্যে আমরা তাকে দেখেছি চার্লির পাশে পাশে। চালির চোখে তখন আবার জ্বলেছে আলো—আবার সে চেয়েছে নিজেকে দেখ্‌তে সারির নীল-চোখের দীপ্ত মুকুরে। কিন্তু চালির যৌবন যে চির-

পথিক, আবার সে পা বাড়িয়েছে নতুন কোন অভিযানের পথে।

অনেকদিন বাদে আবার আমরা চার্লির দেখা পেলাম —পাশে তার আছে ট্রাউজারপরা হাস্যমুখী একটী মেয়ে।

James Dunn

পলেট্ গডার্ড—।

'হলিউডে'র এক ষ্টুডিওতে তখন তোলা হচ্ছে 'কিড্-ফ্রম্ স্পেন্।' একদল মেয়ে নাচ্ছে আর গান গাইছে। তারই মাঝে দাঁড়িয়েছিল একটী মেয়ে—সকলের চেয়ে সুন্দরী—সকলের চেয়ে হাস্যমুখরা। দূরে বসে' চার্লি দেখ্লে—তার চোখ বহুদিন বাদে আবার উঠলো জ্বলে'—আবার সে তার মানসীর পেয়েছে সন্ধান। প্রতিটী রাত্রি চার্লি যার স্বপ্ন দেখেছে—যাকে পাবার আশায় তার মন-প্রাণ হয়ে আছে উন্মুখ—সেই কল্পনার প্রেরণা আবার এসে দাঁড়িয়েছে তার সাম্নে। চার্লির রক্তের প্রতি কণায় কণায় সুরু হলো তাণ্ডবের মাতন—তার প্রতিটী ইন্দ্রিয় হ'য়ে উঠলো উন্মুখ।

নাচের আসর থেকে চার্লি ধরেঃ নিয়ে এল মেয়েটীকে। অবুঝ মেয়েটী সবে এসেছে 'হলিউডে।' জীবনের এই ঘূর্ণমান আবর্ত্তে পড়ে' সে তখন উঠেছে হাঁপিয়ে—হঠাৎ সে পেয়ে গেল একটা অবলম্বন। দিনের পর দিন দেখা যেতে লাগ্লো পলেট্ আর চার্লিকে পাশাপাশি মোটরে—একসঙ্গে তারা নাচ্ছে কোনও 'কাফে'তে বা বসে' আছে কোনও এক চাঁদনী রাতে—সমুদ্রের বেলাভূমিতে।

নিষ্কলঙ্ক বোকা মেয়েটীকে চার্লি গড়ে' তুল্তে লাগ লো নিজের আদর্শে—জীবনে তার যত কিছু কল্পনা ছিল, যত কিছু প্রেরণা ছিল সব সে উজাড় করে' দিলে পলেটের কাছে। চার্লির জীবনে আবার এল সেই সব রাত্রি—যে রাত্রি কাটে শুধু ছোট ছোট মধুর স্বপ্ন দেখে—যে রাত্রির নিস্তব্ধতায় শোনা যায় কোনও অতিথির পদধ্বনি—যে রাত্রির হিম-শীতল অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করা যায় কোন সুন্দরী মেয়ের নবনী কোমল স্পর্শ।

আমেরিকার সমাজ আর একবার উঠ্লো মেতে। কাগজগুলো তবু এতদিন পরে লেখ্বার মত একটা খবর পেলে। লিটা গ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর থেকে চার্লি যেন এতদিন ছিল অন্যমনস্ক। বড় বড় হরফে তারা প্রচার করতে আরম্ভ করলে—পলেট্ আর চার্লির মিলন-কাহিনী—পলেট্-ই যে চার্লির ভবিষ্যৎ স্ত্রী, এও জানিয়ে দিতে তারা ছাড়্লে না। চার্লির আর পলেটের ফটো নানা বেশে নানা ভঙ্গীতে কাগজের পাতায় পাতায় ছাপা হলো। গুজবে গুজবে আর একবার সারা ইউরোপ আর আমেরিকা মাত্লো।

কিন্তু পলেট্ আর চার্লি—দু'জনে দু'জনের আরও কাছে ক্রমশঃ সরে' এল। চার্লি আবার নিজেকে ভুল্লে। বন্ধুদের কাছে তার মুখে খালি লেগে থাকে পলেটের কথা—তার কথা বল্তে গিয়ে নিজেকে সে ফেলে হারিয়ে। কথায় কথায় চার্লি বলে' ওঠে—"পলেট্কে তোমরা কেউ জানো না—তার হৃদয়ে শুধু আছে আলো, আর চোখে জ্বল্‌ছে বুদ্ধির দীপ্তি—তার সঙ্গে না মিশ্লে তাকে বোঝা যায় না।"

"Aunt Jemima"

আমরা সত্যিই হয় তো পলেট্কে বুঝি না; কিন্তু এটুকু বেশ অনুভব করি যে, তার সেই বুদ্ধির দীপ্তি চার্লির ভগ্ন-

জীবনে এনেছে বৈদ্যুতিক প্রেরণা। এটুকু বুঝি পলেট্ তার হৃদয়ের আলোয় যাকে বরণ করেছে সে চালি— আর এও জানি চালি আবার তার হৃদয় বিলিয়েছে—অন্য কারুর কাছে নয়, পলেটেরই কাছে।

পলেট্-ই চালির নবতম প্রেম—তাকে নিয়েই আবার সে আরম্ভ করেছে তার জীবনের জয়যাত্রা। চালির জীবনে পলেট্ এসেছে বসন্তের মত—কোকিলের কুহুরব আর বহু পুষ্পের সৌরভ নিয়ে—বৃদ্ধ চালিকে সে করে' তুলেছে নবীন। চালি আবার যুবক হয়েছে—কপালের প্রতিটি কুঞ্চিত রেখা আবার এসেছে মিলিয়ে—বহুদিন পরে আবার তার ঠোঁটে ফুটেছে বঙ্কিম সেই হাসি।

বিভারলি হিল্‌সের বাড়ী আর অন্ধকার নয়। বসন্তের আগমনে বনানী যেমন হয় মর্ম্মরিত—পলেটের পদচিহ্ন আবার চালির বাড়ীতে তেম্‌নি ডেকে এনেছে উৎসবের বান। সারাদিন তার কাটে হাসি আর হল্লা করে'। কিন্তু সন্ধ্যায়—যখন অন্ধকার ধীরে ধীরে নামে চারপাশের মাঠের ওপর—ঘরের ভেতর হ'য়ে ওঠে ধূসর—সারা বাড়ী ভরে' যায় নির্জ্জনতায়—প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের কাছে পাশা-পাশি গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে চালি আর পলেট্। ধূপের মৃদু গন্ধে তখন ঘর ওঠে ভরে'। একটু পরেই শোনা যায় অস্পষ্ট গুঞ্জরণ—অনাগত ছন্দময় কবিতার মত। সেই ঘরে—তোমার, আমার বা অন্য কারুর প্রবেশ নিষেধ! সেখানে—কইতে দাও তাদের দু'জনকে কথা—পৃথিবী যদি তাদের চোখে ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হ'য়ে যায়—তা'তেই বা ক্ষতি কি?—তাদের মন-প্রাণ খুলে কথা কইতে দাও।

আবার কোনও এক গভীর রাতে—জ্যোৎস্না যেদিন অজস্র ধারে পড়্‌ছে ঝরে'—আকাশ যেদিন তারার মালায় গেছে ভরে'—সেদিন দেখ্‌তে পাবে—নির্জ্জন পথ বেয়ে চলেছে দু'টী নরনারী। দু'পাশের গাছ থেকে ঝরে' পড়ে একটির পর একটি পাতা—আর তাদেরই মাড়িয়ে এগিয়ে চলে—পলেট্ আর চালি। নিস্তব্ধ রাত্রি—বিস্তৃত আকাশ—মূক হ'য়ে তাদের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে—আর তারা দু'জনে এগিয়ে চলে—আঙুলের শিহরণে বলে সহস্র কথা—প্রতিটি পদক্ষেপে সৃষ্টি করে কবিতা।

আজও এমনিভাবে চালির পাশে আছে পলেট্। বহু নারীর পদচিহ্ন আছে এই চালির জীবনে আঁকা—তাদের কোনটি বা গ্যাছে মিলিয়ে, আর কোনটি বা যায় নি আজও। কে জানে চালির ক্ষুধিত অন্তরে পলেট্ কতখানি তৃপ্তি এনেছে—কে বল্‌তে পারে চালির জীবন-রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় কতক্ষণের জন্যে। কিন্তু ক'দিন বাদে যদি তার পাশে দেখো নতুন কোনও মেয়েকে—তবে যেন বিস্ময়ে চোখ বড় করো না।

চালির যৌবন যাযাবর—সে ভালবাসে চল্‌তে। পথে মেলে কত পান্থশালা—কত নারীর সঙ্গে হয় দেখা—তার যৌবনের পাত্র থেকে সে ঢালে একটুখানি সুধা—তারপর আবার এগিয়ে চলে। প্রতি নারীর মধ্যে চালি করে নিজেকেই আবিষ্কার—নারী যেন তার যৌবনের অজস্র অমৃত ধারণের জন্যেই সৃষ্টি।

আজও হয় তো চালির যাত্রার শেষ হয় নি—পলেট্ গডার্ডও হয় তো তাকে ধরে' রাখ্‌তে পারবে না। আবার যদি আমরা ভবঘুরে চালিকে তার চিরন্তন ছড়ি-বুট আর টুপি নিয়ে চল্‌তে দেখি জীবনের রাজপথ বেয়ে, তা'তেই বা আশ্চর্য্য হবার কি থাক্‌তে পারে। তার এই যাযাবর যৌবনের পথযাত্রার শেষে তাকে যদি আমরা দেখি সম্পূর্ণ একা—তা' হ'লেও বল্‌বার কিছু থাক্‌বে না—কারণ, সে যে চালি—অন্তর যে তার চির-পথিক।

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মরমী

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

সবই অদ্ভুত অনাসৃষ্টি। ধরণধারণ ত একটুও ভাল নহে। সাধে কি আর বুড়ী শাশুড়ী অমন করিয়া জ্বলিয়া মরেন। জ্বালা যে সব তাঁরই। একটা দু'টা কথা বলা? তা' না বলিলে চলে কৈ? একেই ত ঐ অতি বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া অস্থিদগ্ধকারিণী বধূ, উহাকে লইয়া ঘর করাই ত এক মহা যাতনা, তার উপর উহাকে যদি আস্কারা দেওয়া যায়, তবে কি রক্ষা আছে? আর কি ওর ঘর-সংসারে মন বসিবে? না গৃহস্থ-ঘরের কাজ করিতে হাত উঠিবে? পটের বিবির মত রাত্রি-দিন আপনার সাজসজ্জা, দেহের তদ্বির লইয়াই ও দিন কাটাইবে। সেই শঙ্কাতেই ত শাশুড়ী-ঠাকুরাণী শাসনের নাগপাশ দিয়া তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এক তরফা কলহের বহ্নিশিখার সঙ্গে কটূক্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাই অনির্ব্বাণ হইয়া নিয়ত এ গৃহে জ্বলে।

বিভা নীরবে, একান্ত নীরবেই সব শুনিয়া যাইত। প্রতিবাদ করিত না, অন্য কা'কে দোষও দিত না। ভাগ্য তার বিরূপ, জগৎও যে তার প্রতি সকল রকমে অকরুণ হইবে, তা'তে আর বৈচিত্র্য আছে কি? সে মুখ বুজিয়া আপনার করণীয় কার্য্যগুলি করিয়া যাইত। আর এই নীরব ঔদার্য্যই শ্বশ্রূকে পাগল করিয়া তুলিত। এত যে বলা-কহা কিছু কি ওর গায়ে লাগে না? ওর কি মানুষের দেহ মন নয়? আঘাতের যাতনায় আহত যদি আঘাতকারীর সুমুখে পড়িয়া ছট্‌ফট না করিল, তবে আর আঘাত করিবার সার্থকতা কি? তার সহিষ্ণুতাই আঘাতকারীর মনকে আরও নবীন নিষ্ঠুরতায় উদ্দাম করিয়া তুলিয়া ব্যথা দিবার নব নব পন্থা আবিষ্কার করায়—দাগ যাহাতে আরও গভীর হইয়া বসে। জীবনের পরপারে গিয়াও আঘাতের ব্যথা তার মনে জাগিবে, তবেই না আঘাত করিয়া তৃপ্তি!

দিন কাটে। হিতৈষিণী প্রতিবেশিনীরা আসিয়া উপদেশ দেন—বৌমা, মুখ খোল, চুপটী করে শুনে যাও কেন? কেই বা অত সহ্য করে? তাই না তোমায় অমন করে পেয়ে বসেছে ও। বাছা, ভালমানুষটীর কাল কি আর আছে। যে যত ভাল, কপালে দুঃখু তারই তত বেশী। মুখে মুখে জবাব দিও, কাজ করো না, দেখো এখন, আপনিই শাশুড়ী তোমার জব্দ হয়ে যাবে।

বিভা উত্তর দেয় না। ভাল-মন্দ কিছুই বলে না। হিতৈষিণী ছাড়িবার পাত্রী নহেন। উপদেশ যে দিলেন' তা' সফল হইল কি ব্যর্থ হইল না জানিয়া স্বস্তি হয় না, তাই বারবার প্রশ্ন করেন—কি বৌমা, যা' বল্‌লুম শুনবে ত?

মৌনতা বজায় রাখা যখন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন ধীরকণ্ঠে বিভা উত্তর দেয়—না মাসীমা, সে আমি পারব না। গুরুজনের মুখের উপর কথা বলা সে আমার দ্বারা জীবন থাকতে হবে না। তা' ছাড়া, মা তো আমায় তেমন কিছুই বলেন না। যা' বলেন, সে আমার ভালর জন্যে। ভাল করে কাজ শিখব বলে। তা' নিয়ে তাঁর উপর কি রাগ করতে আছে।

কথায় বলে ভস্মে ঘি ঢালিয়া দেওয়া। এমন অমূল্য উপদেশের কি না এই পরিণতি! প্রতিবেশিনীর ক্ষুব্ধ হইবারই কথা। বলিলেন—ও গো, আগুন কি আর ছাই চাপা থাকে? তুমি তোমার শাশুড়ীর দোষ ঢাকবেই ত, কিন্তু তা' কি আর ঢাকা পড়ে বাপু! ওকে তো আমরা আজ দেখছি না, দেখছি সেই বউ বেলা থেকে, ওর গুণাগুণ সব আমরা জানি যে। অতবড় দুষ্টু দুর্জ্জয় মেয়েমানুষ কি এ তল্লাটে আছে! তুমি যেন বাছা ভালমানুষের মেয়ে সব সয়ে যাচ্ছ, শাশুড়ীর ভয়ে দু'টী

ঠোঁট এক কর না, তাই ত ও মনের সুখে যা' খুসী তাই করে যাচ্ছে। অন্য কেউ হ'লে কি সহ্য করে এত? আর কেউ হ'লে এতদিন—

আর কেহ হইলে এতদিন যে কি করিত সেটা উহ্য রাখিয়াই হিতার্থিনী স্থান ত্যাগ করেন। তারপর কখন আসিয়া বধূর নাম-সংযোগে শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর কাছে এমন কতকগুলি কথা বলিয়া আপন ঘরে ফিরিয়া যান, যার ফলে বিভাদের গৃহে সেদিন ভীষণ কাণ্ড ঘটে—তার কতকটা তুলনা পাওয়া যায় সেই দ্বাপর-যুগের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে। তবে পার্থক্য আছে, সে ছিল দুই পক্ষে অস্ত্র বিনিময়। আর এ এক তরফা বাক্যবাণ বর্ষণ—যার তীক্ষ্ণতা শানিত শায়ক হইতে এতটুকুও কম নয়, বুকে বাজেও তেমনই কঠিন আঘাত দিয়া। অগ্নিদাহের জ্বালা বড় প্রখর, বড় অসহ্য, কিন্তু সর্ব্বদেহ যার নিয়ত অবিরাম দহনে জ্বলিতেছে, সে আর সে জ্বালায় কষ্টবোধ করে না। দহনের তীব্রতা সহিয়া সহিয়া দেহ মন তার অসাড় হইয়া গিয়াছে। কিছু আর তার গায়ে লাগে না। তবু এ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটিল না, পুত্র কার্য্যস্থান হইতে বাড়ী আসিতেই জননী সবিস্তারে সালঙ্কারে তাঁর মত নিরীহ শ্বশ্রূর উপর দুর্ব্বিনীতা বধূর এই ভীষণ অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। দোষীর মুখ হইতে কোন কথা শুনিবার প্রয়োজন হইল না। বিচারকের অটল গাম্ভীর্য্য মুখে আনিয়া রমেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে কহিল— এ বাড়ী থাকতে হ'লে সব বিষয়ে আমার মায়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে থাকতে হবে। তুমি যে তাঁর অবাধ্য হবে, লোকের কাছে তাঁর নিন্দামন্দ করবে, এ আমি কিছুতেই সইব না। কিছু বলা হয় না বলে বড্ড সাহস বেড়ে গেছে তোমার। এবার যদি আর একটী কথাও আমার কানে যায়, তা' হ'লে ঘাড় ধরে ঐ পথে তোমায় বার করে দেব। কেউ আমায় আটকাতে পারবে না এ জেনে রেখো।

কার্য্যরতা বিভা মুখ তুলিয়া শুধু স্বামীর দিকে একবার চাহিল মাত্র। উত্তরে একটী কথাও বলিল না। স্বামীর কর্ত্তব্য সম্যকরূপে প্রতিপালন করিয়া রমেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে কি কাজে শয়নকক্ষের একদিককার একটা জানালা খুলিতেই বিভার দৃষ্টি গিয়া পড়িল পার্শ্বস্থিত খোলার বাড়ীর অঙ্গনে উপবিষ্ট একটী ছেলের কচি কিশোর মুখখানির উপর। তাহার চোখ দু'টাকে কে যেন সবলে সেইদিকেই টানিয়া রখিল; চেষ্টা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিল না।

দুইটা মানুষে এতটা সাদৃশ্যও থাকে! এ যে ঠিক সেই রকম দেখিতে! বৎসরাধিক পূর্ব্বে গত, বিভার সেই ছোট ভাইটীর অবিকল প্রতিচ্ছবি! ঠিক, ঠিক তেমনই একরাশ অবিন্যস্ত ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, নিটোল সুডৌল ললাট, উজ্জ্বল চঞ্চল দু'টী চোখ, অল্প একটু বাদামী রংয়ের নেত্রতারকা। সব একরকম। শ্যামলবর্ণ, তেমনই হাসিমাখা রাঙ্গা ঠোঁট দু'টী। বয়সও দু'জনের প্রায় একরূপ। বিভার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিল। মাতৃহীন ছোট ভাইটী অসময়ে চলিয়া গিয়া তাকে যে কতটা ব্যথা দিয়াছিল, তার সাক্ষী ছিলেন একমাত্র শুধু তিনি—মানব চিত্তের ক্ষুদ্রতম অংশটীও যাঁর অগোচর থাকে না।

সেই একান্ত প্রিয়, অতি পরিচিত, অকালে হারাণ মুখখানির আভাস এই মুখে দেখিয়া আকুল আগ্রহে বিভা যেন অধীর হইয়া উঠিল। ছেলেটীকে একবার বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বুভুক্ষিত তৃষিত চিত্তের দুর্দ্দম পিপাসাকে কতকটা প্রশমিত করিবার জন্য একটা গভীর ব্যাকুলতা তার উদ্বেল মনটাকে একান্তই বিকল বিহ্বল করিয়া তুলিল। কিন্তু উপায়? পাশের এ বাড়ীটায় যারা থাকে, বিভা তাদের চিনিত। গোয়ালা কি কৈবর্ত্ত এমনই একটা জাতি। কাজেই নিম্নশ্রেণী বলিয়া এদের সঙ্গে কথা বলা পর্য্যন্ত বিভার নিষিদ্ধ। এতদিন এ নিষেধ সে মানিয়া আসিলেও আজ যেন মন কোনও বাধা মানিতে চায় না। তার শান্ত সহিষ্ণু চিত্ত হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ক্ষণেক ইতঃস্তত করিয়া সে ডাকিল—খোকা, ও ভাই খোকা!

দৃষ্টিভরা বিস্ময় লইয়া ছেলেটী ফিরিয়া চাহিল।

ব্যগ্রভাবে বিভা কহিল—তুমি কোন্ বাড়ীর ছেলে খোকা, তোমায় তো কখনও দেখি নি?

তার কথার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ঘরের মধ্য হইতে একটী প্রৌঢ়া রমণী বাহির হইয়া আসিল। বিভা তাকে চিনিত, এই বাড়ীরই গৃহিণী সে। ছেলেটী নির্ব্বাক হইয়া শুধু পলকহারা চোখ দু'টা তুলিয়া বিভার দিকে চাহিয়া রহিল। কথার উত্তর দিল রমণী—ওকে আর আগে দেখবেন কি করে মা, ও তো এখানে থাকত না, এই দু'দিন হ'ল এসেছে। আমার মেয়ের ছেলে। বাপ মা ওর বহুকাল গেছে। ছিল কাকার কাছে—তা' এমন বরাত হতভাগার, সে কাকাটীও আজ মাসখানেক হ'ল সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে, তাই কর্ত্তা ওকে নিয়ে এলেন।

গভীর আগ্রহে বিভা জিজ্ঞাসা করিল—ও এখন এখানেই থাকবে তো?

মুখে একটা সক্ষোভ শব্দ করিয়া রমণী বলিল—আর কোথায় যাবে মা, কে আছে ওর আমরা ছাড়া! আমার পোড়া ভাগ্যি দেখুন। নিজেদের দিন চলা দায়, তা'তে এই বোঝা পড়ল ঘাড়ে। কি যে করি মা, ভেবে আর কূল-কিনারা পাই না। বলি—

কথায় বাধা দিয়া বিভা বলিল—ওকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও না।

—কোথায় মা, আপনাদের বাড়ী?

—হ্যাঁ, আসুক না একটু। এখনি চলে যাবে।

রমণী খানিকটা অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কেন মা, ওকে যেতে বলছেন কেন?

মুহূর্ত্ত দ্বিধার পর বিভা বলিল—আমার একটী ভাই ছিল ঠিক অমনি দেখতে।

—ও, বুঝেছি মা, বুঝেছি। ওরে বলাই, যা' যা' ঐ বাড়ীর মায়ের কাছে যা'। উনি তোর দিদি হন্।

ছেলেটী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া ব্যাকুলভাবে বিভা বলিল—ছেলেমানুষ, একা ও আসতে পারবে না; তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এস। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।

ত্রস্ত পদে সে নীচে নামিয়া আসিল। শ্বশ্রূদেবী তখন নিদ্রামগ্না। দিবানিদ্রা শেষে এক ঘটী মিছরির সরবৎ খাইয়া একটু পান দোক্তা মুখে দিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর সারা দেহে কে যেন লঙ্কা বাটা মাখাইয়া দিল। সংসারের সমস্ত কাজ স্তূপাকারে পড়িয়া অপেক্ষা করিতেছে, আর বধূ? বধূ নিশ্চিন্ত মনে পাশের ঐ গোয়ালা বাড়ীর ছেলেটাকে কাছে বসাইয়া তন্ময় হইয়া তার সঙ্গে কি গল্প করিতেছে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। নীচজাতির বালকটাকে একেবারে তুলিয়া আনিয়াছে উপরের শয়ন কক্ষে, বসাইয়াছে নিজের একান্ত সন্নিকটে। না, স্লেচ্ছাচারী গৃহের কন্যাকে আনিয়া তাঁদের জাতিধর্ম্ম কিছু আর রহিল না। সব গেল। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে দিশাহারা হইয়া তিনি যে কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বধূর এতবড় দুঃসাহস আসিল কোথা হইতে তাই শুধু আপন-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সত্যই বিভার সেদিন কোনদিকে দৃষ্টি ছিল না। অন্য চিন্তাও তার মনে আসিল না। সে যেন অপর এক জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। তার একবারও মনে জাগে নাই যে, এভাবে ছেলেটীকে লইয়া তন্ময় হইবার পরিণাম কি। সব ভুলিয়া সে একদৃষ্টে বালকটীর দিকে চাহিয়া ছিল। এ তার কেহ নহে, তাদের হইতে অনেক দূরে এর স্থান, মধ্যের ব্যবধানটা কোনমতেই মুছিয়া দিবার উপায় নাই একথা সে সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এ তার ভাই, সেই ভাই—যে অভিমান করিয়া কোথায় লুকাইয়াছিল, আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। বহুদিন বর্ষণান্তে মেঘজাল সরাইয়া নবীন রবিকর যেমন অপূর্ব্ব দ্যুতিতে দেখা দেয়, বিভার ক্লিষ্ট মুখেও পুলকের আভাষ তেমনই ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

স্নেহের আকর্ষণ বড় তীব্র। ঐকান্তিক স্নেহ মানুষকে যত নিকটে আনে, এমন আর কিছুতেই পারে না। একান্ত অপরিচিতা এই তরুণীর মুখে চোখে ছেলেটী কি দেখিল কে জানে! কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভাকে সে তার নিতান্ত আপনজন বলিয়াই জানিল। তার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস হইতে প্রতিদিনকার সহস্র খুঁটিনাটি ঘটনা সে এই কয় ঘণ্টার মধ্যে বিভাকেই জানাইয়া দিল। সে

কথা বলিতে লাগিল, বিভা এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল শুধু তার মুখের দিকে। এতদিনকার অতৃপ্ত তৃষ্ণা বুঝি সে একদিনে মিটাইয়া লইতে চায়। ঘর-সংসার, শাশুড়ী, স্বামী সবই তখন তার মন হইতে মুছিয়া গিয়া কোন বিগত দিনের মধুর স্মৃতি সেখানে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুখশান্তিময় মুক্ত অবাধ আনন্দ-উচ্ছল কুমারী জীবন। সেখানে ছিল শুধু অপর্য্যাপ্ত আদর মমতা, অবিরাম হাসি ও হর্ষ। বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল, নিয়মের গণ্ডী যেখানে তাকে আড়ষ্ট করে নাই, শাসনের নাগপাশ যেখানে ঘিরিয়া ছিল না, সেই দূরে অপসৃত দিন—কত দূরে, কত দূরে আজ!

বিভার চমক ভাঙ্গিল রমেন আসিয়া ঘরে দাঁড়াইতে। বাড়ীতে পা দিয়াই পত্নীর নূতন কীর্ত্তির বিবরণ শুনিয়া ঘৃতসিঞ্চিত বৈশ্বানরের মতই ভয়াবহ মূর্ত্তি লইয়াই সে আসিয়াছিল। কঠিন আঘাতে সুমধুর স্বপ্ন-জাল ছিঁড়িয়া গিয়া সুপ্ত ব্যক্তি যেমন সত্রাসে জাগিয়া উঠে, স্বামীর পদশব্দে চকিতা বিভা তেমনই ভীতিত্রস্ততায় চাহিয়া দেখিল। বলিদানের জন্য আবদ্ধ পশু হয় ত এমনই সকরুণ শঙ্কিত দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া থাকে। মৃদুকণ্ঠে বিভা ছেলেটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বলাই, তুমি এখন বাড়ী যাও ভাই!

বলাই উঠিয়া পড়িল। বিভা ব্যস্তভাবে সরিয়া আসিয়া স্বামীর জুতার ফিতায় হাত দিল। পায় একটা ঝাঁকানী দিয়া রমেন বিভার হাত হইতে পা সরাইয়া লইয়া রুক্ষস্বরে কহিল—থাক্, থাক্, আর অততে কাজ নেই। এ আপদটা জুটল কোথা থেকে, কে ওকে জোটালে?

মৃদুকণ্ঠে বিভা কহিল—আমিই ওকে ডেকে এনেছি।

—তোমার সাহসটা এত বেশী হবার কারণ কি তাই শুনি? বলা নেই, কওয়া নেই, একটা ছোট জাতের ছেলেকে ঘরে এনে এত আদর কাড়ান হচ্ছে কেন?

বিভা ধীর-কণ্ঠে উত্তর দিল—ও দেখতে ঠিক আমার ছোট ভাই আমার মলিনের মত; দেখে বড় মন কেমন করতে লাগল—

—দেখতে মলিনের মত, তাই ও মলিন হয়ে গেল। চিতা থেকে উঠে এল বুঝি ও তোমার জন্যে? যত সব লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড! এই ছোঁড়া, যা' যা', বাড়ী যা' তুই। ছোটলোকের আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়! ঐ বা কি বলে এসে উঠল ঘরের মধ্যে? ভেবেছ কি তোমরা, কিছু বলা হয় না বলে ভারী সাহস হয়েছে, না?

বলাই সত্রাসে পলাইল। বিভা নীরবে স্বামীর পরিত্যক্ত জামা গেঞ্জী তুলিয়া আলনায় রাখিল। চটি জুতা আগাইয়া দিল। বাহিরে শ্বশ্রূর কণ্ঠ তখন সানাইকেও পরাভূত করিয়াছিল। ঘরের মধ্যে রমেন্দ্রও বলিতেছিল—মা বকে কি সাধে। যে যেমন তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার না করলে চলে কৈ? প্রবৃত্তিই বা কি নীচ! একটা ছোট জাত সে হ'ল ওঁর ভাই, গলায় দড়ি! বারণ করে দিচ্ছি, খবরদার ও ছোঁড়া যেন আর এ বাড়ীতে না আসে। ভাল হবে না তা' হ'লে এ জেনে রেখো।

বিভা নীরবে ঘরের বাহিরে গিয়া কাজে মন দিল।

ব্যাপারটার যবনিকাপাত কিন্তু এখানেই হইল না। শাশুড়ী স্বামীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল সেই বাধ্য বিনীত চিরশান্ত বধূ। তার এত সাহস, কারও নিষেধ সে গ্রাহ্য করে না! দিনের পর দিন তাদের চোখেরই উপর ছেলেটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে আনে, গল্প করে, সকলকার অলক্ষ্যে সংগোপনে হয় ত তাকে কিছু না কিছু খাইতেও দেয়। বলিলেও শুনে না, বারণ মানে না। কি আদর, কি যত্ন ঐ নীচ জাতির ছেলেটাকে! এ কি কাণ্ড! রমেন বলিয়া বলিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়াই ক্ষান্তি দিল। কিন্তু শাশুড়ী তো তাই বলিয়া নীরব থাকিতে পারেন না। ও যে তাহা হইলে আরও বাড়াইয়া তুলিবে। তাই তার রসনার আর বিশ্রাম নাই। কিন্তু কেই বা শুনে সে কথা! কা'কেই বা বলিতেছেন তিনি! যেন কাঠের পুতুল, বলো কহ যাই কর, সমান নির্ব্বাক। যন্ত্রচালিতের মত নিজের

শিশু বালা

সুনয়না ও সুশ্রী উদীয়মানা অভিনেত্রী শ্রীমতী শিশু বালা।

ইনি সম্প্রতি পাতাল পুরীতে বিলাসীর ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন।

জয়েস অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

কাজ করিয়া যাইতেছে। তারপর বাকী সময় কাটিতেছে ঐ ছেলেটার সাহচর্য্যে।

আর সেই ছেলেটাই কি কম নির্লজ্জ। মাতা পুত্রে প্রতিদিন তাকে কুকুর বিড়ালের মত দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেও সে আসিতে ছাড়ে না। এ কি গ্রহ! কি সম্মোহন মন্ত্রে যে বলাই বিভাকে বাঁধিয়াছিল, তাহা সেই জানে! তার সারা চিত্ত অধীর আগ্রহে উন্মুখ আকুল হইয়া থাকিত সেই দিকে। পরিতৃপ্ত চিত্তে আর তার কোন ব্যথা কোন দুঃখ ছিল না। শ্বশ্রূ স্বামীর নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রগুলা তার পুলকবর্ম্ম চ্ছাদিত চিত্তে ঠেকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িত। যাহা হারাইয়াছিল, তাহা আবার সে পাইয়াছে—তাহার ভাইটী ফিরিয়া আসিয়াছে। এ তার কতবড় আনন্দ, কত তৃপ্তি কে বুঝিবে! পদে পদে অপরাধ ঘটে। অন্যমনা চিত্ত, সংসারের কাজে হয় কত ত্রুটী। ক্রুদ্ধ স্বামী কটুকাটব্য করেন, শাশুড়ী করেন বধূর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার, তবুও তার চেতনা নাই। এমন তো সে ছিল না। যখন যা' বলিয়াছেন, মৌণ স্থিরতায় অবিচলিত ধৈর্য্য লইয়া সব সে শুনিয়া গিয়াছে। আজও যে না শুনে তা' নহে। তবে ঐ একটা কথা—ঐ ছেলেটা সম্বন্ধে কিছু বলিলে যেন সে কানেই তুলিতে চায় না। এ ত ভাল কথা নহে। নিজের তূণে সঞ্চিত শর যতগুলি ছিল একে একে সব কয়টা নিক্ষেপ করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন সত্যসত্যই নিতান্ত হতাশ হইয়া শ্বশ্রু-ঠাকুরাণী তার পুত্রের শরণ লইলেন। এভাবে আর কিছুদিন কাটাইতে পারিলেই ত বধূ তাঁর হাতের বাহির হইয়া পড়িবে, সকল কথাই অগ্রাহ্য করিবে, এই বেলা ওর শাসনের দরকার যে।

সেদিন রবিবার অফিস বন্ধ। রমেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্তমনে আরাম-কেদারায় পড়িয়া কি একখানা বই দেখিতেছিল।

পুত্রের নিকট আসিয়া মাতা বলিলেন—হ্যাঁরে রমে, তোর চোখ আর কান দুই-ই কি গিয়েছে, তুই বেঁচে আছিস না মরে ভূত হয়েছিস, তাই আমায় বল দেখি?

জননীর কথায় উঠিয়া বসিয়া পুত্র প্রশ্ন করিল—কেন, হয়েছে কি?

—নতুন আর কি হবে। যা' হয়েছে, তাইতেই যে প্রাণান্ত হ'ল আমার। বউ কি কাণ্ড কচ্ছে তা' দেখছিস? একটা ছোট জাতের ছোঁড়াকে নিয়ে এই মেলামেশা, লোকে দেখলে কি বলবে বল্ ত? এত যে বলা-কওয়া কিছুই শোনে না, এমনি বেয়াড়া হয়েছে ও।

ঈষৎ অপ্রসন্নমুখে রমেন্দ্র কহিল—কেন যে শোনে না তা' আমি জানি না। কিন্তু ঐ একটা নেহাৎ বাচ্ছা ছেলে, ওর সঙ্গে মিশলে লোকে কি বলবে মা, কেউ কিছুই বলবে না।

গভীর বিস্ময়ে মা গালে হাত দিয়া বলিলেন—ও, তুই একবারে মানুষের বার হয়ে গেছিস। বউ মন্তর দিয়ে তোকে একবারে গোভূত করে ফেলেছে। তোতে আর পদাথ নেই। একেবারে বৌয়ের ছক্কা গোলাম হয়েছিস তুই। নইলে এই কথা বলিস, এ্যা!

বিরক্তচিত্তে রমেন্দ্র কহিল—তা' এখন আমায় কি করতে হবে?

—করতে আর কি হবে, বৌয়ের এই বেয়াড়াপনা আদিখ্যেতা বন্ধ কর্। ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা বলা, বাড়ীতে আসা—

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই হতাশভাবে রমেন্দ্র কহিল—ঢের বলেছি মা, অনেক চেষ্টা হয়েছে, তুমিও কিছু ছেড়ে দাও নি, এততেও যদি না শোনে, কি করব বল?

—কি কর্ব্ব বল্লে তো হবে না, বাছা, তোমার ইস্তিরি, তুমি যদি ওকে শাসনে না রাখতে পার, তা' হ'লে কেমন হয়? পুরুষ মানুষ তুমি, সোয়ামী তুমি, তোমার কথা ও শোনে না?

—অন্য কথা নয় মা, শুধু এইটাই শোনে না, কি কর্ব্ব?

—কি কর্ব্ব বল্লে হয় কি বাছা, যা' হয় কর।

—যা' হয় কি করব মা, ধরে মারতেও পারি না, পথেও বার করে কিছু সত্যি সত্যি দেওয়া যায় না। মুখে বলার ত্রুটী নেই এত তুমি দেখছ? ছোঁড়াটাও সমান বেহায়া

কিছুতেই আসতে ছাড়বে না। আর কি করব তুমিই বলে দাও মা।

বলিয়া দিবার মত কিছু মাও সহসা খুঁজিয়া পাইলেন না। নিরুপায় হইয়াই না তিনি আসিয়াছেন পুত্রের কাছে। কি করা যায়? এত সহিবার শক্তিই বা সে পায় কোথায়? জলেও আগুন জ্বলে, তার দেহমন বুঝি তাহা অপেক্ষাও শীতল। সহিতে হইবে বলিয়াই কি বিশ্বনিয়ন্তা অসীম সহ্য শক্তি দিয়া তাকে জগতে পাঠাইয়াছেন! হয় ত তাই। মাকে নীরব দেখিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে রমেন্দ্র কহিল—আর সব কাজই যখন ঠিকমত পাচ্ছ ওকে দিয়ে, তখন ও তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে অশান্তি বাড়াও কেন মা। ও ছেড়েই দাও না। ছেলেটা ওর ভাইয়ের মত দেখ্‌তে। ওর সঙ্গে কথা বলে, ওকে কাছে রেখে ও যদি খুসী হয়, হোক্। কি ক্ষতি তা'তে আমাদের। ছেলেটাকে পেয়ে ভাইয়ের কথা ও ভুলেছে।

বাদামের শক্ত খোলার নীচে অবস্থিত নরম শাঁসটুকুর মত রমেন্দ্রের বাহিরের কঠিন আবরণখানার তলায় কতকটা কোমলতা নীরবে আত্মগোপন করিয়াছিল। পত্নীর জন্য চিত্তে তার স্নেহের অভাবও ছিল না। তবুও যে ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিত সেটা তার স্বভাব। একান্ত প্রিয় ছোট ভাইটীকে হারাইয়া বিভা কতখানি ব্যথা পাইয়াছে এ সে বুঝিত। বলাইকে পাইয়া বিভার দিগ্ধ অন্তর কতটা শান্ত হইয়াছে তাও তার অজ্ঞাত ছিল না, তবুও কতকটা জননীর কথায়, কতকটা নিজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে এ লইয়া বিভাকে নানা কথা শুনাইতে সে ছাড়ে নাই। তবে তাহার কথায় প্রখরতা থাকিলেও কাজে কিছু করিবার সাহস ছিল না। বিভাও সেটা বুঝিয়াছিল। সে মুখে যতটা বিরক্তিই প্রকাশ করুক, অন্তরে ততটা বিরক্ত হয় নাই। স্বামীর কাছে এইটুকু পাইয়াই বিভা পরম সুখী হইয়াছিল। তার মনোভাব তিনি বুঝিয়াছেন এই যথেষ্ট।

ছেলের কথায় মা ঝাঁকিয়া বলিলেন—তুই আর জ্বালাস নে রমে। ও হ'ল ওর ভাই। ভাইয়ের মত দেখতে বলেই ঐ ছোট জাতের ছোঁড়াকে ভাই বলে মাথায় তুলে নাচতে হবে না কি? যত অনাছিষ্টি কথা! না বাবু, এসব আমি সইতে পারব না। ভাল কথায় বলছি—এর একটা বিহিত তুমি কর, নইলে আমার যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাই। বউ চোখের সামনে যা' খুসী তাই কর্ব্বে, এ বাছা আমি সইতে পার্ব্ব না তা' বলে দিলুম। বলে কি কর্ব্ব? করবার আবার ভাবনা। পুরুষমানুষ না তুই, ও না তোর স্ত্রী, নিজের পরিবারকে যে শাসনে না রাখতে পারে তার গলায় দড়ি, জীবনে ধিক!

মনের ভাবটা চলন ভঙ্গীমায় প্রকাশ করিয়া মা সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

ঘরের মাঝখানে বিভা বসিয়া আছে, আর তার পিঠের উপর মাথা রাখিয়া আধশোয়াভাবে বলাই আপন-মনে কত কি বলিয়া চলিয়াছে। বিভার ওষ্ঠে মৃদু হাসি, দুই চোখের দৃষ্টি স্নেহ-মধুর। রমেন্দ্রের মনটা একেই তাতিয়া ছিল, তাহাতে সুমুখেই ছেলেটাকে এমনভাবে বিভার গায়ের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাকে আরও উগ্র করিয়া তুলিবে এ আর বিচিত্র কি? উভয়ের দিকে চাহিয়া শ্লেষকটুকণ্ঠে কহিল—এই যে আদুরে গোপাল এসে জুটেছেন! ওর কি বাড়ী-ঘর কিছু নেই যে, সর্ব্বক্ষণ আছে এখানে? আর ওকেই বা কি বলি, আমার বাড়ীর লোকটী ত কম নন্। এত যে বলি, কথা গ্রাহ্যই নেই। দুই সমান। রুচি-প্রবৃত্তিও কি তেমনই! ঐ ছোট জাতের ছেলেটাকে নিয়ে এত মাথামাখি কর্ত্তে ইচ্ছেও হয়। যেমন ছোট ঘরের মেয়ে, চাল-চলন, প্রবৃত্তিও তার তেমনই।

শরাহত বিহঙ্গ ব্যথিত দৃষ্টিতে আঘাতকারীর দিকে চাহিয়া থাকে। প্রতিকার, প্রতিবাদ করিবার শক্তি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা তাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। নীরবে আঘাত সহিবার জন্যই তার জীবন। বিভা স্বামীর রোষতপ্ত মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল। বলাই শুষ্কমুখে কহিল—দিদি, আমি এখন বাড়ী যাই।

মানব মন বুঝিতে শিশুচিত্ত বড় পারদর্শী। বিভা ভিন্ন এ বাড়ীর কেহ যে তার উপর প্রসন্ন নয়, বলাই তাহা বেশ

জানিত। তবুও তার মাতৃস্নেহ বঞ্চিত বুভুক্ষু অন্তর বিভার অকৃত্রিম স্নেহ-মমতার অদম্য আকর্ষণ কিছুতেই কাটাইতে পারিত না। গোলাপের কাঁটার মত মাতা-পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত তিরস্কার লাঞ্ছনা তার গায়ে বিঁধিলেও ব্যথা দিত না। বিভার ভালবাসার তুলনায় ওটুকু সহিতে তার আপত্তি ছিল না। তবে সাধ্যমত মাতা-পুত্রের সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিত। রমেনকে দেখিলেই সে পলাইয়া যায়, বিভাও তাকে বারণ করে না, কিন্তু আজ কেন কে জানে বলাইয়ের কথার উত্তরে সে মৃদুকণ্ঠে কহিল—এই তো এলি, একটু পরে যাস্।

—কেন কি হবে ওর থেকে, তাই শুনি? কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই—খালি ওইটাকে নিয়ে আদর কাড়ান হচ্ছে। হতচ্ছাড়া আপদ কোথাকার! নড়ে না এখান থেকে। এই ছোঁড়া, যা' না, তোর বাড়ী যা' না।

কিছুক্ষণ পরে রমেন পুনরায় কহিল—আমার জামা-কাপড় বার করা হয়েছে, না ওকে নিয়েই মত্ত হয়ে সে সব ভুলে বসে' আছে?

বিভা একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল। মিথ্যাকে যত জোর দিয়াই প্রকাশ করা হোক্ না কেন, নিজ মনের কাছে সে মিথ্যাই থাকিয়া যায়। লুকাচুরি চলে আর সকলের সঙ্গেই, চলে না শুধু আপন মনের কাছে। বলাইকে লইয়া বিভা যত তন্ময় হইয়াই থাকুক, সংসারের সর্ব্ব কার্য্যে আজও সে একাধারে পাচিকা ও পরিচারিকা। বিভার সে দৃষ্টি হয় ত রমেনকে কিছু অপ্রতিভ করিল। আর কিছু না বলিয়া ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলের উপর চিরুণী চালাইতে লাগিল।

বন্ধু-গৃহে রমেনের নিমন্ত্রণ ছিল। বিভা পূর্ব্বেই রেশমী চাদর ও পাঞ্জাবী গুছাইয়া ধুতিতে চুনট করিয়া রাখিয়াছিল। সেগুলা স্বামীর হাতের কাছে আনিয়া দিল।

কাপড়খানা তুলিয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে রমেন্দ্র কহিল—স্নো, সেন্টের শিশি, পাউডার বার কর।

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া বিভা জিনিষগুলা বাহির করিতে লাগিল। বলাই তার কাছে একটু আগাইয়া আসিল। সবুজ রংয়ের সেন্টের শিশিটার দিকে লুব্ধনেত্রে বারকতক চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—ওতে কি আছে দিদি?

বিভা ফিরিয়া দেখিল—বালকের দুই চোখে ব্যগ্র লোলুপতা!

কোমল কণ্ঠে সে বলিল—এতে এসেন্স আছে ভাই!

চাকচিক্যময় রঙ্গিল শিশিটা বলাইকে নিতান্তই মুগ্ধ করিয়াছিল। সম্মুখে রমেন্দ্র, কিছু বলিবারও সাহস হয় না; অথচ শিশিটা একবার হাতে লইয়া দেখিবার ব্যাকুল আগ্রহও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিভা তার দিকেই চাহিয়াছিল। বলাইয়ের মনোভাবটা স্বচ্ছ কাচের মতই তার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। শিশিটা একবার মাত্র তার হাতে দেওয়া, ছেলেমানুষ দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে, একবার দেখিয়াই এখনই সে ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু সম্মুখে রমেন্দ্রনাথ! পুলিশ-প্রহরী-বেষ্টিত অপরাধী যেমন অন্তরস্থ সকল ইচ্ছাকে সবলে দমন করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে, তেমনই ভাবে বিভা নীরব রহিল। তার স্বাধীনতা কতটুকু? কিন্তু বলাই বিভাকে নীরব থাকিতে দিল না। মৃদু কম্পিতকণ্ঠে সে ডাকিল—দিদি!

বিভা বুঝিল, সে কি বলিতে চায়। মনের মধ্যকার ভীতি দ্বিধাটুকু জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া শিশিটা তুলিয়া বলাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—এই নে, দেখ্।

কাঙ্ক্ষিত রত্নলাভের তীব্র আনন্দে অধীর চিত্তে ফুল্ল মুখে বলাই হাত বাড়াইয়া শিশিটা লইল।

সঙ্গে সঙ্গে রমেন্দ্রের রুক্ষ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড—ঐ বাঁদরের হাতে দেওয়া হ'ল সেন্টের শিশি! এখনি ভেঙ্গে সব নষ্ট করবে। পাঁচ টাকা দাম ওটার, সেটা মনে আছে? ও সব আদর-আদিখ্যেতা করতে হয় যদি, তা' হ'লে বাপের বাড়ী থেকে পয়সা এনে সেই পয়সায় করো। আমার বাড়ীতে ও সব চলবে না। এই হতভাগা উল্লুক ছোঁড়া, রাখ্ শিশি, এখনি ভাঙ্গবি।

অতিরিক্ত সাবধানতাই হয় অনেক সময় বিপদের হেতু। রমেন্দ্রের চীৎকারে বলাইয়ের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। স্পন্দিত বক্ষে ব্যস্তভাবে শিশিটা টেবিলের উপর রাখিতে গিয়াই তার কম্পিত হাতখানা

আরও কাঁপিয়া শিশিটা টেবিল হইতে ঘরের মেঝেয় পড়িয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। তীব্র মধুর গন্ধে ঘরখানা নিমেষে সুরভিত হইয়া উতল হাওয়ায় সারা ভবনে সেই সুবাস ছড়াইয়া পড়িল। বিভা ও বলাই দুইজনেই আড়ষ্ট। কঠিন অপরাধে অপরাধী যে দৃষ্টি লইয়া সভয়ে বিচারকের দিকে চাহিয়া দণ্ডাজ্ঞার প্রত্যাশা করে, উভয়ের চোখে মুখে সেই ভাব সুপরিস্ফুট। কি যে ঘটিবে বিভা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অসহ্য ক্রোধে নিমেষমাত্র শুব্ধ থাকিয়া রুদ্র দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিয়া রমেন্দ্র লাফাইয়া উঠিল—হতভাগা শূয়ার, যা' ভেবেছি ঠিক তাই—ভাঙ্গলি সেণ্টটা। কথার সঙ্গে-সঙ্গেই অদূরে রক্ষিত হকি ষ্টিক্‌টা টানিয়া লইয়া সজোরে তার কয়টা আঘাত বলাইয়ের পিঠে বসাইয়া দিল।

বলাই আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেই বিভার চমক ভাঙ্গিল। ব্যাকুলভাবে স্বামীর হাত দুইটী ধরিয়া বলিল—মেরো না, ওগো আর মেরো না!

একটা পৈশাচিক হিংস্রতা রমেন্দ্রকে তখন উদ্দাম করিয়া তুলিয়াছিল। সবলে বিভাকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল—সরে যাও বল্‌ছি।

তার হস্তস্থিত বেতটা পুনরায় বলাইয়ের পিঠে গায়ে উঠিল পড়িল। ছেলেটা আর্ত্তস্বরে চেঁচাইতে লাগিল। রমেন আবার ঘা কতক তার কাঁধে পিঠে বসাইয়া দিয়া বলিল—দুর হয়ে যা'। আর কখনও যদি এখানে দেখি, তোকে তা' হ'লে একবারে মেরে ফেল্‌ব। হতভাগা আপদ জালিয়ে খেলে!

বলাইয়ের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া তার মাতামহী ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে কাঁদিয়া বলিল—আর ও আসবে না বাবু, কখন আসবে না, এবারকার মত ছেড়ে দাও। মরে গেল যে।

রমেন্দ্র ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বেতটা ফেলিয়া দিল। বালককে বুকে লইয়া তার মাতামহী সজল চোখে বাহির হইয়া গেল। বালকের শ্যামল দেহে রক্ত রাগ ফুটাইয়া কাটিয়া কাটিয়া বেতের দাগ বসিয়াছে। নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া বিভা সেইদিকে চাহিয়া রহিল। একটী কথাও তার মুখ দিয়া বাহির হইল না। প্রহারের শব্দে রমেন্দ্রের জননীও দ্বারের কাছে আসিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া একান্ত তৃপ্তির সহিত ভিতরের ব্যাপারটা উপভোগ করিতেছিলেন। এমন মার খাইয়া ছেলেটা আর যে এ বাড়ীতে আসিবে না এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। আপদ বিদায় হইল, অস্থিদাহ কমিল। তাড়াইবার না কি উপায় নাই? এই ত তাড়ান গেল। কথায় বলে মারের চোটে ভূত পলায়, তা' এত একটা ছোট ছেলে। প্রীতি-বিকশিত নয়নে মা একবার পুত্রের দিকে চাহিলেন। দীর্ঘ কালের মধ্যে পুত্রের কোন কার্য্য যে তাঁকে এতটা তৃপ্তি দিয়াছে এমন মনে হইল না। তবে এ সবই তার সেই ক্ষণ পূর্ব্বেকার অমূল্য উপদেশ-বাণীরই ফল তা'তে আর সন্দেহ নাই। বধূরও ব্যথা-ক্ষুব্ধ মুখখানা তার প্রাচীন দেহ-মনে পুলক শিহরণ জাগাইল। ঠিক হইয়াছে! এইবার বুঝুক মজাটা! মনের আনন্দ নিরালায় উপভোগ করিবার জন্য মা পায় পায় সরিয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন—রমু, তা' হ'লে তুই এইবার যা'। দেরী হচ্ছে যে।

তাঁর মনে আশঙ্কা জাগিতেছিল বধূর ম্লান মুখ বুঝি এখনই পুত্রের মনে করুণা জাগাইয়া তুলিবে, সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করাইবে। সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে আর রক্ষা আছে কি! রমেন্দ্র একবার স্ত্রীর দিকে চাহিল। সেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা-কাতর মুখশ্রী তার চিত্ত উদ্বেল করিয়া তুলিল। চূর্ণ কাচ খণ্ড যেন বিভার শতধা দীর্ণ অন্তরের প্রতীক। নীরবে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বুকের রক্তে পশ্চিম গগন প্রান্ত আরক্ত করিয়া দিনান্তের কান্ত রবি তাহার শেষ শয়ন বিছাইয়াছেন। আকাশে গাঢ় শোনিমা, বিশ্ববুকে তারই ছায়া। বিদায়ী আলোর ম্লানিমায় চারিদিক তখন বিষণ্ণতাময়। খোলা জানালার ঠিক সামনেই পড়িয়া আছে বিভার ব্যাধিক্লিষ্ট দেহখানি রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক ফুলটীর মত। এক ঝলক লাল আলো আসিয়া পড়িয়াছে তার পাণ্ডুর মুখে। বালিশ

বিছানা সবই সেই লাল রঙ্গে মাখামাখি হইয়াছে। রমেন নিঃশব্দে বিভার শিয়রে বসিয়া তার মাথায় আইস ব্যাগ ধরিয়াছিল। অসাড় স্তব্ধ দেহ, চোখ দুইটী নিমীলিত। শ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। রমেন্দ্রের নির্নিমেষ দৃষ্টি বিভার সেই লালিমা-বিজড়িত ক্লিষ্টমুখে স্থাপিত। হরিনামের মালা লইয়া সন্তর্পণে নিষ্ঠা-আচার বাঁচাইয়া মা দ্বারপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁকামুখে প্রশ্ন করিলেন—কেমন বুঝ্‌ছিস রমু, আজকের রাতটা কাটবে, না আজই হয়ে যাবে, কি মনে হয়?

ম্লানমুখে রমেন্দ্র উত্তর দিল—কি জানি, কিছুই বুঝ্‌ছি না। ডাক্তারকে একবার খবর দিই, এসে দেখে যান।

—আর কেন বাবু, মিছে কতকগুলো পয়সা অপব্যয় করা। এমনই ত ক'দিনে টাকার শ্রাদ্ধ হ'ল, আবার কেন ডাক্তার ডেকে টাকা নষ্ট করা। আর ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি বলছি—ও বড় জোর আজ কি কাল। মিছে ওষুধে ডাক্তারে আর কতকগুলো টাকা খরচ করিস নি। বৌ পরের মেয়ে, তার জন্যে যা' করা হয়েছে যথেষ্ট। আর কেন বাপু, যা' রয় সয়, তাই ভাল।

রমেন উত্তর দিল না। উঠিয়া আইস ব্যাগটা বরফে পূর্ণ করিয়া আবার বিভার শিয়রে আসিয়া বসিল। বিভা চাহিয়া দেখিল। তার বিভ্রান্ত ব্যাকুল দৃষ্টি যেন কা'কে খুঁজিতেছে। রমেন ঝুঁকিয়া তার মুখের উপর পড়িয়া ডাকিল—বিভা, বিভা!

বিভা উত্তর দিল না। ব্যাকুল-ব্যথিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল—বলাই, বলাই, পালিয়ে যা' ভাই, পালিয়ে যা', আর আসিস নি এখানে! এবার মারলে আর তোকে বাঁচতে হবে না! উঃ, কি মারটাই মেরেছে! গায়ে যেন রক্ত ফুটে উঠেছেরে! আহা, তোমার কি দয়া মায়া নেই, ছোট ছেলে অসাবধানে না হয় সেন্টের শিশিটা ভেঙ্গেই ফেলেছে, তাই বলে অমন করে কি মারে? মারলে কি শিশিটা ফিরে পাবে? তবে কেন মারলে ওকে, কেন মারলে অমন করে! ওর প্রতি আঘাতটী যে আমার গায়ে এসে লাগ্‌ছে! ওঃ, এত নিষ্ঠুর তুমি!

এই প্রলাপ বাণী তীব্র কশাঘাতের মত রমেন্দ্রের বুকে আসিয়া আঘাত করিল। বিভার জর সেইদিন হইতে—যেদিন সামান্য কারণেই বলাই রমেন্দ্রের নিকট হইতে নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়া এ গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। সারাদিন শুধু অনড়ভাবে বিভা ক্ষোদিত মূর্ত্তির মতই সেখানে দাঁড়াইয়া কাটাইয়াছে। শ্বশ্রূর রূঢ় তিরস্কার, গালাগালি কিছুতেই তাকে সে কক্ষের বাহির করিতে পারে নাই। সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া মাতার নিকট হইতে বিভার মহা অপরাধের বিবরণ শুনিয়া রুষ্টচিত্তে রমেন্দ্র যখন ঘরে আসিল, তখন প্রবল জরে সংজ্ঞাহীনা বিভার দেহ মেঝের উপর লুটাইতেছে। তারপর তিনদিন এই ভাবেই কাটিয়াছে, লুপ্ত চেতনা আর ফিরিয়া আসে নাই। প্রলাপ বাণী ভিন্ন একটা কথাও সে উচ্চারণ করে নাই। চিকিৎসক শেষে জবাব দিয়া গিয়াছেন।

বিভা আবার বলিয়া উঠিল—বলাই, বলাই, একটীবার আয় না ভাই, একবার আমি দেখে নিই! এখনি আবার চলে যাস! আয় ভাই, আয়! বলাই, বলাই!

মা দ্বারপ্রান্ত হইতে বিকৃতমুখে কহিলেন—আদিখ্যেতা দেখে আমার গা জলে যায়! মরতে বসেছেন, তবু ঢং যায় না! বলাই আর বলাই, মরণ আর কি!

বিভা সহসা ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া ভয়ার্ত্তকণ্ঠে কহিল—চলে যা' বলাই, চলে যা', এখনি আবার মারবে তোকে! আহা, কেন মরতে আমি তোকে এনেছিলুম এখানে, তাই না তোর এত শাস্তি! যা' ভাই যা', আর আসিস নে! ওঃ, ওঃ, আর মের না, মের না! দেখ্‌ছ, কি হয়েছে ওর গায়ে? তোমার প্রাণে কি একটুও মমতা নেই? কাঁদিস নি বলাই, কাঁদিস নি, আর সইতে পাচ্ছি না! ওঃ, কি কান্না! আমার বুকটা ছিঁড়ে গেল, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!

রমেন্দ্র তাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। ভ্রূকুঞ্চিত মুখে মা বলিলেন—দেখো একবার বজ্জাতি ওর। শুয়ে শুয়ে আমাদের গাল দিচ্ছে। মরুক, মরুক ডাইনি! পনের দিনের মধ্যে আমি ছেলের বে দিয়ে বউ ঘরে তুলি। মরুক!

রমেন্দ্র একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। মা তখন স্থান

ত্যাগ করিতেছেন। আকাশের বুক হইতে দিবসের শেষ জ্যোতিটুকু তখন প্রায় মুছিয়া আসিয়াছে। লালিম দ্যুতিটুকু মিশাইয়া যাইতেই অন্ধকার মন্থর পদে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিমীলিত চোখে মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে বিভা তখনও বলিতেছিল—মেরো না,ওকে আর না মেরে আমায় মার যে, আমি সইতে পারব! ওকে কিছু বলো না!

পরদিন। পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতা, অলক্তক-সিন্দূর-শোভিতা বিভার প্রাণহীন দেহ বাহিরের উঠানে রাখিয়া জনকত আত্মীয়-বন্ধু ঘেরিয়া বসিয়াছিলেন আরও কয়জন সঙ্গীর অপেক্ষায়। মৃতার শিয়রে বসিয়া রমেন্দ্র। দূরে বারান্দার উপর পড়িয়া মা বিনাইয়া বিনাইয়া বধূর জন্য কাঁদিতেছেন। সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ মৃতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। বিভার প্রশান্ত কমনীয় মুখ। মরণের স্পর্শ তাকে এতটুকুও রূপান্তরিত করে নাই। গভীর শান্তিতে সে যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে কয়জন লোক কাঁধে গামছা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তখন উপবিষ্টদের মধ্য হইতে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন—আর দেরী নয় হে, উঠে পড়।

গৃহিণী চীৎকারের মাত্রাটা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। রমেন্দ্র ও অন্য সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছিন্না-ছেঁড়া ধনুকের মত ঠিক সেই সময় বলাই ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বিভার দেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বুকফাটা আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল—দিদি, দিদি, ও দিদি!

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন—কেরে, কেরে ছোঁড়া!

গৃহিণী কান্না ভুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওরে, ওরে, সেই ছোঁড়া। ও মা, কি সর্ব্বনাশ হ'ল মা, গয়লা ছোঁড়া ছুঁয়ে দিলে বামুনের মেয়ের মড়া! ও মা, কি হবে মা!

তখন সকলে একসঙ্গে হৈরৈ করিয়া উঠিল। বলাই কোনদিকে না চাহিয়া তেমনই মর্ম্মন্তুদস্বরে বলিতে লাগিল—দিদি, দিদি, ওঠ দিদি, কথা বলো আমার সঙ্গে!

মর্ম্মভেদী আকুল আহ্বানে সে যেন মহানিদ্রা হইতে তার দিদিকে জাগাইয়া তুলিতে চায়। সারা পৃথিবীর ডাকে ওর যে এ ঘুম আর ভাঙ্গিবে না, হয় ত একথা তার জানা নাই। তাই সে কেবলই ডাকিতে লাগিল—দিদি, দিদি!

প্রবীণ লোকটা আগাইয়া তার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়া কহিলেন—এই ছোঁড়া, ওঠ্, ওঠ্ বল্‌ছি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব নইলে।

কোন কথা বলাইয়ের কাণে গেল কি না কে জানে! সে একভাবেই কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—দিদি, দিদি!

তার মাতামহ খানিকটা দূরে পথের উপর দাঁড়াইয়া ভীতনেত্রে চাহিয়াছিল। তাকে লক্ষ্য করিয়া রমেন্দ্রের মাতা কহিলেন—বেয়াক্কেল বুড়ো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস না কি! ডাক্ না তোর নাতিকে। কি বলে' ওকে ছেড়ে দিয়েছিস তুই।

অপ্রতিভ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল—ও যে অমন করে এসে পড়বে তা' আমি ভাবি নি মা। শুনে পর্য্যন্ত কেঁদে সারা হচ্ছে। চোখে চোখে রেখেছি, তা' সত্ত্বেও হঠাৎ কখন ছুটে চলে এল।

—ছুটে চলে এল, ন্যাকামী! ডাক্ শীগ্‌গির ওকে, নইলে মেরে খুন করে ফেলব। কি বজ্জাত ছেলে, কিছুতেই ওঠে না যে!

বৃদ্ধ দূরে দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিল। বলাই উঠিল না। বিভার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—দিদি, দিদি, একটা কথা বল! আমি ক'দিন আসি নি বলে কি তুমি রাগ করেছ! ও দিদি, একটা কথা বল দিদি!

—না, এ ত ভাল জালা হ'ল দেখ্‌ছি! মার না খেলে ও কিছুতেই উঠবে না দেখ্‌ছি। দে ত নিতাই, ওকে ঘা কতক চড়।

আদেশপ্রাপ্ত নিতাই আগাইয়া আসিয়া তাকে টানিয়া তুলিতেই তার হাত ছাড়াইয়া বলাই আবার বিভার বুকের উপর গিয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটী নিজেই এবার আসিয়া তার কাণ দুটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া তাকে খানিকটা দূরে সরাইয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধ ব্যস্তভাবে

ছুটিয়া আসিয়া বলাইয়ের হাত দু'টা ধরিয়া তাকে বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। বালকের আকুল কণ্ঠ ভেদ করিয়া তখনও ধ্বনিত হইতেছিল—দিদি, দিদি'!

শববাহীরা হরিধ্বনির সঙ্গে খাট তুলিল। মা কাঁদিতে লাগিলেন—ও মা আমার ঘরে লক্ষ্মী, ও মা আমার সোনার পিতিমে, কোথায় গেলি মা! ও মা, তোমায় ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো মা! ওরে রমে, ক্যাসবাক্সর চাবীটা আমায় দিয়ে যা', তুই আবার কোথায় হারিয়ে ফেলবি। ওরে রমে, চুড়ী ক'গাছ খুলে সিন্দুকে রেখেছিস ত? কাণের দুল দুটো, হার ছড়া? সোনার নো গাছটা হারায় নি তো? আচ্ছা। ও মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ মা! ও মা, আমি কি করে থাকব মা! ও মা, কোন্ দোষে আমায় ছেড়ে গেলি মা! ও রমু, দেখিস, টাকা যেন বেশী খরচ করিস নে। তোর সব বাড়াবাড়ি কি না।

দিন তিনেক পর। কার্য্যস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—কে কাঁদছে মা?

মা তোলা উনানে ছেলের বৈকালিক আহারের জন্য লুচি ভাজিতেছিলেন। সাজান রেকাবীখানা ছেলের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া কহিলেন—সেই ছোঁড়াটা আজ মরে গেল কি না, তাই ওর দিদিমা কাঁদছে। আয়, তুই খেতে বোস। ভেবে ভেবে তুইও যে যাবার দাখিল হ'লি। এতই বা কি? বৌ কি আর কারো মরে না? তার জন্যে এত কেন?

রমেন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল—বলাই মারা গেছে, কি হয়েছিল তার?

জ্বর। সেই রাত থেকেই জ্বর হয়, আজ দুপুরে শেষ হয়ে গেল। শুনলুম, সে আর ওঠেও নি, খায়ও নি, কারও সঙ্গে কথাও বলে নি। কে জানে বাপু, কি যে সব ঢংয়ের মরণ হয়েছে, দেখ্‌লে হাড় জ্বলে যায়!

রমেন্দ্র নীরবে উঠিয়া একখানা টুলের উপর বসিয়া পড়িল। বিরক্তভাবে মা কহিলেন—তোর আবার হ'ল কি?

রমেন্দ্র কথা কহিল না। অপরাহ্নের উতল হাওয়ায় বলাইয়ের দিদিমার আর্ত্তকণ্ঠ ভাসিয়া আসিতে লাগিল—বলাই, বলাইরে!

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ
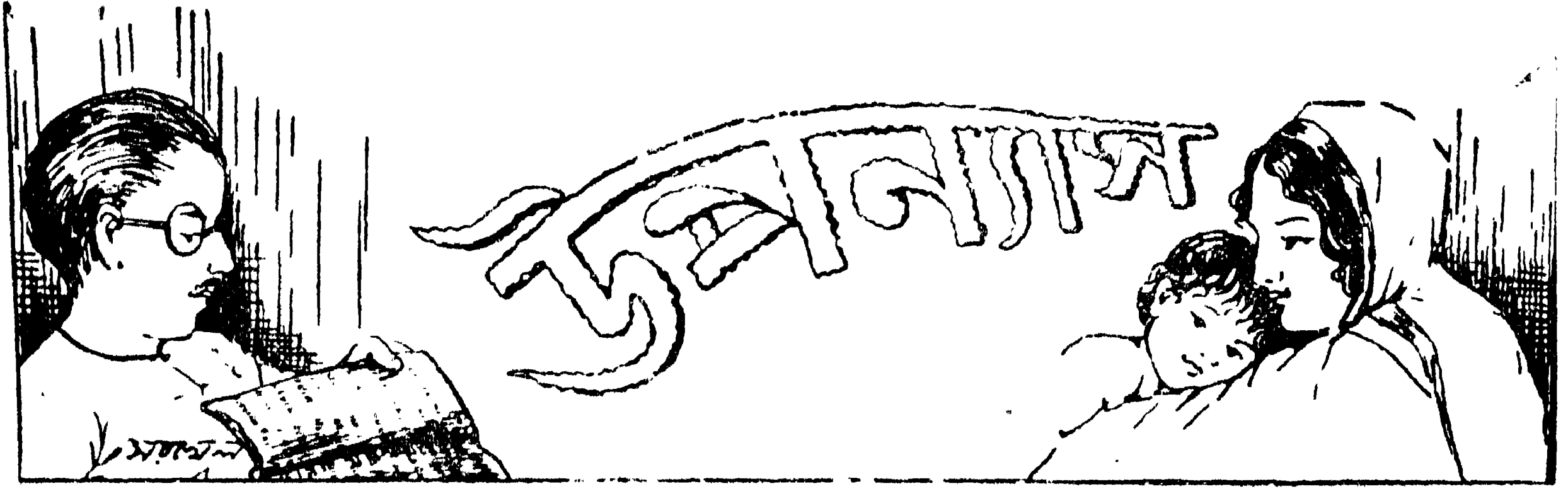
উপন্যাস

অভিশপ্তা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

পূর্ব্বাভাষ—

উপন্যাসের নায়ক মিহির উচ্চশিক্ষিত না হলেও অশিক্ষিত নয়। সে রূপবান, স্বাস্থ্যবান, এবং তার প্রকৃতি মধুর। তা' ছাড়া, তার বাড়ীর অবস্থা ভাল। মিহিরের পিতা দত্ত-মশায়ের লোহার সিন্ধুকভরা অগুণতি টাকা, কিন্তু এক পয়সা বাজে খরচ করবার সময় নেই তাঁর। সেই সংসারে দত্ত-মশায়ের এক বন্ধু কন্যা উপন্যাস নায়িকা রেখা থাকে। মিহিরের বাগ্‌দত্তা পত্নী সে, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে মিহিরের সহিত বিবাহ হতে পারে নি; তার কারণ, রেখার পিতা অতর্কিতে একদিন ওপারের সন্ধানে চলে গেলেন মেয়েকে দত্ত-মশায়ের সংসারে রেখে। রেখা রূপের মোহে মিহিরকে ভালবেসেছিল; কিন্তু মিহির সে ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারে নি তাদের বাড়ীর ঝি যুবতী তরীর মোহে। তরীই তার ভালবাসার প্রতি-বন্ধক হয়েছিল এ কথা রেখা জান্‌তে পারে। সে বুঝ্‌তে পারল তার ভালবাসা একটা খেলার সামগ্রীর মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন বর্ষারাতে মিহির হারাল প্রাণ, আর এই হত্যাকাণ্ডে দত্ত-মশায়ের সংসার গেল ভেসে। মিহিরের ছোট ভাই শিশির থাক্‌ত কোলকাতায়। সে এল, পুলিশ এল, বিচার হ'ল। তরীকে সন্দেহ করল অনেকে। রেখা এই হত্যাকাণ্ডে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল; তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল সেই প্রাণ-প্রতিম মিহিরের মুখ। সে শিউরে উঠল! তার শোকে মুহ্যমানা হয়ে পড়ল সে। সুনীত একজন উচ্চশিক্ষিত বিলেত-ফেরৎ যুবক। রেখাকে তারই বিয়ে করবার কথা ছিল; কিন্তু হয়ে ওঠে নি ভাগ্য বিড়ম্বনায়। মিহিরের এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডে রেখা একরকম পাগল হয়ে উঠল। শিশিরের সাহায্যে কোলকাতায় এল সে। সুনীতের দেখা পেল। তরীকে বাঁচবার জন্যে সুনীতের সাহায্য চাইল। সুনীত প্রথমে রাজী হ'ল না। রেখা বল্‌ল—তরী নির্দ্দোষ; বিনাদোষে সে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারবে না—প্রাণ থাক্‌তে সে এ দৃশ্য দেখ্‌তে পারবে না।...অদ্ভুত এ হত্যাকাণ্ড! রেখার এ প্রার্থনা সুনীত অগ্রাহ্য করতে পারল না। সুনীত ভাবতে লাগ্‌ল, অন্যমনস্ক হয়ে রেখার জড়িয়ে পড়া জটিল জীবনটাকে মুক্ত করা যায় কি প্রকারে? এই হত্যাকাণ্ডের মামলা চল্‌ল অনেক দিন ধরে। তরীই যে হত্যাকারিণী এই সকলে বুঝ্‌ল। রেখা চাইল তরীকে বাঁচাতে। রেখা এই হত্যার কথা ভাবতে ভাবতে পড়ল এক বিশ্রী রোগে। দিন দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগ্‌ল। হত্যাকাণ্ডের মামলার দিন পড়ল। রেখারও জবানবন্দী দেওয়া ছিল; তাকে যেতে হ'ল কোর্টে। তরীকে জেরা করল উকীল। তরী নির্দ্দোষ একথা প্রমাণ করল সে নিজে; কিন্তু তার পক্ষে কেউ ছিল না সাক্ষী-হিসাবে। সেই কোর্টে তরীর আশু বিপদ দেখে হঠাৎ রেখার হ'ল মূর্চ্ছা। শিশির ও সুনীত ধরাধরি করে নিয়ে এল তাকে বাড়ীতে। অসুখের মধ্যে একদিন সুনীতের দেখা পেল রেখা। তার কাছ থেকে জান্‌তে পারল তরী বেকসুর খালাস পেয়েছে। সুনীতের এই দয়া ও চেষ্টা দেখে রেখা সুনীতকে বল্‌লে—তুমি আমায় বাঁচালে সুনীত দা'!...রেখা আজকাল সুনীতের বাড়ীতেই থাকে। এখন সে আগেকার চেয়ে একটু ভাল। দত্ত-মশায় রেখার সংশ্রব ত্যাগ করলেন। সুনীত রেখাকে আশ্রয় দিল আনন্দে বল্‌লে—আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন...ততদিন...তুমি থাকবে?... রেখা বল্‌ল শেষে,—তাই থাক্‌ব সুনীত দা'। ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই, তবু দুঃখিনী অনাথা বোন্‌টি বলে—তার অপরাধ ভুলে যদি আমায় ঘরে স্থান দাও তুমি!...

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহার পরের ঘটনা বিবৃত হইল।

এগার

তরী আর গ্রামে যায় নি।

কোলকাতারই একটা হোটেলে সে চাকরী করে। তার বয়স অল্প, চালাক চতুর আছে বেশ, সকলের মন যুগিয়ে চল্‌তে পারে, কাজেই হোটেলের কর্ত্তা তাকে মাইনে কিছু বেশী দিয়েই রেখেছেন। তা' ছাড়া, বখ্‌শিস্‌টা-আস্‌টাও পেয়ে যায় সে মধ্যে মধ্যে। মোটের ওপর তরীর রোজগার এখানে মন্দ হয় না। এখানে গ্রামের চেয়ে সুখেই আছে সে।

সেদিন রাত দশটা কি তারও বেশী হবে। তরী বাবুদের জন্য পান বিড়ি আন্‌তে দোকানে যাচ্ছিল। দোকানটা রাস্তার মোড়ে। গলি দিয়ে গেলে 'ফুস্‌' করে বেরিয়ে যাওয়া যায়, তাই সেই দিক্‌ দিয়েই সে যাচ্ছিল। অদূরে কেরোসিনের একটা লণ্ঠন টিম্‌ টিম্‌ করে জ্বল্‌ছে, তা'তে সঙ্কীর্ণ গলির গাঢ় অন্ধকারটাকে সামান্য একটু ফিকে করেছে মাত্র।

তরী আপন-মনেই গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে গাইতে হন্‌হনিয়ে চলেছে, হঠাৎ কে ডাক্‌লে—তরী!

তরী ফিরে দেখ্‌লে—আহ্বানকারী তা'র অপরিচিত নয়। ঠিক্‌ এমন সময় এখানে তার আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না হয় তো, তাই তরী গতি স্থগিত করে বিস্ময়ের সহিত বলে উঠ্‌ল—কে রে? শিবু? তুই এখানে যে!

—কি করি, তোর জন্যে—

শিবু তখন তরীর কাছ ঘেঁসে এসে বল্‌লে—বাবারে বাবা! ক'দিন ধরে খুঁজে খুঁজে একেবারে হয়রান! এ কোলকাতা সহরে পাত্তা লাগানো তো সোজা কথা নয়! তারপর? খবর কি তোর? আছিস তো বেশ দেখ্‌ছি। চেহারাখানিও গোলগাল হয়েছে দিব্যি! তা' হবে না কেন, বড় বড় সব বাবু জুটেছে এবার।

—সব্‌! এ মিন্সে আমার বাবু জুট্‌তেই দেখে খালি! খেটে খেটে মুখ দে রক্ত ওঠে, তবে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাই, তা'তেও তোর বুক কর্‌কর্‌ করছে!

শিবু তরীকে ভালবাসে অনেকদিন থেকেই। গ্রামে থাকৃতে তরীকে সে চোখে চোখে রেখেছিল। তার আশা ছিল, সহরে কোনো একটা কাজের সুবিধা করতে পারলেই সেখানে তরীকে নিয়ে গিয়ে সুখের সংসার পাত্‌বে—এরি মধ্যে এই বিভ্রাট!

তরীর কথায় শিবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—বুক কর্‌কর্‌ করবে না? আমি পুরুষ তো বটে! আমার চোখের সামনে তুই অন্য পুরুষের সাথে···না তরী! সে হবে না, আমি তোকে হোটেলে চাকরী করতে দেব না কক্ষনো—

তরী রাগত হয়ে উষ্ণকণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল—আ মরে যাই! কি আমার সুহৃদ রে! চাকরী করতে উনি দেবেন না! তা' হ'লে না খেয়ে মরব না কি! বসিয়ে খাওয়াবার মুরোদ আছে তোর? না, মুখেই শুধু ফরফরানি!—

শিবু তরীর হাতে হাতের একটু চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লে—বসিয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থাই এবার করছি তরী, আর আমাদের ভাবনা নেই। এধারে আড়ালে একটু আয় তো, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি কথা? আমার এখন কথা-টথা শোনবার ফুরসৎ নেই, বাবুরা পান বিড়ির জন্যে...

—ধুত্তোর বাবু! আমি যা' ফিকির করেছি, তা' যদি ঠিকমত লেগে যায়, তা' হ'লে কোনো বাবুর তোয়াক্কা রাখ্‌তে হবে না আর—একেবারে আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে...

তরীকে গলির একধারে অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়ে শিবু তা'র কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বল্‌তেই তরী তার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা করলে—কেন? তার সাথে দেখা করৃতে চাস্‌ তুই কি মতলবে, তা' আমায় বল্‌ আগে—

—আ গেল যা'! কেন, কি বৃত্তান্ত সব বল্‌তে হবে ওকে! তোর অতশত জেনে দরকার কিরে মাগী! যা' বল্‌ছি, তাই কর্‌ না—শুধু একবারটী নিরিবিলিতে দেখা করিয়ে দেওয়া, বাস! তারপর যা' করবার, আমিই করব। বল্‌,—রাজি?

তরী চুপ করে একটু ভেবে মাথা নেড়ে দৃঢ়তার সহিত

বল্‌লে— উঁহুঁ, আমি পারব না। তোর নিশ্চয় কোনো কু-মতলব আছে। সে বেচারী এই সবে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচেছে। কদ্দিন মনে করেছি একবারটী গিয়ে দেখে আসি; তা' সাহস হয় না, কি জানি আমাকে দেখে যদি কান্না-কাটি করে...

—কিসের কান্না? ও তো বেশ আনন্দে আছে। অত-বড় একজন ব্যারিষ্টারের বউ—আরে, এখনো হয় নি যেন, কিন্তু দু'দিন বাদে হবে তো?

—দূর! কে বল্‌লে?

—বল্‌বে আবার কে? এতো ধরা কথা। অত দরদ অত টান কি শুধু শুধুই? ওদের বিয়ে যদি না হয় তো কি বলেছি...

—তা' হোক্ না, বেশ তো, ও মেয়েটা সুখী হোক্! তা'তে তোর এত গায়ের জ্বালা কেন?

—গায়ের জ্বালা নয়, এ তো খুসীর কথা। কিন্তু... আমি চাই এই হিড়িকে কিছু টাকা আদায় করে নিতে, বুঝ্‌লি? যাতে একটা দোকান-টোকান করে আমরা দু'টীতে...

—অ্যাঁ! বলিস্ কিরে,—এত টাকা তোকে দেবে কে? কেন দেবে?

—আবার! বল্‌ছি, তোর ঐ কেন কি বৃত্তান্ত আমি এখন বল্‌তে পার্‌ব না, তবু—থাক্ গে, মিছে বকর্ বকর্ করিস নে পথের মাঝখানে। আমি যা' বল্‌লুম, তা' করতে রাজি কি না তাই বল?

—না, আমি পারব না কক্ষনো। তুই ও সব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দে শিবু! যে মানুষটা আমার জন্যে এত করলে, আমাকে ফাঁসী থেকে বাঁচালে ··

—ইস্! ফাঁসী থেকে বাঁচিয়েছে না ঘোড়ার ডিম! আমি বেঁচে থাকতে তোকে ফাঁসী দিতে পারত কে? কারো বাবারও সাধ্যি নেই—

—আঃ, কি আবোলতাবোল বকিস্ শিবু! আজ-কাল নেশাটেশা ধরেছিস্ না কি?

—নেশাই বটে! মাইরী! তোর জন্যে আমি যে কি যন্ত্রনা ভোগ করছি তরী, তা' বুঝ্‌তিস যদি!

শিবু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে তরীর হাত দু'খানা ধরে মিনতির সুরে বল্‌লে—আমার কথা শোন্ তরী, তেরে পায়ে পড়ি! আমি তোর ভালর জন্যই বল্‌ছি। ফাঁকতালে কিছু টাকা রোজগার করা যায় যদি—

—থাক্! আমার ভালর জন্যে ভাবতে হবে না তোর। টাকাও আমি চাই না। আমি বুঝতে পেরেছি, মনে মনে কি একটা ফন্দী এঁটেই তুই—না বাবু, আমি পারব না।

—পারবি না? তবে মর গে যা' তোর ওই বাবুদের—

তরীর হাত দুটো ছেড়ে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে শিবু রাগে গস্‌গস্ করতে করতে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শঙ্কিত হয়ে তরী ভাবতে লাগ্‌ল—এ আবার কি কাণ্ড! শিবুর আসল মতলবটা কি? রেখার কাছে টাকা আদায় করবে সে কেমন করে? যাই হোক্, রেখাকে একটু সতর্ক করে দেওয়া দরকার। শিবুটা যে কাঠ গোঁয়ার, টাকার লোভে কি করে বসে না জানি! এ সব কুবুদ্ধি কে যে মাথায় ঢুকিয়ে দিলে তার!

বার

—আজ শিশির এসেছিল সুনীত দা'।

—কই সে?

—চলে গেছে। লুকিয়ে এসেছে বেচারা, জ্যাঠামশায় না কি রাগ করেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিঃশব্দে ফেলে রেখা বল্‌লে—ও বাড়ীতে ঐ একটাই লোক ছিল সুনীত দা', যে আমার ব্যথা বুঝেছে, আমাকে যথার্থই ভালবেসেছে আপন বোন্‌টীর মত।

সুনীতের ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞাসা করে আর একজনের কথা—যার জন্যে রেখা জীবনটাকে এভাবে নিষ্পেষিত ব্যর্থ করতে উদ্যত, তার কাছে এমন কি পেয়েছিল সে?—

কথাটা কতদিন বলি বলি করেও বল্‌তে পারে নি সুনীত, আজও পারলে না—রেখার আহত চিত্তে নূতন করে আঘাত লাগ্‌বার ভয়ে।

যদিও মিহিরকে ভালবেসে রেখা প্রতিদান পায় নি,

তার কতক আভাষ এর মধ্যে পেয়েছে সে...কিন্তু কে জানে, নারীর অন্তরের সন্ধান অন্তর্যামীই জানেন বুঝি!

সুনীত বল্‌লে—হ্যাঁ, শিশির ছেলেটী ভাল, বাপের মত মোটেই নয়। বাস্তবিক, তোমার জ্যাঠামশায়টীকে যে রকম দেখ্‌লুম, তা'তে আমার বড় আশ্চর্য্য মনে হয় রেখা, যে, ঐ লোকটার অধীনে তুমি আজন্মের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে এতদিন কেমন করে কাটিয়েছ?

—কি করি? ভুল করলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সুনীত দা'। তবে প্রায়শ্চিত্তটা যে শেষে এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠবে—

—ভুল মানুষ মাত্রেই করে থাকে রেখা। তার জন্যে তুমি এত···

—না, না, আমার মত মারাত্মক ভুল কেউ কোনোদিন করে নি সুনীত দা'! সত্যি, আমি যে কি করে বেঁচে রয়েছি এখনো—

—যাক্ গে, ও সব ভেবে তুমি মন খারাপ করো না। চলো, মোটরে করে গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।

—কি হবে আর বেড়িয়ে? থাক্!

সুনীত ক্ষুণ্ণ হয়ে রেখার ম্লান মুখের পানে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লে—জীবনটাকে এভাবে তুচ্ছ করে কোনো লাভ নেই, বুঝলে রেখা?—তোমার জীবনের দাম তোমার কাছে কিছু না হতে পারে, কিন্তু—আমার কাছে ঢের বেশী!—নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে তোমাকে আমি যে কি করে ফিরিয়ে আন্‌তে পেরেছি—তা' যদি জান্‌তে—

—জানি সুনীত দা',—তুমি আমার জন্যে কত কষ্ট করেছ, এখনো করছ, তা' বুঝি সবই,—কিন্তু কি করি, দুর্ভাগ্য আমার,—তোমাকে শুধু কষ্ট দিতেই এ পৃথিবীতে এসেছিলুম আমি!

রেখার চোখ জলে ভরে এল।

সুনীত উদ্বেলিত হৃদয়াবেগ কষ্টে চেপে রেখে চুপ করে বসে রইল।

রেখাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সে ব্যথা দিয়ে ফেলে, তার এতটুকু আদর-স্পর্শ রেখা সহ্য করতে পারে না, একটি মিষ্টি কথা বল্‌লেই চোখে জল এসে পড়ে তার, এর প্রতীকার করা যায় কি করে?

—তুমি বেড়িয়ে এসো না সুনীত দা', বেড়ানো অভ্যেস তোমার।

—না, আজ আর বেড়াতে ইচ্ছে করছে না। তবে রমেশবাবুর কাছে একবার যেতে হবে জরুরী একটা কাজে—

—তা' হ'লে বেলাবেলি সেরে এসো না। সন্ধ্যেবেলাটা আমি একা থাকৃতে পারি না, কেমন ভয় ভয় করে যেন—

—ওটা কিছু না—দুর্ব্বলতার জন্যে। তাই তো বলি, অন্ততঃ সন্ধ্যেবেলায় একটু ফাঁকা জায়গায় বেড়িয়ে এলে মনটাও অন্যমনস্ক হয়, শরীরও সারে। আচ্ছা, আজ না হয় থাক্,—কাল থেকে কিন্তু তোমার কোনো ওজর শুন্‌ব না আমি, জোর করে ধরে নিয়ে যাব, বুঝ্‌লে?

সুনীত কাপড় ছেড়ে যাবার সময় বলে গেল—আমি এখনি আস্‌ছি রেখা। তুমি ততক্ষণ ঘরের কোণে না থেকে ঝিকে নিয়ে বাগানে গিয়ে বসো একটু।

রেখার মর্ম্মস্থল মথিত করে' ঝরে' পড়ল একটা উচ্ছ্বসিত উষ্ণশ্বাস।

—ও গো দেবতা! ও গো ক্ষমাময়! ও গো দয়াময়! তোমার দয়ার একটু কম করো, কম করো! সর্ব্বহারা রিক্তার ভাঙা বুকে অত যে সয় না গো! বুক যে তার ফেটে যায়!

—যে তোমাকে শুধু ব্যথাই দিয়েছে নির্ম্মমের মত—এমন করে বুকের দরদ ঢেলে তাকে কেন...না, না, এতো তার প্রাপ্য নয়!

—জানি, তোমার ভাণ্ডার অফুরন্ত, কিন্তু হে দাতা! গ্রহীতার গ্রহণের যোগ্যতা কোথায়? আজ তোমার করুণার দান নিতেও মন যে তার মরমে মরে যায়, অনুতাপে গলে যায়!

কিন্তু...এ কি শুধু করুণা? আর···আর কিছু নয়?কে জানে!

বাগানে এসে রেখা আনমনা হয়ে ভাব্‌ছিল—সে, যা' একদিন পেয়ে হারিয়েছে, আর তা' পাওয়ার প্রত্যাশা

না রেখে তারি গোপন আভাস যেন ছুঁয়ে যায় সুনীতের চোখের চাহনিতে, মুখের বাণীতে,—রেখার বুকখানাও তখন দুলে ওঠে যেন পুলকে নয়, বেদনায়।

কিন্তু সেই বেদনাই মাঝে মাঝে এমন নিবিড়, মধুর হয়ে ওঠে কেমন করে?—'তোমার জীবন তোমার কাছে তুচ্ছ, কিন্তু আমার কাছে তার দাম ঢের বেশী—'

সুনীতের এই কথাটাই আজ ঘুরে ফিরে বারে বারে রেখার গুরু আঘাতে মূর্চ্ছাহত স্তব্ধ মনখানাকে চঞ্চল করে তুল্‌ছিল ওই চৈত্র মাসের আবেগ-তপ্ত উদাস বাতাসের মত। সদ্যফোটা রজনীগন্ধার মিষ্ট মদির গন্ধে অন্তর তার কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন, বিহ্বল হয়ে পড়ছিল যেন।

সেই সময় অন্যমনস্কা রেখা কিসের একটা শব্দে চমকিত হয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে দেখ্‌লে—বাগানের পাঁচিলের ওপর মুখ বাড়িয়ে কে একজন লোক তারই দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। কি উদগ্র তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি! মুখখানা যেন চেনা চেনা। কে ও? অমন করে লুকিয়ে ওখানে কি মতলবে?

ভাল করে না দেখতে-না-দেখ্‌তেই মুখটা পাঁচিলের ওধারে ত্রস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই একটা হুটোপুটির মত শব্দ এবং অস্ফুট চীৎকার—

কে চীৎকার করে, তরী না? হ্যাঁ সেই তো। ধস্তাধস্তি করতে করতে হাঁপাতে হাঁপাতে সে কি যেন বল্‌তে চেষ্টা করছে।

উঃ! এ কি! আবার সেই কাণ্ড না কি?

রেখার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। চোখের সামনে চকিতে ভেসে উঠ্‌ল—আর একদিনকার একটা নৃশংস বীভৎস দৃশ্য! থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে পাশের বেঞ্চিখানায় বস্‌তেই অবশ দেহটা তার ঢলে পড়ল মূর্চ্ছিতের মত।

—রেখা! ও রেখা!—কি হ'ল তোমার?—অমন করে পড়ে যে—

ব্যগ্র ব্যাকুল আহ্বান ও কোমল করস্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রেখা দেখ্‌লে—সুনীত তার পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন মুখে।

—কে সুনীত দা'?—ওরা গেছে?—অ্যাঁ!

বল্‌তে বল্‌তে রেখা সুনীতের হাতখানা চেপে ধরলে। তার চোখে মুখে ভীতিবিহ্বল ভাব।

—কে রেখা, কার কথা বলছ তুমি?

—ওই যে এখনি—কি কটমটে তার চোখ দুটো—

ঝি বল্‌লে—কই, এধারে তো কেউ আসে নি। দিদিমণি ভয় পেয়েছেন বোধ হয়। ভর সন্ধ্যাবেলা বাগানে একলাটী, আমাকে ডাক দিলেন না কেন?

—নাঃ!—ভয় আবার কিসের? তুমি তো এমন ভীতু ছিলে না রেখা?

—ছিলুম না, কিন্তু এখন হয়েছি। কি জানি কেন মনে হ'ল—যেন ঐ ধারের পাঁচিলের ওপর থেকে কে উঁকি মার্‌ছে,—আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

আসল কথা গোপন করে রেখা বাধবাধভাবে পুনরায় বল্‌লে—ও হয় তো আমার চোখের ভুল সুনীত দা'। কিন্তু তা'তেই এমন ভয় হ'ল,—মনে হ'ল যেন—

দারুণ আতঙ্কে রেখা কথাটা শেষ করতে পারলে না। সেই ক্ষণিকের দেখা মুখখানা—সেই অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার—তার মনে তখনো বিভীষিকা জাগিয়ে রেখেছে,—কিন্তু সুনীতকে বল্‌তে সাহস হয় না—কি জানি কেন!

সুনীত বল্‌লে—দুর্ব্বলতার জন্যই এ রকম হচ্ছে রেখা, ডাক্তার বল্‌ছিলেন—চেঞ্জে গেলে তোমার উপকার হবে। তাই নিয়ে যাব মনে করছি। হাতে যে মোকর্দ্দমাটা আছে, তার একটা বিহিত করে—আচ্ছা, কোথায় যাবে বলো দেখি? পুরী?—না, পশ্চিমে কোথাও?

সুনীতের দরদভরা ব্যাকুল চোখ দু'টির পানে তাকিয়ে রেখার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল,—এত স্নেহ,—এত দয়া,—কিন্তু—হায়!

চোখের জল চোখে চেপে ঠোঁটের কোণে জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে রেখা বল্‌লে—আচ্ছা, সে পরে ভেবে ঠিক করা যাবে। এখন চলো, তোমার খাবার সময় হয়েছে।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

বৌদীঘি

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

দেশের সঙ্গে আমাদের কোনদিনও কোন সম্পর্ক ছিল না। বাবা বরাবরই সরকারী চাকুরী করতেন; মাঝে মাঝে তাঁকে বদলী হ'তে হ'ত, আমরাও তাঁর সাথে সাথে চরকীর মত ঘুরে বেড়াতাম। এইভাবে জীবনের অনেক-গুলি বছরই যখন কেটে গেল, তখন ম্যাট্রিক পাশ করে কোলকাতায় আই-এ পড়তে এলাম।

বাবা মায়ের মুখে দেশের নাম বহুদিনই শুনেছি, কিন্তু সেখানে যাওয়া কখনও ঘটে ওঠে নি; কেন না সহর-অভ্যস্তা মা আমার পাড়াগাঁয়ের নামও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, যত ম্যালেরিয়া, সর্দ্দি, কাশি, জর-বিকার সব যেন সেখানে তাঁর স্নেহের সন্তানগুলিকে আঁকড়িয়ে ধরবার জন্য 'ওৎ' পেতে বসে আছে।

কিন্তু সেবার গ্রীষ্মের বন্ধে ঠাকুরমা আমাদের মিলনাকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে বাবাকে এক চিঠি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ চেতনাও দিয়ে দিলেন যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের যে লীলাভূমি স্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধনে তাঁদের বেঁধে রেখেছিল, তাকে আমরা এতদিন কাটাবার যত চেষ্টাই করে থাকি না কেন, আজও তার সঙ্গে আমাদের দেনা-পাওনার শেষ হয় নি। সাপ-খোপ, মশা-ম্যালেরিয়ার ভয় মা আমাকে যতই দেখান না কেন, এ ধাঁচের কথা শুনলে মন আমার কোনদিনই স্থির থাকতে পারে নি—তাই শীগ্‌গিরই একদিন ভুলে-যাওয়া সেই দেশের পথে আমায় পা বাড়াতে হলো।

কি অদ্ভুত আকর্ষণ এই পল্লী-জননীর! ষ্টীমার হ'তে নেমে মাটিতে পা দিতেই সেটা ভালরূপে অনুভব করলাম। মনে হ'ল, আমার এক মা আর এক পুরাতন মায়ের বুক হতে আমায় এতদিন যেন ছিনিয়ে রেখে দিয়েছিল।

পল্লীর সে শ্যামশোভা আমার চক্ষু দু'টি জুড়িয়ে দিল। পথের দু'ধারে অসংখ্য গাছপালা। তা'তে ফুটে রয়েছে লাল, সাদা, নীল, সবুজ হরেক প্রকারের ফুল, আর তারই আশে-পাশে মৌমাছিদের আনাগোনা!

দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই আমি গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম। ঠাকুরমা আমায় কত বল্‌তেন—দেশে এলি ত দিনরাত পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরেই বেড়াবি? দু'-দণ্ড না হয় আমার কাছে বোস্‌।

কিন্তু চির-প্রবাসী মন আমার আজ সহসা দেশের মাটীতে পা দিয়ে যেন এক অনাস্বাদিত স্বরলোকে বিচরণ করতে লাগলো।

সমস্ত দিনটা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যখন নিঝুম চাঁদের আলোয় ঠাকুরমার কোলে মাথা রেখে বাবার ছোটবেলাকার গল্প শুন্‌তাম, তখন আমার দু' চোখের কোণ ব্যথায় ও আনন্দে ছলছল করে উঠত।

সেদিন বিকালের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যখন গ্রামের মধ্যে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছি, এমন সময় গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়লো একটা ফাঁকা জায়গা। এগিয়ে গিয়ে দেখি—সেটা ফাঁকা জায়গা নয়, বহুদিনকার অব্যবহার্য্য একটা পুরাতন দীঘি!

ধীরে ধীরে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলাম। সিঁড়ি-গুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় হাত দশেক হবে। দশ-বারটা সিঁড়ি নেমে তবে জলে পৌছান যায়। সিঁড়িগুলো ভেঙে ভেঙে এক এক জায়গায় মস্ত মস্ত ফাটল ধরেছে; সেই ফাটলের ভিতর হতে নানা প্রকারের বন্য গাছপালা তাদের শাখা-প্রশাখা বার করে আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে। দীঘির জলও অসংখ্য বন্য গুল্ম-

লতায় ভরে গেছে। এক জায়গায় দু'টি পদ্ম সন্ধ্যার হাওয়ায় দুল্‌ছিল। দীঘির চারিপাশও গাছপালায় ভর্ত্তি।

পথ চলে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম; তাই এগিয়ে গিয়ে একটা ধাপের উপর বসে পড়লাম।

আকাশের গায়ে তখন দু'-একটী সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠেছে। সারাদিনের অসহ্য গরমের পর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া শিরশির করে বইতে আরম্ভ করেছে। দীঘির পাড়ের গাছপালার ভিতর হতে ঝিঁঝিঁ পোকার বাজনা বেজে উঠেছে। চারিদিকে যেন কেমন একটা নিঝুম নিস্তব্ধ ভাব! আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হলো। এমন সময় হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে চেয়ে দেখি—একটি বৃদ্ধ সেই ঘাটের ধাপের 'পরে দাঁড়িয়ে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার চুপ করে বস্‌লাম।

বৃদ্ধটি নিঃশব্দে নেমে এসে আমার পাশেই বস্‌লেন।

—তুমি মুখুয্যেদের বাড়ীতে থাক না?

—আজ্ঞে হাঁ।

—গ্রীষ্মের বন্ধে দেশে বেড়াতে এসেছ বুঝি?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম।

—এর আগে দেশে আর কোনদিন আস নি?

—না।

তারপর বহুক্ষণ এ কথা সে কথার পর আমি তাঁকে শুধালাম—আচ্ছা, এ দীঘিটা এমন অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে আছে কেন? এমন মস্ত দীঘি, এটা সংস্কার করলে লোকের কত উপকার হয়।

তিনি মৃদু হেসে বল্‌লেন—কে সংস্কার করে বাবা, গ্রামে কি আর মানুষ আছে! কতগুলি নর-কঙ্কাল শুধু এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকের বিশ্বাস এটা ভূতে-পাওয়া দীঘি।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে শুধালাম—ভূতে-পাওয়া! কেন?

সে অনেক কথা। বলে তিনি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন।

সে আজ প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। ঐ যে দেখ্‌ছ দীঘির পশ্চিম পাড়ে একটা দালান দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে রায়েদের কোঠাবাড়ী; আর এই দীঘিটা ওঁদেরই পূর্ব্বপুরুষদের খনন করা।

মাধব রায়রা ছিলেন তিন ভাই। মাধব, যাদব আর জিতেন। জিতেন ছিল সকলের ছোট।

সে যখন মেডিকেল কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে, তখন রমা তাদের বাড়ীর বৌ হয়ে এলো। অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর দেখা যায় না। কি সুন্দর তার গঠন! মাথা ভরা একরাশ চুল। টানা টানা কালো দু'টি চোখ, গভীর কালো ঝালরের আঁখিপাতে ঢাকা। সারা অঙ্গ বেয়ে যেন একটা লক্ষ্মী-শ্রী নেমে এসেছে। সার্থক তার বাপ-মায়ের রাখা নাম রমা! সে ছিল যেন একটী হাসির ঝর্ণা!

বাড়ীর আর দুই বউ রমার চাইতে রূপে অনেক খাটো ছিল। রমাকে যে দেখ্‌তো, সেই ভাল না বেসে থাকতে পারত না। পরকে আপন করে নেওয়ার যে ক্ষমতা, সেটা রমার খুব বেশীই ছিল। এই জন্যই বাড়ীর ঝি-চাকর হতে কর্ত্তারা পর্য্যন্ত 'রমা' বলতে অজ্ঞান হয়ে যেত। এই সব কারণেই বাড়ীর মেজ বৌ তাকে দু' চক্ষে দেখতে পারত না। এবং কিসে সে রমার দোষ ধরবে সর্ব্বদাই এই সুযোগ খুঁজে বেড়াত।

শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন নির্ম্মল এই বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে ছিল মাধবদের দূর-সম্পর্কীয় খুড়তুতো ভাই।

জিতেনের মেডিকেল কলেজের পড়া, সেই জন্য তাকে সব সময়েই কোলকাতায় থাকতে হতো, মাঝে মাঝে কচিৎ-কখনো ছুটী-ছাটা হ'লে সে দু'-একদিনের জন্য বাড়ী আসত। বড় দুই ভায়ের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না, তাই রমার মনটা সর্ব্বদাই সঙ্গী অভাবে ছট্‌ফট্ করত। এমনই একটা সঙ্গী-বিরহের দিনে হঠাৎ বাইরের ঘরে একরাশ পুঁথি-পত্রের মধ্যে সে আবিষ্কার করলে নির্ম্মলকে। যে মন্ত্রের গুণে বাড়ীর সব প্রাণীগুলিই রমার কাছে বশ মেনেছিল, সেই মন্ত্রেরই গুণে নির্ম্মলও এক পা এক পা করে তার কাছে এগিয়ে এল।

সেদিন হতে নির্ম্মলই হলো রমার সারা দিন-রাতের সাথী। নির্ম্মল গ্রামের স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়তো। সে চিরকালই একটু ভাবুক ছিল। অতি শৈশবে মা-বাপের স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে নির্ম্মলের মনের যে দিক্‌টা স্নেহের অভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সহসা রমা এসে সেখানে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে।

ঘুমিয়ে-পড়া দলগুলি আবার ধীরে ধীরে জাগতে আরম্ভ করলে। রমার দরদী মন দু' দিনেই নির্ম্মলের কোথায় ব্যথা তা' সহজেই জান্‌তে পারলো। সেও শৈশবে মাকে হারিয়েছিল, তাই যেদিন সে প্রথমে জান্‌তে পারলে নির্ম্মলেরও মা নেই, সেদিন রমার চোখের কোণ দু'টি ব্যথার জলে ভরে এলো।

নির্ম্মলের তখন থেকে ছোট বৌদি' না হ'লে আর কিছুতেই চলতো না। আগে স্কুল হ'তে এলে বড় বৌদি' খাবার এনে দিত। এখন থেকে সেই খাবার ছোট বৌদি' নিয়ে আসতে আরম্ভ করলে।

রমা একদিন নির্ম্মলকে বল্‌লে—কী যে এক ডাক শিখেছ ছোট বৌদি'—এতবড় একটা নাম উচ্চারণ করতে মুখ ব্যথা করে না?

একটু হাসি হেসে নির্ম্মল বল্‌লে—তবে কি বল্‌ব রাঘব পিসী!

খিল্‌খিল্‌ করে হাস্‌তে হাস্‌তে লুটিয়ে পড়ে রমা বল্‌লে—দূর তা' কেন, শুধু রমা দি' বল্‌তে পার না।

নির্ম্মলের কোন বোন্‌ ছিল না, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্‌লে—আচ্ছা যদি—বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ সে থেমে গেল।

উৎসুকভাবে রমা বল্‌লে—বা, থাম্‌লে কেন? যা' বল্‌ছিলে বলো?

এবার মাথাটা নীচু করে ধীরে ধীরে নির্ম্মল বল্‌লে—আচ্ছা রমা দি' না বলে যদি শুধু দিদিই বলি, তা'তে কি তুমি আমার ওপর রাগ করবে 'বৌদি'!

সস্নেহে নির্ম্মলের হাতটা ধরে রমা বল্‌লে—রাগ করবো কেন ভাই! সেই ভাল, আমি তোমার দিদিই হলুম। আজ হ'তে তুমি আমায় দিদি বলেই ডেকো।

নির্ম্মলের চোখের কোণ দু'টি অশ্রুভারে টলমল করে উঠ্‌লো।

সেদিন আকাশ ঘিরে নেমেছে ঘন বরষা। খোলা জানালার ধারে বসে নির্ম্মল একমনে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যখানা পড়ছিল, এমন সময় রমা নিকটে এসে বস্‌ল। কিছুক্ষণ একথা সে কথার পর সে বল্‌ল—এবার তো কোলকাতায় চল্‌লে ভাই, আর কি এই পাড়াগেঁয়ে দিদিটীর কথা মনে থাক্‌বে?...সেখানে কত গাড়ীঘোড়া, কত ভাল ভাল দেখবার জিনিষ; সে সব নিত্য-নতুন জিনিষ দেখতে দেখ্‌তে 'ফুস্‌' করে আমায় একদিন ভুলে যাবে।...

আজ কয়দিন হলো নির্ম্মলের পাশের খবর এসেছে; সে এবার কোলকাতায় কলেজে পড়তে যাবে।

মৃদু হেসে নির্ম্মল বল্‌লে—কি করে তুমি বুঝলে তোমায় আমি ভুলে যাবো দিদি!...

—বারে, একথা বুঝি আবার কেউ জানে না। এ তো খুব সোজা কথা। একজন যদি আর একজনকে অনেকদিন না দেখে, তবে সে ক্রমে ক্রমে তাকে ভুলে যায়।

—ও, তাই বুঝি তুমি ভেবে রেখেছ, আমি তোমাকেও ভুলে যাবো!

—না না, তা' কেন।

—তবে?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নির্ম্মল আবার বল্‌লে—হয় তো এমন দিন আস্‌বে দিদি, তুমিই আমায় ভুলে যাবে। কিন্তু নির্ম্মল কোনদিনও তোমায় ভুলবে না। আমার এ কথা সত্য কি না একদিন বুঝ্‌তে পারবে, কিন্তু আজ নয়।...

বলে সে তার নীরব দৃষ্টি দিয়ে বর্ষার ধারার দিকে চেয়ে রইল। তার ছোট বুকখানি যে আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায় কতখানি কাতর হয়ে উঠেছিল তা' এক ভগবান ব্যতীত

বোধ হয় আর কেউই জানে না। শুধু তার সাক্ষী রইল নীরবে ঝরে-পড়া চোখের দু'টি ফোঁটা জল।

রমার চোখ দু'টিও জলে ভরে এলো।…

নির্ম্মল কোল্‌কাতায় পড়তে চলে গেল। সেখানে সেই জনারণ্যের ভিতর যে তার দিনগুলি কেমন করে কাটত তা' একা সেই-ই জানত। কতদিন রাত্রে সে চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছে। তার ঘরে রমানাথ বলে আর একটী ছেলে থাকৃত। তার সাথে নির্ম্মলের বেশ আলাপ জমে গেছ্‌ল। মাঝে মাঝে সে বল্‌তো—যত ঘরের মধ্যে বসে থাকবেন নির্ম্মলবাবু, ততই মনের মধ্যে কেমন করবে; যান্, বাইরে একটু ঘুরে আসুন দেখি। বাইরের দুটো-চারটে জিনিষ দেখলেও মনটা অনেকটা শান্তি পায়, যান্।

প্রথম যেদিন রমার চিঠিখানা এলো সেদিন নির্ম্মলের আনন্দ দেখে কে!…

সে বারবার করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চিঠিখানা পড়লে, কিন্তু আশা যেন কোনমতে মিট্‌তেই চায় না।

আগের দিন ছিল রবিবার। রমানাথ শ্রীরামপুরে মামার বাড়ী গেছ্‌ল। সে ফিরে এলে নির্ম্মল একগাল হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—এই দেখুন, দিদি চিঠি দিয়েছে।

রমানাথ এগিয়ে এসে বল্‌লে—কৈ দেখি?

নির্ম্মলও চিঠির জবাব দিলে মস্ত একখানা পাতা ভর্ত্তি করে; তার মধ্যে বারে বারে একই কথা ঘুরে-ফিরে ছিল—দিদি গো, তোমায় ছেড়ে এসে আমার মন বড্ড খারাপ হয়ে গেছে…তুমিও কি এখানে চলে আসতে পার না ভাই?…

গ্রীষ্মের ছুটীতে নির্ম্মল যখন বাড়ী এলো, বড় বউ এসে সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে—সহরে গিয়ে নির্ম্মল আমাদের বড় রোগা হয়ে গেছে নারে ছোট বৌ!…

রমার চোখ দু'টি জলে ভরে এলো।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরে নির্ম্মল একা একা শুয়ে কত কথাই ভাবছিল, এমন সময় রমা এসে ডাক্‌লে—নিমু!

দিদি! বলে' নির্ম্মল উঠে বস্‌ল।

—ওঃ, এতদিন কি কষ্টেই কেটেছে দিদি!

—আমার জন্য কি খুব মন কেমন করতো নিমু?

—না তা' কি আব করত!……যত কষ্ট যেন একা তোমারি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার তাদের পুরাতন দিনগুলি ফিরে এলো।

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে একজন যে এই দু'টী সমবয়সীর মিলন মোটেই দু' চক্ষে দেখ্‌তে পারত না—সে হচ্ছে মেজবৌ নন্দরাণী।

সেদিন দুপুরবেলা রমার কোলে মাথা দিয়ে নির্ম্মল একমনে কোলকাতার গল্প করে যাচ্ছিল, রমা সস্নেহে নির্ম্মলের মাথার চুলগুলি আঙুল দিয়ে চিরে চিরে দিচ্ছিল আর তার কথা মন দিয়ে শুন্‌ছিল। এমন সময় সহসা মেজবৌয়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে দু'জনেই চমকে উঠ্‌লো।

—ছোটবৌ!

—মেজ দি'।

—এখানে বসে দেওর নিয়ে আদর হচ্ছে, ওদিকে যে চাকর-বাকরেরা স্নান করে দাওয়ায় এসে পাতা পেতে বসে আছে। দিদির ও আমার হাতযোড়া, তুমি ত তাদের একটু ভাতটাতগুলো দিতেও পার। দিবারাত্রিই কেবল পুরুষ ঘেঁসা—ছি ছি, ঘেন্না ধরালি ছোটবৌ, ঘেন্না ধরালি!…

বল্‌তে বল্‌তে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে রমা উঠে দাঁড়াল। ঘৃণায় দুঃখে মাটির বুকে তার মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল। এরপর হতে রমা খুব কমই নির্ম্মলের কাছে আসত। নির্ম্মলেরও ইচ্ছা হ'ত না দিদি তার কাছে এসে বকুনী খায়। শুধু দু'টী মিলন-পিয়াসী আত্মা ক্রমে ক্রমে যে কতবড় ব্যথায়

ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ছিল সে খবর এক শুধু ভগবানই জান্‌তেন।...

পূজার বন্ধে ইচ্ছা থাকলেও নির্ম্মল বাড়ী গেল না; সে এক বন্ধুর সাথে তার মামাবাড়ী বেড়িয়ে এলো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এমনি করে দেড়টা বছর কেটে গেল। আই-এ পরীক্ষা দেবার পর দীর্ঘ অবকাশে নির্ম্মল দাদার এক চিঠি পেয়ে এবার বাড়ীতে এলো।

সে এসে দেখ্‌লে, রমা অনেকখানি রোগা হয়ে গেছে। তার সারা অবয়বে ফুটে রয়েছে যেন করুণ বিরহের একটা কালো ছায়া! চোখের কোল দু'টীতে কালি পড়ে গেছে।...

দুপুরবেলা রমার হাত দু'টি ধরে নির্ম্মল শুধালে—এমন রোগা হয়ে গেছ কেন দিদি?...

করুণ হাসি হেসে রমা বল্‌লে—কিন্তু আমিও দেখ্‌ছি ভাই তুমিই রোগা হয়ে গেছ।

এর দিন কুড়ি বাদে হঠাৎ একদিন সুদীর্ঘ দুই বছর পরে জিতেন বাড়ী এলো। বাড়ীময় একটা হৈচৈ পড়ে' গেল। দিন দশ-বার থেকে আবার সে চলে গেল। এই সময়টা মেজবৌ কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী গেছ্‌ল। সেইজন্য নির্ম্মল আর রমার মেলামেশায় চোখ টাটাবার মত কেউ তখন ছিল না।

সুদীর্ঘ অবকাশের পর নির্ম্মলের যখন কলেজ খুল্‌লো, তখন সে একদিন দিদিকে বল্‌লে—আবার যাবার দিন এগিয়ে এল দিদি! এবার বিদায়ের গান গাইতে হবে।...

এরই কিছুদিন আগে বাড়ীময় রাষ্ট্র হয়ে গেছ্‌ল রমার ছেলে হবে। তাই নির্ম্মল হেসে বল্‌লে—এবার যখন নতুন অতিথি আসবে, তখন আবার একবার আস্‌ব।

লজ্জায় রমার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।

নির্ম্মলের আর যাওয়ার মাত্র দিন দশেক বাকী আছে, হঠাৎ সেই সময় একদিন মেজবৌ বাপের বাড়ী হতে ফিরে এলো। রমা নির্ম্মলের মেলামেশাটাও আবার সেদিন থেকে কমে এলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাতর হয়ে নির্ম্মল জান্‌লার ধারে বসে ভাবছিল, আর কয়দিন বাদেই তো এখান হ'তে চলে যেতে হবে তার দিদিকে ছেড়ে! আবার কতদিন পরে দেখা হবে ...

এমন সময় কি একটা কাজে রমা সে ঘরে এসে নির্ম্মলকে সেই অবস্থায় দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দেখ্‌লে, চোখের জলে নির্ম্মলের বুক ভেসে যাচ্ছে!...

—নির্ম্মল কাঁদ্‌ছ কেন ভাই?

সস্নেহে রমা নির্ম্মলের মাথাটা নিজের বুকের ওপর টেনে নিল।

—ছি ভাই, পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি কাঁদছ! আর ভাব তো আমি কত অসহায়!...

—ছোট বৌ!

সহসা সে ঘরে বাজ পড়লেও বোধ হয় এতটা কেউ চম্‌কে উঠ্‌ত না, যতটা মেজ বৌয়ের কণ্ঠস্বরে উভয়ে চম্‌কে উঠ্‌লো।

—ঢের ঢের দেখেছি, কিন্তু এমনটী আর দেখি নি! ও মা, কোথায় যাবো মা, এই ভর সন্ধ্যেবেলা সোমত্ত বৌ দেওরকে বুকে জড়িয়ে সোহাগ করছে!...

ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে রমা পাগলের মত টল্‌তে টল্‌তে ঘর হতে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

মেজ বৌ তখনও বিষ ছড়াচ্ছিল—আমিও তো বলি, সাতকালে ছোট ঠাকুরপোর দেখা নেই, ছোট বৌ আমাদের অন্তসত্ত্বা...ছি, ছি!...

স্বয়ং ধরিত্রীও বোধ হয় এতখানি বিষ হজম করতে পারতেন না—রমা ত দূরের কথা!

জ্ঞানহারা রমা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। নির্ম্মল ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ হ'তে কুঁজো এনে তার মাথায় চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হতে খবর পেয়ে সকলে ছুটে এলো। সকলে মিলে ধরাধরি করে রমাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

সে রাত্রে আর নির্ম্মলের চোখে ঘুম ছিল না। অনেক রাত্রে ধীরে ধীরে সে এই দীঘির ধাপে এসে বস্‌ল।

আকাশময় অসংখ্য তারা। বহুক্ষণ হলো চাঁদ অস্তে গেছে। নীরব নিঝুম ধরিত্রী যেন ঘুমের কোলে নেতিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে সে সেখানে শুয়ে পড়লো।

এর মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো তা' সে মোটেই টের পায় নি। হঠাৎ জলে একটা শব্দ হ'তেই তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের চোখে সে উঠে বস্‌লো।

সহসা জলের উপর তার নজর পড়লো। জলের বুকে কি যেন একটা ভাসছে। প্রথমটা সে ঠাওর করতে পারলে না; কিন্তু হঠাৎ তার কি মনে হ'তে সে তাড়াতাড়ি জলে নেমে গেল। সাঁতরে গিয়ে তুলে দেখে একটা শাড়ির আঁচল!...

পরের দিন ভোরের আলো গুটি গুটি পা ফেলে ধরণীর বুকে নেমে এলো। রায়-বাড়ীর সকলে একে একে জেগে উঠ্‌লো; কিন্তু কৈ, যে সকলের আগে উঠে সারা বাড়ীময় ঘুরঘুর করে বেড়ায় সে তো জাগ্‌ল না।

ছোট বৌকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে বড়বৌ বল্‌লে—কাল তার শরীরের ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে! যা' তো মেজো, দেখে আয়, এখনও বোধ হয় সে ঘুমিয়ে আছে। বল্‌তে বল্‌তে তিনি কার্য্যান্তরে চলে গেলেন। কিন্তু তাকে যখন কোথাও পাওয়া গেল না, তখন সারা বাড়ীময় একটা বিরাট হৈচৈ পড়ে গেল।

হঠাৎ কে একজন দীঘির মধ্যে আবিষ্কার করলে তার শাড়িখানা। জেলেরা এসে বড় বড় জাল ফেলে দীঘির বুকখানা তোলপাড় করে ফেল্‌লে—কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। কারণ, দীঘিটা ছিল অত্যন্ত গভীর; পাড়ার দুর্দ্দান্ত ছেলে-ছোকরাও সে দীঘিতে ডুব দিয়ে তল পেত না।

রমাকে ত পাওয়া যাবে না। বড় দাগা পেয়ে সে যে জুড়িয়েছে দীঘির কোলে! মেজবৌ যে হলাহল তার মুখের কাছে ধরেছিল, তাই কণ্ঠে ধারণ করে রায়-বাড়ীর সোনার প্রতিমা রায়-দীঘির শীতল জলেই চিরবিশ্রাম নিলে, আর উঠ্‌লো না!...

সেই হতেই লোকে এই দীঘিকে 'বৌ-দীঘি' বলে। আজও সে তেমনি গভীর, তেমনি স্থির, কিন্তু যে পল্লীবধূ তার বুকভরা ব্যথা জুড়াবার জন্য এর বুকে আশ্রয় নিলে, সে কি স্থির হতে পেরেছে? সে কি শান্তি পেয়েছে?...না, আজও তার ব্যথার কাহিনী তারই বুকে জমাট বেঁধে আছে!

সহসা চমক ভাঙতে চেয়ে দেখি, আকাশে বোবা নক্ষত্রগুলো দীঘির কালো জলের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে। মনে হলো, আশ-পাশের সেই গাছপালা-গুলোও যেন সেই স্থির জলরাশির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে—কবে আবার সেই রায়-বাড়ীর ছোট বৌটী ঐ কালো জলের তল হ'তে উঠে আসবে, যেমন করে একদিন সাগর-প্রবাসী বিষ্ণুপ্রিয়া উঠে এসেছিলেন হাতে লয়ে তাঁর সোনার ঝাঁপিটী।...

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

রিক্তা

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

কাল তোমাদের স্কুলে খুব ধুম—না ঠাকুরঝি ?

বেলার বাসন্তী রঙের ছোপানো শাড়িখানা কুঁচিয়ে দিতে দিতে উমা জিজ্ঞাসা করলে।

কিশোরী বেলা তক্তাপোষে বসে' নিবিষ্ট মনে সরস্বতীর বন্দনা মুখস্থ করছিল, কালকের সভায় শোনাতে হবে বলে। উমার প্রশ্নে কাগজ থেকে চোখ তুলে সে একগাল হেসে আনন্দে বলে' উঠল—ও, তা' আর বলতে! শুধু পূজোই তো নয়, আরও কত রকমের আয়োজন করা হয়েছে—প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ, গান, বাজনা, অভিনয়···ভারী আমোদ হবে বৌদি'! সত্যি, তুমি যদি দেখ্‌তে···

—কি করে আর দেখি ভাই, আমি তো তোমাদের স্কুলে পড়ি না যে······

—বারে, তা' কেন ? কত মেয়ের মা বোন্ বৌদি'রা সব আসবে। কি করি, মা যে বেরোতেই চান না, নইলে না নিয়ে গিয়ে ছাড়তুম না কি ? অন্ততঃপক্ষে তোমাকে···

উমার অধরপুটে চকিতে ফুটে উঠ্‌ল একটু মৃদু করুণ হাসি—পাগল! ··

সমারোহে সে যোগ দিতে পারে কেমন করে—ভগবান যাকে বঞ্চিত করেছেন সকল দিক্ থেকে।...কিন্তু, এ তো শুধু উৎসব নয়,—এ যে পূজা, দেবী বীণাপাণির আরাধনা—যাঁর আশীর্ব্বাদ এই নশ্বর মরজগতের মানবকে অমর করে' রাখে যুগে যুগে। মহিমা যাঁর রিক্ত নিঃস্বকে পূর্ণতা দান করে' মহিমান্বিত করে' তোলে। যাঁর প্রসন্নতা দুঃখীর দুঃখকে, ব্যথিতের বেদনাকে সহনীয় করতে পারে, সেই মহিমাময়ীর পূজার অধিকারে বঞ্চিত থাকে সে কোন্ অপরাধে ?...

উমার আনত মৌন মুখের পানে তাকিয়ে, তার মনের ভাব উপলব্ধি করে' বেলা আস্তে আস্তে বল্‌লে—তা' হ'লে মাকে একবার বলি বৌদি' ?

—কি ?

—এই কালকের সভায় যাবার জন্যে। তিনি না যান, তোমাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন।

—না ভাই, মিছে কেন...কি হবে ?

উমার কালো চোখ দু'টীতে পলকে জেগে উঠ্‌ল ব্যথার আভাষ, সেটুকু গোপন করতেই সে যেন কোঁচান কাপড়খানায় পাক দিতে লাগল হেঁট হ'য়ে।

কি হবে ?—এই প্রশ্ন যেন তার বিড়ম্বিত জীবনটাকে একান্ত অনাবশ্যক, দুর্ব্বিসহ করে' তুলেছে।—সকল কথায়, সকল কাজে—কি হবে ?

শাশুড়ী যেদিন মমতাপরবশ হ'য়ে তার জট্-পাকানো চুলগুলা আঁচড়ে দেন, বা ময়লা কাপড়খানা ছেড়ে ফেল্‌তে বলেন, কি ভাতের পাতে একহাতা দুধ দিয়ে যান, তখন উমার নিজের মনেও স্বতঃই উদয় হয় এই কথাটি—কি হবে ? কিন্তু এদিক থেকে ও প্রশ্ন ওঠ্‌বার যথার্থ কোন হেতু আছে কি ? সব হারানো জীবনে তার বাস্তবিক কিছুই হ'বার সম্ভাবনা নেই কি আর ?

একে পল্লীগ্রামের মেয়ে, তায় মামার বাড়ী মানুষ। শিক্ষার সুযোগ উমা সেখানে পায় নি। মামাতো ভাইটির কাছে কোনমতে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেই সে চলে এলো শ্বশুর-ঘর করতে।

বিদ্বান স্বামীর সহধর্ম্মিনী হবার যোগ্যতা তার ছিল না।

অনিল প্রথম যেদিন তার এক শিক্ষিতা বন্ধু-পত্নীর লেখা একখানি চিঠি উমাকে পড়তে দিয়ে বল্‌লে—দেখো

দেখি, কি সুন্দর চিঠি! পড়তেও মনে আনন্দ আসে। গুছিয়ে একখানা চিঠি লিখ্‌তে পার্‌তে, তুমি যদি এরকম লেখাপড়াও শিখ্‌তে!

নিজের অপারগতার লজ্জায় উমা যেন মরমে মরে' গেল। সত্যই তো! এ চিঠির তুলনায়—তার কাঁচা হাতের আঁকাবাঁকা লেখা, বানানে যার দশটা ভুল···ছি!

আরক্ত মুখখানি নামিয়ে নিয়ে ব্যথাক্ষুব্ধস্বরে সে বলেছিল—কেউ শেখায় নি যে।

—আচ্ছা, আমি তোমায় শেখাব।

শুধু মুখের কথাই নয়, অনিল তার বালিকা বধূর শিক্ষকতায় লেগে গেল পরম উৎসাহে।

বাল্মীকি যেমন 'মরা' 'মরা' বল্‌তে বল্‌তে 'রাম' নাম উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, তেমনই প্রথমটা শুধু স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য লেখাপড়া করতে গিয়ে শেষে উমার অন্তর থেকেও একটা প্রেরণা এসেছিল।

মাসিক-পত্রিকায় মেয়েদের লেখা পড়তে পড়তে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌তো পরম বিস্ময়ে! এ রকম লিখতে সে কি পারবে কোনদিন!

সে কথা শুনলে অনিল তা'কে আদর করে হেসে বল্‌ত—কেন পারবে না? খুব পারবে। আমার উমারাণীর লেখা একদিন কাগজে কাগজে বেরুবে—দেখো তখন।

স্বামীর সেই আশ্বাস, ভবিষ্যদ্বাণী মনের কোণে গোপন রেখে উমা গৃহকর্ম্মের অবসরে এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে লেখা-পড়া করতে লাগল, বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু সে ক'দিনই বা? উমার বিয়োগান্ত জীবন-নাট্যে সুখের অঙ্কে যবনিকা পড়ে গেল—এত দ্রুত, এমন সহসা যে, মনের আশা মনেই রয়ে গেল তার।

এমন অসমাপ্ততা দিয়ে সে কি করবে—আর কিসের জন্যেই বা করবে?·· কোন দরকার নেই তো!

তবু যে জিনিষের আস্বাদ সে পেয়েছে, তা' ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তাই ননদ বেলা যখন সকাল সকাল নাকে-মুখে ভাত গুঁজে বই-টই নিয়ে তাড়াতাড়ি স্কুলের বাসে গিয়ে ওঠে, উমা তখন হাতের কাজ ফেলে রেখে জানলায় ছুটে আসে শুধু একবারটি দেখতে।

তখন ওর চোখে সেই দৃষ্টি দেখা যায়—পথের কাঙাল ধনীর উচ্চ সৌধ শিখর পানে তাকিয়ে থাকে যে দৃষ্টিতে।

বৈকালে ফিরে এসে বেলা জলখাবার খেতে খেতেই গল্প আরম্ভ করে দেয়—ওদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের গল্প। উমা অবাক হয়ে তা' শোনে।

আবার সন্ধ্যার পর বেলা যখন তার বই, খাতা-পত্র সব ছড়িয়ে স্কুলের পড়া করতে বসে, তখন উমা কোন এক ছুতায় এসে তার পাশটিতে বসে চুপ করে দেখে।

বেলা বয়সে উমার চেয়ে ছোট হলেও লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে গেছে। ওর শিক্ষার ত বাধা নেই, বরং শিক্ষিতা হলে বর পাওয়া সহজ, কাজেই...

কিন্তু উমার পক্ষে।···

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সে একদিন বেলাকে বল্‌লে—আমাকে তুমি একটু করে পড়াবে ঠাকুরঝি? যেটা বুঝতে না পারব—

—বেশ ত পড়ো না। বেলা খুসী হয়েই বল্‌লে।

কিন্তু কথাটা বেলার মার কাণে যেতেই, তিনি ভ্রূকুটি করে এমন ভাবে বল্‌লেন—কি হবে? যে, বেচারী উমার আর সাহস হ'ল না, প্রবৃত্তিও হ'ল না পড়তে।

দেবর সুনীল একবার একখানা কবিতার বই এনে দিয়েছিল ওকে পড়তে। কোনো মহিলা কবির লেখা। উমা কবিতাগুলির খুব প্রশংসা করছে দেখে সুনীল বল্‌লে—ইনি একজন বাল-বিধবা জানো বৌদি'? খুব অল্প বয়সে—এই তোমারই মত আর কি। তবু কেমন সুন্দর লিখেছেন দেখো।

তাই ত।

উমার মর্ম্মমথিত করে একটা আকুল নিশ্বাস ঝরে পড়ল।

মর্ম্মাহত প্রাণের অব্যক্ত গোপনতম অনুভূতি, মনের গহন-তলে গুমরে-মরা অসহায় ব্যথা ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাস যিনি এমন মধুরভাবে সুষ্ঠু ভঙ্গীতে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন, জীবনে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের শেষ হয়-নি নিশ্চয়!

আর যাই হোক্, ব্যথার পথে তার একটা লক্ষ্য আছে, বৈচিত্র্য আছে এবং একটু সার্থকতাও আছে বোধ হয়। আর সে?...

এরপর দু'দিন রাত জেগে কবিতা লেখার চেষ্টা করে' মাথা ঘামিয়ে হয় নি কিছুতেই। ছত্র মেলে না, অক্ষর কম-বেশী হয়ে যায়। যদিই বা মেলে তো ভাষা মনের মত হয় না, খটমট লাগে নিজের কানেই। একটা কবিতা যদি বা শেষ পর্য্যন্ত একরকম দাঁড়াল, তা' আর একবার নিখুঁত-ভাবে দেখ্‌তে গিয়ে মনে হ'ল—অদ্ভুত! এ কবিতা হয়েছে, না ছাই! ভাগ্যে কেউ দেখে নি, দেখ্‌লে...

কাগজখানা কুচিকুচি করে' ছিঁড়ে উমা শুয়ে পড়ল। তখন বুক ভেঙে তার কান্না আসছিল যেন। গভীর রাতের নীরবতার মধ্যে বিনিদ্র হয়ে উমা কতদিন ভাবে, সেকালের মহাকবি কালিদাসের মত সেও যদি একবার মুহূর্ত্তের জন্যে মা সরস্বতীর দেখা পায়, তা' হ'লে তখুনি তাঁর রাঙা চরণ দু'টি জড়িয়ে ধরে' একবার বর চেয়ে নেয়, যেন সে ওইরকম সুন্দর বই লিখ্‌তে পারে।

শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সভায় যাওয়ার উল্লাসে প্রায় নাচ্‌তে নাচ্‌তে, বাসন্তী ফিতার ফাঁস-বাঁধা বেণীটি দুলিয়ে, বাসন্তী শাড়ির রঙীন আঁচল বাতাসে উড়িয়ে বেলা যখন একটা আনন্দের হিল্লোলের মত হাস্‌তে হাস্‌তে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল, তখন বেচারী উমা জান্‌লার কবাট ধরে' কতক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইল সেই দিকে।...

কী পার্থক্য দু'জনে! অথচ বয়সে কতই বা তফাৎ? বড় জোর বছর দুই কি তিন। কিন্তু উমার সে সব শেষ হয়ে গেছে! অভাগী সে, এ কথাটা ভুলে যায় যে কেন, কেন যে তার মনে থাকে না!...

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সব আমোদ করে' দেবী সরস্বতীর চরণে অঞ্জলি দান কর্‌লে। উমাকে কেউ ডাক্‌লে না, জিজ্ঞাসাও কর্‌লে না একবার।

স্কুল থেকে ফিরেই বেলা উচ্ছ্বসিত আনন্দে পঞ্চমুখ হ'য়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—আজ সভায় কি কি হয়েছে—কোন মেয়েটির প্রবন্ধ হয়েছে সব চেয়ে ভাল, কোন মেধাবিনী ছাত্রী সব চেয়ে ভাল সরস্বতীর বন্দনা-গীতি শুনিয়ে সকলকে মোহিত করেছে, কার অভিনয় সব চেয়ে ভাল হয়েছে, কার হয় নি, কে কি পেয়েছে... ইত্যাদি।...

সে সব বিচিত্র কাহিনী উমার ভাবপ্রবণ মুগ্ধ তরুণ মনকে এমন স্বপ্নাচ্ছন্ন করে' তুল্‌লে যে, বেচারী তার নিত্যকার কাজে পদে পদে ভুল করে' ফেল্‌তে লাগ্‌ল,—শাশুড়ীর কাছে বকুনি খেলে কতবার।

একখানা বড় জলচৌকীর ওপরে দেবী বীণাপাণির পট নামিয়ে রাখা হয়েছিল। তা' ছাড়া, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি খানকতক বাছা বাছা বই, মাটির দোয়াত, খাঁকের কলম, আর বেলার এস্রাজটা। সকলকার অঞ্জলি দেওয়ার নিদর্শন ফুল, যবের শীষ আর আবীরের গুঁড়ো তার ওপর ছড়ানো—সেই দিকে তাকিয়ে উমা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, করযোড়ে।

তার অযত্নে জড়িয়ে রাখা এল খোঁপা থেকে আল্‌গা হয়ে পড়া সাম্‌নের ছোট ছোট চুলের গোছা কপাল বেয়ে গালে এসে পড়েছে। বালিকার তারুণ্যমাখা বড় কোমল সে মুখ-শ্রী, সরু পাড় সাদা কাপড়খানা তার সাথে খাপ খায় নি মোটেই। অকরুণ বিধাতা!...

অকম্পিত দীপশিখার স্নিগ্ধ আলোটুকু সেই দীন পূজারিণীর স্তব্ধ মুখে, ব্যথাভরা দু'টি কালো চোখের ওপর পড়ে' আরও করুণতর করে' তুলেছে যেন।

পুষ্পপাত্রে পড়েছিল পূজা শেষে দু'টি গাঁদা ফুল। তাই দেবীর চরণতলে তুলে দিয়ে, বেদীর তলায় মাথা লুটিয়ে উমা ভক্তি-গদগদ হ'য়ে বল্‌লে—

সরস্বত্যৈ মহাভাগে বিদ্যা কমল-লোচনে।
বিদ্যারূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে॥

—মা গো, দয়া কর, দয়া কর! এ অধম সন্তানকে পূজার অধিকার, সেবার অধিকার দাও মা!

সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ বেয়ে তার গড়িয়ে পড়ল কয়েকটা অশ্রুবিন্দু। চকিতে তা' মুছে ফেলে উমা উঠে দেখ্‌লে দেবীর কমল নয়নেও যেন অশ্রুর আভাষ!...

অসহায়ের আর্ত্তবেদনা মায়ের বুকে বেজেছে বুঝি!...

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

কলঙ্কের বোঝা

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বি-টি

নীল অচঞ্চল অসীমতার বুকের ওপর দিয়ে দোদুল দোলায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে একখণ্ড মেঘ। কত জনমানবহীন পথ অতিক্রম করে' নির্ব্বিঘ্নে নীরবে চলে তার প্রিয়ার সন্ধানে—যেখানে তা'র প্রিয়া ব্যর্থ প্রেম নিয়ে বসে' থাকে তারই তরে।...

পূর্ণিমা রাত্রি।

যৌবনের মাদকতা ছড়িয়ে দিয়ে চন্দ্র আকাশের কোলে হেসে ওঠে। বিরহী মেঘকে অবজ্ঞাভরে বলে' ওঠে—আমার এই যৌবনভরা সুন্দর রূপ তোমার ঐ অসুন্দর দেহের আড়ালে গেলেও এই রূপের ছটা একটুও প্রশমিত হবে না। তোমাদের চেয়ে যে আমি—

বিরহী মেঘ চন্দ্রের রূপকে ব্যর্থ ঢাকায় ঢেকে দিয়ে ক্ষুণ্নমনে বলে' ওঠে—চিরদিন কারও সমান যায় না! এমন একদিন আস্‌বে, যেদিন তোমার ঐ দীপ্ত কিরণের চারিদিকে জরাব্যাধি এসে ছেয়ে ফেল্‌বে—আর আমার এই কালো যৌবন তোমাকে বুভুক্ষুর মত থেৎলে ফেলে চলে' যাবে।

বলেই মেঘ চলে' যায় তা'র চলার পথে।

এমন সময় চন্দ্রের নজর পড়ে সুদূরস্থিত চিরদুঃখিনী প্রিয়ার ওপর।...

কত দিন, কত রাত্রি, কত যুগ-যুগান্তর ধরে' বসে' থাকে যে রোহিণী তা'রই প্রতীক্ষায়!...ব্যাকুল দৃষ্টিতে যে চেয়ে থাকে তারই পানে!...

চন্দ্র তা'র উজ্জ্বল অথচ শান্ত দীপ্তি চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিষণ্ণ হ'য়ে বলে' ওঠে—এমনি ধারাই যেন আমার হয়!

চন্দ্র তা'র প্রিয়ার ব্যাকুল দিঠি দেখে কেঁপে ওঠে! মনের মাঝে তা'র বহুদিনকার জমাট বিরহ-কান্না ঠেলে ঠেলে উঠ্‌তে থাকে! চন্দ্র তার পাগল-পারা আঁখি দু'টি নিয়ে ছুটে চলে রোহিণীকে বাহুপাশে বেঁধে নিতে—কিন্তু সে শিউরে উঠে দু'-এক পা পেছিয়ে যায়। বুক-ভরা ব্যথার বোঝা চেপে রেখে আর্ত্তস্বরে বলে' ওঠে—না, না, আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—তা' হ'লে আর আমি তোমায় দেখ্‌তে পাব না—

চন্দ্র আচমকা থম্‌কে যায়, মধু-মাখা চোখ দু'টি রোহিণীর দিকে ফেলে বলে' ওঠে—কেন?

রোহিণী নক্ষত্র তার সজল-দৃষ্টি পূর্ণচন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করে' বলে—ভুলে গেছ কি যে, তুমি আমার নেই। তুমি আমায় পাবে না, আর আমিও তোমায় পাব না—কেবল দূর হ'তে তোমায় দেখে আমার প্রাণের আশা মিটিয়ে নেব!...আমরা যে শাপভ্রষ্ট!...

চন্দ্র শিউরে ওঠে। ছল্‌ছল্ নেত্রে সে বলে—আমার...আমার এই অন্তরে যে কী দারুণ ব্যথা রোহিণী! একদিন এক মুহূর্ত্তের ভুলে মোহান্ধ হ'য়ে যে ঘৃণিত কার্য্য করেছি, ভগবান তো তা'র কলঙ্ক রেখা আমার দেহের 'পরে এঁকে দিয়েছেন, তবুও কি তিনি শান্ত হন্ নি?...এর শাস্তি কি আমায় আজীবন ভোগ কর্‌তে হবে রোহিণী?...তোমায় কি আর পাব না!...

রোহিণী তার সজল চাহনি চন্দ্রের কাছ হ'তে আড়াল করে' নিয়ে করুণ সুরে বলে' ওঠে—ও গো, না না, আর আমাদের মিলন হবে না, আমাদের অভিশপ্ত জীবনে আর সুখ নেই!...হৃদয়ের সব আশা ঐ অরুণ আলোয় পুড়িয়ে আমাদের চল্‌তে হবে এই চলার পথে নিঃস্বভাবে, একেবারে আশাহীন হ'য়ে।...লক্ষ্যের পথকে লক্ষ্য করে' নয়—এ আমাদের অলক্ষ্যের পথে যাত্রা!...

সীমাহীন গগনের এক সীমাকে লক্ষ্য করে' চন্দ্র বলে' ওঠে আপন-মনে—প্রথম মিলনে তোমায়-আমায় যে সুখ, সে সুখ হ'তে বঞ্চিত আমরা! যৌবনের উদ্দাম স্রোতে মোহাবিষ্টের মত এক রূপের আলোয় আলেয়ার মত

সৌন্দর্য্যকে পাবার আশায় ছুটে গিয়েছিলাম—কিন্তু নিয়তি আমার সে পথের অন্তরায় হ'ল!...অমৃতের সন্ধানে বেরিয়ে গরল তুলে আন্‌লাম!...তখন জ্ঞানহারার মত ছুটেছিলাম, পিতা-মাতা-ভাই-বোন্-আত্মীয়স্বজন সকলকে বিসর্জ্জন দিয়ে—তারই পরিণাম তো অক্ষরে অক্ষরে আমার দেহের 'পরে ফুটে উঠেছে, তবুও কি ঈশ্বর এতে তৃপ্ত হন্ নি?...চিরদিনই কি সেই দুর্ব্বিষহ ব্যথা বুকের মাঝে পোষণ করে' নিয়ে পথ চল্‌তে হবে?...

অশ্রুভরা চোখে রোহিণী বলে' ওঠে—নিয়তি আমাদের মিলনের পথে যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে' রেখে দিয়েছেন, তা' অতিক্রম করা আমাদের সাধ্যাতীত!... তোমার ঐ নব-মুকুলিত সুন্দর আননটি দেখ্‌তে পাব ঐ দূর পথের পথিক হ'য়ে, আর কিছুই না।

চন্দ্র তখন তা'র দীপ্ত কিরণরাজির ওপর এক বিষাদময় হাসি ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণের আবসিত জঞ্জালকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলে' ওঠে—না, না রোহিণী! এই দুঃসহ বেদনার শেষ সীমা যে কোথায়, তাই আমি জান্‌তে চাই! এর শেষ কোন্ অসীমতার চরণস্থলে গিয়ে স্তূপীকৃত হয়েছে, তাই দেখ্‌তে চাই!...রোহিণী! আমার মিনতি, তুমি একবার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও, আমি প্রাণ খুলে একবার দেখে নি, কতখানি বুকের ক্ষত আমার বেড়েছে।

রোহিণী তা'র ক্ষীণ বিষাদময় আলো চন্দ্রের দিকে বিক্ষিপ্ত করে' দিয়ে বলে' ওঠে—আজ শেষ রাত। যদি তুমি আমার হ'তে, তা' হ'লে আজ আমি তোমায় কত সোহাগ করে' বিদায়ের সাজে সাজিয়ে দিতাম—যখন তুমি রণভেরী নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পৃথিবীকে মুক্ত কর্‌তে তা'র শত্রুর কবল থেকে;—আর আমি তখন তোমার প্রেমমাখা কোমল অধরে আমার অধর প্রতিষ্ঠিত করে' কত মধুর আস্বাদ নিতাম! তোমার সুধামাখা বুকের ওপর আমার মুখ রেখে কত সোহাগ কর্‌তাম!...বিরহের ভাবনায় আতঙ্কে শিউরে উঠতাম কখনও, কখনও আবার মিলনের মধুর আনন্দে হাসির ফোয়ারায় দু'জনে ভেসে যেতাম, আবার তারই পরক্ষণে কত কি অনিশ্চিত আশঙ্কায় অশ্রুর বন্যায় ভেসে ভেসে ছুটে চল্‌তাম!...কত হাস্‌তাম আবার কত কাঁদতাম!...তবুও আমাদের এ প্রেমের খেলা ফুরাতো না! শেষে অবশ হ'য়ে দু'জনে—একজনের বুকে আর একজন মুখ রেখে কত সুখে ঘুমিয়ে পড়তাম!

বলেই সে মেঘের আড়ালে লুকায়।

চন্দ্র আতঙ্কে বলে' ওঠে—না, না, রোহিণী, যেও না—যেও না!

পরক্ষণেই বিহ্বল-দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

তার জ্যোতি ধীরে ধীরে আকাশের কোল হ'তে মুছে যেতে থাকে।

* * * *

পাগল-করা চোখ নিয়ে শুকতারা দৌড়তে দৌড়তে এসে দাঁড়ায় নীলিমার ওপর।

সে দেখে—চাঁদ আকাশের কোলে ঢলে পড়ে—আর তারই মুখের অস্ফুট ক্রন্দনের স্বর শোনা যায়—রোহিণী! রোহিণী!...

আতঙ্কে শিউরে ওঠে সে। মুখ তুল্‌তেই দেখ্‌তে পায়, তার চলার পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেছে তার কাছে ইহজীবনের মত।...

আকাশের কোলে মুছে যায় সে মুহূর্ত্তে।...ফেলে যায় তা'র চোখের জল এই পৃথিবীর বুকের ওপর।...

ঊষা তার বিভোল যৌবন নিয়ে এসে দাঁড়ায় এই পৃথিবীরই এক কোণে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গ অধিকার

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী

যে খবরটি আজ আপনাদের বল্‌তে এসেছি, তা' আফিঙের ঝোঁকেও নয় বা [illegible] আতিশয্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির অবস্থাতেও নয়, নিছক বিজ্ঞানের কৃপায় এই ঘটনাটি জান্‌তে পেরেছি।

শ্রাবণের নিঝুম দুপুর রাত। জলো-হাওয়ার ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম ভেঙে গেল। জান্‌লা বন্ধ করে' বিছানায় শুতে যাবো, দেখি বেতার যন্ত্রে টুং-টাং বিচিত্র আওয়াজ দিচ্ছে। অমন ত দুপুর রাতে রোজই শোনা যায়, কখনও ফ্রান্সের, কখনও বেলজিয়মের, কখনও বা রুশিয়ার গানবাজনা টুং-টা করে' এসে বেতারে বেজে ওঠে, তাই বেতারের চাবিটা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে উঠে দেখি, এ ত সে ভাষা নয়। বিচিত্র ভাষার ঝঙ্কার! কান পেতে একটু স্থির হ'য়ে শুন্‌তে লাগ্‌লাম—প্রথমে অস্পষ্ট, পরে অতি মৃদু, তারপর স্পষ্ট হ'তে লাগ্‌ল—বিশুদ্ধ দেবভাষায় খবর আস্‌ছে।

ব্যাপার কি? সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, গান বাজনা করে, এমন দেশ পৃথিবীতে কোথায়? আমার বুকখানা ত দশহাত ফুলে উঠ্‌লো!

পরে বুঝ্‌তে পার্‌লাম, আমাদের এ মরজগতের খবর নয়, দেবলোক হ'তে বেতারে খবর আস্‌ছে। বেতারের কাছে আর চালাকী খাটে না। শব্দ-তরঙ্গ যা' আস্‌বে তাই ধরা পড়বে। যে রসগ্রাহী, সেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

খবরটি এই ঃ—

স্বর্গে কিছুদিন হ'ল গত মহাযুদ্ধের পর থেকে হৈ-চৈ পড়ে' গেছে। কত গুণী, কত শিল্পী, কত ইঞ্জিনীয়ার, কত বিমানবীর, কত সম্রাট, অসংখ্য সৈন্য, বড় বড় সেনাপতি সব মারা গেছেন। পৃথিবীর রাজাদের মুকুট নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা চলেছে। কালমার্কের দর্শনের জীবন্ত দৃষ্টান্তে রুশিয়া ওলটপালট হয়েছে এবং সারা পৃথিবী গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে। যাঁরা এই সব করে' পৃথিবীতে তাঁদের অমর কীর্ত্তি রেখে গেছেন, তাঁরা স্বর্গে গিয়ে ত চুপ করে' নেই!

এক বছর তাঁদের জোর করে' যমপুরীতে বন্ধ করে' রাখা হয়েছিল। তাঁদের যমলোকের মেয়াদ ফুরুতে ফুরুতে তাঁরা দলবলে স্বর্গে গিয়ে হাজির। তাঁদের বহুপূর্ব্ব হ'তেই তরুণের দল স্বর্গে গিয়ে দল-পাকিয়ে অশান্তি বাড়ানোর চেষ্টায় ছিল; কিন্তু তাদের সে চেষ্টা তখন ফলবতী হয় নি। তরুণেরা স্বর্গে গিয়ে দেখ্‌লো, স্বর্গ বুড়োমীতে ভরা। সেখানে প্রেম নাই, জরা নাই, তৃষ্ণা নাই, কামনা নাই,—আছে অফুরন্ত চাঁদের আলো, ফোটা ফুলের সুবাস, মন্দাকিনীর শীতল জলধারা, নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফলের গাছ, আর পাখাওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে' বেড়ান। যখন ইচ্ছা কল্পগাছের নীচে গিয়ে যা' ইচ্ছে তাই চাও, মন্দাকিনীর তীরে বিশ্রাম কর, সন্ধ্যার পর ইন্দ্রসভায় গিয়ে উর্ব্বশীর নাচ দেখো, আর দিনের বেলা ইচ্ছে হ'লে, পাখাওয়ালা ঘোড়ায় চেপে ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোক ঘুরে এস।

কোনো কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, সভা-সমিতি নেই, 'সিনেমা', 'টকি' নেই, হোটেল নেই, 'নিউস পেপার', মাসিক-পত্র বা সমালোচনা—এ সবেরও কিছু নেই; বসে' বসে' খাও আর বুড়োদের কাছে ধর্ম্ম-কথা শোন। তরুণেরা একেবারে মরিয়া হ'য়ে ইন্দ্র-সভায় গিয়ে খুঁজে-পেতে বঙ্কিমবাবুকে বার করলো। তিনি দিব্যি আরামে তাঁর প্রথমা পত্নীকে নিয়ে আছেন। ওঁকে গিয়ে প্রণাম কর্‌তেই তিনি বল্‌লেন—"আমি আর কি করবো বলো, আমার কথা কে-ই বা আর শুন্‌বে?"

তরুণেরা তখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আচ্ছা মশায়, কালিদাস, সেক্সপীয়র, ভবভূতি, বাল্মীকি; হোমার—এঁরা সব কোথায়?"

বঙ্কিমবাবু বল্‌লেন—"তাঁরাও আছেন। ইন্দ্র-সভায়

দেবতাদের বাৎসরিক 'এ্যানিভারসারি'তে তাঁদের কবিতা পড়তে হয়। সেই সময় আসেন, আর অন্য সময় তাঁরা স্বর্গের বিভিন্ন স্থানে তপস্যা করেন।"

একদিন তরুণেরা উর্ব্বশীর বাড়ী গিয়ে হাজির। তিনি তখন ভগীরথের কেনা ও অশ্বিনীকুমারদের দেওয়া নানা রকম গাছ-গাছড়া বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত। তরুণেরা দেখ্‌লে উর্ব্বশীর মুখ মলিন, রূপ ম্লান হ'য়ে গেছে, চোখের নীচে কালি-দাগ, শরীরও ভেঙে পড়েছে। উর্ব্বশীকে তারা বল্‌লে—"আচ্ছা, তুমি নতুন নতুন নাচ-গানের মহলা দিতে পার? আমরা শিখিয়ে দেব।"

উর্ব্বশী বল্‌লেন—"তা' হ'লে আর রক্ষে থাকবে না! ভরত মুনির কড়া শাসন, নাট্য-শাস্ত্রের একটুও ব্যতিক্রম হ'লে আর রক্ষে নেই! একবার আমার তাল কেটে যাওয়ায় মুনির অভিশাপে আমায় মর্ত্ত্যে জন্ম নিতে হয়।"

সে স্মৃতি উর্ব্বশীর বড় দুঃখের, বড় সুখের! পুরুরবার প্রেমের কথা তিনি এখনও ভুলতে পারেন নি, তাই দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে তিনি বল্‌লেন—"আমার দ্বারা সে সব কিছু হবে না। তোমরা একদিন সোজা দেবরাজের কাছে যাও।"

তরুণেরা নাছোড়বান্দা। ইন্দ্রের সভা রোজ বসে না। ইন্দ্র প্রায়ই অন্দরের বাগানে শচীদেবীকে নিয়ে বেড়ান। ইন্দ্রসভার সে জৌলুস নেই। নাট্যশালায় রোজ 'রিহার্শাল' হয় বটে, ভরত মুনি রোজ আসেন, নারদ মুনি গানের সুর দেন, অপ্সরীদের আর মেনকা রম্ভা প্রভৃতিদের আস্‌তে হয়—এই যা'—। যাই হোক্, তরুণেরা একদিন দেবরাজ ইন্দ্রকে পাক্‌ড়াও কর্‌ল। তিনি তখন তাঁর ঐরাবতে চড়ে' শচীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দাকিনীতে স্নান কর্‌তে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় তরুণদের এক 'ডেপুটেসান্।' তাঁকে দেখে সকলে ধর্‌লে। বেগতিক দেখে দেবরাজ ঐরাবত দাঁড় করিয়ে তিনি তাদের 'ডেপুটেসান্'-এর মুখপাত্রের কাছে তরুণদের আবেদন শুন্‌লেন। তরুণেরা বল্‌লে—"দেবরাজ, আপনার স্বর্গে সুখ নেই, কুড়েমীতে ভরা, আমি...হোটেল, 'সিনেমা', 'মোটর কার', 'এরোপ্লেন' এই সব করুন আর স্বর্গের 'ম্যানেজমেণ্ট' একটা 'কমিটি' করে' আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।"

দেবরাজ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমরা এখানে কি করে' এলে?"

তরুণেরা বল্‌লে,—"আমরা পরের জন্য জীবন দান করি, তা'তেই একেবারে স্বর্গে এসেছি।"

দেবরাজ দেখ্‌লেন বেগতিক, এদের স্বর্গ থেকে তাড়াবারও উপায় নেই; তাই তিনি কথা চাপা দেবার জন্যে বল্‌লেন—"আমার আর কোনও হাত নেই। দেনার দায়ে এই স্বর্গটা এখন 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্'-এ। গত অসুর-যুদ্ধের দেনা শোধ হয় নি, তার ওপর আমি আবার নাটকে বহু টাকা খরচ করে' ফেলেছি, সেই কারণ স্বর্গরাজ্য ব্রহ্মার হুকুমে 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্'-এ। আমাকে বাঁধা মাসহারার টাকায় ঠাট্ বজায় রাখ্‌তে হয়। 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্'-এর মালিক নারায়ণ। তোমরা বিষ্ণুলোকে যাও। টাকার মালিক তিনি। তিনি টাকা দিলেই এ সব হ'তে পারে। তা' ছাড়া, 'কমিটি'-টমিটি তোমরা যা' বলছ, সে সব আমার দ্বারা কিছু হবে না। এ সবের মালিক হচ্ছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাঁরাই স্বর্গের প্রকৃত মালিক, আমি তাঁদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। তাঁরা অনুমতি দিলে সবই হ'তে পারে।"

তরুণেরা নাছোড়বান্দা। তারা বিষ্ণুলোকে যাবার পথঘাট ও যানবাহনের খোঁজ নিতে লাগ্‌ল। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখ্‌ল, স্বর্গের চৌমাথা হ'তে রোজ অসংখ্য পক্ষীরাজ ঘোড়া নানাদিকে ছোটে। সে সব ঘোড়া পাওয়া মুস্কিল। স্বয়ং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এই 'সারভিস্' পরিচালিত। যত মুনি-ঋষিরা রোজ ব্রহ্মলোক, শিবলোক ও বিষ্ণুলোক দর্শন কর্‌তে যান, তাঁদের জন্য আগে হ'তেই সব 'বুক' করা।

ঘোড়া পাবার জন্য অশ্বিনীকুমারদের সাথে তরুণদের হাতাহাতি হবার উপক্রম। শেষে ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার মধ্যস্থ হ'য়ে তরুণদের জন্য দু'টি ঘোড়া দিলেন।

অশ্বিনীকুমারেরা স্বর্গের বৈদ্য, তাই পৃথিবী হ'তে যে সব

ডাক্তার-কবিরাজ স্বর্গে যান, তাঁদের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদের কারবার। তা' ছাড়া, এঁদের ওপরে ঘোড়ার হেফাজতের ভারও আছে।

তরুণেরা পাঁচ-সাতজন দু'টি ঘোড়ায় চড়ে' চল্‌ল একদিন বিষ্ণুলোকে। তারা বিষ্ণুলোকে গিয়ে দেখ্‌ল— বাড়ীর ভেতর ঘোর কলহ হচ্ছে। দ্বারী দু'জন—জয়-বিজয় নেই, দ্বার শূন্য। দরজার সাম্‌নে সরস্বতীর বাহন হাঁসটা লক্ষ্মীর বাহন পেঁচার গলা চেপে ধরেছে। দ্বার শূন্য দেখে সোজা তরুণেরা বাড়ীর ভেতর চলে' গেল। গিয়ে যা' দেখ্‌ল তা'তে তাদের চক্ষুস্থির! নারায়ণ সিংহাসনে বসে' আছেন, লক্ষ্মী চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, জয়া বিজয়া দুই দাসী লক্ষ্মীকে ঘন ঘন পাখা করছে, আর নারায়ণ সরস্বতীর পা ধরে' সাধাসাধি করছেন। সরস্বতীর নতুন মূর্ত্তি, নতুন বেশ—চুল 'সিঙ্গেল' করে' ছাঁটা, পরণে 'সর্ট্ স্কার্ট', কুচবন্দ বাঁধা, আর হাতে বীণার বদলে 'রেডিয়ো সেট।'

তরুণেরা 'মা' বলে' তাঁকে প্রণাম কর্‌তেই তিনি ধমক দিয়ে বল্‌লেন—"মা কি? 'কম্‌রেড' বলো। আমার আর সেরূপ নেই। আমি অশরীরি বাণী-মূর্ত্তি, যুগে যুগে নরের কণ্ঠে নতুন বাণী দিই। আমি বাক্, আমি সঙ্গীত। আমি বীণ্ ছেড়ে 'রেডিও' নিয়েছি। পৃথিবীতে নতুন সঙ্গীত, নতুন বাণী দিয়েছি, তাই নারায়ণের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। নারায়ণ আমাকে বেঁধে রাখ্‌তে চান, কিন্তু আমি ত কারও নিজস্ব নই, তাই আমি চল্‌লাম পৃথিবীতে। সেখানে কাজ সেরেই আমি আস্‌ছি। তোমরা যে জন্যে এসেছো তা' জানি। স্বর্গকে নতুন করে' গড়তে হবে, সে কাজ তোমাদের। তোমরা লোকও পাবে, তারা শীগ্‌গিরই আস্‌ছে। এর মধ্যে তোমরা 'অ্যাজিটেসন্' জোরসে চালাও।"

নারায়ণের সরস্বতীকে ছাড়তেই হবে, নতুবা লক্ষ্মী তাঁকে ছেড়ে যাবেন। লক্ষ্মী তো সরস্বতীর নতুন রূপ দেখে বিতৃষ্ণায় ভরে' গেছেন এবং সরস্বতীকে যা' তা'বলে' গালাগালি দিয়েছেন। নারায়ণের বিপদ, তাঁর অবতার হওয়া থেমে গেছে। গত মহাযুদ্ধে নারায়ণকে আর অবতার হ'তে হয় নি। মানুষেরা নারায়ণের বিনা সাহায্যেই এতবড় যুদ্ধ-ব্যাপার নিজেরাই চালিয়েছে। নারায়ণ দেখ্‌লেন ব্যাপারটা ক্রমেই সঙ্গীন হ'য়ে উঠছে। একে তাঁর ঘর সামলান দায়, তার ওপর বাইরের ফ্যাসাদ। না যাওয়াই ভাল। তাই তিনি উপায়ান্তর না দেখে তরুণদের বল্‌লেন—তাঁর নিজের কোনই হাত নেই, ব্রহ্মার কাছে যেতে। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যা' কর্‌বেন, তা'তেই তাঁর মত।

ছোকরারা এইবার রীতিমত ক্ষেপে গেল। এঁরা নিজেরা কেউ কিছু কর্‌বেন না, কেবলি তাদের ঘোরান হচ্ছে। তরুণেরা ঠিক কর্‌লে, আর নয়; একবার ব্রহ্মার বাড়ী ঘুরে এসে রীতিমত স্বর্গে 'সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স' সুরু করে' দেবে।

যাই হোক্, তারা ক্ষুণ্ণমনে দেবলোকে ফিরে এল। এসে দিনকয়েক বেশ করে' নিজেদের দল ঠিক করে' একেবারে ব্রহ্মলোকে গিয়ে হাজির।

ব্রহ্মলোক আশ্চর্য্য স্থান। 'অরোরা বোরিওলিস্'-এর আলোতে দিন রাত বোঝ্‌বার যো নেই। আলোর রং কেবলি বদ্‌লাচ্ছে। কখনও বেগুনী, কখনও শাদা, কখনও লাল, আবার কখনও বা সবুজ। চারিদিকে বরফ গলে। একে ত মানস সরোবর, তা'তে আবার 'ভিক্টোরিয়া রেজিনা' পদ্মফুলের বাহার। এক-একটা পদ্মফুলের ওপর এক একজন লোক অনায়াসে শুতে পারে। স্বচ্ছ জল, মাটির নীচ পর্য্যন্ত প্রবাল-মণি-মুক্তা সব দেখা যায়। ব্রহ্মার তখন কুটীর বন্ধ। চারিদিক থেকে তাঁর রচিত সামগান শোনা যাচ্ছে। সমস্ত ব্যোমব্যাপী ওঙ্কারধ্বনি হচ্ছে। বেশ গুরু গম্ভীর ব্যাপার। তরুণেরা প্রথমে এই সব দেখে-শুনে বেশ একটু ভড়কে গিয়েছিল। তারপর নিজেদের সাম্‌লে নিয়ে ব্রহ্মলোকের চারিদিক ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। মানস সরোবরের তীরে অসংখ্য, নানা চেহারার মুনি-ঋষি সব ধ্যানে বসে' আছেন। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে তারা স্বামী বিবেকানন্দকে বের করলো। স্বামীজী তখন সবেমাত্র ধ্যান ভেঙে বাইরে এসেছেন। তরুণেরা তাঁকে প্রণাম করে' বল্‌লে—"বেশ ত, স্বামী, আপনি

আমাদের নাচিয়ে দিয়ে এখানে পালিয়ে এসে ধ্যানে বসেছেন।"

স্বামীজী মৃদু হেসে বল্লেন—"তোমরাই তো আস্‌বে, আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। তা' তোমরা যে জন্য এসেছো তা' জানি, একদিন অপেক্ষা করতে হবে। আগামীকাল ব্রহ্মার 'কাউন্সিলে'র মাসিক মিটিং। তা'তে বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি পৃথিবীর ধর্ম্ম-গুরুরা, আর ব্যাস, সপ্তর্ষিগণ, মনু প্রভৃতি আস্‌বেন। তোমাদের আরজী তাদের সাম্‌নে পেশ করতে হবে।"

তরুণরা বল্লে—"আমরা আরজী-টারজী পেশ্ করতে পারবো না। আমরা স্বর্গটাকে 'রিমডেল' করবই, তা', আপনি আমাদের সাহায্য করুন।"

স্বামীজী বল্লেন—"তাই হবে। একদিন অপেক্ষা কর।"

তরুণেরা একদিন ব্রহ্মলোকের চারিদিক ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

পরদিন দেখে আশ্চর্য্য ব্যাপার! মানস সরোবরের পাড়ে অপূর্ব্ব মণি-রত্ন-খচিত সোনার মায়া সভাগৃহ। ব্রহ্মার আসন মধ্যখানে, চারিদিকে পৃথিবীর ধর্ম্ম-গুরুগণ, সপ্তর্ষি-মণ্ডল, মনু, ব্যাস প্রভৃতি ঘিরে বসে' আছেন।

তরুণদের দেখে ব্রহ্মা প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন—"পৃথিবীর নতুন কোন বিপদ হয়েছে কি না, আবার নারায়ণকে অবতার হ'তে হবে কি না?"

এর উত্তরে তরুণেরা বল্লে—"মহাশয়গণ! পৃথিবীর ভাবনা আপনাদের ভাবতে হবে না; মানুষের ভাবনা মানুষেই ভাবছে, আর মানুষের কাজ মানুষেরাই করছে। মানুষ দেবলোককে নতুন করে' গড়তে চায়, সেই জন্যে আমরা এখানে এসেছি।"

ব্রহ্মা তো একথা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারেন না। বুদ্ধ, যিশু, চৈতন্য, মনু এঁদের মুখের দিকে চাইলেন। তাঁরাও নীরব থাকলেন। স্বামীজি মধ্যস্থ হ'য়ে ব্রহ্মার 'কাউন্সিলে' তরুণদের কথা বিশদ্ করে' বুঝিয়ে বল্লেন। সকলে তো শুনে অবাক! মানুষ আবার দেবলোককে নতুন করে' গড়তে চায়! পুরন্দরের আবার নতুন বিপদ দেখ্‌ছি! কি করা যায়? তখন স্বামীজি বল্লেন—"কালধর্ম্মে এই সব হচ্ছে ও হবে, অতএব মহাকালকে না জানিয়ে কিছু করা যায় না।"

তরুণেরা চটেই ছিল, একথা শুনে তারা বল্লে—"মহাশয়রা! আপনাদের 'মিউচুয়্যাল এ্যাড্‌মিরেসন্ সোসাইটী' রেখে দিন, ও 'টেপ্‌পিসন্' চল্‌বে না। আমরা এ ভাবে স্বর্গে থাক্‌তে পারব না; কোন একটা কাজ চাই, আর কুড়েমী চল্‌বে না।"

ব্রহ্মা বিবেচনা করে' দেখ্‌লেন, এদের চটালে ফল ভাল হবে না; তাই তিনি বল্লেন—"আচ্ছা, স্বর্গের বাৎসরিক উৎসবের আর মাসখানেক দেরী আছে। সেই সময় আমরা তিনজন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সকলেই দেবরাজের ভবনে অতিথি হবো, সেই সময় সকলের সাম্‌নে এর মীমাংসা হবে।"

তরুণরা ভেবে দেখ্‌লে, এ আর এমন বেশী কি, একমাস তো!—আবার স্বামীজি যখন মধ্যস্থ আছেন, তখন একমাস চুপ করে' থাকাই ভাল।

তরুণেরা স্বর্গে ফিরে এসে দেখে লেলিন প্রভৃতি মহামনিষীগণ স্বর্গে এসেছেন। গত মহাযুদ্ধে মৃত সব ইঞ্জিনীয়ার, গুণী, শিল্পী এসেছেন। তাঁদের নিয়ে 'অপোজিসন্' দল খুব জোর পেল এবং রীতিমত 'ড্রাফ্‌ট্ কন্‌স্টিটিউসন' লেলিন খাড়া করলো। মন্দাকিনী তীরে বৃহৎ সভায় সেটা 'পাশ' হলো। যথাসময়ে দেবদূতের মারফৎ সেটা দেবরাজের কর্ণগোচর হ'ল।

স্বর্গের বাৎসরিক দিন আগত। দেবকন্যাদের বিশ্রামের অবকাশ নেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেবরাজের সভা গড়ে' উঠ্‌ল। সেখানে চন্দ্র-সূর্য্য আলো দিচ্ছে, নাগ-কন্যারা দেয়ালের স্তম্ভের গায়ে জড়িয়ে আছে, পারিজাতের মালায় চারিদিক ছেয়ে দিয়েছে, স্তম্ভের পাশে পাশে অপ্সরী-বিদ্যাধরীরা চামর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুউচ্চ 'প্ল্যাট্‌ফরম'-এর উপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের আসন; তাঁদের পায়ের নীচে ইন্দ্রের রত্ন-সিংহাসন।

যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, অশোক, জার্ নিকোলাস প্রভৃতি আর পৃথিবীর গণ্যমান্য চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ইত্যাদির স্থান

হয়েছে সভার ডানদিকে, আর দেবগণ, দিক্‌পাল ইত্যাদির স্থান হয়েছে বামদিকে, আর তরুণের দল সভার সাম্‌নে জায়গা করে' নিয়ে বসে' গেছে।

একে একে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাঁদের বাহনে চড়ে' নিজ নিজ সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে করে' এলেন; দেবগণ তাঁদের দেবীদের সঙ্গে করে' আস্‌তে লাগ্‌লেন। সকলেই নিজ নিজ আসন গ্রহণ কর্‌লেন। সভা আরম্ভ হ'বার পূর্ব্বে কিন্নরীদের একদফা গান হ'ল, আর অপ্সরীদের নাচ হ'ল। তারপর সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। তরুণদের পক্ষ থেকে স্বর্গের 'ড্রাফ্‌ট্ কন্‌স্‌টিটিউসান্' পড়া হবে, এমন সময় সরস্বতী দেবী সেই পূর্ব্বের বেশে 'রেডিও' হস্তে একেবারে সভায় এসে হাজির। অমনি বাল্মীকি, হোমার, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি তাঁকে দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌তেই তিনি সে পথ এড়িয়ে চল্‌লেন। তাঁদের দিকে না চেয়েই তিনি তরুণদের 'ডেপুটেসন্'-এর 'লিড' নিয়ে 'ড্রাফ্‌ট্ কন্‌স্‌টিটিউসন্' নিজেই পাঠ কর্‌লেন। ভোলানাথ ভাঙের নেশায় বিভোর হয়েছিলেন, সরস্বতীর কথায় চমক্ ভেঙে পর্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমার মেয়ে বলে কি?"

মা ভগবতী সব কথা খুলে বল্‌লেন। ভোলানাথের অমনি ভাবান্তর হ'ল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্‌তে লাগ্‌ল। বাঘছাল শ্লথ হ'য়ে খসে' পড়্‌লে অঙ্গের ভূষণ ফণীসব ফণা তুলে দাঁড়াল। ভোলানাথ ডমরু হাতে নিয়ে ভীষণ নাদে বাজাতে লাগলেন আর নাচতে নাচতে ঠিক্ যেন নটরাজের 'পস্‌চার্'-এ দাঁড়ালেন।

সভা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। প্রলয় তাণ্ডব আরম্ভ হবে। দেবগণ গতিক দেখে শঙ্কিত হ'য়ে পড়্‌লেন। দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তখন যোড়হাতে দেবতারা মহাকালের স্তব আরম্ভ কর্‌তে লাগ্‌লেন। মহাকাল তাই শুনে বল্‌লেন —"এখন আমার 'জুরিস্‌ডিক্‌সন্।' যা' প্রাচীন যা' পুরোনো সব ভেঙেচুরে নতুন করে' গড়বার পালা—তাই মহাতাণ্ডবে আমি সব ধ্বংস করব। তরুণেরা আমার অংশে জন্মেছে, তারা কালধর্ম্মে সেই কাজ কর্‌তে চাইছে, তোমরা বাধা দিচ্ছ কেন?"

তখন দেবতারা একবাক্যে তরুণদের 'ড্রাফ্‌ট্ রেজোলিউসন্' পাশ কর্‌লেন। স্বর্গের 'ম্যানেজমেণ্ট' তরুণদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'লো।

স্বর্গ হোটেল, 'সিনেমা', 'টকি', খবরের কাগজে ছেয়ে গেল। উর্ব্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

পক্ষীরাজ ঘোড়ার বদলে ব্রহ্মলোকে, বিষ্ণুলোকে ও শিবলোকে 'ফ্রি এরোপ্লেন' ও 'জেপিলীন সার্ভিস্' চল্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের বড় বড় মুনি-বৈদ্য ও পৃথিবীর ডাক্তার-কবিরাজ নিয়ে হাসপাতাল খুলে ফেল্‌লেন; বড় বড় ডাক্তারখানা সৃষ্টি হ'ল।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীর সম্রাট্ দুর্য্যোধনের, রাবণ, জার, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতিদের নিয়ে একটা 'সিক্রেট কাউন্সিল' খুল্‌লেন; তা'তে দিন-রাত এই আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল যে,—কি করে' স্বর্গে 'অর্ডিনেন্স' জারি করা যেতে পারা যায়।

আর ওদিকে স্বরস্বতীর কৃপায় দিনরাত স্বর্গ হ'তে 'রেডিও'তে এই খবর আস্‌ছে—

"শুন হে মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী.

গ্রেস্ মুর।

পঞ্চপুষ্প
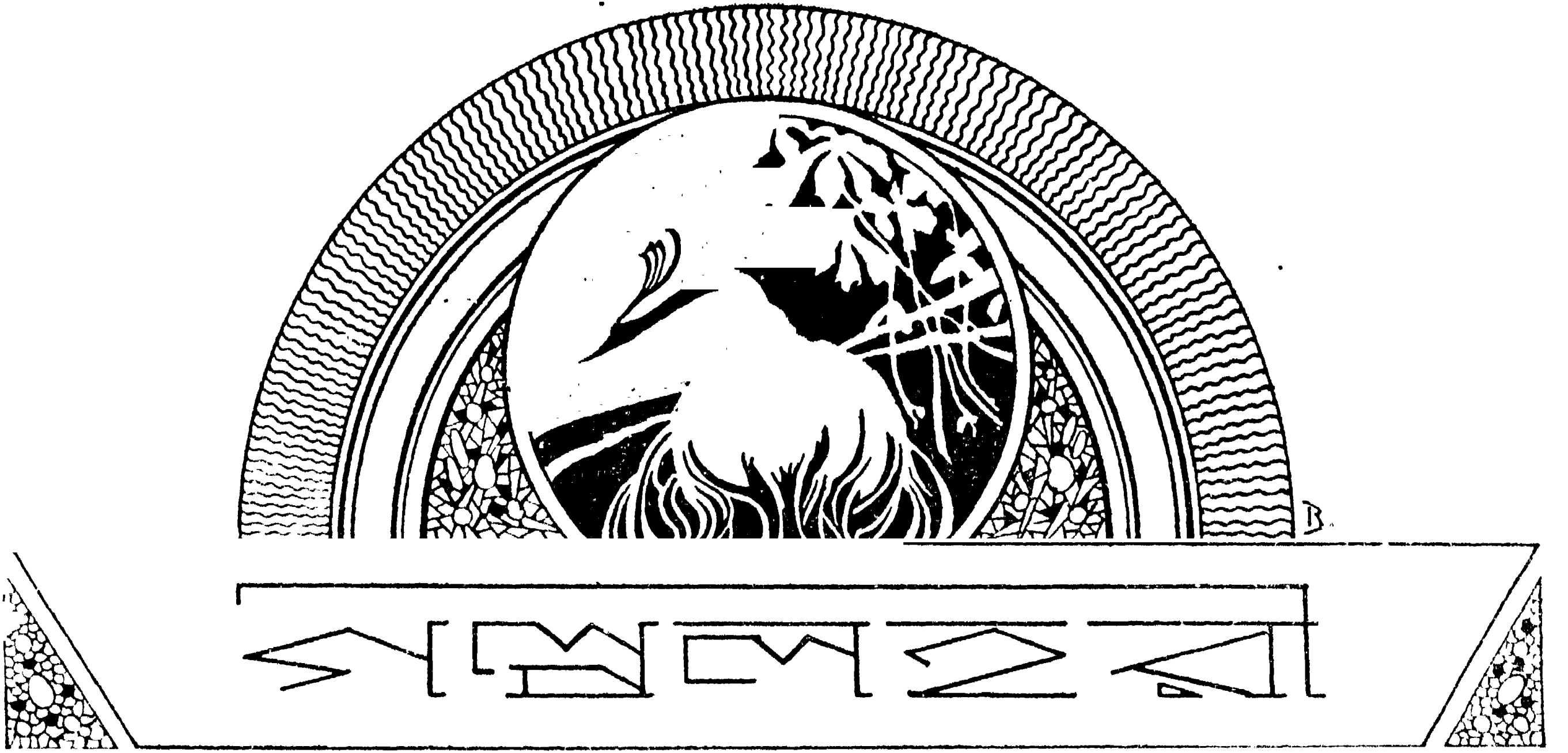
একাদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ | দ্বিতীয় সংখ্যা

রজত-জয়ন্তী

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

'পঁয়ত্রিশ সালের ছয়ই মে! এই একটী দিনকে লক্ষ্য করে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক যুড়ে যে সাড়া পড়ে গেচে, এ সম্বন্ধে কিছু জানার কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং যে লোকটীকে কেন্দ্র করে এত বড়ো সমারোহের আয়োজন, তাঁর জীবনের সমস্ত কথা জানতে আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। এই দিনটী ইংলণ্ডের রাজা এবং ভারতের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের এক চতুর্থ শতাব্দী অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করার ঠিক পরের দিন, তাই এ দিনটী রাজনৈতিক খাতার পাতায় এত স্মরণীয়—এত উৎসবের। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে ঠিক এই দিনটীর সঙ্গে বৃটেন বাসী,—তথা ভারতবাসীর, কত দুঃখ-সুখের স্মৃতি বিজড়িত। একদিকে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের দরবারকক্ষে নতমস্তকে রাজ কর্ম্মচারিবৃন্দ দণ্ডায়মান; চারিদিকে গভীর নীরবতা—প্রাসাদ কক্ষে নতমস্তকে সম্রাট এডওয়ার্ড মহা-নিদ্রায় শায়িত;—আর একদিকে বিরাট শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বের সূচনা! একদিকে নির্ম্মম শোকযাত্রার বিরাট অনুষ্ঠান, আর একদিকে নবীন সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের বিপুল সমারোহ! দু'টী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পন্থায় হলে-ও এ দিনটী সত্যই চিরস্মরণীয়।—এ স্মৃতি কি ভোলবার?

মৃত সম্রাটকে অভিবাদন জানাবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক দলে দলে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে সমবেত হলেন এবং শোকসন্তপ্ত চিত্তে শেষ অভিবাদন জানিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সব চেয়ে কঠোর কর্ত্তব্যের পরিচয়

দিলেন নবীন সম্রাট। গভীর পিতৃশোক মনের মাঝে লুক্কায়িত রেখে অবিচলিতচিত্তে তিনি বিরাট শোক-বাহিনীর অনুসরণ করলেন। এতবড় গভীর শোক নীরবে সহ্য করা কম প্রশংসার কথা নয়।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

সম্রাট এডওয়ার্ডের মৃত্যুকালে নবীন সম্রাটের বয়স ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর। এক কোটী পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত ভূভাগের এবং প্রায় চল্লিশ কোটী নরনারীর শাসনকর্ত্তা এই বিরাট মানুষটী কেমন, কেমন তাঁর শৈশব-লীলা, কেমন তাঁর কৈশোর-জীবন,—অল্প-বিস্তর আলোচনা না করলে, কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা মোটামুটী সেই কথাই ব'লব:

প্রায় সত্তর বছর আগে এক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ইংলণ্ডের রাজ পরিবারে দোসরা জুন শুক্রবার রাত একটার সময় (ইংরাজী মতে তেসরা জুন) সম্রাট এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট জর্জ্জ ফ্রেডেরিক আর্ণেষ্ট এ্যালবার্টের জন্ম হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন ব্যালমোরালে ছিলেন, তাঁকে তখনই তার-যোগে খবরটী দেওয়া হোল এবং সরকারীভাবে ম্যান্‌সন্ হাউসের সম্মুখে এই আনন্দ-সংবাদ ঘোষণা করা হোল। এই শুভসংবাদে সমস্ত রাজ্য জুড়ে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সে এক অভিনব ব্যাপার! গির্জ্জায় মুহুর্মুহুঃ ঘণ্টাধ্বনি হতে লাগল—নানাবিধ 'টাওয়া'র থেকে সম্মানসূচক তোপ ধ্বনি করা হোল, নবকুমার এইভাবে ধরণীর প্রথম আলোয় হলেন অভিনন্দিত।

রাজ পরিবারের উপযুক্ত করেই সম্রাটের লেখাপড়া,—তথা মানুষ করার আয়োজন চলতে লাগল। পিতামহী ভিক্টোরিয়ার ইচ্ছামত রাজকুমারদের ধার্ম্মিক করবার জন্যে এক ধর্ম্মপ্রাণ পাদ্রীর হাতে শিক্ষার ভার পড়ল। পাদ্রী ডাল্টনকেই কুমারদের শিক্ষার ভার নিতে হয়েছিল। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট এবং তখনকার দিনের ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারী তাঁর বড় ভাইয়ের শিক্ষকরূপে ১৮৭১ সালে

তিনি নিযুক্ত হন এবং ছ'বছর পরে তাঁদের গভর্ণর মনোনীত হন। ব্যায়াম প্রভৃতি শেখাবার জন্য রাজ সৈন্যদলের মেজর সিমকিনের উপর রাজকুমারদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। এই মেজর সিমকিন্‌কে উপলক্ষ করে সম্রাটের শৈশবকালীন চপলতার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

১৮৭৮ অব্দে মেজর সাহেব একটী ব্যায়ামের প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে উচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। প্রিন্স জর্জ্জ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজেদের শিক্ষকের এই কৃতকার্য্যতায় অসীম গৌরবান্বিত হয়ে জননীর কাছে মেজরকে ধরে আনেন। ছেলেদের হাতে মেজরের দুর্দ্দশা দেখে জননী আলেকজান্দ্রা, মেজরকে রীতিমত অভিনন্দিত করেন। বর্ত্তমান সম্রাট জর্জ্জ কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি আবদার ধরলেন, মেজরের সঙ্গে মায়ের করমর্দ্দন করতে হবে। মেজর লজ্জায়, ভয়ে ভীত হয়ে উঠলেন। গলদঘর্ম্ম হয়ে পালাবার পথ খুঁজ্‌ছেন, দয়ালু রাণী-মা তাঁর মনের অবস্থা বুঝে সহাস্যবদনে পুত্রের আবদাররক্ষা করতেই করমর্দ্দন করে মেজরকে মুক্তি দিলেন। এবার প্রিন্স জর্জ্জ দাদার সঙ্গে যুক্তি করে ঠিক করলেন, মাষ্টারমশায়কে ঠাকু'মার কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া যাক্। ছাত্রদের মতলব শুনে মেজর সাহেব ত ভয়েই অস্থির, লাফিয়ে উঠলেন আর একদফা পালাবার জন্যে। কিন্তু ছাত্রদের হস্তে অবশেষে বন্দীরূপেই তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজকার্য্যে ব্যস্ত, মুখ তুলে পৌত্রদের হাতে মেজরের অবস্থা দেখে না হেসে থাকতে পারলেন না। মেজরকে ছেড়ে দিতে বলে তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। মেজরের করমর্দ্দন পর্ব্ব বিপুল আনন্দের মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্ত হ'ল।

...এর পর আরম্ভ হোল সম্রাটের নাবিক-জীবন। এদিক দিয়েও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন। ১৮৭৭ অব্দে তাঁর প্রথম নাবিক-জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু মাত্র তিন চার বছরের মধ্যেই তিনি 'মিড্‌শিপম্যান', 'সব-লেপ্টেন্যাণ্ট' 'লেপ্টেন্যাণ্ট' প্রভৃতি নৌ-বিভাগের মর্য্যাদাপূর্ণ উপাধিতে বিভূষিত হন। '১৮৯১ অব্দে মীলাম্পাস্ নামক জাহাজের

বার বৎসর বয়সে নাবিকবেশে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

রাজা ও রাণী সৈনিকদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিতেছেন

কমাণ্ডার হয়ে তিনি জাহাজখানি পরিচালিত করেন। ১৮৯২ অব্দে তাঁর বড় ভাই ডিউক অফ্ ক্ল্যারেন্স হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যান।

দাদার মৃত্যুতে তাঁকে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করতে হয়। দাদাই ভবিষ্যতে রাজা হবেন, এই ঠিক জেনে ইনি নৌ-বিভাগে বিশেষ করে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। বড় ভাইকে সরিয়ে নিয়ে ইঙ্গিতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, অদূর ভবিষ্যতে অর্দ্ধ-পৃথিবীর শাসনভার প্রিন্স জর্জ্জকেই নিতে হবে। প্রিন্স জর্জ্জ মনে মনে এতে অসন্তুষ্ট হলেও একান্তভাবে নৌ-বিভাগে কাজ করার আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হোল। কিন্তু এ জিনিষটা তাঁর এতো ভাল লাগত যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে একে ত্যাগ করতে পারলেন না। তাঁর ধৈর্য্যের পারিতোষিকস্বরূপ ১৮৯৩ অব্দে ক্যাপ্টেন, ১৯০১ অব্দে রীয়ার এ্যাডমিরাল এবং ১৯০৩ অব্দে ভাইস এ্যাড্মিরাল পদের গৌরব লাভ করেন।

নাবিক-জীবন পরিচালনার সময় তিনি দু'একটী মহানুভবতার পরিচয়ও দিয়েছেন। একদিন জাহাজে অবস্থানকালীন তাঁর একটী অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্যাপ্টেনের বিছানার নীচে কতকগুলি গজাল দুষ্টুমি করে রেখে দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন ক্রোধপরবশ হয়ে অপরাধীকে আবিষ্কার করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর বন্ধু ভয় পেয়ে রাজকুমার জর্জ্জের শরণ নিলেন, এই বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে। প্রিন্স জর্জ্জ নির্ব্বিকার চিত্তে ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করলেন। রাজকুমার ভেবে ক্যাপ্টেন প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেলেন ও পরে সামলে নিয়ে বললেন: তোমায় এর জন্য শাস্তি নিতে হবে। প্রিন্স এতটুকু কুণ্ঠিত না হয়ে নতমস্তকে শাস্তি গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রীসের রাজকুমারী মেরিণার সহিত কনিষ্ঠ পুত্র ডিউক্ অফ্ কেণ্টের বিবাহ-সভায় রাজা ও রাণী

এছাড়া তাঁর কৈশোর জীবনে-ও কৌতুকপ্রিয়তার অভাব ছিল না। অতি অল্প-বয়সেই অনেক গুণের আধার হলেও বয়সোপযুক্ত দুষ্টুমির যে তা'তে অভাব ছিল, একথা বললে মিথ্যা বলা হয়। জাহাজ কোন বন্দরে নোঙ্গর করলে, নাবিকদের একটু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার একটা আইন আছে। এই আইনের সুযোগ নিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যেত—কোন ডাক্তার সকালে তাঁর সার্জ্জিকাল ইনষ্ট্রুমেণ্টের বাক্স খুলে নাপিতের ক্ষুর, কাঁচি দেখতে পেতেন, আবার পাশের নাপিতের দোকানে প্রথম খরিদ্দারকে কামাতে গিয়ে নাপিত অবাক্ হয়ে কাঁচির বদলে প্রোব বা ল্যান্সেট্ আবিষ্কার করে বসত। কোন্ আশ্চর্য্য যাদু-প্রভাবে পাশাপাশি কামরার সরঞ্জামগুলো ওলোট-পালোট হয়ে যেত, একটী সুকুমার, উজ্জ্বল নয়ন, বলিষ্ঠ দেহ রাজকুমারের মতো আকৃতি বিশিষ্ট যুবককে জিজ্ঞাসা করলে, হয় ত তখন রহস্য উদ্ঘাটন হতে পারত। জাহাজে খাবারের জিনিষের ভেতরও মাঝে মাঝে এরকম ম্যাজিক ঘটে যেত। বেচারী ষ্টুয়ার্ড অবাক্ হয়ে যেতেন, তার তত্ত্বাবধানের মার্ম্মালেড প্রভৃতি ক্যাপ্টেনের উৎকৃষ্ট আহার্য্যের পরিবর্ত্তে কোথা থেকে সাধারণ নাবিকের খাবারের জিনিষ এসে পড়তো, কিছুতেই তিনি তা' ঠিক করতে পারতেন না। কিন্তু মজার কথা এই যে প্রিন্স জর্জ্জ জাহাজে থাকলেই এই ওলোট-পালোট ব্যাপারটা ঘন ঘন ঘটতো। অতোগুলি ছেলের মধ্যে থেকে প্রকৃত দোষীকে নির্ণয় করা খুবই কঠিন, কেন না মালসহ কেউই কোনদিন ধরা পড়েন নি। কেউ কেউ একে হয় ত ভৌতিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন, কিন্তু নিতান্ত সাদাসিধা জীবন-যাপনকারী অত্যন্ত ভালমানুষ অর্দ্ধ পৃথিবীর এক রাজর্ষিকে এই ভৌতিক-তত্ত্বের অলৌকিক রহস্য উদ্ঘাটন করতে বললে হয়

অভিষেক-সজ্জায় রাজা ও রাণী
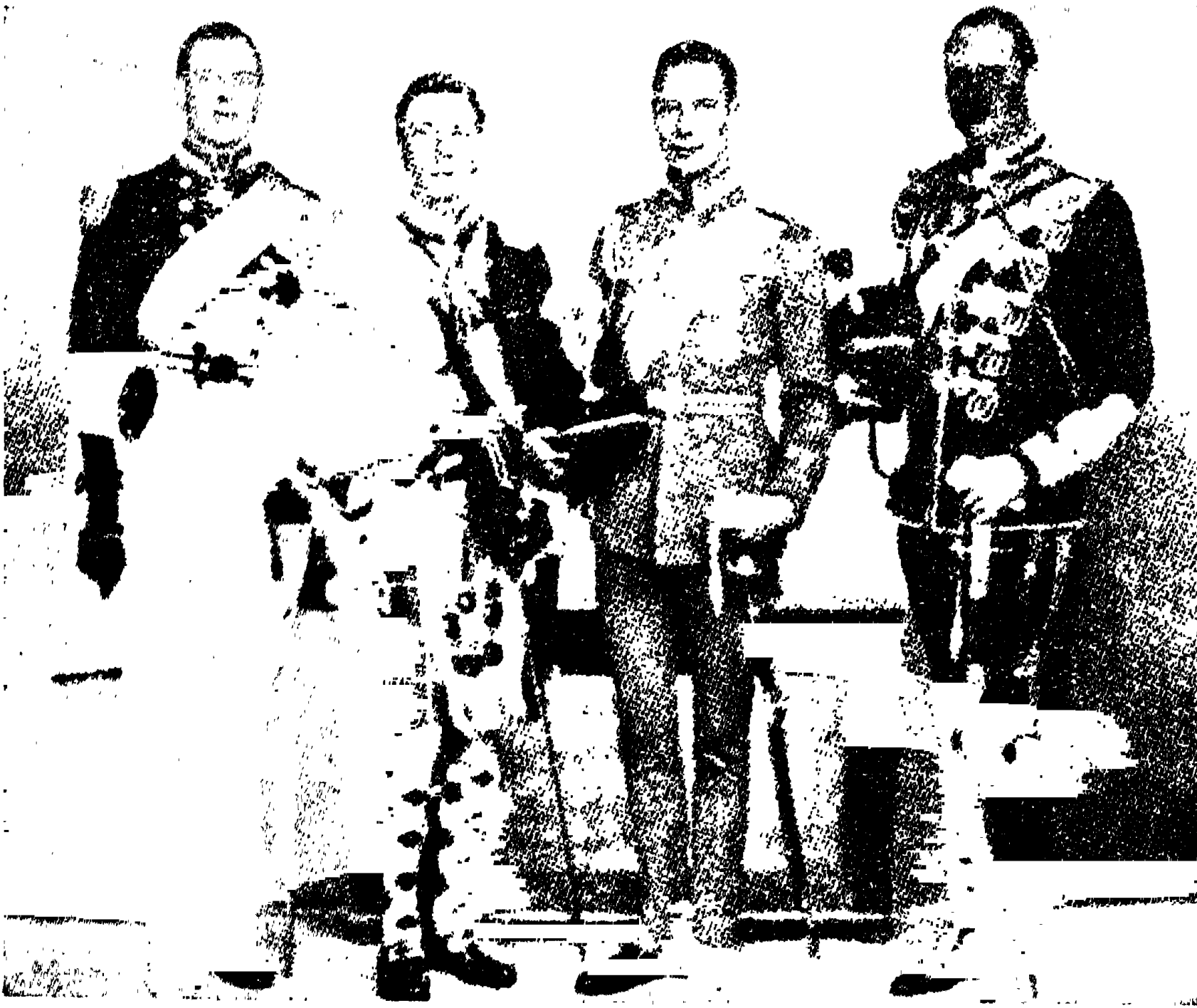
প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ ও অন্যান্য রাজকুমারগণ

দিল্লী-দরবারের বিপুল জনতাকে রাজা ও রাণী দর্শন দিতেছেন

ত তিনি তাঁর পঞ্চান্ন বছর আগেকার দু'-চারটে দুষ্টুমির কথা স্মরণ করে না হেসে থাকতে পারবেন না।

একজন রাজার যে-সব সদ্গুণ থাকা প্রয়োজন, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের মধ্যে তার কোনটীরই অভাব নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এঁর মতো সাফল্যমণ্ডিত রাজত্ব করার সংখ্যা খুবই কম। তাঁর এই পচিশ বছর রাজত্বকালের মধ্যে এতপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে, যা ভাবলে সত্যই সম্রাটের মুক্তকণ্ঠে গুণগান করা ছাড়া উপায় থাকে না। সহস্র রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জয়পতাকা উড়িয়ে চলেছেন। তাঁর একটী মহৎ গুণ, তিনি প্রেম দিয়ে ভালবাসা দিয়ে প্রজাদের হৃদয় জয় করতে চান। তাই যিনি একবার তাঁর গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছেন, বাঁধন কেটে বিদ্রোহ করবার সুযোগ তাঁর কোনদিনই ঘটে নি।

এতো প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা হয়েও তিনি কিন্তু সব চেয়ে জব্দ তাঁর দুই নাতনীর কাছে। দাদুর অন্তর-সিঞ্চিত প্রেমধারা এই দু'টী চপল চিত্তকে আজো বশ করতে পারে নি। দাদু যখন নাতনী দু'টীকে তাঁর কাছে আসবার জন্য ডাকেন, তখন হাসতে হাসতে দু'টী বোনে কখনও জামার কলার বা হাতায় একটা টান দিয়ে ছুটে পালিয়ে যান টেবিলের নীচে। তখন বিরাট গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করে সম্রাটকে ছুটতে হয় তাঁদের পিছু পিছু নিজের স্নেহঢালা বুকে বন্দী করতে।

ভগবান রাজাকে সুদীর্ঘ সুখময় জীবন দান করুন, আজকের রজত-জয়ন্তী উৎসবের দিনে আমাদের এই একটি মাত্র কামনা। *

কার্ত্তিক শীল

* রজত-জয়ন্তীর ব্লক কয়খানি 'দীপালী'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী

হলিউড্ ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানের শত্রু

কেউ যদি বলেন হলিউড্ ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানের শত্রু, তবে এর চেয়ে বিস্ময়ের কথা আর নাই! বিস্ময়ের কথা বল্‌লাম এই জন্যে, হলিউড্ লোকচক্ষে মধুময় স্বপ্ন! সেখানকার অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও লোকে তুচ্ছ ব'লে মানতে চায় না।—স্বপ্নজগতের কথা কিনা!—যাক্, যে কথা বল্‌ছিলাম। সম্প্রতি কিন্তু এমনি একটা কথা - রূঢ় সত্য কথা কেউ বলেছেন। তিনি 'ডগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্কস্ (ছোট)।'

হলিউড্ একমাত্র প্রতিষ্ঠান,—যার জন্যে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠতে পারে না। প্রত্যেক দেশের যেমন স্বতন্ত্র সাহিত্য, শিল্প, স্বতন্ত্র ফিল্‌ম, নাটক, নাট্যকার, প্রযোজক আছে এবং হচ্ছে, তবে ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানই বা হবে না কেন? এমনও দেখা গিয়েছে, জার্ম্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স-এর প্রযোজনায় খুব ভাল ভাল বই পর্দ্দার গায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ফিল্‌ম-শিল্পে আমেরিকা যতখানি খ্যাতি অর্জ্জন করেছে এর মূলে আছে ভিন্ন দেশের প্রতিভা। একমাত্র আমেরিকাকে নিয়ে এতবড় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠেনি। যেমন চাপ্‌লিন ইংরাজ, গার্ব্বো সুইডিস্, ডিয়েট্রিচ্ জার্ম্মান। হলিউডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান ইটালিয়ান, একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিরেক্টর জার্ম্মান।

'ফ্লাইং ডাউন টু রিও'র একটা দৃশ্য

ভিন্ন দেশের প্রতিভা, ভিন্ন দেশের শক্তি ও মস্তিষ্ক হলিউড্‌কে আজ এতবড় করেছে। হলিউড স্বর্গ হ'লেও আমেরিকার গৌরব কর্‌বার এই জন্যেই কিছু নাই, যাঁদের নাম বিশ্ববিশ্রুত তাঁরা যদি সকলেই হলিউড্ পরিত্যাগ করেন, তবে আমেরিকার নিজস্ব বল্‌তে বৃহৎ মরু-ষ্টুডিও মাত্র, আর কিছু নয়।

তাছাড়া আরও একটা কথা আছে, এতে ক'রে ফিল্‌ম শিল্পের উন্নতি হয় না। ভিন্ন দেশের শিল্পী, ভিন্ন দেশের

মস্তিষ্ক, শক্তি এ নিয়ে ফিল্ম হয়, কিন্তু হয় না ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি, বরং হয় অধোগতি।

হিপ্‌বার্ণ ও ফেয়ারব্যাঙ্ক (জুনিয়ার)

যে কোন প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ক'রে তুল্‌তে না পার্‌লে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না। হলিউড্ সেইজন্য আজও জাতীয় হ'তে পার্‌লো না।

বেশীদিনের কথা নয়—এই সেদিন পর্য্যন্ত জগতে বৃটীশ ফিল্মের অভাব ছিলো। কিন্তু আজ? আজ বৃটীশের যে কোন ফিল্ম হলিউডকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান কর্‌তে পারে। আধুনিকতার দিক্ থেকে বা প্রয়োজনার দিক থেকে লণ্ডন হলিউডের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—অবশ্য ষ্টুডিওর দিক্ থেকে এখনও অনেক পিছনে। না হবেই বা কেন? হলিউড্ আজকের প্রতিষ্ঠান নয়। কত দীর্ঘ দিনের, কত বড় বড় ধনীর ঐশ্বর্য্য দিয়ে গঠিত। কিন্তু কালে আর কোন প্রতিষ্ঠান যে ওর চেয়ে বড় হ'য়ে উঠবে না এমন কোন কথা নাই।

এই লণ্ডনের ষ্টুডিওর কথাই বলি। বরং আধুনিকতার দিক্ থেকে হলিউড অপেক্ষা যেন আরও উন্নত ব'লে মনে হলো। "I have just been shown a "Silent floor" in one of your studios—an excellent invention which is quite new to me."

তারপর স্থান-হিসাবে লণ্ডন হলিউড্ অপেক্ষা কম প্রীতিপ্রদ নয়। বরং হলিউড্ একটি বৃহৎ কারখানা। যান্ত্রিক যুগে মানুষ যেন সেখানে যন্ত্রবিশেষ; তার পৃথক কোন সত্ত্বা নাই। আরও একটা বিস্ময়ের কথা—"There is no such thing as private life."

তথাপি হলিউড্ স্বপ্নরাজ্য—এ যাদের কথা, তারা অন্য রাজ্যের লোক। বাইরে থেকে—হলিউড্ নয়, নট-জীবন স্বপ্ন-জীবন ব'লেই মনে হয়। কথাটা ঐ দিক্ থেকেই এসেছে,—স্থান-মাহাত্ম্য নয়। সুতরাং তাঁদের নিয়েই স্বপ্নরাজ্য গ'ড়ে উঠবে দেশে বিদেশে।

প্রতিচ্ছায়া

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ

মায়া একদিন মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—অনিল দা' তোমার না কি বিয়ে?

—কে বল্‌লে?

—যেই বলুক না, সত্যি তো? জানি তুমি হেসে সব কথা উড়িয়ে দেবে, ভারী চালাক ছেলে, খাওয়াতে হবে কি না, তা' অতো ভয় কিসের, কতো আর খাব একটা মানুষ তো, তা' নেমন্তন্ন না হয় নাই করবে। বলিয়া কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই লুটানো আঁচলটা তুলিয়া লইয়া দুলাইয়া দুলাইয়া অর্গানের সাম্‌নে গিয়া বসিয়া একটা গান ধরিল—

অনিল দেখিতেছিল অর্গানের রীডের উপর দিয়া মায়ার হাতের আঙুলগুলি কেমন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

সহসা মায়া গান থামাইয়া অনিলের পানে ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা অনিল দা', তুমি কি সত্যি বিয়ে করছ?

—না, এখনও তেমন কিছু স্থির করি নি, তবে কি জান, বাড়ীতে ভারী পীড়ন করছে, তবে আমার কথা কি জান, যাকে কোনদিন দেখ্‌লুম না, ভালবাসলুম না, সহসা তাকে একেবারে ঘরে তুলে আনি কেমন করে' বল দিকি? —আমাদের ম্যারেজ সিষ্টেমের এই একটা মারাত্মক ত্রুটি। পূর্ব্বরাগ ছাড়া বিয়ে হওয়াই উচিত নয়।

—আচ্ছা ধরো, তুমি যাকে ভালবাস না, সে যদি তোমাকে ভালবাসে?

—তা' কি হয়! এক পক্ষের, একার জিনিষ এ নয়। এক পক্ষ ভালবাসলে, আর এক পক্ষ টের পাবেই।

—কিন্তু তুমি তো এখনও টের পাও নি।

—আমি? কেন, আমায় কে ভালবাসে?

—হয় তো কেউ বাসে।

—সত্যি?

—সত্যি!

অনিল স্থির দৃষ্টিতে মায়ার মুখের পানে তাকাইল। মায়া চোখ নামাইয়া লইল। অনিল বুঝিল, বলিল—কিন্তু...মায়া, তুমি তো একথা এদ্দিন আমায় জানাও নি?..

—এ কি কাণের কাছে চীৎকার করে' জানাতে হবে—বলিয়া মায়া হাসিল। ভারী মধুর হাসি। সে হাসি অনিলের মাথার মধ্যে 'দপ্' করিয়া একটা সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল—এমনি মধুর হাসি হাসিয়াই মোহিনী অসুরদের মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে অন্য কথা লুকাইয়া আছে, না হইলে কুমারী মেয়ে সকল লজ্জার মাথা খাইয়া কখনো এমন করিয়া ভালবাসার কথা স্বীকার করিতে পারে?

ইহার মধ্যে অন্য যে কথা লুকাইয়া ছিল অনিলের তাহা অজানা নয়। ধীরাজ সরকার যেদিন কোথা হইতে একটা সুন্দরী মেয়েকে লইয়া আসিয়া ঘর-সংসার পাতিয়া বসিল, সেদিন আন্দোলন তো বড় কম হয় নাই। ধীরাজ সরকারের মত পয়সাওয়ালা একরোখা লোকটিকে মুখোমুখি প্রশ্ন করার সাহস প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও ছিল না বটে, কিন্তু আড়ালে আব্‌ডালে টীকা-টিপ্পনি করিতে তো কেহ ছাড়ে নাই। মায়া তো তাহাদেরই মেয়ে, বাপ যত পয়সাই রাখিয়া যাক্ না কেন, এখন তাহার পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল বই কি, শুধু পিতৃকুলের পরিচয়ই তো সব নয়, মাতৃকুলের পরিচয়ও তো দিতে হইবে! তাই বোধ হয় অনিলকে হাতে পাইয়া এমনি মধুর হাসিতে সে মোহিত করিতে চায়।

অনিল বলিল—কিন্তু কি জান মায়া, আমি তোমায় চিরদিন বোনের মতই দেখে এসেছি, তুমি যে...

মায়া সহসা রুক্ষ হইয়া উঠিল, বলিল—থাক্, আর ভূমিকার দরকার নেই, তুমি যা' বল্‌বে আমি তা' বুঝেছি। নিমপাতা তেতোই, গুড় দিয়ে কি তাকে মিষ্টি করা যায়!

অনিল চুপ করিয়া গেল।

মায়া কি একটা অস্পষ্ট কথা বলিয়া সেই যে ঘর হইতে

বাহির হইয়া গেল, আর আসিল না। অনিল অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে বাহির হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, ঠিক্ জবাব দেওয়া হইয়াছে।

তাহার পর কতদিন কাটিয়া গেছে আমরা তাহার হিসাব রাখি নাই। একবছরও হইতে পারে, আবার দু'বছর হওয়াও অসম্ভব নয়।

ইহার ফাঁকে মায়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, অনিলের সঙ্গে নয়, বালীগঞ্জের এক বিপত্নীক ভদ্রলোকের সঙ্গে। লোকটীর বয়স হইয়াছে, কিন্তু বয়সে কি আসিয়া যায়? অত্যন্ত সৌখীন, আর সেই সখকে মিটাইবার মত পয়সা আছে প্রচুর।

লেকের ধারে বেড়াইতে গেলেই অনিল মায়াদের বাড়ী যায়। মায়া যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, একবার বাড়ীতে গিয়া উঠিলে হয়। আর ছাড়িতে চায় না, বলে—আর একটু বসো, যাবেই তো, এতো তাড়া কিসের?

রকমারী শাড়ী-ব্লাউজ্-স্যাণ্ডেল পরিয়া আসিয়া দেখায়, বলে—দেখতো, কেমন মানিয়েছে, ভাল?

অনিল হাসিয়া বলে—তোমায় যদি ভাল না মানায় তো কা'কে মানাবে বল?

—ইস্, খুব যে প্রশংসা করছ দেখি! যাক্, কাল একটু সকাল সকাল আস্বে, বায়স্কোপ যাবো তিনজনে, বুঝলে? আসা চাই কিন্তু। আচ্ছা...তুমি আনাষ্টেনের 'নানা' দেখেছ? বরিস্ কার্লফের 'মমি?'

পয়সার প্রচুর্য্যের তৃপ্তির উচ্ছ্বাসে মায়া যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়। মোট কথা, অনিলের মনে হয়, সে সুখীই হইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অনিল আসিতেই মায়া হাসিয়া হাসিয়া বলে—দেখ্বে? একটা মজার জিনিষ দেখাবো?

—কি?

—এসো না দেখাই—বলিয়া মায়া অনিলকে ডাকিয়া লইয়া গেল পাশের ঘরে। ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—অশ্রু, দেখ্ লো কে এসেছে, তোর সঙ্গে আলাপ কর্বে বলে'—

—কে? বলিয়া ঘরের মধ্যে চেয়ারে উপবিষ্ট একটী মেয়ে চোখ তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিল, চাহিয়াই চোখ নামাইয়া লইল। দু'গালে তখন তাহার রক্তের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনিল তাহার পানে চাহিয়াছিল, তাহার সহিত অশ্রুর চোখোচোখি হইয়া গেছে।

মায়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—কি-লো, লজ্জায় যে রাঙা হয়ে উঠ্‌লি, ওকে অত লজ্জা কিসের—ও কে জানিস? আমার অনিল দা'।

তারপর অনিলের পানে ফিরিয়া মায়া বলিল—একে জান? আমার মেয়ে, আমি ওর মা হই। ওর আসল মা মরে গ্যাছে বছর পাঁচেক আগে।

কথাটার মধ্যে কি ছিল জানি না, অনিল কেমন যেন একটু আহত হইল। তাহার চোখে একটা বিষণ্ণ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। সে দৃষ্টি মায়ার চোখকে ফাঁকী দিতে পারিল না। সে বলিল—কি, তুমি অমনভাবে তাকালে যে? ওকে বুঝি তোমার মনে ধরলো না, কেন ওর চেহারা কি কিছু খারাপ?

অনিল এবার কথা বলিল, বলিল—আমি কি তাই বলেছি?

—বেশ তা' যদি না বলে' থাকো, তবে দু'জনে বসে' একটু গল্প করো, আমি আস্‌ছি। অশ্রু পালাস নি যেন—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অনিল ও অশ্রু সামনাসাম্‌নি বসিয়াই রহিল। আলাপ করিবে কি, মুখ ফুটিয়া কাহারও কথা বাহির হইল না।

দু'জনেই বসিয়া বসিয়া ঘামিতেছিল, শেষে মায়া আসিয়া তাহাদের উদ্ধার করিল।

যাক্, প্রথম পরিচয়টুকু এমন করিয়া হইলেও, চিরদিন একভাবে যায় না, তাহার উপর সুন্দর মুখের একটা আকর্ষণও তো আছে।

অনিল এখন অবসর পাইলেই বালীগঞ্জে ছুটিয়া যায়।

এখন অশ্রুর মুখে খই ফোটে, সে বলে—আপনার জন্যেই বসে' আছি—চলুন যাই লেকের ধারে।

অনিলের আর বসা হয় না, বলে—বেশ চলো।

মায়া হাসে, বলে—বসো, চা খাও, অম্‌নি চলো

বল্‌লেই চল্‌লে। কেন এ বাড়ীতে কি অশ্রু ছাড়া আর লোক নেই ?

—আমি কি তাই বল্‌ছি।

অশ্রু তখন ঘর হইতে পলাইয়াছে।

অনিল বলিল—তুমি কি মায়া? তোমার কি এতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি নেই ?

—ও অশ্রু চলে' গেল বলে' আমায় গাল দিচ্ছ, আচ্ছা, ডেকে দিচ্ছি—বলিয়া হাসিতে হাসিতে মায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে অনিল যখন অশ্রুকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, মায়া তখন স্বামীর কাছে আসিয়া বসিল, বলিল—অনিল দা'কে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌ছি, আমার ইচ্ছে ওরই সঙ্গে অশ্রুর বিয়ে হয়। ভারী চমৎকার ছেলে! তবে গরীব এই যা'।

—চরিত্রবান তো ?

—নিশ্চয়ই।

—তা' হ'লে গরীবের জন্য কি হয়েছে,আমি তো একেবারে ফুল-বিল্লিপত্তর দিয়ে মেয়ের বিয়ে দোব না, চরিত্র ভাল হলেই ভাল। আমার ইচ্ছে বিয়ের পর জামাইকে বিলেত পাঠাবো, তুমি কি বল ?

—তোমার ইচ্ছাতে আর বলাবলি কি আছে, এ কি অন্যায় কিছু ? লেখাপড়ার দিক্ থেকেও তো অনিল দা' ছেলে খারাপ নয়।

স্বামী হাসিলেন, স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—বেশ, তোমার যখন চোখে লেগেছে, তখন তুমিই ঠিক্ করো, আমার আর গররাজী হবার কি আছে ?

অনিল বাড়ী ফিরিতেই মায়ার স্বামীর ঘরে তাহার ডাক পড়িল। স্বামী যা' বলিলেন, অনিলের জীবনে তাহার গুরুত্ব বড় কম নয়। অশ্রুকে বিবাহ করিতে তাহার ইচ্ছা আছে কি না ও বিলাত গিয়া সে কি শিখিয়া আসিতে পারিবে, এই সব কথাই শুধু হইল।

অনিলের মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। ঘর হইতে বাহির হইয়াই সে গেল অশ্রুর কাছে। বলিল—জান অশ্রু, তোমার বাবা জিজ্ঞেস কর্‌লেন তোমায় আমি বিয়ে কর্‌তে পারি কি না ?

—সত্যি ?

—সত্যি !

—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

—সত্যি, সত্যি, সত্যি,—তিন সত্যি করলুম, এবার বিশ্বাস হোল তো ?

অনিল হাসিল, অশ্রু হাসিল।

সেইদিন হইতে অনিলের বালীগঞ্জ যাতায়াত নিয়মিত হইয়া উঠিল।

এখন অশ্রুকে একদিন না দেখিলে, অনিলের মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। অবশ্য অশ্রুরও তাহাই হয় কি না, তাহা আমরা জানি না।

অশ্রুকে মনের কেন্দ্রে রাখিয়া অনিল যখন বিলাত যাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময় সহসা একখানি চিঠি পাইল। মায়ার স্বামী লিখিয়াছেন—

প্রিয়বরেষু—

অশ্রুর সঙ্গে তোমার বিবাহের যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা ভাঙিয়া দিলাম। এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি অনেক দিক্ ভাবিয়া-চিন্তিয়া এই বিবাহ ভাঙিয়া দিতেছি; কাজেই ইহার আর নড়চড় হইবে না। তুমি অশ্রুর কথা ভুলিয়া যাইও। তাহার সঙ্গে আর চিঠিপত্র লেখালিখির চেষ্টা করিও না।

অনিলের সোণার সৌধ ধ্বসিয়া পড়িল। সহসা অতর্কিতে এমন একটা অকারণ আঘাত আসিতে পারে তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই। মাথায় হাত দিয়া তো বেচারা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কিন্তু এত সহজে আশা ছাড়িতে পারিল না। মায়াকে চিঠি লিখিতে বসিল—

কল্যাণীয়াসু—

আমার উপর এমন কড়া আদেশ জারী হইল কেন, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান, অন্ততঃ আমার তো তাহাই বিশ্বাস। আমি তো এই আদেশ জারী হইবার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। ব্যাপার

কি? তোমরা অশ্রুর জন্য আমার অপেক্ষা কি সুপাত্র পাইয়াছ? অশ্রু কি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে? যাহা হউক, সব খুলিয়া লিখিলে আমি সুখী হইব। ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা তিনেকের উচ্ছ্বাসময় চিঠি লিখিয়া অনিল শান্ত হইল।

যথাসময়ে তাহার জবাবও আসিল। মায়া লিখিয়াছে—একসপ্তাহ পরে সে বাপের বাড়ী যাইতেছে, সেখানে গিয়া সে সকল কথা বলিবে।

তাহার পর একটা সপ্তাহ অনিল যে কি করিয়া কাটাইল তাহা সেই জানে।

সাতদিন পরে মায়া সত্যই আসিল। আসিয়াই সন্ধ্যাবেলা অনিলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অনিল আসিল।

যে অনিলকে বালীগঞ্জের বাড়ীতে দেখা গিয়াছিল, তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে। চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, মুখে ঘনাইয়াছে পাণ্ডুর ছায়া, যেন সুস্থ সবল মানুষটী সহসা কোন আন্তরিক বেদনায় আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। মায়া খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ, অনিল দা', বড় খারাপ দেখছি যে, কোন অসুখ করেছিল না কি?

—কই, না।

—ও, তা' হ'লে অশ্রুর বিরহ?

—ঠাট্টা করছ মায়া!

—না না, ঠাট্টা কি? তবে বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমার মত লোক সত্যি ভালবাসতে পারে?

—কেন পারে না মায়া, আমার অপরাধ?

—অপরাধ অনেক। যাক্ সে কথা, তুমি আমার কাছে কি জানতে চেয়েছিলে?

—সেই চিঠির কথা।

—ও, অশ্রুর সঙ্গে তোমার বিবাহ বন্ধ হোল কেন, এই কথা? তার কারণ হচ্ছে—আমার মত নেই।

—তোমার মত নেই!

হাঁা, আমার মত নেই। মনে পড়ে, আমি যেদিন তোমার কাছে আমার মনের কথা বলেছিলুম, সেদিন তুমি আমায় উপেক্ষা করেছিলে, আমার মায়ের কলঙ্কের কথা ভেবে। সেই ছেলে তুমি আমার সতীনঝিকে বিয়ে করার জন্যে ঝুঁকে পড়লে। বিলেত যাবে? কেন, আমাদের টাকায় তোমার বিলেত যাওয়া চলতো না? তা' হ'লে কি ওই পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে হোত? আমি তাই শোধ নিলুম। ওই বিয়ের কথা কে প্রথম পেড়েছিল জান? আমি। আমিই শেষে আবার চরিত্র দোষের কথা তুলে, ক'খানা মিথ্যে চিঠি দেখিয়ে ওই বিয়ে ভেঙে দিলুম। এ শুধু আরসীর মুখ দেখাদেখি, বুঝলে? এখন বুঝতে পারছ আমার সেদিন কি রকম মনের অবস্থা হয়েছিল?

মায়ার মুখে এমন একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল, মেফিস্টো-ফিলসের যে হাসি দেখিয়া ফাউষ্ট কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, শুধু তাহার সহিত তুলনীয়। অনিলের বুক কাঁপিয়া উঠিল, তথাপি অনুকম্পা সৃষ্টি করিবার জন্য সে বলিল—আমার ওপর না হয় শোধ নিলে মায়া, কিন্তু অশ্রু?...

—অশ্রু? এ তার বরাত। আমি কি করব।

এই বলিয়া একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনিলের মুখের পানে তাকাইয়া হাতের হীরার আংটিগুলা নাড়াচাড়া করিতে করিতে জরীপাড় শাড়ীর আঁচল লুটাইয়া মায়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ঠোঁটের কোণে একটা ক্রূর হাসির আভাষ টানিয়া আনিয়া বলিল—বসো অনিল দা', চা আনি—

অনিল বসিবে কি চলিয়া যাইবে ঠিক করিতে পারিল না। মায়ার মুখের হাসি তখন তাহার বুকে পাথর চাপাইয়া দিয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গল্পের প্লট্

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল

সুপ্রীতি তাহার নিরীহ সাহিত্যিক স্বামী সুধীনকে পুরাদস্তুর ডাক্তার না করিয়া ছাড়িবে না। তাই সে নিজে পছন্দ করিয়া স্বামীর নামে বেশ একটা সৌখীন ট্যাব্‌লেট সদর দরজায় ঝুলাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। শুধু তাই নয়, বিকালে বেড়াইতে যাইবার সময় চৌরঙ্গীর এক দোকানে সুধীনকে লইয়া গিয়া ভাল সুটের অর্ডার দিয়া আসিয়াছে।

ইহাতে সুধীনের কিন্তু অস্বস্তির সীমা নাই।

সুধীন ডাক্তারী পাশ করিয়াছে সত্য, এবং অনেকের চেয়ে ভালো হইয়াই পাশ করিয়াছে। মেধাবী ছেলে বলিয়া কলেজে তাহার খ্যাতিও ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, একটা মহৎ দোষ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

সে অপরিণত বয়স হইতেই সাহিত্য-চর্চ্চা সুরু করিয়াছিল। ফলে মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় তাহার নোটের খাতার ভিতর রঙীন গল্পের সন্ধান পাওয়া যাইত।

ডাক্তারী কেতাবের চেয়ে তাহার হাতে আধুনিক লেখকদের নভেলই থাকিত বেশী এবং তাহাকে দেখিলেই মনে হইত, সে তাহার হাতে ছবি আঁকিবার রং-মাখানো তুলি অস্ত্রোপচারের ছুরির অপেক্ষা বেশী মানায়।

ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই।

সুধীন ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিলেও ডাক্তারী করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা তাহার কোনদিনই ছিল না। প্রচুর অবসর পাইয়া সে এখন দুইখানি উপন্যাস এক সঙ্গে আরম্ভ করিয়াছে। ছোটখাটো গল্প লেখা, সে তো আছেই।

তাহার কাজের মধ্যে—সে সকালে উঠিয়া বিছানায় বসিয়া বসিয়া সুপ্রীতির হাত হইতে চায়ের কাপ্‌টি লইয়া ধীরে ধীরে চুমুক দেয় আর ঘুমের জড়তা দূর করে। পরে মাঠে গিয়া খানিকটা বেড়ায়। বাড়ী ফিরিয়া জলযোগ ও খবরের কাগজ পড়ে। তাহার পর স্নানাহার। দুপুরে সাহিত্য-চর্চ্চা। সে বলিয়া যায় আর সুপ্রীতি লেখে। তিনটায় আবার চা। পাঁচটায় সান্ধ্য-ভ্রমণ অবশ্য সুপ্রীতিকে লইয়া। সাতটায় বাড়ী ফেরা। তারপর দুইজনে গল্প-গুজব—সুপ্রীতির গান, না হয় রেডিও। ঠিক্ ন'টায় খাওয়া। দশটা পর্য্যন্ত ছবির বই উল্টানো। তারপর ঘুম।

এই রকম করিয়া সুখের নীড়ে সুধীনের দিন যায়।

সুপ্রীতির পিতা অসীমবাবু সহরের বড় ডাক্তার। কন্যার সহিত পরামর্শ করিতে তিনি বলেন—"তুই মা উঠে-পড়ে না লাগ্‌লে সুধীন গা করবে না। বেটাছেলে কুঁড়ের মত বাড়ীতে বসে' থাকা কি ভালো। থাক্‌লেই বা বাপের চারটি পয়সা।"

কন্যা সুপ্রীতি নীরবে শুনিয়া যায়।

পিতা আবার বলেন—"ছেলে তো খারাপ নয়। কলেজে থাক্‌তে তো দেখেছি। ও একটু যদি চেষ্টা করে, এ লাইনে উন্নতি কর্‌তে পারে। তা' ছাড়া, আমিও তো রয়েছি। পাঁচজনকে বলে'-কয়ে' দিলে ওর সুবিধা হ'তে পারে।"

সুপ্রীতি এবার বলিল—"বলি তো, শোনে কই বাবা। খালি উপন্যাস আর গল্প। আর আমাকে খাটিয়ে মারে। লিখ্‌তে লিখ্‌তে আমার হাত ব্যথা হয়ে যায়।"

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রীতির পাতলা ঠোঁঠের কোণে খুসীর হাসি ফুটিয়া উঠে।

ডাক্তার অসীমবাবু রোগীর নাড়ী আর অস্ত্রোপচারের ছুরিই বেশী বুঝেন। উপন্যাস বা গল্পের রঙীন প্লট্ তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। অবসর সময়ে ডাক্তারী কেতাব হয় তো পড়েন। উপন্যাসের ভিতর বড় জোর স্কট্ বা ডিকেন্সের বই—তাও কম। বাংলা মোটেই পড়েন না।

সুধীনের সাহিত্য-চর্চ্চার কথা উঠিতে অসীমবাবু একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন—"সাহিত্য সাহিত্য করে' বটে, কিন্তু সাহিত্য-চর্চ্চা করে' আমাদের দেশে ক'টা লোক পয়সা করেছে ?"

হাসিয়া সুপ্রীতি বলিল—"বলে আমার বেশী পয়সায় দরকার কি ? খেতে তো দু'টি প্রাণী। যা' আছে তা'তেই একরকম চলে' যাবে।"

"ঐ তো, একটা কুঁড়ের মত কথা। পৈত্রিক টাকা বসে' বসে' খাওয়ায় কি বাহাদুরী। বেটা ছেলে, লেখাপড়া শিখেছো, নিজের চেষ্টায় যাতে আরও দু'পয়সা বাড়াতে পারো তার চেষ্টা করো।"

সুপ্রীতি নীরব।

—"খাবার লোক না থাকে, পাঁচটা গরীবও তো আছে। রোজগার করে' তাদেরই না হয় খাওয়ালে। তা' ছাড়া, যাক্ না কেন বিলেত ঘুরে আসুক, সেখান থেকে ডাক্তারী ডিগ্রি নিয়ে আসুক। একটা কাজে লেগে থাকুক। তা' নয় কুড়ের মত বসে' থাকায় কি ফল। এতে যে শরীরটাও মাটী হয়ে যাবে।"

কন্যা সুপ্রীতি পিতার উপদেশ শুনিয়া গেল বটে, কিন্তু সুধীনের উপর ইহার কোন ক্রিয়া হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না। যাই হোক্, নিজে একটু শক্ত হইবার চেষ্টা করিল এবং যাহাতে সুধীনকে ডাক্তারী করিতে বাহির করিতে পারে তাহার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল।

তাই সেদিন যখন সুধীন তাহাকে উপন্যাস লিখিবার জন্য ডাকিল, তখন সে একটু ঝাঁজিয়াই উত্তর দিল—"আমি অত লিখ্‌তে পারবো না।"

সুধীন এই ব্যতিক্রমের হেতু বুঝিল না। বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। সে নির্ব্বিবাদে আপনি লিখিতে সুরু করিল।

সুপ্রীতির দুঃখ হইল। এমন নিরীহ নির্ব্বিবাদী লোকের উপর রাগও করে।

খানিক পরে নিজেই ঘরে আসিয়া সুধীনের হাত হইতে কলমটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"দাও দাও, আমি লিখ্‌ছি। একবার পারবো না বল্‌লাম, অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল।"

টেবিলের উপর হইতে মুখ তুলিয়া তাহার স্নিগ্ধদৃষ্টি সুপ্রীতির উপর ন্যস্ত করিয়া সুধীন বলিল—"কে রাগ করেছে ? আমি ? কই না ? কে বল্‌লে ?"

"কেউ বলে নি—এখন বলো কি লিখ্‌তে হবে।" বলিয়া কথাটা চাপা দিবার জন্য সুপ্রীতি তাড়াতাড়ি লিখিতে বসিয়া গেল।

অসীম যেমন রোজ বলিয়া যায় বলিতে লাগিল। সুপ্রীতি লিখিয়া চলিল।

সেদিনকার মত লেখা শেষ হইলে চাপাহাসি হাসিয়া সুপ্রীতি জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, তোমার গল্পের মঞ্জুলা তোমার ঘরের সুপ্রীতি নয় তো ?"

কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সুধীন বলিল—"কেন বলো তো ? এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছো কেন ?"

হাসিয়া সুপ্রীতি বলিল—"এমনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

সুধীন বলিল—"সত্যি কথা বল্‌তে কি সু, আমার সব গল্পের নায়িকার উপরই তোমার ছাপ কেমন পড়ে' যায়। এড়িয়ে চল্‌তে পারি না। তুমি আমার চিত্তটিকে এমন দখল করে' বসেছো যে, সেখানে আর কারও স্থান সঙ্কুলান হয় না।"

ডাগর চোখ দু'টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া সুপ্রীতি বলিল—"ওরে বাসরে, তুমি যে উপন্যাসের ভাষায় কথা বল্‌তে সুরু করে' দিলে দেখ্‌ছি ! অতগুলো কথা যখন গুছিয়ে মশায়ের মুখ থেকে বেরুতে শুনেছি, তখন আমি আর বাঁচলে হয়। তা' মশায়ের উপন্যাস শেষ হ'তে আর কতদিন লাগ্‌বে ?"

আন্দাজ করিয়া সুধীন বলিল—"বোধ হয় হপ্তাখানেক। এর ভেতর শেষ কর্‌তেই হবে। পাব্‌লিসারের কাছে টাকা নিয়ে বসে' আছি।"

সুপ্রীতি কহিল—"বেশ, আজ চলো চৌরঙ্গীর দিকে একটা দোকানে গোটাকয়েক সুটের অর্ডার দিয়ে আসবে।"

প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে সুধীন জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, সুট্ কি

হবে আবার? সুট্ আবার কবে আমায় পর্‌তে দেখ্‌লে।"

—"তোমায় ডাক্তারী কর্‌তে বেরুতে হবে। আমি দরজায় টাঙাবার একটা ট্যাবলেটের অর্ডার দিয়ে এসেছি।"

—"সে কি! তোমার এ খেয়াল হঠাৎ মাথায় ঢুক্‌লো কেন?"

—"না, সত্যি তোমায় ডাক্তারী কর্‌তে হবে। ব্যাটা-ছেলে এ রকম বাড়ীতে বসে' থাক্‌লে কুড়ে হয়ে যাবে। শরীরও খারাপ হয়ে যাবে। বাবা বলে গেছেন—আস্‌ছে হপ্তা থেকে তোমায় সঙ্গে নিয়ে রোগী দেখ্‌তে বেরুবেন।"

সুধীনের উপন্যাসের প্লট্ সব গুলাইয়া গেল। একটা দারুণ অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। সে শুধু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

হাসিয়া সুপ্রীতি বলিল—"উপন্যাস লেখাও সঙ্গে সঙ্গে চল্‌বে গো—ভাবনা কি? তবে কি জানো—একটু বেরুনো ভালো। পয়সার জন্য নেই বা ডাক্তারী কর্‌লে—পাঁচটা গরীবেরও তো উপকার কর্‌তে পারো।"

কথাটা সুধীনের মন্দ ঠেকিল না। গরীবের উপকার! করা তো দরকারই।

বলিল—"তাই হবে সু। চলো, আজই আমি সুটের অর্ডার দিয়ে আসি।"

* * *

সুধীন অসীমবাবুর সহিত রোগী দেখিতে বাহির হইল। এ বাড়ী সে বাড়ী অনেক বাড়ী ঘুরিয়া সব শেষে অসীমবাবু একটী রোগীনীকে দেখিতে গেলেন।

সুধীন দেখিল, সে অষ্টাদশী। সুন্দরীও বটে। কেন না, রোগের কালিমা দেহের সব কান্তিটুকু এখনও মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

রোগ শক্ত হইলেও বাগে আসিয়াছে। সে এখন সারিবার মুখে। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে দেরী হইবে। এবং সে সুস্থতালাভের প্রধান উপায় হইতেছে চিত্তের প্রফুল্লতা রক্ষা।

ডাক্তার অসীমবাবু রোগীনীকে পরীক্ষা করিয়া এবং কয়টি হিতোপদেশ দিয়া ভিজিটের টাকা পকেটে ফেলিয়া সুধীনকে লইয়া মোটরে উঠিলেন। তাহার পর গাড়ীতে যাইতে যাইতে রোগীনীর রোগের ইতিহাস ও তাহার চিকিৎসার কথা বিশদভাবে সুধীনকে বুঝাইয়া দিলেন।

অসীমবাবু বাড়ী পৌছিয়া সেই গাড়ীতে সুধীনকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবার জন্য ড্রাইভারকে নির্দ্দেশ করিলেন। সুধীন বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে পথে অষ্টাদশী রোগীনীর রোগের কারণটা উপন্যাসের দিক্ দিয়া ভাবিলে কি রকম হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল—

* * *

অষ্টাদশী যেন রূপকথার নাগপুরীর নাগকন্যা।

উতলা চাঁদিনী রাত্রি। চারিদিকে নব বসন্তের হিল্লোল। গাছে গাছে পাতায় পাতায় নব ফাল্গুনের আমেজ প্রাণে পুলক জাগাইয়া তুলিতেছে।

নাগকন্যা কুসুম-শয্যায় শায়িতা। সখীরা বীজন করিতে করিতে কখন ঘুমে ঢলিয়া পড়িয়া তাহারই শয্যার একপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে।

হঠাৎ কাহার মৃদু স্পর্শে নাগকন্যার চমক ভাঙিল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—এক দিব্যকান্তি রাজকুমার।

এ কি, এ মুখ যেন নাগকন্যার পরিচিত! যেন তাহারই জন্য সে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া পথ পানে চাহিয়া আছে।

নাগকন্যা উঠিয়া অতিথি রাজকুমারের অভ্যর্থনা করিল। তাহার পর দুইজনে সেখান হইতে উঠিয়া এক ঝরণার ধারে গিয়া বসিল।

রাজকুমার গল্প বলিতে লাগিল। কত দেশ-বিদেশের কথা, পক্ষীরাজের কথা, সোনার কাটি রূপার কাটির কথা।

নাগকন্যা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনিতে লাগিল।

তাহার পর রাত্রি পোহাইল। পূর্ব্বাকাশ লাল হইয়া উঠিল। রাজকুমার বিদায় চাহিল। নাগকন্যা চোখের জলে কুমারের বিদায়-ব্যাথাকে মধুর করিয়া তুলিল। রাজকুমার চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—সে আবার আসিবে।

নাগকন্যা অপেক্ষা করে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন। রাজকুমার আসে না। দিন যায়, দিন আসে। কিন্তু রাজকুমার ফেরে না।

নাগকন্যা অধীর হইয়া উঠে। কুসুম-শয্যায় কাঁটা ফোটে। গলার মালা শুকাইয়া ঝরিয়া মাটিতে পড়ে। চোখের জলে গা ভাসিয়া যায়। কিন্তু রাজকুমার আসে না।

নাগকন্যা ভাবে—হয় তো রাজকুমার ঠিক্‌ই তাহার কাছে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে পথে হয় তো দেখিয়াছে রাজপুরীর বাগানে মেঘবরণ রাজকন্যা। দেখিয়া হয় তো পক্ষীরাজ সেইখানেই থামাইয়াছে। গাছের গুঁড়িতে ঘোড়ার লাগাম বাঁধিয়া হয় তো তাহার পাশেই বসিয়াছে। তাহার পর হয় তো রাজকুমার নাগকন্যার কথা, নাগপুরীর কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।

রাজকুমারের অদর্শনে নাগকন্যার কৃশ দেহ দিনদিন কৃশতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বৈদ্যরাজের ডাক পড়িল। ঔষধের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রোগের উপশম নাই।

নাগরাণী চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। আড়ালে সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমারের কথা সখীরা আর গোপন রাখিতে পারিল না।

কথাটা নাগরাজার কাণে উঠিতে দেরী হইল না। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনে লোক ছুটিল রাজকুমারের সন্ধানে। সন্ধান মিলিলও। অর্দ্ধেক রাজত্ব ও নাগকন্যা পাইয়া রাজকুমার বিবাহে মত দিল।

ওদিকে নাগকন্যার রোগপাণ্ডুর মুখে সঙ্গে সঙ্গে সলাজ খুসীর লালিমা ফুটিয়া উঠিল।

গাড়ী আসিয়া সুধীনের দরজায় দাঁড়াইল।

হাসিতে হাসিতে সুপ্রীতি আসিয়া সুধীনের পকেট হইতে ষ্টেথিস্‌কোপ বাহির করিয়া লইয়া বলিল—"প্র্যাকটিশ্‌ তো করে' ফির্‌লে—টাকা কই ?"

সুধীন বলিল "টাকা তো আনি নি সু।"

সুপ্রীতি জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি আন্‌লে শুনি ?"

সুধীন জবাব দিল—"খুব ভালো একটা গল্পের প্লট্‌। লিখ্‌তে পার্‌লে খুব রোম্যাণ্টিক হবে কিন্তু।"

বলিয়া সোচ্ছ্বাসে জুতা জামা খুলিতে খুলিতে সুধীন অষ্টাদশী রোগীনীকে লইয়া যে গল্পের প্লট্‌ ঠিক্‌ করিতে করিতে ফিরিতেছিল তাহাই বলিতে লাগিল।

শ্রবণান্তে হাসিতে হাসিতে সুপ্রীতি বলিল—"তা' হ'লেই হয়েছে। রোগী দেখ্‌তে গিয়ে এমনি করে' তুমি গল্পের প্লট্‌ ভাব্‌বে, তা' হ'লেই ডাক্তারী করেছো।"

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রসরঙ্গ

মদনমোহন ভট্টাচার্য্য

আগন্তুক—খোকা, তোমার বাবা কি করেন ?

খোকা—আমার বাবা খুব লাভের চাকরি করেন, তিনি ঘোড়ায় চড়া পুলিস।

আগন্তুক—ঘোড়া চড়ায় পুলিশ হ'লে কি লাভ বেশী ?

খোকা—নিশ্চয়ই, বিপদ এ'লেই তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়া যাবে।

* * *

"জজ সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বয়স কত আমি কিছুতেই ঠিক করতে পারিলাম না। আটাস না উনত্রিশ।"

"কি বললে ?"

"একুশ।"

* *

পুলিস্ সাহেব—আপনি কিরেন ?

"আমি জুবিলি দোকানদার।"

"সে কি ?"

"আমি ১৯১০ সালে দোকান প্রথম খুলি।"

কবির বেদনা

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য, বি-এ

আমার দাদা ও কাকা পাকা বিষয়ী লোক। কেমন করিয়া তুচ্ছ দু' পয়সা ততোধিক তুচ্ছ সংসারের জন্য সংস্থান করিতে পারা যায়, এই চিন্তা ছাড়া জীবনের আর কোনো কাম্য তাঁহাদের নাই। আমি কবি লোক। কাজেই বাড়ীর মধ্যে একজন অপদার্থ বলিয়া গণ্য হইয়া ছিলাম। লোকে বলিত, আমার প্রত্যেক কাজেই কবির পরিচয় পাওয়া যাইত। কবিরা বৈষয়িক দৃষ্টিতে অপদার্থ-ই হইয়া থাকে, অতএব আমি মহোৎসাহে অধিকতর অপদার্থ হইতে আরম্ভ করিলাম। বাড়ীর ছোট কাজকর্ম্ম, যেমন বাজার করা, হয়ত' এক-আধদিনের জন্য আমার ঘাড়ে পড়িত, এবং আমি যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট মূল্যে যথাসম্ভব নিকৃষ্ট জিনিষ আনিয়া কবিত্ববর্জ্জিত কর্ত্তাদের কাছে প্রমাণ করিয়া দিতাম যে, জগতে কবিকুল বাজার করিতে জন্মগ্রহণ করে না।

তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর হইতেই আমি যেন দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শটা বেশ উপলব্ধি করিতাম এবং গায়ে হাত বুলাইয়া লক্ষ্য করিতাম দক্ষিণ বায়ু আমার অঙ্গে শিহরণ আনিয়া দিয়াছে কি না। ক্রমে যখন দেখিলাম চাঁদের আলো বড়ই ভাল লাগিতেছে, তখন আমি যে কবি এ বিষয়ে একেবারেই নিঃসংশয় হইলাম, এবং চাঁদের আলোয় ছাদে বসিয়া অঙ্গুলি দিয়া চোখের পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম যে, কোনো অজানিত বিরহে চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছে কি না। কবিত্বের আর একটি প্রধান উপকরণ, কোকিলের অভাব বড়ই অনুভব করিতাম। কারণ, কলিকাতায় এটির বড়ই অভাব। তবুও আমার সান্ত্বনা ছিল এই যে, কোকিল শূন্য কলিকাতায় ছোট বড় অনেক কবিজন-ই আজন্ম কলিকাতার বাহিরে পা না বাড়াইয়াও কবিতার মধ্যে কোকিল কণ্ঠস্বরের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।. তখন কোকিল ছাড়া আমার মত নবীন কবিরই বা চলিবে না কেন ?

প্রকৃতপক্ষে, আমার মধ্যে কবির সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। কি করিব, প্রকৃতির অনেক অসম্পূর্ণ কাজ মানুষকেই সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হয়, এবং অনেক অপকার্য্য-ও মানুষকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। সরু লৌহশলাকা তপ্ত করিয়া মাথার উপর চাপিয়া ঊর্দ্ধমুখী চুলগুলিকে যথাসম্ভব অবনত করিতে চেষ্টা করিলাম, এবং নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন্‌ভাবে মুখখানা দেখাইবে ভাল। মাথার টেরি বৈচিত্র্যময় করিলাম। লম্বা চুল রাখিলাম, এমন কি, চোখের দু'পাশে 'জি'-মার্কা নিব দিয়া কালো সরু রেখা পর্য্যন্ত টানিয়া দিলাম। নিজের গায়ের রং এবং মুখখানা আমার নিজের কেমন পছন্দ হইত না। কিন্তু সমস্ত দেশ যুগে যুগে যে সুন্দররাজকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে সেই শাশ্বত সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের কথা স্মরণ করিয়া আমি ঈশ্বরের কাছে কোনদিনই অভিযোগ করি নাই, বরং ধন্যবাদই জানাইয়াছি। কারণ, বন্ধুরা বলিত, আমার বর্ণ বাঙ্গালীর নিজস্ব বর্ণ, শোভাশ্যামল বাঙ্গালা দেশেরই বর্ণ। মোটের উপর সকলেই বলিত, আমাকে দেখিতে ঠিক কবিরই মত, আমি নিজে আগে তা বুঝিতে পারিতাম না।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া কবিত্ব আমাকে পূর্ণ মাত্রায় অধিকার করিল, এবং তখন হইতে প্রতি পাতায় এমন কি কেমিষ্ট্রীর খাতাতেও এখানে ওখানে কবিত্বের বীজ পড়িয়া ছোট বড় অঙ্কুর উদ্গত হইতে আরম্ভ করিল। কলেজের টেষ্ট পরীক্ষায় আমি ফেল করিলাম। কারণ, পরীক্ষার উত্তর-পত্রে কবিত্বের কোনো নম্বর পাওয়া যায় না। জগতে অনেক কবি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে।

এ সংবাদ আমার জানা ছিল বলিয়াই আমি অকৃত-কার্য্যতায় মর্ম্মাহত হই নাই।

আমার কবিতা আমি আমার বন্ধুদের দেখাইতাম। সকলেই উচ্চ প্রশংসা করিত। আমার কবিতার যে সব-চেয়ে বেশী প্রশংসা করিত, সে মনোরঞ্জন। আর তাহার প্রশংসার মূল্যও ছিল। কারণ, সে ভাল সমা-লোচক। নামও আছে বেশ। খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং রসিক। শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার কথা কয়। চেহারাখানিও বেশ মনোরঞ্জন। তাহার প্রশংসার লোভেই আমি বেশী বেশী কবিতা লিখিতাম। এবং তাহার কথাতে আমি যে সর্ব্বাঙ্গীন কবি হইয়া উঠিয়াছি তাহার পরিচয় পাইলাম। কারণ, একদিন সে কথায় কথায় হাসিয়া বলিল, "তুমি যে কবি, তা আমি প্রথমদিন দেখেই ঠিক ধ'রে ফেলেছি।

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "কিসে বুঝলে?"

মনোরঞ্জন বলিল, "আমি ঠিক বুঝি ভাই। তোমার মুখ চোখ দেখেই ঠিক্ বোঝা যায়। আমি লক্ষ্য ক'রেছি ক্লাশে লেকচারের সময় তুমি অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবো। এবং সেটা যে ভাবুকের ভাব তা আমি ঠিকই বুঝেছি।"

আমি বলিলাম, "তোমার অদ্ভুত লোক চেনবার ক্ষমতা।"

সে বলিল, "না হ'লে চ'লবে কি ক'রে? এই ত' আমার পেশা।"

মনোরঞ্জন তা হইলে লক্ষ্য করিয়াছে! করিবে না বা কেন? সত্যই ত', আজও কেমিষ্ট্রীর লেকচারের সময় আমি 'মনে পড়ে সেই মুখ' এই পদের সহিত শেষ শব্দে সুখ দিয়া কিংবা দুখ দিয়া মিলাইব তাহাই ভাবিতে-ছিলাম। সেই দিন হইতে মনোরঞ্জন দেখিবে বলিয়াই আমি প্রত্যহ অন্যমনস্ক হইতাম।

মনোরঞ্জন বলিল, "বনসুষমা মজুমদারের নাম নাম শুনেছো ত'?"

বলিলাম, "নিশ্চয়ই। নবীন সাহিত্যিক কে এমন আছে যে, বনসুষমার নাম শোনে নি?"

মনোরঞ্জন বলিল, "সে যে আমার আত্মীয়—শুধু আত্মীয় নয়, পরমাত্মীয়।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলাম, "কি রকম?"

"বড় মধুর সম্পর্ক। আমার শালী। তার বড় বোনকে আমি বে' করেছি। ওরা দুই বোন্, বনসুষমা আর মনসুষমা।"

মনোরঞ্জনের সঙ্গে গিয়া বনসুষমাকে দেখিয়া আসিবার বড় লোভ হইল। কিন্তু কথাটা তাহাকে বলিতে পারিতেছিলাম না। আমার বলিতেও হইল না, মনো-রঞ্জনই বলিল, "চলো না, একদিন আমার শ্বশুর-বাড়ীতে বনসুষমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর আমার মনসুষমাকেও দেখে আস্‌বে। বনসুষমার কাছে তোমার নাম ক'রেছি, সে তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ ক'রতে চায়। যাবে?"

আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় হইতেছিল। কবি-সাহিত্যিক বনসুষমাকে দেখিব—আলাপ করিব! সে আমার নামও শুনিয়াছে; শুধু তাই নয়, উপযাচক হইয়া আলাপ করিতেও চাহিয়াছে। এতদিন তাহাকে তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেখিয়াছি—এইবার তাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিব! মৃদুস্বরে মনোরঞ্জনকে বলিলাম, "তা গেলে হয়।"

কথাটা এমন লঘুভাবে বলিলাম যেন আমার ততটা আগ্রহ নাই।

কিন্তু মনে মনে মনোরঞ্জনের এতটা সৌভাগ্যে তাহাকে যতটা অভিনন্দিত করিলাম তার চেয়ে বেশী ঈর্ষাও হইল। তাহার নিজের সুন্দর স্বাস্থ্য, রূপ এবং যশ আছে। মনসুষমা—অমন গালভরা নামের স্ত্রী—আবার বনসুষমা তার শালী। কথা গোপন করিয়া লাভ নাই, ভাবিলাম, এই-রকম যদি আমার একজন শালী থাকিত, তা হইলে কবি হইবার পথে কতকটা সাহায্য হইত! কিন্তু যখন মনে হইল, শালী পাইতে হইলে আগে একটী স্ত্রীর-ই প্রয়োজন আছে, তখন মনে মনে ভারি হাসি পাইল, বোধ হয় একটু দুঃখও হইয়াছিল।

যাই হোক্, মনোরঞ্জনের সহিত তাহার শ্বশুরবাড়ীতে

গেলাম। সে আমাকে বৈঠকখানায় বসাইল। চমৎকার বৈঠকখানাটি! ভাবিলাম, ছেলেবেলায় এমন একটি বৈঠকখানা পাইলে অনেক পূর্ব্বেই কবি হইয়া যাইতাম—ঘরটির মধ্যে এমনি একটি বিশৃঙ্খল সৌন্দর্য্যের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলাম। চারিদিকে বই সাজানো। সাজানো ঠিক নয় ছড়ানো। ঘরের ভিতরেই কতকগুলি ফুলের টব। সেই ক্ষুদ্র কুঞ্জটির মধ্যে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজপত্র। একখানা কাগজে দেখিলাম, একটা কবিতা, নীচে লেখা, কুমারী বনসুষমা মজুমদার। বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল—বনসুষমা কুমারী! নিজের অলক্ষিতেই কখন একবার মনে হইল, সে মজুমদার, আমি মুখোপাধ্যায়—স্বজাতিই! আমি তাহার লেখাটি তুলিয়া লইয়া সার্টের পকেটে রাখিলাম। ইচ্ছা, হোষ্টেলে ফিরিয়া গিয়া বনসুষমার হস্তাক্ষর ভাল করিয়া দেখিব।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিম আকাশ হইতে একটা দীর্ঘ রক্ত-রশ্মি জানালার ভিতর দিয়া ঠিক আমার মুখের উপর পড়িল। আমি মুখ সরাইলাম না। আমি কবি—আমার মুখে গোধূলির আলো লাগিয়াছে, মুখ সরাইব কেন? মনটা কেমন আবেশে ভরিয়া গেল। সেই আবেশ বাড়াইয়া দিল আবার, উপর হইতে একটি অর্গানের বেদনা-গম্ভীর স্বর এবং তারপরেই একটি কণ্ঠস্বর। গানের কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সেই বুঝিতে-না-পারার গানের মাধুর্য্য যেন আরও বাড়িয়া গেল বলিয়া মনে হইল। গানটা যত ভাল লাগিল, তত ভাল হয়ত' না-ও হইতে পারে, কিন্তু আমার সেই—মানসিক অবস্থায় অতি—অতি সুন্দর লাগিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মত সেই গান শুনিতেছি, এমন সময় মনোরঞ্জন নীচে নামিয়া আসিয়া বলিল, "কি হে, একলাটি ব'সে কি করছো? বনসুষমাকে তোমার আসার খবর দিইছি। সে ওপরে একটা গানের সুর তৈরী ক'রছে, এখনি আসবে।"

তা হইলে ও বনসুষমার কণ্ঠস্বর! গান তখন থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার মর্ম্মে আবার নূতন করিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। বাণী তাঁর এই বরপুত্রীকে সকল দিক্ হইতে আশীর্ব্বাদ করিতে কোন কার্পণ্যই করেন নাই! দেখিলাম, আমার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিতেছে এবং কবিজন-কথিত অজানিত বিরহ যে কি, তা অনেকটা উপলব্ধি করিলাম।

মনোরঞ্জন বলিল, "তোমার কোনো কবিতা সঙ্গে এনেছো? সে দেখ্‌বে।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, একটা এনেছি।"

ভিতরে ভিতরে কিন্তু আমার লজ্জা হইল। কারণ, যে-কবিতাটা আনিয়াছি সেটা প্রেমের কবিতা। বনসুষমাকে দেখাইব এরূপ আন্দাজ করিয়াই আমি আমার শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাটি আনিয়াছিলাম। একবার ভাবিলাম, বনসুষমা হয়ত' কি মনে করিবে? আবার ভাবিলাম, কবির কাছে কবির লজ্জা কি? প্রেম ত' কবির কাছে জীবনের চরম সম্পদ?

খানিক পরে একটী তরুণী-মূর্ত্তি ঘরে ঢুকিল। ছবিতেও দু'একবার বনসুষমার ছবি দেখিয়াছি, কাজেই ঠিক বুঝিতে পারিলাম, এই বনসুষমা। বনসুষমার চেহারার রঙীন ছবি দেখিয়াছি, খুব বড় আর্টিষ্টের—কিন্তু চোখের সামনে যে জীবন্ত রঙীন ছবিটি দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম প্রাণের রঙে যা ফুটে আর্টিষ্টের তুলিকায় তা ফুটে না। এমনি সুন্দর। মনে মনে যতটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলাম, ততটা যোগ্য হয়ত' না হইতে পারে, কিন্তু আমার চোখে ওইরূপ-ই মনে হইল। আমার তখন মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। বাঙ্গলা-সাহিত্যের বরপুত্রী বনসুষমা আমার সম্মুখে, এবং একই ঘরে, একহাত ব্যবধানে দাঁড়াইয়া! আমি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বনসুষমা ঘরে ঢুকিয়া দুই হাত একত্র করিয়া নমস্কার করিলে আমি প্রত্যর্পণ করিতে পারিলাম না।

বনসুষমা বলিল, "আপনি এসেছেন, খুব খুসী হলুম।"

আমি বলিলাম, "মনোরঞ্জন অনেকদিন আগেই আমাকে—"

"—হ্যাঁ, রঞ্জন দা'র মুখেইত' আপনার নাম শুনেছি। রঞ্জন দা'ত' আপনার খুব সুখ্যাতি করেন—বলেন, আপনি

খাঁটী কবি। জগতে কবি দু'রকমের, এক আসল আর এক নকল। আপনি আসল।"

কথাটা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল, বোধ হয়, স্বয়ং বীণাপাণি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার কবিত্বশক্তিকে স্বীকার করিয়া লইলেও আমি এত আনন্দিত হইতাম না।

মনোরঞ্জন বলিল, "অনিল, তোমার কবিতা একটা দেখাও না?"

বনসুষমা সকৌতূহলে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি সার্টের বুকপকেট হইতে একখণ্ড ফুলস্কেপ্ কাগজে লেখা কবিতাটা বাহির করিয়া বনসুষমার হাতে দিলাম। সে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। আগে বলিয়াছি, সেটা প্রেমের কবিতা। বনসুষমা কবিতাটা পড়িতে লাগিল, এবং আমার মনে হইতে লাগিল, ওটা পড়িয়া তার শুভ্র গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠি-উঠি হইয়াছে। আমি মুগ্ধনেত্রে তাহার আনত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিতে লাগিল, কবিতাটা পড়িয়া সে হয়ত' কি মন্তব্য করিবে।

মুখ তুলিয়া বনসুষমা বলিল, "বেশ হ'য়েছে, অতি সুন্দর! আপনার কবিত্বশক্তি অসাধারণ। মাঝে মাঝে দয়া ক'রে এসে এইরকম কবিতা আমাকে দেখাবেন —অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

আমি বলিলাম, "নাঃ, আপত্তি আর কি?"

সেদিন আরো অনেক কথা হইয়াছিল, সব কথা স্মরণ নাই। তবে বেশ মনে আছে, বনসুষমা নিজ হাতে চা আনিয়া আমাকে খাওয়াইয়াছিল এবং চলিয়া আসিবার সময় পুনঃপুনঃ অনুরোধ জানাইয়া বলিয়াছিল, "মাঝে মাঝে রঞ্জন দা'র সঙ্গে আসতে ভুলবেন না কিন্তু। আপনার আসাতে আমি ভারী আনন্দিত। আর না-ই বা রইলো রঞ্জন দা', একলাই আসবেন—বাড়ীত' চেনা রইলো?"

সেইদিন আমার কি আনন্দ! আনন্দাতিশয্যে সে রাত্রে ভাত পর্য্যন্ত খাই নাই এবং ঘুমাই নাই। মনে হইল আমার জীবনের উপর এতদিনে একটা নূতন কিরণ-সম্পাত হইল!

সেই দিন হইতে আমি বনসুষমার বাড়ী যাইতাম। প্রথম দু'একদিন মনোরঞ্জনকে সঙ্গে লইতাম, শেষে তার সঙ্গে যাওয়া আমার পছন্দ হইত না। সন্ধ্যাবেলা, সপ্তাহে একদিন দু'দিন, বনসুষমার বাড়ী বেড়াইতে বেড়াইতে যাইতাম এবং যাইতাম বলিয়াই বেড়াইতাম। আমি আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছি শুনিলেই বনসুষমা নীচে নামিয়া আসিত, কোনো কোনোদিন সঙ্গে বড় বোন্ মনসুষমা এবং আরো অন্যান্য আমার অপরিচিত লোকও আসিতেন। দেখিতাম, বাড়ীর সকলেই বেশ আমুদে, এবং রসিক; এমন কি, শিশুটী পর্য্যন্তও! সকলের সঙ্গে খুব হাসি-খুসী গল্প-গুজব করিতাম,—বেশী কথা আমি-ই কহিতাম, তা-ও কবির ভাষায় এবং কবির আদব-কায়দায়। কারণ, আমার প্রতি রক্তকণিকায় যে কবিত্বের বীজ আছে, এ সংবাদ তাঁহাদের দিতে ভুলিতাম না এবং তাঁহারা ভুলিলে আমি তৎক্ষণাৎ স্মরণ করাইয়া দিতাম। তাঁহারা সকলেই আমার কবিতা শুনিতে চাহিতেন এবং আমি-ও মহোৎসাহে রাত্রি দু'টা তিনটা পর্য্যন্ত জাগিয়া, কলেজের পড়া কামাই করিয়া, কবিতা লিখিতাম।

সেদিনও বনসুষমার বাড়ী গিয়াছি। গিয়া দেখি, বৈঠকখানায় লোক অনেক। তাঁহাদের বেশভূষা, চুলের বৈচিত্র্য এবং কথাবার্ত্তাতে বুঝিলাম, ইঁহারা কবি বা সাহিত্যিক না হইয়া যান না। তা'ত' নিশ্চয়ই, কারণ, কবি বনসুষমা মজুমদারের বাড়ী বাজে লোকের স্থান নাই। ছবিতে চেহারা দেখিয়াছি এমন অনেক বড় সাহিত্যিককে দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলাম,—কত বড় উচ্চ সংসর্গ আমার! ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যের দরবারে একটা আসন পাইব, এবং আমার দাদা ভাবিবে, কবি অনিল মুখোপাধ্যায় আমার-ই ভাই। এই আশা করা দুরাশা হইবে না ভাবিয়া আমার বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল।

তখন গান হইতেছিল। বনসুষমা গান গাহিতেছিল। ভয় হইল, যদি আমাকে গাহিতে বলে? যা ভাবিলাম তাহাই হইল। বনসুষমা গান শেষ হইলেই বলিয়া উঠিল, "এই যে, আসুন। একটা গান শোনান।

আমি ও রসে বঞ্চিত, কবি হইয়া কবিসমাজে ও-কথা স্বীকার করিতে লজ্জা হইল। একটু অস্পষ্ট ভাষায় বলিলাম, "না, ওতে—ইয়ে—থাক্।"

বনসুষমা বলিল, "থাকবে কেন? আপনি কবি লোক, গান জানেন না, এ কথা আমি কেন, কেউ-ই স্বীকার ক'রবে না। নীলোৎপলবাবু, ইনি কবি অনিল চট্টোপাধ্যায়,—চট্টোপাধ্যায় নয়, মুখোপাধ্যায়। এঁর কথাই ব'লছিলাম তখন।"

বিখ্যাত "প্রেম—প্রেম—প্রেম" কাব্যের কবি নীলোৎপল ঘরের কোণ হইতে আমার দিকে চাহিয়া, বেশ সুর করিয়া, প্রায় গান গাহিয়াই, বলিলেন, "একটা গান শোনান না?"

গান জানি না বলিতে পারিব না বলিয়াই অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিলাম, "আমার শরীর খারাপ। কাল থেকে খাই নি।"

নীলোৎপলবাবু বলিলেন, "তা বেশ, আর একদিন শোনাবেন।"

কবি হইতে হইলে যে গান গাওয়ার প্রয়োজন, এ কথাটা আগে আমার মাথায় যায় নাই। কবি হইবার আগে অবশ্য কোনো কোনোদিন গাহিয়াছি বটে, কিন্তু সে গানের আমি ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় শ্রোতা নাই, এই ভরসাতেই গাহিয়াছি। ভারী দুঃখ হইল। বনসুষমা নিজে আমাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু সেই কবিসমাজকে, বিশেষ করিয়া বনসুষমাকে আমার গান শোনানো হইতে বঞ্চিত হইলাম, নিজের এই অক্ষমতার দুঃখে মন যেন বাগ্দেবীর পায়ে মাথা কুটিতে চাহিল। কিন্তু কবি হইতে হইলে নিরাশ হইলে চলিবে কেন? পরিশ্রম করিতে হইবে। দাদা কলেজের মাহিনা এবং হোষ্টেলের খরচবাবদ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। সেই টাকা লইয়া পরদিনই আমি দোকান হইতে একটা সিঙ্গ্‌ল রীড্ হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিলাম, এবং আনিবার পাঁচ মিনিট পর হইতেই সঙ্গীত-সাধনার কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলাম। আমাদের হোষ্টেলে একজন গান গাহিত ভাল। তাহাকে অনেক অনুরোধে আমার শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলাম। বনসুষমার জন্যই আমি দুইটা গান, প্রেমের গান, তৈরী করিলাম, এবং এক পক্ষকাল তাহার শিক্ষকতায় এবং অবিশ্রান্ত সাধনায় সুরও শিখিয়া ফেলিলাম। আমার শিক্ষক বলিয়া দিল, আমার গলা এই কয়দিনের সাধনাতেই মার্জ্জিত এবং সুরময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার পর আর কাহারও শিক্ষকতার আবশ্যক হইবে না।

কিন্তু গান ত' গাহিলেই চলিবে না। সেদিন বনসুষমা বলিয়াছিল, গান গাইতে হয় শুধু মুখ দিয়া নয়, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া। সুতরাং, অতঃপর চিন্তা করিতে লাগিলাম, গান দু'খানি গাহিতে হইলে মুখ ছাড়া অন্যান্য কি কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করিব। সম্মুখে একটা বড় দর্পণ রাখিতাম। গান গাহিবার সময় দেখিতাম, মুখখানা কেমন দেখাইতেছে। কল্পনা করিয়া লইতাম, আমি যেন একটা প্রেমের গান গাহিতেছি আর বনসুষমা আমারই পাশে বসিয়া মুগ্ধ নয়নে আমার সঙ্গীত-বিভোর মুখখানার দিকে চাহিয়া আছে। ওইরূপ কল্পনা করিয়া আমি আমার মুখে সোহাগের ভাব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতাম। এই এক পক্ষকাল আমি বনসুষমার বাড়ী যাই নাই, কারণ, মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, গান না শিখিয়া আমি তাহার বাড়ী যাইব না।

একদিন মনোরঞ্জন বলিল, "অদ্ভুত ভাই শক্তি তোমার! যাতে হাত দাও তাতেই সোণা ফলে।"

মনোরঞ্জন যে কি বলিতে চায়, তাও বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তবুও তাহার মুখ হইতে একটু আত্মপ্রশংসা শুনিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "তার মানে?"

মনোরঞ্জন বলিল, "তোমার গানের কথা ব'লছি। এই ক'দিনেই চমৎকার শিখে ফেলেছো। যেমন গলা, তেমনই গাইবার ভঙ্গী। ভগবান যাকে দেন, তাকে এমনি ক'রেই দেন।"

আমি বলিলাম, "তুমি শুন্‌লে কি ক'রে?"

সে বলিল, "লুকিয়ে লুকিয়ে শুন্‌ছিলাম। তা তুমি বনসুষমাকে শুনিয়েছো?"

আমি বলিলাম, "না।"

মনোরঞ্জন বলিল, "বনসুষমা তোমাকে গান শোনাতে যেতে লিখেছে। তুমি এতদিন যাও নি বলে অনেক দুঃখু ক'রে আমাকে চিঠি লিখেছে।"

আমার হৃৎপিণ্ডটা বেশ স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমি যাই নাই বলিয়া সে দুঃখু করিয়া মনোরঞ্জনকে চিঠি লিখিয়াছে! তপোবনের নিভৃত মালঞ্চে সখীগণের কাছে শকুন্তলার স্বীকারোক্তি শুনিয়া দুষ্যন্তের মনে যেমন হইয়াছিল, আমার মনেও তেমন হইল। আমার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে যে, তাহাতে বনসুষমাও আকৃষ্ট! ভাবিলাম, বনসুষমা ত আমাকে কিছু লেখে নাই? সেত' অনায়াসে একখানা চিঠি লিখিতে পারিত? ভাবিলাম, হয়ত' লজ্জায় লিখিতে পারে নাই। যাই হোক্, যতবড় কাব্য-প্রতিভা-ই থাক্ সেত' ছেলেমানুষ! আমাকে লিখিতে লজ্জা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

মনোরঞ্জনের ওই কথাটা সমস্তদিনই আমার মনের মধ্যে একটা মধুর মধুরতম বেদনা দিয়া ফিরিয়াছে—বনসুষমা—আমার কল্পনা-নন্দন-বনের মূর্ত্তিমতী সুষমা, আমি যাই নাই বলিয়া কত দুঃখ করিয়াছে। সেই-ভাবের অসংযমনীয় প্রাবল্যে আমি ক্লাশে বসিয়াই তৎক্ষণাৎ নোটবুকে একটা কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। সেদিন শেষ ঘণ্টার লেক্‌চার কামাই করিয়া সটান্ ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। কেবল-ই চোখের সম্মুখে দেখিতেছি বনসুষমার বেদনা-নত সুন্দর মুখখানা। অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিয়া, হারমোনিয়ামটা লইয়া গান দু'খানা ভাল করিয়া সাধিলাম। কাল বনসুষমাকে গান শোনাইব-ই। মনোরঞ্জন পাকা সমালোচক। সে যখন আমার গানের এত সুখ্যাতি করিল, তখন বনসুষমাকে মুগ্ধ করিতে পারিব না? মনে মনে বীণাপাণির কাছে করযোড়ে, অন্ততঃ কালকের জন্য, এই শক্তিটুকু প্রার্থনা করিলাম।

বনসুষমাকে গান শোনাইতে গিয়া প্রথমটা বড় গোলমাল ঠেকিল। আগেই বলিয়াছি, আগে সর্ব্বস্থান-ময় ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো শ্রোতার সম্মুখে গান গাহি নাই। এখন শ্রোতার সম্মুখে গাহিতে হইতেছে—আর সে যে-সে শ্রোতা নয়, বনসুষমা। হাতের আঙ্গুলগুলা কাঁপিতে কাঁপিতে অর্গানের নিসিদ্ধ রীডের উপর পড়িতে লাগিল। ঈষৎ-কম্পিত কণ্ঠস্বরটুকু অতিকষ্টে সংযত করিলাম এবং পরে অনেকটা স্বাচ্ছন্দভাব আনিয়া, মুখ এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া গান গাহিলাম। গানের শেষে বনসুষমার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে কোনো একটা অন্তর্নিহিত ভাব অতিকষ্টে চাপিয়া আছে। তাহার চোখে বেশ একটা সহাস্যভাব ফুটিয়া আছে, এবং তাহার পশ্চাতে যে একটা অনুরাগের ঔজ্জ্বল্য লুকানো রহিয়াছে তা আমার কবির চোখ বলিয়াই ধরা পড়িয়া গেল।

সেদিনও আর একটি গান শোনাইতে গিয়াছিলাম। আমি একাকী। বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখিলাম, একটা গালিচার উপর একটা সেতার পড়িয়া আছে। খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। অন্যদিন চাকরবাকর আমাকে দেখিতে পাইয়া বনসুষমাকে ডাকিয়া দেয়, আজ কেহ নাই। আমি বসিয়া অঙ্গুলী দিয়া মাঝে মাঝে সেতারের তারে আঘাত করিতে লাগিলাম। মিনিট চার পাঁচ পরেই বনসুষমা ঘরে ঢুকিল। আমাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "অমন টুং টাং করছেন কেন? একটু ভাল ক'রেই বাজান না শুনি?"

আমি সেতারটা একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, "নাঃ, থাক্।"

বনসুষমা বলিল, "কেন, থাক্‌বে কেন? আপনার মত লোক সেতার জানেন না, তা বিশ্বাস ক'রতে পারছি নে। কবি মানুষ!"

মনে মনে ভাবিলাম, কবি হওয়ার ঝঞ্ঝাট অনেক। জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিলাম, কেন, কবি হ'লেই কি সেতার জান্‌তে হবে?"

বনসুষমা বলিল, "জানাটাই স্বাভাবিক। জগতের কত তুচ্ছ জিনিষকেও যে—কবি সঙ্গীতময় ক'রে তোলেন, তাঁর হাতেত' সেতার আপনিই বাজবে?" নীলোৎপলবাবু বাজান্, আহা! কালকে আমার এখানে এসে বাজিয়ে-

ছিলেন, এখনো আমার কানে সেই ঝঙ্কার বাজছে!" বলিয়া বনসুষমা সেতারটা তুলিয়া লইল।

বনসুষমা একমনে সেতার বাজাইতে লাগিল, আর আমি যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, "বনসুষমা তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!"

গানের সঙ্গে সঙ্গে আমার যে সেতার বাজানোও প্রয়োজন, তা আমার পূর্ব্বে মনে হয় নাই। আর ওই কাঠের প্রাণহীন যন্ত্রটার মধ্যে অত দরদী সঙ্গীত থাকিতে পারে, পূর্ব্বে তাও আমার জ্ঞান ছিল না। বাঙ্গলার দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, নীলোৎপল ও বনসুষমা যখন সেতার বাজায় তখন কবি-জীবনের এটাও যে একটা উপাদান, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। তার উপর নীলোৎপল যে,—যে-রকমেই হোক্—বনসুষমার চিত্তহরণ করিবে ইহাও বা সহ্য করি কেমন করিয়া? প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি-ও সেতার শিখিয়া, বনসুষমাকে শুনাইয়া আসিব। ইহা আমার অল্পায়াসে হইবে, তা আমি আমার অল্পদিনের কণ্ঠসঙ্গীতের সাফল্যেই অনুমান করিলাম। আমি যে কবি, সঙ্গীত-বিদ্যা যে কবিদের জন্মগত সংস্কার!

বাসায় আসিয়া মনোরঞ্জনের নিকট হইতে ত্রিশ টাকা ধার লইয়া একটা বড় সেতার কিনিয়া আনিলাম, এবং কালবিলম্ব না করিয়াই, 'ডারাডারা ডিরিডিরি' সাধনা আরম্ভ করিলাম। ইহার জন্য মাসিক পাঁচটাকা দিয়া একজন মুসলমান ওস্তাদের কাছে সপ্তাহে দু'দিন সেতার শিখিতে যাতায়াত করিতেছি। কিছুদিন একপ্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্তভাবে সেতার অভ্যাস করিলাম। মাস দেড়েক পরে, আমার অনেক পীড়াপীড়িতে ওস্তাদ আমাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, আমার হাতের আঙ্গুলের মূল্য অনেক হইয়া গিয়াছে, এবং এই মূল্য সাধারণ লোক দিতে পারিবে না। ওস্তাদ যে অত্যুক্তি করিয়াছেন তা অবশ্য আমি বুঝি নাই, এমন নির্ব্বোধ নহি। তবে আমি বনসুষমাকে মুগ্ধ করিয়া দিব, এ ভরসা এবং এ আত্মপ্রত্যয় আমার খুবই ছিল।

প্রায় দুই মাস পরে, আমি আমার নিজের সেতার কাঁধে করিয়া বনসুষমা, মনসুষমা এবং পরিবারস্থ সকলকেই সেতার শোনাইয়া আসিলাম। এবং তাঁহাদের সকলকেই যে আনন্দদান করিয়াছি তা তাঁহাদের মুখচোখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম।

সেই দিন মনোরঞ্জন বলিল, "কবিবর, চলো বনসুষমার বাড়ী ঘুরে আসি।"

আমি বলিলাম, "চলো।"

রাত্রিতে খাওয়াদাওয়া করিয়া তাহাদের বাড়ীতে গেলাম। মনোরঞ্জন আমাকে বৈঠকখানায় বসাইল—না, আমিই মনোরঞ্জনকে বৈঠকখানায় বসাইলাম। হইতে পারে, মনোরঞ্জনের শ্বশুর-বাড়ী, হইতে পারে, বনসুষমা তার শালী। এ-বাড়ী আমার কাছে কমলবন, আমি কবি, কমলবন কবির নিকট শ্বশুর-বাড়ী অপেক্ষা ঢের বেশী আপনার। আর বনসুষমা! সেও মনোরঞ্জনের অপেক্ষা আমার ঢের বেশী আপনার! সে-সম্বন্ধ আমাদের হইয়াছে।

রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে—সদর দোরের কাছে একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল শুনিতে পাইলাম, এবং পরমুহূর্ত্তেই বনসুষমা আমাদের ঘরে ঢুকিল। বনসুষমার পরণে একখানা ঠিক গাছের পাতার মত সবুজ কাপড়, হাতে নানান্ রকমের গহনা, যা তাহার হাতে কোনোদিনই দেখি নাই, এবং বোধ হয় আজকালকার মেয়েরাও পরে না, এমন কি কাণে লম্বা দুল পর্য্যন্ত। পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, খালি পা, এবং পায়ে আল্‌তাই হোক্ আর যা-ই হোক্, রঙ্! ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোতে তাহার কাপড়খানা ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, এবং দীপ্ত সহাস্য মুখখানার দিকে চাহিয়া আমার মনে হতেছিল যেন পথহারা বাণী স্বয়ং! এমনি সুন্দর তাহাকে দেখাইতেছিল।

মনোরঞ্জন বনসুষমাকে বলিল, "এগুলো সব পরিবর্ত্তন না ক'রেই এসেছ?"

বনসুষমা বলিল, "হ্যাঁ, বড্ড রাত হ'য়ে গেলো, ভাবলুম, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যা করবার ক'রবো।"

বনসুষমা মনোরঞ্জনের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিল। তাহাকে উপযাচক হইয়া কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার লজ্জা হইতেছিল, এবং এরূপ লজ্জা আমার বরাবরই ছিল। আমি মনোরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা থেকে মনোরঞ্জন ?"

বনসুষমা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আজকে যে একটা নৃত্য-প্রদর্শনী ছিল। জান্‌তেন না—সহরময় এত হৈচৈ ?"

মনোরঞ্জন বলিল, "তুমি কোন্ কোন্ নাচ দেখালে, বনসুষমা ?"

বনসুষমা বলিল, "প্রথমে বিলাস-নৃত্য, তারপরে হর-পার্ব্বতী নৃত্য। সেই সাজত' এখনও কিছু কিছু রয়েছে। তুমি গেলে না কেন, রঞ্জন দা' ?"

মনোরঞ্জন বলিল, "শরীরটা তত সুবিধের ছিল না। তোমার নাচত' অনেকবারই দেখেছি। তা সেই বিখ্যাত ফরাসী ড্যান্‌সার—কি নামটা ভাল ?—নাচলে কেমন ?"

"অনির্ব্বচনীয়! সত্যি তোমার মত একজন সমালোচকের দেখা খুবই উচিত ছিল। এত সুন্দর তা ব'লতে পারছি নে।"

খানিক চুপ করিয়া বনসুষমা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "সমস্ত চারুশিল্পের ভেতর নাচ-ই শ্রেষ্ঠ, কি বলেন ? শরীরের লীলায়িত ভঙ্গী দিয়ে, মনের যত কিছু সৌন্দর্য্য, তার বিকাশ দেখানো—এ কি কম কবিতা, কম শিল্প! ওই ফরাসী নর্ত্তকের নাচ দেখ্‌তে দেখতে ভাবছিলুম, কবি ত এই! কবিতা ত এই-ই!"

মনোরঞ্জন বলিল, "নিশ্চয়! আর আজকাল একটা নাচের হাওয়া এসেছে। নাচতে আরম্ভ করেছে সকলেই। বিশেষ কবি-সাহিত্যিকেরা। নীলোৎপল ত শুনছি আজকাল সুন্দর নাচচে। তুমি নাচো না কেন, অনিল ?"

আমি বলিলাম, "ও আমার অভ্যেস নেই।"

মনোরঞ্জন বলিল, "অভ্যেস ক'রলেই ত পারো ? কবি লোক তোমরা! এগুলো তোমাদের যে দরকার!"

বনসুষমা বলিল, "আপনি নাচ জানেন না কি ?"

আমি বলিলাম, "জানি বটে—তবে—"

বনসুষমা বলিল, "বেশত' একদিন আমাদের দেখান না ?"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, একদিন হবে।"

হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বনসুষমা যা বলিয়াছে তা যথার্থই সত্য—শরীরের লীলায়িত ভঙ্গী দিয়ে মনের যত সৌন্দর্য্য তার বিকাশ দেখানো শ্রেষ্ঠ শিল্প। বাস্তবিকই নাচের একটা হাওয়া আসিয়াছে—বাঙ্গলার সৌখীন সমাজ আজ নাচিতেছে। বিশেষ, আমার মত কবি-সাহিত্যিকগণ। বনসুষমা নাচে, নীলোৎপল নাচে, আরো অনেকে-ই নাচে তা আমার জানা ছিল। আর বনসুষমার মতে যদি নৃত্য শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়, তা হইলে, আমার কবিজীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ। কিন্তু এত বয়স পর্য্যন্ত কখনোত' নাচি নাই ? এখন কাব্যচর্চ্চা করিয়া পা ভারী হইয়া গিয়াছে। ব্যায়ামের অভাবে শরীরের আয়তন বাড়িয়া গিয়াছে। এই স্থূল বপুটাকে লইয়া সূক্ষ্ম শিল্প দেখাইতে পারিব কি ? পারিব না কেন ? নিশ্চয় পারিব—কবি আমি, শিল্পে আমার জন্মগত অধিকার। সেই দিনই সমস্ত রাত্রি আলো জালিয়া ঘরের দোর জানালা বন্ধ করিয়া, দর্পণের সম্মুখে শরীরের লীলায়িত ভঙ্গী দিয়া আমার মনের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য বিকশিত করিতে লাগিলাম। প্রত্যূষে গায়ে ব্যথা হইল, তথাপি সাধনা হইতে বিরত হইলাম না। বনসুষমা হরপার্ব্বতী নৃত্যের কথা বলিয়াছে। আমি মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া রাসনৃত্য নামে এক নৃত্য আবিষ্কার করিয়া, তাহাতে রূপ দিতে লাগিলাম। কি সে সাধনা! সকালে নাচিয়া নাচিয়া ঘুম হইতে উঠি, খাইতে খাইতে পা সুড়সুড় করে এবং অভুক্ত অন্ন রাখিয়াই কতদিন নাচিয়া উঠিয়াছি! অর্দ্ধেক রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, খানিক নাচিয়া লই, তারপর আবার শয্যাগ্রহণ করি! এই একনিষ্ঠ তপস্যার ফল ফলিল। সুন্দর নাচিতে শিখিলাম। একদিন মনোরঞ্জনকে নিভৃতে নাচ দেখাইলাম। সে বলিল,—অবশ্য বন্ধুর মত পরিহাস করিয়া—এই নাচ কত শত যুগ পূর্ব্বে একদিন বৃন্দাবনে কালিন্দীতটে জ্যোছনা রাত্রে হইয়াছিল, আর

কত শত যুগ পরে সেই নাচ কলেজ-হোষ্টেলের এক নিভৃত কক্ষে হইতেছে! আর তাহারই অনুরোধে, পরদিন-ই বনসুষমাকে এই রাসনৃত্য দেখাইতে গেলাম।

বনসুষমাকে নাচ দেখাইতে উঠিয়া আমার মুখচোখ নববধূটির মত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আবার ঘরে শুধু বনসুষমা নয়—একঘর লোক—বনসুষমা, মনসুষমা, মনোরঞ্জন, তাহার ক্ষুদ্র দু'টি শ্যালক, পরে তাহার বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিলেন। যাহাই হোক্, সাহস করিয়া লাগিয়া গেলাম। মনোরঞ্জনের সকল তাতেই একটু বাড়াবাড়ি ছিল, সে সত্যসত্যই একটা বাঁশের বাঁশী আনিয়া হাজির করিল, শ্রীকৃষ্ণের মত ফেরু দিয়া একখানা হরিদ্রা রঙ্গের কাপড় পরাইল,—রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণের সকল বেশভূষাটা-ই চাই,—এবং আমার কানে কানে বলিয়া দিল, শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যের প্রধান বস্তু রাধিকাটি উপস্থিত বড় দুষ্প্রাপ্য, সেটি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। মনোরঞ্জন জানিত না,—শুধু বোধ হয় অন্তর্য্যামীই জানিতেন,—আমার ভাব-বৃন্দাবনের রাধিকা কল্পনার নয়, সে মূর্ত্তিমতী—ওই আমার সম্মুখে নাচ দেখিবার জন্য বসিয়া। রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাধার মুখের দিকে চাহিয়া বিভোর হইয়াছিলেন, আমিও তেমন বনসুষমার মুখের দিকে চাহিয়া বিভোর হইয়া নাচিলাম। নাচের শেষে বনসুষমা আমাকে প্রচুর জলযোগ করাইল। ফিরিবার সময় সে দোর পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আমাকে আর একদিন নাচ দেখাইবার জন্য বারংবার কাতর অনুরোধ জানাইল।

প্রায় মাসখানেক পরে। রাসনৃত্য দেখাইয়াছি, এই বার কুঞ্জনৃত্য বলিয়া আর একটা অভিনব নৃত্য দেখাইব বলিয়া বনসুষমার বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। যাইতেছি কবিজনোচিত বেশে—ইতিমধ্যে বেশ অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। পায়ে নাগরা জুতা, চোখে চশমা, চুল পুরাদস্তুর বাবরী, অগ্রহায়ণের শীতের সন্ধ্যায়ও গায়ে অতি সূক্ষ্ম সিল্কের পাঞ্জাবী। দোরে চাবিকুলুপ দিতে দিতে দেখিলাম, ঘরের সম্মুখে বারান্দায় ছেলেরা একখানা মাসিক-পত্রিকা লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতেছে। শুনিলাম, ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়—এ-মাসে বনসুষমা মজুমদারের একটা ছোট নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছে। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমি পত্রিকাখানা লইয়া নাটিকাটা পড়িতে লাগিলাম। সব পড়ি নাই, তবে যতটুকু পড়িয়াছি তার আখ্যানভাগটুকু বলিতেছি।

"একটা বামন এক রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিত। অদ্ভুত চেহারা ছিল ওই বামনটির। ওই অদ্ভুত চেহারা দেখিতে রাজকুমারীর বড়ই ভাল লাগিত। রাজকুমারী সখীদের লইয়া, প্রাসাদকক্ষের বাতায়ন খুলিয়া, বামনটিকে দেখিত এবং সখীদের লইয়া হাসিয়া কুটোকুটি হইত। বামন ভাবিল, রাজকুমারী তাহার প্রেমে পড়িয়াছে। সে কবিতা,—বিশেষ করিয়া, প্রেমের কবিতা লিখিয়া রাজকুমারীকে শুনাইত। রাজকুমারী অন্তর্নিহিত অসংবরণীয় হাসি কোনোমতে চাপিয়া রাখিয়া এমন ভাব দেখাইত, যেন সে বামন কবির কবিতায় মুগ্ধ! কবিতা ছাড়িয়া বামন তাহার বিচিত্র কণ্ঠস্বরে ততোধিক বিচিত্র স্বরে, মহাকোলাহল করিয়া গান শুনাইল। তারপর কোথা হইতে একটা বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করিয়া অঙ্গুলি দিয়া তাবে নানাবিধ শব্দ উৎপাদন করিয়া শুনাইল। রাজকুমারী এমন ভাব দেখায়, যেন সে একেবারে আত্মহারা। আনন্দে এবং প্রেমে অধীর হইয়া বিকৃতমস্তিষ্ক বামন একদিন রাজকুমারীর সম্মুখে তাহার বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করিয়া নাচ দেখাইতে লাগিল—"

আর পড়ি নাই। কারণ, মাথা ঘুরিতে লাগিল। এতদিন আমিই তাহা হইলে বনসুষমার নাটিকার উপাদান যোগাইয়াছি! হায়, কি নির্ব্বোধ আমি, এতবড় ছলনা এতদিনেও ধরিতে পারি নাই!

শুনিলাম, সেইদিন য়ুনিভার্সিটিতে আমাদের ইংরাজীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমি এতদিন কাব্যলোকে বাস করিতেছিলাম, কাজেই বাস্তব জগতের কোনো সংবাদই রাখি নাই। ঠিক করিলাম, কালই দাদাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিব যে, আর পড়াশুনা করিব না, দেশে গিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখিব।

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য

ফুলদোল

শ্রীহরিপদ গুহ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভারতী

সেদিন দুপুরবেলা স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। নটবর সবেমাত্র বাড়ী ঢুকিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কোমরের গামছাখানা দিয়া মুখের ঘাম মুছিতেছিল, এমন সময় বিলাসী দাওয়ায় দাঁড়াইয়া কাংসকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল: 'বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়, এখন নাটসাহেব বাড়ী এলেন! আমি পাতে দেব কি এখন? কাল থেকে ব'লে ব'লে হায়রান হ'য়ে গেলুম যে, চাল বাড়ন্ত; তা' বাবুর হুঁসই নেই। আমি আর কি করব? থাকো আজ উপোস দিয়ে। রোজ রোজ ধার দেবে কে?'

নটবর স্ত্রীর এই তিরস্কারের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না। তাহার দিকে তাচ্ছিল্যভরে একবার চাহিয়া সে গভীর মনোযোগ-সহকারে তাম্রকূট সেবনে মন দিল।

তাহার এই উপেক্ষায় বিলাসীর চিত্ত একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া সে স্বামীকে গালিগালাজ করিতে লাগিল। ক্রমেই তাহার গলার পর্দা খাদ হইতে পঞ্চমে এবং শেষে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল।

নটবরের অন্তরের পুরুষ সিংহটা তখন গর্জ্জিয়া উঠিল। সে স্ত্রীর দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া বলিল: 'চুপ কর্ বল্‌ছি! এই রদ্দুরে তেতেপুড়ে এলুম, কোথায় একটু জল আগিয়ে দিয়ে বাতাস কর্‌বি, না ষাঁড়ের মত চীৎকার আরম্ভ ক'রে দিয়েছিস। বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের কত পতিভক্তি! দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়। এ মাগী ছোটলোক কি না, তা' ভাল হবে কোত্থেকে!"

বিলাসী মুখ বাঁকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল: 'ইস্, ভারী পতিভক্তি দেখাচ্ছিস্! বাবুদের কথা যে বল্‌লি, পারিস্ তাদের মত এক গা গয়না দিতে? মুরোদ ত বড়! পতিভক্তি অম্‌নি আসে? একবেলা ভাত দেবার ক্ষেমতা নেই, আবার মুখনাড়া! বিষ নেই তায় কুলোপানা চক্কোর! আমি খেটেখুটে এনে দি' তাই ত পিণ্ডি গেলো।'

কথাটায় নটবরের রাগের মাত্রাটা আরও চড়িয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল: 'চুপ রও! মুখে মুখে চোপরা! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, জান না?'

বিলাসী তাহার কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে বলিল: 'তবে রে অধঃপেয়ে মিন্সে, চুপ করব তোর ভয়ে। আয় না, মুখ ছিঁড়বি আয় না। দেখি, তোর তেজ কত? ক' জোড়া জুতো আছে বার কর না একবার!'

এতটা অপমান কোন স্বামীরই সহ্য হয় না, নটবরও সহ্য করিতে পারিল না। সে তাহার হাতের হুঁকাটাকে সজোরে স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। কল্কেটা মধ্যপথেই ছিটকাইয়া পড়িল, হুঁকাটা সশব্দে তাহার গায়ে লাগিয়া দাওয়ায় পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

বাস্, আর যায় কোথা! ঘরের কোণে নূতন ঝাঁটা-গাছটা দাঁড় করান ছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া পাগলের মত বিলাসী সজোরে স্বামীর পিঠে ঘা কতক বসাইয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

* * * *

ইহারা জাতে গোয়ালা। তবে জাত-ব্যবসা করে না। বিলাসী লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করে; তাহাতেই কোন-রকমে কায়ক্লেশে সংসার চলিয়া যায়। নটবরের বাঁধাধরা কোন কাজ নাই, করেও না। না করিলেও সন্দেশ সে যা' করিতে পারে, দই পাতিবার কায়দা তাহার এমনই অদ্ভুত যে, কাজ-কর্ম্মে দূর গ্রামান্তর হইতেও লোক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করিয়া

দেয়; কিন্তু এমনই কুঁড়ের মরণ যে, দশঘর ফিরাইয়া একঘরেও সে যায় কি না সন্দেহ।

এইখানেই বিলাসীর দুঃখ এবং তাই লইয়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা লাগিয়াই আছে—কিন্তু হাতাহাতি এই প্রথম।

ঝাঁটা বেশ ভাল করিয়াই নটবরের পিঠে পড়িয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যেকটা কাঠির দাগ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। লজ্জায় দুঃখে অভিমানে সে একেবারে কেমন হইয়া গেল। তাহার দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। সে তখনই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

এতটা কিন্তু বিলাসীরও অভিপ্রেত ছিল না, এ অপকর্ম্ম করিয়া সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। তাহার উপর মারের বদলে তাহাকে প্রহারে প্রহারে একেবারে শেষ করিয়া না ফেলিয়া অমন নিঃশব্দে স্বামীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

* * * *

সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও নটবর বাড়ী ফিরিল না। একটা অজানিত আশঙ্কায় বিলাসীর মন তখন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, তাহার উৎকণ্ঠা ততই বাড়িয়া চলিল। ভীতি-ব্যাকুল-দৃষ্টিতে সে কেবলই পথের পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সারাদিন সে জলস্পর্শ করে নাই। স্বামী রৌদ্রে তাতিয়া-পুড়িয়া আসিয়া অভুক্ত অবস্থায় বাহির হইয়া গিয়াছে—ফিরিয়া আসিলে তাহার পাতে সে দিবে কি? ঘরে ত একমুষ্টিও অন্ন নাই।

আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না, কিঞ্চিৎ চাউল সংগ্রহের আশায় তখনই বাহির হইয়া পড়িল।

পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে রাখালের মায়ের বাস। সে তাহার নিকট হইতে কিছু চাউল ধারস্বরূপ লইয়া আসিল। তারপর তাড়াতাড়ি একটা ভাতে ভাত রাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল—যেন স্বামী আসিলেই সে বাড়িয়া দিতে পারে।

* * *

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। নটবর কিন্তু বাড়ী ফিরিল না।

ঘুমে বিলাসীর দুই চোখ ঢুলিতে লাগিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। মাটীতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। তারপর আধ ঘুমে আধ জাগরণে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল।

গতকল্য সমস্ত দিনরাত বিলাসীর উপবাসে কাটিয়াছে, সেজন্য ক্ষুধার উদ্রেকও হইয়াছিল যথেষ্ট। একটা নিষ্ফল আক্রোশে সে জ্বলিতে লাগিল। সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল নিষ্ঠুর স্বামীর উপর। তাহার উদ্দেশে সে আজ আবার বকাবকি সুরু করিয়া দিল।

একপ্রহর বেলাতেও যখন নটবর বাড়ী ফিরিল না, বিলাসী তখন আর তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। স্নান সারিয়া উঠিয়াই সে একথাল পান্তা লইয়া খাইতে বসিয়া গেল। কিন্তু খাইতে বসিয়া গলায় বাধিয়া যাইতে লাগিল। সে তখন থালাসমেত ভাত পুকুরে ঢালিয়া দিয়া আসিল।

* * *

দেখিতে দেখিতে চার পাঁচদিন অতীত হইল, কিন্তু নটবর সেই যে গিয়াছে, আর বাড়ী ফিরে নাই।

বিলাসী প্রথম দিন দুই ভাবিয়াছে, এখন আর ভাবে না। সে যে বাড়ীতে কাজ করিত, আবার সেখানে তাহা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সারাদিন ত নিশ্বাস ফেলিবারই অবসর পায় না, স্বামীর কথা ভাবিবে কি? হাড়ভাঙা খাটুনীর পর রাত্রে শয্যায় শুইতে-না-শুইতেই সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এমনই করিয়া এই কয়টা দিন কাটিয়া গিয়াছে।

সেদিন খুব সকালে বিলাসী কাজ করিতে ঠাকুর-বাড়ী যাইতেছিল, পথে হারাণ চৌকীদারের সঙ্গে দেখা।

সে বলিল : 'তোমাকে এখনই একবার নদীর ঘাটে যেতে হবে।'

বিলাসী বিরক্তিভরে প্রশ্ন করিল : 'কেন ?'

হারাণ যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—নদীর ঘাটে আজ একটা পচা মড়া ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহার দেহ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। তবে অনেকে সন্দেহ করে উহা নটবরের, তাই দারোগাবাবু সনাক্ত করিবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

কথাটা শুনিয়াই বিলাসীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। এতবড় অমঙ্গলের কথা সে ত স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই! ভয়-ব্যাকুল-হৃদয়ে উন্মাদিনীর মত সে চৌকীদারের সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

নদীর ঘাটে লোক আর ধরে না।

একটা বটগাছের নীচে মৃতদেহটা পড়িয়া আছে, চারিদিকে কৌতূহলী দর্শকের ভীড়।

হারাণ দারোগাবাবুকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল : 'হুজুর, এই নটবরের স্ত্রী, বিলাসী।'

বিলাসী ঘোমটাটা একটু টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

দারোগাবাবু তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন : 'তোমার স্বামীর নাম নটবর ?'

বিলাসী মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

দারোগাবাবু তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : 'সে কি ক'দিন আগে তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে গেছে ?'

বিলাসী কি বলিল, ঠিক্ বোঝা গেল না। হারাণ তাহার নিকটে গিয়া বলিল : 'হ্যাঁ, হুজুর।'

দারোগাবাবু বলিলেন : 'দেখো ত এটা দেখে চিন্‌তে পার কি না ? এটা নটবরের বলে মনে হয় কি ?'

মৃতদেহ দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। উহা ফুলিয়া পচিয়া একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বিলাসী ভাল করিয়া শবের দিকে চাহিতেও পারিল না, অশ্রুভারে চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিল।

দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই উহা নটবরের শব বলিয়া সনাক্ত করিল। বিলাসী একটা কথাও কহিতে পারিল না, কাঁদিয়াই আকুল হইল।

মৃতের কোমরে একটা গামছা বাঁধা ছিল। হারাণ চৌকীদার সেখানা খুলিয়া বিলাসীকে দেখাইল সেটা নটবরের কি না ?

নটবরের গামছাখানাও ঠিক্ এই রকমই ছিল, বিলাসী তাহা স্বীকার করিল।

তখন উহা যে নটবরের মৃতদেহ, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

দারোগাবাবু রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া লাস জ্বালাইবার অনুমতি দিয়া গেলেন। গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—নটবর স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া মনোদুঃখে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

নটবর যে বিলাসীকে এতবড় শাস্তি দিয়া যাইবে, ইহা সে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবে নাই। কেন সে মরিতে সেদিন তাহার সহিত ঝগড়া করিতে গিয়াছিল ? ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে কি-একরকম হইয়া গেল।

* * *

বছর দুই পরের কথা।

স্বামী বিয়োগ-বিধুরা বিলাসীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহাকে দেখিলে আর চেনা যায় না। চেহারা একেবারে কালিমাখা হইয়া গিয়াছে। স্বামীর শোক সে ভুলিতে পারে নাই। সে বেশ জানে—নিজের দোষেই পতিকে হারাইয়াছে, তাই অনুতাপের তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছিল।

সেবার ঠাকুর-বাড়ীর বড় গিন্নী তীর্থ করিতে কাশী যাইবেন। তিনি বিলাসীকে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন : 'তুই চল্ বিলাস, আমার সঙ্গে। সেখানে গেলে মনে শান্তি পাবি। বাবা বিশ্বনাথ তোর সব দুঃখু-কষ্ট ভুলিয়ে দেবেন। তোর যাবার খরচ লাগ্‌বে না; মাইনে যা' পাচ্ছিস্, সেই চারটাকা করেই পাবি। যাবি ?'

এতবড় সুযোগ বিলাসীর ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। সে

রাণীবালা দেবী।

তাহার সহিত যাইতে সম্মত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এবার বিশ্বনাথের চরণে পড়িয়া নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইবে।

* * *

কাশী বিলাসীর বেশ ভালই লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর বড় গিন্নীর সহিত সে আরতি দেখিতে যাইতেছিল। হঠাৎ একখানা মিষ্টান্নের দোকানে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার পা দু'খানা যেন একেবারে অচল হইয়া গেল। বিলাসী অপলক দৃষ্টিতে শুধু সেইদিকেই চাহিয়া রহিল। একজনের চেহারার সহিত আর একজনের এমন মিলও থাকে—সেই মুখ, সেই চোখ, বসিবার ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত সেই এ কই রকম!

হঠাৎ স্বামীর স্মৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু নিজের হাতে যাহাকে চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার চিন্তার মত বাতুলতা আর কি হইতে পারে?

গিন্নী-মা বলিলেন: 'কি হ'ল বিলাস, দাড়ালি কেন?'

'কি যেন পায়ে ফুটল মা, তাই। চলো, যাচ্ছি এইবার।' বলিয়া বিলাসী পা চালাইয়া দিল।

* * *

বৈশাখী-পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার বন্যায় সারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যেন মিতালী-উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। কাশীতে আজ ছোট দোল। সহরের বুকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আজ বেচা-কেনারও অন্ত নাই।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। লোকজনের আর আসিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া একজন দোকানী টাট হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল: 'দোকান বন্ধ হ'ল না কি দোকানদার?'

দোকানী সে স্বরে শিহরিয়া উঠিল! চাহিয়া দেখিল, একটী স্ত্রীলোক। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল: 'হুঁ। কিছু চাই না কি?'

'না চাইলে এত রাত্রে কেউ দোকানে আসে কি?' বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকটী একেবারে দোকানীর পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

চঞ্চল হইয়া দোকানী বলিল: 'আজ্ঞে, আপনি!'

'না, তুমি।' বলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া রমণী পুনরায় কহিল: 'কাশীতে এসে লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম করে, কিন্তু আমার এমন পোড়া কপাল যে, অ[illegible] তেই ছুটে এলুম। গিন্নী-মাকে ঘুম পাড়িয়ে চোরের মত পালিয়ে এসে— এখন এখানে থাকতে না দিলে যাই কোথায় [illegible]'

দোকানী বলিতে যাইতেছিল, চুলোয়! কিন্তু বলা হইল না; ভাল করিয়া আগন্তুকার দিকে চাহিতেই তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

রমণী বলিল: 'অমন ক'রে কি দেখছ বলো ত? চেনা কি না? চেনা নেই গো, চেনা নেই; যদিও একটু-আধটু থাকে, সে মরেছে! বাবার দয়ায়—'সে আর কথা বলিতে পারিল না, চোখের বড় বড় কয়েকটা ফোটায় দোকানীর পা দু'টা ভিজাইয়া দিল।

দোকানী ডাকিল: 'বিলাসী!'

ধরাগলায় বিলাসী বলিল: 'বিলাসী নয়, দাসী বলেই ডেকো আমায়। সেদিন তোমায় এখানে প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকে যে কি হ'য়ে আছি, তা' আর কি বলব। আশপাশের লোকের কাছে খোঁজ নিয়ে সেদিনই আসতুম; আসি নি ভয়ে—যদি পায়ে না স্থান দাও। কিন্তু আজ বছরের শুভদিনে মানুষ মানুষকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারে না, সেই ভরসাতেই শুধু চ'লে এসেছি! বলো, তুমি আমায় ক্ষমা করলে?'

'দূর পাগ্‌লী, ক্ষমা করব কেন? অমনটা হয়েছিল বলেই ত এখানে এসে দু'পয়সা ক'রে খাচ্ছি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সত্যি-সত্যিই মরতে চলেছিলাম—তোর এয়োতের জোর আছে, তাই আর মরা হ'ল না। পথে এক বুড়োর সঙ্গে দেখা। কি জানি তার কি দয়া হ'য়ে গেল—সঙ্গে ক'রে এনে একেবারে এই দোকানে আমায় বসিয়ে দিলে। তারপর সে ম'রে গেলে মালিক হলুম আমি। পেলুম টাকা, সঙ্গে সঙ্গে তোকেও। কিন্তু ক'দিন থান কাপড় পরেই যেন তোকে এপথ দিয়ে যেতে দেখেছি না?— তাই চিনেও চিনি নি। বাঃ, বার বছর পার হ'তে-না-হ'তেই একেবারে ঝাড়া হাত পা!'

'কি বাজে বকো!' বলিয়া বিলাসী তাহার আবীর-রাঙা মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।

শ্রীহরিপদ গুহ

উপন্যাস
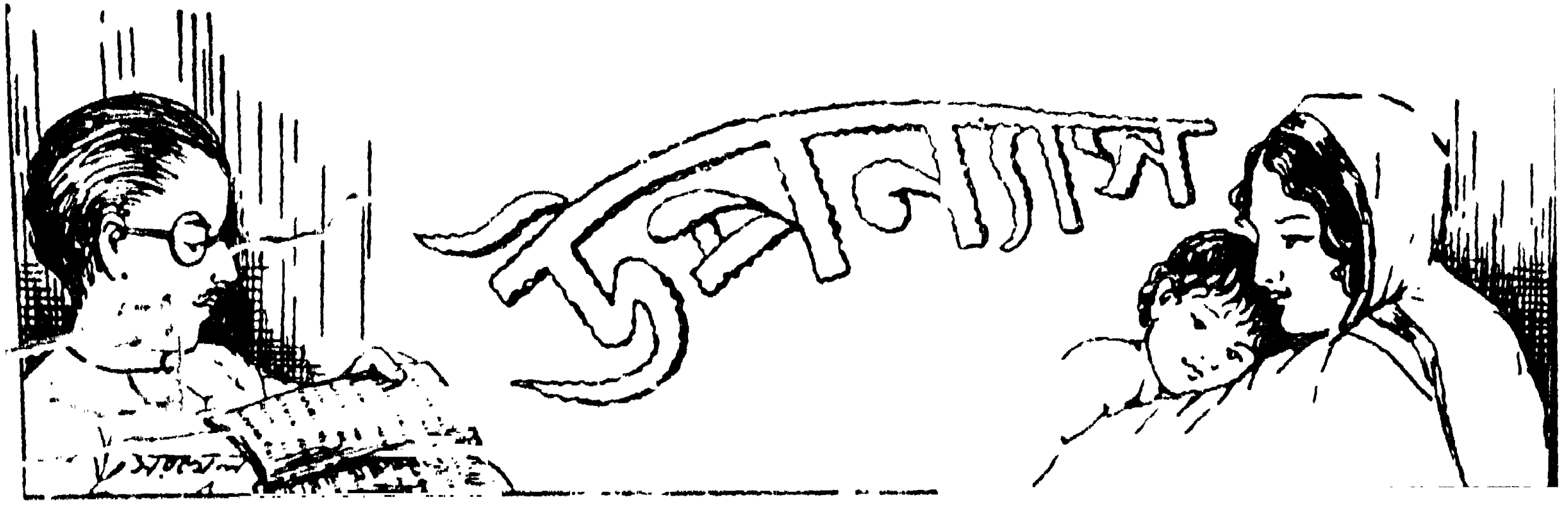
অভিশপ্তা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

তেরো

—আজ একেবারে সব ঠিক্‌ঠাক্ করে' এলুম রেখা, জান্‌লে? এ কি, ঘর অন্ধকার কেন?

—মাথাটা বড় ধরেছিল তাই—

রেখা তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল। তার গলাটা ভার ভার।

সুনীত ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—মাথা ধরেছে! তা' হ'লে উঠো না, শুয়ে থাকো। আমি একটু পরে—

—না, এখন কমে গেছে, তুমি বসো সুনীত দা'! আলোটা...

ছোট সবুজ আলোটার সুইচ খুলে দিয়ে সুনীত রেখার কাছে এসে তার দিকে চাইতেই চম্‌কে উঠ্‌ল! রেখার কেশবেশ বিপর্যস্ত, বিবর্ণ ক্লিষ্ট মুখ, পাংশু অধর, দীপ্তিহীন চক্ষু, দেখে মনে হয় যেন কতকালকার রোগী!

ঘণ্টাকতক আগে সুনীত যখন দেখে গেছে রেখা তো তখন বেশ ভালই ছিল, এরি মধ্যে...

—ইস্! মাথাটা বড্ড বেশী ধরেছে, না?

—হ্যাঁ, ধরেছিল, কিন্তু এখন...

—এখনো সারে নি, তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে। তুমি শুয়ে পড়ো রেখা! কপালে রগে একটু 'মেন্থল' ঘ'ষে দিই আস্তে আস্তে, তা' হ'লে আরাম পাবে।

—'মেন্থল' দেবার দরকার নেই আর, তুমি আমার কাছে বসো সুনীত দা'! তা' হ'লেই হবে।

বুকের ভেতর গুম্‌রে-ওঠা দীর্ঘশ্বাসটা সবলে প্রতিরোধ করে রেখা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। তার ক্লান্ত উদাস কণ্ঠস্বরে শুধু ব্যথাই নয়, কিসের একটা ব্যাকুল আবেগ প্রচ্ছন্ন ছিল যেন।

—এই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি কর্‌ছি আমি। চলো, কালই বেরিয়ে পড়া যাক্।

—কোথায়?

—পুরীতে। ভেবে দেখ্‌লুম, পুরীতে যাওয়াই সুবিধে।

সুনীত চেয়ারখানা খাটের কাছে টেনে বস্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় রেখা বল্‌লে—উহুঁ, ওখানে নয়, এইখানে বসে' আমার কপালে এমনি একটু হাত বুলিয়ে দাও দেখি।

বালিসটা সরিয়ে দিয়ে সে সুনীতের বস্‌বার জায়গা করে' দিলে।

সুনীতের বড় আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। তাকে কাছে পাবার জন্য এত ব্যগ্রতা, এমন ব্যাকুলতা রেখা কোনদিন প্রকাশ করে নি তো! মরণাপন্ন রোগে যখন শয্যাগত হয়ে পড়েছিল, তখনও তো সুনীতের এতটুকু সেবা নিতে কত কুণ্ঠিত হয়েছে—সেই রেখা আজ এমন ক'...

শুধু বিস্ময় নয়, একটুকু আশা-পুলকের মৃদু মধুর শিহরণ স্নীতের নিভৃত মরম-তলে চকিতে খেলে গেল।

বিছানায় বসে' রেখার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে বল্‌লে—পুরীতে গেলে সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার শরীর নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে রেখা!

রেখা কিছু না বলে' চোখ বুজিয়ে শুয়ে রইল চুপটী করে'। পৃথিবীতে তার এই একমাত্র দরদের দরদীর আন্তরিকতাপূর্ণ মমতা-করুণ স্পর্শটুকু সে যেন আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ কর্‌তে চায় নিবিড়ভাবে।

সবুজ বাতির স্তিমিত স্নিগ্ধ আলো তার শুভ্র নিথর মুখখানির করুণ সৌন্দর্য্য আরো করুণতর করে' তুলেছিল। সেদিকে বিহ্বলভাবে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে স্নীতের মনে হ'ল, এ মুখ তার নিজস্ব—একান্ত,—তার অতর্কিতে হারিয়ে-যাওয়া অঞ্চলের নিধিটীকে ফিরিয়ে দেবার জন্যেই বুঝি দয়াল ভাগ্য-বিধাতার এই সংঘটন!

একটা গভীর নিশ্বাসের শব্দে চকিত হয়ে স্নীত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—একটু আরাম লাগ্‌ছে?

—হ্যাঁ, বড্ড!—তুমি কাছে থাক্‌লে আমি এত অশান্তির মধ্যেও একটু শান্তি পাই স্নীত দা'!—সত্যি বল্‌ছি। কিন্তু ভয় করে তোমাকে কাছে রাখ্‌তে—

স্নীতের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠ্‌ল। উচ্ছ্বল হৃদয়াবেগ কষ্টে রোধ করে' সে গাঢ়স্বরে বল্‌লে—এবার আমি তোমার কাছেই থাক্‌ব রেখা, এখানে কাজের ভীড়ে হয়ে ওঠে না, কিন্তু—

—না, না, তুমি আমার কাছে থেকো না স্নীত দা'! আমার ছায়াও স্পর্শ করো না,—তুমি জানো না আমি—আমি যে কত......

কপালের ওপর রাখা স্নীতের হাতখানা ব্যাকুল আগ্রহে চেপে, তার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রেখা ত্বরিতে বলে' উঠ্‌ল—এমন করে' আর মায়ায় জড়িয়ো না স্নীত দা'! আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, দু'টী পায়ে পড়ি তোমার! এবার যেতে দাও আমাকে—

—কোথায়? তুমি কোথায় যেতে চাও রেখা?

—যেতে চাই না, কিন্তু যেতেই হবে যেদিকে দু' চক্ষু যায়। যেতে যে পার্‌ছি না—শুধু তোমার···না না, আমাকে আর আদর করো না, যত্ন করো না স্নীত দা'! তুমি আমাকে দূর করে' দাও, নইলে আমার ছোঁয়াচ লেগে...

—কি বল্‌ছ রেখা! আমার চিরদিনের কামনার ধনকে কাছে পেয়ে দূর করে'দেব, আমি কি এমনি পাগল? তবে তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও...না, তা' হ'লেও আমি ছেড়ে দেব না রেখা! তোমাকে আমি...

স্নীত উদ্বেলিত অধীর আবেগে রেখাকে বুকে টেনে নিতে গেল, কিন্তু রেখা তার উদ্যত হাত দু'খানা সরিয়ে দিয়ে ত্রস্তে উঠে বস্‌ল। তার বিবর্ণ সন্ত্রস্ত মুখের পানে বিমূঢ়ের মত খানিক চেয়ে থেকে স্নীত সলাজ-সঙ্কোচে বল্‌লে—আমার দুর্ব্বলতার জন্য মাপ্ চাইছি রেখা! আমার ভুল হয়েছিল—আমি মনে করেছিলুম, তোমাকে এবার···

—না, না, ভুল তোমার হয় নি, হয়েছে আমারি! তুমি আমাকে এত করে' কেন বাঁচালে স্নীত দা'! মর্‌ছিলুম তো, মর্‌তে দিলে না কেন? আমাকে তুমি কেন এত···

রেখা সহসা স্নীতের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে' ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল। এ কান্না কিসের?

* * * *

রাত হয়েছে বেশ। রেখার ঝি ঘরের মেঝেয় পাতা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। রেখা ঘুমোয় নি তখনো। সে রাইটিং-টেবিলে আলোর কাছে বসে' কি লিখ্‌ছিল। একটুখানি লেখে, আবার গালে হাত্ দিয়ে ভাবে। চোখ তার জলে ভরে' আসে থেকে থেকে। এক-একবার চম্‌কে উঠে এদিক-ওদিক চায়, শঙ্কিতভাবে—ঘরের দরজা বন্ধ তবুও।

তার মুখ-চোখের ভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হচ্ছিল—কখনো আতঙ্ক, কখনো বেদনা, কখনো উত্তেজনায়। এমনি করে' যে কয়টী ছত্র লেখা হয়েছিল, রেখা তাই পড়তে লাগ্‌ল একবার, দুবার—আবার কি মনে করে'

কাগজখানা প্যাড থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কুটিকুটি করে' ফেলে দিলে।

তারপর নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে দুয়ার খুলে দালানে বেরিয়ে এলো। সেই দালানেই রেখার ঘরের ঠিক পাশে নয়, মাঝে একখানা ঘরের ব্যবধানে সুনীতের শয়ন কক্ষ। জানলার সার্শী থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। সুনীত কি এখনো জেগে? তবে তো—

রেখা ধীরে ধীরে সেই দিকে চল্‌ল। প্রতি পদক্ষেপে তার বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়ে যেন।

দুয়ারের কাছে এসে সে থম্‌কে দাঁড়াল—দরজা বন্ধ যে! রুদ্ধ কবাট একবার স্পর্শ করেই রেখার কম্পিত হস্ত যেন শ্লথ অবশ হয়ে ফিরে এলো। আস্তে আস্তে সরে গিয়ে জান্‌লার সার্শীতে উঁকি মেরে দেখ্‌লে—সুনীত জেগে নেই, ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতে তার খবরের কাগজ। কাগজখানা পড়তে পড়তেই তন্দ্রা এসে গেছে বোধ হয়। একটুখানি সাড়া পেলেই উঠে পড়বে—কিন্তু...রেখার ভরসা হ'ল না।

যদি সুনীতের সাক্ষাতে নিজেকে সাম্‌লে রাখ্‌তে না পারে, যদি সুনীত তাকে ভুল বোঝে......না, থাক্!—রেখার সে শক্তি নেই, সাহসও নেই—

সন্তর্পণে সার্শীতে চোখ দুটো রেখে, নিশ্বাস রোধ করে' দেখ্‌তে লাগ্‌ল তন্দ্রাতুর সুনীতের সৌম্য প্রশান্ত মুখচ্ছবি। সুপ্ত অবস্থাতেও সে মুখে স্নেহ মমতা করুণা যেন ঝরে' পড়ছে। ঠোঁটের কোণে অম্লান স্নিগ্ধ হাসিটুকু যেন তখনো লেগে রয়েছে।

ঘন-স্পন্দিত বক্ষে, পলকহারা নয়নের অতৃপ্ত দৃষ্টিতে কতক্ষণ দেখে দেখে সুগভীর আর্ত্ত একটা নিশ্বাস ফেলে রেখা আবার ফিরে এলো। কিন্তু ঘরে আর ঢুকল না, ঘরের সাম্‌নে দালানের জোড়া থামের গায়ে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। গেটের কাছে লাইট আছে, কিন্তু বাগানের দিক্‌টা অন্ধকার।

ছোট বাগানখানি। ফুলের গাছই বেশী, তার মধ্যে বড় ঝাউ গাছ দু'টী যেন সহনাতীত বেদনায় নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আঁধারে নিজেকে গোপন করে মৌন বিষাদের সুগম্ভীর করুণ ছবির মত। তার মাথার ওপর কয়েকটা নক্ষত্র বড় উজ্জল হয়ে ফুটে আছে—অনলস নৈশ প্রহরীর সতর্ক অতন্দ্র চক্ষুর মত। ওদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কি বাস্তবিক সর্ব্বদর্শী? মানুষের অন্তরের অতি গোপনতম গূঢ়তম রহস্যের সন্ধান...... ও কি! জল্‌জল্ কর্‌তে কর্‌তে ওরা হঠাৎ শিউরে ওঠে কেন?

সেদিনও তো......সেই বিভীষিকাময়ী রাত্রিতে বাগানের ঘরের ওপর কালো মেঘের ফাঁকে দু'টী তারা এমনি করেই কেঁপে উঠেছিল—কি জানি কেন? ঘরের ভেতরকার নৃশংস নির্ম্মম দৃশ্য দেখেই বুঝি......উঃ!

রেখার হৃৎপিণ্ডটা জোরে, এত জোরে ধ্বক্‌ধ্বক্ করতে লাগল যে, নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। কম্পিত কণ্টকিত দেহে কোনোমতে ঘরের ভেতর এসে দু'হাতে বুকখানা চেপে সে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। তার সকল অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে গেল একটা আচ্ছন্নতায়।

*　　*　　*　　*

তখনো ভোর হ'তে দেরী আছে।

ঝিয়ের ঘুম ভেঙে গেল রেখার ডাকে। রেখা তার পাশে বসে' আস্তে আস্তে গা ঠেলে ডাকছে—তরী! ও তরী! কি হ'ল তোমার?

বড় ব্যাকুল ভয়ার্ত্ত সে কণ্ঠস্বর। সে কখন থেকে ডাক্‌ছে কি জানি? ঝি অপ্রতিভ হ'ল, বিস্মিতও হ'ল একটু। রেখা তো তাকে 'হরির মা' বলে' ডাকে, তবে আজ 'তরী' বলে কেন? তরী কার নাম?

—ও মা গো! এখনো জ্ঞান হ'ল না, তা' হ'লে কি হবে জ্যাঠামশায়?

—ও দিদিমণি!—কি আবোলতাবোল বক্‌ছ গো?

ঝি হস্তদন্ত হয়ে গায়ের কাপড়খানা সরিয়ে ওঠ্‌বার উপক্রম কর্‌তেই রেখা তার হাত দু'খানা 'খপ্' করে' ধরে' চকিত বিস্ময়ে আর্ত্তস্বরে বলে' উঠ্‌ল—ও বাবারে! এ কি! এত রক্ত, উঃ!—কেন?

ঝি হাত দুটো টেনে নিয়ে সভয়ে বল্‌লে—কই রক্ত

কোথায়?—তোমার কি হ'ল দিদিমণি? স্বপ্ন দেখেছ না কি?

—স্বপ্ন? না না, এই তো—এত রক্ত, ওঃ! এখনো গরম রয়েছে যেন!

রেখার সর্ব্বশরীর ভয়ঙ্কর শিউরে কেঁপে উঠ্‌ল। এ আবার কি রোগ!

ঝি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি স্থনীতকে ডেকে নিয়ে এলো।

স্থনীত আস্তেব্যস্তে কাছে এসে বল্‌লে—কি হয়েছে রেখা? অমন করছ কেন?

রেখা তার হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে' কাঁদোকাঁদো হয়ে বল্‌লে—শিশির! এ কি হ'ল ভাই?

—আমি তো শিশির নয়, তুমি আমাকে—

—ও, আমার ভুল হয়েছিল, তুমি শিশির নয়, তবে কি তুমি সেই—সেই—

স্থনীতের হাত ছেড়ে দিয়ে রেখা তার দিকে চেয়ে রইল নিষ্পলকে। তার বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

স্থনীত তার কাঁধের ওপর হাত রেখে কোমলকণ্ঠে ব্যাকুলভাবে বল্‌লে—আমাকে চিনতে পারছ না রেখা? আমি যে তোমার স্থনীত দা'!

—স্থনীত দা'? সত্যি বল্‌ছ?

রেখা স্থনীতের আরো কাছে ঘেঁসে এসে, তার মুখের পানে ভ্রূ কুঁচ্‌কে খানিক সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে থেকে সহর্ষে বলে' উঠ্‌ল—হ্যাঁ, তাই তো! স্থনীত দা', তুমি আমাকে মাপ করো, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে—সাংঘাতিক ভুল! সত্যি বল্‌ছি, এই তোমার পা ছুঁয়ে—

রেখা স্থনীতের পায়ের দিকে হেঁট হতেই স্থনীত তাকে ধরে' ফেলে বল্‌লে—কেন অমন করো রেখা? শান্ত হও লক্ষ্মীটী আমার!

রেখার বেপথু ক্ষীণ দেহখানি নিস্পন্দ হয়ে এলিয়ে পড়্‌ল স্থনীতের বাহুবেষ্টনের মধ্যে। আবার মূর্চ্ছা!

মূর্চ্ছাটা ঘন ঘন হ'তে লাগ্‌ল। ডাক্তার পরীক্ষা করে' শঙ্কিত হলেন। শুধু মস্তিষ্কের বিকার নয়, রেখার হার্টের অবস্থাও শোচনীয়। তার জীবনের আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তে।

সারাদিনমান একই ভাবে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে রেখা যেন একটু সুস্থ বোধ করে' ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্থনীতের মনে একটু আশার সঞ্চার হচ্ছিল, ভগবানের দয়ায় রেখা যদি এযাত্রা রক্ষা পায়, তা' হ'লে ওকে এখানে আর রাখা হবে না। নতুন জায়গায়, নতুন দেশে—যেখানে গেলে ওর অভিশপ্ত জীবনের যন্ত্রণাময় স্মৃতি—যা' থেকে এই রোগের উৎপত্তি, তা' নিঃশেষে মুছে যেতে পারে...

স্থনীত রেখার শিয়রে বসে' তাই ভাব্‌ছিল তন্ময় হয়ে। রেখা চোখ খুলে আস্তে আস্তে ডাক্‌লে—স্থনীত দা'!

এতক্ষণ পরে রেখাকে সহজভাবে চাইতে ও কথা বল্‌তে দেখে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়ে স্থনীত তার গায়ে হাত রেখে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—কি বল্‌ছ রেখা?

—বল্‌ছি, তুমি আমাকে নিয়ে চলো—দূরে, অনেক দূরে যেখানে, যেখানে কেউ...

—তাই নিয়ে যাব রেখা! তুমি যেখানে বল্‌বে সেই-খানেই। একটুখানি সাম্‌লে উঠ্‌লেই—

—না না,—আর একদিন, এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়। তা' হ'লে আমাকে...ও কি! জানলায় ও কে—

বরফের ব্যাগটা রেখার মাথায় চেপে স্থনীত বল্‌লে—কই? কেউ তো নেই।

—নেই তো? আঃ, বাঁচলুম! তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না স্থনীত দা'।

—না রেখা। আমি তো তোমার কাছেই রয়েছি সর্ব্বক্ষণ।

—তাই থাকো। তোমাকে কত যে কষ্ট দিচ্ছি—কিন্তু ...ওই দেখো দেখো! ও তারাগুলো অমন করে কেন? আমাকে ভয় দেখাচ্ছে! ওরা কথা বল্‌তে পারে না, তবু ..উঃ! জানালাটা বন্ধ করে' দাও।

স্থনীত জানলা বন্ধ করে' এসে বল্‌লে—কোন ভয় নেই রেখা, আমি যে তোমার কাছেই রয়েছি।

রেখা তখনকার মত সাম্‌লে গেল। কিন্তু রাত্রে আবার এত রক্ত—উঃ—বাবারে! এত রক্ত এলো কোত্থেকে? বলে' ঘুমের ঘোরেই একসময় চীৎকার করে' সে ধড়-মড়িয়ে উঠে বস্‌ল।

স্থনীত শশব্যস্তে তাকে ধরে' শোওয়াবার চেষ্টা করতেই

সে বল্‌তে লাগ্‌ল—সুনীত দা', সুনীত দা', তুমি আমাকে বাঁচাও! ঐ যে আস্‌ছে—ঐ যে রক্ত মেখে, মা গো!...

বল্‌তে বল্‌তে সুনীতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে' সেই যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্‌ল না।

হতভাগিনী রেখার শেষ নিশ্বাস ঝরে' পড়্‌ল তারই বুকে—নির্ম্মল জীবন-উষায় মুকুলিত চিত্ত-বনের প্রথম ফোটা ফুলে অর্ঘ্য সাজিয়ে যাকে সে বরণ করেছিল।

চোদ্দ

সুনীত আজ বাইরে যাচ্ছে। কোলকাতায় তার মন টেঁক্‌ছিল না কিছুতেই। অভিশপ্তার বেদনাময় স্মৃতি তাকে ব্যথিত পীড়িত করে' তুল্‌ছিল। জীবন মরণের অলঙ্ঘ্য সুদূর ব্যবধানে থেকেও রেখা যেন তাকে আকর্ষণ করছিল অহরহ। সে আকর্ষণ কাটাবার জন্য নয়, রেখাকে ভোলবার জন্যও নয়, সুনীত যাচ্ছে ক্লান্ত অবসন্ন মনের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে এই দুর্ব্বিসহ বেদনা একটু সহনীয় করে' নিতে পারে যদি, এই আশায়।

যাবার আগে রেখার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে রাখ্‌তে গিয়ে সুনীতের হাতে পড়্‌ল একখানা চিঠি। অপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা। শিরোনামায় রেখার নাম। তা'তে লেখা রয়েছে—

মহাশয়া,

আমি আপনার পরিচিত না হ'লেও একেবারে অচেনা নই। দত্ত-মশায়ের কাছে আমাকে মধ্যে মধ্যে আস্‌তে হ'ত কাজের খাতিরে। তখন আপনি আমাকে দেখে থাক্‌বেন। যাক্‌, এখন কাজের কথা বলি। আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ নিবেদন আছে—সেটা সাক্ষাতে জানাতে পারলেই ভাল হ'ত, কিন্তু সুবিধে যে হয়েও হ'ল না, হতভাগী তরীর জ্বালায়। সে আপনাকে ভালবাসে কি না—

—হ্যাঁ, বাজে কথায় সময় নষ্ট করব না—যা' বল্‌তে এসেছি, তাই বলি।

—সেই যে...তারিখে আপনাদের বাগানের ঘরে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সে বিষয় আমি সমস্তই জানি, যা' কেউ জানে না, তা-ও। মিহিরবাবুর খুনীর পাত্তা আজও মেলে নি। পুলিশ সন্ধান কর্‌ছে—কিন্তু পুলিশের বাবাও আসল খুনীকে ধর্‌তে পার্‌বে না—যদি আমি না বলি।

দিদি-ঠাক্‌রুণ! তরীকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন দয়া করে' নয়—ধর্ম্মভয়ে, বিবেকের তাড়নায়। যাই হোক্‌, সেটা খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন, নইলে আদালতের মধ্যে দশের সাক্ষাতে আমাকে আসল কথা প্রকাশ কর্‌তে হ'ত, তরীকে বাঁচাবার জন্যে। ওকে আমি ভালবাসি। ও যখন আপনাদের বাড়ী কাজ কর্‌তে যায়, তখন আমি মানা করেছিলুম পইপই করে'—যে হেতু, মিহিরবাবুর স্বভাব আমার অগোচর ছিল না।

—কিন্তু পোড়ারমুখী তা' শোনে নি, তাই ভুগ্‌তেও হ'ল। সে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল—ভেবেছিল, আমি কিছুই জানি না—কিন্তু আমি তলে তলে খবর রাখতুম সব। একদিন হাতে হাতে ধরে' ওদের আচ্ছা করে...সেই মতলবেই বেড়াতুম সর্ব্বদা।

—যেদিন এই কাণ্ড হয়, সেদিন আমি সন্ধ্যে থেকেই সুবিধা খুঁজছিলুম, তরীকে একবার নিরিবিলিতে পাবার জন্যে।

—রাত তখন কত হবে কি জানি, মেঘ করেছিল খুব। বাগানের দিকে খিড়কীর দুয়ারের পাশে গিয়ে আমি কাণ পেতেছিলুম, তরীকে একলা দেখ্‌লেই ডাক্‌ব বলে'। কিন্তু কতক্ষণ পরেও কারো সাড়া-শব্দ না পেয়ে চুপিসাড়ে ভেতরে উঠোনে এসে দেখি, সেখানে জনপ্রাণী নেই, অন্ধকার। তরী কি এরি মধ্যে কাজকর্ম্ম সেরে ওপরে গেছে! তা' হ'লেও দোরতাড়া বন্ধ কর্‌তে আস্‌বে তো? কিন্তু গেরস্তর ঘরে চুপি চুপি ঢুকেছি, চোরের মত, বেশীক্ষণ থাকতে ভরসা হ'ল না—আস্তে আস্তে যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, সেইখানেই ফিরে গেলুম আবার। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, কিন্তু এবার দেখ্‌লুম বাগানের ঘর থেকে আলো আস্‌ছে, আলোটা কেরোসিনের নয়, টর্চ্চের মত—তবে কি ওইখানেই মিহিরবাবুর সাথে সে...বিষম একটা

সন্দেহ হ'ল মনে। তক্ষুনি চল্লুম, সোজা পথে নয়, গাছ-গাছড়া ঘাসের ভেতর দিয়ে, অন্ধকারে, পাছে কেউ দেখে ফেলে। তখন বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।

—যা' ভেবেছি তাই! ঘরের কাছে আস্তেই তরীর কথা শুনতে পেলুম। সে হেসে হেসে চাপাগলায় কি যেন বল্ছে মিহিরবাবুর সঙ্গেই। গা জলে গেল। ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি না ভেজানো কপাটের ফাঁকে চোখ রেখে—আপনি! তক্ষুনি সরে গেলুম, না দেখ্লেও নয়, কেমন করে' দেখি? ঘরের পিছনে দেয়ালের গায়ে যে একটা ঘুলঘুলির মত ছিল—যা' থেকে আলো বেরোচ্ছিল, সেখানে গিয়ে দেখ্লুম ঘুলঘুলিটা অনেকখানি উঁচুতে, এম্নে নাগাল পাওয়া যায় না, তবে তার ঠিক্ নীচেই দেয়ালের সঙ্গে জড় করা ছিল কতকগুলো ইট-পাটকেল আর মাটী। ওর ওপরে উঠতে পার্লে আমি লম্বা মানুষ, দেখ্তে পাই যদি—

—সাপ-খোপের ভয় না রেখে তার ওপরেই উঠে পড়্লুম। একটা শব্দও হ'ল, কিন্তু কি ভাগ্যি কেউ শুনতে পায় নি। ঘুলঘুলি থেকে স্পষ্ট দেখা গেল মিহিরবাবু চেয়ারে বসে', তরীর হাত ধরে। তরী ওর দিক্ থেকে মুখটা ফিরিয়ে অভিমানের সুরে বল্ছে—যাও, যাও, সোহাগ দেখাতে হবে না আর! তোমার ও খোসামুদী কথায় আমি আর ভুল্ছি না—

মিহিরবাবু—আরে ছুঁড়ী, আগে যা' বলি, তা' শোন্ তো! বলে' ওকে নিজের দিকে টান্ছেন, কিন্তু তরী বাস্তবিক চটেছিল বোধ হয়, তাই হাতখানা এক ঝট্‌কায় ছাড়িয়ে নিয়ে দড়াম্ করে' দোরটা খুলে সে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল। 'ক্যাঁক' করে' তরীর গলাটা টিপে ধরব বলে' আমি নামতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু নাবা আর হ'ল না, ঘরের মধ্যে আপনাকে আস্তে দেখে। মনে কেমন একটা কৌতূহল হ'ল, দেখি না, মিহিরবাবু আপনাকে কি রকম কৈফিয়ৎ দেন। আপনিই বা কি বলেন তা'কে। চুপটি করে' দেখ্তে লাগ্লুম মিহিরবাবু আপনাকে দেখেই চম্‌কে উঠ্‌লেন—ইনি আবার কোত্থেকে? কেমন করেই সব টের পায় যে! এদের চোখ এড়িয়ে কিছুই কর্‌বার যো নেই, একেবারে পাক্কা গোয়েন্দা!

ভাল কথা মিহিরবাবু আমার দিকে পেছন ফিরে বসেছিলেন, টর্চ্চটা টেবিলের ওপর সাম্‌নে রেখে। আর আপনি ছিলেন টেবিলের অন্যধারে তার সাম্‌না-সাম্‌নি-ভাবে, একটু ডানদিক ঘেঁসে—কেমন, ঠিক্ কি না? আমার যে এখনো চোখের ওপর রয়েছে—অমন ব্যাপার জীবনে দেখি নি তো।

—হ্যাঁ, তারপর মিহিরবাবুর কথায় আপনি চটে-মটে বল্লেন—তোমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে আস্‌ব এত ছোটলোক নই আমি! আমি এসেছি একটা দরকারে—

—আরে বাস্‌রে! এমন তেরিয়ান্ মেজাজ কেন চাঁদ? এসেছ, বেশ তো! চুপটী করে' বসো একটু—এ কবিতাটা চট্ করে' সেরে ফেলি, তারপর তোমাকে শোনাব 'খন—তোমার তো এদিকে খুব 'টেষ্ট' আছে, না? মোদ্দা কাগজখানা তোমার হাতে দিচ্ছি না, গায়ের জ্বালায় যদি ছিঁড়ে ফেলো? হুঁ হুঁ, এইটে নিয়েই আজ যাব কি না! শুনবে একটু?

মিহিরবাবু হাসিমুখে বেশ মোলায়েমভাবে কথাগুলো বল্লেও আপনি আরো চটে গেলেন, বল্লেন—থাক্, তোমার ও ছাই কবিতা শুনতে আমি চাই না, অত ধৈর্য্যও আমার নেই, আমি এসেছি তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া কর্‌তে—

—ও বাবা! বোঝাপড়া আবার কিসের গো! না ভাই, মাপ করো, আমি আর দেরী কর্‌তে পার্‌ব না—কোনোমতেই। চারটে লাইন আমার কখন শেষ হয়ে যেত তা' হ'ল না পোড়ারমুখী তরীর জ্বালায়। সে এসেছিল তোমার তরফের উকীল হয়ে, জান্‌লে? আচ্ছা, একটু সবুর কর দয়া করে'।

—না, সবুর আমি ঢের করেছি, আর পারি না, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না আমার! আমি আজই একটা হেস্তনেস্ত করে' ফেল্‌তে চাই—

—আরে কিসের হেস্তনেস্ত ঠাকরুণ? আজ খামকাই গায়ে পড়ে' ঝগড়া করতে এলে কেন বলো দেখি?

—ঝগড়া করতে চাই না; আমি শুধু জানতে চাই, তোমার মনোগত অভিপ্রায়টা কি? আমাকে বন্দী করে' রেখে তুমি যে এমন করে' প্রজাপতির মত—

—প্রজাপতির মত? হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ বলেছ তো! তুলনাটা ঠিক্ হয়েছে মাইরী! আমি প্রজাপতি হয়ে থাকতেই ভালবাসি। কি করি বলো? স্বভাব যায় না ম'লে! কিন্তু তোমার তা'তে ক্ষতিটা কি? তুমি থাকবে আমার পাটরাণী হয়ে—

—পাটরাণী করো তোমার বীথিকে, আমি চাই না। আমি চাই এবার মুক্তি। এই বন্দীর বন্ধন থেকে—

—এ বন্দী-বন্ধনে তুমি তো নিজেই ধরা দিয়েছ রাণী, আমি তো তোমাকে ধরে' বেঁধে—

—তখন আমি বুঝতে পারি নি, লোহার শিকলকে ফুলের মালা মনে করে'—যাক্ যা' হবার হয়ে গেছে, ঘাট হয়েছে আমার! এখন দয়া করে' নিষ্কৃতি দাও—মুক্তি দাও আমাকে।

—ভাল, মুক্তি যেন দিলুম, তারপর তুমি যাবে কোথায় তা' শুনি?

—যেদিকে দু' চক্ষু যায়।

—আরে রেখে দাও। ও সব নভেলীয়ানা কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না রেখা! আমি জানি তোমার ব্যথাটা কোন্‌খানে! এদ্দিন বন্দী-বন্ধন মনে হয় নি, আর যেই শুনেছ সুনীত ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসেছে, বেশ রোজগার করছে—অমনি মুক্তি চাই! বেশ তো যাও না, সেও তো বিয়ে করে নি—তোমার আশা নিয়েই বসে' আছে এখনো—

এতে রাগের এমন কি কথা ছিল বুঝতে পারলুম না। কি জানি, আমরা গরীব মানুষ—বড় ঘরের বড় কথা! আপনি রাগে মুখচোখ লাল করে' হুমকে বলে' উঠলেন—চুপ করো। সবাইকে নিজের মত মনে করো না? তোমার মত প্রবঞ্চক—

—হাঁ হাঁ, আমি তো প্রবঞ্চক, লম্পট, বদমাইস, সব কিছু। তা' তুমি সেই সাধু মহাপুরুষের কাছেই যাও না। দিব্যি ব্যারিষ্টার-সায়েবের মেম-সায়েব হয়ে থাকবে, যা' তুমি চাও—হুঁ হুঁ, আমি কি বুঝি না!

স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আপনি রাগে কাঁপছেন। তরী বলতো দিদিমণি ভারি ঠাণ্ডা-প্রকৃতির—কিন্তু এ কি ভীষণ রাগ রে বাপু! দেয়ালের কুলুঙ্গীতে একখানা ডাবকাটা দা রাখা ছিল—এদিক-ওদিক চেয়ে সেই দা-খানা তুলে নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন—দেখো, আর বেশী বাড়াবাড়ি করো না, তা' হ'লে ভয় দেখানো কথা নয়, সত্যি বলছি—এই দা বুকে বসিয়ে আমি তোমার সামনেই আত্মহত্যা করে' মরব এখনি।

তারপর আপনি সত্যি সত্যি দা-খানা বুকের ওপর তুলে ধরলেন।

মিহিরবাবু কথাটা বিশ্বাস করেন নি বোধ হয়, তাই হাসতে হাসতে রঙ্গ করে' বললেন—আহা! করো কি—করো কি সুন্দরী! ওই ভোঁতা দা-খানা তোমার কচি বুকে বসিয়ে রক্তপাত করে' মিছে ব্যথা পাবে কেন? ওতে তো মরবে না—আর খামকা তুমি মরতে যাবেই বা কোন্ দুঃখে? তোমার এই নতুন জীবন—নতুন যৌবন—বেঁচে থাকলে অমন কত সুনীত দা' জুটবে!

—থামো, লজ্জা করে না তোমার ওরকম কথা মুখে আনতে?

—না, আমার লজ্জা-সরম কিছু নেই, আমি স্পষ্ট কথাই বলি। তোমার ইচ্ছে হ'লে সুনীত দা'র কাছে ফিরে যেতে পারো স্বচ্ছন্দে—আমি বাধা দেব না—তুমিও আমাকে বাধা দিতে এসো না, বুঝলে? এতক্ষণ বকাবকি করে' খামকাই দেরী করে' দিলে—জ্বালা আপদ বটে! বীথি মনে করছে—সে বেচারী জানে না তো আমার প্রাণটা কি ঝামেলার মধ্যে...হয়েছে, কাঁদতে হবে না আর, বিদেয় হও! আমি তোমার কান্নাতেও ভুলব না, চোখ রাঙানীতেও ভয় পাব না—আমার যা' খুসী তাই করব, যত ইচ্ছে মেয়েমানুষ...

—তুমি জাহান্নমে যাও!

বলতে বলতে আপনি হাতের দাখানা রাগের ভরে

সজোরে ছুঁড়ে ফেল্‌লেন চক্ষের নিমিষে কোন্ দিকে তা' ঠিক্ ঠাওর কর্‌তে পার্‌লুম না। দুম্‌দাম্ ঝন্‌ঝন্ করে' একটা শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানা অন্ধকার হয়ে গেল। আর কিছু দেখা যায় না—কেবল আপনি হুস্ করে' দোর খুলে তীরের মত বেরিয়ে গেলেন দেখ্‌তে পেলুম। তার-পরই ঘরের মধ্যে একটা কাতরানির শব্দ। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—এখানে থাকা আর ঠিক্ নয়। আমি ইট্‌পাট্‌কেলের ঢিবি থেকে আস্তে নয়, লাফিয়ে নেমে পালাব—এমন সময় আবার কাণে গেল সেই কাতরানি, এবার আরো জোরে। ভাব্‌লুম, একবার সাহস করে' দেখেই যাই বাবু যদি আঘাত পেয়ে থা'কেন—বাস্তবিক এ তো ন্যাকামো বলে' বোধ হয় না।

আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজায় গিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে দেখি—সর্ব্বনাশ! মিহিরবাবু দু'হাতে মাথা ধরে' টেবিলের ওপর ঝুঁকে—মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে—কি ভয়ানক রক্তারক্তি ব্যাপার! একবার ভাব্‌লুম, বাড়ীতে খবর দিই—কিন্তু শেষকালে খুনের হাঙ্গামে পড়ে' থানা-পুলিশ কর্‌তে হয় যদি—গরীব মানুষ দরকার কি? তার চেয়ে সরে' পড়াই ভাল। তখন বৃষ্টি আর পড়ছে না, আকাশে মেঘের ফাঁকে দু'-একটা নক্ষত্রও দেখা যাচ্ছে—কেমন ঠিক্ কি না? কথাটা আমি চেপে রেখেছিলুম—যে হেতু, আপনি এ কাজ ইচ্ছে করে' করেন নি তো? আর মিহির-বাবুর ওপর আমার একটা আক্রোশও ছিল—ওই তো আমার তরীকে—তবে প্রকাশ কর্‌তেই হ'ত, যদি আপনি ওকে না বাঁচাতেন। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না দিদি-ঠাক্‌রুণ! শিবরামের গলায় ছুরী বসালেও কেউ এ কথা বার কর্‌তে পার্‌বে না। তবে আমার একটা নিবেদন আছে—আমাকে কিছু টাকা আপনি দিন, বেশী নয় হাজার-খানেক হলেই যথেষ্ট। আপনার তো টাকার অভাব নেই এখন—অতবড় ব্যারিষ্টারের স্ত্রী হ'তে যাচ্ছেন, এই সামান্য টাকা দিলে আপনার কোনোই ক্ষতি হবে না—অথচ, আমার যথেষ্ট উপকার করা হবে, গরীব মানুষ আমি। আর এতে আপনি সুখে-স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে জীবন কাটাতে পারবেন, আর আমিও। নইলে আপনার ভাল হবে না—যেখানেই যান না কেন, এ শিবরামের হাত থেকে রেহাই পাবেন না, বুঝ্‌লেন কি না? পুলিস এখনো খুনীর তল্লাস কর্‌ছে। জেনে হোক্, না জেনে হোক্—মিহিরবাবুকে হত্যা করেছেন আপনি, একথা মান্‌তেই হবে আপনাকে? কাল সন্ধ্যেবেলা বাগানে সেই বেঞ্চির ওপর আপনি বসে' থাক্‌বেন একলাটী, আমি আপনার মতামত জান্‌তে আস্‌ব। ইতি—

চিঠিখানা পড়্‌তে পড়্‌তে সুনীতের চোখে যেন দিনের আলো নিভে গেল। ওঃ, এ কি নিদারুণ নির্ম্মম বিধি-লিপি! কী যন্ত্রণা, কী অশান্তির মধ্যেই অভিশপ্তার জীবনের সমাপ্তি হয়েছে! হে ভগবান্! তাকে শান্তি দিও এবার! তার অজানিত অপরাধ ক্ষমা তুমি করো!

সুনীত সজল চক্ষে রেখার মৃত্যুবাণ সেই চিঠিখানা দেশলাই জেলে ভস্মসাৎ করে' ফেল্‌লে।

শেষ

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

নূতন বউ

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন, অর্থাৎ পূর্ণ দুইটী সপ্তাহ পরে নরেশের দেখা মিলিল।

দুপুরবেলা উপরে শুইয়া বই পড়িতেছিলাম। ছোট ভাইটি যখন খবর দিল যে, তার নরেশ দা' নীচে বসিয়া আছেন—আমার দেখা পাওয়ার জন্য, তখন রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল।

কি অভদ্র! এতদিনকার আলাপ-পরিচয়। সে কি না বিবাহ করিয়া আসিল, একটিবার খবর পর্য্যন্ত দিল না। কিন্তু বিবাহের মত একটা ব্যাপার, সে কি গোপন করা চলে? কিছুতেই চলে না।

তার বিবাহের পরদিন না শুনিয়া খবরটি যদি আগের দিন সকালবেলাও অন্ততঃ আমি শুনিতাম, তা' হইলে, বোকাটা—গাধাটা দেখিত—নিশ্চয় দেখিত যে, তার বিবাহে বিনা নিমন্ত্রণেও আমি যাইতে পারি। হাঁ, সে অধিকার সে আমাকে দিয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি।

ছোটভাই দাঁড়াইয়াই ছিল। বলিল,—দাদা, এসো নীচে, নরেশ দা' যে ব'সে রয়েছেন।

ধম্‌কাইয়া উঠিলাম,—বল্‌গে যা', তার সঙ্গে দেখা আমি করবো না।

ভাইটি নামিয়া গেল।

কিন্তু—না, দেখা করিতে হইবে। তা না হইলে নরেশ—ওঃ, তার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে!

তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। নীচের ঘরে আসিয়া দেখিলাম, নরেশ তখন যাওয়ার উপক্রম করিতেছে। সারা মুখ তার লাল হইয়া উঠিয়াছে।

কর্কশ হুকুমের কণ্ঠে বলিলাম,—বোসো।

আমার মুখের দিকে সে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর বসিয়া পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ছাঁচাছোলা, অত্যন্ত নির্দ্দয় কণ্ঠে,—কি তোমার বল্‌বার আছে, বলো।

সে চুপ করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে যেন অনেক চেষ্টা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—বল্‌বার অনেক কিছু কতক্ষণ আগেও ছিল। এখন আর নেই।

তার অভিমানের কোনো দাম দিলাম না। বলিলাম,—কিন্তু আমার বল্‌বার আছে। তুমি না কি বিয়ে করেছ?

—না। সে পরিষ্কার উত্তর করিল,—করি নি।

—করো নি! হাতের মুঠিটাকে অনেক কষ্টে দাবাইয়া রাখিলাম। বলিলাম,—মিথ্যাবাদী।

সে কোনো প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু তা' করাই এ অবস্থায় তার চিরদিনের অভ্যাস।

বলিলাম,—তুমি জানো যে, তোমার বিয়ের পরদিন রাত্রে তোমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তার কাছেই এ খবর আমি পেয়েছি। আমার সাম্‌নে ঠাট্টা ক'রে মিছে কথা বল্‌তে পারার মত প্রশ্রয় আমি তাকে কোনোদিন দিই নি, তা' তুমি জানো।

—জানি। সে বলিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—তবু তুমি বল্‌তে চাও সে মিছে কথা বলেছে?

না। সে উত্তর করিল।

রাগ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। বলিলাম,—এ তোমার কোন্ হেঁয়ালি? বিয়েও করো নি, তোমার ভাইও মিছে কথা বলে নি। এ সব তুমি কি বল্‌ছো?

কতক্ষণ থামিয়া নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইলাম। তারপর বলিলাম,—হেঁয়ালি আমি শুন্‌তে চাই না—এ রাগের সময়। আমি তোমার মুখ থেকে উত্তর পেতে চাই যে, তুমি বিয়ে করেছ কি না।

বলিল,—তুমি মাথাটা একটু ঠিক্ না কর্‌লে তো কিছুই বল্‌তে পার্‌বো না আমি।

কথাটা শুনিয়া আমি বেশী করিয়া রাগিলাম, না রাগ সাম্‌লাইবারই চেষ্টা করিলাম, তা' বলিতে পারি না। শুধু তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বারংবার দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, তার ডান পাশে পৈতাগাছি জামার বাহিরে ঝুলিয়া রহিয়াছে, এবং পৈতায় হলুদ্ রঙ্ মাথানো।

চট্ করিয়া তার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। বলিলাম,—তুমি বিয়ে করো নি, অথচ, তোমার পৈতেয় হলুদ মাথানো কেন?

সে কিছুই বলিল না।

বলিলাম,—যাও, তোমার কাছে আর কিছু আমার বল্‌বার নেই। আমার কাছেও তুমি কোনোদিন কিছু বল্‌তে এসো না।

আবার উপরে উঠিয়া আসিলাম। নরেশ গেল না, থাকিল, বা কি করিল, কিছুই আর পিছন ফিরিয়া দেখিলাম না।

তার একসপ্তাহ পরে।

দেশবন্ধু পার্কে ঘুরিতেছিলাম। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। হঠাৎ একখানা বেঞ্চির উপর দেখিলাম, একেবারে জীর্ণ-শীর্ণভাবে নরেশ তার দেহটি এলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। চোখ বোজা এবং সারামুখে অবর্ণনীয় বিষাদ।

তার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনের সব ঝাল উবিয়া গেল। না ডাকিয়া পারিলাম না। তার গায়ে হাত দিলাম। সে ধড়মড় করিয়া উঠিল। আমার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, যেন আমায় চিনে না। এ অবস্থা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। হতাশ বেকারত্বের দিনেও তার মুখের হাসি মিলাইতে দেখি নাই। বিবাহের আগে সে ছিল হাসির খনি। গম্ভীরতার আশা তার কাছ হইতে করা ছিল অসম্ভব। সে ছিল মূর্ত্তিমান আনন্দ।

আর আজ?

এর কারণ কি? অনুমান করা অসম্ভব হইল। নূতন বিবাহের পরে মানুষের এ বিষাদ কল্পনা করিতে পারে কেহ? তার পাশে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে তোর, বল্‌তো।

কিছু বলিল না। মাটির পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—বল্‌বি নে? আমার কাছে তো কিছুই লুকোস না তুই?

ধীরে ধীরে বলিল,—সে অধিকার সেদিন তুমি কেড়ে নিয়েছ।

জানি, সে অভিমানী!

তার ও উত্তরের পরে আর কোনো কথা আমার মুখে জোগাইল না। বাস্তবিক বড়ই নিষ্ঠুরতা সেদিন তার উপর করিয়াছি। আমারি বা অপরাধ কি? জগতের কোনো দুঃখ তার মধ্যে এতবড় মূকত্ব আনিয়া দিতে পারে, আজিকার আগেও যে তা' আমি জানিতাম না। বিশ্বাস করিতাম না।

এদের পাঁচ-সাতদিনকার দাম্পত্য-জীবনে নিশ্চয়ই বিরাট একটা অশান্তি দেখা দিয়াছে। কিন্তু কিসের জন্য? বউ দেখিতে ভাল নয় না কি? একটা কথা বটে। শ্রীহীন বধূ ঘরে আনার পক্ষপাতী সে কোনদিনই ছিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—বউ দেখালি নে?

উত্তর দিল,—বউ দেখাবার মত অবস্থা এখন আমার নয়।

বলিলাম,—তবে বিয়ে করেছিস্ বল্। সেদিন যে বল্‌লি—

—বিয়ে আমি করি নি,—আমায় করিয়েছে।

জানিতে চাহিলাম,—তার মানে?

বলিল,—বিয়ে না কর্‌লে মা যে সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা কর্‌তে যাবেন, তা' ভাবি নি। কিন্তু আমার একগুঁয়ে অস্বীকৃতিতে মা যখন সত্যই সে প্রচেষ্টা কর্‌লেন, তখন বাধ্য হয়ে বিয়ে আমায় কর্‌তে হ'ল। সে এমন উৎসবহীন বিবাহ যে, তোমাদের নিমন্ত্রণ করার পুঁজি আমি পাই নি।

—কেন, পণ দেয় নি ?

—পণপ্রথার বিপক্ষে আমি শুধু মুখে নয়, তা' জানো তো।

লজ্জা পাইলাম ; কারণ, পণপ্রথার বিপক্ষে বক্তৃতা-মঞ্চে কাহারো চেয়ে কম জোরে না চেঁচাইয়াও আমার বিবাহে পণ আমি লইয়াছি।

সে বলিল,—এবং শ্বশুর এত দরিদ্র যে, শাঁখা-সিঁদুর আর পাঁচসিকে দামের বাগেরহাটের লাল একখানা শাড়ী ছাড়া কন্যাভরণ আর কিছু তিনি দিতে পারেন নি। তার জন্য বিন্দুমাত্র অতৃপ্ত আমি নই—বরং গর্বিত।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিন্তু বউকে বাড়ী আনার পরে আমায় একবার বউ দেখার নিমন্ত্রণও তো তুমি করো নি।

বলিল,—নিমন্ত্রণ করার দরকার আমার বাড়ীতে তোমার আছে ব'লে আমি মনে করি না। তুমি আমার খাঁটী বন্ধু বলেই জান্‌তাম আমি। কিন্তু নিমন্ত্রণ যদি কর্‌তে যাই, তবে তোমার একলাকে কর্‌লে চল্‌বে না। বন্ধু না হোক, 'ফ্রেণ্ড'-এর সংখ্যা আমার কম নয়। তুমিও যে নামকা-ওয়াস্তে বন্ধু হয়ে পড়েছ, তা' আমার সেদিন তোমার সাথে দেখা হবার আগে জানা ছিল না।

হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—দেরী হ'য়ে গেছে, আর দেরী কর্‌লে গাড়ী পাবো না।

বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল—খানিক ক্ষণের মধ্যেই।

গাড়ী না পাওয়ার ছলটা যে তার একেবারেই মিথ্যা, তা' জানি।

রাত সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত তার গাড়ী আছে। তবু তাকে বাধা দিতে পারিলাম না। নিজেকে তার কাছে এত ছোট মনে হইতেছিল যে, তাকে ধরিয়া রাখিয়া আমার হীনতার আরো বেশী প্রমাণ সংগ্রহের ইচ্ছা ছিল না।

পল্লীগ্রামে এক বিঘা জমির উপর ভাঙা একখানা বাড়ীর মালিক হইয়াও নিরাভরণা দরিদ্র কন্যাকে যৌতুকহীন পণহীন বিবাহ করার গরিমা নরেশেরই আছে, লক্ষপতির পুত্র হইয়া আমার তা' নাই।

সেদিন নিদ্রাহীন রাত্রে এক ফন্দি আঁটিলাম।

নরেশের অন্তর চায়, তার বউ দেখার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া একটা ঘটা করিতে। কিন্তু পারিবে কেন ? পঁয়ত্রিশ টাকা তো মাহিনা পায়। সে হয় তো চায়, দুই তিনমাসের উদ্বৃত্ত টাকা—সংসার খরচ চালাইয়া যা' হাতে থাকে—তা' জমাইয়া বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিতে। না, অত টাকা খরচ করা তার চলিবে না। আমি তা' হইতে দিব না। চাকরী হইয়াছে তো তার এই সাত কি আট মাস হইল। ওকে এখনো বাড়ী সারাইতে হইবে, বলিয়াছে, বউয়ের গয়না নাই—

কিন্তু বউ ? নরেশের এ বিষণ্ণতার হেতু কি, অথবা কে ? নাঃ, তার বউটিকে দেখিয়া আসা দরকার—নিতান্ত প্রয়োজন।

নরেশ এবার মাইনা পাইল কবে ? পাইবে, না পাইয়াছে ? মাসের কত তারিখ হইল ? ঠিক্। মাইনা পাইয়াছে সে সপ্তাহখানেক আগে অন্ততঃ। অতএব তার হাতে এখন টাকা আছে। সাত-আটজন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া তার বাড়ীতে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে বিপন্ন সে হইবে না। তার অবস্থার সম্মান রাখিতে পারিবে। ঘটা করিতে পারিবে না। তা' করিয়া টাকা নষ্ট করিতে তো দিবই না তাকে।

তা' হইলে এই রবিবারে যাওয়াই ঠিক্। তার সেদিন ছুটি। ইতিমধ্যেই সব কয়জন বন্ধুকে এ মতলবটা জানাইয়া রাখিতে হইবে। রবিবারের প্রথম গাড়ীতেই যাত্রা।

সমবয়সী দশজন যুবকের হল্লায় প্রথম এবং দ্বিতীয় গাড়ী হারাইতে হইল। তৃতীয় গাড়ীতে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিলাম।

নরেশের বাড়ী সোদপুরে—কলিকাতা হইতে পাঁচটি ষ্টেশন।

বেলা নয়টার সময় পরিচিত সেই তার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ইট বাহির-করা দুই কামরার একতলা সেই জীর্ণ বাড়ীখানি। দরজা জানালায় আলকাতরার রঙ করা। বিবাহ উপলক্ষে একবিন্দু সংস্কারও তার হয় নাই। হওয়ার উপায় নাই, হইবে কেমন করিয়া।

দশটি বন্ধু হর্‌রা করিয়া ডাকিতে লাগিলাম,—নরেশ, নরেশ!

এক মিনিট পরে নরেশ বাহির হইয়া আসিল। আমাদিগকে দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই রহিল। তিন-চারদিনে কি বিশ্রী হইয়াছে তার চেহারা! বয়স যেন পনের বছর পিছাইয়া গিয়াছে। কোথায় তার মুখে সেই সদাহাসির সরসতা!

আমি এবং সব কয়জনেই চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোর কি অসুখ হয়েছে?

কোনো উত্তর দিল না। নির্ব্বিকার চাহিয়া রহিল—চোখে পলক নাই। কপালের উপর লুটাইয়া-পড়া বিশৃঙ্খল রুক্ষ চুলগুলি তার মৃদু বাতাসে দুলিতে লাগিল। সে যেন মূর্ত্তিমান শোক। বুক কাঁপিয়া উঠিল।

তবু বলিলাম,—বউ দেখ্‌তে এসেছি।

তার চোখে ফুটিয়া উঠিল অস্বাভাবিক দীপ্তি, কিন্তু তখনি আবার তা' নিভিয়া গেল। বলিল,—আয়।

গেলাম।

সম্মুখের ঘরটি দেখাইয়া বলিল,—বোসো।

ব্যস্‌, কোনো অভ্যর্থনার লেশমাত্রও নাই। সবাই গিয়া সেই ঘরে বসিলাম। আগে যখন আসিতাম, তখন এঘর ছিল বৈঠকখানা। এখন দেখিলাম, সেখানকার ভগ্ন তক্তাপোষের উপর অর্দ্ধমলিন একটা বিছানা পাতা। এদিক ওদিকে ঘটি হাঁড়ি প্রভৃতি আসবাবপত্রও আছে বুঝা গেল। এ ঘরে এখন তার মা থাকেন এবং অন্য ঘরে থাকে সে আর তার বউ।

অন্যবার আসিলেই তার মা ছুটিয়া আসেন। এবারে তাঁর দেখা পাইলাম না। নরেশ আমাদের বসাইয়াই চলিয়া গিয়াছে।

নীরবে দশটি বন্ধু মিনিট কয়েক বসিয়া রহিলাম। কেহ কাহারো মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিলাম না। কি এখন করা যায়, ভাবিয়া পাইলাম না। আনন্দ করিয়া বন্ধুর বউ দেখিতে আসিয়া যদি বাড়ীর কাহারো মুখে অভ্যর্থনার একটি বাঁধা বুলি পর্য্যন্ত না শোনা যায়, তবে মনের অবস্থা হয় কেমনতরো?

নরেশের আর দেখা নাই।

আরো যে নয়টি লোক রহিয়াছে, আমার কথায়ই তো আসিয়াছে তারা—আমারি ভরসায়। আমি উঠিলাম। বলিলাম,—তোমরা বোসো, আমি ওঘরে দেখে আসি।

আগে এ বাড়ীতে কোথাও আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না এবং নরেশের বিবাহ হওয়ার অজুহাতে এখনো তা' থাকিবে বলিয়া মনে হইল না।

পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, মাসীমা—নরেশের মা আর কি। ও দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন—হয় তো আমার আসার সাড়া পাইয়াই।

ঘরে ঢুকিলাম। দেখিলাম, কবাট ধরিয়া নরেশ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তার মুখ দেখিয়া এও মনে করা যাইতে পারে যে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে। তার দিকে চাহিয়া কোনো কথা আমার মুখে ফুটিল না।

ঘরের কোণে, দেখিলাম, মলিন কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া একটি বধূ বসিয়া আছে—ওদিক ফিরিয়া। একগাছি শাঁখা আর নোয়াপরা বাঁ হাতখানি শুধু বাহির হইয়াছিল। সুগৌর হাতখানি। দেখিয়া আশা হইল—বউ তা' হ'লে কুরূপা নহে।

সেই একটুখানি পুলকেই হউক, অথবা নিতান্তই একটা কিছু কথা না বলা অসঙ্গত মনে করিয়াই হউক, জিজ্ঞাসা করিলাম,—ওই বুঝি বউ, নরেশ? কি কর্‌ছেন ওখানে চুপটি ক'রে?

নরেশ উত্তর দিল। ছোট্ট উত্তর। বলিল,—কাঁদ্‌ছে।

—কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম,—বাড়ীর জন্য মন কেমন কর্‌ছে বুঝি?

নরেশ আমার দিকে চাহিল। চাহিয়াই রহিল।

ভাবিলাম চাহিয়াই থাকিবে। কিন্তু সে বলিল,—জীবনে আজ প্রথম উপোস করতে হবে, তাই কাঁদছে।

—উপোস করতে হবে! অবাক হইলাম।—কেন?

বলিল,—পূজো-পার্বণের উপোস নয়, ঘরে চাল নেই, তাই উপোস করতে হবে।

—চাল নেই!

—না। নরেশ বলিল,—আর কেউ ধার দিতে চায় না।

—তার মানে? জিজ্ঞাসা করিলাম,—গেল মাসের মাইনে পাও নি?

—না। সে বলিল,—আমার চাকরী গেছে।

কতক্ষণ মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। এবং একটু পরে অনেকগুলি কথাই পর পর বলিয়া ফেলিলাম,—কেন? চাকরী গেল কেন? গেল তো আমায় জানাও নি কেন? বাবাকে কেন বলো নি? চাকরী গেল, কেন, কি অপরাধে?

অনেকদিন বেকার কাটাইবার পর আমার বাবা তাকে চাকরীটি করিয়া দিয়াছিলেন। চাকরী যাওয়ার পর নরেশ কেন যে তাঁকে তা' জানায় নাই, বুঝিলাম। চাকরীর জন্য সে বাবাকে অনেক বিরক্ত করিয়াছে। অর্থাৎ, তিনি ধনী, তাই দরিদ্রের নাছোড়-বান্দা আবেদনকে উৎপীড়ন মনে করিয়াছেন। তাই চাকরী দিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাকে তিনি বলিয়াছিলেন,—যাও, আর আমায় বিরক্ত করতে এসো না কোনদিন।

নরেশ অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল,—তোমার বাবাকে জানাতে সাহস করি নি, তিনি বিরক্ত করতে বারণ করেছিলেন ব'লে।

বলিলাম,—আমাকে কেন জানালে না?

উত্তর দিল,—সেদিন তোমায় জানাতেই গিয়েছিলাম, তুমি তো শুনলে না।

নিজের গায়ে চাবুক মারিতে ইচ্ছা হইল। সত্যই তো। আমাকে না জানাইয়া সে বিবাহ করিয়াছে, সেই অপরাধে নিজের রাগে নিজে ফাটিয়া পড়িয়াছি, একটিবার তাকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করি নাই যে, সেই দুপুর রোদ মাথায় করিয়া শুষ্কমুখে কি কথা সে আমায় বলিতে গিয়াছিল। কোনো কথা তাকে বলিতে দিই নাই। তার কোনো কথা আমি শুনিতে চাহি নাই।

বলিলাম,—তুমি ভেবো না, আমি বাবাকে বলবো। কিন্তু কি অপরাধে তোমার কাজ গেল?

বলিল,—বাবাকে ব'লে কিছুই হবে না, আমার জায়গায় লোক নেওয়া হয়ে গেছে।

—অপরাধ?

তার ধীরকণ্ঠ উগ্র হইয়া উঠিল। বলিল,—অপরাধ, বিয়ের জন্য তারা তিনদিনের বেশী ছুটি আমায় কিছুতেই দেয় নি। কিন্তু আরো তিনদিন অফিস কামাই না ক'রে আমি পারি নি। বিয়ে করেছি দূরদেশে। ছ' দিন লেগে গেছে যাতায়াতে, কাজকর্ম্মে।

—এই অপরাধ? বলিলাম,—বাবাকে ব'লে ঠিক্ ক'রে দেবো। তুমি ভেবো না।

বলিল,—কোনো ফল হবে না তাঁকে বিরক্ত ক'রে। কারণ, আমার জায়গায় যাকে নেওয়া হয়েছে, সে অফিসের ম্যানেজারের ভাইপো।

অভাগা নরেশ! এই চাকরীর উপর ভরসা করিয়াই বুঝি সে বিবাহ করিতে সাহস পাইয়াছিল!

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

ভুলের দণ্ড

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, বি-এল

মেল ডে—হিসাব এখনই পাঠাতে হবে। তিনটে বাজে। ত্ব'-তিনবার হেড ক্লার্ক মন্মথবাবুকে হিসাব চেক্ কোর্‌তে দেওয়া হয়। সঞ্জীব কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারে না। বড়বাবু ভর্ৎসনা করে' বলেন—অমনোযোগী।

কার্ত্তিক মাস,—ঠাণ্ডার আমেজ পড়েছে, মাথার ওপর পাখা, তবু সঞ্জীব ঘেমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়!

তার আরক্ত মুখ দেখে, সহকর্ম্মী বন্ধু দিগীন বলে,—তোর আজ হ'ল কী? ম্যানেজার যে তোর হিসেবের জন্যে অপেক্ষা কোরছেন।

সঞ্জীবের মুখখানা সিঁদুরে আমের মত রঙ ধরে ওঠে। দরদরধারায় ঘাম ঝরে' হিসাবের কাগজ ভিজিয়ে তোলে।

মন্মথবাবু মনে মনে হাসেন—তাঁর বড় কুটুমকে ডিঙিয়ে ওই অপদার্থকে সাহেব ওপরে তুলে দিয়েছেন। আজকে বুঝ্‌বেন এখন,—কেমন চীজ্ ওই সঞ্জীব!

তিনি হাঁকেন,—তিনটে বাজ্‌ল, সঞ্জীববাবু, আর কতদূর? আপনার জন্যে কী মেল আট্‌কে থাক্‌বে?

হাঁক শুনেই সঞ্জীব চমকে ওঠে—হাত থেকে পেন্‌সিল ঝুপ্ কোরে মেজেয় পড়ে!...

বন্ধু দিগীন্ না থাক্‌লে, সেদিন তার মুখ রাখা ভার হ'ত। বড়বাবুর ভয়ে, প্রকাশ্যে তার ওপর কেউ সহানুভূতি দেখাতে পারে না! কী একটা কাজের জন্যে বড়বাবু সাহেবের ঘরে গেলেই, হিসাবের কাগজটা কেড়ে নিয়ে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে, দিগীন্ দেখে,—ইংরাজী আটকে চার বোলে সঞ্জীব বারকতক যোগ দিয়েছে। বড়বাবুর চোখেও সে ভুলটুকু ধরা পড়ে নি!

ইসারা কোরে জলখাবার ঘরে সঞ্জীবকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দিগীন্ জিজ্ঞাসা করে,—তোর আজ হ'ল কী?

তার মুখ দিয়ে কথা সরে না,—সে শুধু ঘাম মোছে।...যা' হোক সে-যাত্রায় সে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে!...

* * *

কোনও-গতিকে 'দিনগত পাপক্ষয়' মিটিয়ে,—দিগীনের মিল করা হিসাবটা বড়বাবুর হাতে দিয়ে, অপমানের বোঝাটা ট্রামগাড়ীতে ঝেড়ে ফেলে, সঞ্জীব বাড়ী ঢোকে,—দুরুদুরু-বক্ষে, কম্পিত-পদে, ইতস্ততঃ-চঞ্চল-বিক্ষিপ্ত-নেত্রে আর অতি উৎকণ্ঠিত-কর্ণে। সদরের সাম্‌নেই, দাসী সংবাদ দেয়,—'দাদাবাবু, আজ বৌদি' এয়েছেন।' কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে,—'ও, আজ বুঝি দাদাবাবু তোমার বড় খাটুনি হয়েছে, নয়?'

সঞ্জীব মনে মনে ভাবে এমনি দরদ আর একস্থান থেকেও আস্‌বে—এটার চেয়ে সেটা কত মিষ্টি?

শয়ন-ঘরের সম্মুখে, দালানের ওপর দাঁড়িয়ে সঞ্জীব চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দাসী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে,—'দাদাবাবু এসেছেন গো, বৌদি'!'

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, কেউ তাকে অভ্যর্থনা কোর্‌তে আসে না!...

কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে গত ত্ব'টী বৎসর কত না আশার রঙে সে মস্‌গুল হ'য়ে রয়েছে। কি ভাবে সে তার হৃদয়-সুষমা, মনোমোহিনীর কাছ থেকে ভালবাসার প্রতিদান আশা কোর্‌তে পারে, এরই মনগড়া কত চিত্র তার অন্তর-মজ্জায় অঙ্কিত হয়ে আছে! আজ সে দেখ্‌তে চায়, বাস্তব কতখানি তার আশার সুসার এনে দেবে—কিন্তু কই, বিচিত্রা অভ্যর্থনা চুলোয় যাক্—দেখা দিতেও আসে না। ঘরের ভিতরের নূতন প্যাট্‌রার আমদানী, প্রমাণ করে তার আগমনী! কিন্তু আসল মানুষটি কোথায়?...

অন্যমনস্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতার ধূলা ঝাড়্‌তে তার অনেকটা সময় নষ্ট হয়। অকারণ পকেট থেকে তুলে

নেওয়া ট্রামের মন্থলী টিকিটের নিয়ম কানুনে তার বড় বেশী আগ্রহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

দৃষ্টি থাকে টিকিটে, কিন্তু মন অন্তর মাঝে তলিয়ে যায়! এরই জন্যেই না সে কত বিনিদ্র রজনী শয্যায়, শয্যা-অসহ্যে ইজিচেয়ারে কাটিয়ে দিয়েছে।...মিলন মুহুর্ত্তের কত সুখকর স্মৃতিকে প্রাণের রসে, সমাদরে পুষ্ট কোরে তুলেছে...এরই জন্যে না এর ভাললাগা জিনিষগুলি একটী একটী কোরে সে সংগ্রহ কোরে রেখেছে···আসার এই দিনটীতে এরই মনের মত জিনিষ কিনে দেবে বোলে, লুকিয়ে লুকিয়ে কত দিনই না সে ওভার টাইম্ খেটে টাকাগুলো সেভিংক্স্ ব্যাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছে...ওঃ সুদীর্ঘ দু'টী বৎসর!...তার কাছে দু'টী যুগ রূপ ধরে এসেছিল! কিন্তু, আজ!···সে তো বড় বেশীর প্রত্যাশী নয়,—এতটুকু ইঙ্গিত বা একটু মুচকি হাসি বা অকস্মাৎ আবির্ভাব,—তাই তার পক্ষে যথেষ্ট! কিন্তু দেবী কেন এতে বিমুখ, কেন এত কার্পণ্য?

প্রায় কোয়ার্টারখানেক অতীত হবার পর হঠাৎ সে পেছনে শব্দ পায়,—কে যেন আসে। তাড়াতাড়ি ফিতা খুলে, পা থেকে জুতাজোড়াটা বের কোরে, জামা খুল্‌তে লেগে যায়! সামনের আ'ল্‌না থেকে একখানা কোঁচান ধুতি বদলে পরে, আর একখানা পাখা নিয়েই বসে পড়ে,—দালানের ওপর।···

'পাখাটা দে আমি বাতাস করি' বোলে মা একরকম পাখাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই বাতাস কোর্‌তে কোর্‌তে বলেন, 'আজ তোর বড্ড খাটুনি হয়েছে নারে?'

পুত্রের মুখ ততক্ষণে অন্ধকারময়!

উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই মা অনর্গল বকে যেতে থাকেন,—'আজ বেলা দুটোর সময় বউমা এয়েছে,—বেই অনেক রকম খাবার সঙ্গে দিয়েছিল। একটা বড় রুই মাছও এয়েছে। সেটার পোলাও কোর্‌ছি।'

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দাসী এনে দিল গাড়ু গামছা, ছোট ভাগ্নী রেখে গেল পানের ডিবা। পাখাখানা মেজেয় তাড়াতাড়ি ধপাস্ কোরে ফেলে মা উঠে পড়েন খাবার আন্‌তে। ছেলে অনেকক্ষণ এয়েছে মনে পড়ে যায়।

সঞ্জীবের ছাড়া অফিসের কাপড়, জামা, গেঞ্জী স্বেদ-সিক্ত অবস্থাতেই মেজের এককোণে টাল হয়ে পড়ে থাকে। সে তখন ভাবে,—এই বুঝি বিচিত্রা এসে ওগুলো নিয়ে বারান্দায় গিয়ে মেলে দেবে! দৃষ্টি তার তখন রান্নাঘরে নিবদ্ধ,—ওখান থেকেই যে সে বেরুবে, এটুকু যেন সে সংস্কারবলে বুঝ্‌তে পারে!

কিন্তু···বেচারার হৃদয়খানা দলিত, মথিত কোরে মা নিয়ে আসেন খাবারের রেকাবখানা, আর দাসী নিয়ে যায়, ছাড়া কাপড়-চোপড়গুলা। আশ্চর্য্যে মা জিজ্ঞাসা করেন,—'এখনও হাত পা ধুলি না? কখন্ এয়েছিস্—সেই সক্কালে দু'টো হাতে-ভাতে কোরে গেছলি।'

শুষ্কমুখে সঞ্জীব বলে, 'আমার খিদে নেই।'

'না, না, ওঠ্, মুখখানা শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে যে।'

এক রকম জোর করেই মা তাকে ঠেলে তুলে দেন।...

'পোলায়ের আকূনি দেখ্‌তে হবে' বোলে খাওয়ার মাঝখানেই মা ছোটেন রান্নাঘরে। ইতিমধ্যে কী একটা কাজে বিচিত্রা রান্নাঘর থেকে বেরোয় সহসা,—তার মস্তক তখন অর্দ্ধাবগুণ্ঠন-মেঘে আচ্ছাদিত, আর দৃষ্টি মৃত্তিকা সংবদ্ধ! হঠাৎ আনন্দের একটা বিদ্যুৎ সঞ্জীবের শিরায় শিরায় বয়ে যায়, স্থানকাল ভুলে সে আনন্দে গলা খাঁকারী দেয়! কিন্তু প্রেয়সীর দৃষ্টি ফিরে না!

যেমন ভাবে সে বাহির হয়, তেমনি ভাবেই সে রান্নাঘরে আবার ঢোকে। সঞ্জীবের গলা খাঁকারী নিজেরই কাণে ব্যাঙ্গের মত বোধ হয়। সমস্ত খাবার আর খাওয়া হয় না,—সঞ্জীব হাত মুখ ধুতে চলে যায়?

মা ছুটে আসেন, ভৎ'সনার স্বরে বলেন,—'এখনও তুই তেমনই ছেলেমানুষটী রয়ে গেলি সঞ্জীব! ধরে না খাওয়ালে কী খাবি না? নিজের শরীরটার ওপর একটু দরদ কোরতে হয় ত।'

শুধু বকাই সার—মা খাবারের থালাখানা নিয়ে চলে যান।

দুই

সন্ধ্যা সম্মুখে।

শরীর ভাল নয় বোলে দালানেই একটা মাদুর পেতে সঞ্জীব শুয়ে পড়ে। মা এসে মাথায় একটা বালিস ঠেলে দিয়ে যান।

সন্ধ্যা হবার একটু আগেই বিচিত্রা ছাদের সব কাপড়-চোপড় যথাস্থানে এনে রেখে দেয়, ক্ষিপ্রহস্তে সাঁজের বাতি জ্বালে, আবার রান্নাঘরে পুনঃপ্রবেশ করে। অর্দ্ধ-মুদিত চক্ষে সঞ্জীব দেখে,—তার মনের সাঁজ যেমনই ছিল, তেমনই থাকে,—অন্ধকার! বিচিত্রা একটীবারও ফিরে তার দিকে তাকায় না। ওই দু'টী বছরে সে তার কত পরই না হয়ে গেছে!...

তার প্রেম যে বিচিত্রার চেয়ে কত উর্দ্ধে,—এটুকু ভেবে ভেবে সহসা তার মনটা গরম হয়ে ওঠে।...

চক্ষু বুজে নিদ্রা যাওয়ার ভান কতক্ষণ আর ভাল লাগে? কাজেই সে উঠে পড়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে টেবিল-ল্যাম্পটা উস্কে দিয়ে বটতলার একখানা উপন্যাস খুলে পড়্‌তে বসে যায়। অন্যমনস্কভাবে পাতার পর পাতা উল্টে চলে। কাণ থাকে কিন্তু রান্নাঘরের পানে, হাতের চুড়ির একটু টুং টাং শব্দ শোনার জন্যে। কিন্তু......

হাস্‌তে হাস্‌তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছোট ভাগ্নীটী সহসা এসে তার চিন্তাস্রোত ঘুরিয়ে দেয়। সে বলে,—'মামা, আজ এখনও পর্য্যন্ত দাবা খেল্‌তে যাও নি, অসুখ কোরেছে বোলে শুয়েছিলে; এখন যে বড্ড বই পড়্‌ছ?'

অন্যদিন এমন সময় পাশের বাড়ীতে সঞ্জীবের দাবার চাল জোর চালে চলে থাকে। তারা ডাক্‌তে এসেছিল। বালিকা বলে, 'আমি তাঁদের বলে দিয়েছি,—মামার অসুখ,—মামা আজ খেল্‌বে না।'

অফিস থেকে ফিরে আসা অবধি একজনের এতটুকু আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসে থাকার চিন্তায় সঞ্জীবের লজ্জা এল। সে উত্তর দেয়,—'তখন ঠিক্ বলেছিলি। এখন একটু ভাল আছি। এইবার যাই।'

বোলেই একটা সার্ট সে মাথার মধ্যে গলিয়ে দেয়, সাম্‌নে রাখা একটা ভাঙা ছাতার বাঁট ছড়ি মনে কোরে বগলে নিয়ে বেরুতে যায়, এমন সময় বালিকা খিল্‌খিল্ কোরে অট্টহাস্য কোরে ওঠে। হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে চীৎকার কোরে বলে,—'মামা উল্টো জামা পরেছে,—ছাতার বাঁট ছড়ি কোরেছে।'

অদূরে রান্নাঘরেও মনে হয়—কারা যেন চাপাগলায় হাসে।

ভুল সংশোধন কোরে, ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে ফুল্‌তে ফুল্‌তে সঞ্জীব রাস্তায় নেমে পড়ে।

তিন

অসুখ হয়েছে বোলে যখন প্রচারিত হয়েছে, তখন সেই কথাই থাক্। পাশের বাড়ীর জান্‌লার পাশ কোনও গতিকে কাটিয়ে সে এগিয়ে চলে নির্জ্জন গঙ্গাতীরের অভিমুখে। তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে শুধু একটা প্রশ্ন উঁকি মারে—বিচিত্রা কী তাকে ভালবাসে, যেমনতর সে তাকে বাসে? —না, কখনই না। হ্যাঁ, সত্য বটে, দু'বছর আগে পিত্রালয়ে যাবার সময় হাসি-কান্নার মধ্যে চোখের জল সে ফেলেছিল—কিন্তু সে কী প্রেমাশ্রু? পোষা পশু-পক্ষীর বিরহেও মানুষ অমনতর দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

সে সিদ্ধান্ত করে,—সে ভালবাস্‌লেও বিচিত্রা তাকে ভালবাসে না,—আদৌ না,—এতটুকুও না!

তখন দমকা বাতাস মধ্যে মধ্যে ফুলে ফুলে উঠে জলে, গাছে, মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল। বাতাসের একটা ঝাপ্‌টা যখন তার নাকে-কাণে-মুখে আছাড় খায়, তখন তার হুঁস হয়—সে গঙ্গাতীরে এসে পৌচেছে!

মনের ঝড় মিতালী করে বাইরের ঝড়ের সঙ্গে...তার বড় ভাল লাগে...তীরে ঘাসের ওপর সে বসে পড়ে। কিন্তু...বাইরের ঝড়টা তাকে উদ্ব্যস্ত কোরে যাবার পরই ভিতরের ঝড় ঠেলে ওঠে, তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কয়েক ফোঁটা জল চোখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে আসে!...

অদূরে পেটা ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা বেজে ওঠে। সহসা তার চমক ভাঙে। সে উঠে দাঁড়ায়।...পেছন থেকে কে যেন তার সজল চোখ দুটো সজোরে টিপে ধরে,—কিছু বল্‌বার আগেই, পেছনের লোক হাঁকে,— 'আরে, তুই এখানে বসে কাঁদছিস্‌ ?'

তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সঞ্জীব বলে, 'যে জোরে টিপন্‌ দিয়েছ, জলের আর অপরাধ কী ? তারা জোড়্‌টা যে ছিট্‌কে যায় নি—এই-ই আমার বরাত জোর।'

একটা কাজের জন্য এসেছিল নীরদ,—কাজেই একটু থতমত খেয়ে সে বলে—'তোর কী বড্ড লেগেছে ?'

কথাটা চাপা পড়ে দেখে, সোৎসাহে সঞ্জীব বলে,—'থাক্‌ গে, এমন কিছু নয়। তোর খবর কি ?'

করুণকণ্ঠে নীরদ বলে,—'ভারী দুঃখিত হলাম। কিন্তু একটা কথা···আমি অফিসের ফেরৎ কাল পুনায় যাচ্ছি, অফিসেরই কাজে। সুধা আর মা দু'জনেই রোগে শয্যাশায়ী, তাদের মুখে জল দেবার মত একটীও আত্মীয়-স্বজন কাছে নেই,—তুই যদি আমার অবর্ত্তমানে—

সুধা হচ্ছে নীরদের স্ত্রী।

বাধা দিয়ে সঞ্জীব বলে,—'তার জন্যে তোর অত ভাব্‌তে হবে না। তুই না বল্‌লেও, খবর পেলেই তাঁদের ব্যবস্থা কোর্‌তে যেতুম। তবে একটা কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, তোর এমন বিপদ্‌ শুনেও কী বলে' সাহেব তোকে জোর কোরে পুনায় পাঠায় ? তাঁকে সব বলেছিলি ?

নীরদ বলে,—'বোল্‌তে কী আর বাকী রেখেছি—দরখাস্তের ওপর দরখাস্ত দিয়েছি। তবে সাহেবের দোষ নেই। তিনি বলেন,—জরুরী কাজ। পুনার ব্যাঙ্ক অফিসের কেসিয়ারের নামে তহবিল তছরূপের মামলায় প্রয়োজনীয় খাতাপত্র সব এখান থেকে যাবে। যাকে-তাকে তো বিশ্বাস কোরে পাঠান যায় না। তবে যদি আমি কোনও ডিপার্টমেণ্টের কোনও পুরনো কর্ম্মচারীকে রাজী করাতে পারি, তা' হ'লে সাহেবের কোনও আপত্য থাকবে না।'

সাগ্রহে সঞ্জীব ফের জিজ্ঞাসা করে,—'অফিসের বাবুদের জিজ্ঞেস করেছিলি ?'

'সে আর বোল্‌তে,—কেউ রাজী হয় না। বিপদের সময় বন্ধুও বিগড়ে যায় ;—তাই বুঝি বা হয়েছে আমার কপালে।...'

আর একটা দমকা বাতাস হা হা হা কোর্‌তে কোর্‌তে সঞ্জীবের মাথা-মুখের ওপর দিয়ে ছুটে যায়,—তার মন উদাস হয়ে ওঠে। গঙ্গাজলে প্রতিফলিত একটা আলোক-রশ্মির ওপর সে দৃষ্টিনিবদ্ধ কোরে থাকে। খানিক পরে সে সহসা বলে ওঠে,—'আচ্ছা, আমি যদি যাই, সাহেব আমায় পাঠাবেন না ? বেশ তো,—একটা নতুন দেশ বেড়িয়ে আসা যাবে এখন,— দেশ-ভ্রমণে আমার ভারী আনন্দ হয়।'

নীরদ যেন সহসা আকাশের চাঁদ হাতে পায় ! তার কথায় বিশ্বাস কোর্‌তে পারে না। সে বলে,—'দূর পাগল ! তাও কী হয় ? দু'বছর পর সবে আজ মাত্র বৌঠান এয়েছে—'

বাধা দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নীরদের দুটো হাত ধরে সঞ্জীব বলে, 'না না, তুই কালই সাহেবকে বুঝিয়ে বল্‌—আমি রাজী। আহা ! বিপদের সময় বন্ধুকে বন্ধু না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে বল্‌। আমারও তো একদিন আছে অমননতর।'

সঞ্জীবের জিদে নীরদ আর অবিশ্বাস কোর্‌তে পারে না। বলে—'আচ্ছা, তুই সকালেই আমার হাতে সাহেবের নামে একটা সম্মতি-পত্র দিবি। তাঁকে দেখাব। তোকে পেলে তাঁর কোনও অমত হ'তে পারে, এমনতর তো মনে হয় না।'

চার

সঞ্জীব যখন বাড়ী ফেরে, তখন রাত্রি বারটা। সকলে ঘুমন্ত,—বিচিত্রাও। গরুর গাড়ী, রেলপথ ইত্যাদির পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় বসে থাকতে থাক্‌তে পাশ বালিসে ঢলে পড়ে। তারপর একেবারে কখন সে ঘুমে অচেতন।

শয়ন-ঘরের এককোণে, আঁচ-নেভান তপ্ত তোলা উনানের ওপর ঢাকা পোলাও। তার ওপর ব্যঞ্জনাদি ঢাক্‌নি ঢাকা। কাজেই সব গরম। খাবারের পাশে, অন্তরের শিখার মতই বাতির শিখা দাউদাউ জ্বলে।

ঘরে ঢুকেই সব অবস্থাটা একনজরে সে দেখে নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে যায়। বিচিত্রাকে ডাক্‌বার ইচ্ছে এক-একবার হয়,—আবার মনের মধ্যে একটু দরদ জেগে ওঠে—আহা! বেচারা বোধ হয় পথশ্রমে শ্রান্ত! কিন্তু সে দরদটুকু মিলিয়ে যেতেও দেরী হয় না —বেহায়া, তোর কী লজ্জা নেই ......

বিচিত্রাকে আর ডাকা হয় না।

পরদিন প্রভাতে উঠে সঞ্জীব দেখে,—অরুণ কিরণে ঘর ভরা। শয্যা বিচিত্রা-শূন্যা।...

রাতের কথাগুলো মনে পড়ায়,—পুনা যাত্রার কথা মনে জাগে, তার বুকের মধ্যে কে যেন হা হা কোরে ওঠে।......তবু......খবরটা একবার বাড়ীতে দিতে হবে তো।

কিন্তু কী জ্বালা! সেদিন সকালবেলায় অফিস যাবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও বিচিত্রা তার সাম্‌নে দেখা দেয় না।...

বিচিত্রা কিন্তু তখন মায়াময়ী নিদ্রাদেবীর ওপর আঙুল মট্‌কাচ্ছিল।

অপরাহ্ণে বাটী ফিরেই সঞ্জীব জলদগম্ভীরস্বরে প্রচার করে,—তাকে এখনই পুনায় যেতে হবে। অফিসের হুকুম। শূন্যে দৃষ্টিবদ্ধ কোরে যেন কোন্ অদৃশ্য জীবকে সে বলে,—আধঘণ্টার মধ্যেই তার হাতব্যাগটায় যেন কাপড়-চোপড় ভরা হয়;—সে মুটে ডাক্‌তে যাচ্ছে। সঞ্জীব ছুটে সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে আসে। পিছনে তার মায়ের গলা শোনা যায়,—'দাঁড়া, দাঁড়া, জলটল খেয়ে যা'! সময় ঢের পাবি।'

...ততক্ষণে সঞ্জীব রাস্তায়।...

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আস্‌বার আগেই বাড়ীর আঁধার ঘনিয়ে এনে সঞ্জীব একেবারে হাজির মুটে সমেত। অদূরে একটা হাতব্যাগ কার অদৃশ্য হাতের কেরামতিতে স্ফীতোদরে একপাশে ঢলে পড়ে, যেন হতাদরে নতমুখ! সঞ্জীবের বুকখানা টন্‌টন্ কোরে ওঠে।...

মায়ের দেওয়া খাবার দু'-একটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদরস্থ কোরেই এক গ্লাস জল ঢোঁক কোরে সে গিলে ফেলে।...তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে মুটেকে বলে,—'উঠাও জল্‌দি।'

তারপর সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে আসে,—পিছু পিছু মা বোল্‌তে বোল্‌তে আসেন,—'এখনো গাড়ীর ঢের দেরী। একটু জিরিয়ে গেলে হয় না?'

কথা ক'টা মা দু'-তিনবার বলেন। কিন্তু সে জবাব দিতে পারে না। তার বুক ফাটে কান্না তখন ঠেলে আস্‌তে চায়! পথে নাম্‌বার আগেই মাকে একটা ঢিপ্ কোরে প্রণাম কোরে নিজেকে সে সামলে নিয়ে বলে,— 'অফিসে একবার যেতেই হবে। খাতাপত্র আর আর্‌দালিকে নিয়ে তবে ট্রেণ ধর্‌তে হবে। সময় কই?'

সে আর দাঁড়ায় না,—হন্‌হন্ কোরে সে ছুটে চলে।...

পাঁচ

তিন দিন গত হয়ে যায়,—সঞ্জীবের কোনও সংবাদ নেই। এমন ব্যস্ত হয়ে গেল সে, যে, ঠিকানাটাও কেউ মনে কোরে তার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে নি।

অনেক কষ্টে নীরদের কাছ থেকে মা তার ঠিকানাটা যোগাড় কোরে এনে বিচিত্রাকে দিয়ে বলেন— এমন পাগল ছেলেও কার থাকে! আমরা বুড়-হাবড়া আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। তোমার কাছেও ত অন্ততঃ ঠিকানাটা দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তার। আর তুমিই বা কেমন বোকা মেয়ে মা, জিজ্ঞেস করে নিতে পারনি। শুধু মুখ শুখিয়ে ঘুরলে কি করব বল! যাও; বেশ করে একখানা গুছিয়ে চিঠি লিখে দাও ত যাতে উত্তর দিতে পথ না পায়।

বধূর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। অকারণে

সে ঘামতে সুরু করে দেয়। চিঠি লিখ্‌তে হবে, ছি ছি, কি লজ্জার কথা! কিন্তু শ্বশ্রূর আদেশ অমান্য করতে পারে না।

সে চিঠি লেখে—

'পৌঁছে একদম সংবাদ দিলে না। আমরা সকলে ভেবে মর্‌ছি। মা আহার-নিদ্রা ত্যাগ কোরেছেন। অধিনীর অপরাধ মার্জ্জনা কোরো। তোমা বিনে এখানে কেউ ভাল নেই।

ইতি তোমার অনুগতা—বিচিত্রা'

সে যে নিজে আহার-নিদ্রা ত্যাগ কোরে বসেছে,—মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছে,—এ সব কথা লিখ্‌তে তার বড় লজ্জা করে। অনেক ভেবে-চিন্তে, পাছে দোষণীয় না হয়, অমনতর একখানা পত্র খাড়া কোরে সে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। মাও নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন।...

পত্রে কোনও কবিত্ব ছিল কি না,—তা' সঞ্জীবই একমাত্র বোল্‌তে পারে। তবে ফেরৎ ডাকে একটা জবাব এল। সকলের পক্ষে,—এমন কী বিচিত্রার পক্ষেও তাই যথেষ্ট। পত্রটী এই—'আগামী সোমবার রাত্রি এগারটায় বাটী পৌঁছবো। পথে একটা কাজ সার্‌তে কিছু দেরী হতে পারে। আমি ভাল আছি।'

পত্র-প্রেরক নিজেকেই গৃহীতা কোরে শিরোনামায় নিজের নাম লিখে পত্র পাঠিয়েছে।

মা মনসার উদ্দেশে, মা হাত তুলে গড় করেন।

সোমবার বাড়ী ফির্‌তে সঞ্জীবের রাত্রি বারটা বেজে যায়। কাজেই অভ্যাসমত সকলে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু বিচিত্রা দরজায় হেলান দিয়ে একটা জলন্ত আলোর সাম্‌নে বসে ঢুল্‌তে থাকে।...বিস্ময়ে সঞ্জীবের মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে।

ওই উপবিষ্ট অবস্থায় উঠ্‌তে গিয়ে কি সঞ্জীবকে নমস্কার কোর্‌তে গিয়ে (বোঝা যায় না) ঘুমের ঢুলে বিচিত্রা পড়ে যায় তারই পায়ের ওপর।...

মাথা হেঁট কোরে বিচিত্রার মুখ তুলে ধর্‌তেই সবিস্ময়ে সঞ্জীব দেখে,—দু'ফোঁটা জল তার চোখের কোণ বেয়ে নেমে আস্‌ছে!

সস্নেহে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে লোভ সংবরণ কোর্‌তে না পেরে তার তপ্ত কপোলে একটা গভীর চুম্বন রেখা সে এঁকে দেয়।...

কাপড় ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে সঞ্জীবের মনে হয়।—কী ভুলই না কোরেছে সে!...

বাড়ী ফের্‌বার সময় ট্রেন-পথে, কাপড়-জামা-টাকা-সমেত হাতব্যাগটা হারিয়ে তার মনের মধ্যে এতক্ষণ কেমন একটা খচ্‌খচ্ কর্‌ছিল।

বিচিত্রাকে ফিরে পেয়ে, সহসা তার মনে হাসি এল—ভুলের দণ্ড তার পক্ষে ন্যায্যই হয়েছে বটে!

শ্রীআশুতোষ ঘোষ
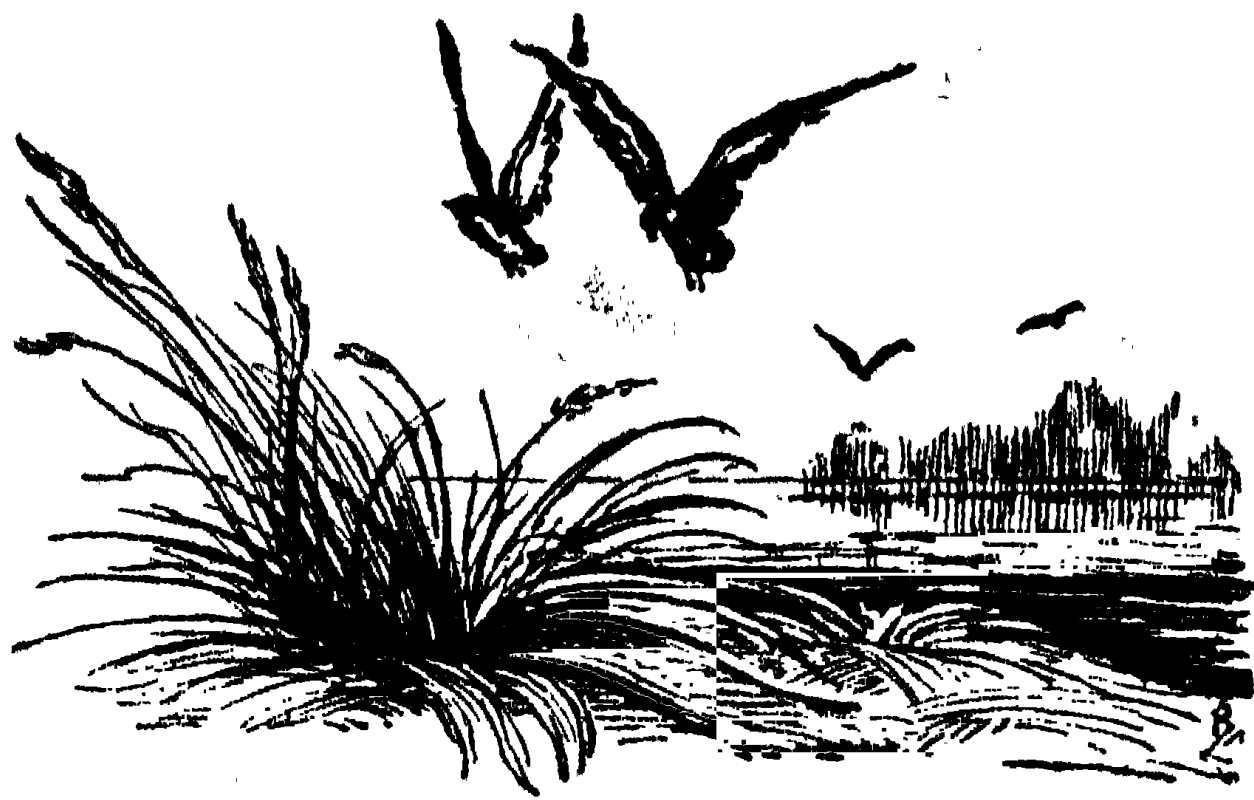
শনিবার

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম-এ

সেদিন ছিল শনিবার। বেলা তখন প্রায় একটা বাজে। অফিসে একটা কোণের দিকে অনন্তের সিট্। টেবিলের উপর খাতাপত্র মেলিয়া, চেয়ারের পিছন দিকে মাথাটা হেলান দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখের সিটে বিমলবাবু কেন, অফিসের চোদ্দআনা লোকের মধ্যে আজ একটা ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কাল মাহিনার দিন গিয়াছে, আজ শনিবার বাড়ী যাইতে হইবে। কেরাণী-বাবুরা অনেকেই প্রবাসী। মেসের ভাত, উড়ে ঠাকুরের রান্না হলুদ গোলা ইলিস্ মাছের ঝোল, লাউ দিয়া কুচা-চিংড়ির ঘণ্ট খাইতে খাইতে প্রাণান্ত হয়। যাক্, বাড়ী গিয়া দুটো দিন তবু মুখ বদলাইতে পাইবে।

বিমলবাবুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আজ কুড়ি বৎসর চাকরী করিতেছেন। পনের টাকায় ঢুকিয়াছিলেন, আজ তাহা পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। প্রতি শনিবার বাড়ী যাওয়া চাই। একটা সপ্তাহ ফাঁক যাইবার উপায় নাই—তা' সে যতই বাধা-বিপত্তি থাক্ না কেন। মেসের লোকেরা এই লইয়া কানাকানি করে। কোন ছুটিছাটাতে মেসে যদি সখ করিয়া একটা 'ফিষ্ট' হয়, সকলে বলে—"দাদা, আজ আর বাড়ী নাই গেলেন; পাঁচজনে আনন্দ করে' কর্‌ছে।"

বিমলবাবু বলিয়া ফেলেন—"তা' কি করে' হবে ভাই, বাড়ীতে কত কাজ।"

মেসের মধ্যে অবিনাশ মুখফোড়। বয়সেও ছোট। সে বলিয়া উঠে—"ও কথা বলো না হে, দাদার হাজ্‌রে কামাই হ'লে বৌদিদি রাগ কর্‌বেন। আর সে কি যে সে রাগ—তা' ভাঙ্‌তে দাদার প্রাণান্ত ব্যাপার! তোমরা ত জান না—আমার সব কথা জানা আছে কি না।"

বিমলবাবু হাসিতে হাসিতে বলেন—"যা' যা', ফাজলামি করিস্ নি! সেদিনের ছেলে, ঘরের কোণে বসে' জিওগ্রাফী মুখস্ত কর্‌তে দেখ্‌লাম—উনি আসেন আবার আমার সঙ্গে এয়ারকি কর্‌তে!"

হাসিয়া অবিনাশ পলাইয়া যায়।

অফিসের কর্ম্মসঙ্গীরা পর্য্যন্ত বিমলবাবুর এ দুর্ব্বলতা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিত। কাল মাহিনা পাইয়াছেন, বিমল-বাবু হিসাব মিলাইতেছিলেন। মেসের চার্জ বার টাকা। অফিসে জলখাবার তিন টাকা। দুপুরে সকলে খায়; না খাইলে চলে না—কিন্তু মাস গেলে তিন টাকা দিতেও মন কেমন করে। ও টাকা ক'টায় খুকীর একটা জামা হইত। সে ক'দিনই বলিতেছে—একটা ভাল জামা নেই; কোথায় নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে লজ্জা করে। ছেলে ক্লাসে উঠিয়াছে; তাহার নূতন বই চাই—পড়ে ত ভারী, কিন্তু বইয়ের সংখ্যা কম নয়—তা'তেও কোন্ না গোটা আষ্টেক টাকা লাগিবে। গিন্নীর কাপড় একেবারে নাই; এক জোড়া না হইলে অন্ততঃ একখানিও ত চাই—তাও ধর টাকা দেড়েক। বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছে—রুস্তমপুরের গোমস্তা খাজনা লইতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আবার রবিবারে আসিবে বলিয়া গিয়াছে। তিন সনের খাজনা বাকী। চার টাকা করিয়া খাজনা,—এক বৎসরের মিটাইতেই হইবে। এই গেল গিয়া সাড়ে আটাশ টাকা। তারপর বাড়ী হইতে লম্বা ফর্দ্দ আসিয়াছে। মশলাপাতি, সাবু-মিছরি এও ত নানান রকমের—তা'তেও কোন্ না টাকা দেড়েক যাইবে। হাতে রইল মোট কুড়িটী টাকা। চার সপ্তাহে বাড়ী যাইতে অন্তত পাঁচ টাকাও লাগিবে। বাকী রইল পনের টাকা—ওটা বাড়ীতে সংসার-খরচ দিতে হইতে। দুধের দাম, দোকানের উঠ্‌না এ সব শোধ করিয়া বাজার-খরচ, 'এস জন, বসো জন' সব খরচই উহাতে চালাইতে হইবে।

বিমলবাবু হিসাব শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অনন্ত তখনও সেই একভাবে বসিয়া আছে। নিস্পৃহ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা, বাড়ী যাচ্ছেন ত ?"

বিমলবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ তা' যেতে হবে বই কি। সাত-সাতটা দিন সহরের ধুলো-বালি খেয়ে প্রাণ অস্ত—তার উপর খবর পেলাম, ছোট ছেলেটার অসুখের মত হয়েছে, থাকি কি করে' বলো ?"

অনন্ত বলিল—"ছেলের অসুখ যখন, তখন থাকা আর কি করে' হয়।"

অনন্ত ভাল রকমই জানিত, ছেলের অসুখ বিমলবাবুর মিথ্যা কথা। শনিবারে বাড়ী না গিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না।

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমিও যাচ্ছ ত হে ?"

অনন্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা' আর হ'ল কই ? যাব ত মনে করেছিলাম, কিন্তু এক ফ্যাসাদ বেধেছে। ছাত্রের বাড়ীতে আজ একটা কিসের খাওয়ান-দাওয়ান আছে ; কর্ত্তা অনেক করে'বলে' দিয়েছেন —না গেলেই নয়। পনেরটা করে' টাকা দেয়—জানেন ত সব, চটাতে ভয় হয়।" বলিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল।

বিমলবাবু আর উচ্চবাচ্য না করিয়া কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে ; হাতের কাজটুকু সারিয়া ফেলিতে হইবে। সকালে কেনাকাটা কিছুই হয় নাই ; অফিস হইতে বাহির হইয়া ও সব করিতে হইবে। তার-পর দু'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটের ট্রেণফেল হইলে, আবার গাড়ী রাত্রি ন'টায়—তা' হইলে বাড়ী যাইতে যার নাম সেই রাত্রি বারটা। বিমলবাবু তাড়াতাড়ি কাজ করিতে লাগিলেন।

ও পাশের টেবিলে বসিয়া ললিতবাবু কাজ করিতে-ছিলেন। দেশ তাঁহার খুলনা জেলায়। সেখানে যাইতে আসিতে সাত টাকা খরচ। বছরে দুইবার বাড়ী যান। সামান্য কেরানী, অত টাকা পাইবেন কোথা ?

অনন্ত বি-এ পাশ করিয়া অফিসে ঢুকিয়াছে। মাহিনা পঁয়ত্রিশ টাকা। কাটোয়া লাইনে বাড়ী। বাড়ীতে মা, ছোট ভাই, স্ত্রী ও তিনটী ছেলেমেয়ে আছে। কম রোজগার—প্রতি সপ্তাহে বাড়ী যাইতে পারে না—এক সপ্তাহ অন্তর যায়।

দক্ষিণের টেবিলে হাঁটু তুলিয়া, চেয়ারটায় ঠেস্ দিয়া হিমাংশু একখানা নভেল পড়িতেছিল। সহরেই তাহার বাস। বৎসর দুই হইল এইখানেই বাসা করিয়াছে ; স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকে—বাড়ী যাইবার হাঙ্গামা নাই। বাড়ীতে আছে বুড়া বাপ-মা—মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দেয়।

দুইটা বাজিতে আর দশ মিনিট বাকী। বাবুরা যে যাহার খাতাপত্র বন্ধ করিয়া ফেলিল। অনেকেই অফিসে আসিবার সময় হাটবাজার করিয়া আসিয়াছে। ঝাড়নে বাঁধা পোঁটলাপুঁটলি এতক্ষণ টেবিলের তলায় রক্ষিত ছিল—এখন সকলে সে সব টানিয়া বাহির করিল। কেহ কেহ আবার সেগুলি খুলিয়া—কোন জিনিষ লইতে ভুল হইয়াছে কি না দেখিয়া আবার বাঁধিয়া লইল। সকলেরই মুখে একটা তৃপ্তির ছাপ—পরিজনের সহিত মিলিত হইবার আশু-আনন্দে উৎফুল্ল।

বিমলবাবুর আর ধৈর্য্য থাকিতে ছিল না—কেনা-কাটা কিছুই হয় নাই ; উসখুস করিতেছিলেন। একটু এদিক-ওদিক চাহিয়া কোটের বোতামটা ঠিক্ করিয়া লাগাইয়া একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সোজা বড়বাবুর নিকটে গিয়া বলিলেন—"দেখুন, আজ সকালে কিছু কেনাকাটা কর্‌তে পারি নি—তার উপর ছেলেটারও অসুখের খবর পেলাম ; ফলটল দু'-চারটে নিতে হবে, তা' তা আমি এখন—"

বড়বাবু লোক ভাল। বিমলবাবুকে তিনি বেশ ভালরূপ চিনিতেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তা' যান্, কিন্তু দেখ্‌বেন। সোমবারে যেন ট্রেণ ফেল না করেন।'

বিমলবাবু—"না না, তা' কি হয়।" বলিতে বলিতে ত্রস্ত-

পদে চলিয়া গেলেন। গাড়ী ফেল করা তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে মাঝে মাঝে প্রায়ই ঘটিত।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। বাবুরা যে যাহার সিট্ হইতে উঠিয়া পড়িলেন—নিজ নিজ পোঁট্‌লাপুঁট্‌লী তুলিয়া লইলেন। তারপর পিপীলিকা শ্রেণীর মত কাঠের সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। কাহারও হাতে তরী-তরকারী; কাহারও বা হাতে ঝাড়নে বাঁধা গোটাকতক কমলা লেবু, হর্‌লিক্‌সের কৌটা; কেহ বা এক হাতে এক গোছ পাণ, অন্য হাতে ছেলের জন্য দু'-একটা খেলনা লইয়াছেন। এমনই হরেক রকমের জিনিষ লইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা, হাসি-ঠাট্টা, উপরওয়ালাদের বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে চলিতেছেন। আজ সকলের বেশেরও একটু পরিপাট্য আছে; দাড়ী কামান, পরণে ফর্সা কাপড়-জামা—কেরাণী-মহলে আজ যেন একটা ছোটখাট উৎসবের দিন। আনন্দের স্বর্গ হইতে যেন একটা রশ্মি তাহাদের অন্ধকারময় জীবনে ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

অনন্ত তখনও নিজের সিটে বসিয়া উৎসুকভাবে এই সব দেখিতেছিল। মনটা বিমর্ষ; বাড়ী যাইবে বলিয়া আসিয়াছিল, যাওয়া হইল না। একবার ভাবিল, দূর ছাই, চলিয়াই যাই—যা' বলে বলিবে। আবার ভাবিল—কি জানি যদি অসন্তুষ্ট হয়; দু'দিন পরে যদি বলে—অন্য মাষ্টার রাখিয়াছি—তাহা হইলেই ত চমৎকার! পনেরটা টাকায় যাহা হউক কলিকাতার খরচা ত চলিয়া যাইতেছে—অফিসের মাহিনাটা তবু পূরাপূরিই বাড়ীতে দিতে পারিতেছে। তা' ছাড়া, ভদ্রলোককে কথা দিয়াছে খাটিয়া-খুটিয়া দিবে—না গেলে অভদ্রতা হইবে। এক সপ্তাহ নাই বা যাওয়া হইল। অবনীকে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে; আবার সোমবারে তারই হাতে বাড়ীর চিঠি পাইবে—তবে আর ভাবনা কি? টেবিলের ড্রয়ার বন্ধ করিয়া চাবিটা পকেটে ফেলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

অফিসের বাহিরে আসিয়া ট্রামে উঠিতে গিয়া কি ভাবিয়া সে হাঁটিয়াই চলিল। দু'ধারে তাকাইয়া দেখিল—কি ভীড়! হাওড়া ষ্টেশনের মুখে হুহু করিয়া জনপ্রবাহ ছুটিতেছে। কাহারও দাঁড়াইবার অবসর নাই—দেরী হইলেই ট্রেণ ফেল করিবে। অনন্ত ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডানদিকের ফুটপাত ধরিয়া সে চলিতেছিল বৌবাজারে তাহার মেসের দিকে।

দু'পাশে সারি সারি দোকান—হরেক রকমের ব্যাপারীরা কেনা-বেচা করিতেছে। সুমুখে সব নানান ধরণের সাইনবোর্ড—"ছয় আনা পাউণ্ডের সস্তা চা।" "সেভিং সেলুন"—উত্তমরূপে দাড়ি ও চুল ছাঁটাই হয়।" "খাঁটি গিনি সোণার অলঙ্কার-বিক্রেতা—এন সি সরকার এণ্ড কোং।" "প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা—মণ্ডল ব্রাদার্স।" এমনি কত কি? মোড়ের মাথায় একজন লোক কমলালেবুর ঝাঁকা লইয়া বসিয়া আছে—তিন পয়সা ও চার পয়সা জোড়া হাঁকিতেছে। ফুটপাথের পাশে একটা টিনের বাক্সে কতকগুলা বিড়ির তাড়া লইয়া ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে—"দু' পয়সা বাণ্ডিল—সস্তা বিড়ি নিয়ে যান বাবু—খুব সস্তা।"

চলিতে চলিতে একটা বড় কাপড়ের দোকানে কাচের শো-কেসের মধ্যে নানাপ্রকার বস্ত্র দেখিয়া অনন্তের মনে পড়িল—স্ত্রী সুধার জন্য একজোড়া কাপড় কিনিতে হইবে। তাহার বড়ই ইচ্ছা—আজকাল ওই সব কি 'গঙ্গা-যমুনা', 'তরুণী', 'সুন্দরী' নানারকম শাড়ী উঠিয়াছে, তাহাই এক জোড়া কিনে—কিন্তু দাম শুনিয়া সে ইচ্ছা অচিরে ত্যাগ করিতে হইল—ছয় টাকায় সুধার দু' জোড়া আটপৌরে কাপড় হইবে। গরীব কেরাণী, স্ত্রীকে মনের মত একখানা বস্ত্রও দিবার সাধ্য নাই! কথাটা ভাবিতে সে মনে একটু বেদনা বোধ করিল। বি-এ পাশ করা ছেলে দেখিয়া সুধার বাপ তাহার হাতে মেয়ে দিয়াছিলেন—খুব সুখেই সে তাহার স্ত্রীকে রাখিয়াছে! অনন্ত একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল; চলিতে চলিতে এক ভদ্রলোকের গায়ের উপর গিয়া পড়িল। লোকটী

বিরক্ত হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—"মশায় কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চল্‌ছেন না কি ?"

অপ্রস্তুত অনন্ত লোকটীর কাছে ক্ষমা চাহিয়া একটু জোরে জোরে পা চালাইয়া দিল।

মেসে আসিয়া দেখিল—মেস প্রায় নিস্তব্ধ। অধিকাংশ লোকই বাড়ী গিয়াছে ; আছে সে আর জনকয়েক ছাত্র। ছাতিটা দেওয়ালের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিয়া, জামাটা খুলিয়া দড়ির আল্‌নায় মেলিয়া দিল। ঘরের একপাশে এক বালতী জল সে সকালে তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল ; একটা নিজস্ব ঘটিও তাহার ছিল—চৌবাচ্ছার জলে সে মুখ ধুইতে পারে না ; ভাত-মাছের আঁশ কত কি পড়িয়া থাকে। হাত মুখ ধুইয়া সে ঝিকে ডাকিয়া চারটী পয়সা দিল জলখাবার আনিতে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতে আসিল—সে খাইবে কি না ? রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে, চাল লইতে হইবে না জানিয়া সে চলিয়া গেল।

ঝি ফিরিয়া আসিলে জলখাবার খাইয়া সে ছাতে গিয়া বসিল। রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। বেশ স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতেছে। ও পাশের বাড়ী হইতে কে একটী মেয়ে অর্গান বাজাইয়া একটা মিষ্ট সুর বাজাইয়া চলিয়াছে। অনন্ত ভাবিতে লাগিল—এতক্ষণ হয় ত তাহাদের গাড়ী 'খামারগাছি' ছাড়াইয়া গিয়াছে। বেলাশেষের পড়ন্ত রৌদ্র মাঠের উপর, গাছপালায় ঝিকিমিকি করিতেছে। গাড়ী চলিয়াছে। দু'ধারে ফাকা মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—ফসল সব তোলা হইয়া গিয়াছে। আলপথ দিয়া কোথাও একদল গরু ঘরে ফিরিতেছে—ট্রেনের শব্দে দু'-একটা ভীরু গাভী লাফাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। মধ্যে মধ্যে আম বাগান—ফাল্গুনের শেষাশেষি, বেশ বড় বড় গুটি ধরিয়াছে। নীচে বৌচ বন—ফলগুলি পাকিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। আশ-শেওড়ার জঙ্গল—কাঁটাঝোপে দু'-চারিটা পাখী বসিয়া কিচিমিচি করিতেছে। গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে—মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া। লাইনের বেড়ার ধারে আলোকলতা ঝুলিতেছে—কোথাও কোন্ ঝোপে ভাঁটফুল আর বনমল্লিকা ফুটিয়াছে ; তাহাদের গন্ধ বোধ হয় বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। কোথাও কোন গ্রামের ধারে ছোট ছেলেমেয়েরা সার দিয়া দাঁড়াইয়া গাড়ী দেখিতেছে—কোন্ দুষ্ট ছেলে বুড়ো আঙুল দু'টীকে কদলীতে পরিণত করিয়া যাত্রীদের দিকে বাড়াইয়া দিতেছে। লাইনের ধারে কোন আম বাগানের মধ্যে সান-বাঁধান পুকুর-ঘাটে গাঁয়ের মেয়েরা বিকালে গা ধুইতে আসিয়াছে। কাপড় কাচিতে কাচিতে আধ ঘোমটার ফাঁকে ট্রেণের দিকে তাহাদের কৌতুহলী দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। বেলাটুকু নিভিয়া গেল—গাড়ীও বোধ হয় এতক্ষণ গুপ্তিপাড়া ছাড়াইয়া চলিল। গুপ্তিপাড়ার সন্দেশ খুব ভাল—অনন্ত অনেকবার ছেলেমেয়েদের জন্য সেখান হইতে সন্দেশ কিনিয়া লইয়া গিয়াছে। আর দু'টো ষ্টেশন পরেই তাহাদের ষ্টেশন। সেখানে মোটর বাস্ নিশ্চয়ই আছে। সেখান হইতে বাসে করিয়া তাহাদের বাড়ী যাইতে বড় জোর পনের-কুড়ি মিনিট লাগে। এতক্ষণ বোধ হয় যাত্রী বোঝাই বাস্ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুধা হয় ত একটা হ্যারিকেন দিয়া ঝিকে বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে পাঠাইয়া দিয়াছে। খোকাও হয় ত সেই সঙ্গে আসিয়াছে—যে দুষ্ট ছেলে, না আসিয়া কি থাকিবে ? মা হয় ত এতক্ষণ আহ্নিকে বসিয়াছেন। সুধা দক্ষিণদ্বারী রোয়াকে গাড়ুতে করিয়া জল আর তাহার উপর গামছাখানি পাট করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। আজ হয় ত একটু সকাল সকাল সে কাজকর্ম্ম সারিয়া লইয়াছে। গা ধুইয়া একটী সেমিজ ও একখানি ফর্সা কাপড় পরিয়াছে—চওড়া লাল পাড় শাড়ীখানাই হয় ত পরিয়াছে—সে জানে ওই কাপড়খানিতে তাহাকে চমৎকার মানায়! আলতাপরা পায়ের উপর শাড়ীর আলতা পাড়টী কি সুন্দর দেখায়! সব দিন ছেলেমেয়ের জ্বালায় সুধা চুল বাঁধিতে পায় না—আজ হয় ত তাহাদের হাতে খাবার দিয়া একটু সময় করিয়া চুলটাও বাঁধিয়া লইয়াছে। একটা ছোট সিঁদুরের টিপ্ কপালে জ্বলজ্বল করিতেছে। কোঁকড়ান কালো চুলের মধ্যে সাবান দিয়া পরিষ্কার করা মুখটী—পাতার ফাঁকে সদ্য বৃষ্টিতে ধোওয়া ফুলটীর মত দেখাইতেছে। পাণও বোধ হয় একটা

খাইয়াছে—ঠোঁট দু'টী লাল টুক্‌টুক্ করিতেছে। ঠাকুর-ঘরে এবং তুলসীতলায় এতক্ষণ সন্ধ্যা দেখান হইয়া গিয়াছে। শোবার ঘরে বিছানাটী বোধ হয় বেশ পরিপাটী করিয়া পাতিয়াছে। মেজেয় বড় চওড়া করিয়া বিছানা, সুধা ও ছেলেমেয়েদের জন্য। তাহার জন্য খাটের উপর বিছানা পাতা—ছেলেমেয়েদের ঘেঁস সে মোটে সহ্য করিতে পারে না। সে নিজ হাতে কয়েকটা মল্লিকার ঝাড় পুঁতিয়াছিল—বোধ হয় সেগুলিতে ফুল ফুটিতেছে। সুধা হয় ত গোটাকতক ফুল তুলিয়া ডিসে করিয়া তাহার মাথার কাছে রাখিয়াছে। জলখাবার সাজানও বোধ হয় এতক্ষণ হইয়া গিয়াছে। সে মাস দুই আগে একটা ধবধবে শাদা গেলাস কিনিয়া লইয়া গিয়াছিল—সুধা হয় ত তাহাতে মিছরির সরবৎ করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সে জানে, তাহার স্বামীর সরবৎ বড় ভাল লাগিবে—তাতিয়া-পুড়িয়া যখন আসিতেছে। কুয়ো-তলায় বাল্‌তী করিয়া জলও হয় ত তোলা আছে। দক্ষিণদ্বারী রোয়াকটায় বড় রৌদ্র লাগে—নিজ হাতে সুধা সেটাকে জল ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিয়া সেখানে একখানি মাদুর বোধ হয় পাতিয়া রাখিয়াছে। আলনাতে তাহার কাপড়খানি কোঁচাইয়া রাখিয়া দিয়াছে; হাত-মুখ ধুইয়া সে পরিবে বলিয়া। উঠানের মাঝখানে বাতাবী লেবুর গাছটায় বোধ হয় অজস্র ফুল ধরিয়াছে—সারা বাড়ীটা গন্ধে আমোদ করিতেছে। সব কাজ সারিয়া সুধা হয় ত তরকারী কুটিতে বসিয়াছে। সে বড় বড় করিয়া আলু ভাজা খাইতে ভালবাসে—খোসা ছাড়াইয়া আলুগুলি বোধ হয় তেমনি করিয়া কুটিতেছে। বড় মেয়ে মিনা ছোট বোন্‌টীকে দোলনায় শোয়াইয়া দোল দিতে দিতে হয় ত সুর করিয়া গান গাহিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

বোধ হয় বাস্ এতক্ষণ গ্রামে আসিয়া থামিয়াছে। যে যাহার পোঁট্‌লাপুঁট্‌লী লইয়া নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। খোকা হয় ত উৎসুক-নেত্রে তাহাকে খুঁজিতেছে। সকলে চলিয়া গেলে পর ঝি বোধ হয় বলিল—"খোকা, তোমার বাবা আজ আর এলেন না, চল বাড়ী যাই।" সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এই কথায় খোকার কচি মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। একবার চারিদিকে তাকাইয়া সে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ীর দিকে চলিল। সুধা হয় ত এখনও বঁটি লইয়া তরকারী কুটিতেছে; আর এক-একবার সদর দরজার দিকে চাহিতেছে। মিনা একটানা সুরে খুকীকে ঘুম পাড়াইয়া চলিয়াছে। ঝিয়ের সহিত বাড়ী ঢুকিয়া খোকা কাঁদকাঁদভাবে বোধ হয় বলিল—"মা, কই, বাবা এলেন না ত?" সুধা চম্‌কাইয়া উঠিয়া খোকার কথার সুর টানিয়া হয় ত বলিল—"এলেন না?" আচম্‌কা বঁটিতে তাহার আঙুলটা বোধ হয় একটু কাটিয়া গেল। কাটা আঙুলটা মাটিতে টিপিয়া ধরিয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে সুধা বলিল—"এলেন না? তোরা ভাল করে' দেখেছিস্ ত?" ঝি বলিল—"দেখেছি বই কি বৌদি'—সকলে চলে' গেলে তবে ত আমরা এনু।" সুধা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—তাহার অন্তরে যে কি হইতেছিল, সে সব বুঝিতে পারিতেছে। মিনা বোন্‌টীকে দোল দিতে দিতে থামিয়া বলিল—"ও সোমবারে বাবা যে বলে' ছিলেন আস্‌বো। তাই ত, এলেন না কেন?" মেয়ের কথায় চমক ভাঙিতে সুধা যেন বলিল—"কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ত কেন এল না—শরীর খারাপ বলে' গিয়েছিল, অসুখ-বিসুখ কর্‌ল না ত?" ঝি বলিল—তা' নয় বৌদি', অসুখ কর্‌বে কেন? হয় ত কোন কাজে আট্‌কা পড়েছেন, তাই এ শনিবারে আস্‌তে পার্‌লেন না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুধা বোধ হয় বলিল—"তাই বলো ভাই, তাই যেন হয়। মেসে একলা পড়ে' থাকে, অসুখ কর্‌লে মুখে এক ফোঁটা জল দেবারও কেউ নেই।" সে যেন দেখিতে পাইল—তাহার চোখ দু'টী জলে ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। এতক্ষণ হয় ত মায়ের আহ্নিক হইয়া গিয়াছে। ওঘর হইতে তিনি হাঁকিলেন—"বৌমা, অনন্ত এল?" মিনা উত্তর দিল—"না ঠাকু'মা, বাবা আসেন নি।" "আসে নি? সে কিরে? আসবার কথা ছিল না?" মিনা বলিল—"ছিল ত, হয় ত কোন কাজে আটক পড়েছেন।" মা বোধ হয় আবার মালা লইয়া বসিলেন।

সুধা বঁটি তরকারী তুলিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিল।

তারপর গলায় আঁচল দিয়া হয় ত ঠাকুরের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল—"ঠাকুর, ভাল রেখো—অমঙ্গল যেন না হয়।" তারপর বাহিরে আসিতে ঝি বলিল—"বৌদি', আমি বাড়ী চল্লু গো।' সুধা বলিল—"তা' যাও। যাবার সময় সদর দরজাটা ভাল করে' ভেজিয়ে দিয়ে যেও—না হ'লে গরু গাছগুলো মুড়িয়ে খেয়ে যাবে। রাতে পাঁচপেয়ে আর গরুর জালায় অস্থির! হ্যাঁ, গোয়ালে সাঁজাল দিয়েছ ত?" "দিয়েছি।" বলিয়া বোধ হয় ঝি চলিয়া গেল। খুকী হয় ত এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মিনা ছোট ভাইটিকে লইয়া রোয়াকে অনন্তের জন্য যে মাদুর পাতা ছিল, সেখানে গিয়া বসিল। সুধা হয় ত উনানে আগুন দিতে বসিয়াছে—ছেলেমেয়েদের ও দেওরের জন্য রাঁধিতে হইবে। রান্নার উৎসাহ তাহার যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। কুচান ভাজার আলুগুলির দিকে চাহিয়া আপন-মনে বোধ হয় বলিয়া উঠিল—আহা, খাইতে ভালবাসে!

উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া তাহার সম্মুখে সুধা হয় ত বসিয়া আছে। মুখে জলন্ত উনানের আঁচ আসিয়া লাগিতেছে। মনে মনে বোধ হয় কত কি ভাবিতেছে। ছোট ভাই হেমন্ত আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"বৌদি', দাদা আসে নি?" মাথায় কাপড়টা তুলিয়া দিতে দিতে সুধা বলিল—"না।" হেমন্ত ছেলেমেয়েদের লইয়া পড়াইতে বসিল। সুধা মাথায় একটা মল্লিকা ফুল হয় ত গুঁজিয়া রাখিয়াছিল—কাপড় তুলিয়া দিতে গিয়া তাহাতে হাত পড়ায় তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

নীচে মেসের বড় ঘড়িটাতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। ঘড়ির শব্দে অনন্তের চমক ভাঙিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—বাড়ীর কক্ষে কক্ষে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে—মেসের ছাত্রেরা কলরব করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ছাত হইতে নামিয়া আসিল। তারপর জামা-কাপড় ছাড়িয়া শ্যামবাজারে ছাত্রের বাড়ীর অভিমুখে দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল।

ছাত্রের বাড়ী হইতে অনন্তের মেসে ফিরিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। পরিবেশন করিয়া দেহটা ক্লান্ত হইয়াছিল; জামা-কাপড় ছাড়িয়া সে শুইয়া পড়িল। বিছানায় শুইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—সুধা বোধ হয় এতক্ষণ খুকীটাকে কোলের কাছে রাখিয়া বড় ছেলে-মেয়ে দু'টীকে দু'পাশে শোওয়াইয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে।

রাত্রে ঘুমের ঘোরে অনন্ত পাশ-বালিসটার গায়ে হাত রাখিয়া ডাকিল—"সুধা!"

তারপর বালিসটাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আবার নিস্তব্ধ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

রস রঙ্গ

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

সুবোধ—"কাল পার্কে আমি দু'আনা কুড়িয়ে পেয়েছি।"

প্রবোধ—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার একটা দোয়ানী পড়ে' গিয়েছিল—আমাকে দে।"

সুবোধ—"তা' হ'লে বোধ হয় দোয়ানীটা পড়ে' দু'খানা হ'য়ে গিয়েছিল।"

* *

নব-বিবাহিত স্ত্রী—"তুমি কি আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে।"

স্বামী (উত্তেজিতভাবে)—"কেন? কি কর্‌লে তুমি?"

স্ত্রী—"আমার একটা দাঁতও আসল নয়—সব বাঁধান।"

স্বামী (মাথা থেকে পরচুল খুলে)—"যাক্ বাবা, বাঁচা গেল! এবার মাথাটা ঠাণ্ডা করা যাবে।"

* *

ছাত্র—"স্যার, আপনি আমার খাতার মার্জিনে কি লিখেছেন পড়্‌তে পার্‌লুম না ত।"

শিক্ষক—"লিখেছি, তোমার হাতের লেখা পড়া যায় না।"

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

"অতীতের সাক্ষী"

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

(নাটিকা)

[ঘরের একটা দিক বড় বড় ঝুড়িতে অসংখ্য খালি মদের বোতল স্তূপীকৃত করিয়া রাখা আছে ;—ঠিক যেন আবর্জ্জনার মত]

অশোকা। কি বল্লে ?—ঐ তোমার অতীত জীবনের সাক্ষী ?

অজয়। হাঁ, ঐ আমার অতীত জীবনের সাক্ষী। ইচ্ছা করলে,—তুমি এ বাড়ীতে আস্‌বার আগেই আমি ওগুলোকে সরিয়ে ফেল্‌তে পার্‌তাম, কিন্তু তা' করিনি,—কোন কথা গোপন কর্‌বো না ব'লেই।

অশোকা। কিন্তু তোমার এ সৎসাহস আমাকে বিয়ে কর্‌বার আগে ছিলো কোথায় ?

অজয়। তুমি কি আমার কোন কথা শুন্‌তে চাও না ?—না চাও, আমি থেমে যাচ্ছি।

অশোকা। শোনাবার আরো আছে না কি ?

অজয়। আছে।—পতি পরমগুরু হ'য়ে চোখ বুজে তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা নিতে চাই না। তুমি আমাকে জান, আমি তোমাকে জানি—তার পর যা' দাঁড়াক,—সেই আমার প্রাপ্য।

অশোকা। যাক্, কি বল্‌বে বলো ?

অজয়। আমি দেখ্‌তে কেমন ?

অশোকা। (হাসিয়া ফেলিয়া) শেষকালে সেই মামুলি কথায় এসে দাঁড়ালো ?

অজয়। মামুলি কথা নয়,—আমি কুৎসিৎ সে জানি। তবু তোমার চোখে কেমন ?

অশোকা। সবার চোখ থেকে কি আমার চোখ ভিন্ন ?

অজয়। আমি তোমার মুখ থেকে একটা শুন্‌তে চাই।

অশোকা। স্বামী হ'লে সুশ্রী কুশ্রীর কোন প্রশ্নই আসে না।

অজয়। বিয়ে কর্‌বার আগে—তখন যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌তো ?

অশোকা। সে উত্তর তখন দিতাম,—আজ নয়।

অজয়। আমার বয়স কত জান ?

অশোকা। (হাসিয়া) হয় ত পঞ্চাশ—

অজয়। না, অত নয়,—চল্লিশ। এই চল্লিশ বছরের কীর্ত্তি কাহিনী আজ আমি তোমাকে শোনাবো।

অশোকা। তার প্রয়োজন নেই।

অজয়। ভুল কর্‌ছো অশোকা!—স্বামী বেশ্যাসক্ত জানার পর স্ত্রীর পক্ষে তার কর্ত্তব্য সহজ হ'য়ে আসে।

অশোকা। নইলে ?—সহজ হয় না ?

অজয়। অন্ততঃ মনের সংশয়টা কোনদিনই ঘোচে না।

অশোকা। যাক্, তোমার কি বল্‌বার বল।

অজয়। বলি।—বিয়ে কর্‌বার কোন প্রয়োজনই ছিলো না আমার। মেয়ে মানুষের ওপর লোভ আর নেই। এই চল্লিশটা বছর ক'টা বছরই বা। কিন্তু আমি এই ক'টা বছরেই একশো বছরের দীর্ঘতা অনুভব করেছি। আমার যৌবন যদি আজো না গিয়ে থাকে—যদিও জানি সে বোধ হয় আর নেই।—কি ক'রে থাক্‌বে ? ছোট্ট শিশুকে মুখে নুণ টিপে টিপে মার্‌তে দেখেছো ? আমিও আমার যৌবনকে ঠিক অম্নি ক'রেই নিঃশেষ করেছি। আজ শক্তিও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই।—উপভোগের তিক্ততা আজ আমি অনুভব কর্‌ছি।—তবু আমি আমার যৌবনের সায়াহ্নে তোমাকে বিয়ে কর্‌লাম।—কেন জান ?

অশোকা। না।

অজয়। আমি যথার্থ ভালবাসার স্বাদ কোন দিনই পাইনি। এতদিন পরে—এই চল্লিশ বছর পরে, হঠাৎ একদিন আমি অনুভব করলাম,—আমি একা—বড় একা! —যেমন একা ঐ আকাশের সূর্য্য—নিজেকে নিঃশেষে পুড়িয়ে দিচ্ছে! (শিহরিয়া)—আমাকে বাঁচাও অশোকা!

অশোকা। তোমার আর কিছু বল্‌বার নেই তো?

অজয়। এ্যাঁ···বল্‌বার?—এখনও আমি মদ খাই। —আকাঙ্ক্ষা নেই,—স্বভাব। আমার সংশোধনের ভার নেবে অশোকা?

অশোকা। নেবো।—কিন্তু আমার কথা তো কিছু শুন্‌লে না?

অজয়। এ্যাঁ! তোমারও কিছু অতীত আছে না কি?

অশোকা। অতীত নেই কার?—দু'দিনের শিশুও তার একটা দিনকে অতীতে ফেলে এসেছে।

অজয়। না না,—আমি সে শুন্‌তে চাইনে; আমি হয়ত সহ্য কর্‌তে পারবো না।

অশোকা। যা' তুমি নিজে পার না, তা' আমার কাছ থেকে কি ক'রে আশা কর?

অজয়। এর যুক্তি নেই।—আমি জানি তুমি স্কটিশে পড়্‌তে।—

অশোকা। হাঁ, যেখানে মেয়ে-পুরুষে একসঙ্গে পড়ে।

অজয়। আমার শুন্‌তে ভয় করে।—তুমি ব'লো না।

[ছুটিয়া পলাইয়া গেল]

অশোকা। (আপন-মনে) শুন্‌তে ভয় করে—

অশোকা। ঝি!—ও ঝি!

[ঝির প্রবেশ]

অশোকা। দেখ্‌তো বাবু কোথায় গেল?

[ঝি চলিয়া গেল]

[রাস্তার ওধারে গির্জ্জার ঘড়িটা টং টং করিয়া বাজিয়া গেল; অশোকা জানালাটা খুলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিল]

অশোকা। এর মধ্যেই চারটে বেজে গেল!—এর মধ্যেই বা আর কেন; ঠিক সময়েই বেজেছে।—ঝি, —ও ঝি!

[ঝি প্রবেশ করিল]

ঝি। ও বৌদি'!—বাবু যে ওঘরে বসে মদ খাচ্ছে!

অশোকা। এ্যাঁ!—মদ খাচ্ছে! (একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল)

[টলিতে টলিতে অজয় প্রবেশ করিল]

অজয়। হাঁ খাচ্ছি।—এই, তুই যা'!

[ঝি চলিয়া গেল]

অশোকা। তোমার না আর মদে আকাঙ্ক্ষা নেই?

অজয়। আগে খেতাম নেশার জন্যে, এখন খাচ্ছি—তুমি যে স্কটিশে পড়েছো এই কথাটা ভুল্‌বার জন্যে।

অশোকা। তবে আমি কি খাব ব'লে দাও? তোমাকে আমার ভুল্‌তে হ'লে ও মদে শানাবে না।

অজয়। shut up; কলেজে পড়া মেয়ে কথা আয়ত্ব করেছো খুব!—তোমার বাক্স খোল,—আমি দেখবো। কুমারী অশোকার হয়ত অনেক পরিচয়ই জান্‌তে পার্‌বো। —আর তাইতো যায়—

অশোকা। যাক্‌,—এই নাও চাবি।

(চাবি ছুঁড়িয়া দিল)

[অজয় উল্লসিত হইয়া চলিয়া গেল]

[অশোকা একদৃষ্টে তাহার যাওয়ার পথে চাহিয়া রহিল,—যেন মৃন্মূর্ত্তি]

[অনেকক্ষণ কাটিল—

[যখন অজয় প্রবেশ করিল—তখনও অশোকা ঠিক সেইভাবেই দাঁড়াইয়া]

অজয়। তুমি একইভাবে দাঁড়িয়ে আছো দেখ্‌ছি প্রতীক্ষা করার অভ্যেস আছে তা' হ'লে?—কার জন্যে প্রতীক্ষা কর্‌ছো অশোকা?—এই নাও চাবি। (ফেলিয়া দিল)—আমিই ভুল করেছি অশোকা! কিন্তু এমন ভুল আমার না হওয়াই উচিত ছিল।—অভিজ্ঞতা তো আমারও কম নেই। স্কটিশে একদিন আমিও পড়েছি,—তবে তখন মেয়েরা পড়্‌তো না।

অশোকা। তোমার দুর্ভাগ্য।

অজয়। বেথুনের চাইতে স্কটিশে পড়বার আগ্রহই মেয়েদের বেশী নয়?

অশোকা। কি ক'রে জান্‌বো।

অজয়। (ব্যঙ্গে) জান না ?—তুমি বেথুনে পড়লে না কেন ?

অশোকা। আমার বাবা স্কটিশের প্রফেসর।

অজয়। হ'লেই বা। তিনি কি সব সময় তোমাকে আগ্‌লে থাক্‌তেন ?

অশোকা। এসব সম্বন্ধে কথা বল্‌তেও আমার ঘৃণা হয়। বাবা তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে যা' উচিত বিবেচনা করেছিলেন তাই করেছিলেন। তোমার ভুল হয়ে থাকে, আমাকে তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিতে পার।

অজয়। না, তা' পারি না। তোমাকে আমি বিয়ে করেছি।

অশোকা। মদ খেলেও সে জ্ঞান এখনও আছে দেখ্‌ছি।

অজয়। মদ খেয়ে আমি কখন মাতাল হই না।

অশোকা। দুঃখের বিষয় মাতাল বুঝ্‌তে পারে না কোন্‌টুকু তার মাতলামি। নইলে তুমি এই কিছুক্ষণ আগে আমার সংশোধনের ভার নেবে অশোকা ব'লে,—আমারই কৈফিয়ৎ নিতে ছুটে আস্‌তে না।

অজয়। নিশ্চয়,—কৈফিয়ৎ নেবো না? তুমি আমার স্ত্রী—

অশোকা। তবে মদ না খেয়ে সে কৈফিয়ৎ নেবার সাহস হলো না কেন ?

অজয়। তুমি থামো। আমি মাতাল নই। চাবি নিয়ে গিয়ে বাক্স খুলে ঠিক যেটুকু বের ক'রে আন্‌বার নিয়ে এসেছি। এ ছবি কার ?

অশোকা। আমি বল্‌বো না।

অজয়। আমি জানি ; তোমার কুমারী জীবনে—

অশোকা। (মুখ চাপিয়া) আর উচ্চারণ করো না। তুমি মাতাল, তুমি উচ্ছৃঙ্খল ! স্ত্রী পুরুষের ঐ একটি সম্বন্ধই তুমি জান। ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন।

অজয়। (ব্যঙ্গে) তবে তোমার সঙ্গে এটির কি সম্বন্ধ ?

অশোকা। তুমি অন্ধ ! নইলে দেখ্‌তে পেতে ঐ মুখের সঙ্গে আমার মুখের কতখানি সাদৃশ্য। ও আমার ছোট ভাই, আজ দু'বছর হ'লো মারা গেছে।

[অজয় ছবির দিকে চাহিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল]

অশোকা। আমার সত্যিই তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। তুমি কখন কাউকে ভালবাস্‌তে পারলে না।

অজয়। (যেন আপন-মনে) কেন পারলাম না অশোকা ?

অশোকা। তুমি নিজে কোনদিন মানুষ হ'তে পারলে না ব'লে। দূষিত আবহাওয়া শুধু স্বাস্থ্য নষ্ট করেনি তোমার, মনকেও করেছে দূষিত।

অজয়। (সেই একইভাবে) তা' হয়ত করেছে।

অশোকা। মনের এই পঙ্কিলতাই মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। স্কটিশে পড়া সব মেয়েই যেমন খারাপ নয়, বেথুনের সব মেয়েই তেমনি ভাল নয়। কোথাও না প'ড়েও অনেক মেয়ে খারাপ হয়, সে দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

অজয়। তুমি ঠিকই বলেছো অশোকা !—আমার মন পর্য্যন্ত দূষিত হয়েছে। এ মন নিয়ে তোমাকে আমার বিয়ে করা উচিত হয় নি।

অশোকা। একি তোমার অভিমানের কথা ?

অজয়। না, এ আমার সত্যিকার কথা। যখনই তোমার দিকে তাকিয়েছি, আমি ঠিক সোজা তাকাতে পারিনি,—অথচ মেয়েদের নিয়ে আমি কি না করেছি !

অশোকা। হাঁ, কি না করেছো।—কিন্তু—

অজয়। তোমারও কিন্তু কি আমি জানি অশোকা ! আরো জানি, তোমার অপরাধের কথা আমি ভাব্‌তেও পারি না।—সত্যি অপরাধ করলেও বোধহয় শাস্তি দিতেও পারবো না।

অশোকা। না, অপরাধ করলে তুমি শাস্তি দেবে। আমি চিরদিনের জন্যে তোমার চরণে আমার মাথা পেতে রাখ্‌লাম। (পায়ের উপর মাথা রাখিল)

[অজয়ের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিল]

অজয়। অশোকা !

অশোকা। একি !—তুমি কাঁদ্‌ছো !

অজয়। হাঁ,—আমাকে আজ কাঁদ্‌তে দাও।

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

ভৌতিক-চক্র

কুমারী সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিভাকে কাঁদাইয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম। ছোট বোন্‌টী অভিমানভরে অভিশাপ দিল, "এ যাওয়ার ফল ভাল হবে না দাদা—দেখো, দেখো, দেখো!"

তবুও যখন তাহার ইচ্ছার অনুকূল বাতাস বহিল না, তখন জোর করিয়া চাকর নফরার মাথায় প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্যটা চাপাইয়া দিয়া বলিল, "নিয়ে যাও তোমার মাছ—এ বাড়ীর কেউ তোমার ধরা জিনিষ পাতে পাড়্‌বে না।"

ফিরিয়া বলিলাম, "সত্যি না কি হে?"

রঞ্জন গম্ভীর-মুখে বলিল, "তোমার বোনের কথা তুমি উপেক্ষায় হয় ত ঠেলে ফেল্‌তে পার দাদা, কিন্তু আমি পারি না। ওই-ই এই ঘরের গৃহিণী।"

নিভার মুখ স্বামীর এ কথায় হয় ত প্রসন্ন হইয়াছিল, কিন্তু মায়ার ফাঁদে জড়াইবার ভয়ে সেদিকে আমি আর চাহিলাম না, একপ্রকার পলাইয়াই আসিলাম।

কাজটা খুবই জরুরী। নিলামের দিন হাজির হইতে হইবেই; নচেৎ ও পক্ষের অতবড় জমিদারীটা হস্তগত ত হইবেই না, দীর্ঘসূত্রী ও অকর্ম্মণ্যের আখ্যাটা বেশ পাকা হইয়াই বর্ত্তিবে।

ভগ্নীর নিকট হইতে ছাড়ান পাইলাম সত্য, কিন্তু তাহার চাকরের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ক্ষেপেছ বাবু, বল্লভপুরের মাঠের ওপর দিয়ে এই মাছ নিয়ে কেউ যায়, না যেতে আছে? রাক্ষুসী মাগীটার হাতে পড়্‌লে আর জমিদারী কিন্‌তে হবে না—ওইখানেরই জমীদার হ'য়ে থাক্‌তে হবে।"

হাসিয়া বলিলাম—"রাক্ষসী মাগীটা কে হে নফরচন্দ্র? সে যেই হোক্, তুমি ভয় পেয়ো না—তোমার এ দাদাবাবু শুধু দুধই খায় নি, ছেলেবেলা থেকে লাঠিও খেয়েছে, খাওয়াতেও শিখেছে। বিশ-পঁচিশজন লাঠিয়ালকে আমি গ্রাহ্য করি না—ও ত রাক্ষসী একটা মেয়ে।"

তবুও নফরের মুখে প্রসন্নতার হাসি ফুটিল না। সে আম্‌তাআম্‌তা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, সে আমার জান্‌তে বাকী নেই, সেজন্যে বল্‌তুমও না—কিন্তু এ যে উপদেবতা।"

হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিলাম। "উপদেবতা কি হে' ভূত না কি? আরে তা' হ'লে ত আরও ভাল! এতদিন তোমাদের পাড়াগাঁয়ে মানুষ ভূত দেখেছি, এবার না হয় একটা জ্যান্ত ভূতের সঙ্গেই আলাপ করা যাবে। তুমি দেখে নিও নফরচন্দ্র, এ লোহার শরীর দেখে তোমার ভূতগুলো পালাতে পথ পাবে না। মাছটার ওপর লোভ নেই আমার—তবে তোমার মাছ-লোভী মেয়েমানুষটাকে

দেখ্‌তে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে বলেই এটাকে সঙ্গে নিতে হ'ল।"

শুষ্কমুখে নফরচন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিল, কিন্তু আর প্রতিবাদ করিল না।

গরুর গাড়ী ছাড়া আর যান নাই; তাহাও আবার বাজারে আসিয়া করিতে হয়। সময় অল্প; কাজেই বাধ্য হইয়া ক্রোশাধিক পথ হাঁটিয়াই আসিলাম। পথে নফরা এক ছুতারের বাড়ী হইতে কাঠের একটা 'ধুর' সংগ্রহ করিয়া যখন কাঁধে তুলিল, তখন হাসিব কি রাগিব হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া সমর্থনের হাসিই হাসিলাম। দেখিলাম, বেচারা বৃদ্ধ তাহাতে সন্তুষ্টই হইল। তাহাকে এভাবে উৎসাহিত করা যে পরিহাসেরই রূপান্তর, সে কিছুতেই তাহা বুঝিল না।

মাত্র একখানি যান, তাহাও আবার অপরের অধিকৃত, কাজেই বেশ একটু ফাঁপরে পড়িলাম। মিদ্‌ধে গাড়োয়ান না থাকিলে নফরা আমাকে ফিরিতেই প্রোরোচিত করিত; কিন্তু জমিতে বসবাসসূত্রে সে যখন প্রজা, তখন জমীদারের খাতির সে না রাখিয়া পারিল না—পরের ভাড়াকরা গাড়ী হইলেও তাহাতে আমার স্থান হইল।

তবে মাছ লইয়া যাইতে সহযাত্রীদের মধ্যে, এমন কি মিদ্‌ধেরও বিশেষ আপত্তি দেখিলাম। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মন কোনমতেই তাহাদের কথায় সায় দিল না—একপ্রকার জোর করিয়াই সকলকে নিরস্ত করিলাম।

নফরা নিজের মনের কথা বুঝাইয়া বলিয়া গাড়ীতে তাহার ঘাড়ের বোঝা নামাইয়া দিল। আমার কথায় মিদ্‌ধের অন্তরে তখন সাহস দেখা দিয়াছে। সে হাসিয়া পরিহাস-মাখা-কণ্ঠে বলিল, "আমার লোহার ধুর তোর ও ঘুণধরা কাঠেরচেয়ে ঢের শক্তরে নফরা ওটা পগারে পড়ে' থাক্, আমার কোন কাজে আস্‌বে না।"

নফরা কিন্তু শুনিল না, বলিল, "হোক্, বোঝার ওপর শাকের আঁটি বই ত নয়, নিয়ে যা'।"

মিদ্‌ধে কিন্তু খুব একচোট প্রাণখোলা হাসি হাসিল। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু বন্ধুর দেওয়া অযাচিত দান উপেক্ষা করিতে পারিল না, সঙ্গে লইল।

দুই

"মাছটা দিয়ে যাও।"

নির্জ্জন প্রান্তরে অকস্মাৎ এক অলোকসামান্যা নারীর আবির্ভাব ও প্রার্থনা শুধুই বিস্মিত করিল না, চঞ্চলও করিল—তবে কি শেষ পর্য্যন্ত মূর্খ নফরার গল্প-কথাই বাস্তবে পরিণত হইল না কি? সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—একেবারে মড়ার মত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। হাসিয়া বলিলাম—"মজা মন্দ নয়, মাছ নিয়ে যাচ্ছি নিজে খাব বলে', তোমাকে দেব কেন?"

সে কথার কোন উত্তর পাইলাম না। মেয়েটী সলাজকণ্ঠে আবার বলিল—"মাছটা দিয়ে যাও না।"

সে প্রার্থনার মধ্যে কি ছিল কে জানে! করুণায় সারা অন্তর ভরিয়া উঠিল। সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলাম। জোর করিলে লাঠি চালাইতে কাতর নহি, কিন্তু অমন কাতর কণ্ঠের যাচিঞাকে না বলিয়া ফিরাইয়া দিবার কল্পনাও অসহ্য। বুঝি যাচিকার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই মাছসমেত হাতটা তুলিয়াছিলাম, কিন্তু পাশের লোকটী তাহা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "করেন কি বাবু, রাত্তিরকালে মাছ কাউকে দিতে আছে কি?"

বাতাসে এক বিকট হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিল, "হা হা হা, হি হি হি!"

চমকিয়া মেয়েটীর দিকে চাহিলাম—না, তাহার মুখে অমানুষিক আবির্ভাবের কোন চিহ্নই দেখিলাম না।

গাড়ী চলিতেছে। নারীর চরণে গতি আছে কি না বুঝিতেছি না। কিন্তু পার্শ্বের যে স্থানটীতে সে প্রথম আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক্ সেই স্থানটিতেই আছে, একটুও এদিক-ওদিক দেখিতেছি না।

'দপ্' করিয়া মাঠে একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মেয়েটী এবার সকাতরে কাঁদিয়া উঠিল; হাতযোড় করিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, "ওগো দাও, দাও! নইলে—"

কথা শেষ না করিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে সে সেই জ্বলন্ত আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—একরকম ফস্‌ফরাস আছে, যাহা রাত্রে দেখিলে ঠিক্ আগুন লাগিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। হাসিয়া

বলিলাম—"ও দেখে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন, ওতে মানুষ পুড়ে মরে না। এই নাও মাছ; নিয়ে তুমি বাড়ী যাও। এমন সময় বউ মানুষ মাছ নিতে আসে না, ছি!"

এই বলিয়া আবার উদ্যত হস্ত তুলিলাম। পল্লীর সেই লোকটী পুনরায় আমার হাত চাপিয়া ধরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "তোমাকে বিশ্বাস নেই মশায়, একটা বিপরীত কাণ্ড না বাধিয়ে তুমি দেখ্‌ছি ছাড়্‌বে না। থাক্, ওটা আমার কাছেই থাক্।"

মেয়েটীর মুখে সেই নীরব হাসি। সে করুণ চোখ দু'টী তুলিয়া আমার পানে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল। অভিভূতের মত সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তাহার কাতরধ্বনি আবার রণিয়া উঠিল, "ও গো, মাছটা দাও, দাও, দাও না গো!"

ক্যাচ্‌ক্যাচ্ শব্দে গাড়ী চলিয়া পড়িল। মিদ্‌ধে গাড়োয়ান গরু সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "লোহার ধুর ভেঙে গেল বাবু—নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।"

কিন্তু নামিবে কে? গাড়ীর মাল, যাত্রী সব তাল পাকাইয়া জমিতে আসিয়া পড়িল। আবার চারিদিকে সেই পৈশাচিক অট্টহাসি, "হা হা হা, হি হি হি!"

"কি লো, মায়া হ'ল বুঝি! তোর কর্ম্ম নয়, সর্।" বলিয়া একটা প্রবল ঝড় বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া মেয়েটীকে ঠেলিতে ঠেলিতে আগুনের দিকে লইয়া চলিল। মনে হইল, যেন অগ্নিশিখা হইতে আমাকে প্রাণপণে বাঁচাইবার জন্যই সে দু'হাত দিয়া সেই অগ্নিরাশিকে দূরে ঠেলিয়ে দিতেছে। কে যেন বলিতেছে, "নিতে দিবি না, বেশ, দেখি কেমন রাখ্‌তে পারিস। এতদিন জ্বালিয়েছে, যার জন্যে এত ভোগান্তি, তার ওপর অত কেন? সর্, এখনই শেষ করে' দিই।"

কিন্তু মেয়েটী সে কথায় কর্ণপাত করিল বলিয়া বোধ হইল না।

তিন

কখন উত্তেজনাবশে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। সম্বিৎ ফিরাইয়া পাইয়া, খোলা আকাশের নিম্নে স্নিগ্ধ বাতাসের পরিচর্য্যা সত্যই বড় মধুর লাগিল। সম্মুখে পার্শ্বে মালের স্তূপের মধ্যে আমি একা, সহযাত্রী কেহই নাই—বুঝিতে পারিলাম না, আমায় বিপদের মুখে ফেলিয়া অনুগত প্রজা মিদ্‌ধে গাড়োয়ান অপর যাত্রীদের অনুসরণ করিল কি করিয়া? মনকে জোর করিয়া প্রবোধ দিলাম—বাঙ্‌লার আবহাওয়ায় যখন তাহার জন্ম, তখন মুসলমান হইলেও ভীরুতার হাত এড়াইবার ক্ষমতা তাহার কোথায়?

ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম! কিছুক্ষণ পূর্ব্বের ঘটনাটা যেন দুঃস্বপ্ন বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম—দূর, বহু দূর পর্য্যন্ত জনমানবের বসতি নাই। শুধু প্রকাণ্ড একটা বাড়ী অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বোধ হইল, যেন মৃদু আলোকরেখাও তাহার মধ্য হইতে উঁকি মারিতেছে এবং অস্পষ্ট কলগুঞ্জনও শোনা যাইতেছে।

কি এক আকর্ষণী শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তারপর বাড়ীটার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। মন কেবলই বলিতে লাগিল—"এ বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে নিঃসঙ্গ থাকা অপেক্ষা ওখানে যাওয়া অনেক ভাল।"

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া কে যেন আমায় পাগল করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। সিপাহীর বন্ধন-রজ্জুর আস্বাদ জানি না—কিন্তু মনে হইল, ইহার কাছে সে টান কিছুই নহে।

প্রকাণ্ড বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেখানে একটী ভোজ-সভা বসিয়াছে। নিমন্ত্রিতের দল ফুল্লমুখে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একদিকে কয়টী ভদ্রলোক মণ্ডলাকারে চেয়ারে বসিয়া যেন নিভৃত আলাপে নিমগ্ন। অন্যদিকে গানের আসর চলিতেছে।

অন্তঃপুরের খোলা জানালার নিকট কেবলমাত্র একখানি বিষাদভরা মুখ সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে যেন এই আনন্দ-প্রবাহে গা ভাসাইয়া এদের একজন হইতে চায়, কিন্তু পারে না—অনিবার্য্য কোন বাধা আসিয়া বাধা দেয়।

কে একজন পিছন হইতে ধমক দিয়া বলিল, "বৌমা, মাছটা কি পচ্‌লে কুট্‌বে বাছা। পাঁচজন এসেছে, আমোদ করে' খাবে, তা'তে তোমার আনন্দ নেই—তুমি কেমন হাঘরের বেটী!"

মেয়েটী শিহরিয়া সরিয়া গেল। প্রকাণ্ড উঠানে মস্ত বড় একটা বঁটী পাতা। না, বৌটী সাম্‌লাইতে পারিল না—এ মাছ কাটা কি তাহার কর্ম্ম?

দূরে দাঁড়াইয়া একটী যুবক এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। নিজে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মধুর-কণ্ঠে বলিল, 'তুমি ওঠো বীণা, মাছ আমি কুটে দিচ্ছি।"

বীণা ফিরিয়া চাহিয়া যুবককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

কোমর বাঁধিয়া যুবক মাছটাকে দুই হাতে সাপ্‌টাইয়া ধরিয়াছে, হঠাৎ পিছন হইতে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খাইয়া তাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া একেবারে বঁটির উপর পড়িয়া গেল।

পিছন হইতে কে একজন আদেশের সুরে বলিল, "ঠিক্ করেছিস অনে! এবার ওকে কুটে ফেল—পোড়ারমুখী বৌটাকে দিয়ে রাঁধিয়ে ভোজে চালান দে। এও হয়! জ্ঞাত নয়, গোত্র নয়, অতবড় সোমত্ত ছেলে পাতান দাদা সেজে ওদের বাড়ী ছিল কেমন করে' তাই ভাবি। আর বেয়ান মাগীরই বা কি আক্কেল যে,—"

মেয়েটী আবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। রান্নাঘর হইতে সে ছুটিয়া পলাইতে গেল। কিন্তু শাশুড়ীর সতর্ক চোখ এড়াইতে পারিল না। হেমাঙ্গিনী কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "এই হাটের মাঝে কেন দই ঘাটাবে বৌমা—আছ যেখানে, সেখানেই বসে' থাকো। ও যে তোমার জন্যে আসে নি, তার প্রমাণ হবে ভাল রান্নায়। দেখিয়ে দাও—সত্যিই তুমি সতীর মেয়ে সতী, নইলে—"

কথাটা আর উচ্চারিত না হইলেও তাহার লজ্জাকর ইঙ্গিত বুঝিতে বীণার বাকী রহিল না। সে মাথা হেঁট করিয়া রন্ধনশালার এককোণে বসিয়া পড়িল—অনিচ্ছায়, ভয়ে, উপায়হীন অবস্থায়। বজ্রাহতের মত বিমূঢ় বিস্ময়ে আমি সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

খানিক পরেই রান্নাঘর ছাড়িয়া অতি ধীরে চুপি চুপি বীণা ছাদে পলাইয়া আসিল। এতক্ষণ প্রাণ খুলিয়া সে একটু চোখের জলও ফেলিতে পারে নাই, হয় ত এ নির্জ্জনে তাহারই আয়োজন করিতে চায়।

যতটা লুকাইয়া আসিবে মনে করিয়া সে ছাদে উঠিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। সর্ব্বনাশী হেমাঙ্গিনী পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধাক্কায় ধাক্কায় তাহাকে একেবারে প্রাচীরের শেষপ্রান্তে আনিয়া ফেলিল, তারপর—

না, সে দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না। ভয়-বিহ্বল চীৎকারের সহিত বীণার সেই পতন রোধ করিতে হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া চলিলাম—কিন্তু কিসের কি একটা বাধা আমায় টানিয়া ধরিল। হিড়হিড় করিয়া বন-জঙ্গল কাঁটা-গাছের মধ্য দিয়া কে আমাকে আবার সেই পূর্ব্বস্থল অর্থাৎ ভাঙা গাড়ীর তলায় আনিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কাণে গেল—"মাছটা দাও, দাও গো!"

চাহিয়া দেখিলাম, মাছটা তখনও সেইভাবে পড়িয়া আছে।

শুনিতে পাইলাম কে যেন বলিতেছে, "বড় যে সোহাগ করে' মাছটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছিস্—তা' হবে না লো, তা' হবে না—ওকে নেবই নেব! তোর সাধ্য নেই যে, ওকে রক্ষা করিস। ও কি কম শয়তান! বেঘোরে মলো, কোথায় ভূত হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবে, তা' নয়—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে আবার মানুষ হয়েই জন্মেছে। এবার নিতেই হবে। মাছ চাই না, মাছ কি কর্‌ব, ওকে চাই। টেনে নিয়ে ত গিয়েছিলুমই, একটু অন্যমনস্ক হয়েছি কি 'ফুস্' করে' বার করে' এনেছিস্? এবার আর নড়ছি না, কি বলিস অনে?"

পুরুষ কণ্ঠে উত্তর আসিল, "তা' বই কি মা। হত-ভাগীর জ্বালায় মরেও শান্তি নেই—যেমন করে' হোক্ ওটাকে শেষ কর্‌তেই হবে।"

মেয়েটীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—পূর্ব্বকার মত স্নিগ্ধ হাসিতেই তাহা রঞ্জিত হইয়া আছে বটে, কিন্তু

সম্পূর্ণ প্রসন্নতা যেন আর তাহাতে নাই। ভয়ের একটা ছাপ তাহার চোখ দু'টিতে স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

পরক্ষণই কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ কাণে গেল পিছন হইতে মিদ্‌ধে বলিতেছে, "নফরেরটা ত খুঁজে পেলুম না বাবু। তাই আবার ধূর আন্‌তে গেছ্‌লুম। এবার গাড়ী চল্‌বে।"

বাস্তব ও স্বপ্নের খেই খুঁজিয়া মিলাইতে পারিলাম না, হাঁ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিলাম। মিদ্‌ধে ধূরে চাকা পরাইয়া গাড়ী সারিতে প্রায় ঘণ্টা দুই লাগাইল। তারপর আবার আমাদের যাত্রা সুরু হইল।

" মাছটা দে, দেনারে !"

গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা এবং প্রার্থিতবস্তুর যাচিঞার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধরাবক্ষে পতনের ঘটনাটা খুব বেশীক্ষণের কথা নহে, কিন্তু তার স্মৃতি আমার বুকটা স্পন্দনহীন করিয়া দিল।

এভাবে কতক্ষণ চলিয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ বিশ্বগ্রাসী বেড়া আগুনের হল্কায় শিহরিয়া উঠিলাম। মিদ্‌ধে প্রাণপণে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। কিন্তু বেশ বুঝিলাম, নিষ্কৃতির উপায় নাই। অদৃশ্য হস্তের আকর্ষণ যে কোনও মুহূর্ত্তে অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে।

হইলও তাই। আবার ঘুরাইয়া আমায় সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বাড়ীটার সাম্‌নে আনিয়া হাজির করিয়া দিল। এবার দেখিলাম, তাহা রক্তভূমিতে পরিণত হইয়াছে। একদল ডাকাত মশাল হাতে করিয়া বাড়ীটা ঘেরাও করিয়াছে। প্রাণভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলাম। নিমন্ত্রণ-বাড়ীর সকলে পলাইয়া বাঁচিবার জন্য সেই আগুনের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সভয়ে চক্ষু বুজিলাম। কিন্তু কেহই নিষ্কৃতি পাইতেছে না। নিষ্ঠুরভাবে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সভয়ে মিদ্‌ধে 'হা আল্লা!' বলিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল।

স্পষ্ট অনুভব করিলাম—কয়েকটা হিমশীতল হাত আমার গলার উপর চাপিয়া বসিতেছে—কিন্তু কিসের বাধায় যেন ততটা জোর করিতে পারিতেছে না।

কে যেন গম্ভীর গলায় বলিল, "ছাড়, ছাড় বল্‌ছি—নইলে ভাল হবে না।"

"আর ভালয় কাজ নেই আমার—তোমাদের পায়ে পড়ি, ওকে ছেড়ে দাও।"

"ছেড়ে দেব বই কি! এখনও সরে যা'। ভোর হ'য়ে আস্‌ছে। তোর জন্যে ওকে শেষ করতে পারি নি। সর্ বল্‌ছি! ভালবাসার লোককে নিলে কষ্ট হবে জানি, কিন্তু পরকীয়া—"

"ছি ছি, ওকথা বলো না—উনি যে আমার দাদা! নাই বা হ'ল মায়ের পেটের ভাই, ওঁর—"

"যাক্, আর শুন্‌তে চাই না। সর্, সর্ বল্‌ছি!" বলিয়া কে যেন সজোরে কাহাকে দূরে সরাইয়া দিল। গলার উপর ঠাণ্ডা হাতের চাপ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল। বুঝি এই শেষ! কিন্তু এ কি, সে বজ্র বন্ধন কে শিথিল করিয়া দিল! স্পষ্ট অনুভব করিলাম—যেন অদৃশ্যে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিয়াছে।

চার

হঠাৎ ভোরের কাক ডাকিয়া উঠিল। গম্ভীর-কণ্ঠে কে বলিল, "নিতে দিলি নি সর্ব্বনাশী! যাক্, এ যাত্রা বড় বেঁচে গেল!"

উত্তরে মৃদু হাসির একটা শব্দ কাণে আসিয়া বাজিল। হঠাৎ প্রভাত বাতাস গায়ে লাগায় চক্ষু মেলিলাম —নফরা না, সেই ত!

নফর বলিল, "না, জেনেশুনে তোমায় বিপদের মুখে সঁপে সরে যেতে পার্‌লুম না বাবু, তাই পিছে পিছে এসেছিলুম। অন্যায় নিও নি।"

তাহার সঙ্গে ভগ্নীর বাড়ীতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। পথে আসিতে আসিতে নফরচন্দ্র বলিল—"আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন বাবু, কাজেই এসব মান্‌তে চান না—কিন্তু চোখে দেখা ঘটনাকে আমি ত আর না বলে' উড়িয়ে দিতে পারি না।"

"বছর তিরিশ আগের কথা হ'লে কি হয়, এখনও যেন

চোখের ওপর ভাস্‌ছে। ওই পড়োবাড়ীটাতে তখন মানুষ ধর্‌ত না—গ্রামের মধ্যে ওঁরাই ছিলেন ধনী, মানী। কর্ত্তা যতদিন বেঁচেছিলেন, লক্ষ্মী যেন ঘরে বাঁধা ছিল। কর্ত্তাও গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও ছাড়্‌লেন! আর ছাড়্‌বেন নাই বা কেন, অতবড় পাপ কি কখনও সহ্য হয়!" বলিয়া নফরচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

চাহিয়া দেখিলাম—তাহার চোখে জল চক্‌চক্ করিতেছে। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিয়া চলিল—"কর্ত্তা সাধ করে' বৌ এনেছিলেন গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী। শাশুড়ী মাগীর চোখ্‌কে বলিহারী কিন্তু! তাকে তার পছন্দ হ'ল না। উঠ্‌তে-বস্‌তে গঞ্জনায় বৌটীর চোখের জল আর শুকুতে দিত না। তাদের বাপের বাড়ীর একটী ছেলেকে নিয়ে অপবাদ দিতেও ছাড়্‌ত না। অপরাধ—সে মাঝে মাঝে এসে বৌটীকে দেখে যেতো।

"সেদিন ওদের বাড়ীতে ছোট ছেলের এল্‌-এ পাশ করা উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া চলেছে। সেই ছেলেটীকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমি তখন ওদের ওখানেই কাজ করি।

"বল্‌ব কি বাবু, সড় করে' শাশুড়ী আর তার ছেলেতে মিলে মাছের বঁটিতে সেই ছেলেটীকে কেটে ফেল্‌লে! বৌটিকে ছাত থেকে ফেলে দিয়ে মার্‌লে! ওঃ, সে কথা ভাবলে আজও জ্ঞান থাকে না!

"সেইদিনই ঘৃণায় ওদের কাজ ছেড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম। পাপের শাস্তি পেতে কিন্তু একটুও দেরী হ'ল না। সেই রাত্রিতেই কোথা থেকে একদল ডাকাত এসে একেবারে সব ক'টাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে যা' কিছু ছিল সব লুট্‌ পাট্‌ করে' নিয়ে চলে' গেল। হবে না—সতী লক্ষ্মীর অভিশাপ কি সহজ বাবু!"

প্রতিবাদ করিলাম না। নীরবে পথ চলিতে লাগিলাম। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই হতভাগ্য ছেলেটীই যে আজ নফরচন্দ্রের সম্মুখে রহিয়াছে ইহা যদি সে জানিত।

পরের দিন তার পাইয়া বিস্মিত হইলাম। আমি উপস্থিত না হইলেও বিষয়টা আমার নামে ডাকা হইয়াছে। শুধুই তাহাই নহে—অগ্রিম দেয় টাকাটাও জমা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। অলৌকিক রহস্যভরা এ ঘটনা কেহ বিশ্বাস করিবে না জানি—তবুও সকলের অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটা স্মরণ করিলে এখনও চোখের জল রোধ করিতে পারি না। বীণার জন্য মনটা অসহ বেদনায় কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে।

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব-বৈচিত্র্য

শ্রীমদমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রকৃতির নৈপুণ্য

মনীষিদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মানুষ কত স্মৃতি-সৌধ, মূর্ত্তি প্রভৃতি তৈরী করে। আমেরিকার শত শত লোক ডিনামাইট্‌, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাহায্যে যুক্তরাজ্যের প্রধান নেতাদের মূর্ত্তি নির্ম্মানে ব্যস্ত। কিন্তু মনীষিদের মূর্ত্তি প্রকৃতিও যে গঠন করে, তা' শুনলে আশ্চার্য্যান্বিত হ'য়ে যেতে হয়। স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্রকৃতি নির্ম্মিত এক মূর্ত্তি দেখা যায়—সেটি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্টার স্কটের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাইমন্‌স্‌ টাউন থেকে কেপ্‌ পয়েণ্টের পথে যে মূর্ত্তি দেখা যায়, সেটা সব চেয়ে চমৎকার। এটা ল্যাড্‌ষ্টোন-সাহেবের হুবহু মূর্ত্তি। রাস্তা থেকেই মূর্ত্তিটী দেখা যায়—একটা পাহাড়ের উপর। মাথা, কপাল, নাক এবং উপরের ঠোঁট ঠিক্ ল্যাডষ্টোন সাহেবের মূর্ত্তির সঙ্গে মিলে যায়—শুধু দাড়িটা দেখা যায় না—সম্ভবতঃ, সেটা মাটীতে লুকানো আছে।

ওয়ারলেস্‌ চিকিৎসা

ভিয়েনার দু'জন ডাক্তার বলেছেন—"আমরা এখন

যেমন বলি এক ডোজ্ ওষুধ দিতে। কিছুকাল পরে সে রকম লোকেরা বল্‌বে—এক ডোজ্ ওয়ারলেস্ দিতে।" বহুদিন হ'ল তাঁরা ওয়ারলেস্‌কে ঔষধ-হিসাবে ব্যবহার কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন এবং তাঁদের চেষ্টা কিছু কিছু সফলও হয়েছে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস—অদূর ভবিষ্যতে অনেক কঠিন রোগ আরাম হবে ওয়ারলেসের সাহায্যে।

পৃথিবীর বহুস্থানে ওয়ারলেসের সাহায্যে কৃত্রিম জ্বরের সৃষ্টি করে' অন্য রোগ আরোগ্য কর্‌বার চেষ্টা করা হয়। ফুসফুস্, রক্ত এবং হৃদয়ের ব্যায়রামে ওয়ারলেস্ ব্যবহার করা হয়।

রহস্যময় ডিম

মার্ক হিলবার্ণ্ বলে' এক চাষা তার মুরগীর কাণ্ড দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। মুরগীটা একটা গাছের তলায় ভয়ানক জোরে জোরে পাখা নাড়ছিল আর চীৎকার কর্‌ছিল। গাছের উপর একটা বাজপাখী উড়ছিল। পাখীটা উড়ে চলে' যেতে উক্ত চাষা গাছে উঠ্‌ল। গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে সে দেখ্‌লে একটা কাঠ বিড়ালীর বাসা আর তা'তে পাঁচটা মুরগীর ডিম। মুরগীটা যে কি করে' ওখানে ডিম পেড়েছিল তা' বোঝা যাচ্ছে না।

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

অন্যত্র গ্রেস মুরের নাম দিয়ে যে ছবিখানি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েচে, আসলে উনি হচ্ছেন, আর-কে-ও'র উদীয়মানা অভিনেত্রী 'মার্ল ওবেরণ।' মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ এত বড় গর্হিত ভুলও সম্ভব হয়ে গেচে, এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। এই সুন্দরী অভিনেত্রীটী 'প্রাইভেট লাইফ অফ হেনরি দি এইট্‌থ্', 'প্রাইভেট লাইফ অফ ডন জুয়ান' প্রভৃতি পুস্তকে অভিনয় করে যশস্বিনী হয়েচেন। এঁর সর্ব্বশেষ পুস্তক 'স্কারলেট পিম্পারেল'এ অভিনয় নাকি অতীব সুন্দর হয়েচে।

*　　*　　*

বাঙালী অভিনেত্রীদের যে কয়জন বম্বে গিয়ে চলচ্চিত্র জগতে নাম কিনেছেন—শ্রীমতী রাণীবালা তাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি গোড়ায় ম্যাডাম কোম্পানীর অধীনে কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্খী মন তা'তে তৃপ্ত না হওয়ায় বম্বের কোন একটী চলচ্চিত্রাগারের আহ্বানে তিনি সেখানে চলে যান এবং সুখ্যাতির সঙ্গেই তাহাতে অভিনয় করতে থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে 'নূর-এ-এসলাম' 'দেওয়ানী কা রাণী', 'ভুল-কা-ভোগ' ও 'ফিভাই-টাউহি' প্রভৃতি কথক—ছবিতেও ইনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। সম্প্রতি কোলকাতার কোন বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানী তাঁকে তাঁদের ওখানে অভিনয় করবার জন্যে নিয়ে এসেছেন। আমরা প্রতিভার যোগ্য আদর দেখে খুসী হয়েছি।

গল্প-লহরীর সাহিত্য-বিভাগ—'নারায়ণ-সাহিত্য-মন্দির' থেকে প্রকাশিত উদীয়মান তরুণ ঔপন্যাসিক শ্রীমান্ ভুবনমোহন মিত্রের 'স্রোত' নামক নব-প্রকাশিত উপন্যাসখানি 'বঙ্গীয়-নাট্য-সঙ্ঘ' সুযোগ্য অভিনেতা-অভিনেত্রী সহযোগে শীঘ্রই 'নাট্য-নিকেতনে' মহা-সমারোহে অভিনয় কর্‌বেন। এই নাট-সঙ্ঘের পরিচালক—শ্রীযুক্ত পান্নালাল পাঠক। উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নটও নাট্যকার শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। আমরা এই অভিনয়ের সাফল্য কামনা করি।

অনিল পারফিউমারী ওয়ার্কস্' হইতে তাঁহাদের প্রস্তুত ষ্টুডেণ্ট বোকেট, রোজ, অনিল স্নো, অনিল পাউডার প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য উপহার পাইয়াছি।

আজকাল পারফিউমারীর আদর সর্ব্বত্র। বিলাতীর সহিত তুলনায় এগুলি নিকৃষ্ট নয়। আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া প্রীত হইয়াছি।

*　　*　　*

আমরা এন ব্যানার্জ্জি এবং 'জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পার-ফিউমারী'র প্রকাশিত দুইখানি ক্যালেণ্ডার উপহার পাইয়াছি। মোটের উপর ক্যালেণ্ডারগুলি মন্দ হয় নাই।

এ্যান হার্ডিঙ্গ

প্রবাসী

একাদশ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪২ | তৃতীয় সংখ্যা

প্রতিক্রিয়া

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এম এ, ডি-লিট্

দেওয়ালের গায়ে টাঙানো বড় আর্শিখানার দিকে চাহিতেই সুনয়নীর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। উঃ! এই এক বছরের মধ্যে তাহার চেহারা কী খারাপই না হইয়াছে! কে বলিবে যে, তাহার বয়স মাত্র আটাশ বৎসর—ভাগ্যে চুলগুলি এখনও কালো আছে, নতুবা তাহাকে পঞ্চাশ বৎসরের বুড়ী বলিয়া মনে করিতে কাহারও একটুও আটকাইত না। কাঠির মত দীর্ঘ ও শীর্ণ আঙুল দিয়া সে কোটরগত চক্ষুর কয়েক বিন্দু জল ধীরে ধীরে মুছিয়া ফেলিল।

সুনয়নী বোঝে তারানাথ তাহাকে যতই যত্ন-আদর করুক, আগেকার সেই প্রাণভরা ভালবাসার কোথায় যেন ভাঁটার টান ধরিয়াছে। আর তারানাথকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি করিয়া? এই একবছর ধরিয়া রোগের চিকিৎসা ও সেবা করিতে করিতে সে বেচারাও যেন আধখানা হইয়া গিয়াছে। তাহার অবস্থা এমন কিছু স্বচ্ছল নহে, তবু তাহার সাধ্যের অতীত সে করিয়াছে। সওদাগরী আফিস—পূরা মাহিনায় বেশী ছুটী দিতে চাহে না। অর্দ্ধ-বেতনে ও বিনা-বেতনে ছুটী লইয়া সে প্রায় ছয়মাস ধরিয়া সুনয়নীকে লইয়া একবার দেওঘর, একবার পুরী, একবার রাঁচী—এই করিয়া বেড়াইয়াছে। ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম—কাহাকেও দেখাইতে বাকী রাখে নাই। যেখানে যে দৈব ঔষধের সন্ধান পাইয়াছে, অমনি ছুটিয়া গিয়া লইয়া আসিয়াছে। কবচে ও তাবিজে সুনয়নীর গলার হার ও হাতের তাগা প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছে,—কিন্তু

ফল কিছুই দেখা যায় নাই। সুনয়নী যেন দিন দিন তিলে তিলে মরণের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

মরণ?—মরণকে সুনয়নীর বড় ভয়! মৃত্যু-যন্ত্রণার কথা মনে করিতে তাহার সকল শরীর অবশ হইয়া আসিতে থাকে। মুখুয্যেদের বড় বউ দুই দিন দুই রাত ধরিয়া কী কষ্ট পাইয়াই না মরিল! তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর বিকৃত মুখখানার কথা মনে পড়িতেই সুনয়নীর চোখ দু'টী আপনা-আপনি বুজিয়া আসিল।

নদীর ও-পারে বাবলা ঝোপের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। পশ্চিম আকাশের রঙিন আভা নদীর বুকের উপর স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিতেছিল। অনতিদূরে একখানি বেদের নৌকায় একটী তরুণ ও তরুণী কি একটা কথা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে পরস্পরের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িতেছিল। দমকা হাওয়ার সাথে সাথে একটা অজানা বনফুলের মিষ্ট গন্ধ আসিয়া সুনয়নীর মনটাকে যেন নেশায় পাগল করিয়া তুলিল। যতক্ষণ দেখা যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে নৌকাখানার দিকে চাহিয়া রহিল। বেদের মেয়েটীর স্বাস্থ্য কি নিটোল! উহাকে দেখিয়া ভাবিতেও পারা যায় না যে, একদিন ও থুড়থুড়ে বুড়ী হইয়া মরিবে।

*　　*　　*

—"বৌমা!"

মুখ ফিরাইতেই সুনয়নী দেখিল ও-পাড়ার নৃত্য-পিসী।

তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিয়া সে তাঁহার পায়ের গোড়ায় ঢিপ্ করিয়া একটী প্রণাম করিল ও বলিল, —"আসুন, বসুন পিসীমা, ভাল আছেন ত? কবে এলেন আপনি?"

তাহার চিবুকে হাত দিয়া নৃত্যকালী বলিলেন,—"থাক্, থাক্, হয়েছে, আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। এমনিই আশীর্ব্বাদ করছি স্বামী-পুত্তর নিয়ে নীরোগ দীর্ঘজীবি হয়ে সুখে ঘর কর মা,—হাতের নোয়া সিঁথির সিদুর অক্ষয় হোক্। আমাদের আর ভাল থাকাথাকি কি মা, এঁদের সব রেখে এখন একদিন যেতে পারলেই হয়। বয়সও ত বড় কম হয় নি,—শোক তাপও ত কম পেলাম না। তা' বাছা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে? চিনে ওঠাই শক্ত যে!"

চেহারার কথায় সুনয়নীর মন আবার বেদনায় ভরিয়া উঠিল। পিসীমার অনতিদূরে বসিয়া সে পান তৈরী করিতে করিতে নিজের দুরবস্থার কথা সবই বিবৃত করিল।

গোটাচারেক পান ও বড় এক টিপ দোক্তা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নৃত্যকালী বলিলেন,—"তা' বাছা, যাই বলো তুমি, ও ডাক্তার-কবিরাজের কর্ম্ম নয়। নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার দৃষ্টি তোমার ওপর পড়েছে। ভাল তন্ত্র-মন্ত্র না হ'লে কোনো কিছুতেই কিছু হবে না।"

পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসি ফুটাইয়া সুনয়নী বাহু ও স্কন্ধ অনাবৃত করিয়া দেখাইল ও বলিল,—"তারও কি কোন ক্রটী রেখেছি পিসীমা—কিন্তু আমার কপাল মন্দ, কোন কিছুতেই কিছু হ'ল না।"

প্রতিবাদের সুরে নৃত্যকালী বলিলেন,—"ও কথাটি বলো না বাছা, যথার্থ দৈব অষুদ হ'লে ফল না হয়ে যায় না। আজকাল সব বিষয়েই জুয়োচুরি চল্‌ছে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী চল্‌ছে বোধ করি এই দৈব অষুদ নিয়ে। হাব্‌লাদের দেশের কাছে শক্তিপুর বলে একটা জায়গা আছে, সেখানকার মা আদ্যাশক্তি (পিসীমা যুক্তকর ললাটে ঠেকাইলেন) ভারী প্রত্যক্ষ। তাঁর সেবায়েৎ আনন্দঠাকুর এ-সব বিষয়ে একেবারে সিদ্ধহস্ত। তুক্-তাকে তাঁর সমকক্ষ ভূভারতে বোধ করি কেউ নেই। তুমি বাছা একবার তাঁকে গিয়ে দেখাও। নিশ্চয়ই সুফল পাবে। দূরও ত এমন নয়। সকালের গাড়ীতে গেলে বিকাল নাগাদ ফিরে আসতে পারবে। আচ্ছা, সন্ধ্যে হয়ে এল, আজ তা' হ'লে উঠি বৌমা। আছি আরও তিন চারদিন,—আবার একদিন এসে দেখা করে যাবো।"

*　　*　　*

রাত্রে তারানাথের কাছে কথাটা পাড়িতে সে ততটা উৎসাহ দেখাইল না। কতকটা অন্যমনস্কভাবে বলিল,— "দেখ্‌লে ত ক'রে অনেক কিছু, তা' তোমার বিশ্বাস হয়

শক্তিপুরে যেতে পারো; আমার আর আপত্তি কি? তা' আমি নিজে যেতে পারবো না, ঘোষালদের বাড়ীর পঞ্চুকে সঙ্গে ক'রে নিয়েই না হয় যেয়ো।"

অভিমানে স্থনয়নীর চোখ সজল হইয়া উঠিল,—"জানি, আমার উপর তুমি এখন বিরক্ত হয়ে উঠেছ; আর তোমারই বা দোষ কি? বারমাস এমন রোগ নিয়ে কে-ই বা আর কত পারে? এত ভুগছি, তবুও আমার মরণ হয় না!"

ঈষৎ নরম অথচ ঝাঁঝালো স্বরে তারানাথ বলিল,—"কথাটা না শুনেই তুমি তিলকে তাল ক'রে তুলছো। কালকেই আমাকে মাদ্রাজে যেতে হবে। বড় সাহেব কিছুতেই শুনলে না, বল্‌লে,—'গাঙ্গুলি, এবার আর তোমার না গেলে চল্‌ছে না। আগের বার প্রকাশবাবু গিয়ে অনেকগুলো টাকা লোকসান ক'রে এসেছে। লোকটা তামাকের ভালমন্দ কিছুই চেনে না—এবার যদি আবার সে যায়, তা'হ'লে কোম্পানীকে শীগ্‌গিরই লালবাতি জ্বালতে হবে।'—ভেবে দেখলাম, গেলে লোকসান কিছুই নেই—মাইনে আর ভাড়া নিয়ে প্রায় দেড়শ' টাকা বেশী পাওয়া যাবে। তা' ছাড়া, কেনাবেচার কাজ হাতে থাকলে দু'পয়সা যে না আসবে এমনও ত নয়। এই একটা বছরে রোগ-ব্যামোর পিছু বড় অল্প টাকাটা ত গেল না। ধারও ত হয়েছে প্রায় পাঁচশ' টাকার ওপর। ছ'টা মাস যদি কোনরকমে কাটিয়ে আসতে পারি, ধারশোধ করেও হাতে কিছু জমবে। ভাবছি, এবার আর এখানে-ওখানে নয়, দার্জিলিঙ্ পাহাড়ে গিয়ে তোমাকে নিয়ে কিছুকাল থাক্‌বো,—শরীরটা তা'তে তোমার নিশ্চয়ই সেরে যাবে।"

স্থনয়নীর ইচ্ছা হইতেছিল যে বলে,—"ও গো, ছ'মাস পরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না। এর মধ্যেই আমার দিন ফুরিয়ে যাবে।"—কিন্তু মনের কষ্টে সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার যদি এইরূপ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি না হইত, তবে তারানাথের বা ধার হইবে কেন, আর সেই বা নিজের দেশঘর ফেলিয়া পয়সার জন্য মাদ্রাজের কোন্ অজানা দূর দেশে যাইতে চাহিবে কেন?

স্বামীর শয্যার একপ্রান্তে শুইয়া স্থনয়নী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে মরিয়া গেলে তারানাথ আবার নিশ্চয়ই বিবাহ করিবে। তাহার নিজের হাতে গোছানো এই ঘর-সংসারে আর একজন নারী আসিয়া কর্তৃত্ব করিবে। শিয়রের দিকে স্থনয়নী ও তারানাথের বিবাহের সময়কার যে ছবিখানি আছে, নববধূ তাহা নিশ্চয়ই ওখান হইতে সরাইয়া ফেলিবে। সন্তু ও ডলিকে সে নিশ্চয়ই মাতৃস্নেহ দিয়া যত্ন-আদর করিতে পারিবে না। মাতৃহীন শিশু দু'টী হয় ত ক্রমে ক্রমে পিতৃস্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইবে। উঃ! স্থনয়নী আর ভাবিতে পারে না! যে করিয়াই হউক তাহাকে বাঁচিতে হইবে,—তাহার হৃতস্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিতে হইবে। শক্তিপুরের মা আদ্যাশক্তির উদ্দেশে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতে করিতে সে নিশীথ রাতের শীতল হাওয়ার স্পর্শে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

* * *

তারানাথ মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই একদিন শক্তিপুরে গিয়া স্থনয়নী ঔষধ লইয়া আসিয়াছে। ঔষধ আর অন্য কিছুই নহে,—মায়ের পাদপদ্ম হইতে একটী রক্তজবার কুঁড়ি দিয়া আনন্দ ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন, শনি বা মঙ্গলবারে কোন স্বাস্থ্যবতী যুবতী নারীর কেশে ফুলটী গুঁজিয়া দিতে হইবে; তাহা হইলেই স্থনয়নীর উপর হইতে অপদেবতার দৃষ্টি গিয়া সেই মেয়েটীকে ভর করিবে ও স্থনয়নী ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইবে। কয়দিন ধরিয়াই স্থনয়নীর মন দ্বিধা ও অস্বস্তিতে ভরিয়া আছে। নিজের সুখের জন্য সে কাহার সর্ব্বনাশ করিবে? এইরূপ হীন কাজ করিতে তাহার মন কিছুতেই যেন সায় দিতেছে না। এক-একবার ভাবিতেছে,—আনন্দ ঠাকুরের কথা হয় ত সত্য নাও হইতে পারে। আর পাঁচজনে যেরূপ তাহাকে ঠকাইয়াছে, আনন্দ ঠাকুরও যে সেইরূপ করেন নাই তাহারই বা প্রমাণ কি? কিন্তু পরক্ষণেই আদ্যাশক্তির করালিনী মূর্ত্তি মনে পড়ায় সে শঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। মায়ের ওখানে কি ধুমধামই না সে দেখিয়া আসিয়াছে! আনন্দ ঠাকুরকে

ও অঞ্চলের লোকে সাক্ষাৎ ভৈরব বলিয়াই মনে করে। তাঁহাকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করিলে সুনয়নীর সর্ব্বনাশ হইবে। আঁচলের প্রান্ত হইতে ফুলের কুঁড়িটী খুলিয়া লইয়া সে পুনঃপুনঃ মাথায় ঠেকাইতে লাগিল।

কাহার উপর এই ঔষধের প্রয়োগ করিবে, ইহাই হইল সুনয়নীর প্রধান সমস্যা। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পল্লীর কোন নারীই সেরূপ স্বাস্থ্যবতী নহে। একটা-না-একটা রোগ প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। মা আদ্যাশক্তি বড়ই প্রত্যক্ষ। সুনয়নীর মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন তিনি মুখুয্যে-বাড়ীর গিন্নীকে নিজের কোলে টানিয়া নিলেন। উপযুক্ত পুত্রেরা মহাসমারোহে মায়ের শ্রাদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইল। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই আত্মীয়-পরিজনে মুখুয্যে-বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। মুখুয্যে-বাড়ীর ভাগিনেয়ী বেলাকে দেখিয়া সুনয়নীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে যেন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও স্ফূর্ত্তির অফুরন্ত খনি। তাহার দিকে চাহিলে সহজে চোখ ফিরানো যায় না। বেলার বর কলিকাতায় কাজ করে,—বেলাকে সে একদিনের জন্যও কাছ-ছাড়া করিতে চাহে না। মামাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মাত্র এই কয়েকদিনের জন্য সে আসিয়াছে। স্বামী-সৌভাগ্যগর্ব্বিতা রূপসী বেলা পল্লী মেয়েদের অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু হইয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যাবেলায় মুখুয্যেদের অন্দরে রামায়ণ গান হইতেছিল। সুনয়নীর ভাগ্যক্রমে সেদিন বারটীও ছিল শনিবার। রক্তজবাটী আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া সে চোরের মত সঙ্কোচভরা মন লইয়া মুখুয্যে-বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। অন্যান্য মেয়ে ও বৌদের মাঝে যেখানে বসিয়া বেলা গান শুনিতেছিল, সে ধীরে ধীরে তাহার পাশটীতে গিয়া বসিয়া পড়িল। বৌয়েরা তাহাকে দেখিয়া আপ্যায়ন করিল—ডিবা খুলিয়া তাহার হাতে পান দিল। সুনয়নী পান খাইল না, বলিল আজ তাহার শনিবারের উপোস। ক্রমে ক্রমে গান জমিয়া উঠিল :—"লবকুশের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র ধরাশায়ী হইয়াছেন,—রামের ভূপতিত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আলুথালুবেশা মা জানকী করুণ ক্রন্দন করিতেছেন। গায়কের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল,—সে গাহিতে লাগিল :

"রাজার নন্দিনী আমি রাজার ঘরণী গো।
ত্রিভুবনে মোর সম নাহি অভাগিনী গো॥
সর্ব্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা গো।
মোর ভাগ্যে বৈধব্য কি লিখিল বিধাতা গো॥"

শ্রোত্রীদের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। ঘোষাল-বাড়ীর রাঙা পিসী ত দস্তুরমত হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়াই উঠিলেন। হতভাগিনী বালবিধবা। স্বামী সুখ যে কি তাহা জীবনেও জানেন না। তথাপি সীতার দুঃখ তাঁহার হৃদয়েই যেন সবচেয়ে বেশী করিয়া বাজিল। বেলাও একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। এই উপযুক্ত অবসর। সুনয়নীর হাত দুই-একবার কাঁপিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া জবার কুঁড়িটী বেলার চুলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বেলা কিছুই টের পাইল না।

সুনয়নীর চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল, তাহার মাথার মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। সকলেই আত্মহারা হইয়া গান শুনিতেছিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া তাই কেহ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

বাটী আসিয়াই সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। অনেক এলোমেলো চিন্তা তাহার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতে লাগিল। মুখুয্যে-বাড়ী হইতে তখনও রামায়ণ গানের সুর মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই অস্পষ্ট সুর শুনিতে শুনিতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

* * *

পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া তারানাথ বিস্মিত না হইয়া পারিল না। এই কয়মাসের মধ্যেই সুনয়নীর স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্যরকম উন্নতি হইয়াছে। সুনয়নী তাঁহার বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া স্মিতহাস্যে বলিল,—"তুমি ত কিছু বিশ্বাস কর না। শক্তি-মায়ের দয়া না হ'লে এ-যাত্রা এসে আর আমাকে দেখতে পেতে না।"

তাহার দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া তারানাথ বলিল,—"তোমার শক্তি-মা মাথায় থাকুন, আমি তাঁকে কোটি প্রণাম জানাচ্ছি। কিন্তু তোমার ভাল হওয়া সম্বন্ধে ডাক্তাররা হয় ত অন্য কথা বল্‌বে।"

সুনয়নী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। চট্ করিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া সে তাহার পেলব বাহু দুইটী দ্বারা তারানাথের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—"তোমার ও সব বাজে কথা রেখে দাও মশায়। ডাক্তারদের যা' বিদ্যেবুদ্ধি তা' আর আমার জান্‌তে বাকী নেই।'

…সুনয়নীর দিন ভালভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল। মাদ্রাজ হইতে তারনাথ বেশ দু' পয়সা লইয়া আসিয়াছে। বড় সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া পূরা মাহিনায় তাঁহাকে একমাসের ছুটীও দিয়াছেন। সুনয়নীর মনে হইত তাহার নববধূ-জীবনের মাধুর্য্য-ভরা দিনগুলি যেন দেবতার বরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

রাত্রির নিস্তব্ধতা যখন মন্থর হইয়া আসিত, তখন হঠাৎ এক-একদিন কি জানি কেন তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। বুকখানা হঠাৎ খাঁ খাঁ করিয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, সুখের দিন শেষ হইতে আর বেশী দেরী নাই। ঘোর অমঙ্গলের ছায়া যেন কোন্ অজ্ঞাত পথে আসিয়া তাহার চোখের সম্মুখে নৃত্য করিত।

বেলা আজকাল কিরূপ ভাবে আছে তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রাণ মধ্যে মধ্যে আইঢাই করিয়া উঠিত। কিন্তু তাহার অপরাধী মন সাহস করিয়া সে-কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। পারতপক্ষে সে কাহারও বাড়ী বড়-একটা যাইত না; বিশেষতঃ, মুখুয্যেদের বাড়ীতে।

যে-ভয় সে করিতেছিল, একদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া তাহাই সে স্বকর্ণে শুনিয়া আসিল। মুখুয্যে-দের বাড়ীর একটী মেয়ে ও পাড়ার এক বর্ষিয়সীকে বলিতে-ছিল,—"বেলা-দি'র আর সে রূপ সে দেহ নেই জ্যেঠাইমা। ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের সময় এখান থেকে সেই যে কোলকাতায় গেল—কী রোগেই যে তাকে চেপে ধরলো তার আর কী বলবো। কোন অসুদ-পত্তরে কিছু হচ্ছে না। শরীর যেন তার একেবারে শুকিয়ে চুপসে যাচ্ছে। জামাইবাবুর মেজাজও হয়ে গেছে অত্যন্ত খিট্‌খিটে,—বেলা-দিকে না কি আর দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তারপর শুন্‌লাম, তাঁর না কি স্বভাব-চরিত্তির গেছে একেবারে বিগ্‌ড়ে। ন-কাকা যা' বলছিলেন তা'তে বেলা-দি' হয় ত আর বেশী দিন বাঁচবে না।"

মুখে দুই-চারিটী সহানুভূতির কথা সুনয়নী যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল। কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে তুষের আগুন ধিকিধিকি করিয়া জলিতে লাগিল। ধিক্কারে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ছিঃ! ছিঃ! নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটী নিরপরাধা বালিকার সে কী সর্ব্বনাশই না সাধন করিয়াছে! তাহার চোখের সাম্‌নে যেন চিতার আগুন ধ্বক্‌ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

তাহার এই আকস্মিক বিষণ্ণতা তারানাথের দৃষ্টি এড়াইল না। সে রহস্য করিয়া বলিল,—"আমি আসার সঙ্গে-সঙ্গেই এই মাস তিনেকের মধ্যে তোমার মন্ত্রের জোর কমে গেল না কি? যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকো, বলো না হয় আর একবার মাদ্রাজ ঘুরে আসি।"

সুনয়নী বিশেষ কোন উত্তর দিল না। অন্যমনস্কভাবে দুই একটী হুঁ হুঁ মাত্র বলিয়া কাজের অছিলায় তারানাথের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বেলার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। গ্রামের প্রান্তে এয়োর 'বটতলা'য় জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠী-পূজার দিনে একটী মেলা বসিত। ইহা বিশেষ করিয়া মেয়েদেরই উৎসব। বহুদূরের গ্রাম হইতেও ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে মেয়েরা এই উৎসবে যোগদান করিতেন।

মেলা হইতে কয়েকটী জিনিষ কিনিয়া সুনয়নী গৃহে ফিরিতেছিল, হঠাৎ কতকগুলি মেয়ের মধ্য হইতে আসিয়া বেলা তাহার পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিল। বেলার চেহারা দেখিয়া সুনয়নীর বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। আশীর্ব্বাদের বাণী তাহার মুখ দিয়া উচ্চারিত

হইতে পারিল না। রোদে শুকাইয়া গেলে কচিপাতার যে অবস্থা হয়, বেলারও ঠিক্ সেই অবস্থা। কে যেন তাহার প্রাণ-পদার্থকে তিলে তিলে পিষিয়া নীরস করিয়া ফেলিয়াছে। বেলার কোলের কচি ছেলেটা তাহার জননীর চেয়েও অধিকতর শীর্ণ। মাতার শুষ্কবক্ষে দুগ্ধ-ধারার সন্ধানে শিশুটা বিফল প্রয়াস করিতেছিল। সুনয়নী কিছুক্ষণ কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বেলা চলিয়া যাইবার পর তাহার চোখ দুইটীর মধ্যে সে যেন আগুনের উত্তাপ অনুভব করিতে লাগিল।

সে রাত্রে তারানাথের আদর-আপ্যায়নে সে আর প্রাণ খুলিয়া সাড়া দিতে পারিল না। ক্লান্ত তারানাথ ঘুমাইয়া পড়িলে, সে ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। বাহিরে চাঁদের আলোয় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুনয়নীর মনে হইতে লাগিল,—বিশ্ব সংসারের সর্ব্বত্র ধূ ধূ করিয়া আগুন জলিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নিশিখার ধূম সুনয়নীর চোখের সম্মুখে এক ভীষণা করালিনী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল,—সুনয়নী চিনিতে পারিল সেই মূর্ত্তি শক্তিপুরের আদ্যাশক্তির।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল আনন্দ ঠাকুরের সেই কথাটা। তাহার প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ বলিয়াছিলেন, যে-মেয়ের কেশে সুনয়নী রক্তজবা গুঁজিয়া দিবে, সুনয়নী বাঁচিয়া থাকিতে সে কখনও রোগমুক্ত হইবে না; ডাকিনীর দৃষ্টি তাহাকে সর্ব্বত্র অনুসরণ করিয়া ফিরিবে।

সুনয়নী ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে আসিল। নিজের সর্ব্বদেহ যেন আগুনে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল। মোহাচ্ছন্নের মত সে নিঃশব্দপদে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

নদীর জল এত ঠাণ্ডা আগে সে কখনও বোধ করিতে পারে নাই। তাহার উত্তপ্ত দেহ যেন জুড়াইয়া গেল। একটী একটী করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া সে জলের মধ্যে নামিতে লাগিল। চাঁদের আলোয় নদীর জল ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। সুনয়নীর মনে হইল, নদীর বুকে যেন লক্ষ লক্ষ পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। আকণ্ঠ জলে আপনাকে নিমজ্জিত করিবার পর সে কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে ডুব দিল। সেই জায়গার জল দুই-একবার ছল্‌ছল্ শব্দ করিয়া আবার নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

মাকড়সা

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ

লাহোর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শঙ্করলাল স্থির করলে, লরেন্স ষ্ট্রীটে ইডেন হোটেলের সাত নম্বর কামরা সে ভাড়া নেবে। এই কামরায় উপর্য্যুপরি তিন শুক্রবার তিনজন লোক আত্মহত্যা করেছে আর তাদের আত্মহত্যা করবার প্রণালীও এক।

প্রথম ব্যক্তি একজন মার্কিণ বণিক। তার মৃতদেহ দেখা যায় শনিবার অপরাহ্লে। ডাক্তার বলেন, তার মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার অপরাহ্নে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। জানলার কাঠে পোষাক ঝুলিয়ে রাখার জন্যে যে হুক লাগানো ছিল সেই হুকে মৃতদেহটি ঝুলছিল। জানলা বন্ধ ছিল। পর্দ্দা টানার জন্য যে দড়ি ছিল সেই দড়ি মৃত ব্যক্তির গলায় বাঁধা। জানলাটা নীচু ব'লে মৃতব্যক্তির পা দুটো প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত মেঝের উপর ন্যস্ত। আত্মহত্যা করবার সঙ্কল্প তার যে খুব দৃঢ় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। খবর নিয়ে জানা গেল, লোকটি বিবাহিত ও চারটি সন্তানের পিতা। আর্থিক অবস্থা তার বেশ ভালই ছিল এবং সকল সময়েই সে খুব প্রফুল্ল থাকত। আত্মহত্যা করবার যে তার ইচ্ছা আছে এমন কিছু সে লিখে রেখে যায় নি এবং তার বন্ধুদের কাছে এ সম্বন্ধে কোনরকম ইঙ্গিতও করে নি।

দ্বিতীয় মৃত্যুটিও ঠিক ঐ রকমের। জার্ম্মান সার্কাসের খেলোয়াড় কার্ল ক্রাউজ দু'দিন পরে এই কামরায় আসে। পরের শুক্রবার রিহার্সালে সে হাজিরা না দেওয়ায় ম্যানেজার সার্কাসের একজন কর্ম্মচারীকে হোটেলে পাঠান। কর্ম্মচারী ক্রাউজের কামরার সামনে উপস্থিত হয়ে দেখে, দরজা খোলা এবং ক্রাউজের দেহ জানলার হুকে ঝুলছে। এই মৃত্যুটিও প্রথমটির মত রহস্যময়। কার্ল সার্কাসের একজন নাম-করা খেলোয়াড় ছিল—বেতন পেত প্রচুর। বয়স তার পঁচিশ বৎসর, আমোদ-প্রমোদে তার উৎসাহের অন্ত ছিল না। সেও কিছু লিখে রেখে যায় নি, মুখেও কাউকে কিছু বলে নি। দেশে তার বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কোন আত্মীয় নেই। মার টাকাকড়ি যথেষ্ট—প্রতি মাসেই ছেলেকে তিনি কিছু কিছু টাকা পাঠাতেন।

একই কামরায় দু'জন লোকের বিস্ময়কর মৃত্যুর কথা শহরে যখন রাষ্ট্র হ'ল, হোটেলের কর্ত্রী তখন অত্যন্ত মুস্কিলে পড়লেন। তাঁর হোটেলে নূতন লোকের আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, আর হোটেলের যারা স্থায়ী বাসিন্দা ছিল তাদেরও মধ্যে জনকয়েক অন্যত্র চলে গেল। থানার ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ ছিল—নিজের বিপদের কথা জানিয়ে তিনি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইন্‌স্পেক্টার শুধু যে এই অদ্ভুত আত্মহত্যা সম্বন্ধে তদন্ত সুরু করে দিলেন তা' নয়, তিনি তাঁর অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীকে হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন ঐ কামরায় কিছুদিন থাকবার জন্যে।

সার্জ্জেণ্ট ওয়াট্‌সন এই কাজের ভার পেয়ে ভারী খুসী হলেন। বারো বছর তিনি সিঙ্গাপুরের ডকে কাজ করেছেন। রাত্রে একাকী পাহারা দিতে তিনি অভ্যস্ত। ডকে চীনা দস্যুদের উৎপাতের অন্ত ছিল না। কত বার কত চীনা দস্যুকে তিনি যে কাবু করেছেন তা' বলা যায় না। ইডেন হোটেলের রহস্য তিনি যে উদ্ঘাটন করতে পারবেন এবিষয়ে কা'রো সন্দেহ ছিল না। শনিবার অপরাহ্নে তিনি হোটেলে আস্তানা নিলেন। সন্ধ্যার সময় হোটেলের কর্ত্রী নানাবিধ সুখাদ্য তাঁর কামরায় পাঠিয়ে দিলেন। আহার সেরে পরম নিশ্চিন্তমনে সার্জ্জেণ্ট ওয়াট্‌সন নিদ্রার চেষ্টা করলেন।

সকালে ও বিকালে সার্জ্জেণ্ট ওয়াট্‌সন রিপোর্ট দিতে থানায় হাজির হতেন। প্রথম দিনকয়েক তিনি বলেন যে, সন্দেহজনক কিছুই তিনি দেখেন নি। বুধবার বৈকালে

তিনি জানান, তাঁর মনে হচ্ছে যেন তিনি সন্ধানসূত্র পেয়েছেন। এসম্বন্ধে আরও কিছু বলবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি বলেন যে, ব্যাপারটি এখন প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না, কারণ এ-ব্যাপারের সঙ্গে ঐ রহস্যজনক মৃত্যু দুইটির কোন সম্বন্ধ আছে কি না তা' তিনি এখনও বুঝতে পারেন নি। তাঁর আশঙ্কা হয়, ব্যাপারটি প্রকাশ করলে সকলে তাঁকে উপহাস করবেন। বৃহস্পতিবার তাঁকে যেন একটু গম্ভীর মনে হ'ল, কিন্তু নূতন কোন সংবাদ তিনি দিলেন না। শুক্রবার সকালে তাঁকে যেন একটু চঞ্চল মনে হ'ল, কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, তাঁর মনে হয় জানলাটার এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। কিন্তু একথাও তিনি বললেন যে, এর সঙ্গে ঐ রহস্যজনক আত্মহত্যার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না,—এবং এবিষয় নিয়ে তিনি যদি আর কিছু বলেন, লোকে শুনে তাঁকে উপহাস করবে। ঐদিন বৈকালে থানায় তিনি এলেন না, থানার কর্ম্মচারীরা হোটেলে গিয়ে দেখলে, জানালার হুকে তাঁর দেহ ঝুলছে।

পূর্ব্ব দুইবারে মৃতদেহ যে অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেছে, এবারও ঠিক সেই অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। পা দুটো মেঝের উপর রাখা। জানলা বন্ধ, কিন্তু দরজাটি খোলা। মৃত্যু হয়েছে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। মৃতব্যক্তির মুখ হাঁ-করা, জিভ অনেকটা ঝুলে পড়েছে।

এই তৃতীয় মৃত্যুর ফলে হোটেলের সমস্ত বাসিন্দা সেইদিনই হোটেল ত্যাগ করলে। শুধু পনেরো নম্বর কামরায় যে লোকটি ছিল, সে গেল না। সে রাশিয়ার একজন খ্যাতনামা মল্ল—মাস দুই হ'ল ভারতবর্ষে এসেছে মল্লক্রীড়া দেখাবার জন্য। এই সুযোগে সে কামরার ভাড়া কমিয়ে নিলে।

এই ঘটনাটি আর দু'চার মাস পরে ঘটলে কাগজওয়ালারা হয় ত সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই ব্যাপার দিয়েই কাগজের কলেবর পূর্ণ করত। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন এসে পড়ায় কাগজওয়ালারা রাজনৈতিক দলাদলি নিয়ে এমন মেতে উঠল যে, এই রহস্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ করার দিকে তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। ফলে ইডেন হোটেলের ব্যাপার সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যতটা আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, তার কিছুই হ'ল না। তা' ছাড়া, খবরের কাগজে মৃত্যুর যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা'র মধ্যে অতিরঞ্জন ছিল না বললেই হয়—পুলিশ রিপোর্টে যতটুকু ছিল, শুধু তাই কাগজে ছাপা হয়েছিল।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শঙ্করলাল ইডেন হোটেলের ব্যাপার সম্বন্ধে খবরের কাগজের বিবরণ পড়েছিল। ঐ বিবরণে একটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। বিষয়টি এত তুচ্ছ যে, থানার ইন্‌স্পেক্টার কিংবা কোন প্রত্যক্ষদর্শী কাগজের রিপোর্টারকে কেউ ও-কথা বলেন নি। লোকের ওবিষয় মনে পড়েছিল কিছুদিন পরে—শঙ্করলালের অসমসাহসিক চেষ্টার পরিণতির পর সার্জ্জেণ্ট ওয়াট্‌সনের মৃতদেহ জানলা হ'তে যখন নামানো হয়, তখন তার মুখের ভিতর হ'তে একটা বড় কালো মাকড়সা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। কনেষ্টবল নেহাল সিং আঙুল দিয়ে মাকড়সাটা সরিয়ে দিয়ে ইন্‌স্পেক্টারকে লক্ষ্য ক'রে বলে, "ভারী আশ্চর্য্য তো! এবারও একটা মাকড়সা দেখছি যে!" পরে শঙ্করলালের সম্বন্ধে যখন তদন্ত সুরু হয়, তখন নেহাল সিং বলে, মার্কিণ বণিকের মৃতদেহ যখন নামানো হয়েছিল তখন সে ঠিক ঐ রকমের একটা মাকড়সাকে মৃতব্যক্তির কাঁধের উপর দিয়ে চলে যেতে লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে শঙ্করলাল কিছুই জানত না।

সার্জ্জেণ্ট ওয়াট্‌সনের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে, এক রবিবার শঙ্করলাল ইডেন হোটেলের সাত নম্বর কামরায় এসে উঠল। এখানে সে যা' কিছু দেখলে সবই যথাযথভাবে তার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করলে।

শঙ্করলালের ডায়েরী

সোমবার, ২৮-এ ফেব্রুয়ারী।

কাল সন্ধ্যায় আমি এখানে এসেছি। সুটকেশ খুলে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে রাখতে রাত ন'টা বেজে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। রাত্রে ঘুম বেশ ভালই হয়েছিল। সকালবেলা দরজায় করাঘাত হ'তেই ঘুম

ভেঙে গেল—ঘড়ির পানে চেয়ে দেখি পৌনে আটটা। দরজা খুলতেই হোটেলের কর্ত্রী ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজেই আমার প্রাতরাশ নিয়ে এসেছেন। আমার জন্য তিনি যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তা' খাদ্যের প্রাচুর্য্য হ'তেই অনায়াসে অনুমান করা যায়। আমি হাত-মুখ ধুয়ে বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে খেতে বসলুম। হোটেলের ভৃত্য আমার ঘর পরিষ্কার করবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি জানি, আমি যে কাজে হাত দিয়েছি তা'তে যথেষ্ট বিপদ, কিন্তু এ বিশ্বাস আমার আছে যে, আমার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হ'বে না। আমার মত লোকের জীবনের মূল্য কতটুকু—যদি এ জীবন যায় তা'তেই বা দুঃখ কি ?

শুনলুম, এই জটিল রহস্য সমাধানের জন্য আরও অনেকে ব্যগ্র হয়েছিল। সাতাশজন লোক এই ঘরখানি নেবার জন্য চেষ্টা করেছিল—কেউ বা পুলিশের সাহায্যে, কেউ বা হোটেলের কর্ত্রীর কাছে আবেদন করে। তাদের মধ্যে তিনজন না কি নারী। বিপদের কাজে এ রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্যই বিস্ময়কর—তবে আবেদন-কারীরা সবাই যে আমারই মত হতভাগ্য—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘরখানি পেলুম আমি। কেন ? পুলিশকে আমি জানালুম যে, অনেক চিন্তা ক'রে আমি এ-রহস্য সমাধানের এক ফন্দী আবিষ্কার করেছি। অবশ্য কথাটা যে একেবারে মিথ্যা, তা' আমি এখন স্বীকার করছি।

আমার এই ডায়েরী পুলিশের জন্যেই লেখা। আমি যে অতি সহজে পুলিশকে প্রতারিত করতে পেরেছি এ-কথা মনে ক'রে বাস্তবিক আমার আনন্দ হচ্ছে। ইন্‌স্পেক্টার যদি বুদ্ধিমান হন্ তা' হ'লে এই ডায়েরী পড়ে নিশ্চয়ই বলবেন, "শঙ্করলালের তুলনা নেই।" অবশ্য তিনি পরে কি বলবেন এজন্য আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। আপাততঃ আমি এই ঘরে স্থান পেয়েছি এবং আমার প্রথম কৌশল যখন ব্যর্থ হয় নি, তখন আশা করা যায় কার্য্যসিদ্ধি হয় ত হ'বে।

প্রথম আমি হোটেলের কর্ত্রীর কাছে গিয়েছিলুম। তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন থানায়। এক সপ্তাহ আমাকে থানায় যাতায়াত করতে হ'ল। প্রতিদিনই আমাকে বলা হ'ত যে, আমার আবেদন কর্ত্তৃপক্ষ বিচার করছেন এবং আমি যেন পরদিন দেখা করি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অধিকাংশ অনেক আগেই বিদায় নিয়েছিল। তাদের বোধ করি প্রতিদিন্ থানায় যাতায়াত করা ভাল লাগে নি, অথবা আর কোন কাজে তারা মনঃসংযোগ করেছিল। থানার ইন্‌স্পেক্টার শেষটা আমার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে যেন একটু বিরক্ত হ'লেন। আমাকে ও অন্যান্য আবেদনকারীকে তিনি জানালেন যে, আমাদের মত অনভিজ্ঞ সখের গোয়েন্দাদের উপর তাঁর কোন আস্থা নেই, তবে যদি কা'রো কোন ভাল ফন্দী থাকে তা' হ'লে তিনি তার আবেদন বিবেচনা করতে পারেন।

আমি তখন তাঁকে বললুম যে, আমার এক নূতন রকমের ফন্দী আছে। অবশ্য ফন্দী আমার কিছুই ছিল না এবং বেশী কিছু বলতে গেলে আমার অজ্ঞতাও ধরা পড়ে যেত। আমি শুধু বললুম, আমি তাঁকে আমার ফন্দী জানাতে পারি, যদি তিনি এক সর্ত্তে রাজী থাকেন—যদি তিনি নিজেই আমার ফন্দী পরীক্ষা করেন। অবশ্য আমার ফন্দীটি সহজসাধ্য নয় এবং যদি আমি নিজে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই, আমার প্রাণনাশেরও আশঙ্কা আছে। ইন্‌স্পেক্টার বললেন, তাঁর সময় অত্যন্ত অল্প—আমার ফন্দী পরীক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু পরে যখন তিনি ঐ ফন্দীর কিঞ্চিৎ আভাস দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন, তখন বুঝলুম, কৌশল আমার ব্যর্থ হয় নি।

ইন্‌স্পেক্টারের অনুরোধ রক্ষা করলুম। আমি এমন এক অদ্ভুত অর্থহীন গল্পের অবতারণা করলুম, যা' আমি এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও চিন্তা করি নি। কোথা থেকে এ-গল্প যে আমার মাথায় এসে গেল তা' আমি বলতে পারি না। ইন্‌স্পেক্টারকে আমি বললুম যে, সপ্তাহের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যার প্রভাব অত্যন্ত অদ্ভুত ও রহস্যময়।

এই সময়টি হচ্ছে ইহুদীদের সপ্তাহের শেষদিনের অপরাহ্নের শেষবেলা। এই সময়ে যীশু খৃষ্ট কবর থেকে অন্তর্দ্ধান করেছিলেন নরকে অবতরণ করবার জন্য। এবং তাঁর হয় ত স্মরণ থাকতে পারে যে, এই সময়েই—শুক্রবার অপরাহ্ন পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে—ইডেন হোটেলের তিনটি আত্মহত্যাই ঘটেছিল'। এর বেশী এখন আমি তাঁকে বলতে পারি না। আমার কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য আমি তাঁকে সেণ্ট জন্-এর রেভেলেশন্ পড়তে অনুরোধ করলুম।

ইন্স্পেক্টার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সাহেব,—আমার কথা শুনে রীতিমত বিস্মিত হ'লেও কৌশলে বিস্ময়ের ভাব গোপন ক'রে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন এবং পরে আমাকে বললেন, আমি যেন সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করি। আমি যথাসময়ে তাঁর অফিসে উপস্থিত হলুম। দেখি, তাঁর টেবিলের উপর এক কপি নিউ টেষ্টামেণ্ট পড়ে আছে। আমিও ইতিমধ্যে পড়তে সুরু করে দিয়েছিলুম। সমগ্র রেভেলেশন্ পড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এক বর্ণও বুঝতে পারি নি। ইন্স্পেক্টার হয় ত আমার কৌশল ধরে ফেলেছিলেন ; কবে মিশনারী কলেজে দু'-চারছত্র বাইবেল পড়েছি, তারই উপর নির্ভর করে প্রকাণ্ড একটা ধাপ্পা দিয়েছি। সে যাই হোক্, ইন্স্পেক্টার ভদ্রভাবে আমাকে বললেন যে, আমি আমার ফন্দীর তাঁকে যে অভাস দিয়েছি তা' থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, আমার ফন্দী নিতান্ত ব্যর্থ হবে না এবং তিনি আমাকে সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন।

তাঁর কাছ থেকে আমি যে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। হোটেলের কর্ত্রীর সঙ্গে তিনি বন্দোবস্ত করেছেন, যতদিন আমি হোটেলে থাকব আমাকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করতে হবে না। তিনি আমাকে একটি দামী রিভলভার ও একটি হুইসল্ দিয়েছেন। লরেন্স ষ্ট্রীটের কন্ষ্টেবলদের উপর হুকুম জারী করেছেন, তারা যেন ঘন ঘন হোটেলের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে এবং আমার কাছ থেকে সামান্য সঙ্কেত পেলেই যেন সাহায্য করতে ছুটে আসে। তা' ছাড়া, তিনি আমার ঘরে টেলিফোনের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, যাতে থানার কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সব সময় আমি কথোপ-কথন করতে পারি। থানা হোটেল থেকে বেশী দূরে নয়, যে-কোনো সময়েই সাহায্যের প্রয়োজন হোক্ না কেন, সাহায্য আসতে মোটেই দেরী হ'বে না। কিন্তু বাস্তবিক আমি বুঝতে পারছি না, ভয় করবার আছে কী!

মঙ্গলবার, ১-লা মার্চ্চ।

কিছুই ঘটে নি—কালও না, আজও না। হোটেলের কর্ত্রী সময় পেলেই আমার ঘরে আসেন এবং যখনই আসেন আমার জন্য ভাল কিছু খাবার সঙ্গে আনেন। আমি তাঁর কাছে তিনটি আত্মহত্যার কাহিনী পুনরায় বিস্তারিতভাবে শুনলুম, কিন্তু এ-সম্বন্ধে নূতন কিছু জানতে পারলুম না। মৃত্যুগুলির কারণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি তা'ও তিনি জানালেন। সার্কাস খেলোয়াড়ের মৃত্যুর মূলে যে এক হতাশ প্রণয়ের ব্যাপার আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গত বৎসর যখন সে এই হোটেলে ছিল, তখন একটি তরুণী প্রায়ই তা'র সঙ্গে দেখা করতে আসত—এবার তাকে একবারও দেখা যায় নি। মার্কিণ বণিক কেন যে আত্মহত্যা করে-ছিলেন, তা' তিনি সত্যই জানেন না—কিন্তু একজনের পক্ষে সব কথা জানা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ঐ সার্জ্জেণ্ট নিশ্চয় গলায় ফাঁসী দিয়েছিল শুধু তাকে জ্বালাতন করবার জন্য।

বলা বাহুল্য, হোটেলের কর্ত্রীর এই সব অদ্ভুত ধারণা আমার মনের উপর কোন ছাপ দিতে পারে না। কিন্তু তাঁকে আমি কখনও বাধা দিই না—তাঁর কৌতুককর মন্তব্য অনেক সময় আমার শ্রান্তি ও অবসাদ দূর করে।

বৃহস্পতিবার, ৩-রা মার্চ্চ।

এখনও কিছুই ঘটে নি। ইন্স্পেক্টার দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাকে টেলিফোনে ডাকেন এবং আমি তাঁকে জানাই যে, আমি বেশ স্বচ্ছন্দে আছি। এই খবরে তিনি যে বেশ সন্তুষ্ট হন্ না তা' বেশ বোঝা যায়। আমি

সুটকেস্ খুলে ডাক্তারী বইগুলি বা'র করে পড়তে সুরু করে দিয়েছি। ইচ্ছা ক'রে নিজেকে যখন বন্দী করেছি, তখন এই সময়টুকু যদি কাজে লাগাতে পারা যায় ত মন্দ কি!

শুক্রবার, ৪-ঠা মার্চ্চ। বেলা ২টা।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনে প্রচুর খাদ্যের আয়োজন ছিল। হোটেলের কর্ত্রী আমার জন্যে নানারকমের খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করেছিলেন। এ যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীর শেষ ভোজনের ব্যবস্থা। হোটেলের কর্ত্রীর কথাবার্ত্তায় বেশ অনুমান করা গেল যে, তিনি মনে করছেন আজই ঘণ্টা কয়েক পরে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। বিদায় নেবার পূর্ব্বে তিনি সাশ্রুনয়নে আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন এই দুঃসাহসিক কাজে আর অগ্রসর না হই। তাঁর ভয় হচ্ছে, আমিও হয় ত গলায় ফাঁসি দেবো তাঁকে বিপন্ন করবার জন্য।

পর্দ্দার দড়িটার দিকে আমি একবার তাকালুম। সত্যই আমি ঐ দড়ি নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই গলায় ফাঁসি দেবো না কি? কই, সে ইচ্ছা তো আমার নেই। দড়িটা বেজায় শক্ত—ঐ দড়ি দিয়ে ফাঁস বানানো মোটেই সহজ হবে না। আমাকে যদি আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হয় তবে সে-কাজ অত্যন্ত কঠিন হবে। সে-কাজ করবার মত মনের দৃঢ়তা আমার নেই। এখন আমি আমার টেবিলের সামনে বসে আছি। আমার বাঁ দিকে টেলিফোন, ডান দিকে রিভলভার। ভয় আমার এতটুকু নেই, তবে কৌতূহল অসীম।

বেলা ৬টা।

কিছুই ঘটে নি। এ আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা' বলতে পারি না। যে-সময় তিনজন গলায় ফাঁসী দিয়েছে সেই ভয়ঙ্কর সময়টি এল আবার চলে গেল, কিন্তু কিছুই প্রত্যক্ষ করলুম না। আমি অস্বীকার করব না যে, মাঝে-মাঝে আমার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগছিল জানলার কাছে যাবার জন্য—কিন্তু গলায় ফাঁসী দেবার উদ্দেশ্যে নয়, অন্য এক কারণে। পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে ইন্‌স্পেক্টার অন্ততঃ দশবার আমাকে টেলিফোনে ডেকেছেন,—আমার উৎকণ্ঠা যতখানি, তাঁরও ঠিক ততখানি। কিন্তু হোটেলের কর্ত্রী অত্যন্ত খুসী হয়েছেন,—সাত নম্বর ঘরে সপ্তাহকাল বাস করেও একজন আত্মহত্যা করে নি।

সোমবার, ৭-ই মার্চ্চ।

আমি যে-কিছু আবিষ্কার করতে পারব এ-ধারণা এখন আর আমার নেই। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের আত্মহত্যা দৈব দুর্ঘটনা মাত্র। ইন্‌স্পেক্টারকে আমি বলেছি যে, তিনি যেন তিনটি মৃত্যু সম্বন্ধে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করেন। আমার স্থির বিশ্বাস, যথারীতি তদন্ত হ'লে মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় জানা যাবে। আমি অবশ্য এখনই হোটেল ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমি এখানে দিব্য আরামে আছি—বিনা খরচে উপাদেয় খাদ্য পেয়ে শরীর আমার দিন-দিন পুষ্ট হচ্ছে। কাজকর্ম্ম না থাকায় পড়াশুনা বেশ ভালই চলছে—আশা করি, এইভাবে কিছুদিন পড়তে পারলে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন হ'বে না। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস আছে যা'র জন্যে এখান থেকে আমি এখন বিদায় নিতে পারছি না।

বুধবার, ৯-ই মার্চ্চ।

আমি আর একটু অগ্রসর হয়েছি। সোফিয়া—

ও, সোফিয়ার সম্বন্ধে কিছুই এখনও বলা হয় নি। আমার এখানে থাকার একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে ঐ সোফিয়া—সোফিয়ার জন্যই শুক্রবারের সেই ভয়ঙ্কর সময়টিতে জানলার কাছে যাবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল—গলায় ফাঁসী দেবার জন্য নয়। সোফিয়া—এই নামে ওকে আমি কেন অভিহিত করছি? ওর নাম কি আমি জানি না—কিন্তু আমার মনে হয়, এ-নাম ছাড়া ওর আর কোনো নাম হতে পারে না। আমি বাজী রাখতে পারি, আমি যদি ওকে ওর নাম জিজ্ঞাসা করি তা' হ'লে ও নিশ্চয়ই বলবে ওর নাম সোফিয়া।

এখানে আসার দু'-চারদিনের মধ্যেই আমি সোফিয়াকে লক্ষ্য করি। সঙ্কীর্ণ রাস্তাটির ওপারে ও থাকে, ওর জানলাটি ঠিক আমার জানলার সামনেই। পর্দ্দার পিছনে জানলার কাছেই ও বসে থাকে। আমি ওকে

লক্ষ্য করবার আগেই ও আমাকে লক্ষ্য করেছে—আমার সম্বন্ধে ওর কৌতূহলও যথেষ্ট আছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আশেপাশে যত লোক থাকে সবাই জেনেছে যে, আমি এই ঘরে রাস করছি। পাড়ার লোক দু'-পাঁচজন মাঝে-মাঝে হোটেলের কর্ত্রীর কাছে আসে আমার সম্বন্ধে খবর নেবার জন্য।

প্রেম আমার প্রকৃতিগত নয়—মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশাও আমি খুব কম করেছি। ডাক্তারী পড়বার জন্যে সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে যে সহরে এসেছে, সঙ্গতি যা'র এত অল্প যে, মাসের অধিকাংশ দিন অর্দ্ধাহারে কাটে, তার পক্ষে কি প্রেম করা সাজে? আমার কেমন মনে হচ্ছে, আমি এই প্রেমের ব্যাপারটি আরম্ভ করেছি নিতান্ত বোকার মত। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমার এই ক্রটির জন্যে আমি বিশেষ ক্ষুব্ধ নই।

প্রতিবেশিনীর সঙ্গে পরিচয় করবার ইচ্ছা প্রথমটা আমার কিছুই ছিল না। আমার শুধু মনে হয়েছিল, আমি যখন এখানে রয়েছি পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য এবং আপাততঃ যখন পর্য্যবেক্ষণ করবার কিছুই নেই, তখন আমি অনায়াসে আমার প্রতিবেশিনীকে পর্য্যবেক্ষণ করতে পারি। সারাদিন বই নিয়ে বসে থাকা কি সম্ভব?

আমার মনে হয়, সোফিয়া একাই সামনের বাড়ীর দোতলায় বাস করে। ওর ঘরের তিনটি জানলা, কিন্তু ও সেইটির পাশে বসে, যেটি আমার জানলার ঠিক সামনে। জানলার পাশে বসে চরকায় ও সূতা কাটে। সোফিয়ার চরকাটি বাস্তবিক অদ্ভুত,—খুব ছোট আর শাদা; দেখে মনে হয়, আইভরির তৈরী। নিশ্চয়ই ও যা' সূতা কাটে তা' অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সারাদিন পর্দ্দার পিছনে বসে ও চরকা চালায় অবিরাম—কাজ ওর বন্ধ হয় যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে। আজকাল এই শীতের দিনে ছ'টা বাজলেই অন্ধকার হয়ে আসে—বিশেষ ক'রে এই সঙ্কীর্ণ রাস্তাটির মধ্যে। কিন্তু কোনদিনই আমি সোফিয়ার ঘরে আলো জলতে দেখি নি!

সোফিয়াকে দেখতে কেমন তা' আমি ভালরকম জানি না। মাথায় একরাশ কোঁকড়া কালোচুল—গায়ের রঙ্ যেন একটু ফ্যাকাশে। নাক বেশ সরু ও উন্নত, ঠোঁট-দু'টি সুগঠিত কিন্তু যেন রক্তশূন্য। দাঁতগুলি মুক্তার মত শাদা, কিন্তু তীক্ষ্ণ—শিকারী পশুর দাঁতের মত। চোখের দৃষ্টি নীচের দিকে নিবদ্ধ, কিন্তু মাঝে-মাঝে যখন উপর পানে চায়, তখন ওর কালো ডাগর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলা করে। কিন্তু এ-সমস্ত আমার অনুভূতি মাত্র,—ভালরকম কিছুই আমি জানি না। পর্দ্দার আবরণ ভেদ ক'রে ভাল ক'রে কিছু জানা সহজ কথা নয়।

সোফিয়ার সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার আছে। সোফিয়া আমার স্বদেশীয়া নয়—সব সময় ও একটা কালো পোষাক পরে থাকে। হাতে লম্বা কালো দস্তানা,—সূতা কাটতে গিয়ে পাছে হাত অপরিষ্কার হয়, বোধ করি সেই জন্যে ও দস্তানা পরে। ওর ছোট ছোট কালো আঙুলগুলি যখন ক্ষিপ্রভাবে সূতা কাটে, তখন মনে হয় যেন কোন কালো পোকা দ্রুত পা ফেলে চলাফেরা করছে।

আমাদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব কেমন? আপাততঃ আমাদের পরিচয় ভাসা-ভাসা—তবে আমার মনে হয় যেন আমাদের পরস্পরের প্রতি সম্পর্ক ক্রমশঃ গভীরতর হচ্ছে। সোফিয়া রাস্তার ওপার থেকে আমার জানলার পানে তাকালে, আমিও তাকালুম ওর জানলার পানে। ও আমাকে লক্ষ্য করলে, আমিও লক্ষ্য করলুম ওকে। আমাকে হয় ত ওর ভালো লেগে থাকবে—এক দিন আমার পানে চেয়ে ও হাসলে। আমিও অবশ্য হাসলুম। এইভাবে দিনকতক গেল—পরস্পরের পানে চেয়ে প্রায় আমরা হাসি। রোজই ভাবি সোফিয়ার সঙ্গে দেখা হ'লে মাথা আনত ক'রে ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাব, কিন্তু কেন জানি না, মন আমার বারেবারে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে।

আজ অপরাহ্ণে সোফিয়াকে দেখে আমি মাথা নত করলুম, সোফিয়াও মাথা নত করলে—তার মাথা নোয়ানো আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি।

বৃহস্পতিবার, ১০-ই মার্চ্চ।

গতকল্য আমি বই নিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিলুম, কিন্তু পড়া বেশীদূর এগোয় নি। বসে-বসে শুধু স্বপ্নের জাল

বুনেছি। রাত্রে ঘুম ভাল হয় নি—আজ সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা অনেক।

জানলার কাছে যেতে দেখলুম, সোফিয়া নিজের স্থানটিতে বসে আছে। আমি মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন করলুম, সোফিয়াও তাই করলে। সোফিয়ার ক্ষীণ ওষ্ঠে মৃদু হাসি ফুটে উঠল,—আমার পানে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

পড়ার জন্যে তৈরী হ'বার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না; জানলার কাছে বসে তার পানে চেয়ে রইলুম। দেখলুম, হাত দুটো কোলের উপর রেখে সেও চুপ ক'রে বসে আছে। শাদা পর্দ্দাখানি টেনে একপাশে সরিয়ে দিলুম, সেও ঠিক্ ঐ মুহূর্ত্তে তাই করলে। আমরা পরস্পরের পানে চেয়ে বসে রইলুম।

আমার মনে হয়, আমরা প্রায় একঘণ্টা এইভাবে বসেছিলুম।

তারপর সে সুতা কাটতে সুরু করলে।

শনিবার, ১২-ই মার্চ্চ।

দিন কাটছে। আমি বেশ আরামেই আছি। খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকক্ষণ টেবিলে বসে লিখি। তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে বই নিয়ে বসি। কিন্তু পড়ি না কিছুই। পড়বার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু মনে মনে আমি জানি যে, চেষ্টা আমার ব্যর্থ হ'বে। তারপর জানলার কাছে যাই। সোফিয়ার পানে চেয়ে আমি মাথা নীচু করি, সোফিয়াও করে। তারপর দু'জনেই আমরা চেয়ে থাকি পরস্পরের পানে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা!

গতকল্য অপরাহ্নের শেষদিকে আমার মনটা হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার অন্যদিনের চেয়ে কিছু পূর্ব্বেই নেমে এসেছিল—এক অজ্ঞাত ভয় আমার সারামনে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। টেবিলের সামনে আমি চুপ ক'রে বসেছিলুম। জানলার কাছে যাবার জন্য মন আমার ছট্‌ফট্ করছিল—অবশ্য গলায় ফাঁসী দিতে নয়, সোফিয়াকে দেখ্‌তে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পর্দ্দার পিছনে এসে দাঁড়ালুম। আমার মনে হ'ল এমন স্পষ্টভাবে আর কোনদিন ওকে দেখি নি—যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হয়েছে। সোফিয়া সুতা কাটছিল, কিন্তু ওর চোখ দু'টি ছিল আমার দিকে নিবদ্ধ। আমি এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করলুম, কিন্তু মনকে ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারলুম না।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। নির্ব্বোধ ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হ'ল—অনাবশ্যক কতকগুলি প্রশ্ন ক'রে আমাকে এভাবে জ্বালাতন না করলেই নয়?

আজ সকালে ইন্‌স্পেক্টার হোটেলের কর্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে আমার ঘরে এসেছিলেন। হোটেলের কর্ত্রী আমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন। সাত নম্বর ঘরে দু' সপ্তাহ বাস করেও আমি যে জীবিত আছি, এ যেন তাঁর ধারণার অতীত। ইন্‌স্পেক্টার কিন্তু আরও কিছু প্রত্যাশা করেন। তাঁকে আমি আভাস দিলুম যে, আমি এক অদ্ভুত ব্যাপারের সন্ধান পেয়েছি, চেষ্টার ফল পরে তাঁকে জানাবো। লোকটা ভারী নির্ব্বোধ; যা' বললুম, তাই বিশ্বাস করলে। যাই হোক্, আমি এখন এখানে যতদিন খুসী থাকতে পারি এবং এখানে থাকাই আমার একমাত্র ইচ্ছা। খাদ্যের প্রাচুর্য্য যে আমার মনকে প্রলুব্ধ করছে তা' নয়—ও সব জিনিসের আকর্ষণ বেশীদিন থাকে না- আমি এখানে থাকতে চাই শুধু ঐ জানলাটির জন্যে।

সন্ধ্যায় আলো জ্বালার পর আমি আর ওকে দেখতে পাই না। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে নীচে পথের পানে চেয়ে থাকি, কিন্তু কোনোদিন ওকে বেরুতে দেখি না।

পড়ার সুবিধা হবে বলে হোটেলের কর্ত্রী আমার ঘরে গদিমোড়া একখানা বড় চেয়ার পাঠিয়েছেন—টেবিল-ল্যাম্পে সবুজ 'শেড্' লাগানো হয়েছে—কিন্তু পড়ায় মন বসে না।

রাত্রে ঘণ্টা দুই পড়ি বটে, কিন্তু পড়ার শেষে বেশ বুঝতে পারি—যা' পড়েছি, তার এক বর্ণ মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি। মনে হয়, সোফিয়ার চিন্তা ছাড়া আর কিছুই মস্তিষ্কে স্থান পাবে না। শেষটা বইগুলি ঠেলে রেখে চেয়ারে

হেলান দিয়ে ভাবতে সুরু করি—ভাবনা সেই এক, সোফিয়া।

রবিবার, ১৩-ই মার্চ্চ।

আজ সকালে আমি ভারী এক মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। হোটেলের চাকর আমার ঘর পরিষ্কার করছিল, আমি তাই ঘরের সামনে বারান্দায় পায়চারী করছিলুম। বারান্দার দক্ষিণ কোণে একটা মাকড়সার জাল আছে—সেই জালের মাঝখানে দেখি খুব বড় একটা স্ত্রী-মাকড়সা বসে আছে। হোটেলের কর্ত্রী এই মাকড়সার জাল কিছুতেই নষ্ট করবেন না—তাঁর ধারণা এ না কি মানুষের ভাগ্যোদয়ের পথ প্রশস্ত করে; কিন্তু তাঁর ধারণা যে নিতান্ত অমূলক, তা' অনায়াসে বোঝা যায় হোটেলের গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী থেকে। কিছুক্ষণ পরেই দেখি আর একটা মাকড়সা জালের কাছে এসেছে। এটা পুরুষ এবং খুব ছোট। সাবধানে আস্তে আস্তে সে জালের উপর দিয়ে এগুতে লাগল, কিন্তু স্ত্রী-মাকড়সাটা যেই একটু নড়েছে, অমনি সে দ্রুত পেছিয়ে এল। খানিক পরে আবার সে ধীরে-ধীরে এগুবার চেষ্টা করলে, একটু গিয়েই আবার সে ভয়ে পেছিয়ে এল। শেষটা মনে হ'ল, স্ত্রী-মাকড়সাটি যেন বৈরিভাব ত্যাগ করেছে, প্রণয়ীর প্রেম-নিবেদন উপেক্ষা করবার ইচ্ছা তার আর নেই—নিশ্চলভাবে জালের মাঝখানটিতে সে অপেক্ষা করতে লাগল। পুরুষ-মাকড়সাটা জালের একাংশে পা দিয়ে প্রথমে আস্তে, পরে জোরে নাড়া দিতে লাগল—সমগ্র জালটা কাঁপতে সুরু করল, কিন্তু স্ত্রী-মাকড়সাটা যেমন নিশ্চল ছিল, তেমনি নিশ্চলভাবেই রইল। এবার পুরুষ-মাকড়সাটা দ্রুত এগুতে লাগল, কিন্তু একেবারে অসতর্কভাবে নয়। স্ত্রী-মাকড়সাটা শান্তভাবে প্রণয়ীর আলিঙ্গনে ধরা দিলে। কিছুক্ষণ তারা বড় জালটিতে ঝুলতে লাগল পরস্পরকে আঁকড়ে।

তারপর দেখলুম, ছোট মাকড়সাটা আস্তে-আস্তে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। মনে হ'ল যেন সে তা'র প্রণয়িনীকে ফেলে পালাতে পারলেই বাঁচে। হঠাৎ নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সে ছুটতে সুরু করল প্রাণপণে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে স্ত্রী-মাকড়সাটা যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল, ক্ষিপ্তের মত সে তার পিছু নিলে। দুর্ব্বল পুরুষ-মাকড়সাটা জালের সূতা ধরে ঝুলতে লাগল, কিন্তু প্রণয়িনীর হাত থেকে সে নিস্তার পেলে না। দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে মেঝের উপর পড়ল—পুরুষ-মাকড়সাটা নিজেকে মুক্ত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তখন চেষ্টা করা বৃথা—প্রণয়িনী তাকে এমন জোরে আঁকড়ে ধরেছে যে, এক-পাও নড়বার তার শক্তি নেই। সে তাকে টেনে উপরে জালের মাঝখানে তুললে এবং একটু আগে যেখানে তারা পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করেছিল, এখন সেইখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক দৃশ্যের অনুষ্ঠান হ'ল। বিপন্ন প্রণয়ী তার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল পাগুলি দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু প্রণয়িনী তার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল ক'রে দিলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তার প্রণয়ীর চারিধারে জাল বুনে ফেললে—পালিয়ে যাবার আর কোনো উপায় রইল না। তারপর সে তার দীর্ঘ সূচিতুল্য মুখাগ্রভাগ প্রণয়ীর দেহে প্রবেশ করিয়ে তার রক্তটুকু নিঃশেষে পান করলে। খানিক পরে দেখলুম, সে তার প্রণয়ীর দেহাবশেষ ঘৃণার সহিত জাল থেকে দূরে নিক্ষেপ করলে।

এই সব প্রাণীর মধ্যে প্রেমের ধারা এই। আমি যে তরুণ পুরুষ-মাকড়সা নই, এই কথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি।

সোমবার, ১৪-ই মার্চ্চ।

এখন আর বইগুলি খুলেও দেখি না। জানলার পাশে বসেই দিন আমার কাটে। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসার পরও জানলা থেকে নড়ি না। সোফিয়া আর ওখানে নেই, কিন্তু আমি চোখ বুজে তার দেখা পাই।

হ্যাঁ, এ-ডায়েরী আমি যেমন চেয়েছিলুম, ঠিক্ সে-রকম হ'ল না। হোটেলের কর্ত্রী, ইন্‌স্পেক্টার, মাকড়সা, সোফিয়া—এই সবের কথাতেই ডায়েরীর পাতা ভরে উঠছে। রহস্য-সমাধানের অনুকূলে কোন তথ্যই এখনও পর্য্যন্ত এর মধ্যে স্থান পায় নি।

মঙ্গলবার, ১৫-ই মার্চ্চ।

আমরা ভারী এক মজার খেলা পেয়েছি। সারাদিন ধরে শুধু ঐ খেলাই খেলি। সোফিয়ার সঙ্গে যেই দেখা হয় আমি মাথা নীচু করি, সোফিয়াও করে তাই। তারপর জানলার কাচের উপর আঙুলের আঘাত ক'রে নানা-রূপ শব্দ করি, সোফিয়াও তাই করতে সুরু করে। আমি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকি, সেও প্রত্যুত্তরে হাতছানি দেয়। কথা বলবার ছলে আমি ঠোঁট নাড়ি, সেও অবিকল তাই করে। হাত দিয়ে সামনের চুলগুলো আমি পিছন দিকে সরিয়ে দিই, অমনি দেখি তারও হাত কপালের উপর এসে পৌঁচেছে। এ যেন ছোট ছেলের খেলা—আমরা খেলি আর হাসি। সোফিয়া হাসে অতি মৃদু, শান্তভাবে,—শব্দ হয় না মোটেই।

কিন্তু এ-খেলা বাহ্যতঃ যতটা নিরর্থক বলে মনে হয়, ঠিক্ ততটা নয়। এ শুধু অলস অনুকরণ নয়; তা' যদি হ'ত, তবে দু'-চারদিনের মধ্যেই আমাদের উৎসাহ নিবে যেত। এই খেলার মধ্যে আমাদের পরস্পরের চিন্তা-বিনিময় ঘটে। কারণ সোফিয়া আমার ভাবভঙ্গী অনু-করণ করে এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে। এই সময়টুকুর মধ্যে আমার ভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে যথাযথ অনুকরণ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। কত রকমেরই কসরৎ না আমি করি, কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য—একবারও তার অনুকরণে বিলম্ব হয় না।

এইভাবে দিন আমার কাটে। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখনও আমার মনে হয় না যে, সময় আমি বৃথা নষ্ট করছি।

বুধবার, ১৬-ই মার্চ্চ।

সত্যই এটা কি অদ্ভুত নয় যে, আজও পর্য্যন্ত আমি কোন চেষ্টা করলুম না সোফিয়ার সঙ্গে পরিচয় করতে—শুধু জানলার পাশে বসে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। গতরাত্রে এসম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছি। সোফিয়ার সঙ্গে পরিচয় করা—সে আর শক্ত কি? জামাজোড়া পরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা, তারপর রাস্তাটুকু পার হয়ে সামনের বাড়ীতে ওঠা। সোফিয়া দোতলায় থাকে—সুতরাং তার ঘরের কাছে পৌঁছুতে বেশী সময় লাগবে না। দরজার উপর মৃদু করাঘাত করব, তারপর—

এই পর্য্যন্ত আমি বেশ কল্পনা করতে পারি—আমার কল্পিত অভিযানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার কাছে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু এরপর কি যে ঘটবে, তা' আমার কল্পনায় আসে না। দরজাটি খুলল, আমি দেখলুম—কিন্তু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরদিকে উঁকি মেরে দেখি, ঘরে এমন অন্ধকার যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সোফিয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সে আসে না—কেউ-ই আসে না। ঘর যেন জনশূন্য, মসীবর্ণ দুর্ভেদ্য অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই।......

আমি কি সোফিয়াকে ভালবাসি? মাঝে-মাঝে আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করি, কিন্তু কোন সদুত্তর মেলে না—যে-হেতু এর আগে আমি কখনও ভালবাসি নি। কিন্তু সোফিয়ার প্রতি আমার অনুরাগ যদি ভালবাসা হয়, তবে এটা ঠিক যে, ভালবাসা সম্বন্ধে বন্ধুদের মুখে যা' শুনেছি অথবা উপন্যাসে যা' পড়েছি আমার এই ভালবাসা ঠিক্ তা' নয়।

নিজের অনুভূতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে কঠিন। আমি এমন কিছু চিন্তা করতে পারি না যার সঙ্গে সোফিয়ার—বিশেষ ক'রে আমাদের ঐ খেলার—কোন সম্পর্ক নেই। সত্য কথা বলতে কি, ঐ খেলাই সকল সময় আমার মনকে অধিকার ক'রে রাখে। কেন যে এমন হয় তা' আমি বুঝতে পারি না।......

সোফিয়া—হ্যাঁ, সোফিয়াকে আমার ভাল লাগে। কিন্তু ভাল লাগে বললে সব বলা হ'ল না—ঐ ভাল লাগার সঙ্গে মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ভয়ের ভাব জাগে। ভয়? না, ঠিক্ ভয় নয়—কেমন একটা সঙ্কোচ—একটা অনিশ্চিত ঘটনার সম্বন্ধে উদ্বেগ। একবার অগ্রসর হই, আবার পিছিয়ে আসি। তবে মনে-মনে আমি বেশ জানি, শেষটা আমাদের মিলন হবেই।

জানলার পাশে বসে সোফিয়া সূতা কাটে—লম্বা মিহি সূতা—সূতা ক্রমশই বাড়ে; মনে হয়, যেন ওর শেষ নেই। সে ঐ মিহি সূতা দিয়ে কি যেন বুনছে—ভারী

আশ্চর্য্য, সুতা একবারও জোট পাকাচ্ছে না বা ছিঁড়ছে না—উর্ণাজাল ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। তার ঐ উর্ণাজালে কত রকমেরই না নক্‌সা—অদ্ভুত জীবজন্তুর বীভৎস মুখ ও অবয়ব।

কিন্তু আমি লিখছি কী সব? প্রকৃতপক্ষে সে যে কি বুনছে তা' আমি কিছুই দেখতে পাই না—সুতাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টিগোচর হয় না। তবু আমার মনে হয় আমার কল্পনা মিথ্যা নয়—তার ঐ বুনট আমি যা' ভাবছি ঠিক্ তাই। চোখ বুজলে আমি যেন ঐ সূক্ষ্ম সুতার জাল স্পষ্ট দেখতে পাই—প্রকাণ্ড জাল—তা'তে নানারকমের অদ্ভুত জীব—মুখ ও অবয়ব কদাকার!

বৃহস্পতিবার, ১৭-ই মার্চ্চ।

আমার মনের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা উপস্থিত হয়েছে। কা'রো সঙ্গে আমি আর কথা বলি না। হোটেলের কর্ত্রী দেখা করতে এলে বিরক্ত হই। খেতে বসে বেশী সময় নষ্ট করি না। আমি শুধু চাই, সর্ব্বক্ষণ জানলার পাশটিতে বসে থাকতে—আর সোফিয়ার সঙ্গে কৌতুক করতে। এই খেলা আমার সারামনে এক অপূর্ব্ব শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

আমার কেমন মনে হচ্ছে, কাল একটা কিছু নিশ্চয় ঘটবে।

শুক্রবার ১৮-ই মার্চ্চ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে। ওরই জন্যে তো আমার এখানে থাকা। কিন্তু আমার মনে ভয় আসে কেন? কেন আমার বারংবার মনে হয়, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভাগ্যে যা' ঘটেছে, আমারও ভাগ্যে ঠিক্ তাই ঘটবে?

সত্যই আমার বড় ভয় হচ্ছে, ইচ্ছা করছে সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে চীৎকার করে উঠি!

অপরাহ্ণ ৬টা।

তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা লিখে ফেলি।

চারটার সময় আমার মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। হ্যাঁ, এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে—এই ঘরে যে-সব দুর্ঘটনা ঘটেছে, শুক্রবারের অপরাহ্ণের সঙ্গে তার কিছু যোগ থাকা সম্ভব। অদ্ভুত একটা গল্প রচনা ক'রে ইন্‌স্পেক্টারকে ঠকিয়েছি মনে ক'রে এখন আর উল্লাস করতে পারছি না।

চেয়ারে আমি বসেছিলুম—কিছুতেই চেয়ার থেকে উঠব না সঙ্কল্প ক'রে। কিন্তু খানিক পরে কে যেন আমাকে জোর ক'রে জানলার কাছে টেনে নিয়ে এল। সোফিয়ার সঙ্গে খেলার মোহ অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠল। কিন্তু জানলার কাছে এসেই ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলুম। একটা বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখলুম, তিনজন লোকের মৃতদেহ জানলার হুকে ঝুলছে—মুখ তাদের খোলা, জিভ অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। তারপরই লক্ষ্য করলুম, ঐ তিনজনের পাশে আমার দেহও ঝুলছে।

ওঃ, কি ভয়ই না আমার হ'ল! ভয়—এক অজ্ঞাত রহস্যময় ভয়! ঐ জানলার হুক, আর—আর ঐ সোফিয়া দুই-ই আমাকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে ফেললে। সোফিয়া আমাকে ক্ষমা করবে কি না জানি না, কিন্তু আমি যা' বলছি সবই সত্য। যখনই ঐ তিনটি মৃতদেহের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে—তখনই সোফিয়াকে মনে পড়ে, আর এক অজ্ঞাত ভয়ে দেহ মন অবশ হ'য়ে আসে।

একথা সত্য যে, গলায় ফাঁসি দেবার ইচ্ছা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে জাগে নি অথবা আমি যে গলায় ফাঁসি দিতে পারি এমন ভয়ও আমার হয় নি। আমার ভয় করছিল শুধু ঐ জানলাকে আর সোফিয়াকে। আমার মনে হচ্ছিল, যেন এক ভীষণ সহস্যময় বিপদ নিঃশব্দে আমার পানে এগিয়ে আসছে।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে কোন কিছু শোনবার অপেক্ষা না ক'রে, আমি চীৎকার ক'রে বললুম, "আসুন, শীঘ্র চলে আসুন।"

আমার উচ্চ কণ্ঠস্বর যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ভয় দূরে তাড়িয়ে দিলে। আমি শান্তভাবে চেয়ারে বসে পড়লুম। কপালের ঘাম মুছে এক গ্লাস জল পান করলুম। তারপর আমি চিন্তা করতে লাগলুম, ইন্‌স্পেক্টার উপস্থিত হ'লে তাঁকে কি বলবো। অবশেষে আমি পুনরায় জানলার

কাছে গেলুম এবং সোফিয়ার পানে চেয়ে মৃদু হাসলুম, সোফিয়াও হাসলে।

মিনিট পাঁচেক পরে ইন্‌স্পেক্টার উপস্থিত হ'লেন। আমি তাঁকে বললুম, এতদিন পরে আমি রহস্যের সমাধান করেছি। আজ যেন তিনি আমাকে কোন প্রশ্ন না করেন, কিন্তু শীঘ্রই আমি তাঁকে সমস্ত ব্যাপার জানাবো। ভারী মজার কথা এই যে, আমি যখন তাঁকে এসব কথা বলছিলুম, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি তাঁকে সত্য কথাই বলছি। এমন কি এখনও আমার মনে হচ্ছে—যদিও মন আমার এখন অনেক শান্ত ও ধীর—যে, আমি যা' তাঁকে বলেছি তা' সত্য।

ইন্‌স্পেক্টার আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছিলেন, কারণ আমি অনেক চেষ্টা করেও আমার ঐ ভয়ার্ত্ত চীৎকারের কোন সঙ্গত কারণ উপস্থিত করতে পারছিলুম না। তিনি সদয়ভাবে আমাকে বললেন, আমি যেন এ-ব্যাপারে বিচলিত না হই। কারণ, তাঁর কর্ত্তব্যই হচ্ছে, আমাকে সকল সময় সাহায্য করা। তিনি বরং বিনা কারণে দশবার আসবেন, তবু প্রয়োজনের সময় আমাকে যেন তাঁর অপেক্ষায় একবারও বসে থাকতে না হয়। তারপর তিনি আমাকে একটু বেড়িয়ে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। একা সব সময় ঘরের মধ্যে বসে থাকলে মানসিক অবসাদ আসতে পারে। আমি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম—যদিও ঘরের বাইরে যেতে আমি আদৌ ইচ্ছুক ছিলুম না।

শনিবার, ১৯-এ মার্চ্চ।

আমরা লরেন্স পার্কে কিছুক্ষণ বেড়ালুম। ইন্‌স্পেক্টারের কথাই ঠিক্—খোলা জায়গায় বেড়িয়ে মন আমার সুস্থ হ'ল। প্রথমটা আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলুম,—মনে হচ্ছিল, ঘর থেকে পালিয়ে এসে আমি যেন বিশেষ অন্যায় করেছি। ক্রমে সে ভাব মন থেকে চলে গেল। নিকটে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে আমরা চা পান করতে করতে নানা বিষয়ে গল্প করতে লাগলুম।

আজ সকালে যখন জানলার ধারে গেলুম, সোফিয়ার মুখ দেখে মনে হ'ল যেন সে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু বোধ হয় ও শুধু আমার কল্পনা,—কেমন ক'রে সে জানবে যে, কাল সন্ধ্যায় আমি বাইরে গিয়েছিলুম? সে যাই হোক্, সোফিয়ার গাম্ভীর্য্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না,—সে হাসলে, যেমন রোজ হাসে তেমনি।

সারাদিন আমাদের খেলা চলল।

রবিবার, ২০-এ মার্চ্চ।

আজ শুধু এইটুকু লিখলেই হবে—সারাদিন আমরা খেলা করেছি।

সোমবার, ২১-এ মার্চ্চ।

সারাদিন আমরা খেলা করেছি।

মঙ্গলবার, ২২-এ মার্চ্চ।

হ্যাঁ, আজও আমরা সারাদিন খেলা করেছি। আর কিছু করবার অবসরই হয় নি। মাঝে-মাঝে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি,—"কেন আমি এভাবে সময় কাটাই? কী আমার ইচ্ছা? এই খেলার পরিণতি কোথায়?" কিন্তু প্রশ্নের কোন উত্তর পাই না। সত্য কথা এই যে, এই খেলা ছাড়া আর কিছুই আমি চাই না। এবং এর পরিণতি যা' হবে—অন্ততঃ হ'তে পারে, তাই যেন আমার কাম্য।

দিনকতক হ'ল আমাদের কথাবার্ত্তা সুরু হয়েছে—অবশ্য নিঃশব্দে। প্রায়ই আমরা কথাবার্ত্তার ছলে ঠোঁট নাড়ি—কখনও কখনও শুধু পরস্পরের পানে চেয়ে থাকি।

আমার কল্পনা অমূলক নয়। সোফিয়া আমাকে তিরস্কার করছিল গত শুক্রবার বাইরে যাওয়ার জন্যে। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করলুম এবং আমার আচরণ যে অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে তা' অকপটে স্বীকার করলুম। সে ক্ষমা করলে,—আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, আর কোনদিন এই জানলা ছেড়ে বাইরে আমি যাব না। আমরা পরস্পরকে চুম্বন করলুম, জানলার কাচের উপর দীর্ঘকাল ঠোঁট দুটো চেপে রেখে।

বুধবার, ২৩-এ মার্চ্চ।

এখন আমি বুঝতে পারছি যে, আমি সোফিয়াকে ভালবাসি। সত্যি তাকে আমি ভালবাসি—আমার সারা মন সে অধিকার করেছে। হ'তে পারে অন্য

লোকের ভালবাসা একরকমটা নয়। কিন্তু একের অবয়বের সঙ্গে অন্যের অবয়বের যখন কোনো সাদৃশ্য নেই,—যখন লক্ষ লোকের মধ্যেও একখানা হাতের মত আর একখানা হাত মেলে না,—তখন কি ক'রে আশা করা যায় যে, মনের গঠন সকলের এক হবে? আমার মনে হয়, কোন ভালবাসারই জোড়া মেলে না—ভালবাসার অসংখ্য রূপ। আমি জানি, আমার ভালবাসা সাধারণের মত নয়,—কিন্তু তা' বলে কি আমার ভালবাসা একান্ত মাধুর্য্যহীন? আমি এ ভালবাসায় অপূর্ব্ব আনন্দ ও তৃপ্তি পাই।

আমার এ আনন্দে কোন ফাঁক থাকত না, যদি আমি ঐ ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতুম। মাঝে-মাঝে ভয়টা যেন মনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে—ভয়ের কথা কিছুই আর মনে থাকে না; আবার সে জাগে এবং আমাকে অস্থির ক'রে তোলে। মনে হয়, একদিন ঐ ভয় আমার বিপুল ভালবাসার কাছে পরাজয় স্বীকার করবে।

বৃহস্পতিবার, ২৪-এ মার্চ্চ।

আমি এক তথ্য আবিষ্কার করেছি—আমি সোফিয়াকে নিয়ে খেলি, না সোফিয়াই খেলে আমাকে নিয়ে। কেমন ক'রে এই তথ্য আবিষ্কার করলুম, সেই কথা বলি।

কাল সন্ধ্যায় আমি প্রতিদিনের মত আমাদের খেলার বিষয় চিন্তা করছিলুম। সোফিয়াকে অবাক্ ক'রে দেবার জন্যে আমি পাঁচটি নূতন ভঙ্গী ঠিক্ করলুম—ভঙ্গী কোন্‌টা কি রকম হবে কাগজে তার খসড়া করলুম—প্রত্যেকটির একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করলুম—তারপর কসরৎ সুরু ক'রে দিলুম ভঙ্গীগুলি আয়ত্ত করবার জন্যে। প্রথমে গোড়ার দিক্ থেকে পর পর পাঁচটি ভঙ্গী অভ্যাস করতে লাগলুম—তারপর শেষের দিক্ থেকে। তারপর আর একজোড় সংখ্যাগুলি একবারে এবং বিজোড়গুলি আর একবারে এইভাবে অনেকক্ষণ কসরৎ চলল—ক্লান্তিকর হ'লেও এর মধ্যে আমি প্রচুর আনন্দ পাচ্ছিলুম। মনে হচ্ছিল, আমি যেন ক্রমশঃ সোফিয়ার নিকটবর্ত্তী হচ্ছি,—যদিও সন্ধ্যার অন্ধকারে সোফিয়াকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না।

আজ সকালে আমি জানলার ধারে গিয়ে কসরৎ সুরু ক'রে দিলুম। ভেবেছিলুম, সোফিয়া আমার ভঙ্গী যথাযথ অনুকরণ করতে পারবে না—কিন্তু আশ্চর্য্য, যতই তাড়াতাড়ি আমি হাত-পা নাড়ি না কেন, আমার অনুকরণ করতে সোফিয়ার এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় না।...

কে দরজায় আঘাত করলে। চেয়ে দেখি, হোটেলের ভৃত্য,—আমার জুতা পরিষ্কার ক'রে সে ভিতরে রেখে গেল। দরজার কাছে এসে জুতা জোড়া পরলুম। জানলার কাছে ফিরে যাবার সময় আমার দৃষ্টি পড়ল সেই কাগজখানার ওপর, যা'তে ভঙ্গীগুলি সংখ্যানুযায়ী লিখে রেখেছিলুম। দেখ্‌লুম, কাগজে-লেখা ভঙ্গীগুলির একটিও আমি সম্পন্ন করি নি।

টলতে-টলতে চেয়ারের উপর বসে পড়লুম। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে, আমার এ অভিজ্ঞতা সত্য। আবার কাগজখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিলুম। হ্যাঁ, যা' দেখেছি ঠিকুই। জানলার কাছে আমি অনেক রকমের ভঙ্গী করেছি বটে, কিন্তু তার কোনটাই আমার নয়।

আবার আমার মনে হ'ল, যেন একটা দরজা ক্রমশঃ উন্মুক্ত হচ্ছে—আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—ভিতরে কিছুই দেখা যায় না—শুধু অন্ধকার—ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে, আমি যদি এখন পিছিয়ে আসি, তা' হ'লে আর আমার কোন ভয় নেই। যে রহস্যের সমাধান করবার জন্যে আমি এখানে এসেছি তা' এখন আমার মুঠার মধ্যে। পুলিশের কাছে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ ক'রে দিলে একদিনেই আমার খ্যাতি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়বে। কেউ যে-কাজ পারে নি, আমি তা' পেরেছি।...কিন্তু কি হবে আমার খ্যাতি নিয়ে? সোফিয়ার ভালবাসার কাছে সারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যও তুচ্ছ!

আমার মনের দুর্ব্বলতা কেটে যেতে বেশী সময় লাগল না। আবার আমি কাগজখানা নিয়ে ভঙ্গীগুলি ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে লাগলুম। কিছুক্ষণ অভ্যাসের পর পুনরায় আমি জানলার কাছে গেলুম।

এবার খুব সাবধানে অঙ্গভঙ্গী সুরু করলুম—কিছুতেই যেন ভুল না হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল—আমি যে-সব ভঙ্গী করলুম তার কোনটাই আমার স্থির করা নয়।

আমি স্থির করলুম, কড়ে আঙুল দিয়ে নাক ঘসবো, কিন্তু তা' না ক'রে জানলার কাচে চুম্বন করলুম। আমি ভাবলুম, সার্শির ওপর আঙুল দিয়ে আওয়াজ করবো, কিন্তু আঙুল সার্শির ওপর না পড়ে চুলের মধ্যে চলাফেরা করতে লাগল।...বুঝলুম, সোফিয়া আমার ভঙ্গীর অনুকরণ করে না, আমিই অনুকরণ করি তার ভঙ্গী, আর এত তাড়াতাড়ি আমি অনুকরণ করি যে, আমি বুঝতেই পারি না যে, আমার ভঙ্গীগুলি অনুকরণমাত্র—তার অন্তরালে আমার নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই।

সোফিয়ার চিন্তাধারা আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ভেবে এক সময় মনে গর্ব্ব হয়েছিল—এখন দেখছি আমিই তার অধীনে। কিন্তু তার এই প্রভাব আদৌ পীড়ন করে না—অত্যন্ত কোমল ও মধুর। বাস্তবিক, এর চেয়ে মধুর আর কিছু আছে আমি ভাবতে পারি না।

না, মনের বল এখনও হয় ত আমার কিছু আছে। দেখাই যাক্ না একবার পরীক্ষা ক'রে। দুটো হাত আমি পকেটে ভরলুম—হাত পকেট থেকে তুলব না—সোফিয়ার নির্দ্দেশেও নয়—মনে মনে এরকম সঙ্কল্প করলুম। তারপর সোফিয়ার জানলার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। দেখলুম, সোফিয়া হাত তুলে তর্জ্জনী নেড়ে আমাকে তিরস্কার করছে। আমি হাত তুললুম না। মনে হ'ল, আমার ডান হাতখানা পকেট থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে—আমি আঙুলগুলো পকেটের ভেতর দিকে নামিয়ে দিলুম। কিন্তু আস্তে-আস্তে, মিনিটকয়েক পরে, আঙুলগুলো অবশ হয়ে এল—হাত দুটো পকেট থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে গেল। আমিও তর্জ্জনী নেড়ে তাকে তিরস্কার করলুম—তারপর তার পানে চেয়ে হাসলুম।

শুক্রবার, ২৫-এ মার্চ্চ।

টেলিফোনের তার আমি কেটে দিয়েছি। আর আমি জ্বালাতন হ'তে চাই না!—যেই সেই দুর্লভ মুহূর্ত্ত আসে, অমনি নির্ব্বোধ ইন্‌স্পেক্টার আমাকে বারংবার ডাকে আর নানারকম প্রশ্ন ক'রে আমার আনন্দে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ...কিন্তু এ আমি কি লিখছি? এ যে মিথ্যা—মিথ্যা। কলম যেন আমার আর কেউ চালনা করছে।

কিন্তু আমি লিখবো—সত্য কথা লিখবো। লিখতে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হচ্ছে—কিন্তু আমি লিখবো। কে যেন আমাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে—কিন্তু আমি সঙ্কল্প ছাড়বো না—আমি লিখবো।

টেলিফোনের তার আমি কেটে দিয়েছি। কেন? কাটতে হ'ল যে,—না কেটে পারলুম কৈ!

আজ সকালে আমরা দু'জনে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে খেলছিলুম। কাল থেকে আমাদের খেলা বদ্‌লে গেছে। সোফিয়া একটা ভঙ্গী করে—আমি যতক্ষণ পারি প্রতিকূলতা করি, শেষটা পরাভব স্বীকার করি—সে যা' নির্দ্দেশ করে তাই করি। কিন্তু এইভাবে তার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করার মধ্যে যে কী আনন্দ, তা' সত্যই অবর্ণনীয়।

খেলতে-খেলতে হঠাৎ একসময় সোফিয়া ঘরের ভিতর চলে গেল। আমার দৃষ্টি তার অনুসরণ করল, কিন্তু ঘর এমনই অন্ধকার যে, তাকে আর দেখা গেল না—মনে হ'ল সে যেন অন্ধকারে মিশে গেছে! কিন্তু শীঘ্রই সে ফিরে এল—আমার ঘরে যেমন টেবিল-টেলিফোন আছে, সেই রকম একটি টেবিল-টেলিফোন দু'হাতে ধরে। মৃদু হেসে সে টেলিফোনটি জানলার পাশে রাখলে—তারপর একটা ছুরি দিয়ে তারটা কেটে পুনরায় টেলিফোনটি ঘরে নিয়ে গেল।

পনেরো মিনিট আমি নিজের সঙ্গে যুঝলুম। আগের চেয়ে ভয় আমার অনেক বেড়ে গেল, কিন্তু ধীরে-ধীরে সোফিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করার আনন্দটুকু অত্যন্ত লোভনীয় হয়ে উঠল। অবশেষে আমি আমার টেলিফোনটি এনে তারটা কেটে পুনরায় টেবিলের ওপর রেখে এলুম।

টেলিফোনের তার কাটার ইতিহাস এই।......

টেবিলের সামনে আমি বসে আছি। চা পান করা হয়ে গেছে। হোটেলের ভৃত্য এইমাত্র চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে গেল। সময় কত আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—আমার ঘড়ি ঠিক সময় দেয় না। সে বললে, পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিট।

আমি জানি, আমি যদি এখন সোফিয়ার পানে চাই, তা' হ'লে সে কিছু করবে—আর সে যা' করবে আমাকেও তাই করতে হ'বে।

তবু আমি তার পানে চাইলুম। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসছে। আমি অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করলুম—পারলুম না। সোফিয়া পর্দ্দার কাছে গেল—পর্দ্দার দড়িটা খুলে নিলে—দড়িটা লাল রঙের, আমার ঘরে যেমন আছে, ঠিক্ তেমনি। দড়িটা নিয়ে সে ফাঁস তৈরী করলে—তারপর জানলার কাঠে যে হুক আছে, তা'তে দড়িটা ঝুলিয়ে দিলে।

জানলার পাশে বসে সোফিয়া হাসছে।

হ্যাঁ, আমার ভয় করছে। ভয়? না, এ ঠিক্ ভয় নয়। এ এক অপূর্ব্ব অনুভূতি—এতে মাদকতা আছে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদের বিনিময়েও এ আমি ছাড়তে রাজী নই।

এখন আমি উঠে তার আদেশ পালন করতে পারি। কিন্তু না,—আমি নিজেকে সংযত করব। কিন্তু আমার শক্তি যেন ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে আসছে।

আবার আমি চেয়ারে এসে বসেছি। ক্ষিপ্রপদে জানলার কাছে গিয়ে তার আদেশ পালন ক'রে এসেছি—পর্দ্দার দড়িটা নিয়ে, ফাঁস তৈরী করে, জানলার হুকে ঝুলিয়ে দিয়েছি।

আর আমি সোফিয়ার পানে তাকাব না। একদৃষ্টে এই খাতার পানে চেয়ে থাকব—মুখ তুলব না। কারণ আমি জানি সে কি করবে যদি আমি আবার তার পানে তাকাই। সেই ভীষণ মুহূর্ত্ত এসে পড়েছে—ছ'টা বাজতে বোধ করি আর বেশী দেরী নেই। আমি যদি তার পানে তাকাই তা' হ'লে সে যা' চাইবে আমাকে তাই করতে হ'বে। আমি কিছুতেই তার পানে তাকাব না—তাকাব না।

পরক্ষণে আমি হেসে উঠি। না, হাসি না আমি,—কে যেন আমাকে লক্ষ্য ক'রে হাসে! কেন হাসে তা' আমি জানি—আমি যে তাকাব না বলেছি সেই জন্যে।

আমি তাকাব না—অথচ আমি জানি আমাকে তাকাতে হবে। হ্যাঁ, আমি তাকাব—সোফিয়ার পানে তাকাব—পরিণাম যা' হয় হোক্।

আমি বিলম্ব করছি—শুধু আমার এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে বেদনা আছে, কিন্তু সে বেদনায় অপরিমেয় আনন্দ। আমি যে দ্রুত লিখে চলেছি, সে শুধু আরো কিছুকাল এখানে বসে থাকবার জন্য—যতক্ষণ বসে থাকব, ততক্ষণ ঐ মধুর বেদনা!

আবার ভয় আসে যে! আমি জানি আমি ওর পানে তাকাব—তারপর উঠে জানলার কাছে গিয়ে ওই ফাঁস নিজের গলায় পরাব। এতে ভয়ের কি আছে? না, আমি ভয় পাব না। এ ত সুন্দর—মধুর!

কিন্তু একটা কথা—হুঁ, একটা কথা ভাববার আছে। ফাঁস তো নিজের গলায় লাগাবো—তারপর? তারপর কি হবে তা' আমি জানি না। কিন্তু জানতে বেশী দেরী হবে না—বেদনার আনন্দ অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছে—আমি বেশ বুঝতে পারছি এক ভীষণ পরিণতি আমার অপেক্ষায় রয়েছে।

না, কিছু ভাববো না আর। দ্রুত লিখে যাই, যা' খুসী—যাতে কোনো চিন্তা না আসতে পারে।

আমার নাম—শঙ্করলাল—শঙ্করলাল—না, আর লিখতে পারছি না—আমি ওর পানে চাইব—হ্যাঁ, চাইব—না, চাইব না—আমি শঙ্করলাল—শঙ্করলাল—শঙ্কর—

* * *

বারংবার টেলিফোনে ডেকে কোনো উত্তর না পেয়ে ইন্‌স্পেক্টার ছ'টা পাঁচ মিনিটের সময় ইডেন হোটেলে উপস্থিত হলেন। শঙ্করলালের কামরায় ঢুকে দেখলেন যে, তার মৃতদেহ জানলার হুকে ঝুলছে—ঠিক্ তার পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত; শুধু মুখের আকার বিভিন্ন। ভীষণ ভয়ে তার মুখ বিকৃত—চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে; ঠোঁট কুঞ্চিত, দু'পাটি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং দাঁতের মাঝে একটা প্রকাণ্ড কালো মাকড়সা—দাঁতের চাপে দেহ তার একেবারে থেঁতো হয়ে গেছে।

টেবিলের উপর শঙ্করলালের ডায়েরী। ইন্‌স্পেক্টার আদ্যোপান্ত পড়ে তখনই সামনের বাড়ীতে অনুসন্ধান করতে গেলেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল,—ঐ বাড়ীর দোতলায় কেউ থাকে না এবং বৎসরাধিক কাল খালি পড়ে আছে।

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

উপন্যাস
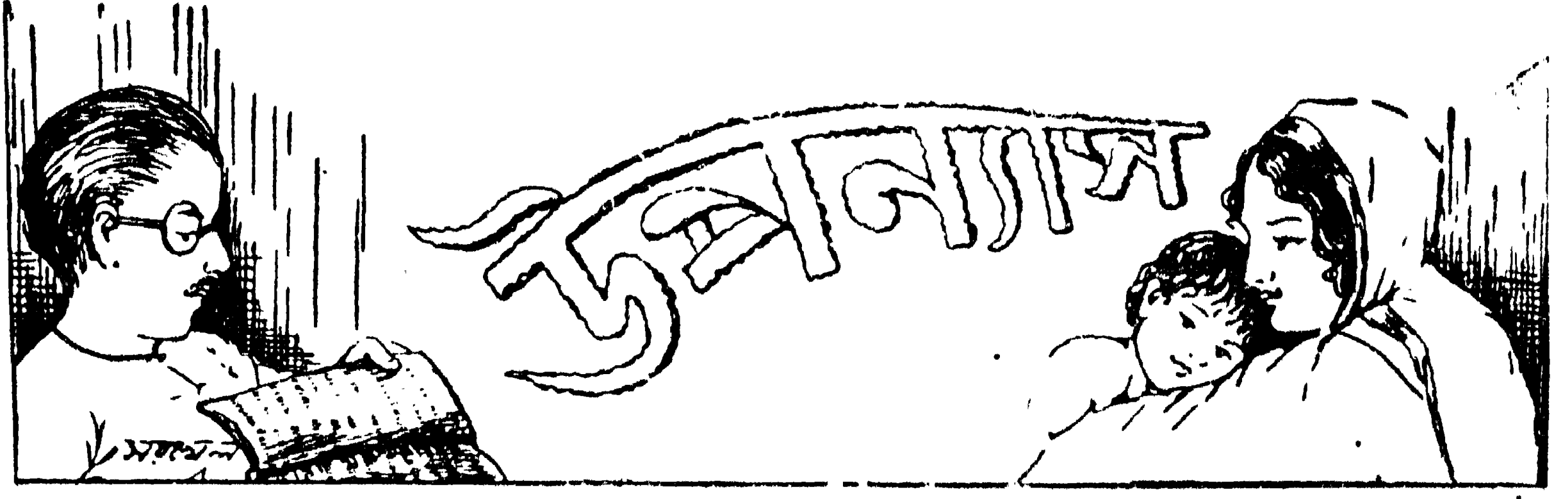
আলো ও ছায়া

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুসুমপুর গ্রামখানির নাম শুনিয়াই যদি কেহ কেবল ফুলের বাগানের কল্পনা করিয়া বসেন, তাহা হইলে আগে হইতে সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল—কারণ, ফুলের গন্ধ সারা গ্রামখানির মধ্যে বিশ-পচিশ বৎসরের মধ্যে কেহ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। তবে বিধাতাপুরুষকে করুণাময় বলিতেই হইবে; কেন না, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যেমনই বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তেমনই শ্রবণেন্দ্রিয়কে অপর্য্যাপ্ত দানে কৃপণতা করেন নাই। তাই ভোরের 'ভোঁ' হইতে লৌহ-এঞ্জিনের বিকট শব্দ সারাদিন এ গ্রাম কেন, গ্রামান্তর পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়া থাকে এবং কাজের চাপ পড়িলে রাত্রির নিস্তব্ধতাকেও শব্দময় করিয়া তুলিতে ছাড়ে না।

এমনই একটা শব্দ-মুখর রাত্রির ঘটনা লইয়াই এ আখ্যায়িকার সূচনা। বাজে কথা না বলিয়া সেইখান হইতেই আরম্ভ করা যাক্।

সরযূ ম্লান আলোর সম্মুখে বসিয়া একখানি মলাট-সুন্দর উপন্যাস লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, কিন্তু ঠিক্ মন দিতে পারিতেছিল কি না বলা কঠিন। বারবারই তাহার কর্ণ দুইটী কাহার আগমন শব্দের প্রত্যাশায় সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। বাহিরের নিঃসীম অন্ধকারের বুকে প্রকৃতির কি লেখা চলিয়াছিল, কে জানে! হঠাৎ সদরের দরজা সজোরে নড়িয়া উঠিল।

সরযূ ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কে?

—দরজা খুলুন। অজয়বাবুর হঠাৎ এঞ্জিনের মুখে হাত ঢুকে গিয়েছিল, আমরা ডাক্তারখানা থেকে তাঁকে নিয়ে আসছি।

ডাক্তারখানা! এঞ্জিন! এ দু'টী কথা ছাড়া কোন কথাই যেন ঠিক্‌মত সরযূর হৃদয়ঙ্গম হইল না। সে অভিভূতের মত দরজা খুলিয়া দিল। একখানা খাটে করিয়া আনিয়া কয়জনে ধরাধরি করিয়া অজয়কে তাহার ঘরের বিছানায় শোয়াইয়া দিল। নিঃশব্দে সরযূ আলো ধরিয়া সাহায্য করিল। মুখে একটী কথা পর্য্যন্ত কহিল না। আগতদের মধ্যে একজন বলিল—এখন ভয় কিছু নেই, তবু যদি বলেন, আমাদের কেউ না হয় থাকতে পারে এখানে।

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—প্রয়োজন নাই।

সকলে চলিয়া গেল।

সরযূ অর্থহীন দৃষ্টিতে শয্যাগতের পানে চাহিয়া রহিল; সাম্‌নের দরজাটা যে দেওয়া প্রয়োজন, এ কথাটা মনেও পড়িল না। কতকক্ষণ এমনইভাবে কাটিয়া গেল তাহার হিসাব ছিল না। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে অজয় ডাকিল—সরযূ?

স-র-যূ! সরযূ শিহরিয়া শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের আলোর একটা ছায়া আসিয়া অজয়ের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সরযূ দেখিল—অজয়ের গণ্ডদ্বয় বাহিয়া দুইটী ধারা গড়াইয়া চলিয়াছে।

হাসিতে চাহিয়া অজয় বলিল—জীবনে ভুল অনেক

করেছি, সাজাও হয় ত পেয়েছি কিছু কিছু, কিন্তু তোমার কাছে যে ভুল করলাম, তার কি কোন প্রতিকারই হ'তে পারে না সরযূ?

সরযূ উত্তর দিল না।

অজয় আপন-মনেই বলিয়া চলিল। বেশ বুঝা গেল, কথা বলিতে তাহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে। কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না।—আজ অমরকে চিঠি লিখে দিয়েছি। হ্যাঁ, সব কথা খুলেই বলেছি। জানি সে মানুষ, আমার মত অমানুষকে সহজেই ক্ষমা করতে পারবে। তবু বিনা সাজায় তার কাছে দাঁড়াতে মন সরল না। মনে করো না, মরতে আমি ভয় পেয়েছিলাম; মরি নি আমি ইচ্ছা করেই—তা'তে মুক্তি পেতাম হয় ত, কিন্তু শাস্তি পাওয়া হ'ত না।

এবারও সরযূ কথা কহিল না।

অজয় আপন-মনে বলিয়া চলিল—হয় ত বলবে, কে আমাকে এ কাজ করতে বললে? কেউ বলে নি সরযূ, মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন আসে, যখন কারুকে কিছু বলে' দিতে বলতে হয় না। নইলে বন্ধুপত্নী তুমি, তোমাকে যেদিন বায়স্কোপ থেকে বাড়ী না নিয়ে গিয়ে একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে হাজির করলাম, সেদিন কে বলে' দিয়েছিল, আর কেই বা বলে' দিয়েছিল এই কুসুমপুরে এসে কয়লার খনিতে কাজ নেবার। এ আমার বিধিলিপি!

সরযূ ধীরে ধীরে শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।

অজয় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। জড়িত-কণ্ঠে বলিল—ছেলেবেলা কবে মা-বাবাকে হারিয়েছিলাম মনে পড়ে না। স্নেহের দরজা আমার ভাগ্যে অনাবিষ্কারই থেকে গিয়েছিল, না হয় বাকী দিনগুলোও যেতো। কোথা থেকে তুমি এসে আমার সেই অজানা দ্বার খুলে অকাতরে স্নেহধারা বইয়ে দিলে বল ত? পঙ্গুর সাগর লঙ্ঘনের সাধ জাগল—উন্মাদের মত তোমাকে ছিনিয়ে এনে লক্ষীছাড়ার ঘরে লক্ষী-প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মস্ত ভুল হ'য়ে গেল—বুঝতে দেরী হ'ল না যে, প্রাণহীন লক্ষীকে নিয়ে আর যার মন ভরে ভরুক, আমার ভরতে পারে না। ভাবলাম—দু'মাস অপেক্ষা করলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে—কিন্তু বৎসর ঘুরে এল, তোমাকে পাওয়া দূরের কথা, তোমার ছায়াও আমার ভাগ্যে স্বপ্ন হ'য়ে রইল। জীবনে কোনদিন জোর করে' কারও কাছে কিছু চাই নি—জোর করবার প্রবৃত্তিও হ'ল না। তা' ছাড়া, অভিযোগ করবার মুখ আর আমার নেই, দাবী করবার সুযোগ আমি হারিয়েছি, কাজেকাজেই—

অজয়ের চোখ দুইটা কি জানি কেন জ্বলিয়া উঠিল। সে উঁচু হইয়া বসিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। অসহ্য যন্ত্রণায় উঃ বলিয়া শয্যার উপর আবার এলাইয়া পড়িল।

সরযূ তাহার নিকট আগাইয়া গিয়াই পিছাইয়া আসিল। অজয়ের দুইখানা হাতই দেহচ্যুত হইয়াছে—অবশিষ্ট কতটুকু আছে, তাহাও ব্যাণ্ডেজের উপর দেখিয়া বুঝা দুরূহ। তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল—আপন অজ্ঞাতেই সে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। কতক্ষণ এমনভাবে ছিল জানে না। জ্ঞান হইতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্ষণপূর্ব্বের ঘটনাটাকে মিথ্যা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতেই বোধ করি ভাল করিয়া অজয়ের পানে চাহিল; কিন্তু দারুণ হতাশায় তাহার চোখ দুইটী বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। সে বলিল—এতবড় সর্ব্বনাশ কেন তুমি করলে? কেন করলে?

অজয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—সর্ব্বনাশ নয় সরযূ, এ আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার। তবু যদি জানতাম—

—কি জানতে?—ভালবাসি কি না? কোনদিন—হ্যাঁ, কোনদিন তোমায় আমি বলি নি, কিন্তু আজ বলতেই হ'ল—আমি তোমাকে ভালবাসি—এত ভালবাসি যা' তুমি কল্পনায় আনতে পারবে না। তোমার ভালবাসা নয়—মোহ, তাই ধরতে পার নি। নইলে তোমার এতটুকু কলঙ্কের আঁচ সত্য হ'লেও আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় বলেই না এখানে পড়ে' আছি। মিথ্যা বোন্ বলে' তুমি একদিন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলে—সত্যকার বোনের দাবী নিয়েই আমি আজও বেঁচে আছি। নইলে

হিন্দুর মেয়ে আর কিছু পারুক না পারুক, মর্‌তেও কি পার্‌ত না মনে কর ?

অজয় নির্ব্বাক বিস্ময়ে সরযূর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সরযূ বলিয়া চলিল—মায়ের স্নেহ তুমি পাও নি, বোনের মমতা তোমার কাছে অজানা ছিল, তাই না- আমি তোমার মায়ের অভাব, বোনের অভিযোগ মেটাতে এগিয়ে এসেছিলাম। তুমি অন্ধ, তুমি...না কি, তা' হয় ত আমি ধরতে পারি নি। সেও সহ্য করেছিলাম, কিন্তু আজকের এ ক্ষতি...

অজয়ের চোখ দুইটীতে ধারা গড়াইয়া চলিয়াছিল। সে আবেগোদ্বেল-কণ্ঠে বলিল—এ ক্ষতি নয়—সরযূ, এ আমার জীবনে চরম লাভ। অসহায় শিশুর মত এই হতভাগাকে মার স্নেহ, বোনের ভালবাসা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে জীবনভোর, হয় ত তার পরও। যতবড় পাপই করি না কেন, প্রায়শ্চিত্ত সে এত মধুর হবে, এ আমি কল্পনায়ও আন্‌তে পারি নি। সরযূ মা, সরযূ বোন্! বলিতে বলিতে অজয় চুপ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিয়া উঠিল—সংসারের প্রথম পরীক্ষাতেই আমার পাশ মার্ক রইল না, কিন্তু তুমি এ অগ্নি-পরীক্ষায় পাশ কর্‌তে পার্‌বে ত সরযূ ?

সরযূ হাসিল, উত্তর দিল না। ঘরের আলো ম্লান করিয়া দিয়া বাহিরে আলো ফুটিয়া উঠিয়াছিল দেখিয়া সে আলোটা নিবাইয়া দিয়া সেখান হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বোধ করি চোখের জল রোধ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই সে পলাইয়া বাঁচিল।

দুই

ক'টা বাজ্‌ল সরযূ ?

সরযূর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু আনন্দের আভায তাহাতে একটুকু ছিল বলিয়া মনে হয় না। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল—বারটা বাজে বোধ হয়।

—তা' হ'লে এখনও সময় আছে, কি বলো ?

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

অজয় বলিল—চিঠি দিয়েছিলুম শুক্রবার; হ্যাঁ, শুক্রবারই ঠিক্। নিজে হাতে পোষ্ট-অফিসে গিয়ে দিয়ে এসেছি। তারপর আজ হ'ল শুক্রবার; আটদিন হ'য়ে গেল, তবু সে কেন এল না বল ত ? নিশ্চয় চিঠি খোয়া গেছে; নইলে তার ত কখন দেরী হয় না। তুমি হয় ত মনে মনে ভাবছ—এমন আর কি দেরী হয়েছে; এর মধ্যে এত অধৈর্য্য হ'লে কি চলে ? কিন্তু তুমি ত জান না আমাদের ভিতরের কথা—একদিন চিঠি দেবার দেরী হ'য়ে গেলে দু'জনের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হ'য়ে যেতো। একবার বাড়ীতে ঝগড়া করে' কাশী পালিয়েছিলুম—অমর খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করে নি। ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিয়েছি কি, তারপরদিনই সশরীরে হাজির হয়েছে। রেলের শব্দ হচ্ছে, না ?

—হ্যাঁ।

—গাড়ী এল তা' হ'লে। সে নিশ্চয়ই এসেছে—না এসেই পারে না। তুমি তার জন্যে জলটল ঠিক করে' রাখ। বস্‌বার চেয়ারটায় বড় ধুলো জমেছে, একটু ঝেড়ে দাও। আজকের রান্নার মধ্যে পোস্ত চচ্চড়ি বাদ যায় নি ত ? সে পোস্ত বড় ভালবাসে।

সরযূ কিন্তু সে কথায় কান দিল না। কয়দিন ধরিয়া অজয় শুধু তাহার বন্ধুর জন্য উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সরযূকে পর্য্যন্ত উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সরযূর অন্তরও তাহার সহিত প্রথম প্রথম কম সায় দেয় নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছে। এখন অজয়ের আগ্রহ আর তাহার অন্তরে সাড়া জাগাইতে পারে না; তবু সে অজয়কে ব্যথা দিবার প্রবৃত্তি নাই বলিয়াই প্রতিবাদ করে না।

অজয় বলিল—আজও খনির ম্যানেজার এসে কি বলেছিল তা' ত তুমি জানই। কথা দিই নি অমরের আশায়। সে উকীল। শুধু উকীল নয়, আইন ঘেঁটে খেয়েছে। এরই মধ্যে তার পশার দেখে সকলেই বল্‌তে স্বরু করেছে, দু'-চারবছরের মধ্যেই সে হাই-কোর্টের জজ্ হবে। জজ্ সে হবেই। এক জ্যোতিষীর কাছে একবার দু'জনে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। সে দেখেই বল্‌লে কি জানো—অমর জজ্ হবে, আর আমি হবো ভিখিরী। কথাটা সেদিন দু'জনেই হেসে উড়িয়ে

দিয়েছিলুম। কেন না, লেখাপড়ায় কেউ কার চেয়ে কম ছিলুম না। অবস্থা হিসাবে বিচার কর্‌লে তার চেয়ে আমারই ছিল ভাল। ভবিষ্যৎ কারও কাছেই অন্ধকার নয়। হেসে বল্‌লাম—তথাস্তু জ্যোতিষী-মশায়। আচ্ছা, বলুন ত ভিখিরী হয়েই না হয় গেলুম, আমাদের বন্ধুত্ব থাক্‌বে ত?

জ্যোতিষী বোধ হয় একটু চটেই গিয়েছিলেন। বল্‌লেন—না।

—না। অমর হেসে বল্‌লে—থাক্‌বে না কিছুতেই। আপনার অঙ্ক কষায় ভুল হচ্ছে না ত?

জ্যোতিষী দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে—না, ভুল হয় নি। বরং ওর চিন্তাও আপনার কাছে বিভীষিকা হ'য়ে উঠ্‌বে একদিন।

অমর মুখ বেঁকিয়ে একটা পয়সা জ্যোতিষীর দিকে ফেলে দিলে। জ্যোতিষী বল্‌লে—একটা পয়সা আমার দর্শনী নয়, ও আপনার কাছেই থাক্‌। একদিন মনে পড়বেই, সেদিন আমার ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে ইতস্ততঃ কর্‌বেন না।

—তাই হবে। বলে' দু'জনে সেস্থান ত্যাগ করে' এলুম।

—তুমি দেখে নিও সরযূ, অমর জজ্‌ হবেই। আমি···

বাধা দিয়া সরযূ কি বলিতে যাইতেছিল, দরজার নিকট হঠাৎ পিয়ন হাঁকিল—অজয়বাবু বাড়ী আছেন? চিঠি আছে।

চিঠি! সরযূ দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া সদর দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। পিয়ন চিঠি দিয়া চলিয়া গেল। খামখানির উপরকার লেখাগুলা পড়িতে পড়িতে সরযূর হাত দু'টা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দীর্ঘ একবৎসরের পর আজ যেন প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া সে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে আনন্দ অধিকক্ষণ তাহাকে আবিষ্ট রাখিতে পারিল না। খামের ভিতরকার ছোট্ট কাগজখানি না জানি কি সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে!

সব চেয়ে এই চিন্তাটাই তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল যে, নির্জ্জনে পড়িয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইবার উপায় নাই। অজয়ের নিকট নিজেকেই নিজের শাস্তির কথা অবিচলিত-কণ্ঠে পড়িয়া যাইতে হইবে। এতটুকু চঞ্চল হইলে চলিবে না। অজয় ডাকিল—কার চিঠি এল সরযূ? অমর লেখে নি ত?

—হ্যাঁ। বলিয়া সরযূ যন্ত্রচালিতের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অমর সাগ্রহে বলিল—পড়ো ত। সে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে নিশ্চয়। আজ গাড়ী নেই, কাল সকালে যেমন করে' হোক্‌ আমাদের চলে' যেতে হবে। খনির ম্যানেজার টাকা দিয়ে এখান থেকে সরাতে চেষ্টা কর্‌ছিল। এসে খুব আনন্দ করবে 'খন। টাকা কিছু নয় সরযূ, অনেক টাকা দু'হাতে উড়িয়েছি। আজ হাত নেই বলে' পিছুলে চল্‌বে কেন। পড়ো ত সরযূ।

সরযূ এতটুকু ইতস্ততঃ করিল কি না বুঝা গেল না। চিঠিখানি খুলিয়া ধীরকণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিল—

অজয়,

তোমার পত্র পাইয়াছি। এমন করিয়া তোমার আমার মধ্যে পত্র-বিনিময় করিতে হইবে, ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বলিয়াই উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

সরযূকে লইয়া যাইবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছ, তাহাতে আপত্তির কারণ ঘটিয়াছে—কেন না, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছি। এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। ইতি,

অমর

বজ্রপাতেও বোধ করি এতটা স্তব্ধতা সম্ভব নহে। অজয়ের মুখ দিয়া একটা কথাও সরিল না। সে নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত সরযূর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৌতিক গল্প

অপর্ণা

কবিশেখর শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চা খেয়ে খামখানা খুলে চিঠি পড়তেই মাথা ঘুরে গেল। খানিকক্ষণ চোখ বুজে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, কিছু কূল-কিনারা পেলাম না। বন্ধু বেণীর চিঠিখানা নিয়ে গিন্নীর মতলব নিতে ভেতরে গেলাম। গিন্নীকে সব বল্‌লাম, চিঠিখানাও দিলাম। গিন্নী এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে বল্‌লেন—"বল কি? আহা, দুধের বাছা অপর্ণার শেষটা এমন ক'রে কপাল পুড়লো! হায়! হায়!"

আমি—আমিও ত ভাবছি, জামাই বাবাজীর শরীর ভালই ছিল, অমন মোটা সোটা, অসুখ-বিসুখ কখন তার হয় নি, হঠাৎ একদিনে মারা গেল, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

বিনুর অসুখ, কি ক'রবো, বউমাদের ওপর ভার দিয়ে যাবারও উপায় নেই, তুমি বরং আজকেই ওবেলার গাড়ীতে না হয় যাও।

আমি—আজকে আর যাব না, কালকের খাওয়াটা একটু চাপ হয়েছে, শরীরটায় তেমন জুতও নেই, কাল না হয় যাওয়া যাবে।

গিন্নী—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, রমেন তার শাশুড়ী বউ আর শালাকে নিয়ে তীর্থে চলে গেল, তার পাঁচদিন পরেই রমেনের বাপ বেণী ঠাকুরপোকে চিঠি লিখে লোক পাঠালে যে, বউমাকে পাঠাবেন, রমেন জামালপুরে কলেরায় মারা গেছে, অথচ চিঠির ভাষায় যেদিন মারা যায় সেইদিনই রাত্তিরের ট্রেণে এরাও সব চলে গেছে। আমি ত এ গোলমেলে ব্যাপার বুঝ্‌তে পারছি না।

আমি—আমিও ত তাই ভাব্‌ছি। লেখায় পাচ্ছি বেলা আটটায় মারা যায়, এদিকে বেলা দশটার সময় বেণী কিন্তু তার পায় যে, অপর্ণা, তার মা, যেন ছোট খোকাকে সঙ্গে ক'রে আজকের মেলে চলে আসেন, আমি ষ্টেশনে থাক্‌বো, সেখান থেকে একসঙ্গে সবাই যাব। পাশ লোক দিয়ে পাঠালাম, সে বিকেলের মধ্যে যাবে। এক্ষেত্রে গাঁজাখোর কাকে বলি বল ত—বেণী না তার বেয়াই?

গিন্নী—রমেন অনেকদিন থেকে ব'লে আস্‌ছে যে, একবার শীগ্‌গির যেখানে যত তীর্থ আছে তা দেখিয়ে আন্‌বে। আর বড় চাকরে, পাশও সেকেণ্ড ক্লাশের

পাবে বোধ হয়, এতে অপুর বাবার রাগ বা সন্দেহ করবার ত কিছু নেই।

আমি—সেই ত হচ্ছে কথা, ঐখানেই ত গোলোক ধাঁধার চরকী, বুঝ্‌ছ না গিন্নী, তার বাপ চার-পাঁচদিন পরে চিঠি লিখ্‌লে যে, রমেন নেই, অমুক দিন মারা গেছে, বউমাকে এঁর সঙ্গে পাঠাবেন, আর তার বউমাকে নিয়ে তারি ছেলে তীর্থে চলে গেল।

গিন্নী—যাক্। ও নিয়ে আর ব'কে কোন ফল নেই, কালকেই তুমি যাবার চেষ্টা কর, খবরটা নিয়ে এস, তারপর বিনু একটু সারলে আমিও একবার দেখে আস্‌বো, অনেক দিন যাই নি।

দুই

আমার যাবার কথা ছিল বটে, কিন্তু পেটটা একটু গোলমাল বাধালে, ফলে চার পাঁচদিন বার্লীর জলের সঙ্গে ভাব ক'রতে হ'ল।

যেদিন গাঁধালের ঝোল দিয়ে দু'টি ভাত খাব, সেইদিন সকালে বেণী ভায়ার আর একখানি চিঠি পেলাম, খামটা বেশ মোটা ভারী, ডাকের টিকিটও পাঁচ পয়সা লেগেছে। খামখানা খুলে ফেল্‌লাম, দেখ্‌লাম প্রায় দু'পাতা লেখা। লেখা আছে—

"বোধ হয় চিঠি পেয়েছ। আস্‌বে ভেবেছিলাম, কিন্তু কেন এলে না তা বুঝতে পারলাম না। যাই হোক্, যে-দিন তোমায় চিঠি দিই সেইদিন ডাকে হরিদ্বার থেকে এক চিঠি পাই, তার ভেতর রমেনের, অপর্ণার আর তার মার লেখা তিনখানা চিঠি পাই। তারা গয়া, বৈদ্যনাথ, কাশী, অযোধ্যা হ'য়ে হরিদ্বারে গেছে, সেখান থেকে অনেক সব তীর্থে যাবে, তারপর কুরুক্ষেত্র। তারা বেশ সুখ ও শান্তিতে আছে, ছোট খোকার খুব স্ফূর্ত্তি, সে খুব বেড়াচ্ছে। খিদেও সকলের খুব বেশী রকম বেড়েছে, তিন-চারদিনের খাওয়া তারা না কি একদিনেই খায়।

...আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। ব্যাই-মশায়কে জানিয়েছি যে, মেয়েরা এখানে কেউ নেই, আর হরিদ্বার থেকে সবার চিঠি এসেছে।...রমেনের তারের নকল, ও পাশের নম্বরও তাঁকে জানিয়েছি। কিন্তু তার উত্তর এখনও পাই নি।

...বড় আশ্চর্য্যের কথা, আজকে অপর্ণার নামে ডাকে একখানা চিঠি এসেছে, হাতের লেখাটা মেয়েমানুষের, তাতে ডাকখানার ছাপ দেখ্‌লাম জামালপুর। অপুর নামের বলে খুল্‌লাম না, তাতে মেয়েমানুষের লেখা...

চিঠিটা খুব পাতলা, বোধ হয় তার ভেতর এক চির চিঠির কাগজ আছে।......তাদের ঠিকানা পেলে সেইখানে চিঠি দিতাম, কিন্তু তারও উপায় নেই, কি ক'রবো কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।...

যাই হোক্, তুমি যত শীঘ্র পার এসে দেখা ক'রবে, অনেকটা সাহস পাব।

তোমারই বেণী"

উঠ্‌লাম। সটান গিন্নীর কাছে গিয়ে খামখানা ফেলে দিলাম। তিনি আগাগোড়া প'ড়ে বল্‌লেন—"আমি ত আগেই বলেছিলাম আমার কেমন সন্দেহ হয়, এর ভেতর কোনরকম দুষ্টলোকের ষড়যন্ত্র আছে কি না, তাত বুঝতে পারছি না। হয় ত জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলে মজা দেখ্‌ছে, এই তো তোমার কথা?"

আমি—হাঁ, তাই সাব্যস্ত ক'রেছি বটে, কিন্তু সবি গোলমেলে। রমেন নিজে তাদের সঙ্গে আছে, তারা চিঠিতে জানাচ্ছে আর ওদিকে রমেনের বাপ লিখ্‌ছে রমেন মারা গেছে, এসব কি যে গোলমেলে কাণ্ড ঠিক্ বুঝতে পারছি না ব'লেই ত তোমার কাছে বুদ্ধি নিতে এলাম।

গিন্নী—কি জানি বল, আমি ত ওর কোন খেই খুঁজে পাচ্ছি না; রমেনের বাপও ত' বিদ্বান, ছেলের মরা খবর পেয়ে, কোন খোঁজ-খবর নেওয়া কি সেখানে যাওয়াটা দরকার ব'লে মনে না ক'রেই অমনি অচেনা অজানা একটা লোকের চিঠিতে বিশ্বাস করলে? এও কি কখন সম্ভব হ'তে পারে।

আমি—সেটা এখান থেকে আন্দাজেই বা কি ক'রে

বলি। যাক্, আজ দু'টো ভাত ত খাই, তারপর দেখি কাল না হয় পরশু যাব।

গিন্নী—উচিত ত এখনি যাওয়া। লোকের বিপদে না দাঁড়ালে চ'লবে কেন? সংসারে থাক্‌তে হ'লে সে-গুলো নিয়ম মত না করলে লোকে যে চামার ব'ল্‌বে, কিন্তু তোমার যে শরীর, তাতে ক'রে যেতেও বল্‌তে সাহস হয় না, যাক্, একখানা চিঠি এখনি লিখে দাও, এখানকার সব খবর দিতে ভুলো না।

আমি—সে ত দেবই। পোষ্টকার্ড লিখে ডাকে পাঠিয়ে তবে নাইবো, হ্যাঁ দেখ, তুমি একটু জল গরম করতে বল। আচ্ছা দেখ, এক কাজ করলে হয় না, আমি ভাব্‌ছি বেচাকে সঙ্গে নিয়ে যাই, সে ত অনেক দিন পুলিসে চাক্‌রী করেছিল, গোয়েন্দাগিরীতেও বেশ হাতযশ আছে।

গিন্নী—হ্যাঁ, জানি, কিন্তু সে সবের এখন দরকার নেই, আগে যাও, কিশোরীর বাপের সঙ্গে দেখাশোনা কর গে, ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝ—তারপর যা করবার তা ক'রবে।

আমি আর কোন কথা না বলে, বৈঠকখানায় এসে বেণীকে চিঠি লিখে চাকরকে দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে, স্নান ক'রে সকাল সকাল দু'টি খেয়ে শুয়ে প'ড়লাম।

বিকেলে উঠে বৈঠকখানায় এসে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে ডাকের একখানা চিঠি।

নলটা মুখে দিয়ে খামখানা খুলে দেখ্‌লাম—এক পৃষ্ঠায় লেখা বেণীর চিঠি, লেখা আছে :—

"তোমায় কাল একখানা চিঠি দেবার পর অপুদের আর একখানি দিল্লী থেকে লেখা চিঠি পেলাম, তারা সব বেশ ভাল আছে, নানান স্থানের সব জিনিষপত্র তারা কিনেছে, তোমাদের জন্যেও কত কি সব নিয়েছে। তারা কুরুক্ষেত্র দেখে আজকেই আগ্রা হ'য়ে মথুরা বৃন্দাবন যাবে, সেখান থেকে কাশ্মীর, যে যে তীর্থ করেছে, তার নাম দেখলাম একশো দশ। ছোট খোকার স্বাস্থ্য বেশ মোটাসোটা হ'য়েছে, তার গর্ভধারিণীর উন্নতি না কি সবার চেয়ে বেশী হ'য়েছে। রমেন টাকার শ্রাদ্ধ ক'রছে। বড় বড় সব তীর্থে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীদের খাইয়েছে, খুব ঘটা ক'রে রাজারাজড়ার মত পুজোটুজোও সব দিয়েছে, কাশীতে না কি, একশো সধবা, একশো কুমারী করেছে, শ'খানেকর উপর দণ্ডীও খাইয়েছে—এ রকম সব দান-ধ্যান না কি সব তীর্থতেই করেছে। শেষটা লিখেছে যে, যদি আমি সঙ্গে যেতাম তা হ'লে এমন সুখ, শান্তি ভোগ ক'রে আর এইসব অদ্ভুত জিনিষ দেখে জীবন সার্থক ক'রতেম—এমন অনেক দেখবার আছে, যা দেখ্‌লে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। যাক্, তুমি সুবিধামত একবার আস্‌বে, তোমায় সব চিঠিগুলো দেখাব। আমার কষ্ট হচ্ছে শুনে বড় মেয়ে কিশোরী তার ছেলেমেয়ে নিয়ে কাল আস্‌বে। যাক্, তোমাদের সব খবর দেবে, বিন্থর মার শরীর কেমন? ওরা সব ফিরলে আমি নিজে গিয়ে তোমাদের এখানে আন্‌বো।

তোমারই

বেণী"

চিঠিখানা প'ড়ে মনে একটু জোর পেলাম, তাড়াতাড়ি গিন্নীকে গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লাম—"এই দেখ বেণীর আর একখানা চিঠি এসেছে।"

গিন্নী তাড়াতাড়ি হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে প'ড়ে ব'ল্‌লেন—"এ যে কি ব্যাপার তা ত আমি ভাল বুঝছি না।"

আমি—কেন?—বেশ পরিষ্কার, জলের মত, এতে আর বোঝবার কি আছে? স্পষ্ট প্রমাণ হ'চ্ছে যে, রমেন বেঁচে আছে, বদ্‌মায়েসরা এই চাল চেলেছে।

গিন্নি—চিঠি প'ড়লে তাই বোঝায় বটে, কিন্তু মরার খবরটা, আর রাজারাজড়ার মত অগাধ খরচ, এ দুটো কেমন আমার মনে খট্‌কা বাধাচ্ছে। মাইনে ত তিনশো না কত, বাপের অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়, জমিদারীও নেই, তবে হ্যাঁ, বছর দশেক চাক্‌রী ক'রছে, তাতে ক'রে আর সে কত টাকা জমাবে বলো?

আমি—তোমাদের মনগুলো সব ভাল নয়। কেন, মাইনে ছাড়া কি তার আর উপরি থাক্‌তে পারে না? ঐ যে শিবে, কলে চাক্‌রী ক'রতো, তিরিশ টাকা

মাইনে, কিন্তু মাস গেলে ত্বু'-তিনশো টাকা উপায় করতো,' তেমনি রমেনও অতবড় চাকরে ছিল, সেও না মাসে দু'-তিনহাজার উপরি পেত।

গিন্নী।—জানি, কিন্তু রমেনের সে রকম জঘন্য চরিত্র নয়, সে একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, সেটা আমি জোরগলায় বল্‌তে পারি। রমেন ঘুষ্‌কে প্রাণের সঙ্গে ঘৃণা করত।

আমি আর কোন তর্ক না করে ভালমানুষের মত চিঠিখানা নিয়ে বৈঠকখানায় ফিরে এলাম।

তিন

আমার যেদিন যাবার কথা, সেইদিন বেণীর আর একখানা চিঠি পেলাম, তাতে লেখা আছে :—

"কাল অপর্ণাদের একখানা চিঠি পেয়েছি, কিশোরীর গর্ভধারিণী যা লিখেছেন, তা পড়েও ভাই আমার সে সব দেখ্‌বার জন্য প্রাণটা বড় উতলা হয়েছে, কিন্তু কি ক'রবো উপায় নেই, কেন না তারা সেখান থেকে চিঠি দিয়েই নেপালের দিকে গেছে।

তোমায় একটু না জানিয়ে থাকৃতে পারলাম না, মোটামুটি কতকটা লিখে জানাচ্ছি। কাশ্মীর থেকে যাবার সময় তারা একটা বাগানবাড়ী রাত্রির কাটাবার জন্য ভাড়া নেয়, সে বাগানবাড়ী নাকি স্বর্গের কোন নন্দনকানন-টানন হবে, টাট্‌কা ফুলের গন্ধে চারিদিক মাতিয়ে দিয়েছে, গাছগুলি ফটকের দু'দিক্ থেকে ঠিক সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে ছোট সেজ মেজ বড় করে পর পর উঠেছে, কে যেন এক মাপ ক'রে সব তৈরী করে পুঁতেছে। বাগানের রাস্তা ফুলে ভরা, সুরকী কি পাথর নয়, সব সাদা ফুলের রাস্তা, মাঝে মাঝে রকমারী ফোয়ারা, আশেপাশে ঝরণার জল এঁকেবেঁকে চলেছে, তাতে চিক্‌মিক্ ক'রে ছোট ছোট সব মুক্তা ভেসে যাচ্ছে, অপু দু'-চারটা তুলেছে, ছোট খোকাও কত কি সব বাগান থেকে নিয়েছে তোমার জন্যে। কত রকমের সব সুন্দর গাছ আর রঙ বেরঙের ফুল, তা আর তোমায় বোঝাতে পারবো না, কোন্ গাছটা ফেলে কোন্‌টা দেখ্‌বো তা আমরা ঠিক্ ক'রতে পারি নি। কত রকমের যে ছোট ছোট সব পাখী গাছে আছে, তা জন্মেও কখন দেখি নি, বা কোন বইয়েতেও পড়ি নি,—আহা! তাদের কি সব মিঠান সুর, প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। বাগানের মাঝখানেই একখানি ফুলের বাড়ী, থামগুলো সব স্থল পদ্মের, তার যে কোথাও ইট কি লোহা আছে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। বাড়ীর সিঁড়ির দু'পাশে শ্বেতপাথরের চৌবাচ্ছায় সোনা রূপার মাছ সব কিলকিল করে খেলা ক'রছে। খোকা ধ'রতে পারে নি, অপুও অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ধরতে পারে নি। রমেন ব'ল্‌লে—'ও জল থেকে তুল্‌লেই মরে যায়।'

তোমাকে আর কত লিখ্‌বো, বলে শেষ হয় না। এ যে আমরা কোথায় এলাম, আর যে কি দেখ্‌লাম, কি শুনলাম তা কখন জীবনে শত চেষ্টা ক'রলেও বোঝাতে পারবো না।

ঘরের ভেতর গিয়ে দেখ্‌লাম বড় বড় সব ফুলের ঝাড়, তার ভেতর থেকে চাঁদের মত লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কত রকমের আলো বেরিয়ে ঘরখানা রামধনুর রঙের মত আলোময় ক'রছে। দু'খানা ফুলের পালঙ, ফুলের বিছানা, সে যে কি সুন্দর স্বপ্নেও আন্‌তে পারি না।

অনেক বই পড়েছি, বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখেছি, কত সব আজগুবি রাজকন্যা পরীর দেশের গল্প শুনেছি, কিন্তু এ রকম কখন যে হ'তে পারে বা হয়—তা মনেও আন্‌তে পারি না।

ঘরের ভেতর ঝিরঝির ক'রে মিষ্টি বাতাস বইছে, ঘুরে ঘুরে শরীরটা খুব ক্লান্ত বোধ হ'চ্ছিল, লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই আগে পালঙের উপর ব'স্‌তেই যেন কোথায় নেমে গেলাম ঠিক্ ক'রতে পারলাম না, চোখ যেন জড়িয়ে গেল—যখন অপুর ডাকাডাকিতে চমক্ ভাঙলো, তখন অপ্রস্তত হ'য়ে উঠ্‌লাম। রমেন ব'ল্‌লে—'ভোর হ'য়ে আস্‌ছে আমাদের এবার বেরুতে হবে, নইলে নেপালে পৌছুতে দেরী হবে।' কাজেই মুখ হাত ধুয়ে শেষ রাতে সবাই বেরিয়ে প'ড়লাম।

পাহাড়ে উঠে উলোর হ্রদের যে কি শোভা তা তোমায় বোঝাতে পারবো না—সূর্য্যি যখন ওঠে, তখন যে কতবড় আর কত সুন্দর তা আর কি জানাব, এসব দেখলে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হয় না; আহা যদি সঙ্গে থাক্‌তে!

এ ছাড়া আরও কত কি সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা লিখেছে, তা আর তোমায় কত লিখ্‌বো, এখানে এলে চিঠি প'ড়ে দেখো। সে প্রায় বার-তেরপাতা হবে। সব শেষে লিখেছে, তাদের ফিরতে, এখনও দিন কুড়ি দেরী। তোমার চিঠি পেয়েছি। বিন্তুর অসুখের কথায় বড় ভাবিত হ'লাম, তোমার মত সাবধানীর ঘরে অসুখ হওয়াটা খুব আশ্চয্যির কথা। আজ এই পর্য্যন্ত, নতুন খবর পেলে জানাব।

তোমারই
বেণী"

যাওয়া আর হ'ল না, চিঠিখানা নিয়ে গিন্নীকে দিলাম। গিন্নী ত প'ড়ে অবাক্! তিনি গম্ভীর মুখে বল্‌লেন—"কি বুঝছ? আমার কথাটা বিশ্বাস হ'চ্ছে?"

আমি—কেন? অবিশ্বাসের কি হচ্ছে? বনে জঙ্গলে পাহাড়ে কত কি অদ্ভুত অদ্ভুত সব আছে তা কি সবাই জানে, না সে সব জায়গায় গেছে; ওরা হয় ত যেতে যেতে ঐ পথে গিয়ে পড়েছিল।

গিন্নী। যাই বল, আমি বড় ভাল বুঝ্‌ছি না—আর সন্দেহটা ক্রমে বেশী হ'য়েই দাঁড়াচ্ছে।

আমি—মেয়েদের মনে সন্দেহটা যেন 'জিউলীর আঠা'র মত লেগেই আছে। সন্দেহের কি আছে এতে? বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে, বদ্‌মায়েসদের ওটা চক্রান্ত।

গিন্নী—বেশ, তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রতে চাই নি, ওরা সব ভালয় ভালয় ঘরে আগে ফিরে আসুক, তারপর সব বুঝবে।

আমি ত হেসেই উড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌লুম—"আচ্ছা, বাজী ফেল্‌বে, দেখ, তারা ত এই মাসের শেষেই ফিরবে কুড়ি একুশ দিনের মধ্যেই।"

গিন্নী—বাজী ফেল্‌লে হারবে। এই ত ঘোড়দৌড় লটারীতে কতটাকা দিলে, কিন্তু কি পেলে? আমি অমন পুরুষের সঙ্গে বাজী ফেলি না—কি বাজী ফেল্‌বে?

আমার কেমন রাগ হ'য়ে গেল, মেয়েটার সুমুখে ওকথা বলায় মেজাজ্‌টা একটু গরম হ'য়ে গেল, ব'ল্‌লাম—"একশো টাকা।"

গিন্নী—বেশ—এ খবর যদি সত্যি হয়, রমেন বেঁচে আছে, তা' হ'লে আমিও তোমায় একশো টাকা দেব।

আমি বুক ফুলিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে, ছড়িটা নিয়ে বেড়াতে বেরুলাম। অনেকদিনের এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির। দেখি তাসের মজ্‌লিস বসেছে। বন্ধু খেল্‌তে খেল্‌তে আমায় একটু খাতির করে তাঁরি হাতে খেল্‌তে বল্‌লেন, আমি দলে না বসে একটু তফাতে একখানা চেয়ারে বস্‌লাম। একটু পরেই দেখি বেচা ঘরে এসে ঢুক্‌লো। বেচা আস্‌তেই তাকে কাছে বসালাম, একথা সেকথার পর বেণীর কথা জানালাম, সংক্ষেপে চিঠির ব্যাপারটাও জানালাম।

বেচা বেশ গম্ভীর হ'য়ে শুন্‌লে, তারপর একটু হেসে ব'ল্‌লে—"আরে যা যা ওসব আবার একটা 'কেস', ওরকম হাজার হাজার অনেক হয়, ওসব বদ্‌মায়েসদের চালবাজী, দিক্ না, তোর বন্ধু আমায় ভার দিক্, কোন্ বেটার এ কীর্ত্তি তা দু'দিনেই হাতে-নাতে ধরে দেব।"

আমি—আমিও ত তাই ভাবি। কিন্তু অনেকেই বলে, যা রটে তার কিছুও ত বটে, তাই একবার তোমায় জিজ্ঞেস ক'রলাম।

বেচা—দিক্ না বেণীবাবু নগদ একশো। আমার কাছে কোন চালই খাটবেনা, ঢের ঢের গুণ্ডা বদ্‌মায়েস ঢিট্ ক'রে ছেড়ে দিয়েছি।

আমি—বেশ ভাল কথা, আমি কালকেই বেণীকে চিঠি দেব, উত্তর এলেই তোমায় জানাব।

বন্ধু খেলায় জিতে খুব চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, বেচাকে দেখে, ডেকে তাঁর জায়গায় বসিয়ে আমার কাছে উঠে এলেন। অনেকদিনের পর দেখা। একথা সেকথার পর জানালেন তাঁর ছেলে এম-এতে প্রথম হ'য়েছে, এই বড়দিনের ছুটীতে

একটা ছোটখাট প্রীতিভোজ দেওয়া হবে, আমায় আস্‌তে বিশেষ করে ব'লেও দিলেন। চা এল—খেয়ে বিদায় নিয়ে বরাবর বাড়ী চ'লে এলাম।

চার

দু'-তিনদিন পরে বেণীর চিঠি পেলাম, পড়েই ত হতভম্ব! কিশোরী এসে সব শুনেছে, কিন্তু রমেনের বাপের চিঠি দেখে চ'ম্‌কে উঠলো, অপুর নামে যে চিঠিখানা এসেছিল, তাড়াতাড়ি খুলে প'ড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

ব্যাপারটা হচ্ছে অপু যখন রমেনের সঙ্গে ছ'মাস জামালপুরে ছিল, তখন ঐখানের অনেক মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হ'য়েছিল, তাদেরই মধ্যে একজন নাম তার লিলি, সে দুঃখ ক'রে লিখেছে—যে হঠাৎ রমেন কাল রাতে মারা গেছে। তার গুণ, তার উদারতা, এই সব অনেক কথা লেখা। কোন ঠিকানা বা তারিখ নেই, তবে ডাকঘরের ছাপ জামালপুর, এই পর্য্যন্ত।

আমি ত একেবারে আকাশ থেকে প'ড়েছি, প্রাণটাও কেমন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, খুব যে একটা ভয়ানক সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, তা যেন আমার প্রাণটায় কে জোর ক'রে এঁকে দিচ্ছে, উড়িয়ে দিতে চেষ্টা ক'রেও পারছি না।

কাল রাত্রিরে বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। প্রায় শেষ রাত্রিরে দেখ্‌লাম রমেন এসে আমায় ব'ল্‌ছে—"বাবা! কিছু মনে ক'র্‌বেন না, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারলাম না, মাকে আর ওদের যেখানে যত তীর্থ আছে সব দেখিয়ে এনেছি, বাকী কিছুই নেই, দেশ-বিদেশের সব ভাল ভাল জিনিষপত্র কিনেছি, এদের কোন কষ্ট হয় নি, বেশ শান্তিতে আছেন—যেদিন এই চিঠি পাবেন, সেইদিন থেকে চারদিনের দিন সকালে সবাই পৌঁছবেন, খাবার ব্যবস্থা করে রাখ্‌বেন।"

স্বপ্নটা দেখে চমকে উঠ্‌লাম। দুর্গা দুর্গা বলে উঠে বস্‌লাম, আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘড়ি দেখলাম—রাত্রি চারটে। ভোরের স্বপ্ন না কি সত্যি হয়, এই ভয়ে ঘুমাবার জন্য শুয়ে পড়লাম, অনেক কষ্টে ঘুম হ'ল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে ভেঙে যেতে লাগ্‌লো।

সকালে উঠে দেখি কিশোরীর মুখখানি ভয়ে কি এক রকম হ'য়ে গেছে, চোখ দুটো বেশ লাল। হয় সারারাত ঘুমোয় নি, না হয় ত খুব কেঁদেছে। আমায় দেখে ভাঙাগলায় বল্‌লে—"বাবা! কাল রাত্রে বড় ভয় পেয়েছি, খ্যাঁদার মা ঘরে শুয়েছিল তাই রক্ষে, নইলে হয় ত—"

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লাম—"ও কিছু নয়। যে সব বিষয় দিনের বেলায় কি রাত্রিরে খুব চিন্তা করা যায়, তাই স্বপ্নে দেখে। কালকে রমেনের কথা সমস্তদিন ধরে চলেছিল, তারপর খুব কেঁদেছিলে, তাই রক্তটা গরম হয়, মাথাটাও ঠিক্ থাকে না—তাই স্বপ্ন দেখেছ, ভয় নেই, স্নানটান করে নাও, আমি জামালপুরে নিজেই না হয় যাব।"

কিশোরী ব'ল্‌লে—"বাবা, যেতে আর হবে না—যা সর্ব্বনাশ হবার তা' ত হয়েছে, অপুর কপাল চিরকালের মতই পুড়লো, এখন ভালয় ভালয় তারা বাড়ী ফিরলে বাঁচি!"

আমি—কি স্বপ্ন দেখেছিস্?

কিশোরী—রাত্রির তখন কত তা ঠিক্ বল্‌তে পারি না। খ্যাঁদার মার সঙ্গে ঐ সব কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখলাম, অপু থান কাপড় পরে, এলো চুলে কাঁদতে কাঁদতে এসে আমায় 'দিদি গো' বলে জড়িয়ে ধরলে, তাকে জড়িয়ে কতক্ষণ যে কেঁদেছি তা বল্‌তে পারি নি, খ্যাঁদার মা ডাকৃতে ঘুম ভাঙলো। দেখি, চোখের জলে কাপড়, বালিশ সব ভিজে গেছে।

আমি—কাল ভোরে আমিও স্বপ্ন দেখেছি, রমেন এসে সব তীর্থের কথা বল্‌লে, তারা না কি তিনদিন পরে এসে পৌঁছবে।

কিশোরী—তবু ভাল, যতশীঘ্র এসে পৌঁছায়, ততই মঙ্গল।

যাক্, তুমি আর দেরী ক'রবে না, আমি বড় ভয়

পেয়েছি, কি ক'রবো বুঝ্‌তে পারছি না—যত শীঘ্র পার আসবে।

তোমারই

বেণী

গিন্নীকে চিঠিখানা দেখিয়ে সেইদিনের ট্রেণেই যাওয়া স্থির করলাম। গিন্নী চিঠি পড়েই খানিকটা চোখ দিয়ে জল বার করতে কসুর ক'রলেন না। আমি পাড়াগাঁয়ের শীতের জন্য গরম কাপড়চোপড় বার করে স্নানটা সেরে, সকাল সকাল দু'টী খেয়ে বারটার ট্রেণ ধরবার জন্য ষ্টেশনে গেলাম। হাবড়া থেকে রেল পৌনে বারোটায় ছাড়ে।

আসবার সময় গিন্নী অনেক করে বলে দিয়েছিলেন যে, গিয়েই যেন খবর দিই, সেই জন্যে একখানা খাম ঠিকানা লিখে সঙ্গেও এনেছিলাম। বেলা চারটার সময় বেণীর বাড়ীতে এসে পৌছালাম।

বেণীর মুখ চোখ শুক্‌নো, তার যে খুব অশান্তি ও দুশ্চিন্তা তা বুঝতে পারলাম। আমায় দেখে কিশোরী শুকনো মুখে এসে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—"পিসেমশাই, সব শুনেছেন? বাবা গোড়া থেকে মোটেই বিশ্বাস করেন নি।"

আমি—সবি ত শুনেছি মা—কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি ক'রবে? বিধির মার বড় মার।

বেণী—যাক্, তবু এসেছ, মনে অনেকটা সাহস পেলাম, আর তারাও পরশু সকালে আস্‌বে।

কিশোরী। আমার বড় ভয় ক'রছে, আমি কি ক'রে তাদের সুমুখে দাঁড়াব।

আমি। দেখ, তাদের আস্‌তে দাও, তোমরা যে এসব জান্‌তে পেরেছ, কাউকে সেটা জান্‌তে দেবে না, তারা এসে কে কি বলে শোন, তারপর ক্রমে ক্রমে সুবিধামত চিঠির কথা জান্‌লেই হবে।

বেণী। এই দেখ দিকি—এ সুবুদ্ধিটা দেবারও কেউ নেই। ঠিক কথা ব'লেছ, এসব মিথ্যে কি সত্যি তার ত ঠিক্ নেই, মিছিমিছি এসব কথা তোলবার দরকার কি? তারা ঘরে আসুক তারপর তাদের মুখেই সব শোনা যাবে।

কিশোরী—সেই ভাল, স্বপ্ন ত মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু প্রাণটা থেকে থেকে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ছে, কোনমতে প্রবোধ মান্‌ছে না।

* * * *

শীতটা কোলকাতার চেয়ে প্রায় তিন গুণ বাড়া। রাত্রি আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে বেণীর সঙ্গে শোয়া গেল, নানান কথার পর ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে, পাড়াটা বেড়িয়ে এলাম, অনেকদিন আসি নি, অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে বেলা এগারটা বেজে গেল। বেণী আমায় তেল মাখ্‌তে বল্‌লে, আমি তেল মেখে পুকুরে স্নান ক'রলাম—উঃ, জলটা যেন বরফের মত কন্‌কনে! কি করি, নেমেছি উপায় নেই, এধার ওধার দেখে, কোনরকমে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে গামছা ভিজিয়ে স্নানটা সেরে কাঁপতে কাঁপতে এলাম। দাঁতে দাঁত লেগে যাবার মত অবস্থা—হৃদকম্প! ম্যালেরিয়ার ভয়ে ডুব দিই নি। থাক্, কাপড়চোপড় ছেড়ে গরম জামা গায়ে দিয়ে খাওয়াটা সেরে—দু'জনে বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খাচ্ছি, এমন সময় ডাকের চিঠি এল—অপুরা কাল সকালে এসে পৌছবে।

রাত্রিরও কেটে গেল—সকাল সকাল উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে নেওয়া গেল। কিশোরীকে খুব হুঁসিয়ার করে দিলাম, বেলা আটটার সময় এক গরুর গাড়ী মাল নিয়ে সবাই বাড়ী এল।

তাদের সব জিনিসপত্র দেখাতে দেখাতে আর রকম রকম মজার কথা বল্‌তে বল্‌তে বেলা দু'টা বেজে গেল, তারপর সব খেয়েদেয়ে নিলাম।

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প, নানা দেশের অদ্ভুত অদ্ভুত কথা, দেশ-বিদেশের ভাল ভাল জিনিষ, সে সব গল্প আর দু'দিন ধরেও শেষ হয় না।

অপুর চেহারা দেখলে বোধ হয় যেন সে একখানি দেবীপ্রতিমা—তার আর সে রূপ নেই, তার হাবভাব সৌন্দর্য্যে এমন একটা কিছু হ'য়েছে যে, সবাইকে মুগ্ধ করে দেয়। ছোট খোকাও বেশ মোটা সোটা হ'য়েছে, আর তার মা বাবা! হাতীর মত কুঁদো হ'য়ে এসেছেন।

শুনলাম—রমেন তাদের সঙ্গে বরাবরই এসেছিল, ছুটীর শেষ দিন, কাজে হাজির হতে হবে বলে সে আর এল না, পূজোর ছুটীতে আস্‌বে।

সে যে কি যত্ন, আর কি খাতির তা জীবনে কেউ কখন ভুলতে পারবে না। খোকা না কি এবার পূজায় রমেনকে ঐরকম আদর যত্ন ক'রবে—সে অনেক পয়সা এনেছে। আমায় সব কত কি জিনিষ দিলে, গিন্নীর জন্যও অপুর মা একটি বড়গোছের পুঁটলী বেঁধে দিলেন।

দু'-তিনদিন থাকলাম। কিশোরী ও বেণীকে খুব হুঁসিয়ার করে দিয়ে ব'লে এলাম ঘুণাক্ষরেও তোমাদের স্বপ্নের কথা এদের জানতে দেবে না—দেখ, রমেনের চিঠি আসে কি না?

পরদিন সবার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরলাম। বাড়ীতে এসে গিন্নীকে জিনিষপত্র দিয়ে সব ব্যাপার ব'ললাম—আর সঙ্গে সঙ্গে বাজীর টাকাও চাইলাম।

গিন্নী—তাদের সব দেখ্‌লে কেমন?

আমি—সে দেখ্‌লে তুমি তাদের চিন্‌তেও পারবে না, অপুর মা ত একটা হাতীর মত হ'য়ে এসেছে।

গিন্নী—তুমি নিজে যেমন শুঁটকো, সবাইকে অমনি চাও—না মোটা দেখ্‌লেই হাতী। আর জন্মে নিশ্চয়ই কসাই ছিলে, মাংস বেচেছিলে।

আমি—তা ব'লতে পারি নি কি ছিলাম, তবে মোটাগুলো কোন কাজেরই নয়, কেবল ঢোঁস্‌কা—দু'-চারবার ওপর নীচে ক'রলেই অমনি বুক্ ধড়মড় করে! প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। ওই দেখ না তার সাক্ষী তুমি।

গিন্নী—কি! আমি হাতী?

আমি—না—না হাতী নও, তবে আমার আটগুণ ত বটে? এই আমি দুশোবার ওপর নীচে ক'রবো, কিচ্ছু হ'বে না, আর তুমি?

গিন্নী চটে উঠ্‌লেন, বেশ কড়াগোছের দু'কথা শুনিয়ে হনহন্ করে নীচে নেমে গেলেন। বুঝ্‌লাম, সেটা আমায় দেখিয়ে।

* * *

যে সব জিনিষপত্র দিয়েছিল, সেগুলোর দাম খুব কম ক'রে দু'-তিনশো টাকার হবে। জিনিষগুলো সব দেখ্‌বার, আর সব খাঁটি।

দু'-তিনদিন মিঠে কড়া ঝগড়া সমানভাবেই চ'লতে লাগ্‌লো, আমারও বাজীর টাকার তাগাদা দু'বেলা চ'লতে লাগ্‌লো।

একদিন সকালে চা খেয়ে বৈঠকখানায় বসে আছি, বেণীর একখানা চিঠি এল, তাড়াতাড়ি খুলে দেখি কি সর্ব্বনাশ! এ কি! এ ও সম্ভব? আমার হাত থেকে চিঠিখানা টেবিলের ওপর প'ড়ে গেল। কতক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসেছিলাম ঠিক্ জানি না, মেজো ছেলের ডাকে চমক ভাঙলো, বেলা তখন এগারটা। স্নান হয় নি, বেলা হয়েছে, খাবার সময় হয়ে গেছে—কাজেই খোঁজ পড়েছে।

উঠ্‌লাম। ভিতরে গিয়ে চিঠিখানা গিন্নীর হাতে দিলাম। গিন্নী পড়েই ত ধপাস্ করে বসে প'ড়লেন।

চিঠিতে লেখা ছিল—"স্বপ্ন মিথ্যা হয় না ভাই। তোমার কথায় মনকে শক্ত করেই আমরা বেঁধেছিলাম, কিন্তু কাল বড় অফিস থেকে দশ হাজার টাকার চেক অপুর নামে এসেছে, সেটা রমেনের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের। রমেন যে আর নেই, তার আর কোন ভুল নেই। যেদিন সে মারা যায় ঐ দিনই এরাও তীর্থে যায়। রমেন বরাবর বলে এসেছিল—'মা, আপনাদের সব তীর্থ আমি দেখিয়ে আন্‌বো, কোন খরচ-পত্র হ'বে না।' তা সে মরে গিয়েও তার সত্য অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেছে বটে, কিন্তু আমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে গেল। কাল থেকে অপু আর উঠে নি—তার জ্ঞান নেই, অনেক চেষ্টা করা হ'চ্ছে, বদ্দি ডাক্তার আনাও হ'য়েছে, জানি না কপালে কি আছে.........

যাক্, সে দিন ত আর খাওয়া হ'ল না, কোনরকমে রাতটা কেটে গেল। সকালে উঠেই বেণীকে উপদেশ দিয়ে চিঠি দিলাম। বিকেলে চারটার সময় টেলিগ্রাম পেলাম—"সব শেষ—অপুও রমেনের কাছে চলে গেছে।"

শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সৌজন্য

শ্রীভিক্ষুমোহন সেনগুপ্ত, বি এ

—"তার জন্য কি হয়েছে, আপনি গড়পারের মোড়ে নাববেন ত? তা' চলুন না, ভুল মানুষেরই হয়।"

কণ্ডাক্টরের এবম্প্রকার সান্ত্বনা বাক্যেও মনোজ কিছুতেই স্বস্তিবোধ করিতে পারিতেছিল না। বাসের মধ্যে আরও কত আরোহী এবং আরোহিনী রহিয়াছে—তাহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে যত তাকাইতেছে, মনোজ আরও তত লজ্জায় সঙ্কোচে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিতেছে। একবার সে মনে করিল চলন্ত বাস হইতেই লাফাইয়া পড়ে; কিন্তু তাহাতে জীবনের আশঙ্কা আছে। আর এরূপভাবে মরিয়াও আত্মগোপন করা অসম্ভব। কারণ, তাহা হইলে পরদিন প্রত্যুষেই খবরের কাগজে তাহার মৃত্যুর বিবরণ ও কারণ প্রকাশিত হইবে। তখন হঠাৎ একটা উপায় মনোজের মাথায় আসিল; তাড়াতাড়ি সে কণ্ডাক্টরকে ডাকিয়া বলিল—"দেখুন, আপনার বাসের নম্বরটা আমায় দিন, আর আমায় এই শিয়ালদহের মোড়েই নাবিয়ে দিন। আমি এটুকু পায়ে হেঁটেই চলে যাবো 'খন। তারপর এক্ষুনি আমি বাড়ী থেকে ফিরেই রামমোহন লাইব্রেরীর কাছে দাঁড়াবো—আপনাদের বাস ফিরলেই আমি আপনাকে ডেকে ভাড়াটা দিয়ে দোবো।"

কণ্ডাক্টর ভদ্রোচিত অনুনয়ের সুরে উত্তর করিল—"কেন আপনি এত অস্থির হচ্ছেন? সামান্য ছু'গণ্ডা পয়সা ত! আপনি একজন ভদ্রলোক—ভুল করে ফেলেছেন যখন, তখন আর কি হবে? আমি আপনাকে বলছি, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুন; আর যেখানে নাববার দরকার সেইখানেই নেবে যাবেন। তারপর যেদিন হোক্ একদিন আপনার সময়মত ভাড়াটা দিয়ে যাবেন 'খন।"

এদিকে দেখিতে দেখিতে বাস শিয়ালদহে আসিয়া পৌছিল। মনোজ আরও অস্থির হইয়া উঠিল, শেষে অধীরভাবে করযোড়ে কণ্ডাক্টরকে বলিল—"আর আমায় লজ্জা দেবেন না, আমি এটুকু এবার হেঁটে যেতে পারবো।"

কণ্ডাক্টর আর কোন আপত্তি করিল না। মনোজ কৃতজ্ঞতার সহিত কণ্ডাক্টরকে একটি নমস্কার করিয়া বাস হইতে নামিতে যাইবে, ঠিক এমনি সময় তাহার পাশ হইতে একব্যক্তি অপর একব্যক্তিকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—"দেখুন, এ আর এক রকমের জোচ্চোর, ভদ্র-লোকের বেশ পরে ছু'গণ্ডা পয়সা পকেটে আনেন না—এটা আবার একটা কথা? এর দরকার শেয়ালদায়, তাই ভদ্রতার অজুহাতে ও এইখানেই নেবে যাবে। আরও আগে নাবলে আবার হেঁটে ফিরতে হবে। গড়পারের মোড়ে নাববো—এটা একটা মিথ্যা কথা। মনে করেছেন ও আবার পয়সা দিতে রামমোহন লাইব্রেরীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে? সত্যিই যদি ওর গড়পারে যাবার দরকার থাকতো, তা' হ'লে ও সেই-খানেই নাবতো।" ইত্যাদি।

কথাগুলা মনোজের শ্রুতিগোচর হওয়ায় সে বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কিন্তু কিছু প্রতিবাদ করিতে পারিল না। অবশেষে মনোজ কণ্ডাক্টরকে নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন কণ্ডাক্টর বাধ্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি করবেন, এইখানেই ত নাববেন?"

মনোজ অভিমানভরে উত্তর করিল—"না, আমি গড়পারের মোড়েই নাববো।"

তাহার হঠাৎ এরূপ মতিগতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া অন্যান্য আরোহীরা বড় কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে একটি তরুণী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কণ্ডাক্টরকে ডাকিয়া বলিল—"এই বাবুকে একটা গড়পারের

টিকিট দাও।” এই বলিয়া তরুণীটি কণ্ডাক্টরকে একটি দোয়ানি দিল।

পিছন হইতে হঠাৎ কেহ সজোরে চাবুক বসাইয়া দিলে মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয় মনোজেরও ঠিক তাহাই হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে লজ্জায় অপমানে অধোবদনে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণী তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—“আপনি দাঁড়িয়ে রইলেম কেন? বসুন না।”

নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া চলিবার মত অবস্থা মনোজের তখন ছিল না; কাজেকাজেই তখন যে যাহা তাহাকে বলিতেছে, সে তাহাই করিতেছে। তাহার উপর একজন ভদ্রমহিলার কথার অবাধ্যতা করিবার মত সাহস তাহার কোনকালেই ছিল না। সুতরাং সে সেই অপরিচিতা তরুণীটির নির্দ্দেশমত তাহারই একপাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িল। এদিকে বাসও পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যেই গড়পারের মোড়ে আসিয়া থামিল। তরুণী নামিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু মনোজ অন্যমনস্কভাবে তখনও বসিয়া রহিল। অগত্যা তরুণীটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“কি হলো, উঠবেন না?”

মনোজ সচকিতভাবে বলিয়া উঠিল—“হ্যাঁ, এই যে।”

সেরূপ অবস্থায় হাসিয়া তাহাকে আরও হতবুদ্ধি করিয়া তুলিবার প্রকৃত ইচ্ছা কাহারও না থাকিলেও হাস্য সংবরণ করা কিন্তু কঠিন হইয়া উঠিল। তরুণী মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল, তারপর মনোজকে একটা জড় পদার্থের মত বাস হইতে নামাইয়া লইয়া বরাবর দুইজনে এক পথেই চলিল। মনোজও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর তরুণী মনোজকে প্রশ্ন করিল—“গড়পারে কি আপনার বাড়ী? না, আপনার কোন আত্মীয়ের?”

মনোজ—“না, গড়পারে আমাদের বাড়ী।”

তরুণী—“গড়পারের কোনখানে?”

মনোজ—“ঐ যে চুয়াল্লিশ নম্বর বাড়ীটা।”

তরুণী—“আচ্ছা, এখন আসুন, এইটা আমাদের বাড়ী, চা-টা খেয়ে একটু বসে বাড়ী যাবেন 'খন।”

মনোজ কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া নীরবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন যেন তাহার নিজের উপর কোন দাবী-দাওয়াই ছিল না। মাত্র দুই আনাতেই তাহার সমস্ত স্বত্ব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—যেন এই ভাবিয়াই সে তরুণীর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। তারপর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া একবার তাকাইতেই দেখিল, দরজার ঠিক দক্ষিণ দিকে একটি শ্বেতপাথরের ট্যাব্‌লেট্। তার উপর লেখা আছে—মিঃ এন্, এন্, সিংহ এ্যাটর্নি।

তরুণী মনোজকে বরাবর তাহার পড়িবার ঘরে আনিয়া সেখানে তাহাকে বসাইয়া নিজে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনতিকাল মধ্যেই পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া সে ফিরিয়া আসিল এবং মনোজের সহিত আলাপ-পরিচয় সুরু করিয়া দিল।

তরুণীই প্রথমে মনোজকে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনার নামটি ত এখনও জানা হলো না।”

মনোজ উত্তর করিল—“আমার নাম মনোজ মিত্তির।”

তরুণী আবার প্রশ্ন করিল—“কিছু মনে করবেন না, আপনি কি করেন?”

মনোজ—“আমি রিপন কলেজে ল পড়ি।”

মনোজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর টেবিলের উপর বই ও খাতাপত্রগুলির দিকে চাহিয়া এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—“আপনিও ত পড়েন দেখ্‌ছি।”

তরুণী—“হ্যাঁ, আমি আই-এ পড়ছি।”

এমন সময় পাচক বাটির ভিতর হইতে চা ও কিছু জলখাবার একটি পাত্রে সাজাইয়া মনোজের সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। মনোজ প্রথমতঃ কিছুই খাইতে রাজী হইল না; কিন্তু তরুণী পুনঃপুনঃ অনুরোধ করাতে সে জলযোগ করিল। তারপর নানা কথা-বার্ত্তায় আরও কিছুক্ষণ কাটিলে মনোজ বাড়ী ফিরিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। কিন্তু এক্ষণে সে কিরূপে বিদায় লইবে আর কেমন করিয়াই বা এই অপরিচিতা ভদ্রমহিলা-

টির ঋণশোধ করিবে? আজ যে সে তাহার মানরক্ষা করিয়াছে তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। কেমন করিয়া এই তরুণীকে তাহার দুই আনা পয়সা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিবে—ইহাই মনোজের দুর্ভাবনা। এক্ষণে তাহার ঋণ মাত্র দুই আনার নয়; হিসাব করিয়া দেখিলে ঋণের পরিমাণ অনেক বেশী হইয়াছে। তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া সে যে আতিথেয়তা দেখাইল, তাহার মূল্য মনোজ ইহজীবনেও দিতে পারিবে না। যাহা হউক, অপর একদিন না হয় আসিয়া অন্ততঃ তাহার বাস ভাড়াটা ফেরৎ দিবার একটা উপায় তাহাকে খুঁজিয়া লইতেই হইবে। এখন তাহার নাম ও বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি জানাই দরকার। সুতরাং মনোজ তরুণীকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল—এই বাড়ীর নম্বর কত এবং তাহার সহিত দেখা করিতে হইলে কখন আসিতে হইবে, এবং কাহার দ্বারাই বা ভিতরে সংবাদ দিতে হইবে? তরুণী উত্তরে জানাইল, তাহাদের বাটির নম্বর সাতাত্তর, তাহার নাম সুলেখা সিংহ, দেখা করিবার সময় তাহাদের বাড়ীর চাকরের দ্বারা সংবাদ দিলেই হইবে এবং সন্ধ্যার পর সব সময়েই তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে।

এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মনোজ বিদায় চাহিলে তরুণী তাহাকে পরদিন বিকালে আসিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিল; এমন কি, শেষে বলিয়া দিল—যদি সে কাল না আসে তা' হ'লে পরশ্ব তারিখে সে নিজেই মনোজের ঐ চুয়াল্লিশ নম্বর বাড়ীতে হানা দিবে। মনোজ তরুণীর এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের বিপরীত অর্থ বুঝিয়া লইল। সে মনে মনে ভাবিল, নিশ্চয়ই তাহার দুই আনা পয়সা শোধ করিয়া দিবার জন্য সে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেছে। যদি সে নিজে আসিয়া না দিয়া যায়, তবে সে তাহার বাটীতে তাগাদা করিতে যাইবে। মনোজ বড় অপমান বোধ করিল; আবার একটু অভিমানও হইল। কেন সুলেখা তাহাকে এরূপ অযাচিতভাবে সহানুভূতি দেখাইয়া শেষে বাটীতে আনিয়া অপমান করিল? যাহা হউক, কাল তাহাকে আসিতেই হইবে, নতুবা সুলেখা তাহাকে জুয়াচ্চোর মনে করিবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সে বিষণ্ণ মুখে বিদায় লইল।

মনোজের স্বভাব মাধুর্য্যে সুলেখা সত্য-সত্যই মোহিত হইয়াছিল; কৌতূহলবশতঃ সে যতই মনোজের নিকটে আসিতে লাগিল, ততই সে তাহার প্রতি আকৃষ্ট বোধ করিতে লাগিল।

ফুল যেদিন ফুটে, সেইদিনই আমাদের নজরে পড়ে; কিন্তু ফুটিবার জন্য তাহাকে যে আয়োজন করিতে হয়, তাহা আমরা কদাচ লক্ষ্য করি না। মানুষের স্নেহ, ভালবাসাও ঠিক তাই। একদিন হঠাৎ আমরা দেখি অমুক অমুককে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু ভালবাসিবার পূর্ব্বে তাহার মনের ভিতর যে একটা বিরাট আয়োজন চলিতেছিল, তাহা সেও দেখে না, আর আমরাও দেখি না। আবার দেখিবার চেষ্টা করিলেও আমরা নিজেদের প্রবঞ্চনা করিয়া বসি। মানুষ তাহার মনের কার্য্য-প্রণালী-গুলিকে পরীক্ষা করিবার জন্য যতই সতর্কতা অবলম্বন করে, ততই সে একটা বেকুফ হইয়া পড়ে। স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রত্যহই সে দৃঢ় পণ করিতেছে, আবার তাহার সে দৃঢ়তা নিমেষের মধ্যে শিথিল হইয়া যাইতেছে—সে জানিতেও পারিতেছে না।

মনোজের সহিত ক্ষণিকের আলাপ-পরিচয়েই সুলেখার মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার সে মনে ভাবিল, হয় ত তাহাকে রাস্তা হইতেই বিদায় দিলে ভাল হইত; কিংবা বাসের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত না করিলেই হইত। আবার ভাবিল, মনোজের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া একেবারে চুপ করিয়া থাকা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হইত; সুতরাং সে যাহা করিয়াছে তাহা অতি নিষ্ঠুর সমালোচকের চক্ষুতেও অশোভন হইতে পারে না। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সুলেখা কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন মনোজের কথা ভাবিয়া

তাহার হাসি আসিল। হোহো করিয়া না হাসিলেও একটা চাপা হাসির রেশ তাহার সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন স্থলেখা যদি কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির নজরে পড়িত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ধরা পড়িয়া যাইত। এইরূপে স্থলেখা নিজেরই অজ্ঞাতসারে হাসিয়া এবং আরও কত কি ভাবিয়া তাহার পড়িবার সময় অতিবাহিত করিয়া দিল। তারপর আহারের জন্য ডাক পড়িতেই সে তাহার আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

মনোজ গৃহে ফিরিয়াই তাহার মাকে ডাকিয়া প্রীতির সন্ধান করিল। মনোজের মা ছেলের তপ্তস্বর হইতেই বুঝিয়া লইলেন যে, কন্যা প্রীতিলতা তাহার দাদার কাছে কিছু একটা অন্যায় করিয়াছে। সেই কারণ তিনি প্রীতির কোন খবর না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন —"কেন, সে কি করেছে?"

মনোজ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"কি আবার করবে? আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথাটি খাচ্ছ। তুমি ত আর কিছু বলবে না।"

মনোজের মা বিশেষ উদ্বিগ্নের সহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করেছে তাই বল্ না বাপু।"

মনোজ—"আমার পকেটে সাড়ে বারআনা পয়সা রেখেছিলাম—কোথায় গেল? সেই রাক্ষুসীই যখন-তখন আমার পকেটে হাত দেয়—নিশ্চয়ই সে বার করে নিয়েছে।"

তখন মনোজের মা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন—"ও, এই কথা, তা' আমি বাপু তোর পকেট থেকে দশআনা পয়সা নিয়েছিলাম। ফিরিওয়ালাটা দশগণ্ডা পয়সা পেতো, সে দুপুরবেলা এসে যে জ্বালাতনটা আরম্ভ করলে—তা' আর কি বলবো! আমি উঠতে পারলুম না, তাই প্রীতিকে ডেকে বল্লুম—তোর দাদার পকেটে থাকে ত ওকে দিয়ে বিদেয় করে দে মা, দুপুরবেলা একটু না গড়ালে বড় মাথা ধরে।"

মনোজ তখন স্বরটা একটু নামাইয়া বলিল—"তা' আমাকে ত বলবে? আমি বিকালবেলায় মাসীমার বাড়ী গেলাম ঐ জামাটা গায়ে দিয়েই। যাবার সময় বাসে উঠে কণ্ডাক্টরকে একটা দোয়ানি দিলাম; তারপর যে ব্যাগে মোটে দু'টি পয়সা পড়ে আছে, তা' আমি আর অত দেখি নি। আমি জানি আমার সব পয়সাই এখনও মজুত আছে। তারপর ফেরবার পথে বাসভাড়া দিতে যেয়ে দেখি মোটে দু'টি পয়সা সম্বল। তখন আমাকে কি রকম বিপদে পড়তে হলো বলো দিকি?"

মনোজের মা ব্যাপারটাকে অতি তুচ্ছ ভাবিয়া বলিলেন—"অত কেন বাপু, তোর মাসীর কাছ থেকে ত কিছু চেয়ে নিতে পারতিস্, তা'তে আর লজ্জা কিসের? মায়ের বোন্ মাসী ত। কিছু চাইলে কি তোর মাথা হেঁট হতো?"

মনোজ আবার রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"হাঁ, তোমার যেমন বুদ্ধি! বাস থেকে কি বলে নেমে যাবো?—'আমার পয়সা নেই আমায় নাবিয়ে দাও।' একথা বল্‌লে লোকে কি ভাববে?"

মনোজের মা—"অতবড় ছেলে তুই, ব্যাগটা একবার না দেখেই কি বলে বাসে উঠে বসলি?"

মনোজ—"আমি কি করে জানবো যে, তোমরা আমার পয়সাগুলিকে আত্মসাৎ করেছ?"

মনোজের মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"অত গজ্‌গজ্ করিস নি বাপু, দশগণ্ডা পয়সা আমি তোকে ফেলে দোবো'খন।"

মনোজ দেখিল বৃথা তর্ক। কিছুতেই মা তাহার দুরবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবেন না, অতএব সে সেই-খানেই নিরস্ত হইল।

মনোজ তাহার মায়ের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া স্থলেখার সহৃদয়তার কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। অবশ্য মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া স্থলেখাকে তাঁহার নিকট প্রশংসার পাত্রী করিয়া তুলিবার আগ্রহ তাহার যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তখন তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। মনোজ একপ্রকার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই

শ্রীমতী উমারাণী

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

সমস্ত ব্যাপারটা সেদিনকার মত তাহার মায়ের কাছে গোপন রাখিল।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই সে সুলেখাদের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার সময় তাহার মনটা বেশ ভার ভার ছিল। কেমন করিয়া সে আজ সুলেখার কাছে ঋণমুক্ত হইবে—ইহাই তাহার দুর্ভাবনা। কিন্তু সুলেখাদের বাড়ী যাইয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে দুশ্চিন্তার অনেকটা উপশম হইল। সুলেখা তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল; বায়স্কোপের টিকিট বুক্ করিয়া রাখিয়াছে—সে আসিলেই তাহাকে লইয়া বাহির হইবে। মনোজ যাইতেই সে আর অপেক্ষা না করিয়া তাহার ছোট বোন্ উমাশশীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মনোজ তাঁহাদের গন্তব্যস্থানের কথা জানিতে চাহিলে সুলেখা তাহাকে সমস্তই খুলিয়া বলিল। সুলেখা যাইতে যাইতে বলিল—"চলুন, এইটুকু পার হ'য়ে সার্কুলার রোডে একখানা ট্যাক্সী কর্‌লেই হবে।"

তারপর আবার কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পর সে বলিল—"আর কয়েক মিনিট পরে আমাদের চাকরটাকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠাব মনে করে ছিলাম।"

মনোজ মনে মনে তাহার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিল। তারপর ট্যাক্সীতে উঠিয়া সুলেখা উমাশশীর সহিত মনোজের পরিচয় করিয়া দিল।

উমাশশীর স্বভাব বড় চঞ্চল, কিন্তু খুব সরল। সে প্রথম প্রথম তাহাকে দুই-একবার 'মনোজবাবু' বলিয়া সম্বোধন করিবার পর একেবারে 'মনো দা'তে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইল। ইহাদের দুই ভগ্নীর স্বভাব-মাধুর্য্যে মনোজ বড়ই আনন্দ বোধ করিতে লাগিল। সুলেখার প্রতি যে ভুলধারণা এতক্ষণ পোষণ করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহা কল্পনা করিতেও তাহার গাত্র শিহরিয়া উঠে; নিজের এরূপ সঙ্কীর্ণতার জন্য সে মনে মনে বড়ই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করে, ততই সে জটিল হইয়া উঠে, ততই সে তাহার জন্মলব্ধ আনন্দ ও তৃপ্তিকে সগর্ব্বে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়া যাইতে চায়। শেষে, সভ্যতার বিষে জরজর হইয়া সে তাহার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া ফেলে। এই সভ্যতাই মানুষের সর্ব্বনাশের মূল এবং এই সভ্যতার গর্ব্বই মানুষকে প্রকৃত সভ্য হইতে দেয় না। এই সভ্যতার শৃঙ্খল হইতে মনোজ ক্রমে ক্রমে যতই মুক্ত হইতে লাগিল, ততই সে এক সহজ সরল আনন্দের স্বাদ পাইতে লাগিল।

বায়স্কোপ দেখিয়া প্রায় সাড়ে নয়টায় গৃহে ফিরিয়া সুলেখা মনোজকে বলিল—"চলুন ভেতরে; দশটার আগে আর আপনার বাড়ী ফেরা হচ্ছে না।"

মনোজ সুলেখার অনুসরণ করিতে করিতে মৃদু আপত্তি দেখাইবার নিমিত্ত বলিল—"না, অপর কিছু নয়, সাম্‌নেই পরীক্ষা কি না, তাই।"

সুলেখা কিঞ্চিত বিস্মিত হইয়া বলিল—"এখন আবার কিসের পরীক্ষা?"

মনোজ—"ল ফাইন্যাল্ প্রতি বৎসর এমনি সময়েই হয়।"

সুলেখা—"আপনার তা' হ'লে মেয়াদ ফুরিয়ে গেল? তারপর কি করবেন মনে করেছেন, ওকালতী?"

মনোজ—"বাবার ইচ্ছা তাই-ই, আমি তাঁর সঙ্গে কোর্টে বেরুই।"

সুলেখা মনোজকে বসিবার জন্য চেয়ারটা সরাইয়া দিতে দিতে বলিল—"আপনার বাবাও বুঝি ওকালতী করেন? তা' হ'লে মন্দ হ'বে না।"

তারপর তাহারা স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

সুলেখা প্রথমেই প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা, 'কপালকুণ্ডলা'র সবাক্ চিত্র কেন তেমন ভাল লাগ্‌ল না? অভিনয়ের দোষে?"

মনোজ উত্তর করিল—"অভিনয়েরও দোষ থাক্‌তে পারে, হয় ত তা' আমাদের নজরে পড়ে নি। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে, 'কপালকুণ্ডলা' সবাক্ চিত্রে দেখাবার জিনিষ নয়। 'কপালকুণ্ডলা'র সৌন্দর্য্য নির্ব্বাক্ চিত্রে যেমন সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হ'তে পারে, তেমন কখনও সবাক্ চিত্রে হ'তে পারে না।"

সুলেখা আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কেন এর সবাক্ চিত্র দেখাচ্ছে?"

মনোজ—"প্রকৃত সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাব। জগতে সৌন্দর্য্যের মূল্য ক'জন দিতে পারে? যারা সৌন্দর্য্যের আদর জানে, তারা কখনও সৌন্দর্য্যের অপচয় সহ্য করতে পারে না।"

মনোজের সমালোচনার মধ্যে তাহার ব্যক্তিগত রুচি প্রকাশ হইয়া পড়িল। আজ যেন সুলেখা এক নিমেষেই তাহার ভিতরটা প্রত্যক্ষ করিয়া লইল। এত সহজে এবং এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে মনোজ যে তাহার কাছে ধরা দিয়া বসিবে, তাহা সে পূর্ব্বে ভাবিতেও পারে নাই। তাই সুলেখা লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে তাহার আলোচনায় তন্ময় করিয়া তুলিবার জন্য আবার প্রশ্ন করিল—"কপালকুণ্ডলা'কে বাঙ্ময়ী করলে যদি তার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয়, তবে লেখক কেন তার মুখে ভাষা দিয়েছেন?"

মনোজ সংক্ষেপে উত্তর করিল—"পাছে আমরা 'কপালকুণ্ডলা'কে মানবী না ভেবে বনদেবী বলে ভুল করে বসি।"

সুলেখা আর কোন প্রতিবাদ করিল না। রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে; মনোজ তাহার রিষ্ট ওয়াচ্‌টার দিকে চাহিয়া দেখিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুলেখা বলিল—"ও কি, এরি মধ্যে উঠছেন যে?"

মনোজ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল—"অনুগ্রহ করে ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলুন?"

সুলেখা তাহার বুক্-সেল্‌ফের উপর টাইম পিস্‌টার দিকে চাহিয়া বলিল—"ও, মাত্র দশটা।"

মনোজ বলিল—"নিজের বাড়ীতে বসে বলা খুবই সহজ।"

তারপর মনোজ হাসিতে হাসিতে নমস্কার করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই মনোজ ও সুলেখাদের মধ্যে এরূপ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্টি হইল যে, সামান্য কোন কারণ উপলক্ষেই দুইটি ভিন্ন পরিবারের একত্রে মিলন ঘটিত। সব চেয়ে প্রীতিলতা ও উমাশশীর বন্ধুত্বটা শীঘ্রই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্তরের নৈকট্য দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই দৈববিড়ম্বনায় বাহিরের পার্থক্য তাহাদের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়িল। মনোজেরা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিত। তাহাদের বসবাসের অসুবিধা হইতেই তাহার পিতা চারুবাবু বাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে মনন করিলেন; এবং তাঁহার এক আত্মীয়ের পরামর্শে ডিক্সন্ লেনে উঠিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আসিবার দিন মনোজের মা সুলেখাদের বাটী যাইয়া তাহার মাকে মাঝে মাঝে তাঁহাদের নূতন বাড়ীতে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া আসিলেন এবং নিজেও সময় করিয়া উঠিতে পারিলে তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তারপর তিনি সুলেখা ও উমাকে বুকে ধরিয়া আদর করিয়া তাহাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহাদের বিদায়কালে প্রীতিও তাহার সুলেখা দি'কে এবং উমাকে জানাইয়া আসিল যে, পরদিনই সে তাহার দাদার সহিত তাহাদের বাড়ীতে আসিবে এবং তাহাদিগকেও নিজেদের বাড়ীতে লইয়া যাইবে। এইরূপে গৃহকর্ত্রীদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ বড় একটা না ঘটিলেও ছেলেমেয়েদের যাতায়াত প্রায় পূর্ব্বের মতই বজায় রহিয়া গেল।

এইরূপভাবে প্রায় বৎসরখানেক কাটিয়া গেলে সুলেখার আই-এ পরীক্ষা শেষ হইল। ইতিমধ্যে মনোজও তাহার পিতার সহিত আইন-ব্যবসায়ে মন দিয়াছে। সে পিতার নিকট হইতে ব্যবসায়ে খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন

করিবার নানাবিধ কৌশল পূর্ণ উদ্যমে শিক্ষা করিতেছে। এখন মনোজ তাহার সময় ও জীবনের মূল্য সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছে ; এখন কোন কারণেই সে বৃথা সময় নষ্ট করিবার পক্ষপাতী নয়। এমন কি, সুলেখাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছাও আর তেমন নাই। কিন্তু তাহার মা, সকলের উপর ছোট বোনের আগ্রহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে সুলেখাদের বাড়ী যাইতে হইত এবং মাঝে মাঝে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াও আনিতে হইত। কিন্তু ইহাতে সে আর পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ পাইত না।

এদিকে অধিক রাত্রি জাগরণের ফলেই হউক অথবা অত্যধিক পরিশ্রমের ফলেই হউক সুলেখা কঠিন ব্যায়রামে পড়িল। মনোজ প্রীতিকে লইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে যাইত। তাহার মা পুত্রকন্যার মারফৎ নিয়মিতভাবে সুলেখার সংবাদ লইতেন। প্রায় মাসার্দ্ধকাল ভুগিবার পর সে ক্রমে ক্রমে সারিয়া উঠিতে লাগিল। তখন নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাহার মাতাপিতা তাহাকে লইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন। কারণ, আর দু'-একমাস পরেই সুলেখার পরীক্ষার ফল বাহির হইবে এবং তখন তাহাকে আবার পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে হইবে। এরূপ ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিলে পড়াশুনারও বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং তাহাতে পুনরায় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনাও অনেক। অতএব ইহার মধ্যে সে যাহাতে ভালরূপ আরোগ্যলাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই উচিত। এই সমস্ত ভাবিয়া সুলেখার পিতা নরেনবাবু সপরিবারে ফাল্গুনের শেষেই মধুপুরে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। যাইবার দিন মনোজ ও প্রীতি আসিয়া তাঁহাদিগকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া গেল।

•

প্রবাসে প্রায় মাসাধিককাল কাটিলে সুলেখা অনেকটা সুস্থবোধ করিতে লাগিল। একদিন বিকালবেলায় বেড়াইতে যাইবার জন্য ও উমা প্রস্তুত হইয়া তাহাদের পিতার সন্ধানে বাহিরের ঘরে আসিবামাত্র পিওন একখানা খামের চিঠি দিয়া গেল। চিঠির উপরের হস্তাক্ষর দেখিয়াই সুলেখা বুঝিল—ইহা মনোজ লিখিয়াছে। উমা একবার দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেই সে তাহার ঔৎসুক্য দমন করিবার নিমিত্ত একটা ধমক দিয়া উঠিল। হঠাৎ মনোজের চিঠি পাইয়া সুলেখা বড় আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। কারণ, এতাবৎকাল সে শুধু তাহার ছোট বোনের নিকট হইতেই রাশি রাশি পত্র পাইয়াছে; মনোজের একখানি চিঠিও পায় নাই। তাহার জন্য সুলেখা তাহার উপর যথেষ্ট অভিমান করিয়াছিল। যাহা হউক, সে পত্রখানি খুলিয়া নিমেষের মধ্যেই পড়িয়া ফেলিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মুখখানি ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। তারপর উমাকে সেদিনের মত তাহার পিতার সহিত বেড়াইতে যাইতে বলিয়া সে ছাদের উপর উঠিয়া গেল। সেখানে কিছুক্ষণ পায়চারী করিবার পর তাহার মাথাটা বড় ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল। সুতরাং নামিয়া আসিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর তাহার অবসন্ন দেহটাকে এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিল। পরক্ষণেই আবার উঠিয়া বসিয়া তাহার প্যাড্‌খানা টেবিলের উপর হইতে টানিয়া লইয়া লিখিল—

শ্রীশ্রীহরি
শরণম্‌

মধুপুর
২৭-এ চৈত্র, ১৩৩৪ সাল

নমস্কার মনোজবাবু,

আমার অনুপস্থিতির জন্য আপনার একটা শুভ-অনুষ্ঠান বন্ধ রহিয়াছে শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। শেষে আমিই আপনার সুখ-শুভের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলাম! বোধ হয় ইহা আমারই কৃতকর্ম্মের ফল। আমার জন্য আপনার শুভ-বিবাহ অসম্পূর্ণ থাকিবার কোন কারণ ত আমি দেখিতেছি না। যাহা হউক, আপনাদের প্রয়োজনাতীত সৌজন্যে আমি চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ইতি,
শ্রীসুলেখা সিংহ

শ্রীভিক্ষুমোহন সেনগুপ্ত

ঘরের কথা

শ্রীসরলা দেবী

দুইটি মাঝারি রকমের ঘরের কোলে ঘরেরই মত প্রশস্ত দালানটিতে কর্ত্তা খাইতে বসিয়াছেন, সম্মুখে তাঁহার প্রিয় বিড়াল মহাশয় তাঁহার হস্তের সঙ্গে সঙ্গে একবার তাঁহার মুখের দিকে এবং একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া উৎসাহব্যঞ্জক-স্বরে 'মেও মেও' করিয়া লাঙ্গুল আন্দোলন করিতেছিল।

গৃহিণী হস্ত সঞ্চালনে মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে বলিলেন—"হাঁ গা, ছেলেকে কি তুমি এখনও আইবুড়ো কার্ত্তিক করে রেখে দেবে না কি? বাছা ত যেটের কোলে এই বাইশ বছরে পড়ল, তোমার কি এখনও নাতি-পুতি দেখ্‌বার সাধ যায় না?"

কর্ত্তা একমনে গৃহিণীর কথাগুলি শ্রবণ করিয়া ধীর-ভাবে বলিলেন—"হবে গো হবে গিন্নী, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সবুরে মেওয়া ফলে, নগদে চাই তিনটি হাজার, হুঁ হুঁ!" বলিয়া কর্ত্তা ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী কহিলেন—"তা' যেন বুঝলুম, তবুও ত একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির চেষ্টা-চরিত্তির করতে হয়। আর ছেলেও তোমার বয়স্থ হয়েছে। জান ত আজকালকার ছেলেদের উস্‌খুস্থনি। বেশীদিন আইবুড়ো রাখাটা ঠিক নয়।"

—"হাঁ, একটা ভাল কথা মনে পড়েছে। নকড়ির সেজ মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ করলে কেমন হয়? অবস্থা ভাল, দেবেথোবেও বেশ।" বলিয়া কর্ত্তা মাছের ঝোলের বাটিটা পাতে উপুড় করিয়া গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন।

ঠোঁট উল্‌টাইয়া গৃহিণী কহিলেন—"মা গো মা, বলিহারি যাই তোমার পছন্দকে! আমার সোণার চাঁদের পাশে কি না শেষকালে এসে দাঁড়াবে ঐ মেয়ে! হরি হরি, টাকা নিয়ে কি তুমি ধুয়ে খাবে, না টাকার ছালা নিয়ে স্বর্গে যাবে! যেমন-তেমন ঘরেরও যদি একটী সুন্দরী মেয়ে পাই ত তারি সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব। বেঁচে থাকুক আমার দুলাল, তার টাকার ভাবনা কি? বলি ও বামুনদিদি, বাবুকে দুধ দিয়ে যাও না গো।"

দুই

পুত্রকে খাইতে বসাইয়া গৃহিণী কার্য্যান্তরে দ্বিতলে গিয়াছিলেন। নীচেয় আসিতেই দেখিলেন, ময়রাদের টেঁপি দাঁড়াইয়া। তিনি কহিলেন—"কিরে টেঁপি?"

—"দুলাল দাদা কোথায়? আমি তাঁকে দর্পণ-সংক্রান্তির বেরত করতে এসেছি।"

দালানে আসিয়া গৃহিণী দেখিলেন, পুত্রের উচ্ছিষ্ট পাতে মাছি ভন্‌ভন্‌ করিতেছে। মায়ের পায়ের শব্দে দুলাল রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেই তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"ও মা, এঁটো হাতে রান্নাঘরে গিয়েছিলি কেন?"

দুলাল কলতলায় পলাইতে পলাইতে কহিল—"তোমার বউ হেঁসেল থেকে পটলভাজা চুরি করে খাচ্ছে দেখ গে, মুখে তার চিহ্ন আছে এখনও।"

টেঁপি রোয়াক হইতে কহিল—"হ্যা গা বৌদি', ভাল মানুষের বোন্‌, তোমার বুঝি শেষে এই কাণ্ড! সেই যে কথায় বলে না—'বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণেয় বসে কচ্ছ কি?' না নোলায়—"

বধূ বরুণা কাঁদকাঁদভাবে কহিল—"দেখুন না মা, সব মিথ্যে কথা। নিজে খেয়েদেয়ে উঠে এঁটো হাতটি আমার মুখময় মাখিয়ে দিয়ে গেল, আবার এখন বদনাম দেওয়া হচ্ছে।"

ফুটন্ত তরকারীর আনাজ টিপিয়া দেখিতে দেখিতে গৃহিণী বধূর অভিযোগে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

টোঁপির ব্রতে পাওয়া দক্ষিণার পয়সাটি রান্নাঘরে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিয়া দুলাল কহিল—"এই নাও। যদি বেশী ক্ষিদে পেয়ে থাকে ত পয়সাটা কারুকে দিয়ে কিছু আনিয়ে খাও গে, নইলে আবার বাপের বাড়ী গিয়ে নিন্দে করবে।"

গৃহিণী তাড়া দিয়া কহিলেন—"আর জ্বালাস নে বাপু বউমাকে।"

বরুণা শাশুড়ীর অলক্ষিতে ঘোমটা তুলিয়া দূর হইতেই ভ্রূ কুঁচকাইয়া কৃত্রিম কুটিল কটাক্ষ হানিল। ইহার অর্থ—সাজা তোলা রহিল।

তিন

বরুণা ভাঁড়ার ঘরে পান সাজিতেছিল। দুলাল কোটের বোতাম লাগাইতে লাগাইতে ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"দাও, দাও, শীগ্‌গির দাও।"

বরুণা মুখ তুলিয়া কহিল—"তোমার সবে তাড়া, দেখ্‌ছ পান সাজছি।"

উঠান হইতে গৃহিণী ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—"হাঁ গা বৌমা, কাল না তোমায় পইপই করে বল্লুম যে, ঘুঁটেগুলোর পাশে কাপড় শুকুতে দিও না, আর আজ কি না আবার সেই!"

দুলাল কহিল—"কি, আজ আবার সেইখানে কাপড় শুকুতে দিয়েছিলে?"

বরুণা ঈষৎ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"না। আজ প্রথমে আমি অভ্যাসমত ঐখানেই কাপড় শুকুতে দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু মনে পড়তে তখনই তুলে নিই। সেই সময়েই যা' দু'-চারফোঁটা জল পড়েছে তা'তে করে শুক্‌নো ঘুঁটে যে ভিজবে না এটা ঠিক কথা।"

—"তবে বোবার মত চুপ ক'রে বসে আছ কেন? মাকে গিয়ে বলো না। না বলতে পার ত বলো, আমি বলছি।"

ব্যস্তভাবে স্বামীর হাত ধরিয়া বরুণা কহিল—"না, তুমি আমার হ'য়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করতে পাবে না।"

তেলিদের বড় বৌ বেড়াইতে আসিয়া গৃহিণীর ক্রুদ্ধ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—"কি হয়েছে গা দিদি?"

—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! এমন গুণের সাগর বউ আমি কস্মিন কালেও দেখি নি। সামান্য একটা কথা, তাও কি মনে থাকে না! এদিকে বয়স ত আঠার পেরোতে চল্‌লো। ছি, ঘেন্নার কথা, এমন ছোটলোকের ঘরের মেয়েও এনেছিলুম!"

সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দুলাল বাহিরে আসিয়া কহিল—"দেখো মা, যার দোষ তাকেই বলো, তার গুষ্টিশুদ্ধ টেনে এনো না। তোমার মেয়েরা যদি শ্বশুরবাড়ীতে এমনি ধারা কথা শোনে, তা' হ'লে তোমার মনের অবস্থাটা কি রকম হয়? তারা যা' গুণের গুণময়ী তা' ত আমার জানা আছে। তাই সেদিন বড় মেয়ের ঝগড়ার চোটে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে সারাদিন ভাত খাও নি।"

গৃহিণী গালে হাত রাখিয়া কহিলেন—"অবাক কাণ্ড! হাঁরে দুলাল, তোকে না আমি পেটে ধরেছিলুম! আর এখন বৌয়ের রাঙামুখ দেখে সব ভুলে গেলি? তার হয়ে ঝগড়া করতে এলি! যা' যা' রূপসী বৌয়ের পা ধুয়ে জল খে গে যা', দেহ মন শুদ্ধ হবে।"

[চা]র

বরুণা দুলালের পিঠে [হা]ত রাখিয়া কহিল—"মা বলে দিলেন তোমায় বল্‌তে, বাবার অসুখে যা' কিছু টাকা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে। তুমি যদি কিছু টাকাকড়ি না দেও, তা' হ'লে বাবার চিকিৎসা ত হবেই না, সংসারও অচল হয়ে উঠবে।"

বই হইতে মুখ তুলিয়া দুলাল কহিল—"আমি যেমন মাসের মাস ত্রিশটাকা ক'রে দিই, তার এক পয়সাও বেশী দেব না; তোমার আমার খেতে মাসে ত্রিশটাকার এক পয়সাও বেশী লাগে না। আর তা' ছাড়া, আমায় এখন টাকা জমাতে হবে, কারণ মা যেমন ব্যবহার করছেন তা'তে বাধ্য হ'য়ে দু'-একমাসের মধ্যে আমাদের ভিন্ন হ'তে হবে।"

—"আর আমি যদি তোমার সঙ্গে না যাই?"

—"উঃ, তুমি ত আর দেবতা নও যে, মার এই ব্যাঙ-খোঁচানি চিরকাল পড়ে পড়ে সহ্য করবে।"

রূঢ়স্বরে বরুণা কহিল—"আমি যে দেবী নই তা' আমি জানি। তবে আমি মানুষ, পশুর মত ব্যবহার আমার কাছে পাবে না।"

—"মা।"

গৃহিণী চাহিয়া দেখিলেন, বরুণা তাহার গায়ের সমস্ত গহনাগুলি একসাথে জড় করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিতেছে। শুদ্ধমাত্র হাতে গাছকতক চুড়িপরা বধূর দিকে চাহিয়া তিনি বিস্মিতভাবে কহিলেন—"এ কি করছ গা? গায়ের গয়না খুল্‌ছ কেন?"

—"ও বললে, টাকা দিতে পারবে না। আপনি এইগুলো বিক্রী করে ভাল ক'রে বাবার চিকিৎসা করুন।"

নতমুখী বধূর দিকে চাহিয়া ছলছল চোখে গৃহিণী কহিলেন—"এর বদলে কি দেব মা তোমায়, আমার ত কিছু নেই।"

হাসিমুখে বরুণা কহিল—"কিছু চাই না মা, কেবল এই আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের কাছে মেয়ের মত স্নেহ পাবার যেন যোগ্য হই।"

শ্রীসরলা দেবী

বিশ্ব-বৈচিত্র্য

বুদ্ধিতে কে বড়—পুরুষ, না নারী?

প্রোফেসার কার্ল পিয়ারসন্ ও ডাক্তার রেমণ্ড পিয়ার বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করেছেন যে, সাধারণ নারী সাধারণ পুরুষের চেয়ে বুদ্ধিমত্তায় নিকৃষ্ট। তাঁরা স্থির করেছেন যে, গড়ে পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন সাড়ে উনপঞ্চাশ আউন্স্ এবং নারীর চুয়াল্লিশ আউন্স্। অবশ্য মস্তিষ্কের ওজন কম হ'লেই যে বুদ্ধিও কম হবে তা' বলা যায় না। বিখ্যাত লেখক অ্যানাতোল ফ্রাঁসের মস্তিষ্কের ওজন ছিল মাত্র আটত্রিশ আউন্স্। তবে যারই ত্রিশ আউন্সের কম এবং পঁচাত্তর আউন্সের বেশী মস্তিষ্কের ওজন হবে, তার নির্ব্বোধ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

উক্ত বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে' আরও বলেছেন যে, ইংরেজদের মস্তিষ্কের ওজন গড়ে সুইডেন্, ব্যাভেরিয়া, বোহিমিয়ার অধিবাসীদের মস্তিষ্কের ওজনের চেয়ে কম। তাঁরা পরীক্ষা দ্বারা আরও স্থির করেছেন যে, চতুর লোকদের মস্তিষ্ক অনেকটা বাঁদরের মত।

মানুষের যেমন দুটো কান, দুটো চোখ আছে, তার সে রকম মস্তিষ্কও আছে দুটো। যদি কোনোক্রমে একটা মস্তিষ্ক নষ্ট হ'য়ে যায়, তা' হ'লে অপরটা কাজ করে ঠিক্ প্রথমটার মতই যোগ্যভাবে।

আদি যুগের মানব

লণ্ডনের নিপুণ কর্ম্মীরা এখন এক অভিনব কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁরা একটা পাথরের মধ্য থেকে একটা কঙ্কাল বা'র কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন। কঙ্কালটা না কি ত্রিশ হাজার বছর পূর্ব্বেকার। কঙ্কালটা পেয়েছিলেন—কেম্ব্রিজের মিস্ ডরোথি গ্যারড্, প্যালেষ্টাইনের কার্ম্মেল পাহাড়ের উপর।

পরে আরো প্রায় বারটা কঙ্কাল পাওয়া যায়। ইউরোপ থেকে বিলুপ্ত দানবজাতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এই কঙ্কালগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্যালেষ্টাইনের এই আবিষ্কার থেকে দানবজাতির শেষ পরিণতির বিষয় অবগত হওয়া যাবে আশা করা যায়। মানবজাতির ক্রমবিকাশের উপরও এই আবিষ্কার আলোক সম্পাত কর্‌বে।

সব কঙ্কালগুলোই দণ্ডায়মান অবস্থায় পাওয়া গেছে। একটার হাতে আবার বন্য-বরাহের চোয়ালের হাড় দেখা গেছে। কঙ্কালটা হাতে বন্যবরাহের চোয়ালের হাড় যে কেন ধরে' আছে তা' এখন কেউ বল্‌তে পারে না। হাড়টা যে হাতে ইচ্ছে করে' ধরানো হয়েছিল তা' বেশ বোঝা যায়—হয় ত পুরাকালের কবরস্থ কর্‌বার এটা একটা প্রথা ছিল।

অপয়া

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

বারবার দুইবার মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর তৃতীয়বারে যখন ছোট্ট আঁতুড় ঘরখানি মুখরিত করিয়া শিশুর ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, আমরা সকলেই ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম—ফুলের মত একটী শিশু বৌদি'র বুকের কাছে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে; বৌদি'র চক্ষু দু'টী মুদ্রিত। ধাত্রী কহিল, 'মেয়ে হয়েছে গো বাবু! কিন্তু ডাক্তারকে একবারটী ডেকে পাঠাও দেখি, বৌমা যেন আমার কেমন হয়ে পড়েছে গো!…'

আমি তখুনি ডাক্তারের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ঔষধ-পত্র দিলেন, কিন্তু বৌদি'র সে লুপ্তজ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। বৈকালের দিকেই সব শেষ হইয়া গেল।

মেয়েটা জন্মাইতে না জন্মাইতেই মাটাকে খাইয়া ফেলিল। বাড়ীর সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—'রাক্ষুসী অপয়া!'

সকলের সাথে সাথে আমারও মনটা যেন কেমন তাহার উপর বিগ্‌ড়াইয়া গেল। রাণীর মা আমাদের বাড়ীতে বহুদিন হইতেই আছে, সেই এই মাতৃহারা শিশুটীর সকল রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছিল। কখনও যদি মেয়েটা আমার দৃষ্টিপথে পড়িত, তখুনি আমার স্নেহময়ী বৌদি'র কথা মনে পড়িয়া যাইত, আমিও অমনি চোখ ফিরাইয়া সেখান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া আসিতাম। আমার অমন বৌদি' তাকে কি না ও বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই খাইয়া বসিয়া রহিল।

…সংসারে আমরা দু'টী মাত্র ভাই ছিলাম। বাবা শ্রীরামপুরে ওকালতী করিতেন। দাদা যেবার বি-এ পাশ করিয়া চাকুরীর উমেদারী আরম্ভ করেন, সেইবার দাদার বিবাহ হয়। বিবাহের দুইমাস পরেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে বৌদি'র আদরটাও খুব যেন বাড়িয়া গেল। বৌদি' প্রায় আমার সমবয়সীই ছিল, সেইজন্য আমাদের মধ্যে একটা সুমধুর সখ্যতা শীঘ্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল। দাদার চাকুরীর প্রায় চার বৎসর পর বাবা একদিন সহসা সন্ন্যাস-রোগে আমাদের সকলকে কাঁদাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর আমরা সকলে গ্রামে চলিয়া আসিলাম। দাদা মাসের মধ্যে এক-আধবার দেশে যাইতেন, আর বাকীটা সময় কলিকাতার মেসে থাকিয়াই কাটাইয়া দিতেন। আমি গ্রামে থাকিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী হাইস্কুলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। বৌদি'র মৃত্যুর পর দাদা দেশে ঘাটে আসা প্রায় একদম বন্ধ করিয়াই দিলেন। মা মাঝে মাঝে কাঁদিয়া কাটিয়া চিঠি দিতেন, কিন্তু অন্যপক্ষে চেতনার লক্ষণ দেখা যাইত না। এমনি করিয়াই দিন চলিতেছিল। একটী মাত্র লোকের মৃত্যুতে আমাদের ছোট্ট সংসারটীর মধ্যে যে চিড় খাইয়াছিল, তাহা বুঝি আর কোনদিনও যোড়া লাগিল না!……সেদিন কি একটা কারণে স্কুলে ছুটী হইয়া যাওয়ায় বাড়ী চলিয়া আসিলাম। ঘর্ম্মে সিক্ত জামাটা খুলিয়া ঘরের মধ্যে টানাইয়া রাখিতে যাইতেছি, এমন সময় একটা অস্পষ্ট কাকলী আমার কানে ভাসিয়া আসিল। ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম, দাদার মেয়ে মাটীতে একটা পাটীর উপর শুইয়া হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে, আর মাঝে মাঝে অবোধ্য শব্দ করিতেছে। সুন্দর ফুটন্ত পদ্মের মত মুখখানিকে ঘেরিয়া এক মাথা কাল কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। নিজের মনেই হাসিয়া চলিতেছে। একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কখন যে আনমনে নিজের একান্ত অজ্ঞাতে তাহার অতি নিকটে আগাইয়া গিয়াছি, তাহা নিজেও টের পাই নাই।

গাল দু'টি টিপিয়া বলিলাম, 'উমা! তুই আমার উমা রাণী!…'

সে যেন আমার আদর বুঝিতে পারিয়াছে, এমনি ভাবে একটুখানি হাসিয়া আরো জোরে হাত পা নাড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলা কথায় কথায় মাকে বলিলাম, 'হ্যাঁ মা, দাদার মেয়ের নাম কি রেখেছ?'

অগ্নিতে ঘৃত ছিটাইয়া দিলে যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আমার কথায় মাও তেমনি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। 'অলক্ষ্মী আস্‌তে না আস্‌তে মাটাকে খেলে! অমন বাপ, তা' একবার সেই হতে বাড়ীতে পা দেবার নামটী পর্য্যন্ত করে না। রাক্ষুসী! ওর আবার নাম না আরো কিছু! ওটা মলেই বাঁচি!'

আজ আমি তার বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিলাম না। বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলাম, 'এতে এর দোষ কোথায় মা, সে ত আর বিষ খাইয়ে বৌদি'কে মেরে ফেলে নি? বৌদি'র আমার আয়ু শেষ হয়ে গেছল, তাই চলে গেছে! নইলে...'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর যেমন কথা...ওই তো ওই পোড়া-কপালীই ত আমার অমন জলজ্যান্ত বৌটাকে খেয়ে ফেল্‌লে!...অভাগী, মুখপুড়ী...'

—'ও সব কথা থাক্ মা।'...বলিয়া আমি সেদিনকার মত সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

ইহার কিছুদিন পরে আমি যেদিন মাকে জানাইয়া দিলাম, 'ওর নাম আমি উমারাণী রেখেছি মা ..।'

সেদিন মা শুধু মুখখানা কোঁচকাইয়া কহিলেন, 'উমারাণী না পেত্নীরাণী। তার চাইতে রাক্ষুসীরাণী রাখ্‌লেই পারতিস্।...'

সকলের অনাদর অবহেলা কুড়াইতে কুড়াইতে সংসারের এক কোন দুর্ব্বল চারাটীর মত আমার উমারাণী বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।...

দুই

মায়ের কান্নাকাটিতে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া বৌদি'র মৃত্যুর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বাদে দাদা বাড়ীতে আসিলেন। এই কয় বৎসরেই দাদার চেহারা এত বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল যে, দাদাকে যেন আর চেনাই যায় না। উমারাণী আসিয়া আমার কোল ঘেঁসিয়া ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া তাহার বাবাকে দেখিতে লাগিল। উমার মুখের প্রতি রেখায় রেখায় যেন বৌদি'র মুখখানি ধরা দিয়াছিল। দাদা উমাকে দেখিয়া ডাকিলেন, কিন্তু সে গেল না; আমার হাঁটু দু'টি আরো জোরে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিল। আমি তাঁহার অবিন্যস্ত কোঁকড়া চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে কহিলাম, 'উমা, যাও মা, দাদা ডাকছেন; ঐ যে তোমার বাবা!'

কিন্তু সে গেল না।

উমা আমার সাথে এক বিছানায়ই শুইত। রাত্রে আমার গলা জড়াইয়া সে শুধাইল, 'কাকুমণি, ঐ আমার বাবা।...'

—'হ্যাঁ মা, ঐ তোমার বাবা।'

—'কিন্তু বাবা ত কই আমার জন্য পুতুল আন্‌লে না। মিন্টুর বাবা সেদিন তার জন্য কত পুতুল নিয়ে এসেছে।'

আজ সহসা আমার অনেকদিন আগেকার একটা পুরাতন কথা মনে পড়ায় অশ্রুবাষ্পে চক্ষু দু'টি আমার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। পর পর দুইটী সন্তান হইয়া আঁতুড় ঘরেই তাহাদের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া যাওয়ার পর তৃতীয় বারে যখন উমা বৌদি'র গর্ভে আসিল, বাড়ীর প্রত্যেকের তখন সেই অচীন আগন্তুকের মঙ্গলকামনায় কি সে ব্যাকুল চেষ্টা ও প্রতীক্ষা! মাদুলীর উপর মাদুলী চাপাইয়া বৌদি'র গলদেশ ও দুই হাতের মধ্যে প্রায় 'ন স্থানং তিলধারণং' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আগন্তুক যখন আসিল, আজ তার দিকে কেউ ফিরিয়াও তাকায় না। উমার জন্মের সাথে সাথেই যেন ওর এখানে আসার সকল ব্যাকুলতা ও সকল প্রতীক্ষার অবসান হইয়া গিয়াছে।... আমি স্নেহভরে তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, 'হয় ত এবার কাজের ভিড়ে পুতুল আন্‌তে ভুলে গেছেন মা—পরের বার আসার সময় নিশ্চয়ই অনেক পুতুল আনবেন দেখো।'

—'কাকুমণি, তুমি যে বলেছিলে, আমার মাও বাবার কাছে আছে, সেও বাবার সঙ্গে আস্‌বে, তা' কই এল না?'

—'তোমার মা যে সেখানে তোমার এক ছোট্ট ভাইটী আছে তাকে নিয়ে আছে, তাই আসতে পারে নি।'

একথা সেকথার পর উমা এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু আমার চোখে বোধ হয় সে রাত্রে আর ঘুম ছিল না! দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আগেকার একটা সুখের সংসারের যাবতীয় চিত্র যেন আমার সমগ্র দৃষ্টিটুকু জুড়িয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই সুখদুঃখ হাসিকান্না মেশান কতকগুলি দিন যেন আজ সহসা আমার নিদ্রাহীন দুই চক্ষের কোলে কোলে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নজাল রচনা করিয়া ফিরিতেছিল। খোলা বাতায়ন দিয়া এক পশ্‌লা চাঁদের আলো ঘুমন্ত উমার মুখের উপর পড়িয়া যেন তার স্বর্গগতা জননীর বুকভরা আশীর্ব্বাদের মতই এক সুমধুর আবেশে লাগিয়াছিল!...

দাদা যে ক'দিন দেশে ছিলেন, উমাকে আমি ইচ্ছা করিয়া প্রায়ই দাদার কাছে পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু তিনিও উমাকে তেমনভাবে ডাকিতেন না, উমাও বোধ হয় সেইজন্য তাঁহার কাছে তেমন করিয়া ধরা দিল না! ফলে এই হইল যে, পিতা ও কন্যার মাঝে যে এক মধুর সম্পর্ক সেটা ফুটিয়া উঠিবার অবকাশও পাইল না।...

উভয়ের মাঝে যে দূরত্ব তাহা পূর্ব্বের মতই উভয়কে এক হইতে অন্যকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল!...

তিন

দীর্ঘ দশটী বৎসর পরের কথা।

সংসারে এখন আমি ও উমা ভিন্ন আর কেহই নাই। একে একে সকলেই আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আরও একজন আছে, সে আমার প্রিয়-ছাত্র নির্ম্মল। আমি দেশের স্কুলেই পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় শিক্ষকতা করি। গ্রামে ঐ টাকাতেই আমার ও উমার বেশ স্বচ্ছলভাবেই চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় নির্ম্মল আমাদের কাকা ও ভাইঝির মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলের বাবা সঞ্জীববাবুর অবস্থাটা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু পুত্রকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাঁহার সংসারের আর দশজন পিতার মতই ছিল। কিন্তু অর্থের জন্য তাঁহার সে ইচ্ছা একেবারে চাপা পড়িবার মত হইয়াছিল; এমন সময় হেড্‌মাষ্টার মশাই সঞ্জীববাবুকে আমার নিকট সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। আমি প্রত্যেক মাসেই অল্প-বিস্তর গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রদের আমার সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্য করিতাম। নির্ম্মলকে আগে হইতেই চিন্‌তাম। ক্লাসের মধ্যে তাহার মত মেধাবী ছাত্র অল্পই ছিল। আমি সঞ্জীববাবুর অবস্থার কথা শুনিয়া নির্ম্মলকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলাম। যেদিন নির্ম্মলকে তিনি আমায় তুলিয়া দিয়া অশ্রুআবিল চক্ষে কহিলেন, 'দীনেশ-বাবু, আমার ওই নির্ম্মলই একমাত্র সন্তান...আমার স্ত্রীর প্রথম ও শেষ দান; আমি ওর সকল ভার আজ হতে আপনার হাতে তুলে দিলাম। ও আজ হতে আপনারই ছেলে মনে করবেন।...'

সেইদিন হইতেই নির্ম্মল আমাদের সংসারের একজন হইয়া দাঁড়াইল। ওর বাবা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন মধ্যে মধ্যে তিনি এক-একবার আসিয়া পুত্রকে দেখিয়া যাইতেন মাত্র।

নির্ম্মল ও উমা উভয়েই আমার কাছে পড়াশুনা করিতে লাগিল। উমার যখন সাত বৎসর বয়স, তখন নির্ম্মল আমাদের সংসারে আসে, তারপর এখন নির্ম্মল ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতার এক কলেজে আই-এ পড়ে। আমি বিবাহ করি নাই, যদিও পাড়ার অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আমার হিতসাধনায় বহুদিন পর্য্যন্ত দিবারাত্র আমায় এক-প্রকার প্রায় উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু আমার একান্ত ও বিষয়ে অনাসক্তি দেখায় শেষটায় রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন।

উমা ও নির্ম্মলকে লইয়া আমার দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়া যাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাদের মধ্যে হয় ত ঝগড়া-ঝাঁটি বাঁধিয়া যাইত—উভয়েই আমাকে মধ্যস্থ মানিত; উভয়কেই অল্পবিস্তর সন্তুষ্ট রাখিয়া আমার গোল-মাল মিটাইয়া দিতে হইত। এইরূপে একদিকে উমা ও অন্যদিকে নির্ম্মল দু'টী অসমবয়সী বালকবালিকা আমার

সমস্তটুকু জুড়িয়া দিবারাত্র আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিত।

সহসা একদিন পাড়ার আমার এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসীমা আমায় স্মরণ করাইয়া দিলেন—উমা বড় হইয়া উঠিয়াছে—তার এখন বিবাহ হওয়া প্রয়োজন। সত্যই ত! আমার উমারাণী যে মেয়ে; তাকে ত চিরকাল আমার ঘরে ধরিয়া রাখা যাইবে না! যেদিন সে বাংলার মেয়ে হইয়া জন্মাইয়াছে, সেইদিনই ত সে পর হইয়া গিয়াছে! আমার উমা! সে চলিয়া যাইবে—আমার আঁধার ঘরের উমারাণী সে যে শিবের ঘর করিতে যাইবে! চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এতদিন যাহাকে বুকে করিয়া এতটা বড় করিয়া তুলিলাম, সে আর আমার নয়...সে আর একজনের! কেন এমন হয়!

—'কাকুমণি!'

—'কে রে আমার উমা-মা!'

কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি নাচাইতে নাচাইতে উমা আসিয়া দু'হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল।

—'তোমার মুখখানি এত শুক্‌নো শুক্‌নো কেন কাকু-মণি! কি হয়েছে তোমার?'

আমি তার এলোমেলো চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, 'কই মা, কিছু ত হয় নি।'

—'বারে! তুমি আমায় লুকুচ্ছো...কি হয়েছে বল্‌বে না?'

—'এই ভাবছিলাম মা, আর দু'দিন বাদেই ত আমার উমা-মা পরের ঘরে চলে যাবে! তখন এতবড় বাড়ীটায় আমি একা একা কেমন করে থাক্‌ব!'

—'বারে! আমি তোমাকে ছেড়ে আবার কোথায় যাবো!...'

—'তোর বিয়ে হ'লে আর কি তোকে ধরে রাখ্‌তে পারব মা?'

—'তবে আমি বিয়ে করবো না!'

—দূর পাগ্‌লী, বিয়ে না করলে কি চলে!'

—'কেন চলবে না; এই যে তুমি বিয়ে কর নি, তাতে কি এসে যাচ্ছে বল ত? আমিও তেমনি তোমার মত কোনদিনই বিয়ে করব না!'

—মেয়েমানুষের বিয়ে না হ'লে যে জীবনই বিফল মা! তার জীবনের অর্দ্ধেকটাই যে বাকী থেকে যায়!'

—'তাই বলে আমি তোমায় ছেড়ে কিন্তু কোথাও যাবো না!

—'তাঁরা তাঁদের বৌকে ফেলে রাখ্‌বে কেন মা!'

সেদিনকার মত কথাটা ঐখানেই চাপা পড়িয়া গেল। সেই হইতেই আমি উমার জন্য দু'-একটা সম্বন্ধর খোঁজ লইতে লাগিলাম। কিন্তু কোনটাই যেন আমার মনোমত হইতেছিল না।

মোটের পর বিবাহের পরই যে আমার উমাকে বিদায় দিতে হইবে সেই কথা ভাবিতেই যেন আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত; তাই যে সম্বন্ধই আসুক না কেন, একটা না একটা খুঁত বাহির করিয়া আমি তাহা বাতিল করিয়া দিতে লাগিলাম।

গ্রীষ্মের বন্ধ আসিয়া পড়িয়াছে। সকালবেলা স্কুলের ছেলেদের কয়েকটা খাতা লইয়া 'করেক্ট' করিয়া দিতেছি, উমা নির্ম্মলের একখানা চিঠি হাতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। 'নিমু-দা' চিঠি দিয়েছে কাকুমণি, তাদের কলেজ কাল পরশু বন্ধ হবে, এবার সে আসবে।'

'কই দেখি।' বলিয়া আমি চিঠিখানা হাতে লইলাম।

নির্ম্মলের চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে সহসা যেন আমার চোখের উপর এক পশ্‌লা আলো খেলিয়া গেল। এতদিন যে জিনিসটা কখনো আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, সহসা সেই জিনিসটা যেন আমার সমগ্র অবচেতনাকে সমূলে একটা নাড়া দিয়া গেল।

উমার বিবাহের পর তাহাকে বিদায় দিতে হইবে এই কথা ভাবিয়া আমি কত না ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, অথচ নির্ম্মলের দিকে আমার কোনদিনও নজর পড়ে নাই। ইচ্ছা করিলে ত আমি উমার বিবাহ এই নির্ম্মলের সঙ্গেও দিতে পারি। উমার বিবাহও দেওয়া হয়, অথচ সেই সঙ্গে চিরটাকালই সে আমার ঘরে থাকিয়া যায়। ও ত আমাদের স্বজাত ও পাল্‌টা ঘর। নির্ম্মলের ত

বাড়ী ঘরদোর কিছুই নাই। ও ত আমার এখানেই থাকে।...যে জিনিসটা এত অধিক নিকটত্ব হেতু এতদিন আমার চোখে পড়ে নাই, আজ সহসা সেটা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় আমার সকল চিন্তা ও সকল ভাবনার অবসান হইয়া গেল। আর নির্ম্মলেরও উমার সাথে বহুদিন হইতেই ভাব। ছোটবেলা হইতেই দু'জন দু'জনকে দেখিয়া আসিতেছে, এতদিন উভয়ের মধ্যে বেশ একটা প্রীতির সম্পর্কও গড়িয়া উঠিয়াছে। আরও নির্ম্মল ত আমারই হাতে তৈরী করা ছেলে?...এইখানেই আমার বিবেচনার ভুল হইয়াছিল।

চার

শুভদিনে শুভক্ষণে উমা ও নির্ম্মলের বিবাহ হইয়া গেল। প্রথমটা নির্ম্মল বেশ একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু শেষটায় আবার কি ভাবিয়া রাজী হইল।

বিবাহের দিন সাতেক পরেই 'এটা পরীক্ষার বছর, বাড়ীতে থাকিলে পড়াশুনার বিশেষ সুবিধা হইবে না' বলিয়া নির্ম্মল কলিকাতায় হোষ্টেলে চলিয়া গেল।

মাথায় সিন্দুরের টিপ পরিয়া একখানা লাল চওড়া পাড় সাড়ী পরিয়া উমা মা যখন এঘর ওঘর ঘুরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইত, তখন আমার মাঝে মাঝে মনে হইত, বুঝি বৌদি' আবার আমার সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

একদিন দুপুরে উমাকে কোলের কাছে বসাইয়া আমি শুধাইলাম, 'আচ্ছা মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, ঠিক জবাব দিবি ত?...

ও আমার মাথার চুলের মাঝে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে কহিল, 'কি কথা কাকুমণি?'

—'আমি যে তোকে নির্ম্মলের সঙ্গে বিয়ে দিলাম, তাতে তুই সুখী হয়েছিস ত মা?'

ও আমার প্রশ্নে ছোট্ট একটু জবাব দিল, 'হু।'

আমি কহিলাল, 'শ্বশুর-ঘর নেই বলে তোর কোন দুঃখ নেই ত মা?'

—'শ্বশুর-ঘর থাক্‌লে আজ যে আমায় তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হতো কাকুমণি। তার চাইতে এই ত বেশ! চিরকাল তোমার এখানে থাক্‌তে পার্‌ব — কোনদিন কোথাও যেতে হবে না।...'

—'দূর পাগলী!...নির্ম্মল যখন চাক্‌রী-বাক্‌রী কর্‌বে তখনি ত ও তোকে নিয়ে যাবে।...'

—'তা হ'লে তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।...'

* * *

পরীক্ষার পর তিনমাসের ছুটীতে নির্ম্মল বাড়ী আসিল। বিবাহের পূর্ব্বে নির্ম্মল সব সময় অসঙ্কোচে আমার সহিত হাসিয়া কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু ইদানী যেন সে একটু লাজুকভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। আমি ভাবিতাম, উমার সহিত বিবাহ হওয়ায় ওর বোধ হয় আমার সাম্‌নে আসিতে লজ্জা করে।

স্কুলের বেলা হইয়া গিয়াছে। কই, উমা এখনও আমায় আহার করিতে ডাকিল না; অথচ, অন্যান্য দিন সে কত আগে আমায় ঠেলিয়া ঠুলিয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইয়া তবে সংসারের অন্যান্য কাজে হাত দেয়। মনে পড়িল আজ সকাল হইতে অন্যান্য দিনের ন্যায় উমা যেন একবারও আমার কাছে আসে নাই। হঠাৎ তার কি হইল? চিন্তিত মনে এক পা এক পা করিয়া রান্নাঘরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলাম। উনুনে কি একটা তরকারী ফুটিতেছে, কিন্তু উমা সেখানে নাই। এঘর ওঘর করিতে করিতে তাহার শুইবার ঘরে গিয়া দেখিলাম, বাগানের দিকের খোলা বাতায়নের একটা শিক্ ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। ধীরে ধীরে গিয়া পিছন হইতে তাহার মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া ডাকিলাম—'উমা!'

সে ফিরিয়া তাকাইল। দেখিলাম মুখখানি যেন বিষণ্ণ ও করুণ! 'আমার উমারাণীর কি হয়েছে মা!'

এক টুক্‌রো মলিন হাসি হাসিয়া কহিল, 'কই, আমার কিছু ত হয় নি।...'

আমি তাহার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, 'কি হয়েছে মা, তোমার মুখখানি শুক্‌নো শুক্‌নো...'

এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল—'ও গো দিদিমণি, তরকারী যে এদিকে ধরে গেল।'

—'ওই দেখো, তোমার স্কুলের হয় ত কত বেলা হয়ে গেছে। এদিকে আমার একটুও খেয়াল নেই। তাড়াতাড়ি তুমি স্নান সেরে এস কাকুমণি, চট করে তোমার ভাত বেড়ে দিই।'

সে দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সেদিন সমস্ত ক্ষণই আমার সকল কাজ-কর্ম্মের মাঝে উমার বিষণ্ণ মুখখানি বারে বারে আমার উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। সত্যই ত আমার সদাহাস্যময়ী মায়ের মুখে আজকাল যেন আর হাসি দেখিতেই পাই না। আজ আমার প্রথম মনে হইল, এ বিবাহে উমা যেন সুখী হয় নাই! কিন্তু নির্ম্মল, তাকে আমি যতটা জানি, সে ত তেমন ছেলে নয়, তবে ?...

এবার হইতে উমাকে আমি চোখে চোখেই রাখিতে লাগিলাম।

যে একদিন আমার সমস্ত একাকীত্বকে তাহার হাসি ও অশ্রু দিয়া উত্তাল তরঙ্গমালার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন তাহার সেই প্রাণবান প্রচেষ্টা সহসা কোন্ মায়াজাল স্পর্শে অসাড় হইয়া গিয়াছে। সংসারে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম ভাবিয়া দু'হাতে বুকের মাঝারে টানিয়া লইয়াছিলাম, সে যেন আজ আমার সমগ্র বুকখানিকে খালি করিয়া দিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

পাঁচ

উমা ও নির্ম্মল আমার পাশের ঘরেই শুইত।

হঠাৎ সেদিন মাঝরাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সহসা আমার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কাহারা যেন পাশের ঘরে বেশ জোরে জোরেই কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ভাবিলাম, এত রাত্রে জাগিয়া কাহারা ?...

—'উমা, ফের যদি তুমি ন্যাকার মত কাঁদতে বসো, তবে লাথি মেরে তোমাকে এঘর হতে বের ক'রে দেব!'

এ কি, এ কার গলা? না না, এ নির্ম্মলের গলা বলিয়াই ত মনে হইতেছে। জাগিয়া আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না ত!...

—'উমা, এখনও ভাল চাও ত আমার কথা শোন!... নইলে আমার সঙ্গে আর তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

—'আমি মরে গেলেও কাকুমণির কাছে ও কথা বলতে পারব না।...'

—'পারবে না ?...'

—'না!...'

—'তবে মর!...'

'ঠাস্' করিয়া একটা শব্দ হইল। আর দেরী করা উচিত নয়। এক লাফে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেলাম। উমাদের ঘরের দরজায় আসিয়া গম্ভীর স্বরে দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিলাম, 'নির্ম্মল, দরজা খোল।'

কিন্তু দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনিই রহিল। উমাকে ডাকিলাম, 'উমা, দরজাটা খোল ত মা।'

এবারে দরজাটা খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই উমা ছুটিয়া আসিয়া আমার গলাটা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল, —'কাকুমণি!'

আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম—'চল্ মা, তুই আমার ঘরে চল্!'

সে রাত্রে আমার চোখে আর ঘুম ছিল না। সারা রাতই উমাকে বুকের কাছে লইয়া পড়িয়া রহিলাম। শেষে রাত্রের দিকে বোধ হয় একটু তন্দ্রা মত আসিয়াছিল। জাগিয়া দেখি পাশে উমা নাই!...

কোথায় গেল ভাবিয়া এঘর ওঘর খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিলাম পথের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া উমা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার দু'চোখের কোল বাহিয়া ফোঁটার পর ফোঁটায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। আমি আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেলাম।

নির্ম্মল সে রাত্রের ঘটনার পর আমার সহিত আর দেখা না করিয়াই চুপিচুপি পলাইয়া গেল। সেদিনকার সে ঘটনার পর আর হয় ত তাহার আমার সহিত দেখা করিবারও ভরসা হয় নাই। কিন্তু উমা যেন দিন-দিনই রৌদ্রদগ্ধ চারাগাছটীর মত ক্রমেই শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার সমস্ত অবয়ব বাহিয়া যেন এক বিরহের গৈরিক আভা নামিয়া আসিল। আজকাল আর সে কাহার সহিত তেমন কথাবার্ত্তাও কহিত না। বারবার জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত ছোট একটী জবাব পাওয়া যাইত। একখানি সচল বিষাদের প্রতিমূর্ত্তির মত যখন সে আমার সামনে দিয়া যাতায়াত করিত, তখন আর কোনমতেই আমি আমার অশ্রু দমন করিয়া রাখিতে পারিতাম না।

নির্ম্মল সেই যে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল, আর প্রায় দীর্ঘ তুইটী মাসের মধ্যেও এদিকে পা বাড়াইল না।

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে কিন্তু নির্ম্মলের নাম গেজেটের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, ইদানীং নির্ম্মল পড়াশুনাতেও গাফলতি করিতেছিল।

ভাবিয়াছিলাম, নির্ম্মলের পরীক্ষার খবরটা উমার নিকট হইতে চাপিয়া যাইব। সেদিন কি একটা উৎসব উপলক্ষে স্কুলে হাফ্ হলিডে হওয়ায় তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, উমা গেজেটটা লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি যেন দেখিতেছে। আমার পায়ের শব্দ পাইয়া সঙ্কুচিত-ভাবে গেজেটটা হাত হইতে নামাইয়া রাখিয়া এক টুক্‌রো বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া সে আমার দিকে তাকাইল। আমি তার দিকে তাকাইয়া কহিলাম, 'নিমুর ঠিকানাটা জানিস্ মা! তাকে লিখে দিতে হবে, সে যেন পড়া ছেড়ে না দেয়...ভাল করে পড়ুক, এবার নিশ্চয়ই পাশ করে যাবে। হয় ত তেমন ভালভাবে পড়াশুনা করে উঠ্‌তে পারে নি।

—'আমি ত তাঁর ঠিকানা জানি না কাকুমণি!'

—'সে কিরে, তোকে চিঠিপত্র দেয় না?'

সে নীরবে ঘাড় হেলাইল।

—'এই তুই মাসের মধ্যে সে তোকে একখানাও চিঠি দেয় নি?'

—'না।' সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোনমতেই নির্ম্মলের প্রতি উমার মনোভাবটা জানিতে পারিলাম না। সে ঐ জায়গাটায় ধরা দিয়াও যেন ধরা দিত না। উমা অসুখে পড়িল। উমা যেভাবে দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল, তাহাতে আমার মনে বহু পূর্ব্বেই এই আশঙ্কাটা জাগিয়াছিল। প্রথম প্রথম উমা সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া বাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম্মই করিত, কিন্তু ক্রমে সে এত অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, বাধ্য হইয়াই তাহাকে শয্যা লইতে হইল। যদি তাহাকে বলিতাম, 'উমা, তোর অসুস্থ শরীর, অমনভাবে খাটিস্ নে মা! একজন রাঁধুনী রেখে দিই।' সে আমার কথায় এক টুক্‌রো বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিত, 'আমার ত কিছু হয় নি কাকুমণি, আমি ত বেশ ভালই আছি!'

সেদিন উমার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে শুধাইলাম—'উমা, মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, উত্তর দিবি মা?'

ও আমার হাতের আঙ্গুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে কহিল—'কি কাকুমণি?'

—'সে রাত্রে নির্ম্মল তোকে আমার কাছে কি বল্‌তে বল্‌ছিল মা?'

হাসিতে চাহিয়া উমা বলিল—'ও কথা শুন্‌তে চেয়ো না কাকুমণি, শুন্‌লে তোমার কষ্ট হবে!'

আর অনুরোধ করিলাম না।

না, আমার সকল চেষ্টা, প্রাণভরা প্রার্থনা, সকল কিছুই একেবারে নিষ্ফল করিয়া দিয়া মা আমার দিনের পর দিন যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে সেই ভীষণ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রি বোধ হয় তখন আড়াইটা হইবে, আমি উমার শিয়রের ধারে জাগিয়া বসিয়া আছি, সহসা সে আমায় মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, 'কাকুমণি!'

আমি ওর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শুধাইলাম—'আমায় ডাক্‌ছিস্ মা?'

অল্পক্ষণ বাদে সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—'সে যদি কখনো এখানে ফিরে আসে, তবে তাকে বলো, তার উমা তার কাছে মরবার সময় ক্ষমা চেয়ে গেছে—যেন ক্ষমা করে। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি কাকুমণি, সে ওই দরজার

গোড়ায় দাঁড়িয়ে অহরহ এখানে আসার জন্য যেন ছট্‌ফট্ করছে, কিন্তু আস্‌তে পারছে না—তোমার কাছে যে অপরাধ সে করেছে, তার যে সীমা নেই! ওই দেখো সে কাঁদছে, তাকে ক্ষমা করো কাকুমণি!'

আমি ওর রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম—'ক্ষমা ত' তাকে আমি অনেকদিনই করেছি মা! আর কেউ হোক্, না হোক্, সে যে আমার উমার স্বামী। তার ওপর কি রাগ রাখতে পারি!"

সেইদিনই শেষ রাত্রে আমার উমারাণী এই মাটীর পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া না জানি কোন্ লোকান্তরের পথে যাত্রা করিল।

খবরের কাগজে কাগজে নির্ম্মলের জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। আর এ গ্রাম ভাল লাগে না। যাহাদের লইয়া আমার সুখের সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারাই যখন একে একে আমায় ফাঁকি দিয়া যে যাহার পথে চলিয়া গেল, তখন আমিই বা কেন বৃথা এ ভাঙ্গাহাটে ঝাঁট্ দিয়া বেড়াই।

ইদানীং আমি খুব অল্প সময়ের জন্যই বাড়ী থাকিতাম। সমস্ত বাড়ীময় যেন উমার স্মৃতি এক বিষণ্ণ ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া মরিত। সারারাত ধরিয়া যেন একটা অবরুদ্ধ চাপা কান্না ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত রাত্রে মনের ভুলে প্রদীপ হাতে ঘরে ঘরে কে কাঁদিতেছে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, তারপর হয় ত রাত্রিশেষে ক্লান্তভাবে বিছানার উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছি।

ভোর হইতে তখন অল্প কিছু বিলম্ব আছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটাইবার পর ভোরের দিকে সেই বুঝি সবেমাত্র একটু তন্দ্রা মতন আসিয়াছে, সহসা মনে হইল কে যেন সদর দরজা ঠেলিয়া ডাকিতেছে—'কাকুমণি, দরজা খোল!'

চট্ করিয়া তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সত্যই ত বাহিরে কে ডাকিতেছে না? দরজা খুলিয়া দিতেই—ও কে নির্ম্মল না? হাঁ, সেই ত! কিন্তু এ কি তার চেহারা হইয়া গিয়াছে! এক মাথা রুক্ষ চুল!...গাল ভর্ত্তি দাড়ি!···চোখের কোলে কালি পড়িয়া গিয়াছে!...

—'কাকুমণি!'...আমার পায়ের উপর নত হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেই আমি তাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইলাম—নির্ম্মল বাবা!···আমার উমা!...

'সে নেই! সে থাক্‌তে পারে না, কাকুমণি সব কথা তোমার কাছে বলব আজ। তার প্রতি যে পাপ আমি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত কোনদিনও হবে কি না জানি না। পরীক্ষার ফিজ্ দেওয়ার জন্য তুমি আমায় যে টাকা পাঠিয়েছিলে, সে টাকা আমার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মদ ও মেয়েমানুষে খরচ হয়ে যায়। এদিকে ফিজ্ দেওয়ার দিন এসে পড়ল। কি করি, তোমার কাছেই বা চাই কি ক'রে? এক বন্ধুর কাছ হ'তে অনেক বলে-কয়ে ত টাকা ধার নিয়ে উপস্থিত বিপদ কাটালাম। কিন্তু কিছুদিন বাদেই সে টাকা চেয়ে বসল এবং অন্যথায় আমার নামে নালিশও করবে ভয় দেখালে। উমাকে একটা মিথ্যা কথা ব'লে বুঝিয়ে তোমার কাছ হ'তে টাকা চাইতে বল্‌লাম। কিন্তু সে আমার কথা বিশ্বাস করলে না। এমন সময় একটা চিঠি হঠাৎ তার হাতে পড়ায় সব সে জেনে গেল।' বলিতে বলিতে সে লজ্জায় মুখ ঢাকিল।

* * *

বৈকালের দিকে কি একটা কাজে সেন ও পাড়ায় গিয়াছিলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। বাড়ীতে ঢুকিয়া নির্ম্মলকে কোন ঘরেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অবশেষে যে ঘরে উমা তাহার শেষ নিঃশ্বাস লইয়াছিল, সেই ঘরে আসিয়া দেখি, সে মাটীর উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে—'উমা! উমা! ফিরে এস··· আমি যে আবার এসেছি...দেখে যাও লক্ষ্মীটী!...উমা!... উমা!...

ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া তার লুণ্ঠিত মস্তকটী আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম—'নির্ম্মল, বাপ্, কাঁদিস নে...ওরে, তোর উমা যে তোকে কাঁদতে দেখলে কষ্ট পাবে···সে যে বলে গেছে তোকে না কাঁদতে!...কাঁদিস নে যাদু!...'

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

দেবাহুতি

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

হল্‌দে রঙের তো এক টুক্‌রো কাগজ, আছে কি ওতে? সীমাহীন সৌন্দর্য্য, না, মাখানো আছে বিশ্বের মাধুর্য্য? না, ওর ওই বুকের আঁকা কয়টী কালীর আঁচড়; তার এতই প্রভাব যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়খানা ভরিয়ে তোলে পরিপূর্ণতায়, আনন্দের মহা উৎসে? যা' হোক্, হবে একটা কিছু নিশ্চয়ই। দেবাহুতি তাই ওর হাতে থাকা তারখানা বারবার উৎফুল্ল নয়নে গভীর আগ্রহ-ভরে পড়ছিলো।

"দেবা, সাত তারিখে সকালবেলা বম্বে মেলে হাওড়া পৌঁছাব।

শ্রী"

ওর খুসীতে সমুজ্জ্বল মুখখানি। সে কেমন যেন বারবার চম্‌কে উঠছিল। মনের যে গোপন কোণ ঘিরে থাকতো সব সময় কালো মেঘের স্তূপে, কত আপ্রাণ ব্যর্থ চেষ্টা যাকে মুছতে পারে নি, আজ কে জানে কেমন করে তা' ভরে গেছে আলোর জোয়ার এসে। মুছে গেছে সেই জীবনভরা ব্যথার কাহিনী, চার বৎসর পূর্ব্বের অস্পষ্ট স্মৃতি-রেখা। আটটী দিনের কত গান, গল্প, হাসি, উৎসব। তারপর? তারপর সব শেষ! স্বামীর স্মৃতিটুকু ছাড়া তার কোন অস্তিত্বই রইল না পৃথিবীর বুকে। নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হ'ল ওর স্মৃতিপট থেকে রঞ্জিতের তরুণ-শ্রীমাখা কোমল মুখখানি, ভেসে উঠলো চোখের সুমুখে প্রবাসী নবশ্রীর শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি হাস্য-মধুর হ'য়ে।

বাবা, দিদির যেন আর তারখানা পড়ে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না! বল্‌তে বল্‌তে দুরন্ত হাওয়ার গতিতে একটী পনেরো-ষোলো বছরের ফর্সা মত মেয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। দিদির মুখের পানে চেয়ে চঞ্চলভাবে আবার বল্‌লে সে, "জানিস্ দিদি, আমার আর শ্রী দা'কে আনা হবে না। মা বল্‌ছেন, মাসীমা না কি আমাদের এ নতুন বাড়ী চেনেন না। আমি তাই শেয়ালদায় তাঁকে আন্‌তে যাচ্ছি—তোকে হাওড়ায় নাবিয়ে দিয়ে যাব, তুই শ্রী দা'র গাড়ীতে চলে আসিস।"

বিভোরা দেবাহুতির স্বপ্নমাখা মনটা মুহূর্ত্তের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেল। সে চম্‌কে উঠে মুখ তুলে বোনের পানে চাইলে। গভীর বিস্ময় ওর দু'টী চোখকে বিস্ফারিত করে তুললে। কি বলছে উৎসা, সে যে কিছুই বুঝতে পারছে না। না না, সে এ কাজ কিছু-তেই করতে পারবে না—এ যে নিতান্তই অসঙ্গত কথা। হ্যাঁ, সে না হয় একটী বৎসর নবশ্রীর সাথে মিশেছে, হেসেছে, আলাপ-আলোচনা, গান-গল্প সবই করেছে; তাই বলে একা একা নির্জ্জনে নয় তো। কলেজভরা বন্ধু-বান্ধবীর সুমুখে, না হয় মা ও উৎসার সঙ্গে। সে বিধবা বলে কত মেয়ে চেয়েছে তাকে বিদ্রূপ হাসিতে, তীব্র কথায় ঘা দিতে, কিন্তু সে তাদের মনকে সন্তুষ্ট করতে কারও কোনও কথায় কাণ দেয় নি। তবু সে আজ নবশ্রীর সঙ্গে একলা গাড়ীতে আস্‌তে কিছুতেই পারবে না। না—না—না, সে কিছুতেই পারবে না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেবাহুতির সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো দ্বিধায়, গভীর লজ্জায় ও কুণ্ঠায়। সে সলজ্জ মুখখানি নত করে অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লে, "আমি একা যাব ষ্টেশনে, আর শ্রীর বাড়ীর যদি কেউ আসে?"

"বিলেত-ফেরতাদের ঘরে ওটা এমন কিছু সিরিয়স্ নয়। ভাবী স্ত্রীর ভাবী স্বামীকে আনতে যাওয়া একটা রীতি আছে, না যাওয়াই সভ্যতার বাইরে।"

উৎসার কথা শেষ হতেই চাকর এসে জানালে, "গাড়ী তৈরী হয়েছে।"

উৎসা চঞ্চলগতিতে, আর দেবাহুতি ধীর অলসচিত্তে গিয়ে গাড়ীতে চড়ে বসলে।

ভাবী স্বামী ! উৎসার এই দু'টী কথা দেবাহুতির মনের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে। উন্মনা করে তুল্‌লে। মনের একদিকে যেমন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার শুষ্ক মন নূতন প্রেমের আহ্বানে, আনন্দের আতিশয্যে বিহ্বল হয়ে উঠেছিল, তেমনি অপরদিকে সুপ্তদিনের অতীত স্মৃতি জেগে উঠে, তাকে ব্যথিত করে তুল-ছিলো। দেবাহুতির ভাবনাগুলি বিষমভাবে জোট পাকিয়ে গেল—যুদ্ধ করলে সে প্রচুর, কিন্তু বুঝ্‌তে পারলে না মন ওর কোন্ দিকে যেতে চায়। উৎসাকে বল্‌লে, "চল্ না ভাই, আমরা দু'জনে মাসীমাকে আন্‌তে যাই।

রুখে উঠে উৎসা বল্‌লে, "বলছ কি তুমি, দেখতে পাচ্ছ গাড়ীখানা যে ব্রীজের ওপর দিয়ে চল্‌ছে—আর শ্রী দা'কে তুমি না আন্‌তে গেলে তিনি কি রকম দুঃখ করবেন বলো তো ? ভুলে গেছ বুঝি তোমায় যে স্পেশাল তার দিয়েছেন ?"

সত্যিই ত, চম্‌কে উঠে দেবাহুতি বাইরের দিকে চাইলে, দেখলে গাড়ীখানা তখন ব্রীজ অতিক্রম করে, বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে।

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম্মখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। মুখর হলো তাদেরই মৃদু গুঞ্জনে, কলোচ্ছ্বাসে। সকলের মুখে আকুল প্রতীক্ষার ছায়া পরিস্ফুট হয়ে ফুটে উঠেছে, উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ সুমুখের পথের পানে। কিছুক্ষণ পর জনতার ব্যগ্রতাকে উৎফুল্লে ও চাঞ্চল্যে আরও বর্দ্ধিত করে, তীব্র বাঁশী বাজিয়ে বম্বে মেলখানা ধীর মন্থর গতিতে প্লাটফর্ম্মে এসে থামলে। কামরা থেকে যাত্রীরা নেমে পড়ে সকলে নিজের নিজের পথ বেছে নিলে। কেবল নবশ্রী জনপ্রবাহের মাঝে অন্বেষণরত ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে, ব্যথিত মনে কামরা থেকে নেমে অলস পায়ে চল্‌তে সুরু করলে। "তবে কি দেবা আসে নি ?" ক্লান্তকণ্ঠে খুব অস্পষ্টভাবে নবশ্রী নিজের মনে বল্‌লে। চোখ দু'টী ওর করুণ হতে করুণতর হয়ে উঠলো, চলার গতি আরও অলস হয়ে এল। "এই যে দেবা !" অফুরন্ত আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে নবশ্রী বল্‌লে, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

"আমিও খুঁজছিলুম।" কথাটা শেষ হ'ল না, দেবাহুতি মুগ্ধদৃষ্টিতে আত্মবিহ্বলের মত নবশ্রীর স্মিতমধুর মুখ-খানির পানে চেয়ে রইলো।

নবশ্রী ওর দৃষ্টির মাঝে মোহন দৃষ্টি মিশিয়ে দিয়ে গেট্ থেকে বেরিয়ে আস্‌তে আস্‌তে বল্‌লে, "কেমন ছিলে দেবা ?"

"ভাল। তুমি কেমন ছিলে ?"

দেবাহুতি একবৎসর পর নবশ্রীকে দেখে, ওর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে আরও মুগ্ধ হয়ে, বুকের মধ্যে একটা বেশ মিষ্টি রেশ উপভোগ করতে করতে অনেকটা নিজের অজান্তেই নবশ্রীকে তুমি বলে সম্বোধন করলে।

নবশ্রীর অন্তর খুসীতে ভরে গেল। এগিয়ে এল ওরা দু'জনে গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ডে। নবশ্রীর পুরানো ড্রাইভার দীর্ঘদিন পর মনিবকে পেয়ে উল্লসিত হয়ে সসম্ভ্রমে গাড়ীর দরজা খুলে দিলে। দু'টী তরুণ তরুণীর হৃদয়ভরা বিরহের মধু-গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে, গাড়ীখানা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বেনেপুকুরের একটা গলির মধ্যে দেবাদের দোতলা বাড়ীখানির সুমুখে থাম্‌লো। উৎসা অধীর অপেক্ষায় বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছিল, গাড়ীখানা দেখে নেমে এসে নবশ্রীর পানে চেয়ে খিল্‌খিল্ করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "জানেন শ্রী দা', দিদি আগে হাওড়ায় গেল, কিন্তু সেই হেরে গেল, দেখলেন ত ?" বলে সে গাড়ীর পাদানের ওপর উঠে নবশ্রীর একখানা হাত ধরে অনুনয়ভরে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে, "আসুন নেমে শ্রী দা'। একবছর পরে এলেন, মা মাসীমার সঙ্গে দেখা করবেন না ? মা তা' হ'লে বড্ড রাগ করবেন।"

"শুধু মা রাগ করবেন—আর তুমি রাগ করবে না উৎসা।" মৃদু হাসিমাখা কণ্ঠে বল্‌তে বল্‌তে নবশ্রী গাড়ী থেকে নেমে পড়লো।

নবশ্রীকে দেবাহুতির মা ও মাসীমা আদর-অভ্যর্থনার পর বিকেলে চায়ের নেমন্তন্নে আসার অনুরোধ করে, ওকে মোটরে তুলে দিয়ে রান্নাঘরে ফিরে এসে বিকেলের বাজারের ফর্দ্দ করতে বস্‌লেন। দেবাহুতি বাথরুম থেকে কাপড়-

জামা বদ্‌লে ফিরে এসে, দীর্ঘ চার বৎসর পর মাসীমাকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। ভক্তিনত মনে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যমুখে বল্‌লে, "কতদিন দেখি নি তোমায় মাসীমা! সেই বিয়ের রাত্রে একটীবার এসেছিলে!" বল্‌তে বল্‌তে সে মাসীমার পানে চেয়ে তাঁর গম্ভীর অশ্রুধৌত মুখখানা দেখে ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

মাসীমা তখন অবিশ্রান্তভাবে কাঁদ্‌ছিলেন। দেবাহুতিকে অশ্রুজলে নীরব আশীর্ব্বাদ করে ধরাগলায় বল্‌লেন, "মা, দুর্ভাগ্য আমার, তাই তোকে আর দেখ্‌তে আস্‌তে পারি নি—কোন্ প্রাণে আস্‌বো বল্ দেবা!"

ব্যাথায় তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমেই গাঢ় হয়ে এল, তিনি সজল করুণতাভরা নয়নে দেবাহুতির আধফুটন্ত অপরাজিতার মত সুন্দর মুখখানির পানে চেয়ে রইলেন। দেবাহুতি ধীরে ধীরে, মাসীমার চোখের সুমুখ থেকে সরে নিজের ঘরে ফিরে এল। ওর মোটেই ভাল লাগছিল না ওই অনর্থক দুঃখভোগ করাটা—কি দরকার ঘুমন্ত স্মৃতিটাকে জাগিয়ে তোলবার? ওর মনের পাতে মৃত রঞ্জিতের তরুণ সুশ্রী মুখখানা জলন্ত আগুনের টুকরোর মত জ্বলে উঠে তখনই ছাই হয়ে নিবে গেল,—নবশ্রীর স্নেহপূর্ণ প্রাণের স্নিগ্ধ উজ্জলতায়। সে ড্রয়ার থেকে ডায়েরীখানা বের করে সতৃপ্ত বুকে আজকের সার্থক দিনের সুন্দর মধুময় ছোট ছোট ঘটনাগুলি দেখতে সুরু করলে।

"ছি, কাঁদিস্ নে বোন্!" দেবাহুতির মা বোন্‌কে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "যা' হবার হয়েছে—অদৃষ্টে ছিল যা' ঘটেছে, তার জন্য কেন মিছে দুঃখ কর্‌ছিস; তার চেয়ে এখন চেষ্টা কর্ এ বিয়েটা হোক্, সুখে-স্বচ্ছন্দে ওরা ঘর সংসার করুক।"

আঁচলে ভিজে চোখ দু'টা মুছে মাসীমা একটু খুসীর সঙ্গেই বল্‌লেন, "হ্যাঁ দিদি, এ ছেলেটীও ত বেশ সুন্দর—দেবাহুতির মত আছে?"

"হ্যাঁ, ওদের আবার মতামত। সেদিন শুনলুম উৎসার কাছে কলেজে ওর নবশ্রীর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে; শুনে আমি নবশ্রীর কাছে বিয়ের কথা তুল্‌লুম, সে তো খুসী মনেই রাজী হ'ল; দেবা হাঁ না কিছুই বলে না।"

"তা' কি আর মেয়েছেলে বল্‌তে পারে? মনের কথা ত বলা যায় না দিদি, হয় ত কখন কি খেয়াল উঠ্‌বে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম। তা' দেবার পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই তো বিয়ের দিন ঠিক্ করছো?"

"হ্যাঁ।"

এমন সময় উৎসা হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে এসে বল্‌লে, "ও মা, শীগ্‌গির এস—দিদির আবার সেদিনের মত ফিট্ হয়েছে।"

ফিট্! মাসীমা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে বোন্‌কে সঙ্গে করে দেবাহুতির ঘরে এসে দেখলেন, সে চেয়ারের পিছনে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। চোখ দু'টি মুদ্রিত, মুখখানি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। টেবিলের ওপর একখানা খোলা ডায়েরী পড়ে আছে। মা ওর চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দিতে দিতে, একটী সুগভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে অতি করুণ সুরে বল্‌লেন, "কি যে ছাইভস্ম ওই ডায়েরীতে লেখে বুঝি নে বাপু! সেদিনও এমনি হয়েছিল।"

ঠাণ্ডা জলের বাতাসে মায়ের কণ্ঠস্বরে দেবাহুতির আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। সে ত্রস্তে ধড়্‌মড়্ করে মাসীমার কোল হ'তে মাথাটী তুলে ভীষণ লজ্জিত হয়ে ডায়েরীর খোলা পাতাখানা মুড়ে ফেল্‌লে। কিন্তু উৎসা ততক্ষণে অদম্য ব্যগ্রতা না চাপ্‌তে পেরে নিমেষের মধ্যে খোলা পাতার কথা কয়টী পড়ে নিয়েছিল।

আর পড়া হ'ল না উৎসার, সম্ভব লেখনী চলে নি দেবাহুতির।

দেবাহুতির পরীক্ষা হয়ে গেছে। সেদিন সে সন্ধ্যে-বেলা নবশ্রীর সাথে 'পূর্ণ'তে 'তরুণী' দেখে ফিরে এসে নিজের ঘরে বসে বেশ প্রফুল্লমনে ছবিখানির কথা ভাবছিল। মিষ্টি আমোদ অনুভব করছিল বুকের তলে।

কি চমৎকারভাবে কাটলো আজকের সকালবেলাটা।

ভারী সুন্দর লাগ্‌লো আমার! যেন হঠাৎ কাঁটাবনে ফাল্গুনের উৎসব! শ্রীর সান্নিধ্য বড় মিষ্টি, আমাকে মুগ্ধ করে, তৃপ্ত করে। কখন আসবে আবার সে? উঃ, সেই সন্ধ্যেবেলা! এখন তো মাত্র বারোটা বেজেছে। কেমন করে কাটবে এ দীর্ঘ সময়। শ্রীর ওই কথাটা আজকে আমার বড়ই সুন্দর লাগলো। বাস্তবিক খাঁটী সত্যি কথা। "ক্ষণিকের একটা ঘটনা বিপর্য্যয়ে সারা জীবনটা যে দুঃখের ভেতর দিয়ে কাটাতে হবে তার কোনও মানে নেই। যার সঙ্গে মাত্র আটদিনের পরিচয় হয়েছিল—তাকে স্বামী বলে মেনে নেওয়াটা মনের বিকার মাত্র। সত্যিই তো রঞ্জিতের—"

পাশের ঘরে নবশ্রী ওর মায়ের সঙ্গে গল্প করছিল। কিছুক্ষণ পর সে দেবাহুতির ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ারে বসে জিগ্‌গেস করলে, "ছবিখানা তোমার কেমন লাগলো দেবা?" হাসিমাখা উৎসুক দৃষ্টি দেবার মুখের পানে মেলে রাখ্‌লে।

"খুব সুন্দর লাগল।" মুগ্ধকণ্ঠে দেবাহুতি বল্‌লে, "ওইখানটা বেশ চমৎকার, না? আচ্ছা, অত সুন্দর কেন হয়েছে বলো তো? বাস্তবের সাথে মিল খেয়েছে বলে, তাই না?"

"তাই হবে।" নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে নবশ্রী বল্‌লে। তারপর একান্ত আগ্রহভরে বল্‌লে, "কোন্‌খানটা ভাল লাগল তোমার দেবা?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেবা সলজ্জভাবে কুণ্ঠায় নুইয়ে পড়ে বল্‌লে, "সেইখানটা।"

"কোন্‌খানটা?"

"সেই যে, সেই যে।" বলে খুব জোরে হেসে উঠলো দেবাহুতি। লজ্জায় ও আনন্দে মুখখানি ওর অপূর্ব্ব সুন্দর হয়ে উঠলো। সেই ভোরের স্নিগ্ধ আলোর মত নম্র মুখখানির পানে নির্নিমেষে চেয়ে নবশ্রী বল্‌লে, "বলবে না দেবা? বলবে না কোন্‌খানটা তোমার ভাল লাগলো?"

"সেই যে।" অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে দেবাহুতি বল্‌লে, "প্রণববাবু আর গীতাদেবী একখানা চেয়ারে বসেছিল, এমনি সময় আনন্দবাবু—বুঝতে পেরেছ ত আর আমি বল্‌তে পারি না।"

"তোমার বুঝি এত ভাল লেগেছে; তা' চলো, কাল আবার দেখে আসা যাক্‌। যাবে না কি?"

"না।" অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে দেবা বল্‌লে, "কাল যে একটার গাড়ীতে নাটোর যাব। অজিতের বিয়ে, সে নিজেই নিতে আস্‌বে।"

"ওঃ, তোমার দেওরের বিয়ের দিন বুঝি এসে গেল। তা' না গেলে কি হয়? ওদের সঙ্গে আর সম্বন্ধ কিসের?"

"না শ্রী, ওরা অনেক করে বলেছে, একবার যেতেই হবে।"

"তোমার যে আবার বিয়ে হবে, সে কথা ওরা জানে?"

"বোধ হয়, না।" দেবাহুতি বল্‌লে।

সেই সময় উৎসা ঘরে এসে ঝর্ণার গতিতে কথায় হাসিতে মিশিয়ে বলে উঠল, "বাবা, শ্রী দা'র যেন আর সবুর সইছে না কিছুতেই, আর তো মোটে দশদিন বাকী বিয়ের, তবু কি ভীষণ অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে!"

নবশ্রী ও দেবাহুতির কি বিষয় আলোচনা হচ্ছে তা' কাণ দিয়ে না শুনে উৎসা পরিহাস-বাণীতে ঘরখানিকে মুখরিত করে তুললো।

দীর্ঘ চার বৎসর? হ্যাঁ, দীর্ঘ চারবৎসর পর দেবাহুতি দেওরের বিয়েতে শ্বশুরবাড়ী এসেছে। উৎসাকেও সাথে এনেছে। সেই যে বিয়ের আটদিন পরে স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে সে বিদায় নিয়েছিল এ গৃহ থেকে, তারপর আর সে এ বাড়ীতে আসে নি। এরূপ আকস্মিক ঘা খেয়ে ওর মনটা এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছিল, বদলে গেছলো ওর জীবনধারা। লেখাপড়ায় ব্যস্ত মন ভুলে গেল রঞ্জিতের স্মৃতিটুকু; ক্রমেই অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেল নিঃশেষে সম্পূর্ণরূপে। নবশ্রীর সান্নিধ্য ওর বুকে নব প্রেরণার সৃষ্টি করলে; আশা উৎসাহ উদ্দীপনা আনলে প্রচুর। শ্বশুরবাড়ীর কথা ও প্রায় ভুলে গেল। আজ সে চারবৎসর পর স্বামীর ঘরে এসে

সমস্ত বাড়ীখানা ঘুরে ফিরে দেখ্‌ছিল। দেখতে ওর বেশ লাগ্‌ছিল। তবে কি থেকে থেকে ওর বুকের মাঝে ঘুমন্ত স্মৃতি জেগে ওঠে নি? করুণতার রসে সিক্ত হয় নি সারা মন? হ্যাঁ হয়েছিল, মুখখানি ওর ব্যথায় শুক্‌না ম্লান হয়েছিল। তবে কি যেন গৌরবের একটা স্পন্দনও অনুভব করছিল সে। দেওর অজিত বিয়ে করতে চলে গেছে। দেবাহুতি বার-বাড়ীতে কি নেন একটা নিতে এসে একটী মস্ত বড় সুসজ্জিত ঘর দেখে, পাশে ছোট একটা দূর-সম্পর্কের ননদ ছিল, তাকে জিগ্‌গেস কর্‌লে, "ওখানা কার ঘর ভাই ঠাকুরঝি?"

"তা' বুঝি জান না বৌদি', ওখানা যে রঞ্জিত দা'র 'ষ্টাডি রুম' ছিল; এখন তারই স্মৃতিস্বরূপ সাজান থাকে, ব্যবহার হয় না। দেখবে এস না বৌদি', কত বড় বড় লেখকদের লেখা বই আছে।"

সুমিত্রার পিছু পিছু দেবাহুতি লাইব্রেরি ঘরখানায় ঢুক্‌লে। সুমুখের দেওয়ালে রঞ্জিতের মস্ত অয়েল পেন্টিংখানা চোখে পড়তেই সে সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। পলকহারা চোখে আত্মবিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল ফটোখানার পানে। এই তো সেই যুগে যুগে চেনা চির-পরিচিত স্নেহভরা আঁখি দু'টী। চেয়ে আছে শান্ত সৌম্য দৃষ্টি মেলে ওর পানে, সান্ত্বনার মিনতিপূর্ণ জ্যোতি ঝরছে ওই দৃষ্টির অভ্যন্তর হতে; যেন হাতছানি দিয়ে ডাকৃছে দেবাকে, বল্‌ছে, "দুঃখ করো না দেবা তুমি, আমি আছি তোমারই প্রতীক্ষায়; এস চলে তুমি তোমার কাজ শেষ হলে; আবার এখানেও বাঁধবো আমরা সুখের ঘর—কি বল দেবা?"

দেবাহুতির চোখ থেকে দু'ফোঁটা তপ্তাশ্রু ঝরে পড়লো, সে নিজেকে সংযত করে অবাধ্য দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিল ওই দিক্ থেকে। বই ভর্ত্তি কাচের আলমারী ও সেল্‌ফগুলোতে দৃষ্টি পড়তে সে অশ্রুজল পরিপূর্ণ মুগ্ধচোখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে ওর হৃদয়খানা ভরে গেল। মনীষিদের কাব্যগ্রন্থ ও ঐতিহাসিকের গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থাদি যেন উন্মুক্ত করা রয়েছে হায়রে পৃথিবীতে তারই প্রতীক্ষায়! এতদিন অজ্ঞতাই অর্জ্জন করে এসেছে; তাই সে এ সমস্ত রত্ন উপলব্ধি করিবার সময় পায় নি। অনুশোচনার তীব্র অনলে দেবাহুতির হৃদয়খানা পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে লাগলো। কেন মিছে পার্থিব একটা সুখের স্রোতে জীবনটাকে ভাসিয়ে দেবে? না, তা' সে কিছুতেই দেবে না। নবশ্রীর কথা মনে হতেই ওর বুক ফেটে কান্না এল—শ্রী যে ওকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে; কি করে সে শ্রীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করবে, অকালে ব্যর্থ করে দেবে একটী তরুণ মুকুলিত জীবন।

"ও বৌদি', বৌদি', কি ভাবছ এত—ওই শোন অজিত দা' এল বিয়ে করে; শীগ্‌গির এস।"

"তুই যা' ভাই মিতু।" অত্যন্ত করুণ স্বরে, উন্মনা হয়ে দেবাহুতি বল্‌লে, "আমার এ শুভানুষ্ঠান দেখ্‌তে নেই।"

প্রায় সমস্ত রাত্রিটাই উৎসা নতুন বধূর সাথে হৈচৈ করে, অল্প একটু নিদ্রার পর ভোরবেলাতেই ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ত মনে অধীর হয়ে দিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ, কাল তার একটী পরীক্ষা, আজ তাকে বাড়ী ফিরতেই হবে। ভেতর বাড়ীখানা তন্নতন্ন করে খুঁজে দিদিকে না দেখতে পেয়ে সে ত্রস্তে বার-বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটলে। এমন সময় উঠোনে দেখতে পেলো দেবাহুতি 'ষ্টাডি ঘরখানা'র দিকে এগিয়ে চলেছে। হাতে ছিল ওর পিতলের সাজিভরা একরাশ সদ্যফোঁটা টাট্‌কা ফুল। পরণে পাড় না থাকা সাদা শাড়ী, অঙ্গ নিরাভরণ—টুক্‌রো সোণার এতটুকু চিহ্নও কোথাও নেই। উৎসা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে হতভম্বের মত দিদির পানে চেয়ে রইল। দিদির এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখে সে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। স্নিগ্ধ হেসে, স্বাভাবিক কণ্ঠে দেবাহুতি বল্‌লে, "বড্ড আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে না রে উৎসা? আয়, ঘরে আয়, অনেক কথা আছে বলবো তোকে।"

নীরবে দিদির সাথে ঘরে ঢুকে উৎসা একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বল্‌লে, "এ কি বেশ পরেছ

দিদি তুমি! কিছুই যে আমি বুঝ্তে পারছি না—" বল্তে বল্তে ওর দেওয়ালে রঞ্জিতের অইল-পেণ্টিংখানার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে, সে অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

মেঝেতে বসে পড়ে দেবাহুতি আঁচল খুলে সূচ-সুতো বের করে, সুতোয় একটী ফুটন্ত গন্ধঢালা বেলফুল পরাতে পরাতে বল্লে, "উৎসাহ দেখ্ছিস ত ভাই, —এ যেন ছবি নয়, তোর জামাইবাবুর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তাই ভেবেছি, এ পরম তীর্থ থেকে ফিরব না উৎসা।"

অসীম ব্যগ্রতাঢালা কণ্ঠে উৎসা শুধালে, "তা' হ'লে তুমি ওখানে যাবে না দিদি? বিয়ে করবে না শ্রী দা'কে?"

"না বোন্!" কোমল অথচ দৃঢ়কণ্ঠে দেবাহুতি বল্লে, "জানি ভাই, আমার এ ব্যবহারে শ্রী ভারী কষ্ট পাবে, কিন্তু কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি নে।" একটু থেমে আবার বল্লে সে, "উৎসা, পারবি নে কি তুই শ্রীর ব্যথা মুছিয়ে দিতে?"

উৎসুক নয়নে সে চেয়ে রইল বোনের পানে।

"বলো তুমি, কি করবো আমি?"

"তার সারা জীবনের সাথী হতে বল্ছি, পারবি নে বোন্ শ্রীকে বিয়ে করতে?"

উৎসা কোনওদিন দিদির কোনও কথা ঠেলে নি—আজও সে পারলে না—নতমুখে বল্লে, "আচ্ছা, কি বলবো আমি তাঁকে?"

"তোকে কিছুই বল্তে হবে না, আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তাকে দিস্।" বলে দেবাহুতি অর্দ্ধগাঁথা মালাগাছি সাজির 'পরে রেখে দিয়ে, টেব্‌ল থেকে কালী কলম প্যাড নিয়ে, শ্রীকে লিখলে, "শ্রী, আজকে আমার ফেরবার কথা ছিল, কিন্তু পারলুম না কিছুতেই। কিছু মনে কোর না। উৎসার কাছে সমস্ত শুনো। দুঃখ পাবে জানি—আমার এই অনুরোধটী রেখো, দেখবে সব দুঃখ নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হবে। বুক হাল্কা হয়ে যাবে। রাখবে ত শ্রী আমার এ অনুরোধ? একান্ত অনুনয় আমার, উৎসাকে তুমি ভালবেসো, তাকে চলার পথে নিবিড়ভাবে সাথী করে নিও। করবে তো বিয়ে? তুমিই বল শ্রী, দ্বিতীয়বার পুনরুদ্যমে, উৎসাহের স্রোতে গা ভাসিয়ে নবগড়া সংসারে জমে ওঠা বিধবার কি সাজে? এতে আমার স্বামীর আত্মাকে কতখানি কষ্ট দেওয়া হয় বলো তো? বাল্যে বিয়ে হ'ত যদি, সে না হয় ভিন্ন কথা; এ যে জোর করে মুছে ফেলা হচ্ছে তাঁর স্মৃতিটাকে, তাই নয় কি? দ্বিতীয়বার বিয়ের মানে কি? ভোগের চরম সার্থকতা ভিন্ন আর কিছু কি? অনেক কথা বল্লুম শ্রী, রাগ করো না? বিয়ে কোরো ওইদিনেই উৎসাকে, আর কিছু বলবার নেই আমার। ইতি, তোমাদের দিদি।"

দেবাহুতি চিঠিখানি খামে ভরে, আর একখানি চিঠি টেব্‌লের ওপর থেকে নিয়ে উৎসার হাতে দিলে, বল্লে, "এখানা মাকে দিস্, এখানা শ্রীকে।"

এমন সময় অজিত এসে বল্লে, "এস উৎসা, গাড়ীর সময় হয়ে গেছে।" বৌদি'র পানে চেয়ে বল্লে, "মত আপনার বদলাবেন না তো বৌদি', চলে যাবেন না তো?"

"দূর পাগল, সে কি আর হয়?" বলে দেবাহুতি সাজি থেকে মালাগাছি নিয়ে গাঁথতে বস্‌লে।

অজিত তাড়াতাড়ি উৎসার লগেজগুলি গাড়ীতে তুলে দিতে গেল। হেঁট হয়ে দিদিকে প্রণাম করে মুখ তুলে অশ্রু-সজল নয়নে দেবাহুতির শুদ্ধ তপস্বিনীর মত পবিত্র মূর্ত্তি-খানির পানে চেয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ধরাগলায় বল্লে, "দিদি, আমি তোমার ছোট বোন্, কি বলবো তোমায়। শুধু এইটুকু বল্ছি, জামাইবাবু কাছে থাক্‌লে ভালবাসতেন, দূরে থেকে আরও ভালবাসবেন। আমি তোমার অনুরোধ রাখবো, শ্রী দা'ও রাখবেন নিশ্চয়ই।" বলে সে ঝড়ের গতিতে দিদির শাশুড়ীকে প্রণাম কর্‌তে চলে গেল।

দেবাহুতির মালাগাছি গাঁথা শেষ হয়েছিল। উৎসা বারাণ্ডা অতিক্রম করতে করতে পিছন ফিরে আবার দিদির ঘরে তাকালে। দেবাহুতি তখন নিবিষ্টচিত্তে সদ্যগাঁথা মালাগাছি ভক্তিনম্র পুলকিত মনে রঞ্জিতের ফটোখানায় পরিয়ে দিচ্ছিল।

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

মোরিস্ শিভালিয়ে

[বাল্যের রহস্যাবৃত জীবন-কথা ও হলিউডে আগমন]

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

মাষ্টার ক্লাস থেকে বার করে দিলে—ক্লাসের ভেতর গান, বখাটে ছেলে। মুখ্‌টি চূণ করে ছেলেটি বাড়ী গেল। ভাব্‌লে—গান আর সে গাইবে না—কখনও না। খানিকটা পরেই সে গেল সব ভুলে—আবার দেখ্‌লে তার

অ্যান সোদার্ণ মোরিস্ শিভালিয়ে

গান পাচ্ছে—আর গুণগুণ করে আপন-মনে সে গেয়ে

গুণ করছিস? মা বল্‌লেন—ওরে থাক্ থাক্—গান নিয়েই যে জন্মেছে, গান সে গাইবেই।

দুঃখের সংসার আনন্দ করার এতটুকু অবসর নেই। বেঁচে থাকার এই চিরন্তন নিয়মকে বজায় রাখ্‌তে গিয়ে গান নিয়ে যে জন্মেছে, গান হয় ত তেমন করে সব সময় গাইতে সে পায় না—কবিতা নিয়ে যে জন্মেছে, অঙ্ক কষেই হয় ত তার দিনটা কাটে। মোরিসের জীবনে কিন্তু তা' হয় নি—মার সেই প্রথম সত্য যা' তার জীবনের প্রথম প্রভাতে দীক্ষার বীজমন্ত্রের মত গিয়ে পৌঁচেছিল, সেই তাকে বড় করলে। কিন্তু 'ষ্ট্রাগ্‌লে'র সেখানে কম্‌তি হয় নি, কখন উদ্দাম জলরাশির বিক্ষিপ্ত উর্ম্মিমালার সঙ্গে তাকে যুঝ্‌তে হয়েছে—আবার কখনও বা চির-শব্দিত নটরাজের রিণিঝিনি তাকে উল্লসিত করেছে। তাই শিভালিয়ে একদিন প্যারিসের ছোট গ্রাম মিলি মোনতান্ত-এর ছোট ঘরখানিতে বসে বাল্য-জীবনের দুর্যোগের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে এক বন্ধুকে বলেছিলেন—'ষ্ট্রাগ্‌ল' নেই যে জীবনে, সেখানে বৈচিত্র্যের স্থান কোথায়? কেটে আনা নদীর মত একঘেয়ে একটানা চলার মধ্যে বেঁচে থাকার সাড়া পাওয়া যায় না।

এম্‌নি দুর্যোগের মধ্যে অতি সাধারণভাবে সংসার চলে—এমন সময় হাতের তুলিটি প্লেটে রেখে পিতা

হাওয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঠিক্‌রে যাবার যোগাড় হ'ল—এমন সময় আর একখানা কোমল হাত তাদের সাম্‌লে নিলে—তিনি হচ্ছেন শিভালিয়ের স্নেহময়ী মা। তাদের মনে হ'ল তাদের সব আছে, আর যা' হারিয়েছিল তা' মার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেল। তবে সুধু পাওয়া গেল না একটা জিনিষ—যেটাকে এ সংসারে চলার পথে সব সময় সব অবস্থাতেই মানুষ বড় করে ধরে নেয়—যেটার পূরণে অনেক কিছু শোক-তাপ, মান-অভিমান মানুষ সাম্‌লে নিতে পারে—বাঁচতে গেলে যেটার প্রয়োজন, আবার যেটার জন্যে মানুষ বাঁচার প্রয়োজন, বোধ করে—সেই পয়সা! বয়সের তুলনা দিয়ে অভিজ্ঞতা মাপ্‌তে গিয়ে দেখা গেল—বয়স যদিও মোরিসের তখন এগার, কিন্তু বুদ্ধিতে তিনি ত্রিশ, আর হাসা-কৌতুকে তিনি প্রায় ষাটের কাছাকাছি এসে পৌচেছেন।

কাজ তার মিল্‌ল এক ছুতোরের দোকানে। দিন-কতক বেশ চল্‌লও। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, কারখানার দলসুদ্ধ লোক ঐ বালকের রসালাপ ও সঙ্গীতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল যে, কাজ তারা একরকম ভুলেই গেল; তারপর ঐ সঙ্গীতই মোরিস্‌কে একদিন ওখান থেকে তাড়ালে। আবার ঘোরার পালা। দুঃখ বুঝি আর আর ঘোচে না—সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার দিকে হতাশ হয়ে মোরিস্ বাড়ী ফির্‌লে। মা জিজ্ঞাসা করেন—হ্যারে ম্যাসি, কিছু হ'ল? মোরিস্ বলে—কৈ মা! যদি ছেলের আনন্দ হয়,এই ভেবে মা বলেন—দেখিস্,কাল নিশ্চয় হবে। তার পরদিন সত্যিই মোরিস্ কাজ পেলে, আবার তার পরের দিনই ছাড়লে। এমনি করে অনেক কাজই মোরিস্ করলে—গাড়ীর রং-মিস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, পুতুলের দোকান, এমন কি সাইকেল মেরামত পর্য্যন্ত। কিন্তু সবখানেই দোকানের ঐ মালিকরা ঐ আত্মভোলা ছেলেটাকে নিয়ে তাদের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌তে পারলে না—অর্থাৎ, সবাই তাকে সাহায্য কর্‌লে মোরিসের ঐ বাঁধা পথে তাকে এগিয়ে দিতে।

কিছুদিন হ'ল কাজকর্ম্মও নেই, আর কিছু করতেও তার ভাল লাগে না; তাই একদিন বসে বসে ঠিক্ করে ফেল্‌লে যে, এসব কাজ সে আর কোরবে না—এ-সবের মধ্যে প্রাণ নেই, আর থাক্‌লেও তার প্রাণের সঙ্গে এরা যেন সাড়া দেয় না। প্রাণপণে মোরিস্ একটা নিশ্বাস নিয়ে, মার কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালে—তার দ্বারা এসব আর হবে না—সে হ'বে 'এ্যাক্রোবাত্।' করুণাময়ী মা বল্‌লেন—বাবা, তোর যা' ভাল লাগে, তুই তাই কর। মাথার উপর বেঁচেছিল তখনও মোরিসের দু'জন বড় ভাই। মা ও মোরিসের সংসারে যদিও কোন সাহায্যেই তাঁরা আস্‌তেন না; তবুও মোরিসের এই অবনতির কথা শুনে তাঁরা না এসে পারলেন না এবং এক-রকম জোর করেই এক পেরেকের কারখানায় মোরিস্‌কে দিলেন ঢুকিয়ে। কাজ মোরিস যদিও নিলে, কিন্তু 'এ্যাক্রোবাত্'-ও সে হলো—একরকম লুকিয়ে, জোর করে এবং 'প্যালেস অফ্ এভালে'র শিল্পীদের সঙ্গে মিশে, তাদের নানানভাবে ছেলেমানুষী মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে নানান রকম হাসির গান ও অঙ্গভঙ্গীও মোরিস শিখতে লাগ্‌ল। এম্‌নি করে দিন যায়, একদিন হটাৎ 'ফ্লাইং ট্রাপিজ' থেকে পড়ে পা ভেঙে, মুখে ভীষণভাবে আঘাত লাগিয়ে মোরিস দাদা ও মার কাছে ধরা পড়ল এবং সেই প্রথম তার মার কাছ থেকে মোরিস্ একটা বিপরীত উত্তর পেলে; মা বল্‌লেন—"নো মোর এ্যাক্রোবেতিস ফর ইউ মাই সন্।"—মার কথা সে কোনদিনই ঠেল্‌তে পারে না, তাই সেদিনই মোরিস প্রতিজ্ঞা করে বসল যে, 'এ্যাক্রোবাত্' সে আর হবে না—এবার সে হ'বে 'কমেদিয়ান্।'

গাঁয়ের পাশেই গাঁ—কোল লোকের বাস, দিন আনে দিন খায়। সেই গাঁয়েই 'ক্যাফে দ্য এয় লিওঁ' একটি নাম-করা 'রেস্তোরা'—গ্রামের গৌরব। তার নাম বল্‌তে পার্‌লে যেন সবাই খুসী হয়—আবার শনিবার যারা সেখানে যেতে পারে, গর্ব্ব করে তারা দশজনের বাড়ী গিয়ে; কথার ছলে ঐ কথাটাই শুনিয়ে আসে। শনিবারের রাত্রে নানান রসালাপে 'ক্যাফে'টা মস্‌গুল হয়ে ওঠে—সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের পর—বাইরের চাকুরেরা ঘরে ফিরে এসে ঐখানে বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে প্রাণভরে খায় 'ভোরুজ আর স্তোপা'—

আর সস্তা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরিয়ে তোলে সারা ঘরখানাকে। সম্প্রতি সেখানে গান-বাজনা 'ইন্‌ট্রডিউস্' করা হয়েছে—গ্রামের 'অ্যামেচার'রা মদের বিনিময়ে শনিবার এখানে এসে, গান গেয়ে ও যন্ত্র বাজিয়ে বাহবা নিয়ে যায়।

মোরিসের বয়স তখন তের বছর। সে ভাব্‌লে—আমি যা' শিখেছি, তা' 'ক্যাফে ছ এয় লিওঁ'র পক্ষে যথেষ্ট; তাই সে একদিন সোজাসুজি 'ক্যাফে'র ম্যানেজারের সঙ্গে গিয়ে কর্‌লে দেখা। নেশার ঝোঁকে বালক মোরিসের কথায় ম্যানেজার হোহো হেসে উঠ্‌ল। মোরিস্ তখন রেগে গরগর করছে—ইচ্ছে হচ্ছে তার সদ্যশেখা 'বক্‌সিংয়ে'র একটা বড় প্যাঁচ ম্যানেজারের ঐ মোটা নাকের উপর সে দেখিয়ে দেয়; কিন্তু ইতিমধ্যে দয়ামায়ার প্রতীক্ মিষ্টভাষী ম্যানেজারের স্ত্রী এসে দেখা দিলেন এবং তিনিই মোরিস্‌কে আগামী শনিবারের জন্য বিশিষ্ট গায়ক স্থির করলেন। জীবনে সেই প্রথম দশজনের সাম্‌নে মোরিস্ কর্‌বে গান—আনন্দ ও ভয়ের সে একটা কি রহস্যাবৃত আলোড়ন তার মধ্যে চল্‌তে লাগ্‌ল তা' সেই জানে। শনিবার রাত্রে 'ক্যাফে'র চারিদিক থেকে সকলেই মোরিসের গান ও নাচ দেখে 'ব্রিবিয়া ব্রিবিয়া' বলে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল—অবশ্য সে সুখ্যাতির খানিকটা যে তার অল্প বয়সের জন্যেই হ'ল—এটা মোরিস্ বেশ বুঝতে পারলে তখন, যখন 'ক্যাফে'র ম্যানেজার তাকে কাছে এনে পেটভরে 'সোকলা' খাইয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এত অল্পবয়সে লেখাপড়া ছেড়ে এসব করে বেড়াচ্ছ কেন? তোমার কি বাবা নেই? সেই থেকে আর মোরিস্ সেখানে যায় নি। অন্য অনেক জায়গায় অবশ্য সে গিয়েছে—কোথাও কেউ বালককে আনন্দ দেবার জন্যে সুখ্যাতি করেছে—কোথাও কেউ সত্যিই মোরিসের মধ্যে হয় ত আনন্দের উপকরণ পেয়ে তাকে মেডেল দিয়েছে, বাড়ীতে এনে খাইয়েছে—আবার কোথাও হয় ত কেউ নিছক নিন্দে করেছে—চাকুরী নেই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এম্‌নি করে চল্‌তে চল্‌তে একদিন মোরিসের মার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল—গর্ব্বে মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—কাজিনো ছ টুরইলস্‌য়ে মোরিসের চাকুরী হ'ল—বার 'ফ্রাঁ' সপ্তাহে। মাইনে কম বেশীর জন্যে কিছু নয়, মোরিস্ ভাব্‌লে, এতদিনে সে যেন সত্যিকারের 'প্রফেসন্যাল' হ'তে পেরেছে—এতদিনে যেন সে সত্যিকারের জয়ের পথে যাত্রা সুরু করেছে। মোরিস্‌কে ঘিরে ধীরে ধীরে একটা সুনামের স্রোত গ্রাম থেকে দূর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল এবং তা' সহরে এসেও পৌঁছল। ধনী লোকদের বাড়ীতে আনন্দ-উৎসবে মোরিসের হ'তে লাগ্‌ল নিমন্ত্রণ—আজ আর এই সব স্থানে নাচগানের পরিবর্ত্তে মোরিস কেবল খেয়েই চলে আসে না—মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে আসে, কম হ'লে ফেরত দেয়।

ঐ সময় এক বন্ধুর মারফৎ সহরের 'ফলি বার্জেয়ার'-এর বিখ্যাত নর্ত্তকী ও গায়িকা মাদেমুসেল মিসেন্ গুয়েতের সঙ্গে মোরিসের হ'ল পরিচয়। মিসেন্ গুয়েত মোরিসের মধ্যে পেলেন সোণার খনির সন্ধান—তাই তিনি যুবক মোরিস্‌কে আপনার করে নিলেন—গ্রাম ছেড়ে প্যারিসের সহরে এসে মোরিস উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার খ্যাতি প্যারিসের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে কেমন করে ছড়িয়ে পড়্‌ল—মোরিস্ তা' নিজেই টের পেলে না। সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এলো—মার প্রাণে আনন্দ আর ধরে না! গ্রামের অভাবগ্রস্থ লোকেরা মোরিসের কাছে মোরিসের মার কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল; মা ছেলে কারুরই দানে কৃপণতা ছিল না—তাই যারাই আস্‌ত, তাদের কেউই কোনদিন খালি হাতে ফির্‌ত না। মা সময় সময় দান-সম্বন্ধে সংযমী হ'তে গেলে মোরিস্ বল্‌ত—মা, আজ আমাদের সেই মাড়িয়ে-আসা দুর্গম পথটার কথা মনে করে এদের দিকে চেয়ো; দেখো, তোমার সংযম ভেসে যাবে।

এমন সময় রুদ্রের ডমরু উঠ্‌ল বেজে—মহাসমরের সমারোহ দ্বারে হ'ল উপস্থিত। চারিদিকেই সাজ্ সাজ্ রব—কারুর এতটুকু ফুরসৎ নেই একমাত্র যুদ্ধের কথা কওয়া ছাড়া। ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে, জয়ের চিন্তায় মসগুল হয়ে বীগল্-এর তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চল্‌ল—ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, অভিনেতা অভিনেত্রী কেউই বাদ গেল না—কাজেই মোরিস্‌কেও

তার সঙ্গে যোগ দিতে হ'ল। গানের কিন্তু তখনও শেষ নেই—সেখানেও ট্রেঞ্চের ভেতর বসে দিনের পর দিন 'এক মন্ রাম' (এক শ্রেণীর মদ) আর দু'-চার টুকরা 'ডগ্ বিস্কুট' খেয়েও মোরিসের সেই আমুদে কথা আর গানের ফোয়ারা স্বাভাবিকভাবেই বয়ে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ ভীষণভাবে একদিন দলে বাঘ পড়্ল—জার্ম্মানীরা করলে এদের আক্রমণ—মোরিস্‌রা হলেন বন্দী—এলেন একেবারে জার্ম্মানীতে। নিজে মোরিস্ লোকটা এমন যে, যেখানেই থাকুক্ সেখানেই যেন সবাই তার বেশ একটা আপনার হয়ে যায়। কয়েদীদের মধ্যে ছিল নানান জাতের লোক। মোরিস্ অল্পদিনেই তাদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলে। এদের মধ্যে মোরিস্ একজন ইংরাজ-বন্ধুর নিকট ইংরাজী শেখ্‌বার আবার ব্যবস্থা করে নিলে। এইভাবে বন্দী-জীবনের দিনগুলি এক রকম মোরিসের মন্দ কাট্‌ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ গেল থেমে। মোরিস্ আবার পরম আনন্দে 'ম্যাডিলন্ ডি ল্যা ভিক্‌টোয়রি' গাইতে গাইতে দেশে ফির্‌ল। দশে তাকে ফুলের মালা দিয়ে ঘরে তুলে আন্‌লে। 'ফলি বার্জেয়ার'-এর আলোর লেখায় আবার মোরিসের নাম টাঙান হ'ল—পুস্তিকা-পত্রিকায় মোরিসের ছোটবড় বিভিন্ন ভঙ্গীর বিভিন্ন ছবি বেরুতে লাগ্‌ল সবাই বলে মোরিসের নাম—সবাই কয় তার কথা। দেশ-বিদেশের লোক প্যারিসে মাদেমুসেল মিসেন্ গুয়েত ও মোরিসের প্লে দেখ্‌বার জন্যে জড় হ'তে লাগ্‌ল এবং অভিনয় দেখে প্রাণভরা উৎসাহ আনন্দ নিয়ে তারিফ্ কর্‌তে কর্‌তে যে যার দেশে ফিরে গেল।

এইখানটায় এসে মোরিস্ একটী মেয়েকে ভালবেসে ফেল্‌লেন তিনি হচ্ছেন মোরিসের নূতন 'রিভিউ'র নূতন 'পার্টনার।' ছোট্ট টুকটুকে মেয়েটা—সারাদেহের মধ্যে স্বভাবতই যেন তার সুর ও ছন্দের দোলা লীলা করে যাচ্ছে—নাচের জন্যেই যেন সে নাচ্‌তে এসেছে, পয়সার জন্যে নয়। সারা পৃথিবীটা মোরিসের চোখে রঙিন্ হ'য়ে উঠ্‌ল—মোরিস্ ইভোন্ ভ্যাল্‌কে চাইলেন একান্ত আপ্‌নার করে, ইভোন্‌ও তাতে সায় দিলে—তারপর ঠিক হ'য়ে গেল চুপে চুপে গ্রামের গীর্জ্জেতেই তারা বে'টা সেরে ফেল্‌বে। কিন্তু তা' হ'ল না—বে'র দিন দেখা গেল—ফোটগ্রাফার, কাগজওয়ালা, সিনেমার লোক প্রভৃতি বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, অনিমন্ত্রিত হাজার হাজার লোক গ্রামের গীর্জ্জাটি ছেয়ে ফেলেছে—আনন্দের আতিশয্যে মোরিসের বৃদ্ধা মায়ের চোখে একফোঁটা জল গড়িয়ে এল—

র‍্যালফ্ ব্যালামি, অ্যানা ষ্টেন ও গ্রে কুপার

তিনি পুত্রবধূ ইভোন্ ভ্যাল্‌কে ও মোরিস্‌কে বুকে জড়িয়ে ঘরে তুল্‌লেন।

সেই মাসেই প্যারিসের থিয়েটার-জগতে মোরিস্ শিভালিয়ে হলেন 'ষ্টার।' তারপর এল দেশ-বিদেশের ডাক্। ১৯২৭ সালে বিরাট উৎসবের 'মধ্যে ষ্টেজ সেটিং'য়ে প্রায় ত্রিশ হাজার পাউণ্ড খরচ করে লণ্ডনে মোরিসের 'হোয়াইট্ বার্ড' অভিনীত হ'ল—আজও সেই 'হোয়াইট্ বার্ডে'র 'ভ্যালেন্‌তিনো' গান শ্রদ্ধার সঙ্গে ইংলণ্ডের যুবক-যুবতীদের মুখে গীত হ'য়ে আস্‌ছে। ডগ্‌লাস ও মেরী পিক্‌ফোর্ডের সঙ্গে এইখানে হ'ল মোরিসের প্রথম দেখা। 'লভ্ এ্যাট্ ফার্ষ্ট সাইট্'-এর মত ডগ্-মেরীর সঙ্গে মোরিসের বন্ধুত্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ জমে গেল। তারপর উঠ্‌ল 'ফিল্মে'র কথা। মোরিস্ বল্‌লে—'ফিল্মে'র কথা অবশ্য যদি বলেন, ওর মধ্যে কেমন আমি হাসতে গাইতে কথা কইতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠি—বাকী দেহটা আমার ঐ মূক 'ফিল্ম' অভিনয় করতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। পিক্‌ফোর্ড বল্‌লেন—সে দু'-চার-বার অভ্যাসের ফলে সড়গড় হ'য়ে যাবে, আপনি আমাদের সঙ্গে হলিউডে চলুন— আর এখন যদি একান্ত না যান, তা' হ'লে পরে যাবার জন্যে এখন থেকে আমরা উভয়ে আপনাকে নিমন্ত্রণ করে রাখ্‌লুম। লজ্জায় সম্ভ্রমে মোরিস্, পিক্‌ফোর্ডের নিমন্ত্রণকে বরণ করে নিয়ে বিনীতভাবে বল্‌লে—আমি প্যারিসে ভালই আছি। কিন্তু জগত মোরিস্‌কে ভাল থাকতে দিলে না—ছায়ার মধ্যে মূক যে ভাষা কোন্ নিভৃত কোণে বাসা বেঁধে বসেছিল, বিজ্ঞান জগতের যাদুকরদের অনুগ্রহে সে একদিন মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল। ছায়ার মায়া-পুরী হলিউডের সিনেমা-জগতে মোরিসের যাত্রা হ'ল সুরু।

দুর্ভাবনার বোঝা সারা যাত্রার পথে মনটাকে তার অবশ করে দিলে। এমেরিকার কত তাজ্জব শোনা কথাই আজ আবার ঘুরে-ফিরে তার মনকে ঘিরে দাঁড়াতে লাগ্‌ল। একবার মনে হয়, হয় ত 'ফিল্ম'-জগতে গিয়ে আমি ভাল করছি না—যদি সুনাম আমার না হয়, তা' হ'লে হয় ত দু'কূলই যাবে—এর চেয়ে চির পুরাতন প্যারিসই আমার ছিল ভাল। সঙ্গের সাথী মিঃ জেসি ল্যাস্কি যিনি এমেরিকায় নিয়ে যাবার এবং সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থা-পত্রের জন্য মোরিসের সহায়ক হ'য়ে চলেছেন, তিনি অভয় দিলেন। পত্নী ইভোন্ যাত্রার পথে স্বামীর এই সব মিথ্যা দুশ্চিন্তার কথা ভেবে একটু মুচ্‌কে হাসলেন মাত্র। পথেই মোরিসের হাতে ডগ্-মেরীর টেলিগ্রাম এসে পৌছল—উৎসাহ দিয়ে, পৌছনামাত্র দেখা করার বিনীত অনুরোধ জানান হয়েছে।

চঞ্চল সহরের সচঞ্চল পথিকেরা অতিথিকে সমাদরেই বরণ করে নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হ'ল না—মোরিস্ হলিউডে এসে পৌছল। হুজুগে দেশ, একটা নূতন কিছু পেলেই হয়—বন্যার মত চিঠির স্রোত তাঁর কাছে এসে পৌছতে লাগ্‌ল—কেউ চায় হাতের লেখা, কেউ চায় ছবি, কেউ বলে খাওয়াবে কবে, কেউ বলে গান শোনাতে—আবার কেউ বলে তোমার দেশ থেকে আমাদের জন্যে আন্‌লে কি? মোরিস্ ত হয়ে উঠ্‌ল অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। তারপর আসে লোক ফটো তুল্‌তে—'অটোগ্রাফ্' নিতে। কতকটা এইসব কাজ অবশ্য ল্যাস্কিই সারলেন—তারপর কাগজের মারফত জন-সাধারণকে ধন্যবাদ দিয়ে জানান হ'ল যে, এখন কিছুদিন ধরে 'ফিল্মে'র কাজে মোরিস্‌কে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকতে হবে; কাজেই দয়া করে যদি তার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণ কিছুদিনের জন্যে তাকে ব্যতিব্যস্ত না করেন, তা' হ'লে তার যথেষ্ট উপকার করা হ'বে।

'ষ্টুডিয়ো'র কাজ আরম্ভ হ'ল। রাতের পর দিন, দিনের পর রাত, এই দিন রাতকে এক করে পরিশ্রম চল্‌তে লাগ্‌ল। 'প্যারামাউন্ট' নিলেন ভার, তারই জীবনের ইতিবৃত্ত তোলা হ'ল 'ইনোসেণ্ট অফ্ প্যারিস্।' যেদিন এই ছবির প্রথম 'ট্রেড্ শো' হ'ল, সেদিন হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে আরম্ভ করে কেউ বাদ গেল না এই ছবি দেখ্‌বার জন্যে—সকলেই আগ্রহের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হ'য়ে ছবি দেখ্‌তে গেল—গেল না কেবল একটা লোক, তিনি হচ্ছেন, আমাদের বর্ত্তমান 'ফিল্ম' জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেতনভোগী আনন্দের প্রস্রবণ মোরিস্ শিভালিয়ে।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

চিত্র-কথা

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

শিশু তারকা শার্লি টেম্পল।

চলচ্চিত্রে অভিনয় করে যে সকল শিশু অভিনেতা বা অভিনেত্রী প্রসিদ্ধ লাভ করেচে, তার মধ্যে 'ফক্স ফিল্ম কোম্পানী'র শিশু অভিনেত্রী শার্লি টেম্পল অন্যতম। 'ইউনিভার্স্যাল' কোম্পানীও বেবী লী রয় বলে একটী উপযুক্ত শিশু পেয়েচেন বটে, কিন্তু শার্লির অভিনয়ের তুলনায় তার অভিনয় অনেকটা নিম্নস্তরের বলেই মনে হয়। অবশ্য

JAMES DUNN and SHIRLEY TEMPLE are once more buddies in Shirley's newest Fox Film starring picture, "Bright Eyes," dramatic story of an ace's orphaned daughter and her adopted dad. "Bright Eyes" is Shirley's biggest vehicle to date.

শার্লি, লী রয়-এর চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো। 'ফক্স ফিল্ম কোম্পানী' ঐশীগুণ-সম্পন্না এই ক্ষুদ্র অভিনেত্রীটীকে পেয়ে যে লাভবান হয়েচেন, তাতে কারোর কিছুমাত্র সন্দেহ করবার কারণ নেই। শার্লির বয়স এখন মাত্র পাঁচ বৎসর কয়েক মাস, কিন্তু ইতিমধ্যে 'ফক্স কোম্পানী'র যে কোন ছবিতে সে অবতীর্ণ হয়েচে, তাতেই তার অসাধারণ অভিনয়দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের চিত্তজয় করেচে। 'বেবী টেক্ এ বাউ' 'ষ্ট্যাণ্ড আপ্ এণ্ড চীয়াস', 'ব্রাইট্ আইজ্' প্রভৃতি পুস্তকে তার সরল এবং স্বাভাবিক অভিনয় চিত্র-জগতে একটা নূতন ধারার সৃষ্টি করেচে। শেষোক্ত বইখানিতে জেমস্ ডানের সহিত তার অভিনয় এত করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী যে, ও সম্বন্ধে দু'-এককথা না লেখার লোভ সংবরণ করা গেল না। ছবিখানি দেখ্‌তে দেখতে শার্লির বয়সের কথা ভুলে যেতে হয়। তার কথাবলার ভঙ্গী, ভাব এবং চালচলন এত উচ্চঅঙ্গের যে, তখন ভ্রম হয়, শার্লি বালিকা না একটী যশস্বী অভিনেত্রী—এই বইখানির গল্পাংশ-ও যেমন করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী, শার্লির অভিনয়-ও ততোধিক সুন্দর। সদ্য মাতৃবিয়োগ-বিধুরা শার্লির সজল মুখখানি দর্শকের মনে যেমন একটা গভীর দাগ এঁকে দেয়, পরমুহূর্ত্তে পিতৃ-আহ্বানে সজল চোখে হাসির ছটা গম্ভীর এক মর্ম্মবেদনার সৃষ্টি করে। ছবিখানি স্বচক্ষে না দেখ্‌লে এ জিনিষটা ঠিক্ অনুভব করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ছবিখানি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আমারা পরিচালককে-ও ধন্যবাদ না দিয়ে থাকৃতে পারি না। শার্লির শিশু প্রতিভা যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা লাভ করছে তা' তার অভিনয়ের ধারা দেখলেই বেশ বোঝা যায়। ভাল পরিচালকের হাতে মানুষ হ'লে শার্লি যে অদূর ভবিষ্যতে অভিনেত্রীদের শীর্ষস্থানীয়া হবে, এমন আশা করা দুরাশা নয়। শোনা যাচ্চে শার্লির আধুনিকতম ছবি 'লীটল্ কর্ণেল' শীঘ্রই কোলকাতায় আসচে এবং যে কোন প্রসিদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে দেখান হবে। যতটুকু খবর পাওয়া গেচে, শার্লির অভিনয় না কি এই পুস্তকে সবগুলিকে ছাড়িয়ে গেচে। এই বইখানিতে শার্লি, লায়োনেল ব্যারিমুরের সঙ্গে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেচে। বইখানি না দেখা পর্য্যন্ত এর বেশী বলবার সামর্থ্য আমাদের নেই।

শার্লির ফিল্মে যোগদান করার ব্যাপারটাই যেন

অনেকটা ভগবানের প্রেরণা চালিত বলে মনে হয়। শোনা যায় 'ফক্স কোম্পানী'র একজন ডিরেক্টার একদিন একটা শিশু-চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে একটী উপযুক্ত শিশুর সন্ধানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বিফলমনোরথ হয়ে ষ্টুডিওর দিকে ফিরে আসতে থাকেন। হঠাৎ শালিদের বাড়ীর কাছে এসে পরিচালক-মশায়কে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। তার কারণ, শালি কার বা কাদের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দেবে বলে এমন একটী মিষ্টি ভঙ্গীতে চোরের মতো বাইরে পালিয়ে এসে দাঁড়াল, যাতে পরিচালক মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। শালির পিতা-মাতার সঙ্গে শালি সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাঁর ধারণা আরো বদ্ধমূল হ'ল এবং তখনি তিনি নিজের হাতে শালির ভার নেবার জন্য মিনতি করলেন।

শালি যখন মাত্র চার বছরের, তখন থেকে সে তার নাম লিখ্‌তে শিখেচে এবং নামের অক্ষরগুলো আর কোথাও দেখ্‌লেও চিন্‌তে পারে। এটা সাধারণ মেধার কথা নয়। আরো একটা মজার কথা এই যে, সে যখন থেকে হাঁটতে শিখেচে, তখন থেকেই তাকে নাচগান শেখান আরম্ভ হয়েচে। মুখ দিয়ে ভালরকম কথা বের হয় না বলে গানের চেয়ে নাচের দিকেই তার ঝোঁক বেশী।

কোন ছবি স্যুটিং হবার সময় শালিকে নিয়ে পরিচালক-মশায়কে বিশেষ বেগ পেতে হয়। কারণ সমস্ত বইখানিতে আগাগোড়া অভিনয় করবার জন্যে শালির শিশু-হৃদয় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কাজেই তার অভিনয়াংশ শেষ হলেই কর্ত্তৃপক্ষগণ তাকে বাড়ী না পাঠিয়ে পারেন না।

ডগলাস (জুনিয়ার) ও কলিন ব্রোবেন

শালি উপস্থিত সাপ্তাহিক তিনশ' পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার সাতশ' পঞ্চাশ টাকা 'ফক্স কোম্পানী'র কাছ থেকে পায়।

শ্রীমতী প্রতিভা শীল

স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

ডাঃ এম, জি, বসাক, এম-বি

বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিপত্য ও মৃত্যুর হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বিভিন্ন রোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, একথা অস্বীকার করিবার নহে। প্রতি বৎসর প্রায় দশ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ এই ম্যালেরিয়া জর। এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য, ধনসম্পদ, আমোদপ্রমোদ, আশাভরসা, সুখশান্তি ও স্বাস্থ্যবল সকলই বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে, প্রতি সহরে বিরাজমান ছিল। কিন্তু আজ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে দিনে দিনে পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য ক্রমশঃ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এ ধ্বংসের পথ রোধ না করিলে বাঙ্গালী জাতির আর উন্নতি নাই। ম্যালেরিয়া আজ যে কেবল এই প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। বরং ইহা বিহার, উড়িয়্যা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবে পল্লীর কুটীরগুলি শূন্যপ্রায়, পল্লীর হং বৃহৎ অট্টালিকা এখন পরিত্যক্ত। দেশের স্বাস্থ্যের আবহাওয়া এখন এত দূষিত যে, পুনরায় শীঘ্র ইহাকে বিশুদ্ধ না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার আর উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া এদেশে এখন সাধারণভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে। এমন কি নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত ইহার সহিত সুপরিচিত। ধনী প্রাসাদের মধ্যে ইহার আক্রমণ হইতে নিস্তার পান্ না। এনোফিলিস্ মশক কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্ত শোষণ করিয়া ঐ বিষ যদি কোন সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তখন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ঐ রোগ প্রকাশ পায়। অধিকাংশস্থলে দেখা যায় যে, যে স্থলে একব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে, সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশজন। এই কালব্যাধিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি যে কত নষ্ট হইতেছে তাহার পরিমাণ হয় না। শীর্ণ দেহে, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত উদরে, পাংশুমুখে, কতশত উপার্জ্জনক্ষম যুবক গৃহের কোণে নিরুপায় হইয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া নবীনা মাতার স্তন্যদুগ্ধও শুষ্ক হইয়া যায়; ক্ষুধাতুর শিশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া বিষ রক্তস্থ লাল কণিকাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বা ক্রমে তাহাদের ধ্বংসসাধন করিয়া রক্তাল্পতা উপসর্গ আনয়ন করে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ম্যালেরিয়া রোগভোগের পর ক্ষীণদেহ রক্তের অভাব হেতু পাংশুবর্ণ হইয়া যায়। খাদ্যে অরুচি জন্মে, পেট জোড়া পিলে হয়, ও দেহ কর্ম্মশক্তি হীন হইয়া পড়ে। এখন এ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। বহু বৎসর গবেষণার পর ইহা বিশেষজ্ঞগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সুইজারল্যাণ্ডের আবিষ্কৃত রচিটোন ম্যালেরিয়া রোগীর কর্ম্মশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ। ইহার নিয়মিত ব্যবহার ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করে। রচিটোনের মূল্যবান উপাদানগুলি স্বভাবজাত উদ্ভিদসংমিশ্রণ বলিয়া অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার গুণ ও কার্য্যকারিতা অনেক বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া রোগভোগের পর রচিটোন ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া বীজাণুদের ধ্বংসসাধন করিয়া, শরীরে নূতন রক্ত কণিকা সৃষ্টি করিয়া রক্তকে সতেজ করে। ইহা সেবনে দুর্ব্বলতা দ্রুত দূর হইয়া দেহে যথেষ্ট নববল ও জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়; উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

এম, জি, বসাক

হেলেন ম্যাক্

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস কলিকাতা

একাদশ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪২ | চতুর্থ সংখ্যা

শতকরা নিরানব্বুই

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

বেলা প্রায় দশটা। ডাক্তারখানায় বসে' বসে' ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম—রোগ-সংক্রান্ত কিছু নয়—সাহিত্য-সংক্রান্তই। চম্‌কে ওঠার এতে কোন কারণ নেই। ডাক্তারের সাহিত্য-চর্চ্চাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ, রোগীর দেহের ছন্দ-পতন যিনি সংশোধন করেন—তিনি সত্যিকারের কবি বা সাহিত্যিক না হয়েই পারেন না।

কি একটা যোগ উপলক্ষে বড় রাস্তা দিয়ে দলে দলে স্নানার্থিনী চলেছে গঙ্গা অভিমুখে। আষাঢ় মাস। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে আছে; থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। তন্ময় হ'য়ে আলোচনা কচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ কানে এল—ডাক্তারবাবু! ও গো ডাক্তারবাবু!

ফুটপাতের দিকে চেয়ে দেখলাম—একটি মেয়ে। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ; রোগা লিক্‌লিকে দেহ। ডান হাতে দড়ি দিয়ে মুখবাঁধা একটি ছোট ঘটি, তা'তে বোধ করি গঙ্গাজল—আর বাঁ কোলে একটি ছেলে নিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকছে। পরণে অত্যন্ত ময়লা একখানি নীলাম্বরী, ছেলে কোলে থাকায় বুকের বাঁদিকের শ্লীলতা রক্ষার যথেষ্ট ত্রুটি ঘটেছে এবং সমস্ত মুখময় একটি অতিরিক্ত রকম রুক্ষতা। ছেলেটির মধ্যেও মানবীয় সুস্থতার কোন লক্ষণই নেই। চোখ দু'টি আধবোজা করে' মায়ের কোলে নেতিয়ে পড়ে' আছে—এই এতটুকু তার দেহ।

ডাক্তারবাবু ভিক্ষুক মনে করে' তার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—কেন?

—আমার খোকাকে একবারটি দেখো না, ওর যে বড্ড অসুখ করেছে।

—কি অসুখ? ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন।

—কি অসুখ তা' আমি কী করে' বলবো। জ্বর হয়েছে, মধ্যে মধ্যে কেঁদে উঠছে, আর পাতলা জলের মত—

—হুঁ। কি খেতে দিচ্ছ ?

—ভাত।

—ভাত দিও না, এ্যারারুট দাও। ভাত ওর সহ্য হবে না।

—এ্যারারুট ?···আচ্ছা। কিন্তু তুমি একটু ওষুধ দাও না।

—ওষুধ! ডাক্তারবাবু একটু থেমে বল্লেন—তা' ওষুধ নেবে, পয়সা এনেছো ?

—পয়সা? মেয়েটি একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে চাইলো। তারপর বল্লো—না তো!

—তবে ?

—পয়সা যে নেই আমার। আচ্ছা···তবে থাক্··· বড্ড কাঁদছে কি না···আচ্ছা থাক্ তবে।

মনটার মধ্যে কিরকম করে' উঠলো। ডাক্তারবাবুকে বল্লাম—ডাক্তারবাবু! এ মেয়েটি এখনও ভাল করে' ভিক্ষে করতে শেখে নি। আপনি ছেলেটিকে ওষুধ দিন। দাম যা' লাগে আমি দিচ্ছি।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপর বল্লেন—মশায়! দয়া করতে আমরাও জানি। কিন্তু এরকম ক'টা লোকের ওষুধের দাম আপনি দেবেন শুনি? শুনছো, ওগো ও মেয়েটি! তুমি ও-ঘরে যাও, কম্পাউণ্ডারবাবু তোমাকে ওষুধ দিয়ে দেবেন। এই বলে' কম্পাউণ্ডারকে ডেকে তিনি একটা প্রেসক্রিপ্‌সন্ লিখে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি ফিরে যাবার সময় একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে বল্লো—আচ্ছা, এ্যারারুটের বদলে আর কিছু দেওয়া যায় না—না ?

—হ্যাঁ, দেওয়া যায়, কিন্তু তুমি দিও না। এই সিকিটা নাও, দোকান থেকে এ্যারারুট কিনে নিয়ে যাও—বুঝ্‌লে ?

মেয়েটি বল্লো—আচ্ছা। বলে' অত্যন্ত সন্তর্পণে সিকিটা আঁচলে বাঁধলো, তারপর গঙ্গাজলের ঘটিটা আবার ঠিক্ তেমনি করে' ডানহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ফুটপাথের ওপর নেমে পড়লো।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন—'ব্যাসিল্যারি ডিসেন্‌ট্রি!' দেখ্‌লাম তাঁর দুই চোখ একটি নিবিড় বেদনায় ছল্‌ছল্ করছে।

কী-ই বা এমন ঘটলো, কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটি গভীর ছাপ এঁকে রেখে গেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, ঐ যে মেয়েটি, ঘটিতে গঙ্গাজল আর বাঁ কোলে ছেলে নিয়ে ডাক্তারের কাছে অসঙ্কোচে ওষুধের দাবী করলে, অত্যন্ত সরল ভাষায় স্বীকার করলে যে, সে পয়সা আনে নি, কারণ পয়সা তার নেই—ও কে? ও কি কোন গৃহস্থের বউ, ও কি কোন···? কী জানি!

ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে' মন কেবলই কল্পনার জাল বুন্‌তে থাকে। অতীতের অতল অন্ধকারে মেয়েটির পরিচয় লুকোনো আছে, তাকে খুঁজে বার করতে পারলে যেন আমি খানিকটা শান্তি পাব। নইলে যেন ওর ওই দারিদ্র্যের দাবীর যথেষ্ট মর্য্যাদা দেওয়া হবে না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম ওরই কথা। কেবলই কানে বাজতে লাগলো—"বড্ড কাঁদছে কি না! তবে থাক্—আচ্ছা তবে থাক্।"

'ব্যাসিল্যারি ডিসেন্‌ট্রি' ডাক্তারবাবু বলেছেন। ছেলেটা বোধ হয় আর বাঁচবে না। তিন-চারবৎসর ধরে' খাইয়ে-পরিয়ে, স্নেহ-মমতা দিয়ে তিলে তিলে বড় করে' তুলে—! সমস্ত জগৎ জুড়ে যেন কেবল প্রবঞ্চনারই আদান-প্রদান চলেছে। ছেলে করছে মাকে, মা করছে বাপকে, আর বাপ করছে নিজেকে। কিন্তু নিজের ছেলেকে কোলে করে' তার অসুখের এমন অকুণ্ঠিত দীনতায় চিকিৎসার দাবীতো কোন ভিক্ষুকে করতে পারে না। না, ও ভিক্ষুক নয়।

ওই দারিদ্র্যভারাবনতা মেয়েটিকে কেন্দ্র করে' আমার আধতন্দ্রার মাঝে একটি ঘটনা-সম্ভাবনার লীলা চল্‌তে থাকে......

কুসুমপুরের জমিদার হরিশঙ্করবাবু লোক যে খুব খারাপ ছিলেন তা' নয়, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন ভয়ানক কানপাতলা মানুষ। কোন বিষয়েই তাঁর মতের স্থিরতা ছিল না। যখন যে কাজটা করতেন, তখন মনে হ'ত এর আর বুঝি নড়চড় হবে না, কিন্তু মাসখানেক পরে দেখা যেত যে, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী মতটাকে তিনি পরবর্ত্তী নূতন আর একটা মত দিয়ে খণ্ডন করছেন। তাই পনেরো বছরের ছেলে নীলাম্বরকে কোলে ফেলে দিয়ে তাঁর প্রথমা পত্নী যখন পরলোক গমন করলেন, তার মাস তিনেকের মধ্যে তিনি কেবল সকলকে এই কথাই বলে' বেড়াতে লাগ্‌লেন যে—বয়স হ'ল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করবার ইচ্ছা অনেকদিন মনের মধ্যে জাগ্‌লেও শুধু নীলাম্বরের মার জন্যই এতদিন হয়ে উঠে নি। এইবার নীলুর একটা বিয়ে দিয়ে—ইত্যাদি।

বিয়ে তিনি দিলেনও। পরিষ্কার ফুট্‌ফুটে বউ, বয়স বছর এগারো কি বারো। নববধূর লজ্জা এখনও আয়ত্ত করতে পারে নি, কথায় কথায় অকারণে খিল্‌খিল্ করে' হেসে ওঠা তার অভ্যাস। একদিন সটান গিয়ে শ্বশুরের কাছে নালিশ করে' এল—নীলাম্বর তার কান মলে দিয়েছে বলে। হরিশঙ্কর এই বালক-দম্পতীর হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে নিজের জীবনকে নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ করে' তোলবার চেষ্টা করতেন। গৃহিণীহীন সংসার—বালিকার অনভিজ্ঞ হাতের কর্ত্তৃত্বের স্পর্শে অসম ছন্দে চল্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু চল্‌লো না বেশীদিন। পৃথিবীতে কন্যাদায়গ্রস্তের সংখ্যা এত বেশী যে, তারা প্রত্যেকদিন হরিশঙ্করবাবুর চোখে পড়তে লাগ্‌লো। তাদের নানারকম পরামর্শ—নানারকম প্রলোভন—নিরীহ হরিশঙ্করের রাত্রের নিদ্রা-হরণ করবার উপক্রম করলো। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন কানপাতলা প্রকৃতির মানুষ। প্রথম স্ত্রী বিয়োগের মাস আষ্টেক পরেই দেখা গেল তিনি একটি সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতীর হাত ধরে', মাল্যবেষ্টিত অবস্থায় পাল্কী থেকে নাম্‌লেন। একমাত্র নীলাম্বর আর তার স্ত্রী সুরমা ছাড়া আর কেউ বিস্মিত হ'ল না।

নূতন গিন্নীর নাম—কল্যাণী। এই জমিদার-পরিবারে তিনি কী কল্যাণ বহন করে' আন্‌লেন জানি না, কিন্তু বহন করে' আনলেন তাঁর বিধবা মাকে—আর বছর পনেরো বয়সের একটি ছোট ভাইকে। হরিশঙ্কর তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে' নিজের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অধি-কারবোধ নিয়ে বাধলো গণ্ডগোল সংসারে। অপমানিতা সুরমা স্বামীর কাছে নালিশ জানালো—নীলাম্বর হেসে উড়িয়ে দিলে।

বছর দুই পরে কল্যাণীর একটি ছেলে হ'ল। হরিশঙ্করের দ্বিতীয় পক্ষের গর্ভে এলো তার জমিদারীর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী। পাড়ার সকলেই আশঙ্কিত চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লো একটা চরম বিপদের। হ'লও তাই। কিছুদিন পরে হরিশঙ্কর একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে দেখ্‌লেন—কল্যাণী মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছেন—কপাল কেটে ঝর্‌ঝর্ করে' রক্ত বেয়ে পড়ছে। খবর নিয়ে জানা গেল—শাশুড়ী-বউ একসঙ্গে পুকুর-ঘাটে গা ধুতে গিয়েছিলেন; সামান্য কি একটা কথা নিয়ে বচসা সুরু হয়—তারপরই সুরমা রেগে কল্যাণীকে কলসী দিয়ে—ইত্যাদি। ক্রুদ্ধ হরিশঙ্কর তৎক্ষণাৎ নীলাম্বরকে ডেকে বল্‌লেন—বাড়ী থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

নীলাম্বর ইতঃপূর্ব্বেই স্ত্রীর কাছে সমস্ত ব্যপার শুনে-ছিল, অভিমান করে' বল্‌লো—যাচ্ছি।

স্বামীর হাত ধরে' বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার সময় শ্বশুরকে প্রণাম করতে এসে সুরমা কেঁদে বল্‌লো—বাবা, উনি মিছে কথা কইছেন। আমি ওঁকে মারি নি, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে—

—হুঁ, তাই বই কি। লজ্জাও করে না শ্বশুরের কাছে জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাগুলো বল্‌তে! বালিশ থেকে বহু-কষ্টে মাথা তুলে কল্যাণী জবাব দিলেন।

—কোন কথা শুন্‌তে চাই নে। যাও, এক্ষুনি চলে যাও। হরিশঙ্কর গর্জ্জন করে' উঠলেন।

নীলাম্বর ছিলো উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। গান গেয়ে আর তবলা বাজিয়ে তার দিন কাটতো। পৈতৃক স্বচ্ছলতার আড়ালে তার এই স্বভাব খাদ্য পেয়ে দিন দিন

স্ফীত হ'য়ে উঠছিলো। এইবার সময় এলো নিজের সুবিপুল অসহায়তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার।

কোলকাতার উপকণ্ঠে টালায় এসে সুরমা স্বামীকে নিয়ে ঘর বাঁধলো। অবস্থাপন্ন ঘরের বউ সে—প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধায় পড়তে লাগ্‌লো। অস্বচ্ছলতার অনভ্যস্ত পথে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই হোঁচট খায় আবার উঠে দাঁড়ায়। হাসি দিয়ে, প্রেম দিয়ে, আর তারুণ্য দিয়ে ভরিয়ে তোলে দারিদ্র্যের বিশ্বগ্রাসী গহ্বর।

অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর কাশীপুরের দিকে কি একটা কলে নীলম্বর চাকরী পেলো—মাইনে ত্রিশ টাকা। খেয়ে-দেয়ে বেরোতে হয় দশটায়, আর বাড়ী ফেরে রাত্রি আটটায়। ক্রমে ক্রমে এই জীবন-যাত্রা সয়ে এলো সুরমার প্রত্যেক দিনের কাজে আর চিন্তায়, অবসরে আর দাম্পত্য-আলাপে। গেল বছরখানেক। অনাগত সন্তানের আগমনীর আভাস পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো সুরমার দেহে ও মনে। ঠিক্ এই সময়টায় নীলাম্বরের পাঁচ টাকা মাইনে বাড়লো। সেইদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে নীলাম্বর সুরমাকে বল্‌লো—জানো, আজ থেকে আমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়লো।

—সত্যি! সুরমা হাসিমুখে প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ, কিন্তু কার জন্যে এসব হচ্ছে জানো তো?

—ধ্যাৎ! সুরমা লাল হয়ে স্বামীকে শাসন করলো।

এরপরে সুদীর্ঘ চার বৎসরের ব্যবধান। নীলাম্বর-সুরমার জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটায় সে ইতিহাস বলতে চাই নে। ইতিমধ্যে নীলাম্বরের মাইনে হয়েছে চল্লিশ আর ছেলেটীর বয়স চার। কেরানী-জীবনের দৈন্যকে হাসিমুখে বরণ করে' নিতে পেরেছে সুরমা—তাই অল্প টাকায় স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পাওয়া যাবে তার ঘরে গেলেই।

সেদিন সন্ধ্যায় সুরমা খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখ্‌ছিল। কোলকাতার বাইরে খোলার ঘর, সন্ধ্যার পরই মশার ডাক সুরু হয়েছে। খোকার জন্য একটা মশারী না কিন্‌লেই আর চল্‌ছে না। আজকে বাড়ীতে এলে নিশ্চয়ই কথাটা বলতে হবে।…আরও বছর দুই পরে কোলকাতার ভেতরে গিয়ে একখানা ছোট্ট একতলা বাড়ী ভাড়া করবে তারা। একখানা শোবার ঘর, একটি ভাঁড়ার, রান্নাঘর, কল, পায়খানা, বেশ হবে…।

অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে। সেই কুসুমপুরের তেতলার ছাদে রাত্রে শীতলপাটি বিছিয়ে তারাভরা অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে যখন সে এইসব কথা ভাব্‌তো। সারাদিনের গুমোট ভেঙে ঝির্‌ঝির্ করে বইত দক্ষিণে হাওয়া, বাগান থেকে কাঠমল্লিকার গন্ধ আস্‌তো ভেসে, বাড়ীর বারান্দা থেকে খাঁচায় বন্ধ কোকিলটা বারেবারেই উঠতো ডেকে...স্বামীর হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে আজ তার মুখে উঠছে প্রত্যেক গ্রাস অন্ন, অথচ সেখানে—। কিন্তু সত্যিইতো সে আর শ্বাশুড়ীকে ধাক্কা দেয় নি, নিজেই সিঁড়ির ওপর থেকে আছাড় খেয়ে কেন যে মিছিমিছি বাবার কাছে নালিশ করলেন তা' তিনি নিজেই জানেন। ওঁর মা কিন্তু মোটেই লোক ভাল নয়...। সুরমার বুক ঠেলে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। ভুলের কাঁটা-বিছান পথ দিয়ে যাদের স্বাচ্ছন্দ্যের সুরু, তারা সুখী হোক্—সুখী হোক্ তারা। অন্যের ঐশ্বর্য্যে সে ঈর্ষা করবে না।

ছড়ছড় করে' একখানা ঘোড়ার গাড়ী এসে বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ালো। ও কি! বিদ্যুৎবেগে সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, সত্যিই তাই, নীলাম্বরই বটে। চার-পাঁচজন লোকে তাকে ধরাধরি করে' নিয়ে আসছে। কাজ কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে পড়ে যায়, তার-পরই এসেছে প্রবল জ্বর।

সুরমা অসহায়ভাবে একবার চারদিক্ চেয়ে একজনকে বল্‌লো—ডাক্তার!

একজন ডাক্তার আন্‌তে বেরিয়ে গেল।

একদিন দু'দিন কর্‌তে কর্‌তে ছ'মাস কেটে গেল। একটু একটু করে' নীলাম্বর আরোগ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে।

সুরমাকে দেখে এখন আর চেনা যায় না। গায়ে তার একখানিও গয়না নেই, মুখে নেই শ্রী, কঙ্কালসার দেহে দারিদ্র্যের স্বাক্ষর। মৃত্যু-দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে' করে' ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে সুরমা—আর সে পারে না। এই ছ'মাস যে কি ক'রে' স্বামীর ওষুধ-পত্র আর সংসার চালিয়েছে তা' এক ভগবানই জানেন।

নীলাম্বর যেন কী-রকম খিট্‌খিটে মেজাজের হ'য়ে গেছে। একটুতেই রেগে রেগে ওঠে, কোন কিছু বল্‌তে যাবার উপায় নেই—চীৎকার করে' গালাগালি দিয়ে পাড়া মাথায় করবে। ছেলেটার শরীর আবার ভাল নেই। জ্বর, পেটের অসুখ; তা' ছাড়া, তার নিজেরও রোজ বিকেলে একটু একটু জ্বর হচ্ছে। ডাক্তার দেখাবার আর তার সামর্থ্য নেই। ডাক্তার চুলোয় যাক—কাল কি খাবে তারও ঠিক নেই। নাঃ, আর সে পারে না! সত্যই পারে না!

—শুনছো? নীলাম্বর ডাক্‌লো।

—কী? সুরমা স্বামীর দিকে চেয়ে বল্‌লো।

—আমার বেদানা কই? বেলা আটটা বাজ্‌তে চল্‌লো—কী ব্যাপার?

—আজকে বেদানা আনাতে পারি নি—লক্ষীটি, রাগ কোরো না।

—কেন আনাতে পার নি হারামজাদী? নীলাম্বর দাওয়া থেকে খিচিয়ে উঠলো।

—কী—কী বল্‌লে?

—হারামজাদী বল্‌লাম, কেন অপরাধ হয়েছে কিছু?

—ছি ছি, তুমি এত নীচে নেমে গেছো!—মনুষ্যত্বের কিছু কি আর অবশিষ্ট নেই!—সবই কি এমনি করে' হারিয়েছো!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হারিয়েছি। উনি আমার সতীকুলরাণী সাবিত্রী এলেন উপদেশ দিতে।—বেদানা আস্‌বে কি না আমি জান্‌তে চাই।

—না বেদানা আসবে না আর, আজ থেকে ওটা বন্ধ করে' দিলাম।

—তবে যাও, বেরোও আমার সাম্‌নে থেকে—উল্লুক কোথাকার।

—গালাগাল দিও না বল্‌ছি।

—একশোবার দেব, হাজারবার দেব—যা' করতে পারিস করিস।

—আয় বাবা, আমরা চান করে' আসি। পয়সা নেই, সম্মান নেই, আশা নেই, ভরসাও নেই। চল্‌ পুণ্যি করে' আসি।

এই সুরমাকেই আমি দেখেছি ডাক্তারখানার সাম্‌নে ওষুধ ভিক্ষে করতে—বাঁ কোলে নেতিয়ে-পড়া ছেলে আর ডান হাতে গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে ও যেন সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা। অভাব-অনাটনের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র নেই, নিজের আত্মমর্য্যাদা হয়েছে ধূলায় অবলুণ্ঠিত। বাৎসল্য-স্নেহাতুরা সন্তান কোলে নিয়ে পৃথিবীর প্রতি দ্বারে দ্বারে দাঁড়াচ্ছে আর পথ চলেছে। তোমার আলো-নেবানো ঘরের সুবিস্তীর্ণ সুখ-শয্যায় প্রিয়ার বাহুপাশে বিলীন থেকেও তুমি যদি কান পেতে শোনো,—তবে শুনতে পাবে বহির্জগতের সুবিশাল শূন্যে থেকে থেকে কেবলি তার আর্ত্তকণ্ঠ বেজে উঠ্‌ছে—ওগো! তোমরা আমার খোকাকে একবারটি দেখ না, ওর যে বড্ড অসুখ করেছে!............

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

তরুণ স্বামী

শ্রীশচীন্দ্র বসু

অত্যন্ত সাধারণ চেহারা। একটি দেহ, হু'টি হাত, হু'টি পা। মুখের ওপর একটি নাক, হু'টি কান, হু'টি চোখ। কারো হয়তো মনে হ'তে পারে যে, এ বর্ণনা অনাবশ্যক; কারণ, এ মানুষমাত্রেরই আছে। আছে মানি মানুষমাত্রেরই, কিন্তু তা' বলে আমার বর্ণনা অনাবশ্যক একথা প্রমাণ হয় না; কারণ, ওর চেহারা বর্ণনা করতে হ'লে এ ছাড়া আর বলবার আজ কিছু নেই—এত সাধারণ এত বিশেষত্বহীন সে চেহারা। তা' বলে আমি বলছি না যে, ও দেখতে কুৎসিৎ। তা' মোটেই নয়; বরং মুখের দিকে চাইতে ভালই লাগে—কারণ, ওর চেহারায় এমন কোন বিশেষ কদর্য্যতা নেই যাতে আর তাকাতে ইচ্ছে না করতে পারে। আর যদি কুৎসিতই হ'ত ওর মুখ, তা' হ'লেতো তাকে বিশেষত্বহীন বলা যেতো না; কুৎসিৎ মুখকেও লোকে লক্ষ্য করে, এবং মনের ভেতর সুন্দর মুখের চেয়ে বোধ হয় খারাপ চেহারাই ছাপ রাখে বেশী। কিন্তু আমি বলেছি, 'বিশেষত্বহীন'—বোধ হয় ও কথাটাই একমাত্র বিশেসণ, যা' ওর চেহারাকে দেওয়া যায়—তার মানে ভালও বিশেষ লাগে না, অথচ খারাপও মনে হয় না; অর্থাৎ, মনে রাখবার মত কিছু নেই ওর চেহারায়।

শুধু চেহারা কেন—কি এমন আছে যার জন্য ওকে লোকে লক্ষ্য করবে! পড়াশুনায় যে খুব ভাল ছেলে ছিলো তা' নয়; তবে খারাপও নয়, পাশ করে যায়। খেলাধূলার পারদর্শিতা নেই বিশেষ কোনটাতেই, তবে বোধ হয় সবটাই জানতো কিছু কিছু। সে জানার কোন মানে নেই; কারণ, অনেক লোকের মধ্যে চোখে পড়ার মত কিছু ও খেলতে পারতো না। গুণের মধ্যে — কি বলব? কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছি না তেমন—গুণের মধ্যে হয়তো বলা যেতে পারে ফটো তুলতে জানতো, সাইকল চালাতে জানতো, এস্রাজ আর ম্যাণ্ডোলিন সামান্য কিছু বাজাতে পারতো। কিন্তু এগুলোকে গুণ বলে বর্ণনা করতে লজ্জা করে, লোকে হাসবে; কারণ, ওগুলো আজকাল সব ছেলেকেই জানতে হয়, না জানাটাই বরং 'ড্র-ব্যাক।' এগুলো সবাই করেই নিয়ে থাকে; কারণ, এরকম একটু-আধটু যে না জানে, তাকে কোন কাজে গোণাই হবে না—সেতো 'ব্যাক নাম্বার', তার সম্বন্ধে কোন 'চান্স'ই নেই। সেই রকম সেও জানতো অনেক জিনিষ কিছু কিছু—কিন্তু কোনোটাই এমন কিছু জানতো না যাতে লোকের দৃষ্টি ওর ওপরে পড়তে পারে। এই সবটাই কিছু কিছু জানার চেয়ে বোধ হয় কিচ্ছু না জানাও ভাল ছিলো; কারণ, তা' হ'লে সেটা তবু লক্ষ্য করবার মত কিছু হ'ত, কিন্তু তাও নয়, সবদিক দিয়ে ও ছিলো সম্পূর্ণ সাধারণ এবং কোন বিষয়ে ও যদি সম্পূর্ণতা এবং বিশেষত্ব অর্জ্জন করে থাকেতো তা' হচ্ছে নিশ্ছিদ্র সাধারণত্ব।

—কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনেও লেখবার মত ব্যাপার ঘটে, ঘটে 'রোমান্স।' সাধারণ মানুষেরও মন আছে, আছে মনস্তত্ত্ব, ঘাত প্রতিঘাত। তা' যদি না হ'ত তা' হ'লে জগতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড়লোকের ছেলে অথবা আই-সি এস্, অথবা 'ডন্ জুয়ান' ছাড়া আর কারও বাঁচবার কোনও দরকার ছিলো না—এ গল্পের কল্পনাও হ'ত না সম্ভব।

আর যাই হোক্, সাধারণ মানুষ ভালবাসতে পারে এবং আরও আশ্চর্য্য, ভালবাসা পেতেও পারে। কলেজ তখনও ছাড়ে নি, তবে তার সঙ্গে সম্পর্কও বিশেষ নেই। সময়মত কলেজে যায় আসে, বাকী সময় কাটায় সে আড্ডা দিয়ে, এমনি সময় ও আবিষ্কার করল যে, ও ভালবেসেছে। সে এক আশ্চর্য্য ভালবাসা! প্রথমে ও কিছু বুঝতে পারে নি, কিন্তু শেষে একদিন হঠাৎ ও জানতে পারলো কার মুগ্ধ দৃষ্টি সারাক্ষণ ওকে বিদ্ধ করছে। তার দিকে

প্রথমে ওর নজর পড়ে নি ; কারণ, বয়স তার এমন কিছু বেশী নয় যাতে নজর পড়তে পারে। কৈশোরের সূর্য্যে ওর সারাদেহ তখনও উদ্ভাসিত। বাল্যের চঞ্চল চাপল্যের পরে সবে বুদ্ধি এবং চিন্তার শান্ত ছায়া পড়তে আরম্ভ করেছে। সে যাই হোক, প্রথমে ওর দিকে চোখ না পড়লেও যেদিন পড়লো, সেদিন থেকেই—এমনি মানুষের মন—সেদিন থেকেই সেও তাকে সমর্পণ করলো ওর মন। করল বটে, কিন্তু অত্যন্ত গোপনে,—দু'জনার কারও মুখে ভাষা নেই, শুধু চোখের অগাধ দৃষ্টি, তাই দিয়ে ওরা জানিয়ে দিলো পরস্পরের হৃদয়ের খবর। এই চোখ দু'টির জন্য এক-একসময় এত কৃতজ্ঞ বোধ করতে হয়!

সে যাই হোক, ওদের প্রেমের সঙ্গে আমার গল্পের বিশেষ সম্পর্ক নেই ; এখনকার মত শুধু এটুকু জানলেই হবে যে, কখন ওরা পরস্পরকে হৃদয় দান করেছিল। কিন্তু এটাও কিছু অসাধারণ নয়, কারণ সব মানুষই (অন্তত প্রায় সব) ভালবেসে থাকে।

ওর একটি বন্ধু ছিল—নাম শুচীন। ওর হোষ্টেলের কাছাকাছিই তার বাড়ি। শুচীন হচ্ছে সাহিত্যিক—অর্থাৎ, ভাবী সাহিত্যিক। সাহিত্যিকদের অনেক রকম বন্ধু থাকে, যাদের একজনের সঙ্গে আর একজনের হয়তো কোনো মিল নেই ; কাজেই ওর মত একটি বন্ধু থাকা শুচীনের আশ্চর্য্য নয়। ওরও শুচীনকে ভালো লাগতো তার প্রমাণস্বরূপ নীচের ঘটনা বিবৃত করছি।

ও যখন সবে প্রেমে পড়েছে, তখন শুচীনের ওখানে ও রাত্রে ক'দিন এসে শুয়েছিলো। পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে ওদের যে-সব আলাপ হ'ত তারই খানিকটা লিপিবদ্ধ করছি। অনেক গুণের মধ্যে ওর একটা গুণ ছিল যে, ও হাত দেখতে পারতো। একদিন রাতে ও শুচীনের হাত দেখে বোল্‌লো, 'তোমার দুটো বিয়ে।'

শুচীন কোনোকালে ওসব বিশ্বাস করে না, অট্টহাস্য করে বললে, 'প্রথমটা বোধ হয় একটি সাধারণ মেয়েকে, তারপর তাকে 'ডিভোর্স' করে বোধ হয় তোমার বৌকে নিয়ে ...।'

নির্ব্বিকারচিত্তে ও বললো, 'তা' তুমি করতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

শুচীন বললো, 'ও, তুমি পামেলীকে এই ভালবাস! এই না সেদিন বলছিলে, ওকে বিয়ে না কর্‌লে তোমার চল্‌বে না?'

পামেলী হচ্ছে ওর ওই প্রিয়ার নাম ; একটু অদ্ভুত নাম, নয়? কিন্তু ওই নামটাই ওর ভয়ানক ভাল লাগে। এমন কি ওই নাম দিয়ে ও কবিতা পর্য্যন্ত লিখতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এক শুধু 'চামেলী' ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে মেলাতে পারে নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে ওর আর একটা গুণও ছিলো, ঐ একটু-আধটু কাব্য-চর্চ্চা—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রায় কোনো কবিতাই ও শেষ করতে পারে নি।

সে যাক, শুচীনের ঠাট্টার উত্তরে ও বললো,'ওকে ভাল-বাসি কি না তা' আমি আর ওই জানি। কিন্তু জোর করে কখনও ভালবাসানো যায় না, ওর যদি কোনোদিন তোমায় ভাল লাগে, তবে কেন আমি ওকে ধরে রাখবো ; আর তা' ছাড়া, সেদিনের একটি কে-না-কে মেয়ের জন্য আমাদের এতদিনের পুরোনো বন্ধুত্ব কখনো নষ্ট হওয়া উচিত নয়।'

ঠোঁটের কোণে একটু হাসিকে চেপে রেখে শুচীন জবাব দিয়েছিলো, 'এতই বন্ধুপ্রীতি! কিন্তু জানোতো ভালবাসা বড় স্বার্থপর জিনিষ, দুটো পাশাপাশি থাকতে পারে না।' তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেয়ে, 'কিন্তু জেনো, যদি ও দুটোতে বাঁধে সংঘর্ষ তবে সেদিন আমি তোমায় দোষ দেবো না, কারণ সেটাই স্বাভাবিক ; তার জন্য লজ্জিত হবার কিছু নেই।'

ও উত্তেজিত হয়েছিলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখে নিও।'

যা' ওরা কেউ আশা করতে সাহস করে নি শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাই হ'ল,—অর্থাৎ বিয়ে হ'ল ওদের। তখনও ওদের বয়স খুব কম ; পামেলীর এক বুড়ো দাদামশাই না কে আছে, তাড়াতাড়ি মরে যাবেন ভেবে একমাত্র

নাতনীর ছোট্ট একটি জামাই আনার সখ তিনি চরিতার্থ করলেন। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, ওদের ঐ মৌনপ্রেম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে কি করে সম্ভব হ'ল। সেটা হয়েছিলো ওরই একটি বৌদি'র কৃপায়। তাঁর সঙ্গে পামেলীদের পরিবারের চেনাশোনা ছিল এবং ভ্রাতৃতুল্য দেওরের শোচনীয় অবস্থা—চিঠিপত্র দেখেশুনে যতটুকু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর কোমল প্রাণে আঘাত করেছিলো। কিন্তু এ সব শুধু প্রসঙ্গত।

বিয়ের পরই ওরা চলে গেল বাঙলার সীমান্তে কি একটা জায়গায়,—তার যে-কোনো একটা নামই হ'তে পারে। সেখানে ওর জন্য কি যেন একটা ছোটখাটো চাকরী ঠিক্ হয়েছিল—অত্যন্ত সাধারণ চাকরী—এই ইনসিওরেন্স অফিসের কিছু অথবা কণ্ট্রাকটারি অথবা মফঃস্বলের কোনো ক্ষীণজীবি পত্রিকার সম্পাদকত্ব, এমনি যা' হোক্ একটা কিছু ভেবে নেওয়া যেতে পারে। ছোট-খাটো একটা টালির বাড়িতে ওরা থাকে—বিশেষ কোনো অভাব নেই। ও রকম সৃষ্টিছাড়া জায়গায় থাকতে হয় বলে ওদের দুঃখ নেই, এই ওদের ভাল লাগে। ভোরবেলা সূর্য্যোদয়ের অনেক আগে উঠে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে ওরা বেড়াতে যায়, বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এসে ও পামেলীকে নিয়ে ওদের ছোট বাগনটায় যেয়ে বসে—কোন্‌খানে কি গাছ লাগালে ভাল হবে, আজ বাজারে কি নতুন জিনিষ উঠেছিলো, অথচ, অনেক দাম বলে আনা গেল না, জানলায় পর্দ্দার কাপড়ের ছিটটা কি মানানসই হয়েছে—এই সব ঘরোয়া আলোচনাতেই সুখ পায়। তারপর আস্তে আস্তে আকাশের রংটা গাঢ় হয়ে আসে, সন্ধ্যাতারার ঘুম ভাঙে—সে চায় চোখ খুলে, চারদিকে শোনা যায় অসংখ্য ঝিঁঝিঁর ডাক আর হঠাৎ আসা একটু বাতাসে পাওয়া যায় বুনোফুলের তেজালো গন্ধ। সেই সময় আপনা থেকেই ওরা চুপ করে বসে থাকে, যেন কিসের প্রত্যাশায়। হঠাৎ বহুদূর হতে শোনা যায় একটা ক্ষীণ একটানা গম্ভীর শব্দ, আস্তে আস্তে সেটা উচ্চতর হ'তে হ'তে যেন হুড়মুড় করে এসে পড়ে, গভীর নীরবতা চুরমার হয়ে ভেঙে চারদিকে ছিটকে পড়ে, তারপর আবার সেটা মিলিয়ে যায় ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর। ট্রেণের কামরার লালচে বাতিগুলো ঘনায়মান অন্ধকারে ঠিক মালার মত সাজানো মনে হয়। তারপর ওরা উঠে আসে ঘরে।

এমনি একদিন বিকেলে ওরা বারন্দায় বসে আছে; তখন বাতাসে সবে শীতের ধার অনুভব করা যায়। অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে বসেছিলো কোনো কথা না বলে। সুনীল সন্ধ্যার মায়া তখন দু'জনার মনে। হঠাৎ পামেলী বল্‌লো, 'দেখো কি সুন্দর!' তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেও তাকালো আকাশের দিকে—বাঃ! এতক্ষণ চোখে পড়ে নি—বিরহবিদীর্ণা প্রেয়সীর চোখের মত আকাশটার রং আর তার গায়ে শুদ্ধ একটী চাঁদ। তারদিকে চেয়ে চেয়ে অনেকদিন পর ওর আজ হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল; মনে মনে—কেন সে নিজেও জানে না—পামেলীর জন্য ও একটা অহেতুক করুণা অনুভব করলো! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও হঠাৎ বল্‌লো, পামেলী, তোমার এখানে বড় একা একা লাগে, নয়?

পামেলী, কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইলো বিস্ময়ে, তারপর আস্তে আস্তে বললো, এ কথা কেন বলছো, তোমার নিজের কি কষ্ট হয় একা থাকতে?

'না, আমার হয় না; কারণ, এক তুমি যদি থাকো তো সমস্ত জগতকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি। কিন্তু তোমার চোখের দিকে চেয়ে আমি বুঝতে পারি মিলি, যে, তুমি বড় একা। আমার তবু কাজ আছে, কিন্তু তোমার তো কথা কইবারও একটা লোক নেই। আমি ভাবছি আমার একটি অনেক কালের বন্ধু আছে তাকে এখানে এসে ক'দিন বেড়িয়ে যেতে লিখে দি'।'

'না না না', পামেলী প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো, 'মিছে ও সব হাঙ্গামে কোনো দরকার নেই, এই আমি বেশ আছি।' তারপর স্বরটা হঠাৎ একটু গভীর করে, 'তুমিই তো আমার আছো, আমার আর কোনো সঙ্গীর দরকার নেই, তুমিই তো আছ।"

হাত ধরে ওকে কাছে আকর্ষণ করে ওর গালে একটা চুম্বন করে সে বললো, 'না মিলি, ওকে আমি কাল

একটা চিঠি লিখে দি'। ওকে আজ হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে করছে। এ জায়গাটা ওর ভালই লাগবে—ও আবার কবি মানুষ। ওর সঙ্গে আলাপ করে তোমার নিশ্চয় ভাল লাগবে আমি বলে দিতে পারি। হ্যাঁ দেখো, ওর যেন যত্নের ক্রটী না হয়, ও আমার অনেককালের বন্ধু—আমাদের ভেতর গভীর বন্ধুত্ব।' তারপর একটু থেমে আপন-মনেই আবার বললো আস্তে আস্তে, 'আমাদের গভীর বন্ধুত্ব।'

'একটা জিনিষ আমাকে মাপ করতে হবে পামেলী দেবী, সেটা হচ্ছে সিগরেট। ওটা আমি একটু বেশী খাই এবং না খেয়ে পারি নে।' বারান্দায় ইজিচেয়ারটা টেনে এনে বস্‌তে বসতে শুচীন বললো মৃদু হেসে।

'বা, সে কি কথা, নিশ্চয়ই। শুনেচি, সাহিত্যিকরা না কি সিগরেটের ধোঁয়া মগজে না ঢোকা পর্য্যন্ত প্লট ভাবতে পারেন না ; সত্যি, আশ্চর্য্য লোক আপনারা। কি করে লেখেন,—এক এক-সময় ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। আমাকে মেরে ফেললেও বোধ হয় আমার কলম থেকে একলাইন কবিতা বেরোবে না।'

সেদিন চতুর্দ্দশী কিংবা তার কাছাকাছি একটা দিন হবে। পরিষ্কার নীল জোৎস্না ওদের পায়ের ওপর এসে পড়েছে, কিন্তু ওদের মুখ রয়েছে টালির ছাতের ছায়ায়। একঝলক সিগরেটের ধোঁয়া আস্তে আস্তে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল অলস খানিকটা চিন্তার মত।

'কক্ষনো নয়—চেষ্টা করলে নিশ্চয় আপনি লিখতে পারবেন, কিছুই কঠিন নয়। সাহিত্যটা কি, জানেন—যে-সব ছেলেদের আর কোনোদিকে কোন গতি হ'ল না ওটা তাদের শেষ সম্বল—অনেকটা ইন্‌সিওরেন্স এজেন্সীর মত।'

'না না, ওকথা বলবেন না, আমি চেষ্টা করে দেখেছি। পড়বার সময় মনে হয় বটে, যে এতো অত্যন্ত সহজ ; মনে হয় লেখক যেন বসে বসে অলস খানিকটা গল্প করে যাচ্ছেন, কিন্তু আসলে ঐ রকম করে বলাটাই কঠিন। আচ্ছা, আপনি প্লট ভাবেন কি করে—এত সব অদ্ভুত কল্পনা কি করে আপনাদের মাথায় আসে?'

'কি করে আসে তা' অনেক সময় নিজেও টের পাই না। সাধারণতঃ যখন অন্য কোনো কাজ করতে থাকি, যেমন ধরুন হয়তো খাচ্ছি, অথবা পড়ছি, কিম্বা রাস্তা দিয়ে চলছি, সে রকম সময় হঠাৎ হয় তো সামান্য একটু 'আইডিয়া'র আভাস পাওয়া যায়। ব্যাপারটা অত্যন্ত ক্ষণিক এবং আকস্মিক এবং কখন যে হয় বলা যায় না। কখনো কখনো ঘুমের মধ্যেও আমি সেটা টের পেয়েছি। গল্প লেখবার পক্ষে ঐ ক্ষীণ 'আইডিয়া'টুকুই যথেষ্ট ; ওকে বাড়িয়ে একটা উপযুক্ত 'ব্যাকগ্রাউণ্ড'-এ বসিয়ে দিলেই গল্প হ'ল। অবশ্য সবাই সেটা পারে না, তার জন্য দরকার জগতের সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি। তা' ছাড়া, বাস্তব জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে—সে সবইতো এক একটা গল্প।'

'কি করে? একটা গল্প পড়ে যে রকম মনে হয়, যে আনন্দটুকু পাওয়া যায়, আশপাশের ঘটনাগুলি থেকে কি তা' পাওয়া যায়?'

'আমরা যদি চোখ খুলে থাকতে পারি, শুধু দেহের চোখ নয়, মনের চোখ, তবে নিশ্চয় পাওয়া যায় ; তা' হ'লে আমরা দেখতে পাবো, আমাদের চারদিকে প্রতিদিন শত শত 'রোমান্স' ঘটে যাচ্ছে। সাহিত্যিক আর কিছুই নয়, তার শুধু সে-দৃষ্টিটুকু আছে, সব লোকে যা' দেখতে পায় না তাও সে দেখতে পায়, আর সেটুকুই কাগজ-কলমের সাহায্যে লোকের চোখের সামনে ধরে আর সব কিছু হ'তে বিচ্ছিন্ন করে'।'

গেটের ফাঁক দিয়ে একটা সাইকল্ এসে বাগানে ঢুকে বারান্দার সিঁড়ির কাছে থামলো। শুচীন বললো, 'কি হে, তোমার কাজ শেষ হ'ল?

'হ্যাঁ, তারপর তোমাদের কি আলাপ হচ্ছিল এতক্ষণ?'

'কেন, তোমার তা'তে কি দরকার? আমাদের যা' আলাপ হচ্ছিল তা' তুমি বুঝবে না।' পামেলী বললো।

'কি এমন ব্যাপার শুনিই না—গোপন কিছু না কি?'

শুচীন তাড়াতাড়ি বললো, 'আর্ট হে আর্ট ; আমরা আর্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম—বুঝবে কিছু তার ?'

সংক্ষিপ্ত একটি 'হুঁ' করে সে কতক্ষণ বসে রইল, তারপর হঠাৎ উঠে, 'আচ্ছা, ইউ কন্‌টিনিউ ইওর টক্ অ্যাবাউট্ আর্ট, আই ওণ্ট ইন্‌টারফিয়ার'—বলে ঘরে ঢুকে গেল।

ওরা বসে রইলো নির্ব্বাক—অসহ বেদনার মত সে স্তব্ধতা।

রাতে খাওয়ার পর শুচীন বললো, 'ও হে, কি রকম জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছো, চলো একটু ঘুরে আসা যাক্। তা' ছাড়া, যা' খাওয়া হয়েছে, একটু হেঁটে না এলে হজমই হবে না।'

সড়কের ওপর এসে পড়ে ওরা সিগরেট ধরালো। রাস্তার ধারের বড় বড় শিশু আর দেবদারু গাছগুলির ছায়া পড়েছে লম্বা লম্বা, বাঁপাশে পাকাধানের হলদে ক্ষেত অস্পষ্ট হ'তে অস্পষ্টতর হ'তে হ'তে বহুদূরে দিগন্তে মিশে গেছে।

খানিকটা এসে ও জিজ্ঞেস করলো, 'পামেলীকে কি রকম লাগলো শুচীন ?'

'বেশ।' শুচীন বললো 'বেশ এ্যাকম্‌প্লিজড্ মনে হ'ল। তা' ছাড়া, সি হ্যাজ্ গট্ হার ফিজিক্যাল্ চার্মস্ কোয়াইট্ এ কভেটেবল্ থিং ; ল্যকি ইউ গট্ হার।'

'তোমার তো ভাল লাগা উচিত ; সি ইজ্ আর্টিষ্টিক্ এ্যাণ্ড ক্যান্ টক্ অফ্ আর্ট।'

তারপর আর বিশেষ কোনো কথা হ'ল না। খানিক পর শুচীন বললো, 'ঠাণ্ডা লাগছে, চলো ফেরা যাক।'

সেই রাতে ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার পর বিছানায় যেয়ে ও বললো, 'কেমন লাগলো শুচীনকে পামেলী ?'

'বেশ, ভদ্রলোককে সত্যিই বেশ লাগলো, অনেক কিছু জানেন। কথা বলে আরাম পাওয়া যায়।'

'দেখতেও বেশ, না ? সুন্দর আর্টিষ্টিক্ চেহারা !' বলে অন্ধকারের ভেতর ও পাশ ফিরে শুলো।

'মানে ?' পামেলী অকস্মাৎ জিজ্ঞেস্ কোরলো ; কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। সংক্ষিপ্ত ঐ প্রশ্নটা যেন নীরব অন্ধকারের ভেতর হাতড়ে হাতড়ে খালি মানে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

তারপর দিন থেকে ওর হঠাৎ কাজ বেড়ে গেছে, প্রায় সারাদিনই বাইরে থাকে। বাড়িতে যখন ফেরে, তখন সে ক্লান্ত ; কারো সঙ্গে বেশী কথা বলার সময় পায় না। বিছানায় পড়ে চোখ বুজে থাকে ; কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে মাথা ধরেছে।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় ও হঠাৎ ফিরে এলো হাসতে হাসতে। হাতে একটা চৌকো কাগজের বাক্স ; সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে খুলতে খুলতে বললো, 'আজ কয়েকটা 'সিম্পল্ চার্মস' কিনে আনলাম—কোলকাতা থেকে নতুন আমদানী, মাণিকমালার লেটেষ্ট।' তারপর পোর্টেবল্ গ্রামোফোনটায় একটা রেকর্ড চাপিয়ে চাবি দিতে লাগলো।

গানটা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ও হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো, 'দি আইডিয়া ! শুচীন, তুমি জান পামেলী নাচতে জানে, ভারী সুন্দর নাচে !'

'তাই না কি ?'

'হ্যাঁ, সিম্‌প্লি মার্‌ভেলাস্ ! নাচো না মিলি, সেই 'নেচেছো প্রলয় নাচে' গানটা।'

পামেলী প্রথমে রাজী হয় নি, কিন্তু শেষে ওদের দু'জনের অনুরোধে রাজী হলো ; গানটা সে 'স্লো-স্পীডে' চালিয়ে দিলো।

শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শুচীন মুগ্ধ হয়ে শুধু দেখছিল, শেষ হওয়ার পর বললো, 'সত্যি, এত সুন্দর নাচ আমি আগে দেখি নি—এত আর্টিষ্টিক্ ভঙ্গী। আপনার ভেতর এগুণ ছিল আগে তো জানতাম না।

তারপর আরম্ভ হ'ল ওদের নাচ-সম্বন্ধে আলোচনা।

কথায় কথায় পামেলী বললো, 'বিয়ের পর যা-ও জানতাম তা-ও ভুলে যাচ্ছি—চর্চ্চা নেই। আর সত্যি দেখতে গেলে বিয়ে যখন হয়ে গেছে, তখন নাচের উদ্দেশ্য তো শেষ হয়েছে।'

'এ আপনি অত্যন্ত অন্যায় বলছেন। শিল্প অথবা আর্টের উদ্দেশ্য কখনো শেস হয় না। আপনাকে নাচের 'কাল্‌চার' রাখতেই হবে, তা' না হ'লে সেটা হবে সমস্ত জগতের প্রতি অবিচার। যে শিল্পী, তার নিজের ওপর কোনো হাত নেই; কারণ, তার ওপর দাবী সমস্ত জগতের।'

কথার মাঝে ওরা লক্ষ্য করে নি ও কখন উঠে গেছে; রেকর্ড আর মেসিনটা টেবিলের ওপর ছড়ান। 'এ কি, ও গেল কোথায়?' বলে পামেলী বাইরে এসে দেখে বারান্দায় বসে আছে ও, কপালটা টিপে রেখেছে দুটো আঙুল দিয়ে।

'কি হয়েছে, চলে এলে যে?'

'মাথা ধরেছে', ওবললো।

'ঘরে এসো অ-ডি-কলোন দিয়ে দি'।'

'না, এখন যাও, জ্বালাতন করো না।'

শুচীন এলো, 'কি হে নতুন গান না শুনেই চলে এলে! তা' গান থাক, চলো একহাত 'কাট্‌থ্রোট্' খেলা যাক।'

'মাপ করো, মাথা ধরেছে ভয়ানক, একটু একলা থাকতে দাও।'

'তা' থাকো, নাও একটা সিগরেট টানো দেখি কষে, মাথা ধরা সেরে যাবে।'

'না, ধন্যবাদ।'

রোজ রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় পামেলী একটা কাঁচের গ্লাসে করে খাবার জল এনে রাখে খাটের পাশে জানলার কাছে। সেদিনও সে জল এনে দরজা বন্ধ করলো। তারপর আস্তে আস্তে যেয়ে বোসল ওর মাথার কাছে, ঠাণ্ডা হাতটা ওর মাথার ওপর খানিকক্ষণ রেখে বললো, 'কমেছে?'

ও পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আরও কিছুক্ষণ পর সে আবার বললো, 'আচ্ছা, তুমি তখন ওরকম উঠে গেলে কেন বলো দেখি? শুচীনবাবু হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন।'

'অতিথির প্রতি অসম্মান হয়েছে না কি? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তুমি থাকতে ওর পরিচর্য্যার কোনো ত্রুটী হবে না, বরং আমি থাকলে হয় তো ক্ষতি হ'তে পারে।'

এবার পামেলীর নীরব থাকবার পালা।

ও আবার বলে যেতে লাগলো, 'তা' ছাড়া, তোমরা আর্ট বোঝো, তোমরা বোঝো নাচ, গান, কবিতা—পারো সে-সব জিনিসের সূক্ষ্ম বিচার করতে, সেখানে—'

ওর কথায় বাধা দিয়ে পামেলী বল্‌লো, 'আমি মনে করেছিলাম তুমি সত্যিই চেয়েছিলে যে, আমি নাচি; তোমার বন্ধুর যেন অযত্ন না হয়, তোমার এই অনুরোধটিই আমি শুধু না-ভুলতে চেষ্টা করেছি।"

'পামেলী।' ও হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'নিজেকে আর ঢাকতে চেষ্টা করো না। শুচীন কবি, সে দেখতে সুন্দর, তার আছে বিদ্যা, আছে আর্টের সূক্ষ্ম বিচার, আর তুমি কবিতার মানসীর মত রূপবতী, ছন্দের মত তোমার নাচের ভঙ্গী। পামেলী, আমি ছেলেমানুষ নই।' ওর গলা এখানে ঈষৎ কম্পিত হ'তে হ'তে উচ্চতর হ'তে লাগলো, 'হ'তে পারি আমি মূর্খ, গরিব, কোনো গুণ আমার নেই, অত্যন্ত সাধারণ মানুষ আমি—কিন্তু, কিন্তু আমার হৃদয় আছে, বুঝলে পামেলী, আমি ভালবাসতে পারি, তোমার ওই শুচীনের মত আমিও ভালবাসতে পারি।'

'আঃ, চুপ করো, এত জোরে চেঁচিয়ো না—'

'চুপ করবো?' ওর স্বর তীব্র চীৎকারের স্তরে এসে পৌচেছে, 'না, সমস্ত পৃথিবী শুনলেও আজ আমার কোনো ক্ষতি নেই। অনেক চেষ্টা করেছি চুপ করতে, ভুলে যাবার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি, কিন্তু তার বদলে কি শিখেছি জানো? শিখেছি, তোমরা মানুষ নও, হৃদয় বলে কিছু তোমাদের নেই, তোমাদের মূল্য কতটুকু জানো,

—এই এতটুকু।' বলার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের গ্লাসটা তুলে সে দেয়ালে ছুঁড়ে মারলো, তীব্র একটা আর্ত্তনাদ করে সেটা ছিটকে পড়লো চারদিকে।

কিন্তু তারপর হঠাৎ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল ওরা। যেন দু'জনে পাথরে জমে গেল হঠাৎ। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ—তারপর ও আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো পামেলীর কাছে। তারপর হঠাৎ ওর ম্লান শীতল মুখখানি বুকের মধ্যে চেপে বললো আস্তে, 'মিলি, তুমি যদি জানতে কি হচ্ছে আমার মনের ভিতর; ক্ষমা করো, মিলি, দয়া করে ক্ষমা কর আমায়! আমায় দোষ দেবার আগে একবার আমার ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করো, তা' হ'লে, পারবে না আমায় ক্ষমা না করে'।'

আর ওর আলিঙ্গনের মধ্যে পামেলীর দেহটা দ্রুত স্পন্দিত হ'তে থাকলো।

খুব ভোরে দরজায় দুটো মৃদু টোকার আওয়াজ শুনে পামেলী উঠে এল বিছানা ছেড়ে। দরজা খুলেই বলে উঠলো, 'এ কি, এত ভোরে কোথায় যাচ্ছেন? হাতে সুটকেস?'

মৃদু হেসে শুচীন বললো, 'কোলকাতার ট্রেইন এখন একটা আছে।' তারপর একটু থেমে অন্যদিকে চেয়ে, 'হঠাৎ বিশেষ একটা কাজ মনে পড়ে গেল।'

পামেলী চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর, 'ও কিন্তু ঘুমিয়ে রয়েছে এই ঘণ্টাখানেক হ'ল—'

'বুঝেছি। ওকে বলে দেবেন। কিছু যেন মনে না করে। তা' ও ভাববে না কিছু। বলবেন, বিশেষ দরকার কোলকাতায়, তা' হ'লেই বুঝবে। ও আমাকে চেনে—আমাদের অনেক কালের বন্ধুত্ব।' তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে, 'গভীর বন্ধুত্ব আমাদের।'

আস্তে আস্তে ওরা বারান্দায় এগিয়ে এল। বাগানটা তখনো ঘুমের নেশায় আবছায়া আচ্ছন্ন। ফিকে ধূসর অন্ধকারে সব কিছু ছায়ার মত।

সিঁড়িতে পা দেবার আগে একমুহূর্ত্ত থেমে ও বললো, 'শেষ তারাটা এখনো নেবে নি, দেখেছেন—কত ক্লান্ত, কত বিষণ্ণভাব, তবু মিটমিট করে' চেয়ে আছে ঠিক।'

শ্রীশচীন্দ্র বসু
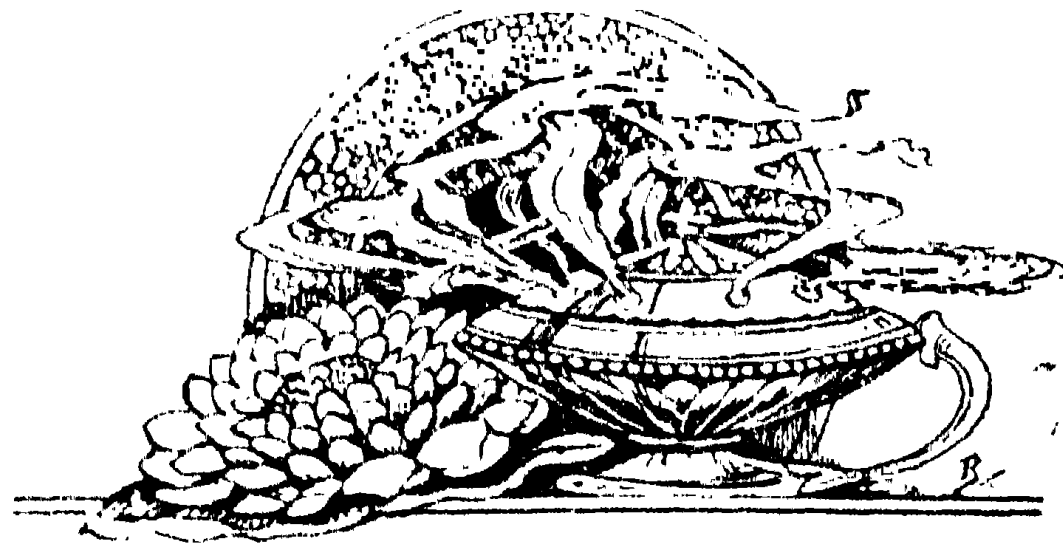
একটী তারা ও একরাশ কালো মেঘ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ

দুঃস্বপ্নের মত যে ভয়টা মাঝে মাঝে জাগিত, সেদিন অতর্কিতে তাহাই ঘটিয়া গেল।

ভাল করিয়া এক ঘুম ঘুমাইয়া লইবার আগেই পিতার চীৎকারে নিতায়ের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। চোখ মেলিয়া শুনিল পিতা বলিতেছেন—তাই তো ভাবি, চেষ্টা করলে আবার চাকরী হয় না। বাবু বাপের হোটেলে খাচ্ছেন আর দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। সংসারে দু'পয়সা সাশ্রয় করার জন্যে তো বাবুর ঘুম ধরছে না। আচ্ছা, দেখি, এমনি করে তোর ক'দ্দিন কাটে। আমি যে ক'দিন আছি বই তো নয়, তারপর...

অনাদিবাবু হয় তো আরো অনেক কথাই বলিতেন, কিন্তু গৃহিণী আসিয়া পড়িলেন। একটী মাত্র ছেলে,তাহাকে যখন তখন এত বকাবকি গৃহিণী পছন্দ করিতেন না, বলিলেন—বাড়ী ঢুকেই ছেলেটাকে বকাবকি স্থরু কর্‌লে? আজ শরীরটা খারাপ বলেই বেরোয় নি, না হ'লে কবে আর দুপুরে বাড়ী থাকে! দুপুর রোদে ঘুরে ঘুরে ওর শরীরটা কি হয়েছে দেখেছ?

পুত্রের প্রতি গৃহিণীর দরদ দেখিয়া অনাদিবাবু আরো জলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রোদে ঘোরবার জন্যে তো ওর ঘুম হচ্ছে না, ততক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলে কাজ হবে। রোজই শুনি 'শরীর খারাপ'—'শরীর খারাপ।' চাকরীর চেষ্টায় বেরোতে হলেই শরীর খারাপ। চব্যচোষ্য গাণ্ডেপিণ্ডে গেলার সময় তো শরীর খারাপ হয় না। বাবু এদিকে আড্ডা দিচ্ছেন, বায়াস্কোপ যাচ্ছেন, কিন্তু শ্যামবাজারের মধু মুখুয্যের বাড়ী কোন্ পাঁচবার যেতে পার্‌লে? তার অফিসে লোক নিচ্ছে, একটা লেগে যেতো। এই যে এত খরচ-পত্র করে পড়াশুনো, দু'পয়সা যদি ঘরে না আসে, তা' হ'লে এই পড়াশুনার দাম কি?

গৃহিণী বলিলেন—তা'তো জানি, কিন্তু চাকরী বল্‌লেই তো আর এক্ষুনি চাকরী হবে না; যখন হবার হবে, আপনি হবে। অনর্থক বকাবকি করে লাভ কি? এখন জামা-কাপড়টা বদ্‌লে একটু জিরোও গে।

—যখন হবার হবে, আপনি হবে; অফিসের বড় সাহেব বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যাবে—বলিয়া গজ্‌গজ্ করিতে করিতে অনাদিবাবু পাশের ঘরে কাপড়-জামা ছাড়িতে চলিয়া গেলেন।

নিতাই বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। পিতা আজ এত শীঘ্র বাড়ী ফিরিবে জানিলে, সে কখনই বাড়ী থাকিত না। চাকরী-চাকরী করিয়া পিতা তাহাকে যেভাবে খেদাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার সম্মুখীন হওয়া নিতায়ের পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। কতবার তো পিতা শুনিয়াছেন যে, মধু মুখুয্যে বলিয়াই দিয়াছে—কিছু হইবে না, তথাপি সে কথা বলিতে তিনি ছাড়িবেন না। তাঁহার বিশ্বাস,মধু মুখুয্যের কাছে কয়বার যাতায়াত করিলেই বুঝি তাহার একটা চাকরী লাগিয়া যাইবে। এ সম্পর্কে অতি সাধারণ সহজবোধ্য কথাগুলোও তিনি বুঝিবেন না, তাঁহার সঙ্গে বেশী কথাকাটাকাটি করিয়াও তো লাভ নাই। স্কুল মাষ্টারের মন, দু'-চারটা কথাতেই গরম হইয়া উঠিবেন। তাহার উপর স্কুল হইতে ফিরিয়াই আজ যখন বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই বকাবকি শেষ হইবার সম্ভাবনা কম। তাহার এখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত—ভাবিয়া নিতাই উঠিয়া পড়িয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাপড়টা বদলাইয়া জামাটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

পথে বাহির হইয়া নিতায়ের মনে দুঃখ হইল। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হইয়াও এতটুকু আদর সে পাইল

না কোনদিনই। পিতার বুকে যেন স্নেহ-মমতার স্থান নাই। তিনি তো পুত্রকে চান্ না, চান পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থ। তাঁহার কাছে চাকরী না পাওয়ার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জীবনটা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে তাহার আর এতটুকু শান্তি নাই। একবার পথে বাহির হইলে বাড়ী ফিরিতে আর ইচ্ছাই করে না। চাকরীর জন্য অনর্থক ঘুরিয়া ঘুরিয়াও তো মনটা বিষাইয়া উঠিয়াছে। গ্রাজুয়েট হইলে এমন হইবে জানিলে ইচ্ছা করিয়াই সে বি-এতে ফেল করিত।

ভাবিতে ভাবিতে নিতাই চলিয়াছিল। প্রতিদিনের অভ্যাসমত অফিস কোয়ার্টারের দিকেই তাহার পা চলিতেছিল। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত আসিতে-না-আসিতেই তাহার সারাদেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। কোঁচার কাপড়ে ভাল করিয়া মুখটা বারকয়েক মুছিয়া লইয়া সে একটু দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। সাম্‌নের বাড়ীতে পিতলের ফলকে যে নামটা লেখা রহিয়াছে ওইটাই তার পিতৃবন্ধু মধু মুখুয্যের অফিস। ওই অফিসেরই সে বড়বাবু। একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিলে ক্ষতি কি। পিতা যখন এতো করিয়াই বলিতেছেন, বলা তো যায় না, হয় তো আজই তাহার চাকরী লাগিয়া যাইতে পারে। নিতাই আর দ্বিধা করিল না, রাস্তা পার হইয়া বাড়ীটার মধ্যে গিয়া ঢুকিল। তারপর সিঁড়ি বাহিয়া তর্‌তর্ করিয়া দোতলায় উঠিয়া গেল।

সাম্‌নেই হলঘরের একপাশে বসিয়া বড়বাবু কাজ করিতেছিলেন, নিতাইকে দেখিয়া তাঁহার ভ্রূ দু'টা অসম্ভব-রকম কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিতাই কাছে যাইয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—আবার তুমি আজ এলে কেন? তোমাদের জন্যে দেখ্‌ছি আমাদের কাজ-কর্ম্ম সব বন্ধ করতে হবে।···

বড়বাবুকে একটু নরম করিবার চেষ্টায় গলার স্বরটা যথাসম্ভব কোমল করিয়া নিতাই বলিল—দেখুন, বাবা বল্‌লেন—

বড়বাবু আরো তাতিয়া উঠিলেন, বাধা দিয়া বলিলেন —বাবা বল্‌লেন, তো আমি কি কর্‌বো বল? চাকরী বল্‌লেই তো আর চাকরী হয় না, খালি না হ'লে কি করবো? তার ওপর তোমার আগে দু'শ' এগারো জনের নাম রেজেষ্ট্রী করা আছে, তাদের তো আগে 'চান্‌স্' দিতে হবে!

—বেশ, তা' হ'লে সাহেবের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিন।

বড়বাবু নিতায়ের মুখের পানে একবার কট্‌মট্ করিয়া করিয়া তাকাইয়া বলিলেন—সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না; সাহেব বারণ করে দিয়েছেন যাকে তাকে তাঁর ঘরে যেন না পাঠানো হয়।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিতায়ের মুখের পানে আর একবার তাকাইয়া বড়বাবু টেবিলের উপরকার কাগজ-পত্রগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

নিতাই কি ভাবিয়া কতক্ষণ বড়বাবুর টেবিলটার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর তরতর করিয়া সিঁড়ি দিয়া পথে নামিয়া আসিল। এই তাহার পিতার বন্ধু মধু মুখুয্যে। ইহার কাছে আসিবার জন্য পিতা বারবার কড়া তাগিদ দেন। এই বন্ধুর উপর তিনি কতটা আশা করেন, কিন্তু ইহার ব্যবহারটা যদি তিনি দেখিতেন। যদি দেখিতেন, তাঁহার প্রতি এই মধু মুখুয্যে কি অবজ্ঞা করিয়াই চলে, তাহা হইলে তাহাকে আসিবার জন্য তিনি এমন করিয়া পীড়ন করিতেন না। আর মধু মুখুয্যের অমন ব্যবহারের মধ্যে কোন অসঙ্গতি তো নাই। বাল্যে ও কৈশোরে যে বন্ধু ছিল, প্রৌঢ়ত্বেও তাহার সেই ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে এমন কি কথা। অবস্থার ব্যবধান ও বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের বিকার ঘটাও তো স্বাভাবিক। আজ যদি কোন বাল্য-সাথী স্বার্থের সিদ্ধি কামনায় 'হিট্‌লার মুসোলিনী' কি 'কামালে'র পূর্ব্ব বন্ধুত্বের দাবী করিয়া বসে, তাহা হইলে সে দাবী শুধু অযৌক্তিক হইবে না, অবজ্ঞাত হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। তবে মধু মুখুয্যে হিটলার মুসোলিনী কি কামাল না হইলেও একটা অফিসের তো বড়বাবু, মাসে সাড়ে তিনশো টাকা মাহিনা পান, আর তাহার পিতা সত্তর টাকা মাহিনার একজন সাধারণ স্কুল মাষ্টার—অনেক

তফাৎ! কিন্তু এই সহজ পার্থক্যের কথাটা পিতা কিছুতেই বুঝিবেন না।

চলিতে চলিতে নিতাই লালদিঘীর মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। আর কোন অফিসে যাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না; জানাশুনা না থাকিলে কিছুই হইবে না। মিথ্যা ঘোরা-ঘুরি করিয়া লাভ কি! পকেটে একটা পয়সা ছিল। সাম্‌নের বাদামওয়ালাটার নিকট হইতে এক পয়সার চীনা-বাদাম কিনিয়া লইয়া ঘাসের উপর একটা বড় গাছের ছায়ায় গিয়া সে বসিয়া পড়িল। রৌদ্রে এইটুকু আসিতেই মাথাটা চন্‌চন্ করিতেছে। ছায়ায় আসিতে একটু আরাম বোধ হইল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আধশোয়া অবস্থায় শুইয়া পড়িয়া সে পকেট হইতে চীনাবাদাম বাহির করিল। চীনাবাদাম খাইতে খাইতে অনেক কথাই তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল অতীতের দিনগুলির স্মৃতি। ছাত্রজীবনের সেই আনন্দমুখর দিন-গুলি, কি অভাবিত বর্ত্তমানের মধ্যে তাহাকে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই বর্ত্তমানকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য, অর্থ সঙ্কলনের চেষ্টায় এই খর দ্বিপ্রহর রৌদ্রে অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সে পরিশ্রান্ত হইতেছে। আগে যাও বা আশা ছিল, এখন কংগ্রেসের কর্ম্মনিষ্ঠার কল্যাণে তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। দেশকে স্বাধীন করিবার নামে গান্ধিজী আইন অমান্যের 'এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট' করিয়া মধ্যবিত্তের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। দিন-অন্ন-পন্থীদের অনিবার্য্য মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে তিনি পিছাইলেন না, জাতীয় কল্যাণের অপেক্ষা খ্যাতি ও মহা-মানবতা প্রকাশের আগ্রহ তাঁহার কাছে বেশী বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িল। না হইলে উত্তর বিহারে মুমূর্ষুর চীৎকারে বাতাস যখন কাঁপিয়া ফিরিল, আসামের প্লাবনে যখন গ্রামের পর গ্রাম জলস্রোতের বুকে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তখন তো তিনি হরিজন ফাণ্ডের বিরাট টাকার তোড়া হাতে লইয়া সিন্দুকে জমা করিলেন। মহামানবের মহানুভবতা তো এতটুকু প্রকাশ পাইল না।...

—বাবু, একটা পয়সা?

নিতায়ের চিন্তার চমক ভাঙিয়া গেল। কোথা হইতে একটা ভিখারী আসিয়া কখন সাম্‌নে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহার পকেটে কয়েকটা চীনা-বাদাম ছাড়া তো আর কিছুই নাই। একটা চীনাবাদাম ভাঙিতে ভাঙিতে সে বলিল—মাপ করো।

অমন 'মাপ করো' শুনিয়া শুনিয়া ভিখারীটার অভ্যাস্ হইয়া গিয়াছে। নিতায়ের ধপ্‌ধপে কাপড়-জামার পানে তাকাইয়া সে আশা ছাড়িতে পারিল না। সাম্‌নে আরো কাছে আসিয়া বলিল—সারাদিন ভুখা আছে, বাবু।

নিতাই উঠিয়া বসিল, বলিল—আমার কাছে কিছুই নেই, মাপ করো।

কিন্তু 'কিছুই নাই' এ কথাটা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি ভিখারীটার হইল না, তাড়াতাড়ি নত হইয়া নিতায়ের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কহিল—রাজা বাবু!

নিতায়ের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলিল না, তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেলে পা ঢুকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভিখারীটা আর একবার তাহার পদ স্পর্শ করিবার আগেই তাহাকে পাশ কাটাইয়া নিতাই লালদিঘীর বাহির হইয়া আসিল।

কয়েক পা যাইতে-না-যাইতেই জগদীশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। একই কলেজ হইতে একই সঙ্গে দু'জনে পাশ করিয়াছে, মুখোমুখি হইতে দু'জনেই দাঁড়াইল। জগদীশ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি হে, কোথায়?

নিতাই বলিল—এ-ই ফিরছি।

নিতাই যে চাকরীর চেষ্টা করিতেছে, জগদীশ তাহা জানিত। বলিল—কিছু হ'ল না কি?

আবার সেই চাকরী না পাওয়ার কথা উঠিতেছে দেখিয়া নিতাই বিরক্ত হইল। জগদীশের বাবা না হয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্, বি-এ পাশ করিতে-না-করিতেই ছেলেকে চাকরীতে বসাইয়া দিয়াছেন। তাই বলিয়া নিতাই তাহার কাছে কৈফিয়ৎ দিবে কেন? সে

গম্ভীরভাবে বলিল, একটা মিথ্যা কথাই বলিল—হ্যাঁ, হয়েছে।

—কোথায় ?

—নদীয়া ব্যাঙ্কে।

—কত করে' পাচ্ছ ?

—চল্লিশ।

—তা' বেশ,তবে দিশী ব্যাঙ্ক, কবে উঠে যাবে এই যা'।

জগদীশ হয় তো আরো কিছু বলিত, কিন্তু তাহার সমালোচনা শুনিবার আগ্রহ নিতায়ের ছিল না—আচ্ছা ভাই, একটু তাড়াতাড়ি আছে—বলিয়া সে জগদীশকে পাশ কাটাইল।

চলিতে চলিতে নিতায়ের মনে বিরক্তি জাগিল। এম্‌নি করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার লাভ কি! এই নিরানন্দ জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিলেও তো চলে। ঘরে শান্তি নাই, চাকরী চাকরী করিয়া পিতার অবিরাম অসন্তোষ, বাহিরেও তৃপ্তি নাই, একটী পয়সার প্রয়োজন হইলে মায়ের কাছে গিয়া হাত পাতিতে হইবে—প্রতিটী পয়সার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। ভিখারীরাও দেখিয়া-শুনিয়া তাহারই কাছে হাত পাতিবে। বন্ধুদের সঙ্গেও সময় বুঝিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় দেখা হইয়া যাইবে। জীবনটা সহসা মস্ত বিদ্রূপ আর পরিহাসের কেন্দ্রে আসিয়া থামিয়াছে। পারিপার্শ্বিকতার চাপে জীবনটাকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার সহ্যশীলতা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইখানে এই হেয় জীবনের উপর একটা পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিলেও চলে। পরাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ য়ুনিভার্সিটী দাসত্বের যে ডিপ্লোমা তাহার বুকে আঁটিয়া দিয়াছে, তাহার মায়া কাটাইয়া উঠিতে হইবে। পিতৃদত্ত কালো দেহটাকেও ফাঁকী দিতে হইবে। পরজন্মে স্বাধীনদেশের শাদাজাত হইয়া জন্মাইবার সাধনা করিতে হইবে। জীবন-যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা থাকিবে না। কালো দেহটাকে টানিয়া লইয়া দু'মুঠো অন্নের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। সব লজ্জা,সব অপমানের শেষ হইয়া যাইবে। এক সন্ধ্যায় গোলদিঘীর এক বেঞ্চের উপর তাহার নিস্পন্দ দেহটী পড়িয়া থাকিবে। আত্মহত্যাই তাহাকে করিতে হইবে, না হইলে এই দুর্ব্বহ জীবন ভার টানিয়া লইয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব।...

ভাবিতে ভাবিতে নিতাই ফিরিতেছিল। সহসা বহুবাজারের চৌমাথার কাছে পিছন হইতে সুধীন আসিয়া ধরিল, তাহার একটা কাঁধে সজোরে ঝাঁকানি দিয়া সারা-দেহ কাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল—তোরই কথা ভাব্‌ছি আজ ক'দিন ধরে'। মনে করেছিলুম, তোর বাড়ীতেই যাব একবার।

নিতাই জিজ্ঞাসা করিল—কেন ? হঠাৎ আমায় এত দরকার পড়লো যে ?

—আরে, দরকার না থাক্‌লে কি আর শুধু শুধু তোকে খুঁজছি। তারপর···ফির্‌ছিস্ কোত্থেকে, অফিস থেকে না কি ?

—না।

—তবে...কি কর্‌ছিস্ এখন ?

—কিচ্ছু না।

—আমি তো তোকে আগেই বলেছিলুম, মিছে ঘুরে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে এম-এটা পড়্, তা' তো শুন্‌লি না।

—পড়্ বল্‌লেই তো আর পড়া যায় না। পড়ার খরচ দেবে কে ?···টাকা ?

—কেন, একটা ভাল 'ট্যুশনি' জুটিয়ে নিলেই তো পারতিস্ ?

—বলা ভারি সোজা, ভাল ট্যুশনি! যে ট্যুশনিটা করছিলুম, তা'ও দু'মাস হ'ল জবাব হয়ে গেছে।···যাক্, এখন তোর দরকারটা কি বল্‌তো শুনি ?

—আমার বোন্‌টাকে পড়াতে হবে। অচেনা অজানা বাজে মাষ্টার আমি রাখবো না। তাই তোকে খুঁজছিলুম।

—কোন্ বোন ? শেলী ?

—হ্যাঁ, বোন্ তো আমার ওই একটীই, এবার ফার্ষ্ট-ক্লাসে উঠেছে।

নিতাইয়ের বিস্ময় জাগিল, বলিল—বলিস্ কি রে! অতটুকু মেয়ে ফার্ষ্টক্লাসে উঠেছে ?

সুধীনের মুখে এবার হাসির অস্ফুট-প্রকাশ পাইল।

বলিল—আরে, সে কি এখনও অতটুকুই আছে না কি! বছর তিনেক তুই তো তাকে দেখিসই নি, এখন তার চেয়ে অনেক বড় হয়েছে।

নিতাই বুঝিল।

সুধীন তাহাকে শীঘ্র ছাড়িল না। একেবারে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া বসাইল। কতদিন পরে দেখা, খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা না করিলে চলিবে কেন? একথা সেকথা করিয়া অনেক কথারই আলোচনা হইল। শেষে একটা ফাঁক পাইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া সুধীন ডাকিল—শেলী, শেলী!

উপরতলা হইতে উত্তর আসিল—কেন দাদা?

—একবার নীচে আয়।

—যাই—বলিয়া শেলী নামিয়া আসিল। সুধীন তাহাকে নিতায়ের সাম্‌নে আনিয়া বলিল—নিতাই কাল থেকে তোকে পড়াতে আসবে, বুঝ্‌লি?

শেলী ছেলেবেলা হইতে নিতাইকে চেনে। এবাড়ীতে সে বহুবার বহুদিন আসিয়াছে। দাদার কথার উত্তরে শেলী মাথা কাৎ করিয়া জানাইল—আচ্ছা।

শেলীর সঙ্কোচ দেখিয়া নিতাই হাসিল, বলিল—এতটুকু দেখেছিলুম, এর মধ্যেই এতবড় হ'য়ে গেছে!

সুধীন হাসিল, উত্তর দিল—আমিও তো তোকে দেখেছি বইখাতা হাতে করে' স্কুলে যেতে, এখন আর যাস্ না কেন?

শেলী এবার হাসিয়া ফেলিল; হাসিয়া ফেলিয়াই তাড়াতাড়ি সুধীনের পানে চাহিয়া বলিল—দাদা, তা' হ'লে আমি এখন যাই।

—যাবি কি রে? নতুন মাষ্টার-মশায়কে এক কাপ্ চাও খাওয়াবি নে?

নিতাই বলিয়া উঠিল—জানিস্ তো চা আমি খাই নে কি অত্যাচারই করে ওরা চা-বাগানে, নিজের চোখে দেখে এসেছি!

নিতায়ের মুখটা করুণ হইয়া উঠিল, যেন তাহার চোখের সাম্‌নে সত্যই কোনো মেটের চাবুক চা-বাগানের কোনো কুলির পিঠের উপর লাফাইয়া উঠিতেছে।

—বেশ, তবে যা'—বলিয়া সুধীন শেলীকে ছাড়িয়া দিল।

তারপর দুই বন্ধুতে কথা হইল, কি ভাবে পড়াইলে নিতায়ের সুবিধা হইবে, কখন সে আসিবে, ইত্যাদি। তারপর উঠিয়া আসিবার সময় সুধীন বলিল—মাইনের কথা তুই যখন কিছুই বল্‌লি নে, তখন আমিই বলি—উপস্থিত টাকা কুড়ি করে' পাবি, তা'তে হবে না?

কুড়ি টাকায় হইবে না? যখন একটা পয়সা রোজগারের অভাবে তাহার মন বিষাইয়া উঠিয়াছে, তখন সকালে দু'ঘণ্টা একটা মেয়েকে পড়াইবার জন্য কুড়ি টাকা কি কম হইল! নিতাই সুধীনের কথায় ঘাড় নাড়িল; বলিল—খুব হবে, কুড়ি টাকা কি কম হ'ল!

সুধীন হাসিয়া উঠিল। নিতাই বাহির হইয়া আসিল।

পথে চলিতে চলিতে নিতায়ের মনে আনন্দ জাগিল—কাল হইতে তাহার কপর্দ্দকহীন কর্ম্মহীন জীবনের উপর সাময়িকভাবে যবনিকা পড়িবে। মাসের পর মাস কুড়ি টাকা করিয়া পাইলে মন আবার আনন্দময় হইয়া উঠিবে; মানসিক স্ফূর্ত্তি আবার ফিরিয়া আসিবে। বায়োস্কোপ ও ফুটবল-খেলা দেখিবার জন্য অর্থাভাব হইবে না। তাহার উপর দশ-পনেরো টাকা করিয়া মাসে মাসে পিতার হাতে ধরিয়া দিলে, তাঁহার আর এমন রুদ্রমূর্ত্তি থাকিবে না। শুধু পিতা নন্, নিতায়ের অর্জ্জিত রৌপ্যচক্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার পারিপার্শ্বিক জগতের রূপও বদ্‌লাইবে। তাহার জীবনের গতিও হয় তো এই সুযোগে নূতন দিকে ঘুরিয়া যাইবে। ওই শেলীই হয় তো তাহার জীবন-সঙ্গিনী হইবে একদিন। সুধীনের পৈতৃক-সম্পত্তির অর্দ্ধেক হয় তো তখন তাহারই হাতে আসিয়া পড়িবে।... ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে! শেলীকে দেখিতে-শুনিতে কিন্তু ভারী চমৎকার! এই বছর তিন-চারের মধ্যেই কৈশোর হইতে একেবারে যৌবনের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। সুন্দর!...কিন্তু এসব যা' তা'

সে কি ভাবিতেছে ? আবাল্যের বন্ধু সে, তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া সুধীন তাহার বোন্‌কে পড়াইবার জন্য তাহার হাতে ছাড়িয়া দিবে। তাহার উপর সুধীনের কতখানি বিশ্বাস, আর সে কি না এরই মধ্যে একটা 'রোমান্সে'র কল্পনা করিয়া রাখিতেছে।

—এই-ও !—এ-ই—বা বু !

ভাবিতে ভাবিতে নিতাই ফুটপাত হইতে নামিয়া দু'পা আগাইয়া গিয়াছে, সহসা পিছনে সহিসের চীৎকারে চমকিয়া উঠিল। ছুটন্ত ঘোড়াটা তখন প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আত্মরক্ষা করিবার জন্য সচকিত নিতাই ক্ষিপ্রপদে সাম্‌নের দিকে খানিকটা ছুটিয়া গেল। ঘোড়ার গাড়ীটা পাশ দিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু আসিয়া পড়িল একেবারে একখানা মোটরের মুখে। বেগবান মোটর। ড্রাইভার ব্রেক কসিতে কসিতে মোটরখানা তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। ধাক্কা খাইয়া সে ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়িল ট্রাম লাইনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মোটরের একখানা ঘূর্ণমান চাকা একেবারে নিতায়ের পেটের উপর উঠিয়া থামিয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিয়া গেল। অসহ্য যন্ত্রনায় সে ছট্‌ফট করিয়া উঠিল। অফিসের ফিরতি-মুখ। পথ জনারণ্য হইয়া উঠিল। মোটরের ভিতরে বসিয়াছিলেন একজন সাহেব। তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া আহত নিতাইকে ড্রাইভারের সাহায্যে মোটরের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। তারপর তিনি গাড়ী ছুটাইলেন মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে। নিতায়ের আহত পেট তখন ফুলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হাসপাতালে কাচের খাটের উপর নিতাইকে শোয়াইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া হাউস সার্জ্জেন জানাইলেন—নো হোপ্, বট্ উই মাষ্ট্ ট্রাই আওয়ার বেষ্ট। (আশা নেই, তথাপি আমরা চেষ্টার ত্রুটি করবো না।)

মোটরের সাহেব দাঁড়াইয়া রহিলেন। চোখ তাঁহার ছলছল্ করিতেছিল। আধঘণ্টার মধ্যেই নিতায়ের পেটে অস্ত্রোপচার করা হইল।.........

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চিরিয়া ফুঁড়িয়াও কোন ফল হইল না। পেটের অন্ত্রগুলি থেঁতলাইয়া পিষিয়া বিকল হইয়া গিয়াছে ; সেগুলিকে সঠিক্ করিয়া নিতায়ের জ্ঞান আর ফিরাইয়া আনা গেল না। পরদিন সকালে সাতটার সময় তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের কম্পনটুকুও থামিয়া গেল। আসন্ন-মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবনের এই শেষ পনেরো ঘণ্টা কি করিয়া সে কাটাইল তাহা ইতিহাসে লেখে নাই।

ঠিক্ সেই সময় বহুবাজারের একটী বাড়ীর দোতলার পড়ার ঘরে বসিয়া একটী বছর পনেরোর তরুণী মেয়ে নূতন মাষ্টারের আগমন প্রতীক্ষায় পড়ার বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়া নীচে পথের পানে চাহিতেছিল।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ভৌতিক গল্প
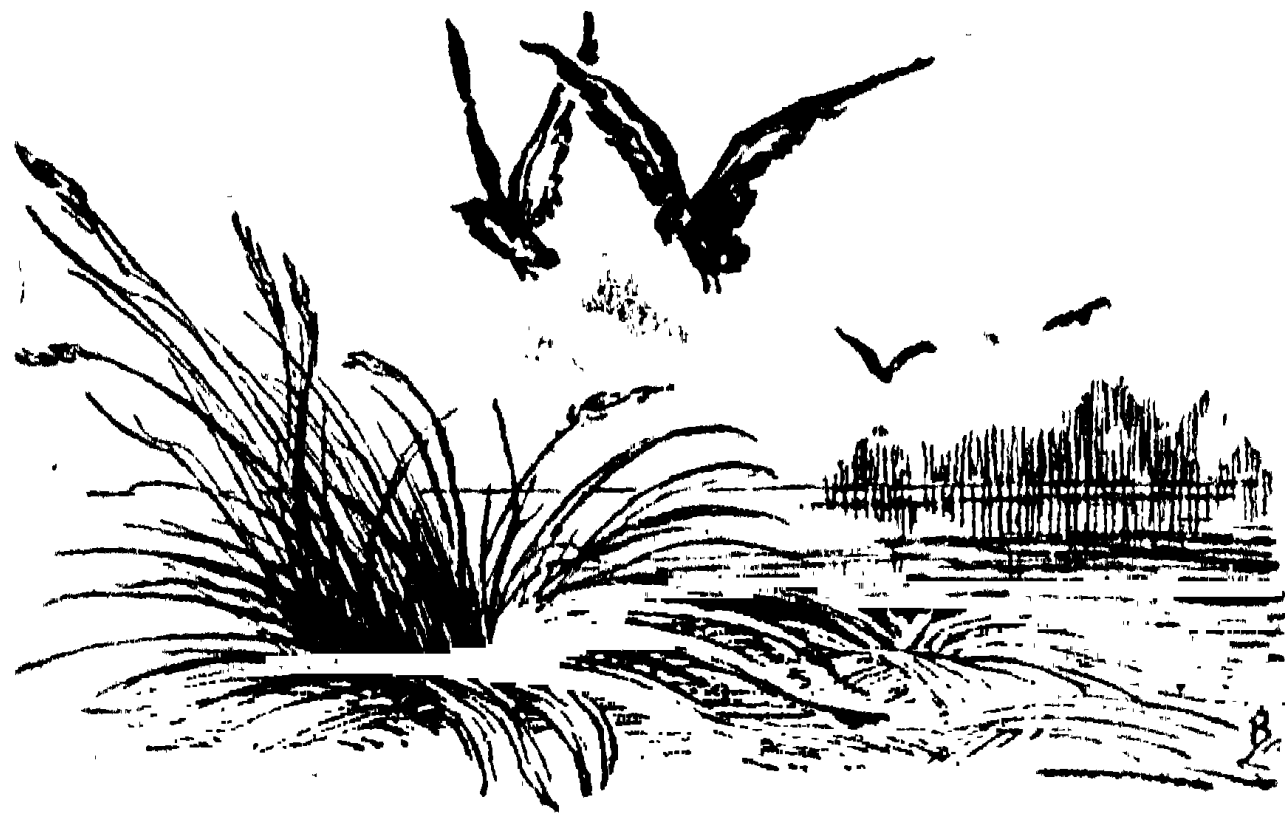
ভূতের হাতে

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম-এ

[সত্য-ঘটনা-অবলম্বনে]

বেশীদিনের নয়, প্রায় বছর দুই আগের কথা। আমি তখন বর্দ্ধমান জেলায় একটা পল্লীগ্রামের হাইস্কুলে হেডমাষ্টারী করি। এম-এ পাশ করার পর প্রায় বছরখানেক বসে থাক্‌তে হয়েছিল; তারপর কাজটা জোটায় ওখানে চলে' যাই। জায়গাটা একেবারে খাঁটি পাড়াগাঁ—রাঢ়ের পল্লীর সমস্ত বিশেষত্বগুলি স্থানটীতে বর্ত্তমান—সহরের সভ্যতা ও আবিলতার সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিচয় খুব কমই।

গ্রামের বাহিরে একটা উচ্চ প্রান্তর; ওদেশের ভাষায় বলে 'ডাঙা।' সেইখানে স্থানটাকে চৌরশ করে' বেশ একটা ময়দানের মত করে' নেওয়া হয়েছে। তারি তিন দিক্‌ ঘিরে লম্বা তিন সারিতে খানকতক মেটেঘর—খড়ের ছাউনি, সিমেণ্ট করা মেঝে। খানদশেক ঘরে ক্লাস হয়—বাকী-গুলোতে বোডিং, ছেলে ও মাষ্টারেরা থাকে। ছেলেদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই আছে। মুসলমানদের বোডিং ও খাবার জায়গা আলাদা। মধ্যে খোলা স্থানটা স্কুল কম্পাউণ্ড—ছেলেরা সেখানে খেলা করে; গরমের দিনে সন্ধ্যাবেলায় মাদুর বিছিয়ে বসে' লেখাপড়া করে। বর্ষার সময় স্থানটা জলে ভরে' যায়; ছোট ছোট ছেলেরা নৌকা ভাসিয়ে আনন্দ করে। চতুর্দ্দিকে মাঠ, তারি মধ্যে স্কুল—প্রকৃতির একেবারে ক্রোড়ের মধ্যেই ছেলেদের শিক্ষা হয়। আশে-পাশের গ্রাম থেকে মাঠ ভেঙে ছেলেরা আসে—গ্রীষ্মের রোদে পোড়ে, বর্ষার জলে ভেজে। দল বেঁধে আসে, ছুটীর পর দল বেঁধে বাড়ী ফেরে। রোদের সময় মাঠের মধ্যে বটের ছায়ায় বিশ্রাম করে; তারপর দু' পাশে ধানের ক্ষেত ছাড়িয়ে আলপথ বেয়ে পদ্মদীঘির পাড় ভেঙে বৈঁচি বনের পাশ দিয়ে সন্ধ্যার আগে ঘরে ফেরে—পথের কণ্টক তারা আমলেই আনে না। সহর থেকে এসে রাঢ়ের পল্লীর সরল জীবন যাত্রা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে মনটা খুবই প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল।

আমি যখন সেখানে যাই, তখন ফাল্গুনের প্রথম। সকাল ও মাঝরাতে বেশ একটু শীতের আমেজ তখনও আছে। দুপুর ও সন্ধ্যায় কিন্তু খুবই গরম; তার উপর আবার মাঠের মধ্যে বাস—কাজেই গরমটা আরও বেশী লাগে। তাই সন্ধ্যাবেলা স্কুল গ্রাউণ্ডের খোলা জায়গায় মাদুর পেতে বস্‌তাম। বোডিংয়ে আমরা মাষ্টারেরা থাকৃতাম প্রায় আট-নয়জন। ছেলেদের সংখ্যাও প্রায় তিরিশের ওপর। স্কুলের কাজে যতক্ষণ থাকৃতাম, ততক্ষণ হেডমাষ্টারের গাম্ভীর্য্যের বর্ম্ম পরে থাকতেই হ'ত; সন্ধ্যাবেলা অসীম নীলাকাশের তলে জোৎস্নার আলোতে বসে' ফাল্গুনের দখিণা হাওয়ায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের বর্ম্ম খসে' পড়্‌ত। তখন আর আমাদের মধ্যে ছোট-বড় কেউ থাকৃত না—সব সমান। সব শিক্ষকই প্রাণ খুলে সকলের সঙ্গে হাসি-গল্প, ঠাট্টা-তামাসা করত; আমাকেও হেডমাষ্টার বলে' তারা রেহাই

দিত না। আর আমার বয়সও কাঁচা, প্রায় সকলেই সমবয়সী, কাজেই মনের মিল্‌টাও বেশ ভালই হয়েছিল।

বোর্ডিংয়ে রাত দশটার কমে কোনদিনই খাওয়া হ'ত না—কাজেই সন্ধ্যা হ'লেই আমরা সব শিক্ষক মিলে গ্রাউণ্ডের একধারে বসে জটলা করতাম। আমাদের আর একজন সঙ্গী রোজই এসে জুটতেন এই সন্ধ্যার মজলিসে—তিনি হচ্ছেন আমাদের স্কুলের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। আমাদেরই সমবয়সী; খুব আমুদে ও গল্পপ্রিয় লোক। ভদ্রলোকের বাড়ী ওই গ্রামেই। আশপাশের দশখানা গ্রামের মধ্যে তিনিই একমাত্র পাশকরা ডাক্তার। কাজকর্ম্ম সেরে সন্ধ্যাবেলায় স্কুলে এসে আমাদের সঙ্গে আড্ডা না জমিয়ে ভদ্রলোক মোটেই থাক্‌তে পার্‌তেন না।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত। আকাশ ও ধরণী চাঁদের আলোয় ভরে' গেছে। ঝির্‌ঝির্ ক'রে হাওয়া বইছে; তার সঙ্গে ভেসে আস্‌ছে আম্র মুকুলের সৌরভ, আর নাম-না-জানা কোনো বনফুলের গন্ধ। আমরা ফাঁকা মাঠটায় বসে' গল্প-গুজব কর্‌ছি। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র—শস্যহীন, ধূ ধূ করছে। ছেলেরা সব যে যার লেখাপড়ায় মগ্ন। কথায় কথায় ভূত-সম্বন্ধে আলোচনা উঠ্‌ল। থার্ড মাষ্টার নিতাইবাবু বল্‌লেন—"যাই বলেন আপনারা, আমি কিন্তু ভূতটুত মোটেই মানি না। আমি ত আজ পাঁচ বছর এই মাঠের মধ্যে বাস কর্‌ছি, একদিনও ত কই ওসব কিছুই দেখ্‌লাম না। শুনেছিলাম, ওই যে দূরে 'মাসুন্দির মাঠ'—ওখানে এক ময়রা বুড়ী ভূত হ'য়ে আছে। কত লোককে সে দেখা দিয়েছে। রাত-বিরেতে মাঠ দিয়ে আস্‌তে কতলোক দেখেছে—মাঠের মধ্যে উনুন জ্বালিয়ে বুড়ী বেগুনী ভাজ্‌ছে; ঠিক্ যেমন সে করত বেঁচে থাক্‌তে। কিন্তু কতদিন ওই মাঠ দিয়ে 'মাসুন্দি' পার হ'য়ে জলাটার পাশ দিয়ে কাটোয়া থেকে এখানে এসেছি—কোনদিন ত কাউকে দেখ্‌তে পাই নি। হ্যাঁ, ভূত আবার আছে। আমরা নিজেরাই ত এক-একটা আস্ত ভূত—না হ'লে এই মাঠে বাস কর্‌তে আসি।"

থার্ড মাষ্টারের কথায় অনেকেই হেসে সায় দিলেন। সেকেণ্ড পণ্ডিত বল্‌লেন—"যা' বলেছেন মশায়, ভূত-প্রেতযোনী ও সব মনের ভ্রম। আজ এই যে এখানে স্কুল বসেছে, ডাঙা কেটে বসতি হয়েছে, এখানে এককালে কি ছিল? সে সব ত আমাদের চোখে দেখা। মস্তবড় ডাঙা, চারদিকে আস্‌শেওড়া আর শেয়ালকাঁটার বন; মধ্যে মধ্যে খেজুর গাছ, তার তলায় সেয়াকুলের ঝোপ। আর ওই যে জায়গাটায় আজ ফার্ষ্টক্লাস বসছে, ওইখানে ছিল একটা মস্তবড় আমগাছ; তার তলা দিয়ে ছিল পায়ে-চলার পথ উদ্ধারণপুরের ঘাট পর্য্যন্ত। দশ-পনের ক্রোশ থেকে লোক আস্‌ত মড়া গঙ্গায় দিতে। ওই পথ দিয়ে যেত। রাত হ'য়ে গেলে মড়া টাঙিয়ে রাখ্‌ত সেই আমগাছটায়, আর গ্রামের মধ্যে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসত এর-ওর বাড়ীতে। তারপর সকাল হ'লে মড়া নিয়ে আবার হাঁট্‌তে সুরু কর্‌ত। কত লোক রাতে গাছে টাঙান মড়াকে মাঠের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে দেখেছে। কতদিন এ পথে আনাগোনা করেছি; যজমান-বাড়ী যেতে-আস্‌তে রাতও কখন কখন হ'ত বই কি—কিন্তু কোনদিন ত কিছু দেখি নি মশায়।"

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ চুপ করে' শুন্‌ছিলেন, এখন বল্‌লেন—"আপনারা ত ভূতকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার জীবনে এমন একটা ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে, যাতে আমি ভূতের অস্তিত্বের কথাটাকে একেবারে অস্বীকার কর্‌তে পারি না।"

তাঁর কথা শুনে আমরা সব উৎসুক হয়ে উঠ্‌লাম গল্পটা শোন্‌বার জন্যে। ডাক্তারবাবু একবার কেশে নিয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—

আমি তখন সবে পাশ করে' গ্রামে ফিরেছি—ইচ্ছা, এখানে বসেই প্রাক্‌টিশ্ করবো। সহরে হাজার হাজার ডাক্তার; তার মধ্যে স্থান করে' নেওয়া বড় শক্ত। আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার-বদ্দির বড় অভাব; কাজেই ভাবলাম, হয় ত পশারটা মন্দ জম্‌বে না। যা' ভেবেছিলাম হ'লও তাই। এই ত দেখ্‌ছেন, আমাদের গাঁ—এর দশ ক্রোশের মধ্যে পাশকরা ডাক্তার আর নেই—যা' আছে, তাদের হাতুড়ে বল্‌লেই হয়। তাদের বিদ্যে

ওই ফিভার মিক্শ্চার আর কুইনাইন মিক্শ্চার পর্য্যন্ত—কাজেই শক্ত কেস্ হ'লেই আমার ডাক্ পড়্ত। দেখ্তে দেখ্তে বেশ নামডাক হ'য়ে গেল; হাতে পয়সাও বেশ আস্তে লাগ্ল। যে গ্রামে একটা শক্ত 'কেস্' সারাতে পার্তাম, সেখানে ধন্য ধন্য পড়ে যেত—সেখানকার সব 'কল্'গুলোই পেতাম। তবে আমার ভিজিট ছিল একটু বেশী - না হ'লে মান থাকে না। গরীব লোকেরা তাই প্রথমে ডাক্তে পার্ত না; শেষে নাচার হ'য়ে পড়লে তবে সে সব ঘরে 'কল্' পেতাম। রুগী দেখ্তে আমায় কতদিন কত জায়গায় যেতে হয়েছে, বাড়ী ফিরতে কতদিন রাতও হয়ে গেছে, আবার রাতেও কত শক্ত 'কেস্' দেখতে যেতে হয়েছে। যে ঘটনাটা বল্‌ছি, সেটা ঘটেছিল এমনি এক রুগী দেখ্তে গিয়ে। এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় দূরে একটা গ্রাম—নাম ক্ষীরপুর। দুপুরবেলা লোক এসে হাজির। তখনি যেতে হবে, 'ডেলিভারি কেস্।' তিনদিন ব্যথা খাচ্ছে; এখনও সন্তান হয় নি—প্রসূতি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। ধড়াচূড়ো পরে তৈরী হয়ে নিলাম। আমার বেহারা হরি ওষুধের বাক্স মাথায় করে' লোক দু'টার সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়্ল। সবে ভাত খেয়ে উঠেছি, একটু বিশ্রামের ইচ্ছে ছিল—তা' আর হ'য়ে উঠ্ল না, উঠে পড়্লাম। আমাদের এ পাড়াগাঁ—মাঠে মাঠে আলপথে প্রায়ই যেতে হয়; কাজেই ঘোড়াই এ পথের সব চেয়ে ভাল বাহন। তবে গ্রীষ্মকালে সাইকেল্‌ও চলে।

ওদের গ্রামে পৌঁছে রোগিনীকে দেখে বুঝ্লাম, অবস্থা ভাল নয়—সন্তান ও প্রসূতির একজন বাঁচতে পারে, দু'জন নয়। তারপর অনেক চেষ্টার পর ঘণ্টাকতক পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করে' মেয়েটী একটু সুস্থ হ'ল। তার শুশ্রূষার ও ঔষধের ব্যবস্থাদি কর্‌তে অনেক দেরী হয়ে গেল। সুমুখে আঁধার রাত, বাড়ী ফির্‌তে কোন্ না রাত ন'টা-দশটা হবে। তা'তে আবার বিকেলে এক পসলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে; মেঠো পথ, বেশ কাদাও হয়েছে। তারা বল্লে—"ডাক্তারবাবু, আজ আর যাবেন না, গেলে রাস্তায় কষ্ট পাবেন। আকাশে এখনও মেঘ রয়েছে, পথে বৃষ্টি হ'তে পারে।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ্লাম, সত্যই ঘন অন্ধকার; কিন্তু ওদের বাড়ী থাক্‌তে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। বল্লাম—"ঘোড়ায় যাব, এই ত ক'মাইল পথ, কতক্ষণ আর লাগ্‌বে? তোমরা বরং একটা হ্যারিকেন আলো দাও।"

তারা একটা আলো দিলে—রোগিনীর সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে হরিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়্লাম।

গ্রাম পার হ'য়ে মুসলমানপাড়া ছাড়াতে-না-ছাড়াতেই টিপ্‌টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়্তে লাগ্ল। হরি বল্লে—"বাবু, থাক্‌লেই হ'ত, এই দেখুন বৃষ্টি নাম্ল।"

তখন গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে পড়েছি। একবার মনে হ'ল, ফিরে যাই। আবার ভাব্লাম, বেরিয়ে পড়েছি যখন, তখন বাড়ী গিয়ে পৌঁছবই যে করে' হোক্। দুর্ব্বুদ্ধি আমার! কপালে কষ্ট আছে, কে খণ্ডাবে বলুন। তখন যদি ফিরে যেতাম, তা' হ'লে কিছুই হ'ত না, আর আপনাদেরও আজ এ গল্প বল্‌বার অবসর পেতাম না।

দু'-পাঁচখানা মাঠ পার হ'য়ে আস্‌তেই খুব জোরে বৃষ্টি নাম্ল। ধারা বর্ষণের মধ্য দিয়েই আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে চল্‌তে লাগ্লাম। হরি আলো ধরে আগে আগে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে একটা খাল পড়ে আমাদের দেশে তাকে বলে 'কাঁদর।' তা'তে সব সময়েই জল থাকে—বর্ষা-কালে খুব বেশী জল হয়, সাঁতার দিয়ে পার হ'তে হয়; অন্য অন্য সময় হেঁটেই পার হওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় গ্রামের লোকেরা বাঁশের সাঁকো করে' দেয় পারাপারের সুবিধার জন্যে। যে সময়ের কথা বল্‌ছি, তখন সবেমাত্র বর্ষা পড়েছে। তখনও 'কাঁদর' ছাপায় নি; ঘোড়ায় চড়ে পার হবার কোন অসুবিধা নেই। ক্ষীরপুর থেকে মাইলখানেক এলে পর 'কাঁদর' পড়ে; তারপরই বাদশাই সড়ক—সোজা এসে আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই পথেই আমরা যাতায়াত করি। 'কাঁদরে'র ধারে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। জামা-কাপড় সব ভিজে গেছে। হরি বেচারার ত দুর্দ্দশার সীমা নাই—তার মাথায় ওষুধের বাক্স, হাতে হ্যারিকেন। এক-একটা দম্‌কা হাওয়া আসছে, আর আলোটা নিব্-

নিবু হচ্ছে। যেখানে আমরা খালটা পার হই, সেখানে খালের ধারে বেশ বড় বাঁধ। বাঁধের উপর বাব্‌লা গাছের সারি; তারই তলা দিয়ে পারঘাট। ক্ষীরপুর থেকে যে মেঠো পথ ধরে' যাতায়াত হয়, ঠিক্ সেই পথ ধরেই এসেছি—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বাঁধ বা বাব্‌লা গাছের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেলাম না—এ ত পারঘাট নয়! ভাব্‌লাম, পথ ভুল হ'ল না কি? হরিকে শুধালাম—"হরি, ঘাট কই রে?"

সেও যেন অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। বল্‌লে—"তাই ত বাবু, এ কোন্ জায়গায় এলাম—এ ত বাবলাকাটীর ঘাট নয়। পথ ভুল হ'ল নাকি?" এই বলে' সে লণ্ঠন তুলে ধরে' পেছনের পথের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"না, ঠিক্ পথেই ত এসেছি—এই ত বেশ পষ্ট আল-পথ রয়েছে।"

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—যেন একটা অজানা আতঙ্কের ছাপ। বল্‌লাম—পথই ভুল হয়েছে। একটু আগে যা' দেখি, ঘাট পাবি এখন।"

দু'জনে এগিয়ে চল্‌লাম। খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঠের মধ্যে হুহু করে হাওয়া বইছে। বৃষ্টির ছাট্‌গুলো গায়ে এসে বিঁধছে তীরের মত। প্রায় দু'রশি পথ খালের ধারে ধারে গেলাম—ঘাট আর নজরে পড়ে না। কি বিপদ! কি হ'ল কিছু ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। দেখ্‌লাম, হরি রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। সে বল্‌লে—"বাবু, আমাদের দিশে লেগেছে নিশ্চয়ই—আজ দশবৎসর এ পথে যাই-আসি, এমনটা ত কখন হয় নি।"

তার কথাটায় সায় দিতে না পার্‌লেও মনে কিন্তু বেশ একটা খট্‌কা লাগ্‌ল। আর না এগিয়ে আবার 'কাঁদরে'র দিকে ধীরে ধীরে পেছিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লাম। এমনি প্রায় আধঘণ্টা ধরে' খালের ধারে ঘুরে বেড়ালাম—কিন্তু কই, পারঘাটা ত পেলাম না। এইবার সত্যই মনে ভয় হ'তে লাগ্‌ল। এমন সময় একটা দম্‌কা হাওয়ায় আলোটা নিবে গেল। বিপদের উপর বিপদ! কয়েকবার ঘোরাঘুরির পর আঘাটা দিয়েই জলে নাম্‌ব কি না ভাবছি, এমন সময় বিদ্যুৎ চম্‌কাল। সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম—ঠিক্ পারঘাটাতেই দাঁড়িয়ে আছি। দু'ধারে বাঁধ; তার উপর বাব্‌লা গাছের সারি বৃষ্টি-ঝড়ের ঝাপ্‌টায় নুয়ে নুয়ে পড়্‌ছে। মনে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল তার জন্যে একটু লজ্জিতই হ'লাম। হরিকে বল্‌লাম—"এই ত ঘাট রে, অন্ধকারে কেবল ভুল পথে ঘুরে মর্‌ছিলাম। নে চ' নামি।"

হরি কোন কথা বল্‌লে না; দু'জনে খালপার হয়ে এ পারের বাঁধে এসে উঠ্‌লাম। তখন বৃষ্টির জোর একটু থেমেছে। হরি বল্‌লে—"বাবু, আপনি শুন্‌লেন না, আজ না বেরুলেই ভাল হ'ত। কি নাকাল দেখুন দেখি!"

কিছু না বলে' এগিয়ে চল্‌লাম। খানিকটা গিয়েই পেলাম বাদসাই সড়ক। তখন টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে কিন্তু মেঘ যেন উথলে উথলে উঠ্‌ছে। মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দ, চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে দম্‌কা হাওয়া—প্রকৃতি যেন রণ-মুখরা। মনে হ'তে লাগ্‌ল, সত্যই পথে বেরিয়ে ভাল কাজ হয় নি। পথে নতুন মাটি দিয়েছে; কাদায় পথ ভরে' গেছে। আঁঠাল মাটির পেছল; এখানে পা দিতে ওখানে পড়ে। খালের ধার থেকে খানিকটা পথ এসেছি, বেশ স্পষ্ট মনে হ'ল, আমার ডানদিকে একটা কি রকম ঘুংঘুং শব্দ হচ্ছে। ঘোড়াটা একটু উৎকর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। তারপর আর একটু আগে যেতেই সে শব্দটা ঘোড়ার বাঁদিক্ থেকে হ'তে লাগ্‌ল, তারপর আবার ডানদিকে। ভাব্‌লাম, শেয়াল-টেয়াল হবে বোধ হয়। কিন্তু যতই আগে যাই, ততই স্পষ্ট শুন্‌তে পাই একবার ডানদিকে শব্দ হচ্ছে ঘুংঘুং, আরবার বাঁদিকে। অদূরে একটা শ্মশান আছে, তার পাশ দিয়ে পথ। মনে বেশ একটু ভয় হ'ল। হরিকে বল্‌লাম—"হরি, কিছু শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছিস?"

সে বল্‌লে—"কই বাবু, না ত!"

ভাব্‌লাম, আমারই বোধ হয় মনের ভুল। কিন্তু মনের ভুলই বা বলি কি করে'—এ যে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আমি শুন্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু হরি পাচ্ছে না কেন? ঘোড়াকে একটু দাঁড় করালাম। হরিকে বল্‌লাম—"একটু দাঁড়া, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই।"

বৃষ্টি প্রায় ছেড়েছে, কিন্তু টিপ্‌টিপুনি তখনও

চলেছে। ঘোড়াটা দাঁড়াতেই কিন্তু আর কোন শব্দ নেই। ভাব্‌লাম, মনেরই ভুল নিশ্চয়। আবার এগিয়ে চল্‌লাম—পথ যেন শেষ হ'তেই চায় না। কই, শ্মশানটা ত দেখা যাচ্ছে না—সেটা ত খাল থেকে বেশী দূর নয়। ভাব্‌লাম, অন্ধকারে হয় ত ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। একটু আগে যেতেই আবার সেই শব্দ। এবার মনে হ'ল খুব নিকটেই, একেবারে ঘোড়ার ঠিক্ পাশেই। চেয়ে দেখ্‌লাম—ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না! কি হ'ল ঠিক্ বুঝ্‌তে পারলাম না। এবার ঘোড়াটাও যেন বেশ চঞ্চল হ'য়ে পড়েছে। হরি কিন্তু আগে আগে নির্ব্বিকারভাবে চলেছে; তাকে এসব বলে' আর তার মনে আতঙ্ক আন্‌তে ইচ্ছা হ'ল না। কিন্তু বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লাম—কে যেন ঠিক্ আমার পাশে পাশে যাচ্ছে—তার নিশ্বাস যেন আমার গায়ে এসে লাগ্‌ছে। আবার জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। একটু জোরে চল্‌বার জন্য ঘোড়ার পেটের তলায় পা দিয়ে একটু আঘাত কর্‌লাম; কিন্তু সে নড়ল না। এমন সময় কক্কড় করে' মেঘ ডেকে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চম্‌কাল। সেই বিদ্যুতের আলোয় দেখ্‌লাম—উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর! আজও যেন চোখ বুজ্‌লে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। দেখ্‌লাম, প্রকাণ্ড একটা কালো ঘোড়া তীরবেগে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে। তার চোখ দিয়ে নাক দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। ঘাড় নীচু করে' মাটিতে পা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে উল্কার মত ছুটে আস্‌ছে। ভয়ে দেহ অসাড় হ'য়ে গেল আমার। ঘোড়াটা থম্‌কে দাঁড়িয়ে একটা বিরাট চিঁহি চিঁহি রব তুলে সড়ক ছেড়ে প্রাণপণে মাঠের দিকে দৌড়তে লাগ্‌ল। আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল—কি করে' যে ঘোড়ার রাশ তখনও ধরে-ছিলাম তা' জানি না। ভয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল; হরি বলে' ডাক্‌তেও পার্‌লাম না। মনে হ'তে লাগ্‌ল। ছুটো আগুনের ভাঁটা যেন উল্কাবেগে আমার পেছনে ধেয়ে আস্‌ছে। ডাঙা ডহর আল ভেঙে আমায় পিঠে নিয়ে ঘোড়াটা চার পা তুলে প্রাণপণে ছুটে চলেছে। মেঘের গর্জ্জন, বৃষ্টির ঝমঝমানি, বাতাসের হাহারব সব মিলে মনে হ'ল যেন আমায় গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে। কতক্ষণ যে এভাবে ছুটেছিলাম মনে নেই—পাঁচ মিনিটও হ'তে পারে, আবার পচিশ মিনিটও হ'তে পারে। কোথায় চলেছি তার কোন খেয়াল নেই। অনেকটা পথ আসার পর যেন সে ভাবটা কেটে গেল। হাতে পায়ে জোর পেলাম। ঘোড়ার রাশটা ধরে' তার গতি সংযত কর্‌লাম। মূক প্রাণীটা তখন হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্‌ছে, সারাগায়ে দরদর করে' ঘাম ঝর্‌ছে, মুখের দু'পাশ দিয়ে ফেনা বার হচ্ছে, আর চোখ ছুটো যেন বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তার গায়ে দু'-চারটে আদরের চাপড় দিলাম। আমার নিজের শরীর ত কাঁপছে, তার চেয়ে আরও বেশী কাঁপ্‌ছে জন্তুটা। ঘোড়াটা একটু সুস্থ হ'ল। চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম—কোথায় এসেছি, বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। শুধু অন্ধকার, আর ঝম্‌ঝম্ করে' বৃষ্টির ধারা। মাঠের মাঝে একটা অশ্বথ গাছ দেখ্‌লাম; তার তলায় ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোন্ মুখে এসেছি, কোথা দিয়ে বাড়ী যাব কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌লাম না। কোট-প্যান্ট সব ভিজে জব্‌জবে; মাথার টুপিটা কোথায় যে উড়ে গেছে তার ঠিক্ নেই। এ অবস্থায় কি করি ভাব্‌ছি, এমন সময় দেখি একটা বনের আড়াল থেকে মানুষের কথার শব্দ ভেসে আস্‌ছে। খানিক পরে দেখি, একটা আলো নিয়ে জন চার-পাঁচ লোক এই দিকেই আস্‌ছে। দেখে একটু আশ্বস্ত হ'লাম। তারা কাছে এসে হাঁক্‌ল—"এখানে দাঁড়িয়ে কে?"

বল্‌লাম—"আমি নলিন ডাক্তার।"

—"কে, ডাক্তারবাবু, এত রাতে এখানে এ বেশে কেন?"

সংক্ষেপে সব বল্‌লাম।

তারা বল্‌লে—"বাবু, আপনি গোঁয়ার্ত্তুমি করে' ঝড়-জলে বেরিয়ে ভাল করেন নি। খাল পারে একটা ভয়ের জায়গা আছে—অনেকেই ওখানে ভয় পায়। আপনারা লেখাপড়া জানা লোক, হয় ত বিশ্বাস কর্‌বেন না—কিন্তু এ যে সত্যি এতে কোন ভুল নেই।

—"অনেকদিন আগে এমনিতর এক বর্ষার পরের দিন সকালে সকলে দেখ্‌লে—আলের ধারে একটী সুন্দর

টুকটুকে ছেলে পড়ে' আছে, আর তার সাম্‌নে তারই জ্ঞানশূন্য মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো ঘোড়া। কিন্তু তার দিকে এগুবার কারও সাধ্য হ'ল না। ঘোড়াটা বিকট আওয়াজ করে' তেড়ে তেড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

—"গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। ছেলেটীর প্রাণ আছে কি না বোঝা গেল না। পুলিশে খবর গেল। লাঠিসোটায় কিছুতেই ঘোড়াটাকে সরান যখন সম্ভব হ'ল না, তখন গুলি করে' তাকে মেরে ফেলে ছেলেটীকে শুশ্রূষা কর্‌তে সকলে এগিয়ে এল—কিন্তু বৃথা চেষ্টা, তখন সব শেষ হয়ে গেছে!

—"খোঁজ নিয়ে জান্‌তে পারা গেল, জ্ঞাতি-শত্রুদের চক্রান্তে জীবন বিপন্ন জান্‌তে পেরে ছেলেটী একমাত্র বিশ্বাসী ঘোড়াটিকে নিয়ে বহুদূর গ্রাম থেকে পালিয়ে আস্‌ছিল। বোধ হয় বৃষ্টিতে পথ ঠিক্ কর্‌তে না পারায় এবং ক্লান্ত অবসন্ন দেহভার বহন কর্‌বার শক্তি না থাকায় এইখানেই চিরজীবনের মত ঢলে পড়ে। প্রভুভক্ত ঘোড়া তার প্রভুর দেহ রক্ষা কর্‌বার জন্যে আজও সারারাত ধরে' পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

—"ভাগ্যে আমরা রাতের ট্রেণে কাটোয়া থেকে ফির্‌ছি, তা' না হ'লে সারারাত হয় ত আপনাকে এই গাছতলায় বসে' থাক্‌তে হ'ত। বাদশাই সড়ক থেকে কত পথ এসেছেন, সে খেয়াল আছে কি?"

শুধালাম—"কত?"

—"প্রায় দু' ক্রোশ।"

তারপর তাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে এসে সড়কে উঠ্‌লাম। ঘড়ি খুলে দেখ্‌লাম, রাত তখন বারটা। পথে হরির কি হয়েছিল জানি না—তার চিহ্নও দেখ্‌তে পেলাম না। লোকগুলিকে বল্‌লাম—"বাপু, এতটা পথ যখন আলো দেখিয়ে নিয়ে এলে, তখন আর একটু কষ্ট করে' গ্রামের মধ্যে আমায় দিয়ে তোমরা না হয় যেও—আজ আমার বাড়ীতেই না হয় রাতটা কাটিয়ে যাও।"

তারা বল্‌লে—"না ডাক্তারবাবু, বাড়ী আজ রাতে আমাদের যেতেই হবে। তবে চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

খানিক পরে গ্রামে এসে পৌছলাম। বৃষ্টি তখন ছেড়ে গেছে। দেখ্‌লাম—লাঠি ও আলো হাতে পাঁচ-ছ'জন লোক গ্রাম থেকে বেরুচ্ছে। কাছে আস্‌তে দেখলাম—দাদা, হরি, আর আমাদের কৃষাণ তিনজন আমারই খোঁজে চলেছে। আমায় দেখ্‌তে পেয়ে সকলে আনন্দে চীৎকার করে' উঠ্‌ল। দাদা বল্‌লে—"কি হয়েছিল রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? হরির সঙ্গে তোকে না আস্‌তে দেখে ভেবে মরি আর কি! ব্যাপার কি?"

বল্‌লাম—"বাড়ী চলো, সব বল্‌ব 'খন।"

সঙ্গের লোকগুলি বল্‌ল—"ডাক্তারবাবু, আমরা তবে যাই এখন।"

বল্‌লাম—"আজ আর নাই গেলে ও পথে।"

তারা হেসে বল্‌লে—"না বাবু, আমাদের সে ভয় নেই—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান। ঝড়-জলের রাতে আর যেন কোথায় ডাকে বার হবেন না।"

বাড়ী এসে দেখি, মেয়েরা সব পাংশুমুখে দাওয়ায় আলো জ্বেলে বসে' আছে উৎসুক প্রতীক্ষায়। বাড়ী ঢুক্‌তেই মা বল্‌লেন—"কি রে, নলিনকে পেলি?"

দাদা বল্‌লেন—"হাঁ।"

তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর সব কথা তাদের বলে', হরিকে শুধালাম—"হাঁরে, তুই কিছু দেখিস্ নি—ছিলিই বা কোথায়?"

সে বল্‌লে—"কই, কিছু দেখি নি ত বাবু। বৃষ্টিটা জোরে আস্‌তে একটু তাড়াতাড়ি এসে বৈরিগীতলার হাটে আশ্রয় নিয়েছিলাম—আমি কিছুই দেখি নি।"

দাদা বল্‌লেন—"তুই যেমন ভীতু! কি একটা পাখী-টাখী হয় ত ঘুঁৎ ঘুঁৎ শব্দ কচ্ছিল, তুই মনে কর্‌লি ভূত।"

আমি বল্‌লাম—"তা' নয় শব্দটা পাখীরই হ'ল—কিন্তু ওই উল্কামুখী প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটা?"

দাদা আর কিছু না বলে' চুপ করে' রইলেন।

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)
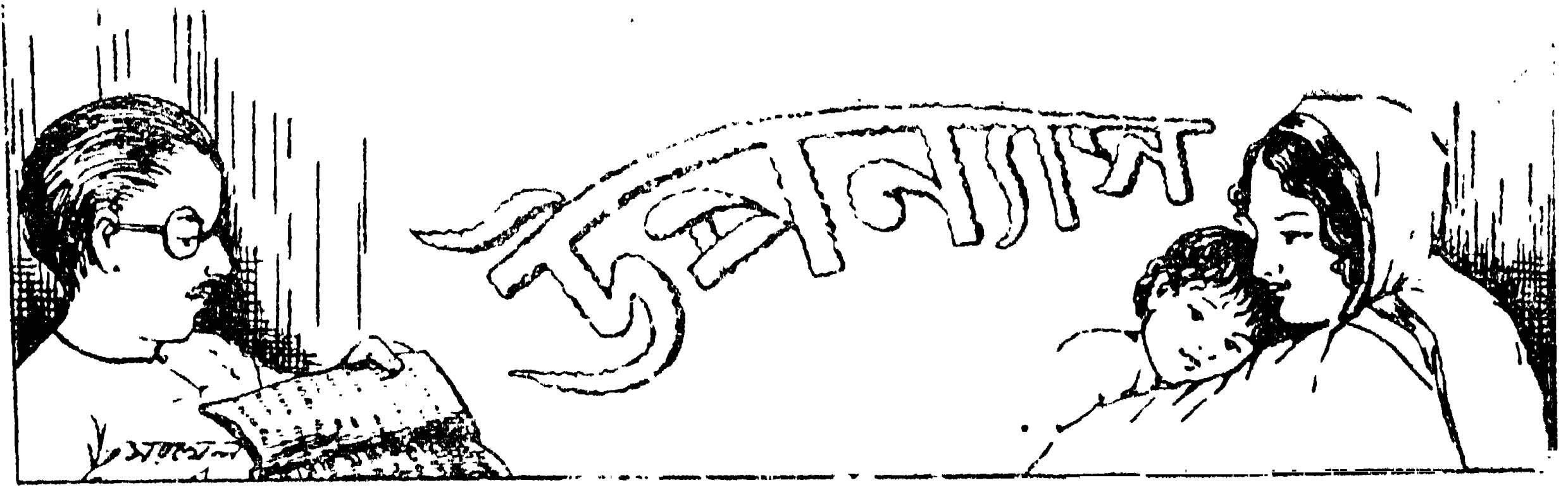
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন

অজয় পাথরের মত অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল—সরযূ ?

সরযূ বলিল—কি ?

—আমি তোমাকে পথে বসালাম।

সরযূ ধীরকণ্ঠে বলিল—বাবা বল্‌তেন—উপলক্ষ একটা কিছু থাক্‌লেও তাকে দোষ দেওয়া উচিত নয় ; মানুষ নিজের কর্ম্মের ফলই নিজে ভোগ করে। তুমি অযথা আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না।

অজয় বোধ করি কণ্ঠের ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছিল ; চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারিল না।

সরযূ চিঠিখানা লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল—ক'দিন থেকে ভেবে দেখ্‌লাম অজয় দা', খনির ম্যানেজার-এর মুখের কথায় চুপ করে থাকা উচিত নয়। একখানি লিখিত দাবী জানান দরকার।

অজয়ের চোখ দুইটায় এতক্ষণে ধারা গড়াইয়া পড়িল। বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কঠোর বাস্তবের ঝঞ্ঝাঘাতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে—তাই সরযূ আগে হইতে প্রস্তুত হইতে চায়। সে ধীরকণ্ঠে কহিল—দেওয়া উচিত, কিন্তু এখানে লিখ্‌বে কে ? দেখ্‌ছ না কাজ যাবার ভয়ে কলের কোন শিক্ষিত কর্ম্মচারীই আর আমার কাছে আসে না পর্য্যন্ত। অমর—

—সে লেখা যা' হোক্ হয়ে যাবে 'খন। বাবার কাছে আমি অল্প-সল্প পড়েছি, অবশ্য তা'তে বেশী কিছু ফল হবে না। তবু যদি তুমি ভুল সংশোধন করে দাও। একটা খসড়া যা' হোক্ করে রেখেছি, দেখ্‌বে সেখানা বলিয়া কোন উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি সেটা আনিবার উদ্দেশে বাহিরে আসিয়া একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল।

মধ্যাহ্ন আকাশের উদাস ভৈরব মূর্ত্তি যেন আজ তাহার নিকট একান্ত সুন্দর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সীমাহীন শূন্য অম্বর বক্ষেরই মত তাহার সারা অন্তরটা যেন প্রসারিত হইয়া পড়িয়া আছে। কোথাও কোন আকর্ষণ নাই—বুঝি কর্ত্তব্যও না। কিন্তু চমক ভাঙিয়া গেল। কর্ত্তব্য নাই বলিলে চলিবে কেন ? তাহার নিকট যে এখন শুধু কর্ত্তব্যই রহিয়াছে। আর কিছু—না, জীবনে এইটুকু ছাড়া আর কিছুই নাই। অত্যন্ত সন্তর্পণে সুগোপনে চিঠিখানি নিজের শয্যাতলে লুকাইয়া রাখিয়া সরযূ অকারণে আরক্ত-মুখে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল, তারপর আবার ধীরপদে একখানা কাগজ লইয়া অজয়ের সম্মুখে আসিয়া আপন-মনেই পড়িতে সুরু করিয়া দিল। পড়া শেষ হইয়া গেল। অজয় সবিস্ময়ে যেমন প্রথম হইতে চাহিয়াছিল, তেমনই চাহিয়া রহিল। একটা শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিল না।

সরযূ বলিল—খুব ভুল আছে, না অজয় দা' ?

স্বপ্ন-ভাঙার মত অজয় বলিল—ভুল? ভুল দূরের কথা, সত্যি কথা বল্‌তে কি এমন সুন্দর করে আমি নিজেও লিখ্‌তে পারি না। এত ভাল ইংরাজী তুমি কোথায় শিখ্‌লে সরযূ?

সরযূ মুখ ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিল—অজয় দা'র যত বাজে কথা। এমনই করে লজ্জায় ফেল্‌তে হয় বুঝি বোন্‌কে। শিখেছি না ছাই! বাবা কলেজে ইংরিজির প্রফেসার, তাঁরই কাছে দু'-চারখানা বই পড়েছিলুম বই ত নয়। কোথায় ভুল আছে বলো না।

অজয় সে কথার উত্তর দিল না। বলিল—তোমার বাবা কি বলেছিলেন সরযূ, কর্ম্মফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে, না?—

—হবে বই কি অজয় দা', বাবা আর একটা বড় দামী কথা বল্‌তেন—সুখ-দুঃখ মানুষের অনুভূতি ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীতে দুঃখ যাকে আমরা বলি, তাই পরকালে সত্যকার সুখ—এই কথাটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিতে পার্‌লে কোন কষ্টকে আর কষ্ট বলে মনে হবে না।

অজয় কথা কহিল না, অবাক-দৃষ্টিতে সরযূর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চার

কাল মধ্যাহ্ন।

কলিকাতার একখানি দ্বিতল কক্ষে একটী আনন্দ-সুন্দরী যুবতী একজন পুরুষের পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছিল। যুবক বলিল—না শেফালি, তোমার এ পাগ্‌লামী আমি রাখ্‌তে পারি না।—আমার ভবিষ্যৎ আছে, তোমারও ভবিষ্যৎ আছে। এসব ছেলেমানুষীর কথা নয়।

যুবতী হাসিয়া উঠিল; বলিল—উকিল হ'লে যে মাথার ঠিক্ থাকে না, এ আমি হলপ করে বল্‌তে পারি। আরে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করে যে ভেবেই অস্থির হয়ে পড়্‌লে। না হয় একখানা পাকা দেখে উইল করে রাখ না তার জন্যে। আমার বাবু স্পষ্ট কথা, দিদিকে আন্‌তেই হবে। একা একা মানুষ থাকৃতে পারে। আমরা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কোলকাতায় এসে জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়েছি যেন। দোহাই তোমার, দিদিকে নিয়ে এস, দু' বোনে গল্প করে বাঁচি।

যুবক বলিল—গল্প করবার জন্যে একজন লোককেই না হয় দেশ থেকে আনিয়ে নাও না। এমন করে কেন অশান্তি কুড়ুবে। তা' ছাড়া, এতবড় ব্যাপারের পর তাকে ঘরে স্থান দেওয়া যেতেই পারে না।

—ও মা, তুমি অবাক্ কর্‌লে দেখ্‌ছি! এতবড় ব্যাপার আবার কোন্‌খানে দেখ্‌লে। অসহায় অবস্থায় পেয়ে কেউ যদি কারুকে জোর করে ধরেই নিয়ে যায়, তারপর ফেরবার সুযোগ পেয়েই যদি ছুটে আসে—ফিরে ঘরে আস্‌তে পাবে না? আশ্চর্য্য! বলিহারি বাবু তোমাদের ভালবাসাকেও! আজ আমায় এত যত্ন কর্‌ছ, যদি আমার ভাগ্যে... মা গো, ভাব্‌লেও ভয় করে। অমনি করে অনায়াসে বল্‌তে ত? না, ও সব কোন কথা নয়—তুমি চিঠি দাও না দাও, আমি আগেই চিঠি দিয়েছি দিদিকে এখানে আসবার জন্যে। রাগ কর্‌বে জানি, কিন্তু মেয়েদের এতবড় বিপদে মেয়েমানুষ হয়ে না দেখ্‌লে চল্‌বে কেন বলো ত?

যুবক গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—চিঠি লেখা পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। ভাল, তোমার নিজের পা তুমি নিজে কাট্‌তে চাও আমি বাধা দেব না। দোষ দিও না যেন ভবিষ্যতে, এইটুকু বলে রাখ্‌লুম।

'ঢিপ্' করিয়া যুবকের পায়ের উপর মাথাটা ঠুকিয়া যুবতী বলিল—তোমাকে দোষ দেবার আগেই যেন আমার মরণ হয়। দোষ একটুও দেব না গো, একটুও না। বরং দিদি এ বাড়ীতে আগে এসে আমার চেয়ে তোমায় অনেক ভাল করেই জেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে জেনে নিয়ে এমন করে নিজেকে তৈরী করে নেব যাতে পা দুটো ইস্পাতের চেয়েও শক্ত হয়—বুঝলে?

—বুঝ্‌লাম বই কি। আর কিছু বলবার আছে?

—ও মা, বলার কি শেষ আছে না কি আবার! কাল সোমবার আবার ত মক্কেল নিয়ে পড়্‌বে। যদি দু'দণ্ড পেলুমই, অত ব্যস্ত হও কেন বল ত?

যুবক না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—ব্যস্ত আবার হলুম কোথায়। তোমার মকর-গঙ্গাজলের গল্প ত কই বল্‌লে না?

—ওঃ, সে মুখপুড়ীর কথা আর বলো না! তার মত নেমকহারাম যদি আর দু'টী থাকে। তাকে খুব কড়া করে চিঠি দিয়ে দিয়েছি। সে বলে কি জানো—তোমার বাড়ী তুমি না বল্‌লে সে কিছুতেই আস্‌বে না এখানে তুমি আর আমি যেন ভিন্ন।

—তা' বটে।

—তা' বটে না, যে ও কথা মুখে আন্‌বে আমি তার সঙ্গে কথাই কইব না। কাল বায়স্কোপে 'সাবিত্রী' বই দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। স্বামীর জন্যে সাবিত্রী কি কষ্ট সহ্যই না করলে বলে লোকগুলো—এমন কি, মেয়েরা পর্য্যন্ত বাহবা দিতে লাগ্‌ল। এমন রাগ হ'ল আমার—যেন বিলেতে বসে সব বিলিতী মেমদের সঙ্গে ছবি দেখ্‌ছি। হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্যে কর্‌তেই ত জন্মেছে। এতেই ত তার আনন্দ—সাবিত্রী এমন কি করেছে বেশী!

যুবক হাসিয়া বলিল—ওসব বিষয় আমার তত মাথা খোলে না। তা' ছাড়া, পুরাণের গল্প—

—গল্প? গল্প বলো না। যারা জানে না তাদের কথা ছেড়ে দাও—তুমি ও কথা বল্‌লে চল্‌বে না। আমাদের দেশে অমন অনেকে মেয়ে জন্মেছে। শুধু সাবিত্রী একা জন্মায় নি। দরজার সাম্‌নে কাদের গাড়ী দাঁড়াল না? হ্যাঁ, তাই ত। নিশ্চয় দিদি এসেছে। চলো চলো, তাঁকে নিয়ে আসি ওপরে। ও মা, চুপ করে বসে রইলে যে বড়—উঠবে না? হাস্‌ছ আবার। বেশ, আমিই ধরে নিয়ে আস্‌ছি তাঁকে। ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে আন্‌বার দায়ীত্ব যে আমারই বলিয়া সে তড়তড় করিয়া নামিয়া গেল।

পত্নীর এই অকারণ চাঞ্চল্যে স্বামী দেবতাটী কৌতুকই অনুভব করিতেছিল। প্রথমটা সে যেমন বসিয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল। পরক্ষণে কাহারা আসিয়াছে দেখিবার জন্য জানালা দিয়া উঁকি মারিতেই বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। শেফালীর অনুমান মিথ্যা নহে। সরযূই আসিয়াছে বটে।

প্রথমে একজন গাড়ী হইতে নামিয়া সরিয়া গেল, সে অজয়। তাহার পরে শেফালী একগলা ঘোমটা দিয়া যে রমণীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লইল সে সরযূ না হইয়া যায় না।

শেফালী সরযূকে হড়হড় করিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে বলিল—মাগো, দিদি যেন কি! নিজের ঘরে আস্‌বে তাতেও লজ্জা। তোমার কাছে ত আস্‌তেই চান না। বলেন কি জানো, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি বোন্—ও মা, উনি আবার কোথায় গেলেন! মা গো, দু'জনকে নিয়েই হ'ল আমার বিপদ দেখি—

গমনোদ্যত শেফালীর হাতখানা 'খপ্' করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সরযূ বলিল—না, তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। বোস, দু'জনে একটু গল্প করি। উনি ত আর পালিয়ে যাচ্ছেন না।

—ঠিক্‌ই বলেছ দিদি। তখন একজন ছিলুম না হয় ভয় ছিল, এখন দু'জনের জোরে ছুটে আস্‌তে পথ পাবে না। কিন্তু তুমি দিদি একশ' বছর বাঁচ্‌বে। এইমাত্র তোমারই কথা হচ্ছিল।

সরযূ হাসিতে চাহিয়া বলিল—আর অতবড় আশীর্ব্বাদ করিস নি বোন্, তোদের কোলে আজই যেন মরি!

শেফালী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—আর সব সহ্য কর্‌তে পার্‌ব দিদি, কিন্তু মেয়েমানুষের মত নাকী-কান্না আমি সহ্য কর্‌তে পারি না। বালাই, যাট্! মর্‌বে কেন বলো ত? কার ধার করে খেয়েছ যে, এরই মধ্যে মর্‌তে হবে! ও কি, ওদিকে আবার 'হাঁ' করে দেখ্‌ছ কি? ও মা, শুক্‌নো মালাটা এখন ফটোখানার ওপর ঝোলান রয়েছে দেখো। ওঁর জন্মতিথি দিনে পাগ্‌লামী করেছিলুম—ওই যে লাল গোলাপ দেওয়া মালাটা দেখ্‌ছ, ওটা তোমার, আর আমারটা ওই যে, মাঝখানে স্থলপদ্ম দেওয়াটা। উনি হেসে বল্‌লেন—এ আবার কি ব্যাপার! এত

পাগ্‌লামীও কর্‌তে পার। কোথায় কে তার ঠিক নেই—তার নামে সঙ্কল্প করা হচ্ছে। বল্‌লুম—তোমরা যদি সোনার সীতা গড়ে রাজসূয়-যজ্ঞ করে বাহবা নিয়ে স্বর্গে যেতে পারো, আমার দিদির নাম করে ফুল দিয়ে বাহবা চাই না, তৃপ্তি আমরা ছু'জনেই পাবো এতে ভুল নেই—ঠিক্ বলি নি দিদি ?

বুকের ভিতর সজোরে টানিয়া লইয়া সরযূ বলিল—আর জন্মে নিশ্চয় তুই আমার মা ছিলি, না শেফা ?

—রক্ষে কর, মা আমি হ'তে পারব না, আমি এমনই বোন্ ছিলুম। মার কোল নিয়ে ছু'জনে মারামারি করেছি, ঝগড়া করেছি। আবার সন্ধ্যে হ'লে ছু'টিতে মিলে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়েছি। ভাল খাবারটি পেলে তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছ। আমিও ছুটে গিয়েছি। নইলে তোমার বাড়ী তুমি এমন করে আমাকে ছেড়ে দিতে পার কখন ? যখন প্রথম এসে এ বাড়ীতে পা দিলুম—জনপ্রাণী নেই, এমনই ভয় হ'ল। চারদিকে শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চাইতে লাগ্‌লুম। রাত্রে উনি বল্‌লেন—তোমার মুখ শুকনো কেন ? ভাল লাগ্‌ছে না এখানে ?

বল্‌লুম—না।

তাঁর বুক থেকে ছোট্ট একটি নিশ্বাস বেরিয়ে এল চোখ খুলে দেখ্‌লুম—মুখখানি ম্লান হয়ে গেছে। তিনি বল্‌লেন—আমাকে ভাল না লাগাই সম্ভব, নইলে—

লজ্জা ভুলে বল্‌লুম—নইলে কি বল্‌লে না ? মনে হ'ল, কোথায় যেন ওঁর মস্তবড় ব্যথা লুকান আছে। একটী একটী করে তোমার কথা সব শুনে নিলুম। প্রথম বিয়ের রাতে কি বলে তুমি কথা বলেছিলে—কত ভালবাসা ছিল তোমাদের। সব, সব। এত ভাল লাগ্‌ল—সেইরাত্রেই জোর করে ওঁর বাক্স থেকে লুকনো তোমার ফটোখানা জোর করে বার করে নিয়ে বারবার মাথায় ঠেকিয়ে বল্‌লুম—দিদি, তোমার যোগ্য আমি নই, তবু যেন ওঁকে সুখী কর্‌তে পারি।

সরযূ কথা কহিল না। শেফালীর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া রহিল মাত্র। শেফালী বলিয়া চলিল—পুরুষগুলো নিজেদের ভারী সেয়ানা মনে করে, জানো দিদি—কিন্তু আসলে তারা যে আমাদের চেয়ে অনেক বোকা এ কথা মানতেই চায় না। যেদিন তোমার চিঠি এল, সেদিন উনি যেন কি হয়ে গেলেন। মক্কেলদের ফিরিয়ে দিলেন। খেতে বসে দেখ্‌লুম, ভাত আর উঠ্‌ছে না মুখে। বল্‌লুম—কি হয়েছে গা ?

উনি বল্‌লেন—কিছু না।

—কিছু না বল্‌লেই ছাড়ি কি না—কেঁদে-কেটে অনর্থ করে তুল্‌লুম। শেষে বল্‌লেন—তোমার খবর পেয়েছেন। নিয়ে আস্‌তে লিখেছো। চিঠিখানা দেখ্‌তে চাইলুম—কোনমতেই দেখালেন না। ঠিকানা বল্‌লেন—বিলাসপুর। আর কথা নয়, তোমাকে আসবার জন্যে চিঠি দিয়েছিলুম। জানি উনি লিখবেনই, তবু স্থির থাকৃতে পার্‌লুম না। শেষ কিন্তু ভয় হ'ল, হয় ত ঠিকমত ঠিকানা লেখা হয় নি, চিঠি তোমার হাতেই পড়বে না। পেয়েছ যে, এই ঢের। উনি কে দিদি ?

এ প্রশ্নের জন্য সরযূ প্রস্তুত ছিল না, তাই কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। অর্থহীন-দৃষ্টিতে শেফালীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পাঁচ

শেফালীর চিঠিখানি পাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সরযূ কি করিবে ঠিক করিতে পারে নাই। কলের ম্যানেজারের সহিত রফা করিয়া হাজারখানেক টাকা লইয়াই ছাড়িয়া দিবে, কি আইনের সাহায্য লইলে বেশী ফল হইবে সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। প্রথমতঃ, মোকর্দ্দমা করার কথা মুখে বলা যতটা সোজা, কাজে ততটা নয়। তাহাতে চাই অর্থবল—তারপর লোকবল।

দুইটী বিষয়ই তাহাদের অভাব। তা' ছাড়া, অজয়ের মনের অবস্থা এমনই যে, তাহার দ্বারা মোকর্দ্দমা চলে না। এ বিষয়ে পরামর্শ লইবার মত কাহাকে পাইলে যেন সে বাঁচিয়া যাইত; কিন্তু কাহার সহিত আলাপ ত দূরের কথা, এ কয়মাস সে কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে তাহাই ভাল করিয়া বলিতে পারে না। ঘরের বাহিরের বিরাট আকাশ, আর জানালা দিয়া যতটা দৃষ্টি চলে খোলা

মাঠই তাহার পরিচিত। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? মাঠের ওপারের রাঙা বাড়ীটার বাহিরটা অনেক দিন দেখিয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে মানুষ বাস করে কি না তাহাও সে বলিতে পারে না। সে লুব্ধ-দৃষ্টিতে সেই বাড়ীটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আকাশ-পাতাল কি চিন্তা করিতেছিল।—হঠাৎ সদরদরজা খোলার শব্দে চাহিয়া দেখিল, একটী ফুট্‌ফুটে গোলাপ ফুলের মত ছেলের হাত ধরিয়া একটী যুবতী বাড়ীর ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহাকে দেখিয়াই বলিল—তোমার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশই করে ফেললুম ভাই, দণ্ড দিতে হয় খোকামণিকেই দিও, ওই দুষ্টই ত জোর করে টেনে এনেছে। উঠনের গোলাপফুলটা—ওরে পাজি, এগুস নি, এখুনি কাঁটা ফুটে যাবে।

সরযূর বুকের মধ্য হইতে যেন একটা কিসের বোঝা নামিয়া গেল। তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিল—বসুন, আমি খোকামণিকে ফুল তুলে দিচ্ছি।

—তা' যে ডাকাত এসেছে, না নিয়ে ছাড়বেও না। কিন্তু আমাকে আপনি বল্‌লে রাগ করব।—এ দেশে এমন গাছ ত নেই, কোথাও থেকে এনেছিলে বুঝি? কিন্তু যত্ন কর না কেন ভাই—জল না পড়ে গাছগুলো যে শুকিয়ে উঠেছে।

—সে কথার কোন উত্তর না দিয়াই সরযূ খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ফুল গাছের দিকে অগ্রসর হইল। এখানে যে ফুলগাছ আছে এবং তাহাতে ফুল ফুটে এটাও এতদিন তাহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই—আজ সে প্রথম দেখিল। সত্যই অজয়ের সযত্নরোপিত গাছগুলি যত্ন অভাবে মরিতে বসিয়াছে। মনে পড়িল—সে ফুল ভালবাসে বলিয়া বহুদূর হইতে গাছ আনিয়া সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর নিজে মাটি তৈয়ার করিয়া এগুলি সে পুঁতিয়াছে। জল দিয়াছে, ফুল ফুটাইয়াছে।

খোকার হাতে ফুলটি তুলিয়া দিয়া যুবতীর পাশে আসিতেই সে বলিল—দুষ্টু কিছুতে বাড়ী থাকবে না। রাস্তা বেড়িয়ে বেড়িয়ে একেবারে বারমুখো হয়ে গেছে। বাইরের দিকে হাত দেখিয়ে বলে—বেড়া। কি রে, বেড়ান হ'ল? কার কোলে উঠেছিস্‌, মাসীর?

খোকা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া সরযূর কোলে মুখ লুকাইল। সরযূ তাহাকে আদর করিতে করিতে বলিল—বাড়ী তোমাদের কোন্‌দিকে ভাই?

—ওই যে ওই লালবাড়ী দেখ্‌ছ না—ওইটা। ওখানে আমার দাদা থাকেন। উনি ছুটি পেয়েছেন, তাই এখানে ক'দিনের জন্য এসেছিলুম। কালই চলে যাব।

—কাল চলে যাবে, উনি কি করেন?

—কলমপেষা কেরানী। কেরানী নয় ত কি বলো—মুনসেফ নাম বটে, কিন্তু শেয়ালের লড়াই টোকা ছাড়া ত আর কাজ দেখি না। তোমার—

—আমার ভাই। এর কাছে আমি আছি। কলেই উনি কাজ করতেন, কিন্তু......সরযূর কথা বন্ধ হইয়া গেল।

—কিন্তু কি দিদি, চাকরী গেছে?

হাসিতে চাহিয়া সরযূ বলিল—না বোন্‌, দু'খানি হাতই কলে......

—ও মা! ওঁরই না কি? কাল শুনছিলাম বটে। কি সর্ব্বনাশের কথা! কি হবে দিদি?

—কি হবে জানি না, তবে তুমি যখনই এখানে এসেছ আমার ভাবনা কমে গেছে। তোমরা দু'টীতে মিলে যাতে দাদার কোন উপায় হয় করে দাও। কলের ম্যানেজার হাজারখানেক টাকা দিয়ে মিটিয়ে দিতে চান—কিন্তু সারা জীবন—

—তা' ত বটেই। এর ব্যবস্থা না করে ত যাওয়া যায় না। একটা জীবনের দাম কি হাজার টাকা না কি?—বসো ভাই, এখনই আস্‌ছি আমি। যে কুণো লোকটা, কি বল্‌ব ভাই, রাগ ধরে। সঙ্গে বেড়াতে বেরুতে বল্‌লুম—যদি আস্‌ত তা' হ'লে ত কাজ মিটে যেতো। কি রে খোকা, যাবি না কি আমার সঙ্গে?

খোকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—ও রে শত্তুর, এরই মধ্যে মাসীকে পেয়ে মাকে ভুল্‌তে চলেছ! তুমি দেবে বড় হয়ে আমায় খেতে—তবেই

হয়েছে। আমিও শক্ত মেয়ে—দেখিস্, কেমন জব্দ করি। মা......

খোকা সরযূর বুকের মধ্যে মুখ টিপিয়া ধরিল। যুবতী হাসিয়া উঠিল—তাও আছে, না রে শয়তান! বলিয়া হাসির বিদ্যুৎ হানিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরযূ খোকাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই অজয় বলিল—তোমার ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন সরযূ।

—তা না চাইলে যে পৃথিবী মিথ্যে, তিনি মিথ্যে হয়ে যাবেন অজয় দা'! তোমার এ দুঃসময়ে তাঁর দয়া না হ'লে চলবে না যে।

—তাঁর দয়া আমার ওপর—পাগল হয়েছিস্ দিদি! তা'তে তাঁর ন্যায়বিচার—

—ফের ওসব বাজে কথা। যাও, শুনতে চাই না আমি—কি বল খোকাবাবু?

খোকা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সরযূ বলিল—দেখ্‌লে অজয় দা', খোকা পর্য্যন্ত যা' জানে তুমি জান না।—গরীব মাসীর বাড়ী কি খাবে বলো ত? ও মা, আঙুল—আঙুল খেয়ে কি পেট ভরবে না কি?

—তা' ভরবে দিদি, ও ছোড়া একেবারে কাঙাল—তা' ছাড়া, তোমার সোনার কলির মত আঙুল চুষে পেট না ভরলেই নিন্দে হয়—কি গো, তুমি যে একেবারে কনে বৌয়ের মত পিছিয়ে যাচ্ছ। এস না দিদি, তুমি না ডাকলে বাবু আস্‌বেন না।

একটী সুন্দর যুবক পিছন হইতে যুবতীর পিঠে একটা ছোট কিল মারিল।—ওঃ, লাগে না বুঝি! না, লজ্জা-ঘেন্না নেই তোমার। ও দিদি, দেখো না তোমার ভগ্নীপোত না বন্দরের কাণ্ডখানা।

সরযূ একটুখানি ঘোমটা দিয়া বাহিরে আসিতেই যুবকটী নমস্কার করিয়া বলিল—ওর কথা শুন্‌বেন না, ও নয় কে হয়, আর হয় কে নয় কর্‌তে পারে।

—তোমার মত না কি। বড় উকিল দেখ্‌লেই তার দিকে রায় দিয়ে দাও যেমন।—যাক্, ঝগড়াটা পরেই হবে, দিদি ত রইলেন বিচারকর্ত্তা। কি করা যায় বলো ত?

—কিসের?

—ও মা, তাও বলা হয় নি বুঝি? দেখেছ, মাথার ঠিক্ নেই আমার। আর থাক্‌বেই বা কেমন করে। বল্লুম—চলো বেড়াই, না বাবু ঘরে বসে রইলেন। হ্যাঁ দেখো, কাল রাতে যে হাতকাটার গল্প শুনছিলে না, সে দিদির দাদা—মন্দ বলা হ'ল না, না? আমারই দাদার। তারা হাজারখানেক টাকা দিয়ে বিদায় কর্‌তে চায়—একটা মানুষের দাম বুঝি হাজার টাকা। যা' করে হয় এর ব্যবস্থা করে দাও—বুঝ্‌লে?

যুবকের মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

—চুপ করে রইলে যে বড়?—বড় উকিলের মুখ মনে পড়ে গেল বুঝি?

যুবক হাসিয়া ফেলিল। বলিল—সেখানে না হয় তার দলেই রায় দিতুম, এ যে তার বড় পেয়াদার।

—ফের?

—গ্রহ থাকলেই তার ফের একটা থাকবে বই কি। কি বলেন দিদি বলিয়া যুবক সরযূর দিকে ফিরিতেই সরযূ বলিল—ঠিকই বলেছেন! কিন্তু বাইরে কেন ঘরে আসুন না আপনি।

—আবার আপনি, যাব না আমরা—চলো।

সরযূ হাসিয়া ফেলিল; বলিল—বাবা! বেশ, আপ—তুমি ঘরে এস না ভাই।

যুবক ঘরে আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল—কিন্তু মোকর্দ্দমার সুরাহা হইবার সম্ভাবনা অল্প, ভয়-টয় দেখাইয়াই আদায় করা উচিত সাব্যস্ত হইল। স্থির হইল—যুবক আজই ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তারপর যাহা হয় তাহাই করা যাইবে।

যুবতী বলিল - কর্‌ব না, এখনি যাও। যে কুণো, ঘরে ঢুক্‌লে বেরুতেই দিন কাবার হয়ে যাবে। জান্‌লে দিদি, এমন লোক জান্‌লে আগে বিয়েই কর্‌তুম না।' বেথুনে পড়্‌তুম—রোজ 'হাঁ' করে গেটের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। ভাবতুম, লোকটার কি কাজকর্ম্ম কিছু নেই না কি?—কাজের হুজুরী! একদিন নিজেই বলে ফেল্লুম—অমন 'হাঁ' করে কি দেখো বলো ত?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে আপ—

—থাক্, আর না—এদিকে এলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

—দেখো।

—কি দেখ্‌ব, দেখ্‌ছিই ত কতদিন ধরে। হ্যাঁ, একদিন দেখি হেদোর ওধারে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সটান নেমে গিয়ে বল্‌লুম—এখানে ফের দাঁড়িয়ে রয়েছ যে বড় ?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে ওখানে দাঁড়াতে বারণ করেছিলেন, তাই—

—না বাবু, হেসে বাঁচি না! শেষে দাদার সঙ্গে ভাব করিয়ে বাড়ী নিয়ে গেলুম। তারপর বাড়ীতে মত নেই, কাজেই একদিন দু'জনে সরে পড়লুম একেবারে পগার পার। আমি বল্‌লুম—বিয়ে ত হয়েই গেছে—মনের চেয়ে আগুন বড় সাক্ষী না কি? ও সব পাগলামী করব না আমি। কিন্তু শোনে কে? বাবুর এদিকে গোঁড়ামী আছে—অনেক বামুন এল, মন্ত্র পড়া হ'ল—কেমন বলি নি ঠিক্? এতদিন পরে দাদার রাগ পড়েছে, তাই চিঠি লিখেছিলেন আস্‌তে। এসে গেছি, কিন্তু এবার রাগ না পড়্‌লে—

যুবক হাসিয়া ফেলিল। সরযূ বলিল—তোমার ভাগ্য ভাল তাই অমন স্বামী পেয়েছ বোন।

—ও মা, তাই না কি! কিন্তু অনেকে বলে কি জান—ও বিয়েই নয়, বেউশ্যে—

—ছি ভাই!

যুবতী হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল—মানুষের কথার চেয়ে মানুষকে আমি বড় বলেই জানি দিদি, তাই ওতে দুঃখ পাই নি। তুমিও হয় ত মনে মনে ঘৃণা—

—ঘৃণা, ছিঃ! বলিয়া সরযূ যুবতীকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

হাজার তিনেকের বেশী কিন্তু কোনমতেই আদায় করা সম্ভব হইল না। মুনসেফ্ দেখিয়া বিভ্রাট ঘটিবার ভয়েই ম্যানেজার অতটা উঠিয়াছিল, নতুবা কি হইত বলা যায় না।

যুবতী বলিল—এই মুরোদ, চার হাজারও কর্‌তে পার্‌লে না?

সরযূ বলিল—ওই ঢের। তুই আর চালাকী করিস নি ভূপা।

—চালাকীতেই যে জগৎ চল্‌ছে দিদি।

—চলুক। ব্যাচারী সেই বেরিয়েছে, এখন খাওয়া হয় নি—তার ব্যবস্থা করেছিস কিছু?

—সে ত তুমিই করেছ, দাও না খেতে।

—দেবই ত! পাটা ধুয়ে বসো ত ভাই।

—আমি কিন্তু খাব না আগেই বলে দিলুম। বলো আমার সঙ্গে যাবে। সেখানে দু' মাস থেকে তারপর যেখানে খুসী যেও। নইলে জলগ্রহণও কর্‌ছি না তোমার বাড়ী।

অসীম খাইতে বসিয়া বলিল—ওর কথা মন্দ নয় দিদি, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

সরযূ বলিল—যাবই ত ভাই, তোমরা ছাড়া আর আমাদের কে আছে! কিন্তু···

—ফের কিন্তু, বেশ যেতে হবে না তোমায় বলিয়া ভূপালী মুখ ঘুরাইয়া বসিল।

সরযূ বলিল—বেশ ভাই, তাই যাব—কিন্তু বোঝা বলে তাড়িয়ে দিস নি যেন।

কিন্তু পরদিন শেফালীর চিঠিখানি আসিয়া তাহার সমস্ত সঙ্কল্পই ওলট-পালট করিয়া দিল। একখানি একান্ত আপনার মুখ দেখিবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভূপালী বলিল—স্বামীর ঘরে যাবে, তা'তে বাধা দেব না দিদি, কিন্তু কথা দাও আমার বাড়ী পায়ের ধুলো দেবে একদিন।

—পায়ের ধুলো বলিস নি বোন্, কথা দিচ্ছি যাবোই।

অসীম বলিল—সেই ভাল, দাদাকে নিয়েই যাবেন কিন্তু। সরযূ হাসিল, উত্তর দিল না।

খোকাবাবুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সরযূ বলিল—কই, তুমি ত যেতে বল্‌লে না খোকামণি?

খোকা 'য য' করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।—ঠিক্

বলেছিস্ বাবা, যাবোই জেনে রেখেছিস বলে আর খোসামোদ করছিস না, না রে ?

খোকা খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সে কথার সমর্থন করিল।

খোকাকে আড়ালে পাইতেই সরযূ বলিল—হ্যাঁরে খোকা, তোর মেশোমশাই খুব রেগে আছে, না? কথা কইবে না ত ? কি বল্ ?

ঘাড় নাড়িয়া খোকা 'না না' বলিতে সরযূ তাহাকে বুকের মধ্যে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ঠিক্ বলেছিস্ বাবা, ঠিক্ বলেছিস্, কথা সে কইবে না কোনমতেই ! তবু যেতেই হবে আমায়, নইলে…অমন করে চেয়ে আছিস কেন রে ? নইলে তাঁকে যে দেখ্‌তে পাব না আমি বলিয়া সে নিজেই যেন নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে খোকাকে লইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

শেফালীর অনুমান মিথ্যা হইল না অমর ফিরিয়া আসিল বটে, তবে রাত তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বোধ করি সারাক্ষণটাই সে পথে পথে ঘুরিয়াছে—তাই ক্লান্তিতে তাহার সারা অবয়ব ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। শেফালী বলিল—কোথায় পালিয়েছিলে বলো ত ? বামুন-ঠাকুর ঢুল্‌তে আরম্ভ করেছে দেখে—তাকে বিদায় দিয়ে দিদিতে আমাতে 'হাঁ' করে পথ চেয়ে বসে আছি।

—কেন ?

—দেখো কথা, কেন আবার—সখ হয়েছে, তাই। সেই সকালে চারটি খেয়েছ, আর ক্ষিধে-তেষ্টাও নেই না কি আজ। যাও, তাড়াতাড়ি পা-টা ধুয়ে বসো, এখনই লুচি ভেজে দিচ্ছি—ময়দা মাখাই আছে।

—আজ আর…

—খাব না আমি—কেমন, এই বল্‌বে ত ? ও সব কথা পরে হবে'খন, আগে বসো ত দেখি। মা গো মা, আমার যেন হয়েছে এক দায়—একবার এঁকে দেখি ত উনি বিগড়োন, ওঁকে দেখি ত ইনি ! কি আক্কেল বলো ত ? খিদেয় নাড়ি চুঁয়ে যাচ্ছে—তোমারা বায়ুভুক হতে পারো —কিন্তু আমি পারি না। বসো, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

অমরের আর কথা কাটাকাটির প্রবৃত্তি ছিল না। সে ধীরে ধীরে আসনে আসিয়া বসিল।

সরযূ লুচি বেলিতে বসিয়াছিল। শেফালী তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল—ওঠো, ফাঁকি দেবার মতলব মন্দ নয়। একে মাথা ধরেছে, তা'তে আগুন তাতে যাচ্ছি ভেবেছ ? ভাজো গে যাও লুচি—

—তা যাচ্ছি, কিন্তু…

—কিন্তু কি ? ও ঘরে দিতে যেতে পারবে না ত, এই কথা ? সে হবে না। একবার ময়দা বেল্‌ব, আর দিতে ছুট্‌ব অত গতর নেই আমার। যদি নাই পার্‌বে, কেন বল্‌লে না ঠাকুরটাকে রেখে দিতুম।

সরযূর অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। সে কাতর-কণ্ঠে বলিল—লক্ষ্মী ভাই, আজ থাক্, কাল আমি দেব 'খন—রেলের ধকল তার ওপর সারাদিন না খাওয়া না দাওয়া মাথাটা ঘুরছে।

কিন্তু খানিক আগেই যে বল্‌ছিলে বড়, আজ খাব না চোঁয়াঢেকুর দিচ্ছে। না দিদি, তোমাকে শাসন না কর্‌লে চল্‌ল না দেখ্‌ছি। বেশ আজকের মত আমিই না হয় পরিবেশন করলুম—এখন ভাজ ত। কিন্তু কাল থেকে অমন করলে আর মুখ দেখ্‌ব না—বুঝলে ?

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া সরযূ লুচি ভাজিতে সুরু করিল—কিন্তু খোলার দিকে দৃষ্টি পড়িবে কি একরাশ চোখের জলে তাহার দৃষ্টি বদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

—ক্ষরে উঠল যে নামাও। না, আজ তোমাকে ছুটিই দিতে হ'ল দেখ্‌ছি বলিয়া শেফালী নিজেই ভাজিতে লাগিয়া গেল।

কিন্তু খানকয়েক লুচি দিতে-না-দিতেই শেফালী 'ধুম্' করিয়া লুচির থালাখানা নামাইয়া রাখিয়া মুখ গোঁজ করিয়া আসিয়া দিদির পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

সরযূ বলিল—কি হ'ল শেফা ?

—মাথা! পারব না অত ছুটোছুটি করতে! খেতে হয় খান্ না হয় উপোস করে থাকুন।

—সে কি লো!

—হ্যাঁ। রইল পড়ে, যা' খুসী কর। কেন আমারই বা এত মাথা ব্যাথা কিসের—তোমার কেউ নয় বুঝি?

সরযূ বিস্তর অনুরোধ করিল, কিন্তু শেফালীর উঠিবার কোন গা দেখা গেল না। বাধ্য হইয়া সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অগ্রসর হইবে কি, তাহার পা দু'টা যেন কে জোর করিয়া পিছন দিকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। বহু কষ্টে এক পা আগাইয়াই সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—পারব না শেফা, তুই—

—বয়ে গেছে আমার বলিয়া শেফালী গম্ভীরভাবে গোলায় লুচি ছাড়িতে লাগিল।

কম্পিত পদে নিজের ঘরেই নিজে চোরের মত আসিয়া সরযূ প্রবেশ করিল। অমর অন্যদিকে মুখ করিয়াছিল, আর দিও না শে—বলিয়া মুখ ফিরাইতেই চুপ করিয়া গেল।

সরযূ কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, খান্ দুই লুচি পাতে তুলিয়া দিয়া পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যায়। কিন্তু তাহা দিবার মত শক্তিও যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাত দু'টাকে প্রবল চেষ্টায় সে নিজের বশে আনিতে পারিল না; একান্ত নির্লজ্জের মত পাতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকারণ ঘামিতে লাগিল। অমর বিস্ময় বোধ করিল—মুখ তুলিয়া একবার সরযূর মুখের পানে কি দেখিল, সেই জানে! ধীরকণ্ঠে বলিল—আর লুচি নেব না আমি।

সরযূ প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া ফিরিতেছিল, হঠাৎ পেছন হইতে অমর ডাকিল—শোন।

সরযূ দাঁড়াইয়া পড়িল। অমর বলিল—অজয় খেয়েছে?

ঘাড় নাড়িয়া সরযূ জানাইল—হ্যাঁ।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া অমর বলিল—আমার বলা উচিত না হ'লেও বলতে বাধ্য হলুম, তাকে নিয়ে তোমার এখানে আসা উচিত হয় নি। বোঝা উচিত ছিল—এটা একজন ভদ্রলোকের সংসার, এখানে মান-ইজ্জত বজায় রেখে চলা ছাড়া পথ নেই।

কথা কহিতে বোধ করি পারিল না বলিয়াই সরযূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—বুঝিয়াছে।

অমর আর কথা কহিল না। সরযূ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

শেফালী বলিল—নিলে না ত?

—না।

—না নিলে বয়ে গেল! নিজেরই পেট কাঁদবে। আমরা খেতে বসি এস। বাবা, এমন খিদে পেয়েছে!

সরযূ না খাইবার কথাই বোধ হয় বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু কোন কথা না বলিয়াই হাতের উল্টা পিঠে চোখের জল মুছিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতির অপচয়

ননী মুখোপাধ্যায়

ধব্‌ধবে শাদা—প্রকাণ্ড এক বাড়ী। যেন শ্বেত-পাথরের রাজপ্রাসাদ। লৌহ ফটকের তু'পার্শ্বের স্তম্ভের উপর তু'টী শুভ্র ময়ূর—মেঘ-কুমারীর নাচের তালে তালে নাচ্‌বে বলে,—ঢলে টলে চলা তরুণীর লুটিয়ে পড়া বসনাঞ্চলের মত পুচ্ছটীকে ঈষৎ বক্রভাবে রেখে উর্দ্ধমুখে অসীম নীলিমার পানে তাকিয়ে আছে।

তারপরেই ফুলের বাগান — সব গাছগুলোই সবুজ, তাজা, তরুণ। ফুল ফোটে···সুবাস বিলায়······বাতাসের সাথে মিশে সমস্ত বাড়ীখানিকে আমোদিত করে রাখে।—সত্তফোটা ফুলের গন্ধের আমেজে······বাড়ীর লোকের আঁখিতে বুলিয়ে দেয় তন্দ্রার তুলি······

বাড়ীর সাম্‌নে প্রকাণ্ড আঙ্গিনা ·····শ্বেত-পাথর দিয়ে মেঝে তার মোড়া······শুভ্র পাথর কেটে ছোট ছোট থাম করে গড়া হয়েছে তার রেলিং ········· 'বৌ কথা কও'······'বৌ সরষে কোট'······ডাকা পাখী······বসন্ত-কালে বকুল বন থেকে ধরে আনা কোকিল······ময়না···টিয়া···পাপিয়া······'কুটুম আয়'······ইত্যাদি বন্য এবং আদরণীয় পোষা পাখীতে বাড়ীখানি ভরা······তা'দের কেউ বা থাকে রূপার খাঁচায় অলিন্দের ওপর···কেউ বা ঝোলে বাতায়নে।······কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একজন ডেকে ওঠে······'বৌ কথা কও'—তুপুর বেলা······ভাল লাগে না······ও শুধু চেঁচিয়ে মরে······'কুটুম আয়—কুটুম আয়'······সাঁজের বেলায় ওটা খালি পিউ্‌—পিউ্‌—করে কেঁদে-কেঁদে ওঠে।

ওরা ঘুম যায়······তখনও রাত ভাল করে পোহায় নি ·····সবেমাত্র ঝির্‌ঝির্‌ করে ভোরের শীতল উদাস হাওয়া বইতে সুরু করেছে ·····তারাগুলো একটুমাত্র ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠেছে······দখিণের বাতায়ন খোলা······বসন্ত কাল·· ···মলয় ফুলের গন্ধ সারা দেহে জড়িয়ে এনে দখিণের বাতায়ন দিয়ে ঘরের মাঝে শান্তভাবে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়্‌ছে······ঠিক্‌ হাসির দোলায় লুটিয়ে পড়া কিশোরীর মত।······ওর মুখের পাশের ছোট ছোট কেশগুচ্ছ অল্প অল্প উড়ছে······নাকের ডগায় শুকিয়ে-যাওয়া স্বেদবিন্দুর রেখাটী তখনও লেগে রয়েছে······আঁচলখানি লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়···ও তার বুকের মাঝে মুখ গুঁজে বিভোর হ'য়ে ঘুমোচ্ছে······ওর ভীরু কোমল হৃদস্পন্দন তা'র বুকে মৃতুমৃতু আঘাত হান্‌ছে······সে তা'র একখানি হাত অলসভাবে ফেলে রেখেছে ওর কটীর ওপর দিয়ে······আর একখানি সাপের মতন উপাধানের ওপর দিয়ে ঈষৎ বক্রভাবে ওর ছোট মাথাটীকে বেষ্টন করে শয্যার উপর আশ্রয় নিয়েছে······ওরা অঘোরে ঘুমাচ্ছে···· সুপ্তি এবং বিশ্রামের শান্তিতে ওদের মুখে তৃপ্তির আভা ফুটে উঠেছে······ওদের মৃতু নিশ্বাসটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে মলয়ের বুকে····· তখনও ঠিক্‌ ভোর হয় নি······একটু রাত আছে······তা'রা আরম্ভ করে দিল চেঁচামেচি······'বৌ কথা কও'—কু-উ-উ—'বৌ সর্‌ষে কোট'—পিউ্‌—পিউ্‌—

ওদের আর ঘুমোতে দেয় না······ওরা উঠে পড়ে··· তবুও বিরক্তি নেই······ওরা বলে—"অনেকক্ষণ আমাদের দেখে নি তাই অমন করে ডাক্‌ছে—চলো, একটু আদর করি গে।"

ওরা বাইরে যায়······ওদের দেখে··· · পিঞ্জরটাকে একটু নাড়াচাড়া করে······তু'-একটী কথা বলে।

এমনি করে এই সব বনের ছোট ছোট প্রাণী বাড়ীটাকে রাখে সজীব করে···ছোট ছেলেমেয়ে বাড়ীতে নেই —এরাই তা'দের অভাব মোচন করেছে···তা'দের মতই চেঁচামেচি করে এরা বাড়ীটাকে মাতিয়ে রাখে।

সন্ধ্যা আসে·· শুভ্র বাড়ীর বাতায়নে জ্বলে বাতি।···

বাতি মিটমিট করে চেয়ে থাকে তারার পানে...আর তারা দেয় ওকে হাতছানি···মাঝের ব্যবধান রচে বিরহ···বাতি গুমরে গুমরে কেঁদে মরে।

মানুষ বল্‌তে দু'টী প্রাণী ছাড়া এতবড় বাড়ীতে আর কেউ নেই···একটী পুরুষ···আর একটী নারী··· পরিপূর্ণ যৌবন উছলে উছলে পড়ে দু'জনার দেহে··ওরা দু'জনা হাসে, গান গায়, খেলা করে···সারা বাড়ীটাকে মাতাল করে রাখে ওদের প্রেমের পরশে...ওরা দু'জনা হ'ল স্বামী আর স্ত্রী.........

—"বৌ কথা কও।"

—"না কইব না—তুই আমাকে বৌ বল্‌বার কেরে... বারে বারে অমন করে জ্বালাতন করবি ত বাড়ী থেকে দূর করে দেবো...সাহস বেড়ে গেছে দেখ না একবার...উনি ছাড়া আমাকে আর কেউ বৌ বলে ডাকৃতে পার্‌বে না।"

কবিতা খাঁচাটাকে একটা নাড়া দেয়···পাখীটা ভয়ে শিউরে ওঠে......

—"কবিতা!"

—"কি বল্‌ছ?"

—"ওকে অমন করে বক্‌ছ কেন?"

—"ও আমাকে দেখ্‌লেই—'বৌ কথা কও'—করে কেন?"

—"কর্‌লেই বা, দোষ কি?"

—"না, তুমি ছাড়া আমাকে—বলেই কবিতা ফিক্ করে হেসে ফেলে পালিয়ে যায়।

তারপর আরম্ভ হয় ছুটোছুটীর পালা...এ ঘর থেকে ও ঘর···কবিতা যখন ধরা পড়ে, তখন দেখা যায় পলব ওকে বাহুর বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে।

চোখের উপর চোখ রেখে পলব বলে—"এবার......"

—"এবার আবার কি?"

—"এবার কোথায় যাবে?...যদি জোর করে চুমু খাই?"

—"আমিও জরিমানা করে দেবো।"

—"জরিমানার ভয় আমি করি না,—আর সে ত পরের কথা, আগে দোষটা ত করে নিই, তারপর পার ত আদায় করে নিও—দেখা যাবে ক্ষমতা।"

পলবের মুখ নীচু হ'য়ে নেবে আসে কবিতার মুখের 'পরে, তারপর 'চক্' করে ছোট একটী আওয়াজ হয়......

—"যাও—আড়ি"...বলে কবিতা মুখ গম্ভীর করে নেয়। পলব ওকে ভয়ে ভয়ে ছেড়ে দেয়······

—"কেমন ভয় লাগিয়ে দিলুম বল ত?"···বলে হাস্‌তে হাস্‌তে কবিতা শয্যার বুকে লুটিয়ে পড়ে।—·

পলব গিয়ে ওর মাথাটা তুলে নেয় নিজের কোলের ওপর...ওর চোখের উপর চোখ রেখে চেয়ে থাকে......

কবিতা বলে—"আমার একটা জিনিষ চাই।"

পলব বলে—"কি?"

—"একটা কাকাতুয়া···খুব সুন্দর হওয়া চাই কিন্তু।"

কাকাতুয়া আসে, দাঁড় আসে···তার থাক্‌বার জায়গা করে দেওয়া হয় কবিতা আর পলবের শয়ন-ঘরের দরজার সাম্‌নের ছোট গোল অলিন্দটুকুতে—যেখানে দাঁড়িয়ে কবিতা দূর অসীমের পানে তাকিয়ে থাকৃত।

কবিতা বলে···"জরিমানা?"

পলব বলে—"জরিমানা বই কি, আমারও একটা কাকাতুয়ার সখ ছিল অনেকদিন থেকে।"

উভয়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে কাকাতুয়াটার দিকে। কাকা-তুয়াটাও এদের দিকে তাকিয়ে গলা থেকে একটী বন্য আওয়াজ বার করে......আওয়াজটী একটু বিধঘুটে ......উভয়েই হেসে ফেলে......মুহূর্ত্তেক আগের কথার সূত্র তারা যায় ভুলে.........

কাকাতুয়াটি ভারী মুখর, বড় তাড়াতাড়ি কথা শিখে ফেলে সে। বাড়ীর প্রাণী দু'টির এত যাতনা—তবুও ওর কথার বিরাম নেই·· পলবের যাতনা, কারণ তা'র ভয়ানক অসুখ···আর কবিতার কষ্ট স্বামীর যাতনা দেখে...তার চোখে ঘুম নেই···আহার নেই···স্বামীর শিয়রে বসে তার দিন কাটে ··মাঝে মাঝে পলব চোখ মেলে চায়··· কথা বল্‌বার চেষ্টা করে...আওয়াজ বেরোয় না...কাকা-তুয়া এতবড় বিপদ বোঝে না···তার মতই সে বলে চলে...কবিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীর শিয়র থেকে উঠে

যায় কাকাতুয়াটিকে ধমক দিয়ে আসে···তা'তে ফল হয় না, বরং চেঁচামেচি বেড়ে যায়...কবিতা দেখে ..ওর বাটীতে জল নেই, খাবার নেই...চাকর আর ঝিটা এটুকুও পারে না···আর তাদেরি বা দোষ কি।...তারাও ত দিন-রাত খাট্‌ছে...কবিতা ওকে খেতে দেয়...জল দেয়···ও চুপ করে...

ডাক্তার আসে...ঔষধ আসে···নির্জ্জন বাড়ীতে লোক গিস্‌গিস্ করে...তবুও পলব বাঁচে না...রাতের শেষে পলবেরও শেষ হয়ে যায়...ওরা তা'কে নিয়ে যায়··মাটীর সাথে মিশিয়ে দেবার জন্য···

বুকভাঙা হাহাকার ক্রন্দনে সারা বাটীটিকে ব্যথিত করে...কবিতা আছড়ে পড়ে মেঝের উপর···কাঁদে . আর কাঁদে···ঝিয়ের অনুনয়-অনুরোধেও একটু নড়ে না... খায় না দায় না...সেই এক বসনে··একদিন···দু'দিন... তিনদিন···সেই মেঝের ওপর পড়ে থাকে···চোখের জল যায় ফুরিয়ে···বুক যায় শুকিয়ে...মাথা যায় বিকৃত হ'য়ে— তবুও ওঠে না—খায় না—তেমনি করে পড়ে থাকে—

অত্যধিক দুর্ব্বলতার জন্যই হয় ত একটু তন্দ্রার আমেজ আসে,—অমনি ডাক্ আসে—"কবিতা — কবিতা— কবিতা!

ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বসে—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—তুমি এসেছ— ডাকছ—কই—"

কবিতা ছুটে বাহিরে আসে। কাকাতুয়াটি তেম্‌নি করেই ডেকে চলে—কবিতা আবার আছড়ে পড়ে···

ঝি ওকে তোলে—নাওয়ায়—অল্প একটু খাওয়ায় একরকম জোর করেই।

—"কবিতা আড়ি করেছ বুঝি—আচ্ছা, এবার ধর্‌তে পার্‌লে নিশ্চয় একটা চুমু আদায় করে নেবো।"

কবিতা আবার কেঁদে ওঠে—ঝি একরকম জোর করেই ওকে শুইয়ে দেয়।

বাইরে তখন চাঁদ উঠেছে...তারা ফুটেছে...বাতাস বইছে...বাড়ীটা তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে...ওরা ডাক্‌ছে—'বৌ কথা কও'—পিউ্—পিউ্—

ভিতরে শুধু বিরহের...বিচ্ছেদের ব্যথায়···সাথী-হারা কবিতা গুম্‌রে কাঁদ্‌ছে...শ্বেত-পাথরের মেঝের ওপর এপাশ ওপাশ কর্‌ছে···

—"ও কবিতা, এখনও এলে না...আমি কতক্ষণ এক্‌লা থাক্‌বো।"

কবিতার অসহ্য বোধ হয়—অবিকল তা'র গলা, ওর মনে হয় পাখীটিকে ছেড়ে দেয়।

—"কবিতা, চল ছাদে যাই...তুমি গান গাইবে, আজ না গাইলে কিন্তু জ্বালাতন কর্‌বো—বলে দিচ্ছি।"

সদ্য বিধবার মন ভরে ওঠে অসহ্য ব্যথায়—সে চলে গেছে—আর ফির্‌বে না—অথচ ঐ হতচ্ছাড়া পাখীটা এমন করে তার গলাটা নকল করেছে—দিনরাত আমাকে জ্বালিয়ে মারবে। কবিতার মনে হয় পাখীটার গলা টিপে মেরে ফেলে—কবিতা কাঁদতে কাঁদতে শূন্য বিছানায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে তা' সে টেরই পায় না।

ভোরবেলায় ও ডেকে ওঠে—"কবিতা—কবিতা!"

কবিতা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। ও বলে চলেছে— "শীগ্‌গির দেখ্‌বে এসো—চাঁদ মেঘের সাথে কেমন লুকোচুরি খেল্‌ছে।"

ওরা ডেকে ওঠে—'বৌ কথা কও'—কু—উ—উ— পিউ্—পিউ্—

কবিতার আর সহ্য হয় না—সে কাকাতুয়াটিকে দাঁড় থেকে জোর করেই তুলে আনে—কাকাতুয়াটির দু'-তিন-খানা পালক খসে পড়ে—সে চীৎকার কর্‌তে থাকে।

চাকরের ছেলে ভিখনকে ডেকে কবিতা কাকাতুয়া-টিকে দিয়ে দেয়—সে আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে মাকে দেখাবার জন্য বাড়ীর পানে ছোটে—ওদের কতককে সে ছেড়ে দেয়—আর কতককে বিলিয়ে দেয়।

বাড়ীটি খাঁখাঁ কর্‌তে থাকে—ভোর হয়—সকাল হয় —সন্ধ্যা হয়· একটিও আওয়াজ পাওয়া যায় না—বাড়ীটি কি অসহ্য নীরব—অযত্নে ফুলগাছগুলো মরে যায়—শুভ্র প্রকাণ্ড বাড়ীটাকে মনে হয়—শ্বেতবসনা নিরাভরণা বিধবার মত—পলবের স্মৃতির একটুকুও লেশ সেখানে অবশিষ্ট থাকে না—দিন যায়—রাত যায়—মাস যায়— কবিতার আর সহ্য হয় না—এ বিরাট নীরবতা তার দম

মিস্ ডলি দত্ত

ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর "বিদ্রোহী" চিত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'বিদ্রোহী' পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

আট্‌কে দেবার যোগাড় করে—সে ভাবে...ওরা থাক্‌লেই ভাল হ'ত—সে কত করে ওদের একটীর পর একটী সঞ্চয় করেছিল—আর সে তার অনুপস্থিতিতে—তা'দের অমন করে অপচয় কর্‌লে কেন—সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে তার কাকাতুয়াটিকে·· সে থাক্‌লে অন্ততঃ মাঝে মাঝে তার মুখ থেকে সে ত পলবের কথা শুনতে পেত—যে কথাগুলো পলব তা'কে সব চেয়ে বেশী বল্‌তো—যা' শুনে সে সব চেয়ে বেশী শান্তি পেত—সেইগুলোই ও শিখেছিল—আর সেইগুলোই ও বল্‌ত—শূন্য দাঁড়্‌টীর পানে নজর পড়্‌তেই কবিতার মন ব্যথায় ভরে উঠ্‌লো—কাকাতুয়ার মুখে পলবের কথা শুন্‌তে মন তার হয়ে উঠ্‌লো ব্যাকুল—তার মনে হ'তে লাগ্‌লো—কাকাতুয়ার মুখে সে পলবের কথা শোনে—আর গলা ছেড়ে কাঁদে।

সে চাকরকে ভিখনের কাছ থেকে কাকাতুয়াটা চেয়ে আন্‌তে বল্‌ল—চাকর ছুট্‌লো আদেশ পালন কর্‌তে।

কাকাতুয়া এলো···দাঁড়ে বস্‌লো···কবিতা তার কথা শোন্‌বার জন্য বিরহ-ব্যথায় উন্মুখ হ'য়ে রইলো··· কাকাতুয়া কথা আর বলে না···কবিতা তার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদে···তবুও তার কথা ফোটে না...কবিতা তা'কে খেতে দেয়...আদর করে···কাকাতুয়া ঘাড় নীচু করে কি যেন ভাবে...তার স্মৃতি যায় হারিয়ে···তারপর বলে ওঠে—"ভিখ্‌ন্‌ খৈনী বানা···লখিয়া খানে দে।"

কবিতা ফুকরে কেঁদে ওঠে···নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ···তার মনে হয় সেই তার স্বামীর স্মৃতি নিজে হাতে মুছে ফেলেছে...

ঝড়ো বাতাস গাছের পাতাগুলোকে দোলা দিয়ে যায় ···পাখীটা পালকের ঝাপ্‌টা মারে...শূন্য বাড়ীটি ওঠে হাহাকার করে...কবিতা আছড়ে পড়ে মেঝের উপর...

নবী মুখোপাধ্যায়

রসরঙ্গ

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

খুকু অনেকক্ষণ আশির সাম্‌নে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আশির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কি কর্‌ছ?"

খুকু—"মা, আমাকে ঘুমোলে কি রকম দেখায় তাই দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি।"

* * *

অন্যমনস্ক অধ্যাপক—"কে? কে?"

চোর—"আজ্ঞে, কেউ নয়।"

অধ্যাপক—"আশ্চর্য্য, আমি এই যে কিসের শব্দ শুনলুম।"

* * *

উকিল—"ঠিক্ ক'রে বলুন ত আপনাদের সিঁড়িটা কি রকম?"

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সাক্ষী বল্‌লে—"যখন দোতলায় থাকি, তখন দেখি সিঁড়িটা নীচের দিকে গেছে, আবার যখন নীচে থাকি, তখন দেখি সিঁড়িটা ওপর দিকে গেছে।"

* * *

—তুমি যে আমার কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়েছিলে তা' কবে দেবে?"

—"পরের সপ্তাহে।"

—"বেশ যা' হোক্, ঠিক্ ঐ এক কথাই ত গেল সপ্তাহেও শুনেছি।"

—"স্যার, পরের সপ্তাহেও ওই একই কথা শুন্‌তে হবে। আমি যে এ সপ্তাহে এক কথা বল্‌ব আর পরের সপ্তাহে আর এক কথা বল্‌ব, সেরকম লোক আমি নই।"

আশ্রমের রাণী

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

নাম সুন্দরী।

তা' মোটেই অশোভন হয় নাই।

আঠার বছরের মেয়ে, দুধে আলতায় রং, ছিপ্‌ছিপ্ গড়নের মাঝে রহিয়াছে এক স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য, টানাটানা চোখ দু'টীতে ফুটিয়া উঠে এক মোহন দৃষ্টি, বাঁশীর মত নাক, চলে নাচের ছন্দে, পাতলা ঠোঁট দু'টীতে হাসির রেখা, মাথায় মেঘের মত একরাশ কালো চুল।

উহাকে দেখিলে রূপকথার রাজকন্যাকে মনে হয়।

কিন্তু আসলে রাজকন্যা সে মোটেই নয়।

বাড়ী যে তাহার কোথায় ছিল তাহা সে আজ একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছে। মায়ের মুখখানি তাহার খুব অস্পষ্টই মনে পড়ে। মনে পড়ে যেন মায়ের ললাট ছিল অতি ক্ষুদ্র।

তা' হউক ক্ষুদ্র, কিন্তু যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাহাকে ত কোন দুঃখ-কষ্ট পাইতে হয় নাই। বিধাতা হয় ত তাহার সেই ক্ষুদ্র ললাটেই যথেষ্ট লিখিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহার এ প্রশস্ত ললাটে কি লিখিয়াছেন—কতটুকু লিখিয়াছেন? মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয় যে, বিধাতাপুরুষ তাহার ললাটে আদৌ কিছু লিখিয়াছেন কি না।

পিতা তাহার থাকিয়াও নাই। মাতার মৃত্যুর পর তিনি দিয়াছেন তাহাকে বিসর্জ্জন। তিনি বাঁধিয়াছেন আবার নূতন করিয়া ঘর; সে ঘরে তাহার স্থান আর হইল কই?

মাতার মৃত্যুর পর পিতা তাহার সেই যে রাখিয়া গিয়াছিলেন মাতুলের আশ্রয়ে, তাহার পর এই দীর্ঘদিনের মধ্যে একবারও তাহার অবসর ঘটিয়া উঠিল না একটী দিনের জন্য তাহাকে দেখিয়া যাইবার।

পিতার উপর অভিমান করা নিষ্ফল। তাঁহার কাছে তাহার এই অভিমানের কোন মূল্যই যে নাই।

মামাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, করিবেই বা না কেন? শিবেশ্বর তাহাকে লালন করিয়াছে, পালন করিয়াছে, মানুষ করিয়া বিবাহও দিয়াছে।

শিবেশ্বর মানুষ ভালই। মা-মরা এই ভাগ্নীটিকে সে যথেষ্ট স্নেহ করে, ভালবাসে। ভাগ্নীকে বিবাহ দিয়া পরের ঘরে পাঠাইতে তাহার মন চাহে নাই বলিয়াই দেখিয়া শুনিয়া যাহার সহিত তাহার ভাগ্নীর বিবাহ দিয়াছে সে এইখানেই রহিয়া গিয়াছে।

নাম তাহার কৃষ্ণধন। হাবাগোবা মানুষ। অসাধারণ ঢ্যাঙ্গা, সেইজন্য কুঁজো হইয়া চলে, গায়ের রং কৃষ্ণ, চোখ দুইটী আবার টেরা।

তা' হোক্।

পুরুষ মানুষের রূপ আবার কে দেখিতে চায়। গুণ থাকিলেই যথেষ্ট।

বিদ্যা-বুদ্ধি সংসারে আর ক'জনের থাকে। নেশা-ভাঙ্ না করিলেই হইল।

তা' কৃষ্ণধনের এ বদ্‌অভ্যাস ছিল না।

কিন্তু সুন্দরীর মত অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী পাইয়াও কৃষ্ণধনের মনে সুখ ছিল না। ছিল না নানা কারণে—

সে এ বাড়ীতে আসিয়া দেখিল যে, এই বাড়ী যাহাদের, সংখ্যায় তাহারা নিতান্ত কম হইলেও ইহাদের আত্মীয়, দূরাত্মীয় আর অনাত্মীয়ের অনেকগুলি নরনারী নির্ব্বিকার-চিত্তে শিবেশ্বরের স্কন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে।

কৃষ্ণধনের ইহা ভাল লাগে না।

বাহিরে বড় ঘরটায় ছেলেদের আড্ডা। বিমল ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ। এখানে আসিবার সময় সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল দুইখানি হোমিওপ্যাথির বাংলা বই,

ঔষধের ছোট একটী কাঠের বাক্স আর মরিচাধরা একটা ষ্টেথিস্কোপ।

ধর্ম্মজয় আসিয়াছিল কেশবকে সঙ্গে করিয়া। সেখানে কেশব এক সখের নাট্য-সমিতিতে অভিনয় করিত, সাজিত রাধা, দিনের মধ্যে সে নানাকাজে বহুবারই আপন-মনে কহিত—

এস এস নব রসবর,
বিহনে তোমার
সেবিকা রাধার আকুল অন্তর অতি।
এ কি হে শ্রীপতি—ইত্যাদি

কেশবের এক্‌টিং শুনিয়া ধর্ম্মজয় হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিত, আর সুর করিয়া কহিত—

রহু ধৈর্য্যং, রহু ধৈর্য্যং, রহু ধৈর্য্যং রাধে—

বয়সে জীবন ছিল সকলের ছোট। ইহাদের সঙ্গে বসিয়া থাকিয়া সময়ের অপব্যবহার সে করিত না, মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিয়া সে সময় কাটাইয়া দিত।

হরিদাস বড় একটা কাহারও সঙ্গে মিশিত না, আপন-মনে বিড়ি ফুঁকিয়া দিন কাটাইত।

শিবেশ্বরকে সভাপতি করিয়া ইহারা খুলিয়াছে একটী আশ্রম। নাম দিয়াছে তাহার 'সেবাশ্রম।'

অসামঞ্জস্য হয় নাই।

দীনদুঃখী কাঙ্গালের সেবা যতখানি না হউক, তাহাদের নিজেদের সেবার কোন বিঘ্ন হয় না।..কিন্তু কাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই আশ্রমটী গড়িয়া উঠিয়াছে ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধি কৃষ্ণধনের আছে। তাই তাহার ইচ্ছা, বিমল ডাক্তারের ঔষধের বাক্সটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে, কেশবের নাকি সুরের এক্‌টিং শুনিয়া তাহার গা জ্বালা করিতে থাকে, মেয়েদের পিছন হ্যাংলার মত জীবনকে ঘুরিতে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হয় যে, উহার মুখে এক চড় মারিয়া উহাকে ভিতর হইতে বাহিরে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় কই, মনের বাসনা তাহার মনেই চাপিয়া রাখিতে হয়।

...সেদিনকার অধিবেশনে শিবেশ্বর প্রস্তাব করিল যে, এই আশ্রমে আর একটা বিভাগ খুলিলে তাহার মনে হয় খুবই ভাল হয়, সেটী ব্রহ্মচর্য্য বিভাগ।

শিবেশ্বরের এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিল কৃষ্ণধন।

কিন্তু কৃষ্ণধন এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেও ভোটে তাহা একেবারেই টিঁকিল না। আপত্তি তুলিল হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, আপত্তি তুলিল নাটুকে কেশব, হ্যাংলা জীবন। কহিল, একসঙ্গে দুটো বিভাগ খুল্‌লে তার একটারও সফল হওয়ার সম্ভব থাকে না, সুতরাং সে স্থলে একটা নিয়ে থাকাই সমীচীন।

হরিদাস কহিল, মিথ্যা নয়, দু' নৌকয় পা না দেওয়াই ভাল।

কৃষ্ণধন তখন প্রস্তাব করিয়া বসিল, তাহার মতে সেবাশ্রম তুলিয়া দিয়া, ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম খোলাই সর্ব্বপ্রথম উচিত। কারণ, পুরুষের জীবন গঠনের মূলেই থাকা উচিত ঐ ব্রহ্মচর্য্য। ওটাকে বাদ দিয়া মানুষ না কি বড় হইতে পারে না।

কৃষ্ণধনকে যাহা ভাবা গিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, আসলে তাহা সে মোটেই নয়। প্রয়োজন মত সে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণধনের এ প্রস্তাব টিঁকিবার নয়, টিঁকিলও না।

ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিল বিমল ডাক্তার, কেশব এবং জীবন দিল সায়, ধর্ম্মজয় দিল বাহবা। ডাক্তার কহিল, আজ আমাদের কৃষ্ণধন বসু ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে কথা কইলেন তা' খুবই খাঁটী কথা, কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, ওটা হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত, কিন্তু আমাদের এই সেবাশ্রম এটা মোটেই ব্যক্তিগত নয়, বহুর মধ্যে এর প্রচার করা চলে। সুতরাং বহু ব্যক্তির স্বার্থ বলি দিয়ে একের স্বার্থের পথ বেছে নিয়ে চলা মোটেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। এবং যার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বেই সম্পন্ন হয়ে গেছে এখন অন্যটা গ্রহণ করবার জন্য পূর্ব্বটাকে বিসর্জ্জন দেওয়া চলে না, চলা

উচিতও না। দিলে শুধু শত্রুপক্ষকে ব্যঙ্গ করবার সুযোগ দেওয়াই হবে। সুতরাং কৃষ্ণধনবাবুর প্রস্তাবমত সেবাশ্রম তুলে দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করবার কথা গ্রহণ করা বোধ হয় কোনপ্রকারেই সমীচীন হয় না।

বাহিরের পুকুর হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল সুন্দরী। কাঁখে-ভরা কলসী। ছলাৎ ছলাৎ করিয়া জল পড়িয়া তাহার বুকের বসন ভিজাইয়া দিয়াছে...পরিপূর্ণ যৌবন তাহার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে... কৃষ্ণধন সেখানে ছিল বলিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত ঘোমটা সে টানিয়া দিয়াছে; কিন্তু দৃষ্টির পথ তাহাতে রুদ্ধ হয় নাই। আশ্রম গৃহের দিকে চাহিতে গিয়া সুন্দরীর দৃষ্টি গিয়া পড়িল প্রথমেই বিমল ডাক্তারের উপর। তাহার মুখে ফুটিয়া উঠে একটু হাসি।

হয় ত তাহা অকারণে।

কারণেই হউক আর অকারণেই হউক ইহাতে কিন্তু বিমল ডাক্তারের বক্তৃতার উৎস আরও খুলিয়া গেল। কহিতে লাগিল, এই সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা আমাদের যদি পূর্ব্বে না হ'ত তা' হ'লে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম খোলবার প্রস্তাব আমিই সর্ব্বপ্রথম করতাম...সেবাশ্রমের নিন্দা নাই। দীনদুঃখীকে দেব অন্ন, পাব তাদের আশীর্ব্বাদ, কিন্তু আজ যদি আমরা এই আশ্রম তুলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করি ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম—আমাদের উদ্দেশ্য লোকে বুঝবে না, বল্‌বে, বেটারা সব ভণ্ড।

ডাক্তারের এই প্রচণ্ড বক্তৃতার পর আর কোন কথা বলা চলে না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের আর কোন বালাই সেখানে আসিয়া জুটিতে পারিল না।

কৃষ্ণধনের প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল, ডাক্তারের মুখের উপর সে যদি উপর্য্যুপরি কয়েকটা ঘুসি মারিতে পারিত!

কিন্তু মনের বাসনা তাহার সম্ভব হইবার সম্ভাবনা কই? তাই মনের বাসনা মনেই চাপিয়া রাখিতে হয়।

বিমল ডাক্তারকে সে কোনদিনই ভাল চক্ষে দেখিতে পারে নাই। এই না পারার কারণ ছিল অনেকগুলি। ডাক্তারের সুন্দর চেহারার দিকে চাহিলে সে যে অত্যন্ত কুৎসিৎ এইটাই সর্ব্বপ্রথম মনে হইত। আর ঠিক্ তখনই কেন জানি তাহার মনের মাঝে ভাসিয়া উঠিত সুন্দরী ও বিমল ডাক্তারের চেহারা দু'টী, কিন্তু ইহার কারণও সে খুঁজিয়া পাইত না। এই বাড়ীতে বিশেষ করিয়া এবং পাড়ার দুই-চারজনের কাছেও ডাক্তারের প্রতিপত্তি ছিল। ডাক্তার কবিতা লিখিত। শুধু এইটুকুই শেষ নয়; ডাক্তারের দুই-একটী কবিতা আবার কলিকাতার কোন এক মাসিক-পত্রে ছাপাও হইয়া গিয়াছে। তাহারই একটা কৃষ্ণধনকে সত্য অস্থির করিয়া তুলে। কবিতার মধ্যে বহুবারই সুন্দরীর নাম যখন তাহার কানে যায়, তখন কৃষ্ণধনের গা সত্য জ্বালা করিয়া উঠে। 'পিয়াসী' —এইটাই ডাক্তারের সর্ব্বপ্রথম ছাপান কবিতা, তাই এইটী দিনের মধ্যে সে বহুবারই আবৃত্তি করিয়া থাকে।

যদিচ কবিতার সব কথাগুলো সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, তথাপি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া যে ডাক্তারের এই কবিতা, তাহা সে ভাল করিয়াই বুঝে। কিন্তু বুঝিয়াও প্রতিবিধানের উপায় খুঁজিয়া পায় না। ডাক্তারের কবিতার উৎস সে ঠেকাইবে কি করিয়া! সুন্দরীর কাছে কি সে তাহার মনের এই ঈর্ষার কথা তবে খুলিয়া কহিবে! কিন্তু কহিবেই বা কি? কহিবে কি, ডাক্তার কবিতা লেখে কেন—সে সুন্দর কেন—তুমি সুন্দর কেন—আমি কুৎসিৎ কেন—এই সব? এ ত একটা ছেলেমানুষের মত কথা হইবে। সুন্দরী হয় ত তাহাকে ছোট ভাবিবে, বোকা ঠিক্ করিয়া লইবে। না, বোকা সে হইতে পারিবে না।

কিন্তু মনের অশান্তিও যে যায় না। আজ শুধু তাহার নিজের উপরই রাগ হয়। দুঃখ হয়, নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া।

সে যদি সক্ষম হইত তাহা হইলে ত সে সুন্দরীকে লইয়া অন্যত্র ঘর বাঁধিতে পারিত। সেখানে থাকিত

সে আর সুন্দরী। বিমল ডাক্তার নয়, নাটুকে কেশব নয়, হ্যাংলা জীবন নয়, আর কেউ নয়, শুধু সে আর সুন্দরী।

সে যে কতবড় অক্ষম তাহা সে আজ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে আর অলক্ষ্যে তাহার চোখ দিয়া শুধু দুই ফোঁটা অশ্রু বাহির হইয়া আসে।

সময়টা চৈত্রের শেষাশেষি। আশ্রম-গৃহের সম্মুখের কৃষ্ণচূড়ার গাছটীতে তখন অজস্র ফুল ফুটিয়া চারিদিক একেবারে রাঙ্গা করিয়া দিয়াছে। তাহারই কোন একটা ডালে বহুক্ষণ ধরিয়া একটা ঘুঘু অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিয়াছে। পার্শ্বের ছোট করবী গাছটায় একটা দোয়েল বসিয়া শিস্ দিতেছে। আঙ্গিনার উপর দিয়া প্রজাপতি বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সুন্দরী বালিশের উপর দেহভার রাখিয়া খোলা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। আজ কয়দিন হইল তাহার জ্বর হইয়াছে। মুখখানি পাণ্ডুর, খোঁপাটি শিথিল, রুক্ষ কুন্তলের দুই-একটা গোছা তাহার প্রশস্ত ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সুন্দরী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল বাহিরের প্রজাপতি দুইটীর খেলা।

দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মজয় ও কেশব ও-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া দাবা খেলিতেছে। জীবন আর হরিদাস যেন কোথায় গিয়াছে তাস খেলিতে। কৃষ্ণধন বাহিরের ঘরে দিবানিদ্রায় মগ্ন। মেয়েরা সব বড় ঘরে। তাহাদের কেউ বা যাইতেছে নিদ্রা, কেউ বা করিতেছে গল্প। এম্‌নি সময় বিমল ডাক্তার আসিয়া ঢুকিল সুন্দরীর ঘরে। আসিয়াই কহিল, কেমন আছ? আছে না কি জ্বর?

সুন্দরী ডাক্তারের দিকে চাহিয়া কহিল, কি জানি! দেখো না।

এই বলিয়া সে তাহার বাঁ হাতখানি উঠাইয়া ধরিল।

ডাক্তার 'খপ্' করিয়া সুন্দরীর শুভ্র হাতখানি নিজের সবল হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল এবং নাড়ি টিপিবার ছলে সে হাতখানি বহুক্ষণ ধরিয়াই রহিল।

সুন্দরী একটু হাসিল। কহিল, কি নাড়ী নেই না কি?

ডাক্তার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, না, জ্বরটা একেবারে ছাড়ে নাই দেখ্‌ছি। তারপর কহিল, খাবে না কি এক ডোজ্ ওষুধ?

সুন্দরী কহিল, কার? তোমার না ডাক্তারখানার?

বিমল ডাক্তার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌টায় বিশ্বাস—ডাক্তারখানার?

সুন্দরীও হাসিল। কহিল, না, তোমারটা দাও ত খাই।

আচ্ছা—বলিয়া ডাক্তার প্রফুল্ল-চিত্তে ঔষধ আনিতে চলিয়া গেল।

সেইদিকে চাহিয়া সুন্দরী আপন-মনেই হাসিতে লাগিল, কেন তা' সেই জানে!

ধর্ম্মজয় আর কেশব খেলায় একেবারে মাতিয়া গিয়াছে। ওখানে বসিয়া তাহারা উপর্য্যুপরি কেবল চীৎকার করিয়া যাইতেছে—এই কিস্তি—এই কিস্তি—

ঘুঘুটা ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া গিয়াছে। দোয়েলটাও সাড়া দিতেছে না। আঙ্গিনার উপর হইতে প্রজাপতি দুইটাও যেন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

এক শিশি ঔষধ লইয়া আবার বিমল ডাক্তার ঘরে ঢুকিল। সুন্দরীর পাশে শিশিটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, দিলাম বেশ একটা জোরাল ওষুধ। তিন দাগ—তিন ঘণ্টা অন্তর। ব্যস্, এই এক শিশিতেই জ্বর পালাতে পথ পাবে না। আজ একটু দুধ সাবু, আর কিছু না।

বাহিরের ঘরে কৃষ্ণধনের গলা শোনা গেল। বোঝা গেল দিবানিদ্রা তাহার ভঙ্গ হইয়াছে।

বিমল ডাক্তার কহিল, খেয়ে ফেলো এক দাগ। আমায় এখনই আবার ও পাড়ায় যেতে হচ্ছে, সেখানে আছে একটা রোগী এই বলিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এবারও সুন্দরী তেমনি একটু মৃদু হাসিল। ঔষধের শিশিটা তেমনি পড়িয়া রহিল। শুধু সে সেইদিকে একবার চাহিল মাত্র।

কৃষ্ণধনের সম্মুখ দিয়া বিমল ডাক্তার বাহির হইয়া গেল। সেইদিকে একবার চাহিয়া লইয়া কৃষ্ণধন ঘরে ঢুকিল। সুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিল, কেমন আছ এখন? এই বলিয়া সে সুন্দরীর কপালের উপর তাহার হাতখানি রাখিল।

সুন্দরী কোন কথা কহিল না। তেম্‌নি বসিয়া রহিল।

কৃষ্ণধন হাতখানি নামাইয়া লইয়া বলিল, খেলে কিছু এবেলা?

সুন্দরী মাথা ন'ড়াইয়া জানাইল, না, সে কিছুই খায় নাই।

এতক্ষণের পরে কৃষ্ণধনের দৃষ্টি গিয়া পড়িল ঔষধের শিশিটার উপর। সুতরাং সুন্দরীর না খাওয়ার চিন্তা আর তাহার মনে রহিল না। শিশিটার দিকে চাহিয়া কহিল, তোমার ওষুধ বুঝি? ...তা' দিলে কে? ঐ বিমল ডাক্তার না কি?

তারপর শিশিটা তুলিয়া লইয়া খোলা জান্‌লা দিয়া সেটা বাহিরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, দূর যা'!

সুন্দরী শুধু চাহিয়া দেখিল, কোন কথা কহিল না।

সুন্দরীর কাছে সরিয়া আসিয়া কৃষ্ণধন কহিল, ও ব্যাটা আবার ডাক্তার! ওর ওষুধ! দিচ্ছি তোমাকে এনে বড় ডাক্তারখানার ভাল ওষুধ।

এই বলিয়া কৃষ্ণধন সুন্দরীর জন্য ঔষধ আনিতে এই দ্বিপ্রহর রৌদ্রের মাঝ দিয়াই সরকারী ডাক্তার-খানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

কিন্তু সরকারী ডাক্তারখানায় বড় ডাক্তারের ভাল ঔষধ খাইয়াও সুন্দরীর জ্বর কমিল না। বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। কৃষ্ণধন মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। শেষে আবার বিমল ডাক্তারের ঔষধই কি খাওয়াইতে হইবে না কি।

সুন্দরীর মুখখানা আরও পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। রুক্ষ চুলগুলি প্রায় জটা বাঁধিবার উপক্রম করিয়াছে, শুভ্র ললাটের উপর দুই-চারটা রেখা দেখা দিয়াছে। চোখের দৃষ্টি হইয়াছে উদাস...কৃষ্ণধন সত্যই মহা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

সুন্দরীর জ্বর খুব বেশী হয় না বটে, কিন্তু যেটুকু হয় সেটুকু আর ছাড়িতে চায় না। সঙ্গে আবার একটু কাশিও আছে।

বিমল ডাক্তার সুন্দরীকে দেখিতে আর বড়-একটা আসে না। যদি কখনও আসে, তখন কেউ একজনের সঙ্গে, হয় ত ধর্ম্মদাস, নয় ত হরিদাস, এমনি একজন কেউ। আসিয়া সুন্দরীর জ্বরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করে না...তার ঔষধ না খাওয়ায় ওর হয় ত অভিমান হইয়াছে।

জ্বরটা যখন বেশী হয়, তখন জীবন হয় ত আসিয়া সুন্দরীর কাছে বসে। বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, বাতাস করে, অসুখ তাহার দুই-একদিনের মধ্যে সারিয়া যাইবে বলিয়া সান্ত্বনাও দেয়।

সুন্দরী ভাবে, জীবনের মনটা বেশ। ছেলেমানুষ কি না হয় ত তাই, কতই বা বয়স! জীবন হয় ত তাহার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোটই হইবে।

কেশবও আসে, আসিয়া বিজ্ঞের মত নানা কথা বলে, অসুখ গুরুতর কিছুই নয়, তবে নিয়মিত ঔষধ-পথ্যের দরকার, তাহা হইলে দুই-চারিদিনের মধ্যে সুন্দরী আবার সুস্থ হইয়া উঠিবে, এই কথাও বলে।

এমনি করিয়াই দিন গড়াইতে লাগিল। আর শুইয়া শুইয়াই সুন্দরীর দিন কাটিতে লাগিল। জ্বরের ধারা একভাবেই চলিল। মেয়েদের বড়-একটা সুন্দরীর কাছে আসিতে হয় না, ছেলেরাই সব করে। জীবন ত সব সময় তাহার কাছেই থাকে। ধর্ম্মজয় আর কেশবকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। কৃষ্ণধন ত সুন্দরীর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চাহে না...

শিবেশ্বর বাড়ী ছিল না। বিদেশে গিয়াছিল, এক শিষ্যপুত্রের বিবাহে। সেখান হইতে ফিরিয়াছে আজ এবং ফিরিয়াই সুন্দরীর অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া সে মহা

হৈচৈ সুরু করিয়া দিয়াছে। সরকারী ডাক্তারখানার ঔষধ কোনদিনই কোনও ক্ষেত্রেই যে সুফল হয় না ইহাই সে বারবার মন্তব্য করিতে লাগিল।

কৃষ্ণধন তাহাকে অনেক করিয়াই বুঝাইতে লাগিল যে, ঔষধ ভালই, কারণ সে নিজে গিয়া সেখান হইতে ঔষধ আনিয়াছে।

শুনিয়া শিবেশ্বর আরও চটিয়া কহিল, তবে আর কি? বলি, তুমি সেখানে নিজে ঔষধ তৈয়ারী কর না কি? দেয় ত সেই কম্পাউণ্ডার ব্যাটা। ফাঁকিবাজ—ব্যাটা মহা ফাঁকিবাজ।

তারপর বিমল ডাক্তারকে ইঙ্গিত করিয়া কহিল, কেন বাপু, বাড়ীর পরে রয়েছে যাদের ডাক্তার, তাদেরকে আবার পরের দোরে ছুট্‌তে হবে কেন? বিমল দেখুক। দেখে ভাল দেখে একটা ওষুধ দিক্। হোমিওপ্যাথির কাছে আবার এলোপ্যাথি। ওর শিশিতে শিশিতে যে কাজ হবে না এর এক ফোঁটায় সেই কাজ হবে...দেখে দিক্ বিমল একটা ওষুধ—

এই বলিয়া সে হাঁকাহাঁকি করিয়া বিমল ডাক্তারকে ডাকিতে লাগিল।

এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণধন কোনপ্রকারে সহিয়াছিল, কিন্তু যখন শিবেশ্বরের পশ্চাতে ডাক্তারের ভারিক্কিচালে টেথিস্‌কোপ্ এবং ঔষধের বাক্সটী হাতে করিয়া বিমল ডাক্তার সুন্দরীর ঘরে ঢুকিল, তখন কৃষ্ণধন বিস্ময়ে একেবারেই হতবাক্ হইয়া গেল। ও টেথিস্‌কোপ্ লইয়া আসিয়াছে—কিন্তু কেন!...কৃষ্ণধনের টেরা চোখ দুটো জ্বলিতে থাকে। একান্ত ইচ্ছা হয় বিমল ডাক্তারের হাত মুচড়াইয়া টেথিস্‌কোপটা কাড়িয়া লইয়া সেইদিনকার সেই ঔষধের শিশিটার মতই জানলা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়; চীৎকার করিয়া বলে, এখানে এসে তোমার ডাক্তারী করতে হবে না—ওদিকে সরে পড়ো। কিন্তু কোনদিন সে কোন কিছুই কহিতে পারে নাই, আজও পারিল না। তাহার উপর শিবেশ্বর সঙ্গে রহিয়াছে যে। বোবা হইয়া থাকা ছাড়া তাহার আর অন্য উপায় কি থাকিতে পারে।

ডাক্তার বহুক্ষণ ধরিয়া সুন্দরীকে পরীক্ষা করিল, বুকে টেথিস্‌কোপ লাগাইল, নাড়ী টিপিল, জিব বাহির করিয়া দেখিল, চক্ষু টিপিয়া দেখিল এবং পরিশেষে একসঙ্গে ইংরাজী কথার গোটাকতক শক্ত শক্ত অসুখের নাম করিয়া বাক্স খুলিয়া এক ডোজ্ ঔষধ লইয়া সে নিজেই সুন্দরীর মুখে ঢালিয়া দিল।

শিবেশ্বর মিথ্যা কহে নাই। হোমিওপ্যাথি ঔষধের গুণেই হউক আর বিমল ডাক্তারের হাতযশেই হউক ইহার পর হইতেই কিন্তু সুন্দরীর অসুখ কমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল।

গর্ব্বের সঙ্গে শিবেশ্বর সকলকে হাঁকিয়া কহিতে লাগিল, কেমন তখনই বলেছিলাম না, ওষুধ যদি থাকে তবে ঐ হোমিওপ্যাথি। তারপর কহিল, ডাক্তার, আর মিছে সময় নষ্ট নয়, এবার প্রাক্‌টিস্ সুরু কর।

মাথা নীচু করিয়া বিমল ডাক্তার বিনয়ের সঙ্গে একটু হাসে।

শিবেশ্বর বলিল, না, না, হাসির কথা নয়।—খুলে দেও বড় রাস্তার উপর ঠিক্ 'শিল্পকুটীরে'র পাশটীতে একটা ডিস্পেন্সারী। ভাল হবে হে তোমার, ডিস্পেন্সারীর 'পোজিসন্' খুব ভাল হবে।

বিমল একটু হাসিয়া অতি বিনয়ের সঙ্গেই জানায়, হ্যাঁ, তাহাই সে এবার করিবে।

আমি বল্‌ছি বিমল, তুমি একদিন এই সেনহাটীর মত এতবড় গ্রামের মধ্যে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক হয়ে উঠ্‌বে--শিবেশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করে।

...সুন্দরীর জর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে দিন দিনই ভাল হইতে লাগিল। তাহার পাণ্ডুর মুখ আবার উজ্জল হইল। চোখে আবার স্নিগ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। ললাটের রেখাগুলি আবার মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

তথাপি কৃষ্ণধন সুন্দরীর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে চাহে না। মেয়েরা ঠাট্টা করে। বলে, অবাক্ করলে জামাই, বোয়ের অসুখ কি জগতে আর কারও হয় না!

এরপর কৃষ্ণধনের সেখানে বসিয়া দিন কাটান

আর ভাল দেখায় না। কাজেই মাঝে মাঝে উঠিতেই হয়।

কিন্তু কৃষ্ণধনের সর্ব্বদা আসিবার প্রয়োজন না হইলেও ডাক্তারের আসিবার প্রয়োজন হয়—আসেও।

আসিয়া সুন্দরীর একখানা হাত ধরিয়া বসে। বলে, নাড়ী ভালই। তারপর অন্যকথা বলে। সুন্দরীর হাতখানা ছাড়িয়া দেয় না, হাতের মধ্যেই রাখিয়া দেয়।

...সেদিন ডাক্তার আসিল তাহার লেখা আর একটা নূতন কবিতা লইয়া। আসিয়া কহিল, লিখ্‌লাম একটা নূতন কবিতা। শুন্‌বে না কি?

ডাক্তারের কবিতা সুন্দরীর ভালই লাগে। বেশ লেখে ডাক্তার...কৃষ্ণধন যদি কিছু লিখিতে পারিত।...

কহিল, পড়ো না।

ডাক্তার কবিতার খাতাখানি খুলিতে লাগিল।

সুন্দরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এবারটার কি নাম রাখ্‌লে, প্রেয়সী?

ডাক্তার মৃদু হাসিল। কহিল, না এবারের নাম 'আশ্রমের রাণী।'

সুন্দরী ডাক্তারের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, আশ্রমের? কোন্ আশ্রম—তোমাদের এইটে?... আশ্রমের রাণী তবে আমি না কি?

মৃদু হাসিয়া ডাক্তার কহিল, হুঁ। তাই।

মিথ্যা নয়, সুন্দরীকে লইয়া বেশ ভালই কবিতা লেখা চলে—আশ্রমের রাণী? তা' সুন্দরী আশ্রমের রাণীই বটে।

ডাক্তার কবিতা পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মাঝেই সুন্দরী প্রশ্ন করিয়া বসিল, তুমি বিয়ে করবে না বিমল দা'?

প্রশ্ন একেবারেই অসংলগ্ন। ডাক্তার হঠাৎ ইহার কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পায় না।

সুন্দরী তাহার প্রশ্ন ঘুরাইয়া বলিল, বিয়ে করো না বিমল দা', বৌদি'র সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বাঁচি এই বলিয়া সুন্দরী হাসে।

ডাক্তার কিন্তু হাসে না। একটু গম্ভীর হইয়া বলে, কি হবে এই ত বেশ আছি! তা' ছাড়া—সুন্দরীর চোখের পানে চাহিয়া বলে, মনই যদি যায় হারিয়ে—

কিন্তু কথা তাহার আর শেষ হয় না। জীবনটা কোথা হইতে যেন ঠিক্ এই সময় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আসিয়া একটা আসনে বেশ জম্‌কাইয়া বসিয়া পড়ে।

অগত্যা ডাক্তারকে উঠিতে হয়। উঠিতে উঠিতে বলে, আজ আর নয়, কাল থেকে দু'বেলাই ভাত। ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে জীবনের দিকে একবার চাহিয়া ডাক্তার বাহির হইয়া যায়।

বক্রদৃষ্টিতে জীবন তা' দেখিতে পায়। ডাক্তারের যাইবার পথের দিকে চাহিয়া বলে—ফুঃ!

তাহার পর জীবন তাহার জামার পকেট হইতে গোটা-চারেক কাটা পেয়ারা বাহির করিল, আন্‌লাম তোমার জন্য সু দি'।

এই বলিয়া জীবন পেয়ারা কয়টী সুন্দরীর হাতে দেয়।

সুন্দরী খুব খুসী হইয়া বলে, জীবন লক্ষ্মী, সত্যি লক্ষ্মী।

জীবনের চোখ মুখ আনন্দে হাসিয়া উঠে। কহে, তুমি যখনই চাইবে, তখনই এনে দেব। কবিরাজ-বাড়ীর গাছে আরও আছে।

কৃষ্ণধন সেখানে আসিয়া জীবনকে দাঁত বাহির করিয়া সুন্দরীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে দেখে। হাতের পেয়ারাগুলো তাহার চোখে পড়ে। ওগুলো এখানে কে আনিয়াছে এবং কাহার জন্য আনিয়াছে তাহাও সে বোঝে। বুঝিয়াও সে উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করে।

কৃষ্ণধন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। ভাবে, একসঙ্গে ক'জনের পানে সে দৃষ্টি রাখিবে, রাখিয়াই বা করিবে কি! চুপ করিয়া থাকাই ভাল। বোবার শত্রু নাই এই কথাটাই সে এবার প্রমাণ করিবে।

সুন্দরী সারিয়া উঠিল, কিন্তু এই বাড়ীতে ঘটিয়া গেল এক অভাবনীয় ব্যাপার। দুইদিনের সামান্য একটু জ্বরে শিবেশ্বর মারা গেল।

এই নিদারুণ মৃত্যুর আঘাত পাইল অনেকে, কিন্তু সুন্দরীর মনে হইল, তাহার যে আশ্রয়টুকু ছিল আজ তাহাও ধুইয়া মুছিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াই গেল। এতবড় পৃথিবীর মাঝে আর তাহার কোন আশ্রয়ই রহিল না।

কৃষ্ণধন চোখে দেখিল অন্ধকার। সংসারে কারও অভাব যে চিরদিন থাকে না তাহা সে জানে। কৃষ্ণধন ভাবে, শিবেশ্বরের অভাবও বুঝি একদিন পূর্ণ হইবে। হয় ত একদিন বিমল ডাক্তারই তাঁহার শূন্য সিংহাসনটায় নিজের আসন পাতিয়া লইবে। কিন্তু তখন কোথায় রহিবে কৃষ্ণধন, কোন্ প্রয়োজনে লাগিবে তাহাকে।

আজ সুন্দরীকে তাহার বোঝা বলিয়াই মনে হয়। সে যদি একলা হইত, কি ভাবনা ছিল তাহার? কাহার কোনও ধারই সে ধারিত না। একলা পেট, কোনরকমে চলিয়াই যাইত। কিন্তু সুন্দরী—

তবুও তাহার মাঝে মাঝে মনে হয়, সময় থাকিতে সে সুন্দরীকে লইয়া এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে, না হয় ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তখনই তাহার মনে হয়, সুন্দরী যাইবে ত? তাহার সঙ্গে এখান হইতে যাইতে সুন্দরী চাহিবে ত?

ভাবিতে গিয়া কৃষ্ণধনের চোখের সম্মুখে অন্ধকারে মিলিয়া মিশিয়া সব কিছু একাকার হইয়া যায়।

এই সংসারে মাঝে মাঝে এমন দুই-একটা অঘটনও সংঘটন হইয়া থাকে যে, যাহার হদিস পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কেহ পায় না। কিন্তু যখন সত্য তাহা ঘটে, তখনই লোকের চক্ষু পড়ে তাহার দিকে। ভাবে, তাই ত—এ কি হইল! এবং হয় ত তাহার সূত্র ধরিয়া মানব জীবনের চাকা যায় নিমিষের মধ্যে অন্যদিকে ঘুরিয়া।

এমনি এক অঘটন ঘটিয়া গেল সুন্দরীর জীবনে এবং তাহাতেই একদিন কৃষ্ণধনের হাত ধরিয়া এ বাড়ীর বাহির হইতে হইল।

কৃষ্ণধন এতদিনে ভাবিয়া যাহার কূলকিনারা পাইতে ছিল না, তাহারই কূল দেখাইয়া দিল সুন্দরী।

কিন্তু কিসে যে এমন হইল এবার তাহাই বলিতেছি—

বাড়ীতে আরও আত্মীয়স্বজন আসিয়াছে। শিবেশ্বরের শ্রাদ্ধ। সুন্দরী নিজের হাতে বহু কাজ করিতেছিল—কাজ করিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল। মামা তাহাকে কত ভালবাসিতেন। তাহার কাজ, অন্যকে সে কাজের ভার দিতে মন ত তাহার চাহিতেছিল না।

আজ বহুবারই মামাকে তাহার মনে হইতেছিল। সেই ছোটবেলা হইতে আজ এই বয়স পর্য্যন্ত তাহার উপর মামার স্নেহ-ভালবাসার কথা আজ বারবার তাহার মনে হইতেছিল। এমন মামা তার—ভাবিতে গিয়া সুন্দরী চোখের জল রোধ করিতে পারিতেছিল না।

কাজের বাড়ী। জীবন কেশব ঘুরিয়া ফিরিয়া নানান কাজ করিতেছিল। ধর্ম্মজয় ভিয়ানের ভার লইয়াছে। হরিদাসের উপর ভার পড়িয়াছে সমস্ত বিষয় তদারকের। শুধু নির্লিপ্ত বসিয়াছিল কৃষ্ণধন।

বিমল ডাক্তারের উপর সমস্ত দায়ীত্ব। তাহাকে সর্ব্বদিকেই ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। নানা কাজে সুন্দরীর কাছে ডাক্তারকে বহুবারই আসিতে হইতেছে। আসিয়া নানা পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে। বলিয়াছে, একাজে যেন কোন নিন্দা না হয় এইটাই তুমি লক্ষ্য রাখো সুন্দরী!

তা' কাজের কোন নিন্দা হইল না। বরং বহুলোকই বিমল ডাক্তারকে ডাকিয়া প্রশংসা করিয়া গেল।

শ্রাদ্ধ-বাড়ীর গণ্ডগোল মিটিতে মিটিতে রাত্রি হইল অনেক। শুইতে যাইবার পূর্ব্বে বিমল ডাক্তার আসিয়া সুন্দরীকে কহিয়া গেল, সকলেই কাজের খুব সুখ্যাতি করে গেলেন সুন্দরী।

শুনিয়া সুন্দরীর সারা অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেল, তৃপ্তিও পাইল।

রাত্রি হয়েছে, এইবার তুমি একটু গড়িয়ে নেও, আবার ত ভোরেই উঠ্‌তে হবে—এই বলিয়া ডাক্তারও ঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

সুন্দরী কিন্তু বসিয়া রহিল। দৃষ্টি ছিল বাহিরের ঐ আকাশের গায়ে। আকাশে অসংখ্য তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐ আকাশও কতদূরে! ঐ তারাগুলো সব

কাহারা! যাহারা পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া যায় তাহারা গিয়া কি ঐ আকাশের গায় তারা হইয়া থাকে? তাহার মামা—কোন তারায় আছেন তিনি? তিনি কি ওখান হইতে তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

সুন্দরী তারাগুলির পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে···তারার মাঝে মামার মুখ আজ সে দেখিতে চায়···

ঐখানেই সুন্দরী কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল কাহার তপ্ত নিঃশ্বাস যেন তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ···সুন্দরী চক্ষু খুলিল। খোলা জানলা দিয়া বাহিরের খানিকটা জ্যোৎস্না সুন্দরীর বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলোকে বিমল ডাক্তারকে চিনিয়া লইতে একটুও বিলম্ব হইল না। এই গভীর রাতে বিমল ডাক্তার চোরের মত কেন যে আসিয়াছে সুন্দরীর তাহা বুঝিয়া লইতে এতটুকুও বিলম্ব হইল না। বুঝিয়া তাহার সর্ব্বশরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া গেল।

মুহূর্ত্ত মাত্র। পরমুহূর্ত্তেই ডাক্তার সুন্দরীর মুখের উপর নিজের ব্যগ্র ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

এই পশুর এই বিষাক্ত চুম্বনে সুন্দরীর সর্ব্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। দুই হাত দিয়া ডাক্তারের মুখখানা নিজের মুখের উপর হইতে সবেগে সরাইয়া দিয়া কহিল, বেরিয়ে যাও,—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ডাক্তার চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার পরমুহূর্ত্তেই সুন্দরীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া চাপা গলায় কহিতে গেল, সুন্দরী—

ডাক্তারের হাত হইতে নিজের হাতখানা টানিয়া লইয়া সুন্দরী তিক্ত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আর কোন কথা নয়, শীগ্‌গির বেরিয়ে যাও এখান থেকে, নইলে আমি চীৎকার করে সকলকে ডাক্‌ব।

বিমল ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু দ্বিধা করিয়া, একবার ইতস্ততঃ করিয়া বিকৃত-কণ্ঠে কহিল, পার ত আমায় ক্ষমা কর। আমি—

সুন্দরী ঘৃণার সঙ্গে কহিল, কোন ছলে এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না ডাক্তার। তোমার উপর আমার এতদিন যে ভুল ধারণা ছিল, আজ তা' ভেঙ্গে ভালই হ'ল, তোমার স্বরূপ আমি চিনেই গেলাম—এই বলিয়া সুন্দরী ডাক্তারকে আর কোন কথা কহিবার অবসর না দিয়া নিজেই সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকারেই ডাক্তার ভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যখন সকলকে একেবারে বিস্মিত করিয়া কৃষ্ণধনকে সঙ্গে লইয়া সুন্দরী তাহার এই দীর্ঘ দিনের আশ্রয় ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে ভাবিল, এ কি, এ আবার কি হইল!

কিন্তু সুন্দরী কাহারও কোন আদেশ, কোন অনুরোধ, কোন আবদারই রাখিল না। আশ্রমের রাণী ঠিক্ রাণীর মতই মাথা উঁচু করিয়া ঘরের বাহির হইল।

শুধু জীবন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা দূর আসিয়াছিল। ফিরিবার মুখে জিজ্ঞাসা করিল, সু দি', বলে যাও কেন এমন করে আমাদের ছেড়ে চল্‌লে!

ব্যথাভরা চোখে জীবনের দিকে চাহিয়া সুন্দরী কহিল, না গিয়ে যে উপায় নেই, যেখানে হয় নারীত্বের অপমান, সেখানে যে আর থাক্‌তে পারি না ভাই—

সুন্দরীর কথা জীবন বুঝিল না, শুধু জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী কহিল, আজ সবকথা বুঝ্‌বে না ভাই, কিন্তু যেদিন বুঝ্‌বে সেদিনকার জন্য আজ এই অনুরোধটুকু করে যাই—শুধু এইটুকু মনে রেখো, তোমরা পুরুষ, নারীকে যা' ভাব, আসলে কিন্তু তারা তা' নয়—

সুন্দরী আর কিছু কহিল না। চক্ষু মুছিয়া কৃষ্ণধনের সঙ্গে আগাইয়া গেল।

বাঁকের মোড়ে তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইতেই জীবন ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

সুন্দরীকে সে সত্যই বড়বোনের মত ভালবাসিয়াছিল।

সুন্দরীদের চলিয়া যাইবার পথের দিক্ হইতে জীবন তাহার দৃষ্টি কিছুতেই ফিরাইয়া লইতে পারিতেছিল না।

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়।

বিদ্রোহী

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য

অজয় এলাহাবাদে থাকিয়া কলেজে প্রোফেসারী করে। দিনরাতই লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকে এবং অসংখ্য ফাইফরমাজে স্ত্রী সুলেখাকে ব্যস্ত রাখে। জুনিয়র প্রোফেসর—বেতন অল্প, কিন্তু অধ্যাপক হিসাবে তাহার নাম অল্প ছিল না। যুক্তপ্রদেশের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই জানিত, অজয় মুখার্জ্জি প্রোফেসর অব্ লজিক; বাঙ্গালী অধ্যাপকটি শুধু অধ্যাপনায় নয়, শৃঙ্খলারক্ষণেও অসাধারণ সুদক্ষ; আজও স্কুলের ছাত্রদের মত কলেজের বয়োবৃদ্ধ বন্ধুগণকে প্রয়োজন হইলে বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দেয় এবং প্রয়োজনানুসারে নিজের হাতে কানমলা খাইতে দেয়।

অজয় মুখোপাধ্যায় নিজের মনের মত মানুষ—নিজের কেন্দ্রগত। বাইরে যে এতবড় একটা বিশ্বসংসার চলিতেছে, ইহার মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপ করিবার কিছু নাই; জাগতিক কার্য্য যিনি চালাইয়া যাইতেছেন তিনিই চালাইবেন, অতএব মানুষের সেদিকে দৃষ্টিপাত করা শুধু বিফলতা নয়, দুঃখেরও কারণ—এইরূপ মনের ভাব।

সুলেখা বড়লোকের মেয়ে। তার আর আর সব বোনের খুব বড় ঘরেই বিবাহ হইয়াছে—পয়সার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে সুলেখাই সব চেয়ে দরিদ্র স্বামীর ঘরে আসিয়াছে। তাহার জন্য অবশ্য সুলেখার কোনো অনুযোগ অভিযোগ ছিল না। বিবাহের পর হইতেই তাহাদের প্রবাস-জীবন। দেশ হইতে, আত্মীয়-বন্ধুদের দৈনন্দিন পরিচয় হইতে দূরে—বহুদূরে তাহাদের মিলন-মন্দির নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এ সংবাদে সে বরং পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। মনের ভিতর অভিযোগ সুরু হইল সেইদিন, যেদিন অজয় তাহার প্রবাসে এতটুকু স্বাধীনতা দিতে চাহিল না। ধনীকন্যার নিকট স্বামীর এই সকল কারণে অকারণে কঠোর বিধিনিষেধ লৌহশৃঙ্খলের মত মনে হইত এবং কখনো কখনো মানসিক উত্তেজনায় তাহার মন ওই শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিত।

বিকালবেলা তেতালার ঘরে বসিয়া অজয় কি-একটা লিখিতেছে, দোতালায় কলরব শুনিয়া বুঝিল সুলেখার কতকগুলি বন্ধু আসিয়াছে। তাহার অনুমান ঠিক-ই হইল। খানিকক্ষণ পরে সুলেখা আসিয়া লিখনরত স্বামীর সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইল।

অজয় মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাঁড়িয়ে রইলে ?"

সুলেখা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সৌদামিনী, তার ভাইবোন্ সব এসেছে।'

অজয় বলিল, "বেশ।"

সুলেখা বলিল, "আজ তারা বায়স্কোপে যাবে।"

সোজা হইয়া বসিয়া অজয় বলিল, "যখন তখন বায়স্কোপে যাওয়া। তার আমি কি করবো বলো? তাকে বারণ করবার অধিকার ত আমার নেই? নরেনটা এ বিষয়ে উদাসীন—একটা ষ্টুপিড্। যায় যাক্।

সুলেখা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে জন্য ওই ভূমিকাটুকু করিয়াছিল অজয় সে ধার দিয়াও গেল না। সে জানিত আজকাল বায়স্কোপে যে সকল ছবি সচরাচর দেখানো হয়, তাহা নৈতিক অধঃপতনের অনুকূল —ইহাই অজয়ের বিশ্বাস, এবং এই জন্যই বায়স্কোপে যাওয়াতে তাহার এত আপত্তি। সুলেখা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আজ 'শকুন্তলা' হচ্ছে।"

অজয় বলিল, "হোক্ গে। তা'তে তোমার কি? আমি শুনিছি যে, শকুন্তলার বিলাতী ছবি হয়েছে। তা'তে দেখবার চেয়ে না দেখবারই অনেক কিছু আছে। যে অভিনেত্রীটী শকুন্তলার পার্ট করেছে, তার ইতিহাসটা পড়ে মনে হ'ল, স্ত্রীলোকের নৈতিক দুর্ব্বলতার যেখানে

শেষ সীমা, সে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সে করবে তপস্বী কন্যা শকুন্তলার পার্ট আর 'হলিউডে'র কতকগুলো অমানুষ মিলে কেউ করবে 'কন্বে'র পার্ট, 'দুষ্যন্তে'র পার্ট,—সেই ছবি আবার দেখে?"

সুলেখা বলিল, "কিন্তু ওরা যাচ্ছে—"

—"যাক্ গে। তুমি যেয়ো না। বলো গে, আমি বারণ করেছি।"

সুলেখা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাল্যসখী সৌদামিনীকে আজ সে ডাকিয়া আনাইয়াছে শকুন্তলা ছবি দেখিতে যাইবে বলিয়া। সেও সদলবলে আসিয়া হাজির হইয়াছে। এখন সে কেমন করিয়া তাহাকে বলিবে তাহার যাওয়া হইবে না, কারণ স্বামীর নিষেধ? এমনি ত সৌদামিনী এবং তাহার স্বামী নরেনবাবু, তাহার স্বামীকে পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের সহিত তুলনা করিয়া কত ঠাট্টা করে—আজ এই ব্যাপারের পর তাহারা কি না বলিবে? তাহার সব চেয়ে বেশী কষ্ট হইতেছিল, বায়স্কোপে না যাইতে পারাতে নয়—স্বামীর বলিবার ভঙ্গীতে। অতি সহজ এবং স্বচ্ছন্দে আদেশ হইল, "বলো গে আমি যেতে বারণ করেছি।" যেন তাহার মনের আনন্দ আকাঙ্ক্ষা—তা' আপনার বস্তু নহে—তা' নিজের সত্তার সঙ্গে স্বামীর বিধিনিষেধের পায়ে বিক্রীত। সম্মুখে দণ্ডায়মান স্ত্রীর আনত মুখের দিকে চাহিয়া অজয় বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে? এখন যাও। একান্তই বায়স্কোপ দেখতে সাধ হ'য়ে থাকে, বেশ সামনের শনিবারে আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে দেখিয়ে আনবো।"

সুলেখা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তারপর নিজের ঘরে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ। কিন্তু তুচ্ছতার জন্যই মনের উপর আঘাতটা বাজে বেশী। সারাদিন সেবাদাসীর কর্ম্মের হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া সন্ধ্যাবেলা একদিন বন্ধুর সহিত বায়স্কোপে গেলে বিশ্ব সংসারের কোনো অমঙ্গল ঘটিত না, কিন্তু তাহার স্বামী হিন্দু-স্বামীর অধিকারের অবিসংবাদিত দাবী লইয়া সেই সহজলভ্য আনন্দটুকু হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিল। শুধু আজ বলিয়াই নহে, প্রতিদিনই প্রতি কাজে এই কঠোর শাসন তাহাকে যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। একবার তাহার মনে হইল, গোড়া হইতে এমন করিয়া আত্মসমর্পন করিয়া সে মস্ত ভুল করিয়াছে। ভাবিল, স্বামীর আদেশ উপেক্ষা করিয়া কেন সে সৌদামিনীর সঙ্গে চলিয়া গেল না। একটা রুদ্ধ আক্রোশে তাহার মন ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া উৎক্ষিপ্ত মন শূন্য হাউয়ের মত নৈরাশ্যে লুটিয়া পড়িল।

সৌদামিনীর সহিত সে নিজেকে মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। সে তাহার বাপের মত বড়লোকের মেয়ে নয়—তাহার মত শিক্ষিতাও নয়। তাহার স্বামী নরেনবাবুও অতি সাধারণ একজন কেরানী। সে জানিত নরেনের চরিত্রে একটু ত্রুটী আছে—মাঝে মাঝে লুকাইয়া সে মদ খায়। সুলেখার উত্তপ্ত মন আজ সেই নরেনের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। থাকুক চরিত্রের সামান্য একটু ত্রুটী—সে অন্ততঃ তাহার পরিণীতা স্ত্রীকে অসুখী করে নাই—এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের গৌরব পুরুষের অন্যান্য সমস্ত বিচ্যুতি ঢাকিয়া দেয়। তাহার মদ খাওয়া দোষের হইত, যদি মদ সৌদামিনীর চেয়ে তাহার প্রিয় হইত। নরেন সৌদামিনীকে ভালবাসে—যেমন ভালবাসা উচিত এবং স্বাভাবিক। সৌদামিনীর বড়-ছোট কোন আনন্দ আকাঙ্ক্ষার পথে সে ত কোনদিন বাধা সৃষ্টি করেই না বরং আরও উৎসাহ দেয়। হিন্দুর ঘরের স্ত্রী—তার আর কোথাও স্বাধীনতা নাই, আর কোথাও স্বাধীনতা সে চায়ও না, শুধু চায় স্বামীর কাছে। এইটুকু তার বিশুদ্ধ বাতাসের মত মনের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। এইটুকু না হইলে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

সৌদামিনী যথার্থই সুখী। ছেলেবেলাকার মত সেই যখন-তখন মুক্ত হাসি তাহার মুখে লাগিয়াই আছে। তাহারও প্রবাস-জীবন, কিন্তু প্রবাস-জীবনের ষোলআনা মাধুর্য্যটুকু সে উপভোগ করিতেছে। গাড়ী করিয়া অনেক কিছু দেখিবার এবং না দেখিবার বস্তু দেখিয়া বেড়ানো—এ ত সৌদামিনীর নিত্য সাংসারিক কাজের ভিতর গণ্য।

তারপর থিয়েটার বায়স্কোপ ত আছেই। ইহাতে নরেনের ত অমত নাই-ই বরং বিশেষ সমর্থন আছে। প্রায়ই সৌদামিনী সুলেখার বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া বন্ধুকে লইতে উপরে উঠিয়া আসে, এবং সুলেখার আবেদন-পত্রে স্বামী না-মঞ্জুর লিখিয়া দেন—সুলেখার যাওয়া হয় না।

ইহার সপ্তাহখানেক পরে সুলেখা ও সৌদামিনীর মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সৌদামিনী সুলেখার স্বামীকে গুরুমশায়ের সহিত তুলনা করিয়া সুলেখার সহিত ঠাট্টা করিত। তাই অজয়কে দেখিতে না পাইয়া সুলেখাকে বলিল, "গুরুমশায় কোথায় রে, তোকে একলাটি রেখে?"

সৌদামিনীর এই পরিহাসে ইদানীং সুলেখা সত্যই একটু বিরক্ত হইত। এটা তাহার মনে হইত বন্ধুর সরল পরিহাস নহে, আত্মতুলনামূলক পরিহাস। সুলেখা বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি জানি কোথায়।"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, "তুই আজকাল অত ভারিক্কে মেজাজী হয়েছিস্ কেন বল্ ত সুলেখা? সত্যি, বিশেষ ক'রে এই ক'দিন তুই যেন বড্ড গুম্‌রে গুম্‌রে বেড়াচ্ছিস্। তোর মত হ'লে আমি—সত্যি সুলেখা।"

মুখ তুলিয়া সুলেখা বলিল, "কি?"

—"আমি ধন্য হ'য়ে যেতুম।" সুলেখার বিস্মিত চোখের উপর কারুণ্যপূর্ণ চক্ষু দুইটি সংন্যস্ত করিয়া সৌদামিনী বলিল, "সত্যি বলছি—ঈশ্বর জানেন, আমি আমার প্রাণের কথা-ই বল্‌ছি। ও-রকম গুরুমশায় সকলের ভাগ্যে জোটে না রে।"

—"তাই রক্ষে।"

—"আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই সুলেখা, মানুষ, বিশেষ ক'রে আমাদের মত মেয়েমানুষ, যখন নিজের ভালো কোন্‌টা মন্দ কোন্‌টা তা' জানে না, তখন কোন্ মুখে সে ভগবানের কাছে নিজের দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ করে?"

—"ভালমন্দের জ্ঞান সব মানুষের কাছে ত এক নয়।

—"আচ্ছা, বল্ ত সৌদামিনী, প্রত্যেক কাজে, তা' যত তুচ্ছ হোক্, শাসন ভাল লাগে? হুকুম মত পা গুণে গুণে যদি চল্‌তে হবে—হুকুম মত আনন্দ করতে হবে—মনে কোনো কিছু ইচ্ছে হয়, তা' হলেও সে ইচ্ছে করতে হবে হুকুম নিয়ে—এটা যে সৌভাগ্য মনে করে, সে সৌভাগ্য তারই জন্মে জন্মে হোক্। আমার সহ্য হয় না। বাবা আমাকে এভাবে মানুষ করেন নি, আর এমন কড়ার করেও বিয়ে দেন্ নি।"

উত্তরে, সৌদামিনীর মনে এই কথাটাই বারংবার উঠিতে লাগিল, স্বামীর বন্ধন—জগতের মধ্যে প্রিয়তমের হাতের বন্ধন—সেই-ই ত মুক্তি! এই বন্ধনটুকুর জন্যে আমি যে কত হাহা করে বেড়িয়েছি, তা' যদি বুঝ্‌তিস্ সুলেখা? এই কথাটা সুলেখাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু তার তেজোদীপ্ত সবল চিত্ত বাল্যসখীর নিকটও আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিল না।

সুলেখা ত জানে না, তাহার যেটা অভিযোগ, সেই-টুকুর জন্যই ওই আর একটী নারীচিত্ত ঈশ্বরের পায়ে নিরন্তর মাথা কুটিতেছে। সুলেখার ঈপ্সিত ওই তুচ্ছ বাহ্য স্বাধীনতাটুকুও সৌদামিনী অর্ঘ্য করিয়া স্বামী-দেবতার পায়ে নিবেদন করিতে চাহিতেছে, কিন্তু দেবতা তা' গ্রহণ করে নাই। এটা ত তাহার কাছে সৌভাগ্য নয়—সে যে সেই দেবতার মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে চাহে—তাহার বন্ধনে আত্মসমর্পণ করিতে চাহে! এ গভীর চিত্ত-বেদনা সে কেমন করিয়া লঘু-হৃদয় সুলেখাকে বুঝাইবে? সৌদামিনী নরেনের বিবাহিত স্ত্রী। কিন্তু তবুও যেন তাহাদের উভয়ের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। সে আরো কাছে পাইতে চায়—আরো নিবিড় নিগূঢ় গভীর মধ্যে পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে চায়।

সুলেখা তাহাকে সেদিন অভিনন্দিত করিয়াছিল, "তুই ত ঘরের মালিক—যা' ইচ্ছে যায় করতে পারিস্, কেউ নিষেধ করবে না।" সুলেখাকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে, সেইটাই তার সবচেয়ে বড় ব্যথা! সে ইচ্ছা-মত বায়স্কোপে যায়, থিয়েটারে যায়, কেউ নিষেধ করে না, কেউ নিষেধ করিবার নাই। যদি একটি দিনও নরেন্দ্র

নিষেধ করিয়া, শাসন করিয়া, আত্মঅধিকারের দাবী লইয়া বারণ করিত, "সৌদামিনী, আজ তুমি যেয়ো না, আমি বারণ কর্‌ছি"—তা' হইলে সে কৃতার্থ হইয়া যাইত। সেই শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত!

সেদিন সৌদামিনী আসিয়া সুলেখাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। নরেন বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের লইয়া একটা প্রীতি-ভোজ দিতেছে—তাহারই নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যার পরই সুলেখা সাজিয়া-গুজিয়া প্রস্তুত হইতেছে—সৌদামিনীর ছোট ভাই আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যাইবে।

অজয় কলেজ হইতে আসিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল—সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া সুলেখাকে সাজিতে-গুজিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "কোথায় যাবে সুলেখা, সেই ষ্টুপিড্‌টার বাড়ী ?"

স্বামীর মুখের দিকে হাঁ-করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সুলেখা বলিল, "সৌদামিনীর বাড়ী।"

"বুঝেছি, তাই তোমাকে বারণ কর্‌তে এলুম। সেই রাস্কেল্‌টার বাড়ী যাওয়া—একেবারে অসম্ভব! রাস্কেলটা কর্‌ছে কি জানো? গেল দু'দিন দু'রাত্তির মোটে বাড়ী আসে নি—কোথায় একটা বেশ্যা মাগী নিয়ে মত্ত ছিলো। আর সৌদামিনী দু'দিন খায় নি, নায় নি। সেই রাস্কেল্ ক'টা বকাটে ইয়ার নিয়ে গুষ্টির পিণ্ডি প্রীতিভোজ দিচ্ছে, আর সেই প্রীতিভোজে যাবে তুমি!"

মৃদুকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "কিন্তু ভদ্রতা রক্ষা—"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অজয় বলিল, "ভদ্রতা রক্ষা? একটা পশুর সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা! তোমার জ্ঞান একেবারে টন্‌টনে হ'য়ে উঠেছে সুলেখা। নিজের স্ত্রীর ওপর যে অতবড় একটা নির্য্যাতন কর্‌তে পারে—ওঃ, আমি যদি একদিনের জন্যও বাঙলাদেশের ডিক্‌টেটর হ'তুম সুলেখা, তা' হ'লে ওই সব পশুর অধমগুলোকে বেছে নিয়ে এক সঙ্গে মার্‌তুম!"

ওই স্বভাব-গম্ভীর স্বামীর মুখে একসঙ্গে এতগুলি কথা এবং এতটা উত্তেজনা বোধ হয় সুলেখা এই প্রথম দেখিল। সে বিস্মিত হইয়া অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এতে যে তাদের অপমান করা হবে?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে অজয় বলিল, "মান-অপমানের প্রশ্ন ওঠে মানুষের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে নয়।"

"তুমি না হয় নরেনবাবুকে অপমান কর্‌তে পারো, কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেছে সৌদামিনী নিজে—আমি তারই খাতিরে, তারই বাড়ীতে যাচ্ছি। সে কি দোষ ক'রলে?"

"আচ্ছা, যাতে তোমার সৌদামিনী কিছু মনে না করে, সে দায়িত্ব আমি নিলুম। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বরং একটু চা ক'রে দাও। আমি না হয় একবারটি তাদের বাড়ী ঘুরে এসে সৌদামিনীর মানটা রেখে আস্‌ছি।"

সুলেখা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি যাবে কি? সৌদামিনী আমার নাম ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে যে?"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অজয় বলিল, "তা'তে এমন কিছু অপমান হবে না যে, আমার আর বাইরে মুখ দেখান ভার হবে। সে অপমানটুকু তোমার খাতিরে না হয় আমি মাথায় ক'রে নেবো। তোমার প্রতিনিধি হ'য়ে আমি যাবো—তা'তে দোষ কি? বড় বড় সাম্রাজ্যের কাজ চল্‌ছে প্রতিনিধিদের দিয়ে।"

উত্তরে সুলেখা নীরব হইল। তাহার আর ইহার উপর কিছু বলিবার নাই। নীরবে বেশভূষাগুলি খুলিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সৌদামিনীর ভাই গাড়ী লইয়া আসিলে তাহাকে তীব্রকণ্ঠে জবাব দিয়া ফিরাইয়া দিল, "সৌদামিনীকে বল্ গে আমি যাবো না।"

সুলেখার অন্তরে পুঞ্জীভূত আক্রোশ এইবারে মনের উত্তাপে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ভগবান যেখানে নারীর সহন-শক্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, স্বামীর প্রভুত্বের দাবী তার-ও অনেক উর্দ্ধে আসিয়া পৌছিয়াছে। যেন সে এইবার একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইবে, এই ভাবেই সে তাহার নারী-চিত্তকে আসন্ন-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিল।

এ কি অন্যায়? তাহার কি একটা নিজের সত্তা

নাই ? তাহার সৃষ্টি কি স্বামীর হাতের পুতুল হইয়া ছাই-ভস্মের ঘর-সংসার করিবার জন্য।

সৌদামিনী তাহার বাল্যবন্ধু। সে তাহাকে হাত ধরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। সেখানে যাওয়া উচিত কি অনুচিত তাহার বিচার তাহাদের উভয়ের মধ্যে, মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির বোঝাপড়া করিতে আসা অনধিকার—সম্পূর্ণ অনধিকার।

আজকাল অজয় কলেজ হইতে আসিলেই সুলেখা চা তৈয়ারী করিয়া দেয় না। অজয় একবার, দুইবার, তিনবার বলিলেও সুলেখা ব্যস্ত হয় না। স্বামীর আদেশ-মাত্রই যে স্ত্রীর কাছে বাধ্যতামূলক নয়, তা' তার ইচ্ছাধীন, এই কথাটা সে তাহার প্রতি কাজের ভিতর সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাহে। এমন দু'-একদিন হইয়াছে যে, অজয় একবার দুইবার চা চাহিয়া তারপর ভুলিয়া গিয়াছে, জলযোগ না করিয়াই বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

আগে অজয় কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিত, তাহার পড়িবার ঘরটা ঝাঁট দেওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বইগুলি সুন্দর করিয়া আলমারীতে গুছানো। আজকাল ঘরের মেঝের উপরই হয় ত বই পড়িয়া থাকে। টেবিলের উপরই হয় ত দু'দিনের চায়ের কাপটা পড়িয়া থাকে—আর কেউ সেগুলির যত্ন লয় না। বহুকালের অনভ্যাসের পর অজয় নিজ হাতেই নিজের বই সব, ছোট ছোট ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া লয়।

তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার-রাজ্যের সর্ব্বত্রই যে ওই একটা বিপ্লব সুস্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে, ইহা কিন্তু অজয়ের চোখে পড়িল না ইহা ভাবিয়া সুলেখা বিস্মিত হইল। চোখে হয় ত না পড়িয়াছিল, কিন্তু এই বিপ্লব দেখিয়াও রাজা তাহার স্ব-প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং স্থির হইয়া বসিয়া—এতটুকু টনকও নড়িল না।

সেদিন সুলেখা তাহার চাকরটাকে পাঠাইয়া দিল সৌদামিনীর বাড়ীতে। সৌদামিনী অনেকদিন আর আসে নাই। আজ সুলেখা স্থির করিল, সৌদামিনীর সহিত বায়স্কোপে যাইবে, এবং অজয় নিষেধ করিবে বলিয়াই তাহার বায়স্কোপে যাওয়া প্রয়োজন। শিবিরে যাইয়া আক্রমণ করিয়া সে স্বামীর চোখ খুলিয়া দেখাইয়া দিবে!

ভৃত্যটা ফিরিয়া আসিল, সৌদামিনীর হাতে লেখা একখানা চিঠি লইয়া। তাহাতে সৌদামিনী লিখিয়াছে যে, তাহার সুলেখার বাড়ী আসা অসম্ভব। হইতে পারে তাহার স্বামী মাতাল, চরিত্রহীন, কিন্তু তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া এমন করিয়া তাহাকে ও সৌদামিনীকে অপমান করার অধিকার সুলেখার নাই। এ কথাও সে লিখিয়াছে যে, অজয়বাবু শুধু একটু পদধূলি দিয়াই তাহাদের কৃতার্থ করিবেন, একটু জলগ্রহণও করিবেন না, এ কথা পূর্ব্বে জানিলে সে অজয়বাবুকে এতটুকুও অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে বসাইত না!

সুলেখা চিঠিখানা হাতে করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার প্রবাস-জীবন কারাগারের মত মনে হইতে লাগিল। তাহার বাল্যসখী সৌদামিনীও আজ তাহাকে ত্যাগ করিল। সে সৌদামিনীকে ভাল-রূপই চিনিত—সে যে আর কখনো তাহার বাড়ীতে আসিবে না, কথা কহিবে না, ইহা সে নিঃসংশয়ে অনুমান করিয়া লইল। অন্য সময় হইলে হয় ত সুলেখা গিয়া অভিমানিনী সৌদামিনীকে বুঝাইয়া সব কথা বলিয়া ক্ষমা চাহিত, কিন্তু আজ তাহার উত্তপ্ত মন কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল না।

কিন্তু এ-সব কাহার জন্য ? সত্যই ত সে সৌদামিনীকে অপমান করিয়াছে, এবং দ্বিগুণ অপমান করাইয়াছে। এ-সব ত তাহার-ই দুর্ব্বলতার জন্য ? কেন সে স্বামীর হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের বাড়ীতে গেল না ? কেন সে স্বামীর এতবড় অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিল ? কোন্ অপরাধে এই সুদূর প্রবাসে তাহাকে বন্ধুশূন্য বন্দিনীর মত থাকিতে হইবে ? কেন সে থাকিবে ? নিষ্ফল দুঃখে ও আক্রোশে তাহার মর্ম্মজ্বালা অসহ্য হইয়া উঠিল।

অজয় ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছে, ছাদে জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহার এক মাসতুতো শালা আসিয়াছেন। অজয় বই রাখিয়া শ্যালককে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ঘরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, হঠাৎ?"

"সুলেখাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"কেন?"

ভদ্রলোক বুকপকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া অজয়কে দেখাইলেন। চিঠিখানা সুলেখার লেখা। সে ভাইকে লিখিয়াছে, এখানে তার শরীর মন খারাপ, দিনকতক দাদার কাছে বেড়াইয়া আসিবে। সেই জন্যই ভাই আসিয়াছেন। অজয় হাসিয়া বলিল, "কেবল বেড়ানো, কেবল বেড়ানো! নাচের পা নেচেই আছে! আমি ত আর দারোয়ানী ক'রে ক'রে পারি না!" বলিয়া অজয় হাসিয়া উঠিল।

অজয় কলেজ হইতে আসিয়া আরামকেদারায় শুইয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছে। এমন সময় সুলেখা সাজিয়া-গুজিয়া ঘরে ঢুকিল। মুখের উপর হইতে বইখানা সরাইয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া, অজয় স্ত্রীর দিকে কৌতূহল-দৃষ্টিতে চাহিল। হাসিয়া বলিল, "কোথায় গো? তোমার মাথা কি খারাপ হ'য়ে গেল? বলা নেই, কহা নেই, চল্‌লে বেনারসে? যাও, ওসব খুলে ফেলো গে।"

রূঢ়কণ্ঠে সুলেখা বলিল, "আমি যাবো।"

সুলেখার এমন রূঢ় কণ্ঠস্বর এই ছয় বৎসর বিবাহিত-জীবনের মধ্যে অজয় এই প্রথম শুনিল। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর তীক্ষ্ণ চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিল। সুলেখা বলিল, "কেন, আমি কি মানুষ নই? তোমার স্ত্রী হয়েছি ব'লে এমন দাসখৎ ত লিখে দিই নি যে, প্রত্যেক কাজে তোমার হুকুম নিতে হবে? আমাব কি নিজের কোনো অধিকারই নেই?"

ওই কথাগুলি সুলেখা তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে ইহা যেন সে তাহার চক্ষু ও কর্ণকে বিশ্বাস করাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, এমনি বিমূঢ় দৃষ্টিতে অজয় সুলেখার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কলেজে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লজিকের বক্তৃতা দেয়, তাহার মুখে এখন স্ত্রীর লজিকের একটা ছোট্ট প্রত্যুত্তরও জোগাইল না। খানিক নীরব থাকিয়া অজয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "তা'—তা'—সে অধিকার-অনধিকারের মামলা আমাদের ভেতর—এই ধরো, ছ' বছরের মধ্যে—কোনো-দিন ত ওঠে নি? ও ইয়েস্, তুমি কোন দাসখৎ লিখে দাও নি—তোমার ওপর হুকুম চালাবার আমার কোনো আইনতঃ অধিকার নেই। আমি স্বীকার কচ্ছি, তোমার সম্পূর্ণ অধিকার কাছে ইচ্ছামত কাজ করবার। ভায়ের সঙ্গে যাবার তোমার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এবং অধিকার আছে। তুমি যেতে পারো।"

সুলেখা প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালী পল্লী হইতে দু'-চারটা শাঁকের আওয়াজ সুরু হইয়া গিয়াছে।

সুলেখার ভাই তেতালায় আসিয়া দেখিলেন, সুলেখা অজয়ের আবেষ্টনের মধ্যে তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া আছে। গয়না-পত্র যা' সে পরিয়াছিল, তা' টেবিলের উপর ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য

ভ্রমণ
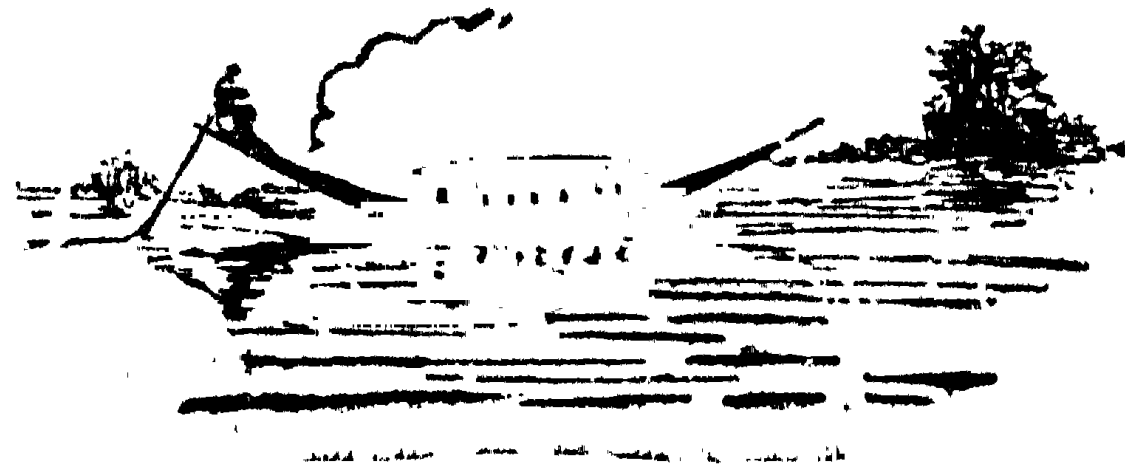
খণ্ডগিরি উদয়গিরি

শ্রীহেমাঙ্গিনী দে

অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পুরী ও ভুবনেশ্বরে বেড়াতে গেছলুম। মোটঘাট বেঁধে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে পুরী এক্সপ্রেসে উঠে বসলুম। মন্থর-গতিতে ট্রেণ প্লাট্‌ফরম ছেড়ে এসে পড়ল পল্লীর বুকের উপরে। ক্রমে বেগ বৃদ্ধি হয়ে রক্তচক্ষু দানবের মত অন্ধকারের বুক চিরে উন্মত্ত গতিতে সেটা ছুটে চললো। রাত্রি যখন প্রায় সাড়ে নয়টা, নিশারাণী তখন সারা পৃথিবীর গায়ে কাল পর্দ্দা টেনে দিয়েছেন। দূর হতে দেখা গেল, সেই বিশ্বজোড়া আঁধারের বুকের উপর আলোর সারি দেওয়া খড়্গপুর ষ্টেশনটী যেন হীরক-মালায় বিভূষিত হয়ে মহারাজাধিরাজের মত মস্তক উন্নত করে দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেণের গতি ক্রমশঃ মন্দ হয়ে এলো, ধীরে ধীরে খড়্গপুর ষ্টেশনে প্রবেশ করলে। দেখ্‌লুম, ষ্টেশনে প্যাসেঞ্জার রয়েছে অনেকগুলি; ট্রেণ থাম্‌তেই দেখা গেল প্রত্যেক কামরার কাছে খাবারের গাড়ী ঠেলে খাবারওয়ালা হাঁকছে—গরমপুরী, তরকারী, সন্দেশ, মিঠাই। তার পরেই এল হিন্দু চা, চা গরম। পান-বিড়ি-দিয়াশালাই।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ট্রেণ খড়্গপুর ছাড়ল। এইবার বেডিং খুলে আমরাও নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মন দিলুম। কিন্তু ট্রেণের দোলানীতে দেবী যে চক্ষুরাজ্য ছেড়ে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিলেন, তাঁর সন্ধান-ই পেলুম না। কোনরকমে রাত্রি কাটিয়ে আমরা ভোরের সময় এসে পৌছলুম বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ের খুর্দ্দা জংশনে। এখান হতে পুরী, শাখা লাইনে সাতাশ মাইল অতিক্রম করতে হয়। বেলা প্রায় আটটার সময় আমরা পুরী পৌছলুম। ষ্টেশন হ'তে পুরীর মন্দিরের ব্যবধান প্রায় দেড় মাইল। জিনিসপত্রগুলি নিয়ে একটী মোটর ঠিক্ করে সহরের ভেতর গিয়ে হাজির হলুম। হরিরাম গোয়েঙ্কা ও আর দু'-একটী মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা এখানে আছে। পাণ্ডারাও যাত্রীদের থাক্‌বার স্থান দেয়। আমরা এখানে একদিন থেকে জগন্নাথ মহাপ্রভু দর্শন করে পরের দিন সকালে নীল বিশাল-বারিধি-পূর্ণ সমুদ্রে স্নানের কার্য্য শেষ করে সাতটার প্যাসেঞ্জারে ভুবনেশ্বর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম। বেলা যখন সাড়ে দশটা, তখন গাড়ী এসে পৌছল ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে।

গাড়ী থেকে নেমে দেখ্‌লুম, এখানেও পুরীর মত পাণ্ডারা যাত্রীদের সব বন্দোবস্ত করে। এই সব পাণ্ডা ঠাকুরেরা চিত্রগুপ্তের খাতার মত বড় বড় খাতা হাতে তাদের নিজ নিজ অধিকারের যে সব যাত্রী তাদের হস্তগত করে। আমাদের পাকড়াও ক'রে এই সব পাণ্ডা ঠাকুরের দল খাতা খুলে কোথায় দেশ, পিতৃপিতামহাদি কার কি নাম, কি জাতি, কোন্ পেশা ইত্যাদি

জিজ্ঞেস করে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। এদের মধ্যে একজনের খাতায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম-ধাম শুনে তাঁকেই আমরা তীর্থগুরু সাব্যস্ত করলুম। তার-পর একটী গরুর গাড়ী ঠিক্ করে নিয়ে ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠলুম।

এই ধর্ম্মশালাটী ঠিক্ বিন্দু-সরোবরের উপরে। দোতলায় একখানি ঘর নিয়ে তা'তে জিনিষ-পত্র সব রেখে বারাণ্ডায় এসে প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্য্য দেখতে লাগ্‌লুম। বহুদূর অবধি দৃষ্টি চলে। পল্লীরাণীর বিচিত্র শোভা আমাদের সহরের সীমাবদ্ধ চিত্তকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেল্‌লে। সেদিন বেলা বেশী হয়ে যাওয়ায় আর স্নানাদি হ'ল না। পরের দিন সকালে সাতটায় আমরা সরোবরে স্নান করতে গেলুম। মহাতীর্থ সমূহের বিন্দু বিন্দু বারির দ্বারা এই বিন্দু-সরোবর পূর্ণ। সকল তীর্থের ফল পাবার মানসে যাত্রীরা এখানে স্নান ও তর্পণাদি করে থাকে।

পুরানে লিখিত আছে যে, এককালে মহাদেব কাশী-শ্বরের পক্ষাবলম্বন করে বিষ্ণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে ভগবান সুদর্শন চক্র দিয়ে শিবের পাশুপত অস্ত্র ভগ্ন করেছিলেন। মহাদেব সংগ্রাম ভয়ে ভীত হয়ে এইখানে একটা আম গাছের তলায় বসে বিষ্ণুর তপস্যা করেছিলেন। তাই ভুবনেশ্বরের অপর একটি নাম একাম্রকানন। হিন্দুদিগের এই পবিত্র তীর্থ একাম্রকাননে বিন্দু-সরোবরের চতুর্দ্দিকে উৎকলের ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতিগণের অসামান্য ভগবদভক্তির পরাকাষ্ঠাস্বরূপ সুন্দর সুন্দর দেবমন্দিরগুলি সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমরা স্নান শেষ করে পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গেলুম। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। মন্দিরটা পাঁচশত কুড়ি ফুট দীর্ঘ, ও চারশত পঁয়ষট্টি ফুট প্রস্থ, এবং একশত যাট ফুট উচ্চ। ছয়শত সাতান্ন খৃষ্টাব্দে ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তৃক এ মন্দির নির্ম্মান হয়। এইরূপ আর একটি প্রবাদ আছে যে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা না কি এক রাত্রের মধ্যেই এই মন্দিরের নির্ম্মান-কার্য্য সমাধা করেছিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে ভুবনেশ্বরের হরিহরমূর্ত্তি একত্র প্রতিষ্ঠিত। আমরা দর্শন ও পূজা করে যখন ফিরলুম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা।

পাণ্ডাঠাকুর দেবাদিদেবের প্রসাদ এনে দিলে আমরা ভোজনান্তে একটু বিশ্রাম করে বিকালবেলায় বেড়াতে বেরুলুম। ব্রহ্মেশ্বর, কপীলেশ্বর, মেঘেশ্বর, শিব, ইত্যাদি পার্ব্বতী, অনন্ত বাসুদেব এবং বহুবিধ স্থান দর্শন করে আমাদের ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাসায় এসে পাণ্ডাঠাকুরকে বল্‌লুম—এখানে যা' দেখবার আছে আমাদের দু'-একদিনের মধ্যে দেখিয়ে দেবেন। পাণ্ডা বল্‌লেন, হঁ্যা আপনাদের দু'-চারদিনের মধ্যে সব দেখিয়ে দেবো। ভুবনেশ্বরের ছোট বড় ইত্যাদি করে অনেক দেবতা ও মন্দির দর্শন করিয়ে শেষে পাণ্ডা বল্‌লেন, কালকে আপনাদের গৌরীকুণ্ড দেখিয়ে আনবো।

পরদিন প্রাতে পাণ্ডা এসে আমাদের গৌরীকুণ্ডে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দেখিয়ে আন্‌লেন। এটী একটী দেখবার জিনিষ। আমরা রামকৃষ্ণ আশ্রম দেখে গৌরীকুণ্ডে গেলুম। এখানকার দৃশ্যটি অতি মনোরম। প্রভাতের বালারুণ চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল বনানীর উপর সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। মধ্যে এই জলপূর্ণ প্রশস্ত কুণ্ডটীর উত্তর পাড়ে বড় বড় নাগকেশর ও আম্রবৃক্ষ সারি গেঁথে দণ্ডায়মান। এখানে হাতির মুখ দিয়ে জল আসছে, আর বাঘের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলে জলের প্রতি লহরীতে সোনার ঢেউ দিচ্ছে। দক্ষিণ দিকে গৌরী মাতার মন্দির। কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ি দিয়ে বাঁধান। এখানে অনেকে স্নান করতে আসেন। এর জল পাতাল হ'তে উঠ্‌ছে। (অর্থাৎ যাকে বলে স্প্রিং ওয়াটার) এই জল খুব হজমি। অধিকাংশ লোকে এই জল পান করে। এখানে অনেকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্যও আসেন। অনেকগুলি নূতন নূতন বাড়ী তৈয়ারি হয়েছে ও হচ্ছে দেখ্‌লুম। আমরা স্নান শেষ করে গৌরীমাতার দর্শন ও পূজা করে বাসায় ফিরলুম।

আগের দিন একটা মোটর ঠিক করা হয়েছিল

খণ্ডগিরি যাবার জন্যে। মোটর ও গো-যান দুইই পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর থেকে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির দূরত্ব চার মাইল। ভুবনেশ্বরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দেখ্‌বার জিনিষ এই খণ্ডগিরি।

বেলা এগারটার সময় মোটর এল। আমরা খণ্ডগিরির পথে বেরিয়ে পড়লাম। লাল সুরকির বাঁধা রাস্তা, পথের দু'ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ-ধূ করছে। মধ্যে মধ্যে এক-একটা গাছ আছে। একজায়গায় দেখলুম, কয়েকটা অৰ্দ্ধশুষ্ক গাছ দুই কাঠা আন্দাজ জমি নিয়ে অতি সঙ্কুচিত-ভাবে পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটা গাছের ডালে একখানি টিনের ফলকে লেখা আছে মধুবন। দেখে মনে হ'ল যে, জানি না এই শুষ্ক নীরস বনের মধ্যে কত সরস মধু থাকৃতে পারে।

ক্রমে মোটর এসে খণ্ডগিরির পাদমূলে উপস্থিত হ'ল। দেখলুম—সেখানে গো-যানে আরও অনেক লোক এই গিরিবরকে দর্শন করতে এসেছেন। আমরাও পাহাড়ে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। পাথরকাটা আঁকাবাঁকা সিঁড়ি কয়টী বয়ে কিছুদূর উঠে দেখি যেখানে সিঁড়ি শেষ হয়েছে, তার সম্মুখেই একটী গুহা। ঐ গুহাতে একটি জটজুটধারী সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। আমরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে ধুনি থেকে একমুঠা ছাই নিয়ে আমাদের হাতে দিলেন। আমরা হাত পেতে সেই ভস্মরাশি নিয়ে মাথায় স্পর্শ করে তাঁকে কিছু প্রণামী দিয়ে উঠ্‌লুম।

একটা সরুপথ সর্পিল গতিতে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। সেই পথ ধরে আমরা মন্দিরের দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। পাহাড়ের বামদিকে একটু সমতল ভূমিতে আকাশগঙ্গা আছেন। দেখলুম—সেই সমতলভূমির কিছু নিম্নে একটা চতুষ্কোণাকৃতি জলপূর্ণ কুণ্ড রয়েছে। শুনলুম, মাঘী-পূর্ণিমার সময় এখানে বৃহৎ মেলা হয়। ঐ মাঘী-পূর্ণিমার দিন কুণ্ডের জলের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। কিংবদন্তি আছে ঐ দিনে আকাশগঙ্গার জলে স্পর্শ কিংবা স্নান করলে অন্তে স্বর্গলাভ হয়। পুনরায় আমরা সেই প্রস্তরময় পাহাড়ের পথ ধরে মন্দির চত্বরে উপস্থিত হলুম।

সেইমাত্র মন্দিরের দ্বার খোলা হয়েছে। আমরা ভিতরে ঢুকে ঠাকুর দর্শন করলুম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভুবনেশ্বরের সকল দেবীমূর্ত্তিই প্রায় একরূপ।

দর্শন শেষ হ'লে বাহিরে এসে মন্দির প্রাঙ্গণ হ'তে পার্ব্বত্য-শোভা দেখ্‌তে লাগলুম। উপর হতে নীচেকার দৃশ্য কি মনোরম ও নয়ন মুগ্ধকর! চতুর্দ্দিকে গগনচুম্বিত পর্ব্বত সকল দণ্ডায়মান। গিরিরাজের পশ্চিম প্রান্তে গভর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ফরেষ্ট, ও সেই ঘন জঙ্গলের পশ্চাতে অভ্রভেদী পর্ব্বতসমূহের উপরের দিক্ থেকে পশ্চিম গগনে ঢলে-পড়া রবির লোহিত-স্বর্ণ-কিরণচ্ছটা নিম্নে শ্যামল ক্ষেত্রে গলিত স্বর্ণের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। এমন স্বর্গীয় শোভার তুলনা বুঝি আর কিছুর সহিতই হয় না। এ সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। অন্তরে উপলব্ধি করবার জিনিষ। মন্দির হ'তে কিছু নিম্নে দক্ষিণদিকে কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের ভিতর একটী প্রস্তর নির্ম্মিত চত্বর আছে, এই স্থানটার নাম দেবসভা। এখানে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। দেখে মনে কল্পনা জাগে, কোন্ সুদূর অতীতে দেবতামণ্ডলী নরাকারে এই সভার কার্য্য করে-ছিলেন; এখনকার যুগে তা' পাষাণ স্তূপে পরিণত হয়ে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দেবতাদের মানব-লীলার পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু এখানে মনুষ্য সমাগম খুব কম; কারণ, বাঘের ভয় আছে। কখনও কখনও বাঘে না কি এখান থেকে মানুষও তুলে নিয়ে যায়। মন্দিরের উপরের দ্রষ্টব্য যা ছিল দেখে আমরা নীচে নেমে এলুম।

দক্ষিণে খণ্ডগিরি, বামে উদয়গিরি, এই দু'টী পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়ে একটী পথ চলে গেছে, যারা শিকার করতে যায়, এই পথ দিয়ে শিকারের জঙ্গলে প্রবেশ করে।

আমরা খণ্ডগিরি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে উদয়গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হলুম। এই পাহাড়টী খণ্ডগিরি অপেক্ষা কিছু ছোট। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলুম। খণ্ডগিরি

ও উদয়গিরি এই দুই ক্ষুদ্র পর্ব্বত বক্ষে বৌদ্ধযুগের অভূত-পূর্ব্ব অতি আশ্চর্য্য লোচনানন্দদায়ক গুম্‌ফা সকল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বৈরাগীর মঠ, হস্তী গুম্‌ফা, সর্প গুম্‌ফা, ব্যাঘ্র গুম্‌ফা,রাণী গুম্‌ফা, স্বর্গপুরী গুম্‌ফা, জয়-বিজয় গুম্‌ফা, ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ইতিহাস বর্ণিত জনমনোহারী সূক্ষ্ম কারুকার্য্যশোভিত অপূর্ব্ব গুহা-সমূহ শিল্পপ্রিয় দর্শকের মনে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার করে থাকে। এই সব দেখে এইবার আমরা নাম্‌তে আরম্ভ করলুম।

সিঁড়ি থেকে নেমে বামদিকে উদয়গিরির পাদমূলে একখানি ছোট ঘরে একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ বসে আছেন, প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জোড়া খড়ম একখানি চৌকীর উপর রেখে। আমরা দ্বার সন্নিধানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, পাণ্ডাঠাকুর, এতগুলি খড়ম কিসের? পাণ্ডাঠাকুর বল্লেন (তাঁর উড়িষ্যা ভাষায়) ইয়ে যে কাষ্ঠ পাদুকা দেখিছন্তি, ই খণ্ডগিরি, উদয়গিরি পরিক্রম করতে বশিষ্টাদি যেত্য ঋষি আইচিলা মহাত্মা গুটে খড়ম রাখিকিড়ি চলি গেলা। ইয়ে সেই সব মহাত্মাদের পাদুকা অছি। এ’টি মথা কর? (অর্থে প্রণামি কর) আমরা প্রণাম করে কিছু প্রণামী দিয়ে চলে এলুম ডাক্‌বাংলায়।

খণ্ডগিরির নিম্নে ডাক্‌বাংলোটী বড় সুন্দর ও নির্জ্জন স্থানে নির্ম্মিত। ডাক্‌বাংলোর পশ্চিম দিকে খণ্ডগিরি তার আকাশস্পর্শী বৃহৎ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ-ধূ করছে, সম্মুখে অগণিত বৃক্ষ সারি বেঁধে একটী নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি করছে। বামে লাল মাটির বাঁধা সড়ক খণ্ডগিরির পদপ্রান্তে গিয়ে মিশেছে। আমরা বিশ্রামের জন্য এখানে বস্‌লুম। সমতল ভূমির উপর পাহাড়ের কোলে ডাক্‌বাংলোটীতে বসে প্রকৃতি দেবীর অনন্ত রূপ-সাগরে মন ডুবে গেল। তখন সেই অলক্ষ্যের মহান স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলুম। সেই সময় মনে হ’ল একটা ভগবৎ সঙ্গীতের দু’টা ছত্র। যে, হে এই বিচিত্র সৃষ্টির অধিপতি —

"এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা’ সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।"

এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে উঠে পড়লুম। আস্‌বার পথের বামদিকে একটা মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালা আছে, সেখানকার কূয়ার জলে আমরা মুখ হাত ধুয়ে মোটরে উঠ্‌লুম।

শ্রীহেমাঙ্গিনী দে

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী
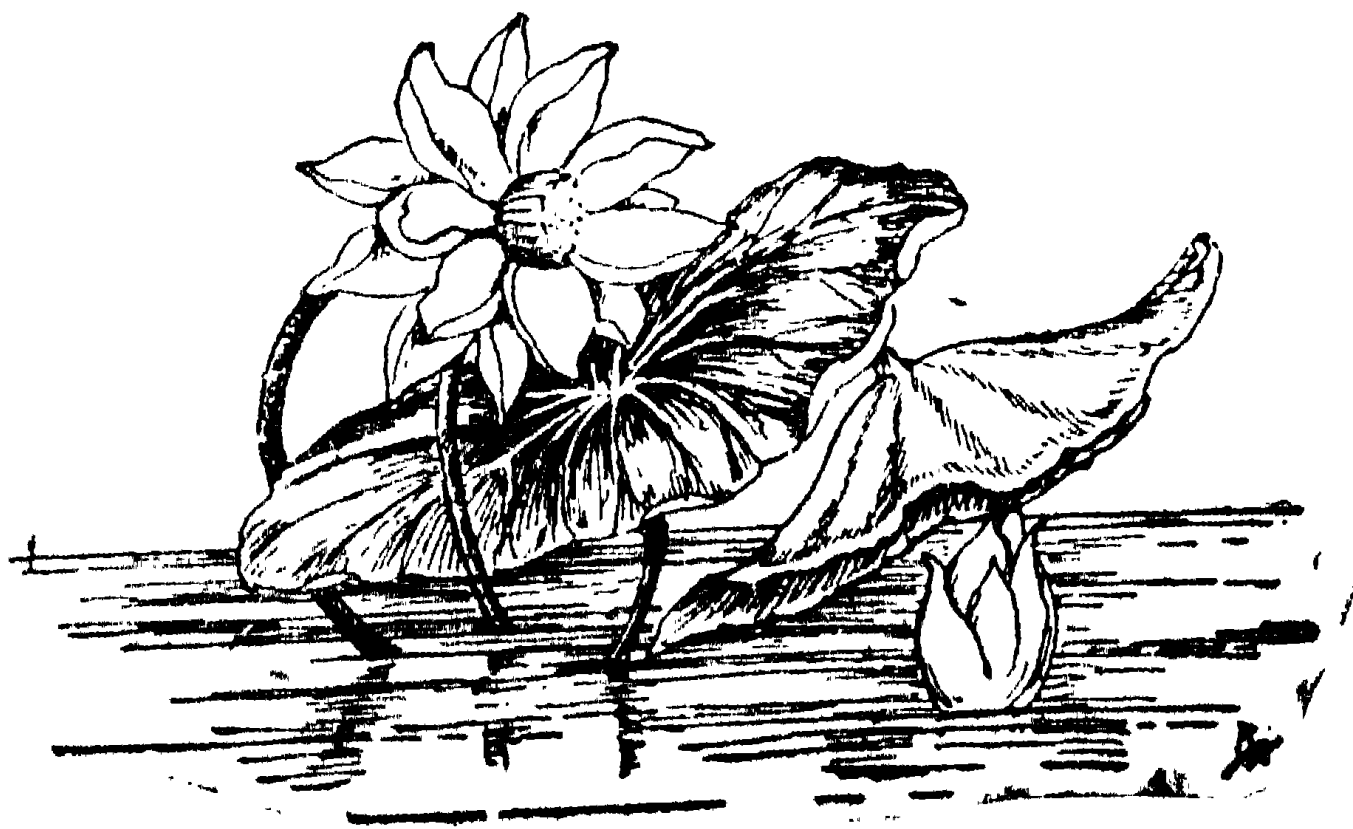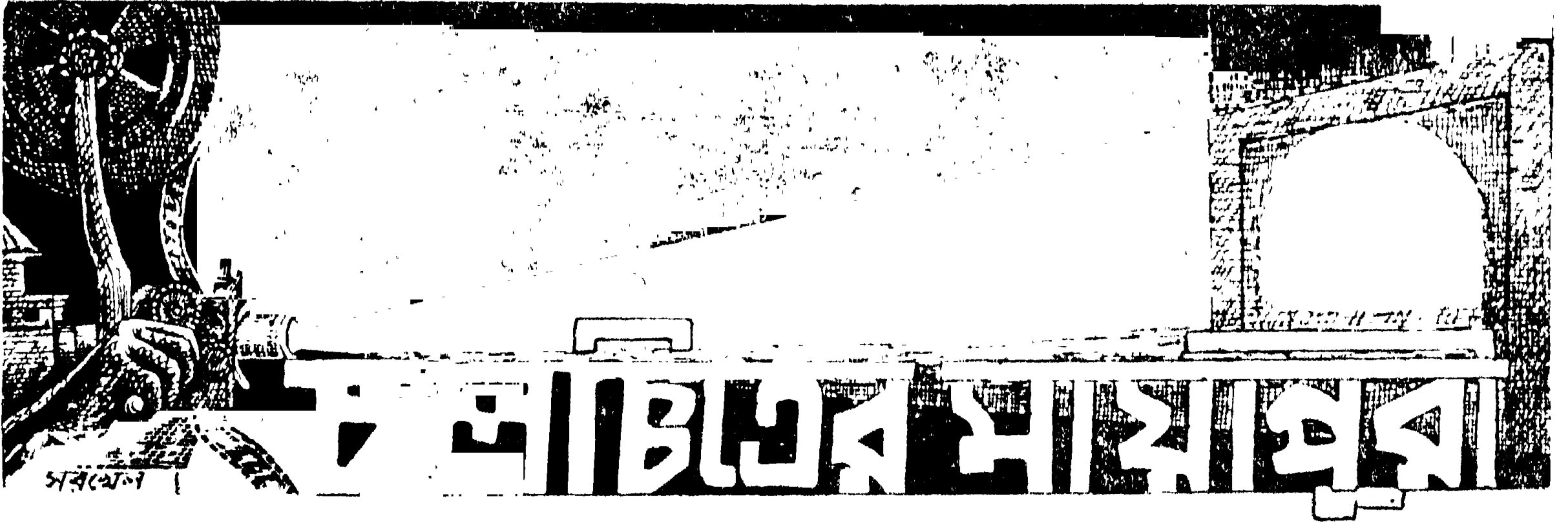
স্বপ্নাবেশে জ্যানেট্ গেনার

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বল্লুম—অপরাধ আমারি হয়েছে, আর ন'টার 'শো'তে যাব না।

কোন কথার উত্তর না দিয়ে স্ত্রী বল্লেন—বুঝেছি, আজও বুঝি সেই মেয়েটার প্লে ছিল ?

জিজ্ঞাসা করলুম—কার ?

—কেন, ঐ যে সেই জ্যানেট্ গেনার—না—কি !

তৎক্ষণাৎ এই আবিষ্কারের স্বপ্ন ধরে, রাগটা কমিয়ে আন্বার জন্যে বল্লুম—সত্যি, তুমি আজকাল হাত গুনতে শিখ্লে না কি ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা দ্বিগুণ বিক্রমে ফিরে এল এবং হাঁ। হাঁ, খুব হয়েছে বলেই তিনি ছবিখানাকে দেওয়ালের গা থেকে টেনে নিয়ে মেঝের ওপর দিলেন আছাড়। কাচ-গুলো করুণ আর্ত্তনাদ করে ঘরের মেঝেতে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

রাগে সারা শরীরটা রী-রী করে উঠল—কোন্ সুদূর থেকে, কত লেখালিখি, কাকুতি-মিনতির পর জ্যানেটের নিজের অটোগ্রাফ ও ঐ ছবিটা পেয়েছিলুম। কত সময় কত দুঃখ-যন্ত্রণা ঐ ছবিটার দিকে চেয়ে ভুলে যেতুম—মনে হ'ত যেন ঐ উদাস অদ্ভুত চোখ দুটো সারা বিশ্বের জ্বালা-যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে বরণ করে নিয়ে অপরকে আনন্দ দেবার জন্যেই সর্ব্বদা উৎসুক হয়ে রয়েছে।

নিজেকে শান্ত করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, রাগটা তোমার কিসের ওপর—ঐ ছবিটা, না আমার এই রাত করে' বাড়ী ফিরে আসার ?

JANET GAYNOR and WARNER BAXTER in "One More Spring," Fox Film's tender screen story of two souls whom life's turbulent tides could not divert from their romantic quest.

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম স্বার্থান্ধ মানুষটী একটু বুদ্ধিমানের মত উত্তর দিয়ে বল্লেন—ও দুটোর ওপরেই।

—মুখ্যু আর কা'কে বলে !

—মুখ্যু ত আমি বটেই ! কেন, ঘরে কি আর অন্য ছবি টাঙাবার নেই ? কেষ্ট, রাধা, কালী, অন্নপূর্ণা—তা' নয়, কোথাকার কতকগুলো বিদেশী মেয়ে পুরুষ—কি না, বায়স্কোপের অভিনেতা অভিনেত্রী—বলি, এদের দিয়ে হবে কি ?

উইনিফ্রেড সটার

—এই ত সেদিন চিন্তার মার সঙ্গে গোকুলবাবুর একেবারে কুরুক্ষেত্র—শুনলুম, বায়স্কোপে প্লে করা নিয়ে। কিছুতেই চিন্তার মা রাজী হ'ল না—তা' না হ'লে, কোম্পানী না কি তাঁর ভাল চেহারার জন্যে দু'শ' টাকা পর্য্যন্ত মাইনে দিতে চেয়েছিল।

রাগে দুঃখে ভরা মনটার ওপর যুক্তিহীন এই সব বক্তৃতাগুলো একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লুম—তোমাদের মত কয়েকজন স্ত্রীর জন্যেই আজ বাঙালী জাতির আমাদের মত দুর্ভাগা ক'জন স্বামী যে ভাগ্যবান হ'য়ে উঠ্‌ছে, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই।

কাচগুলো একটী একটী করে নিজেই কুড়লুম। ছেঁড়া ছবির টুক্‌রোগুলোকে খুব সযত্নে গুড়িয়ে নিয়ে, ছেলেদের রঙিন ভাঙা কাচের ধাঁধার ঘর-বাড়ী তৈরীর মত একটার সঙ্গে আর একটার ধার মিলিয়ে সাজাতে লাগ্‌লুম। নিদ্রাতুর পত্নী তখন ভেঙে পড়া ক্লান্ত ঢেউয়ের মত শাদা মারবেলের মেঝের ওপর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

রাত তখন বেশ জমে উঠেছে। পথের শেষ বাসটী পর্য্যন্ত 'খেপ' শেষ করে, সহরকে যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ দিয়েছে। আমি তখনও একটার পর একটা সেই টুক্‌রোগুলোকে মিলিয়ে যাচ্ছি—কোন কোন জায়গায় এসে, গরমিলের অংশটুকুকে মেলাবার জন্যে সন্তর্পণে মনের সে এক অদ্ভুত নীরব পরিশ্রম চলেছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ মনে হ'ল—যেন সমস্ত ছবিটার বিচ্ছিন্ন রেখাগুলা চোখের নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যে ভরে উঠ্‌ল। আমি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হ'য়ে অপলক-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলুম। ছবিটা ক্রমেই কাগজের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—সম্পূর্ণ সজীব চঞ্চল প্রাণময় হ'য়ে। প্রথমটা বিশ্বাস করতে সাহস হ'ল না—মনে হ'ল যেন আমি কোন স্বপ্ন-মাধুরীতে ডুবে রয়েছি। মূর্ত্তিটার চোখ দু'টোর দিকে একবার তাকাবার চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু কি একটা অজানা আশঙ্কায় চেষ্টা আমার ব্যর্থ হ'ল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধীরে ধীরে মূর্ত্তির মুখে হাসি ফুটে উঠল—সেই হাসি !—মায়াজালে ভারাক্রান্ত বেদনাময় হাসি ! সেই চাহনি !—কাণায় কাণায় স্নেহ-সুধাভরা চাহনি ! মোহাবিষ্টের মত কাঠ হ'য়ে বসে' রইলুম।

ছবিতে যার অভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখে অফুরন্ত জলধারা বাড়ী এসেও শেষ হয়নি—সে রাঙা টল্‌টলে দু'খানি

ঠোঁট বেদনা পরিবেশনে এতটুকু কেঁপে জগতের লোকের মনে প্রাণে কাঁপন এনে দিয়েছে—আবার পরক্ষণেই অনন্ত আরামের অদ্ভুত অনুভূতি দেখিয়ে অন্ধকারের দুঃস্বপ্নকে নিমেষে দূর করে দিয়েছে। 'ষ্ট্রীট্ এন্জেল্‌সে' জ্যানেটের কথা মনে হ'ল, 'সেভেন্থ্ হেভেনে' জ্যানেটের কথা মনে হ'ল, 'সান্ রাইজ,' 'ডাডিলং লেগ্‌স,' 'ফোর ডেভিল্‌স্' এম্‌নি করে সব মনে পড়ে গেল। আরও মনে পড়ে গেল সেই একদিনের কথা—যেদিন একে একে গ্রেটা, ক্রফোর্ড, কলবেয়ার, গোপবার্ন, এমন্ কি ডেল্‌রিও পর্য্যন্ত সব চোখের সাম্‌নে থেকে সরে গিয়ে আমার সমস্ত শরীর ও মনকে ব্যাপ্ত করে', অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ধারা যেন এক হয়ে, শুদ্ধতায় ভারাক্রান্ত দিগন্তপ্রসারিত জীবনের মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে নিকষমণির মত ভেসে রইল কেবলমাত্র সেই রহস্যময় দু'টী চোখ।

ছবি তার দেখ্‌তুম—একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার। প্রতিবারেই সে পুরাতনের বিড়ম্বনাকে দূরে ঠেলে রেখে আমার কাছে নিয়ে আসতো একটা নিত্য নূতনের অনুভব।

ঘরে নটরাজের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিটীর পাশে দেয়ালে মনালিসার ছবিটা টাঙান ছিল। একদিন দেখ্‌লুম, কেমন করে সেখানে জ্যানেটের ছবিটা স্থান পেয়েছে। জন্ম তারিখে তার ঐ ছবির গায়ে কত রং-বেরংয়ের ফুল এনেই না সাজিয়েছি! কত বিনিদ্র রজনী আমার কেটে গেছে ঐ দূরের দিকে চেয়ে। কোন কোনদিন জাগরণের শ্রান্তিতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে' ছায়ার মায়াপুরী হলিউডের কত বিচিত্র স্বপ্নই না দেখ্‌তুম! কিন্তু চেষ্টা করেও জ্যানেটের সঙ্গে দেখা আর আমার হ'ত না। রাত্রের আশা দিনের সোণালী আলোর সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যেত।

এলিসা ল্যাণ্ডি

সেই জ্যানেট্ আজ আমার-ই ঘরে! পায়ের গোড়া থেকে মাথার শেষ পর্য্যন্ত একবার সন্তর্পণে চোখ বুলিয়ে নিলুম। শাদা সাটিনের নিটোল আঁটুনির পাশ থেকে সারা শরীরের আউট লাইনটা শালীনতাকে বজায় রেখে অপরূপ

মাধুর্য্যে ভরে' উঠেছে—ফাঁকি যেন এর কোথাও নেই। পায়ে একটা সাদা ফ্রক, ব্রোক্ করা ক্যাফ্ লেদারের হাফ্‌হিল স্পোর্ট স্যু-টার ওপর গুঁড়িয়ে পড়েছে। মুক্তোর মত অকৃত্রিম দাঁতগুলি মিলনের অপরূপ মাধুর্য্য নিয়ে একটা আর একটার পাশ থেকে যেন সরে যেতে চাইছে না। দু'টী আপ্‌না থেকেই বড়িয়ে ওঠা ঠোঁট সব সময়েই যেন কোন অজানা অনুপমের স্পর্শ-অনুরাগ-আনন্দে সশঙ্কিত। শিল্পীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ফুটিয়ে তুলতে ঐ আড়ম্বরগুলোও বাদ যায় নি—অপ্রয়োজন ও অসামঞ্জস্যকে একেবারে বাদ দিয়ে রুচিসম্মত বাড়িয়ে দেওয়া ঐ নখের ওপর কুটেক্সের মসৃন রঙিন আভা না থাক্‌লেই যেন অশোভনীয় ছিল। শরতের শেষ সূর্য্যের মত রক্তিম আভাবিশিষ্ট মাথার ওপর ঘন একরাশ কোঁকড়ান চুল সারা মুখখানাকে আরও স্নিগ্ধ ও কোমল করে তুলেছে। গা থেকে এপ্রিল ভায়লেটের একটা মিষ্টগন্ধ নেশা এনে দিচ্ছিল, এমন সময় ঐ দু'টী পাত্‌লা ঠোঁটের পাশে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে বাঁদিকের গালে একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করলে। জ্যানেট্ দু'-একপা আমার কাছে এগিয়ে এল; তারপর নিজের হাত দিয়ে আমার হাতখানি ধরে বল্‌লে—কই, চলো।

সারা শরীরটার ভেতর দিয়ে একটা পাত্‌লা বিদ্যুতের তেজ বয়ে গেল—তার চেয়ে আমিই যেন হয়ে পড়লুম লজ্জিত বেশী। বল্‌লুম—কোথায়?

—কেন হলিউডে। যেখানে যাবার জন্যে কত সাধ, যাকে দেখ্‌বার জন্যে কত কাকুতি! তবে কি চিন্‌তে পারছ না—ভয় পাচ্ছো?

আমার মধ্যে যেন একটা খণ্ডপ্রলয় হ'য়ে থা[illegible] হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে বহু চেষ্টার পর মুখ থেকে শুধু একটা 'বেশ' ছাড়া আর কিছুই বেরুল না।

কেমন করে কোন মন্ত্রের সাহায্যে জানি না, নিমেষে আমরা হলিউডে যখন এসে পড়লুম, তখন সারা রাত্রের পরিশ্রান্ত অন্ধকার মৃদু পদবিক্ষেপে পৃথিবীর বুক থেকে সরে যাচ্ছে। ফটকিরির সাহায্যে যেমন জলের ঘোলাটে কেটে গিয়ে স্বচ্ছতা ফুটে ওঠে—তেম্‌নি ক্রমেই যেন তাজ্জব কল্পনার হলিউড তার সত্যিকারের রহস্যময় রূপ নিয়ে আমার চোখের সামনে এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যে দিকে চোখ ফেরাই, সবখানেই যেন একটা সুন্দর ছন্দ! গাছপাতা, ঘরবাড়ী, রাস্তা-ঘাট সবই যেন এখানে জীবন্ত মানুষের সুখ-ঐশ্বর্য্যের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে।

ছোট্ট একখানা বিলাতী ধরণের বাংলো—আড়ম্বরের

লেশমাত্র নেই। কোলাহলকে আড়াল করেই যেন এই নিভৃতে এসে ঠাঁই নিয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে বাংলো-খানিকে ঘিরে জমাট্ হলুদরংয়ের জ্যান্ খোস্কিলাম্ গাছের ছায়ায় হোয়াইট মেরী, রোডোডেন্‌ড্রন ও সান্ ডিউ ফুলের গন্ধ ও রূপবৈচিত্র্য ফুটফুটে এই বাংলোটার চারিধারে যেন একটা করুণ অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। তাদের দু'পাশ বেয়ে বেরিয়ে গিয়েছে দুটো রাস্তা— একটা নদীর বাঁচ্ ও অপরটা ফিল্ম নগরের দিকে।

কাঠের বারান্দায় ঘাস রংয়ের বেতের চেয়ারে বসে' চোখ দুটোকে বহুদূর থেকে কাছে গুটিয়ে নিয়ে এসে দেখি— জ্যানেট আমারই মুখের দিকে চেয়ে। দুটো চোখ এক হয়ে যেতে আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে উঠলুম।

জ্যানেট্ নিজেই বল্তে সুরু করলে—এ' বাড়ীতে থাকি মাত্র আমরা চারটী প্রাণী— আমার মা, আমি, মেড্ ও সোফেয়ার। ফিল্‌ম সংক্রান্ত ব্যবসায়ী কাজকর্ম্ম আমার মা-ই সব করে থাকেন, আমি খালি অভিনয় করেই খালাস। সব সময় এই অভিনয়ও আমার ভাল লাগে না—মনে হয়, তারচেয়ে শান্তিতে অতি সাধারণভাবে চারটী খাওয়া-পরা আর একটা হাওয়াই 'গীটার' হ'লেই জীবনের বাকী দিনগুলো বেশ স্বচ্ছন্দের আবহাওয়ায় হাত-পা মেলে কাটিয়ে দেওয়া যায়। হুড়োহুড়ি, কোলাহল, দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে, সাজ-পোষাক ও আসবাব-পত্রের আড়ম্বরের ভেতর আমি নিজেকে কেমন ছেড়ে দিতে পারি না—হাঁপিয়ে উঠি। জীবনে বড় হবার সাধ আমার মোটেই নেই। কিন্তু লোকে যখন প্রীতি জানিয়ে আমায় গার্কো, মার্লিন প্রভৃতির সঙ্গে সমান আসনে বসিয়ে দেয়, তখন আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ি এবং মনে হয় এরা আমায় ভালবেসে লজ্জা দেয় কেন?

খোলাখুলিভাবে আমাদের কথা ক্রমেই বেশ এগিয়ে চল্‌ছিল, এমন সময় জ্যানেটের মা এসে উপস্থিত হ'লেন—মেয়েরই মা বটে! শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য সে মূর্ত্তি—যেন করুণার প্রতীক! মার সঙ্গে জ্যানেট্ আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। আমি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন জানালুম।

এবার চা খাওয়ার পালা। চা খেতে আমরা যে ঘরটায় ঢুকলুম, সেটাকে ড্রয়িং-রুমও বলা যায়, ষ্টুডিও বলা যায়। ভেতরে ঢুকলেই প্রথম একটা অগোছালভাব নজরে পড়ে বটে, কিন্তু পরে দেখা যায় এইটাই বর্ত্তমান শিল্প-রুচির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ঠিক যেভাবে যেখানে যে জিনিসগুলো স্থান পেয়েছে, তার এতটুকু এদিক ওদিক হ'লে বোধ হয় রসভঙ্গ হয়ে যেত।

মাইটি ম্যানের একটা দৃশ্য

ঘরের একপাশে একটা 'সায়ামী-কলার' কৌতূহলী জ্যামিতিক রেখা চিত্রিত কাঠের গুঁড়ির ওপর অর্দ্ধ মুদ্রিত ধ্যানমগ্ন স্ফটিকের বুদ্ধমূর্ত্তি। 'পারপেল' রংয়ের 'ওয়াল পেপার' লাগান দেওয়ালে টাঙান আছে মাত্র কয়েকখানা ছবি; তার মধ্যে বিশেষ করে নজরে পড়ে তিনখানা—প্রথমখানা বিটোফেন, দ্বিতীয়খানা শেলী ও অপরখানা ছায়াচিত্র-জগতের অমর অভিনেতা ভ্যালেনটিনোর। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটী ছোট-বড় 'গীটার' নানাভাবে পড়ে রয়েছে—কোনটার তার ছেঁড়া, কোনটী আনকোরা নতুন। তারই পাশে আবলুস্ কাঠের মত জমাট্ কালো চক্‌চকে একটা বৃহৎ গ্রামোফোন্ ও স্তূপীকৃত রেকর্ড—গ্রামোফোন্ ও রেকর্ডগুলোর দিকে মুখ করে, কাঠের

চিত্র-পরিচিতি

দি রিচেষ্ট গার্ল ইন্ দি ওয়ার্ল্ড—আর-কে-ও রেডিওর ছবি। পরিচালক—উইলিয়াম সীটার। গল্প—নর্ম্মান ক্রাসনা।

ছবিখানির নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন বিখ্যাত অভিনেত্রী মিরিয়াম হপকিন্স—তাঁর সেক্রেটারীর ভূমিকায় সুন্দরী অভিনেত্রী—ফে রে এবং ভালবাসার পাত্রের ভূমিকায় জোয়েল ম্যাক্রিয়া।

ধনী কন্যা হপ্‌কিন্সের নিজের কোনপ্রকার ছবি ছিলনা যে কেহ তাহাকে চিঠিতে প্রেম নিবেদন করিত তাহারই নিকট সেক্রেটারী ফে-রে'কে সে আগাইয়া দিত। প্রকাশ থাকিত সেই জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী বালিকা।

কিছুদিন পরে হপকিন্স, একটী দালাল পুত্র অর্থাৎ ম্যাক্রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তার প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য স্থির করে। ম্যাক্রিয়া সত্যই তাহাকে চায়, না তাহার অর্থকে চায় দেখিবার জন্য সে তার সেক্রেটারীকে শ্রেষ্ঠ ধনীকন্যা বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেয়। ম্যাক্রিয়া ইহাতে আত্মহারা হইয়া আকণ্ঠ প্রেমরূপ বিষ পান করে এবং ইহার ফলে তাহাকে বিরূপ ফলভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা ছবির পর্দ্দায় না দেখিলে বোঝান কঠিন। ছবিখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

দি মায়িটী বারনাম—ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টের ছবি। পরিচালক—ওয়াল্টার ল্যাঙ্। গল্প—ফাউলার ও মেরিডিথ্।

শ্রেষ্ঠাংশে অর্থাৎ নাম ভূমিকায় ওয়ালেশ বীরি। তার পত্নীর ভূমিকায় জ্যানেট-বীচার, এবং তার কন্যার ভূমিকায় রচেল হাড্‌সন্।

বার্ণামের দোকান অচল দেখিয়া স্ত্রী ন্যান্সী তাহাকে ইংলণ্ড যাইতে টাকা দিল। তাহাতে সে আজগুবী জিনিষের মিউজিয়ম খুলিয়া বসিল। বন্ধু বেলি ওয়ালেসের সহায়তায় সে অর্থ পাইল প্রচুর। কিন্তু দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় দু'বার তার মিউজিয়ম ফেল করিল। তখন বার্ণাম বেলিকে পৃথিবীর সবার বড় হাতী জাম্বোকে কিনিয়া আনিতে পাঠাইল। কিন্তু পরিবর্ত্তে আসিল কোকিল কণ্ঠী গায়িকা জেনি লিণ্ড। বার্ণাম জেনির প্রেমে পড়িয়া এবারও মিউজিয়ম বন্ধ করিল। আবার অন্যের সহায়তায় যখন নূতন করিয়া প্রদর্শনী খুলিতে যাইতেছে তখন অগ্নিদেব তাহার কপালে কেবল ভস্ম রাখিয়া গেলেন শেষ পর্য্যন্ত জাম্বো আসিল এবং পতনের পথ হইতে বার্ণামকে টানিয়া তুলিল।

সিল্‌ভার ষ্ট্রীক্—আর-কে-ও রেডিওর ছবি। পরিচালক—টমাস্ এ্যাট্‌কিন্‌স্। গল্প—হোয়েটলে, হ্যানিমান এবং ও'ডলেন।

ঘণ্টায় ১৫০ মাইল যাইতে পারে এমন একখানি নূতন ধরণের উচ্চগামী ইঞ্জিনের পরিকল্পনা লইয়া একটী রেল কোম্পানীর একজন যুবক ইঞ্জিনিয়ার যখন এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিল, তখন এজেণ্ট পাগলের প্রলাপ বলিয়া তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু যুবক ইঞ্জিনিয়ার এতটুকু বিচলিত না হইয়া আর একজন এজেণ্টের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া নূতন ধরণের একখানি ইঞ্জিন তৈয়ারী করিল। ইহাই সিলভার ষ্ট্রীক্। পূর্ব্বোক্ত এজেণ্টের কন্যাকে মধ্যস্থ করিয়া যুবক ইঞ্জিনিয়ারের সহিত একটু প্রেমের ইঙ্গিত রাখিয়া গল্পটী বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। বইখানিতে যথেষ্ট উত্তেজনা আছে। 'ফোটোট্রিক' সত্যই উচ্চ অঙ্গের এবং প্রশংসনীয়। স্পীড-রেকর্ডিংসীনটী দেখিলে আতঙ্কের উদ্রেক হয়। আধুনিক ছবির মধ্যে ইহাকে একখানি শ্রেষ্ঠ ছবি বলা যাইতে পারে।

ক্লাইভ অফ ইণ্ডিয়া—ইউনাইটেড আর্টিষ্টের ছবি। পরিচালক—রিচার্ড বলেসলস্কি।

ঐতিহাসিক রবার্ট ক্লাইভকে লক্ষ্য করিয়া গল্পটী বিরচিত। তাঁহার নিজ প্রতিভাবলে সামান্য কেরাণী হইতে তিনি কিরূপে একটী সৈনাধ্যক্ষ এবং শেষ পর্য্যন্ত লর্ড হইলেন তাহারই কথা। ইতিহাসের ঘটনার সহিত সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও, ঘটনা বৈচিত্র্যে জীবনটী অনবদ্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের দৃশ্য, মীরজাফরের সহিত ক্লাইভের সখ্যতা প্রভৃতি দৃশ্যগুলি ও সুন্দর। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ক্লাইভের স্ত্রী মার্গারেটের ভূমিকায় নামজাদা অভিনেত্রী লরেটা ইয়ংএর অভিনয়। ইহা এতই প্রাণস্পর্শী ও করুণ যে দর্শককে সত্যই আনন্দ দেয়।

জর্জ্জ হোয়াইট্‌স স্কাণ্ডালস্

এই বইখানির শ্রেষ্ঠাংশে জর্জ্জ হোয়াইট্ জেমস্ ডান, এলিস্ ফে, লেড স্পার্কস, লিডা রবার্টি প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি ফক্সের।

এখানি নাচ-গানের বই। বিশেষ কোন গল্পাংশ নাই। তবে সু-অভিনয় গুণে আনন্দদায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

একাদশ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪২ | পঞ্চম সংখ্যা

বিদ্রোহিনী নারী

সরলা দেবী

অনেকগুলি কণ্ঠের সুমিষ্ট হাসি ও চটিজুতার চটাপট আওয়াজের সহিত আমাদের সিঁড়ির দরজায় করাঘাত পড়িল। দরজা খুলিয়া দেখি, রঙিন প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়ান যে সঙ্গিনীর দলটিকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলি, তাহারাই।

প্রীতি কলহাস্যে আমার গলা জড়াইয়া কহিল—"অনেকদিন পরে ভাই আবার ডেকে জ্বালাতে এসেছি। তোর ম্যাট্রিক এগ্‌জামিন দেওয়া হয়েছে, আর আমাদের পড়ার ওজর দেখাতে পারবি না—আজ আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।"

—"তা' ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু যেতে হবে কোথায়?"

প্রীতির কনিষ্ঠা নীতি কহিল—"আজ 'লেকে' আমরা চড়াইভাতি করবো। সব ঠিক্‌ঠাক্। জন কুড়ি মেয়ে জুটিয়েছি, তোকেও যেতে হবে; কারণ, তোর মিষ্টি গলার গান না হ'লে আমোদটা মোটেই জম্‌বে না।"

মা রান্না করিতেছিলেন, তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রীতিকে বলিলেন—"তোমরা সব ছেলে-মানুষ মা, বড় কেউ সঙ্গে না গেলে কি হয়?"

—"ও মাসীমা, আপনি তার জন্যে কিছু ভাববেন না—আমার মা যাবেন, দরোয়ানটা যাবে, আর আমাদের ও হেনাদের মোটর দু'খানাতেই সবাইকে ধর্‌বে। নে রুবি, শীগ্‌গির নে।"

ঘণ্টাখানেক মধ্যে সকল বাড়ী হইতে মেয়েদের লইয়া আমাদের মোটর দুইখানি যখন রেঙ্গুন ছাড়াইয়া লেক অভিমুখে দ্রুত ছুটিল, তখন প্রীতি বলিল—"জানিস্,

ওদের সব লেকে পৌঁছে দিয়ে তোতে আমাতে মোহিত রায়ের বাড়ী যাব। তোলা উনুন আর শীল-নোড়া আন্‌তে।"

বলিলাম—"কেন সেগুলো বাড়ী থেকে আন্‌লি না?"

—"দূর, অতদূর থেকে আবার সেই সব বয়ে আন্‌ব কেন; মোহিত রায়ের বাড়ী লেকের খুব কাছে, দরোয়ান একলাই দু'বারে বয়ে আন্‌বে।"

অন্য মেয়েদের লেকে নামাইয়া দিয়া আমরা মোহিত-বাবুর বাড়ী আসিলাম। তাঁহার স্ত্রী দরজা খুলিয়া আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

তাঁহাকে আমি এই প্রথম দেখিলাম, হ্যাঁ, সুন্দরী বটে! শুভ্র ফুলের মত সুন্দর মুখ, পিঠ ও বাহু ঘেরিয়া সিক্ত কালো চুলের রাশ পড়িয়া আছে, পরিধানে খদ্দরের শাড়ী, হাতে শুধু দুইগাছি শাঁখা।

তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"বেশ ত। কিন্তু রান্না করবে খাটবে খুটবে তার আগে আমার হাতে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নাও।"

প্রীতি কহিল—"তা'তে কিছুমাত্র আপত্তি নেই বৌদি'। আপনি চায়ের জল চড়ান, আমি ততক্ষণ রুবিকে আপনার ঘরদোর দেখাই। আয় রুবি, আগে ওপরে ঘুরে আসি।"

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, পাশাপাশি দুইটী চেয়ারে দুইটী নরনারী বসিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; সামনে টেবিলের উপর বই খাতা পেন্সিল ছড়ান। আমাদের আগমন তাহারা জানিতেও পারিল না। পুনরায় সিঁড়িতে নামিতে নামিতে প্রীতি কহিল—"ভাই, আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। ওরা কে জানিস? ওই মোহিতবাবু, আর মেয়েটাকেও চিনি, ওই যে পাশে লাল বাংলোটা যাঁর, সেই সতীশ মুখুর্য্যের মেয়ে চপলা। ছি ছি, কি প্রবৃত্তি ভাই! অমন সুন্দরী বউ থাকতে—"

আমাদের তৎক্ষণাৎ ফিরিতে দেখিয়া মোহিতবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"এ কি ভাই, এখুনি চলে এলে, ওঁদের সঙ্গে আলাপ করলে না? ওপরে উনি আছেন, চপলা আছে; চপলা রোজ ওঁর কাছে অঙ্ক শিখতে আসে কি না।"

প্রীতি কহিল—"না দিদি, আজ যাই, আর একদিন আসব।"

আমরা চা পান করিয়া লেক উদ্দেশে রওনা হইলাম।

বেলা চারটার সময় সকলে যখন খাইতে বসিলাম, তখন মাঘ মাসের শেষ হইলেও অকস্মাৎ ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সখের রান্না খিচুড়ীশুদ্ধ পাতাগুলি ঝড়ে উড়িতে লাগিল। পেটের খিদে পেটে রাখিয়া সন্ধ্যা নাগাৎ সব ঝড়ো কাকের মত বাড়ী ফিরিলাম।

দুই

মাসখানেক পরে একদিন হঠাৎ প্রীতি আসিয়া বলিল—"এই রুবি, একটা খবর আছে।"

—"কি?"

মোহিতবাবুর সঙ্গে চপলার ব্যাপার তাঁর স্ত্রী টের পেয়েছেন।"

—"তারপর?"

—"'বৌদি' স্বামীকে মৃদু তিরস্কার করতে যান, তাইতে মোহিতবাবু রেগে দিশেহারা হয়ে স্ত্রীর পেটে লাথি মারেন। তিনি পাঁচ-ছ' মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, পেটের সন্তান ত নষ্ট হয়ে গিয়েছেই, বৌদি'র অবস্থাও অত্যন্ত কাহিল। বৌদি'র আত্মীয় হেমেনবাবু তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। ভাল হ'লে তাঁকে দেশে তাঁর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। আর সতীশবাবু ত মোহিতবাবুকে কাটতে গিয়েছিলেন, মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলেন, পাঁচজন ভদ্রলোক মাঝে পড়ে সব মিটমাট করে ওদের আর্য্য-সমাজ মতে পরশু বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। মোহিত-বাবু প্রথমে না কি আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু চপলা পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা, কাজেই মত না দিয়ে ত উপায় নেই।"

বলিলাম—"ওদের ত মিটে গেল, কিন্তু বৌদিদির জীবনটা জন্মের মতই ব্যর্থ হয়ে গেল।"

দিন পনের পরে একদিন 'গ্লোবে' বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়া যুগল-মূর্ত্তিকে দর্শন করিলাম। তাহারা আমার পাশেই পরস্পরের কাঁধে হাত রাখিয়া প্রেমালাপ করিতে

ছিল। হঠাৎ চপলার দৃষ্টি আমার দিকে পড়িতেই দু'জনে গম্ভীর হইয়া গেল।

চপলাকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম (ইহার পূর্ব্বে খবরের কাগজে তাহার ফটো দেখিয়াছি) রোগা, ময়লা, কাঠির মত চেহারা, স্ত্রীলোকের যে আকর্ষণী সৌন্দর্য্য আছে, তাহার চিহ্নমাত্র শরীরে নাই। টিকালো নাকে সবুজ চশমা, পরণে ঢাকাই শাড়ী, পায়ে ছিল উঁচু জুতা। কথা কহিতেছে চাঁচা-ছোলা নাকি স্বরে, হাসি পুরো-মাত্রায় মেকি, তাহাতে প্রাণেরই স্পন্দন নাই।

আমার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল সেই দেবী প্রতিমা। বেচারা মোহিত! মোহে পড়িয়া পথ হারাইয়া সারা-জীবন এই হাড়গিলে পেতনীর সহচর হইতে হইল!

তিন

আমার ম্যাট্রিক পাশ হওয়ার খবর বাহির হইল। বাবা তিন মাসের ছুটি লইয়া আমার বিবাহের জন্য দেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

একদিন টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে আমরা 'ইংলিস মেল এবওয়ে' কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বিকাল-বেলাতেই এবণ্ডা সমুদ্রে পড়িয়াছে। আমি একখানি উপন্যাস লইয়া ডেকচেয়ারে বসিলাম। সন্ধ্যার পর বৃষ্টির সহিত ক্রমশঃ ঝড় বহিতে লাগিল। জাহাজের বাহিরে ঊর্দ্ধে অন্ধকার আকাশ, আর নীচে চারিপাশে কৃষ্ণবর্ণ সমুদ্র, তাহার ঢেউগুলি চলন্ত পাহাড়ের ন্যায় ছুটিয়া ছুটিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে। কবির সুর মনে পড়িল—

—"পুঞ্জে পুঞ্জে ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়ালোরে অঙ্গ আমার জড়ালো
ছড়ালো প্রাণে ছড়ালো—"

চাহিয়া দেখি ডেকে এতক্ষণ যাহারা আনন্দের মেলা বসাইয়াছিল, সেই সব সাহেব মেম ও দেশীয় যাত্রীরা ছুটাছুটি করিয়া যে যাহার নিরাপদ আশ্রয়ে পলাইতেছে। আমিও উঠিলাম। পা টলিতে লাগিল। নীচে নামিবার সময় দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। অতিকষ্টে রেলিং ধরিয়া নীচে নামিলাম। কেবিনে ঢুকিয়া দেখি মা ও পাঞ্জাবী সহযাত্রিনীটি বমি করিতেছেন। মায়ের সেবা করা মাথায় রহিল, নিজের বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

যখন চক্ষু চাহিলাম, তখন রাত্রি অধিক। জাহাজ নিস্তব্ধ। কপালে কোমল হাতের স্পর্শ পাইলাম।

হাতের অধিকারিনীকে দেখিয়া আশাতীত পুলক অনুভব করিলাম। সাগ্রহে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম—"আপনি?"

তিনি সুমধুর হাস্যে কহিলেন—"চিন্‌তে পেরেছ ভাই। তা' হ'লে দেখ্‌ছি এক পেয়ালা চা খাওয়ান বৃথা যায় নি।"

মনের মধ্যে অনেক ছবি ভাসিয়া উঠিল। 'ফস্‌' করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—"কিন্তু মোহিতবাবুকে ত কত মাসের পর মাস ঐ সুন্দর হাতের চা খাইয়েছেন, তবু ত সবই ব্যর্থ হ'ল!"

তিনি সপ্রতিভভাবে বলিলেন—"দোষ যদি কারুর হয় ত সে আমারি ভাই। আমি যদি মনের মধ্যে স্বামীকেই একান্তভাবে চাইতাম, তা' হ'লে কখনই এসব ব্যাপার হ'ত না। যাক্‌ যে ভাই এসব অপ্রীতিকর আলোচনা। আমি এই পাশের কেবিনেই রয়েছি। সন্ধ্যেবেলা ত প্রলয়কাণ্ড বেঁধে গিয়েছিল। এ ঘরে বমির আওয়াজ শুনে ছুটে এসে দেখি উনি খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন, তাড়াতাড়ি লেবুর রস খাওয়াই, লেবু শুঁকতে দিই, ফ্যান্‌ খুলে দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে থাকি, তবে উনি সুস্থ হয়ে ঘুমোন। তোমার মা বোধ হয়?"

—"হাঁ। আপনি কিন্তু বেশ আছেন ত!"

—"আমার স্বাস্থ্য যে ভাল ভাই। আমাকে সহজে কাবু করতে পারে না। আচ্ছা, একটু ঘুমোও, কাল আবার দেখা হবে।"

চার

পরদিন ভোরে বেড়াইবার সাজে সজ্জিত হইয়া সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য সেকেন ক্লাস ডেকে আসিলাম। দেখিলাম, তিনি রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পিঠে হাত রাখিয়া কহিলাম—"আপনাকে কি বলে ডাকি

বলুন ত? দিদি বল্‌তে ইচ্ছে করে না, তা' হ'লে মোহিত-বাবুর সম্বন্ধটা বড় বেশী মনে পড়ে।"

—"আমার নাম সাধনা।"

ততক্ষণ সমুদ্র ও আকাশের মিলন স্থলে সোনার রেখার মত সূর্য্যদেব দেখা দিয়াছেন। আমরা দু'জনেই মোহমুগ্ধার ন্যায় সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। মিনিট পনের পরে স্বর্ণরেখা স্বর্ণথাল হইয়া ক্রমে রূপার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন দিকে দিকে অরুণালোক ছুটিয়া চলিল। সেই স্মরণীয় সুপ্রভাতে সাধনা দি'র জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। লালপাড় খদ্দরের শাড়ীর আঁচলটুকু তাঁহার দীর্ঘকেশযুক্ত মস্তকের উপর দিয়া ঘুরিয়া, ডান কাঁধে পড়িয়া রহিয়াছে। দীপ্ত চক্ষু দু'টি অলসভাবে সেই মধুর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে। তাঁর শাঁখাপরা শুভ্র হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম—"সাধনা দি' একটি গান গান।"

—"আমি গান জানি তোমায় কে বল্‌লে?"

—"আপনি জানেন না এমন কিছুই নেই।"

হাসিয়া বলিলেন—"বেশ যা' হোক্, খোসামোদ করছ না কি। কিন্তু এখানে গান গাইলে সকলে কি ভাব্‌বে?"

—"লোক ত এখনও বেশী আসে নি এই বেলা গান্।"

তিনি গান ধরিলেন—

"গাহিতে বলো না, আমায় বলো না বলো না,
এ কি শুধু হাসিখেলা প্রমোদেরি মেলা
শুধু মিছে কথার ছলনা!
আমি এসেছি কি হেথা যশেরি কাঙালী
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা!—"

কি মিষ্ট কণ্ঠস্বর! আমি অনেকের মুখে এই গান শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা আমার মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে নাই, আজ যেমন পারিল।

সমুদ্র তরঙ্গে আকাশের গায় ও আমার হৃদয়-বীণায় সুরের লহরী খেলিতে লাগিল—

"কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাবে বল জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায়ে দিবে
গভীর প্রাণের বেদনা।"

আন্‌মনা হইয়া পড়িলাম। হায়! যে আজ সন্তানের জননী হইয়া গৃহস্থের মহিলা হইয়া নন্দন কাননের সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহার প্রাণে এই উদাসীর সুর এই দেশের ব্যথা জাগাইলে কেন? ভগবান, এই কি তোমার শুভেচ্ছা!

একটুখানি আওয়াজ। চাহিয়া দেখি—সাধনা দি' রেলিংয়ের উপর এক-একটি করিয়া হাত রাখিতেছেন এবং অপর হস্তদ্বারা আঘাত করিয়া শাঁখা ভাঙ্গিতেছেন।

সরলা দেবী
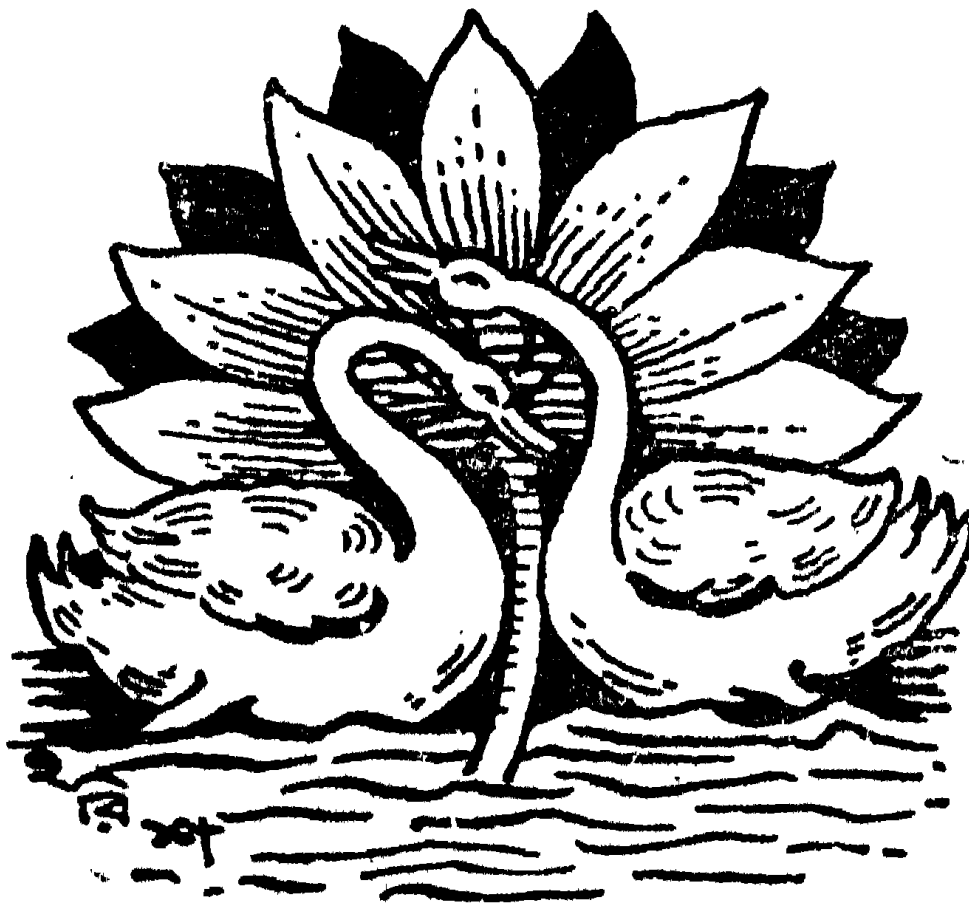
আপন-মনে

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, বি-এ

চড়টা একটু জোরেই মারিয়াছিল !...

কোলের ছেলেটা চিলের মত চেঁচাইয়া উঠিল। কান্নায় মুখখানা তার লাল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তবুও মায়ার রাগ পড়ে নাই। ছেলেটার দিকে আঙুল উঁচাইয়া বলিল—চুপ কর্ বলচি, একদম চুপ্ ! ..

তবুও ছেলেটা থামিতে চাহে না। থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে। মায়া তাহাকে আর একটা চড় মারিত—তাহা আর মারা হইল না। পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল।

চিঠির হস্তলিপি মায়ার বিশেষ পরিচিত। ঠিকানার আখরগুলি দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল চিঠি বীণার লেখা। তাড়াতাড়ি সে চিঠিটা খুলিতে আরম্ভ করিল। ছোট মেয়েটা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল—কিন্তু সে তাহার অত্যাচার ভ্রূক্ষেপ করিল না—চিঠিখানি পড়িতে লাগিল।

নানা কথার পর বীণা লিখিয়াছে—"তোমার বোধ হয় মনে থাকিতে পারে সুধার কথা—আমার বোন্ সুধা। যাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিবার জন্য তোমাকে এক-এক-বার স্মরণ করাইয়া দিতাম। তাহার আজ পাঁচ-ছয়দিন হইল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেয়েটার বিবাহের জন্য বাবা কি রকম ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা বোধ হয় তুমি জানিতে। ম্যাট্রিক পাস করিয়া মেয়েটা একান্ত বসিয়াই ছিল—বিশেষ কিছু করিত না। বাবা তাহার জন্য পাঁচ বছর ধরিয়া বহু পাত্রের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আসিয়াছিল, কিন্তু কোনটাই টেঁকে নাই। শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন।...

যাক্, এবার তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। পাত্র ভালই বলিতে হইবে। ছেলেটা নূতন এম-বি পাশ করিয়া ডাক্তার হইয়াছে। বকুলবাগান রোডে বাড়ী। নাম অজিত।...

...'অজিত !' 'বকুলবাগান রোড !' 'ডাক্তার !' ইস ! মায়া অবাক হইয়া গেল।

আর কেহ হইতে পারে না। এ সেই অজিত। এ কথা তাহার স্থির বিশ্বাস হইল।

কোলের ছেলেটাকে নামাইয়া রাখিয়া মায়া ভাবিতে বসিল :

এই অজিতের সহিত তাহার একদিন বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল না ? হঁ্যা, হইয়াছিল। সে বছর পাঁচেক পূর্ব্বেকার কথা। তখন অজিত ডাক্তারী পাশ করে নাই। ...কিন্তু আশ্চর্য্য, তাহার বাবার সে ছেলে পছন্দ হয় নাই কেন কে জানে ! অবশ্য একটা প্রতিবন্ধক ছিল। যৌতুকের টাকাটা ! তু' হাজার টাকা বিবাহে যৌতুক দিবার অবস্থা তাহার বাবার ছিল না। তাই তিনি ওদিকে ঝোঁকেন নাই। কোর্টের জুনিয়ার উকিল বীরেনের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—ছেলে এম-এতে 'হাই সেকেণ্ড ক্লাশ,' 'মেরিট্' আছে। কিন্তু এই ছেলের হাতে পড়িয়া মায়ার যা' হাল হইয়াছে !...

হঠাৎ অপর ঘরের ভাড়াটিয়াদের মেয়েটা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ও বৌদিদি ! তোমার ছেলের দুধ যে চুঁয়ে গেল। কি ভুলো মন গো তোমার ! শীগ্‌গির এসো।...

কাজেকাজেই মায়াকে উঠিয়া পড়িতে হইল। দুধ নামাইয়া ফেলিয়া আর একটা কি করিতে গিয়া আবার তাহার মন উড়িয়া গেল। ভাবিতে লাগিল—সুধা

মেয়েটাকে তাহাদের কি করিয়া পছন্দ হইল কে জানে! এমনই কি তাহাকে ফর্সা দেখিতে?

মায়া একবার নিজের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া লইল। তারপর ভাবিল—না, না, প্রায় তাহার মতই দেখিতে। কি একটু এদিক-ওদিক। বড় জোর তাহার থেকে একটু ফর্সা। কিন্তু যাই হোক্, মেয়েটা ছিল বেজায় পুরাতন-পন্থী। ঠিক্‌মত কাপড় পরিতেই জানিত না। আর সেই লিক্‌লিকে হাত দু'টাতে সেই ফিন্‌ফিনে চুড়ী-গুলো যা' মানাইত! মায়ার হাসি পাইল।

··আবার ক্ষণিকের জন্য তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। একটা ছেলে কখন কাঁদিতে কাঁদিতে কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অপরটা খাইবার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোলেরটাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া অপরটীকেও স্নান করাইয়া, খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর অল্প একটু হাতের কাজ সারিয়া স্নান করিতে যাইবার সময় দেখিল বেলা দু'টা বাজিয়াছে।

তেল মাখিতে মাখিতে আপনার সাড়ীখানির দিকে হঠাৎ তাহার নজর পড়িল। ছিঃ, কি ময়লা সেখানি, তার উপর আবার সেলাইয়ের টানাপোড়েন পড়িয়াছে। মায়া আপনার বেশভূষার দিকে তাকাইয়া আপনি বিস্মিত হইয়া উঠিল। এ কি রূপ হইয়াছে তাহার!···

মায়ার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। বীরেনকে বিবাহ করিয়া সে কি পাইয়াছে? সবার পূর্ব্বে তাহার মনে পড়ে একটুখানি স্নেহ—অপরিমেয় একট ভালবাসা। কিন্তু এ সমস্ত কে না পাইয়া থাকে। সুধা কি পাইবে না? অথবা যদি অন্য কাহার সহিত বীরেনের বিবাহ হইত সে কি পাইত না?...

মায়া ভাবিল, সে পাইত। কিন্তু এই যে দিবারাত্র খাটুনী,—দু'টা দুরন্ত ছেলে টানায় জর্জ্জরিত জীবন! এ জীবন মায়ার একান্ত আপনার—সুধার জীবন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু ঐ সুধার কথা তো সে জানে! তাহাদের অবস্থা এমন কিছু ভাল ছিল না। সেই একখানা সবুজ ডুরে সাড়ী ছিল, সেইখানাকে সে কতরকম করিয়াই না পরিয়া বাহির হইত। কিন্তু এমনিই মজা ইহার পর হইতে আর ঐ সুধাকে চেনাই যাইবে না। সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিবে। এমনিই মানুষের হয়।

অজিতের বাবার পয়সা আছে শুনিয়াছে। চাকর-দাসী তাহাদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই আছে। সুধার আর সংসারের কাজ করিতে হইবে না। সুধার বিস্তীর্ণ অবকাশ! আজ সুধার অন্তর-আকাশে প্রভাত সূর্য্যের সপ্ত-বর্ণ সুষমা!...

আপন-মনে ভাবিতে ভাবিতে যখন মায়া আহার সারিয়া উঠিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। ছেলে দু'টা উঠিয়া পড়িয়া দুষ্টামী আরম্ভ করিয়াছে। কেরাসিন তেলওয়ালা আসিয়া হাঁকিল—তেল চাই মা!

মায়া বলিল—'আজ চাই না, কাল এস।' তাহার পর গয়লা আসিয়া দুধ দিয়া গেল। মায়া ঘরে ঢুকিয়া ঘর ঝাঁটাইয়া ফেলিল। ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। রাস্তায় মই ঘাড়ে করিয়া গ্যাসওয়ালা ছুটাছুটি করিয়া আলো জালিয়া দিয়া গেল। ঘুগ্‌নীদানা-ওয়ালা সেদিনকার মত বিক্রয় সমাপ্ত করিয়া শেষডাক হাঁকিয়া গেল। সাম্‌নের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে ছেলেটী আলো জ্বালিয়া পরদিনের পড়ায় মন দিল।

ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া ঘরের অবস্থা দেখিয়া মায়ার যেন কান্না পাইল। ছিঃ ছিঃ, ছেলেগুলো ঘরটা কী নোঙ্‌রা করিয়া ফেলিয়াছে! দেওয়ালে কালির দাগ দিয়াছে। এখান-ওখানের বালি তুলিয়া ফেলিয়াছে। মায়া বিরস হইয়া পড়িল। কি করিবে সে? ভাড়াটে ঘরের অবস্থা এমনই হয়। কিন্তু চেষ্টা করিলে কি ইহাকেও পরিষ্কার রাখা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। স্বামী যদি এ বিষয়ে উদাসীন না হইতেন!

রবিবার দিন তো স্বামী বাড়ীতে বসিয়া থাকেন। কিন্তু ছেলেগুলোকে একবারও ধরেন না। সেদিনও মায়াকে ছেলে টানিতে হয়। তাহা না হইলে সে এত দিনে কত কাজ করিয়া ফেলিত। নাঃ, তাহার দ্বারা আর কিছু হইবে না। স্বামীর উপর তিক্ততায় তাহার

মন ভরিয়া যায়। এরূপভাবে বিবাহ করার কি সার্থকতা? এ জীবনের কোন অর্থ নাই!

মায়া মনে মনে ভাবিতে থাকে আজ স্বামী আসিলে দু'-এককথা শুনাইয়া দিবে। তাহার আর এরূপ ভাল লাগে না।

হঠাৎ তাহার মনে হইল কে যেন দরজার কড়া নাড়িতেছে। যাঃ! তাহা হইলে তিনি আসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখনও তো উনানে আঁচ দেওয়া হয় নাই—চা'র জল হয় নাই। সারিয়াছে।...সে ত্বরিত পদে আসিয়া দরজা খুলিতে গেল। কিন্তু দেখিল বীরেন আসে নাই। কোণের দিক্‌কার ঘরের ভাড়াটেদের ছেলেটি আসিয়াছে। যাক্, সে বাঁচিল। স্বামী যেন একটু দেরীতে আসেন। সে তাড়াতাড়ি উনান ধরাইয়া চা'র জল চাপাইয়া ফেলিল। জল ফুটিতে লাগিল।...কিন্তু কই স্বামী তো এখনও আসিলেন না। অন্যদিন তো ইহার বহুপূর্ব্বে তিনি আসেন। তবে—তবে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই তো? এ কথা মনে পড়িতে মায়ার আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। তাহা হইলে কি হইবে! এই দুগ্ধপোষ্য দু'টী ছেলে লইয়া সে কোথায় ভাসিবে? কাহাকেও কি ডাকিবে? কাহাকেও দিয়া বাবাকে সংবাদ পাঠাইবে?...

মায়া ভাবিল, তাহার কে আছে! কাহাকে দিয়াই বা সে খবর দিবে! দারুণ উৎকণ্ঠায় তাহার দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

কিন্তু দালানে কাহার ছায়া পড়িল। স্বামীর না? মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষ না কি প্রিয়জনকে একবার দেখা দিয়া যায়। তবে কি—তবে কি—

এক মুহূর্ত্ত পরেই মায়ার ভুল ভাঙিয়া গেল। বীরেন সত্যই আসিয়া হাসিয়া বলিল—আজ ফিরতে বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তুমি খুব ভাবছিলে, না মায়া?...

মায়া আনন্দে কিছু বলিতে পারিল না। তখনও তাহার বুকের ভিতর ঢিপ্‌ঢিপ্ করিতেছিল।

বীরেন একটী ছেলেকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে কাপড়চোপড় ছাড়িয়া আসিয়া বলিল—ইস্, খুব তাড়াতাড়ি চা করতে লেগে গেছ দেখ্‌চি। দাও দাও, আমাকে দাও—আমিই করে নিচ্ছি। তোমার সমস্ত দিন খাটুনী!...

বীরেন মায়ার হাত হইতে কাপ ডিস্ কাড়িয়া লইতে গেল। মায়া শাসনের স্বরে বলিল—আঃ, দেখ্‌চে লোকে।

বীরেন একবার পিছনে তাকাইয়া দেখিল—অন্যঘরের ভাড়াটিয়াদের মেয়েটী তখনও দাঁড়াইয়াছিল। একটু বিদ্রূপাত্মক স্বরে সে বলিল—বয়ে গেল। তারপর বলিল—আচ্ছা আচ্ছা, তুমিই দাও, আমি বস্‌চি।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যাটা বীরেন ছেলেদের লইয়া কাটাইয়া দিল। একটু রাত্রি হইতেই তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

কাজ সারিয়া খাওয়া শেষ করিয়া মায়া যখন ঘরে আসিল, তখন রাত্রি এগারটা। ছেলে দু'টী নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে। বীরেন হারিকেন জালিয়া বই পড়িতেছে। মায়া আসিয়া তাহার বিছানার উপর বসিল। ঘরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি—তন্দ্রার কুহেলি আব্‌হাওয়া।

হঠাৎ সামিজের ফাঁক হইতে সকালবেলার সেই চিঠিখানি বাহির হইয়া পড়িল। বীরেন লাফাইয়া উঠিল—দেখি দেখি, কার চিঠি?

মায়া 'ফস্' করিয়া সেখানি বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বীরেন বলিল—ও বাবা, এতদূর!—

তারপর তাহারা দু'জনে হাসিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ রাত্রে হাসিতেও যেন ক্লান্তি আছে। বীরেন মায়ার হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল—ইস্, খেটে খেটে তোমার নরম হাত দু'খানা কি শক্ত হয়ে গেছে দেখ! নাঃ। তোমায় বড় কষ্ট দিচ্ছি, না মায়া?

মায়া কোন উত্তর করিল না। তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। গভীর শান্তিতে সে চোখ বুজাইয়া ফেলিল।

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

জীবনে যৌবনে

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য

ফিক্ ক'রে একটু হেসে সুলতা ঘরে এসে ঢুক্‌ল।

—সত্যিই কি করে যে লেখেন আপনি? এমন সুন্দর…

—সত্যিই কি তাই? কলমটি থামিয়ে রেখে সুলতার দিকে মুখ তুলে চাইলাম। সুলতার মুখে চোখে একটা কৌতূহলের দীপ্তি; একটা বিস্ময়।

—আমায় শেখাবেন কেমন ক'রে লিখ্‌তে হয়?

সুলতা আমার লেখ্‌বার টেবিলের উপর অনেকটা ঝুঁকে পড়্‌ল।

—এ কি আর কাউকে শেখবার জিনিস, সুলতা? লিখ্‌তে থাকো, তা' হ'লেই পার্ব্বে।

—সত্যি?

—হুঁ।

আমি আবার নিজের লেখায় মন দিই। সুলতা বার হয়ে যায়। মনে তার একটা ব্যথা—সে লিখ্‌তে পারে না।

কিন্তু সুলতা থেমে গেল না। লিখ্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল। এর জন্য কটূক্তিকে সে যেন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে নিল। আমার টেবিলের পাশে বসে সে এক-একটি করে দেখাতে আরম্ভ কর্ল্ল। ছোট ছোট কবিতা। না, ঠিক্ কবিতাও নয়—উচ্ছ্বাস, অর্থহীন কাকলি! কিন্তু তথাপি তা' শুনলাম শুধু প্রভাত বলেই, শুধু প্রথম বলেই, সুলতা আমায় শোনাচ্ছে বলেই।

—কেমন হয়েছে?

—বেশ, বেশ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরে সুলতা সন্তুষ্ট হ'তে পারে না। বলে —বলুন না ঠিক্‌মত।

—বল্লাম যে।

ব'সে ব'সে তার কথা শোন্‌বার অবকাশ আমার নেই। নিজের উপন্যাসখানার দিকে আবার মন দিতে যাই। সুলতা হয়ত মনে আঘাত পায়, কিছু বলে না যদিও।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গোপন রইল না। সবাই জেনে গেছে যে, সুলতা লিখ্‌তে আরম্ভ করেছে আর তার সুর যোগাচ্ছেন তারই মাষ্টার-মশায়। গিন্নীঠাকরুণ আমায় ডেকে বল্লেন বেশ একটু শাসনের সুরেই—আপনার ছাত্রীর এ সমস্ত কিন্তু আমাদের কাছে ভাল ঠেক্‌ছে না মাষ্টার-মশায়। এতে লেখাপড়ার ক্ষতি, পরন্তু··

কোন্ বিষয়ে যে তিনি কথা বল্‌ছিলেন আমি তা' বুঝ্‌তে পারি নি। জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম—কোন্ বিষয়ে বল্‌ছেন?

ভ্রূজোড়া কপালে তুলে স্বরটা বেশ মিহি করে তিনি বল্লেন—বল্‌ছিলাম এই যে কবিতার ভূত চেপেছে ওর কাঁধে—

আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বার বাকী রইল না। সুলতাকে ডেকে বারণ করে দিলাম যেন আর না লেখে কোনদিন।

মনে আছে সেদিন সুলতাকে বারণ কর্ত্তে গিয়ে আমি থেমে গিয়েছিলাম। সহজে সচ্ছন্দে তাকে বলতে পারি নি। কেন? সুলতা লেখে কেন? কী সে উন্মাদনা! অপূর্ব্ব আনন্দের আহ্বান, বেদনার তিক্ততা, জীবনের কোন্ জিজ্ঞাসায় সুলতা লেখে? নিজেকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেদিন—কেন? কেন আমি লিখি? বিন্দু বিন্দু ক'রে হৃদপিণ্ডের রক্তে অনুভূতির পাত্র ভরে তোলা কেন? কী সে অনুভূতি যা' পৃথিবীকে লুপ্ত ক'রে দিল আমার সাম্‌নে, সমস্ত চেতনার দোরও বন্ধ ক'রে দিল!

—না, লিখো না আর, তার চাইতে মন দিয়ে পড়াশোনা কর, এক্‌জামিন—

—না, লিখো না আর, তার চাইতে মন দিয়ে পড়াশোনা কর, এগ্‌জামিন—

সুলতা বেশ একটু তাচ্ছিল্যের সুরেই বলেছিল—ভারী ত এগ্‌জামিন!

কিন্তু তবু সে থামল না। সারাদিনকার অন্যান্য কাজকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সে লিখতে আরম্ভ ক'রে দিল। কারণ কথা শুনতে সে চাইল না। স্কুল থেকে ফিরে এসে যে তার চেনা দি'র সেখানেই বিকেলটা কাটিয়ে আসত, কিন্তু এখন সে সেখানেও দুর্লভ। সেবার পড়াশুনার দিকেও নজর দিচ্ছে না। শেষে—শুধু লিখেই চলল। মাঝে মাঝে ওকে মানা ক'র্ত্তে যাই। ও শুধু একটু মুচ্‌কি হাসে।

—ছেড়ে দাও ও সমস্ত কাব্যিপনা, মা রাগ কর্বেন।

সুলতা কিছু বল্ল না। কিন্তু সেদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে ড্রয়ার খুলতেই দেখলুম—কয়েকটি কবিতা। সঙ্গে আর একখানা ছোট্ট কাগজে আর একটি ছোট্ট অনুরোধ—কাউকে বলবেন না যেন।

এমনিই চলেছিল, কিন্তু সেদিন ব্যাপারটা হ'য়ে গেল অন্যরকম। কলেজ থেকে মাত্র ফিরেছি, সুলতা হন্ হন্ ক'রে আমার ঘরে এসে ঢুকল, বল্ল—দেখুন।

আর দেবীমাত্র না ক'রে আমার টেবিলের ওপর একখানা পত্রিকা মেলে ধর্‌ল। সুলতারই একটা কবিতা ছাপা হয়ে এসেছে আজ।

—এ কি! কবে পাঠিয়েছিলে? বেশত।

সুলতা বল্লে বেশ একটু আস্তে, আমার কৌতূহলকে বাড়িয়ে দিয়ে—এই কিছুদিন আগে—

সেদিন নৈশাহারের পর বাড়ির কর্ত্তা আমায় ডেকে পাঠালেন, বল্লেন—দেখুন, মেয়েমানুষ হ'য়ে যা' তা' কবিতা লিখবে, আবার ছাপার হরফে তা' ছাপাও হবে, দেশশুদ্ধ লোক তা' পড়ে বাহবা দেবে, এ আমি সইতে পার্ব্ব না, তার চাইতে বলুন আমি মেয়েকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনি।

কথাটি তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই বল্লেন, এবার আমার দিকে মুখ তুলে বলতে গেলেন—আপনার কথাও বলছি, ও সমস্ত ভাল নয়। কি হবে ও সমস্ত দিয়ে? ভাব বিলাস? ও কিছু নয়। আমাদের চাই চাকরী-বাকরী, 'ষ্ট্রাগল্ ফর একজিস্‌টেন্স।' আরও অনেক কথাই তিনি বল্লেন। নীরবে প্রত্যেকটি কথা কাণ পেতে শুনে নিলাম তাঁর। ঠিক্ কর্লাম, পরদিনই চলে যাব সেখান থেকে।

সুলতা আর আমার সাম্‌নে আসে নি সে রাতে বা পরের দিনে। কিন্তু আমার কানে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে যেন একটু সঙ্কোচ, একটু ব্যথার সাথেই বলেছিল—ড্রয়ারে যে কবিতাটা আছে ওটা আপনাকে দিলাম, নিয়ে যাবেন।

সুলতার ব্যথার উত্তর দেওয়া হয় নি বা কবিতাটিও আনা হয় নি। ট্যাক্সি গাড়িতে উঠে ব'সে নিজের কাছে এ কথা স্বীকার করেছিলাম, আমি শূন্যহাতে ফিরি নি।

দুই

তারপর বহুদিন চলে গেছে। সুলতার আর কোন খোঁজ রাখি নি। কিন্তু যেদিন চারিদিকে যখন বাঁশী বেজে উঠেছিল, শরতের আকাশে পড়েছিল শ্যামলতার আল্‌পনা, নব জীবনে। যে প্রভাতে দাঁড়িয়ে যে অদৃশ্য কণ্ঠের বাণী গান সেদিন শুনেছিলাম, হয়ে উঠেছিলাম উৎকর্ণ, ভেবেছিলাম, এ বুঝি কোন অপরিচিতার—সে কণ্ঠ সুলতারই। আমার বিয়ের দিনে একটি কবিতা সে পাঠিয়েছিল।

তিন

তারপর জীবনের এ অধ্যায়। কবিতা আজ আর লিখি না, লিখতে পারি না। ফুল আর ফোটে না। বন-মর্ম্মর ছায়াপথে আজ আর সঙ্গীত রচনা করে না। বাস্তব আজ আমায় ডাকছে, বলছে—এ পৃথিবীতে আছে ফুল, আছে গান, আছে ছায়া, কিন্তু তা' নিতান্তই আকাশের, বনস্থলীর, বিলীয়মান মেঘের। এ আকাশের নীচে যারা বাঁধল কুটীর, বনছায়ায় বসে যারা কত কথা বল্ল, প্রেমের কথা, আনন্দের কথা, অদৃশ্য স্বর্গলোকের মধুর কল্পনায় যারা হয়ে

উঠ্‌ল মুখর, তারা ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, বাস্তবের পদতলে তারা নিঃসহায়। সেদিন যে সময় বসে কবিতা লিখ্‌তাম, আজ সে সময় বসে হিসাব কষি মুদীর দোকানে বাকী পড়েছে কত। ছায়াময় অপরাহ্ণের আমন্ত্রণে আমি যে সময় উন্মনা হয়ে উঠ্‌তাম, সে সময় হয়ত এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ব'সে একটি ছেলেকে য়্যালজাব্রার 'য়ুকুয়েশন' বোঝাচ্ছি। জ্যোৎস্নার আলো কোঠায় লুটিয়ে পড়ত, আমি লিখ্‌তাম কবিতা—আর আজ সেই জ্যোৎস্নারই আলোতে রোগশীর্ণ সন্তানের অস্পষ্ট মুখখানার দিকে তাকিয়ে এক-একবার অজানা ভয়ে শিউরে উঠি। জীবন-কবিতা আজ এসে স্থান নিয়েছে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ স্ত্রীর আর্ত্তকণ্ঠে, ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের নিষ্ঠুর আব্‌দারে। কিন্তু তথাপি শ্রাবণের শেষ সায়াহ্নে যখন ঘনায়মান আঁধারের যবনিকা—হাস্নুহানার মদিরগন্ধে ছায়াপথ পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, জীবন যেন সে মুহূর্ত্তটীর কাছে শীর্ণ হাত মেলে দাঁড়ায়—অবাস্তব স্বপ্নময় অমর্ত্ত্য সে দানের ভিখারী হয়ে ওঠে।

ঠিক এমনই দিনে আবার হঠাৎ সুলতার চিঠি। তার বিয়ে। আমায় যেতে লিখেছে। একবার ইচ্ছা হ'ল—যাব না। কেনই বা যাব? কিন্তু শেষে কি জানি খেয়াল হ'ল—ট্রেণে চেপে বস্‌লাম।

সুলতাকে প্রথম আমি চিন্‌তে পারি নি। নব-জীবনের এ যাত্রাপথে সে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে—সকল রিক্ততাকে দিয়েছে ঠেলে ফেলে।

আমার পাশে এসে সে দাঁড়াল। বল্ল—আমায় একটা কবিতা লিখে দেবেন?

—কবিতা! তা' ত আমি লিখি না আজকাল।

সুলতা আমার আরও কাছে এগিয়ে এল। আস্তে অতি আস্তে ব্যথিত সুরে আবার বল্ল—কেন? কেন লেখেন না আজকাল?

সুলতাকে আমি যে কী বল্‌ব খুঁজে পাই না। কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিতে যাই। বলি—যাও, এসেছি তোমার বাড়ি, একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।

সুলতা উঠে গেল। কিন্তু একটি দীর্ঘশ্বাস রেখে গেল সেখানে।

ফিরে এসে আরও অনুনয়ের সুরে বল্লে—কিন্তু আজকের দিনেও কি একটি কবিতা আপনি লিখ্‌তে পারেন না?

সুলতা জানে না, বুঝে না, এ সত্যটুকু আজও তার কাছে ধরা পড়ে নি—মানুষের জীবনে কবিতা লেখাটাই বড় কথা নয়। নীচের দিকে তাকিয়ে থেকে জীবনের অনেক কথা ভেবে নিলাম। সুলতার সাম্‌নে অনাগত ভবিষ্যৎ আর অনন্ত কল্পনা, মধুর জীবন-ব্যেপে তার সহস্র কনক-স্বপ্ন, আর আমার সাম্‌নে মৃত্যুময় দিবস আর রাত্রি—বর্ণহীন, আশাহীন!

সুলতা আবার বল্ল—আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার অনুরোধ অবহেলা কর্ব্বেন না।

সুলতা বার হয়ে গেল। কিন্তু সে ভালই করেছে। নইলে হয় ত তখন আমি তাকে বলতাম—জীবনে অনেক কবিতা আছে সুলতা, তারই আবৃত্তি মানুষকে ক'রে যেতে হয়। উৎসবের শিখর থেকে জীবন নেমে আসে প্রতিদিনের সমতায়—সে জীবনে দাঁড়িয়ে তুমিও আমায় ক্ষমা কর্ত্তে দ্বিধা কর্ব্বে না।—যখন জীবনের সহস্র কল্পনা তোমার মুছে যাবে, তুমি হয়ে উঠ্‌বে গৃহিণী, রোগশীর্ণ পাণ্ডুর, তখন হয় ত আমারই মত শুধু বেঁচে থাকৃতেই চাইবে।

দু'দিন গেল। সুলতা আর এল না। উৎসবের আনন্দের মাঝে নিজকে সে ডুবিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় দিনে সুলতা আবার এল। এবার আর আগেকার মূর্ত্তিতে নয়, অপ্রগল্‌ভ শুদ্ধতায় আমার সাম্‌নে সে এসে দাঁড়াল। সংসারচারিণী সুলতার দিকে একটিবার মাথা তুলে চাইলাম।

—এখন যাচ্ছি মাষ্টার-মশায়, কিন্তু আমার কবিতা?

—হাঁ, যাও, সুখী হও জীবনে। আর কবিতা? তুমি আমায় ক্ষমা করো সুলতা, আজ আমি শূন্য, রিক্ত।

সুলতা হয় ত আমার দুঃখ সেদিন বুঝেছিল; ধীরপদে সে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সে নির্ব্বাপিত দীপ উৎসব-আলয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে সুলতাকে আমি আশীস্ জানিয়ে ছিলাম সেদিন—সে যেন সুখ পায়, জীবনে শান্তি পায়, আমার মত যৌবনের অপমানে যেন তার জীবনের পূজো না হয়।

সুলতাকে বিদায় দিবার কালে সানাইটি বড় করুণ সুরে বেজেছিল সেদিন।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য

ভৌতিক গল্প

অপার্থিব

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

সুচিত্রা এস্রাজ বাজাচ্ছে আর সমীরণ বসে শুনছে। সুদূর পশ্চিমের একটি সহরের একপ্রান্তে কার্য্যোপলক্ষে ওরা এসে বেঁধেছে নীড় এবং সুখেই আছে। পাড়ার অনেক লোক ওদের দাম্পত্য-জীবনকে ঈর্ষা করে—কিন্তু প্রকাশ্যে বলে না কিছুই। যুবক-মহলে সমীরণের আর মেয়ে মহলে সুচিত্রা সমীরণ দু'জনেরই সম্মান আছে।

রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। সুচিত্রা এস্রাজ থামিয়ে হাসিমুখে স্বামীর মুখের দিকে চাইলো। কপালে আর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সত্যি আজ অপরূপ দেখাচ্ছে সুচিত্রাকে।

—আর বাজাবে?

—না, আজ থাক্ লক্ষ্মীটি, বড্ড হাঁপিয়ে গেছি।

—আচ্ছা, তবে থাক্।

সুচিত্রা উঠে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে ফেল্লো, তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় এসে স্বামীর পাশে 'ধপ্' করে শুয়ে পড়লো।

অনেকক্ষণ পরে—

সমীরণের বোধ করি একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ কি জানি কেন সেটুকু তার ছুটে গেল। বাড়ীর সাম্‌নের মাঠটা থেকে একটানা ঝিঁঝির আওয়াজ ভেসে আস্‌ছে। দক্ষিণের জান্‌লা দিয়ে মেঝের উপর একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে—বিবর্ণ ঠোঁটে কার যেন খানিকটা হাসি। অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ আজ চারদিক। টেবিলের উপর টাইমপিস্‌টার অবিশ্রাম টিক্‌টিক্ শব্দ আর পাশে গভীর ঘুমে অচৈতন্য সুচিত্রার মৃদু নিশ্বাস-প্রশ্বাস মিলে যেন একটি মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে। সারাদিন গুমোটের পর দক্ষিণ থেকে বাতাস উঠেছে—তারই স্পর্শে দুলছে ঘরের আলনার কাপড়চোপড়গুলো।…

হঠাৎ সমীরণের দৃষ্টি পায়ের দিকে যেতেই সে চম্‌কে উঠ্‌লো। মশারীর নেটের অস্পষ্টতার ভেতর দিয়ে সে পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলো তার পায়ের কাছে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে ক্রমে সেই মূর্ত্তি একটি পরিপূর্ণ মানবীর রূপ ধারণ করলো। তার মুখ, চোখ, নাক, ভ্রূ, সব এমনি সুগঠিত যে, অনেকক্ষণ ধরে দেখেও কিছুতেই তাকে কুৎসিত বলা চল্‌বে না। সমীরণের বিস্ময়ের ঘোর কাট্‌তে-না-কাট্‌তেই মেয়েটি মৃদুস্বরে বলে উঠ্‌লো—ঘুমিয়ে পড়ো না যেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—আচ্ছা ঘুমোব না। কিন্তু কে তুমি দয়া করে একবার জানাবে কি? বহুকষ্টে বল্‌লো সমীরণ।

—গল্প কর্‌তে কর্‌তে সে কথা বল্‌বো।

—আচ্ছা, এত লোক থাক্‌তে হঠাৎ আমার ওপর এ দয়ার কারণ কি?

—কি দয়া?

—এই মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে গল্প করবার অস্বাভাবিক আগ্রহ?

—আমার ইচ্ছে।

—ভাল ইচ্ছে নয়। আমার মত মূঢ়মতি তোমার সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পাবে—এমন অদ্ভুত ধারণা মনে এল কোত্থেকে? তোমরা তো অন্তর্য্যামী বলে শুনেছি। এই কি তার নমুনা না কি?

—তুমি কি এই রকম বাজে বক্‌বে?

—না, এই চুপ করলাম।

—আচ্ছা, শোন।

—বলো।

অনেকদিন আগে মেঘনা নদীর ধারে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বাস করতো। তারা ছিল স্বামী-স্ত্রী। সুখে-দুঃখে দিন কাটে—

—এ কি! রূপকথা বল্‌ছো না কি?

—তুমি অত চঞ্চল কেন? ধৈর্য্য ধরে কোন কথা মন দিয়ে শুন্‌তে পারো না? বয়সে নবীন সংসারে তুমি একাই নও আরও অনেকে আছে। যৌবনের গর্ব্বও করো না—কারণ, যৌবন একদিন সকলেরই আসে। আর তা' ছাড়া—

—শিবের গীত সুরু করলে যে! গল্প বলো!

—বল্‌তে দিচ্ছ কই? তারপর সেই ছেলেটি আর মেয়েটি একদিন গেল আর এক দেশে—তাদের দূর-সম্পর্কের মাসীর বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে। সেইদিন অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা শুয়ে শুয়ে অনেক রকম প্রেমের কথা বল্‌লো।—অনেক সুখের, অনেক সম্ভাবনার। পরদিন ভোরবেলা মেয়েটি উঠে দেখ্‌লো তার স্বামীকে কারা যেন কেটে রেখে গেছে। দেহের থেকে গলাটা আলাদা হয়ে পড়ে আছে—বিছানাময় রক্তের ঢেউ বইছে। এই পর্য্যন্ত বলে মেয়েটি একটু থামলো।

—এ যে রীতিমত রোমাঞ্চকর গল্প দেখ্‌ছি। তারপর?

—তারপর আর কি। মেয়েটিরও সংসারে আর কেউ ছিল না, মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করলো।

—আপদ চুকলো। এ গল্প তোমার ভাল নয়।

—কেন?

—এতে রোমান্স কই? জানতো আজকাল রোমান্স নইলে গল্প হয় না?

—সেতো মাসিক-পত্রের গল্প। জীবনের সত্যিকার গল্পে ওসব থাকে না। কিন্তু আমার গল্প তো এখনও শেষ হয় নি।

—বলো কি! মরবার পরও ক্রমশঃ?

—হ্যাঁ। যে মেয়েটির কথা আমি তোমাকে বল্‌লাম আমিই সেই।

বিস্ময়ে সমীরণ একেবারে খাটের উপর উঠে বস্‌লো। দেখ্‌লো তখনও সেই মেয়েটি তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। তার উপস্থিতিটা খুব যেন স্পষ্ট নয়, একটা কুয়াসার পরদা যেন তার সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো আছে, ধর্‌তে গেলেই যেন মিলিয়ে যাবে। কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দর তার দেহ-সুসমা—অনবদ্য তার রূপ।

—সত্যি বল্‌ছো?

—হ্যাঁ, আর তুমি সেই স্বামী! মনে পড়ছে না তোমার?

—না।

সমীরণের যেন দমবন্ধ হ'য়ে এল। এ বলে কি? কত জন্মের আগেকার কথা—কবে সে কোন্ স্মরণাতীত যুগে তারা ছিল স্বামী-স্ত্রী। তারই জের টেনে টেনে চল্‌বে না কি এ জন্মের জীবন যাপন? না না, এসব আর সে শুন্‌বে না। সমীরণের একবার মনে হলো চেঁচিয়ে সুচিত্রাকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু একটা অতলস্পর্শী অবসাদে ধীরে ধীরে তার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে আসছে···

—তারপর শোন তার পরের জন্মের কথা। এই কোলকাতারই বুকে বালীগঞ্জ অঞ্চলে প্রকাণ্ড এক ব্যারিষ্টারের মেয়ে হ'য়ে জন্মালাম। আমার নাম হ'ল মালবিকা—বুঝলে? মালবিকা। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সৌভাগ্য-সম্পদে একেবারে আকণ্ঠ ডুবে রইলাম। আমার রূপের যে কী সুখ্যাতি ছিল তখন, তা' তোমাকে কী বল্‌বো? কত যুবক ঘুরতো আমার পেছনে পেছনে আমার এতটুকু হাসির মূল্যে নিজেদের বিকিয়ে দেবার

জন্য। তাদের মধ্যে দু'জনকে আমার খুব ভাল লাগ্‌তো—একজনের নাম সুহাস আর একজনের নাম বিভব। আমি এটা বেশ বুঝ্‌তে পারতাম আমাকে পাবার জন্য তাদের মধ্যে কি রকম ভাবে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে—কি রকম ভাবে তারা পরস্পরকে ছলনা কর্‌ছে আমার এতটুকু সাহচর্য্য লাভের জন্য, আমার একটা গান শোন্‌বার জন্য, আমাকে নিয়ে পার্কে বেড়াবার জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তোমাকে বল্‌তে ভুলে গেছি আমি খুব ভাল গান গাইতে পারতাম। এমন সময় একদিন সুহাস তার বন্ধু পরিমলকে নিয়ে এল আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। উন্নত বলিষ্ঠ চেহারার একটি যুবক—ঠোঁটের কোণে সব সময়ের জন্য একটা বাঁকা হাসি খেলা কর্‌ছে, যেন প্রতি-নিয়ত সে সমস্ত সংসারকে উপেক্ষা কর্‌ছে। তাকে দেখবামাত্র আমি মরলাম। আমার যা' কিছু বিদ্যা, যা' কিছু গর্ব্ব, যা' কিছু আভিজাত্য সব লোপ পেল। ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পার্‌ছো—আমি প্রেমে পড়লাম। আর শুন্‌বে, না থাম্‌বো ?

—না, থেমো না, বলে যাও—কিন্তু জানিয়ে রাখ্‌ছি গল্পটা আমার এখনও ভাল লাগ্‌ছে না। তবে রোমান্স আস্‌ছে বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আস্‌ছে। তারপর শোন। সেদিন ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। বিকেল থেকে নেমেছে প্রবল বৃষ্টি। বাড়ীতে কেউ নেই—বাবা মা গেছেন সিনেমায়। একলা আমার বেড্‌রুমে চুপ করে বসে বসে 'শেলী' পড়ছিলাম। এমন সময় দরজা ঠেলে পরিমল ঘরে ঢুকলো, 'রেন' কোটটা খুলে একপাশে রেখে মৃদু হেসে বল্‌লো—বাড়ীতে কেউ নেই বুঝি ?

বল্‌লাম—না।

—যাক্‌, ভালই হ'ল। অনেকদিন থেকে সুযোগ খুঁজ্‌ছি তোমাকে একটা কথা বল্‌বার। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, আজও বলা হয়ে উঠলো না।

—নিশ্চিন্ত মনে আজ তুমি উচ্চারণ করতে পারো সে কথা। আমি বল্‌লাম।

—নিশ্চয় বল্‌বো। কিন্তু তার আগে আমাকে সেই গানটা শোনাও মিলি—সেই 'মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর !' গানের সুরে মনটাকে তৈরী করে নিই সে কথা বল্‌তে।

আমি গাইলাম। গান থেমে গেল। জান্‌লায় কাঁচের সার্শির উপর ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। বাগানের পুকুর থেকে গাছের পাতা নড়ার আর ঝিঁঝি পোকার অদ্ভুত কোলাহল উঠ্‌ছে। সমস্ত পৃথিবী আজ যেন উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে—বরষার ধারাপাতে।

পরিমল উঠে এসে আমার কাছে বস্‌লো। তারপর ধীরে ধীরে আমার একখানি হাত নিজের কোলে টেনে নিয়ে তার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লো—মিলি, চলো আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

—সে কি !

—হ্যাঁ। তুমি আমাকে সব দিয়েছ, কিন্তু দাও নি কেবল তোমার নির্জ্জনতা। যে একান্ত নির্জ্জনতায় তোমাকে আমি পরিপূর্ণ উপভোগ কর্‌তে পারবো, আমায় সুযোগ দাও সে নির্জ্জনতায় তোমাকে নিয়ে যাবার। মিলি !

—কিন্তু তা' কী ক'রে হয় পরি দা' ? বাবা মার মনে বুড়ো বয়সে এতখানি আঘাত দেওয়া কি উচিত হবে ? তার চেয়ে তুমি কেন বাবার কাছে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব করো না।

—সে কি আমি করি নি মিলি ? তিনি কিছুতেই মত দিলেন না।

—আমি চুপ করে রইলাম। মনে হ'ল—পরিমল যদি আজ আমাকে ছেড়ে কোথাও চলে যায়, তবে আমি এক দণ্ডও বাঁচবো না। কিন্তু—

—মিলি ! আমার কথার একটা জবাব দাও মিলি !

—আমাকে ভাব্‌বার সময় দাও পরি দা' ! পরশু তোমাকে জবাব দেবো। ও গো বাবু সাহেব ! শুন্‌ছো, না ঘুমোলে ?

—না ঘুমোই নি শুন্‌ছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি বলো তার পর কী হ'ল।

—অনেক ভেবেও কিছু কূল-কিনারা না পেয়ে তার সঙ্গে চলে যাওয়াই স্থির করলাম। তারপর একদিন গভীর রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে পরিমলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম অজানা ভাগ্যের উদ্দেশ্যে। সারা রাস্তা পরিমলের বুকের মধ্যে মাথা রেখে কেবল কেঁদেছি। মধুপুরে এসে —এই পর্য্যন্ত বলেই মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল।

সমীরণ এতক্ষণ তন্ময় হ'য়ে শুনছিল। হঠাৎ থেমে যেতেই সে বল্‌লো—তারপর?

কোন সাড়া নেই। বিছানার উপর উঠে বসে সমীরণ চেঁচিয়ে ডাক্‌লো—কোথায় গেলে গো? তারপর কী হ'ল বলে যাও না। দেখো দেখি কী মুস্কিল! এই জন্যেই আমি মোটে গল্প শুন্‌তে চাই না। আরে! তারপর কী হ'ল বলে যাও।

—কী হয়েছে, এরকম চ্যাঁচাচ্ছো কেন? আমাকে ডাক্‌ছিলে? কেন? জল খাবে? সুচিত্রা ঘুম ভেঙে বিছানার উপর উঠে বসেছে।

সমীরণ ভাল করে চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লো—ভোর হয়েছে। পূবদিকের জান্‌লার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে— দূরের আকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে...

পরের রাত্রি...

দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে সুচিত্রা এস্রাজটা নামিয়ে বস্‌লো। বাজনা আরম্ভ হ'ল, কিন্তু সমীরণ যেন অন্যদিনের মত আজ কিছুতেই মন দিতে পারছে না। তার কেবলই মনে হচ্ছে গত রাত্রের সেই কুয়াসা-ঘেরা মেয়েটির কথা, অর্দ্ধ-সমাপ্ত গল্পের কথা—কেন যে হঠাৎ অমন করে থেমে গেল সে...

—এ কি! তুমি শুন্‌ছো না আজ?

—শুন্‌ছিতো।

বাজনা বেজে চল্‌লো।

সুচিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু সমীরণ এখনও জেগে আছে। রাত্রি বারোটা বেজে চল্লিশ হয়েছে। সমীরণের সমস্ত চেতনা উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে একটা বাজার অপেক্ষায়। সেই অপরিচিতার মুখে-চোখে কেমন যেন একটা মোহ আছে—যা' কিছুতেই মন থেকে যেতে চায় না। জন্ম-জন্মান্তরের সুখ-দুঃখের কাহিনীগুলি এমন অবলীলাক্রমে সে বলে—যার মধ্যে সত্যের ছোঁয়াচ আছে পূরোমাত্রায়, শুন্‌তে শুন্‌তে মন চলে যায় কোন অজানা লোকে—অবাস্তবতার জগতে—সেখানে তুমি ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। তোমার উপস্থিতির উত্তাপে সেখানে ঘটবে জীবন-লীলার নানা প্রকাশ।...আচ্ছা, মেয়েটি কি কোনো অতৃপ্ত আত্মা? পৃথিবীর পরমায়ুর সম্ভোগে মেটে নি যার জীবন-তৃষ্ণা—সেই কি এল আজ সমীরণের আধতন্দ্রা-জড়িত দৃষ্টির সম্মুখে জীবনের বিচিত্র-কাহিনী শোনাতে? অদ্ভুত!

টং করে একটা বাজলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সমীরণের দৃষ্টি পায়ের দিকে পড়লো। দেখ্‌লো আজও মেয়েটি ঠিক্ গতরাত্রের সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। পরণে একখানি চওড়া কালোপাড় শাড়ী—মুখে সেই রকম অপরিচিত রহস্যময় হাসি···

বাইরে ভীষণ বৃষ্টি নেমেছে। ক্ষণে ক্ষণে প্রবল গর্জ্জনে মেঘ ডেকে উঠ্‌ছে। অন্ধকারময় শূন্য চকিত হ'য়ে উঠছে বিদ্যুৎ আলোকে। তারই আলোতে জান্‌লা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের গাছগুলো উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে এই দুর্য্যোগের রাত্রে। সমীরণ চুপ করে পড়ে রইল।

—কি গো। কথা কইছ না যে! কাল গল্পটা শেষ করে যাই নি বলে রাগ করেছ বুঝি? আচ্ছা, আচ্ছা, আজ নিশ্চয় শেষ করে যাব সবটা। আরম্ভ করবো? রাগ যায় নি এখনও? বেশ, আমি তবে চলে যাচ্ছি।

সমীরণ অভিমানভরে বল্‌লো—চলে যাবারতো কোন দরকার নেই। বলো না তোমার গল্প—আমি কি শুন্‌বো না বলেছি?

এইতো বেশ। তা' নয় মুখ গোমড়া করে থাকা। মা গো মা, সে বড় বিশ্রী! শোন। তারপর মধুপুরে এসে একটা ছোট্ট বাড়ীভাড়া করে বাস করতে লাগ্‌লাম আমি আর পরিমল। অনেকদিন এইভাবে কেটে যাবার পর

একদিন সকালে উঠে টের পেলাম যে, আমি সন্তান-সম্ভাবিতা। পরিমলকে একথা জানাতেই তার মুখটা শাদা হ'য়ে গেল। মুখ শাদা হ'য়ে যাবার সঠিক কারণটা তখনও বুঝ্‌তে পারি নি; পারলাম তখন—যখন একদিন সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে পরিমলকে দেখ্‌তে পেলাম না। অনেক খোঁজের পর একজন এসে খবর দিলো যে, সে তাকে ষ্টেশনের দিকে যেতে দেখেছে।

—সর্ব্বনাশ! তারপর? সমীরণ অস্ফুটে বল্‌লো।

খিল্‌খিল্‌ খিল্‌খিল্‌ করে মেয়েটি হেসে উঠ্‌লো। অত্যন্ত তীব্র তীক্ষ্ণ একটা হাসি। যে হাসি শুন্‌লে হাড় হিম হ'য়ে আসে, অথচ ভালও লাগে সে হাসি শুন্‌তে।

—অমন চম্‌কে উঠ্‌ছো কেন? খুব থ্রিল আছে গল্পটায়, না?

সমীরণ চুপ করে রইল।

—তারপর শোন। মধুপুরে থাক্‌তে পরিমলের এক বন্ধু জুটেছিল তার নাম সুশান্ত। সে এসে আমাকে সান্ত্বনা দিলো, ভবিষ্যতের আশ্বাস দিলো, এবং দিন সাতেক পরে পরামর্শ দিলো আমার পেটের সন্তানটি নষ্ট করে ফেল্‌তে। তা' হ'লে তার আর আমার মিলনের পথে কোন বাধা থাক্‌বে না—কারণ পরিমলের সঙ্গে আমার তো বিয়ে হয় নি। তারপর একদিন তার সঙ্গেই গেলুম গোপনে এক ডাক্তারের বাড়ীতে। তিনি ছেলেকে তো মার্‌লেনই—এমন কি আমাকেও মার্‌লেন।

—তুমিও মর্‌লে?

—হ্যাঁ মরলুম। আচ্ছা, বলতো—তুমি কোন্‌ ছেলেটি, পরিমল না সুশান্ত?

—ঠিক্‌ বুঝতে পারছি নে।

—তুমি সুশান্ত।

—ও!

অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌...

একটু পরে মেয়েটি বল্‌লো—আমার এ জন্মের গল্প শুন্‌বে না?

—আর একটা জন্মও আছে না কি?

—নেই? ও মা বলো কি! এইটেই তো সব চেয়ে সুখের জন্ম। প্রথমটায় ছিল দারিদ্র্য, দ্বিতীয়টায় লোক-লজ্জা, আর তৃতীয়টায় শুধু প্রেম। ঘর-সংসার, অর্থ-সামর্থ্য, সুন্দর স্বামী, পরিপূর্ণ ভালবাসা, সব পেয়েছি। কিন্তু আমি ঠিক্‌ জানি—এবারও তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দেবে। অনেক লাঞ্ছনা, হয়ত বা মৃত্যুও।

—এ জন্মে আমার কাছ থেকে তোমার ভয় কিসের? তোমাকেত আমি চিনি না।

—খুব চেনো। চেনো না আবার! আমার নাম শুনলেই এক্ষণি বুঝ্‌তে পার্‌বে আমি তোমার কতখানি পরিচিত।

—তোমার নাম তবে বলো।

—বলি। আমার নাম সুচিত্রা।

—কী কী কী বল্লে? চীৎকার করে সমীরণ খাট থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লো। ঘরময় কেউ কোথাও নেই। যেখানে সে মেয়েটী দাঁড়িয়েছিল, সেখানে আলনার মাথায় সুচিত্রার একখানা চওড়া কালোপাড় কাপড় শুকোচ্ছে। উন্মাদের মত সমীরণ আবার চেঁচিয়ে উঠলো—বলে যাও, এ নাম কেন বল্‌লে তুমি?

কড়কড় করে কোথায় বাজ পড়লো। তার ভয়ানক শব্দে সুচিত্রা বিছানার উপর উঠে বসেছে। সমীরণকে মেঝের উপর পায়চারী করতে দেখে সে নেমে তার হাত ধরলো।

—আমি এ সব বিশ্বাস করি না চিত্রা। সমীরণ গর্জ্জন করে উঠলো।

—কী বিশ্বাস করো না?

কী বিশ্বাস করে না সে কথা গুছিয়ে বল্‌তে গিয়ে সমীরণ কোন কথা খুঁজে পেলো না! শুধু বিমূঢ় চোখে সুচিত্রার দিকে চেয়ে রইল।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ভবেশের ভাগ্যোদয়

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল

অরুণের পিসি অরুণকে দিয়া গেলেন কলিকাতায় একখানি বাড়ী, আর আমাকে দিয়া গেলেন ল্যাজ মোটা একটি বিড়াল।

অরুণরা আমাদের ঠিক্ পাশের বাড়ীটিতে থাকিত। সম্প্রতি তাহার পিতা বালীগঞ্জে বাড়ী করিয়া সেইখানে উঠিয়া গিয়াছেন। এখানকার বাড়ীতে ভাড়াটে বসিয়াছে। অরুণের পিতার সংসারে নিজের স্ত্রী পুত্র ছাড়া একটি বিধবা ভগ্নীও থাকিতেন।

বিধবা ভগ্নীটি (অর্থাৎ অরুণের পিসি) তাই বলিয়া ভায়ের গলগ্রহ নয়। তাঁহার হাতে নগদ কিছু টাকা ও নিজের নামে ছোট একখানি বাড়ী ছিল। ভায়ের সংসারে তাঁর—এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিড়ালেরও এতটুকু আদর-যত্ন কম হইত না।

পিসির বিড়ালটি ছিল শিকারী। অবশ্য শুধু গোঁফ দেখিয়াই যে মালুম করিয়াছিলাম তাহা নয়। মালুম করিয়াছিলাম তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া।

আমাদের বাড়ীতে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য বরাবরই ছিল। এক একটি ইঁদুরের কলেবর প্রায় বিড়ালেরই মত। এ হেন ইঁদুরের দৌরাত্ম্য কম পড়িল সেইদিন—যেদিন পিসির বিড়ালটি আমাদের বাড়ী প্রথম আসিয়া পদার্পণ করিল।

কাজেই বিড়ালটি যে শীকারী, এ কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই।...

পয়সা থাকিলে বাড়ীর বিড়ালটিরও যত্ন হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই।

পিসির বিড়াল দুধ মাছ খাইয়া দিব্য পুরুষ্ট্‌টি হইয়া উঠিয়াছে। তবে ইদানীং কিছু যেন বেশী আয়েসী হইয়া পড়িয়াছে। আর খাবার লোভটাও যেন বাড়িয়াছে। পিসির দেওয়া দুধ ভাত খাইয়াও জানালা টপ্‌কাইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া হানা দিতে শিখিয়াছে। তাড়া করিলেও নড়িতে চাহে না। নড়িলেও গতি এত মন্থর যেন দয়া করিয়া অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন।

মূষিক জাতির কল্যাণ করুক তাহাতে লাভ বই লোক-সান নাই। তবে ভাজা মাছে চক্ষুদান করিলে রাগ হয় বই কি। কাহার-ই বা না হয়?

যাহা হউক, সামান্য একটা বিড়াল লইয়া কি পাড়া-পড়সীর সহিত ঝগড়া করিব? নিজেরা যথাসম্ভব সাবধান হইতাম, যাহাতে বাছাধন মাছের কাঁটা ছাড়া ছালে না দাঁত ঠেকাইতে পারে।

এই রকম করিয়া কয়েক বছর কাটিল।...

বালীগঞ্জের বাড়ী তৈয়ারী হইলে অরুণরা সেইখানে চলিয়া গেল। গেল না কেবল বিড়ালটা।

পিসি কত সাধ্যসাধনা করিলেন। বিড়ালটি কিন্তু এ বাড়ী ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে রাজী নয়। অবশেষে হাপুস নয়নে পিসিকে একাই যাইতে হইল।

বিড়ালটি রহিয়া গেল খালি বাড়ীতেই।...

শীকারী হইলে কি হয়, বিড়ালটার বুদ্ধি-শুদ্ধি নিশ্চয় ধারালো নয়। সে হয় তো ভাবিয়াছিল খালি বাড়ীতেও দুধ ভাত আপনা হইতেই জুটিবে। তাই সে নড়িতে চাহে নাই। দুধ ভাত আপনা-আপনি জুটিলে যে কেউ সখ করিয়া দশটা-পাঁচটা করিত না, বিড়াল হইয়া কেরাণী-জীবনের এই রহস্যই বা সে কেমন করিয়া বুঝিবে?

যাই হোক্, পরে যখন সে আপনার ভুল বুঝিল, তখন তাহার আমাদের বাড়ী ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। কাজেই দু'বেলার আহারের চেষ্টায় তাহাকে আমাদের বাড়ীতেই ঘুরিতে হইত।

খাটিয়া খাওয়া আর বসিয়া খাওয়ার তফাৎ যে কি তাহা বিড়ালটিকে দেখিয়া উপলব্ধি করিলাম। দুধ ভাত পুষ্ট বাছাধনের অমন নধরকান্তি সাতদিনে 'মরকুটে' মারিয়া গেল। বলা বাহুল্য, পিসির মত আদর-যত্ন সে আমাদের বাড়ীতে মোটেই পাইত না।...

ওদিকে বালীগঞ্জে গিয়া বড়লোকের বাড়ীতে অরুণের বিবাহ হইল। কন্যাপক্ষ হইতে যাহা পাইয়াছিল তাহার উপর পিসি অরুণকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীটি যৌতুক-স্বরূপ দান করিয়া কাশীবাস করিতে চলিয়া গেলেন।

তেলা মাথাতেই তেল পড়িয়া থাকে। অরুণের পৈতৃক ও বিবাহের অনেক টাকা থাকা সত্ত্বেও তাহাকেই আবার একখানি বাড়ী দেওয়া!

হায় রে, আর আমার বরাতে!

শুধুই বিড়ালটা!

অরুণদের এ বাড়ীটায় যাঁরা ভাড়া আসিয়াছেন, তাঁদের ঝামেলা অত্যন্ত কম। কেবল স্বামী-স্ত্রী ও পুরাতন একটি চাকর।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই চুল পাকিয়াছে। স্বামী পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন। শুনিতে পাই, হাতে কিছু টাকাও আছে। যাই হোক্, পড়সী মিলিয়াছে ভাল।

কিন্তু এদিকে বিড়ালটা একদিন এক কাণ্ড বাধাইল। শুইতে গিয়া দেখি কাদাপায়ে সে আমার বিছানায় উঠিয়া কাদার দাগ রাখিয়াছে।

স্পর্দ্ধা বটে! মাছের কাঁটা খাইয়া এত আয়েস করিতে চায়!

মোটা একটা লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়া করিলাম। অন্য সময় তাড়া দিলে সে বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ না করিলেও এবার তাড়া করার গুরুত্ব লাঠির স্থূলত্ব দেখিয়াই অনুমান করিয়া লইয়াছিল। তাই সে 'ম্যাও' ম্যাও' করিয়া ছুটিতে ছুটিতে জানালা গলিয়া কার্নিস বাহিয়া পাশের বাড়ীর জানালায় গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল একেবারে সেই ভদ্রলোকটির ঘাড়ে।...

ভদ্রলোক তখন জানালায় পিঠ্ দিয়া হাওয়া খাইতেছিলেন। সাম্‌নে একগ্লাস জল রাখিয়া গৃহিণী পান ছেঁচিতেছিলেন। এমন সময় বিড়ালটি তাহার পিঠ্ আঁচড়াইয়া, জলের গেলাস উল্‌টাইয়া দিয়া ভিতর দিকে ছুটিয়া গেল।

ভদ্রলোক চটিয়া লাল। হইবার কথাই তো। পিঠ্‌টা তখনও জালা করিতেছে। তাহা ভিন্ন কাঁচের গেলাসটা ভাঙিয়া ঘরময় জলে জল।

কিন্তু তাহাতেও আমার কেমন হাসি আসিল। আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

আমাকে হাসিতে দেখিয়া ভদ্রলোকের রাগ বোধ করি বৃদ্ধি পাইল। তিনি বলিলেন, কি রকম লোক মশায় আপনি? ঘরে বিড়াল ছুঁড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছেন?

যথাসাধ্য হাসি দমন করিলাম। বলিলাম, সে কি মশায়, আমি কি কর্‌লাম?

কর্‌লেন না তো কি? দেখ্‌ছেন পিঠ্‌টা কি করে দিলে?—বলিয়া পিঠ্ ফিরাইয়া ক্ষতস্থান দেখাইলেন।

পাছে দু'জনে বচসা হয় এই ভাবিয়া ভদ্রলোকের গৃহিণী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, তা' উনি কি করবেন? বিড়ালটা লাফিয়ে পড়লো তা' উনি কি করবেন? উনি তো আর বিড়ালকে শিখিয়ে দেন নি তোমার পিঠ্ আঁচড়ে দিতে।

গৃহিনীর কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া ভদ্রলোক কিছু শান্ত হইলেন। কেবল আপন-মনেই বলিতে লাগিলেন, দেখি, একটু টিন্‌চার আইডিন যদি থাকে ঘরে—কি জানি, সাবধানের মার নেই।...

কিছুদিন পরের কথা।

বাজার হইতে ফিরিতেছি, এমন সময় পাশের বাড়ীর সেই ভদ্রলোকটির সহিত দেখা। তিনিও বাজার করিয়া ফিরিতেছেন।

সাম্‌নাসাম্‌নি হইতেই তিনি বলিলেন, ভবেশবাবু, কিছু মনে করবেন না। সেদিন হঠাৎ রাগ হয়ে গিছ্‌লো।

বলিলাম, আজ্ঞে, সে কি কথা। রাগ তো আপনার হবারই কথা। আচমকা ঘাড়ের উপর গিয়ে বিড়ালটা…

না না, ও কিছু নয়। তা' ছাড়া, বিড়ালের দ্বারা আজকাল কাজ পাচ্ছি অনেক। দিনকতক ইঁদুরের যা' দৌরাত্ম্য হয়েছিল—তাই দেখুন না ওর জন্যে আলাদা বরাদ্দ করেছি।

ভাবিলাম, বিড়ালটার বরাত জোর আছে। পিসি গেল তো আবার একটি পিসে জুটাইল।…

সাধু সঙ্গে লোক সাধু হয়। ভাগ্যবান বিড়ালের সঙ্গ-গুণে আমারও বুঝি বা ভাগ্য ফিরিল। কেন না, বিড়ালের দৌলতে ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে আমারও নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। প্রায় শনিবার শনিবার নি-খরচায় মাংস সাঁটিতে লাগিলাম।

শুক্‌না মাছের কাঁটার পরিবর্ত্তে নধর ছাগশিশু পাইয়া বিড়ালটাও ওদিকে আবার দিব্য পুরুষ্টু হইয়া উঠিতে লাগিল।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব-বৈচিত্র্য

কুমারী রমা দেবী

—দোষ স্বীকার করাবার ঔষধ—

আঙ্গুল এবং কাণের সাহায্যে বুঝি আর দোষী ধরা গেল না—তাই দুর্ব্বৃত্তেরা যা'তে মিথ্যা বল্‌তে না পারে সেজন্য এক নূতন উপায় বা'র করা হয়েছে। উপায়টী হচ্ছে একটী ঔষধ। সিকাগোর মিঃ লিওনার্ড কিলার এইটীর আবিষ্কারক। এই ঔষধ দিয়ে কয়েকটী 'ইনজেক্‌সান্' দিলেই দুর্ব্বৃত্তদের উপর ঔষধ প্রভাব বিস্তার করে। যখন শরীরের মধ্যে এই ঔষধের কাজ আরম্ভ হয়, তখন দুর্ব্বৃত্তেরা না কি স্পষ্ট সত্য কথা ছাড়া আর কিছু বল্‌তে পারে না।

—অদ্ভুত রূপ পরিবর্ত্তন—

ওয়্যার নামে একটী বারো বছরের মেয়ে প্রতি বৎসরেই তার রূপ বদলায়। তিন বছর বয়স থেকে সে প্রত্যেক বছরে একবার করে ডাইনীর রূপে রূপান্তরিত হয়। তার দেহ কুঞ্চিত, চর্ম্ম লোল হয়ে যায়। মুখের মাংস কুঁচকে, পিঠ বেঁকে তার সমস্ত দেহ শীর্ণ হয়ে যায়। এইরকম ডাইনীর রূপে তা'কে কিছুকাল থাক্‌তে হয়—গ্রীষ্মকালে আবার সে তা'র স্বাভাবিক মূর্ত্তি ফিরে পায়। এটা কি রোগ তা' এখনও কেউ বল্‌তে পার্‌ছে না। এই বছরেও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু রোগের আক্রমণ হয়েছে বড় বেশীরকম। ডাক্তারেরা বলেছেন যে, মেয়েটী আর পূর্ব্বেকার রূপ ফিরে নাও পেতে পারে।

—সমুদ্র বক্ষে ভ্রমণ—

যা' একান্ত অবিশ্বাস্য তা' আজ সম্ভবে পরিণত হয়েছে। একরকম জুতা বেরিয়েছে যা' পরে জলের উপর দিয়ে অনায়াসে বেড়ান যায়। ফ্রিড্রিক্ ওয়ালদার নামক জনৈক জার্ম্মাণ এর আবিষ্কারক। ঐ জুতাগুলো ছোট ছোট নৌকার মত। প্রত্যেকটীর ওজন প্রায় সাড়ে সাতাশ সের। জুতাগুলো ছ' ফুট লম্বা, আট ইঞ্চি গভীর ও দশ ইঞ্চি চওড়া। জুতো পায়ের সঙ্গে একটা চামড়া দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এই জুতার ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক হাতে ছ' ফুট লম্বা একটা বাঁশ নিতে হয়। বাঁশগুলোর দু'ধারে লম্বাকৃতি ধাতু লাগান। লম্বাকৃতি ধাতু দিয়ে যেই জলের উপর জোর দেওয়া হয়, তখনি খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। ফ্রিড্রিক্ সাহেব ডোভার প্রণালী পার হয়েছেন। এবার ইংলিশ চ্যানেল পার হবার চেষ্টা কর্‌ছেন। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হিসেবে তিনি পাঁচ ঘণ্টায় ঐ খাল পার হতে পার্‌বেন আশা করেন।

রমা দেবী

হতভাগিনী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ষ্টেশন হইতে ত আর কম দূরের পথ নয়। সেই যে সুরকীর ছোট্ট লাল রাস্তাটী আঁকিয়া-বাঁকিয়া মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই মাঠই খাঁটী দুই মাইল যাইয়া 'বুড়ো শিবের বটগাছ তলায়' পৌঁছাইয়াছে। তাহার পরই গ্রাম।

মাঠের মাঝ দিয়া পায়ে-চলা সরু পথ, আশপাশে আম-জামের গাছ। লম্বা লম্বা তাল খেজুরেরও অভাব নাই। তাহা ছাড়া, ঝোপ্‌ঝাপ্‌ মাঝে মাঝে ত আছেই। টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া তখনও গাছের পাতাগুলি হইতে বৃষ্টির জল ঝরিতেছিল।

চৌধুরী-বাবুরা মাঠের মাঝে সেই যে ইট কাটিয়াছিলেন, তাহার বড় বড় গর্ত্তগুলি বর্ষার জলে ডুবিয়া গিয়াছে। অজস্র নালের ফুল ফুটিয়া সেগুলি ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। ষ্টেশন ফেরতের দল সময়-অসময়ে তাহাতে মুখ হাত পা ধুইয়া লয়। গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়েরা ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া নাল ছিঁড়ে।

বর্ষাকাল। সকল সময়েই ঝুপ্‌ঝাপ্‌, টুপুরটাপুর করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ষ্টেশনের লাল রাস্তাটুকু বাদে আর সকল রাস্তাই জল-কাদায় ডুবিয়া আছে; মাঠ ত প্রায় ভাসিয়াই গিয়াছে—কিন্তু উপায় কি? উহারই মধ্য দিয়া ছপরছপর করিতে করিতে ষ্টেশনে যাইতে হয়। মাঠের পথে যাইবার সময় গা-টা ভয়ে ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে থাকে। মাঠটা খাঁ খাঁ করিতেছে; যাইবার সময় দম আটকাইয়া যায়। কিন্তু এখন আর সে ভাব নেই। হল্‌দে নীল গলাওয়ালা বড় বড় ব্যাঙের ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙোর ডাক আর কোথাও ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, এই মাঠের মাঝে যে বেশ ভাল লাগে, তাহা 'বসুন্দিয়া'র লোকেরা ভাল করিয়াই বুঝে।

গাড়ী দিনে দুইটা করিয়া আসে। সেই কাক ডাকার আগে একটা, আর একটা সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেলেই। সমস্ত দুপুরটা মাষ্টারবাবু নাক ডাকাইয়া ঘুমান।

নিবারণ ভাবিতেছিল, এ' একরকম মন্দ নয়। বড় লোক জামাই খেয়াল করিয়াই বিধবা শাশুড়ী, কচি বউটাকে শান্তিতে দুই মুঠা খাইতে দেয় না। নহিলে, সেই শনিবারে লিখিল, আজ যাইতেছি, তাহার পর পাঁচদিন চলিয়া গেল, তা' এই পাঁচদিনের মধ্যে একদিনও বাবুর সময় হইল না।

"নাঃ, এই জল কাদা ভেঙ্গে আর পারি নি বাপু, পায়ে ঘা ধরে গেল। এই রে—যাঃ, এলো বৃষ্টি। দুর্য্যোগ! দুর্য্যোগ!"

কড়কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় করিয়া ভীষণ বৃষ্টি। বিড়বিড় করিতে করিতে নিবারণ ছাতি খুলিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া গ্রামে ঢুকিল। হাতের লণ্ঠনটার চিম্‌নি কালি পড়িয়া একদম কালো হইয়া গিয়াছে। ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি ঘোর অমাবস্যা, তাহার উপর আবার ভীষণ কালো মেঘ। কিছুই নিবারণ দেখিতে পাইতেছিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া আন্দাজে পথ চলিতে লাগিল।

ছিদাম বৈরাগীর পাঠশালা, দীনু ভায়ার মুদীখানা, চৌধুরীদের জলের কল, সবই সে একরকম করিয়া পার হইয়াছে। এইবার ডাহিনের ঐ ছোট সুড়ি পথ দিয়া, বড় রাস্তা না ধরিয়া, আড়াআড়ি ছিরিমন্ত দা'র পাকের ঘরের পিছন দিয়া বড় বাড়ীর বৈঠকখানার সাম্‌নে উঠিবে। তাহার পরের রাস্তাটুকু পার হইয়াই ত উমাদের বাড়ী। আঃ, এক ছিলিম খাইয়া সে পা দুটাকে জিরান দিবে!

তিন পোতায় তিনখানা ঘর। কর্ত্তার আমলে করা হইয়াছিল। কর্ত্তা মারা যাইবার পর উত্তরের ঘরটায় চাবি পড়িয়াছে। পূবের বড় ঘরটা ভাল মজবুত বলিয়া উমার মা, উমা আর উমার দেড় বছরের ছেলে নাণ্টুকে লইয়া থাকেন। পশ্চিমের ছোট ঘরটায় থাকে নিবারণ।

আজ পাঁচদিন হইল উত্তরের ঘরটা খোলা হইয়াছে, ঝাড়িয়া-মুছিয়া রাখিতে হইবে আবার; কারণ, জামাতা বিশ্বপতি আজ প্রায় দুই বৎসর পরে শ্বশুরালয়ে আসিতেছে। বিশ্বপতি ধনীলোক। কলিকাতায় তিন-চারখানা বাড়ী আছে। সংসারে নিজে ছাড়া আর কেহ-ই নাই। কর্ত্তা বহুভাগ্যের ফলে এই জামাতা-রত্নটী পাইয়াছিলেন।

বিবাহের পর উমার ভাগ্যে মাত্র একবৎসর স্বামীসঙ্গ লাভ হইয়াছিল। তাহার পর কর্ত্তার মৃত্যু-সংবাদে উমা নিজের দেশে চলিয়া আসে; বিশ্বপতিও ব্যবসা করিতে লক্ষ্ণৌ চলিয়া যায়। তাহার পর এই দুই বৎসরের মধ্যে কোন খোঁজখবর নাই। একখানি পত্র দিয়া উমাকে প্রীতি-সম্ভাষণ করা দূরে থাক্, কোন সংবাদটী পর্য্যন্ত সে লয় নাই। ইহার মধ্যে কত কাণ্ড ঘটিয়া গেল, নাণ্টু হইল, তথাপি সে আসিল না। নাণ্টু হওয়ার সংবাদে সামান্য আনন্দ-প্রকাশ করিয়া নবশিশুকে সুদূর লক্ষ্ণৌ হইতে সে একটী উপহার পাঠাইয়াছিল মাত্র। উমা সাদরে উহা গ্রহণ করিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু পরক্ষণেই দুর্জ্জয় অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিল। দুই-জনার একমাত্র শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু নাণ্টু, তাহাকেও সে একবার দেখিতে আসিতে পারিল না। ছেলেটা বাঁচিল কি মরিল কোন খবরই লইল না। নাণ্টু ত 'বাপু বাপু' করিয়াই অস্থির।

তারপর আস্তে আস্তে সবই সহিয়া গেল। মনকে সে বুঝাইল, আসিবার কথা বলিলেই ত হয় না। কোথায় সেই লক্ষ্ণৌ, আর কোথায় এই 'বসুন্দিয়া।' তাহার পর হয় ত কাজকর্ম্মে এমনই জড়াইয়া পড়িয়াছেন যে সুযোগ পাইতেছেন না। এই সব গণ্ডগোলের মধ্যে আসেন কি করিয়া?

বহুদিন পরে এই পাঁচদিন হইল কলিকাতা হইতে বিশ্বপতির চিঠি আসিয়াছে, "আগামী শনিবার যাইতেছি। ষ্টেশনে ডুলিসহ লোক রাখিও।" ডুলিসহ লোক এই পাঁচদিন ধরিয়া যাইতেছে-আসিতেছে, কেবলমাত্র তিনিই আসিতেছেন না।

নিবারণ আজও ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে উমার মা বলিলেন, "নিবারণ এলে?"

উমা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া খিল্ খুলিয়া দিল। কিন্তু নিবারণ একা। রোজকার মত আজও সে ভাবিল যে, ডুলি হয় ত পিছনে পড়িয়াছে; নিবারণ খবর দিতে আগে আসিয়াছে—কিন্তু উহা চিন্তাতেই শেষ হইয়া যায়।

দাওয়ায় উঠিতে উঠিতে নিবারণ বলিল, "না মা, আজও ত এলেন না। নিজে সকল গাড়ি দেখ্লাম, মাষ্টারবাবুর কাছে শুধালাম, কিছুই হলো না।"

তাহার কথায় আজ উমার রাগ হইয়া উঠিল। চড়া-স্বরে সে বলিল, "কী বা তুমি পার। হয় ত বাজারে তামাকের আড্ডায় বসে গেছ্লে। যে বৃষ্টি। হয় ত ষ্টেশনে কাউকে না দেখে ঐ ট্রেণেই আবার চলে গেছেন।"

নিবারণ হাসিয়া কহিল, "শুন্লে কথাটা, তোর বিশ্ব-পতির জন্যে এই এত জল-কাদা ভাঙ্ছি, আর তুই-ই বল্লি এই। কথায় বলে যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। সেই আধঘণ্টা আগে গিয়ে বসেছিলুম, তবু—"

উমার মা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ নিবারণ, তুই ই বল্তো কেন এল না? চিঠি দিলে, অথচ এই পাঁচদিন ধরে কোন খবরই নাই। কোন অসুখ-বিসুখ কর্লে কি না কে জানে!"

উমার মনে সুযোগ বুঝিয়া কত চিন্তাই না হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। কলিকাতা ত রোগের ডিপো। যদি কিছু—না না, কি সর্ব্বনেশে কথা! নাঃ, ভাবনায়-চিন্তায় এবার সে মারা যাইবেই।

নিবারণ কহিল, "তা' অসুখ-বিসুখও ত হ'তে পারে।"

"কিন্তু তা'হ'লে একটা চিঠি দিত"—অন্যমনস্ক হইয়া উমার মা কহিলেন।

নিবারণ বলিল, "অসুবিধায় পড়েছেন নিশ্চয়। বউ, ব্যাটা, শাশুড়ী, এঁরা ত আর পর নয়। একটা খবর দিতেন-ই। নেহাৎ অসুবিধা—"

নিবারণের এই আল্গা কথায় কেহ-ই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

নিবারণ কর্ত্তার আমলের লোক। কর্ত্তার অনুগ্রহে বাঁচিয়া আসিয়াছে। উমাকে সে বড় ভালবাসে। অত ভাবিয়াও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে নাই; হাসিয়া উমাকে সে বলিল, "বুঝ্লি উমা, বিশ্বপতি কি না, তোর ত আর একার নয়—অন্য সবাই তাই ছাড়্তে চায় না।"

নিজের রসিকতায় সে হাসিতে হাসিতে তামাক সাজিতে বসিল।

অন্যদিন হইলে উমা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত; কিন্তু আজ তাহার এ সব ভাল লাগিতেছিল না। কত চিন্তা যে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে!

কোন কূল-কিনারা না পাইয়া উমার মা কহিলেন, "কি করা যায় বল্তো নিবারণ? আমি বলি, তুই কোলকাতায় চলে যা' কাল, যেয়ে দেখে-শুনে আয় গে।"

উমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। কোনরকমে নিজেকে সাম্লাইয়া বলিল, "নিবারণ দা' কি বাড়ী চিনে বা'র কর্তে পার্বে। কোনদিন যায় নি।"

একটা জোরে টান দিয়া, হুঁকা রাখিয়া নিবারণ বলিল, "না, পার্বো না। দশ-পনেরটা মেয়ে-মদ্দকে বিন্দেবন ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম, আর কোলকাতায় যেয়ে একটা বাড়ী খুঁজে বা'র কর্তে পার্বো না? তুই ঠিকানা দে, পারি কি না দেখ্।"

নিবারণ বড় ঘরের বাহির হয় নাই। একবার গ্রামের অন্যসব যাত্রীদের সহিত সে বৃন্দাবন গিয়াছিল। সেই অবধি কলিকাতা বলো, বম্বে বলো, দিল্লী বলো, সবারই সহিত সে বৃন্দাবনের তুলনা দিয়া উহার গুরুত্ব বুঝাইয়া দেয়। তাহার ধারণা বৃন্দাবন হইতে অন্য কোন সহর বড় হইতে পারে না।

একটু ভাবিয়া নিবারণ কহিল, "হ্যাঁ মা, এক কাজ কর্লে হয় না? কালকের গাড়ীটাও দেখি, যদি না আসে, রামু কা'র ছেলে পরশু যাবে কোলকাতায়, তার সঙ্গে গেলেই দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবে সব। তাই করি, কি বলো?"

মা হতাশ হইয়া বলিলেন, "যা' ভাল বোঝ কর। বাছার জন্যে মনটা আমার ভারী খারাপ হয়েছে।"

উমার আর কথা কহিতে ইচ্ছা হইল না, চোখের জল সে কিছুতেই থামাইতে পারিতেছিল না।

নিবারণ হুকা হাতে করিয়া নিজের ঘরে যাইতে যাইতে বলিল, "তুমি ভেব নি মা, ভেব নি। কথায় বলে দুঃখ্যুর কথা বাতাসের আগে ছোটে। এত লোক আস্ছে-যাচ্ছে, একটা সংবাদ পেতামই। নিশ্চয়ই কাজের ভিড়ে আছেন।" আরও কি বিড়বিড় করিতে করিতে সে নিজের ঘরে ঢুকিল।

অন্য পাঁচদিনের মত উমা আজও খিলটা বন্ধ করিয়া দিল। নান্টু বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে, প্রতিদিনের মত মাথা নাড়িয়া টানিয়া স্বর করিয়া বলিতেছে, "বা—পু, বা—পু!"

উমা চোখের জল ফেলিল। নান্টুর এই মিষ্ট ডাক বিশ্বপতি যদি শুনিত।

মা বলিলেন, "আর দেরী করে কি হবে। যা' খেয়ে নিগে।"

নাকের জলে চোখের জলে দুইটি গিলিয়া উমা শুইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বালিশ ভিজিয়া গেল।

বৃষ্টির আর বিরাম নেই। গাড়িখানি ভিজিতে ভিজিতে ষ্টেশনে ঢুকিল।

নিবারণ বুড়া মানুষ, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। নাঃ, বিশ্বপতি আজিও আসিল না। মাষ্টারবাবু ধম্‌কাইয়া বলিলেন, "রোজ রোজ আমায় জ্বালায় কেন বাপু? তোর দাদাবাবু ত আমায় টেলিগ্রাম করেন নি।"

বুড়ার চোখ দিয়া আজ সত্যসত্যই জল পড়িল। বাড়ী গিয়া কী যে সে বলিবে।

এমন সময় চৌধুরীদের ছোটবাবুর সহিত দেখা। তিনি কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। নিবারণ কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "নিবারণ যে, বিশ্বপতির খোঁজে বোধ হয়?"

নিবারণ বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এঁজ্ঞে, এই পাঁচদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছি—"

বাধা দিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "কাল আস্‌ছে, দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে।"

নিবারণের দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল; উল্লসিত হইয়া সে বলিল, "ভাল আছেন তা'হ'লে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ কালই দেখ্‌তে পাবে।"

ছোটবাবু চলিয়া গেলেন।

আঃ, পাষাণের ভার নামিয়া গেল! ঊর্দ্ধশ্বাসে নিবারণ গৃহের দিকে ছুটিল।

উমা আজ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়ী চলিয়া যাইবার শব্দ পাইয়া মা-ও আসিয়া বসিয়াছেন। দূরে নিবারণের আলো দেখা যাইতেছে। আজ যেন সে দৌড়াইয়া আসিতেছে। উমার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত চলিতে লাগিল। তবে কি—নাঃ, কই, পিছনে ত কেহ নাই! এম্‌নি করিয়া হতাশ হইতে সে অভ্যস্ত হইয়াছে। দূর হইতেই নিবারণ জোরে বলিয়া উঠিল, "বাঁচা গেল!"

বিড়বিড় করা তাহার স্বভাব, আরো যেন কি বলিল।

বাঁচা গেল! উমা স্থির করিল, তাহা হইলে বোধ হয় আসিয়াছেন। ডুলি বড় রাস্তা ধরিয়া আসিতেছে। নিবারণ দা' খবর দিতে দৌড়াইয়া আসিয়াছে। সে উত্তেজনায় বৃষ্টির মধ্যে উঠানে নামিয়া পড়িল।

নিবারণ কাছে আসিয়া মা'র উদ্দেশে বলিল, "বাচ্‌লুম মা, ইষ্টিশনে চৌধুরীদের ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা, তিনিই বল্‌লেন, 'কাল আস্‌ছেন দাদাবাবু, ওঁর সাথে দেখা হয়েছিল কি না।"

মা আনন্দে ঈশ্বরের নাম করিয়া উঠিলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাঁচলুম! ওঃ, কি চিন্তাতেই না ধরেছিল!"

উমা অতি অল্প সময়ের জন্য মুস্‌ড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বিপুল আনন্দ আসিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

আজ আর উমার কথা ফুরাইতেছে না। এই কয়েক বছরের মধ্যে সে কখনও এত কথা কহে নাই। একবার নিবারণকে যাইয়া বলিতেছে, "কাল পানিকচু কেটে নিয়ে আস্‌বে, ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়ে রাঁধ্‌বো। ভারি পছন্দ করেন ওটা।" একবার মায়ের সহিত কি কি রাঁধিবে তাহার পরামর্শ করিতেছে। অন্যদিন যাহা হউক্ দুইটা মুখে দিত, আজ তাহাও হইয়া উঠিল না। কত কাজ যে তার বাকী।

চুপিচুপি নান্টুকে ঘুম হইতে জাগাইয়া অজস্র চুম্বনে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। নান্টুর সহিত আজ তাহার কথা যেন ফুরাইতে চাহে না, "এই ওঠ্, ওঠ্, আর ঘুমুস্ নি। কাল দেখিস্ কে আসে।"

নান্টু মাথা দুলাইয়া বলিল, "বাপু!"

হাসিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া উমা কহিল, "হ্যাঁরে বোকা ছেলে। বাপু নয়, বাবা। এত বয়স হলো তবুও কথা কইতে শিখ্‌লি নি। কাল আস্‌বে দেখিস্। তোর জন্য বল আন্‌বে, বাঁশী, বিস্কুট, আরও কত কি। আস্‌লে কি করবি বল্‌তো? হাঁ করে রইলো দেখো। কিছু জানিস্ না। এলেই গড় হয়ে প্রণাম করবি—বুঝ্‌লি? বল্‌বি, বাবা কেমন আছ, আমার জন্যে কি এনেছ, এতদিন আস নি কেন? পার্‌বি বল্‌তে?

দেড় বছরের নান্টু বেশী কিছু বুঝিল না, মায়ের হাসি দেখিয়া সেও হাসিয়া কুটিকুটি। মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল, "বা—পু বা—পু!"

"হ্যাঁরে, কাল আস্‌বে। নাও, এখন ঘুমোও। কাল আবার সকালে উঠ্‌তে হবে, গন্ধ তেল দিয়ে চান্ কর্‌তে হবে, সাবান মাখ্‌তে হবে—"

নান্টুকে ঘুম পড়াইয়া সে নান্টুর নূতন জামা সেলাই

করিতে বসিল—নইলে বাপের কাছে কি পরিয়া যাইবে? কতদিন বাদে আসিতেছেন।

কাজকর্ম্ম সারিয়া উমা যখন শুইতে গেল, তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ঘুম আর আসিতেই চাহে না। আজ তাহার কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

...এম্‌নি এক বর্ষাকালে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। যেদিন তাহাদের বিবাহ হয়, সেদিন কী বৃষ্টি! উঠান ত জলে জলাকার। অতি কষ্টে জল সরাইয়া, কাদার উপর বালি ছড়াইয়া বিবাহ-সভা বসিল। নিশি দা', বিনু দা' তাহাকে পিঁড়িতে বসাইয়া বিশ্বপতির চারিধারে ঘুরাইতে লাগিল—একবার পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়াছিল আর কি! মা গো, কী লজ্জা! শুভদৃষ্টির সময় ঘোম্‌টার ফাঁকে বিশ্বপতি তাহাকে এমন এক ভেংচি কাটিল যে, সে রীতিমত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। উত্তরের বাড়ীর রাঙা পিসী কি কাণ্ডটাই না করিল সেদিন! এক বাটি ঘৃত, কতকগুলি রসগোল্লা-সন্দেশ লইয়া পলাইতেছিল, এমন সময় নন্দা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পিসীর সে কী রাগ! অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে তিনি ছুটিলেন। বাসরঘরে বিশ্বপতি যা' কাণ্ডটা করিল! তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নাটুকে-ভঙ্গীতে বলিল, "আমি বিশ্বপতি শঙ্কর, তুমি আমার পর্ব্বত-নন্দিনী উমা! আমার জন্যে ত তোমার জগতে আসা।" নন্দা, হাসি, অনি আড়ি পাতিয়াছিল, তাহারা ত হাসিয়াই খুন!

শেষ রাত্রের দিকে উমা ঘুমাইয়া পড়িল।

নিবারণ আগে আগে আসিতেছে, পিছনে ডুলিতে বিশ্বপতি। সঙ্গে কত জিনিস-পত্র। বিশ্বপতি ডুলি হইতে নামিয়া মা'কে প্রণাম করিল।

নান্টুটা ভারি দুষ্ট, বাপের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "বাপু!"

বিশ্বপতি তাহাকে কোলে তুলিয়া চুম্বনে চুম্বনে মুখ ভরিয়া দিল।

উমার আজ আর অভিমান নাই। গড় হইয়া প্রণাম করিয়া সে বলিল, "কি এতদিনে মনে পড়লো?"

"কি করবো উমা, কাজের যে ভীড়! নইলে এক বছর কি করে যে কেটেছে, তা' তোমায় কি বল্‌বো। তোমাদের না দেখে শরীরটা আমার অর্দ্ধেক ক্ষয়ে গেছে।"

উমা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, "ইঃ, শরীর ক্ষয়ে গেছে না হাতী! যে মোটা হয়েছে—বাপ্‌রে! খোট্টার দেশে থেকে থেকে হয়েছে আর কি।"

বিশ্বপতিও গম্ভীর হইবার ভান করিয়া বলিল, "তাই না কি? তবে আমার শরীর নষ্ট হ'লে তোমার ভাল লাগ্‌তো।"

উমার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল; বলিল, অমন কথা বলো না বল্‌ছি। জানো না তোমার জন্যে ভেবে ভেবে শান্তিতে ছুটো—সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বিশ্বপতি আদর করিয়া কহিল, "এই রে, ছিচকাঁদুনীর মত অমনি কাঁদ্‌তে বস্‌লে! আর এমন কথা বল্‌বো না গো, বল্‌বো না। নাও, খেতে দাও, খিদে পেয়েছে আমার।"

হঠাৎ স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। উঃ, এত বেলা হইয়া গিয়াছে! ঘর সাজান, রান্না করা, এমন কত কাজ যে বাকী। উমা উঠিয়া দেখে জানালা দিয়া বিছানার উপর রৌদ্র গড়াইয়া পড়িয়াছে। নান্টু উঠিয়া বসিয়া তাহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নাঃ, বড় বেলা হইয়া গিয়াছে।

নিবারণ ডাকাতের বিলে কচু কাটিতে গিয়াছে; মা বাড়ীতে নাই, পাড়ায় খবর দিতে গিয়াছেন। উমা উঠিয়াই ভাল কাপড়চোপড়গুলি বাহির করিতে লাগিল। আজ একটু রৌদ্র দেখা গিয়াছে, সেগুলি রৌদ্রে দিতে হইবে। কতদিন ঐ সব ব্যবহার করে নাই।

তারপর ময়লা কাপড়গুলিতে উমা সাবান দিতে বসিল। ময়লা কাপড় আবার বিশ্বপতি দেখিতে পারে

না। কাপড় কাচিতে কাচিতে সে গতরাত্রের স্বপ্নের কথাটা চিন্তা করিতেছিল। শেষ রাত্রের স্বপ্ন! উহা কি বিফল হইতে পারে।

নিবারণ হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। একহাতে তাহার একবোঝা পানিকচু, আর একহাতে একখানা খামের চিঠি। চিঠিখানা উমার হাতে দিতে দিতে বলিল, "উমার ডাক বিশ্বপতি এইবার শুনেছেরে, এই নে। আর দ্যাখ, মা'কে বলিস, আমি চল্লেম জেলে-পাড়ায় মাছ আন্‌তে। একটা রুই, আর একটা ইলিশের কথাই বলেছি। ক'জন বা লোক, সেই যথেষ্ট—কি বলিস্?"

উমা ঘাড় নাড়িল।

নিবারণ চলিয়া গেল। হঁ্যা, ঠিক্‌ই—এই ত বিশ্বপতির হাতের লেখা। খামখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সে কতই না ভাবিল—হয় ত বিশ্বপতি লিখিয়াছে, উমা, তোমাদের কতদিন পরে দেখিব, ভারী আনন্দ পাইতেছি। আচ্ছা, বাচ্ছাটা তোমার মত নিশ্চয়ই হইয়াছে। হাঁটিতে পারে, না এখনও হামাগুড়ি দেয়? তোমার জন্য ভাল এক স্যুট্ গহনা লইয়া যাইতেছি; নিজের হাতে সাজাইব—এমন আর কত কি হয় ত লিখিয়াছেন।

চিঠিখানি খুলিয়া উমা দেখিল, উহা খুব দীর্ঘ নয়। রুদ্ধনিশ্বাসে সে পড়িতে লাগিল—

প্রিয় উমা,

তোমরা আমার জন্য খুব ব্যস্ত আছ নিশ্চয়—কিন্তু তোমাদের সহিত দেখা করা হয় ত আর সম্ভব হইবে না। তোমার নিকট কিছুই গোপন করিব না। আজ তোমাকে বাধ্য হইয়া এই সংবাদটী জানাইতে হইতেছে—যদিও আমি জানি, উহা তোমার নিকট মৃত্যুর মত নির্ম্মম ঠেকিবে। কিন্তু সহ্য তোমাকে করিতেই হইবে; কারণ, উহা ভিন্ন তখন আমার আর অন্যগতি ছিল না। কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে আমি লক্ষ্ণৌতে মরণাপন্ন হইয়াছিলাম। একমাত্র সন্ধ্যা তাহার আপ্রাণ সেবা দিয়া, ভালবাসা দিয়া আমাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। তাহার সেবা না পাইলে বান্ধব-বিহীন সেই সুদূর লক্ষ্ণৌতে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইত। সুতরাং তাহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা দেখান উচিত। সন্ধ্যার পিতামাতা কেহ-ই নাই। লক্ষ্ণৌতে সে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিত। সেই আত্মীয়টীর বিশেষ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমি সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়াছি। বিশেষতঃ, সন্ধ্যা আমাকে পতিরূপে পাইতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিল। তুমি ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইও না—কারণ, পৃথিবীতে মানুষের নিজের সুখ-শান্তি একমাত্র কাম্য। আমারও সেই সময় সুখ-শান্তির বড় দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। একমাত্র সন্ধ্যারই চেষ্টায় আমি রোগমুক্ত হইতে পারিয়াছি। এজন্য তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিও এবং সন্ধ্যার সহিত আমার বিবাহ ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিও। আমি স্বামী, সুতরাং তোমাদের প্রতি অবিচার করিব না। মাসে মাসে তোমাদের মাসহারা পাঠাইয়া দিব। আগের তারিখে ডাক্তার যাইতে বারণ করিয়াছিলেন; আজও আর যাওয়া হইল না—কারণ, সন্ধ্যাকে দুঃখ দিয়া আমার যাওয়া উচিত নহে। আমরা শীঘ্র হাওয়া বদ্‌লাইতে দার্জিলিং যাইব। ইতি,

শ্রীবিশ্বপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ—আমার নিকট তোমার পত্র দিবার দরকার নাই—আমি নিজেই সর্ব্বদা তোমাদের খবর রাখিব। সন্ধ্যা যদি জানিতে পারে যে, আমার আর একটি স্ত্রী আছে, তাহা হইলে বড়ই বিপদ।

সামান্য দুই কথায় বিশ্বপতি স্বামীর কর্ত্তব্য সারিয়া লইল। কিন্তু উমা? হতভাগী যে এ কয়টা বৎসর আশায় আশায় রহিয়াছে—স্বামী আসিবে! কত আনন্দই না তাহার হইয়াছিল! তাহার কল্পনা, তাহার রঙিন স্বপ্ন, সাজানো সংসার এক নিমিষের ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল! তাহার স্বামী, যাহাকে সে দেবতার আসনে বসাইয়াছিল—সেই বিশ্বপতি আজ তাহাদের নিকট হইতে কতদূরে! কত সহজে, কত সরলভাবে সে ওই কথাগুলা লিখিতে পারিয়াছে—উমা, নাণ্টু যেন তাহার কেহই নয়! উঃ, স্বপ্ন হইলেও ইহা সহ্যাতীত!

"মা গো!" তীব্র যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট শব্দ করিয়াই সংজ্ঞাহীনা উমা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। আজ অশ্রু তাহার শুকাইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র দুই ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল ধীরে ধীরে গণ্ড বাহিয়া নামিয়া আসিল।

বাহিরে তখন উমার মা কাহাকে যেন চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "ও কৈলেস, বাবা, দু'খানা ভাল দই দিয়ে যেও। জামাই আসছে—হ্যাঁ, নাণ্টুর বাবা। সে বড্ড ভালবাসে দই।"

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আশার ছলনা

শ্রীচারুশীলা মিত্র, বাণী-বিনোদিনী

হেমন্তের অপরাহ্ন। শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র কলেজ হইতে বাসায় আসিতেছিল। সেদিন ছিল শনিবার। থিয়েটারের দিন। আবার সেদিন কি একটা নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় হইবে বলিয়া প্লাকার্ড দেওয়াতে তখন হইতেই থিয়েটার প্রাঙ্গণে লোকসমাগম সুরু হইয়াছিল। টিকিট বিক্রয় অনেক পূর্ব্ব হইতেই হইতেছিল। নারায়ণ পল্লীস-স্তান। গ্রাম্য-বিদ্যালয় হইতে সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন হইল কলিকাতায় আসিয়া আই-এস্-সি পড়িতেছে। বয়সেও যেমন তরুণ, কৌতূহল তাহার হৃদয়ে সেই অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে ছিল। পূর্ব্বে আর কোনদিন সে কলিকাতায় আসে নাই; তাই কলিকাতা সহরটা তাহার কাছে আরব্য উপন্যাসের রূপকথার মায়াপুরীর ন্যায় অনুমান হইয়া থাকে। যাহাই তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহারই ভিতর সে যেন একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখে। এই রঙ্গালয়ের দ্বারে প্রচুর লোকসমাগম কিছুক্ষণ সে গেটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। রাজপথে দাঁড়াইলে গাড়ী চাপা পড়িতে হইবে। এখানেও নিতান্ত নিরাপদ নহে; মিনিট দুই যাইতে না-যাইতেই গোটা দুই-তিন লোকের ধাক্কা খাইতে হইল।

নারায়ণ ভাবিতেছিল, কি এমন মজা এখানে আছে যে, টাকা দিয়া এত লোক দেখিতে আসে। তাহাদের গ্রামে পূজাপর্ব্ব-উপলক্ষে এ্যামেচার পার্টীর থিয়েটার হয়—তাহাতে টিকিট ক্রয় করিতে হয় না—তথাপি ইহার শতাংশের একাংশ লোকও সমবেত হয় না। আর অর্থ ব্যয় করিয়া এত লোক কেন এখানে আসে। তাহার সহধ্যায়ী বন্ধু দেবেন সহসা তথায় আসিয়া তাহাকে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"কি রে, যাবি না কি থিয়েটার দেখ্‌তে?"

নারায়ণ উত্তর করিল—"না ভাই, টাকা নেই।"

—"ওঃ, কতই বা টাকা! একটা বই ত নয়। তোর কাছে না থাকে, আমার কাছে আছে ত—পরে আমায় দিস্ 'খন। আয় ভেতরে আয়। অমন করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হাত-পা নিয়ে ফির্‌তে হবে না। এ তোর সেই ধাপধাড়া বামুন-পাড়া নয়—এ কোলকাতার সহর।"

এই কথা বলিয়া দেবেন নারায়ণের একখানা হাত ধরিয়া একপ্রকার টানিতে টানিতেই গেটের ভিতর লইয়া গেল এবং তাহাকে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া স্বয়ং টিকিট ক্রয় করিতে গেল; কিন্তু একটাকার টিকিটগুলি সব পূর্ব্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল—দেবেন চারটাকা দিয়া দুইখানি টিকিট ক্রয় করিয়া আনিল। বলিল—"একটাকার টিকিট সব ফুরিয়ে গেছে; দু' টাকার টিকিটই নিয়ে এলুম—কি করা যায়, ফিরে ত আর যাওয়া যায় না। বসা জাগ্‌গে চ'। ছ'টা থেকে প্লে আরম্ভ হবে; পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে—আর কতক্ষণই বা।"

দেবেন অগ্রসর হইল। নারায়ণ তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল নীরবেই। মনে যেন কিন্তু সে বেশ একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল। দু' টাকা দিয়া টিকিট কিনিবার কি প্রয়োজন ছিল? না হয় সে ফিরিয়াই যাইত। তাহার পিতা শুনিলে কি বলিবেন? দেবেন ধনীর পুত্র, তাহার পক্ষে সকলই সম্ভব; মাসে মাসে পিতা তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রেরণ করেন। সে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান; তাহার পিতা শুধু উচ্চশিক্ষা দিবার মোহেই তাহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন এবং অতিকষ্টে মাসে মাসে কুড়িটি করিয়া টাকা দেন। কলেজের বেতন এবং মেসের খরচ দিয়া তাহার কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না। কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক পয়সার মুড়ীমাত্র সে জল খায়; কোনদিন দুই পয়সার সন্দেশ কিনিয়াও খায়

নাই। তাহার কি না দুই টাকা ব্যয় করিয়া থিয়েটার দেখা! ছি ছি! তাহার পিতা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন? কি বলিবেন? সে কি উত্তর দিবে তাঁহাকে?

দুইজনে পাশাপাশি বসিল। দেবেন পকেট হইতে দেয়াশলাই এবং সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া টানিতে লাগিল। নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল—"খাবি?"

ত্রস্তে নারায়ণ উত্তর কহিল—"রক্ষে কর। তুমি কি জান না—আমার ওসব অভ্যেস নেই?"

মৃদু হাসিয়া দেবেন প্রত্যুত্তর করিল—"অভ্যেস কি আর মায়ের পেট থেকে পড়েই হয়?"

কিঞ্চিৎ পরে নারায়ণ বলিল—"আচ্ছা, ঐ যে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষেধ', তবে তোমরা ওসব খাও কি করে?"

মৃদু হাসিয়া দেবেন উত্তর দিল—"লেখা অমন কত থাকে। ওসব মেনে চল্‌তে গেলে প্রাণ বাঁচান দায়।" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি কয়েক টান টানিয়া লইয়া হাতের ফাঁকে গোপনে রাখিল।

নারায়ণ বলিল—"নিয়ম না মেনে চলা কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত।"

হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দেবেন বলিল—"গুড বয়! সুশীল ও সুবোধ বালককে সকলেই ভালবাসে।"

নারায়ণ কোনও উত্তর করিল না। প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গেল। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া পর্দ্দা উঠিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে আরও দুইবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। পর্দ্দা উঠিল; প্লে আরম্ভ হইল। দৃশ্যের পর দৃশ্য, অঙ্কের পর অঙ্ক চলিতে লাগিল। নারায়ণ একেবারে বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে অভিনয় দর্শন করিতে লাগিল। সে যাহা দেখিল, তাহা কল্পনারও অতীত ছিল তাহার। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে কোন নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে! কোথায় তাহার সেই বামন-পাড়ার এ্যামেচার পার্টি—আর কোথায় এই কলিকাতার পাবলিক্ থিয়েটার! এক একটা দৃশ্য তাহার দুই চক্ষুকে যেন ধাঁধা লাগাইয়া দিতে লাগিল! ইহা যে বাস্তব নহে, একথা তাহার যেন বিশ্বাসই হইতেছিল না। আসলের অনুকরণ কি করিয়া এমন অবিকল হয়? কিছু পূর্ব্বে দুইটা টাকা ব্যয় হইয়া গেল বলিয়া সে যে মনে মনে ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহার মনের অবস্থা ঠিক্ ইহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। এক্ষণে মনে হইতে লাগিল সার্থক আজিকার এই অর্থব্যয়! এত সুন্দরও থিয়েটারের মধ্যে আছে! তাহার কাছে এতদিন এমন একটা জিনিষ একেবারেই অজ্ঞাত ছিল! যবনিকা পড়িয়া গেল। তথাপি নারায়ণ একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—নূতন দৃশ্য দেখিবার আশায়।

দেবেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"চ', হাঁ করে আর দেখ্‌ছিস কি?"

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল—"শেষ হয়ে গেল না কি?"

সহাস্যে দেবেন কহিল—"না, তোর জন্যে বেলা সাতটা অবধি হবে। আস্‌তেই ত চাইছিলি না, দুটো টাকা খরচ হলো বলে কি রাগ! আমি যাই জোর করে আন্‌লুম, তাই না। বাপ, দেখা ত নয়—যেন গেলা! এইতেই বলে পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়া।"

দুই

মানুষের অন্তরে অযথা সখের উদ্রেক হইলে সে সখ মিটাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনেক। নারায়ণের সে অর্থ কই? কয়েক ঘণ্টা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখিয়া নারায়ণ এরূপ মুগ্ধ হইয়া গেল যে, প্রতি সপ্তাহেই তাহার অভিনয় দেখিবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল এবং মধ্যে মধ্যে না গিয়াও থাকিতে পারিল না। পিতৃদত্ত অর্থে শিক্ষা এবং ভরণপোষণের ব্যয় ছাড়া আর কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না, কাজেই দেবেনের কাছে কিছু ঋণ হইয়া পড়িল।

ঋণের কথা কিন্তু সে পিতাকে জানাইতে পারিল না। তাঁহাকে প্রতারণাপূর্ব্বক, অর্থাৎ পীড়া হইয়াছিল বলিয়া ঔষধ-পথ্য, ডাক্তারের ফি ইত্যাদি মিথ্যা হিসাব দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেবেনের ঋণ পরিশোধ করিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এখন আর থিয়েটারের দিক্ দিয়াও যাইবে না। কিন্তু লঘুচিত্ত

নারায়ণ নিজের এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না। অল্প কয়েকদিন পরেই আবার সে দেবেনের নিকট ঋণ করিয়া তাহার সহিত থিয়েটার দেখিতে সুরু করিয়া দিল। থিয়েটার দেখিতে গেলেই শুধু হয় না, তথায় পাঁচটা সৌখীন যুবক আসে, তাহাদের বেশভূষা, তাহাদের চুলের বাহার, তাহাদের সিগারেট টানা ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেকটিই যেন নারায়ণকে অসভ্য পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়া বলিয়া বিদ্রূপ করে। নারায়ণ সাধ্যমত তাহাদের অনুকরণেরও প্রয়াস পায়। এই সকল কারণে এখন আর তাহার পিতৃদত্ত সামান্য টাকায় সঙ্কুলান হয় না। দেবেন তাহাকে কোথাও গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিবার পরামর্শ দিল। সে তাহাতে সানন্দে সম্মত হইল এবং যদি কোথাও দেবেন ইহা করিয়া দিতে পারে সেজন্য অনুরোধও করিল।

নারায়ণের সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই একটা শিক্ষকের কাজ মিলিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পর দেবেন বেড়াইয়া আসিয়া নারায়ণকে কহিল—"ওরে, একটা দাঁও আছে।"

নারায়ণ ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

—"যা' খুঁজছিলি—'টিউটারি'।"

—"কোথায়?" বলিয়া নারায়ণ উত্তরের প্রতীক্ষায় দেবেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দেবেন বলিল—"এক ব্যারিষ্টারের বাড়ী। তাঁর একটি মেয়েকে পড়াতে হবে। পঁচিশ টাকা করে দেবেন।"

—"মেয়ে" বলিয়া নারায়ণ চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণকে নির্ব্বাক দেখিয়া দেবেন কহিল—"কি চুপ করে রইলি যে? রাজী নোস্?"

—"বাঃ! রাজি থাক্‌ব না কেন? আমি ত খুঁজ্‌ছিলুমই। মেয়ে তাই বল্‌ছি।"

—"মেয়ে বলেই পঁচিশ টাকা দেবে। নইলে আজকাল ত 'টিউটারে'র ছড়াছড়ি। বি-এ, এম-এ পাশ করেও পঁচিশ টাকার 'টিউটারি' পায় না। আর মিষ্টার সাহা আমার বাবার বন্ধু, তাই।"

তিন

নারায়ণ তাহার নবপ্রাপ্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইল। প্রাসাদতুল্য সুন্দর অট্টালিকা। তথায় গেটের পার্শ্বে দ্বারবান উপবিষ্ট। সসঙ্কোচে নারায়ণ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এতবড় বাড়ী এবং এই প্রকার গৃহ-সজ্জা সে জীবনে এই প্রথম দেখিল। একজন ভৃত্য তাহাকে উপরে যাইবার সিঁড়ি দেখাইয়া দিল। সমস্ত সিঁড়িগুলি মূল্যবান বস্ত্রে মণ্ডিত। তাহার উপর পদক্ষেপ করিতে নারায়ণের সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। সিঁড়ির পাশেই এক সুবৃহৎ কক্ষে মীরার পাঠাগার। অপর একজন ভৃত্য সেই কক্ষ দেখাইয়া দিল। কক্ষতলে সুন্দর সুদৃশ্য গালিচা পাতা। তাহার উপর কৌচ, কেদারা, বুক-কেস্ প্রভৃতি যথাস্থানে রক্ষিত। দেয়ালের চারিদিকে চারখানা বৃহৎ আয়না। সে যে দিকে চাহিয়া দেখে, সেই দিকেই নিজের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পায়। এ যেন তাহার যুধিষ্ঠিরের সভায় দুর্য্যোধনের অবস্থার মত হইল। মধ্যস্থলে একটা টেবিল; টেবিলের উপর পাঠোপযোগী পুস্তক, খাতা-কাগজ, কালী-কলম, পেন্সিল সবই রহিয়াছে। টেবিলের পাশে পাশাপাশি দুইখানি কেদারা। ভৃত্য তাহারই একখানিতে বসিবার জন্য নারায়ণকে বলিল এবং টেবিলের উপরস্থিত ঘণ্টাটা লইয়া বাজাইয়া দিল। বাজাইবামাত্র অপর পার্শ্বের কক্ষ হইতে দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া একটি তম্বঙ্গী তরুণী বাহির হইয়া আসিল এবং যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া কহিল—"নমস্কার।"

তারপর সে নারায়ণের পার্শ্বস্থিত কেদারায় বসিয়া নিজের পাঠ্যপুস্তক লইয়া পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিল। নারায়ণ পড়াইবে কি, তাহার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তরুণীর সু-সজ্জিত বেশভূষায় ও অঙ্গের 'সেণ্টে'র সৌরভে গৃহ উজ্জ্বল এবং পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নারায়ণ নিজের অর্দ্ধমলিন জামা কাপড়, ছিন্ন পাদুকা এবং তরুণীর বেশের দিকে চাহিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, তরুণী

কি মনে করিবে! বিশেষতঃ, ভিত্তি গাত্রস্থিত আয়না-গুলির উপর নিজের প্রতিবিম্ব তাহাকে যেন নীরব উপহাসে ধিক্কার দিতেছে বোধ হইল। সে কি ঐ সুসজ্জিতা তরুণীর পার্শ্বে বসিবার উপযুক্ত—যাহার অঙ্গসৌরভ পারিজাত কুসুমের সৌরভবৎ এ গৃহ নন্দনকাননে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে! আর তাহার সদ্যস্নাত কেশ মধ্য হইতে সর্ষপ তৈলের কি বিশ্রী গন্ধ নির্গত হইতেছে! তরুণী কি তাহাকে 'পাড়াগেঁয়ে অসভ্য বর্ব্বর' ভাবিয়া মনে মনে ঘৃণা করিবে না? তাহার নিজের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার সব কিছুই আজ তাহার কাছে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল—এমন কি নামটা পর্য্যন্ত! ছি ছি, বাবা কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুনিয়ায় আর নাম পান নাই? নাম রাখিয়াছেন কি না নারায়ণ!

কিন্তু ক্রমশঃ তাহার এ ভাব দূর হইয়া গেল। নিজের নাম এখন সে 'শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে এন্ মুখার্জ্জি' লিখিয়া থাকে। ইংরাজী বুক্‌নি-মিশ্রিত বাক্য অনর্গল বলিয়া যায়। মিষ্টার সাহার ভৃত্যবর্গ নিরক্ষর হইয়াও যখন ইংরাজী বুক্‌নি-মিশ্রিত কথা বলিতে পারে, তখন তাহার ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে তাহা না পারা নিতান্ত লজ্জাকর বলিয়াই সে মনে করে। আজকাল মাতৃভাষায় কথা কহিলে হয় ত লোকে মনে করিতে পারে যে, সে মূর্খ, ইংরাজী বিদ্যা মোটেই জানে না।

পাঠশেষে মীরার সহিত সে দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করে। মীরাও মাষ্টার-মহাশয়ের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে; আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে অস্থির হইয়া পড়ে। দৈবাৎ কোন কারণবশতঃ একদিন যদি নারায়ণ আসিতে না পারে, তবে বিস্তর অনুযোগ করে। নারায়ণ পিতৃপ্রদত্ত এবং নিজের উপার্জ্জিত অর্থে বেশভূষার ব্যয় একপ্রকার চালাইয়া লয়। এখন আর তাহাকে অর্দ্ধমলিন বস্ত্র অথবা ছিন্ন পাদুকা পরিধান করিতে হয় না। সাবান, 'সেণ্ট' মাখাও কোনদিন বাদ যায় না। বাড়ীতে যাওয়া আর তাহার ঘটিয়া উঠে না। পূজার অথবা গ্রীষ্মের অবকাশে পিতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে যদিই বা যায়, তবে দুই-চারিদিন থাকিয়াই নানা অছিলায় সে চলিয়া আসে।

যথাসময় সে আই-এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইল। পিতার আনন্দের সীমা নাই। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, পুত্র বি-এ পরীক্ষাটায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই মনোমত একটী বধূ আনিয়া তাঁহার অন্ধকার গৃহ আলোকপূর্ণ করিয়া তুলিবেন। পাত্রী একটি মনে মনে নির্ব্বাচিত করিয়াও রাখিয়াছিলেন। পুত্র বি-এ পাশ করিতে পারিলেই যে সে একজন কেষ্ট-বিষ্টু হইয়া উঠিবে, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

চার

বর্ষাকাল। সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছে। যথা-সময় নারায়ণ মীরাকে পড়াইতে আসিতে পারে নাই। সন্ধ্যার পর আসিল। মীরা কতকগুলা চীনের বাদাম ভাজা মুঠার মধ্যে ধরিয়া কতকগুলা মুখে পূরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পড়িতে আসিল। পড়া শেষ হইলে সে ভিতরে চলিয়া গেল। কিন্তু বৃষ্টির বেগ আরও অধিক হইল। নারায়ণ অপেক্ষা করিতে লাগিল, যদি বর্ষণ কিছু কমে।

এমন সময় স্বয়ং মিঃ সাহা মীরার পাঠগৃহে উপস্থিত হইয়া একখানা সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বসো না, এত জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে কোথা যাবে? সোফারকে বলে দিচ্ছি, তোমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে 'খন।"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া নারায়ণ আপন আসনে উপ-বেশন করিল। দুই-একটা আশপাশ কথা বলিয়া মিঃ সাহা বলিলেন—"দেখো নারায়ণ,আমি মীরার জন্যে একটি লেখাপড়া জানা অথচ বেশ সচ্চরিত্র পাত্র অনুসন্ধান করছি—কিন্তু বড়ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়—তা' যদি হতো তা' হ'লে ত যথেষ্ট পাত্র পেতুম—আমি চাই, তোমার মত একটি পাত্র। দেখো, আজকাল অসবর্ণ বিবাহ ত হিন্দু আইনেও হয়েছে; না হ'লে 'সিভিল ম্যারেজ' বলো, ব্রাহ্মমতেই বলো আমি সকল প্রকার বিবাহেই সম্মত আছি। ঐ একটী মাত্র মেয়ে বলেই

আমার এ রকম ইচ্ছা। আমার এই বিপুল সম্পত্তি সবই ত আমার মেয়ে-জামায়ের। তখন তাকে কাছ-ছাড়া করে শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে কি করব? তাকে ছেড়ে থাকা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।”

নারায়ণ তাঁহার কথার মর্ম্ম ঠিক্ উপলব্ধি করিতে পারিল না; নতমুখে উত্তর করিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ, তা’ ত হবেই।”

মিঃ সাহা এবার স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন—“দেখো, আমার বক্তব্য এই যে, এতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি তোমার হাতেই মীরাকে দিতে ইচ্ছা করি। বাস্তবিক বল্‌তে কি, তোমাকে অনেক দিন ধরে দেখ্‌ছি, তোমার ওপর আমার কেমন একটা মায়াও জন্মে গেছে। আর আমারও ত অপর কোন সন্তান নেই; আমার এই সব বাড়ী-ঘর, স্থাবর-অস্থাবর যা’ কিছু সম্পত্তি সমস্তই তোমাদের।”

নারায়ণের মনে হইতে লাগিল তাহার পায়ের তলা হইতে বুঝি পৃথিবীটা সরিয়া যাইতেছে। লোকে ছেঁড়া কাঁথায় শয়ন করিয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, কিন্তু সে ত কোনও দিন এরূপ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে নাই। তাহার ভাগ্যে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য! কোথায় দীন পিতার পর্ণকুটীর, আর কোথায় এই লক্ষপতির প্রাসাদ। ইহা কি বাস্তব না ভোজবাজী! তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া উত্তর দিতে সক্ষম হইল না।

তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া মিঃ সাহা পুনর্ব্বার বলিলেন—“অসবর্ণ বিবাহ এখন আইন-সঙ্গত। তবে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমি কিছু কর্‌তে চাই না। তোমার এতে মত আছে কি না তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।

নারায়ণের তরুণ হৃদয় ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দারুণ দারিদ্র্যের পার্শ্বে বিপুল রাজ-ঐশ্বর্য্য। একদিকে এই ঐশ্বর্য্যের দারুণ প্রলোভন, অন্যদিকে সমাজ, জ্ঞাতি-বন্ধু, বৃদ্ধ পিতা। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; তিনি যে এ বিবাহে সম্মত হইবেন না সেকথা নারায়ণের ভালই জানা ছিল। সহসা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সে কহিল—“দেবেনের সঙ্গে পরামর্শ করে পরে আপনাকে বল্‌বো।”

মিঃ সাহা বলিলেন “বেশ।”

তাঁহার আদেশে সোফার মোটরে করিয়া নারায়ণকে তাহার বাসায় পৌছাইয়া দিয়া গেল। বাসায় আসিয়া সে দেবেনের কাছে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। দেবেন শুনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিল—“অল্‌রাইট, ভেরী গুড্! এমন সুযোগ ছাড়্‌তে আছে?

—“কিন্তু সমাজ?”

—“আরে, রেখে দে তোর সমাজ! সমাজ কি খেতে দেবে? কষ্টে পড়্‌লে সমাজ কি সাহায্য কর্‌বে? আজকাল কি আর সমাজ আছে না কি? শুধু কেবল একটা মুখের বড়াই। তোর খুব অদৃষ্টের জোর, তাই মিঃ সাহা তোকে স্নেহ-চোখে দেখেছেন। এক্কেবারে রাজা হয়ে যাবি। জীবনে কোনদিন অর্থ-কষ্ট পাবি না। বুড়ো বাপের কথা ভাবছিস? বুড়ো আর ক’দিন? একান্তই তোর কাছে না থাকেন, কোনও তীর্থ-টির্থে একখানা বাড়ী কিনে সেইখানে থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দিস। আরে, টাকা হ’লে কি না হয়। মান-সম্ভ্রম, জাত-কুল, সব টাকায়। যার টাকা নেই, তার কিছুই নেই, বুঝ্‌লি? খবরদার, এ বিয়েতে অমত করিস নি। জানিস? তা’হলে ঠক্‌বি।

নারায়ণের সে রাত্রিতে বাস্তবিকই নিদ্রা হইল না। শয্যায় শয়ন করিয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল—মিঃ সাহার প্রস্তাবে সে সম্মত হইবে কি না। শেষে কিন্তু সিদ্ধান্ত করিল—দেবেনের কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য। এ জগতে টাকায় কি না হয়? সারাজীবন দারিদ্র্যের সহিত যুঝা অপেক্ষা মিঃ সাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করা সহস্রগুণে ভাল। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম করিয়া এই যে লেখাপড়া শিখিতেছে, তাহার পরিণাম কি? অদূর ভবিষ্যতে কেরাণীগিরি মিলিবে বই ত নয়।

প্রবাদ আছে, কুসংবাদ বাতাসের সঙ্গে ছোটে। কে জানে কিরূপে এই বিবাহের খবর নারায়ণের পিতার কর্ণগোচর হইল। এ শুভ-সংবাদ তাঁহার পক্ষে

অমঙ্গল-কুসংবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রথমে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; পরে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছু পরে প্রকৃতস্থ হইয়া নারায়ণকে একখানি পত্র লিখিলেন—

কল্যাণবরেষু,

বাবা নারায়ণ, শুনিলাম, তুমি না কি অসবর্ণ বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ। বাবা, স্ববর্ণে কি সৎপাত্রী নাই? আমি তোমার জন্য উত্তম পাত্রী স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তুমি আসিলেই বিবাহ দিব। পত্রপাঠমাত্র তুমি বাড়ী চলিয়া আসিবে। বাবা, তুমি আমার একমাত্র বংশধর—আমি তোমার মুখ চাহিয়াই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করি নাই। বাবা, পিতৃ-পুরুষের নাম লোপ করিও না—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। অধিক আর কি লিখিব। আমার অসংখ্য আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি,

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীকেশবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র যখন নারায়ণের হস্তগত হইল, বিবাহ তখন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

পাঁচ

পাঁচ বৎসর পরের কথা। নারায়ণ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই মিঃ সাহা তাহাকে আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নারায়ণ মেধাবী ছাত্র। পরীক্ষায় সে চিরদিনই বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। নারায়ণ ইংলণ্ডে আসিবার কিছুদিন পরে সংবাদ পাইল, তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এ সংবাদে নারায়ণ যেমন বিস্মিত হইল, দুঃখিতও যে সেই অনুপাতে না হইল তাহা নয়। মিষ্টার সাহার অতুল বৈভবের অধিকারী এখন ঐ নবজাত ক্ষুদ্র শিশু! তাহার ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ বাসনা অচিরেই তাসের অট্টালিকাবৎ ধূলিশায়ী হইয়া গেল। এখন—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল
লভিনু হায়! তাই ভাবি মনে—"

এই আক্ষেপের গান গাহিয়াই কি জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে? মনকে জোর করিয়া সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইল—ছি ছি, কেন সে এমন হীন স্বার্থের বশীভূত হইয়া মনকে কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে! হৃদয়কে এ প্রকার ঈর্ষাবিসে জর্জ্জরিত করিবার কি প্রয়োজন আছে তাহার? হোক্ না শিশু ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, তাহার শ্বশুর তাহাকে যে শিক্ষা দিতেছেন, যদি সে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহা হইলেই ত যথেষ্ট। তাহার শ্বশুর তাহাকে যে প্রকার অর্থ প্রেরণ করিতেন, ঠিক্ সেইরূপই দিতে লাগিলেন; তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিলেন না।

নারায়ণও প্রতি পরীক্ষাতেই যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিল।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। তারপর সহসা একমাস নারায়ণের টাকা আসিবার নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা আসিল না।

আজকাল করিয়া মাস প্রায় শেষ হইয়া যায়, তথাপি সে তাহার খরচের টাকা পাইল না। কোন চিঠিও আসিল না। তখন সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল।

ইংলণ্ড মহানগরীর ন্যায় দেশে টাকা ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও চলে না। কি করিবে এখন? সে টাকার জন্য শ্বশুরকে পত্র দিল, কিন্তু তথাপি কোনও 'উচ্চবাচ্চ' নাই। না আসিল টাকা, না পাইল পত্রের উত্তর। নারায়ণ একান্তই নিরুপায় হইয়া পড়িল।

ইতঃপূর্ব্বে মীরাকেও সে দুই-তিনখানা পত্র দিয়াছে, তাহারও কোন উত্তর পায় নাই। কি এমন ঘটিয়াছে যে, সকলেই তাহার প্রতি বিরূপ হইল।

মিঃ সাহা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কোনরূপেই ত তাহার প্রতি স্নেহ-শূন্যতার পরিচয় দেন নাই। বরং প্রতি পত্রেই নানা উপদেশ-সহ উৎসাহ দিয়াই আসিয়াছেন। এবং টাকার যাহা প্রয়োজন জানাইতে যেন সে কুণ্ঠাবোধ না করে এ কথা লিখিতেও ভুলেন নাই। তবে কেন এরূপ হইল?

মীরাকে উপর্যুপরি কয়েকখানা পত্র লিখিবার পর মীরা উত্তর দিল—সহসা একদিন হার্ট ফেল হইয়া তাহার

পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। নারায়ণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখন উপায় ?

এই সুদূর ইংলণ্ডে অর্থাভাবে সে কি করিবে ? অগত্যা বাধ্য হইয়া সে মীরাকেই টাকার কথা লিখিল। কিন্তু মীরা উত্তর দিল—বাটীর সকলেই এখন শোকে আচ্ছন্ন, সে কাহাকেও টাকার কথা বলিতে পারিবে না। নারায়ণ অত্যন্ত বিপদে পড়িল। হায় হায়, বাস্তবিকই আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া সে কি কুকর্ম্মই করিয়াছে ! আর টাকা না হইলে বাড়ীওয়ালী থাকিতে দিবে না। বিদেশে নির্বান্ধব-পুরীতে কি উপায় করিবে সে ? রাগও তাহার যথেষ্ট হইল। শ্বাশুড়ী হউন না কেন শোকে কাতর, তাহাকে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরামর্শ করিয়াই ত ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। শ্বশুরের না হয় মৃত্যু হইয়াছে, শ্বাশুড়ী ত জীবিতা। তাঁহার কি মনে নাই তাহার কথা ? তবে কেন তাহার এমন সর্ব্বনাশ করা ? সে গরীবের ছেলে, না হয় গরীবই থাকিত। বিপুল অর্থ, শিক্ষা, যশ-মানের প্রলোভন দেখাইয়া অসবর্ণ বিবাহ দিয়া তাহার জাতি-কুল, সমাজ পরিত্যাগ করাইয়া শেষে এই বিপদে ফেলা ! অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবেনকে সব জানাইয়া পত্র লিখিল। দেবেন পশ্চিমের কোনও সহরের এক কলেজে প্রফেসারী করিতেছিল। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া পত্র তাহার হস্তগত হইল। সে উত্তর দিল—"তোমার অবস্থা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু কি করিব, আমার কোনও উপায় নাই। সামান্য আড়াই শ' টাকা মাইনা পাই। বিদেশে ছেলেপুলে লইয়া বাসাভাড়া করিয়া থাকিতে হয়। আমার কুলায় না। তোমার শ্বাশুড়ীকে টাকার কথা লেখো। তোমার শ্বশুর যে টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আবার একটা ব্যাঙ্ক খোলা যায়।"

অগত্যা নারায়ণ শ্বাশুড়ীকেই পত্র লিখিল। কিন্তু কোনও ফল হইল না। এদিকে তাহার বাড়ওয়ালী তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন সে তাহার শ্বশুরের প্রদত্ত একটী মূল্যবান হীরকাঙ্গুরীয় বিক্রয় করিয়া বাড়ী-ওয়ালীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া যেখানে ইংলণ্ডের দরিদ্র ব্যক্তিগণ বাস করে, তথায় একটি ঘরভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু সেখানেও খরচ আছে। তাহার হাতে সামান্যই টাকা ছিল। সে বুঝিল, পাঠের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহার স্বদেশ গমন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। দরিদ্র পল্লীর বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া তথায় বাস করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

কিন্তু শ্বশুরের অবর্ত্তমানে শাশুড়ীর নিকট যে ব্যবহার পাইল, তাহাতে তাহার সারা অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। শ্বাশুড়ীর আর পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ নাই, আদর-যত্নের পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা ও অসম্মানই হইল তাহার প্রাপ্য। তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র মন্টুই এখন সকলের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে। একদিন নারায়ণ স্বকর্ণে শুনিতে পাইল শ্বাশুড়ী কাহাকে বলিতেছেন—"আর একটা বছর থেকে পাশটা করে আসতে পার্‌লে না। আঁস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা কি স্বর্গে যায় ? এখন রইলেন ষাঁড়ের গোবর হয়ে আমার গলায় পড়ে। পুরুত-বামুনের ছেলে, তা' কত ভাল হবে ? বিদ্যার মর্য্যাদা কি বোঝে ওরা ? পরের ধনে নবাবী কর্‌তেই জানে।"

সেইদিন হইতে নারায়ণ চাকুরীর চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। আর একটা বছর থাকিয়া পাশটা করিয়া আসিতে পারিল না, সে দোষ কাহার ? সে ত কত অনুনয় বিনয় করিয়া একটা বছরের খরচ চাহিয়া চাহিয়া হয়রাণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কাহাকে তাহার এ মর্ম্ম-বেদনা জানাইবে ! বিশেষ চেষ্টায় নারায়ণ একশত টাকা মাসিক মাহিনায় কলিকাতার কোন স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইল। মাসিক চল্লিশ টাকায় একটী বাসাভাড়া লইয়া একটা ঠিকা ঝি ও একটা পাচক স্থির করিয়া মীরাকে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিল। অনেক সাধ্য-সাধনার পর মীরা আসিতে সম্মত হইল—কিন্তু তাহার মত ধনীর কন্যা এরূপ দরিদ্রের আবাসে থাকিতে পারিবে কেন ? কথায় কথায় যখন-তখন নানারূপ অনুযোগ। ক্রমে নারায়ণের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। হায়, এই মীরাই কি তাহার আসিতে দু'দণ্ড দেরী হইলে পথের দিকে চাহিয়া থাকিত ! এই মীরাই কি ভালবাসার কথা

শুনাইয়া তাহার কর্ণে মধু বর্ষণ করিত? একদিন উভয়ের মধ্যে খুব বচসা হইয়া গেল। স্কুলে যাইবার জন্য নারায়ণ পোষাক পরিতে গিয়া দেখিল, কোটের একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গিয়াছে। নারায়ণ বলিল—"মীরা, বোতামটা সেলাই করে দাও না।"

মীরা ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"আমি অত পার্‌ব না।"

নারায়ণ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল—"আহা, না পার ছুঁচ-স্থতোটা আমায় এনে দাও, আমিই সেলাই করে নিচ্ছি।"

মীরা পূর্ব্ববৎ স্বরেই উত্তর করিল—"নাও গে না খুঁজে, আমি ত আর পেটে পূরে রাখি নি। বাপ্‌রে বাপ্, দিনরাত খালি ফরমাস! আমি কি তোমার চাকরাণী? এত দুঃখ দেবে ত বিয়ে করেছিলে কেন?"

ব্যথিত-কণ্ঠে নারায়ণ বলিল—"আমি তোমায় বিয়ে কর্‌তে চাই নি মীরা, তোমার বাবাই ত এ বিয়ে দিয়ে গেছেন।"

—"চাও নি? পড়াতে গিয়ে রোজ রোজ কত খোসামোদ কর্‌তে মনে নেই?"

দৃঢ়কণ্ঠে নারায়ণ বলিল—"মিথ্যা কথা, তোমায় বিয়ে কর্‌বার জন্য কোনদিন আমি খোসামোদ করিনি!"

—"না কর নি। আমার সর্ব্বনাশ করেছ বিয়ে করে।"

—"সর্ব্বনাশ আমি তোমার করি নি মীরা, সর্ব্বনাশ করেছ তুমি আমার। অথবা তোমার বাবা। আমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের, উচ্চ-শিক্ষার, বহুল সম্মানের প্রলোভন দেখিয়ে তোমার বাবাই করে গেছেন আমার সর্ব্বনাশ! জাতি সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, বৃদ্ধ পিতা পর্য্যন্ত আর আমার নয়! তবে ভুল করেছি আমি, তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে।"

অত্যন্ত ক্রোধে অধীর হইয়া মীরা কহিল—"বটে! ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়ে বেড়াতে, বাবা এনে রাজার হালে রাখ্‌লেন কি না। বেইমান, অকৃতজ্ঞ, এখন বল্‌বেই ত এ কথা!"

—"আর বেশী বলো না মীরা, সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে! এখন তাই আমিও ভাবি—আমার সেই পৈতৃক কুঁড়ে, আর ছেঁড়া জুতোর মায়া ত্যাগ করে কেন তোমাদের অট্টালিকার মোহে পড়েছিলুম। যদি এখানে থাক্‌তে কষ্ট হয়, তবে তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে ফিরে যেতে পার।

—"যাবই ত। এই ড্রাইভার, ট্যাক্সি ঠারো।"

নীচে রাজপথ দিয়া একখানা ট্যাক্সি যাইতেছিল। তাহাকে থামাইয়া মীরা ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দুম্‌দাম্ শব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তাহাতে উঠিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া নারায়ণ পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীচারুশীলা মিত্র

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]
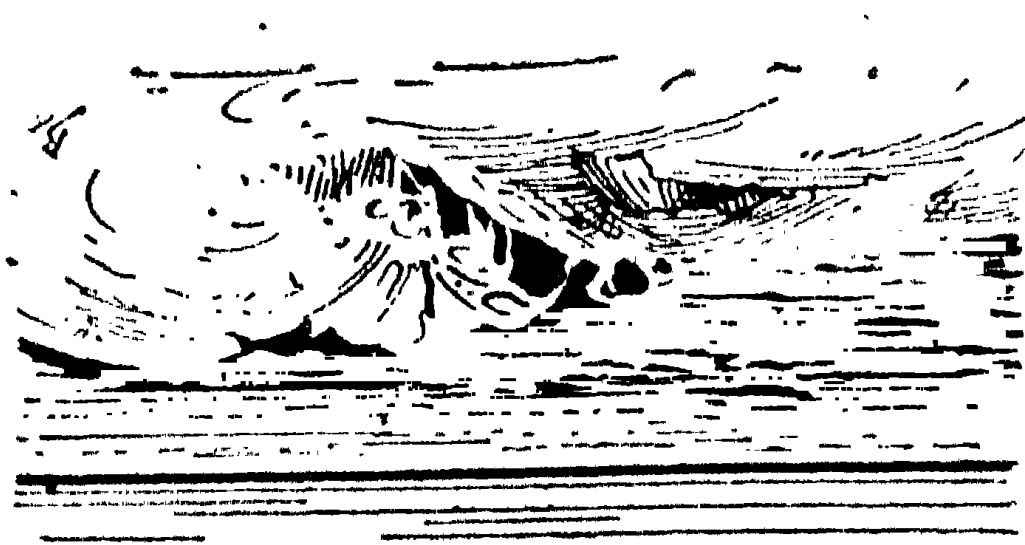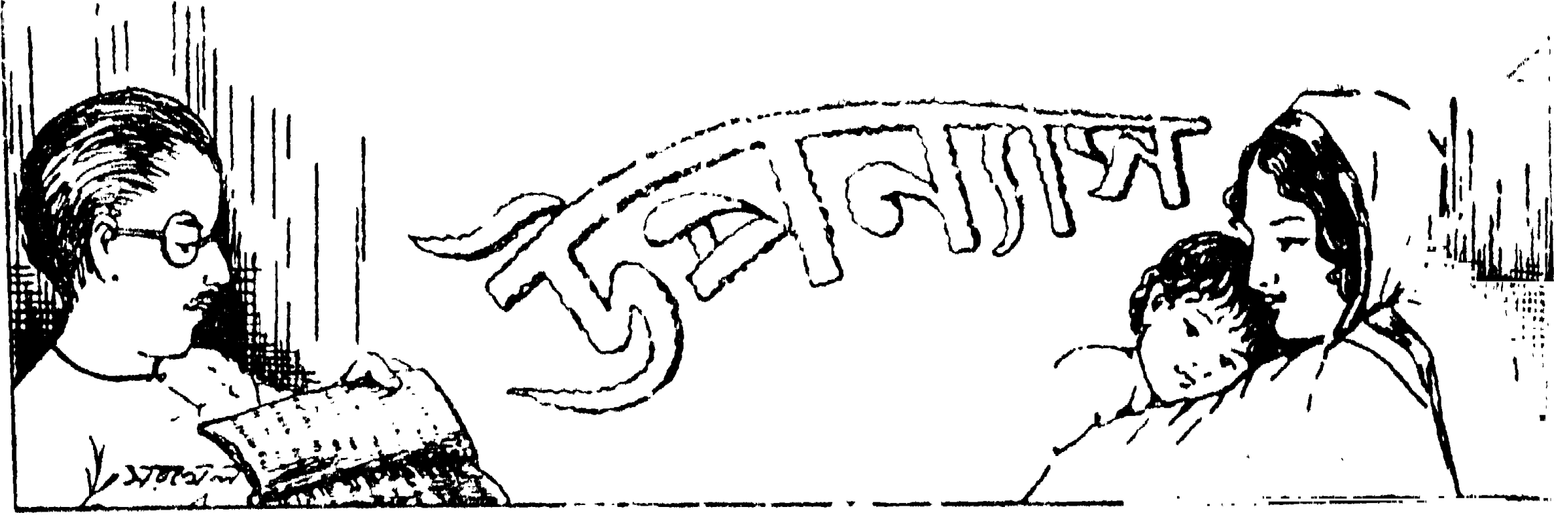
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত

পূর্ব্বদিন দেখা না করিলেও পরদিন প্রভাতেই অমর অজয়ের সম্মুখে না আসিয়া থাকিতে পারিল না। অজয় বাহিরের ঘরেই শুইয়াছিল। সকালে চাকর আসিয়া ঝাঁট্-পাট্ করিয়া দিয়া গেল। মক্কেলের আগমনে দেখিতে দেখিতে ঘরখানি বোঝাই হইয়া উঠিল। ঘরের এককোণে একটা চেয়ারে মুড়িসুড়ি দিয়া অজয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অমর আসিয়া একবার তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। মক্কেলদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। চা আসিল। সকলেই চা পান করিল। অজয়কেও দেওয়া হইতেছিল, সে নিষেধ করিয়া দিল।

লোকের পর লোক আসিল, কাজ সারিয়া চলিয়া গেল। কোর্টের বেলা হইতেছে বলিয়া ভিতরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াতেই অজয় ডাকিল—অমর?

অমর বলিল—কি?

অজয় ধীরকণ্ঠে বলিল—বেশীক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। কাল থেকে তোমাকে খুঁজছি, পাই নি বলেই এখন যেতে পারি নি।

অমর বসিয়া পড়িল।

অজয় বলিয়া চলিল—তোমার চিঠি পেয়েছি। ক্ষমা তুমি আমাকে কর নি, করা সম্ভবও নয়, তার জন্য কোন অনুরোধ করব না। যত বড় পাষণ্ডই আমি হই না কেন, মিথ্যাবাদী নই এ তুমি জানো। আজও মিথ্যা বল্‌ব না—ও নিষ্পাপ, পবিত্র! ওকে তুমি অযত্ন করো না।

অমর কথা কহিল না, হাসিল মাত্র।

—তুমি হাস্‌ছ, হাসা ছাড়া আর কিছু প্রাপ্যও আমার নেই; তবু, একদিন তোমার জীবনের ওপর আমার অনেক দাবী অনেক দাওয়া ছিল—আজ তা' হারালেও বল্‌তে লজ্জা করছি না এই ভেবে যে, যতবড় দোষই করি না কেন, তুমি সেই অমরই আছ। সরযূ তোমার ক্ষমা পেয়েছে জান্‌লে মরতেও আমার দুঃখ থাক্‌বে না। বলো, তুমি তাকে মনে-প্রাণে ক্ষমা কর্‌লে?

এতক্ষণে অমর কথা কহিল। বলিল—তোমার কাব্য-প্রতিভা এখন ম্লান হয়ে যায় নি দেখ্‌ছি। গুছিয়ে বল্‌তে তোমার মত কোনদিনই আমি পারি নি, আজও যে পারব তার কোন দুরাশাই করি না। কিন্তু কাব্য আর বাস্তবে তফাৎ অনেকখানি। ক্ষমা তাকে আমি করতে পারব না

হয় ত, আশ্রয় অবশ্য সে এখানে পেতে পারে ; কেন না, যে তাকে ডেকে এনেছে, তাকে আমি ভালবাসি—তার চেয়ে বড় কথা সে এ বাড়ীর গৃহিণী ; কারুকে স্থান দেবার অধিকার তার আছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে বেশী কথা কইবার সময় আমার এখন হবে না, কারণ কোর্টের তাগাদা আছে। আরও যদি বলবার থাকে অপেক্ষা করতে পারো, সময় হ'লেই শুনব। আশা করি অতিথি-সেবার কোন ত্রুটীই হবে না, যখন আপনার লোক এখানে রয়েছেন !

অজয় কথা কহিল না, চুপ করিয়া দাঁতে দাঁত দিয়া বসিয়া রহিল।

—জ্যোতিষের পারিশ্রমিক দেবার সময় সেদিন হয় নি, আজ হয়েছে। পার ত আমার হ'য়ে তাকে কিছু দিয়ে এস। না থাক্, আগে জজ হয়েই নেওয়া যাক্। কি বলো ? বলিয়া অমর হাসিয়া উঠিল।

অজয় তথাপি কোন কথা কহিল না।

সহসা অমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া অজয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে বলিল—মা যে কবচখানা তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন, এখন সেটা গলাতেই রয়েছে দেখ্‌ছি। ওটা দিয়ে দাও আমায়—ওখানে থেকে ওকে অপমান করে লাভ নেই।

অজয় কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। চাহিয়া দেখিল—ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সরযূ। গত রাত্রের লাজনম্র বিহ্বলা সরযূ যেন এ নয়। ধীরপদে অগ্রসর হইয়া বলিল—গাড়ীর সময় হয়ে এল অজয় দা', আর দাঁড়ালে চল্‌বে না।

—গাড়ী !

—হ্যাঁ, উঠে পড়।

তারপর ধীরভাবে অমরের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল—ভেবে দেখ্‌লুম, তোমার কথাই ঠিক্—আমার এখানে আসা উচিত হয় নি। আসি তবে।

অমর একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অজয় একবার সরযূর, আর একবার অমরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সরযূ বলিল—ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে অজয় দা'। চলে এস।

অজয় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হতভম্বের মত সরযূর অনুসরণ করিল।

অমর চাহিয়া দেখিল, সত্যই একখানি ভাড়াটে গাড়ী ইহারই মধ্যে কোথা হইতে কে ডাকিয়া আনিয়াছে বটে। আরও দেখিল, অজয়কে হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিয়া সরযূ পরে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চাকার ঘড়ঘড় শব্দটা ক্রমে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া গেল।

আপনার অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস অমরের বুক হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে খানিক অর্থহীন-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

নিজের ঘরে আসিয়া দেখিল, শেফালী জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পদ শব্দে মুখ ফিরাইতেই অমর বুঝিল—এখন পর্য্যন্ত চোখের জল তাহার শুকায় নাই। তাহাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল—তুমি ঠিক্‌ই বলেছিলে, কাঁটাই বটে! তাই ভাল করে' না বিঁধ্‌তেই উপ্‌ড়ে ফেলে দিয়েছি।

অমর হাসিতে চাহিয়া বলিল—ভাল।

—ভাল বলে ভাল, আর একটু হ'লে তোমাকেই হারাতে বসেছিলুম! বাবা, গেছে না বেঁচেছি!

—আপদ বিদায় করেও চোখে জল কেন শেফা?

মুখটা মুছিয়া ফেলিবার ছলে চোখ দু'টা মুছিয়া ফেলিয়া শেফালী বলিল—জল কোথা আবার! আচ্ছা মিথ্যে বল্‌তে পার যা' হোক্! ওর জন্যে কাঁদ্‌ব মনে করেছ—পাগল পেয়েছ আমায়! গেছে, যাক্, আর কোনদিন খোঁজ নেবো না। মুখও দেখ্‌ব না। তোমার বাড়া ত আর উনি নন। কাল আসা থেকে তোমার মুখখানি যেন শুকিয়ে উঠেছে। মনে করেছিলুম—গোড়ায় অমন হয়, ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল, তখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বল্‌লুম—দিদি, তুমি মাথার জিনিষ, তোমাকে মাথায় করে' রাখ্‌ব—কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল, তাকে স্থান দিতে

পারব না। এতে ওঁর ওপর অবিচার করা হবে, অত্যাচার করা হবে। ওঁকে কালই যেতে বলো। ও মা, কোথায় যাব! বল্‌লে কি জান—ওর কেউ নেই বোন্, ওকে ছাড়ব কেমন করে'। তার চেয়ে আমাকেই বিদায় দে ভাই! কত বোঝালুম, কোনমতেই শুনলে না। আর যাই করি, এতবড় অন্যায় তোমার ওপর করব কেন। চাকরকে দিয়ে গাড়ী ডাকিয়ে বিদায় করে' দিলুম। ভাল করি নি, অ্যাঁ?

অমরের চোখেও জল ফুটিয়া আসিয়াছিল; সে বলিল—ভালই করেছ শেফা, আমার গৃহিণীর উপযুক্ত কাজই করেছ—কিন্তু আমার বুকের গোপন ব্যথা তুমি জান্‌লে কেমন করে'?

—তুমি হাসালে! ও গো, এ জানা খুব বড় জানা নয়, বাহাদুরীও নেই এতে। স্বামীর বুকের কথা মুখে শুনতে হবে এমন মন নিয়ে যে মেয়েমানুষ জন্মায়, তার মরাই ভাল।

অমর শেফালীকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল—তা' হ'লে সারাদেশের মেয়েদেরই মরতে হয়—তা'তে কাজ নেই শেফা—

আট

কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিয়া অসীম বিস্ময় অনুভব করিল। চিরাচরিত প্রথামত জানালার গরাদে ধরিয়া ভূপালী আজ দাঁড়াইয়া নাই। চাকরটাও জুতা খুলিবার কাজে গরহাজির।

সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—ত্রিলোচন, এই ত্রিলোচন।

ভূপালী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মুখে আঙুল দিয়া চীৎকার করিতে নিষেধ করিল। কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া কহিল—চুপ্, আস্তে কথা বল্‌তে পারো না—এখনই জেগে উঠ্‌লেই অনর্থ করে' তুল্‌বে?

অসীমের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না। সে বলিল—অনর্থ করে' তুল্‌বে কে? আর ও হতভাগাই বা গেল কোথায়?

—আবার চেঁচায়, ত্রিলোচন বাজারে গেছে, মাংস আন্‌তে।

—মাংস!

—নইলে বাঁচ্‌বে কেমন করে'; ও যে সে ঘরে জন্মায় নি, রীতিমত—

রীতিমত যে তা' বেশ বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু ওটী কে তাই অনুগ্রহ করে' যদি ভেঙে বলেন ত বাধিত হই—বলিয়া অসীম ঘরের মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল, 'ঘেউ' করিয়া উঠিতেই পিছাইয়া আসিল।

ভূপালীর হাসি দেখে কে! বলিল—কেমন, হয়েছে, বল্‌লুম চীৎকার করে' তুলো না, এখন ঘরে ঢোক।

—না হয় রাস্তাতেই রইলুম। কিন্তু কোথা থেকে এক নেড়িকুত্তার বাচ্চাকে ধরে' আন্‌লে বলো ত। এই সেদিন একটা বেরাল জোটালে, তার জন্যেই ত আর্দ্ধেক সময় হারিয়েছি, আবার এটার জন্যে কি তোমাকে পুরোমাত্রায় হারাতে হবে না কি? দূর করে' দাও—

—হ্যাঁ, নেড়ি কুত্তোই বটে! বলে, দিতে চায় না, কত করে' বলে'-কয়ে পঞ্চাশ টাকায় তবে রাজী করেছি।

—প—ঞ্চা—শ!

—অমনি চমকে উঠ্‌লে, আচ্ছা কৃপণ বটে! ফার্ষ্ট মুনসেফের বৌ হ'লে এটাকে একশ' টাকাতেই কিনে নিত। বল্‌লুম নেবো না। সে যদি বা ছাড়ে—কুকুরটা ছাড়বে না। সেই যে পায়ের ওপর এসে শুলো, আর ওঠে না। যত বলি ওঠ্, ওঠ্, কে কার কথা শোনে! শেষটা বাধ্য হয়েই নিতে হ'ল।

—বেশ করেছ, ফার্ষ্ট মুনসেফের বৌ এতক্ষণে ওর শোকে কাঁদছে হয় ত! কিন্তু তোমার কুকুর বাঁধো, নইলে মেডিকেল কলেজে 'ইনজেক্‌সন' দিতে ছুটতে হবে।

—হ্যাঁ, সেই মানুষ কি না নলিনী! নেলি, নেলি!

একরাশ ঝাঁকড়া চুল, ছোট মুখখানিতে মানানসই ছোট্ট দাড়ি লইয়া নেলি আসিয়া হাজির।

অসীম খানিক তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ওর নলিনী নাম রাখা উচিত হয় নি ভূপা।

—যাও, বাজে বকো না! এই নেলি, ইনি তোমার

মনিব, বুঝেছ? যাও, সেলাম কর। বলিয়া ভূপালী অসীমের পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেই সে গিয়া তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অসীম তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—থাক্, থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। আমারই কর্ণধার যখন তোমার হস্তগত, তখন অন্যে পরে কি কথা!

অসীমের পায়ের জুতার ফিতা খুলিয়া দিতে দিতে ভূপালী বলিল—ওকে আদর কর্‌ছি দেখে মেনিটার কি রাগ! মুখপুড়ী খায় নি পর্য্যন্ত।

অসীম হাসিয়া বলিল—নিজের অধিকার হারাতে হ'লে অমন রাগ সবারই হয়। কিন্তু খোকা কোথা? তাকে যে দেখ্‌ছি না।

—তবু ভাল, খোকার কথা মনে পড়ল। কোথা গেছে কি জানি। যে দুষ্ট হয়েছে আজকাল! আজ দুপুরে কি হয়েছে জান—জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে আছি খোকাকে কোলে নিয়ে, হঠাৎ খোকা চীৎকার করে' উঠ্‌ল—বা—বা! ও মা, চেয়ে দেখি একটা লোক ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' ওর দিকে চেয়ে আছে—লজ্জায় মরি আর কি! তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম। তারপর—বলিয়া ভূপালী চুপ করিল।

অসীম বলিল—তারপর?

তারপর দেখি আমাদের বাড়ীর দরজাতেই সে এসে দাঁড়াল।

—সর্ব্বনাশ! ঘরে ঢুকে পড়ল না কি?

—পড়ল বই কি। পায়ের দিকে এগিয়ে আস্‌তেই—

—কি মুস্‌কিল! না, এবার দেখ্‌ছি চাকরী-বাকরী ছেড়ে তোমাকে আগলাতে হ'ল। বেড়াল কুকুর সহ্য করা যায়, শেষে মানুষ—

বাধা দিয়া ভূপালী বলিল—সহ্য করা যায় না ত? বেশ তাড়িয়েই দি' তা' হ'লে—বলিয়া সাম্‌নের একটা ঘরের শিকল খুলিয়া তাহার ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—দেখ্‌লে ত ঠাকুরপো, তোমার দাদার কাণ্ড-কারখানা!

খোকা হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটী যুবক ঘর হইতে বাহির হইয়া অসীমকে প্রণাম করিতেই অসীম বলিয়া উঠিল—আরে অপা যে! তুই কখন এলি?

—দুপুরে।

—না একটা খবর, না কিছু—সব ভাল ত?

—মন্দ হলেই বা তোমার কি বলো, এখনই ত তাড়িয়ে দিচ্ছিলে।

খোকাকে কোলে করিয়া অপূর্ব্ব বলিল—খবর দেবার আর সময় হ'ল কোথা! জেল থেকে খালাস পেয়ে বাড়ী গিয়ে উঠলুম—কিন্তু সদর পার হ'তে হ'ল না, সদ্য রায়বাহাদুর টাইটেল বাবা পেয়েছেন, এখনও তার জের মরে নি—তিনি একেবারে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। তোমার কাছে গোটাকতক টাকা নিয়ে সরে' পড়ব ঠিক্ করেই এসেছিলুম—বৌদি' ত ছাড়তেই চান না, বলেন—এখানেই থাক্‌তে হবে।

অসীমের মুখে চিন্তার মেঘ নামিয়া আসিল। ভূপালী বলিল—এবার বড় মনিবের মুখ মনে পড়ে গেল বুঝি? দেখো, মুখই মনে পড়ুক আর ছড়িই মনে পড়ুক, ও সব চল্‌বে না—ঠাকুরপো এখানেই থাক্‌বে।

অসীম হাসিতে চাহিয়া বলিল—ভাল বিপদ! থাকুক না, কে বারণ কর্‌ছে—তবে ও সব ফ্যাসাদগুলো এরপর থেকে না কর্‌লেই হ'ল, বুঝ্‌লে না?

—বাবা, মুচলেকা লিখিয়ে নেবে না কি একখানা! দাও ঠাকুরপো, একখানা লেখাই দিয়ে দাও—তা'তে মনিবও সন্তুষ্ট, ভৃত্যও।

অপূর্ব্ব হাসিয়া একটু বেড়িয়ে আসি আমি—বলিয়া খোকাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভূপালী বলিল—লজ্জায় বেচারী লাল হয়ে উঠেছে। তা' কেমন দাদার ভাই! কি গো, আজ কি আর খাবে না না কি?

—কেন খাবি ত খাচ্ছি।

—বটে, এতবড় অপবাদ! এখনই—

—থাক্, থাক্ অতটা রাগবার দরকার নেই, তোমার এই কুকুর ছুঁয়ে দিব্যি করছি আর এমনটা হবে না, হ'লে—

হোহো করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীর গায়ের উপর

'লাইম হাউস' পুস্তকের একটী দৃশ্যে কেণ্ট টেলার এবং গ্রেটেই মিচেল।

রয়েল আর্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

লুটাইয়া পড়িয়া ভূপালী বলিল—বাবারে বাবা, অমন জাগ্রত দেবতার নাম করে' যখন দিব্যি গেলে ফেলেছ, তখন আর না হলেয় কাজ নেই। আঃ, বড় বেহায়া তুমি! এখনই চাকরটা এসে পড়বে। এখন ছেলেমানুষী গেল না তোমার!

কিন্তু চাকরের ভয়ে পলাইবার উৎসাহ ছিল বলিয়া বুঝা গেল না। স্বামীর বক্ষলীন হইয়াই সে পড়িয়া রহিল।

নয়

—বৌদি'।

মধ্যাহ্ন রৌদ্রের তেজ তখন প্রায় ম্লান হইয়া আসিয়াছে। রুক্ষ চুলগুলা বিদ্রোহ করিয়া যেন অপূর্ব্বের মাথার উপর খাড়া হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। মুখে ক্লান্তির একটা ছাপ পড়িলেও চোখে কিন্তু তাহার আনন্দের আভাস খেলা করিয়া বেড়াইবার অভাব নাই। সে ঘরের সাম্‌নে আসিয়া ডাকিল—বৌদি'।

ভূপালী সাড়া দিল না।

অপূর্ব্ব আবার ডাকিল—বৌদি'।

আর চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না, ভূপালী গম্ভীর-কণ্ঠে উত্তর দিল—কি?

অপূর্ব্ব কহিল—তবু ভাল, আমি মনে করেছিলুম ঘুমিয়ে পড়েছ।

ভূপালী কথা কহিল না। অপূর্ব্ব বলিল—খিদেয় নাড়ি চুঁয়ে যাচ্ছে, দরজা খুল্‌বে না ত?

ভূপালী দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'হড়াৎ' করিয়া খিল্ খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—তবু রক্ষে, মনে করেছিলুম, কলির শুকদেব গোঁসায়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। তা' আপনার যে আছে শুনে বাধিত হলাম। স্নান-টান হবে না কি?

স্নান করেই এসেছি। এবেলা নয়, ওবেলা না হয় তেল-টেল মাখা যাবে 'খন। ঠাকুর কোথা গেল?

—শুয়েছে বোধ হয়। থাক্ বাড়াই আছে—বস্‌বে এস। বলিয়া ভূপালী রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

হাত পা ধুইয়া অপূর্ব্ব রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল—দুইজনের ভাত বাড়া রহিয়াছে। বুঝিতে বাকী রহিল না আজও ভূপালী অভুক্ত রহিয়াছে। পাতের ভাতগুলা নাড়া-চাড়া করিতে করিতে অপূর্ব্ব বলিল—আজও খাওয়া হয় নি তোমার। মনে করি ত আর যাব না, কিন্তু পেরে উঠি না—তুমি খেয়ে নিলেই ত পারতে বৌদি'!

—তবু ভাল, বৌদি'র ওপর নজর পড়েছে! দেবর লক্ষ্মণকে অভুক্ত রেখে খেলে কি আর রক্ষে আছে! এমনই ত একালের মেয়েদের নিন্দেয় টেঁকা দায়! আজ আবার কার ওপর অনুগ্রহ হ'ল? সেদিন ত শুনলুম একটা মুসল-মানকে কাঁধে নিয়ে তাদের মহল্লা অবধি ছুটেছিলে। ভাব্‌লুম—শেষটা না মোল্লার মন্ত্র পড়ে মসজিদেই পড়ে থাকো। আইবুড়ো ছেলে, বলা ত যায় না।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—সত্যি বৌদি', লোকটা হঠাৎ গরমে 'সান্ ষ্ট্রোক্'-এ অজ্ঞান হয়ে যখন পড়ল, তখন হায় হায় করে হাজারটা লোক এগিয়ে এল বটে, কিন্তু দাড়ি দেখে বোধ হয় তারও বেশী লোক ফিরে গেল। বল্‌লে—বেটা নেড়ে, ভালই হয়েছে—মদ-ফদ টেনেছে, মর্‌বে না। ভারী দুঃখ হ'ল—আমরা এত অধম হয়ে পড়েছি বলে!

ভূপালী কথা কহিল না, হাসিল মাত্র।

অপূর্ব্ব বলিয়া চলিল—সত্যি বৌদি', আমরা একান্ত দুর্ব্বল অক্ষম বলেই দুর্ব্বলেরই উপর প্রতিশোধ নিয়ে সুখ পাই। আর যারা সত্যিকার বলবান, তাঁরা এর চেয়ে অপমানের কিছু খুঁজে পান না। আজকে হয়েছে কি জান? বাড়ী ফিরছি, কাল তোমাকে না খাইয়ে রেখেছি, আজ যত কাজই পড়ুক না সকাল সকাল খেয়ে নিতেই হবে। কিন্তু আমি ভাব্‌লে হবে কি—তোমার অদৃষ্টে আছে কষ্ট, কাজেই মাঝপথে বাধা পড়ে গেল। পিছন থেকে কে ডাকলে—শুনছেন?

ফিরে দেখ্‌লুম, একটী মেয়ে একটা ভাঙাবাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। মনের ভুল ভেবে ফিরে চলেছিলুম—আবার ডাকতেই অবাক হয়ে এগিয়ে গেলুম।

অপূর্ব্ব থামিতেই ভূপালী উৎসুক-কণ্ঠে বলিল—তারপর?

চেয়ে দেখ্‌লুম, মেয়েটীর চোখ দু'টী ভরা জল। বল্‌লে—আপনি একটা উপকার করবেন?

উপকার! বল্‌লুম—কি বলো?

আমার মা এইমাত্র মারা গেছেন। বাবা পাগলের মত তাঁর ওপর পড়ে আছেন। কিন্তু পড়ে থাকলে ত কিছু হবে না—ওঁকে নিয়ে যেতে হবে। চেনা দু'-একজন যারা আছে, ডাক্‌লুম—কেউ এল না। বলে—প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে। কিন্তু তার উপায় কোথায়, একটা পয়সা নেই হাতে। আপনি যদি সাহায্য করেন ত বড় উপকার করা হয়।

তোমার মুখখানা মনে পড়ল—কিন্তু তার সঙ্গে এগিয়ে না গিয়ে কোনমতেই পারলুম না। সত্যি বৌদি' বড় গরীব তারা। একটা বিছানা পর্য্যন্ত নেই তাদের। শুনলুম, জলখাবার ঘটিটা অবধি বাঁধা দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। এমন ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলুম! হঠাৎ তোমার দেওয়া আংটিটার ওপর চোখ পড়তেই বুকে বল এসে গেল। তাড়াতাড়ি সেটাকে সাম্‌নের একটা দোকানে বাঁধা দিয়ে যা' পেলুম, তাই নিয়ে ছুটলুম শ্মশানের দিকে। সঙ্গে রইল মেয়েটী আর তার বাবা। ওঃ, সে যে কি দৃশ্য বৌদি'! যা' হোক্, করে ত পোড়ানর ব্যবস্থা হ'ল, কিন্তু মুস্কিল হয়ে গেল—আগুন দিতে গিয়ে। কথা উঠ্‌ল—পেটে এখন ওর ছেলে রয়েছে। এতে ত আগুন দেওয়া যায় না—হিন্দু শাস্ত্রমতে এ মহাপাপ!

উপায়? মেয়েটীর মুখের পানে চাহিতেই সে হাত দুটো চেপে ধর্‌লে—কি হবে?

বাপটীকে সরিয়ে দিয়ে একখানা ছুরি এনে নিজেই মড়ার পেট চিরে ছেলে বার করে' ফেল্‌লুম—ভাগিস্‌ মেডিক্যাল কলেজে পড়েছিলুম কিছুদিন! তাও কি ঠিক্‌ জানি কোথায় আছে। কেমন করে' যে ছেলেটীকে বার কর্‌লুম তা' আমিই জানি।

ভূপালী শিহরিয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—নইলে কি করব বলো? আর লোকই বা পাব কোথা, টাকাকড়িই বা আসে কোত্থেকে? তারপর কোনরকমে দাহ করা হয়ে গেল। তাদের নিয়ে বাড়ী পৌছুলুম। হাতে তখন স'বে দু'আনা পয়সা বাকী রয়েছে। তাদের কিছু এনে দিতে হবে, নইলে কি খেয়ে থাক্‌বে।

মেয়েটীকে আড়ালে ডেকে খাবার কথা তুল্‌তেই সে হেসে বল্‌লে—সে হবে'খন। আপনাকে কিছু দিতে পার্‌লুম না—তা' সুদেই বাড়ুক!

বুঝ্‌তে বাকী রইল না একদিনের মত খাবার সংস্থানও তাদের নেই। আংটীটাকে বেচে ছ' টাকা ক'আনা পেয়ে তাই তাদের দিয়ে এলুম। নেবে না কিছুতেই, বল্‌লুম—আপনি ভুল কর্‌ছেন, এ টাকা আমার নয়, আমার বৌদি'র। তিনি আমার কাছে জমা রেখেছেন—যার সব চেয়ে দরকার তাকে দেবার জন্য। ঠিক্‌ বলি নি বৌদি'?

ভূপালীর চোখের কোণে জল আসিয়া গিয়াছিল। সে ভাতের একটা ডেলা মাখিতে মাখিতে গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—ঠিক্‌ই করেছ ঠাকুরপো!

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া অপূর্ব্ব বলিল—আঃ, বাঁচ্‌লুম! এমনই ভয় হয়েছিল বৌদি', তোমার জিনিষ মাথা পেতে নিতে পারি, দিতে পাবার অনুমতি ত চেয়ে নিই নি—তবে এই ভরসা ছিল, অন্নপূর্ণার জাত তোমরা—বিশেষ করে' আমার মত হতভাগাকে যে কোলে টেনে নিয়েছে তার মন—

—থাক্‌ বাবু, আর কথায় দরকার নেই—খিদেয় মরছি, বাজে কথা শোনার চেয়ে খেয়ে নি আমি—বলিয়া ভূপালী জোর করিয়া একটা ভাতের ডেলা মুখে পূরিয়া দিয়া চিবাইতে সুরু করিয়া দিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর মেয়ে

শ্রীমতী রাণী দেবী

বাঙালীর ঘরের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে সে; তাতে আবার রংটা একটু চাপা। তাই জন্মের দিন থেকেই আত্মীয়স্বজনের কাছে পেয়ে এসেছে—অবহেলা। বাপ ভাবেন,—শত পুরুষের ভিটেখানি মেয়ের কৃপায় হয়ত বা একদিন মহাজনের হাতে চলে যাবে! মা ভাবেন,—তাইত শেষে একটা মেয়ে হ'ল!···তবু মার প্রাণ! তিনি ক্ষোভটুকু মুছে ফেলে মেয়েকে বুকে তুলে নেন।

মা মেয়ের নাম দিলেন—কল্পনা। শুনে বাপ মনে মনে হাস্‌লেন। স্ত্রীকে ঠাট্টা করে বল্লেন, "তুমি তা' হ'লে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করে তুল্‌তে পেরেছ—কি বলো?···

পাড়ার লোক নাম শুনে নাক সিঁটকায়। হুঁ, যা' মেয়ে, তার আবার নামের বাহার!

কল্পনা বড় হ'ল। অন্যান্য মেয়েদের সাথে সেও স্কুলে যায়। লেখাপড়ায় তার কেমন একটা ঝোঁক দেখা দিল। সংসারের আবশ্যকীয় দু'-একটা কাজ করেও লেখাপড়া তার বেশ চল্‌তে লাগ্‌ল। বছর চারেক কাট্‌তেই বাবা বল্লেন, "হবে না ও-সব। মেয়েদের বেশী লিখেপড়ে হবে কি? কী কর্ব্বে তারা? চাকরী?"

ব্যস্, সেইদিন থেকে স্কুলে কল্পনার নাম কাটা গেল।

কল্পনা ম্লানমুখে মার কাছে বল্লে, "স্কুলে আমাকে যেতে দাও মা, বরং তোমরা ঝি ছাড়িয়ে দাও, আমি সব কাজ নিজে কর্ব্ব, আর অবসরমত পড়া তৈরী কর্ব্ব।"

মা মেয়ের কথায় ধমক দিলেন, "ভারী জ্যাঠা হয়েছ, না? উনি ত ঠিক কথাই বলেছেন, লেখাপড়া শিখে হবে কি? আমি যে কিছু লিখ্‌তে পড়্‌তে পারি না, তা'তে কি সংসার করা আট্‌কে যাচ্ছে? তুইত চার বছরে অনেক শিখেছিস্—আর শিখে জজ্ হবি না কি? নিজের কাজ কর গে যাও।"

ঝি ছাড়ানোর কথাটা বাপের কানে উঠ্‌ল; তাঁর মনেও লেগে গেল—সত্যিই ত অতবড় মেয়ে ঘরে থাক্‌তে ঝির দরকার কি? ঝি বিদায় হ'ল, তার স্থান অধিকার কর্ল—কল্পনা। কল্পনা নীরবে কাজ করে যায়, আর সনিশ্বাসে ভাবে, কাজ করি তা'তে দুঃখ নেই, কিন্তু এরমধ্যে লেখা-পড়াটাও যদি শেখা হ'ত।···তার মনের ব্যথা কেউ বুঝ্‌ল না, মাও নয়।···

বয়েসের সাথে কল্পনার লাঞ্ছনার পরিমাণটা বেড়ে গেল। তার প্রধান দোষ সে বাঙালীর ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মেছে। 'নারী' যে 'দেবী', তা' এখন লোকের মুখেই শুন্‌তে পাওয়া যায়; নইলে নারী দেবী নয়, মানবীও নয়, সে জড়—বাজারের পণ্যদ্রব্য মাত্র।···কল্পনার শ্যামলা রং লোকের চোখ ঝল্‌সে দেয় না, তাই তার বয়সটাও কুমারী অবস্থায়ই ষোল পার হ'ল। বাপের মনটা কিছু সন্দিগ্ধ। কল্পনার চালচলনে তাঁর কড়া নজর।...অতবড় মেয়ে এখনো বিয়ে হয় নি—যার তার সাম্‌নে যাওয়া কখনো উচিত নয়। বিশেষতঃ, আজকালকার দিনে ঐ যে সব থিয়েটার বায়স্কোপ হয়েছে, ওগুলো এখনকার ছেলেমেয়েদের কচি মাথাগুলো একেবারে খেয়ে ফেলে। ছেলেদের অবশ্য দেখ্‌তে বাধা নেই; তারা পুরুষ মানুষ—তাদের সঙ্গে মেয়েদের তুলনাই হ'তে পারে না।

তা' কল্পনার দিন একরকম কেটে যায়।

যৌবন কোন এক অজ্ঞাত সময়ে তার সোনার কাঠির স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল কল্পনার সর্ব্বাঙ্গে; তাই তার

শ্যামল বর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল—স্নিগ্ধ মাধুর্য্যমণ্ডিত। বিশাল চক্ষু দু'টির দৃষ্টি সলজ্জ হ'য়ে উঠ্‌ল। বিশ্লেষণ করে দেখ্‌লে খুঁৎ অনেক বেরুবে, নতুবা সহজ দৃষ্টিতে মনে হ'বে—চমৎকার মেয়েটি! পূর্ব্বে যা'রা তার নাম শুনে নাক কুঁচকিয়ে ছিল, তা'রাই এখন স্বীকার করে, "তাইত মেয়েটা দেখ্‌তে বেশ সুন্দরীই হয়েছে; যত্নে থাকলে আরো সুন্দরী হ'ত।"

কল্পনার জ্যেঠতুতো খুড়তুতো কয়েকটি বোন্ আছে—তারা কেমন দশটার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ী চেপে স্কুলে যায়; চারটের সময় ফিরে এসে খাবার খেয়ে দু'-এক-খানা কাজ ইচ্ছে মত করে নিয়ে খেলা করে। তাদের ক' ভাই-বোনের আনন্দোচ্ছল কণ্ঠস্বর হাওয়ায় ভেসে এসে কল্পনাকে আনমনা করে তোলে।···সময় সময় ওদের সাথে নিজের তুলনা করে' আপন-মনে ম্লান হাসি হাসে, "আমি যে কালো, কাজ না শিখ্‌লে বিয়ে কর্ব্বে কে?"

যেন বিয়েটাই ওর জীবনের চরম লক্ষ্য।

কল্পনার পিস্‌তুত দাদা তার এক বন্ধুকে নিয়ে মামার বাড়ী বেড়াতে এল। নীতিশ বল্লে, তোমরা মিলনকে একটু যত্ন-আত্তি করো। কিন্তু—ও খুব বড় লোকের ছেলে; আমার সাথে এক কলেজে পড়ে। গরমের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে।

কল্পনার কাজ বেড়ে গেল। দ্বিপ্রহরে সকলে যখন নিদ্রাসুখ উপভোগ করে, সে তখন বামুন-ঠাকুরুণের সাথে বসে বিকেলের জলখাবার তৈরী করে। কাজ সে দিন-রাত করে; তাতে শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই।...

কল্পনার চোখে সবই পড়ে; কিন্তু, মনের দ্বারে কিছু পৌঁছায় না। সে বিশেষভাবে অপর এক ব্যক্তির কাছে ধরা পড়ে গেল। তার কর্ম্ম-কুশলতা, সহিষ্ণুতা, মিলনকে মুগ্ধ করে; অকারণে তিরস্কৃত কল্পনার ম্লান মুখখানি দেখ্‌লে তা'র মনটা ব্যথিত হ'য়ে পড়ে। নীতিশকে একদিন ওর সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করেই বস্‌ল।

নীতিশ বল্লে, কে কল্পনা? ও মেজ মামার মেয়ে। মেজ মামা ভয়ানক মানুষ ভাই। নিজের যেমনি স্বভাব, অন্যকেও মনে করেন তাই—চব্বিশ ঘণ্টাই মেয়েকে শাসন করেন। ঘরের কাজ অর্দ্ধেকেরও বেশী কর্ব্বে ও একা। তার ওপর আবার কথায় কথায় গালাগালি—সময় সময় মার খায় পর্য্যন্ত। মিলন সহানুভূতিসূচক-স্বরে বল্লে, নীতিশ, আজ ক'দিন ধরে এসে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেছি, ভারী শান্ত প্রকৃতির মেয়ে কল্পনা; এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে। বাড়ীতে তোমার অন্য মামাদের ঘরে ঠাকুর-চাকর আছে। তাঁদের ঘরে মেয়েরা গাড়ী চেপে স্কুলে যায়; বাড়ী এসে 'স্কিপিং' করে—আর যত দোষ ভাই তোমাদের ঐ কল্পনার।"

নীতিশ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্লে, "মেজমামা ঐ এক ধাঁজের মানুষ। তাঁর ধারণা মেয়েদের যত কড়া শাসনে রাখ্‌বে, তা'রা তত ভাল থাকবে। মেজমামার ঘরেও নেহাৎ কম লোক নয়—তা' নামেমাত্র একটা রাঁধুনি আছে; নইলে রান্না থেকে সুরু করে, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া কাপড় কাচা সবই করে ঐ কল্পনা। এইত ষোল বছর বয়েস হ'ল, তা' ওকে দেখ্‌লে বোঝা যায় না। ছোট-বেলা থেকে অত শাসনে থেকে ওর মনের বিকাশ মোটে হয় নি—একটুতেই কেমন যেন মুসড়ে পড়ে। একটা অসহায় শিশুর মত ভাব ওর মুখে-চোখে প্রতিফলিত!..."

মিলন একটু ইতঃস্তত করে বল্লে, "তা' বয়েস হয়েছে, বিয়ে দেবে না?"

নীতিশ মুখভার করে বল্লে, "বাঙলাদেশে মেয়ের বিয়েতে ঝক্কি কত—জান? ছেলে চায়—রূপ; ছেলের বাপ চায়—টাকা। মেজমামা না কি বিয়েতে এক পয়সা খরচ কর্ব্বেন না; তাতে মেয়ের রং ময়লা—এ অবস্থার বিয়ে কে কর্ব্বে ঐ মেয়েকে? তা' ছাড়া, আমাদের কুলীনের ঘরে ভাল ছেলে পেতে গেলে পাঁচ-ছ' হাজার টাকা চেয়ে বসবে। মেজমামা ভীষণ কৃপণ আর স্বার্থপর। টাকা দেবার ক্ষমতা থাকলেও দেবেন না। তুই যদি আমাদের পাল্‌টী ঘর হতিস মিলন, আমি তা' হ'লে তোর বাবাকে বরং বলে দেখ্‌তাম। তোর হাতে পড়লে, কল্পনা জীবনে সুখী হ'তে পার্ত্ত। ওর রংটা একটু ময়লা বটে, কিন্তু চোখ-মুখের গড়ন চমৎকার!"

মিলন লজ্জা পেয়ে বল্লে, "যাঃ, আমি যেন বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছি আর কি!"

এক সপ্তাহ অতীত হয়েছে।

অভ্যাসমত ভোর পাঁচটায় উঠে কল্পনা বাইরে মুক্ত হাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। পথ নির্জ্জন—কাজেই প্রভাতের এই নির্ম্মল বায়ুটুকু উপভোগ কর্বার জন্য প্রত্যেকদিনই সে এই সময় আধঘণ্টাটাক বেড়িয়ে নেয়।

মিলনও গরমের আতিশয্যে শয্যা ছেড়ে বাইরে এল। দিবা-নিশার সংমিশ্রনে কল্পনাকে চিন্‌তে তা'র দেরী হ'ল না। এত কাছে কল্পনাকে দেখ্‌তে পাবে সে আশা করে নি কোনদিন। তা'র সাথে কথা বল্‌বার প্রলোভনটুকু ত্যাগ কর্ত্তে পার্‌ল না। কাছে গিয়ে বল্লে, "আপনি এত ভোরে উঠেছেন যে? বাড়ীর আর কেউত ওঠেন নি?"

কল্পনা প্রথমে চম্‌কে উঠ্‌ল।...এভাবে অপরিচিত পুরুষমানুষের সাথে তার আলাপ-পরিচয় এ পর্য্যন্ত হ'য়ে ওঠে নি। সে নতনেত্রে মৃদুস্বরে বল্লে, "আমি রোজই এই সময় উঠি—ভোরের হাওয়া আমার কাছে খুব ভাল লাগে। সারাদিন বাড়ীর মধ্যে থাকি—এই সময়টুকু তাই বাইরে আসি।"

মিলন বল্লে, "আজকে বড্ড গরম পড়েছে, আমিও তাই বাইরে এলাম। এত গরমে শুয়ে থাকা যায় না।"

তা'র হয়ত আরো কিছু বল্‌বার ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ যে কাণ্ডটি ঘটে গেল সেজন্য সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।...

কল্পনার বাবা গত রাত্রিটা 'বিশেষ স্থানে' যাপন করে তখন ঘরে ফির্‌ছিলেন—এমন তিনি প্রায়ই ফির্‌তেন।

আলো-আঁধারের মাঝখানে তরুণী কন্যার সাথে সঙ্গীটিকে দেখে সন্দেহটা সংক্রামক হ'য়ে উঠল; দ্রুত এসে আচমকা মেয়ের গালে এক চড় মেরে উভয়কে জড়িয়ে একটা কুৎসিৎ উক্তি করে কল্পনার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে আরো কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলেন—মৃদু অতি মৃদু একটি ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ঘরের ভিতর থেকে বাইরে স্তম্ভিত মিলনের কানের কাছে এসে মিলিয়ে গেল—শুধু তা'র ক্ষীণতম রেশটুকু অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে সহস্র কামানের গর্জ্জন ধ্বনি করে উঠ্‌ল।

রাত তখন এগারোটা।

কল্পনা তার কর্ম্মক্লান্ত দেহটাকে নিদ্রার কোলে সঁপে দেবার আশায় শয়ন কর্‌ল। নিদ্রা কিন্তু সহজে এল না। প্রভাতের ঘটনাটা চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল। বিদেশী যুবকটির সাম্‌নেই লাঞ্ছনার কথাটি নতুন করে মনের মাঝে কালির ছোপ বুলিয়ে দিল।...তা'র এই ষোল বৎসরের জীবনে পিতামাতার কাছে শুধু অবহেলা অনাদরই পেয়ে এসেছে। গালাগালি বকুনির সাথে উপরি পাওনা প্রহারটা রোজই আছে।...নির্ব্বিবাদে এতদিন সে এটা নিজের পাওনা বলেই মেনে নিয়েছে এটা তার উপর অত্যাচার কি না এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই মনে জাগে নি।...কিন্তু আজ যেন হঠাৎ কি করে অন্তরের রুদ্ধদ্বার এক নিমেষে মুক্ত হ'য়ে গেল। সে বুঝ্‌ল—নিত্যকার এ নির্য্যাতন তা'র কোনমতেই পাওনা নয়...এটা তার উপর অযথা অত্যাচার করা হয়! কিন্তু, এর উপায় কি? মাওত বোঝেন না। সে কালো, তা'কে দেখে পাত্র-পক্ষীয় কেউ পছন্দ করে না—সে জন্য অপরাধ কার বেশী—তার নিজের, না যারা তাকে পৃথিবীতে এনেছেন, সেই পিতামাতার?...না, সে এভাবে আর তিলে তিলে আত্মহত্যা কর্ত্তে চায় না—সে একবারেই মুক্তি চায়।...কোথায় কার কাছে মুক্তির উপায় আছে, কে তাকে সে কথা বলে দেবে?...

কল্পনার নীরব বেদনা প্রকাশে বাধা পড়্‌ল।

বাপ তাঁর দৈনন্দিন কার্য্য শেষ করে বাড়ী ফির্‌লেন। অভ্যাসমত মেয়েকে ডেকে বল্লেন, "কনি মা', চট্‌ করে খানকতক লুচি আর একটু আলুর দম তৈরী

করে নিয়ে আয়। যা' খেয়েছিলুম, সব বমি হয়ে বেরিয়ে গেছে।"

কল্পনা বারান্দায় ষ্টোভ জ্বেলে বাপের কথামত আহার্য্য প্রস্তুত করে তাঁকে খাইয়ে, বাইরে মুখ হাত পা ধুতে গেল।

মিলন এসে মৃদুস্বরে বল্লে, "আমার ঘরে একটু আস্‌বে কল্পনা? বিশেষ কথা আছে।"

কল্পনা চম্‌কালো না; এতটুকু বিস্ময় বোধ তা'র হ'ল না—শুধু শান্ত মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য যেন কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে, "কি কথা?"

মিলন অধৈর্য্য হয়ে বল্লে, "আমার ঘরে চলো কল্পনা, সেখানেই সব বল্‌ব। আমাকে অবিশ্বাস কর্‌বার মত কিছু নেই। তোমাদের অতিথি আমি এটা ভুল্‌ব না।"

কল্পনা মিলনের সাথে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে এসে প্রবেশ কর্‌ল।

মিলন গিয়ে শয্যার উপর বস্‌ল। কল্পনা দ্বারপ্রান্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

উভয়েই নীরব। বাইরে দ্বিপ্রহর নিশীথের কালো আকাশের কোলের নক্ষত্র বালিকারা যেন জান্‌লা দিয়ে এই দু'টি নরনারীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মৃদু মৃদু হাস্‌ছিল। নৈশবায়ু এসে কল্পনার রুক্ষ কুঞ্চিত অলকে স্নেহের দোলা দিয়ে গেল।

কল্পনাই আগে কথা বল্লে, "আমি তা' হ'লে যাই।" বলে সে দ্বারের বাইরে পা দিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

মিলন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ল। "না, না, শোন"—উঠে গিয়ে সে কল্পনার কাছে দাঁড়ালো। সহসা তা'র হাত দু'খানি ধরে মিলন গাঢ়স্বরে বল্লে, "আমি তোমাকে ভাল-বাসি কল্পনা—তোমাকে আমি বিয়ে কর্ত্তে চাই—তুমি তা'তে রাজী আছত? এত লাঞ্ছনা তুমি সহ্য কর্ত্তে পার্‌ব্বে না।...কোল্‌কাতায় চলো আমার সাথে, সেখানে গিয়ে আমাদের বিয়ে হবে।"

কল্পনা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।...এমন অসম্ভব কথা সে জীবনে কখনো শোনে নি। রূপে-গুণে সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এই মিলন—সে বিয়ে কর্ত্তে চায় তা'র মত অতি নগণ্যা এক মেয়েকে।

মিলন স্পষ্ট অনুভব কর্‌ল, তার হাতের মধ্যে কল্পনার ছোট নরম হাত দু'খানি কাঁপছে।

কল্পনা একটু পরে বল্লে, "বাবাকে বলুন না কেন?"

ম্লান হেসে মিলন বল্লে, "তোমার বাবা রাজী নন। তোমরা কুলীন আর আমরা শ্রোত্রীয়। এতে না কি তোমার বাবা ভয়ানক চটে গিয়েছেন—আমাদের বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না না কি। নীতিশের কাছে আমি সব শুনেছি। তুমিত জান কল্পনা, ওসব মিথ্যে কুসংস্কার। মানুষ বলে যার পরিচয় হয়, তা' ঐ অর্থহীন সংস্কারে নয়, —তার পরিচয় সে নিজেই দেয়। তুমি শুধু সম্মত হও, আমি সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌ব্ব।"

কল্পনা যেন অন্তরে কিসের আলোড়ন অনুভব কর্‌ল। এই মুহূর্ত্তে যেন সে বুঝ্‌তে পার্‌ল—সে নারী। তার সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে—তাকে কেন্দ্র করে একটা সংসারের সৃষ্টি হ'তে পারে—সে ব্যক্তিবিশেষের অন্তরে আনন্দের প্রস্রবণ বইয়ে দিতে পারে।...মাতা-পিতার কঠোর শাসনই শুধু তা'র জন্য সৃষ্টি হয় নি—সেও একদিন জননীর স্থান অধিকার কর্ব্বে—গৃহিণীর কর্ত্তৃত্ব কর্‌ব্বার অধিকার তা'রও আছে।...

পাষাণ প্রতিমায় সেই মুহূর্ত্তে বুঝি প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল।

কল্পনার আকর্ণবিস্তৃত চোখ দু'টির প্রান্ত বেয়ে মুক্তার মত উজ্জ্বল কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়্‌ল।

টেবিলের উপর কেরোসিনের ল্যাম্পটা বড় উজ্জ্বল-ভাবে জ্বল্‌ছিল। অশ্রুমুখী তরুণীর সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বেড়ে গেল। মিলন কেমন যেন মোহযুক্ত হয়ে পড়্‌ল... পরম স্নেহে ভীত শিশুর মত কল্পনাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে আবেগ-রুদ্ধ-কণ্ঠে বল্লে, "বলো কল্পনা, তুমি আমাকে বিয়ে কর্ব্বে? বলো, বলো?"

সে কেমন যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল...হয় ত বা নিজের অজ্ঞাতে তা'র ওষ্ঠ কল্পনার সুকুমার অ-মলিন ললাট স্পর্শ করে ফেলেছিল একবার।

কল্পনার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিজেকে মিলনের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে সে একটু সরে দাঁড়ালো। চোখ দুটো মুছে নিয়ে ধীরভাবে বল্লে,

"আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু, আপনার দান আমি গ্রহণ কর্ত্তে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি আপনার উপযুক্তা নই। আপনি আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন।" বলেই সে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হ'ল।

মিলন আহতভাবে বলে উঠ্‌লো, "একটি কথা বলে যাও কল্পনা, আমাকে তুমি ভালবাস। আমি সমস্ত বাধা তুচ্ছ জ্ঞান কর্ব্ব। শ্রোত্রীয় বলে আমি কি সত্য-ই হীন? বিংশ শতাব্দীতেও কি এই সব কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে হবে?"

কল্পনার মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। প্রাণপণে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে মৃদুস্বরে বল্লে, "আপনার কথা-ই হয়ত ঠিক্। কিন্তু, এ বংশগত বৈষম্যের ভ্রান্ত ধারণা যতদিন পর্য্যন্ত না সমাজ হ'তে দূর হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের মত অনেক নগণ্যা মেয়েকেই সমাজের কাছে তাদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। আমার মত অনেক হিন্দুর মেয়ের জীবন সমাজের যূপ-কাষ্ঠে বলি পড়ে—আপনি ক'জনকে তাদের দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা কর্ব্বেন?...আপনি কাল্‌কেই কোলকাতা চলে যান। আমার দুঃখ দূর কর্ত্তে স্বয়ং বিধাতাও পার্ব্বেন না।...আর আমি এত দুর্ব্বল যে, যে বিয়েতে বাবা-মায়ের সম্মতি নেই, আমি তা'তে মত দিতে পারি না।"—বলে সে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেল। একবারও আর পিছন ফিরে চাইলো না।

মিলন মুহ্যমানের মত শয্যায় ফিরে এল। কল্পনার কথা শুনে তার উপর শ্রদ্ধায় তার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। নিজের মনে সে কল্পনাকে উদ্দেশ করে বল্লে, "তুমি আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান কর্লে—হয়ত এ ভালোই হল।...ঝোঁকের মাথায় তোমার অমর্য্যাদা যদি কিছু করে থাকি, তুমি নিজগুণে সেটা ভুলে যেও। এজন্মে তোমাকে পেলুম না বটে, কিন্তু, পরজন্মে তোমায় নিশ্চয়ই পাব! তুমি দেবী, তোমাকে পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে তবে তোমাকে কামনা কর্ব্ব। এ জন্মের মত এই শেষ—কল্পনা, আর আমি তোমার সাম্‌নে আস্‌ব না! কালই আমি চলে যাব। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও।"

পাঁচ বছর কেটে গেছে।

এক সিনেমা-গৃহে সহসা উভয় বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। নীতিশ আনন্দে চীৎকার করে বল্লে, "আরে, কেও মিলন যে! বলি এতদিন কোথায় নিখোঁজ হয়েছিলি? সেবার মামার বাড়ী নিয়ে গেলাম তোকে, তুই ক'দিন পরেই সেই যে চম্পট দিলি—এ পর্য্যন্ত আর তোর পাত্তাই পেলুম না। কোথায় ছিলি এতদিন?"

মিলন হেসে বল্লে, "গা-ঢাকা দিয়েছিলুমরে—এই ক'বছর শুধু পশ্চিমের সহরে সহরে ঘুরে বেড়িয়েছি। আজ মাসখানেক হ'ল দেশে ফিরে এসেছি। তারপর তোদের খবর কি বল্?"

নীতিশ এবার সলজ্জে হেসে বল্লে, "আমার খবরটা অবশ্য একটু নতুন। হপ্তাখানেক হ'ল বিয়ে করেছি—বৌ খুব সুন্দরী হয়েছে। যাস্ একদিন দেখ্‌তে। তুইও এইবার বিয়ে কর্, আর আইবুড়ো থাকা ভাল দেখায় না।"

বিয়ের কথায় মিলনের মুখ বেদনায় মলিন হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, "সে আর হয়ে উঠ্‌বে না ভাই এ জীবনে! ছেড়ে দে ওসব কথা। হ্যাঁরে, তোর মেজমামার মেয়ে কল্পনার বিয়ে হয়েছে? বেচারী কি কষ্টই না সহ্য করেছে!..."

নীতিশের চোখ ছল্‌ছল্ কর্ত্তে লাগ্‌ল; সে বল্লে, "ওর জীবনটাই কষ্টের! তুই চলে এলি, তার দিনকয়েক পরেই একটা বিয়ের সম্বন্ধ এল। পাত্র চতুর্থ-পক্ষের—বৌ মরে গেছে বলে আবার বিয়ে কর্ত্তে চায়। ঘরে একপাল ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাত্‌নী আছে। মস্তকুলীন সে; কল্পনাকে দেখেই পছন্দ করে ফেল্লো। এক পয়সা নেবে না। মামা ত মহাখুসী! আমি বল্লুম, 'মেজ মামা, মেয়েটার এমনি করে সর্ব্বনাশ কর্ব্বেন না—আমাকে কিছুদিন সময় দিন—ভাল ছেলে এনে দেব।'

"মেজমামা বল্লেন, 'তোমরা সব আজকালকার ছোক্‌রা, গুরুজনের উপর কথা বল্‌তে খুব মজবুত। আমার মেয়ের আমি যেখানে খুসী বিয়ে দেব—তা'তে তোমার কি?'

"মনে ভারি রাগ হ'ল। বল্লুম, 'আমার আর কি? আপনি মানুষ হ'লে নিজের মেয়েকে ঐ ঠাকুরদাদার বয়সী ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতেন না।'

"মেজমামা যাচ্ছেতাই বলে গাল দিলেন আমায়। আমি পরদিন বাড়ী চলে এলাম। দিনকয়েক পরে শুন্‌লাম, বিয়ে হয়ে গেছে। কল্পনা তার বাবার পা জড়িয়ে ধরে না কি বলেছিল, 'আমাকে বিয়ে না দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিন, আমি চলে যাই—না হয় একটু বিষ এনে দিন্, খেয়ে জ্বালা দূর করি আপনাদের।'

"বাপ তার কোন কথায় কান দেয় নি। বিয়ের পর জানা গেল—জামায়ের 'থাইসিস্' হয়েছে। মাস চারেক পরেই কল্পনা শাদা থান পরে বাপের বাড়ী এসে উঠ্‌ল। এখনো সেখানেই আছে। তার সেই পূর্ব্বের জীবন-যাত্রার এতটুকু অদল বদল হয় নি—না, ভুল বলেছি, কিছু হয়েছে—মাসের মধ্যে দুটো একাদশী এবং বিধবার অন্যান্য অবশ্যকরণীয় ব্রত-উপবাস এ সব আছে। মাসখানেক পূর্ব্বে গিয়ে দেখে এসেছি। তার স্বভাব এতটুকু বদলায় নি—এতবড় একটা ঝড় যে ওর উপর দিয়ে বয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে তা'র কোন হুঁসই নেই। আমাকে বল্লে, ও না কি আগে থেকে এমনই নিশ্চিন্ত হয়েছে।...ও মনে করে, ওর বিয়েই হয় নি মোটে...অন্তর ওর কুমারীর মতই নির্ম্মল আছে। বাইরের সংস্কারে কি আসে যায়! আর একটা কথা, ও তোর সম্বন্ধে বেশ আগ্রহের সাথেই আমাকে অনেক প্রশ্ন কর্‌ল। আমি যখন বল্লুম, তুই কাউকে কিছু না বলে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছিস্। তখন ও একটা নিশ্বাস ছাড়্‌ল—ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌ল; আমার কাছ থেকে সরে গেল। এর কারণ কিছু জানিস্ মিলন?"

মিলন গভীর আবেগে নীতিশের হাত চেপে ধরে উন্মত্তের মত চীৎকার করে বল্লে, "এর কারণ ছিল অনেক—তুই সে-সব বুঝবি নি। কল্পনাকে তুই বলিস্ নীতিশ, মিলন নামে তা'র যে এক দীনভক্ত ছিল, সে নিজের সমস্ত অর্থ দিয়ে তার জীবনের ধ্রুবতারা কল্পনার মত অকালবৈধব্যে যারা পিতৃগৃহে আশ্রয় নেয়—সেই সব দুভাগিনীদের সাবলম্বী হবার জন্য কয়েকটী জেলায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর্ব্বে—বিদায় বন্ধু!"

সে ত্বরিতপদে রাস্তার জনস্রোতে মিশে গেল।

বায়স্কোপ-ফের্ত্তা দর্শকদের উচ্চ হাসি-গল্পের মাঝখানেও নীতিশ মিলনের অন্তরের গোপন বেদনা বুঝ্‌তে পার্ল। সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে সে বাড়ীর রাস্তা ধর্ল।

শ্রীমতী রাণী দেবী
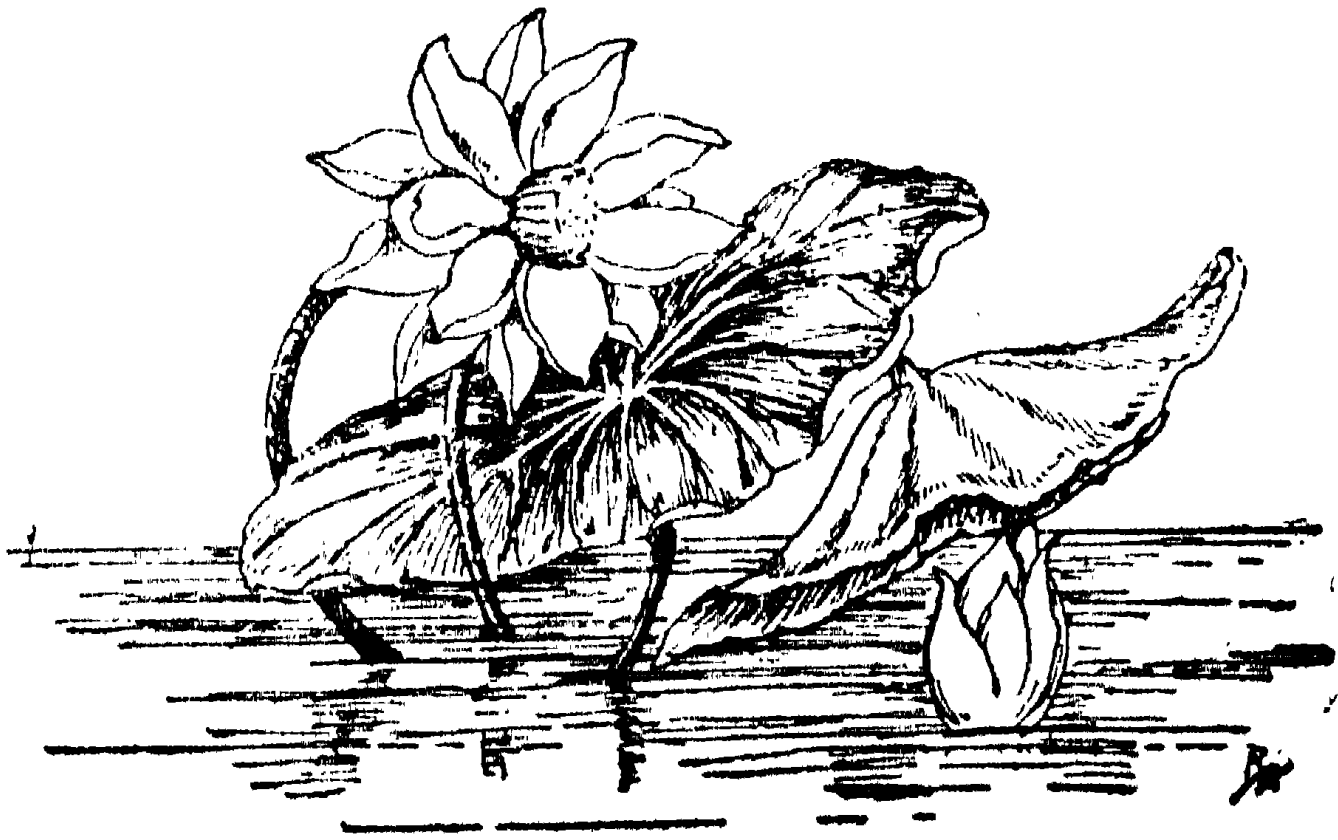
কলঙ্কিনী

শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র, বি-এ

অন্ধকার গলির মধ্যে দ্বিতলবাটী। বালি খসিয়াছে, ইট বাহির হইয়াছে, দেয়াল হেলিয়াছে। বাড়ীওয়ালা উহারই উপর সম্প্রতি এক পোঁচ্ চূণ বুলাইয়া আরও একঘর নূতন ভাড়াটিয়ার আশায় দরজার মাথায় 'বাড়ী ভাড়া'র বিজ্ঞাপন ঝুলাইয়াছেন।

কতজন ভাড়াটিয়া যে ঐ বাড়ীতে বাস করে তাহার সংখ্যা হয় না। বাহির হইতে বাড়ীটা ক্ষুদ্র দেখায়, কিন্তু ভিতরটা বৃহৎ। ছোট্ট একটা উঠান—উহাকেই ঘেরিয়া প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ।

ঐ বাড়ীর দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া মহীতোষ তাহার স্ত্রী ও অনেকগুলি নাবালক পুত্রকন্যা লইয়া বাস করে। কষ্টের সংসার। অনটন, অসচ্ছলতা,—তাহার উপর বিমলা সংসারে একাটি। একহাতে অফিসের ভাত, অন্য হাতে কচি কচি ছেলেদের হেঁপাজত—কি করিয়া বিমলা সে সকল দিক্ বজায় করে, আশ্চর্য্য! নীচের একঘর ভাড়াটিয়ার একটি মেয়ে মাঝে মাঝে উপরে আসিয়া তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করে।

মেয়েটি বিধবা—বাল-বিধবা। বিবাহের দুইমাস পরে হঠাৎ স্বামী 'টায়ফয়েডে' মারা যান। স্বামীর ঘর আর তাহাকে করিতে হয় নাই। মা-বাপের কাছেই থাকে। হাসিয়া-খেলিয়া নিশ্চিন্তে বেড়ায়—যেন কুমারী।

এই মেয়েটি বিমলার দক্ষিণ হস্ত। সুশীলা না থাকিলে যে কি মুস্কিল হইত তাহা বলিবার নয়! কৃতজ্ঞচিত্তে বিমলা স্বামীকে জানায়, "দেখো, ভগবান জুটিয়ে দেন!"

বিমলার ছেলেমেয়েগুলি যেন সুশীলার প্রাণ। কোলের ছেলেটির ঠিক্ যেটি উপরে, তাহার ঘ্যান্ঘ্যান্ প্যান্প্যানের জ্বালায় সমস্ত বাড়ীটাই অস্থির। সুশীলা কি ভাবে যে তাহার ঝক্কি সহ্য করে, তাহা তাহার মা-বাবাও ভাবিয়া পায় না।

সুশীলা এম্নিই উপকারী মেয়ে যে, সেবার বিমলার আঁতুড় অবস্থায় রাঁধিয়া পর্য্যন্ত মহীতোষকে সময়মত ভাত দিয়াছে ও ছেলেদের দেখাশোনা করিয়াছে।

কাজেই সুশীলা বিমলার সংসারে কে এবং কতখানি তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। সুশীলারা বহুদিন হইতে এই বাড়ীতে ভাড়াটিয়া আছে। মহীতোষ দুই বৎসর হইল এখানে আসিয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে সুশীলা আরও ছোট্টটি ছিল, এখন সে বেশ বড় হইয়াছে। আগে সে নির্ব্বিবাদে নিঃসঙ্কোচে যখন-তখন উপরে আসিত এবং বিমলার সহিত হাস্য-কৌতুক করিত। এখন মহীতোষকে দেখিলে লজ্জা করে এবং সে বাড়ী থাকিলে হঠাৎ উপরে আসিতে চাহে না। প্রয়োজন খুব বিশেষ না হইলে—মহীতোষের সহিত কথা কহে না। বিমলা মুখ টিপিয়া হাসে, সুশীলা মুখ লাল করিয়া পলায়।

বিমলা ভাবে, সুশীলা ত আর বালিকা নয়, কাজেই এ লজ্জা তাহার স্বাভাবিক।

সেদিন ছোট ছেলেটা বেজায় বাহানা ধরিল। রবিবার, রান্নার তাড়াহুড়া ছিল না। বিমলা মহীতোষকে বলিল, "শুয়ে আছ, ছেলেটাকে একবার কাছে ডাক না। আমার এখনো একরাশ কাপড় সাবান দেওয়া বাকী।"

মহীতোষ বই পড়িতে পড়িতে বলিল, "ডেকে দাও—আয়রে নটু।"

ছেলেটার চীৎকার সুশীলার কানে পৌছিয়াছিল। একবার সে উপরে আসিবার জন্য হাতের পশম ও কুরুষ-কাটি নামাইয়া রাখিল, আবার কি ভাবিয়া তাই উঠাইয়া লইল। মনে মনে মহীতোষের উপর বিরক্ত হইল—ছেলেটাকে কি একবার নেওয়া যায় না।

ছেলেটা তেমনিভাবে চীৎকার করিতে লাগিল। যদি নাই নেওয়া যায়, তবে ছুটির দিনেও মেয়েমানুষের মত ঘরের কোণে থাকা কেন? সুশীলা ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের কুরুষ-কাঠিটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া সোজা উপরে উঠিতে গেল।

হঠাৎ সিঁড়ির কোলে কলঘরে বিমলার সাড়া পাইয়া চম্‌কিয়া দাঁড়াইল—এবং পরমুহূর্ত্তে পিছন ফিরিয়া আপনার ঘরে চলিয়া আসিল।

মহীতোষ ছেলেটার অবিশ্রান্ত ক্রন্দনে বিরক্ত হইয়া সহসা বিছানা হইতে আসিয়া তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "থাম্, চুপ কর্, নীচে যা', দূর হ'।"

সুশীলা দ্রুতবেগে উপরে উঠিয়া আসিয়া ছেলেটাকে মহীতোষের ঘরের মেঝে হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া অশান্তকণ্ঠে বলিল, "মারা কেন, আমাকে ত ডাক্‌লেই হ'ত—মণ্টুকে দিয়ে ডাক্‌লেই হ'ত।"

মহীতোষ বলিল, "আমি ভাব্‌ছিলুম, তুমি হয় ত স্নান করতে গেছ, বা নীচে কাজে ব্যস্ত আছ।"

সুশীলা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "এরা ছাড়া আর আমার কাজ কি...না না, কাজ থাক্‌লেই বা কি, আর না থাক্‌লেই বা কি—আপনি ত আর একটিবার এদের ছোঁবেন না।" বলিয়া একটু দম ফেলিল।

মহীতোষ বলিতে যাইতেছিল, "তুমি ত আছ"—কিন্তু ও কথা না বলিয়া বলিল, "নিজের কি না তাই ভাল লাগে না, পরের হ'লে ভাল লাগ্‌ত, নিতাম।"

সুশীলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মহীতোষ তাহা লক্ষ্য করিল। দরজার বাহিরে আসিয়া সহসা সুশীলা বালিকার মত বলিয়া উঠিল, "কি যে সব আপনি বলেন। ও রকম কর্‌লে আর আমি আপনার কাছে আস্‌বো—"

"কেন আস্‌বি নে শুনি"—বলিয়া বিমলা একহাতে সাবান কাচা কাপড়ের কাঁড়ি ও অন্যহাতে এক বাল্‌তি জল লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুশীলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। "ছেলেটাকে নামিয়ে দিয়ে কাপড়গুলো একবার ধর্ দেখি।" কাপড় ধরিবার জন্য সুশীল হাত বাড়াইল, কিন্তু সাম্‌লাইতে না পারিয়া সব মেঝের ধূলা-কাদার উপর ফেলিয়া দিল।

"পড়ে গেল, আচ্ছা থাক্ থাক্" বলিয়া বিমলা সুশীলাকে সান্ত্বনা দিল। পুনরায় বলিল, "আবার আমি নীচে যাব, কেচে আন্‌বো।"

সুশীলার বলা উচিত ছিল, "না দিদি, তোমায় যেতে হবে না। এই ত এলে আমিই যাচ্ছি"—কিন্তু তাহাও সে বলিতে পারিল না।

করুণ চক্ষে একবার সে মহীতোষের পানে চাহিল—দেখিল, মহীতোষ তাহার অবস্থা দেখিয়া মৃদু হাসিতেছে।

ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া সুশীলা লজ্জার মাথা খাইয়া বিমলার সম্মুখেই মহীতোষকে বলিয়া উঠিল, "আপনার জন্যই ত এই কাণ্ড ঘটলো!"

মহীতোষ বলিল, "বাঃ, আমি কি কর্‌লাম!"

বিমলা কাপড় কুড়াইয়া লইয়া আবার নীচে নামিয়া গেল। সুশীলা মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া মণ্টুকে হঠাৎ 'ঢিপ্' করিয়া মহীতোষের পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া কাঁদাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

"যেও না, শোনো, রাগ করো না" মহীতোষ ডাকিল।

সিঁড়ির উপর হইতে সুশীলা বলিল, "না।"

"শোনো, ছেলেটা বড্ড কাঁদচে, নিয়ে যাও।"

"আস্‌চি" বলিয়া সুশীলা উপরে না আসিয়া নীচে কলঘরে ঢুকিল।

সেদিন সকালে আসিয়া মণ্টু বলিল, "মাসীমা, মায়ের কাল রাত থেকে বড্ড জ্বর হয়েচে, বাবা তোমায় ডাক্‌চেন।"

"ডাক্‌চেন? দিদির জ্বর হয়েচে? আচ্ছা যাচ্ছি।"

উপরে পৌছিতেই মহীতোষ কোলের ছেলেটাকে শয্যাগত বিমলার কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, "এই ত অবস্থা—এখন যা' হয় কর।"

"জ্বর হয়েচে তা' নীচে কেন শুয়ে দিদি, খাটের ওপর উঠে শোও।" বলিয়া ছেলেটাকে বুকে তুলিয়া লইল।

"আমি হোটেলে-টোটেলে খাব 'খন—তুমি যা' হয় এদের কিনে-কেটে এনে খাইয়ো, আমার সময়ও আর বেশী নেই।" মহীতোষ বলিল।

সুশীলা একটু রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "কবে আপনি হোটেলে খেয়েছেন যে, আজ খাবেন।"

বিমলা জড়িতকণ্ঠে বলিল, "সুশীলা, তুই আর রান্নার ন্যাটা করিস্ নে —আজকের দিনটা কাটিয়ে দে—কাল জ্বর ছেড়ে যাবে—নতুন জ্বর, ক'দিন আর থাক্‌বে।"

সুশীলা বলিল, "না দিদি, তা' হয় না; না খেয়ে কি অফিস করা যায়—তা' ছাড়া, ছেলেরাও কি সব শুকিয়ে থাক্‌বে না কি?"

"আমি না হয় হোটেলেই—"

"না, হোটেল আপনার সহ্য হয় না, হবে না"—বলিয়া সুশীলা কোন কথায় আর কান না দিয়া ছেলেটাকে বিমলার বড় মেয়ের কোলে দিয়া রান্নাঘরে গেল।

একদিনে বিমলার জ্বরটা গেল না। অন্ততঃ আরও তিন-চারদিন সে যে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না, সেটা বেশ বুঝা গেল। ডাক্তার আসিল। ঔষধ দিয়া গেল।

সেদিন রাত্রে আহার করিতে বসিয়া মহীতোষ সুশীলাকে একা পাইয়া বলিল, "সত্যই তোমার ঋণ জীবনে কোনদিন শোধ কর্‌তে পারবো না! তুমি যা' কচ্ছ, যা' করেছ—"

বাধা দিয়া সুশীলা হাসিয়া বলিল, "খাবার সময় কথা কইতে নেই চুপ করে খান।"

"ঠাট্টা নয়, সত্যিই বল্‌চি।"

"আলু চচ্চড়িটা খেলেন না যে, ভাল হয় নি বুঝি?"

"না না, বেশ হয়েছে। এই ত খাচ্চি।"

"অনিচ্ছার ওপর খাবেন না, খেলে হজমের ব্যাঘাত হবে"—বলিয়া সুশীলা ফিক্ করিয়া হাসিল।

"তুমি যে আমার—আমাদের কতখানি উপকারী আত্মীয়—"

"আত্মীয় নয়, প্রতিবেশী।"

"তাই হ'ল। কিন্তু তা' আর বল্‌তে পারি নে। তুমি না থাকলে আমার ছেলেগুলো মানুষই হ'ত না—কারণ, বিশেষ এই সব দায়-বিপদের সময়"—বলিয়া মহীতোষ গ্রাস তুলিয়া জল পান করিল। পরে পুনরায় মুখ নীচু করিয়া আহার করিতে করিতে বলিল, "এসময় কাচ্চাবাচ্চাগুলো হয় ত অনাহারে শুকিয়ে মরত। রুগীকেই বা দেখ্‌তো কে? আমি ত অফিসে। তুমি যেন পূর্ব্বজন্মে আমাদের কেউ ছিলে। এ-জন্মে ভাগ্যক্রমে……"

হঠাৎ মহীতোষ মুখ তুলিয়া দেখিল যাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে কথা বলিতেছে, সে নাই। সুশীলা ইতিমধ্যে কখন উঠিয়া গিয়াছে।

নীরবে আহার শেষ করিয়া মহীতোষ রান্নাঘরের বাহিরে আসিতে দেখিল, সুশীলা দালানের এককোণে দাঁড়াইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছে।

"কাঁদ্‌ছ তুমি? কি হয়েছে?" মহীতোষ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল।

"কিছু হয় নি, যান্।·· কই কাঁদছি?…হাঁ, কাঁদচি ত। রাত দুপুর হ'য়ে গেল, আমার কি ঘুম পায় না"—বলিয়া সুশীলা পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিল।

লজ্জিত হইয়া মহীতোষ বলিল, "তা' তুমি এবার শুতে যাও। এত রাত্তির অবধি আমার জন্য বসেই বা থাকো কেন?"

মনে মনে মহীতোষ বড়ই অপ্রতিভ ও আহত হইল—সত্যই ছেলেমানুষ কি এতটা সহ্য করিতে পারে? উপকার করে বলিয়া, তাহারও কি এতটুকু চক্ষুলজ্জা নাই।

রান্নাঘরের কাজ মিটাইয়া ও ছোট ছেলেটাকে দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া সুশীলা নীচে চলিয়া গেল। কোন কথা আর কহিল না।

পরদিন সকালে উঠিয়া মহীতোষ স্থির করিল, সুশীলাকে রান্নাবান্না করিতে নিষেধ করিবে--সে হোটেলেই খাইবে

এবং রাত্রে হোটেল হইতে খাইয়াই বাড়ী ফিরিবে। ছেলে-মানুষের উপর আর সে অত্যাচার করিবে না; অন্ততঃ, নিজের জন্য ত নয়ই।

কিন্তু দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই বুঝিল সুশীলা কখন আসিয়া স্নান সারিয়া রান্না সুরু করিয়া দিয়াছে। মহীতোষ আর কিছু বলিতে পারিল না।

আহার করিবার সময় মহীতোষ একটু অতিরিক্তমাত্রায় নীরব। সুশীলা তাহার সরল হাসি হাসিয়া বলিল, "কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে কি বলেছিলুম, সে কথা বুঝি এখনও ভুল্‌তে পারেন নি ?"

"না তা' নয়।"

"হাঁ তাই।"

মহীতোষ সুশীলার দিকে একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল, সুশীলা হাসিতেছে; কিন্তু মুখখানা তাহার ভারী শীর্ণ—যেন গত রাত্রে সে ঘুমায় নাই।

খানিক পরে সুশীলা বলিল, "বাজে কথা মনে রাখ্‌তে নেই"—বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন"—বলিয়া আবার চলিয়া গেল।

বিমলার অসুখ সারিয়াছে। ভারী দুর্ব্বল। একবার বাপের বাড়ী হইতে ঘুরিয়া আসিতে পারিলে হইত ভাল। কিন্তু মহীতোষ বলিল, "আমার চল্‌বে কি করে ?"

সুশীলাও বলিল, "না দিদি, যাওয়া তোমার চলে না।"

সুশীলার মুখে এ কথা শুনিয়া বিমলা একটু আশ্চর্য্য হইল। মনে মনে একটু আঘাতও পাইল। সুশীলা ত এমন কথা বলিবার মেয়ে নয়। তবে ? বিমলার মনটা একটু তিক্ত হইল। মনটা যেন বলিতে চাহিল—হাজার হোক্ পর ত বটে!

বিমলার আর যাওয়া হইল না। সুশীলা আগের মত তাহার কাছে আসে ও কাজকর্ম্ম করে। কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর—এবং কি যেন ভাবে।

সুশীলা আর তেমনভাবে হাসে না। বিমলার ঠাট্টা-বিদ্রুপেও আর সেভাবে যোগ দেয় না। ভাল কথা, ধর্ম্ম-কথা, রামায়ণ মহাভারতের কথা উঠিলে সেকথা মন দিয়া শুনে ও তাহা লইয়া আলোচনা করে।

ইদানীং সুশীলা মাঝে মাঝে বিমলার কাছে আসিতে বিলম্ব করে বা আসে না। কারণ, ও মহলটায় একঘর নূতন ভাড়াটীয়া আসিয়াছে—এক বৃদ্ধা আছেন, রামায়ণ মহাভারত তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ; তাঁহার নিকট গিয়া সুশীলা শাস্ত্রকথা শিখে এবং বৃদ্ধাও না কি তাহাকে বড়ই ভালবাসেন।

বৈকালে বৃদ্ধার ঘরে প্রতিদিনই একটা মেয়েদের জটলা বসে। সুশীলা বিমলাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। সেদিন গ্রামোফোন আসিয়াছিল। বৃদ্ধার ঘরে বসিয়া 'সাবিত্রী' পালা বাজান হইল।

একদিন বৃদ্ধা ব্রহ্মময়ী সুশীলাকে বলিলেন, "মা, বিধবা তুমি। সর্ব্বদাই ধর্ম্মে মন রেখো ও মনে মনে মৃত পতির কথা চিন্তা করো।"

সুশীলা বুঝিয়াছে, সে বিধবা। স্বাধীন বিচরণ, স্বাধীন আলাপ-সম্ভাষণ তাহার পক্ষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কঠিন বিধি-বন্ধনে আপনাকে এবার আবদ্ধ রাখিতে হইবে; আর শিথিলতা চলিবে না।

তাই সুশীলা গোপনে আহ্নিক জপতপ করে—অন্ততঃ করিবার চেষ্টাও করে। ব্রহ্মময়ী কতক কতক তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, সে সেইমত করে। জানে না কিছুই, বুঝেও না কিছুই। তবু ছেলেখেলাটুকু করে—কেমন তাহাতে একটু যেন তৃপ্তি পায়।

আহ্নিকে বসিয়া সে স্বামীর কথা চিন্তা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে যাহার কথা তাহার মনে আসে, তাহাতে সে অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠে!

সর্ব্বনাশ, সে যে পরপুরুষ! পরপুরুষের চিন্তা বিধবার পক্ষে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। প্রাণপণ করিয়া সুশীলা মৃত স্বামীর মুখের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে যে বহুদূর—বহুদিনের পথে—বহুদিনের পিছনে। মনে ত তেমন আসে না। উপায়!

বিমলার ঘরে সুশীলা আজকাল আর মোটেই আসে

না। ডাকিলেও 'যাচ্ছি' বলিয়া আর যায় না। ছেলেগুলার কান্না শুনিলে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে, হয় ত নীরবে বসিয়া কাঁদে, তবু উপরে আসে না—তাহাদের চুপ করায় না।

সেদিন মহীতোষ বিমলার সহিত ঝগড়া করিয়া না খাইয়া অফিস গেল। সুশীলা উপরে আসিলে বিমলা কাঁদিয়া বলিল "সব দেখ্‌লি ত সুশীলা। কি দোষ আমার? সারারাত ছেলেটার জ্বর, একটুও ঘুমুতে পারি নি। সকালে সময়মত রেঁধে দিতে পারি নি বলে আমার ওপর তম্বি, অকথা-কুকথা। আর সহ্য করতে পারি না। মর্‌লেই আমার শান্তি।"

ছেলেটার অসুখ এবং মহীতোষ অনাহারে অফিস গিয়াছে শুনিয়া সুশীলা আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া জ্বর-কাতর ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইল, এবং নিজের চোখের জল মুছিয়া ছেলেটার চোখের জল মুছাইয়া দিল।

সুশীলা বলে, "দিদি, যখনই তোমার দরকার হবে আমায় ডেকো, সঙ্কোচ করো না।"

বিমলা কিছু বলে না। কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে সুশীলার পানে চায়।

সুশীলা থাকিয়া থাকিয়া আবার পূর্ব্বের মত বিমলাকে সাহায্য করে। সুশীলা মনস্থির করিয়াছে—জপতপ আহ্নিকের বয়স তাহার ইহা নয়, পরে হইবে। কাজেই বিমলার বাড়ীতেই আবার সে দিবারাত্রি থাকে।

ব্রহ্মময়ী সুশীলার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন। সুশীলার চাল-চলন, অর্থাৎ বিমলার বাড়ী তাহার আসা-যাওয়া ও রাত্রিদিন থাকা তাঁহার মোটেই ভাল লাগে না। সুশীলার মনও তাঁহার অবিদিত নয়; তাহার মনের কোণে একটা যে দুর্ব্বলতা আছে তাহা বৃদ্ধার অজানা নাই। একদিন ব্রহ্মময়ী সুশীলাকে ডাকিয়া একথা সেকথার পর বলিলেন, "আমার কাছে কিছু গোপন করো না, আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। এখনও বল্‌ছি সতর্ক হও।"

সুশীলা জবাব দিল, "সতর্ক হবার কিছু নেই"—বলিয়া সে নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

ব্রহ্মময়ী অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"বটে!"

সুশীলার সম্বন্ধে একটা চাপা আলোচনা সম্প্রতি হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায়। ভাড়াটিয়াদের সকল মেয়েরাই কি যেন একটা রহস্য লইয়া পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে, অথচ স্পষ্ট কিছু বলে না। বৃদ্ধার ঘরে জটলাটা আজকাল একটু দীর্ঘকালস্থায়ী হয় বলিয়া মনে হয়।

সুশীলা বুঝিতে পারে সমস্তই। কখন অগ্রাহ্যভরে তাহা উপেক্ষা করে, কখনো ব্যথিত-চক্ষে অন্যান্য মেয়েদের মুখের পানে চাহিয়া থাকে।

বিমলার মা মৃত্যুশয্যায়। মেয়েকে শেষ দেখা দেখিতে চাহিয়াছেন। বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে সুশীলার উপর স্বামীর ভার রাখিয়া একদিন ছেলেগুলিকে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

সুশীলা মহীতোষকে বলিল, "এইবার তবে হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করুন।"

মহীতোষ বিস্মিতভাবে সুশীলার মুখের পানে চাহিল; চাহিয়া বলিল, "অবস্থা তাই।"

মহীতোষ হোটেলেই দু'বেলা খায়। যখন সে অফিসে বাহির হইয়া যায়, সুশীলা তাহার ঘরে আসিয়া বিছানা-পত্র গুছাইয়া রাখে।

মহীতোষও আর কোনো অনুরোধ করে না—সুশীলাও কাছে আসে না। মহীতোষ না জানুক, সুশীলা জানে; এ বাড়ীর সকল মেয়ে তবুও গভীর দৃষ্টিতে তাহাদের দু'জনের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে।

হঠাৎ একদিন মহীতোষ অফিস হইতে বেলা দুপুরের সময় গাড়ী করিয়া আসিয়া হাজির—সে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে।

বাড়ীর সকলেই বলিল, "হাসপাতালে পাঠান হোক্।"

সুশীলা বলিল, "না, হাসপাতালে কেন, অসুখ ত তেমন কিছু নয়, বাড়ীতেই সেরে যাবে।"

একজন বলিল, বাড়ীওয়ালাকে খবর দেওয়া হোক্।"

সুশীলা ব্রহ্মময়ীর হাত ধরিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া বলিল, হাসপাতালে গেলে উনি আর বাঁচবেন না।"

তীব্র-দৃষ্টিতে ব্রহ্মময়ী একবার সুশীলার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ"—বলিয়া ঘৃণাভরে হাত টানিয়া লইলেন।

সারারাত কেহ আর কাছে আসিল না, এতটুকু সাহায্য করিল না। সুশীলা একা মহীতোষের সেবা করিতে লাগিল।

মহীতোষ সাম্‌লাইয়া উঠিল। বিমলা পরদিনই ছেলেদের লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুশীলাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বোন্, সব শুনেচি—তুই ছিলি বলেই উনি প্রাণ ফিরে পেলেন, নইলে—"

কিন্তু সুশীলার এবাড়ীতে থাকা আর সম্ভব হইল না। প্রকাশ্যভাবে সকলে এবার বলিতে লাগিল, সুশীলা চরিত্র-হীনা—কলঙ্কিনী। অন্যান্য ভাড়াটিয়ারা দলবদ্ধ হইয়া বাড়ীওয়ালাকে জানাইল, সুশীলাকে ঐ বাড়ী হইতে না উঠাইয়া দিলে তাহাদের পক্ষে ছেলেপুলে লইয়া এখানে বাস করা অসম্ভব।

সুশীলাদের উপর একমাসের নোটিশ পড়িল।

মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে সুশীলারা বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল। যাইবার সময় সুশীলা ব্রহ্মময়ীকে একটা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যেন কাহার উপর তাহার কোন অভিযোগই নাই।

ব্রহ্মময়ী অপালক দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র

পরশ

প্রকাশ বসু

আজ সাত সাত বছর ধরে হানাহানির রণারণির পর মনে হচ্ছে, শান্তির মোহানায় এসে পৌঁচেছি। আজ বিশ্বাস হচ্ছে, এই সাত বছর যে ছোট একটু ঘটনার জের টেনেছে, তাকে আমি সত্যিকার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পারব। তাই এমনি করে একটা গোপন গুহার ওপর থেকে কুয়াসার পর্দ্দাটা সরিয়ে নিতে সাহসী হচ্ছি।

মফঃস্বল কলেজের চাকরীটা ছেড়ে যে আমি কোল্‌কাতায় এলুম, তার কারণ, খুঁজলে পরে মনের মত একটা মনোজগতের আবহাওয়া পাওয়া যায়; কিন্তু মফঃস্বলে অনেক স্থলেই তা' মেলা ভার। এই মহানগরীকে আমি বারবার প্রণাম করি; আমি জানি, সে আমার শরীর মনে কতখানি ঘুম ধরিয়েছে, কিন্তু তার বাইরেও আমি শান্তি পাই নি।

যে বাড়ীটাতে উঠ্‌লুম, সৌভাগ্যক্রমে তার খান চার বাড়ী পরেই পাওয়া গেল একটি চেনা লোককে। সে প্রতুল—এরা আমাদের দেশে আমাদের পাশের বাড়ীরই লোক। প্রতুল পড়ত আমার একটা ক্লাস ওপরে,—কিন্তু তা'তে আমাদের অবাধ মেলামেশার কোনোদিন অসুবিধা হয় নি। তার বাবা উমাচরণবাবু পেন্‌সন নিয়ে কোল্‌কাতায় থাকেন; আর প্রতুল আলিপুরের উকীল।

প্রতুলচন্দ্রের সাথে দেখা হতেই সে তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে তার মা ও বাবার সাম্‌নে আমায় হাজির করলে। এমন কি, সে ছেড়ে দেওয়ার সময় বারবার আফ্‌শোষ করলে যে, তার স্ত্রী এখন বাপের বাড়ীতে—নইলে সে শুভ-কার্য্যটুকুও বাদ যেত না। পরে অবশ্য সে কর্ম্মটুকু যত শীঘ্র সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার পূর্ব্বেই তার মা ও বাবা আমাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছিলেন। আমার এই বিদেশে অসহায়,—কেন না আমি অবিবাহিত,—জীবনটা তাঁদের যেমনি উদ্রেক করেছিল দয়া, তেমনি উদ্রেক করেছিল স্নেহ। ও দু'টি জিনিস দিয়ে তাঁরা একেবারে আমায় তাঁদের কাছে টেনে নিলেন।

উমাচরণবাবুর পরিবারে বছর দুই আগে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল;—সে যখন তাঁর মেয়ে মাধুরী বিধবা হয়। মাধুরীকে আমরা দেখেছিলুম, বছর দশের একটি চঞ্চল সুন্দর বালিকা,—চঞ্চল, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি। আর সেদিন তাকে দেখলুম, বিশ বছরের এক শোকসন্তপ্ত বিধবা,—যার ফুটন্ত যৌবন বিষাদের বাতাসে ঝরে পড়ে গেছে।

মাধুরী এখন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি পড়ে কাটায়। কখনও বা সূঁচের কাজ করে।

তার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা চল্‌ত মন্দ না; কিন্তু তা' একটু ঘনিয়ে উঠ্‌ল এমনি করে—

প্রতুলের ঘরে বসে আমাদের তর্ক চল্‌ছিল, সেই সময় মাধুরী ঘরে এসে ঢুক্‌ল। একটু চমকিত হয়ে সে প্রতুলকে বল্‌লে, "আর একটা নতুন কিছু বই দাও, দাদা!"

"কি বই দোব, বল্। আচ্ছা, এই যে প্রোফেসর আছ,—বল ত কি বই দেওয়া যায়। দু'-একটার নাম কর না হে।"

আমি বেশ একটু লজ্জিত হলুম।

"সত্যি বল্‌ছি, ইংরেজি, বাংলা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রায় সবই তো ও শেষ করেছে; এখন কি বই পড়তে বল্‌ব বলো।"

"তুমি একটা ঠিক কর।"

বেচারী মাধুরী দেখ্‌ছিল, মাঝখানে তার কথাটা মাঠে মারা যাচ্ছে। "যা হোক্, ভালো দেখে একখানা বই ঠিক্ করে দিন আপনারা"—বলে সে আমার দিকে তাকালে।

অগত্যা আমি দু'-একখানা ভাল নভেলের নাম করলুম।

মাধুরী বল্‌লে, "নবেলে বা নাটকের মধ্যে কোন সারতত্ত্ব নেই।"

আমি বল্‌লুম, "নবেলে বা নাটকের মধ্যে যে শুধুই কতকগুলো অকেজো গল্প থাকে, তা' নয়। অনেক নবেল আছে, যদিও সেগুলো প্রধানতঃ নবেলই, তবু নীতি কথায়ও তাদের জুড়ি মেলে না। এমন বই আছে, যেটায় একটা সুন্দর, অথচ বৃহৎ আদর্শের বাণী বুক ছাপিয়ে ওঠে।"

অনেক বাদানুবাদের পর সে নবেল পড়তে স্বীকৃত হ'ল।

এইরূপে ধীরে ধীরে কখন যে সে নবেলের একজন ভক্ত হয়ে দাঁড়াল, তা' আমারও নজরে পড়ে নি। তারও খেয়াল হয় নি। তখন নবেল আর বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ রইল না,—কোনো একটা 'মরালে'র খোঁজে সে নবেলের দিকে ধেয়ে যেত না। অতীতের ও বর্ত্তমানের, দেশী ও বিদেশী সমস্ত নবেলই তখন মাধুরী একমনে পড়তে সুরু করলে।

ইতিমধ্যে আমারও কেমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বিকালের দিকে আমি প্রায় প্রতিদিনই প্রতুলদের বাড়ী গিয়ে হাজির হতুম। নবেল পড়াটা কঠিন নয়; কিন্তু বিদেশী ও স্বদেশী কবিদের কবিতা বোঝা সব সময় সহজ নয়। তাই মাধুরীকে বিকালের দিকে বিদেশী কবি ও স্বদেশী কবি রবীন্দ্রনাথ আদির চর্চ্চায় একটু সাহায্য করতে হ'ত। সে জন্য আমার বিকালবেলা তাদের বাড়ী না গেলেই চল্‌ত না। আমাদের আলোচনায় মাঝে মাঝে প্রতুল এসে জুটে পড়ত,—তা'তে তর্কটার জোর বাধ্‌ত বেশী।

একদিন উমাচরণবাবু আমাদের বল্‌লেন, "দেখো, তোমরা কেবল বিদেশের রত্নই খুঁজ্‌লে। আমাদের দেশী সংস্কৃত জিনিষগুলো যাচাই করলে হতো না? কালিদাস প্রভৃতি দু'-একজনের বইগুলো পড়েই দেখো না কেমন জিনিস।"

সেদিন থেকে সুরু হ'ল সংস্কৃতের পালা।

ইতিমধ্যে একদিন প্রতুলের স্ত্রী পুষ্পিকা এল। তার বয়স বছর আঠারো। অনেক আবেদন-নিবেদন ও সলজ্জ হাসির ভিতর দিয়ে তার সাথে আমার পরিচয় জমে উঠ্‌ল। সে সাহিত্য-আলোচনার বড় বেশী যে রসদ যোগাত তা' নয়; তবে সে থাকলে রহস্যালাপে আলোচনাটি একটু মধুর রসে ভিজে উঠ্‌ত। আমার পঁচিশ বছরের অবিবাহিত জীবনটার পিছনে যে কোথায় 'রোমান্স' আছে তা' খুঁজে বের করতে সে যতই উদ্‌গ্রীব হ'ত, আমি ততই তাকে বিঁধে মারতুম হাসির রঙ্গে। মোটের উপর, সন্ধ্যাগুলো রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ত।

সেদিন মাধুরী সন্ধ্যাবেলা পড়ছিল শকুন্তলা। আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ সে ঘরে ছিল না। পঞ্চমাঙ্ক পড়া হচ্ছিল; আমি হঠাৎ বলে ফেল্‌লুম, "আমার মনে হয় মানুষের স্বভাবই এই,—প্রিয়জনকে দু'দিন না দেখ্‌লেই ভুলতে চাওয়া, আবার সে ভুলের জন্য কেঁদে খুন হওয়া।"

মাধুরীর সাথে যে মানুষের জীবনের এই দিক্‌টা নিয়ে তর্ক চলে না, তা' আমি জানতুম; আর এই কথাটি যে সাক্ষাৎ সূত্রে শকুন্তলার আখ্যায়িকার সাথে জড়িত নয়, তাও আমি স্বীকার করি। কিন্তু মানব মন যে অদেখা অলিগলির ভিতর দিয়ে যাতায়াত করছে, লজিক্ তার সমস্ত বিধি নিয়েও তার সন্ধান পায় না। কাজেই, কথাটা 'ফস্' করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই মানুষের স্বভাব?"

আমি কথা ফেরাতে পারলুম না; বল্‌লুম, "আমার তো সেইরূপই মনে হয়।"

কিছুক্ষণ মুখ নুইয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "হয়ত তাই; আমার নিজেরও একদিন মনে হয়েছিল যে, হৃদয়ের ভাবধারাটা এক মুখেই চলে। আজ মনে হচ্ছে, সে চলে শতমুখে ঘূর্ণীপাকে।"

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। "আমার স্বামীর ফটোখানা আমি আগে আগে স্নানের পর প্রতিদিনই দেখতুম। সেদিন হঠাৎ একটা কথা আমায় সে ফটোখানির বিষয় সচেতন করে তুললে। বাক্সটা খুলতেই দেখলুম, ক'দিন ধরে কিসের তাড়ায় আমার তা' দেখবার আগ্রহটা কমে এসেছিল—ফটোখানি অনেকগুলো নবেলের তলায় ঠাঁই নিয়েছে।"

মাধুরীর সেদিনকার অকপট কথাগুলো আমাকে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র করে রাখল। সেই প্রথমবার আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার দুর্ভাগ্যের ভারটাকে একবার অনুভব করতে চাইলুম। একজন হিন্দু নারী, বিধবা;—তার সম্মুখে রয়েছে তার প্রচণ্ড যৌবন,—বিশাল প্রতপ্ত মরুভূমির মত;—তার চোখের সামনে জাগছে তারই বয়স্কা শত শত রমণীর জীবনের বর্ণোজ্জ্বল ছবিটা,—ভগবান যাদের ওপর কোনো অভিশাপের মসীরেখাই টেনে দেন নি। আর সে? তার জীবনে নেমে এসেছে এক নিষ্ঠুর অকাল সন্ধ্যা!

বড় একটা আদর্শ মানুষকে টানতে পারে, আমি মানি; কিন্তু সে টান চিরদিন থাকে না। সে আদর্শকে সে দেখে সম্ভ্রমের চোখে,—শ্রদ্ধায় অবনত শিরে। কিন্তু প্রতিদিনকার তুচ্ছতম জিনিষের প্রতি মানুষের আসল টান। তাকে দেখে সে ভালবাসার চোখে,—বিমুগ্ধের দৃষ্টিতে। বড়কে মানুষ গ্রহণ করে বুদ্ধি দিয়ে,—আর ছোটকে প্রাণ দিয়ে।

পরদিন থেকে আমি আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিলুম, মাধুরীর অশান্ত চিত্তে একটু শান্তি সেচনের আশায়। আমার সমস্ত চপলতা সমস্ত হাসি-রঙ্গ হঠাৎ উবে গেল; তার স্থলে মাধুরী পেলে একটি করুণ ক্রন্দন,—একটু আন্তরিক সহমর্ম্মিতা। আমি দেখেছি, শোকাচ্ছন্ন হৃদয় দরদী প্রাণকে চিনে ফেলে,—সে যতই মৌন হোক্ না। আমাকে মাধুরী তেমনি গ্রহণ করলে। পুষ্পিকা বারবার নাড়া দিয়ে দেখলে আমার হাসির উৎসের মুখে কোথায় পাথর চাপা পড়েছে। প্রতুল বারবার ঠোকর দিয়ে দেখলে, তা' শতগুণ করে ফিরিয়ে দিতে আমার আর আগ্রহ নেই। এমন একটা জাগ্রত বেদনাতুর হৃদয়কে দেখেও যে তারা দেখত না, এতে আমি যেমনি হতুম দুঃখিত, তেমনি হতুম রুষ্ট। একটি প্রাণের কথা ভাবতে বসে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আর দু'টি প্রাণ তখনো তরুণ, তখনো সবুজ।

একদিন হঠাৎ আমার হাতে একখানা ফটো দিয়ে মাধুরী বললে, "আমার স্বামীর চাল-চলনটা ঠিক্ যেন আপনার মতো ছিল।"

আমি সে কথায় আশ্চর্য্য হয়ে মাধুরীর মুখের দিকে তাকালুম! তার সারা অঙ্গ যেন নূতন একটা কিসের সাড়ায় ডাক দিয়েছে।

পরদিন সমস্ত ক্ষণ আমি ভাবলুম। বিকালের দিকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলুম, "আমার শরীর ভাল নেই; আজ যেতে পারব না।"

সন্ধ্যা যেতে-না-যেতেই প্রতুল এসে হাজির। "কি হে, ব্যাপার কি? অসুখটা কি বলো দেখি, শুনি? বাড়ী ফিরতেই তো মাধুরী বললে তোমার অসুখ।"

"না, তেমন কিছু নয়। এই কেমন একটু জ্বর জ্বর।"

"তা' স্নানও ত করেছ; আর তোমার চাকরই ত মাধুরীর কাছে স্বীকার করেছে, তুমি কাজে গিয়েছিলে।"

"দুপুরের দিকেই শরীরটা খারাপ বোধ হ'ল। তাই ছুটী করে চলে এসেছি।"

প্রতুল আর বেশী তাড়া দিলে না। আমি বাঁচলুম! ঘণ্টাখানেক গল্প করে সে বিদায় নিলে। বলে গেল, কাল কেমন থাকি যেন অতি অবশ্যই জানাই। অথচ সত্যসত্যই সে যখন আমাকে না যাওয়ার জন্য বেশী তাড়া দিল না, তখন বুকের ভিতর কোন জায়গায় কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম।

পরদিনই আমি প্রতুলদের বাসায় আবার গেলুম। প্রথম কেমন যেন একটা দ্বিধা নিয়ে গেছলুম, কিন্তু আলাপের ভিতর দিয়ে তা' শীঘ্রই ধুয়ে মুছে গেল।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে বাদল নাম্‌ল। ঘরের ভিতর কতক্ষণ বন্ধ থেকে ছট্‌ফট্‌ করে আমি শেষটায় বেরিয়ে পড়লুম।

মাধুরীদের বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। প্রতুল ও উমাচরণবাবু দু'জনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মাধুরী আমাকে ভিজে ভিজে ঘরে ঢুক্‌তে দেখে চমকিত ও হৃষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। আমি স্পষ্ট দেখলুম, তার চোখের কোণে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। আমার নিজের চোখও বোধ হয় তা'তে সাড়া দিয়েছিল।

"এক পেয়ালা চা আন্‌ছি এখনি"—বলে সে উঠে দাঁড়াল।

আমি বাধা দিয়ে বল্‌তে গেলুম, "চা আমি খেয়ে এসেছি"—তবু সে চলে গেল।

মিনিট দশ পরে সে যখন চা নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল, তখন আমি বেশ দেখ্‌তে পেলুম, তার সমস্ত মুখ আগুনের আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে। তার এই অনাবশ্যক কষ্টের জন্য আমার কেমন একটু লজ্জা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার মনটা বেশ একটু আনন্দে দোলা খেলে।

চায়ের পিয়ালা শেষ করে, আমরা মেঘদূত নিয়ে বস্‌লুম। আমরা পড়ছিলুম, বিরহ-বিধুর অন্তরের সে আকুল ক্রন্দন,—সে উজ্জয়িনীর বাতায়নবর্ত্তিনী পুরাঙ্গনাদের কথা,—সে অলকাপুরীর বেদনামথিত হৃদয়ের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস! আমার মানস-চক্ষে ফুটে উঠ্‌ছিল, সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই প্রসাধন,—সেই বিলাস রচনা! আমরা দেখ্‌ছিলুম, সেই কুরুবকের মালা, সেই বঙ্কিম চাহনি, সেই সাবলীল গতি! মন্দাক্রান্তার তালে তালে হৃদয় নেচে উঠ্‌ছিল, দুনিয়ার বুক থেকে সমস্ত মুছে গিয়ে শুধু ফুটে উঠ্‌ছিল সেই অনন্ত কালের প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি! তাদের প্রতীক্ষার সেই দুরুদুরু হিয়া,—তাদের মিলনের সেই থরথরি দেহলতা,—তাদের বিরহের সেই টল্‌টল্‌ আঁখি!

পড়তে পড়তে কি একটা অস্পষ্ট অভাবে আমার বুক ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল। আমার ব্যথাতুর স্বর কাঁদছে,—আমার কম্পমান হাত শিউরে উঠ্‌ছে,—আমার ঝাপ্‌সা চোখে সবই অস্পষ্ট হয়ে আস্‌ছে। ও গো সেদিনকার মেঘভার! সেদিনকার বারি ঝরঝর সঙ্গীত! সেদিনকার সেই মধুর সন্ধ্যা! কেন তোমরা আমায় টেনেছিলে সেদিন?

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল।

"থামো" বলে কে একটা আকুল স্বরে আমার মুখের কাছ থেকে বইখানাকে টান্‌ মেরে ফেলে দিয়ে হাতখানা চেপে ধরলে। আমার মুখ,—আমার সেই কোন্‌ অদেখা যক্ষের ব্যথা-বিধুর মুখ তুলে আমি দেখ্‌লুম, মাধুরী আমার হাতখানাকে সজোরে ধরেছে! তার সমস্ত শরীর আমার হাতখানার উপর ঝুঁকে পড়েছে,—তার সমস্ত দেহ কাঁপছে —চোখ দু'টি অশ্রু-সায়রে পদ্মের মত ফুটে উঠেছে!

"শোন, আজকের সন্ধ্যায় তোমাকে একটা কথা না বলেই আমি সোয়াস্তি পাচ্ছি না,—খুন করে ফেল্‌লেও আর কোনোদিন একে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌তে না,— কোথা দিয়ে তুমি আমার মনের গোপন-বেদীটি জুড়ে বসেছ। বোধ হয়, অনেকটা আমার স্বামীর মতই হালচাল বলে।"

অপরিসীম বিস্ময়ে আমি অবাক্‌ হয়ে গেলুম,— একেবারে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম! আমার সম্বিৎ যখন ফিরে এল, তখন শুধু আমি ছোট একটি কথা বল্‌তে পারলুম, "সে কি?"

"হাঁ, তাই"—বলে সে দৃঢ়স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "একদিন অসহ্য ঔৎসুক্যে ও কথাটারই ইঙ্গিত করেছিলুম; কিন্তু সেদিন দেখেছিলুম, তোমার দুর্নিবার দ্বিধা। এ কথাটাকে আমি সেদিন থেকে শাসিয়ে, তাড়িয়ে, ঝেঁটিয়ে মনের কোণ থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেল্‌তে চেয়েছিলুম। কিন্তু, দেখেছি, যে কথা ভুল্‌তে চাওয়া যায়, সে কথা ভোলাই সব চেয়ে অসম্ভব। তার বদলে নিদারুণ বিধি আমার মন থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে গেছে তারই স্মৃতির সে গন্ধটুকু,—যেটুকুকে বুকে করে আমি আমার দুস্তর যৌবনকেও সগর্ব্বে পাড়ি দিতে বুক বেঁধেছিলুম।"

আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। আমি যদি এর নিরপেক্ষ শ্রোতা হতুম, হয় ত গম্ভীরভাবে বল্‌তে

পারতুম, "খুবই স্বাভাবিক।" হয়ত মনে মনে আমার তখনকার সৌভাগ্যকে ঈর্ষাও করতুম। আর আমি যদি বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতুম, হয় ত এ কাহিনী শুনে বেশ উল্লসিত হতুম,—নেচে উঠতুম,—আমার এতদিনের বন্ধ হৃদয়-কপাট খুলে দিতুম। কিন্তু আমি তখন ছিলুম স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ।

মাধুরী আবার সুরু করলে, "তুমি ভাবছ, কি বল্‌ছে এ? দেবীর আবার মানবতার ওপর লোভ কেন? কিন্তু জেনো, আমি তোমার কাছে কোন কিছুর প্রার্থী নই,—কোনো কিছু চেয়ে আমি তোমায় বিব্রত করব না,—শুধু আজকের এই ক্ষণিকের জন্য চাই—এইটুকু—অনন্ত জীবন যার স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখব,—শুধু এইটুকু,—"

ধীরে ধীরে একটু একটু করে আমার হাতখানাকে সে তুলে নিলে,—আমি কোনো বাধা দিলুম না। তারপর অল্পে অল্পে নুয়ে পড়ে, অতি কোমল অঙ্গুলিতে একটির পর একটি করে আমার পাঁচটি আঙ্গুল তুলে নিয়ে, অতি আদরের, অতি সঙ্কোচের, অতি মধুর পুলকভরা সুকোমল পরশটুকু বুলিয়ে দিলে। কি ব্যথাতুর, কি মদিরাময়, কি সশঙ্ক, সঙ্কোচ সুন্দর সেই স্পর্শটুকু! মনে হ'ল, সে আমার শিরায় শিরায় নিমেষ মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমার সমস্ত চিন্তা মুহূর্ত্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল,—আমার আপাদমস্তক জলে উঠল।

"এইটুকু" বলে সে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল।

'খপ্' করে তার হাতখানা ধরে ফেলে, আমিও উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লুম, "দাঁড়াও।"

মুখ তুলে আমার চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে সে দাঁড়াল।

"আমার কথাটাও তবে শুনে যাও। জানা ও অজানা-ভাবে আমি তোমার চারিদিকের আব্‌হাওয়াকে ছাড়িয়ে, কবে তার অন্তঃপুরের রাণীকেও যে ভালবেসে ফেলেছি,—সে কথা তেমন করে নজর করার কারণ আজকের আগে আমার ঘটে নি। কিন্তু আজ যদি হঠাৎ তোমার অন্তরের আবরণ খসে পড়ল, তবে আমারই আবরণ শুধু দম্ভভরে অটুট রেখে লাভ?"

আমার চোখের অসম্ভব দীপ্তি বোধ হয় তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সে চোখ নামিয়ে নিলে। আমি দেখ্‌লুম, আবেশে তার সমস্ত মুখে একটা নিদ্রার সুশ্যাম ছায়া ঘনিয়ে উঠ্‌ছে। আমি তার হাত ছেড়ে, গলার ওপর একখানা হাত রেখে ধীরে ধীরে বললুম, "শুধু চাই, একটা—"

বিদ্যুতের মত সে ত্বরিতপদে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে গেল। মুখ ফুটে বেরুল শুধু একটা আকুল মিনতি, "না,—না,—না!"

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখ্‌ছিলুম, তার শঙ্কাজড়িত বেদনা মুখের দীপ্তিকে কণামাত্রও নিবাতে পারে নি।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার চেতনা হ'ল। ধীরে ধীরে সেই বৃষ্টিতেই আমি বেরিয়ে পড়লুম বাড়ীর পথে।

সেদিন সমস্ত রাত্রি চেয়ারে বসে আমার ঘরে যত কিছু বই ছিল সব একেবার, দুবার, বারবার করে পড়ে কাটালুম। কখন ভোরের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছিল, জানি না,—পাখীর ডাকে আমার চৈতন্য হ'ল। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে, আমি কাল্‌কের পরা জামা গায়েই একটু রাস্তায় বেড়াতে বেরুলুম। বাসায় ফিরে চা খেতে খেতে চাকরটাকে বল্‌লুম, "দেখ্, আমার শরীরটা ভালো নেই, অফিসের বেলা হ'লে এই চিঠিখানা দিয়ে আসিস্।"

সমস্তদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আবার যত কবির যত বই ছিল সব বারবার পড়তে লাগ্‌লুম। বিকাল যত এগুতে লাগ্‌ল, অতিষ্ঠতা ততই বাড়ল। কোথায় যাওয়া যায়? মাঠে, সিনেমায়? কিছুই ঠিক্ করতে পার্‌লুম না। অবশেষে মাধুরীদের বাড়ীর কথাটা ধীরে ধীরে এসে উদয় হ'ল। না, কালকের পরে আর আজকে যাওয়া চলে না। কিন্তু —তেমন অশোভন বলে কিছু ঠেক্‌বে না ত প্রতুল প্রভৃতির কাছে? তার চেয়ে যাওয়া যাক্ প্রতিদিনের মত। অবশ্য যত শীঘ্র পারি উঠে পড়ব।

একেবারে সরাসর মাধুরীদের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। দেখ্‌লুম, মাধুরী বই কোলে করে বসে আসে।

একটু বিপন্ন হয়ে যতদূর গম্ভীর হওয়া যায় ততটা গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বল্‌লুম, "প্রতুল কোথা ?"

"বাড়ী নেই।"

সে কথা শোন্‌বার আগেই কখন আমি বসে পড়েছিলুম। তখন-তখনই উঠ্‌তে কেমন বাধবাধ ঠেক্‌ল। আমি একটা জান্‌লা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইলুম। মাধুরী কিছুই বল্‌ল না, বই-এর ওপর চোখ দু'টি রেখে চুপ করে বসে রইল।

দু'হাত মাত্র ব্যবধান! তবু আমরা কেউ নড়লুম না, কেউ একটি ছোট কথাও বল্‌লুম না, দু'জনে দু'দিকে চেয়ে বসে রইলুম। আমাদের দৃষ্টি পর্য্যন্ত মিল্‌ল না। অথচ দু'জনেই বুঝ্‌লুম, দৃষ্টি আমাদের যতই না পরস্পরকে এড়িয়ে চলুক, হৃদয় আমাদের সমতালে নাচছে—দু'জনেরই অস্ফুট বেদনা একই ভাষাহীন সুরে গাঁথা। কথা কইলুম না, তার নিশ্বাসটুকুর পর্য্যন্ত আঘ্রাণ পেলুম না,—তবু আমার হৃদয় অপার আনন্দে ভরে উঠল; মনে হ'ল, এই ভালো, এই ভালো!

কোথা দিয়ে বিকাল নিঃশেষ হয়েছিল দেখি নি। সন্ধ্যার আঁধার জমে উঠ্‌ছিল। পূবের একটা জান্‌লা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরটাকে একটু আলোকিত করে তুলল। তবু আমাদের হুঁস্ হ'ল না। বিকালের বেড়ানোর পালা সেরে ফির্‌তে, হঠাৎ উমাচরণবাবুর গলা শোনা গেল, "তাই ত রে, এ ঘরটাতে আজ যে এখনো আলো দেওয়া হয় নি।"

দ্রুতপদে মাধুরী ঘর ছেড়ে বাহির হয়ে গেল, সেই মুহূর্ত্তেই উমাচরণবাবুর ডাক শোনা গেল, "কিরে, আজ যে ঘরে আলো দিস্ নি? পড়ছিস্ না যে? প্রদীপ আসে নি বুঝি?"

"এখনই আলো নিয়ে আস্‌ছি বাবা"—বলে মাধুরী তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাতে গেল। সে আলো নিয়ে ঘরে ফেরবার একটু পরেই উমাচরণবাবুও ঘরে ঢুকে বল্‌লেন,—"এই যে প্রদীপ! কখন এলে?"

আমি বৃথা হাসি টেনে বল্‌লুম—"এই এক মিনিটও হয় নি।"

আমার হাসি তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেল, "সে কি তোমার মুখ বড় শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে? কোনো অসুখ-বিসুখ করে নি তো?"

"সে কথা বল্‌তেই তো আজ এসেছি। আমার শরীরটা কোল্‌কাতা এসে অবধি ভালো নেই—রাত্তিরে প্রায় একটু একটু জ্বরও হয়। তাই চেঞ্জে যাবো, আপনাদের সাথে দেখা কর্‌তে এসেছি।"

উৎকণ্ঠিত চিত্তে বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমি কবে যাব। জানালুম, কালই যাচ্ছি, আপাততঃ এক মাসের ছুটি নিয়ে। মাধুরী আমার মুখের দিকে ত্রস্ত-দৃষ্টিতে তাকাল। আমি শুধু শাদা চোখ দু'টি দিয়ে অনায়াস-দৃষ্টিতে তার জবাব দিলুম। একটু পরেই বল্‌লুম, "তা' হ'লে এখন উঠি। কালই যাবো, সমস্ত গুছিয়ে নিতে হবে।"

মাধুরী বল্‌লে, "কিন্তু দাদার সাথে দেখা করে গেলেন না?"

"কাল তাকে আমার ওখানে যেতে বলো"—বলে আমি বাড়ীর আর সবার সাথে দেখা কর্‌তে গেলুম।

প্রতুলের মা বল্‌লেন, "কাল দুপুরের দিকে একবার না হয় এস বাবা।"

আমি দেখ্‌লুম, মাধুরীর চোখে মিনতি ফুটে উঠেছে।

"সময় পেলে আস্‌ব"—বলে নমস্কার করে আমি বিদায় নিলুম। তাঁরা দুয়ার পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে আমায় বিদায় দিলেন। রাস্তার একটা গ্যাস-পোষ্টের অস্পষ্ট আলোকে আমি দেখ্‌তে পেলুম, মাধুরীর চোখ দু'টি তেমনি আমার ওপর তখনো বদ্ধ রয়েছে। আমি ঠিক জানি, সে চোখে যেমনি ছিল বেদনা, তেমনি ছিল তাকে জয় করবার একটা দৃঢ় সঙ্কল্প। একটু পরেই যে চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল, হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে বান ডেকেছিল, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস; কেন না, আমার পুরুষের দৃঢ় হৃদয়টাই তখন টলে গলে যাচ্ছিল।

পরদিন রাত্রে যখন গাড়ী করে প্রতুলদের বাসা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম, তখন জানি না, কেমন করে আমার বুভুক্ষু চোখ দুটোকে একেবারে দোতলার বারান্দায় চালিয়ে দিলুম ;—জানি না কেন, গাড়ী থেকে মুখ বার করে গাড়োয়ানকে তাড়াতাড়ি চালাবার হুকুম দিয়ে সেই বারান্দার দিকেই চেয়ে রইলুম একভাবে। সে কি সেই ম্লান আঁধারে নীরবে দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তির কাছে বিদায় মেগে? তবে বিকালে একবার সে বাড়ীতে গেলেই ত হ'ত?

একমাস, দু'মাস, একবছর, দু'বছর করে আজ সাত বছরের ভাবনার শেষে মনে হচ্ছে,—একটা সত্যের খোঁজ আমি পেয়েছি। আমার সন্দেহের সমাধান হয়েছে। সেদিনকার ত্যাগের মধ্যে আমার ছিল না কিছুমাত্র দ্বিধা, কিছুমাত্র ভীরুতা, কিছুমাত্র মিথ্যাচার। আমি আজ বুঝেছি, আমি তাকে ছেড়েছি, নিবিড়তর করে পাওয়ার জন্যে। চিরজীবনের জন্য আমাদের জীবন গাঁথা হ'লে, হয় ত কবে সংসারের ঘূর্ণীবায়ুতে পড়ে আমরা দু'জন দু'জনার কাছ থেকে ছিট্‌কে যেতুম; হয় ত তার মন্থনে আমাদের ভাগ্যে উঠত গরল; হয় ত আমাদের এই অদেখা হৃদয়ের বাঁধন হয়ে উঠত ফাঁসির দড়ি। আজও সেদিন-কার শুভ-মুহূর্ত্তটির কথা মনে পড়লেই, আমার আঙুল পাঁচটি গর্ব্বে, সোহাগে, আনন্দে নেচে ওঠে,—আমার সমস্ত বাহু স্ফুরিত হয়, আমার সমস্ত একটা অতি মধুর অতি তীব্র, অথচ অতি সুন্দর আনন্দে ভিজে ওঠে। কিন্তু সেই পুণ্যক্ষণের জের টান্‌বার লালসায় যদি আমি বসে থাকৃতুম, তবে সেই অতি বাঞ্ছিত, চির-সুকুমার স্পর্শটি হয়ে উঠ্‌ত তুচ্ছ, মামুলী, মধুহীন।

প্রকাশ বসু

রসরঙ্গ

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রোফেসার—সুরেন, তুমি আমার ক্লাসে ঘুমোতে পারবে না।"

সুরেন—"আপনি যদি অত জোরে না চেঁচান, আমি বেশ ঘুমোতে পার্‌বো।"

কুকুরটাকে চেনে বেঁধে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে প্রবোধবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুর দেখা হ'ল। নানা কথা-বার্ত্তার পর প্রবোধবাবু কুকুরের বিষয় বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—"জান হে, আমার কুকুরটা পাঁচ মাইল দূরের পাখীর গন্ধ পায়।"

—"তা' কি হয়?" বলে' বন্ধু কুকুরের দিকে চাইতেই দেখ্‌লেন, কুকুরটা কি শুঁক্‌ছে। তিনি বল্‌লেন—"কুকুরটা যে রকম কর্‌ছে—মনে হচ্ছে, বুঝি ওর সাম্‌নেই একটা পাখী এসে পড়েছে।"

প্রবোধবাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। পাশ দিয়ে যে লোকটী চলে' যাচ্ছিলেন,—তাঁকে ডেকে তিনি বল্‌লেন,—"মশায়, আপনার পকেটে কি কোন পাখী আছে?"

লোকটী গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—"না।"

প্রবোধবাবু আরও বিপদে পড়্‌লেন। লোকটী ফির্‌তেই আবার ডেকে বল্‌লেন,—"কিছু মনে করবেন না—আপনার নামটী জান্‌তে পারি কি?"

—"নীলকণ্ঠ।"

উল্লসিতভাবে প্রবোধবাবু বল্‌লেন—"হয়েছে, তাই কুকুরটা অমন কর্‌ছিল।"

মা—ভলাণ্টিয়ার, আমার খুকীটীকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভলাণ্টিয়ার—"কি রকম দেখ্‌তে বলুন?"

মা—"তার নাকটা ঠিক্ তার বাবার নাকের মত, আর আমাকে ছোটবেলায় যে রকম দেখ্‌তে ছিল, তাকে ঠিক্ সেই রকম দেখ্‌তে।"

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

মধু-যামিনী

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য

[একখানি শয়ন কক্ষ। পরিপাটি করে' খাটের ওপর বিছানা পাতা। দু'টি মাথার বালিশ, দু' পাশে দু'টি পাশ-বালিশ, পায়ের বালিশ—সব ক'টিতে যথোপযুক্ত ঝালর দেওয়া। খাটের উপর বসে' আছে রামকৃষ্ণ—প্রতীক্ষা করছে স্ত্রীর আগমনের। বহুদিন পরে সে কোলকাতা থেকে শ্বশুর-বাড়ী এসেছে। বিয়ে হয়েছে আজ বছর ছয়। একটি ছেলেও হয়েছে ইতিমধ্যে—তার বয়স চার। রাত্রি সাড়ে বারোটা। বহুদিন পরে জামাই এসেছে বাড়ীতে—কাজেই খাওয়া-দাওয়ার একটু বিশেষ আয়োজনই হয়েছিল। সে সব সেরে শুতে আস্তে স্নীতির একটু দেরী হওয়াই স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণ একটা হাই তুলে সিগারেট ধরালো।]

[একটি পানের ডিবে হাতে করে' স্নীতি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল্ দিলো। তারপর ডিবেটা খাটের মাথার কাছে টিপয়টার ওপর রেখে সে স্বামীর দিকে চেয়ে একটু হাস্‌ল।] বল্‌লো—কি গো, মনে পড়্‌লো এতদিনে?

রাম—হ্যাঁ, পড়্‌লো।

[উঠে গিয়ে স্নীতিকে জড়িয়ে ধর্‌লো]

স্নীতি—আমার চিঠি পেয়েছিলে?

রাম—হ্যাঁ, কাল্‌কেই।

[দু'জনে খাটের উপর বস্‌লো]

স্নীতি—আমি ভাব্‌লাম তুমি বুঝি আর এলে না?

রাম—এ তোমার অন্যায় ভাবা। জান ত, ছুটি নইলে—

স্নীতি—তা' আর জানি নে? এবার পেয়েছো ছুটি?

রাম—হ্যাঁ, দু'দিনের। তা' আস্‌তেই ত একদিন বেরিয়ে গেল। চাকরী করাই ঝকমারী!

স্নীতি—সত্যি। ভালও লাগে না আমার এমন একা একা থাকতে। এমন কষ্ট হয়! আবার ভাবি যে, চাকরী না কর্‌লে চল্‌বেই বা কি করে'?

রাম—তা' ত বটেই। খোকন্ আমার নাম-টাম করে?

স্নীতি—কী যে তুমি বলো! তা' কর্‌বে না। দিন রাত বাবা, আর বাবা। সেই যে গেলবার এসে বলে' গেছ্‌লে ছেলের মটর এনে দেবে, সে কথা মুখে লেগেই আছে। আজ তোমার আসা টের পায় নি, কাল সকালে উঠে আর রক্ষে রাখ্‌বে না।

রাম—তুমি আমার কথা ভাবো-টাবো?

স্নীতি—জানি না, যাও!

[কৃত্রিম কোপে মুখ ফেরাতেই রামকৃষ্ণ মুখটি ঘুরিয়ে নিয়ে একটি সুদীর্ঘ চুম্বন কর্‌লো। ঈশ্বর জানেন বেচারী একমাস কোলকাতায় 'ফিল্ম ম্যাগাজিন' দেখে কাটিয়েছে]

রাম—মেজ দি' নেই এখানে?

স্নীতি—না। পরশুর আগের দিন চলে' গেছে শ্বশুর-বাড়ী। কেষ্টবাবু নিতে এসেছিলেন। সে এক ভারী মজার ব্যাপার! কেষ্টবাবুর পানের জমিতে ক'দিন থেকে কারা যেন সব কি করে' যাচ্ছে।

রাম—কি করে' যাচ্ছে?

স্নীতি [তাচ্ছিল্যের সহিত]—কে জানে অত শত! তাই কেষ্টবাবুকে তাঁর গুরুদেব বলেছেন—এসব লক্ষণ ভাল নয়। বৌমাকে আনিয়ে একটা স্বস্ত্যয়ন কর, তা' হ'লেই এসব হ্যাঙ্গাম আর থাক্‌বে না।

রাম—কিন্তু হ্যাঙ্গামটা কি?

স্নীতি—সে আমি জিগ্যেস করি নি বাপু। জানোই ত কেষ্টবাবু তাঁর মায়ের ধরণ পেয়েছেন ষোল-

আনা। সেবার আমি যখন গিয়েছিলাম ওঁদের বাড়ী, একদিন পুকুর থেকে চান করে' এসে ভিজে কাপড়ে দাওয়ায় উঠেছিলাম বলে' বুড়ীর সে কী রাগ! বকর-বকর করে' খৃষ্টান-মৃষ্টান কত কি বল্‌লে। তা' আমিই বা সহ্য করবো কেন? আমিও উল্‌টে দু'-চারকথা এমনি শুনিয়ে দিলাম যে, বুড়ীর একেবারে চক্ষুস্থির! শেষে বিকেলবেলায় আমি যখন চুল বাঁধ্‌তে বসেছি—

রাম [হাই তুলে]—এস, শোওয়া যাক্‌। অনেক রাত হয়ে গেছে।

সুনীতি—বসোই না একটু। তখন বুড়ী এসে ক্ষমা-টমা চাইলে। তুমি বড়লোক আছ, তোমার ঘরেই আছ— আমি ত তোমার পাকাধানে মই দিতে যাই নি বাপু— কি বলো, এঁ্যা?

রাম—হঁ্যা। তা' বই কি।

সুনীতি—ওদের বাড়ীই ওই রকম। সেবারে জান না, সেই দুর্গাপুর থেকে কেষ্টবাবুর মামা এলেন মেজ দি'কে আর আমাকে নিতে ছেলের বিয়েতে। গিয়ে দেখি, সে এক এলাহি কাণ্ড! পুকুর থেকে মাছ এসে পড়ে রয়েছে উঠোনে—সে বোধ হয় মন দুই। কার বা গোয়াল, কে বা দেয় ধুনো। দু' বোন্ দুটো বঁটি নিয়ে বসে' গেলাম দু' পাশে। শুন্‌লাম, ঝি-চাকর না কি সব বাজারে গেছে। ও কি! তোমার ঘুম পাচ্ছে না কি?

রাম [চুল্ সাম্‌লে নিয়ে]—না, তারপর?

সুনীতি—তারপর মাছ-টাছ কুটে—

[ঢং করে' ঘড়িতে একটা বাজল]

রাম [হাই তুলে]—একটা বাজ্‌লো?

সুনীতি—হঁ্যা। কেন, তোমার বসে' থাক্‌তে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? তা' হ'লে থাক্। এস, শুয়ে গল্প করা যাক্। রোজ ত আর তোমাকে পাই নে?

রাম—না।

[দু'জনে শুয়ে পড়্‌লো]

সুনীতি [একটু পরে]—খোকার জুতো এনেছ?

রাম—হঁ্যা।

সুনীতি—আর আমার?

রাম—কি তোমার?

সুনীতি—বে-শ! সেই যে লিখেছিলাম, মেঘদূত শাড়ীর কথা?

রাম—এ্যাঃ! একেবারে মনে ছিল না—তোমার দিব্যি।

সুনীতি—থাক্, আর দিব্যি গাল্‌তে হবে না। [একটু পরে] অত করে' লিখে দিলাম—তা' মন যে থাকে কোথায় জানি নে! বামুনদের ক্ষেন্তি হয়ত কাল্‌কে সকালেই এসে দেখ্‌তে চাইবে। কেন-ই বা তাকে বল্‌তে গেলাম আগে।

রাম—তা' দেখিও না ক্ষেন্তিকে—আরও ত সব জিনিষ আছে।

সুনীতি—থাক্ গে! দরকার কি আমার অত সখে বলো? আমি কি জানি নে তুমি কি মাইনে পাও? মরুক গে যাক্। তবে ক্ষেন্তি সেদিন বল্‌লে কি না দাম খুব সস্তা, তাই লিখেছিলাম।

রাম—আস্‌ছে বার নিশ্চয়ই আন্‌বো। এবার এনেছি ব্রোচ্ আর লেস্‌পিন। এখন ঘুমুনো যাক্, কি বলো?

[অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্ থাকার পর প্রথমে কথা কইল সুনীতি। কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে'—সে তখন অনেক দূরে]

সুনীতি—দ্যাখ গো। রাত্তিরে বাইরে বেরুতে টেরুতে হ'লে আমাকে ডেকো, বুঝ্‌লে? গাঁয়ে বড্ড বাঘের দৌরাত্মি হয়েছে।

রাম [ভয়ে বিছানার ওপর উঠে বস্‌লো]—কই বাঘ?

সুনীতি—গাঁয়ে ঢুকেছে। শুন্‌ছো না, আর একটা কুকুরও ডাক্‌ছে না? বাঘ এলে আর ওরা ডাকে না। সেদিন কি মজা হয়েছিল জান?

রাম [শুয়ে পড়্‌তে পড়্‌তে]—না বলো ত।

সুনীতি—সেদিন বিকেল থেকেই বাদ্‌লা করেছিল। রাত্রি আটটার সময় খেয়েদেয়ে আমরা সব ঘরে দোর দিয়ে শুয়েছি। মেজ দি' আর কেষ্টবাবু আছেন পূবের ভিটেয়। রাত তখন ক'টা কে জানে! হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি, মেজ দি' পরিত্রাহি চাঁচাচ্চে—বাঘ! বাঘ! আর কেষ্টবাবু ঘরের ভেতর থেকে কেবলি বল্‌ছেন—লাঠি কোথায়?

[খুব খানিকটা খিল্‌খিল্ করে' হেসে] এমন সময় উঠোনের সেই বাঘটা 'হাম্বা' করে' ডেকে উঠ্‌লো। ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো? আমাদের মেনিকে দেখেছো ত? সেই যে বড় বড় লোমওলা কালো বেরালটা গো।

[রামকৃষ্ণ যে ঘুমিয়ে পড়েছে, সুনীতি তা' বুঝ্‌তে পারে নি]—তার হয়েছে গোটা চারেক বাচ্ছা। সেইগুলো বুঝি খুব চ্যাঁচাচ্ছিল; মঙ্গলা তাই দড়ি ছিঁড়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মেজ দি' সেই গরুকেই বাঘ মনে করে'—

[আবার খানিকটা হেসে নিয়ে]—তা' ছাড়া, বাচ্ছাগুলোও হয়েছে এমনি চমৎকার!—এ কি! তুমি ঘুমুচ্ছো না কি?

রাম [সবেগে বিছানার ওপর উঠে বস্‌লো]—না। বাচ্ছা হয়েছে তা' হ'লে?

সুনীতি—হ্যাঁ।

রাম—বাঃ!

[আবার শুয়ে পড়্‌লো। ঘরের দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল]—সুনীতি, একবার বেরিয়ে আয় ত ভাই—খোকন্ উঠেছে।

[বাইরে থেকে বৌদি' বল্‌লেন]

সুনীতি [বিছানা থেকে নীচে নেমে]—ঘুমিয়ে পড়ো না যেন, আমি আস্‌ছি।

রাম—না।

[সুনীতি চলে' গেল। অনেকক্ষণ পরে শোনা গেল পাশের ঘরে সে তার ছেলেকে তিরস্কার করছে]—"ঘুমুবি নে হারামজাদা? তবে জাগ্‌লি কেন? ঘুমো, ঘুমো, মারবো বল্‌ছি ঘুমো—অ অ-অ।

[ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের দু' চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। আরও কিছুক্ষণ পরে সুনীতি ঘরে ঢুক্‌লো, তার কোলে ছেলে। সে খাটের কাছে এগিয়ে দেখ্‌লো রামকৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়েছে।]

সুনীতি [স্বামীর গায়ে ধাক্কা দিয়ে]—ও গো।

রাম [হঠাৎ ঘুম ভেঙে]—আঁঃ!

সুনীতি—বারে! এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছ? খোকন্ এসেছে যে।

রাম—এসেছে না কি? তা' কি করবো—

সুনীতি—সুটকেশ খুলে ওর জুতোটুতোগুলো দাও।

রাম—এই দিই।

[বল্‌তে বল্‌তেই ঘুমে মাথা ঝুঁকে পড়্‌লো]

সুনীতি—শুন্‌ছো?

রাম—কি?

সুনীতি—খোকা এসেছে যে?

রাম [উঠে বসে']—তা' এতক্ষণ বল্‌তে হয়।

[ঢং ঢং ঢং ক'রে ঘড়িতে দুটো বাজ্‌লো]

সুনীতি—বাবারে বাবা, কী ঘুম তোমার! দাও এবার ওর জুতোটুতো গুলো বা'র করে' দাও।

রাম—এই দি'।

[উঠে গিয়ে জলের ঘটি থেকে খুব খানিকটা জল চোখে মুখে দিয়ে ফিরে এসে খাটে বস্‌লো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুটকেশটা নিজের কোলের কাছে টেনে নিলো।]

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য

ছায়াছবির মায়াপুরী

রবার্ট মণ্ট্‌গোমারি

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ROBERT MONTGOMERY THE NEW STAR!

একেবারে রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়েই সবার জন্ম হয় না। যাদের হয়, ভবিষ্যতে তাদের জীবনের গতি সব সময়েই যে দুঃখ-দুর্য্যোগকে কাটিয়ে সাবলীল গতিতে চলে' যাবে, তাও যেমন বলা যায় না—তেম্‌নি গোড়া থেকে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগের সঙ্গে নিয়ত লড়াই কর্‌তে কর্‌তে যাদের বাঁচ্‌তে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাদের জীবনও যে ব্যর্থ না হ'য়ে একদিন ফলে ফুলে ভরে' উঠ্‌বে না একথাও বলা যায় না। রবার্ট মণ্ট্‌গোমারির জীবনী আমাদের এম্‌নি অনেক কথাই জানিয়ে দেয়।

কেমন করে' সারা সংসারটা একদিন ওদের তছ্‌নছ্‌ হ'য়ে গেল। আত্মীয়স্বজন, ঘরবাড়ী থেকে বিচ্যুত হ'য়ে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত রবার্ট শূন্যে আশ্রয় খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। ডোব্‌বার সময় অতি তুচ্ছ তৃণটার ওপরও যেমন মানুষ সব ভারটা চাপিয়ে দিয়ে, ওটার শক্তির কথা ভুলে গিয়ে বাঁচতে চায়—সেইভাবে।

নিউইয়র্কে বেকন সহরের সে বাড়ী নেই। পিতার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ সে রবারের কারখানাও নেই—পিতাও নেই। স্নেহময়ী মা—যাঁর জন্যে এতদিন অনেক-কিছু হারিয়েও রবার্ট জীবনটাকে

শূন্য মনে কর্‌তে পারে নি—আজ সে মাও নেই। সারা দুনিয়াটা রবার্টের চোখের সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হ'য়ে উঠ্‌ল—সেখানে এতটুকু জল নেই, হাওয়া নেই—বাঁচা যেন একান্ত অসহ্য, অসম্ভব। তবুও বাঁচ্‌তে হবে। এই বাঁচার 'ষ্ট্রাগল্‌' প্রত্যেক শোণিত বিন্দুটীকে তার দিনের পর দিন ফুরিয়ে আন্‌তে লাগল।

শরীর ভেঙে পড়ল—কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে বোধ হয় একটু আরামের চেষ্টায় মণ্টগোমারি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে গল্প লিখ্‌তে বস্‌ল। স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে তার জীবিকা-উপার্জ্জনের এটাই মনে হয়েছিল বোধ হয় তখন সব চেয়ে সোজা পথ—কিন্তু ইচ্ছে কর্‌লেই যে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, এটা রবার্টের তখন জানা হয় নি, তাই পুরনো টাইপ-রাইটারটার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শাদা কাগজের ওপর যে পরিচয় ফুটে উঠ্‌ল—শ্রদ্ধায় কোন সম্পাদকই তা' গ্রহণ কর্‌লেন না—পয়সা দেওয়া ত দূরের কথা। বিপদ তখন চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌচেছে—বাঁচবার জন্যে একটা কিছু তাকে কর্‌তেই হবে। সেখানে ভাল লাগা, সখ, সুবিধার প্রশ্ন নেই—প্রশ্ন কেবল বাঁচার, তা' তুমি যেমন করেই পার।

একটী একটী করে ঘরের আসবাবপত্রগুলো কমে আস্‌তে লাগল; ঘড়ি, আরসি, চেয়ার, টেবিল, সুটকেশ, ছবি, টাইপ-রাইটার এবং মায়ের দেওয়া আংটীটা পর্য্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—ঘর একেবারে ফাঁকা। রবার্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে—আজ ঘরের প্রয়োজন আর তার নাও হ'তে পারে এই কথা ভেবে। বাড়ীওয়ালার তাগাদা চলে, হোটেলওয়ালা জানায়—আর কতদিন সে পয়সা না পেয়ে এমনি করে' খাইয়ে যাবে? মনেও তার হয় সত্যিই ত! কিন্তু করে কি? কোথায় সে চাক্‌রী পাবে—কোথায় চেষ্টা কর্‌বে? এমন সময় এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে হ'য়ে গেল রবার্টের দেখা। বন্ধুটী হলেন ঐখানকারই একটা নামকরা থিয়েটারের ম্যানেজার। রবার্ট সোজা-সুজি নিজেকে তার কাছে খুলে দিলে—বাল্যে তাদের ধন-দৌলতের কথা বন্ধুর মনে পড়ে গিয়ে চোখে জল এল; তিনি রবার্টকে পরের দিন দেখা কর্‌তে বল্‌লেন।

বন্ধুর সহৃদয়তায় রবার্টের চাক্‌রী হ'ল। অভিনেতা হিসাবে নয়—থিয়েটারের প্রোগ্রাম লেখা ও হাজ্‌রে নেওয়ার—মাইনে খুবই কম। এই ছোট কাজটীকে আশ্রয় করে' এবার বড় কিছু একটা কর্‌বার বা নিজেকে বড় করে' তোল্‌বার একটা প্রবৃত্তি রবার্টকে নিরন্তর অস্থির করে' তুল্‌লে— থিয়েটারটা তার বড় ভাল লাগ্‌ল—এটাই যেন তার উপযুক্ত স্থান।

গভীর রাত্রে অভিনয় শেষে সবাই যখন ষ্টেজের পোষাক পরিচ্ছদ খুলে, মুখের তেল-কালি তুলে আবরণের পশ্চাতে লুকান রূপটী থেকে তাদের সত্যিকারের রূপটী বা'র করে' নিয়ে যে যার বাড়ী ফিরে যেত—রবার্টের অভিনয় তখন হ'ত সুরু। এক্‌লাই তখন সে একশো হ'ত; তারপর ধীরে ধীরে কখন রাজা সেজে, কখন কুলি-মজুরের বেশে, আবার কখনও বা প্রেমিকের সাজে ষ্টেজের ওপর এসে নানা ভঙ্গিমায় নাচ্‌ত, গাইত, অভিনয় কর্‌ত। সে নাচ, সে গান, বা সে অভিনয় দেখ্‌বার বা শোন্‌বার জন্যে যদিও সেখানে কোন লোক থাক্‌ত না,

তবুও রবার্টের মনে হ'ত—যেন হাজার হাজার লোকের সাম্‌নেই সে অভিনয় কর্‌ছে—পূর্ব্বের দর্শকরা যেন তার সাম্‌নে তাদের হাজার হাজার চোখ মেলে এখনও বসে' আছে। এমনি করে' সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে খানিকটা সময় সে অভিনয় করে' যেত—তারপর নিজেই কি ভেবে আস্তে আস্তে ষ্টেজের মধ্যে নিজের ঘরটীতে গিয়ে শুয়ে পড়্‌ত।

এম্‌নি করে দিন কাটে, কত নূতন লোক আসে-যায়, কত রংয়ের খেলা চলে—হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ-উৎসবের অন্ত নেই—সবাই যেন এখানে সবাইকে ভালবাসে—প্রত্যেকের জন্যেই যেন এরা প্রত্যেকে। মিস্ এলিজাবেথ্ এ্যালেন এখানকার একজন নামকরা বিচক্ষণ অভিনেত্রী। তাঁর কথায় থিয়েটারের মালিক থেকে অনেকেই ওঠে-বসে। সেই এলিজাবেথের চোখে রবার্টের লুকান প্রতিভা ধরা পড়্‌ল; তিনি রবার্টকে তাঁর সঙ্গে 'আবৃলিন্ এ্যাডেয়ারে'-এ অভিনয় করতে নাবালেন। প্রথম দিনের অভিনয় দেখেই দর্শকদের মধ্যে বেশ-একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই 'উদীয়মান' থেকে 'লব্ধপ্রতিষ্ঠে'র পর্য্যায়ে নাম উঠে যেতে রবার্টের দেরী হ'ল না। কিন্তু সেই সময় এক মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হ'ল; অর্থাৎ, অখ্যাত-নামা দরিদ্র সেই রবার্ট বর্ত্তমানের এই যশ ও সুনামধারী রবার্টের সঙ্গে সমান হ'য়ে বন্ধু ম্যানেজারের কাছে স্থান পেলে না; তাই হঠাৎ একদিন সামান্য একটু দেরীর সূত্র ধরে' বন্ধু ম্যানেজার রবার্টকে অত্যন্ত কুৎসিতভাবে অপমান করে বস্‌লেন। মিস্ এলিজাবেথ্ এ্যালেন তখন আর মিস্ এ্যালেন নয়, তিনি তখন রবার্টের স্ত্রী। অতএব বন্ধুর ঐ অপমান-উক্তিতে রবার্ট এত ক্ষুব্ধ হ'ল যে, এদের দু'জনকেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়্‌তে হ'ল।

চারিদিকে 'ফ্লিমে'র জয়যাত্রা তখন পূরোদমেই চলেছে। রবার্ট 'ইউনাইটেড আর্টিষ্টের ষ্টুডিও'তে গিয়ে নিজের খরচায় 'টেষ্ট্' ওঠালে। 'টেষ্ট্' দেখে 'ষ্টুডিও'র ধুরন্ধরেরা খুব সন্তুষ্ট হলেন না—তার ওপর সে নূতন লোক। 'ইউ-নাইটেড আর্টিষ্ট'কে ছেড়ে রবার্ট স্যামুয়েল গোল্ডউইনের বাড়ীতে এল। সেখানে তাঁরাও খুব আগ্রহ না দেখিয়ে বরং মুখই বাঁকালেন। এ্যালেন নানাভাবে স্বামী রবার্টকে সান্ত্বনা দিলেন এবং একবার 'মেট্রো'র অফিসে গিয়ে শেষ চেষ্টার জন্যে অনুরোধ জানালেন। এ্যালেনের অনুরাগ তাঁকে নাম ও অর্থের জন্যে পূর্ব্বের অপেক্ষা বর্ত্তমানে যেন আরও অতিষ্ট করে' তুলেছে—বড় না হ'লে, প্রচুর অর্থ না হ'লে যেন প্রাণ খুলে ভালবাসাও যায় না—একথা এ্যালেন না ভাব্‌লেও, রবার্টকে তা' ভাবিয়ে তুল্‌ল।

এ্যালেনের কথা সত্যিই ফল্‌ল। 'মেট্রো গোল্ডউইনে'র 'ষ্টুডিও'তে রবার্টের চাকরী হ'ল। এ্যালেন বল্‌লেন—আমার কথাতেই তোমার চাক্‌রী হ'ল, অতএব মাইনের অর্দ্ধেক আমার প্রাপ্য। রবার্ট বল্‌লে—তথাস্তু! অর্দ্ধেক কেন, ও-সবটাই তুমি পাবে; তবে দয়া করে' খালি আমার খরচাটা চালিও। এ্যালেন মুখ টিপে একটু হেসে নিলেন।

'ফ্লিমে'র মধ্যে এসে, অতি সাধারণ ছোটখাট অভিনেতা থেকে আরম্ভ করে', দিনের পর দিন রবার্টের অভিনয়-নৈপুণ্য ডিরেক্টারদের কাছে তার একটা বিশেষ স্থান করে' দিলে। রবার্টের প্রথম বিখ্যাত ছবি হ'ল কোনী বেনেটের সঙ্গে 'দি ইজিয়েষ্ট ওয়ে।' এই বইখানির মূল ভূমিকায় সে এমন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলে যে, প্রত্যেক বিখ্যাত অভিনেত্রীর কাছে রবার্ট হ'য়ে উঠ্‌ল একটী আকর্ষণের বস্তু। এম্‌নি করে' ক্রমেই রবার্ট বিভিন্ন 'ষ্টুডিও'র বিখ্যাত অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রধান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে লাগ্‌ল। রবার্টের অভিনয়ে একটা বিশিষ্ট ধরণ ধরা পড়ে গেল; সেটা হচ্ছে প্রেমের অভিনয়ে তার উচ্ছ্বাস-বিহীন ভাব-কৌশল ও ইসারা-ইঙ্গিত। 'হলিউডে'র কয়েকজন ছাড়া প্রায় প্রত্যেক অভিনেত্রীর সঙ্গেই রবার্ট অভিনয় করেছে বটে, কিন্তু একদিন জোন্ ক্রফোর্ডের সঙ্গে অভিনয় করে' রবার্ট সবচেয়ে বেশী না কি অভিভূত হ'য়ে পড়ে। রবার্টের মতে ক্রফোর্ডের মধ্যে এমন একটা দিক্ আছে, যা' বর্ত্তমানে 'হলিউডে'র কোন অভিনেত্রীদের মধ্যে নেই।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

কার্ডিনাল রিচ্‌লু

['ইউনাইটেড আর্টিষ্টে'র ছবি]

পরিচালক—রোলাণ্ড ভি লী ।

আর-কে-ও এল্‌ফিনিষ্টোনে এই ছবিখানি আমরা দেখে এসেছি। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ এল্‌ফিনিষ্টোনে ঐতিহাসিক ছবি দেখানো হচ্ছে, এজন্যে আমরা ছবিখানির স্রষ্টা 'ইউনাইটেড আর্টিষ্টে'দের ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না, কারণ, কার্ডিনাল রিচলুর নাম এতদিন আমরা ইতিহাসেই দেখেছিলুম এবং তার কুটিল জীবনীর কথা পড়েছিলুম। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সৃষ্টি করে' এবং যুগোপযোগী সাজে সজ্জিত করে' আধুনিক সময়োপযোগী গল্পের মধ্য দিয়ে ছবি তোলা সহজ ব্যাপার নয়। গল্পটী মোটামুটি এইরূপ :—

ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুইকে তাঁর কয়েকজন অমাত্যের জমি বাজেয়াপ্ত করবার জন্যে কার্ডিনাল রিচ্‌লু এমন উত্তেজিত কর্‌লে যে, তখন তারা ষড়যন্ত্র করে' রিচ্‌লুকে সম্রাটের বিরাগভাজন করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌ল। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে শুধু অমাত্যেরাই রইলেন না, স্বয়ং রাণী এবং রাজ-জননীও যোগ দিলেন। শেষোক্ত দু'জন যখন রাজাকে রিচ্‌লুর বিরুদ্ধে বাগ্‌ভারি করে' তাকে তাড়াবার আদেশ পূর্ণ একখানি কাগজ সই করিয়ে নিচ্ছেন, তখন রিচ্‌লু চালাকী করে' ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে রাজার কাছ থেকে কাগজখানি নিয়ে গিয়ে সব ষড়যন্ত্র নষ্ট করে' দিয়ে গেল।

সম্রাট্ রিচ্‌লুর পালিতা-কন্যাকে দরবার-সঙ্গিনী কর্‌তে চান্ দেখে রিচ্‌লু কুটবুদ্ধি বলে তারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এ্যাণ্ড্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে হাত করে' নিলে। বিবাহের পর রিচ্‌লুর বিপক্ষদলের সর্দ্দার ব্রডান, এ্যাণ্ড্রেকে সেইকথা বলে' দেওয়াতে সে চটে গিয়ে রিচ্‌লুকে খুন কর্‌তে গেল; কিন্তু রিচ্‌লু তার সুচতুর কথাবার্ত্তার খেলায় তাকে-ও জয় কর্‌লে। এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত এ্যাণ্ড্রে তার পা ধরে' ক্ষমা-ভিক্ষা চাইলে। তারপর ব্রডাস তার লোকজন নিয়ে রিচ্‌লুকে আক্রমণ করতে গেলে এ্যাণ্ড্রের সহায়তায় সে ঘোষণা কর্‌লে যে, রিচ্‌লু মরে' গেছে। ব্রডাস উৎফুল্লচিত্তে রাজাকে গিয়ে সেই সংবাদ দিলে। রাণী এবং রাজার মা এই সংবাদের সুযোগ নিয়ে লুইকে সিংহাসনচ্যুত করে' রাণীর ভাইকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করে' স্পেনের দিকে অগ্রসর হলেন। রিচ্‌লু ভেতরে ভেতরে সেই সংবাদ জান্‌তে পেরে তাঁদের পথিমধ্যে আক্রমণ করে' বন্দী কর্‌ল এবং অভিপ্রায় ব্যর্থ করে' দিলে। তারপর রাজার কাছে তাদের সন্ধি-পত্র ফেরৎ দিয়ে দিলে। তখন রাজা পুনরায় রিচ্‌লুকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

বইখানির অভিনয় সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌তে গেলে আমাদের প্রথমেই রিচ্‌লুর ভূমিকায় জর্জ্জ আর্লিসের সু অভিনয়ের কথা উল্লেখ করা উচিত। তাঁর অভিনয় এত উচ্চাঙ্গের যে, প্রায় দর্শকই মোহিত হয়েছে। পরে উল্লেখ-যোগ্য লেনোর-এর ভূমিকায় মরিণ ও' সুলিভ্যানের অভিনয়। পার্ট খুব ছোট বটে, কিন্তু তার সুন্দর চেহারা এবং কথা বলার ভঙ্গী, চালচলন বেশ একটা নূতনত্বের সৃষ্টি করেছে। ছবিখানির অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়-ও বেশ সুন্দর হয়েছে এবং পরিচালনা বেশ উচ্চাঙ্গের। মোটের ওপর ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যেতে পারে।
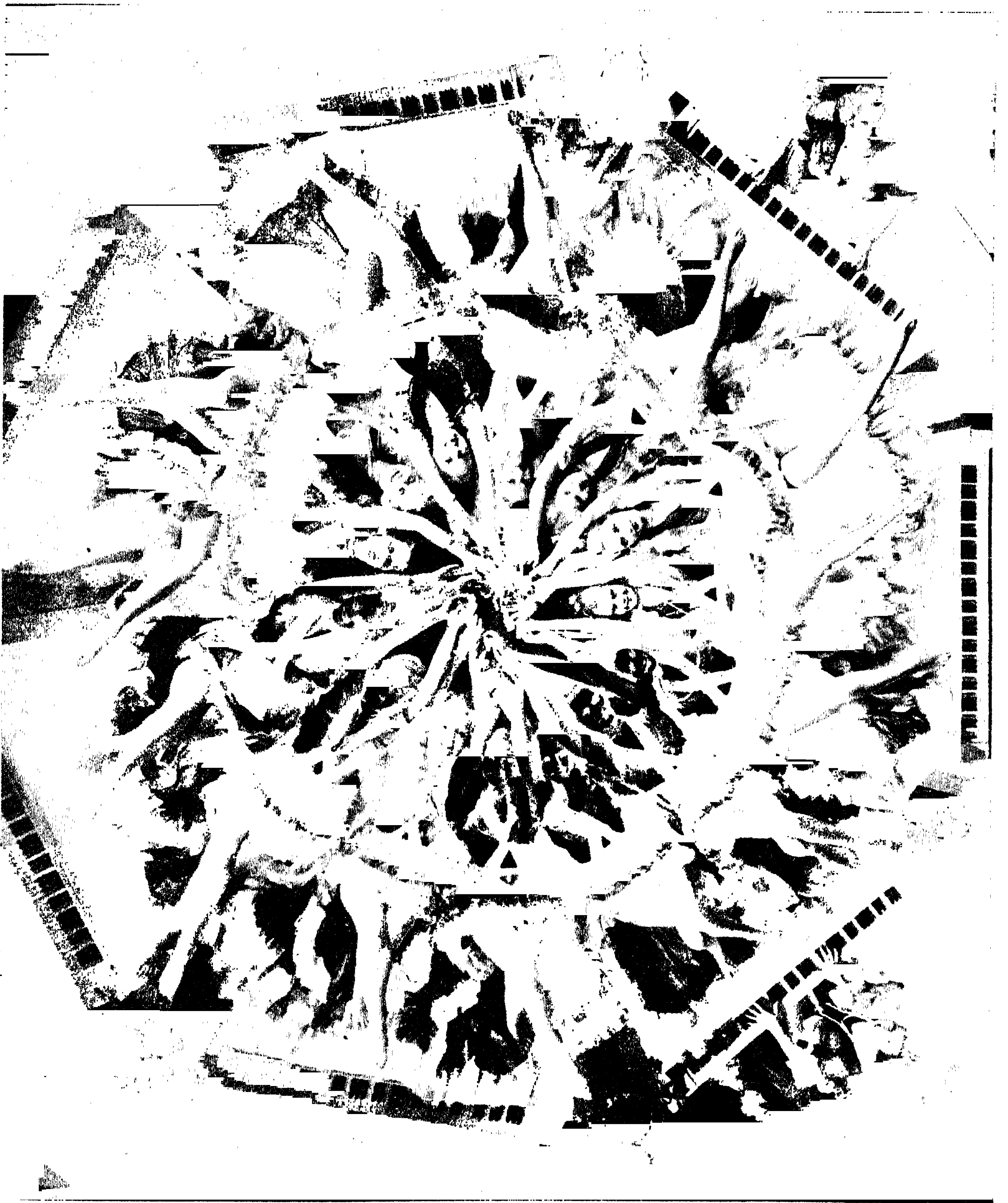
একাদশ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪২ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শরতের মেঘ

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

—অরুণ দা', তুমি কালই যাচ্ছ ?

—মঞ্জু, এস। হ্যাঁ, কালই যাব। কিন্তু মঞ্জু, তুমি আজ সারাদিনের মধ্যে একবারও এলে না কেন বলতো ? এইতো কাল চলে যাব কতদিনের মত, কতদূরে, ফিরব কি না তাই বা—

ত্রস্তে অরুণের ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিয়া গাঢ় অভিমান-ভরা-কণ্ঠে মঞ্জুলা কহিল—অরুণ দা', তোমার মুখে কি ভাল কথা নেই ?

অরুণ হাসিল। কহিল—কেন মন্দ কি বলছি। যাচ্ছি দূরে, বিদেশে, সম্পূর্ণ অচেনা-অজানাদের মধ্যে, যদি অসুখ করে, যদি কোন বিপদই হয়, সম্ভাবনা তারতো যথেষ্টই—

—ফের ঐ কথা। বেশ, আমি চল্লুম তবে—

—না না মঞ্জু, যেও না। এসব শুনতে যদি তোমার এত আপত্তি, তবে আর বলব না। কিন্তু আজ যে সকাল থেকে এতটা বেলা পর্য্যন্ত তুমি একবারও আস নি, তার শাস্তি কি নেবে তাই বলতো ?

মঞ্জুলা হাসিল। আরও একটু সরিয়া অরুণের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া বলিল—যা' তুমি দেবে।

তার রক্তাভ কপোলে আঙুলের একটা আঘাত দিয়া অরুণ বলিল—যা' দেবো তাইতো ? বেশ প্রতি মেলে চিঠি দিতে হবে।

—ও মা, ঐ বুঝি শাস্তি হ'ল ? চিঠিতো তুমি বল্লেও দেবো, না বল্লেও দেবো।

—যদি না দাও।

—তা' হ'লে তুমি ফিরে এসে শাস্তি দিও।

—বেশ, তাই। কিন্তু কি শাস্তি যে দেব সেটাও এখনি বলে রাখি। আমি ফিরে এলে তুমি এক মুহূর্ত্ত আমার চোখের আড়ালে যেতে পারবে না, এই হবে তোমার শাস্তি। এতে রাজি আছতো?

স্মিত-উজ্জ্বল-মুখে মঞ্জুলা উত্তর দিল—না থাকলেই বা রেহাই দিচ্ছে কে? কিন্তু অরুণ দা', তুমি যেমনটী যাচ্ছ, ঠিক এমনিই কি ফিরবে, না অন্য রকম হয়ে আসবে? বিলিতী হাওয়ায় রূপান্তরের সম্ভাবনা বেশী, তাই ভয় করে। বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে ফিরবে না তো?

কৌতুকের হাসি অরুণের সুন্দর মুখখানা দীপ্ত করিয়া তুলিলেও যথাসাধ্য চেষ্টায় সে একান্ত গম্ভীর হইয়া বলিল—ভবিষ্যতের কথা কেউই বলতে পারে না। মানুষের মনের গতিও কখন কোন্ পথে যাবে, তাও কেউ আগে হ'তে বুঝতে পারে না। জগতে বিচিত্র কিছু নয়। যদিই তাই হয়—

—তা' মন্দ কি হবে। ভালই। তবে আগে হ'তে আমায় একটু লিখে জানিও। আমি তোমার মেম-বউয়ের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে রাখব।

—ওঃ, বড় যে সাহস দেখি! অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবে না গায়ে কেরাসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালবে? কি কর্ব্বে ঠিক করে বলতো?

চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গীতে মঞ্জুলা কহিল—ও মা, তুমি মেম বিয়ে কর্ব্বে, তা' আমার কি? আমি কি দুঃখে গায়ে কেরাসিন ঢেলে পুড়ে মরতে যাব? একটা কেন, তুমি দশটা মেম বে করে আন না—আমার কি?

—তোমার কিছু নয়তো? বেশ, ভাল কথা। আমার তা' হ'লে কোন দোষ নেই। তা' হ'লে মেম নিয়েই ফিরব।

—ফির, ফির, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু থাক্ ওসব বাজে কথা। আমার মন বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই মনকে বোঝাতে পাচ্ছি না। অরুণ দা', তুমি যেও না, কি হবে বিলেত গিয়ে, নাই বা ব্যারিষ্টার হ'লে? থাকো অরুণ দা', তুমি এখানেই থাকো, আমি কি করে যে থাকব এই ক' বছর—

উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবাহে মঞ্জুলার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। অরুণেরও চোখ দুইটা সজল হইয়া উঠিল। মঞ্জুলার হাত দুইটী ধরিয়া নিজের দিকে তাহাকে একটু টানিয়া গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—মঞ্জু, আমি চলে গেলে সত্যি কি তোমার খুব বেশী কষ্ট হবে—খুব বেশী?

—খুব বেশী অরুণ দা'! ভয়ানক কষ্ট হবে!

ম্লানমুখে অরুণ কহিল—আমি জানি মঞ্জু, কিন্তু কি করব, বাধ্য হয়ে এ কষ্ট তোমায় দিতে হবে আমাকে। ভবিষ্যৎ উন্নতির—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই ব্যগ্রভাবে মঞ্জু কহিল—উন্নতি মানেতো টাকা? কিন্তু বেশী টাকার দরকার কি তোমার? আমাব যা' আছে সবইতো তোমার।

অরুণের বিষণ্ণ মুখ ম্লান গাম্ভীর্য্যের ছায়াপাতে বড় ক্ষুব্ধ করুণ দেখাইল। সে কহিল—স্ত্রীর টাকায় বড় মানুষী করে আমি জীবন কাটাব, এই কি তুমি চাও মঞ্জু? এতবড় অপদার্থ হ'তে বলো আমায়?

অপ্রতিভভাবে মঞ্জু বলিল—না, তা' নয়, তবে—

—মঞ্জু, এটুকু কষ্ট তোমায় সহ্য করতেই হবে। লক্ষ্মীটী, আমায় বাধা দিও না! যাতে মানুষের মত হ'তে পারি, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা আমার হয়, সে চেষ্টা আমায় কর্ত্তে দাও। তুমি বাধা দিলে আমি যেতে পারব না তা'তো জানো। তোমায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেলে, ছেড়ে দূরে যাবার ক্ষমতা আর আমার হবে না, সেই জন্যেইতো আমাদের বিবাহ এখন বন্ধ রাখলুম। তোমার যোগ্য হয়ে আগে ফিরে আসি, তারপর—

—আঃ, কি যে বলো অরুণ দা'! এখন কি তুমি আমার অযোগ্য? তা' ছাড়া, আমাদের বিয়ে যখন ঠিক হয়েছে, তখনতো এমন কোন কথা হয় নি যে, তোমায় যোগ্যতা অর্জ্জন করবার জন্যে সাগর পারে যেতে হবে।

—তা' হয় নি সত্য, কিন্তু যাঁরা এই বিয়েটা ঠিক করে-

ছিলেন, তাঁদের বিবেচনা-শক্তি যে খুব প্রখর ছিল তা'তো আমার বোধ হয় না। বাঁদরের গলায় হীরের নেক্‌লেস্ পরাবার ব্যবস্থা যাঁরা করেন—

—অরুণ দা'!

মঞ্জুলার সরোষ কণ্ঠস্বরে অরুণ হাসিয়া চুপ করিল।

একত্র সংলগ্ন দুইখানা বাড়ীতে বহুদিন অতিবাহিত করায় দুইটী পরিবার প্রায় এক হইয়া আসিয়াছিল। সেই একতার বন্ধন আরও দৃঢ়তর করিতে সেদিন মঞ্জুলা পৃথিবীতে আসিল, সেইদিনই তাহার পিতা শঙ্করনাথ অরুণের জনককে ডাকিয়া বলিলেন—এস মহিম দা', আমরা প্রতিজ্ঞা করি—বড় হ'লে এই ছেলেমেয়ে দু'জনকে আমরা একসঙ্গে গেঁথে দেবো। কথার সঙ্গে পার্শ্বস্থিত ক্রীড়ারত অরুণকে তিনি বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন। বাল্যে মাতৃহীন অরুণ তাঁহার পত্নীর অঙ্কেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অবস্থা-হিসাবে মহিমচন্দ্র বিপুল বিত্তশালী শঙ্করনাথ হইতে অনেকটাই নিম্নে অবস্থিত। সুতরাং এ কথায় তিনি যে সাগ্রহে সম্মতি দিবেন, তাহা বিচিত্র নয়।

কথাটা এইদিন হইতেই সম্পূর্ণ স্থির হইয়া রহিল। দুই বাড়ীর লোকের সঙ্গে মঞ্জু, অরুণও পরস্পর পরস্পরকে চির-জীবনের সঙ্গী বলিয়া জানিত। একটী বৃন্তে ফোটা দুইটী ফুলের মত হাসি-কলহ, ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া তাহাদের দিন কাটিতেছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের উপর আকর্ষণের মাত্রাও তাহাদের বাড়িয়া চলিল। শঙ্করনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া একদিন মহিমচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন—দেখো হে, মজা দেখো। একজন একজনকে না দেখে মুহূর্ত্ত থাকতে পারে না। ভগবান আগে থাকতেই দু'জনকে এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধে দিয়েছেন। ওদের এক হতেই হবে।

মহিমচন্দ্র হাসিয়া তাঁহার কথায় সায় দিলেন। তারপর অন্যমনে কহিলেন—কিন্তু আরও কিছুদিন যাক্, তারপর এদের বিয়ের ব্যবস্থা—কি বলো শঙ্কর?

বিলম্ব করিবার ইচ্ছা শঙ্করনাথের ছিল না। নিজের শারীরিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একমাত্র সন্তানকে পরিণীতা দেখিয়া তিনি এখানকার কাজ শেষ করিয়া ফেলিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে মঞ্জুলার জননী পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। শরীরের গতিক দেখিয়া তাঁহারও ডাক আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মঞ্জুলার বিবাহটা দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন। মহিমচন্দ্রের কথায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন—দেরী করে লাভ কি মহি দা', কাজটা শেষ করে রাখাইতো ভাল। মঞ্জুর মাতো গেছেন। আমি কবে যাই তার ঠিক কি? তাই—

উচ্চহাস্যের তরঙ্গে তাঁহার কথাটা ডুবাইয়া দিয়া মহিমচন্দ্র কহিলেন—পাগল হয়েছ, এর মধ্যে যাবে কি? এখনও তোমার যেতে ঢের দেরী! তবে হ্যাঁ, এমন বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ হ'লে সংসারে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। সে কথা সত্যি ভাই। আজ প্রায় সতের বছর হ'ল অরুণের জননী স্বর্গে গেছেন। জীবনের এ ক'টা বছর যে কি ভাবে কাটল, সে শুধু আমিই জানি, আর জানেন সেই অন্তর্য্যামী! তবে কি জানো, বেঁধে মারলে সইতেই হয়। উপায়তো কিছু নেই—এ ভগবানের মার! তা' যাক্ আর দুটো বছর, অরুণ এম্-এ টা পাশ করুক। বিয়ে হ'লে আর কি বই ছোঁবে—নিজেদের সে সময়কার কথা মনে পড়েতো?

—পড়ে বই কি, খুব পড়ে। কি দিনই গেছে সব!

সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত সেই বিগত দিনগুলার কথা ভাবিয়া উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন।

সে বৎসর ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধি করাল ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল। ইহারই দুইমাস পর মাত্র কয় সপ্তাহের ব্যবধানে পুত্র-কন্যার মিলন অসম্পূর্ণ রাখিয়া এক ইনফ্লুয়েঞ্জাতেই দুই বন্ধু এখানকার বাস তুলিয়া ওপারে যাত্রা করিলেন। দুইটী বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল পিতৃমাতৃহীন দুইটী তরুণ তরুণী। মঞ্জুলার দূর-সম্পর্কের এক মাতুল সে পরিবারে আসিয়া তাহার কাছে রহিলেন। মঞ্জুলার সঙ্গে আর্থিক অবস্থার অনেকখানি অনৈক্য ছিল বলিয়াই অরুণ ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার জন্য বিলাত-যাত্রার আয়োজন করিল। তাহার গভীর আগ্রহে মঞ্জুলার

সমস্ত অনিচ্ছা-আপত্তি মিটিয়া গেল। মঞ্জুলার মাতুলও বলিলেন—বে-টা হয়ে যাক্, তারপর যেও অরুণ।

মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল—না মামাবাবু, আপনি আর বাধা দেবেন না। বাবার মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হ'তে এখনও চারমাস দেরী। এর মধ্যে বে হবে না, কাজেই চার-পাঁচমাস আমায় এখানে তা' হ'লে থাকতে হবে। অত দেরী আমি কর্ত্তে পারব না—আমি এই সামনের সপ্তাহেই যাব। এদিকে যত শীগ্‌গির যাব, ওদিকে তত শীগ্‌গির ফিরতে পারব।

ইহাদের বিবাহ দিয়া দিতে পারিলেই সংসার-অভিজ্ঞ মাতুল নিশ্চিন্ত হইতেন। তারপর অরুণ ইংলণ্ডেই যাক্, আর আফ্রিকাতেই যাক্ তাঁহার তাহাতে কোন আপত্য ছিল না। কিন্তু কোন কথা টিঁকিল না দেখিয়া তিনি ক্ষুন্ন-মনে নিরস্ত হইলেন। মঞ্জুলা ধনীর কন্যা; অরুণ মধ্যবিৎ গৃহস্থ সন্তান। এই চিন্তাটাই কাঁটার মত তাহার অন্তরে ফুটিতেছিল। আজ না হউক, দুইদিন পরেও সে তাহার সমকক্ষ হইবার শক্তি রাখে। এইটুকু যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া আসিবার ব্যাকুল আগ্রহ তাহাকে ক্রমশই অধীর করিতে লাগিল। যদিই তাহার এ দীন অবস্থা আজ তাহাকে মঞ্জুলার কাছে অবজ্ঞেয় করিয়া তুলে! ইহা সম্ভব নয়, তাহা সে জানে। আবার ইহাও জানে, এ জগতে বিচিত্র কিছুই নহে। তাই কাহারও কোন কথা না শুনিয়া সে বিলাত-যাত্রা স্থির করিল।

বিমুগ্ধ চক্ষের স্থির দৃষ্টি কয় মুহূর্ত্ত অনিন্দা-শ্রী মঞ্জুলার মুখের উপর ফেলিয়া রাখিয়া অরুণ ডাকিল—মঞ্জুল!

মঞ্জুলা চাহিল। অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মঞ্জুল, আমি যদি আর না ফিরি, তা' হ'লে তুমি আর কারো হবেতো? চির-কুমারী থাকবে না এটা নিশ্চয়।

মঞ্জুলা মুখ তুলিয়া করুণ-নেত্রে শুধু একবার অরুণের দিকে চাহিল।

কুণ্ঠা-কোমল-কণ্ঠে অরুণ কহিল—মাপ কর মঞ্জুল, আর ও রকম কথা বলব না। জেনে-শুনে একথা বলা আমার খুব অন্যায় হয়েছে। কিন্তু যাক্ এ সব কথা। বলতো একটা বছর কি করে কাটাবে তুমি?

হাসিতে চাহিয়া মঞ্জুলা বলিল—কি আর করব, আরও পড়ব—ঠিক তোমার উপযুক্ত যাতে হ'তে পারি তারই চেষ্টা কর্ব।

—এখন কি তুমি আমার উপযুক্ত নও মঞ্জু! আমারতো ধারণা আমিই তোমার অনুপযুক্ত, একান্ত অযোগ্য।

—তোমার ধারণা নিয়ে তুমি থাকো, কিন্তু আমার নিয়ে যেন আমি মরি। যখন তুমি সাহেবের দেশ থেকে সাহেব হয়ে ফিরবে, তখন বাঙ্গালীর মেয়ে কি ভাল লাগবে? এখন থেকে একবারে যাতে মেম হয়ে উঠতে পারি, তারই চেষ্টা করতে হবে দেখছি। নইলে কপালে কি আছে কে বলতে পারে! তবে দেখো, যদি মেম সঙ্গে করেই আনো, তা' হ'লে—

বাধা দিয়া অরুণ কহিল—আচ্ছা মঞ্জুল, সত্যি বলোত তোমার বিশ্বাস হয় কি?

একটু থামিয়া পুনরায় গম্ভীর-মুখে কহিল—মেমতো দূরের কথা, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি—

হাসিয়া মঞ্জুলা বলিল—বাঃ, এ আর বিশ্বাস হবে না কেন, আশ্চর্য্যই বা কি, বিবাহিতা স্ত্রী-স্বত্বেও যে কতলোক বিলেতে মেম বে করে আসে, আরও কত কি হয়, এ আর বেশী কি।

—কিন্তু আমিও যে তাদেরই একজন, তুমি কি এই ভাবো মঞ্জু।

মঞ্জুলা এবার হাসিল না, ধীর শান্তভাবে উত্তর দিল—না, তোমাকে আমি তা' ভাবি না। কিন্তু এটাও বলি অরুণ দা', যদি এমনই একটা কিছু হয়ই, তা'তে আশ্চর্য্য হবো না; কারণ, এটা আমি বেশ জানি, জগতে অসম্ভব কিছু নয়। আর মানুষের মন সব সময় একভাবেই থাকে না।

দুই

কয় বৎসর পরের কথা। দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া মঞ্জুলা অন্যমনে অরুণের শূন্য বাড়িখানার দিকে চাহিয়াছিল। পশ্চিম গগনে দিবসের শেষ

আলোর রেখাটুকু বহুক্ষণ মিলাইয়া গিয়াছে। আকাশের গায়ে নব বধূর সিন্দুর ঢালা ললাটের মত তখনও রক্তাভা বিজড়িত। সেই লাল আলোর একটা ঝলক মঞ্জুলার ঈষৎ বিবর্ণ মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে যেন আবীর মাখাইয়া দিয়াছে। বিপর্য্যস্ত চুলগুলা উতল হাওয়ায় ক্রমাগত মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। বামহাত তুলিয়া সেগুলা শিথিল-প্রায় কবরীর মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া মঞ্জুলা সরিয়া ঘরের দিকে চলিয়া আসিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাষ্ঠাসনগুলার একটা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল। বসিয়া ক্লিষ্টকণ্ঠে সে ডাকিল—বিন্দু?

দাসী বিন্দু কাছেই একটা ঘরে বসিয়া কি যেন করিতেছিল; মঞ্জুলার আহ্বানে ব্যস্তভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া মঞ্জুলা প্রশ্ন করিল—মামাবাবু ফিরেছেন?

—ফিরেছেন দিদিমণি। তিনি আপনাকেই খুঁজছিলেন।

—এতক্ষণ বল নি কেন? কোথায় তিনি, চলো যাচ্ছি।

মঞ্জুলা ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল।

তেতালার একটা ঘরে মামাবাবু থাকিতেন। তাহারই সম্মুখস্থ বারান্দায় বসিয়া তিনি কি একটা হিসাব দেখিতেছিলেন। মঞ্জুলা কাছে দাঁড়াইয়া নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—মামাবাবু, আমায় ডাকছেন?

মামাবাবু কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া বেদনা-করুণ নেত্রে কিছুক্ষণ মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তারপর বলিলেন—হ্যাঁ মা, ডাকছি। বসো, কথা আছে।

—বলুন। মঞ্জু বলিল।

মামাবাবু ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিলেন; তারপর যেন কতকটা জোর করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—চল মঞ্জু, দিনকতক আমরা বাইরে কোথাও যাই।

—বাইরে যাব! কেন মামাবাবু? অত্যন্ত বিস্মিতভাবে মঞ্জুলা মাতুলের দিকে চাহিল।

মামাবাবু আরও খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—তোমার শরীরতো খুব খারাপ, চলো না দিনকতক কোথাও থেকে ঘুরে আসি। কালই বেরিয়ে পড়া যাক্—কি বলো?

মঞ্জুলা হাসিয়া বলিল—কেন মামাবাবু, হঠাৎ আমায় দেশছাড়া করবার কি দরকার হ'ল আপনার বলুনতো? কেন আমায় বাইরে পাঠাতে চান্, শুনি।

এ প্রশ্নের উত্তরও মামাবাবু চট্ করিয়া দিতে পারিলেন না। মঞ্জুলা বলিল—কারণ একটা কিছু আছেই। বলুন মামাবাবু।

—মা পরশু অরুণ এখানে ফিরে আসছে।

বেশতো মামাবাবু, সেতো খুব আনন্দের কথা। ব্যথা-ক্ষুব্ধ-স্বরে মাতুল কহিলেন—তা' আর হ'ল কই মা, আনন্দের বিষয় আর রইল কোথায়। আজ যদি জানতুম, অরুণ আসছে আমাদের আপনজন হ'তে, তা' হ'লে কি এইভাবে তোমায় নিয়ে দূরে পালাতে চাইতুম! তা'তো ভগবান করলেন না। এ যে কতবড় দুঃখের কথা—না মঞ্জু, চলো তুমি, আমরা কালই এখান থেকে কোথাও যাই।

মঞ্জুলা হাসিল। সহজ হাসি। কিন্তু প্রকৃত মরমী চোখের দৃষ্টি দিয়া যদি কেহ সে হাসি দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, পাষাণ কারারুদ্ধ উৎসের মত সেই হাসির তলায় রোদনের এক বিরাট উচ্ছ্বাস বহু কষ্টে বদ্ধ রহিয়াছে। সহজভাবে মঞ্জুলা বলিল—কথার কারণ কিচ্ছু হয় নি মামাবাবু। দূরে যাবারও আমার কোন দরকার হবে না। তিনি তাঁর মনোমত স্ত্রী পেয়েছেন, এতো ভাল কথাই। দুঃখের কি আছে এতে?

রুষ্টকণ্ঠে মামাবাবু কহিলেন—কি বলো মঞ্জু, দুঃখের কিছু নেই? তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অরুণের সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ স্থির ছিল—

—তিনিতো সেটা স্থির করেন নি মামাবাবু, যে, তার জন্যে তাঁকে নিজের জীবনের সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিতে হবে? যাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে, তাকে বিয়ে করেছেন। এর জন্যে তাঁকে আমি একটুও দোষ দিতে পারি না। ভগবানের কাছে কামনা করি—তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হোন্।

মাতুল নিষ্পলক নেত্রে কয় মুহূর্ত্ত মঞ্জুলার ক্ষোভ-লেশ-

হীন শ্রী-মণ্ডিত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে সঙ্কুচিত-কণ্ঠে বলিলেন—তোমার কামনা সত্ত্বেও সে সুখী হবে না। হ'তে পারে না মা। এ আমি নিশ্চয় বলছি। করায়ত্ত রত্ন স্বেচ্ছায় ফেলে যে রঙ্গিন কাচের টুক্‌রো যত্ন করে তুলে নেয়, জাগতিক নিয়মে তাকে শাস্তি পেতেই যে হবে। তারপর তোমার উপর এই অবিচার! তার শাস্তি যাবে কোথায়? তোমায় এই কষ্ট দিয়ে স্বর্গীয় বাপমার কথার অন্যথা করে মোহে ভুলে একটা ইংরেজ মেয়েকে যে বিয়ে কর্লে, সে কি কখনও সুখী হবে? হতে পারবে? ভগবান নিজে তার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করে রাখবেন।

ক্ষুব্ধ-ব্যথাভরা-কণ্ঠে মঞ্জুলা বলিল—ওসব কথা থাক্ মামাবাবু।

মামাবাবু গভীর অনুকম্পাভরে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রাগিয়া কহিলেন—আমি তাকে অভিশাপ দিচ্ছি না মা। শুধু এই বলছি যে, সেই নিরপেক্ষ বিচারকের হাত হ'তে এতবড় একটা নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতা, এতবড় একটা অবিচার কখন নিষ্কৃতি পাবে না। যেদিন আমার বন্ধুর ছেলে লিখলে বিলেত হ'তে এই খবর, আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি নি। ভাল করে প্রমাণ না নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি নি। সেই অরুণ, তার এই কাজ!

—মামাবাবু আমি যাব এখন?

—একটু বসো মা, আর একটা কথা। বিশ্বাসঘাতকতা যা' করবার তা'তো সে করেছে। সে যখন সব সম্বন্ধ শেষ কর্লে, তখন আমাদেরও আর তার সঙ্গে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তোমায় এইবার তবে পাত্রস্থা করবার ব্যবস্থা করি? তোমার মত না নিয়েতো কিছু করতে পারি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্ছি।

মঞ্জুলা আবার হাসিল। তার সে হাসি মামাবাবুর আশাভরা চিত্তকে অনেকটাই হতাশার মধ্যে নামাইয়া আনিল। ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হাসলে কেন মা? বিয়েতো একদিন কর্ত্তেই হবে।

—কর্ত্তেই হবে—এমন কি কথা আছে মামাবাবু?

—সে কি মা, হিন্দুর ঘরে, হিন্দু-সমাজে—

—মামাবাবু, আমার ভাইও নেই, বোন্‌ও নেই। আমার সমাজ নিয়ে কি হবে বলুনতো? মামাবাবু, আমার জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না। আমার দিন এইভাবে বেশ কেটে যাবে। আমার কোনো কষ্ট নেই।

মাতুল বিহ্বল-নেত্রে শুধু চাহিয়া রহিলেন।

তিন

মুহূর্ত্তের কল্পনাতেও অরুণের মনে একথা আসে নাই; কিন্তু যেটা ভাবিতেও পারা যায় না, সংসারে অধিক স্থলে সেইটাই হয় সম্ভব। ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যে, মোহের আতিশয্যে মঞ্জুলার উপর কতবড় অবিচার যে করা হইয়াছে, এটা অরুণ বুঝিত। প্রতারণা চলে সকলের সঙ্গে, চলে না শুধু আপন অন্তরের আর সেই অন্তর্য্যামীর সঙ্গে। তাই অনু-তাপের দহন তুঁষের আগুনের মত অরুণের বুকের মধ্যে এযাবৎ ধিকিধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। আরও প্রবল শিখায় দেখা দিল সেদিন, যেদিন শ্বেতাঙ্গিনী পত্নীসহ দেশে আসিতেই ক্ষোভ বিরাগহীন প্রশান্ত হাসিমুখে মঞ্জুলা আসিয়া সাদর অভ্যর্থনায় তাহাদের উভয়কে বরণ করিয়া লইল।

দুকূলপ্লাবী বর্ষাস্রোতের উদ্দাম গতি সব কিছু ভাসাইয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে বহিয়া চলে। আবার সময়ে সে প্রবাহ যখন সরিয়া যায়, তখন তটিনী তড়াগে সেই পূর্ব্বরূপই ফিরিয়া আসে। দুইদিনের সেই উচ্ছ্বাসই বা যায় কোথা? কোথাই বা থাকে সে উতল উদ্দাম মূর্ত্তি? প্রথম মোহের আবেগটুকু মিলাইয়া আসিতেই কৃতকার্য্যের অনুশোচনা অরুণকে পীড়িত করিতেছিল। উপায় থাকিলে বিদেশে চিরবাসের ব্যবস্থাই সে করিয়া লইত। সে উপায় ছিল না বলিয়াই ক্ষুব্ধ ভারাক্রান্ত-চিত্তে সে আবাল্যের বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল।

তবুও এইটা সে আশা করে নাই। অরুণের ধারণা ছিল, মঞ্জুলা তাহার বিবাহের কথা শুনিয়াছে; হয়তো সেও এরপর আর কাহাকেও স্বামীরূপে বরণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া

গিয়াছে। যদিও ওখানে থাকে, সে আর অরুণের ত্রিসীমার মধ্যে আসিবে না। এতবড় অন্যায়কারী বিশ্বাসহন্তার মুখ পর্য্যন্ত দেখিবে না এ নিশ্চিত। এ চিন্তার সঙ্গে একটা গভীর ব্যথা কাঁটার মত অরুণের অন্তরের মধ্যে বিঁধিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকটা নিশ্চিন্তও সে হইত—মঞ্জুলার সম্মুখে এ মুখ লইয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে না জানিয়া। সেই মঞ্জুলাই পূর্ব্বের মত তেমনই স্নেহমাখা-স্বরে 'এস অরুণ দা' বলিয়া যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অরুণ সঙ্কোচ কুণ্ঠার ভারে কোথায় যে লুকাইবে ভাবিয়া পাইল না।

বিনাদোষে আঘাত যাহাকে করা যায়, সে যদি তাহা লইয়া অভিযোগ-অনুযোগ না করিয়া, আঘাতকারীকে একটী কথাও না বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে দেয় পূর্ব্বের মত স্নেহ-মধুর সহজ সরল ব্যবহার, সেটা বড়ই দুঃসহ হয় সেই আঘাতকারীর পক্ষে। আঘাতের ব্যথায় আহত কাঁদুক, অভিযোগ করুক, বিবাদ করুক, সব সহ্য হইবে—কিন্তু নীরব ক্ষমা—তাহার জ্বালা বড় কঠিন! আঘাতের পরিবর্ত্তে প্রতিঘাত সহ্য হয়; অসহ্য হয়—ক্ষমা।

বিবশ বিহ্বল অরুণের দিকে চাহিয়া মঞ্জুলা বলিল—তোমার বউ বোধ হয় মোটেই বাংলা জানেন না অরুণ দা'? ওঁর নাম কি? বেশ চেহারাটী ত! তোমার পছন্দের তারিফ করি। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলে না?

স্তম্ভিত দৃষ্টি তুলিয়া অরুণ একবার মঞ্জুলার দিকে চাহিল। না, অভিযোগ তিরস্কারের একটী রেখাও তাহার কোনোখানে ছায়াপাত করে নাই! এতটুকু ঘৃণা পর্য্যন্ত নয়! সেই মঞ্জু? এত সহজভাবে তাহার এতবড় অপরাধকে ক্ষমা করিল! যেন ইহাতে তাহার কিছু যায় আসে নাই। অরুণ তাহার কোনদিন কেহ ছিল না। সে যাহাই করুক, তাহাতে তাহার কি? কথাটা ভাবিতেও অরুণের বুকে ব্যথা বাজিল। কেন কে জানে মঞ্জুলা তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—কথা বলছ না কেন অরুণ দা'? আমাকে চিনতে পারছ না না কি?

—মঞ্জু!

মঞ্জু চোখ তুলিয়া অরুণের আরক্ত মুখ স্পন্দিত ওষ্ঠের দিকে একবার চাহিল। তারপর সহজভাবে কহিল—তোমার স্ত্রীকে নিয়ে ভেতরে এস। নতুন জায়গায় এসে ওঁর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমার উচিত সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এস, ভিতরে এস।

মহার্ঘ্য আসবাবে সজ্জিত সদ্য-সংস্কৃত ঘরে পা দিয়া অরুণ আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পিতৃ-সঞ্চিত যে টাকা সম্বল ছিল, প্রবাসে তাহা সমস্তই খরচ হইয়াছে। এ বাড়ীর ভাড়া যাহা পাওয়া যাইত, তাহাও পুরাতন ভৃত্য শিবচরণ সব সেখানে পাঠাইয়াছে। তাহার উপর এভাবে ঘর-বাড়ী সারাইয়া সাহেবী-কেতায় সৌখিনভাবে সাজাইয়া রাখা হইল কিরূপে সে ভাবিয়া পাইল না; এতো অল্প খরচের ব্যাপার নহে। শিবচরণের মাথায় যে এতটা বুদ্ধি আসিয়াছে, প্রভু বলিবার আগেই তাহার বসবাসের জন্য সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে এও সে কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অথচ এ সব একজন কেহ যে করিয়াছে ইহাতো নিশ্চিত—কিন্তু কে সে?

অরুণের দিকে চাহিয়া মঞ্জুলা কহিল—তোমাদের চা নিয়ে আসব?

শুষ্ককণ্ঠে বহুকষ্টে ভাষা ফুটাইয়া এবার অরুণ বলিল—শিবু দা' আছেতো এখানে?

—শিবু দা' আছে বই কি। ডাকব তাকে?

—তাকেই বলো না চা আনতে। তুমি কেন কষ্ট করে যাবে?

মঞ্জুলা হাসিয়া উঠিল—ও কি অরুণ দা', ক'টা বছরে তুমি কি নতুন লোক হয়ে এলে না কি? সব ভুলে গেলে? আমি কি কখনো তোমার কিছু কাজ করি নি?

অরুণ উত্তরে কথা বলিল না, শুধু করুণ-নেত্রে একবার মঞ্জুলার দিকে চাহিল। রেণী বহুক্ষণ হইতেই অরুণের ভাবান্তর ও মঞ্জুলার অনবদ্য-শ্রী লক্ষ্য করিতেছিল। কে এই তরুণী রূপসী? অরুণের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধই বা কি? যেমন বিস্ময় তাহার মনে জাগিতেছিল, তাহার সঙ্গে তেমনই প্রবল হইয়া দেখা দিতেছিল নিদারূণ রোষ। কেন, সেটা সেও ঠিক নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। অসহিষ্ণু-কণ্ঠে সে অরুণকে প্রশ্ন করিল—ও তোমার কে?

অরুণ উত্তর দিল না।

মঞ্জু বলিল—আমি ওঁর প্রতিবেশী।

—প্রতিবেশী? রেণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

মঞ্জুলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তা' হ'লে শিবু দা'কে চা আনতে বলে আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি অরুণ দা'। বিকেলে এসে বৌদি'র সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা যাবে এখন।

মঞ্জুলা অগ্রসর হইল। অরুণ দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, মঞ্জুলার সঙ্গে সঙ্গে সেও বাহিরে আসিল। মঞ্জুলা দেখিয়াও দেখিল না। কয় পা আগাইয়া অরুণ সহসা স্পন্দিতকণ্ঠে ডাকিল—মঞ্জু!

মঞ্জুলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। অতি কঠিন তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—যাও, ও ঘরে যাও।

সহসা কঠিন আঘাতে মাতালের জমাট নেশা যেমন ছুটিয়া যায়, মঞ্জুলার দৃষ্টি-সংঘাতে অরুণ তেমনই সচকিত হইয়া উঠিল। হয়তো কিছু বলিতেও গেল, সে অবকাশ তাহাকে না দিয়া চঞ্চল চরণে মঞ্জুলা সে স্থান ত্যাগ করিল।

ট্রের উপর চায়ের কাপ প্রভৃতি সাজাইয়া শিবচরণ এই দিকেই আসিতেছিল। অরুণ তাহার দিকে একবার চাহিল। শিবুও চাহিল। কেহই কথা কহিল না। খানিক পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে, শিবু নিকটে আসিতে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—শিবু দা', ঘর-বাড়ী এভাবে সাজান হ'ল কি করে, এসব খরচাই বা দিলে কে?

এতদিন পর প্রভু-পুত্রকে পাইয়া শিবুর আনন্দের সীমা থাকিত না, যদি সঙ্গে ঐ সর্ব্বনাশী, অর্থাৎ রেণী না থাকিত। মঞ্জুলা ও অরুণ একসঙ্গেই তাহার অঙ্কে বড় হইয়াছে। দুইজনেই তাহার প্রাণাধিক প্রিয়। আর সকলের সঙ্গে শিবুও একান্তভাবে আশা করিয়াছিল, অরুণ ফিরিয়া মঞ্জুলাকে এ গৃহের লক্ষ্মীরূপে বরণ করিয়া আনিবে। তাহার এতদিনের সঞ্চিত আশার মূলে রেণীই যে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, সেই যে সব অনর্থের মূল ইহাতে তাহার আর সন্দেহ ছিল না। দুঃখ, ক্ষোভ, সঙ্গে সঙ্গে রেণীর উপর নিদারুণ আক্রোশের সীমা ছিল না। অপরাধীরূপে অরুণকে সে ভাবিতেই পারে না। তাহার দোষ কি? ঐ ডাইনীই কি মন্ত্রবলে তাহাকে মোহিত করিয়াছে। স্নেহপাত্রকে দোষী ভাবিতেও কষ্ট হয়; তাহার সব অপরাধের ভার আর একজনের মাথায় চাপাইয়া দিতে না পারিলে চিত্তে আর শান্তি আসে না। কাতর-দৃষ্টিতে একবার অরুণের দিকে চাহিয়া শিবু কহিল—আহা দাদাবাবু বিদেশে গিয়ে ডাইনীর মন্ত্রে ভুলে এমন কাজও কর্লে! অদেষ্ট, সবই অদেষ্ট!

অধীরভাবে অরুণ কহিল—শিবু দা', তোকে কি জিজ্ঞেস করলুম—এসব কে দিলে?

—আর কে দেবে? যে দেবার সেই দিয়েছে। সব দিদিমণি দিয়েছেন।

—কে, মঞ্জু? তার টাকা তুই নিতে গেলি কেন?

—কি কর্ব দাদাবাবু, তিনি বল্লেন, তাঁর কথার ওপরতো কথা বলতে পারি না। শুধু এই নয়, প্রায় বছরখানেকের মত সংসার-খরচের যত সব জিনিষ তিনি খুঁটিয়ে কিনে ঘরে রেখে গেছেন।

অরুণ ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর কহিল—সে বড় মানুষ, সেই রকম সব জিনিষ পত্র দিয়েই আমার বাড়ী সাজিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু আমারতো অবস্থা সেরকম নয়; আমার এত সব কিছু দরকারও ছিল না। এ সব দামই বা আমি দেবো কোথা থেকে? এ যে অনেক টাকা।

শিবু প্রায় কাঁদিয়া বলিল—বাবু দিদিমণিকে এর দাম দেবার কথা আপনি মনে আনতেও পার্লেন? তাঁর যা' কর্বার তা'তো করেছেন। তাঁর দেওয়া জিনিষের দাম দিতে গিয়ে তাঁকে আর অপমান করবেন না।

চার

দিন আর কাটিতে চাহে না। ট্যাক্সি করিয়া প্রত্যহ অরুণের কোর্টে যাওয়া-আসাই সার হয়। অর্থের সন্ধান মিলে না।

যে আশা বক্ষে লইয়া অরুণ সুদূর সাগর পারে গিয়াছিল, মরুর স্বচ্ছ মরীচিকার মত তাহা দিন দিন নিরাশায় বিলীন হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, যদি সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া সে বিদেশে না যাইত, তাহা হইলে এমনভাবে সব দিক্ দিয়াই হয়তো তাহার জীবন ব্যর্থতায় ভরিয়া উঠিত না। কেতকীর উগ্রগন্ধেই আকুল মধুকর ছুটিয়া আসিয়া দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলে। হায়, যদি এ পরিণাম সে পূর্ব্বে জানিত! ভবিষ্যৎ বুঝিবার শক্তি যদি মানুষের থাকিত! বিবেকের কশাঘাত, অনুশোচনার তীব্রদাহ ক্রমশই অরুণকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল।

গৃহে অশান্তির সীমা নাই। দরিদ্র কন্যা রেণী অরুণকে বিবাহ করিয়াছিল অর্থলোভে; প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নহে। উপযুক্ত পূজা-অর্চ্চনার অভাবে তাহার বিরক্তির মাত্রা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। তবু শিবচরণের মুখে মঞ্জুলা এ সব সংবাদ জানিতে পারিয়া যতটা সম্ভব তাহার প্রতীকার করিত। সংসারের সব খরচই প্রায় সে দিত। নহিলে আরও যে কি হইত তাহার ঠিকানা নাই। নিজ হাতে নিজের ঘরে যে আগুন দিয়া আপনার সর্ব্বস্ব ছারখার করিয়া ফেলে, নিজের প্রতি তাহার কেমন একটা গভীর ধিক্কার, একটা ক্ষমাহীন বিরাগ সারা অন্তর জুড়িয়া বসে। তেমনই ভাব জাগিয়াছিল অরুণের চিত্তে। সর্ব্বদাই কেমন একটা উদাস নিস্পৃহতা। অধিকাংশ সময়ই সে বাহিরে বাহিরে কাটায়। রেণী তাহার সাক্ষাৎ পায় না। সেজন্য অবশ্য সে ব্যগ্রও নহে। মঞ্জুলা সব সময়ই এখানে থাকিত। রেণীর সঙ্গে তাহার যথেষ্ট সদ্ভাব। নিত্য-নূতন বস্তু তাহার নিকট হইতে উপহার পাওয়ায় রেণীও তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট। অরুণের সঙ্গেও মঞ্জুলার দেখা হয়। তাহার তেমনই সহজ শান্ত নির্ব্বিকার ভাব; কেমন যেন একটু সতন্ত্রতা—এ যেন সেই আগের মঞ্জুলা নয়। অরুণ দুর্জ্জেয় রহস্যের মতই তাহাকে মনে করিত। হাস্য-কৌতুকময়ী, তীক্ষ্ণধী এই রূপসী মেয়েটীর অন্তরের বাণী দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থের মতই তাহার কাছে জটিল হইয়া রহিল। একদিন তাহাকে মঞ্জুলা প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, এ সত্য। তাহার চিত্তে সে মমতা আজও আছে কিংবা তাহার দুর্ব্যবহারে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে এইটুকুই সে জানিতে চাহে। কিন্তু তাহার অপরাধী মন সে সত্য কোনমতেই আবিষ্কার করিতে পারিত না।

সেদিন অপরাহ্নে শ্রান্তদেহে বাড়ী ফিরিতেই অরুণের হাতে শিবচরণ একখানা চিঠি দিয়া জানাইল যে, দ্বিপ্রহরে এই পত্রখানা তাঁহার জন্য রাখিয়া গৃহস্থিত সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি-সহ মেমসাহেব কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এক ফিরিঙ্গি সাহেব তাঁহার সঙ্গে আছেন। এ সংবাদে অরুণ বড় বিস্মিত হইল না; এই রকম একটা কিছু সেও আশা করিয়াছিল। অবহেলাভরে চিঠিখানা খুলিল। রেণী লিখিয়াছে—তাহার সঙ্গে এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একত্র বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বুঝিয়া সে নিজের পথ দেখিয়া লইয়াছে। শীঘ্রই কোর্টের সাহায্যে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইয়া সে নিষ্কৃতি পাইতে চাহে।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অরুণ চিঠিখানা পকেটে ফেলিল। দুচ্ছেদ্য কঠিন বন্ধন-পাশ হইতে কোনমতে মুক্তি পাইলে গভীর তৃপ্তি যেমন সারা চিত্ত উদ্বেল করিয়া তুলে, আজ তেমনই একটা আনন্দের প্লাবন অরুণের দেহ-মনে পুলকের উচ্ছ্বাস বহাইয়া দিয়া গেল। বহুদিন পর আজ হর্ষ-উদ্বেল-কণ্ঠে সেই ছোটবেলাকার মত আদর-আবদার-ভরা-কণ্ঠে সে ডাকিল—শিবে, শিবু দা', শিবচরণ, শিবুমণি আমার জন্যে এক কাপ চা আনতো ভাই!

শিবচরণ অবাক্ হইয়া গেল! মেম-সাহেবের তিরোধানে অরুণ যে কি করিবে, কত কষ্ট পাইবে ভাবিয়াই সে অন্তরে অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিল। রেণীর বিদায়-আনন্দটাও অরুণের কথা ভাবিয়া সে ভালরূপ উপভোগ করিতে পারে নাই। এই সময় তাহার এমন পুলক-দীপ্ত মনোভাব তাহাকে যথেষ্টই বিস্মিত করিল। অরুণের মুখের এ আহ্বান কত, কতদিন সে শুনে নাই! তাড়াতাড়ি চা লইয়া বৃদ্ধ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণ বলিল—আজ রেহাই পেয়েছি শিবু দা'! আপদ বিদায় হয়েছে। এতদিন পরে আমি নিশ্চিন্ত, মুক্ত!

শিবু একবার তাহার দিকে চাহিল, তারপর ব্যগ্রভাবে বলিল—সত্যি বলছ দাদাবাবু! তোমার কোন কষ্ট হয় নি তার জন্যে?

—কষ্ট! আগুনের বেড়াজাল থেকে কেউ যদি মুক্তি পায়, তার কি কষ্ট হয় শিবু দা'? আনন্দ, আজ বহুকাল পরে আনন্দ পাচ্ছি!

—তবে একাজ কর্লে কেন দাদা? মঞ্জু দিদি আমার সোণার দিদিমণি, তার কি সর্ব্বনাশ কর্লে তুমি ভাই!

পরিপূর্ণ আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে আকস্মিক দুঃসংবাদের মত মঞ্জুলার নামটা অরুণকে যেন চাবুক মারিল। হতাশাভরা কণ্ঠে সে কহিল—বলো না শিবু দা', ও কথা আর বলো না! আমার মহাপাপের শাস্তি জন্ম জন্ম ধরে আমি ভোগ কর্ব। তার দুষ্কৃতি নেই, তাই আমার সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িত হয় নি। আমি তার নাম করবারও যোগ্য নই। এ ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে শিবু দা'!

শরাহত বিহঙ্গের মত তার ব্যথাক্লিষ্ট মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শিবু কক্ষ ত্যাগ করিল।

কয়দিন পর একদিন অরুণ শিবুকে জিজ্ঞাসা করিল—শিবু দা', মঞ্জু আর আসে না কেন, জানো?

কয়দিন হইতে মঞ্জুলার শরীর ভাল নহে; কিন্তু তাহাই তাহার না আসার কারণ নহে, শিবু তাহা ভাল জানিত। তবুও কথাটা সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। রেণী ছিল, তাই মঞ্জুলা অবাধে এখানে যাওয়া-আসা করিত। এখন নারীশূন্য ঘরে এক অনাত্মীয় যুবকের নিকট কেন সে আসিবে? তবু বৃদ্ধ সে কথাটা বলিল না; শুধু বলিল—দিদিমণির শরীর ভাল নেই।

—শরীর খারাপ? মঞ্জুর? কি হয়েছে?

অরুণ ব্যস্তভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কয় পা অগ্রসর হইয়াই দাঁড়াইয়া পড়িল।

শিবু বলিল—দিদিমণির জ্বর হয়েছে। তাঁকে দেখ্তে যাচ্ছ, বেশতো, দেখে এস না খোকাবাবু।

অরুণের মন হইতে যেন সমস্ত দ্বিধা অপসারিত হইয়া গেল। 'দেখেই আসি তবে' বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মঞ্জুলার বাড়ী যখন উপস্থিত হইল, সে তখন উপরের বারান্দায় বসিয়া কি যেন করিতেছিল। অরুণ ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। অন্যমনা মঞ্জুলা তাহার আগমন একেবারে জানিতে পারে নাই। অরুণ কয় মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অতীত দিনের পুরাতন স্মৃতিগুলা তাহার চিত্তে জাগিয়া মনের মধ্যে প্রবল ঝড় বহিতে সুরু করিয়া দিল। কয় বৎসর পূর্ব্বে এইখানে এমনই নির্জ্জনতার মধ্যে সে মঞ্জুলার কাছে আসিয়া বসিত। কোন কুণ্ঠা, কোন সঙ্কোচ মনে জাগিত না। তখন মঞ্জুলা ও তাহার মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর এমনভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই। আজ সে স্বহস্তে সেই প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছে।

সেদিন জীবনে মঞ্জুলাই ছিল তাহার ধ্যান-ধারণা, একমাত্র কাম্য। তাহার স্মৃতি সম্বল করিয়াই সে সুদূর প্রবাস-যাত্রা করিয়াছিল। সেখানেও মঞ্জুলাই ছিল তাহার সমস্ত ক্ষণের চিন্তা। তারপর কেমন করিয়া, কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে প্রতিবেশিনী রেণী তাহার তুষার-শুভ্র সৌন্দর্য্য-বিভায়, নিপুণ হাবভাবে তাহার মনে মোহ বিস্তার করিয়া পুরুভুজের মত শত পাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আজও তাহা সে ভাল বুঝিতে পারে না। মোহ আর প্রেম দুইটা এক জিনিষ নহে—স্বর্গ্য মর্ত্ত প্রভেদ উভয়ের মধ্যে; তাই এ মোহের বন্ধন স্থায়ী হইল অতি অল্পদিন। বিদেশে মঞ্জুলার অপূর্ব্ব-শ্রী-মণ্ডিত, স্নেহ-করুণায় মনোরম, প্রতিভায় দীপ্ত মুখখানা তাহার চোখে পড়ে নাই বলিয়াই তাহার এ দুর্গতি। মঞ্জুলাকে সত্যই সে ভালবাসিয়াছিল। সেই চিরপ্রিয় মুখ, চোখের উপর ফুটিয়া উঠিতেই রবিকরস্পর্শে অন্তর্হিত কুহেলীমালার মত রেণীর মোহ কোথায় যে মিলাইয়া গেল, সে তাহার কোন সন্ধানই আর পাইল না। রেণী যে এত সহজে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে সেজন্য সে আজ তাহার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। তবু যাহা সে করিয়াছে, যে ভুল ঘটিয়াছে, তাহাতো সংশোধনের আর উপায় নাই। জীবনব্যাপী অনুতাপ-

অশ্রু বিসর্জ্জনেও কৃতকার্য্যের প্রতীকারতো হইবে না। বৃথা চেষ্টা!

পাঁচ

স্পন্দিতকণ্ঠে অরুণ ডাকিল—মঞ্জুল!

অত্যন্ত চমকিয়া মঞ্জুলা চাহিল। কয় মুহূর্ত্ত কথা বলিতে পারিল না। তারপর অত্যন্ত কঠোরস্বরে প্রশ্ন করিল—তুমি এখানে যে?

অরুণের মুখে উত্তর আসিল না। মঞ্জুলা আরও উচ্চ-কণ্ঠে কহিল—স্বাভাবিক ভদ্রতা জ্ঞানটুকুও কি তুমি হারিয়েছ? বিনা খবরে একজন অনাত্মীয়া কুমারীর বাড়ীর মধ্যে তুমি এস কোন্ বিবেচনায়? এটা অন্যায়, তাও কি জান না?

অতিকষ্টে শুষ্ককণ্ঠে ভাষা আনিয়া অরুণ বলিল—জানি বই কি মঞ্জুলা, এতটা অভদ্র এখনও হই নি। কিন্তু শিব-চরণের মুখে তোমার অসুখের কথা শুনে হঠাৎ কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। এ আমার স্বেচ্ছাকৃত অন্যায় নয়। এজন্যে তুমি আমায় মাপ কর। তা' ছাড়া—

—তা' ছাড়া কি?

—না, কিছু নয়। মঞ্জু, ক'টা কথা আমার বলবার ছিল।

—আমাকে? না আমাকে তোমার কিছু বলবার নেই। অনর্থক আমায় বিরক্ত করো না। যাও তুমি। আর কখনও এভাবে আমার কাছে এস না।

অরুণ কিছুক্ষণ নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। অন্য কোথাও গিয়ে থাকাই আমার ভাল। বাড়ী-খানা বিক্রী করে ফেলতে চাই। তুমি নেবে? যা' দাম দেবে, তা'তেই রাজী।

মঞ্জুলা স্থিরনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া কি ভাবিল, তারপর সহজস্বরে বলিল—বাড়ী বেচতে চাও? বেশ, আমি নিতে পারি। কিন্তু কোথায় যাবে, তাই শুনি?

—যেখানে হোক্, এখানে থাকব না আর।

—বেশ, মামাবাবুকে বলো, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। বাড়ীর ন্যায্য দাম যা' হয়, তা' তুমি পাবে। কবে যেতে চাও?

—যত শীগ্‌গির হয়। তুমি ব্যবস্থা করে দিলেই আমি চলে যাবো।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। অরুণ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—শুনলুম, তোমার শরীর ভাল নেই; কেমন আছ এখন?

—জানি না। আমি কেমন আছি, এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।

—ও, তা' বটে, তা বটে!—বলিতে বলিতে অপ্রতিভ-ভাবে অরুণ স্থান ত্যাগ করিল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায় মঞ্জুলা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সহসা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া সকলের দৃষ্টির অন্তরালে বালিকার মত অঝোরে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল।

সাত-আটদিন পর একদিন সকালে শিবচরণ আসিয়া বলিল—দিদিমণি, খোকাবাবু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কি ভাবিয়া মঞ্জুলা বলিল—আসতে বলো।

একটু পরই অরুণ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ম্লান বিশৃঙ্খল আকৃতি। যেন মূর্ত্ত বিষণ্ণতা। মঞ্জুলার বুকের মধ্যে অজ্ঞাতেই একটা হাহাকার জাগিয়া উঠিল। জোর করিয়াই সে তাহার এই মনোভাব দমন করিতে লাগিল। অরুণ ক্ষণেক তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল—আমি আজই যাচ্ছি মঞ্জু, তাই তোমার টাকাগুলো দিতে এলুম।

মঞ্জুলা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল। কম্পিতস্বরে বলিল—আজ যাচ্ছ? আজই! কই, আমিতো কিছু জানি না।

—তোমায় আর কে বলবে? তা' ছাড়া, আমারতো কিছু ঠিক ছিল না; বাড়ী বিক্রীর দরুণ টাকাটা কাল পেয়েছি। অনর্থক দেরী করে কি হবে?

মঞ্জুলা কথা বলিল না। তাহার চিত্ত জুড়িয়া কি প্রচণ্ড সংঘাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার সন্ধান রাখিলেন শুধু

অন্তর্যামীই! প্রবল ভূকম্পনেও ভূধরের অটল গাম্ভীর্য্য যেমন অবিচলই থাকে, মঞ্জুলারও বাহিরে তেমনই এতটুকু রূপান্তর ঘটিল না। স্থিরভাবে প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবে ঠিক করেছ কিছু ?

—হ্যাঁ, আপাততঃ ভবানীপুরে একটা ছোট বাড়ী ঠিক করেছি।

—শিবু দা' সঙ্গে আছেতো ?

—হ্যাঁ, ও হতভাগাকে কিছুতে পারলুম না। হাজার-খানেক টাকা দিয়ে বল্লুম—এই নিয়ে তুই দেশে যা'। তা' সে মহাকান্না আরম্ভ করলে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। মহা-ঝঞ্ঝাট! ও গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। যাক্! এই নাও মঞ্জু, তোমার টাকা। আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমার সংসার-খরচ সব তুমিই শিবুর মারফৎ আমায় দিয়েছ। কত টাকা যে তার হিসেব আমি করতে পারব না। এই পাঁচ হাজার টাকা রইল; এতেই শোধ করে নিও। আর অন্য যা' যা' জিনিস দিয়েছিলে, সব বাড়ীতেই রেখে গেলুম; দেখে-শুনে নিও। চল্লুম তা' হ'লে।

অরুণ অগ্রসর হইতেছিল, মঞ্জুলা বাধা দিল—একটু দাঁড়াও অরুণ দা'।

অরুণ ফিরিল। মঞ্জুলা জিজ্ঞাসা করিল—হাতে তোমার যে টাকা রইল, কি করবে এসব? ব্যাঙ্কে রাখবে ?

মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল—না, অনেক ঝঞ্ঝাট সে। কে রাখে, কে তোলে, ও এমনই রইল।

অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া মঞ্জুলা কহিল—তুমি এখন থেকে কোর্টে বেরুবেতো ?

—কোর্টে? না মঞ্জু, ওদিকে আর নয়। কিছু করব না। এইভাবে জীবনটা কোনমতে কাটিয়ে দেবো। নিজের জীবন নিজে নষ্ট করেছি, এইভাবেই এর শেষ হোক্।

—কিন্তু তাই কি উচিত? মানুষের কাজ—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই অকারণে উচ্চহাস্য করিয়া অরুণ বলিয়া উঠিল—বেশ বলেছ মঞ্জু, মানুষের কাজ! কিন্তু আমি কি মানুষ? মানুষের মত কোন্ ব্যবহারটা আমায় কর্ত্তে দেখলে যে, বলছ। জীবন ব্যর্থ হয়েছে; দায়ী এর জন্যে আমি নিজেই। এর প্রতীকার আর হয় না, হয় না! এ যাক্, এইভাবেই যাক্!

মঞ্জুলা কথা বলিল না। নিষ্পলক নেত্রে কয় মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অরুণ বলিল—মঞ্জু, যাই তা' হ'লে।

—এস!

অরুণ বাহির হইয়া গেল। মঞ্জুলা সরিয়া জানালার সম্মুখে আসিয়া শূন্য নয়নে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরই শিবু আসিয়া ডাকিল—দিদিমণি।

মঞ্জুলা চাহিল।

অশ্রু-কম্পিত-কণ্ঠে শিবু বলিল—চলে যাচ্ছি দিদিমণি। কি যে হবে, আর দাদাবাবু কি যে করে, সে ভগবানই জানেন। আমার কপালে কত দুঃখই যে আছে!

বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল। অতিকষ্টে চোখের জল লুকাইয়া মঞ্জুলা বলিল—শিবু দা', একটা কথা আমার রাখবে ?

—কি বলবে বলো দিদি।

শিবু মঞ্জুলার দিকে চাহিল।

মঞ্জুলা বলিল—তোমরা যেখানে যাচ্ছ, সেখান থেকে তোমাদের খবর রোজ আমায় বলে যাবে? ভুলবে না একদিনও?

—না দিদি, ভুলব না। রোজ তোমায় বলে যাব।

—আর এক কথা। তোমার বাবু যাই বলুক, তুমি কখনও তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে না। কথা দাও আমায়।

ধরাগলায় বৃদ্ধ বলিল—দিদি, খোকা যে আমার প্রাণ! এক বছরের ছেলে রেখে মা-ঠাকরুণ স্বর্গে গেলেন! আমার বুকেই যে ও মানুষ হয়েছে! ওকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব বলোতো!

শিবু ঘন ঘন চোখের জল মুছিতে লাগিল। তারপর কহিল—দিদি, খোকা আমার এবার যে কি সর্ব্বনাশ কর্বে তাই আমি কেবলই ভাবছি। তুমি দিদি যদি ওর ওপর

রাগ না করে ওর ভার নিতে, তা' হ'লে হয়তো ওর জীবনটা নষ্ট হ'ত না।

গভীর ব্যগ্রতায় শিবু মঞ্জুলার দিকে চাহিল।

অন্যদিকে চাহিয়া মঞ্জুলা বলিল—তা' হ'লে তুমি এখন এস শিবু দা'।

—হ্যাঁ দিদি—বলিয়া শিবু অপ্রসন্নমুখে সে স্থান ত্যাগ করিল।

ছয়

গভীর রাত্রি। বারটা বাজিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণা-চতুর্থী-তিথি ম্লান চন্দ্রালোকে আলোকিত। উচ্চ শীর্ষ সৌধচূড়ে জ্যোৎস্নাধারা লুটাইয়া পড়িয়াছিল। দূর হইতে দেখিতে স্বপ্নপুরীর মত। গৃহ বাতায়নে দাঁড়াইয়া অন্যমনে মঞ্জুলা সেইদিকেই চাহিয়াছিল। মনটা তাহার ভাল নাই। ছয়মাস হইল অরুণ গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। শিবুর নিকট হইতে সে নিত্যই তাহার সংবাদ পায়; কিন্তু সে সংবাদ তাহাকে সুখী করিতে পারে না। শিবু কাঁদিয়া-কাটিয়া নিত্যই বলিয়া যায়—প্রভু তাহার কেমন যেন হইয়া যাইতেছে! আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবারাত্র পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও তিন-চারিদিন রাত্রে বাড়ীই ফিরে না। কিছু বলিলে তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। এভাবে কতদিন তাহার দেহ থাকিবে?

আজও মধ্যাহ্নে শিবু আসিয়াছিল। চারিদিন হইতে অরুণ বাড়ী আসে নাই। সারাসহর খুঁজিয়া বৃদ্ধ তাহার সন্ধান পায় নাই। কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুশ্চিন্তায় সেও পাগলের মত হইয়াছে।

তাহার বিদায়-সময়ের কথা কয়টা মঞ্জুলার কাণে বাজিতেছিল।—রাগ অভিমান ভুলে এখনও খোকাবাবুকে দেখো দিদিমণি, হয়তো বাঁচাতে পাবে। নয়তো সারা-জীবন ধরে চোখের জল ফেললেও আর উপায় হবে না। খোকাকে যদি রক্ষে কর্ত্তে কেউ পারেতো, সে তুমি। তুমি ওর দিকে চাও।

মঞ্জুলা তখন সে কথায় কাণ না দিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিলেও কথাগুলা অলক্ষ্যে কিভাবে যে তাহার অন্তরে আসিয়া আসন লইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই। রহিয়া রহিয়া কেবলই বৃদ্ধের সেই সকাতর উক্তি মনে জাগিতেছিল। সত্য কি তাই? ইহার পর চিরদিন অশ্রু জলে ভাসিয়া নিষ্ফল অনুতাপের দহনে কি তাহাকে দগ্ধ হইতে হইবে? কিন্তু কেন? অরুণ তাহার কে? তাহার অন্তরভরা আশা যে নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহার সব সুখ-সৌভাগ্যের মূলে যে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাকে সর্ব্বরূপে নিঃস্ব, রিক্ত করিয়াছে, তাহার জন্য তাহার দুঃখ-চিন্তার কি আছে?

ভুল। অরুণ ভুল করিয়াছে। তাই বলিয়া সে কি একান্তই ক্ষমার অযোগ্য? মঞ্জুলার বুকের মধ্যটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আবার মনে হইল —না, ক্ষমা নাই! ভুল হোক্, আর জানিয়া-বুঝিয়া জ্ঞানতঃ অপরাধই হোক্, অরুণ যা' করিয়াছে তাহার মার্জ্জনা নাই! অতি দুর্ব্বল মন তাহার, তাই অরুণের জন্য এখনও ভাবিয়া মরে! কেন, কে সে? যা' হয় হোক্ তাহার। তাহাতে তাহার কি? বৃথা কেন সে অরুণের জন্য ব্যস্ত হয়? তাহার কি আর বিশ্বে কোন কাজ নাই? তবুও অবাধ্য অন্তর কোন মতেই প্রবোধই মানিল না। দুই বিন্দু অশ্রু কপোল বাহিয়া বুকের উপর ঝরিয়া পড়িল।

অকস্মাৎ রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া কে ডাকিল—দিদিমণি!

—কে?

ব্যস্তভাবে মঞ্জুলা দ্বার খুলিতেই শিবু ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

—শিবু দা' কি হয়েছে, এত রাত্রে যে?

অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার সারাদেহ কাঁপিয়া উঠিল।

—দিদিমণি, দাদাবাবু খানিক আগে বাড়ী এসেছেন। জ্বরে অচেতন। ডাক্তার এসেছিল। বল্লে—অবস্থা ভাল নয়।

পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানা ধরিয়া মঞ্জুলা কোনরূপে নিজেকে স্থির রাখিল।

আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া শিবু বলিল—আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা সব তুমি, খোকাকে একা ফেলে তাই এলুম। কি হবে দিদি! কি করব আমি!

আপনাকে সংযত করিয়া লইতে একটু সময় লাগিল। তারপর মঞ্জুলা বলিল—গাড়ী এনেছ শিবু দা'?

—গাড়ী? গাড়ী কি হবে দিদিমণি?

—আমি যাব। তা' চলো, হেঁটেই যাই। বেশী দূরতো নয়।

—তুমি যাবে দিদি, তুমি যাবে!

এত দুঃখের মধ্যেও বৃদ্ধ কতকটা শান্তি পাইল।

সহজভাবে মঞ্জুলা বলিল—যাব বই কি! এত অসুখ তাঁর, আমি যাব না! চলো।

চটিটা পায়ে দিয়া একখানা শাল গায়ে জড়াইয়া সে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

* * *

কয়দিন পর লুপ্তসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে অরুণের দৃষ্টি পড়িল মঞ্জুলার উপর। ব্যাকুল, বিহ্বলভাবে সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মঞ্জুলা মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ এখন?

সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করিয়া অরুণ সবেগে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।—মঞ্জু, মঞ্জু, তুমি এখানে! তুমি এখানে!

বাহুবেষ্টনে ধরিয়া মঞ্জুলা তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিল—উঠো না, বেশী কথা বলো না, ডাক্তারের বারণ।

—কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে, বলো আমায়?

—আসব আর কি করে, এলুম বাড়ী থেকে।

—কিন্তু কেন?

—তোমার অসুখের খবর পেয়ে।

—অসুখের খবর পেয়ে। আমার অসুখ, তা' তোমার কি?

মঞ্জুলার মুখখানা ঈষৎ আরক্ত দেখাইল। সে কথার সে উত্তর দিল না।

অরুণ ক্ষণেক স্তব্ধভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—জ্বরের ঘোরে বোধ হ'ত যেন তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে তবে স্বপ্ন নয়, সত্যি! ক'দিন এখানে আছ মঞ্জু?

—চারদিন। নাও, এটা খেয়ে ফেলো।

বেদানার রস লইয়া সে অরুণের সম্মুখে ধরিল

সেটা সরাইয়া দিয়া অরুণ বলিল—ও থাক্। বলো, কেন এখানে এসেছ তুমি? আমার অসুখ তা'তে তোমার কি?

মঞ্জুলা এবারও উত্তর দিল না। শুধু বলিল—এটা খেয়ে নাও।

শিবু আসিয়া কহিল—দিদিমণি, জিনিষ-পত্র সব চলে গেছে। বাকী খালি এই বিছানাটা। হাত বাড়াইয়া অরুণের শয্যাটা সে দেখাইল।

মঞ্জুলা বলিল—এ বাড়ীর ভাড়া দেওয়া হয়েছে?

—হাঁ, সে সব মামাবাবু দিয়েছেন। মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনই যাবেতো তুমি?

—হ্যাঁ, এখনই যাব। তোমরা জিনিষ-পত্র নিয়ে যাও ততক্ষণ।

শিবু চলিয়া গেলে, অরুণের দিকে চাহিয়া মঞ্জুলা বলিল—তুমি উঠতে পারবে কি? না হয় আমার গায়ে ভর রেখে উঠে দাঁড়াও।

—তোমার গায়ে ভর রেখে!

—হ্যাঁ। চলো, আর দেরী করো না।

—কোথায় যাব?

—বাড়ীতে।

—বাড়ীতে! কার বাড়ীতে?

—তোমার বাড়ীতে, আবার কার!

—আমার বাড়ীতো নেই মঞ্জু। সেতো তোমার বাড়ী।

—তা' হোক্, তুমি চলো।

—না মঞ্জু, আমি যেতে পারব না। ভুল করেছি, অপরাধ করেছি, জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ব। তুমি যাও।

উত্তেজিতভাবে কথা কয়টা বলিয়া ক্লান্তভাবে অরুণ চোখ বুজিল।

মঞ্জুলা স্তব্ধভাবে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ছিন্নলতার মত অরুণের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল—আর কত শাস্তি আমায় দিতে চাও! এর কি শেষ নেই?

অরুণ চমকিয়া চাহিল। কষ্টে উঠিয়া বসিয়া মঞ্জুলার বিপর্য্যস্ত কেশগুচ্ছ যথাস্থানে সরাইয়া দিতে দিতে গাঢ়কণ্ঠে সে ডাকিল—মঞ্জু! মঞ্জু!

—আমায় ক্ষমা কর! বড় বেশী অভিমান করেছিলুম। কষ্ট তোমায় দিয়েছি, কিন্তু নিজে পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী! আমায় ক্ষমা কর!

—আজ আর সে অভিমান নেই?

সজলকণ্ঠে মঞ্জুলা কহিল—কিছুমাত্র না! বড় দুর্ব্বল করে ভগবান আমাদের গড়েছেন! রাগ অভিমান যতই হোক্, শরতের মেঘের মত তা' ক্ষণস্থায়ী!

—ভগবানের সৃষ্টির চরম বিকাশ তোমরা মঞ্জু! তোমরা আছ বলেই জগৎ আজও এত মধুর! কিন্তু আমায় তুমি ক্ষমা কর্ত্তে পারবেতো?

স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে মঞ্জুলা কহিল—কেন আর ও কথা বলছ। ভুল সকলেরই হয়—তোমায় এতদূরে সরিয়ে দিয়ে দোষ আমিও কম করি নি। যা' হয় না, হবে না, জোর করে সেটা কর্ত্তে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই! কিন্তু কথা থাক্, এখন বাড়ী চলো।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

রসরঙ্গ

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

—"আমার বাবা আর একটী বউ ঘরে এনেছেন, কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌বার জন্যে।"

—"এঁ্যা, তোমার বাবার দুটো বিয়ে!"

—"না না, আমার সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে।"

* * *

সার্জ্জেন্ট—"ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে তুমি মোটর চালিয়েছিলে কেন?"

—ড্রাইভার একটু হেসে বললে, "আমার মোটরের ব্রেক্‌গুলো ঠিক্ কাজ কর্‌ছিল না, তাই যাতে রাস্তায় 'এ্যাক্সিডেণ্ট্' না হয়, তাই তাড়াতাড়ি 'গেরেজে'র দিকে যাচ্ছিলাম।"

* * *

থানায় একজন ভিখারীকে ধরে' নিয়ে আসা হ'ল।

ইন্‌স্‌পেক্টর—"তুমি কেন রাস্তায় পয়সা পয়সা করে' লোকজনকে বিরক্ত কর্‌ছিলে?"

ভিখারী—"আজ্ঞে, মাপ কর্‌বেন হুজুর, আমার কোনো দোষ নেই। আমি বৃষ্টি পড়ছে কি না দেখ্‌বার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিলাম, আর ভদ্রলোকেরা আমার হাতের ওপর পয়সা দিয়ে যাচ্ছিল।"

* * *

মাষ্টার-মশায় মৌখিক অঙ্কের ক্লাশ নিচ্ছিলেন। "দেড় পয়সা করে' দুটো ডিম, আধ পয়সার মরিচ, আধ পয়সার লঙ্কা, আধ পয়সার নুণ, দু'পয়সার ঘি, সবশুদ্ধ—"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পেছনের বেঞ্চ্ থেকে একজন মেধাবী ছাত্র চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—"মাম্‌লেট্ স্যার।"

* * *

রামবাবু বড় অন্যমনস্ক। তিনি একদিন 'সেলুনে' দাড়ি কামাতে গিয়েছিলেন। কামান শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু রামবাবু উঠ্‌ছেন না দেখে নাপিত বল্‌লে, "আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?"

—"না, ঘুমোই নি ত। আমি চশমা খুল্‌লে দেখ্‌তে পাই না—আরসীতে আমাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলাম, আমি বাড়ী চলে' গেছি।"

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

সনাতনের দুর্গাপূজা

শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত, বি-এস্-সি, এম্-বি

বোধন

ভোরবেলা। তখন সবেমাত্র কাক ডাকতে সুরু করেছে। সনাতন মণ্ডল নবীন ভট্‌চায্যির বাড়ী গিয়ে দোর ঠেলাঠেলি করছে, "ভট্‌চায্যি-মশায়, ও ভট্‌চায্যি-মশায়!"

বাড়ীর ভেতর থেকে নবীন ভট্‌চায্যি সাড়া দিলেন, "কে?"

সদ্য-জাগরিত নবীন চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, "সনাতন।—এত ভোরে?"

সনাতন একটু হেসেই বল্‌লে, "এত সকালে ঘুম ভাঙিয়েছি, দোষ নিও না ঠাকুর। তোমার কাছে একটা বিধেন নিতে এলাম। চাষা মাকে ঘরে আন্‌তে পারে কি?"

নবীন গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, "কোন্ মাকে?"

উত্তর আসিল, "মা গো, মা, দুগ্‌গা-ঠাকুরুণ।"

"ও—তা' কোন্ চাষা মাকে আন্‌ছে যে, এত ভোরে তার বিধেন নিতে এসেছিস্?"

"ইচ্ছে কর্‌লে পারে ত? মা চাষার ঘরে আস্‌বেন?"

"কে ইচ্ছে কর্‌ছে শুনি?"

"এই ধরো না—আমিই।"

নবীন ভট্‌চাযের চোখে তখনও ঘুমের আমেজ লেগে ছিল। ঢুলুঢুলু চোখ দু'টি হঠাৎ বড় করে তিনি বল্‌লেন, "তুই আন্‌বি!"

"সেই রকম ত মনে কর্‌ছি। মা আমার ঘরে আস্‌বেন?"—বলে এমন করুণ-দৃষ্টিতে সনাতন নবীনের মুখের দিকে তাকালে, মনে হ'ল সনাতনের বাড়ী যাবার জন্যে মা বিশ্বেশ্বরী যেন নবীনের ইঙ্গিতের ভরসাতেই আছেন।

নবীন সনাতনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "হঠাৎ তোর এ খেয়াল হ'ল কেন?"

সনাতন দৃঢ় সঙ্কল্পের স্বরে বল্‌লে, "এ খেয়াল নয় ঠাকুর, এ মোর পণ!"

নবীন ব্যঙ্গের সুরে বল্‌লেন, "পণ! কবে আবার এ পণ কর্‌লি?"

একটু ভেবে সনাতন বল্‌লে, "এই বছর দশেক আগে—কেমন, দশ বছর হবে না ঠাকুর?"

"আ মর! আমি জান্‌ব কেমন করে কবে তুই এমন পণ করে বসে আছিস।"

"এই ধরো না—প্রথম পরাণ, তারপর খেঁদী, তারপর কুশী, তারপর ক্ষেন্তী, তারপর সেই যমজ দুটো—যে দুটো বুকে শেল হেনে চলে গেল! তারপর আমার সীতেনাথ। সীতেনাথের বয়স দশ বছর হবে না?

একটু হেসে নবীন ভট্‌চায বল্‌লেন, "তোর সীতে-নাথের বয়স দশ বছর কি বল্!"

একটু অপ্রতিভ হয়ে সনাতন বল্‌লে, "তা' তোমরাই জানো ঠাকুর। তোমরাই ওদের দেখ্‌ছ, তোমাদের আশীর্ব্বাদেই ওরা বেঁচে আছে, তোমাদের সাম্‌নেই ত ওরা বড় হচ্ছে।"

নবীন ভট্‌চায বল্‌লেন, "সীতানাথের বয়স পনের-ষোল হবে।"

ঘাড় নেড়ে সনাতন জানালে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে।"

সীতানাথের বয়স নির্ণয়ের এই অবান্তর কথাটা বুঝ্‌তে না পেরে নবীন বল্‌লেন, "তা'তে কি হ'ল?"

সনাতন বল্‌লে, "যে বছর সীতেনাথ হ'ল সেই বছর দত্তবাড়ী খুব ধুমধাম করে পূজো। কোলকাতা থেকে গোরার বাজনা এসেছিল। মা এসেছেন—মায়ের রূপে

সারা গাঁ-টা আলো হয়ে গেছে। মাকে গড় করতে গেলাম। গড় করে মাকে জানালাম, 'মা, আমার এই পঞ্চাশ বিঘে জমি যদি পাঁচ শ' বিঘে করে দাও ত, তোমাকে ঘরে নিয়ে আস্‌ব।"

নবীন বল্‌লেন, "তারপর?"

সনাতন বল্‌লে, "তারপর গেল সনে বরেনবাবুর দরুণ একশো একুশ বিঘে লাখরাজ জমিটা কিনেছি। মার কৃপায় এইবার একুনে আমার পাঁচ শ' বিঘের ওপর জমি হয়ে গেছে। মাকে এইবার আন্‌তেই হবে। নইলে মার কোপে পড়ে যাব। মার কাছে পিরতিজ্ঞে, তুমিই বলো না সোজা কথা কি? ঠাকুর মাকে আমি আন্‌তে পার্‌ব? চাষার ঘরে মা আসেন—তা'তে কোন বাধা নেই?"

নবীন বল্‌লেন, "না নেই।"

সনাতন এতক্ষণ উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে নবীনের দিকে তাকিয়েছিল। তাঁর মাত্র দু'টি কথায় প্রশান্ত হয়ে বল্‌লে, "এই নাও হাজার একটাকা তোমার ঠাঁয়ে রেখে গেলাম। তুমি বামুন-পণ্ডিত মানুষ পূজো-আচ্ছার সব বোঝো—এর মধ্যে করে-কম্মে নিও।"

নবীন টাকার থলে তুলে নিলেন। তাঁর মুখে আনন্দের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়্‌ল। স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'ল, এই সান্ত্বনা লাভ করে ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে সনাতন বল্‌লে, "এতে সব হবে?"

নবীন ভট্‌চায্যি বল্‌লেন, "এ টাকাটা কি শুধু পূজো-বাবদে খরচ হবে?"

সনাতন বল্‌লে, "হ্যাঁ। লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার খরচ আলাদা করব।"

নবীন ভট্‌চায্যি বল্‌লেন, "একটা নিয়ম আছে জানিস্‌ ত, মাকে একবার আন্‌লে উপরি উপরি অন্ততঃ চারবার আন্‌তে হয়?"

"তা'তে আর কি? যদি তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদ থাকে, আর মার কিরূপা হয় ত—চার বছর কেন, সনাতন মণ্ডল যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন মাকে আন্‌বে। দাও, তোমার পায়ের ধূলো দাও।"

নবীন ভট্‌চায্যির পায়ের ধূলো নিয়ে সনাতন বিদায় হ'ল। পথে যেতে যেতে যাকে সাম্‌নে পেলে, তাকেই জানিয়ে গেল যে, এবার তার ঘরে বিশ্বমায়ের চরণ ধূলি পড়্‌ছে। সে মাকে আন্‌বে—ঠাকুর-মশায় বিধান দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে হরিহর বোস নবীন ভট্‌চায্যির কাছে এসে ব্যঙ্গ করেই বল্‌লেন, "কি হে ভট্‌চায, এবার সনাতন না কি খুব ধুম করে দুগ্‌গোচ্ছব কর্‌ছে?"

"তাই ত শুন্‌ছি।"

"শুন্‌ছ কি হে, সে তোমায় টাকা দিয়ে গেছে—তুমি হ'লে কর্ম্মকর্ত্তা।"

নবীন ভট্‌চায্যি নাকটা একটু সিঁটকে বল্‌লেন, "চাষা-টার কথা ত। এবার বামুন-কায়েতের নাম ডুব্‌ল দেখ্‌ছি।"

বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বোসজা বল্‌লেন, "কালে আরও কত কি দেখ্‌তে হবে কে জানে!"

নবীন ভট্‌চায্যি বল্‌লেন, "সবই হ'ল পয়সার খেলা। শাস্ত্রেই রয়েছে—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃসি কর্ম্মনি, দাসত্বে যদি কিঞ্চিদ্বা ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।' তা' তোমাদের হয়েছে দাসত্ব, আমাদের হয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি।"

হরিহর ভঙ্গীসহকারে বল্‌লেন—"ভিক্ষাবৃত্তি বলো না —যজমানদের মস্তকে হস্তবোলান-বৃত্তি বলো।"

নবীন বল্‌লেন, "সেদিন আর নেই হে, নেই। যজমানরা সব চালাক হয়ে গেছে।"

হরিহর নবীনের পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লেন, "যাক্‌, বাজে কথা যাক। তোমার কত থাক্‌ছে বলো।"

নবীন ভট্‌চায্যি অধর কুঞ্চিত করে বল্‌লেন, "সামান্যই। এই কলাটা-মূলোটা, মিষ্টিটা, বড় জোর এক-আধখানা কাপড়।"

হরিহর নবীনের দিকে আড়চোখে চেয়ে বল্‌লেন, "ভাঁড়াও কেন চাঁদ। চোরের কাছে দাগাবাজী। মোটা দাঁও মার্‌ছো, কেমন?"

নবীন একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন, "সবই মহামায়ার ইচ্ছা।"

সঙ্কল্প

প্রসন্ন বাঁড়ুর্য্যে ও উপেন ঠাকুর আটচালায় বসে কথাবার্ত্তা কইছেন। উপেন ঠাকুর কুণ্ডলী আকারে তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন, "শুনেছ প্রসন্ন দা', সনাতন মণ্ডল—"

প্রসন্ন তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন, "সব শুনেছি। সনাতন মণ্ডল কি হে, বল সনাতনবাবু।"

"এবার থেকে তাই ত বল্তে হবে।"

"শুধু তাই নয়। সঙ্গে আবার একটা মশায় যোগ করে দিলে ভাল হয়। এইবার দেখ্‌বে, সনাতনই এই গাঁয়ের জমিদার হবে। ওর ঘরে লক্ষ্মী গিয়ে যেন আছ্‌ড়ে পড়েছেন। চাষবাস ত আছেই। সম্প্রতি গুড়ের ব্যবসা করে সনা ফেঁপে উঠেছে।"

পাশে বিপিন গাঙ্গুলী বসেছিল—এই কথাবার্ত্তা শুন্‌ছিল। সে বলে উঠল, "গুড়ের ব্যবসা ত কারও একচেটে নয়, আপনারাও কর্‌তে পারেন।"

প্রসন্ন বললেন, "ওসব ব্যবসা চাষাদেরই পোষায়।"

বিপিন বল্লেন, "তা' হ'লে টাকা-পয়সা ওদেরই হবে।"

চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে একটু অপ্রসন্নভাবে বল্লেন, "আবার বিনয় কত! বাড়ীতে সব পায়ের ধূলো দেবেন, দেখ্‌বেন শুন্‌বেন, কাজ উদ্ধার কর্‌বেন।"

উপেন রাগান্বিতভাবে বল্লেন, "দেখো না, যেন সব মাতৃদায় পড়েছে। কার্য্য-উদ্ধার কর্‌বার জন্যে মাথা পেতে দিয়ে দাঁড়াতে হবে। আস্পর্দ্ধা দেখ—জোচ্চোর!"

উপেনের কথায় প্রতিবাদ করে বিপিন বল্লে, "জোচ্চোর?"

প্রসন্নও রুষ্টভাবে বল্লেন, "জোচ্চোর নয় ত কি? চোখের সাম্‌নে বরেন রায়ের অতবড় সম্পত্তিটা ঠকিয়ে নিলে। আজ তার জোরেই এত লপ্‌চপানি! দুগ্‌গোচ্ছব হবে, গাঁ শুদ্ধ বামুন-কায়েত খাবে, গরীব-দুঃখীদের ভূরি-ভোজন হবে।"

উপেন প্রসন্নের কথার রেশ নিয়ে বল্লেন, "আরও কত কি। বরেন রায়ের মর্‌বার ঠাঁই ছিল না, গেল কি না ছোটলোকের কাছে ধার কর্‌তে—নকুলেশ্বর দত্ত থাক্‌তে গেল কি না সনাতন মণ্ডলের দোরে।"

বিপিন বললে, "তবে যে শুনেছিলাম, নকুলেশ্বর বড় উঁচুহারে সুদ চেয়েছিল।"

প্রসন্ন যেন বিপিনের মুখে থাব্‌ড়া মেরে বল্লেন, "চেয়েছিল, চেয়েছিল, সম্পত্তিটা তবু ত কায়েতে পেত—ভদ্দরলোকে পেত। ছোঃ, ছোঃ, জাত-জীবন আর রইল না! ছোটলোক জাত মাথায় চাপ্‌তে সুরু কর্‌লে।"

উপেন আবার একরাশ তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন, "দুশোবার বলো প্রসন্ন দা', ও কথা হাজারবার বলো। এইবার কলির চারপো' হ'ল। যারা জুতোর সুকতলা ছিল, তাদের এইবার ঠাকুর-ঘরে তুল্‌তে হবে। কি অমান্যি দেখো! সনা একটা পাঁটা পুষেছে। সেটা বেশ নধর, নাদুস-নুদুস হয়েছে। বামুনের ছেলে মুখ ফুটে বল্লাম, 'সনা, চল পাঁঠাটাকে মঙ্গলচণ্ডী তলায় উচ্ছুগ্‌গু করে আনি, তোর মঙ্গল হবে।' তখন সে দা দিয়ে খেজুর গাছে দাগা দিচ্ছিল। তেরিয়া হয়ে দা হাতে নিয়ে এমনভাবে এগিয়ে এল, মনে হ'ল দা দিয়ে বুঝি আমাকেই বলি দিয়ে দেবে।"

প্রসন্ন আচার্য্য বিস্ফারিত-নেত্রে বল্লেন, এ্যাঁ! বলো কি?"

উপেন ডানহাতে মেঝে থাব্‌ড়ে বল্লেন, "আমি যদি বামুনের ছেলে হই ত ঐ পাঁঠা খাবো, খাবো, খাবো! এ জেনে নিও। হতভাগা নিজের ঘরের পাশে চোরকুটুরীতে যে পাঁঠাটাকে বেঁধে রাখে—এক-দণ্ড চোখের আড়াল করে না। নইলে এতদিন চুরি করে মেরে দিতাম। আবার সখ করে নাম রেখেছে কালো—কত আদর!"

উপেন ঠাকুর মুখ বিকৃত করলেন।

প্রসন্ন ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে বল্লেন, "এই অগ্রাহ্যি, আর ওঁর বাড়ীতে যাব আমরা ওঁর কার্য্য-উদ্ধার করে দিতে।"

বিপিন বল্লে, "কিন্তু দাদা, সিধের বহরটা খুব হবে; এত হবে যে, ঐ দত্ত-বাড়ীতে তত পাওয়া যায় না।"

প্রসন্ন দন্ত বিকাশ করে বল্‌লেন, "এঁ্যা! বলো কি বিপিন? তা' হ'লে সিধেটা নিয়েই একেবারে ধুলো পায়ে বাড়ী ফেরা—কি বল উপেন?"

উপেন খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে কাশ্‌তে কাশ্‌তে বল্‌লেন, "তা' ছাড়া, আবার কি?"

সপ্তমী

পূজো-বাড়ীতে হুলস্থুল। সনাতনের মনে মহা আনন্দ। আজ যে আনন্দময়ী তার ঘরে চণ্ডীমণ্ডপে এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্তানদের অকল্যাণ-অসুর বধ করতে দেবী দশভূজা মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন। চারিদিকে কল্যাণের ছায়া—দেবী কল্যাণময়ী। মায়ের সন্তানদের মুখে হাসি, জলে-স্থলে হাসি, আকাশে-বাতাসে হাসি, দেবীর মুখে শরতের শোভা-নেওড়ান হাসি। সারা গোলাবাড়ী, গাঁয়ে, হাসির বাস। এবার সেখানে দুইখানার জায়গায় তিনখানা পূজো। ঢাক্ বাজ্‌ছে, "ভয় নেই, আমি পিছে!" কাঁসী বাজ্‌ছে, "ভয় নেই রে, ভয় নেই!"

অষ্টমী

সনাতন কোথা থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে নবীন ভট্‌চাযিকে বল্‌লে, "ভট্‌চাযি-মশায়, তুমি না কি বলেছ?"

তার ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়্‌ছে, দেহ ঘামে ভিজে গেছে। নবীন ভট্‌চায গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, "হাঁ, বলেছি বই কি সনাতন। বলির পাঁঠা পালান; পাঁঠা যোগাড় করতে না পারলে অকল্যাণ হবে যে।"

সনাতন বল্‌লে, "কিন্তু এ যে অসম্ভব।"

নবীন বল্‌লেন, "পাঁঠা পাওয়াও যে অসম্ভব হয়েছে। কাল সকালেই নবমী পূজো। জ্ঞানকে পাঠিয়েছিলাম, সে সারা গাঁ-টা ঘুরে এল, পাঁঠা পেলে না।"

"সারা গাঁ ঘুরে এল, পাঁঠা পেলে না! দেখ্‌ছি আমি—"বলে সনাতন যেভাবে এসেছিল, সেইভাবেই চলে যাবার উপক্রম করলে।

তাকে বাধা দিয়ে নবীন বল্‌লেন, "পাঁঠা পাওয়া যাবে না কেন? ছাগবংশে কি মড়ক লেগেছে?"

"তবে?"

"যা' পাওয়া গেছে, একটাও কাজে লাগ্‌বে না।"

ধৈর্য্যহারা-কণ্ঠে সনাতন বল্‌লে, "কেন?"

"সব ক'টা দাগী।"

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে সনাতন বল্‌লে, "দাগী কি?"

"তাদের গায়ে নানা রঙের ছোপ। সে রকম পাঁঠা ত মায়ের কাছে বলি দেওয়া যায় না। একরঙা কালো পাঁঠা হলেই ভাল হয়। তাই বলছিলাম কি, তোর কালোকে মায়ের প্রসাদে দে। তার জন্ম সার্থক হোক্।"

নবীনের কথা শুনে সনাতনের চোখ ঠিক্‌রে বার হয়ে এল। সে বল্‌লে, "তুমি কি বল্‌ছ ঠাকুর? নিজে হাতে করে এতটুকু বেলা থেকে ওকে এতবড় করেছি। ও যে আমার পাঁজরার একখান হাড়।"

"কিন্তু ও ছাড়া যে উপায় নেই। আর ওতে হয়েছে কি? অনেকেই ও রকম পালন করে, আবার অনেকেই নিজের পেটে দিতে—" নবীন বলি দিবার ভঙ্গী দেখিয়ে বল্‌লেন, "বুঝ্‌লি? তুই তবু মাকে দিচ্ছিস।"

সনাতন কেঁদে ফেল্‌লে—"যারা পারে, তারা পারে, আমি পারব না।"

নবীন হতাশভাবে বল্‌লেন, "ভাল করে দেখ্। আমার আর কি, তোর নিজের কাজেই বাগ্‌ড়া পড়বে।"

দৃঢ়কণ্ঠে সনাতন বল্‌লে, "পড়ে পড়ুক।"

নবীন বল্‌লেন, বলিস কি সনাতন, নির্ব্বংশ হবি যে—"

কান্নার স্বরে সনাতন বল্‌লে, "হ'তে আর বাকী রইল কি। কালো যে আমার পরাণ, সীতেনাথের সমান।"

নবীন বল্‌লেন, "দেখ্ সনা, মায়ের সঙ্গে ছেলেখেলা নয়। আর ঐ পাঁঠাটার সঙ্গে তোর পরাণ, সীতানাথের তুলনা করে লোক হাসাস্ নি।"

সনাতনের দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়্‌ল। সে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ঠাকুর, তুমি বোধ হয় কখনও জীবজন্তু পোষ নি, তাই এ কথা বল্‌ছ। যদি পুষ্‌তে তা' হ'লে তুমিও বল্‌তে যে, তারা মানুষেরই সমান।"

তারপর সে ঘাড় গুঁজে বসে পড়ল। বছর বছর সে কি ধুম! হরে কামারের হাত উঠছে আর পড়ছে, এক-দণ্ড বিরাম নেই। তারপর সেই রক্তের ঢেউয়ের ওপর

হাড়িকাঠের গোড়ার মাটী ছিটিয়ে সে কি কাদামাটী খেলা! সেই দৃশ্য তার চোখের সামনে ভাসতে লাগ্‌ল। তার গা শিউরে উঠ্‌ল। সে দৌড়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে খিল্ দিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। শুয়ে সে যেন সেই অসহায় জীবদের করুণ চীৎকার শুনতে পেলে। তার ভারী ইচ্ছে হ'ল পাশের ঘরের দোরটা খুলে একবার কালোকে দেখে আসে। কিন্তু সে যেতে পার্‌লে না। তার দেহের সমস্ত সামর্থটুকু কে যেন চুরি করে নিয়েছে।

পরদিন ভোর হবার আগে সনাতন কালোর গলার দড়ি ধরে আস্তে আস্তে রাতের অন্ধকারে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। যাবার সময় দূর থেকে মাকে প্রণাম জানিয়ে সে বল্‌লে, "মা, কালোকে আমি নিয়ে চল্‌লাম। এতে যদি পাপ হয়, পাপের শাস্তি আমাকেই দিও। পরাণ, সীতেনাথ, খেঁদী, কুশী, ক্ষেন্তী এদের যেন কোন অকল্যাণ না হয়!"

সকাল আটটা বিশ মিনিটে সন্ধিপূজা। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে ভক্তের ভক্তিতে মৃন্ময়ীমূর্ত্তি চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন। মূর্ত্তি দোলে, মূর্ত্তির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। যে দেখ্‌তে পায়, তার জীবন সার্থক হয়; সে জীবন-মৃত্যুর গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

উপশ্রান্তে বৃষ্টি পড়্‌ছে। খোঁজ খোঁজ—সনাতন কোথায়? কেউ তার দেখা পেলে না। মিনিট কতকে সন্ধি-পূজো শেষ করতে হবে। নবীন ভট্‌চায আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, পূজো শেষ করে নিলেন। তিনি সনাতনকে উদ্দেশ করে বল্‌লেন, "সনাতনের বরাতে নেই। দেখ্‌তে পেলে না। মূর্ত্তি দুলে উঠেছিল, তবে মায়ের গাল-ভরা হাসি দেখ্‌তে পাওয়া গেল না—কেন, কে জানে!"

নবমী

নবমী পূজো শেষ হয়ে এসেছে। এইবার বলিদান। সনাতনকে খুঁজ্‌তে লোক বেরিয়েছে। ছাগ উৎসর্গ হবে। এ কি কালোও যে নেই! ব্যাপারটা বুঝ্‌তে কারও বাকী রইল না। ভট্‌চায ঘাড়টা দু'বার নেড়ে বল্‌লেন, "এখন বুঝ্‌লাম, মা কেন প্রাণভরে হাস্‌লেন না। মায়ের বলি চুরি, এর সাজা পাবে—একেবারে উচ্ছন্ন যাবে!"

পরে দেখা গেল হারাণো পাঁঠা ঘরে চর্‌ছে। তার সঙ্গে পূজোর আরও সব পাঁঠা হাড়িকাঠে পড়্‌ল। বলি শেষ হয়ে গেল, কাদামাটী শেষ হয়ে গেল, ঢাকের বাদ্যি থেমে গেল। মায়ের রসনা তৃপ্ত হ'ল।

দশমী

অনেক অনুসন্ধানের পর কান্ত কুমোর গোলাবাড়ী ইষ্টিশনে গিয়ে দেখে, সনাতন জলে ভিজে ভিজে ঘাস ছিঁড়ে আন্‌ছে। আর কালো দূরে টিনের ছাউনীর তলায় বাঁধা রয়েছে। সনাতন কান্তকে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে কালোকে জড়িয়ে ধর্‌লে। তার হাতে জলে ভেজা কচি কচি ঘাস দেখে কালো যত ডাক্‌ছে, তা'কে তত জড়িয়ে ধরে সনাতন বল্‌ছে, "ওরা রাক্ষস, তোকে খাবে। তাই বলি দেবার জন্যে তোকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। আমি ছাড়্‌ব না কালো, তোকে ছাড়্‌ব না!"

কান্ত সনাতনের কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "সনাতন দা', এদিকে আমরা সবাই তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি এই ইষ্টিশনে বসে আছ। চলো, বাড়ী চলো। ঠাকুর-মশায় গাল পাড়্‌ছেন, আর শাপমন্নি দিচ্ছেন। বাড়ীর সবাই কাঁদ্‌ছে।"

সনাতন কান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ রে কান্তে, নবমী পূজো শেষ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"পাঠাবলি?"

"হ্যাঁ।"

"কাদামাটী?"

"হ্যাঁ।"

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সনাতন বললে, "ভাব্‌ছিলাম বড়গাঁয়ে চলে যাব। তবে আর যেতে হ'ল না। চল্ কালো, বাড়ী যাই চল। আগে এইগুলো খেয়ে নে বাবা!"

ঘাসগুলো সে কালোর মুখের গোড়ায় ধর্‌লে। কচি ঘাসের ডগাগুলো পেয়ে আনন্দের অতিশয্যে নিজের ভাষায় বল্‌লে, "হুঁ হুঁ ভাল।" তার খাওয়া শেষ হ'তে তাকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে সনাতন বল্‌লে, "অতটা পথ হেঁটে যেতে পারবি কি? চল্, তোকে কোলে করে নিয়ে যাই। ওরা ও কথা বল্‌বে না কেন ওরা ত জানে না আমি তোকে কত ভালবাসি।"

শেষে জগদম্বাকে উদ্দেশ করে সনাতন আকুল-কণ্ঠে জানালে, "মা আমিও তোর জীব, কালোও তোর জীব। তাই কালোকে তোর মুখে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। রাগ করিস নে। মহামায়া এতে কি তোর পূজো হ'ল না?"

কিছু দূরে দত্তবাড়ী থেকে বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠল,

ঢাক বাজ্‌ল, "হলরে হ'ল।"
কাঁসী বাজ্‌ল, "হ'ল হ'ল।"

শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত

মরুমায়া

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

সে আজ একযুগ আগেকার কথা।......

নিরবধিকাল অবিরাম ব'য়ে চলেছে, অপ্রতিহত গতিতে। পশ্চাতে চেয়ে দেখি, জীবন-নাট্যের কত দৃশ্য, কত ঘটনা, স্নেহে মধুর, ভক্তিতে মহান্, বিষণ্ণতায় ম্লান, কালক্রমে হ'য়ে এসেছে আবছা, হারিয়েছে তা'দের উজ্জ্বলতা। সেদিন যা' ছিল অনাগত অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ, আজ তাই বিগত বিস্মৃতপ্রায় অতীতের কোঠায় চলে গেছে।

বাবা যখন মারা গেলেন, তখন আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি। তিনি না ছিলেন উপার্জ্জনশীল, না ছিলেন মিত-ব্যয়ী। এ অবস্থায় যা' অবশ্যম্ভাবী, তাই ঘটলো। মৃত্যুর পর রাখবার মধ্যে তিনি রেখে গেলেন মোটা রকম দেনার গুরুভার। সুতরাং কলেজে পড়ার বিলাসিতা আমাকে তখনই বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হ'ল। জ্ঞানার্জ্জনের আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, ধনার্জ্জনের সুগম পন্থা আবিষ্কারে ব্যাপৃত হ'লাম। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল ব্যবহারিক জগতে এখন পর্য্যন্ত এমন কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় নি, যাতে করে কলেজ জীবন ত্যাগ করার সঙ্গে-সঙ্গেই সাফল্যের আলোকপাতে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।......আশা ছিল উচ্চ, আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রচুর, কিন্তু দিবসের রূঢ় আলোকের স্পর্শে, সব স্বপ্ন গেছে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে। কল্পনার প্রস্ফুট কুসুম বাস্তবের কঠিন আঘাতে হয়েছে ধূলি-আলম্বিত।

ড্যালহৌসী স্কোয়ারটাকে,—সাতপাক নয়,—সহস্র পাক দেওয়ার পর ভাগ্যলক্ষ্মীর ভ্রূকুটি-কুটীল মুখে অতি মৃদু প্রচ্ছন্ন হাস্যের বিশীর্ণরেখা ফুটে উঠ্‌লো। পঁচিশ নয়, তিরিশ নয়, একেবারে মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাহিনার এক কেরাণীগিরি গেল জুটে। হোক তুচ্ছ কেরাণীগিরি, তবু আনন্দে, উল্লাসে, ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম;—যেন কোন নিঃসন্তানা নারী সহস্র প্রার্থনা, দেবস্থানে অজস্র মানসিক করার পর অবশেষে পুত্রের জননী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। বহু প্রার্থিত সুসংবাদ শুনে মা'র ব্যাধিক্লিষ্ট ছায়াচ্ছন্ন মুখও মধুর হাসির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। অপরূপ সে হাসি!—শ্রাবণ নিশীথের ঘনান্ধকার আকাশে মেঘান্তরালমুক্ত চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতির সঙ্গেই তার তুলনা চলে। দুঃখের সংসারে সুদুর্লভ সে হাসি!

কিন্তু আর একটি অনাত্মীয়া নিঃসম্পর্কীয়া নারীও সেদিন আমার এই অসামান্য সাফল্যের সূচনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল,—সে 'কালোর মা।' তার বিষয়ে কোন কথার অবতরণা করা অন্যসময়ে হয়ত' অবান্তরই হ'ত, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তার কথাটাই মুখ্য এই জন্য যে, সেই আজ এই গল্পের কেন্দ্রগত।

সে যখন প্রথম আমাদের বাড়ী কাজ করতে আসে,—সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা। বাবা তখন বেঁচে আছেন; আমাদের বাগবাজারের বাড়ী দেনার দায়ে তখনও পরহস্তগত হয় নি। আমি তখন নিতান্ত বালক হ'লেও সে কথা আমার মনে আছে। মা'র ছিল হাঁপানীর ব্যায়রাম, বেশী পরিশ্রম তার সহ্য হ'ত না। তাই সে অর্থকৃচ্ছ্র তার দিনেও আমাদের সংসারে ঝি ছিল অপরিহার্য্য। সমস্ত কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে দেওয়ার পর মা তাকে জিগ্যেস করলেন—"তোমায় কি বলে ডাকব বাছা?"

সে এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে অথচ ধীরে ধীরে উত্তর দিলে,—"আমাকে কালোর মা বলেই ডেকো মা আপনি।"

নিজস্ব নাম তা'র একটা অবশ্যই ছিল, এবং সম্ভবতঃ সেই নামের সঙ্গে জড়িত ছিল, তার পূর্ব্বের ঘৃণিত জীবনের কলুষিত ইতিহাস। কারণ এ শ্রেণীর নারীদের

শতকরা নিরেনব্বই জনের তাই থাকে, কে না জানে সে কথা। নাম বলতে তা'র এই মুহূর্ত্তকালের সঙ্কোচের ও আত্মপরিচয় গোপনের প্রচেষ্টার মূলে সেদিন বোধ করি ছিল এই লজ্জা। রমণীত্ব ভুলে গৌরবময় মাতৃত্বের পরিচয়ে সে চেয়েছিল পরিচিত ও বিজ্ঞাপিত হ'তে। তখন এত কথা তলিয়ে বোঝবার বয়স হয় নি, কিন্তু এখন বুঝতে পারি, সে যে পঙ্কিল পরিবেশে, যে জঘন্য অশুচিতার মধ্যে তা'র জীবনের অমূল্য দিনগুলি অপব্যয় করেছে, তাকে সে স্মৃতির খাতা থেকে সাধ্যমত নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতেই চেয়েছিল।

মা যখন তাকে বললেন,—কাজের কথাত' সব শুনলে কালোর মা, এখন কি হ'লে তুমি...

কালোর মা তাঁর কথা আর শেষ হ'তে দেয় নি; মধ্য-পথেই বাধা দিয়ে বলেছিল,—"সে যা' হয় দিও গো মা ঠাকরুণ...গতর খাটিয়ে সংসারে যা' হবে খাব পরব, আর মাসকাবারে দু'-চারট্যাকা দেশে..." বলে সে একটু অর্থহীন হেসেছিল।

তার ছেলে কালোর কথা জিগ্যেস করতেই উচ্ছ্বসিত শোকে সে ভেঙে পড়লো; তার চোখ দু'টী প্রথমে উজ্জ্বল ও পরে অশ্রুসিক্ত হতেই সে আঁচল চাপা দিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—সে কথা আর শুধিয়ো নি মা; কালো আজ আমার বেঁচে থাকলে, তা' এই দাদাবাবুর পারাই হ'ত বোধ হয়।......আর সে ছেলে কি গো মা! বললে না পেত্যয় যাবে, এই এত্তোখানি মোট্টাসোট্টা... তা' এ পোড়া বরাতে সইবে কেন?...শাস্তোরে নিকেচে, 'তোর বরাতে নেইক ঘি, ঠক্ঠকালে হবে কি?'...

এইভাবে সে তার মৃত পুত্রের স্মৃতি অবলম্বন করে' কথার পিঠে কথা সাজিয়ে, ফাঁপিয়ে সেদিন তার শোকের দীর্ঘ কাহিনী শেষ করেছিল।

পরে অবশ্য এ কথা আমরা তা'র কাছ থেকে জেনেছি, যে কালোর জন্য তার এই শোকোচ্ছ্বাসের অতিশয্য, জন্ম-গ্রহণের পর এক বৎসরের মধ্যেই তা'র আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সেই গতাসু মানবকের জন্য তা'র এই অতিশোচনা মুখ্যতঃ করুণ-রসাত্মক হ'লেও, ভেবে দেখলে এর মধ্যে হাস্যরসের সংমিশ্রণও আছে...কিন্তু থাক্ সে কথা।—

আজ শুধু ভাবি, জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে কত রত্নই হারাই আমরা! কিন্তু যে ভাগ্যবানের ওপর আছে ভগবানের আশীর্ব্বাদ, সে রত্ন কুড়িয়েও পায় পথে; আমি পেয়েছিলাম এই কালোর মাকে।

বাবার লোকান্তর প্রাপ্তির পর আমাদের প্রতিটি দিন যে কি কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটেছে, সে কথা উহ্যই থাক্। কারণ, স্বজনহীন দুস্থের সংসারে সংগ্রামই সাধারণ নিয়ম, ব্যতিক্রম নয়; বৈচিত্র্য এতে বিন্দুমাত্রও নেই। ক্ষুধাতুর তিনটি নিঃসহায় প্রাণী আমরা দিনের পর দিন ব্যাকুল অন্তরে ব্যথিত দৃষ্টি দিয়ে শুধু পারস্পরিক কষ্টের পরিমাপ করে' অন্তরালে অশ্রুর ত্রিধারা সৃজন করেছি। কিন্তু একমাত্র এই কালোর মাই সে বিপদের দিনে শুধু নীরব সহানুভূতি দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় নি; সে তার সাধ্যমত অনর্গল সরব উপদেশবাক্যে আমাকে উৎসাহিতও করেছে, হতাশায় কাতর, ম্রিয়মান হ'তে দেয় নি। একদিকে সে আমাকে দিয়েছে অভয়, আর একদিকে সে মাকে দিয়েছে সান্ত্বনা। সে যা' কিছু সবই করেছে অন্তরের প্রেরণায়, এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি; তার বুকের ভাষা ও মুখের উচ্চারণে গরমিল নেই কোথাও। কতদিন তা'কে তা'র প্রাপ্য বেতন দিতে পারি নি, শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে তার লজ্জা রক্ষা করা হ'য়ে উঠেছে সুকঠিন, কিন্তু কখনও তার মুখে ঘুণাক্ষরেও কোন অভিযোগ শুনি নি। আমি হয়ত' কখনও বলেছি,—"তুমি এখন দিনকতক দেশেই যাও না কালোর মা; তুমি কেন আর মিছিমিছি আমাদের সঙ্গে..."

অসমাপ্ত বাক্য সে আর সমাপ্ত হ'তে দেয় নি,—"কি যে বলো দাদাবাবু, তোমাদের এখানে থুয়ে, ছাশে গিয়েও কি আর নিচ্ছিন্দি থাক্‌বো মনে করতেছো...ও কথা আর বোলো নি দাদাবাবু, সুখে দুখে তোমাদেরও দিন যেমন কাটতেছে, আমারও তেম্‌নিতরই কাটবে গো।"

সুতরাং সমর্থনের অভাবে আমার প্রস্তাবের ওইখানেই হয়েছে পরিসমাপ্তি।

এমন যে কালোর মা, আমার ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে, সাফল্যের সূচনায়, তার মুখে যে হাসির ফিনিক্ ফুটবে, এর মধ্যে আর যাই থাক্, অভিনবত্ব নেই কিছুই।

যাই হোক্, অবশেষে আমার ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত হ'ল। দীর্ঘ রজনীর হ'ল অবসান; আলোকের বিপুল সম্ভাবনায় প্রভাতের ধূসর আকাশ তখন অসহ্ পুলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

নষ্টপ্রায় প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম যে কত অল্পকালের মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তা' ভেবে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হই।...বাড়ী-ওয়ালা ভদ্রলোককে ধৈর্য্যচ্যুত হবার অবসর দিলাম না; মুদির মেজাজ সপ্তমে আরোহণ করার পূর্ব্বেই গেল নেমে। কী অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে চারিদিক 'ম্যানেজ' করলাম! শান্ত করলাম ক্ষিপ্তপ্রায় অধৈর্য্য উত্তমর্ণের দলকে। ক্ষণিকের ছন্দপতনে কারও মনে রেখাপাতই করল না। জীবনের যে মিছিল থেকে ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম, সকলের অলক্ষে, অবিলম্বেই আবার তা'তে গেছি মিশে।

বেশী নয়, বৎসর ঘোরার পূর্ব্বেই দেনার অঙ্ক হ'ল শূন্য; তারপর সুরু হ'ল ধীরে ধীরে সঞ্চয়। অর্থাৎ যে তরীখানি চড়ায় লেগে হয়েছিল রুদ্ধগতি, তা'কে কোন-প্রকারে জলে ভাসান গেল, এবং অসাধারণ দক্ষতার সহিত স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করতেও বেশী দেরী হ'ল না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে বসে' একখানা বাঙলা মাসিকের পাতা ওল্টাচ্ছি, মা এসে ধীরে ধীরে কাছে বসলেন। বইয়ের পাতার ওপর থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাঁ'র দিকে চাইলাম।

—"আজ বুঝি আর কোথাও বেরোস্ নি নরু? শরীর-গতিক ভাল আছেত' বাবা?...তা' হ'লেই হ'ল; তা' বেশ করেছ। আর চব্বিশ ঘণ্টাইত' বাবা বাইরে বাইরে থাকিস্।...ক'দিন ধরে' একটা কথা বলব বলব করছি..."

—"কি কথা মা?"

—"তাই বলতেইত' এলাম বাবা।"

একটু থেমে মা বললেন,—"বলছিলাম কি, দেখতে দেখতে বয়সত' আমার হ'ল; তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তা'র ওপর এই ঝাঁঝরা-ধরা বুকে আর ক'দিন? আর থাকতেও চাই না।...এখন তোকে সংসারী দেখে যেতে পারলেই..."

মা'র বাক্যস্রোত কোন্ পথে চলেছে বুঝতে আর দেরী হ'ল না। তার ওপর কালোর মাও যে দ্বারান্তরালে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটাও অনুভবে বোঝা যাচ্ছে। মানে, ইতিপূর্ব্বে দু'জনে রীতিমত এসব বিষয়ে পরামর্শ হ'য়ে গেছে।

—"সোমেশবাবুর স্ত্রী ক'দিন থেকে আমায় বড় ধরেছেন; তোকে তাঁদের বড় পছন্দ। এদিকে কুষ্ঠিও মিলে গেছে বড় চমৎকার!...আর চন্দ্রাকেত' তুই দেখেওছিস...খাসা মেয়েটি, তোর পাশে তাকে..."

কালোর মার আর নেপথ্যে থাকা চলল না। চন্দ্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠল,—"সে কথাত' আমিও বলতেছি গো; ও বাড়ীর দিদিমণির সাথে দাদা-বাবুর হরগৌরীর পারা..."

সেদিন অনেক কষ্টে কোনমতে দু'জনকে নিরস্ত করা গেল।

বরাবরই লক্ষ্য করেছি, চন্দ্রার ওপর মা'র একটা অহৈতুক আকর্ষণ ছিল, আর সেও মা'র কাছে প্রায়ই আসতো আমার অনুপস্থিতিতে। ইতঃপূর্ব্বে কতদিন হঠাৎ অসময়ে বাড়ী ফিরে তা'র সেই বিচ্ছিন্ন আবির্ভাব ও ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সুযোগে আমি তা'কে একাধিকবার টুক্‌রো টুক্‌রো করে' দেখে নিয়েছি, একথা মিথ্যা নয়। অসামান্যা সুন্দরী না হ'লেও দেহ তা'র সত্যই সুগঠিত; লাবণ্যের সুসমঞ্জস বিস্তারে, সে দেহ লাভ করেছে দুর্লভ কমনীয়তা। আভিজাত্যের তেজে সে দীপ্যমান নয়; প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে ও উপচীয়মান যৌবনের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যে সে যেন ভাদ্রের ভরা নদীর মত টল্‌টল্ করছে। তা'র শরীরকে দেহযষ্টি বললে

যেমন নিছক নিন্দা করা হয়, দেহবল্লরী বললেও খুব প্রশংসা করা হয় না। সাজসজ্জায়, প্রসাধনে অতি আধুনিকতার 'ভ্যানিটি' তা'র নেই, কিন্তু রুচি তার মার্জ্জিত পরিচ্ছন্ন। রুজ্, লিপ্‌ষ্টিক্, প্রভৃতি অঙ্গরাগ উপকরণের ব্যবহার সে সম্ভবতঃ জানেই না; অথচ, সাধারণ সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় নিতান্ত অনভিজ্ঞাও নয় সে। বিজলীর অতি উগ্র চমকের পরিবর্ত্তে তা'র রূপে আছে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা।

জানি না, আমার অবচেতনার তলদেশে হয়ত' প্রচ্ছন্ন ছিল গোপনলালিত ভীরু ভঙ্গুর একটুখানি স্বপ্ন, চন্দ্রাকে নিয়ে নিরিবিলি একটি নীড় বাঁধবার। ঐ সুতনু, কমনীয় কান্তি, অনতিকুণ্ঠিতা মেয়েটিকে জীবন-পথের সঙ্গিনী করে' নেওয়ার মধুর কল্পনায় সমস্ত মন যেন অননুভূতপূর্ব্ব এক মধুর নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।···মত দিলাম।

কিন্তু গতানুগতিক মধ্যবিত্ত সংসারে চন্দ্রা যে শুধু বাহুল্য বা বিলাস নয়, সে যে নিতান্ত অপরিহার্য্য সামগ্রী, সে কথা বুঝলাম সেদিন, যখন দেখলাম দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, একাগ্রচিত্তে, বিনিদ্র নয়নে সে কাটিয়ে দিলে মা'র রোগশয্যার পার্শ্বে। যদি শুধু ঐকান্তিক সেবা ও অনলস পরিচর্য্যার দ্বারা মৃত্যুপথযাত্রিনীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হ'ত, তা' হ'লে সেবার মা'কে হারাতে হ'ত না নিশ্চয়। কিন্তু একথাও মুক্তকণ্ঠে বলি, কালোর মা'র মত অমন আন্তরিক সেবাপরায়না নারীকে সহকারিনী পেয়েছিল বলেই, চন্দ্রার পক্ষে ঐ কাজ অত সহজ সুসাধ্য হ'য়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়েও মা সেদিন একান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন, এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য-নারীর চরিত্র মাধুর্য্যে ও ঐকান্তিকতায়। আমার আর চন্দ্রার মাথায় হাত রেখে অনেক কথার পর সস্নেহে বলেছিলেন, —ভুলো না তোমরা যে, এই কালোর মা শুধু ঝি নয়, এ সংসারে এতকাল অনেক মেঘ-রোদ্দুরের মধ্যে থেকে, এক-সঙ্গে অনেক দুঃখসুখ ভোগ করে' আমাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় ঘনিষ্ঠ; ওর উপযুক্ত মর্য্যাদা যেন ও পায়, অনর্থক অনাদর যেন ওর না হয় সেদিকে তোমাদের দৃষ্টি থাকে, এই আমার শেষ অনুরোধ আর উপদেশ, মনে রেখো তোমরা।"

মা'র মৃত্যুর পর কত বৎসর কেটে গেছে।··চন্দ্রা ছিল তখন চপলা, প্রগলভা, কৌতুকময়ী ষোড়শী; সে চন্দ্রা এখন আর নাই। তা'র হয়েছে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, অভিনব রূপান্তর। প্রথম যৌবনের তার সেই চঞ্চলতা গেছে হারিয়ে; বিরামলাভ করেছে নবলব্ধ গভীরতায়। একাধিক সন্তানের জননী এখন সে নিজেই। তা'র অনতিস্থূল নাতিকৃশ তনু অঙ্গটি পরিব্যাপ্ত করে' একটী স্নিগ্ধ-শ্রী লীলায়িত হয়ে উঠেছে। স্তিমিত-স্রোত হ্রদের উপর হয়েছে আসন্ন অপরাহ্নের ছায়াপাত; উত্তরঙ্গ নদী ইদানী হয়েছে নিস্তরঙ্গ। কিন্তু এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও মুমূর্ষু মায়ের সেই শেষ উপদেশ বাণী চন্দ্রা ভোলে নি,—আমিও না।

অতি বৃদ্ধা কালোর মা'র মেজাজ হয়েছে ইদানী বড় রুক্ষ, খিট্‌খিটে। বুঝি, এই রুক্ষতার উৎস-মূল কোথায়। সে যে সংসারের সামান্য দাসী মাত্র নয়, তা'র স্থান যে এ সংসারে অনেক উচ্চে, এই আত্মাভিমানই হচ্ছে এর মূলে। সময়ে সময়ে তা'র রসনার অসংযত পরিচালনে মাঝে মাঝে গৃহে কলহের কলরবও শ্রুতিগোচর হ'তে আরম্ভ হয়েছে। এই বাক্‌যুদ্ধে তা'র প্রতিপক্ষ হয় কখনও আটবছরের নীলা ওরফে নীলিমা, কখনও তা'র ছ'বছরের ভাই সুনীল; আর এই যুদ্ধে প্রাচীন-কালের চারণের কাজ কতকটা করে তা'দের জননী; অর্থাৎ, সে সুযোগমত উভয় পক্ষকেই করে উত্তেজিত ও উৎসাহিত।

—"হেই, দেখো না বৌদি'মণি, সেদিনকার পুঁটেতেলি ছেলেত' বটেক? বলে কি, তুমিত' পিসী মা'র চাইতে ছোট।...আমি কি আজকার নোক গা? তোদের মায়ের বিয়া দিনু, আঁতুড় তুলনু······

হাসির ক্ষীণ ধারাটিকে প্রচ্ছন্ন রেখে চন্দ্রা বলে, —"ওরা কি জানবে সে সব, কালোর মা..."

আনন্দে গদগদ হ'য়ে কালোর মা বলে,—"বলোত' বৌদি'মণি, বলোত'; তুমি ভাল লোকের মেয়ে, তুমি বলবে বই কি..."

চন্দ্রা রহস্য করে' বলে,—"ও মা, সে কি কথা গো কালোর মা; আমি ভাল লোকের মেয়ে, আর ওরা বুঝি..."

আমি অন্তরালে থেকে চন্দ্রার এই কৌতুক উপভোগ করি।

না থাক্ রক্তের সম্বন্ধ, তবু আমি নিছক দাসী বলে' কালোর মাকে সত্যই ভাবতে পারি না। সংসারের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ সে। আমার শুভচিন্তা করায় কখনও তা'র ঔদাস্য বা অবহেলা দেখি নি; তা'র মঙ্গল সাধনে আমিও যে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য, এই একান্ত সরল সত্যটুকু আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি।

অনটনের বালুবেলায় নিশ্চল সংসার-রথকে গতিদান করার চেষ্টায় যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে একদিন, আজ জীবনের এই প্রশান্ত গোধূলিতে তা'র প্রাপ্য একটু স্নিগ্ধ ছায়া, একটু নিশ্চিন্ত আরাম।

সেদিন কালোর মা দেশে যাবার আগে কিছু অর্থ ধার চাইলে। বৎসরে একাধিকবার দেশে যাওয়া তা'র চাই-ই। চন্দ্রা জিগ্যেস করেছিল,—"কেবল কেবল দেশে গিয়ে এত দান-খয়রাত যে করে' এস,—কিছু মনে করো না,—কিন্তু কে এত আপনার লোক আছে সেখানে গা তোমার কালোর মা? যত সব সুসময়ের বন্ধু।...মণিঅর্ডারেত' মাসে মাসে সর্ব্বস্ব পাঠিয়ে দিচ্ছ, তা'তেও তা'দের হয় না?"

এ কথা শুনে কালোর মা গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী স্থাপন করে', বিস্ময়-জ্ঞাপক এক বিচিত্র ভঙ্গী করে' জানিয়েছিল, দেশে না কি তা'দের বেরহৎ সংসার; সে লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করে বটে, কিন্তু নেহাৎ হাঘরে ঘরের মেয়ে সে নয়। তার ভাজ, ভেয়ের মেয়ে সুন্দুরী, পরী, ভাইপো রতন, সব তা'র তরে অজ্ঞান। সুন্দরী যে তা'র কি রকম 'ন্যাওটো', আতর পিসীর পোড়াকপালী বিধবা মেয়েটা যে তা'কে কত ভালবাসে, এ সব কথা বলতে বলতে কালোর মা'র স্থানকালের জ্ঞান থাকত না। জানি না, দেশে তা'র কি রকম অভ্যর্থনা হ'ত, কিন্তু মাইনের একটি পয়সাও কখনও তা'কে কাছে রাখতে দেখি নি; প্রাপ্তিমাত্রই মণিঅর্ডারযোগে রতনের নামে পাঠিয়ে দিত। তবু প্রায়ই আসত রতনের জরুরী তাগিদ, আজ হাল কিনতে হবে, কাল বলদ চাই, খাজনার বাবদ টাকা না পাঠালে...ইত্যাদি। পত্রখানি হাতে নিয়ে সে কুণ্ঠিতভাবে হাজির হ'ত আমারই কাছে। তা'কে যাবতীয় দায় থেকে উদ্ধার আমাকেই করতে হবে।

একদিন শুধু আমি তা'কে বলেছিলাম,—"তুমি যে কালোর মা তা'দের জন্যে এত কর, তা'রা কি তোমার অসময়ে..."

সে বাধা দিয়ে একগাল হেসে বলেছিল,—"শোনো কথা দাদবাবুর; রতন, সুন্দুরী এরা হ'ল কি না আমার সোদর ভেয়ের ছেলেমেয়ে, দাদাবাবু,—সত্তাতো ভেয়ের ত নয়। তুমি জান নি তাই, এরা আমার পেটের ছেলের বাড়া। এরা আমার বিপদ-আপদে করবে নি ত', করবে কে গো দাদাবাবু?"

ভাবলাম, সত্যইত' এই জরাক্রান্তা, একান্ত নির্ভরশীলা নারীর সরল বিশ্বাসের মূলে আঘাত করার স্পর্দ্ধা আমার হ'ল কি করে'?

—"রতনত' তাই বলতেছিল সেবার, দিনকতক দেশ-ভূঁয়ে এসে বিচ্ছেরাম করো না কেনে পিসী..."

আমি বললাম,—"তাই কেন যাও না কালোর মা; যদ্দিন তোমার ইচ্ছে, সেখানে গিয়েই না হয় থাকো; আমি মাসে মাসে তোমায় মাইনেটা পাঠিয়ে দেব 'খন।"

যাবার আগে সে ছেলেমেয়েদের রাশীকৃত জামাকাপড় কিনে নিয়ে এল। প্রত্যেক জামাটা নিয়ে সে বসল ব্যাখ্যা করতে,—"দেখত' দাদাবাবু, এই ফেরকটা সুন্দুরীকে কেমন মানাবে? ...পরীর সেবার কী কান্না দাদাবাবু! বলে,— আমি আঙা জামা পরবো; তাই এই আঙা ফেরকুটা নিনু, নগদ চোদ্দগণ্ডা পয়সা দিয়ে।...তুমি দাদাবাবু হাসতেছ, কিন্তু এই আমি বলে' দিনু, এ ফেরক্ দেখে সে খুসীতে নেত্য করবে, হ্যাঁ।"

আমি শুধু মুগ্ধনেত্রে চেয়ে দেখলাম, কথা বলতে বলতে

সেই বৃদ্ধা নারীর অজস্র বলিরেখাঙ্কিত কুঞ্চিত শ্রীহীন মুখখানিও যেন এক দিব্য বিভায় অপরূপ হ'য়ে উঠল।

সে চলে' যাবার পর প্রতি মাসের প্রথমেই তা'র নামে মণিঅর্ডার পাঠিয়েছি বরাবর, অন্যথা হয় নি কখনও। অর্থাভাবে যেন সে কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে ছিলাম আমি বিশেষ সচেতন। মধ্যে চিঠিও একখানি পেয়েছিলাম, কালোর মা'র বকলমে রতনের লেখা;—বহু কুশল জিজ্ঞাসার পর জানিয়েছে নিজের শারীরিক সুস্থতার কথা। পরে আরও লিখেছে, ঘর মেরামতির জন্য আগাম কিছু টাকা যেন অনুগ্রহ করে' পত্রপাঠ মণিঅর্ডারযোগে পাঠান হয়…ইত্যাদি। নানাকারণে টাকাটা সংগ্রহ করতে সেবার কিছু বিলম্ব ঘটেছিল।

আগামী কাল টাকাটা যেমন করে' হোক্ পাঠাতেই হবে ভাবতে ভাবতে সেদিন মাঘ মাসের নিদারুণ শীতে আপাদমস্তক র‍্যাপারে আবৃত করে' কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরছি। রাত কিছু বেশী হওয়ায় সহরের রাস্তাও জন-বিরল ও কতকটা নিঝুম হয়ে এসেছে। শুধু স্থানে স্থানে পথের ধারে দু'-চারটা শীতার্ত্ত নিরাশ্রয়, নিঃসহায় ভিখারী শতছিন্ন স্বল্প বস্ত্রখণ্ডে নিজ নিজ শীর্ণ কঙ্কালসার দেহের ওপর রাশীভূত করবার বৃথা চেষ্টা করছে। যা'র সে কাপড়ের টুক্‌রোটুকুও জোটে নি, পুরোনো খবরের কাগজ হয়েছে তা'র অঙ্গাবরণ। শীতের নিষ্ঠুর তুহিন স্পর্শ থেকে নিজের দেহকে রক্ষা করার এই মৌলিক প্রণালী আবিষ্কারের সমস্ত গৌরব এদেরই ; এবং কেউ কেউ হয়ত' এই সংবাদ-পত্রের তলাতেই দেহরক্ষা করবে, যদিও সে সংবাদ সভ্যজগতে কোথাও মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচারিত হবে না।…কী কুৎসিত বীভৎস জীবন এই সমাজ পরিত্যক্ত নিঃস্ব জীবদের !…পথ চলতে চলতে ভাবলাম, হ্যাঁ, সমাজ পরিত্যক্তই এরা ; এদের এই কদর্য্য সান্নিধ্য থেকে সমাজ করে সযত্নে আত্ম-সংরক্ষণ, রক্ষা করে নিরাপদ দূরত্ব। এই আত্মসর্ব্বস্ব আধুনিক জগতে কে করে সময়ের অপব্যবহার ও হৃদয়াবেগের বৃথা অর্থহীন অপচয়, এই কপর্দ্দকশূন্য বিশ্রী ভিখারীগুলোর চিন্তায় মাথা ঘামিয়ে ; বিশেষ, তা'রা যখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েই চলেছে মরণের শান্তিময় ক্রোড়ের দিকে।…

দার্শনিকতায় গিয়েছিলাম ডুবে, ক্ষণিকের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। কখন যে উন্মাদ হয়ে আমাদের বদ্ধ কাণা গলিটায় ঢুকেছি, সে জ্ঞান ছিল না। সহসা কতকগুলো কুকুরের কর্কশ চীৎকারে, দার্শনিক চিন্তার স্রোত গেল রুদ্ধ হ'য়ে, ভাবপ্রবণতা-মুক্ত নিশ্চিন্ত চেতনা ফিরে এল। বহুদূরের গ্যাসের আলো শীতকালের কুয়াসার পর্দ্দা ভেদ করে' আমাদের সাতচল্লিশ নম্বর বাসার কাছে যেটুকু ক্ষীণজ্যোতি বিস্তার করছিল, তাইতে দেখলাম, রাস্তার ধারে আমাদের রোয়াকে কে একজন শীতে সমস্ত দেহটাকে সাধ্যমত সঙ্কুচিত করে' শুয়ে শুয়ে অস্ফুট কাতরধ্বনি করছে।

—"কে ?"

নিরুত্তর।

বার দুই-তিন জিগেস করার পর অনেক কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বললে,—"আমি তোমাদের কালোর মা দাদাবাবু…"

—"কালোর মা ?…তুমি এখানে কেন ? কখন এলে ? কি হয়েছে তোমার ? ..”

উত্তরের অপেক্ষা না করে' কপালে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাসার দরজা ছিল বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর সদ্য-সুপ্তোত্থিত চন্দ্রা শীতে কাঁপতে কাঁপতে এসে দরজা খুলে দিলে। বললাম,—"শীগ্‌গির তোমার হ্যারিকেনটা একটু ধরো এদিকে।"

দু'জনে ধরাধরি করে' ঘরের মধ্যে নিয়ে তাকে শয্যায় শোয়ালাম। চন্দ্রা কোমর বেঁধে লেগে গেল তার সেবায় ; যেমন একাগ্রচিত্তে একদিন সে এই বৃদ্ধারই সঙ্গে মা'র পরিচর্য্যা করেছিল।

চন্দ্রার সযত্ন পরিচর্য্যায় কালোর মা সেইদিনই মধ্যরাত্রে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই চোখ চাইলে বটে, কিন্তু পূর্ণ নিরাময়

হ'তে ও শারীরিক বললাভ করতে কেটে গেল আরও ক'দিন। আমাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তার চোখ দু'টি ছল্‌ছল্ করে' উঠলো। শত নিষেধ সত্বেও সে ধীরে ধীরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সেদিন তার কাহিনী সুরু করলে। যা' বললে তা' সংক্ষেপে এই যে, দেশে গিয়ে অবধি কেউ তা'কে একটা আধলা পর্য্যন্ত দিয়ে সাহায্য করে নি, উপরন্তু সংসারের যাবতীয় কাজ করিয়ে নিয়েছে। প্রায় এক হপ্তা একাজ্বরী হ'য়ে পড়ে থাকায়ও একঘটি জল দিয়ে কেউ উবগার করে নি; তাকে একলাটি দাওয়ার ওপর ফেলে রেখে দিয়েছিল। তার পয়সা-কড়ি, কাপড়-চোপড় সব ছিনিয়ে নিয়েছে, আর অনেক নোংরা কথা বলে' গাল পেড়েছে। তাই সে বিগেরের রুগী শেষকালে কোনরকমে ভাড়ার পয়সা যোগাড় করে' জ্বরগায়েই মরতে মরতে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে। এখানে ডাকাডাকি করে' চিল্লিয়েও কারও সাড়া না পেয়ে অগত্যে রোয়াকের ওপর ভিরমি লেগে পড়েছিল; তারপর আর কিছু তা'র শরণ নেই।— এই পর্য্যন্ত বলে' সে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদতে লাগল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে,—"গাছতলায় পড়ে' পেরাণ দেবো দাদা-বাবু, তবু আর সে আবাগীদের কাছে ফিরে যাব নি কিন্তু, তুমি দেখে নিও; আমিও রামধন মোড়লের বেটি, দাদা-বাবু।...সারা জীবনটা তোদের তরে গতর জল করণ, আর এই কি তোদের ধম্ম হ'ল র‍্যা শতেকখোয়ারীরা? এত অংখার তোদের রইবে নি, রইবে নি, রইবে নি, এই আমি বলে' দিনু।"

তা'র কাহিনী শেষ হ'লে চন্দ্রার দিকে চেয়ে দেখলাম, যে মুখখানি অগাধ খুসীর প্রাচুর্য্যে প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণালোকেরই মত সর্ব্বদা ঝিক্‌মিক্ করত, তা'র ওপর হয়েছে অসীম বেদনার ছায়া বিস্তার। তা'র বসবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত যেন হতাশায় ও ক্লান্তিতে শিথিল, অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। নিষ্প্রভ দুই চোখে তার উদাস, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। মানুষের স্বার্থপরতার সীমা নির্ণয়ের চেষ্টায় সে হ'য়ে গেছে যেন শিলীভূত প্রস্তর মূর্ত্তি।

চন্দ্রা ও কালোর মা উভয়কেই সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললাম,—"বেশত' কালোর মা, তোমার সেখানে যাবার দরকারই বা কি? তুমি এখানেই না হয় থাকলে।"

সে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে,—"তা' বই কি দাদাবাবু, তোমরা কি আর আমার পর গা? সেই শত্তুরদের সাথেই না হয় আমার সব সমন্দ ঘুচেছে।"

থাক্‌ল সে, আমাদেরই কাছে থেকে গেল। নীলা, সুনীল অনেকদিন পরে তাদের পিসীকে পেয়ে আনন্দে গেল মত্ত হয়ে। বললে,—"এবার আর পিসী তোমায় ছাড়ব না;—খালি খালি কেন তুমি চলে যাও?"

কালোর মা সস্নেহে তাদের কোলে টেনে নিলে। আদর করে' বললে,—"আর কোথাও যাব নি বাবা, তোমাদের ছেড়ে।"

চন্দ্রা নানা গল্প-গুজবে তা'কে ভুলিয়ে রাখতে চায়; ভুলেও কখনও সে উত্থাপন করে না তা'র দেশের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা, যদি তার বেদনার স্থানে আবার অতর্কিতে আঘাত লেগে শোণিতক্ষরণ হয় এই ভয়ে।

চন্দ্রার মুখে আবার ফিরে এসেছে প্রসন্নতার সেই স্নিগ্ধ সুষমা,—লুপ্ত হয়েছে সেদিনকার সেই শিলাসুলভ ম্লান রুক্ষতা। বিষণ্ণতার ছায়া অন্তর্হিত হয়েছে। শীত সন্ধ্যার ম্লানিমার সঙ্গে এখন আর তার মুখভাবের তুলনা চলে না; চলে, শরতের প্রভাত-শ্রীর সঙ্গে।

কিন্তু ক'দিনই বা? পূর্ণ দু'টি মাসও কাটলো না। সেদিন সকালে উঠেই দেখি যাত্রার আয়োজন সুরু হয়েছে। জিগেস করলাম,—"কি ব্যাপার গো কালোর মা?"

বিশেষ কোন দীর্ঘ ভণিতা না করেই সে বললে,— "বেশ ছিনু তোমাদের গো সাথে দাদাবাবু, কিন্তু আজ একবার সেই শত্রুদের কাছে যেতে হবে। কাল আত্তিরে একটা বড় বদ স্বপন দেখে বুকখানা এখন পেয্যন্ত টিপিস্ টিপিস্ করতেছে।...দ্যাখলাম, সুন্দুরী যেন কঠিন ব্যামোয় বিছানায় পড়ে আতারি কাতারি করতেছে, আর ক্যাবল ক্যাবল বলতেছে,—পিসী, তুমি একটুখানি কাছে বসো না ক্যানে।"

একটু থেমে একগাল হেসে বললে,—"আহা, তা' বলবে বই কি দাদাবাবু! পিসী বই সে কি কিছু জানে গা?...বলতে বলতে তা'র সেই হাসির ওপর দিয়েই ঝর-ঝর করে' অশ্রু ঝরে' পড়ল; যেমন করে' ঝরে' পড়ে শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ বেয়ে বৃষ্টির ধারা।

সে চলে গেলে বুঝলাম, তা'র এই স্বপ্নের উদ্ভব কোন্ জটিল মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে; কোন্ অনতিক্রম্য সাংসারিক আকর্ষণ, কোন্ অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক বিধি ধীরে ধীরে সঙ্ঘটিত করেছে তা'র চিত্তের এই পরিবর্ত্তন। যে তৃষ্ণার্ত্ত আশাতুর মরুচারী মরীচিকার উদ্দেশে ছুটে চলেছে এক ফোঁটা জলের অন্ধ আশায় লালায়িত হয়ে, সহস্র সতর্কবাণী সে করবে অগ্রাহ্য; শেষ চেষ্টা সে করবেই একবিন্দু জলের জন্য। কিন্তু নিষ্ঠুর সত্যের শ্রীহীন মূর্ত্তি যখন সহসা আত্মপ্রকাশ করবে সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সম্মুখে, যখন এই স্নেহবুভুক্ষু বৃদ্ধার স্বপ্নের প্রাসাদ যাবে মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে, তখন...?

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'ল ঘরে চন্দ্রার আকস্মিক আবির্ভাবে। বিরক্তিতে মুখখানি বিকৃত করে' অসহিষ্ণু-কণ্ঠে সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,—"জানি আমি, ওদের দশাই ওই চিরকাল··· সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়...দেশের লোকের লাথি-ঝাঁটা বড় মিষ্টি লাগে।..." তারপর মোলায়েম কণ্ঠে,—"ও কি? তোমার চা যে জল হ'য়ে গেল; দাও, আবার গরম করে' আনি।"

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

ফুটেছিল একটী কমল

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

* * * শেষ পর্য্যন্ত সুনন্দার বিবাহটা কি না সেই আই-এ ফেল করা ছেলেটির সাথেই হইয়া গেল? আর অশোক?...

এমন আর কি বেশী দিনকার কথা, যেদিন বর্ষার এক ক্ষান্ত-বর্ষণ রাত্রি শেষে শরৎশশী তাঁহার জোষ্ঠপুত্র বিকাশ ও পুত্রবধূ চারুর হাতে অশোকের সকল ভার সঁপিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবেই চক্ষু মুদিয়াছিলেন। তারপর একে একে অনেকগুলি বছরই কালের বুকে মিলাইয়া গিয়াছে; আজও চারু মৃত্যুপথযাত্রীনার শেষ ইচ্ছাটুকু সমগ্র মন-প্রাণ দিয়াই পালন করিয়া আসিতেছে।

বেশী বয়স পর্য্যন্তও চারুর যখন কোন সন্তানাদি হইল না, নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল, "তাইত বৌমা, ভগবান আজও তোমার কোলে একটা দিলেন না!..." ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চারু কাহারও কথায় কোনরূপ জবাব দিত না, শুধু একটুখানি হাসিত।

চারুর মা দু'দিনের জন্য মেয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। একদিন কথায় কথায় কহিলেন, "ওই আমাদের ঝি খেন্তী সেদিন বলছিল ওদের দেশে না কি কি এক জাগ্রত দেবতা আছেন; তাঁর নির্ম্মাল্য নিলে না কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সেই একটা নিয়ে দেখ্ না কেন চারু! এত বয়স পর্য্যন্ত আজও যদি একটি হলো না।"

অষ্টমবর্ষীয় বালক অশোক চারুর পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। পরম স্নেহভরে তাহাকে বুকের নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "এইত আমার ছেলে মা। আশীর্ব্বাদ কর, ওই যেন আমার কোল জুড়ে বেঁচে থাকে। এর চাইতে বেশী কামনা আমার নেই।"

* * * বিকাশ প্রোফেসর মানুষ। দিবারাত্রই সে তাহার 'থিওরি' ও 'প্রব্‌লেম' লইয়া ব্যস্ত থাকিত। সংসারের যাবতীয় 'প্রব্‌লেম সল্‌ভে'র ভারটা সে চারুর হাতে দিয়াই একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিল। সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া অশোক হাতের নোটবুক ও বই দু'খানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বৌদি'! অ বৌদি'! শুনতে পাচ্ছ?"

চারু ওদিককার ঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। অশোকের ডাকে সে সেখান হইতেই জবাব দিল, "ওরে অশোক, এই ঘরে আয় দাদা। আমি এইখানে।"

"শীগ্‌গিরী খেতে দেবে চলো। আমার বুঝি খিদে পায় না। তুমি বেশ যা' হোক্।"

সহসা সম্মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে একপ্রকার লজ্জিত হইয়াই থামিয়া গেল। চারুর ঠিক্ পশ্চাতে একটা কিশোরী যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঠোঁট চাপিয়া অল্প অল্প হাসিতে ছিল। অশোককে সহসা থামিয়া যাইতে দেখিয়া চারু আন্দাজেই কতকটা ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছিল। "ও রে, ও যে সুনু! মনে নেই, যে সেবার আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল। ও এবারে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ও তোদের কলেজেই পড়বে।"

অশোকের মনে পড়িল, হাঁ, বছর ছয়-সাত আগে একবার ওকে দেখিয়াছিল বটে। ও বেশ বড় হইয়াছেত।...

ভাবিতে ভাবিতে অশোক বৌদি'র সাথে খাইতে চলিল। রাত্রে যখন অশোক একটা শক্তগোছের 'প্রব্‌-লেম' লইয়া অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিল, এমন সময় সেই বৈকালের মেয়েটি আসিয়া কহিল, "খেতে চলুন, দিদি ডাকছে।..."

ও বই হইতে মুখটা তুলিয়া কহিল, "হ্যাঁ, চলো যাচ্ছি।"

ইহারই দিন দুই বাদে সুনন্দা অশোকদের কলেজে ভর্ত্তি হইয়া নিয়মিতভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল।

দুই

দিন যায়।

এ বাড়ীতে অশোক, সুনন্দা, বিকাশ ও চারুকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের চাকাটা আগের মতই ঘুরিয়া চলিতে লাগিল। শুধু অশোক মাঝে মাঝে হাতের 'প্রব্লেম'টা আগের মতই সরাইয়া আনমনে ভাবিত, তাইত ও মেয়েটি কেমন, এতদিন এখানে এল, তা' কি একটা কথা বলতে নেই।...

সেদিনও পড়ার ফাঁকে সে সুনন্দার কথাই ভাবিতেছিল। 'সুনন্দা,' 'সুনু' আর যা' হোক্ ওর নামটি বেশ! ডাকিতে সাধ যায়!...সহসা তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল।

"আমার এ অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দিন না। জামাইবাবু যেন কোথায় গেছেন। তাঁকে..."

চুরী করিতে গিয়া ধরা পড়িলে মানুষের যেমন মুখের চেহারা হয়, অশোকের মুখখানিও সহসা সেইরূপ বিপন্ন ও লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে চোখ তুলিয়া উহার দিকে তাকাইল। সুনন্দাও তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল।

যদিও সুনন্দা আজ প্রায় তিন মাসের উপর এ বাড়ীতে আসিয়াছে, তথাপি উভয়ের মধ্যে নেহাৎ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। হয়ত সিঁড়ি দিয়া উঠিতে নামিতে গিয়া কিংবা এঘর হইতে ও ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া, না হয় বাথরুমে স্নান করিতে যাইবার সময় বারান্দায় উভয়ের চোখোচোখি হইয়া যাইত। কিন্তু কেহই কাহারও সহিত যাচিয়া তেমন কথাবার্ত্তা কহিত না। এমন দিনও গিয়াছে, হয়ত দু'জনে একই সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সমগ্র রাস্তাটাই একসাথেই কলেজে গিয়াছে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহে নাই। তাই আজ সুনন্দাকে নিজের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অশোক সত্যই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল।

"আমার এই অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দেবেন?"

ততক্ষণে অশোক নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়া কহিল—"দেখি কি অঙ্ক?"

তারপর সুনন্দার হাত হইতে খাতাটা টানিয়া লইল।

"তোমাদের 'কনিক্স' বুঝি মিঃ রুদ্র পড়ান?"

"হুঁ! কিন্তু ওঁর চাইতে আমার মনে হয় মিঃ পাণ্ডে আরো ভালো পড়াতে পারেন।"

"হ্যাঁ, আমাদের সময় উনিই ক্লাসটা নিতেন; কিন্তু রুদ্র আসার পর হ'তে আর উনি নেন না। কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে, পাণ্ডে বেশ ভাল পড়ান?"

"বারে! কিছুদিন আগে মিঃ রুদ্র ছুটি নিয়ে গেছলেন, সেই সময় উনি ক'দিন আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন যে।"

এরপর হইতেই প্রায় উভয়ের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা হইত। এবং ক্রমে উভয়ের ভিতরের সঙ্কোচটা কাটিয়া গিয়া একটা সখ্যতা গড়িয়া উঠিল। ছুটীর দিন প্রায়ই দেখা যাইত, হয় চারুর কিংবা সুনন্দার ঘরে সুনন্দা ও অশোক নানা কথাবার্ত্তায় মশ্‌গুল আছে। হয়ত চায়ের সময় হইয়া গিয়াছে, এমন সময় চারু আসিয়া কহিল, "ওরে ও সুনু, অশু, তোরা কি আজ আর চাও খাবি নে ঠিক্ করেছিস্ না কি!"

উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হয়ত একটু হাসিত।

দেখিতে দেখিতে পূজার বন্ধ আসিয়া পড়িল। কাল সুনন্দা তাহার পিতার কাছে দিনাজপুরে চলিয়া যাইবে। পরের দিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই অশোকের সহিত সুনন্দার চোখোচোখি হইয়া গেল। অশোক সবেমাত্র ব্যায়াম সারিয়া নীচে নামিতেছিল। প্রশস্ত ললাটের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই।

"আজই তোমার যাওয়ার দিন সুনন্দা! কিন্তু আমি ভাবছি সুনন্দা, ছুটীটা কি করে কাটাব।'

"কেন পড়বেন। ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়া চাই কিন্তু অশোক দা'! জামাইবাবু কালও দিদিকে বলছিলেন,

খোকাটা যদি দিনে দু' ঘণ্টা করে পড়তো, তবে নিশ্চয়ই ফাষ্ট ক্লাসটা পেত।"

একটুকরো হাসিতে গাল ভরাইয়া অশোক কহিল, "দাদা যে কি বলেন!...জানো সুনন্দা, দাদা আমাকে এতখানি ভালবাসে, কিন্তু আমার বড় দুঃখ, হয়ত দাদার এতখানি ভালবাসা পাওয়ার যথার্থ পাত্র কোনদিন হ'তে পারব না।"

যাওয়ার সময় কিন্তু অশোককে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। দিদিকে প্রণাম করিতে করিতে সুনন্দা কহিল, "অশোক দা' যে কোথায় গেল?...তুমি তাকে বলো দিদি।..."

* * * সুনন্দার দাদা সুনন্দাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। সুনন্দাকে একটা 'কমপার্টমেন্টে' তুলিয়া দিয়া নিজে অদূরে দাঁড়াইয়া বিকাশের সহিত গল্প করিতেছিল। রাত্রি বোধ হয় আটটা কিংবা নয়টা হইবে। স্বল্প চন্দ্রালোকে আশপাশের গাছপালাগুলি যেন চোখ মুদিয়া ঝিমাইতেছে। অদূরে রেল লাইনের একটা খড়ের গাদার নীচে একটা কুকুর কুঁকড়াইয়া শুইয়া আছে। সুনন্দা খোলা জানালাটা দিয়া আনমনে সেইদিকেই তাকাইয়াছিল। অশোকের সহিত দেখা হইল না।... কোথায় যে সে গেল!...সহসা হাতের উপর কাহার যেন একখানি হাতের স্পর্শ পাওয়া গেল।

"সুনন্দা!"

"কে ও অশোক দা'।. কোথায় ছিলে বলোত।... সারা বাড়ীময় খুঁজে খুঁজে হায়রান!..."

সেদিন গৃহে ফিরিবার পথে অশোকের মনে হইল, আকাশ বুঝি কাঁদিতেছে!...বাতাসে তারই চাপা কান্নার শব্দ!...

তিন

দিন পাঁচ-ছয় বাদে বৃথা কয়েকবার অস্থির পদে এঘর ওঘর খুঁজিয়া অশোক চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বৌদি', অ বৌদি', কোথায় গেলে বলো ত?"

চারু ঘরে আসিতেই সে পুনরায় কহিল, "বাড়ীটা যেন একটা ভূতের আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বাড়ীতে আর টেঁকা যাচ্ছে না। তার চাইতে চলো বৌদি', দিনকতক কোথা হ'তে বেড়িয়ে আসি।"

চারু অশোকের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিল।

দিনকতক বাদে একখানা খোলা চিঠি হাতে চারু অশোকের পড়ার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। "এই নে অশোক, সুনন্দা তোকে চিঠি দিয়েছে।"

পুস্তকের মধ্যে চোখ বুলাইতে বুলাইতে যেন একটু অন্যমনস্কভাবেই অশোক কহিল, "ওখানে রেখে যাও বৌদি'।"

মৃদু হাসিয়া চারু কহিল, "কেন রে অভিমান হয়েছে! এ ক'দিনত পিওন আসার পথটা চেয়ে চেয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিলি, এখন এই নে চিঠি।"

"হ্যাঁ—কে বললে!"

"ওরে জানিরে জানি!" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চারু ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ইহারই দিন সাত-আট বাদে চারু একদিন অশোককে কহিল, "তুই বুঝি সুনীর চিঠির জবাব দিস নি? ও কত দুঃখ করে চিঠি দিয়েছে।"

"সময় কোথায়? পরীক্ষারত মাত্র একটা বছর বাকী আছে। এখন হ'তে না পড়লে—"

দেখিতে দেখিতে বন্ধ শেষ হইয়া গেল। সুনন্দা আবার এখানে ফিরিয়া আসিল। বৈকালের দিকে সিঁড়ির বাঁকে তাহার সহিত অশোকের দেখা হইতেই সে অশোকের পথটা আটকাইয়া ডাকিল, "অশোক দা'?

"আমার কাজ আছে সুনন্দা।"

"তা' আমি জানি। আমায় ক্ষমা কর অশোক দা'! সত্যি বলছি, ওখানে গিয়ে দিন পাঁচ-ছয় বাড়ীর পূজোর কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, চিঠি দেওয়ার সময় করে উঠতে পারি নি। কিন্তু তুমিওত আমার চিঠির জবাবটা পর্য্যন্ত দাও নি।

"কেন তবে প্রতিজ্ঞা করেছিলে?"

"এবারকার মত আমায় ক্ষমা কর অশোক দা'।"

যাহা হউক, দুইজনে ভাব হইয়া গেল। এবং পুনরায়

উভয়ের দিনগুলি আগের মতই হাসি ও গল্পে কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন রাত্রে চারু তাহার স্বামীকে কহিল, "দেখো, তোমাকে একটা কথা আজ ক'দিন ধরেই বলবো বলবো করছি, কিন্তু—" বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল।

পাঠনিরত বিকাশ বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, "কি কথা চারু?"

"বলছিলাম কি, এই অশোকের সঙ্গে সুনুর বিয়েটা হ'লে কেমন হয়?"

"কেমন হয়, সে কথা আলাদা। কিন্তু তোমার কি সত্য-সত্যই ওই ইচ্ছা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, আমার বড় ইচ্ছা, ওদের দু'জনকে এক করে দিই।"

"কিন্তু তোমার বাবা কি রাজী হবেন চারু?"

"বাবা! তাঁকে আমি রাজী করাব। আর অশোকের চাইতে ভাল পাত্র উনি কোথায় পাবেন যে, অরাজী হবেন?"

মৃদু হাসিয়া বিকাশ কহিল, "এ যে তোমার একেবারে আপনার কথা হয়ে যাচ্ছে চারু! অশোক যেমন তোমার কাছে; সুনন্দাও যে ঠিক্ ততখানিই তার মা-বাপের কাছে। স্নেহের দরবারে তোমাদের উভয়ের অভিযোগই যে একই ভিত্তির 'পরে খাড়া হয়ে আছে। নিক্তির মাপেত এখানে ওজন হবে না।"

"সে তুমি যাই বলো। বাবা ঠিক রাজী হবেন, তুমি দেখে নিও।"

"বেশত, রাজী হন্ সেত ভাল কথা। কিন্তু ও বড় হয়েছে, ওরওত নিজের একটা মতামত আছে। আমাদের নিজেদের দিক্‌টাই শুধু দেখতে গিয়ে ওদের দিক্‌টা উপেক্ষা করলেত চলবে না।"

"তুমি কি যে বলো, অশোক আবার সুনুকে বিয়ে করতে অরাজী হবে! ও হতেই পারে না!"

হাসিতে হাসিতে স্ত্রীর কথায় বিকাশ কহিল, "সে দিক্‌টাও বুঝি তোমার জানা হয়ে গেছে! তবে আর কি কোমর বেঁধে লেগে পড়।"

"নইলে আর—" বলিয়া চারু স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটুখানি হাসিল।

স্বামীর ইহাতে আপত্তি নাই জানিয়া চারু, অশোক ও সুনন্দার ঠিক্ মনোগত ভাবটা জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সুনন্দাকে যদিও একটু-আধটু ধরাছোঁয়া যায়, তার শতাংশের একাংশও অশোককে যায় না।

অশোক ও সুনন্দার ব্যবহারে চারু যতটা আঁচ করিয়াছিল, এখন প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে একান্তভাবে উহাদের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে দেখিল, জিনিষটা ঠিক্ ততটা সোজা নহে। মিতভাষী অশোকের হৃদয়-বেগ ঠিক যে কোন্ পথ দিয়া বহিতেছে তা' সে বহুচেষ্টা করা সত্ত্বেও এতটুকুও জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। বৃথাই সে আঁধারে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল।

শৈশবে মায়ের মৃত্যুর 'পর যখন অশোকের শিশুচিত্ত একটা স্নেহাতুর অবলম্বনের জন্য মনে মনে একান্তভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক্ সেই সময় চারু তাহার ব্যগ্র বাহুর দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল। চারু ও অশোক বাহিরে যতই তাহারা কাছা-কাছি আগাইয়া আসুক না কেন, নিজের মনের কাছে কিন্তু সে চারুর সহিত সম্পূর্ণ প্রকটিত ছিল না। মা ও সন্তানের মাঝে যেমন একটা ঐক্যের নিবিড়তা অনুভব করা যায়, চারু ও অশোকের মধ্যে কিন্তু সেটা ছিল না। কিন্তু অশোকের দিক্ দিয়া সে যতই দূরে থাকুক না কেন, চারু কিন্তু তাহার কাছে আপনাকে নিবিড়ভাবেই ধরা দিয়াছিল, এবং শুধু সেই জন্যই সে অশোকের মনোগত চিন্তা ও প্রকৃতিগত ব্যবহারের সহিত যতটা ঘনিষ্ঠতার দাবী মনে মনে পোষণ করিত, তাহার উপরই সে নির্ভর করিয়া এই ব্যাপারে আগাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভুল তাহার হইয়াছিল এইখানেই।

অধিক বয়স পর্য্যন্তও যখন চারুর কোন সন্তানসন্ততি হইল না, তখন তাহার অন্তরের চিরন্তন নারী অনাস্বাদিত মাতৃত্বের বুভুক্ষায় সম্মুখের অশোককেই বেষ্টন করিয়া ধরিল। অশোকের প্রতি চারুর যে টান ও ভালবাসা তাহা মাতৃস্নেহেরই নামান্তর মাত্র এবং নিজে সে স্নেহে অন্ধ ছিল

বলিয়াই অশোকের মনের দুর্ব্বলতার সন্ধান কোনদিনও পায় নাই ও পাইবার চেষ্টাও করে নাই।

যাহা হউক, হাবে-ভাবে যখন চারু অশোকের দিক্ দিয়া এতটুকু চেতনারও আভাষ পাইল না, তখন ঠিক্ করিল, একদিন সে কথার ছলে কথাটা উহার কাছে পাড়িবে।

চার

বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। টেবিলের উপর একখানা পা তুলিয়া দিয়া অশোক আনমনে বাহিরের বাদলা আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল। হাতে দুই আঙ্গুলের মাঝে ধরা একখানা 'কেমিষ্ট্রী'র বই। গোটা পাঁচ-ছয় তাজা কদমফুল হাতে সুনন্দা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

"অশোক দা' !"

"কে সুনন্দা, এস !"

তারপর ওর দিকে দৃষ্টি পড়ায় কহিল, "ও কি অত কদমফুল কোথায় পেলে ?"

"পুকুরধারের গাছটায় ফুটেছিল। দরোয়ানকে দিয়ে পাড়িয়ে এনেছি। ভারি সুন্দর, না ?"

ফুলগুলি সুনন্দা অশোকের টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল। ছোট ছোট বৃষ্টির গুঁড়ি তখনও সেই ফুলের ঘনসন্নিবেশিত পাপড়ীর গায়ে গায়ে যেন ভোরের শিশির বিন্দুর মতই ছড়াইয়াছিল। একটা সূক্ষ্ম মৃদুগন্ধ ফুলগুলি হইতে বাহির হইতেছিল। টেবিলের উপর হইতে একটা ফুল হাতে তুলিয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিয়া শুঁকিতে শুঁকিতে অশোক কহিল, "কদমফুলের একটা বেশ সুন্দর স্নিগ্ধ গন্ধ আছে, না ? এই জন্যই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ কদম-তলায় বাঁশী বাজাতেন।"

"আপনি এত সামান্য বস্তু হ'তেও এমনি কবিত্ব টেনে বার করেন! আমার মনে হয়, আপনার 'সায়েন্সে' না গিয়ে 'আর্টসে'ই যাওয়া উচিত ছিল"—বলিয়া সুনন্দা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরের মাঝে একটা করে কবি-মন আছে সুনন্দা। তবে কারও থাকে সেটা ঘুমিয়ে, আবার কারও সেটা থাকে জেগে। যাদের জেগে থাকে, তারাই হয় কবি। আর যাদের ঘুমিয়ে থাকে, তাদের যে সব সময়ের জন্যই ঘুমিয়ে থাকে, তারও কোন মানে নেই। মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য সেটা জেগেও উঠতে পারে, আর তখন তার মনে হয় এই জগত, এই আকাশ, এর পারিপার্শ্বিক সবই যেন সুন্দর! সবই যেন মনোরম! এতেত আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। তবে এইটুকু তুমি বলতে পার, সেই ক্ষণিক জাগার হয়ত কিছু হেতু থাকতে পারে। যেমন আজকের এই বর্ষা-মেদুর আকাশ ও তোমার আনা ভেজা কদমফুলগুলি।"

এমন সময় কথার মধ্যে চারু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

"ও মা, সুনি, তুই এখানে, আর সারাটা বাড়ী তোকে খুঁজে খুঁজে মরছি! যা' হোক্ মেয়ে বাবা তুই!"

"কেন দিদি, আমায় খুঁজছো কেন ? আমিত এখানেই ছিলাম।"

"তা' বেশ করেছিস্। আজ বিকালে কলেজের না কি একটা কি মিটিং আছে, তোর জামাইবাবুকেও সেখানে যেতে হবে। তার পোষাক বার করে দিয়ে আয়। তুই এসে অবধি ও সবত তুই দেখিস। কোথায় কোন্‌টা আছে সে তোরই জানা আছে।"

এ বাড়ীতে আসা অবধি সংসারের অনেক কিছুরই ভার সুনন্দা স্বেচ্ছায় স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। কাপড়-জামার খোঁজ-খবর রাখা প্রভৃতি ছোটখাটো কাজগুলি সেই দেখিত। দিদির কথায় সে বাহিরে চলিয়া গেল। টেবিলের উপরের ফুলগুলি দেখিয়া চারু কহিল, "বাঃ, বেশ সুন্দর ফুলত! কোথায় পেলিরে অশোক।"

"সুনন্দা নিয়ে এসেছে।"

চারু ঠিক্ ভাবিয়া পাইতেছিল না কথাটা অশোকের কাছে কি ভাবে পাড়া যায়। সে অশোককে যতটা চিনিত, তাহাতে একেবারে সাম্‌নাসাম্‌নি যে সে কিছুতেই আপন মনোগত ভাব কাহারও কাছেই প্রকাশ করিবে না ইহা খুবই সত্য। অথচ কোন একটা কিছু অন্ততঃ আভাষে-ইঙ্গিতে বুঝিতে ও না জানিতে পারিলে সেই বা বেশী দূর

আর অগ্রসর হয় কিরূপে? আরো দু'-একটা কথাবার্ত্তার পর চারু কহিল, "আজ বাবার একটা চিঠি পেলাম।"

"কি লিখেছেন? সব ভাল আছেনত?"

"তা' হ্যাঁ, এক প্রকার সব আছে। একথা সে কথার পর লিখেছেন, সুনুর শীগ্‌গীরই বিয়ে দেওয়া দরকার। এখন বড়সড় হয়ে উঠেছে।...কথাটা বলিয়া চারু আড়-চোখে অশোকের মুখের ভাবটা জানিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন ভাবান্তর সে লক্ষ্য করিল না। তখন সে কহিল, "হ্যাঁরে অশোক, তোদের সঙ্গেত অনেক ছেলেই পড়ে। ভাল দেখে ওর জন্য দু'-একটি পাত্র দেখে-শুনে দে না।"

মৃদু হাসিয়া অশোক কহিল, "আমাদের সাথে অনেকেইত পড়ে। কিন্তু সুনন্দার যোগ্য।—না বৌদি! কই, আমার তেমন ছেলে চোখে পড়ে না।"

চারু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তোমার মত হাবা ছেলে আমি আর একটীও দেখি নি।"

'কিন্তু ওর এমনিই বা বয়স কি বেশী হয়েছে যে, এখনই ওর বিয়ে না দিলে আর চলছ না?"

"সে কিরে! ওর এখন যা' বয়স, তার তিন বছর আগেই আমার বিয়ে হয়। আর মেয়েছেলেকে কতদিন ঘরে রাখা যায়?"

"সে সময়ের কথা ছেড়ে দাও বৌদি'! আর—"

"কি হঠাৎ থামলি যে, বল্ না কি বলবি।"

"না, বিশেষ কিছু না। এই বলছিলাম, ওর নিজেরওত একটা মতামত আছে?"

"কার?"

"সুনন্দার।"

"ও, সুনীর। ওর আবার মতামত কি? আমরা যার হাতে ওকে তুলে দেব, তাকেইত ও বরণ করবে। বাপ-মা কি কখনও সন্তানের প্রাণে ব্যথা দিতে চায়রে! তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে কিসে সন্তান সুখী হবে। যাদের ওপর চিরটা কাল বিশ্বাস রেখে এতটা বড় হয়েছে, তাদের কাছ হ'তে আর যাই হোক্, ঠক্‌তে কখনও হয় না। আর সত্যিই যদি কোন ভুলচুক্ হয়ে যায় তবে সে ভুলের ব্যথা বাপ-মার বুকে যা' বাজে, সেটার কাছে সন্তানের ব্যথাটা শতাংশের একাংশও নয়।"

এমন সময় সুনন্দা আসিয়া জানাইল, বিকাশ চারুকে ডাকিতেছে।

চারু উঠিল।

পাঁচ

সে রাত্রে শয্যায় শুইয়া চারু কহিল, "না হলো না!"

"কি হলো না গো?"

"অগাধ জল! ডুব দিয়েছিলাম, কিন্তু তার 'তল' পাওয়া গেল না। শুধু নাকে-মুখে খানিকটা জল ঢুকে গেল।"

"ব্যাপার কি! এ যে বানার্ডশ'র নাটকের চাইতেও দুরূহ হয়ে উঠছে।"

"তোমার ভাই বানার্ডশ'র একখানি নাটকই বটে! বাবাঃ, ধরা দেয়ত, ছোঁয়া দেয় না!..."

"আহা, একটু খুলেই বলো না গো! এ অধম একটু বুঝতে পারুক। না হ'লে যে শুধু 'বোকার হাসি'র মত শুনেই হেসে উঠ্‌তে হয়।"

"এত করে বললাম। কিন্তু কিছুতেই ও বুঝতে দিলে না যে, সুনীর ওপর ওর মনোভাবটা ঠিক্ কি রকম।"

"হঠাৎ সুনীর ওপর অশোকের মনোভাবটা জানার জন্যই বা এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে কেন?"

"কেন আবার! এইত তোমাকে সেদিন সে কথাটা বললাম। তুমি যেন কি! এই এখুনি যা' শুন্‌বে, ঠিক্ পরক্ষণেই তা' ভুলে বসে থাকবে!"

"ওঃ, ঠিক্ ঠিক্, আমার মনে পড়ছিল না—এখন পড়েছে। তা' তুমি অশোককে বুঝি সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

সহসা স্বামীর দিকে ফিরিয়া চারু কহিল, "দেখো, তুমি একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে?"

"কে? আমি!"

বিকাশ হাসিয়া ফেলিল, "তুমি কি পাগল হয়ে গেলে

চারু ? ওই কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে যাবো অশোককে ? আর যদি জিজ্ঞাসাই করি, তবে তুমি কি মনে করেছ, সে যে কথা তোমার কাছে বললে না, তাই বলবে আমার কাছে।"

ব্যাপারটা কতকটা এইখানেই চাপা পড়িয়া গেল। চারু আরো দুই-একবার হাবেভাবে অশোকের নিকট কথাটা পাড়িয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বের মত প্রত্যেকবারই তাহাকে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়াই মনে হইল।

যথাসময় পরীক্ষার পর সুনন্দা পিতার কাছে চলিয়া গেল। সুনন্দার পিতা মৃত্যুঞ্জয়বাবু সত্য-সত্যই এবার কন্যার বিবাহের জন্য দু'-একজন পাত্র দেখাশুনা করিতে লাগিলেন; কেন না, চারু জানাইয়া দিয়াছিল তাহার ও বিকাশের সম্পূর্ণ মত থাকিলেও অশোকের এ বিবাহে মত নাই। সেদিন প্রত্যূষে চারু রান্নাঘরে বসিয়া বামুনীকে তরকারী কুটিয়া দিতেছিল, এমন সময় ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। চিঠিটা তাহার পিতাই লিখিয়াছেন।

"মা চারু,

অনেকদিন তোমাদের কোন পত্র বা সংবাদ পাই নাই। তোমরা সকলে কে কেমন আছ ? সুনীর জন্য বেশ একটী ভাল পাত্র পাওয়া গিয়াছে। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল, ওকে অশোকের হাতেই দিই; কিন্তু ভগবান আমার সে সাধ পূরণ করিলেন না। যাহা হউক, আমি আগামী বুধবার পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইব। তুমি যদি এখানে কয়েকদিনের জন্য আসিতে পার, তবে বড় ভাল হয়। যাহা হয় আমাকে সত্বর জানাইবে। ইতি,

তোমার শুভার্থী পিতা"

আজ আর চারু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে ঠিক করিল, আজই একবার সে স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে অশোককে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আসন্নবর্ত্তী পরীক্ষার জন্য অশোক যখন নিজের ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল, চারু তখন সকাল-বেলাকার সেই চিঠিটা হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

"অশোক !"

"কে, বৌদি' !"

"হুঁ। তোকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

"কি কথা বৌদি' ?"

একটু ইতস্ততঃ করিবার পর অবশেষে চারু কহিল, "বাবা লিখেছেন সুনীর বেশ একটী ভাল পাত্র পাওয়া গেছে; বরপক্ষের যদি সুনীকে পছন্দ হয়, তবে আসছে মাসেই তার বিয়ে দিয়ে দেবেন।"

চারুর কথায় অশোক কোনরূপ জবাব দিল না, শুধু সম্মুখের খোলা বইটার কালো কালো অক্ষরগুলির প্রতি চোখ বুলাইতে লাগিল।

চারু ভাবিতে লাগিল, কিভাবে কথাটা অশোকের নিকট পাড়া যায়। সহসা অশোক বৌদি'র মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "ছেলেটী কি করে ?"

"তেমন কিছুই করে না। আই-এতে ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতেই এখন বসে আছে। বাপের অনেক টাকা পয়সা আছে, কোলকাতার ওপর খানকয়েক বাড়ীও আছে।"

"সে কি আই-এ পাশও না ! অথচ সুনন্দাত এবার আই-এ পাশ করবে। অমন ছেলের সঙ্গে—"

"তাইত এই বিয়েতে মার তেমন মত নেই। তবে ছেলের অবস্থা খুবই ভাল।"

—তাই বলে শুধু টাকার লোভে একটা অশিক্ষিত ছেলের হাতে অমন মেয়ে তুলে দিতে হবে !"

"কিন্তু এতত খোঁজাখুঁজি হ'ল, তা' তেমন ছেলেওত কই পাওয়া গেল না।"

অশোক চারুর কথার কোন জবাব দিল না। টেবিলের উপর হইতে পেন্সিলটা লইয়া একটা কাগজের উপর আঁক কাটিতে লাগিল। চারু আড়চোখে অশোকের মুখের দিকে তাকাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, "অশোক !"

ঈষৎ চমকাইয়া মাথাটা তুলিয়া অশোক জবাব দিল, "আমায় ডাকৃছ ?"

"হ্যা। মা'র ইচ্ছা সুনীকে এ বাড়ীতেই দেন, কিন্তু—"

অশোক বিস্মিতভাবে বৌদি'র মুখের দিকে তাকাইল। পরক্ষণেই লজ্জার গুরুভাবে নুইয়া পড়িয়া জড়িতকণ্ঠে কহিল, "ধ্যেৎ! তা' হয় না..."বলিয়া সে টেবিলের উপর মুখ গুঁজিল।

আগাইয়া আসিয়া একখানি হাত অশোকের মাথার উপর রাখিয়া স্নেহসিক্ত-স্বরে চারু ডাকিল, "অশোক!"

কিন্তু একইভাবে টেবিলের পর মাথা গুঁজিয়া অশোক কহিতে লাগিল, "না, না, তা' হয় না বৌদি', তা' হয় না! ছি, ছি, সে কি ভাববে!"

"তবে লিখে দিই তোর কথা, যে—"

অশোক ভাবিল, যখন এই চিঠি সুনন্দাদের বাড়ী গিয়া পৌঁছাইবে, সে হয়ত ভাবিবে অশোক দা'র মনে তবে এই ছিল! যাহার সঙ্গে সে অবাধে, অসঙ্কোচে এতদিন মিশিয়াছে, সেই কি না শেষটায় এই করিল! ছি, ছি, কি লজ্জার কথা! সে হয়ত ইহার পর কোনদিনও আর তাহার মুখ পর্য্যন্ত দেখিবে না! এতবড় প্রতারণা, না না সে সম্ভব নয়! সে ব্যাকুলভাবে চারুর একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "না বৌদি', ওসব লিখো না, আমি বিয়ে করবো না!..."

"লক্ষ্মীটী অশোক, অমত করিস্ নে; মত দে।"

"না বৌদি', তা' হয় না!..."

"তবে ঐ মুখ্যুর সাথেই তার বিয়ে হোক্!"

চারু চলিয়া গেল। একটা বিরাট অভিমানে তাহার সমগ্র হৃদয় গুমরাইয়া গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ তাহার অতিবড় প্রিয়কে শশ্মানে পুড়িতে দেখিয়া যেমন করিয়া সেইদিকে তাকাইয়া থাকে, অশোকও চারুর গমন-পথের দিকে সেইভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার এক-একবার ইচ্ছা হইতেছিল, চীৎকার করিয়া চারুকে ডাকিয়া ফিরায়।—"বৌদি' ফেরো!...শুনে যাও, তাই লিখে দাও!...আমার এতদিনকার স্বপ্ন সফল হোক্!" কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচ তাহাকে দু'হাতে পিছন হইতে প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া রাখিল। ধীরে ধীরে বৌদি'র আচলের শেষ প্রান্তটী পর্য্যন্ত দরজার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছয়

অশোক সুনন্দাকে ভালবাসিয়াছিল এবং সে ভাল-বাসিয়াই সুখী ছিল। কিন্তু সেই ভালবাসার মধ্যে যেদিন দেনা-পাওনার প্রশ্ন আসিয়া উঁকি দিল, সেইদিন সে সর্ব্বপ্রথম সম্মুখের দিকে তাকাইয়া লজ্জায় দিশাহারা হইয়া পড়িল। সুনন্দার প্রতি এই যে তাহার প্রেম, এ যেন নিরন্তর তাহার হৃদয়ে একটা অদৃশ্য কাঁটার ন্যায় খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। সে ভাবিল, তাহার একথা যদি ঘুণাক্ষরেও সুনন্দা জানিতে পারে, তবে সে তাহাকে কি ভাবিবে! পাছে তাহার এই ভালবাসার কাহিনী সুনন্দার কাছে ধরা পড়িয়া যায়, তাই সে অতি সাবধানে চলাফেরা করিতে লাগিল। সেই জন্যই চারু যতবার তাহার নিকটে আসিয়াছে, ততবারই নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

পরদিন হইতেই চারু যেন অনেকটা গম্ভীর হইয়া গেল। অশোক দু'-চারবার তাহার সম্মুখে অপরাধীর মত ঘেঁসিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু চারু আমল দেয় নাই।

এদিকে সুনন্দার বিবাহের দিনক্ষণ পর্য্যন্ত সব ঠিক হইয়া গেল। চারুর দাদা একদিন চারুকে লইতে আসিল। সে একান্ত বিমর্ষভাবে সব গোছগাছ করিতে লাগিল।

অশোকের পরীক্ষার আর মাত্র সাতদিন বাকী। সে যাইতে পারিবে না শুনিয়া চারুর দাদা দুঃখ করিলেন।

চারু গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, এমন সময় দেখিল একটা সুটকেশ হাতে অশোকও তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারু বিস্মিতভাবে উহার দিকে তাকাইল।

"সুনীর বিয়ে, আর আমি যাবো না। পরীক্ষাত প্রত্যেক বছরই আছে; কিন্তু বিয়েত আর হবে না।"

চারুর দাদা হাসিতে লাগিলেন।

সহসা চারুর দু'টি চক্ষুই জলভারে নুইয়া আসিল। সে

[...]দিকে ফিরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে ঠোঁট দু'টি দাঁত দিয়া [...]পিয়া ধরিল।...

*** কাল সুনন্দার বিবাহ। এই অল্পক্ষণ হইল সন্ধ্যার কালো ছায়া পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সান্ধ্য-আকাশে শঙ্খধ্বনি তখনও থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া উঠিতেছে। ছাতের আলিসার 'পরে ঝুঁকিয়া অশোক চুপ-চাপ দাঁড়াইয়া অনেক কথাই ভাবিতেছিল। সেই প্রথম দিন সুনন্দার তাহাদের বাড়ী যাওয়ার পর হইতে তাহার শেষ-বিদায়ের দিনটী পর্য্যন্ত। অনেক দিনের অনেক কথাই তাহার মনের আনাচে-কানাচে যাওয়া-আসা করিতেছিল।

"অশোকদা' !"

"কে ?"

অশোক চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

"আমি সুনন্দা। আমিত ভেবেছিলাম, তুমি বোধ হয় আসবেই না।"

"হঠাৎ তোমার এরকম ভাববার কারণ ?"

অশোকের কথার সুনন্দা কোনপ্রকার জবাব করিল না, শুধু মুখটা একবার ফিরাইয়া লইল।

"সুনন্দা ?" অশোক ডাকিল।

"অশোক দা !"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো জবাব দেবে ?

"কি ?"

"শুনলাম এ বিয়েতে না কি তুমি খুব সুখী ?"

"সুখী !"

সুনন্দার কণ্ঠস্বরটা যেন অশোকের কানে একটা দূরাগত চাপা কান্নার মত মনে হইল।

"হাঁ অশোক দা, সুখী হওয়ার জন্যই চেষ্টা করবো। আমায় আশীর্ব্বাদ কর তুমি, যেন সফল হই! এ জগতে যে যা' চায়, তাই কি পায় ? না সেটা সম্ভব। কাল রাত্রে একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখেছি—আমি যেন আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, আর তুমি যেন দরজার গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছ; অথচ, আমি শুনেও যেন সাড়া দিতে পারছি না। আমার সে ঘুমের মধ্যে মনে হচ্ছিল, আমিও যেন তোমায় কত কি বলতে চাই; কিন্তু তোমায় সেটা বলতে পারছি না!... এমন সময় চট্ করে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি, ভোরের আলোয় ঘরটা ভরে গেছে।"

"সুনন্দা! সুনন্দা!" অশোক অধীর আবেগে ডাকিয়া উঠিল।

"কেন অশোক দা' ?"

"তবে, এ কি সবই আমার ভুল !"

"তা' কি কোনদিন তুমি জানতে চেয়েছ ?"

"কিন্তু, এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত সুনন্দা !"

"স্বপ্নও যে অনেক সময় সত্যি হয় অশোক দা' !"

অশোকের মাথার মধ্যে যেন সব কেমন এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল। এও কি তবে সম্ভব! সুনন্দা তাহাকে ভালবাসে!...কিন্তু সে যে...সুনন্দাও যে তাহাকে ভালবাসিতে পারে, এ কথাত কই একটী-বারও মনে হয় নাই! ভালই যদি বাসিত, তবে কেন সে একথা তাহার নিকট হইতে গোপন করিয়া এতদিন তাহাকে আঁধারেই রাখিয়াছিল! আজ তাহার মনের কোণে অনেক কথাই একের পর এক ছায়াছবির ন্যায় জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সেই প্রথম বিদায়ের দিন ষ্টেশনে সুনন্দার বিদায় কণ্ঠস্বর, সেই কদমফুল হাতে এক বর্ষা-মধ্যাহ্নে তাহার ঘরে আসা, এখানে আসার আগের দিন তাহার নিকট হইতে বিদায়কালে চোখের কোলে অশ্রু-চিহ্ন ?—উঃ! সে কি এতদিন অন্ধ ছিল ?...সব কিছুই যেন আজ তাহার কাছে সহসা জলের মতই পরিষ্কার হইয়া গেল। একটা অসহ্য পুলকের নিবিড় তাড়নায় তাহার সর্ব্বশরীর শুষ্ক কাশপত্রের ন্যায় থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পরক্ষণেই একটা তীব্র ব্যথার দোলায় তাহার সমগ্র প্রাণটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

"বৌদি', বৌদি', আমি যেন জানতাম না, কিন্তু তুমি! তুমিত জানতে, তবে কেন জোর করে আমার মত করালে না!...উঃ!"

সুনন্দা একটু আগাইয়া আসিল। স্নেহ-বিগলিত-স্বরে ডাকিল, "অশোক দা' !"

পাগলের মতন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া অশোক শুধু সুনন্দার দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। দূর আকাশ হইতে স্তিমিত নক্ষত্রগুলি পিট্‌পিট্ করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইতে লাগিল। সহসা অশোক মাতালের মত অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "তা' হয় না সুনন্দা, তা' হয় না—না না!..."

অশোকের একখানি হাত ধরিয়া সুনন্দা ব্যগ্রকণ্ঠে শুধাইল, "কি হয় না অশোক দা' ?"

ধৃত হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া অশোক ঝড়ের মত সেখান হইতে চলিয়া গেল।—"না, তা' হয় না, এ অসম্ভব!...আমি যাই বৌদি'কে বলি গে।"

সহসা সুনন্দার দুই চক্ষু ছাপাইয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু নামিয়া আসিল। বাহিরে তখন রোশনচৌকী মধুর আলাপে বুঝি বা আসন্নবর্ত্তী মিলনেরই গীতি গাহিতেছিল!...

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সন্ধিক্ষণে

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

ছোট্ট ষ্টেশন। প্লাটফর্ম্মে ট্রেণখানা এসে থাম্‌তেই, একটী উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে গাড়ী থেকে নেমে পাশের কামরা হতে ঝিকে নাবিয়ে নিল। ওর সুমুখেই নিতান্ত ছোট ছোট তিনটী লগেজ নিয়ে দু'টী কুলী ভীষণ হৈচৈ করছিলো। মেয়েটী একটী কুলীকে জিনিস-পত্তর তুল্‌তে বলে, চারিদিকে একবার অন্বেষণরত ব্যাকুল দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কুলীকে জিগ্‌গেস কর্‌লে—"হিঁয়া যো নয়া ডাক্তার বাবু বদ্‌লীমে আয়া, উন্‌কো কোয়ার্টার মালুম হায়?"

—"বহুত মালুম হায়, চলিয়ে মাইজী"—বলে সে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে লাইনের ওপারে একটী ইট বার করা লাল রঙের ছোট্ট বাড়ী দেখিয়ে দিল।

অতি অল্প আয়াসেই নূতন জায়গায় নূতন বাসার সন্ধান মিল্‌তে সলিলার দারুণ উন্মত্ত ঝড়ের মত মাতামাতি চিত্ত ক্ষণকালের জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ঝি মালতীর মনেও খুসীর দোল দিয়েছিল। পথ চল্‌তে চল্‌তে সে একগাল হেসে, হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌লে—"যা' হোক্, ধন্যি মেয়ে তুমি! আমরা হ'লে স্বোয়ামীকে এক পাও ঘর থেকে নড়্‌তে দিতুম না—'যাবি তো চল্ আমার সঙ্গে তা' না হ'লে'—"

—"কারও কোনও ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে নেই বুঝলে মালতী।"

তখন আকাশের মাঝখানে ষষ্ঠীর চাঁদের সুন্দর মুখ ভেসে উঠেছে। তার অমল ধবল জ্যোৎস্নাধারায়, অজানা পথে সলিলা চলেছে।

আশ্বিনের মাঝামাঝি। দুর্গাষষ্ঠী। আশেপাশে, গ্রামের ভেতরে বোধনের বাজ্‌না বাজছে। সানায়ের মিষ্ট সুর সলিলাকে উতলা কর্‌লে, অত্যন্ত বিমনা করে তুল্‌লে মুহূর্ত্তের মধ্যে। হ্যাঁ, এই সেই ঢাকের শব্দ, কাঁসর-ঘণ্টা —মানুষকে না কি পাগল করে—সত্যিই কি তাই?—

"মাইজী আউর মাৎ যাইয়ে, এই কোঠী।"

এলোমেলো চিন্তা থেকে জেগে উঠল সলিলা কুলির ডাকে। থম্‌কে দাঁড়াল রাস্তার মাঝখানে। আর ইতস্ততঃ না করে সে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লো। কেরোসিনের স্তিমিত আলোয় স্পষ্টই দেখ্‌তে পেলে, সুমুখের বারান্দাটিতে দাদা ও বৌদি' বসে আছেন। সে সিমেন্টে বাঁধানো একটুখানি উঠান অতিক্রম করে বারান্দায় উঠ্‌তেই, সুশান্ত ও রাণী অপ্রত্যাশিতভাবে সলিলাকে দেখে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন!—"লীলু, তুই!"

বিস্ময়মাখা, অথচ ফুল্লকণ্ঠে দাদা সুশান্ত বল্‌লেন—"নতুন বাসা চিন্‌লি কেমন করে?"

কুলীকে বিদায় দিয়ে সলিলা একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারের ওপর শ্রান্ত তনুখানি এলিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"মন থাকলে সবই হয় দাদা—কি বল বৌদি', ঠিক না?"

—"অনেকটা তাই।"

ওকে পাখা দিয়ে বাতাস কর্‌তে কর্‌তে মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে বৌদি' রাণী বল্‌লে—"তা' ঠাকুরজামাই বুঝি ছুটী পেলে না?"

—"ছুটী পেয়েছেন বই কি···" এক অদ্ভুত দৃষ্টি সলিলা শূন্যের পানে মেলে রাখ্‌লে!

—"তবে এখানে এল না কেন?" উৎসুক হয়ে রাণী সলিলার দিকে চেয়ে রইল।

—"শিলং পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন যে—"

—"শিলং পাহাড়!" সুশান্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টান্‌ছিলেন, উঠে বসে চুরুটটা 'অ্যাস্ ট্রের' ওপর ফেলে অত্যন্ত ব্যগ্রদৃষ্টি বোনের মুখের 'পরে নিবদ্ধ রেখে

জিগ্‌গেস করলেন—"সে কি কথা—সে একা শিলিং পাহাড় গেল, তুই গেলি নে?"

—"আমি ইচ্ছে করেই যাই নি।"

সলিলার কণ্ঠস্বর সাধ্যমত সংযত হলেও, ওর অন্তরের গোপন দেশে যে ঝড়্ বইছিলো, তা' স্পষ্টই প্রত্যক্ষ কর্‌লেন দাদা ও বৌদি'—ওর ভাসাভাসা সুন্দর চোখের উদাস দৃষ্টির মাঝে, পাত্‌লা ঠোঁটের প্রান্তে, নিরন্তর ফুটে থাকা নম্র মিষ্ট হাসির ফাঁকে।

উন্মনা বৌদি' বল্‌লেন—"চলো ভাই ঠাকুরঝি, আমরা ওঘরে যাই—চা বোধ হয় হয়ে গেছে এতক্ষণ।"

রাণীর মতই সুশান্ত তখন গভীরভাবে ভাবছিলেন, হঠাৎ কে ঘটালে এ ঘটন? পুষ্পলতো মোটেই সে রকম ছেলে নয়—লীলুর পরে প্রেম ওর একনিষ্ঠ, গভীরতাপূর্ণ।

পরদিন সকালবেলা। তপনদেবের সোনার আলোয় দিক্‌দিগন্ত ভরে গেছে। সলিলা তখনও গাঢ় ঘুমের কোলে অচেতন। পূবের খোলা জান্‌লা দিয়ে এক টুক্‌রো কাঁচা রোদের মিঠে আলো ওর ঘুমন্ত মুখের ওপর এসে পড়েছে। কেন যেন শান্ত সুন্দর শ্যামল মুখখানি বারে-বারে চম্‌কে উঠ্‌ছে। হঠাৎ ও ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বস্‌ল। অনেকটা নিজের অজান্তেই বলে ফেল্‌লে—"এ কি সম্ভব হ'তে পারে? তিনিতো জানেন না দাদার বদ্‌লীর খবর—তবে?"

আর ভাবলে না সলিলা। সে অপ্রতিভ-দৃষ্টিতে একবার চারিদিক তাকিয়ে ত্রস্তে বিছানা থেকে নেমে দক্ষিণের খোলা জান্‌লায় গিয়ে দাঁড়ালো। ছি, কত বেলা হয়ে গেল ঘুম থেকে উঠতে! দাদা, বৌদি' হয়তো কি ভাবছেন। তখন রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রঙিন সাজে সেজেগুজে আনন্দে মত্ত হয়ে আঁচল ভরে শিউলি ফুল তুল্‌ছে। বাতাসের দোল পেয়ে শিউলি ওদের যেন হাসির ধারায় স্নান করিয়ে দিচ্ছে। বুঝি সৃষ্টি ওদের মায়ের সেবার জন্যেই, শরৎ-রাণীর ছোঁওয়া পেতে। সলিলা এক-দৃষ্টে ওদের পানে চেয়ে নিজের ছেলেবেলার কথাই ভাবছিল।

—"বৌদিদিমণি বল্‌লেন আপনি জেগেছেন কি দেখ্‌তে।"

মালতীর মুখের পানে তাকিয়ে সলিলা একটুখানি প্রাণ নেংড়ানো খুসীর হাসি হাস্‌লে। বল্‌লে—"বড্ড বেলা হয়ে গেছে, না মালতী? ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে বেশ সুন্দর একটী স্বপ্ন দেখলুম।"

—"তা' এখন চলুন, চা খাবেন।"

ভয়ানক মুষড়ে পড়্‌লো সলিলা। সে বড় আশা করেছিল তার মধুর স্বপ্নটী মালতীকে শোনাবে—বৌদি'কে বল্‌তে ওর ভারী লজ্জা করে। কিন্তু মালতীর স্বপ্ন শোন্‌বার কোনই আগ্রহ প্রকাশ পেলে না দেখে, ও অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লে—"তুই যা' মালতী, আমি একটু পরে যাচ্ছি। চা আজ আর খাব না, পাশের বাড়ীতে অঞ্জলি দেব।"

তখন সলিলার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো ভোরের স্বপ্নের মধুর আবেশে। স্বপ্ন কি সত্য? বোধ হয় তা' নয়। স্বপ্ন যদি সত্য হ'ত, তা' হ'লে হয়তো মানুষের জীবনে নিত্য নতুন সুর বাজ্‌তো, চলার পথ হ'ত রঙিন বৈচিত্র্যতায় ভরা।

স্বপ্নের আলোচনায় সলিলা এত বেশী তন্ময় হয়ে পড়েছিলো যে, সুশান্ত বারান্দা অতিক্রম কর্‌লেন ওর পানে একদৃষ্টে তাকাতে তাকাতে তা' সে জান্‌তেও পারলে না। সুশান্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনের ও-পাশে রান্নাঘরে গিয়ে রাণীকে জিগ্‌গেস করলেন—"লীলু একবারও এদিকে আসে নি—কি যে কর্‌ছে ঘরের মধ্যে একা একা তার ঠিক নেই।"

রাণী তখন খুকীর জন্য বোতলে দুধ ভরছিলো। স্বামীর পানে তাকিয়ে ভাবনাভরা অথচ ব্যগ্রকণ্ঠে বল্‌লে—"খবর পেয়েছি বুঝ্‌লে—তুমি যা' বলেছিলে, তাই।"

—"হ্যাঁ, সে বুঝেছি আমি।" উৎসুক হয়ে সুশান্ত পুনরায় বল্‌লেন—"হ্যাঁ, কি হয়েছে বলতো? কেন ঝগ্‌ড়া হ'ল ওদের, সে খবর মালতী রাখে নি?"

—"হ্যাঁ, সবই জানে সে। পূজোর বন্ধে বেড়ানর জায়গা সম্বন্ধে না কি ওদের মতান্তর ঘটেছে।"

—"কেন ?"

পুষ্পল চায় কোনও সৌখীন পাহাড়ের দেশে এ লম্বা ছুটী উপভোগ করতে ; কিন্তু লীলু তা' চায় না। সে চায় দেশে যেতে—বাড়ীতে পূজো হয় কি না।"

—"বাস্তবিক পুষ্পল বড়ই খেয়ালী !" একটু থেমে সুশান্ত আবার বল্লেন—"এ তিনটী পবিত্র, মধুর, আনন্দের দিনে নিজের দেশ ছেড়ে পরদেশে না গেলেই কি চলে না ?"

এমন সময় রাণী উঠানে পায়ের খস্‌খস্ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখ্‌লে সলিলা রান্নাঘরে আস্‌ছে। সে তখনই বোতলে 'নিপ্‌ল' পরিয়ে সুশান্তকে বল্লে—হ্যাঁ গা, দেখেছ, খুকীকে নিয়ে কোথায় গেল? দুধটা এদিকে যে জল হয়ে যাচ্ছে ?"

সলিলা রান্নাঘরে ঢুকে বৌদি'র কথার জবাব দিলে — "হ্যাঁ বৌদি', খুকুমণিকে এইদিকেই নিয়ে আস্‌ছে দেখলুম।" বলে সে একখানি বেতের মোড়ায় বসে সুশান্তর পানে তাকিয়ে বল্লে—"হ্যাঁ দাদা, কাল যে রাত্তিরে বল্লে, এখানে তোমার কোন বন্ধুর বাড়ী পূজোর নেমন্তন্ন আছে—যাবে না ?"

—"হ্যাঁ, রসলপুরে শ্যামলের ওখানে নেমন্তন্নতো আছে, কিন্তু লীলু—"

—"কিন্তু কেন দাদা ?"

"সে যে অনেক দূর গরুর গাড়ীতে যেতে হয়—তুই কি যেতে পারবি ?"

—"খুব পারবো !"

দাদা উৎসাহিত হয়ে প্রফুল্লমুখে সলিলাকে বল্লো— "কাল যাবেতো দাদা ?"

—"আচ্ছা তা' হ'লে গাড়ীর কথা বলে পাঠাই।"

গাঁয়ের সরকারী উঁচুনীচু মেটে সড়ক্ ধরে একখানি ছইঢাকা গরুর গাড়ী ধীর মন্থর গতিতে হেলে দুলে চলেছে। পথে কাঠফাটা রোদের উত্তাপ। বর্ষণসিক্ত রাস্তায় গাড়ীর চাকার দাগগুলো বেশ এক-একটী খাদে পরিণত করেছে। মাঝে মাঝে গাড়ীখানা ওই খাদে পড়ে যাত্রী ও যাত্রিনীদের অসম্ভব রকমের চম্‌কে দিচ্ছিল—আশঙ্কায় বুক ভরে তুল্‌ছিল। বৌদিদির ঘাড়ে পড়ে গিয়ে সলিলা, খিল্‌খিল্ করে শিশুসুলভ হাসি হেসে উঠ্‌ল। বল্লে—"ভিলেজ লাইফ' ভারী সুন্দর না বৌদি' ?"

—"ওই প্রথমটাই সুন্দর ভাই, শেষকালে বড় একঘেয়ে লাগে।"

—"তা' নয়, তুমি আসলে সহরে থাক্‌তে ভালবাস তাই না বৌদি' ?"

—"ওইতো মজা !" বৌদিদি অল্প হাস্‌লে—"দুনিয়ার বৈচিত্র্য মানুষের মনেও ; তুমি পল্লীগ্রাম দেখ নি কি না, তাই।"

সুশান্ত তখন রাস্তার দিকে একাগ্র মনে তাকিয়ে ছিলেন—কে জানে, গাড়ীখানা যদি উল্টেই যায় ?

এমনিভাবে মাইল চারেক পথ যেয়ে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে একটী গ্রামে ঢুকে, শ্যামলদের বাড়ীর সুমুখে এসে গাড়ীখানি থাম্‌ল। মেটেবাড়ী, খড়ের ছাউনি দেওয়া।

গাড়ীর শব্দ শুনে শ্যামলের মা বেরিয়ে এসে ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নাব্‌তে অনুরোধ করলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে করতে সুশান্ত প্রফুল্ল-মুখে বন্ধুর মাকে জিগ্‌গেস করলেন—"হ্যাঁ কাকীমা, শ্যামলকে দেখছি না—কোথায় গেল সে ?"

—"হ্যাঁ বাবা, পরশুদিন সে এক যজমানের বাড়ী শ্রাদ্ধের ডাকে গেছে। কত দুঃখ করলে তোমার সঙ্গে দেখা হয় না বলে।"

—"সে কতদূর ? কবে ফিরবে ?" একান্ত উৎসুক হয়ে সুশান্ত জিগ্‌গেস করলেন।

—"ছয়-সাত ঘণ্টার পথ রেলগাড়ীতে যেতে হয় কি না—আজইতো সকালে ওর ফেরবার কথা। এটী বুঝি তোমার বোন্ ? মুখ যেন একছাঁচে গড়া"—বলে সলিলার চিবুকটা একটু নেড়ে দিলেন। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন—"তা জামাই আসে নি ?"

—"না।" অতি সংক্ষেপে সুশান্ত জবাব দিলেন।

সকলে ভিতরের অঙ্গিনায় প্রবেশ করলেন। বেশ তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। চিত্র-বিচিত্রিত আল্‌পনা আঁকা

আঙ্গিনা। পাশেই পূজার মণ্ডপে দেবীর সহাস্য সুন্দর মুখখানি দেখা গেল। যেন ব্যগ্রতায় উদ্‌গ্রীব—ভক্ত মনের কুঞ্জবনের পুষ্প-অর্ঘের আকাঙ্ক্ষায়। পল্লীগ্রামে ঘরে ঘরে পূজার্চ্চনা; নিতান্তই আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠান।

শ্যামলের বাবা পূজায় বসেছেন। পুত্রবধূ সন্ধি-পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। মণ্ডপে উঠে দেবীর বামপাশে সলিলা ও রাণীকে বসিয়ে শ্যামলের মা ডানপাশে সুশান্তকে বসতে বল্‌লেন। বধূ মাথার কাপড় ঈষৎ সরিয়ে সলিলা ও রাণীর পানে চেয়ে একটু স্মিতহাসি হাস্‌লে।

সন্ধি-পূজার আর মোটেই দেরী নেই। ছোট ছেলেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে ঘড়ির কাঁটার পানে তাকিয়ে আছে। জমীদার বাড়ীর তোপ্ পড়লেই পূজা সুরু হবে। দশ মিনিট পরে তোপ্ পড়লো। বিরাট নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টা, শাঁখের মধুর ধ্বনিতে উৎসব-প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। ধূপ ধুনা, ফুল-চন্দনের গন্ধে কুটীরখানি ফুল্লময় হয়ে উঠ্‌ল। হ্যাঁ, বিশ্বজননীর অর্চ্চনা বটে!

—"এস না ভাই, চলে এস। পূজা-মণ্ডপে সবারই অবাধ গতি; এখানে আর মেয়ে-পুরুষের কোনও ভিন্নতা নেই।"

শ্যামল মণ্ডপে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ফিরে একটী যুবকের পানে চেয়ে হাস্‌লে।—"ছেলেবেলার বন্ধু, বুঝ্‌লে মা। পথে দেখা হ'ল, টেনে নিয়ে এলুম।"

এসময় দেবীর মুখভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে মণ্ডপ-শুদ্ধ সকলে এত ব্যস্ত যে, কারো কাণে শ্যামলের কোনও কথা পৌছল না। কিন্তু কেন যেন সলিলা বারবার বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল—চিত্ত ওর কিসের ব্যকুলতায় উন্মনা হয়েছিল।

শ্যামল বন্ধুটিকে নিয়ে মায়ের ডানদিকে, অর্থাৎ পুরুষের দলে, সুশান্তর অনেকটা পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। সলিলা শ্যামলের কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়ে সাম্‌নে ছেলেদের পানে একবার তাকিয়ে দেখেই চম্‌কে উঠ্‌লো সে ভীষণভাবে। নবাগত যুবকটী তখন বিস্ময়-অভিভূত-দৃষ্টিতে সলিলার পানে চেয়েছিল। যেন ওরা উভয়েই চায়, এই মাত্র দেড়-হাত দূরের ব্যবধান ভেঙ্গে দিয়ে এই রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে।

ঘরের পিছনে ফল-ফুল, শাক-শব্জীর বাগন একটী জাম-গাছের নীচে বেশ স্নিগ্ধ ছায়ায় একটী তরুণ ও তরুণী পাশাপাশি বসেছিল। দেখ্‌লে মনে হয়, ওরা যেন অবিবাহিত।

প্রেমিক-প্রেমিকা—দু'জনেরই চিত্ত ব্যাকুল, ভালবাসার পিয়াসে।—"কই বল্‌লে নাতো এখানে কেমন করে এলে?"

তরুণের সুন্দর আয়ত দৃষ্টি অনিমেষে নিবদ্ধ তরুণীর সলজ্জ আভায় বিকশিত আননখানির 'পরে। "—তুমিওতো বল্‌লে না? বলো আগে।"

—"কেউ যখন বল্‌বে না তোমরা, তবে আমিই বলি।"

একটী করবী ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বেশ গম্ভীরভাবে রাণী বল্‌লে—"মা টেনে আন্‌লেন বুঝ্‌লে গো—তাইতো তোমার শিলং পাহাড়—" সে আর হাসি সংবরণ করতে কিছুতেই পারলে না।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

মুক্তি

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য, বি-এ

মলয়পুর একটা বেশ বড় গ্রাম। জমিদারও খুব বড়। জমীদারীর আয় বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার কম হইবে না। পাড়াগাঁয়ে এ সামান্য আয় নহে। জমীদার বৃদ্ধ রামতারণ দত্ত অতি নিরীহ, শান্তিপ্রিয় লোক। গ্রামের জমীদার হইলেও তিনি গ্রামের কোনো কথায় বা কাজে থাকিতেন না।

তাঁর একমাত্র পুত্র মহেন্দ্র। শরীর ও মনে বাপের ঠিক্ বিপরীত। সুশ্রী চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য। অমন চেহারাখানির দিকে কেন যে মা সরস্বতী একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না, ইহা ভাবিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। মহেন্দ্র ছেলেবেলা হইতেই নিয়মিতভাবে পরীক্ষায় ফেল্ এবং অনিয়মিতভাবে থিয়েটার করিত। বাপ ছেলেকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং বর্ষে বর্ষে ঠিক্‌ই সংবাদ পাইতেন যে, পুত্রের ফেল্ করার কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না। এইভাবে খানিকদূর চলিল। অতঃপর বর্ষে বর্ষে কলিকাতায় যাইয়া স্কুলের হেডমাষ্টারকে অনুরোধ এবং সেক্রেটারীর সহিত কলহ করা তাঁহার পোষাইবে না ভাবিয়া মহেন্দ্রকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া দেশে আনাইয়া বলিলেন "আর তোমার স্কুলে গিয়ে কাজ নেই ; বিষয়-আসয় বুঝে নাও।"

মহেন্দ্র আনন্দে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল। পরদিন হইতেই সে প্রাতঃকালে তাহাদের কাছারীতে গিয়া জমীদারীর কাজ-কর্ম্ম বুঝিতে লাগিল। কিছুদিন গেল। তারপর তাহার জমীদারী বুঝা হইয়া গেল ; বাপও চোখ বুজিলেন।

মহেন্দ্র এখন বড় কড়া জমিদার। গ্রামে কাহারও 'টুঁ' শব্দ করিবার যো ছিল না। ঐ সুন্দর কান্তিমান বালকটি—বিশেষতঃ, আবার রামতারণবাবুর পুত্র—কেন যে এত নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন, বর্ষীয়ান প্রজারা অশ্রুসিক্ত চক্ষে তাহাই ভাবিত। সেই গ্রামে বাঘ ছিল না, থাকিলে বোধ হয় গরুর সঙ্গে এক ঘাটেই জল খাইত। বাঘের মত অনেক প্রজা, যাহারা স্বর্গীয় জমীদারকে কখনো গ্রাহ্য করে নাই, মহেন্দ্রের কঠোর শাসনে তাহারাও ধরাশায়ী হইল। এমনি প্রতাপ। বড়বাবু, অর্থাৎ মহেন্দ্র অতশত আইন বুঝিতেন না, সেধারও ধারিতেন না। প্রয়োজন হইলে দরোয়ান দিয়া অবাধ্য প্রজাকে কাছারীতে ডাকিয়া আনাইয়া ঘা কতক দিয়া ছাড়িয়া দিতেন ; হয়ত বা ঘর হইতে ঘটী-বাটী পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া বাহির করিতেন। জমীদারী রক্ষায় এই কায়িক শক্তি যে বিশেষ আবশ্যক, ইহা উপলব্ধি করিয়া বড়-বাবু রীতিমত কুস্তি করিতেন। সকালে উঠিয়া অন্ততঃ সাড়ে তিনশ' ডন্ দিয়া, ও আধমণী মুগুর জোড়াটা দুশ'বার সঞ্চালিত করিয়া প্রচুর পরিমাণ ছোলা ও দুধ খাইয়া তবে বাহির বাড়ীতে আসিয়া বসিতেন।

বড়বাবুর থিয়েটার করার সখ বাল্যকাল হইতেই ছিল। বাপ বর্ত্তমান থাকাতে এ পথে একটা বিশেষ অন্তরায় ছিল। এখন সেই সখ তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় পাইয়া বসিল। এ পথে বিশেষ সাহায্য করিত তাঁহার এক বন্ধু নীরোদ। তাহার জীবনীও বড়বাবুর সহিত আশ্চর্য্য-রকম মিলে। সেও বড়লোকের এক ছেলে—বাপ কলিকাতার একজন বড় এটর্নী। সেও বন্ধুর মত বাল্যেই সরস্বতীর সহিত হিসাব-নিকাশ মিটাইয়া অভিনয়-কলার উৎকর্ষ-সাধনে মনোযোগ দেয়। স্বভাব-চরিত্র, রীতিনীতি একই প্রকারের—যেন ওপার হইতে আগে বলা-কহা করিয়া এ জগতে দু'জনে বন্ধু হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের ক্লাবের এই নীরোদই ছিল শিক্ষক। সে গান গাহিত, গাওয়াইত, নাচিত, সখীদের নাচাইত ; নিজে একটু-আধটু 'উত্তেজনা'ও

গলধঃকরণ করিত এবং বড়বাবুকে করাইত। আর প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া সহরের বাজার হইতে নূতন নূতন অভিনয়ের ধারা নিজেদের দেশে আমদানী করিত।

বড়বাবু এই থিয়েটারের আখড়াটা নিজের গৃহেই করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা ইচ্ছা করিয়াই না করিয়া বাড়ী হইতে একটু দূরে লোকালয়ের প্রান্তে একটা মনোমত নির্জ্জন জায়গায় আখড়া-ঘর তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সারাদিন প্রজা ঠেঙ্গাইয়া ক্লান্ত হইয়া আখড়ায় গিয়া বসিতেন এবং কোন কোনদিন রাত দু'টা-তিনটা পর্য্যন্ত চাৎকার করিয়া আসিতেন। সাধারণতঃ,রাত্রি বারোটা একটা পর্য্যন্ত আখড়াই চলিত—আসন্ন কুরুক্ষেত্রের জন্য বড় বড় বীরগণ অনর্গল গলাবাজী করিতেন। এবং কখনো কখনো বালক নর্ত্তকী-দের চরণ নূপুর নিক্কন পাড়ার নৈশ নীরবতা মুখরিত করিত। নীরোদ নিজে একগাছি বেত লইয়া সখীদের সলীল চরণের দিকে চাহিয়া তালে তালে বলিত, "এক দুই তিন, এক দুই তিন, এক দুই তিন, দুই তিন চার—" কেউ অর্গ্যান, কেউ তবলা সঙ্গত করিত, কেউ হাটু বাজাইত।

আখড়া-ঘরের ঠিক গায়েই পরিতোষ মণ্ডলের বাড়ী। বেচারী তিন বৎসরের খাজনা বাকী ফেলিয়া এই উপদ্রব নীরবে সহ্য করে। কি করিবে? একেত তিন বৎসরের খাজনা বাকী, তারপর বড়বাবুর মত জমীদারকে কিছু বলার জন্য যে কয়টা মাথার প্রয়োজন, তাহা পরিতোষের ছিল না। শুধু কোলাহলটাই উপদ্রব তাহা নহে, আরো অনেক কিছু ছিল। হয়ত রাত্রি তখন একটা, নীরোদ-বাবু জানালা দিয়া হাক্ দিলেন, "ও হে পরিতোষ?"

ঘর হইতে পরিতোষ বাহির হইয়া বলে, "আজ্ঞে হুজুর!"

"ও হে, আমার এই গেলাসটা মেজে এনে দাওত জল খাবো?"

মেয়ে মুক্তি দাওয়ায় বসিয়া থাকে। সে বলে, "তুমি ঘুমোও না বাবা, আমি মেজে এনে দিচ্ছি।"

কাজে তাহার আলস্য নাই। সে সানন্দে রাতদুপুরে পুকুর হইতে গেলাসটা ভাল করিয়া মাজিয়া আনিয়া দেয়।

পরিতোষের পনেরো বছরের কচি মেয়ে মুক্তি বাল্যে বিধবা হইয়া অবধি বাপের কাছেই আছে। এই মুক্তির যাহা যাহা ছিল, তাহাতে সে কোন বড়ঘরে জন্মাইলেও কিছুমাত্র বেমানান হইত না। আর রূপ দেওয়ার মালিক, মেয়েটা যে এক নিরক্ষর গ্রাম্য চাষার ঘরে জন্মাইতেছে ইহা না বিবেচনা করিয়া রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মেয়েটি সারাদিন খাটে। সকালে উঠিয়াই ঘর, দাওয়া, উঠান নিকায়; তারপর উঠানের উনানে রাশীকৃত ধান একলাই সিদ্ধ করিতে লাগিয়া যায়। দুপুরবেলা বাসনগুলো মাজিয়া দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরটা বিছাইয়া দু'টি ভাইবোনকে লইয়া নানারকম ছড়া সুর করিয়া শোনায়; কখনো বা একখানা ছিন্নপত্র উপন্যাস লইয়া শুইয়া শুইয়া পড়ে। সন্ধ্যাবেলা হাঁসগুলিকে পুকুর হইতে ডাকিয়া আনিয়া ঘরে তুলে। সে যে বিধবা,তাহা কাহারও মনে হইত না। এইত সেদিন, মাত্র বছর তিনেক পূর্ব্বে পরিতোষ ঢোল-সানাই বাজাইয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে। বিবাহের সময় দেওয়া চওড়া লালপেড়ে কাপড়খানা আজও উঠানের দড়িতে শুকায়; পেঁড়া-বাক্সটা ঘরের কোণে পড়িয়া আছে; এগুলির দিকে চাহিয়া পরিতোষের বুকটা ফাটিয়া যায়—মুক্তির কাছে অসংবরণীয় অশ্রু লুকাইবার জন্য সে তখন ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া যায়।

দেখিলে মনে হইত, কই, ওই চাষার মেয়েটার উপরত বৈধব্যের দাগ তেমন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছে না? মনে হইত,হয়ত বা বৈধব্যের চরম দুঃসংবাদ আজও তাহার কাছে সঠিক পৌছায় নাই, কিংবা হয়ত সে তাহা দুঃসংবাদ বলিয়াই গ্রহণ করে নাই। মনের ঘরে তাহার যে এতটুকু ফাঁক নাই! সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও যে কার্য্যারম্ভ। আর কাজ করিবার কি সরল স্বচ্ছন্দভাব! কোথাও যেন কাজের এতটুকুও ভার নাই—সব কাজই যেন তাহার কাছে লঘু হইয়া যায়। বাসন মাজিতে

মাজিতে ছড়া কাটে, ধান ভানিতে ভানিতে হয়ত বা গান গাহে। এমন কি, জ্যোৎস্না-রাত্রে ভাইবোনের সাথে উঠানে কাণামাছি খেলিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। চাষ ক'বছর ভাল হয় নাই। তারপর সাম্‌নের পৌষ কিস্তিতে বাকী খাজনা না মিটাইলে আর রক্ষা থাকিবে না এই ভাবনায় আকুল পরিতোষ দাওয়ায় আসিয়া বসিলে, মুক্তি আগে ভাত বাড়িয়া বাপকে দু'মুঠা খাওয়াইয়া দেয়। কোন কোনদিন ঘরের কুলুঙ্গী হইতে প্রায় রামচন্দ্রের বয়সী-ই একখানা শতচ্ছিন্ন রামায়ণ বাহির করিয়া সুর করিয়া বাপকে শোনায়। একটু শক্ত কথার অর্থ বা শক্ত জায়গার তাৎপর্য্য যথাশক্তি বুঝাইয়া দেয়। 'অঙ্গদ-রায়বার' পড়িতে পড়িতে মুক্তি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। এমন কি, নেহাৎ পাঁচ ছয় বৎসরের খুকীর মত হাসিয়া দাওয়ায় গড়াগড়ি দিতে থাকে। পরিতোষও সব দুঃখ ভুলিয়া মেয়ের এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করে। চমৎকার মুক্তির গলাটি! তার মুখে রামায়ণ শুনিতে কোনো কোনোদিন পরিতোষের বাড়ীতে লোকের ভীড় হইয়া যায়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন পরিতোষ ছোট দু'টী ছেলেমেয়েকে লইয়া শুইয়া পড়িত, মুক্তি তখন অন্ধকারে দাওয়ার উপর বসিয়া বড়বাবুদের আখড়াই শুনিত।—রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিতে তাহার বড় ভাল লাগিত। রাত্রি বারোটা একটা বাজিয়া যায়, মুক্তির কিন্তু নিদ্রা নাই। সে ঠিক দাওয়ার উপর বসিয়া আখড়াই শুনে। অভিমন্যু-পতন বইখানার আখড়াই হইতেছিল। বিদূষকের কথায় সে দাওয়ায় বসিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে—এতো জোরে হাসে যে, সে হাসি বড়বাবু ও নীরোদের কানে আসে। আবার অভিমন্যু-পতনের পর শ্রীকৃষ্ণের নিকট নববিধবা বধূ উত্তরার করুণ গানখানি শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ অন্ধকারে ছলছল করিয়া উঠে!

অভিনেতারা জানিতেন, তাহাদের অভিনয় একজন অন্ধকারে বসিয়া শুনিতেছে। অভিনেতারওত সাধনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু শ্রোতা হইবার এমন সাধনা বড়-একটা চোখে পড়ে না। পৌষের দুরন্ত শীতেও অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত মুক্তি বাহিরে গায়ে পাতলা কাপড়টা জড়াইয়া বসিয়া থাকে। ওই একাগ্রচিত্ত শ্রোতাটীর প্রশংসালাভ করিবার জন্য সকলেই সকলের নৈপুণ্য যথাসাধ্য দেখাইবার চেষ্টা করিত। এমন কি, স্বয়ং বড়বাবু পর্য্যন্ত জয়দ্রথ-বধের শপথ করিয়াই জানালা দিয়া ডাকেন, "মুক্তি, বসে আছিস্ না কি?"

দাওয়া হইতে উত্তর আসে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"অর্জ্জুন এই জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করলে, কি রকম হয়েছে রে?"

"আজ্ঞে, বেশ! উত্তরাকে গানখানা আর একবার গাইতে বলুন না।"

আখড়া-ঘরে একটা হাসির কোলাহল পড়িয়া গেল। নীরোদ জড়িত-স্বরে বলিয়া উঠিল, "গাও হে উত্তরা, আবার গাও।"

একজন বলিয়া উঠিল, "দারোগাবাবু এসেছেন, যাত্রা আবার গোড়ার থেকে সুরু কর। যাও হে মুরারী, সখী উত্তরারে মোর দেহ পাঠাইয়া।"

স্বয়ং বড়বাবু বলিয়া উঠেন, "ওরে রেমো, গানটা আর একবার গেয়ে যা'। ভাল ক'রে গাইবি।"

আখড়ার বাবুদের যাবতীয় কাজ মুক্তিকেই করিতে হইত। মুক্তিরও তাহাতে এতটুকু অনিচ্ছা বা আলস্য ছিল না। জল খাইবার গেলাস মাজিয়া আনাত তুচ্ছ কাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলাবাজী করিয়া বাবুদের চা-তৃষ্ণা পাইলে, যত রাত্রেই হোক্, মুক্তি সানন্দে তাহার উঠানের উনানে জল গরম ও চা তৈয়ারী করিয়া ঘরের দোরের পাশে কেটলিটা ঠেলিয়া দিয়া যাইত। তাহাকে সকল দিন বলিতেও হয় না। আসন্ন কুরুক্ষেত্রে বড় বড় কৌরব পাণ্ডব বীর চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিলে মুক্তির মনে হয়—আহা বাবুরা কি চেঁচানো না চেঁচাচ্ছেন! জানালার ধারে আসিয়া সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "চা ক'রে দেবো বড়বাবু?'

বড়বাবু বলিয়া উঠেন, "দে, বেশ কড়া ক'রে।"

মুক্তি চা তৈয়ারী করিয়া দেয়। তামাক সাজিয়া কলিকাটী গড়-গড়ার উপর বসাইয়া দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসে। এমনি ফরমাইস সে রাতের পর রাত খাটে। শুধু তাহাই নহে, ইদানীং মুক্তির আরো একটা বড় কাজ বাড়িয়াছে। বড়বাবুর হুকুম, মাঝে মাঝে ঘরটা ঝাঁট্ দিতেও হইবে। মাঝে মাঝে কেন, প্রতিদিনই ঝাঁট্ দিতে সে প্রস্তুত। কাজত সে চাহে—তাহাদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র সংসারটায় যে তাহার মত পর্য্যাপ্ত কাজ নাই। বড়বাবু বলিলেন, "ঘরটা মাঝে মাঝে ঝাঁট্ দিয়ে পরিষ্কার করে দিস্, মাইনে পাবি।"

মাথা নীচু করিয়া মুক্তি বলে, "আমি রোজই ঝাঁট্ দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিতে পারি—মাহিনা চাই না বড়বাবু।"

নীরোদ বোধ হয় একটু রসিকতা করিয়াই বলিল, "তোর সঙ্গে কি আমাদের টাকারই সম্পর্ক, কি বলিস্ রে মুক্তি?"

মুক্তি সঙ্কুচিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীরোদের পাকস্থলীতে তখনো একটু 'পদার্থ' ছিল। মুক্তির দিকে চাহিয়া আর একটু রসিকতা করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। বলিল, "এই ঘরের চাবি—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব—তোর-ই হাতে রেখে দিলুম।"

সেইদিন হইতে আখড়া-ঘরের চাবি মুক্তির কাছে থাকে। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, রোজই রাত্রে বড়বাবু ও নীরোদ ঘরে ঢুকিয়া দেখেন, ঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মেঝের উপর কেমন সযত্নে সতরঞ্চিখানি পাতা রহিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সখীগণের চরণ নূপুর, গাণ্ডীবী ও অন্যান্য বীরগণের বাঁখারীর তীরধনু, তবলা এবং অন্যান্য জিনিষগুলি কেমন নিপুণভাবে ঘরের কোণে গুছানো। কেরোসিন ল্যাম্পটা কেমন পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে করিয়া ঘরের দেওয়ালে জ্বালানো থাকে।

পরিতোষের কিন্তু ইচ্ছা নয় যে, মুক্তি এই ভূতের বেগার খাটে। সমস্তদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মেয়েটা যে একটু বিশ্রাম পাইবে, বাবুদের অত্যাচারে তাহাও হইবার যো নাই? কেন, কিসের জন্য? এত খাটুনীর কি কোনো পুরস্কার নাই?

মেয়েকে ডাকিয়া পরিতোষ বলিল, "কাছারীতে গেছলুম। বড়বাবু নায়েব-মশায়কে ডেকে বলে দিলেন, 'এক পয়সাও খাজনার সুদ যেন আমার রেহাই করা না হয়'।"

মুক্তি বলিল, "আমি তার কি করবো?"

পরিতোষ বলিল, "বড়বাবুত আখড়ায় আসবেন। এলে একবার তুই হাতে পায়ে ধ'রে দেখ্ না? ওঁরত কত খেটে দিস্, কথা আর রাখবেন না? তা' না হ'লে আর কোনো উপায় নেই। জমীটা অন্য প্রজাবিলি করলে যে, না খেয়ে মরবো মুক্তি!"

বড়বাবুর কাছে এই আর্জ্জি জানাইতে মুক্তির ইচ্ছা করিতেছিল না। তিনি হয়ত ভাবিবেন, ওই খাজনাটা রেহাই করিবার জন্যই সে অত খাটিয়া দেয়। কিন্তু বাপের মুখের দিকে চাহিয়া সে স্থির করিল, আজই বড়বাবুকে ও-কথা বলিবে।

মহেন্দ্র আখড়ায় আসিলে মুক্তি দোরের কাছে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু বক্রদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দেখিলেন, পরে বলিলেন, "ওখানে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

মুক্তি নীরবে তাহার মলিন কাপড়ের অঞ্চলটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে জড়াইতে লাগিল। বড়বাবু বলিলেন, "কি বল্‌বি, বল্?"

বলিতে শতবার মুক্তির কণ্ঠে কথাটা আট্‌কাইয়া যাইতেছিল। বলিল, "আপনার কাছে আমার আর্জ্জি এই যে, আমাদের বাকী খাজনার সুদটা—"

হাসিয়া বড়বাবু বলিলেন, "রেহাই? কেমন, এই ত? তা'—আচ্ছা, তুই যখন বলছিস্, তখন দেখি, না হয়, তাই

করা যাবে। কিন্তু রেহাই দিতে পারি,যদি—তুই—ইয়ে—"

ঘাড় নীচু করিয়াই মুক্তি বলিল, "হুজুরের যা' আদেশ হবে, আমি তাই ই করবো।"

বড়বাবুও মাথা নীচু করিয়া একটু ভাবিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "তা'— আচ্ছা।"

মুক্তি চলিয়া গেলে, বড়বাবু একাকী ভাবিতে লাগিলেন। তখনো আখড়ায় কেউ আসে নাই। সতরাঞ্চর উপর বসিয়া ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, সব জিনিষের মধ্যেই মুক্তির নিপুণ হস্তের পারিপাট্য কেমন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে! বেশ মেয়েটা! চাষার ঘরে এমন রত্নও থাকে! তারপর উঠিয়া ঘরের কোণে একটা কাঠের আলমারী হইতে এক গেলাস মদ ঢালিয়া গলাধঃকরণ করিলেন।

আখড়াই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বড়বাবু ধনঞ্জয়ের ভূমিকা লইয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং ওই ভূমিকার প্রতি বীতরাগ হইয়া উপবনে উত্তরার সহিত একটি প্রেম-দৃশ্যের লোভে ধনঞ্জয়ের পুত্রের ভূমিকা—অর্থাৎ খোদ্ অভিমন্যুর ভূমিকা লইয়াছিলেন। আজ বড়বাবুর চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ। তাহার উপর জানিতেন, জানালার সম্মুখে দাওয়ায় বসিয়া একজন তাঁহার অভিনয় দেখিতেছে। তাই তিনি আজ তাঁহার অন্তরের কৃত্রিম অকৃত্রিম সমস্ত আবেগ-ই অভিনয়ের মধ্যে নিঃশেষ করিলেন। জানালার ধারে যাইয়া বলিলেন, "কি রকম লাগলো রে মুক্তি?"

অন্ধকার দাওয়া হইতে তৎক্ষণাৎ জবাব হইল, "ভাল।"

আজকাল শুধু বড়বাবু নয়, এমন যে কলা-শিক্ষক নীরোদ, সেও পার্ট করিয়া মুক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, "কেমন হচ্চে রে মুক্তি?" মুক্তির মুখে ওই ক্ষুদ্র প্রশংসা-বাণী 'ভাল' কথাটা না শুনিলে পার্ট করিয়া কেমন আনন্দ হয় না। মুক্তি হাসিয়া বাপকে বলে, "আমার আর একটা কাজ বাড়লো বাবা। বাবুদের আখড়াই শুনে খালি 'ভাল' বল্‌তে হবে। নইলে রেহাই নেই।" বলিয়া মুক্তি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। পরিতোষও মেয়ের মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া হাসে।

সেদিন খুব সম্ভব একটা বিশেষ আখড়াই বা এমনি কিছু একটা ছিল। সন্ধ্যা হইতেই আখড়া-ঘর সরগরম। কলিকাতা হইতে নীরোদের কতকগুলি কলাবিদ বন্ধু আসিয়াছে, এবং তাহাদের জন্য বিশেষ আহার্য্য এবং পানীয়েরও ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বয়ং বড়বাবু ও নীরোদ তাঁহাদের চক্ষু বেশ রক্তবর্ণ করিয়াছেন; কারণ, পাকস্থলীর উত্তেজনা না পাইলে অভিনয়ে হৃদয়ের উত্তেজনা পাওয়া যায় না। আজ তাঁহাদের অভিনয় খুবই ভাল করিতে হইবে। ঘরে এতগুলি আমন্ত্রিত নটকুল-চূড়ামণি! তাহার উপর মুক্তিকে বলা আছে, আজ পূর্ণ আখড়াই। সে সন্ধ্যার আগেই ঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া ঘরের কাজ-কর্ম্ম চুকাইয়া ছোট ছোট ভাইবোন্‌কে লইয়া দাওয়ায় প্রস্তুত হইয়া আছে।

উপবনের দৃশ্য হইতেছে। চারিদিকে বালক-সখীরা গেঞ্জি গায়ে এবং নূপুর পায়ে দেহলতা লীলায়িত করিয়া নাচিতে সুরু করিয়াছে। মধ্যস্থলে একখানা চেয়ারে পূর্ণ-বয়স্ক অভিমন্যু রক্ত-নয়নে বসিয়া। নীরোদ বেত্রহস্তে বসিয়া আছে, এবং গানের ও নাচের তালে তালে হারমোনিয়ম, বেহালা ও তবলা পুরাদমে চলিয়াছে। অভিমন্যু রীতিমত হেলিতেছেন, দুলিতেছেন—স্থির হইয়া বসিবার শক্তি নাই। একটা ফুলের মালা লইয়া প্রেয়সী উত্তরার অবতীর্ণ হইবার কথা, কিন্তু পতি-সোহাগিনী বধূ উত্তরা স্বামীর সম্মুখে বিড়ি খাইতে পারিবে না বলিয়াই আড়ালে কোথায় সেকাযটা সারিয়া লইতেছিল। নীরোদ ঘন-ঘন শীস্ দিতেছে, সকলে, উত্তরা উত্তরা করিয়া চীৎকার করিতেছে—কিন্তু উত্তরার আর সময় হয় না।

আত্মহারা অভিমন্যু মনোরাজ্যে তখন হা-উত্তরা যো-উত্তরা করিতেছেন। এমন জ্যোছনা-শুভ্র উপবন বিফল হইতে বসিল! জানালার দিকে চোখ যাইতেই নজরে পড়িল, সেই অস্পষ্ট আলোকে একখানি সুন্দর কৌতূহল-ভরা মুখ তাহার দিকে স্থিরভাবে তাকাইয়া আছে। প্রেমের অনুপ্রেরণা তখন এতই প্রবল যে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"এস উত্তরা আমার, ওখানে কেন, ভেতরেই এসো না। আজ রেমো ব্যাটাকে তাড়িয়ে সেই স্থলে তোমাকেই—"

নীরদ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বন্ধুগুলি বিকট হাসিয়া জানালার দিকে চাহিল। বড়বাবুও চক্ষু বুজিয়া একটু প্রেমের হাসি হাসিলেন। বলিলেন, "বুঝলে অর্জ্জুন, ওকে যদি পাইত এ সিন্‌টা একেবারে চুটিয়ে করতে পারি। আখড়ায় আবার একটা বিকট হাস্য কোলাহল হইল।

হঠাৎ ঝনাৎ করিয়া প্রচণ্ডভাবে আখড়া-ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং মুক্তি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। একেবারে ঘরের মাঝখানে বড়বাবুর ঠিক্ সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি বল্‌লেন, বড়বাবু ?"

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত বড়বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুক্তির মুখের দিকে চাহিয়া মাথাটা নীচু করিলেন। পরে জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি—তুমি—"

আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রদীপ্তচক্ষে মুক্তি বলিল, "কি বল্‌লেন শুনি ?"

বড়বাবু ততক্ষণে সরিয়া দোরের কাছে। অসংলগ্ন ভাষায় বলিবার চেষ্টা করিলেন, "না, আমি তোমাকে, আমার ভুল, মনের—"

তীক্ষ্ণস্বরে মুক্তি বলিল, "যত সব মোদোমাতাল ছোট লোকের মরণ! কাল যদি তোমাদের ছ্যাদ্দোর আখ-ড়াইয়ে আগুন জ্বেলে না দিত বাপের মেয়ে নই! ভদ্দর-লোকের ঘরে এমন নেশাখোর ছোটলোকও এসে জন্মায় !"

কথাগুলি যাঁহাদের উদ্দেশে বলা হইল, তাঁহারা কিন্তু ততক্ষণে বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। সতরঞ্চির উপর নীরোদের নিঃশেষিত চায়ের কাপটা উল্টাইয়া রহিয়াছে। কেবল একটা অল্পবয়স্ক সখী একপাশে বসিয়া তাহার পায়ের ঘুঙুর খুলিতেছে। তাহা ভিন্ন আর কেহই ঘরে নাই।

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য

সংশোধন

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত

মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করেও শিশির বিভার সঙ্গে একবার দেখা করে' যাওয়ার লোভটাকে কোন রকমেই সাম্‌লাতে পারলে না। আজ বন্ধু নীরুর বিবাহ। সে আনন্দোৎসবে যোগদান না করা যে কতবড় অন্যায়, তা' তার ভালরকমই জানা ছিল; তাই সন্ধ্যাবেলা সে তার বিদ্রোহী মনটাকে বাঁধবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, তার শ্রান্ত চরণ কোন্ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তার ললাটে পরাজয়েরই টীকা অঙ্কিত ক'রে দিয়ে গেছে।

নীরুর বাড়ী যাবার একাধিক পথ থাক্‌লেও যে পথ দিয়ে যেতে বিভার বাড়ী পড়ে অন্যমনস্ক হয়ে শিশির সেই পথ দিয়েই চল্‌তে লাগ্‌লো। এখন বিভার বাড়ীর সান্নিধ্যে এসে সে একটু সঙ্কটে পড়লো—একবার দেখা করে' যাওয়া উচিত কি না? খানিকক্ষণ দরজার সাম্‌নে অপেক্ষা করে' সে সহসা সজোরে দরজায় করাঘাত করলে। ভেতর থেকে বীণানিন্দিত কণ্ঠের আওয়াজ এলো—"কে? কে গো?"

শিশিরের বুকটা যেন অপরাধীর মত বারবার স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌লো। মনে হ'ল সহসা যেন ঝড় বয়ে গেল। মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করে' সে সাহসে ভর দিয়ে বল্‌লে—"দরজাটা খুলে দাও, আমি শিশির।"

ক্ষণকালের মধ্যেই দ্বার উদ্ঘাটিত হ'ল। শিশির দেখ্‌লে দুয়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ফিক্‌ফিক্ করে হাসছে বিভা।

শিশির একটু বিব্রত হ'য়ে উঠে বল্‌লে—"হাস্‌ছ যে?"

বিভা কণ্ঠস্বরে একটা উন্মাদনা মাখিয়ে উত্তর দিলে—"কাল যে বলেছিলে আজ আর আসতে পারবে না, বিয়ে-বাড়ীতে যাবে, তাই হাসছি।—এইটেই কি শেষে বিয়ে-বাড়ী হ'ল?

শিশিরের মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। সে প্রত্যুত্তর করলে—"না, বিয়ে-বাড়ী যাবার পথে একবার দেখা করতে এলুম। রোজ আসি, আজও তাই একবারটী না এসে থাক্‌তে পরলুম না।"

বিভা—"কেন মন কেমন করছিল না কি?"

শিশির—"ঠিক্ তা' না হ'লেও, একা একা কি করছ তাই দেখ্‌তে এলুম।"

বিভা—"যাই হোক্, এসেই যখন পড়েছ, তখন ভেতরে এস—বাইরে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ থাকবে?"

বিভার কথা শেষ না হতেই শিশির ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বিভার পাশে এসে দাঁড়াতেই বিভা একটু সরে গিয়ে বল্‌লো—"আচ্ছা, কি মনে করে' বিয়ে-বাড়ীর সন্দেশ-রসগোল্লা ফেলে এখানে এসে উঠ্‌লে বলো ত?"

দালানের আল্‌নায় নিজের ছড়িটা ঝুলিয়ে রেখে শিশির আবিষ্ট চোখে বিভার মুখের দিকে চাইতে চাইতে আত্মহারা হয়ে অকস্মাৎ বলে' ফেল্‌লে—"হয় ত এখানে আরো মিষ্টি কিছু আছে, তাই।"

বিভার সরম-রাঙা মুখখানা আপনা-আপনি অবনত হ'য়ে পড়ল। পলকের মধ্যে সে আপনার অবস্থাটাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে—"হ্যাঁ, তোমায় বোধ হয় এখুনিই যেতে হবে, না? আচ্ছা, তা' হ'লে চা-টা আগেই তৈরী করে দিই, কেমন?"

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই বিভা উনানে চাপান কড়াটী নামিয়ে চায়ের কেট্‌লিটা চাপিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"পরের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো না। দিন দিন নতুন হচ্ছ না কি?"

তার নিত্যকার অধিকার-করা টুলটা দখল করে' বসে' শিশির বল্‌তে লাগ্‌ল—"সত্যি! রোজ রোজ এখানে

এসে এসে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, না এসে আর কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌লুম না।"

একটা সুমধুর হাসির মাধুরী ছড়িয়ে বিভাও বলে' উঠ্‌ল—"তুমি যে না এসে থাক্‌তে পার্‌বে না তা' আমি বুঝেছিলুম।"

শিশির জিজ্ঞাসা করলে—"কেমন করে'?"

বিভা উত্তর দিলে—"তা' জানি না। তবে মনে হচ্ছিল, তুমি আস্‌বেই, না এসে থাক্‌তে পার্‌বে না।"

বিভার কথায় শিশির যেন একটু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বিভার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে এক নিশ্বাসে বলে' ফেল্‌লে—"ও রকম মনে করে' কিন্তু খুব ভাল কাজ কর নি।"

উৎসুক হ'য়ে বিভা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কারণ?"

শি—"যদি না আস্‌তুম, তা' হ'লে কতটা ঠক্‌তে হ'ত বলো ত।"

বি—"না এলে তবে ত!"

শিশির ইচ্ছা করেই যেন পরাজয়টা মেনে নেবার ছলে বল্‌লে—"হবেও বা! দেখ্‌ছি জোতিষীদের অন্নও তোমরা মার্‌লে। এবার থেকে যে যার ঘরে ঘরেই ভবিষ্যতের ফলাফল জান্‌তে পার্‌বে। আচ্ছা, আমায় ওই বিদ্যেটা একটু শিখিয়ে দাও না।"

বিভা হাসিয়া বলিল—"শেখাব আমি? ঘরের লোক আসুক, সেই শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। পরের ঘরে এ জুলুম চল্‌বে না। তা' হ'লে যে পরের ঘরে বাসা বাঁধা হবে।"

একটা হাই তুলে রুমালটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে শিশির উত্তর দিলে—"তা' বাঁধতে পার্‌লে বড় মন্দ হ'ত না, কি বলো?"

শিশিরের কথায় বিভার সুন্দর মুখখানা ক্রমে ক্রমে রক্তাভ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে শিশিরের দিকে পেছন ফিরে কতকগুলো ঘটী-বাটি নিয়ে নাড়্‌তে নাড়্‌তেই জবাব কর্‌লে —"কিন্তু চুণকাম করা কথা দিয়ে সব জিনিষকেই ঘরের মত করে নেওয়া চলে না—অন্ততঃ, তা' চালাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

কথাটা শেষ করেই বিভা উঠে সাম্‌নের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। স্বামীর পরিত্যক্ত কাপড়টা কুঁচিয়ে আল্‌নায় তুলে রেখে অনেকক্ষণ আল্‌নাটার পানে চেয়ে রইল। তারপর ডাবর থেকে দু'খিলি পান নিয়ে একটি ডিবেয় রেখে, নিঃশব্দে শিশিরের পায়ের সাম্‌নে সেটা নামিয়ে দিয়ে আবার হেঁসেলে ঢুকে নিজের কাজে মনোনিবেশ কর্‌লে।

শিশির লক্ষ্য কর্‌লে বিভার মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। উত্তেজনায় এবং দীপ্তিতে মুখমণ্ডল কঠিন এবং উজ্জ্বল। শিশিরের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ক্ষণেকের জন্য আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল।

সে পান দুটো মুখে পূরে ক্ষণিকের মধ্যে নিজের আড়ষ্ট ভাব্‌টা কাটিয়ে নিয়ে সহজ কণ্ঠেই বল্‌লে—"হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লে যে, রাগ কর্‌লে না কি?"

আপনার কাজের সঙ্গে নিজকে ব্যস্ত রেখে অন্যমনস্কের মত চাপা গলাতেই বিভা উত্তর দিলে—"না, রাগ কেন করতে যাব? তবে মনে মনে এইটুকু ভাব্‌ছিলুম, আমাদের ওপর অনেকের যা' ধারণা আছে, তা' বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল।"

শি—"ভুল কিন্তু অনেক সময় দু' তরফেরই হয়।"

বিভা নিরুত্তর।

শিশির আবার বল্‌তে লাগ্‌লো—"পরের কাপড়-জামার ছোট্ট ছেঁড়াগুলোকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তাকে বড় করে' দেখানটা খুব সহজ বটে, কিন্তু নিজের সেই রকম ছেঁড়াগুলোতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বড় ক'রে দেখাতে পারে ক'জন?"

বিভা তবু নীরব। সে অধোবদনে আপন-মনে আপনার কাজ করে' যেতে লাগ্‌ল।

বারবার আক্রমণের পরেও কথার কোনো জবাব না পেয়ে শিশির উঠে দাঁড়াল। সে দূরের আন্‌লায় টাঙানো নিজের ছড়িটার দিকে একবার দেখে নিয়ে বল্‌লে —"যেখানে লোক কেবল পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে, সেখানে প্রত্যহ আসা-যাওয়াও ত একটা মস্ত বেয়াদপির কাজ। তা' হ'লে বোঝা যাচ্ছে, এ বাড়ীর প্রবেশ-দ্বার এবার থেকে বন্ধই থাকবে। তবে আর মিছিমিছি মায়া বাড়ান কেন? ওঠা যাক্।"

শিশির উঠে দাঁড়াল। যাবার জন্যে ব্যগ্রতা প্রকাশ না করলেও এমনভাবে নড়াচড়া করতে লাগল, যেন সে যাবার জন্য বড়ই ব্যগ্র। সে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—"অনেকদিন ধরে' অনেক অত্যাচারই ত করলুম। যাবার সময় নিজের সব দোষগুণের জন্যে দণ্ড বা পুরস্কার যা' কিছু পাওনা হয়—"

বিভা একটু সংযতকণ্ঠেই জবাব দিলে—"কেউ ত আর কা'কেও ধরে' রাখ্‌তে পারবে না, টেনে আন্‌তেও পারবে না, কাজেই ও কথা তোলা মিছে।"

বিভার কথায় শিশির একটু আশ্বস্ত হ'লেও কম্পিত-কণ্ঠেই বলতে লাগ্‌ল—"ভুল চুকে একটা কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরুণ যদি আমার সঙ্গে কথাই বন্ধ করতে হয়, তবে না হয় কাল থেকে তাই হবে—কিন্তু আজ আমার এই চলে' যাবার সময়টাতেও অন্ততঃ দু-একটা কথা বলা উচিত ছিল—যাতে আমি বুঝ্‌তুম, কাল্‌কে আমার এবাড়ীতে ফিরে আস্‌বার দরজাটা খোলা রইল। যাই হোক্, এখন চল্‌লুম।"

শিশিরের অলক্ষ্যে পেছন ফিরে চোখের জলটা আঁচলের খুঁটে মুছে নিয়ে গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব শান্ত করে' বিভা অনেক কষ্টে উদাসিনীর মত বল্‌লে—"এসো।"

অন্যমনস্কের মত স্খলিত চরণে শিশির ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌লো। তখনও সে সাম্‌নের প্রায় ত্রিশ গজ দূরের গ্যাস্ পোষ্টটা পার হয় নি, এমন সময় একবার পেছন ফিরে দেখ্‌লে দরজাটা বন্ধ হয়েছে কি না? দেখ্‌লে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে। আর একটু এগিয়ে দেখ্‌লে জান্‌লায় কেউ তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি না? যেন মনে হ'ল, কে ডুরে শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কই, না—কেউ ত নেই। শিশির আবার ফিরলো; ছড়িটা যে সে রেখে এসেছে বিভার বাড়ীতে, সেটা ত আনতে হ'বে—যদি কাল থেকে আসা বন্ধই করতে হয়। শিশির মন্থরগতিতে বিভার বাড়ীর সাম্‌নে হাজির হ'য়ে পুনরায় দরজায় করাঘাত করলে। ভেতরের লোক যেন তৈরীই ছিল, মুহূর্ত্তে দুয়ার অর্গলমুক্ত হ'ল। শিশির দেখ্‌লে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বিভা—যেন কোন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু। তাকে কোনো প্রশ্ন করবার অবসর দেবার পূর্ব্বেই শিশির বল্‌লে—"আমার ছড়িটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছি। ওই দালানের আল্‌নায় ঝোলান আছে, ছড়িটা দাও।"

বিভা নীরবেই হুকুম পালন করলে, একটী কথাও বল্‌লে না। ছড়ি হাতে নিয়ে শিশির মাটীর দিকে চেয়ে বল্‌লে—"আজ এখন চল্‌লুম, কাল থেকে বোধ হয় আর আস্‌বার সুবিধা হবে না।"

বিভা তবুও নীরব। সে বিস্ফারিত নেত্রে শিশিরের মুখপানে তাকিয়ে রইল। অজ্ঞাতসারে তার নাসারন্ধ্র দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। শিশিরের দৃষ্টি সেটা এড়াতে পার্‌লে না। পলকমাত্র বিভার মুখের পানে চেয়ে শিশির বল্‌লে—"আচ্ছা, তবে যাই।"

শিশির আর মুহূর্ত্তমাত্রও দাঁড়াল না; বিভারই চোখের সাম্‌নে দিয়ে হন্‌হন্ করে' চলে' গেল।

যতক্ষণ আপনার মধ্যে আপনার চৈতন্য লোপ পেয়েছিল, মাত্র ততটুকু সময় বিভা দরজার সাম্‌নেই নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, পরে সংজ্ঞা-প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই দুয়ার অর্গলবদ্ধ করে' ক্ষিপ্রচরণে গিয়ে আপনার শয্যাধিকার দখল করে' ফেল্‌লে।

কতক্ষণ যে এই ভাবে কাট্‌লো, তা' বিভা ঠিক্ ধারণায় আন্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু তার শয্যাধিকার ত্যাগ করতে হ'ল অতি শীঘ্রই। যখন সে শুন্‌লে কে যেন খুব জোরে জোরে দরজায় করাঘাত করছে। সে সংযত বসনে পুনরায় শয্যাত্যাগ করে' গিয়ে দুয়ার খুলে দিলে। কিন্তু যা' ভেবে খুল্‌লে, ঘট্‌লো ঠিক্ তার বিপরীত। দুয়ারের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যে, সে বিভার স্বামী নয়, সে সদ্য চলে যাওয়া শিশির। কোনো না কোনো কারণে ফিরে এসেছে। শিশির লক্ষ্য করলে, বিভার মূর্ত্তি যেন চলনশক্তি রহিত একটী প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি। চক্ষু দু'টী তার রক্তজবার আকার ধারণ করেছে। বিভার মুখের পানে চেয়ে শিশির বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেল। বল্‌লে—"ইচ্ছাসত্ত্বেও আজ যাওয়া হ'ল না, ফিরে এলুম; পেট্‌টা যেন কেমন একটু কন্‌কন্ করছে।"

এতক্ষণ পরে বিভার মুখ খুল্‌লো—"তা' হ'লে না গেছ,

ভালই করেছ। একটু শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর, হয় ত কমে যেতে পারে—কিন্তু সত্যি ত ?"

হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েও চোর যেমন একটু থতমত খেয়ে যায়, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করে না তার চুরির কথা,—শিশিরের অবস্থাও যেন একপ্রকার সেইরকমই দাঁড়াল। অতি কষ্টে সে বল্‌লে—"মিথ্যে বলে ত আমার লাভ নেই, তাতে বরং নিজের লোকসানই আছে ; তৈরী জিনিস পেটে পড়বে না। আচ্ছা, তুমি সব কথায় আমায় অত সন্দেহ কর কেন বলো ত ?"

—"না, সন্দেহ আবার কিসের ? একটু তামাসা কর্‌ছিলাম আর কি—যেমন খানিক আগে তুমি আমার সঙ্গে করছিলে। আচ্ছা, তোমারই বা রাগ হ'ল কেন ?"

কথা কইতে কইতেই শিশির অন্দরমহলে প্রবেশ কর্‌লে। বিভা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরে এসে বস্‌ল। শিশির বল্‌লে—"রাগটা তুমি আমার দেখ্‌লে কোথায় ? তুমি মিথ্যে সন্দেহ কর, তাই বল্‌ছিলাম—তোমায় মিথ্যে কথা বলে' আমার লাভ কি ?"

—"বেশ, সত্যিই না হয় হ'ল, কিন্তু এরকম যখন-তখন যদি পেট ব্যথা করে, তা' হ'লে বুঝ্‌ছ ত, তোমার নিজেরই না খেতে পেয়ে শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে। আমার আর কি, না হয় কষ্ট করে' গিয়ে দরজাটা খুলে দেওয়া, এ ছাড়া ত আর কিছুই নয়। যাই হোক্, শরীরের একটু যত্ন করো, না হ'লে ওই এক রোগেই অনেক লোকসান সইতে হবে।"

"তা' বল্‌লে আর কর্‌ছি কি ? রোগ যখন ধরেইছে, তখন কোনো না কোনো লোকসান না করিয়ে যাবে কি ? তা' হোক্, এতে আমার লোক্‌সান হয় হোক্, কিন্তু মিথ্যেবাদী বলে' যেন আমায় কেউ সন্দেহ না করে।"

একমুখ হেসে আঁচলের খুঁটটা পাকিয়ে কানে দিতে দিতে বিভা বল্‌লে—"অফিসের বাবুদের যতগুলো পেটের অসুখের দরখাস্ত পড়ে, সবগুলোই কিন্তু সত্যি নয় জান ত ; এদিকে আবার 'মিথ্যে', এমন কথাও বল্‌বার যো নেই—কি মজার কল বলো দেখি ?"

হাসির মাত্রাটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে শিশির উত্তর কর্‌লে—"অফিসগুলো যদি সাহেবদের না হ'য়ে মেম্‌দের হ'ত, তা' হ'লে আমি নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি ওই সব পেটের অসুখের দরখাস্তগুলোই আবার অফিসে না পৌঁছে বাড়ীতে পৌঁছত।"

এবার একটু মুচকি হাসি হেসে মাথার ঘোম্‌টাটা আরও একটু সাম্‌নের দিকে টেনে দিয়ে বিভা বল্‌লে—"তোমারটাও কি ওই দরের না কি ?"

ঈষৎ রাগতস্বরে শিশির প্রত্যুত্তর কর্‌লে—"তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা আর তামাসা। আমি পেটের যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছি, আর তুমি হাস্‌ছ ?"

ঠিক্ একইভাবে নিজের হাস্যমহিমা বজায় রেখে বিভা বল্‌লে—"কই, কোনো লক্ষণ ত দেখ্‌ছি না !"

কথাটা অনেকটা শুনেও শুন্‌তে না পাওয়ার ভান করে' শিশির বল্‌লে—"না, আর পার্‌ছি না, একবার পায়খানায় যেতে হবে ; আর উপায় নেই, যেন বড় কাম্‌ড়াচ্ছে পেটটা।"

শিশির উঠে চলে' গেল। বিভা একখানা বই টেনে নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

শিশির ফিরে এসে দেখ্‌লে মাথার শিয়রে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে বিভা শুয়ে শুয়ে বই পড়্‌ছে, আর কিছুদূরে একটা চেয়ারে বসে' আছেন তারই স্বামী অমরনাথ। শিশিরকে দেখে অমরনাথবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি হে শিশির, আজ যে তোমার কোন্ বন্ধুর বিয়েতে যাবার কথা ছিল, যাও নি ?"

লজ্জিত শিশির উত্তর কর্‌লে—"আজ্ঞে না, যাব বলেই বেরিয়েছিলুম, কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় আর যেতে পার্‌লুম না, এখন মেসেই ফির্‌ছি।"

বিভা যেমনভাবে শুয়েছিল, ঠিক্ তেমনিভাবেই শুয়ে শুয়ে বইটা বন্ধ করে' হাতে ধরে স্বামীর মুখপানে চেয়ে বল্‌লে—"অনেকক্ষণ থেকে বড় কষ্ট ভোগ কর্‌ছে, একবার মেস অবধি এগিয়ে দিয়ে আস্‌বে না কি ?"

অপ্রস্তুত হ'য়ে শিশির বল্‌লে—"না, না, আপনাকে আর যেতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি ; একাই যেতে পার্‌বো 'খন।"

অমরবাবু দু'-তিনবার বলাসত্ত্বেও শিশির যখন তাঁকে কোনমতেই সঙ্গে নিতে চাইলে না, তখন অমরবাবু বললেন —আজ রাতটা না হয় এখানে থেকে গেলে হ'ত না।"

—"আজ্ঞে না, তা' হয় না। আপনারা ভাববেন না, আমি ঠিক্ গিয়ে পৌঁছবো। আবার কাল দেখা হলেই সব গোলমাল চুকে যাবে।"

অমরবাবু এবং বিভার বারবার অনুরোধসত্ত্বেও শিশির কিন্তু আর মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হ'ল। বিভা স্বামীর দিকে চেয়ে বারবার বল্‌তে লাগ্‌ল— "তুমি একটু এগিয়ে দিয়ে এলেই ভাল করতে— অসুস্থ শরীর নিয়ে একলাটি গেল।"

অন্যদিকে চেয়ে অমরবাবু উত্তর দিলেন—"আরে বাপু, ও ত আর তোমাদের মত লগেজ নয়, অত ভয় কিসের? কাল আবার ঠিক্ দেখা যাবে 'খন, ভয় নেই। এখন পেটের দৌরাত্ম্যের কিছু ওষুধ দাও দেখি।"

অন্যমনস্ক হয়েই বিভা রান্নাঘরের দিকে চলে' গেল।

* * * *

তাদের আশাকে ফলবতী করে' শিশির কিন্তু পরের দিন আর দেখা দিলে না। সন্ধ্যার পর থেকে বিভা বড় অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সময়টা বড় নিরানন্দেই কাট্‌তে লাগ্‌ল। স্বামী আস্‌তেই অনুযোগের সুরে তাকে জানিয়ে দিলে—"শিশির আজ আর আসে নি।"

পরক্ষণেই আবার অভিমানের সুর ধরে' বল্‌লে— "তোমায় কাল বারবার বললুম, অসুস্থ শরীর নিয়ে যাচ্ছে, একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে; তা' তুমি মেয়েমানুষের কথা বলে' মোটে গ্রাহ্যই করলে না। কে জানে কেমন আছে!"

অমরবাবু শুনে একটু গম্ভীর হ'য়ে রইলেন, কোনও প্রত্যুত্তর দিলেন না। রাত্রে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে' বিভা আবার বল্‌লে—"রোগের খবর শুনেও তোমরা যে কি করে' নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে' থাকতে পার, তা' বুঝি না। এতদিন ধরে' যাওয়া-আসা করছে, তার ওপর একটু মায়াও কি হয় না? কর্ত্তব্য হিসেবেও ত একটা খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত। হ'তে পারে পর, কিন্তু কাজ আদায়ের সময় যাকে নিজের করে' নিতে হয়, আপদ-বিপদে তার একটু সাহায্য করা দরকার। পশুপক্ষী পুষ্‌লেও একটা মায়া পড়ে। মানুষের উপর যাদের মায়া পড়ে না, তাদের কেমন মন, কে জানে!"

চোখ বুজে কান দুটোকে খাড়া করে' রেখে অমরবাবু বিভার অনুযোগ-অভিযোগ সব শুন্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর ঠোঁট দুটো কিন্তু একবারও নড়তে দেখা গেল না। গৃহস্থালী করে' বিভা নিত্যকার মতই তাঁর পাশে এসে শয্যা অধিকার করলে। রাত্রে অমরবাবুর যতবারই নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, ততবারই বুঝ্‌লেন, বিভা ঘুমোয় নি, জেগে আছে। শয্যার ওপর গতিবিধি তার বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। অমরবাবু নীরবে সব লক্ষ্য করে' নিঃশব্দেই রাত কাটাতে লাগ্‌লেন।

বিভা শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—সেই প্রথমদিনের কথা, যেদিন তার স্বামী সযত্নে এই লোকটিকে ধরে' নিয়ে এসে একবারে অন্দরমহলে তার সাম্‌নে এনে হাজির করেছিলেন। তার মুখের কি শান্ত সরল ভঙ্গিমা, কি আনত দৃষ্টি! কথায় কি নম্রতাই না সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল! স্বামী তার আহ্লাদে বলেছিলেন—"ইনি আজ পকেটকাটার হাত থেকে আমায় খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। পকেটে অফিসের চাবী, নোটের তাড়া, কোম্পানীর কাগজ, ব্যাগ, আরও কত দরকারী কাগজ-পত্র ছিল—ইনি আজ আমায় খুব রক্ষা করেছেন। আজ থেকে এঁকে আপনার লোকের মত দেখ্‌বে।"

তারপর ভাব্‌তে লাগ্‌ল—কেমন করে' তার স্বামীর অনুরোধে প্রায়ই আসা-যাওয়ার মধ্যে তাদের সৌহার্দ্দ বেড়ে উঠ্‌ল, তারপর 'আপনি' সম্বোধন কেমন করে' 'তুমি'তে পরিণত হ'ল, ক্রমে শিশির কেমন করে' তার নিত্যকার সান্ধ্যসাথী হ'য়ে দাঁড়াল। বিভা শুয়ে শুয়ে আরো কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রজনী অতিবাহিত হ'ল। পূর্ব্বাকাশে তরুণ তপন তাঁর আলোর উৎস ধীরে ধীরে ছুটিয়ে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। মুখের ওপর

প্রভাতের আলোর রেখাপাত হতেই অমরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চঞ্চল গতিতে উঠে বস্‌লেন। দেখ্‌লেন, পাশেই বিভা অকাতরে নিদ্রিতা। সারারাত্রি চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করে' ভোরের হাওয়ায় সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। অমরবাবু আর অপেক্ষা না করেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে' বেরিয়ে পড়লেন। বিভা তখনও সুপ্তিস্থির। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে অমরবাবু ফিরে এলেন—সঙ্গে শিশির, আরো জনকয়েক লোক। শিশিরের শারীরিক অবস্থা বেশ সহজ সরল নয়—ব্যাধিগ্রস্থ। মেসের জনকয়েকের সাহায্যে অমরবাবু গাড়ী করে' শিশিরকে নিজের আশ্রয়ে এনে শয্যায় শুইয়ে দিলেন। তখনও সে বড় যন্ত্রনায় কাতর।

শিশিরের অবস্থা দেখে বিভা বিস্মিতা, ক্রমে ভীতা হ'য়ে উঠ্‌ল। মেসের বাবুরা শিশিরকে অমরবাবুর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে ছুটী নিয়ে গেলেন। অমরবাবু বিভাকে বল্‌লেন—"সত্যিই, পরশু শেষরাত থেকে বড় বেশী অসুখে পড়েছে। কাল সমস্ত দিন যন্ত্রনায় ভুগেছে, তাই আস্‌তে পারে নি। মেস জায়গা, সেখানে সেবা করে কে? বড় কষ্টে পড়েছে, তাই নিয়ে চলে' এলুম।"

শিশিরের অবস্থা দেখে বিভার সুন্দর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। রুদ্ধশ্বাসে সে বল্‌লে—"বেশ করেছ, কাল আন্‌লে আরো ভাল কর্‌তে।"

শিশিরের গতদিনের ছলনা শেষরাত্রে সত্যের রূপ ধরে' দেখা দিল। এর অন্তরালে কিন্তু যে কারণটা ছিল, সেটা শিশির ছাড়া আর সকলেরই অবিদিত রইল। শিশির অমরবাবুর কাছ থেকে ছুটী নিয়ে সে অভুক্ত অবস্থাতেই ফিরে যেতে যেতে পথে আপনার ক্ষুৎপিপাসা মেটাবার জন্যে এক 'রেষ্টুরেণ্টে' ঢুক্‌ল। ক্ষুধার মাত্রা তখন অতি প্রবল। নির্ব্বিকারে সে যা' পেলে, তাই উদরস্থাৎ করে' মেসে ফির্‌ল। মেসে ফিরে নানা চিন্তায় রাত্রে ঘুম এল না। শেষরাত্রে এল দাস্তের বেগ। সে বেগ ক্রমে অস্বাভাবিকতায় পরিবর্ত্তিত হ'ল। ক্রমে বমির বেগ দেখা দিলে। সেই শব্দে মেসের দু'-চারজন জেগে উঠ্‌ল।

তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার শরীর অবশ শক্তিহীন হ'য়ে পড়ল। মেসের লোকেরা খানিকক্ষণ তত্ত্বাবধান করে' ডাক্তার দেখিয়ে যে যার কাজে চলে' গেল। সমস্ত দিন ধরে' শিশির যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। পেটের বেদনা ও দাস্তের বেগ কিছু কমল বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ অন্তর আবার দেখা দিতে লাগ্‌ল। সে সম্পূর্ণ আরোগ্য হ'তে পার্‌ল না। অমরবাবু তার শক্তিহীন অবস্থা এবং সেবা-যত্নের অভাব দেখে তাকে আপনার আশ্রয়ে নিয়ে এলেন। তার অবস্থা দেখে প্রথমটা একটু ভীত হ'য়ে পড়লেও, পরক্ষণেই দ্বিগুণ উৎসাহে বুক বেঁধে বিভা তার সেবা-শুশ্রূষায় মন দিলে। অমরবাবু যতদূর সম্ভব বন্দোবস্ত করে' দিয়ে তাঁর কর্ম্মস্থলে চলে' গেলেন। অমরবাবু চলে' গেলে বিভা চঞ্চল হ'য়ে শিশিরের কাছে এসে বস্‌ল। তার পেটে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল, যদি যন্ত্রনার একটু অবসান হয়। বিভার এই আত্মভোলা যত্নে তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে শিশির কখন ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তার ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন সে দেখ্‌লে বিভা অপলক-নেত্রে তার মুখের পানে চেয়ে বসে' আছে। সে বিভার দিকে নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে কাতর-কণ্ঠে বল্‌লে—"সেদিন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছিলে, বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না, দেখ্‌লে ত।"

বিভা তার মাথাটা একটু নীচু করে' শিশিরের হাত দুটো আপনার দিকে টেনে নিয়ে তা'তে শান্ত স্পর্শ দিতে দিতে বল্‌লে—"ভুল বুঝেছিলুম।"

শিশির ধীরে ধীরে আপনার মাথাটী তার কোলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"সেই জন্যেই ত আমি আর ভরসা করে' থাকৃতে পার্‌লুম না, যদি আরো কিছু ভুল বোঝো।"

তারপর সে আপনার হাত দুটো আর মাথাটা বিভার কাছ থেকে টেনে নিয়ে ব্যাকুল হ'য়ে বলে' উঠ্‌ল—"ওঃ, কালকের যন্ত্রনাটা আজ আমি আর ভাব্‌তেও পার্‌ছি না!"

বিভা সাগ্রহে তার মাথাটা আবার নিজের দিকে টেনে নিয়ে বল্‌লে—"তুমি যখন জান্‌তে তোমার সত্যিই

অসুখ, তখন তোমারই কি চলে' যাওয়াটা উচিত হয়েছে ?"

—"আজ যেমন করে' বুঝ্‌তে পারছি উচিত হয় নি, তখন কি তা' বুঝেছিলুম ?"

বিভা কোন প্রত্যুত্তর করলে না, নিঃশব্দে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বল্‌লে—"তুমি কিছুদিন আর মেসে যেও না, এইখানেই থাকো।"

শিশির ধীরে ধীরে বিভার মুখ থেকে আপনার চোখ সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে—আমায় কি শীগ্‌গির সর্‌তে দেবে না তা' হ'লে।"

—"ওর মানে যদি তাই হয় ত, তাই। কিন্তু আপনার লোকেরা এতটা শত্রুতা কর্‌বার মত ইচ্ছে পোষণ করে না। তুমি তা' হ'লে এখনও ঠিক্ আপনার মত ভাব্‌তে পার নি।"

তারপর শিশির আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না, চুপ করে' রইল।

বিভাও আর বাক্যব্যয় না করে' নীরবে সেবাকার্য্য সম্পাদন কর্‌তে লাগ্‌ল।

অনেকক্ষণ নীরব চিন্তার পর শিশির দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়েছে দেখে বিভা ধীরে ধীরে তার নিকট হ'তে সরে' মেঝেয় এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

*　　　*　　　*

বিভার সেবা-শুশ্রূষায় এবং অস্বাভাবিক মনোযোগিতার গুণে শিশির শীঘ্রই আরোগ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। সুস্থ হ'য়ে বিভার কয়দিন পূর্ব্বেকার অনুরোধ তার মনে পড়ল—কিছুদিন থেকে যাবার কথা। সে আর মেসে ফের্‌বার জন্য কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ কর্‌লে না। দিন যেমন কাট্‌ছিল, তেমনই কাট্‌তে লাগ্‌ল। তার মেসে ফিরে যাবার জন্যে কোনো দিক্ থেকে কোনো তাগিদও এলো না। সুস্থ হয়েও সে অমরবাবুর আশ্রয়েই রইল। বিভার সঙ্গ-সাহচর্য্য দিন দিন তাকে লোভাতুর করে' তুল্‌ল। ইদানীং বিভাকে দেখে, রোগশয্যায় তার ওপর বিভার অস্বাভাবিক মনোযোগিতা লক্ষ্য করে' সে একটু নীরব চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বিভা পরিহাসছলে তার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করে—"কি গো, কবি হচ্ছো না কি ? মুখের কথা কমে' গিয়ে মনের কথা বেড়ে উঠ্‌ছে যে দেখ্‌ছি।"

সে একটু গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দেয়—"একজন ফুল ফুটিয়ে দিলে, না ফুটে আর ফুলের উপায় কি বলো ?"

বিভা আর হাসেও না, বিমর্ষও হয় না, উত্তরও দেয় না। মুখে একটা কি রকম ভাব ফুটিয়ে সে চলে' গেল। শিশির নীরবে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ল।

একদিন সন্ধ্যায় সবেমাত্র প্রসাধন সমাপ্ত করে' আপনার আনন্দ-চঞ্চল বিশ্ববিমোহিনী দেহলতাটী নিয়ে বিভা জান্‌লার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপলক-দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে চেয়ে শিশির পেছন থেকে এসে তার চোখ দুটো টিপে ধর্‌লো। সমস্ত আঙুলগুলো বিভার কোমল গণ্ড যুগলের স্পর্শ পেয়ে শিশিরের সমস্ত দেহমনকে অবশ করে' তুল্‌লো। ধীরে ধীরে সে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হ'য়ে বিভার দেহের স্পর্শ লাভ করে' স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিভা প্রথমটা একটু চকিত হ'য়ে চুপ করেই ছিল কিন্তু শিশিরের অঙ্গ তা'র সমস্ত দেহটাকে স্পর্শ কর্‌তেই সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও চোখ গেল, আমার বড় লাগ্‌ছে।"

শিশির সভয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে' দাঁড়ালো। আপনার গুরুতর অপরাধের বোঝাকে হাসির আবরণে ঢেকে নিতে প্রয়াস পেয়ে উচ্চকণ্ঠে হাস্‌তে হাস্‌তে বলে' উঠ্‌ল—"ছি ছি ছি ! চিন্‌তে পার্‌লে না।"

বিভার মুখ ক্ষণেকের মধ্যে আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বল্‌লে—"এর মধ্যে এত উন্নতি করেছ জান্‌ব কি করে' বলো ?"

সে আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করে' কক্ষত্যাগ করে' চলে' গেল। তার পশ্চাদ্ধাবন করবার সৎসাহস সংগ্রহ কর্‌তে না পেরে শিশির অবসাদভরে তার ত্যক্ত শয্যার ওপর শুয়ে পড়ে চক্ষু মুদিত কর্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের গতি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। চক্ষু বুজে সে কত কি ভাব্‌তে আরম্ভ করে' দিলে।

এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই কক্ষে এসে ঢুকলেন অমরবাবু। পেছন পেছন এল বিভা। তাদের পদশব্দে

চঞ্চল হ'য়ে শিশির একবার মাত্র চোখ্‌টা খুলে তাদের দেখে নিয়ে পুনরায় নিঃশব্দে নয়ন মুদ্রিত করলে। অমর-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"শিশির, আজ আছে কেমন?"

বিভা তার কোনো জবাব দিলে না, বল্‌লে—"দয়া আর আত্মীয়তার উপযুক্ত ফলই ফলেছে। আত্মীয়তার আর প্রয়োজন নেই।"

অমরবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"কেন? মেজাজ অত বেগ্‌ড়ালো কেন?"

নয়ন বিস্ফারিত করে' রুদ্ধ নিশ্বাসে বিভা বলে' যেতে লাগ্‌ল—"কেন? পরের স্ত্রীর সঙ্গে আত্মীয়তা করা মানে কি পরস্ত্রীকে অধিকার করা? দয়ামায়া দেখান বা কর্ত্তব্য পালন করা মানে দেহ-মন দান করা নয়। পরকে আপনার করতে গিয়ে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেবো বল্‌তে চাও? যারা মেয়েদের ঠাট্টা-তামাসা বা দয়ামায়াগুলোকে ভালবাসার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তে পারে না, তাদের সঙ্গে না মেশাই ভাল। যদি একটু বস্‌বার অধিকার দাও ত, অম্‌নি তারা শুতে চায়। তুমি যা' ভাল বোঝ কর, আমি কিন্তু আর অমন কর্ত্তব্য পালনেতে নেই।"

কণ্ঠস্বরে দিক্‌ প্রকম্পিত করে' দ্বিগুণ পদশব্দে বিভা স্থানান্তরে চলে' গেল। বিস্ময় বিমূঢ়ের মত নয়ন বিস্ফারিত করে' অমরবাবু শিশিরের মুখ পানে চেয়ে রইলেন। শিশিরের চোখ মুদ্রিতই ছিল, সে সহসা তার দৃষ্টিকে মুক্ত করতে না পেরে মুদ্রিত নয়নেই নীরব রইল। বুকের ভিতর তার দুর্জ্জয় অপমানের তীব্র আঘাত বারংবার ওঠাপড়া করতে লাগ্‌ল। অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হ'য়ে বুক বিদীর্ণ করে' বাহিরে আস্‌বার উপক্রম করে' তুল্‌ল। নিঃশব্দে নীরবে সে চক্ষু বুজে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—মা বসুন্ধরে, তুমি বিদীর্ণ হ'য়ে আমায় কোলে টেনে নাও!"

ক্ষণকালের মধ্যেই অমরবাবু এসে তার মাথার শিয়রে বস্‌লেন। শিশির আর বিলম্ব না করে' তীব্র গতিতে উঠে দাঁড়ালো। তারপর আন্‌লা থেকে আপনার জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে অমরবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে' বল্‌লে—"দাদা, আপনি গুরুজন, আপনার কাছে দোষ স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই, অপমান নেই। লোভ মানুষকে কত দুর্ব্বল করে' তোলে, তা' হয় ত আপনার জানা আছে। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

শিশিরের কণ্ঠস্বর কম্পিত, নয়নে দরবিগলিতধারা।

অমরবাবু শিশিরের হাত দুটো ধরে' টেনে তুলে নিয়ে বল্‌লেন—"ওর কথা ছেড়ে দাও শিশির। ওর মেজাজটা ওই রকম রুক্ষ। আর তুমি যখন তোমার দুর্ব্বলতা বুঝ্‌তে পেরেছ, তখন আর বিশেষ ভাব্‌বার কিছু নেই, কালে ও দুর্ব্বলতা নিশ্চয়ই মুছে যাবে।"

ইতিমধ্যে বিভা কখন এসে দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড় জামা পাট করছিল। তার দিকে নজর পড়তেই শিশির উঠে গিয়ে বিভার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌লে —"একটু পায়ের ধুলো দাও বৌদি', তা' হলেই আমার দেহ-মনের সব ব্যায়রাম সেরে যাবে। আজ চল্‌লুম বৌদি'। বেমানান্‌ যা' কিছু আছে, সব অদল-বদল করে' পরে আবার দেখা কর্‌ব। আমার ভুল-ত্রুটি সব মাপ করো।"

শিশিরের হাত পা কাঁপ্‌ছিল। সে আর কোনোমতেই আপনাকে স্থির রাখ্‌তে পার্‌লে না।—"আচ্ছা, আজ তবে চল্‌লুম।" বলে সে যাবার পথে পা বাড়িয়ে দিলে।

কাপড় কুঁচুতে কুঁচুতে বিভা বল্‌লে—"আপনার লোকেদের কাছে 'চল্‌লুম' কথা বল্‌তে নেই, 'আসি' বল্‌তে হয়, মনে রেখো।" বলেই সে কাপড় চোপড়গুলো নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে।

শিশির তখন প্রায় সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে পড়েছিল, সেখান থেকেই সে বল্‌লে—"আচ্ছা, তবে আজ আসি।" বলেই সে আপন গন্তব্য-পথে পা বাড়িয়ে দিলে।

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত

আলো ও ছায়া

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

দশ

আদালত হইতে বাড়ী ফিরিয়া অসীম ভূপালীর হাতে একখানি খাম দিতে দিতে কহিল—তোমার দিদির চিঠি ফেরৎ এল ভূপা।

ভূপালী তাড়াতাড়ি খামখানি লইয়া একবার ভাল করিয়া তাহার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। তাই ত খামের উপর যে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে—মালিকের খোঁজ না পাওয়ায় চিঠি ফেরৎ গেল। সরযূ তবে গেল কোথায়? সে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিতেই অসীম হাসিয়া বলিল—জ্যোতিষী হ'লে তোমায় ভরসা দিতে পারতাম হয় ত, কিন্তু এক্ষেত্রে অধম নিরুপায়!

—যাও, ঠাট্টা করতে হবে না! কোথায় গেল বলো ত, তার ওপরই যে খোকার জন্মতিথি উৎসবের সব ভার। ঝগড়া কর্‌তে পারি—

অসীম বাধা দিয়া বলিল—লোক বিশেষকে কাঁদাতেও পারি, কিন্তু ভীড় দেখ্‌লেই—

—মাথা ঘোরেই ত! ও সব জন্মে করেছি না কি। লোকজনকে আদর-যত্ন করা, বসান, খাওয়ান মুখের কথা কি না! তা' ছাড়া, কি কি চাই, কেমন করে' কর্‌লে সব সুন্দর হবে জান্‌ব কেমন করে' বল ত? ক'টা কাজ হয়েছে আমার। তোমাদের কি—শুধু মেয়েদের দোষ ধর্‌তে পার্‌লেই বাঁচো, কা'কে আবার কাঁদালাম আমি। যার পান্‌সে চোখ, সে কাঁদবেই, তার আমি কি কর্‌ব?

—তা' বটে!

—বটেই ত। কিন্তু ওসব বাজে কথা যাক্, দিদিকে আন্‌তেই হবে কিন্তু—

—ওই কিন্তুতেই যে আমাকেও ধরেছে। কেমন করে' খোঁজ নেব তাই বলো। এক কোল্‌কাতায় যাওয়া ছাড়া ত পথ দেখি না; তাও সেখানে গেলেই যে সন্ধান পাব, তারও ত কিছু স্থিরতা নেই।

যা' হয় হবে 'খন, এখন ঘরে চলো। তোমাকে রাস্তাতেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি তখন থেকে।

অসীম হাসিল, প্রতিবাদ করিল না।

জলখাবার খাইতে খাইতে হঠাৎ অসীম জিজ্ঞাসা করিল—তারপর অপর খবর কি? ঠাকুরপো বৌদি'তে কতটা কি এগুলে? স্বরাজেরই বা দেরী কত?

—বেশী নয়, বিঘৎখানেক! ভাল কথা মনে করে' দিয়েছ কিন্তু। দেখ—বলিয়া ভূপালী একবার ভাল করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিল।

পাশুপত-অস্ত্রের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু দেখি নাই। তবে হলপ করিয়া বলিতে পারি যে,এ অস্ত্র তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। বিমুগ্ধ-বিহ্বল-দৃষ্টিতে অসীম তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন, এমনই প্রস্তুত। বল্‌তে আজ্ঞা হোক্।

ভূপালীর অধর কোণে আর একবার হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে বলিল—বুড়োবয়সেও কি ছেলেমানুষী স্বভাব যাবে না তোমার।

উঠিয়া গিয়া একবার দেওয়ালে বিলম্বিত বড় আরসী-খানায় নিজের মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আসিয়া গম্ভীরভাবে অসীম বলিল—না, যাবে না। কেন না, ও তোমার মিথ্যে কথা—আমি বুড়ো হই নি।

—বেশ বাবু, খোকাই আছ, হ'ল ত! কথা কওয়াও দায়, না কয়েও পারি না! আজ দুপুরে হয়েছে কি জানো? ঠাকুরপো—

—মড়া পুড়িয়ে এসেছে, কেমন—

—ও মা, তুমি জানলে কেমন করে'!

—নইলে চাকরী থাকে মনে করেছ? সে যাক্, তারপর কিছু আছে না কি?

—জানি না। সবই ত জান? এমন গোয়েন্দাগিরি ধরেছ ক'দিন?

অসীম হাসিয়া বলিল—হলপ করে' বল্‌তে পারি, আমি গোয়েন্দাগিরি করি নি। কোর্টে পেস্কার রাধু এসে পঞ্চমুখে তোমার দেবরটীর প্রশংসা করে' গেল। তারই মুখে যতটুকু শোনা। তা' যাক্, এখন অনুগ্রহ করে' আপনি যদি বলেন—শুন্‌তে সবিশেষ উৎসুক আছি জান্‌বেন।

এবার ভূপালীও হাসিয়া ফেলিল। বলিল—হতাশ কর্‌ব না। নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুনুন—যিনি মারা গেছেন, তাঁর একটি মেয়ে, আর তার বাবা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নেই। শুনলুম, কাল কি খাবে তারও সংস্থান নেই।

—যদি ভরসা দেন, তা' হ'লে তাদের এখানে এনে তুল্‌তে পারেন, কেমন এই ত? কিন্তু মেয়েটি? মেয়েটির বয়স কত,দেখ্‌তে কেমন এবং পাল্‌টি ঘর কি না, না,জেনে কোন মতই দিতে পার্‌ছি না। শেষটা কি বলে—ব্যাধিটা সংক্রামক হ'য়ে উঠ্‌বে না কি? বলিয়া অসীম দুষ্টামীভরা দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের পানে চাহিল।

ভূপালী রাগিল না, বলিল—ভালবাসাটা অত সস্তা নয়, আর হ'লেও বিয়ে করাটা তার চেয়েও দুরূহ। তা' ছাড়া, নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার—আমাদের ওপর মেয়েদের শ্যেন-দৃষ্টি ছিল না, এখানে আমার রইল দৃষ্টি। তোমার—

—থাম্‌লে কেন, আমার কি বলেই ফেলো।

—শাসন! যাক্, ঠাকুরপোকে আন্‌তে বলে' দিই, কেমন?

—কাজেই! কিন্তু বিষবৃক্ষ পড়েছ ত?

—পড়েছি বই কি, তা'তে কি হয়েছে?

—বিশেষ কিছু নয়, মাত্র স্মরণ করিয়ে দিলাম।

গম্ভীর হইতে চাহিয়া ভূপালী বলিল—সূর্য্যমুখীর ভালবাসা ছিল একমুখী—বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই তার ছিল স্বর্গস্বপ্ন। তাই সে ঠকেছে। আমাদের কষ্টিপাথরে বিচার হ'য়ে গেছে। ভালবাসার ব্যবসায় আমরা চুলচেরা বখরা করে' নিছি—ফাঁক রাখি নি, নয় কি? তা' ছাড়া, সারাটা জীবন যদি গুণে গুণে পা ফেলে না চল্‌লেই পড়ে যেতে হয়, তবে পড়াই ভাল। তা'তে বরং সত্যের গৌরব আছে—বুঝেছ? মিথ্যা স্বপ্ন দেখার মোহ নেই।

বুঝা ছাড়া উপায় কি।

অসীম কথা কহিল না, ভূপালীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এগার

সারাটি রাত্রের মধ্যে ভূপালীর ভাল করিয়া ঘুম আসিল না। সত্যই সে সরযূকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। তাহাকে কোন সংবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়ার বেদনাটা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। সরযূর উপর দুর্জ্জয় অভিমান ভুলিতেই বোধ করি সে জোর করিয়া বারবার না দেখা মেয়েটিকেই বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিতে চাহিল। সে আসিলে কোন্ ঘরটি তাহাকে দিবে, কি করিয়া তাহাকে যত্ন করিবে, কি ভাবে তাহাকে লইয়া তাহার এই সীমাহীন দিনগুলি মধুর করিয়া তুলিবে তাহারই একটা মোটামুটি খসড়া সে মনে মনে গড়িতে সুরু করিয়া দিল।

সন্ধ্যার পরই অপূর্ব্বকে সে জানাইয়া দিয়াছে, সকালেই মেয়েটিকে এখানে আনিয়া দিতে হইবে। পাগল আর কাহাকে বলে! অপূর্ব্ব বলিল—সে এখানে আস্‌বে কেন বৌদি'? আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান ত সকলেরই আছে।

আত্মসম্ভ্রম! এই ছোট্ট কথাটা কোনমতেই কিন্তু মন হইতে সে ঠেলিয়া দিতে পারিতেছিল না। তাই ত যদি সে না আসে! তাহার আসা না-আসার জন্য কিছুই আসিয়া যায় না, যাইতও না; কিন্তু সে সরযূকে দেখাইয়া দিতে চায় যে, সে না আসিলেও তাহার দিন চলে, ভাল-ভাবেই চলে। খোকার জন্মতিথি-উৎসব বরং সে এমন-ভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারে, যাহাতে অসীম পর্য্যন্ত বিস্ময় অনুভব করে। কিন্তু ওই মেয়েটা যদি না আসে—

দুঃখে অভিমানে ভূপালীর চোখ দু'টি বাষ্পাকুল হইয়া

উঠিল। সরযূ তাহার কে? কেনই বা সে তাহাকে না জানাইয়া এক পা নড়িবে না! কোন্ অধিকারে সে একটা দাবী করিয়া বসিতে চায়! কিন্তু কোন যুক্তিই কার্য্যকরী হয় না। সরযূর শান্ত মূর্ত্তিখানি তাহার মানস-নয়ন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া সব চিন্তা ম্লান করিয়া দেয়। আসিবার সময় যে চোখের জল তাহার হাত দুইটীকে অভিসিক্ত করিয়া দিয়াছিল, আজও যে সে স্পর্শ সে প্রতি লোমকূপে অনুভব করিতেছে! ইহা কি মিথ্যা? তাহা হইলে তাহার নিজের অস্তিত্বও যে অস্বীকার করিতে হয়।

সত্য মিথ্যা ভাবিবার তাহার প্রয়োজন নাই। সে চিন্তাও সে করিতে চাহে না—জীবনের যাত্রাপথে অমন কত লোকের আনাগোনা হইবে; তাহারই একটাকে জড়াইয়া ধরিয়া অযথা কষ্ট পাইবার কোন অর্থ হয় না। বরং সম্মুখের একান্ত বিপন্না মেয়েটার চিন্তাই তাহার অবশ্য করণীয়। কেন না, বিদেশে বাঙালী বাঙালীকে সাহায্য না করিলে, কে করিবে? কিন্তু মেয়েটা যদি সে সাহায্য হেলায় প্রত্যাখান করে? শুধু বিপন্নকে যতটুকু সাহায্য গৃহস্থের করা প্রয়োজন, সে তাহাই করিতে চায়, করিবেও। ইহাতে যদি মেয়েটী অন্য কিছু মনে করে, সে তাহার কি করিতে পারে? তা' ছাড়া, সম্মুখের ঘন কুজ্ঝটিকা মধ্যে নিজেকে বিপন্ন করা অপেক্ষা আশ্রয়ের একটা ক্ষীণ আশা যদি সে একান্ত মূর্খেরই মত ত্যাগ করে ত করুক,তাহা লইয়া চিন্তা করিবার অপর্য্যাপ্ত সময় তাহার নাই।

ভোরের দিকে ভূপালী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন জাগিল, তখন বেলা বেশ হইয়াছে।

অসীম বলিল—তোমার শরীর অসুস্থ ভেবে ডাকি নি। চা খেয়ে নিয়েছি। ভাল আছ ত?

ভূপালী লজ্জারাঙা মুখে বলিল—হাঁ। ডাক্‌লেই পার্‌তে। ঠাকুরপো কোথা? চা খেয়েছে ত?

—রাম! আদালতের আসামী যদি বা সাম্‌নে আসে ত, তোমার আসামীর কৃপাদৃষ্টি পাওয়া দুর্ঘট! গতিক সুবিধে নয় বুঝে বোধ হয় কোথাও সরে পড়েছে।

ভূপালী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—জানো, তবু ডাক্‌তে ত পার নি। আমি না থাকুলে দেখছি না খাইয়ে মারবে।

—আমি না মার্‌লেও অন্ততঃ ও মর্‌বে বটে।

আর বিশেষ কথা হইল না। অসীম নির্দ্ধারিত সময়ে আদালতে বাহির হইয়া গেল। অপূর্ব্ব তখনও বাড়ী ফিরে নাই। ভূপালী মনে মনে স্থির নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে মেয়েটীকে আনিতে গিয়াছে। কাজে অকাজে বারবার তাই সে সদর দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেছিল।

বার

ঘণ্টাখানেক পরে অপূর্ব্ব ফিরিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে যে আর কেহ আসিয়াছে, তাহা বুঝা গেল না। ভূপালী বলিল—তারা এল না।

সবিস্ময়ে অপূর্ব্ব বলিল—কারা?

—ও মা, এরই মধ্যে ভুলে বসে' আছ। কাল পইপই করে' কাদের নিয়ে আস্‌তে বল্‌লাম বলো ত?

এতক্ষণে অপূর্ব্বের স্মরণ হইল। সে বলিল—সেখানে ত যাই নি বৌদি'?

—থাক্, ও বেলাই তা' হ'লে যেও।

ধীরকণ্ঠে অপূর্ব্ব কহিল—ও বেলাও ত আমার সময় হবে না।

—ও বাবা, এরই মধ্যে বিকালের কাজ ধরা হয়ে গেছে না কি? কোথায় গো?

—বর্দ্ধমানে।

—বর্দ্ধমানে! না ঠাকুরপো, ঠাট্টা নয়, কি খবর বলো ত?

—সত্যিই বর্দ্ধমানে যাব বৌদি'। এইমাত্র খবর পেলাম, সেখানের আশপাশের সারা গ্রামগুলো বন্যায় ভেসে গেছে। এমন লোক নেই যে, সাহায্য করে। দাদার কাছ থেকে পাচশ' টাকার চেক আদায় করে' নিয়েছি। তোমার কাছ থেকে গাড়ীভাড়াটা পেলেই আমি বিদায় হবো।

ভূপালীর সমস্ত অন্তরটা যেন তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—তোমার কাজের বেলা বৌদি', কিন্তু আমার কাজের বেলা কিছু নয়। না, দেবো না আমি। আমি

কেন, তোমার দাদার ও টাকাগুলোও ফেরৎ দিতে হবে তোমায়।

মুহূর্ত্তের জন্য অপূর্ব্বের মুখে বিষণ্ণতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল, পরক্ষণেই সে বিনা দ্বিধায় অসীমের দেওয়া চেকখানি ভূপালীর নিকট আগাইয়া দিয়া বলিল—তোমার সমর্থন পাবো জেনেই অতবড় দুঃসাহস করেছিলাম, যখন নেই'ও তোমারই কাছে থাক্ বৌদি'।

—থাক্! নিজের চোখে যাদের দেখে এসেছ, কাল কি খাবে তার সংস্থান নেই, তাদের কথাটা একবার মনেও হ'ল না, হ'ল কোথায় বর্দ্ধমানে কারা ভেসে চলেছে তাদের কথা। হাতের কাছের বিপন্নকে ছেড়ে যারা বাইরেরটা নিয়ে হাতড়ায়, তাদের কাজে কোন সমর্থন নেই আমার।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—তোমার এ কথা মাথা পেতে নিতে পারলাম না বৌদি'। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি দয়া অন্যায় নয়; কিন্তু তখনই অন্যায়, যখনই বোঝা যায় এর মধ্যে কোন মোহ এসে পড়েছে। ওদের প্রতি তোমার অসীম দয়া, কিন্তু ওদের চেয়েও ত দুঃখীর অভাব নেই সেখানেও। কই, তাদের কথা ত তোমার মনে পড়ছে না। ... কথা কি জানো, মানুষ নিজের নিজের মন দিয়েই ...চার করতে গিয়ে বিভ্রাট গড়ে' তোলে। এই সব কারণগুলো দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন বলেই জীবে শিবজ্ঞানে ...বা করবার জন্যে আমাদের দেশের মহামানব উপদেশ ...য়ে গেছেন। প্রতি জীবের মধ্যে যদি শিবের কল্পনা করে' নিতে পারি, তা' হ'লে একের প্রতি আসক্তি না থাকাই উচিত। কিন্তু ওকথা থাক্। একটার গাড়ীতেই বেরুতে হবে আমায়। বলিয়া সে স্নানার্থে অগ্রসর হইল।

ভূপালী কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

কেমন করিয়া কি ভাবে যে সময় কাটিয়া গেল, তাহা তাহার হুঁস ছিল না। হুঁস হইল তখন, যখন অপূর্ব্ব আসিয়া বিদায় নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব্ব বলিল—যাবার সময়ও কি তোমার একটু আশীর্ব্বাদ পাবো না বৌদি'? কতদিনই ত পাগল বলে' তোমার এই লক্ষ্মীছাড়া ভাইটিকে ক্ষমা করেছ, আজও ন[illegible] উপেক্ষা করলে।

তথাপি ভূপালী কথা কহিল [illegible]

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—তুমি [illegible] আমি যাবার সময় আশীর্ব্বাদ না [illegible]

ভূপালীর কি হইল কে জানে [illegible] দেরাজটা খুলিয়া একগাদা নোট [illegible] আনিতে বলিল—আশীর্ব্বাদ [illegible] করার যোগ্যও ত হ'তে হবে। [illegible] জয় না করতে পারলে কোন ভা[illegible] ভগবান করুন, যেন একদিন [illegible] তোমার দাদার চেক্ ত নেবেই, [illegible] উৎসবের এই টাকাগুলোও তার [illegible] খোকার সত্যকার তিথি-উৎ[illegible] সুসম্পন্ন হোক্!

অপূর্ব্ব মুগ্ধ-বিহ্বল-দৃষ্টিতে [illegible] পানে চাহিয়া পায়ের উপর তাহ[illegible] তারপর আবার যখন মুখ তু[illegible] মুখখানিতে বন্যা নামিয়া আসিয়[illegible]

খানিক পরে অপূর্ব্ব বাহির [illegible]

ভূপালী সদর দরজা অবধি [illegible] শুধু ক্ষান্ত হইল না, যতদূর দৃষ্টি [illegible] দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর [illegible] একখানা ইজি-চেয়ারের উপর [illegible] কোন বেদনাই যেন আর তা[illegible] পারিল না; বরং একটা অপরি[illegible] কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠি[illegible] এত তৃপ্তি! বিপুল বিস্ময়ে ভূ[illegible] লাগিল। *

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

[* আগামী কার্ত্তিক-সংখ্যায় [illegible] বাহির হইবে না। অগ্রহায়ণ মা[illegible] পুনরায় উ[illegible] খানি চলিবে।] সম্পাদক

ছায়াচিত্রের মায়াপুরী

গার্বোর চেয়ে রহস্যময়ী

শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

... চিত্র জগতে কারা বিপ্লব এনেছে জানেন! ... নাম শুন্‌লে সারা পৃথিবী আজ নেচে ওঠে ... ছবিঘরের দিকে ছোটে খবর রাখেন! সারা ... আজ চেয়ে রেখেছে ক'টী মেয়ে—ক'টী ... নাম। গ্রেটা গার্বো, মার্লেন ডিট্রিস্, ... আর মে ওয়েষ্ট। আরও অনেক আছে; কিন্তু ... সারা সভ্যজগতের বুকে বুনেছে এক মায়া- ... ভ্যজগতকে করেছে বিস্ময় বিমুগ্ধ। এদের ... , এমন সভ্য লোক পৃথিবীতে আছে বল্‌লে ... উড়িয়ে দেবে। অন্ততঃ এদের একখানা ... ন বা এদের কথা নিয়ে আলোচনা করে নি ... যার বয়স ষোল থেকে ত্রিশ-এর মধ্যে এই ... সহরে আছে—এ কথা উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ ... মাসে বসে' ভাবা আর ভারতবর্ষের ... স্বপ্ন দেখা দুই সমান। এদের বাদ দিয়ে তুমি ... ঢুক্‌তে পারো না।

... একটি মেয়ে আজও রইলো রহস্যাবৃত আর ... , তার কথা কেউ জান্‌লো না—জান্‌তে চাইলো না ... গার্বোর রহস্য আজ আমাদের কাছে বিস্ময়ের কথা। গার্বোকে রহস্যময়ী বলে' প্রকাশ করতে গিয়ে— তার ... প্রতিটী দ্বার দিনের পর দিন করছি উদ্‌ঘাটিত। শুধু গার্বো নয়, প্রত্যেকের বেলায়ই তাই। ... মাতি করতে হবে—তাই আমরা গার্বোর ... জেনেও বোকা সেজে আছি—তার সম্বন্ধে কিছু জানি না বলে' তার জীবন-যাত্রার ওপর ফেলে দিচ্ছি রহস্যের ঘন কুয়াসা। কিন্তু তবুও আমরা নির্ব্বিকার— যে পথে চলেছি, চল্‌বো—চোখ ফেরাবো না।
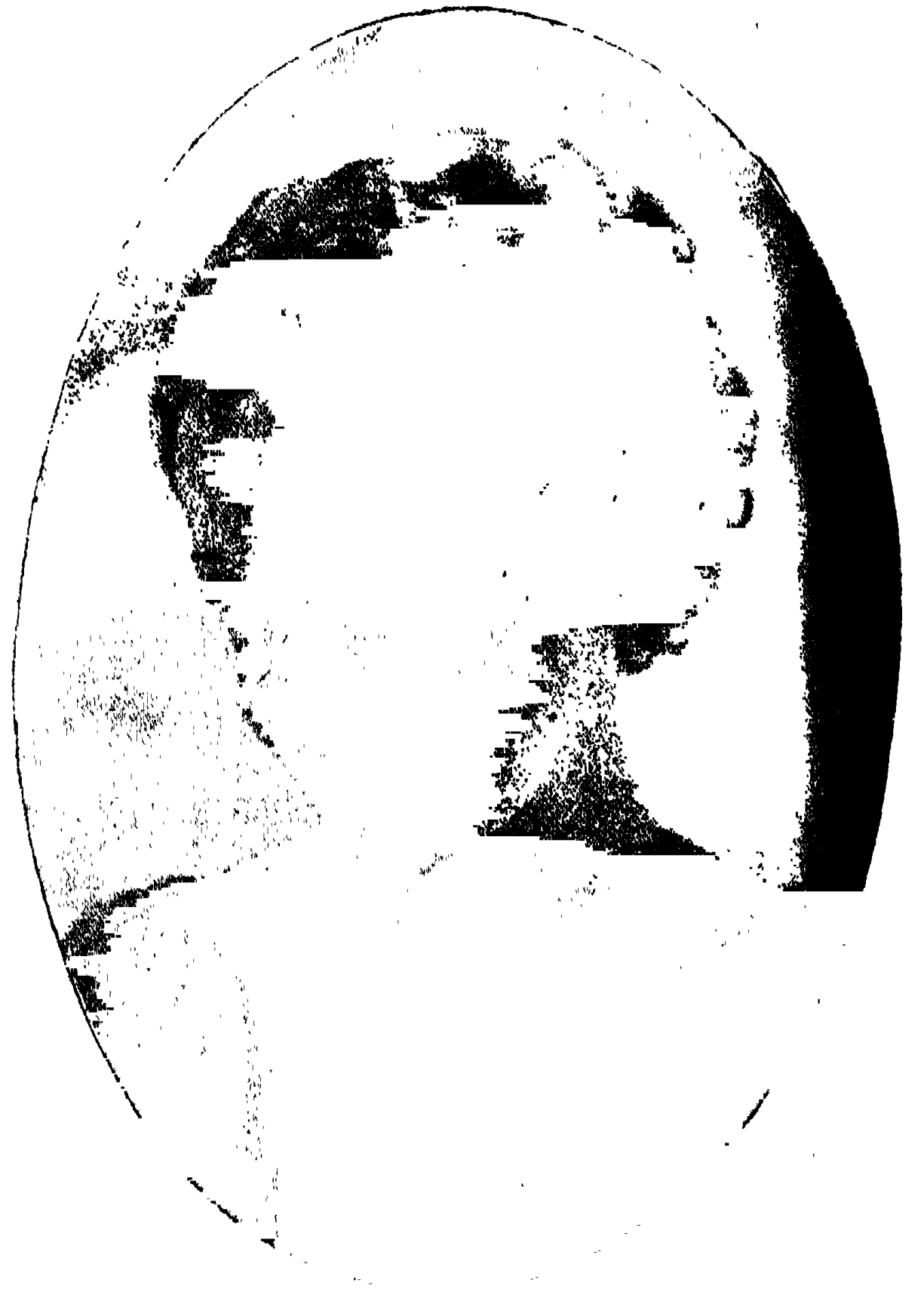
গার্বোর চেয়ে রহস্যময়ী মেয়ে আছে—ওই 'হলিউডে'ই আছে। বারোটী বছর তার কাটছে ওই হলিউডে— ধীরে ধীরে . উঠেছে গাঢ় অন্ধকার থেকে খ্যাতির

উজ্জ্বলতম যশোশিখরে। একদিনের এক ফাঁকিতে, ডিরেক্টরের এক সস্তা চালবাজীতে, বিজ্ঞাপনের জোরে সে বড় হয় নি। জীবনের সঙ্গে সে করেছে দিনের পর দিন যুদ্ধ—একটু একটু করে' এগিয়েছে। তার এই জয়যাত্রার প্রেনও শেষ হয় নি।

ফে, রে-র জীবনের সকলের চেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে—তার এই বারোটী বছরের সম্পূর্ণ ইতিহাস। যে বারো বছর সে এসেছে হলিউডে। কোনও অভিনেত্রীর পক্ষে এই দীর্ঘ বারো বছর অপবাদ আর কাগজের রিপোর্টারের হাত থেকে বেঁচে চলা শুধু আশ্চর্য্য নয়, অসম্ভব। গুজব, যত সব আজগুবি কথা তাদের নামে রটবেই। কোনও না কোনও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার নায়িকা তাদের হ'তেই হ'বে—দু'-চারটে অপবাদ মাথায় নিতেই হবে। কিন্তু ফে, রে এই সব অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে পাশ কাটিয়েছে। বারোটী বছর সে কাটিয়েছে নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়ে। তাই বলছি, গার্ব্বোর চেয়ে সে রহস্যময়ী।

বারো বছর আগে কানাডা থেকে একটী সুন্দরী তন্বী তরুণী এলো হলিউডে। চোখে তার ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন, আশার উজ্জ্বল আলো। যৌবন তার পুরোদস্তর ছিল, কিন্তু বরাতের জোর ছিল না। দিনের পর দিন তাকে ষ্টুডিওর দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়—কিন্তু কাজ জোটে না। চোখের আলো আসে নিভে—দ্রুতপদক্ষেপ হ'য়ে আসে শিথিল। সে আবার দেশে ফিরে যাবে ঠিক্ করলে।

কিন্তু ফির্তে তাকে হ'ল না। কাজ একটা জুটলো—ছবির 'এক্সট্রা' হিসেবে। খানকয়েক ছবিতে সে অভিনয় করলে—মানে এক-আধবার ক্যামেরার সাম্নে দাঁড়ালো। নাচের পার্টিতে, কিংবা ভীড়ের [illegible] দেখা যেতো। ওই পর্য্যন্তই। ফে, রে [illegible] হ'য়ে উঠলো বিরক্ত—এই ঢিমে [illegible] লাগে না। একঘেয়েমীর বেড়া [illegible] ওঠে অসম্ভব।

'কার্ডিন্যাল রিচলু'র একটী দৃশ্য

মানুষ বরাতের দাস—ভা[illegible] যেতে পারে না। ফে, রে [illegible] ষ্ট্রোহিমের চোখে। জহুরী জহ[illegible] রে-কে ঠিক্ চিন্‌লে। ফে, [illegible] চিরকাল মনে রাখবে, যেদিন এ[illegible] মার্চ্চ' ছবিতে নায়িকার ভূমিকা[illegible] "আমি জীবনে যত ডিরেক্টরের [illegible] মধ্যে আমার এরিককেই ভাল লা[illegible] উন্নতির পথ করে' দিয়েছে [illegible] মানুষকে চেন্‌বার আর তা'কে [illegible] অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে।"

এ কথা আমরাও অবিশ্বাস করি না ; কারণ, 'ওয়েডিং মার্চ্চ' আমরা দেখেছি—আর জানি, সেই ছবিতে ফে, রে

জো থেকে কোথায় উঠে গিয়েছিল। সেইখান থেকেই তার সৌভাগ্যের সূচনা।

'টিকি'র যুগে ফে, রে-র কথা আর না বল্‌লেও চলে। 'কিং কং'-এর কথা কার মনে নেই—কে তা'কে এর মধ্যে ভুলেছে—সেই ভয়ঙ্কর দানব গরিলাকে। আর তা'কে যদি ভুলেও থাকে, তা' হ'লে 'এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং'-এর চূড়ায় [illegible] মুহ্যমান মেয়েটীকেও ভোলে নি।

Maurice Chevalier and Ann Sothern in "Folies Bergere"

আজকের দিনে রোমাঞ্চকর ছবিতে অভিনয় করতে ফে, রে-র জুড়ী নেই বললেই চলে। হাসিমুখে সে ছোটে, লাফায়—একটুও ভয় না পেয়ে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। শুধু সে তন্বী, তরুণী, [illegible] নায়িকা নয়—সে কর্ম্মঠ, চঞ্চল, যেন বনের হরিণী। কোনও অভিনেত্রীর পক্ষে এই দুটো গুণ একসঙ্গে থাকা বড় কম কথা নয়।

ছোটবেলা থেকে ফে, রে চঞ্চল—কিন্তু বিপদের সাম্‌নে পড়ে' স্থির থাকা তার স্বভাব। তখন সবে সে হলিউডে এসেছে। ষ্টুডিও থেকে ষ্টুডিওতে ঘুরে বেড়ায়। একদিন ঢুকেছে—'হল-রোচে'। সোজা সরু রাস্তা, পাশে আস্তাবল—ঘোড়া বাঁধা। তার মধ্যে 'রেক্স'-ও ছিল। 'রেক্স'-এর পরিচয় বোধ হয় দিতে হবে না—'টম্ মিক্সে'র 'রেক্স'—দুদ্ধর্ষ, দুর্দ্দান্ত ঘোড়া 'রেক্স', তাকে আজও চিত্র-প্রিয়রা নিশ্চয় মনে রেখেছে। 'রেক্স'—তখনও ভাল পোষ মানে নি, তার দিকে আঙুল দেখালেই সে ক্ষেপে ওঠে।

"DESIGN FOR LIVING"

ফে, রে পথ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে দাঁড়ালো। বড় সুন্দর ঘোড়া তো! বাঃ, কি সুন্দর চেহারা! নিশ্চয় খুব জোরে দৌড়তে পারে। বিস্ময়ের আবেশে কখন সে তার দিকে আঙুল তুলেছে। এক সেকেণ্ড, আর তার পরেই হুড়মুড় করে একটা শব্দ—দুর্দ্দান্ত এক লাফ। আশপাশের লোক চোখ বুজ্‌লে—তাদের গলা থেকে বার হ'ল শুধু একটা চীৎকার—আশঙ্কা আর ভয় মেশানো। কিন্তু চোখ

চেয়ে তারা দেখ্‌লে—কিছু হয় নি। মেয়েটা মাটীতে তো পড়ে' নেই, উঠে দাঁড়িয়ে হাসছে যে—আর 'রেক্স' দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। তাদের চোখের সাম্‌নে দিয়ে কীনা মেয়েটী হাস্‌তে হাস্‌তে চলে' গেল। এমন ব্যাপার তারা কখনও দেখে নি।

শুধু ওই একটা ঘটনাই নয়, আরও অনেক আছে—যাতে বোঝা যায়, জীবনে ভয় কা'কে বলে সে জানে না। জেদ তার অদম্য—খেয়ালের তার সীমা নেই। এমন যে মেয়ে, তার কথা আজও লোকের মুখে মুখে ছড়ায় নি কাগজে কাগজে তার নামে কেন শত-সহস্র গুজব রটে নি তা' জানেন – তার কারণ, তার চারপাশে ফে, রে তুলেছে এক অভেদ্য নিজস্বতার প্রাচীর, যা' ভেদ করে' ঢোকা অসম্ভব। এ গ্রেটা গার্বোর মত লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা নয়—কারণ, গার্বো নিজে যতদূরে থাকুক না থাকুক, লোকে তা'কে কাছে পেয়েও দূরে রাখ্‌বে। তার যা' গুণ নেই, লোকে তাকে রহস্যময়ী বলে' সেই গুণ প্রচার কর্‌বে। গার্বোর যশোময় জীবনে এইটাই যেমন সকলের চেয়ে সাহায্যকারী, হয় তো তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলঙ্কও বা!

নিউ থিয়েটারসে'র 'ভাগ্যচক্রে' পাহাড়ী, চানীদত্ত ও উমাশশী

সেদিন নিউইয়র্ক সহরের ওপর দিয়ে বইছে ঝড়—বৃষ্টির বিরাম নেই—উৎক্ষিপ্ত, তামসী সেই রাত। ফে, রে-র খেয়াল চাপ্‌লো—সে এরোপ্লেনে উড়ে হলিউডে যাবে। যে কথা, সেই কাজ। কোনও খোঁজখবর না নিয়ে সে হলিউড-গামী প্লেনের কেবিনে গিয়ে বস্‌লো। কর্ত্তারা তা'কে কত বারণ কর্‌লে; কিন্তু কোনও কথায় কান না দিয়ে সে বসে' রইলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পথে কিন্তু তার কোনও বিপদ হয় নি।

কিন্তু ফে, রে-র বেলায় তা' নয়। তার বীভারলী হিল্‌সের সুদৃশ্য বাড়ীতে থাকে সে আর তার স্বামী জন্ সান্তার্স। তার এই ছোট সংসারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সাধ্য কারুর নেই—স্বামী-স্ত্রীর ভেতরের কথা জান্‌বে এমন লোক মেলা ভার। ফে, রে-র বাইরের সম্বন্ধ শুধু

দুর্গামূর্তি

[উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প অবলম্বনে অঙ্কিত]

[শিল্পী — নিতাই পাল]

[illegible] অফ ইণ্ডিয়া প্রেস কলিকাতা
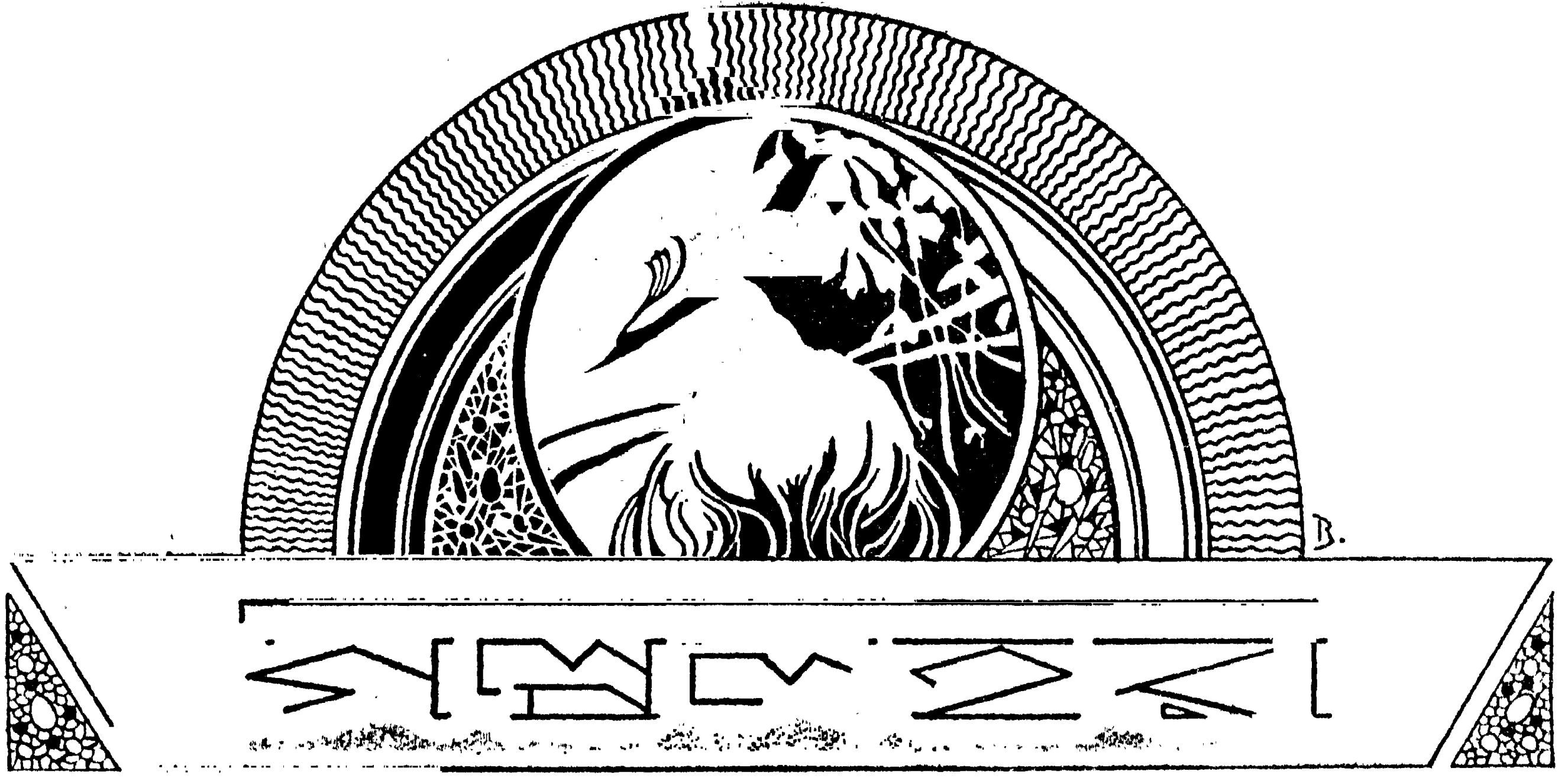
একাদশ বর্ষ } কার্ত্তিক—১৩৪২ { সপ্তম সংখ্যা

মানের জের

শ্রীবজ্রাচার্য্য

সন্ধ্যা সাতটা। বাড়ীর ঝি মোক্ষদা যখন বিছানা পাতছিল, তরঙ্গিণী বলে দিল, "ওরে, আজ পাশবালিশ দিস্।"

মোক্ষদা মুখ টিপে একটু হাসল; কেন না, বিছানার মাঝখানে পাশবালিশের আবির্ভাব, কর্ত্তা-গিন্নীর মনোমালিন্য না হ'লে হয় না।

তরঙ্গিণীর এই বালিশটী তার অভিমানের প্রতীক। স্বামী রজত এর নাম দিয়েছে ঢেঁকী; কলহের ঠাকুর নারদ ঋষির বাহন। বালিশটী খাটজোড়া লম্বা; আর যেমন মোটা, তেমনি ভারী বলে এর অপর নাম দলমাদল। বিষ্ণুপুরের দুর্গে গেলে আজও দলমাদল দেখতে পাওয়া যায়। প্রকাণ্ড কামান, তার সাহায্যে একবার খুব ঘটা করে বর্গী তাড়ান হয়েছিল।

আজ বৈকালে মনোমালিন্য ধূমায়িত হ'ল একটা অতি সামান্য বিষয় অবলম্বন করে। রজতের হিং দেওয়া কড়াইশুঁটীর কচুরি খেতে ইচ্ছা হয়েছিল। তরঙ্গিণী অতি যত্নে নিজের হাতে কচুরি তৈয়ার করে, রজতকে রেকাব সাজিয়ে দিয়ে এল। একটু পরে জিজ্ঞাসিল, "কেমন হয়েছে?"

রজত বলল "একটু বেশী নুন হয়েছে।"

অসহ্য! এত যত্ন, এত পরিশ্রম, সব ব্যর্থ! ঝগড়ার বীজ বোঝাই যতগুলো 'ওয়াগন', 'সাইডিং'-এ ছিল, তারা হুড়মুড় করে রজত তরঙ্গিণী মেজাজের 'মেন' লাইনে এসে চলতি গাড়ীর গায়ে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিল। আগুন জ্বলে উঠ্‌ল...চারিদিকে বিশৃঙ্খলা...লাইন বন্ধ হ'য়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিণীর ঠোঁট ফুলে উঠল, চোখে জল

দেখা দিল। রজত রেগে উঠল…"এ রকম করে আমার ওপর অত্যাচার করলে ত' আর বাড়ীতে টেঁকা যায় না। দূর যা'…কচুরির নিকুচি করেছে…

কাছে শাদা ধবধবে বিড়াল, কানু বসেছিল; কচুরির রেকাবখানা পড়ল তার পিঠের ওপর। ম্যাও ম্যাও করতে করতে কানু ছুটে পালাল। কানু, তরঙ্গিণীর বড় আদরের বিড়াল। সর্ব্বনাশ!

"এ মার ত' কানুকে নয়—আমাকে (ক্রন্দন)…আমাকে (ক্রন্দন)…আমাকে (ক্রন্দন)·· ও মা গো…(ক্রন্দন)

তরঙ্গিণী কেঁদে আকুল হ'য়ে উঠল। রজত অবাক! কি হ'তে কি হ'ল। ঈষৎ শঙ্কাকুল হৃদয়ে সে উঠে পড়ল। ধীরে ধীরে অন্দর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, বাহিরের বারাণ্ডায় এসে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল।

রজতের মনে হ'ল একটু ঘুরে আসা উচিত; হয় গোলদীঘি, না হয় সিনেমা, না হয় হাওড়া বা শিয়ালদহ ষ্টেশন। বারবার চেষ্টা করেও সে কিন্তু বাড়ী হ'তে বেরুতে পারল না। আমরা রজতের ভিতরটা জানি বলে বলছি যে, সে সেদিন বেরুতে পারে নি—ভয়ে। তরঙ্গিণী বড় অভিমানিনী। স্বামী স্ত্রী ভিন্ন বাড়ীতে আর কেউ নেই। ঝি, চাকর, বামুন দরোয়ান ত' আর অভিভাবক নয়, পাছে অভিমানভরে তরু একটা বিপদ ঘটায়। এই অজানা আশঙ্কা রজতের গতিরোধ করল। সে যদি বাড়ী ছেড়ে যায়, তবে তরুকে অলক্ষ্যে পাহারা দেবে কে?

বিছানা পাতার আদেশ, তরঙ্গিণীর গলার শব্দ রজতের কানে পৌছল। তার মনে কলহের প্রবৃত্তি আজ আদৌ ছিল না। বরং আজিকার রাতে ছোটখাটো একটা উৎসব করবে এমন অভিলাষ ছিল। রাতটা যে সে নয়—ফাল্গুনের পূর্ণিমা। বৈকালিক বিপর্য্যয় কিন্তু তার বড় সাধে বাদ সাধল—পূর্ণিমার চাঁদ রাহুতে গ্রাস করল; দখিণা বাতাসে ছুঁচের ডগাগুলি মিশে গেল; তার মেজাজ আর বেফাঁস কথার জন্যে মীনধ্বজের ক্ষেত্র অমন দুগ্ধফেননিভ শয্যা আজ কপিধ্বজের কুরুক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। হা অদৃষ্ট!

রজত ভাবতে ভাবতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। সে কেন আপশোষ করবে? দোষ কি শুধু তার? দায়ী কি শুধু সে? সে কি কেবল মুখ নিয়ে ঘর করে? প্রাণ কি তার নেই? তরু শুধু মুখের কথা চায়, তার প্রাণের অতৃপ্ত গভীর আবেদন কিছুই কি সে বোঝে না? তবে কি তাকে কাঁদাবার জন্যে তরু এমন করে? একটাও সন্তান যদি তাদের হ'ত, তা' হলে বোধ হয় অন্য রকম হ'ত। কেন…কেন…কেন এমন হয়?

ভাবনা তিক্ত হয়ে উঠল; সে ধীরে ধীরে অন্দরে গেল; পরে অডিকলোনের একটা পটি কপালে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সময়—রাত্রি আটটা।

মোক্ষদা এসে খাবার প্রস্তুত সংবাদ দিল। রজতের অভিমান অমনি উথলে উঠল; অতি কষ্টে সে জানাল যে, তার বড় অসুখ। কি অসুখ—না, তা' সে জানে না… তবে বুকটা…না না…সে কথায় কাজ কি…সংসারে সে একা এসেছে…একা চলে যাবে…বলে লাভ কি? কা'কেই বা বলবে?…তার ব্যথা কেউ কি বুঝবে?…উঁহুঁ …উঃ…(ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস)

দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে তরঙ্গিণী চুপ করে শুনছি ; হঠাৎ ভিতরে এসে ধাক্কা দিয়ে মোক্ষদাকে ঘর হ'তে বার করে দিল; চকিতে দোরের ছিটকিনী তুলে দিয়ে, 'সুইচ অফ্' করে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ঢেঁকী, ওরফে দলমাদল, প্রকৃতপক্ষে বিছানাটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। শিমুলতুলার এই এভারেষ্ট—না হোক্ অত বড়—এই 'চাইনীজ ওয়াল'—এমনই উঁচু যে, এ পাশে শুয়ে ও পাশের মানুষকে দেখা যায় না। রজতের ঘন ঘন 'প্যাল্পিটেসনে' খাটখানা কেঁপে উঠছে, নাসার দীর্ঘশ্বাসে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তরঙ্গিণী গুমরে গুমরে কাঁদছে, মাঝে মাঝে নাক মোছার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু হ'লে কি হয়, পরস্পর মুখ না দেখতে পেলে সবই বৃথা। দলমাদল মাঝে থাকায় সমস্তই পণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে; অথচ এই দুষমণকে কেন যে ঠেলে বিছানা হ'তে দূর করে দিচ্ছে না, তার কারণ কিছুই জানা যায় নি।

কিছুক্ষণ পরে, এ অবস্থা যখন অতীত হ'ল, তখন দুই তরফই বাক্যময় কামান পাতল। তরঙ্গিণীর তরফে

'মেশিন গন্' হ'তে মিনিটে ছুশো ষাটটী অগ্নিময় গুলি ছুটল; রজতের তরফের 'সীজ গান্' এক একটী 'শেলে' তরঙ্গিণীর এলাকা ছারখার করে দিতে লাগল। ঐ দেখুন, তরঙ্গিণী যখন নিজের অদৃষ্ট বর্ণনা করে হাজার বুড়ি কথা শুনিয়ে দিল, রজত আরও দম বন্ধ করে চুপ করে রইল। তরঙ্গিণী এতে আরও জ্বলে উঠল; শেষে জোর গলায় ঈষৎ ক্রন্দনের স্বরে বলে উঠল, "আমার মা হাজারবার নিষেধ করছিলেন যে, 'র' যার নামের আগে, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও না; বাবা কিছুতেই সে নিষেধ শুনলেন না। মা বলতেন—

"রক্ত চড়ে মাথায় তার
হয় ভীষণ রাগী;
বউকে দেখে বিষ নজরে
করে দোষের ভাগী;
'র' যার আদ্যক্ষর
সে কি আবার বর?
কোন্ মেয়ে অভাগী বলো
করবে তা'র ঘর?"

এখন দেখছি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে (ক্রন্দন)...

তরঙ্গিণী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, রজত এতক্ষণ পরে বাধা দিয়ে গর্জ্জে উঠল, "ঠাকুরমার কথাই ঠিক; যে স্ত্রীলোকের নামের আগে 'ত' সে হবে জলের মত তরল, নিশ্বাসে চঞ্চল, গড়িয়ে যাবে, একটু তাপে টগ্‌বগ্ ফুটতে থাকবে।"

আর কত বলবো? রণক্ষেত্রে ঘন ঘন গোলা বর্ষণ; আহা উহু দীর্ঘশ্বাস; স্ফুট ও অস্ফুট ক্রন্দন; ছট্‌ফট্ শব্দ; প্রাণত্যাগের ইচ্ছা জ্ঞাপন; ছারপোকা বা মশা কিছুই নাই, অথচ সারা অঙ্গে অস্বস্তি; ইত্যাদি ইত্যাদি নানা-প্রকার অসন্তোষের অভিব্যক্তি চলতে লাগল। শেষে তরঙ্গিণী বুঝল, বিপক্ষ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, না হয় রণশ্রান্ত; কোন সাড়া শব্দ নেই। ইচ্ছা হ'ল, পরীক্ষা করে দেখে; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, কাজ কি বাপু, শেষে বলবে সাধছে, হিতে বিপরীত হবে; তার চেয়ে চুপ করে থাকা ভাল; বলে, বোবার শত্রু নেই।

শয়ন-কক্ষ নীরব নিথর। নাসার নিশ্বাস' শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দীর্ঘ নয় হ্রস্ব। হয় ঘুম এসেছে, না হয় এল বলে। সময়—রাত্রি সাড়ে বারটা।

দুই

"তরু, ও তরু।"

তন্দ্রালস নয়নে তরঙ্গিণী চেয়ে দেখল যে, অতি বৃদ্ধা এক ভৈরবী তার শয্যাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। ভীতা তরঙ্গিণী শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, "কে তুমি? সদর, খিড়কী দালান, ঘর, সব দুয়ার বন্ধ, তুমি কি করে এলে?"

ভৈরবী উত্তর দিল, "তুমি আমায় এক মনে, এক প্রাণে কাতর হয়ে স্মরণ করছিলে, তাই এসেছি। আমি আকাশ, বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকি; আলোয় ভর করে যাতায়াত করি; মনে করলেই যেখানে সেখানে যেতে পারি; আমার শরীর রক্ত-মাংসের নয় যে, কোথাও আটকে যাবে।"

"ঠাকুরমার কাছে, আমাদের বংশের যে কামাখ্যার মন্ত্র-সিদ্ধা ভৈরবীর কথা শুনেছিলাম, তুমি কি সেই ভৈরবী?"

"হাঁ, আমি সেই ভৈরবী, তোমার অতিবৃদ্ধ পিতামহের মা। শোন তরু, এই বালিশটা এখনি খাট হ'তে নীচে ফেলে দাও। ওটার ভিতর কুঁদুলে ভিটের শিমুলগাছের তুলা আছে; কস্মিনকালে বিছনায় এনো না।"

তরঙ্গিণী ধাক্কা দিয়ে দলমাদলকে বিছানা হ'তে দূর করে ফেলে দিল।

"রজতকে আমি কামাখ্যা-দেবীর মন্ত্রগুণে ভেড়া করে ফেলেছি। চাদরখানা তুলে তুমি আর রজতকে দেখতে পাবে না, একটী ভেড়া দেখবে। আজ বুধবার, কাল বৃহস্পতিবার, পরশু শুক্রবার, এই তিনদিন তাকে খুব সাবধানে রাখবে, যেন অন্যলোকে ভেড়া বলে না নিয়ে যায়। শুক্রবার রাত্রি পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ওই ভেড়া মানুষ হবে। ভয় কি তরু, অমন করছ কেন, আমায় স্মরণ করলেই আবার আসব..."

ফিক্ করে হেসে ভৈরবী জোছনার সঙ্গে মিশে গেল—আর দেখা গেল না।

তরঙ্গিণীর বুক কেঁপে উঠল। ভয়ে ভয়ে রজতের গায়ের চাদরখানা সরিয়ে দেখলে বাস্তবিক রজত নেই। একটী হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া......লেজ, লোম, শিং, লম্বা লম্বা কান, শুয়ে রয়েছে।

ভয়ে, ভাবনায় তরঙ্গিণী থরথর করে কাঁপতে লাগল; নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম—না কাঁদতে পারে, না চীৎকার করবার ক্ষমতা আছে। অতিকষ্টে ভেড়াটীকে তুলে, কোলে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। ভেড়াটি 'ভ্যা—ভ্যা' রব করে তরঙ্গিণীর হাত চাটতে লাগল।

এধারে এত ভারী বালিশ পতনের শব্দে মোক্ষদার নিদ্রা-ভঙ্গ হ'ল। প্রথমেই মনে হ'ল তার, দিদিমণি বোধ হয় খাট থেকে মেজেতে পড়ে গেল। ঘুমজড়িত ত্রস্তকণ্ঠে মোক্ষদা শয়ন-কক্ষের দ্বারে এসে ডাকল, "দিদিমণি, অ দিদিমণি...পড়ে গেছ..."

দিদিমণির উত্তর দিবার ক্ষমতা লুপ্ত। কি ভেবে, মোক্ষদা আর ডাকল না। দালানের দরজা খুলে প্রাঙ্গণে এল। সেখান হ'তে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে দেখল, দিদিমণি তার বিছনার উপর বসে—কোলে একটী ভেড়া। আশ্চয্য···অবাক!

মোক্ষদা ভাবল, কিছু না, বাবুর সম্বন্ধী অক্ষয়বাবু শুক্রবার 'ফিষ্ট' হবে বলে, যে ভেড়াটা এ বাড়ীর গোয়ালে বেঁধে রেখে গেছে, এটী সেই ভেড়া। কিন্তু এই নিঝুম রাতে দিদিমণি বিছনা ছেড়ে গোয়ালে গেল কেন; আর বাবু রয়েছেন শুয়ে যে বিছনায়, তাঁর পাশে ভেড়া কোলে করে বসে রয়েছেন কি সাহসে? প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে মোক্ষদা গোয়ালে ঢুকল; দেখলে যেখানকার ভেড়া সেইখানেই আছে। তবে? মোক্ষদার মাথাটা ঘুরে গেল। একটু সামলে, নিজের বিছনায় এসে শুয়ে পড়ল। ফেরবার সময় আবার দেখল দিদিমণি ঠিক তেমনই ভেড়া কোলে করে বসে আছে।

এরপর মোক্ষদার আর ঘুম হয় নি। বাকী রাতটুকু সে ভেবে ভেবে কাটিয়ে দিল। ভোর না হতেই তরঙ্গিণী ডাকল, "মোক্ষদা উঠেছিস......আ মর···এখনও ঘুম ভাঙে নি...

"কেন দিদিমণি? তোমার জন্য আমার সমস্ত রাত ঘুম হ'ল না, জেগে কাটালুম, আর তুমিই পাড়ছ গাল···বলে, 'যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর'।"

"কি হয়েছে আমার যে, তোর মাথার ব্যথায় ঘুম হ'ল না। জ্বালাস নে বাপু, একে বিপদে পড়েছি......এমন বিপদ হয় না। এক গাছা ঝাড়ু, এক বালতী জল আর ফেনাইলের বোতলটা দে···ঘরটা পরিষ্কার করি।"

মোক্ষদা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তবে ত' ভেড়াটাই ঘরে···। তরঙ্গিণী বিলম্ব সহ্য করতে না পেরে নিজে ছুটে চলে গেল। অগত্যা মোক্ষদাও পিছু পিছু চলল।

"নে নে, উনুনে আগুন দে, না হয় ষ্টোভ ধরা। কখন চাকর বামুন আসবে, তাদের আশায় থাকা যায় না। চা, পরটা, হালুয়া, এই মুহূর্ত্তেই চাই।"

শয়ন-কক্ষের মধ্যে কি ঘটেছে, তার নিখুঁত খবরটী পাবার জন্যে মোক্ষদার মাথা ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল। চাবিবন্ধ ঘর··জানলাও বন্ধ···বাবুর সাড়াশব্দ নেই··· অথচ ভিতরে ভেড়া...তার জন্যে দিদিমণি ছুটোছুটি করছে...

চকিতে তরঙ্গিণী চাবি খুলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। মোক্ষদা আসছিল, কিন্তু তাকে আসতে দিল না; ভিতর হ'তে দরজা বন্ধ করে দিল। অগত্যা মোক্ষদা নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে ফিরে গিয়ে ষ্টোভ জ্বালল।

তরঙ্গিণী ঘর পরিষ্কার করে বাহিরে এল এবং তৎক্ষণাৎ দরজায় তালা বন্ধ করল। এই অবসরে মোক্ষদার সন্দেহ-ভঞ্জন হয়ে গেল; দিনের আলোয় সে ভাল করে দেখে নিল, ভেড়াটা মেঝের উপর দাঁড়িয়ে।

থালা সাজিয়ে পরটা, ভাজি, হালুয়া, পূর্ব্বদিনের হিংয়ের কচুরি, চা, তরঙ্গিণী ভেড়াটীকে পরিতোষপূর্ব্বক খাইয়ে এল। ভেড়ার তৃপ্তিরব...'ভ্যা ভ্যা'...বাহিরে থেকে শোনা গেল।

প্রাতঃকাল এক রকম কাটল। মধ্যাহ্নে ভাত, তরকারী

তরঙ্গিণী নিজ হাতে খাইয়ে এল। মোক্ষদাকে বলল, "পরটা, তরকারি, ভাত, বামুনকে বল্, যেন দাদার ভেড়াটীকেও কিছু কিছু দেয়। আহা, সেও ত' ভেড়া··· কে জানে..."(দীর্ঘনিশ্বাস)

ভোজনান্তে পান খাবার সময় তরঙ্গিণী ইতস্ততঃ করতে লাগল। ভেড়াটীকে পান না খাইয়ে, নিজে কি করে খায়। মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসিল, "হ্যাঁ মোক্ষদা, ভেড়াতে পান খায় কি না বলতে পারিস্ ?"

মোক্ষদা বলল, "দাঁড়াও, পরখ করে দেখি।"

তাড়াতাড়ি চারখিলি পান নিয়ে গোয়ালের ভেড়াকে দিল। মহা আনন্দে সে খেয়ে ফেলল।

"ও দিদি খায়...এই ত' খেয়ে ফেললে।"

ফিরে এসে মোক্ষদা দেখল, দিদি ঘর হ'তে বেরিয়ে দরজায় চাবি দিচ্ছে। এক গাল হাসি, মুখে পান।

"মোক্ষদা, তুই হয় ত' ভাবছিস বাবু কোথায় গেল, ভেড়াই বা কোথা হ'তে এল, আমিই বা নিজে এত কাজ করছি কেন। ওলো, এর ভেতর দৈবব্যাপার আছে। তিনদিন, এই তিনটী দিন সবুর কর বোন্···তারপর সব বলবো, সব শুনবি। পরশু শনিবার, সকালবেলা আর কোন ভয় থাকবে না, তখন নির্ভয়ে বলবো।"

চাকর, বামুন, দরোয়ান সকলে শুনল বাবু বাড়ী নেই ; কোথায় গেছেন, শনিবার ভোরবেলা ফিরবেন।

দ্বিতীয় দিন—বৃহস্পতিবার। বেশ কাটল। গায়ে একটু গন্ধ হয়েছিল বলে, সাবান মাখিয়ে ভেড়ার গা ধুয়ে দিল, 'টুথপেষ্ট্' 'ব্রশ্' দিয়ে দাঁত মেজে দিল, চিরুনি দিয়ে গায়ের লোমগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ে দিল। ভেড়াটী চক্ষু বুজে তরঙ্গিণীর এই সস্নেহ অক্লান্ত সেবা উপভোগ করল।

পরদিন—শুক্রবার। বেলা চারটা পর্য্যন্ত ভয় ভাবনার কোন কিছু কারণ দেখা দিল না। নিশ্চিন্ত মনে মোক্ষদার সঙ্গে গল্প করতে করতে তরঙ্গিণী বলল, "দে চুলটা আঁচড়ে ; আজ আর বাঁধব না, কাল বিকেলে দেখা যাবে।"

বেলা পাঁচটার সময় সাক্ষাৎ ধূমকেতুর মত তরঙ্গিণীর দাদা অক্ষয় দেখা দিল। দাদাকে দেখেই তরঙ্গিণীর সর্ব্বাগ্রে নজর পড়ল শোবার ঘরের দরজার দিকে। ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল, মুখ শুকিয়ে গেল ; ওই যাঃ...শোবার ঘরের দরজায় চাবি দিতে ভুল হয়ে গেছে! দরজা ভেজান ; বাইরে থেকে ঠেললেই খুলে যাবে।

মহা ব্যস্তবাগীশ দাদা বলে উঠল, "ওরে আজই 'ফিষ্ট' ; ভেড়াটা নিতে এসেছি।"

শুষ্ককণ্ঠে তরঙ্গিণী উত্তর দিল, "ওই যে গোয়ালে বাঁধা আছে দাদা, নিয়ে যাও। অ মোক্ষদা, ভেড়াটাকে বার করে নিয়ে আয়। চলো দাদা, উঠানে ভেড়া দেখবে চলো।"

তরঙ্গিণী সাহসে ভর করে দাদার হাত ধরে উঠানে এসে দাঁড়াল। পরক্ষণে সহসা প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল।

মোক্ষদা গোয়ালে খোঁটা হ'তে দড়ির ফাঁসটী সবে খুলেছে, এমন সময় ভেড়াটা সশব্দে গলার দড়ি সমেত ছুটে পালাল। যাবি ত' যা', রোয়াকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে একেবারে দালানে প্রবেশ করল। তার মুখের শব্দ শুনে শয়ন-কক্ষের ভেড়াটী শব্দ করতে লাগল। বাহিরেরটা যখন বুঝল যে, ভিতরে তার সঙ্গী আছে, তখন সে মহা উৎসাহে সলম্ফ 'ঢু' মেরে শয়ন-কক্ষের দরজা খুলে ফেলল। মহা আনন্দে দু'টী ভেড়া সশব্দে শিং ঠোকাঠুকি আরম্ভ করল।

তরঙ্গিণী, তার দাদা, মোক্ষদা, ত্বরিতপদে দালানে প্রবেশ করেই এই লড়াই দেখল।

উৎসাহে অধীর হ'য়ে দাদা বলে উঠল, "ওরে, ঘরের ভেড়াটাই নিয়ে যাব। এটা নিশ্চয় রজত কিনে রেখেছে ; পাছে আমি দেখে ফেলি, এই ভয়ে তুই ঘরের ভিতর লুকিয়েছিস।"

বিষম প্রমাদ! দাদা ঘরে প্রবেশ করে পুরুষ্ট ভেড়াটীকে ধরবার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল ; তরঙ্গিণী ও মোক্ষদা কৌশলে যথাসাধ্য বাধা দিতে ক্রটি করল না। এই সুযোগে গোয়ালের কেনা ভেড়াটা কখন যে ঘর হ'তে অন্তর্ধান হ'ল, কেউ লক্ষ্য করল না। শেষে দাদা বলে উঠল, "ঐ যাঃ...আমার ভেড়াটা পালিয়েছে···আর উপায় নেই...তোর ভেড়াটা নিয়ে চল্লুম।" দাদা ভেড়াটীর কান ধরল।

তরঙ্গিণী অমনি দাদার পায়ের উপর মাথা রেখে কান্না

আরম্ভ করল, "ওটা নিও না দাদা, নিও না...তার চেয়ে আমার গলায় ছুরি দিয়ে আমার মাংস খাও।"

নেবো না ত', আজকার 'ফিষ্টে'র দশা কি হবে বল্ ?

"আমি তোমায় এই রকম চারটে ভেড়া কেনবার টাকা দিচ্চি।"

"পঁচিশ টাকার নীচে এরকম ভেড়া পাওয়া যাবে না, তুই একশো টাকা দিবি ?"

"নিশ্চয় দোবো।"

"দেখি তোর ক্ষমতা...দে একশো টাকা।"

তরঙ্গিণী বাক্স খুলে দশখানা দশটাকার নোট বার করে দিল।

"ওঃ...বড়লোক হয়েছিস দেখছি···নে নে, টাকা রাখ্ ...আমি চাই না···চল্লুম তা' হ'লে...কিন্তু যাবার আগে... ভেড়ার কান কেটে দেব।"

দাদা ছুরি বার করল। তরঙ্গিণী সজোরে দাদার হাত চেপে ধরল।

"দাদা, তুমি আমার কান কাটো···ভেড়ার কান কেটো না।"

"ইস্, ভারী দরদ দেখছি...কি হ'লি রে...রজতের ভেড়া বলে, এও রজত না কি ?"

দাদা ভগ্নীর কাতরতা দেখে কোনমতে বিরত হ'ল। তরঙ্গিণী ধমক দিয়ে মোক্ষদাকে বলল, "ওরে, দাদার জন্যে খাবার আর চা নিয়ে আয় ... কখন দিবি বল ত'···চলে যাচ্ছে যে।"

"আজ থাক্, বড় দেরী হ'য়ে গেছে···ভেড়া কিনতে হবে···অনেক কাজ বাকী..."

দাদা ঝড়বেগে যেন উড়ে চলে গেল। মোক্ষদা জলখাবার ও চা নিয়ে এসে দেখল, তরঙ্গিণী দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে ...আর খুলবে না, বলল।

তিন

রাত্রিশেষে রজতের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল; কিন্তু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত দুঃসপ্ন দেখার দরুণ ভয়ে চক্ষু মেলতে সাহস করল না। বুঝলে, তরু পা টেপা শেষ করে মাথায় হাত বুলাচ্ছে।

"এখনও এমন শব্দ করছ কেন ? সারারাত ত' ভুল বকেছ ...বিছানায় ছট্‌ফট্ করেছ...গা গরম···আমি ত' ভয়ে কাঁটা হ'য়ে গেছি...বিকার, না কি হয়েছে···জেগেছ ত', চোখ মেল . আমি তরু..."

তরঙ্গিণী রজতের বুকের উপর তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি রাখল। রজত ভয়ে ভয়ে তরুর কানের উপর মুখ দিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞাসিল, "আমি মানুষ হয়েছি ?"

"এ কি কথা ? কি হয়েছিল ?"

"ভেড়া।"

তরঙ্গিণী হেসে ফেলল। রজত ছাড়ল না, ধীরে ধীরে সব সপ্নটা শুনিয়ে দিল। তরঙ্গিণী যখন বুঝল, বড় ভয় পেয়েছে, ভয় না ভাঙালে বিছানা হ'তে উঠতেই পারবে না, তখন তাকে একে একে প্রমাণ করতে হ'ল, শিং, ক্ষুর, লোম, লেজ এ সকলের এখন কিছুই নেই; দুই কান টেনে টেনে বুঝিয়ে দিল যে, তার দাদা তার কান কাটে নি; যেমন কান তেমনি আছে। সপ্নের ঘোর এতক্ষণে কেটে গেল।

"তরু, আর কখনও তোমার ওপর রাগ করব না !"

এই বলে তরঙ্গিণীর মুখে তিনটী চুম্বন মুদ্রিত করল। রজতের সে দিনকার এই বউনি পয়মন্ত বলতে হবে; কেন না, এরপর সারাজীবন তাদের ভালই যাচ্ছে।

ভৈরবী মাঝে মাঝে আসে; কারুর প্রয়োজন থাকে ত' আমাদের জানালে, রজত বা তরঙ্গিণী মারফৎ তাঁর সাহায্য চাইতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীবজ্রাচার্য্য

অসার্থক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

বিষ্ণুপদ ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল : কি ঠিক্ করে এলেন সরকার-মশায়? 'ভারতী অপেরা'-ই আস্‌ছে ত?

রঙীন রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বিষ্ণুপদ উত্তর দিল : আরে বাবা, এ শর্ম্মারাম যখন গ্যাছে, তখন কি আর একটা হেঁজিপেঁজি দল বায়না করে' আসবে? গিয়ে দেখি বরিশালের কোথাকার কোন্ এক জমিদার-বাড়ী থেকে লোক এসেছে ভারতী অপেরার বায়না কর্‌তে। লোকটা নিতান্ত গেঁয়ো ভূত। এই বোধ হয় প্রথম এসেছে কোলকাতার যাত্রার দল নিতে। আড়াই শো টাকা বলে' ম্যানেজারের হাতে পায়ে ধর্‌তে সুরু করেছে। আমি গিয়েই একেবারে সাড়ে তিন শো হেঁকে দিলুম। আমার ত আর দালালীর কারবার নয় বাবা। পাণিঘাটার প্রসন্নবাবু—কেউ কেটা লোক নয় ত,—তাঁর ত ইজ্জৎ বাঁচাতে হবে। ম্যানেজার বরিশালের ঐ লোকটার পানে আর না চেয়ে একেবারে আমার সঙ্গেই পাকা কথা ঠিক্ করে ফেল্‌লে। তিন রাতেই সম্প্রদায়ের বাছা বাছা লোকদের নামাতে হবে, এই রকম 'এগ্রিমেণ্ট' করে' এলুম।

শ্রোতাদের উৎসাহ উৎকট হইয়া উঠিল। হাত ঘুরাইয়া এক ব্যক্তি বলিল—এবার তা' হ'লে ছ'-আনির বাড়ী মাছিও ভন্‌ভন্ করবে না, কি বলেন সরকার-মশায়?

উত্তর সরকার-মহাশয়কে দিতে হইল না। অপর এক-ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—তুমি কি পাগল হ'লে পেল্লাদ-দা'? ভারতী অপেরা ফেলে লোকে যাবে গিলেতলার ওই হাড়-ছাড়া দলের গান শুনতে! বেটাদের রাজার পোষাকের ত সাত জায়গায় ছেঁড়া, রাণীর মাথার চুলে জটা বেঁধে গেছে, মন্ত্রীর পাগড়ী দিয়ে ন্যাকড়ার ফালি উড়ছে। লোক-গুলো নেহাৎ বেহায়া, তাই ওই রকম সাজ-পোষাক নিয়ে যাত্রা গাইতে আসে। ছ'-আনির সেজবাবুরও যেমন বিবেচনা—ও রকম যাত্রা বায়না না করে' একটা ভাল তরজার দল নিয়ে এলেও লোকে শুন্‌তো!

নাক সিঁটকাইয়া বিষ্ণুপদ বলিল—বুঝ্‌লে না হৃদয়, ও-সব হ'ল গিয়ে তোমার নাম জাহির করা। যে,—পূজোর সময় আমার বাড়ীতেও তিনরাত ধরে' যাত্রাগান হয়েছে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ—কার সঙ্গে কার তুলনা! কোলকাতার সেরা দল ভারতী অপেরা, তার সঙ্গে টেক্কা দেবে কি না গিলে-তলার দল,—পূজোর মরশুমে যার বায়না হ'ল গিয়ে তিন রাতে মাত্র পঁচাত্তরখানি টাকা। এ যেন সিঙ্গীর সঙ্গে শেয়ালের লড়াই! সেজবাবুকে গিয়ে বলো, একদিন যেন এসে প্রসন্নবাবুর বাড়ী গান শুনে যান,—বুঝবেন, গান কা'কে বলে।

বৃদ্ধ হারাণ মণ্ডল এককোণে দাঁড়াইয়াছিল। অসহিষ্ণু হইয়া সে বলিল : বেশী বাড়াবাড়ি করো না বিষ্টুবাবু, ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। আজ নয় দশ-আনির অবস্থা ফিরেছে। কিন্তু মনে করে দেখো, ভাল গান যা' এ অঞ্চলে হয়েছে, তা' সবই সেজবাবুর বাড়ীতে—মতিরায়, ভূষণ দাস, বৌকুণ্ড, শ্রীচরণ ভাণ্ডারী—এ সব দলের গান সেজবাবু না দিলে আর কোথাও গিয়ে শুন্‌তে হ'ত না। চিরদিন অবস্থা কারও সমান থাকে না,—তাই বলে' অতটা তুচ্ছ করা ভাল নয়।

হারাণের কথায় ভিড়ের মধ্যে উৎসাহ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেল,—এক একজন করিয়া লোকও কমিয়া যাইতে লাগিল। বিষ্ণুপদকে উদ্দেশ করিয়া হৃদয় জানা বলিল : বেশী কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সরকার-মশায়। আসুন, আমার দোকানে বসে' তামাক খাবেন চলুন।

ষ্টেশনের কাছে চৌমাথার মোড়ে বসিয়া ফটিক পান-বিড়ি বেচিতেছিল। ফটিকের বয়স মাত্র সতেরো বছর। অল্পবয়সে বাপ-মা মারা যাওয়ায় ফটিক এক বিধবা পিসীর

গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছিল। পিসীর ছেলেমেয়ে ছিল না। ফটিককে সে আদরই দিত। হতভাগা ছেলেটা একটু লেখাপড়া শিখিয়া যাহাতে 'ভদ্রলোক'দের মত চাকুরী করিয়া খাইতে পারে পিসীর মনে সেই ইচ্ছাটাই খুব বেশী ছিল। সে পাড়ার গুরুমহাশয় তিনকড়ি ভবাই-এর পাঠশালায় ফটিককে ভর্ত্তি করিয়া দিল। ফটিকের বিদ্যা-শিক্ষা দুই-এক বৎসর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই তাহা পিসীর দেওর নন্দলালের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। সে কারণে অকারণে এই বিষয় লইয়া বিধবা ভাজের সহিত ঝগড়া বাধাইত; বলিত: লেখাপড়া শিখে তোমার ভাইপো একেবারে জজ-ম্যাজিষ্টর হবে। আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে। যা' শিখেছে, ওই ঢের,—এখন গিয়ে কাজকর্ম্ম করে খাক্। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ধরে' কে এমন কাঁড়ি কাঁড়ি জোগাতে পারে?

নন্দলালের বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হইয়া পিসী শেষে একদিন ফটিককে লইয়া পৃথক হইল। প্রথম প্রথম লোকের বাড়ীতে ধান ভানিয়া, মুড়ি ভাজিয়া, ঘুঁটে দিয়া দু'জনকার দিন চলিত, ফটিকের পড়াশুনাও চলিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পিসীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, ফটিককে পড়া ছাড়িতে হইল। শুধু তাহাই নহে, নিজের এবং পিসীর দু'জনেরই খোরাকের যোগাড় তাহাকেই করিতে হইল।

পান-বিড়ি বেচিয়া যাহা উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই কোনরকমে দু'টী প্রাণীর দিন চলিয়া যাইত।

যাত্রা শুনিতে ফটিক বড় ভালবাসিত। চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে কোথাও যাত্রাগান হইলে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হইত। দোকানপাট ফেলিয়া, পিসীর শত-সহস্র মাথার দিব্য অগ্রাহ্য করিয়া সে যাত্রা শুনিতে ছুটিত।

বিষ্ণুপদর মুখে ভারতী অপেরার নাম শুনিয়া ফটিক একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, চাঁদখালির বারোয়ারীতে সাঁতরা কোম্পানীর গান শুনিয়া আসিয়া সে খুব প্রশংসা করাতে, চাটুয্যে-পাড়ার অরুণবাবু বলিয়াছিলেন: যা' যা' ছোকরা! কোথাকার এক 'হ্যাগার্ড' দলের গান শুনেই তোর এত ফূর্ত্তি, আর যদি ভারতী অপেরার গান শুনতিস্ ত একেবারে ক্ষেপে যেতিস বোধ হয়।

অরুণবাবু কোলকাতার এক বড়লোকের বাড়ীতে কাজ করে—(সে নিজে বলে, 'ম্যানেজার', কিন্তু শত্রুপক্ষ বলে 'বাজার সরকার') বাবুয়ানায় সারা গ্রামের মধ্যে তাহার জুড়ি পাওয়া ভার। সেই অরুণবাবুর মুখেই যখন ভারতী অপেরার এত প্রশংসা, তখন না জানি কী চমৎকারই তাহারা গায়! ফটিক একেবারে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। মাঝের এই ক'টা দিন এখন কাটিয়া গেলে হয়।

নিজের একটাও ভাল জামা-কাপড় নাই মনে করিয়া ফটিকের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। পিসীর অসুখে প্রায় তিন-চার টাকার ঔষধ যদি না লাগিত, তাহা হইলে সে অক্লেশেই একটা ডোরা-কাটা ছিটের শার্ট ও একখানি নরুণ পেড়ে ধুতি কিনিতে পারিত। একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ফটিকের বুকখানা তোলপাড় করিয়া তুলিল। এখনও বেণোয়ারী ডাক্তারের ভিজিটের টাকা বাকী। পূজার আগেই তাঁহাকে অন্ততঃ একটা টাকা না দিলে সে আর ঔষধ দিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ফটিক দুই পয়সা দিয়া একখানা কাপড় কাচা সাবান কিনিয়া লইয়া গেল। তাহার পিসীর দেওরের মেয়েব বিয়ের সময়, পিসী অনেক কষ্টে তাহাকে একখানি নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়াছিল। কাপড়খানি অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহার হইলেও তখন পর্য্যন্ত ছিঁড়ে নাই। ফটিক অতি যত্নে সেই কাপড়খানি ও একটী পুরাতন জামা সাবান দিয়া কাচিল। রোদে শুকাইবার পর সে একটা বোতলের ভিতর গরম জল পুরিয়া কাপড় ও জামাটীকে মোটামুটি ইস্ত্রি করিয়া লইল। তারপর অতি যত্নে ভাঁজ করিয়া পুরাতন তোরঙ্গের এক-কোণে রাখিয়া দিল। এ কয়দিন সে ছেঁড়া কাপড় ও ছেঁড়া গেঞ্জিটী পরিয়াই কাটাইবে। ভাল কাপড় ও জামাটীকে সে মাত্র গান শুনিতে যাইবার সময় ব্যবহার করিবে।

* * *

দেখিতে দেখিতে পূজার দিন কাছে আসিয়া পড়িল। দশ-আনির সদরে নহবৎ বসিল,—পূজার দালানে চণ্ডীপাঠ সুরু হইল। আনন্দময়ীর আগমনে সর্ব্বত্র উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। রেল-ষ্টেশনে লোকের দারুণ ভিড়। প্রত্যেক ট্রেণেই বিস্তর লোক নামিতেছে,—দোকানীদের মাল-পশরায় প্লাটফর্ম প্রায় ঢাকিয়া ফেলিল।

ফটিকের পান-বিড়িও নেহাৎ মন্দ বিক্রয় হইতেছে না। ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিয়া-কহিয়া সে এখন প্লাটফর্মেই ফিরি করিতেছে। কলিকাতা হইতে অতবড় যাত্রার দল আসিতেছে,—আজ বা কালের মধ্যে যে কোন ট্রেণেই তাহারা আসিতে পারে। বিষ্ণুপদ ব্যস্ত হইয়া প্রায় সব সময়েই ষ্টেশনে হাজির আছে। ফটিক তাহাকে ভরসা দিয়াছে: ভয় কি সরকারবাবু! আমরা যখন রয়েছি, দলের লোকদের কোন অসুবিধা যাতে না হয় তা' আমরা দেখ্‌বো। আপনি শুধু গরুর গাড়ীওয়ালাদের ঠিক্ রাখ্‌বেন।

বিষ্ণুপদ তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল: একথা ত তোমরা বল্‌বেই। এ কি আর একজনের ব্যাপার? তুমি আছ, দাশু আছে, নিধিরাম রয়েছে—ভাবনা আমার আর কি? তবে কি জান,—তারা কোল্‌কাতা থেকে আস্‌ছে; কোনরকম অযত্ন হ'লে গ্রামেরই নিন্দে হবে। পূজোর বাজার, পঞ্চাশ রকম কাজ। কোন্ গাড়ীতে তারা আসবে তারও ঠিক্ নাই। মালপত্রগুলো কিন্তু বাবা আমাদেরই ধরাধরি করে' নামিয়ে দিতে হবে। আমার লোকজন সব চারদিকে নানা কাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

'ঘড়াং ঘড়াং' করিয়া ষ্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জমাদার হাঁকিল: গাড়ী ছাড়ে বাণপুর, আদমী লোক উধার হট্ যাও।

বহুদূরে যেখান হইতে ইঞ্জিনের ধোঁয়া উঠিতেছিল, জনতা আগ্রহ-দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে প্লাটফর্ম কাঁপাইয়া গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। চারদিকে লোকজনের সোরগোল পড়িয়া গেল।

বিষ্ণুপদ চীৎকার করিয়া উঠিল: ফটিক, দাশু, নিধিরাম মতি, এদিকে এসো বাবা সব—এঁরা সব এসেছেন। তাড়াতাড়ি সাজ-পোষাকের বাক্সগুলো সব নামিয়ে ফেলো। গাড়ী আবার তিন মিনিটের বেশী দাঁড়াবে না।

ঢেউ খেলান চুলে চেরা সিঁথির বাহারওয়ালা যাত্রা-দলের ছোকরারা বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে শ্লিপার পায়ে প্লাটফর্মের উপর নামিয়া পড়িল।

একটা বড় ভারী বাক্স ফটিকের মাথায় চাপাইয়া দিয়া বিষ্ণুপদ বলিল: এখানে আর দেরী করো না বাবা। একেবারে নাসিম-আলির গাড়ীতে গিয়ে তুলে দাও।

ফটিক বলিল: ধরুন, ধরুন সরকার বাবু! এতবড় বাক্স আমি নিতে পারবো না। উঃ, কী ভারী!

ঝাঁজালো সুরে বিষ্ণুপদ উত্তর দিল: না, পারবি না। অত বড় জোয়ান, এইটুকু বাক্স নিতে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলি। পার্‌বি, পার্‌বি, একটু কষ্ট করে' যা' বাপু! ওই ত দাশু, নিধিরাম, ওরাও ত বড় বড় বাক্স নিয়েছে। না পার্‌লে চল্‌বে কেন বাবা? এত টাকা দিয়ে দল নিয়ে এলাম। সে ত আর আমরা একা শুন্‌ব না। শুন্‌বি ত তোরা সবাই। গায়ে-গতরে একটু না খেটে দিলে চল্‌বে কেন?

ফটিক আর কোন কথা বলিল না। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাক্সটা লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তাহার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল, সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। হাতের গামছাখানি ঘুরাইয়া সে হাওয়া খাইতে লাগিল।

নানা রকমের হাসি-ঠাট্টা, ইয়ার্কি দিতে দিতে যাত্রা-দলের লোকেরা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

অনেক্ষণ বসিয়া দম্ লইবার পর ফটিক নিজের পান-বিড়ির বাক্সটী মাথায় করিয়া ঘরের দিকে ফিরিল।

* * *

মহাসপ্তমীর পূর্ব্বাহ্ন।

দশ-আনির জমিদার-বাড়ী একেবারে লোকে লোকারণ্য।

গত বৎসর প্রসন্নবাবুর বড় নাতি খুব কঠিন ব্যায়রামে পড়িয়াছিল। মহামায়ার দয়ায় কোনরকমে তাহার প্রাণরক্ষা হয়। দেবীর নিকট মানত শোধ দিবার জন্য তাই এবার মহিষ বলি হইবে; ছাগ বলিও হইবে প্রায় সাত-আটটা! মহিষ বলি দেখিবার জন্য গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোকের ভিড় জমিয়াছে। একসঙ্গে পাঁচটা ঢাক বাজিতেছিল। সেই তুমুল শব্দে নিপীড়িত পশুর আর্ত্তনাদ অতল-তলে তলাইয়া যাইতেছিল।

পশু-বলি দেখিতে ফটিকের ভাল লাগে না। নিরীহ জন্তুর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাহার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে,—তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে! রুধিরের ধারা দেখিলে তাহার চোখ আপনিই বুজিয়া আসে।

কাছারী-বাড়ীর দপ্তরখানার এক অংশে যাত্রার দলের লোকদিগকে বাসা দেওয়া হইয়াছিল। ফটিক ছোকরা-দের সহিত ভাব করিবার জন্য সেখানেই ঘোরা-ফিরা করিতেছিল। কলিকাতার যাত্রার দলের ছেলে—কি করিয়া কাজ বাগাইতে হয়, তাহা তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে। ফটিককে তাহারা নিকটে ডাকিল ও তাহার সহিত দুই-চারিটি কথাবার্ত্তার পর বলিল: হ্যা হে, তোমাদের দেশে শুনেছি ভাল শশা পাওয়া যায়, টাট্কা মুড়ি আর কচি শশা আমাদের খাওয়াতে পারো? আমরা যা' হয় পয়সা দোব।

হাসিমুখে ফটিক উত্তর দিল: এই সামান্য জিনিষের জন্য আর পয়সা দিতে হবে না। আমি এখ্খুনি নিয়ে আসছি।

পিসীর জ্বর আসিয়াছিল। সে কাঁথা মুড়ি দিয়া শয্যার একপার্শ্বে চুপ করিয়া শুইয়াছিল। ফটিক জানিত ঘরের কোণে কালো কলসীতে পিসী আজ সকালেই মুড়ি ভাজিয়া রাখিয়া দিয়াছে। সে সন্তর্পণে কোঁচড় ভরিয়া মুড়ি লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল এবং নন্দলালের মাচা হইতে গোটা চারেক কচি শশা তুলিয়া লইয়া যাত্রাওয়ালাদের বাসাবাটীতে গিয়া হাজির হইল।

এইভাবে সমস্তদিন ধরিয়া সে তাহাদের ফরমাস্ খাটিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল।

* * *

জ্বর গায়ে ধুঁকিতে ধুঁকিতে পিসী ভাতে ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া ফটিক তাহারই চারিটী বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল। সে মনে করিয়াছিল, পিসী বোধ করি ঘুমাইয়া আছে। হাঁড়ি নড়িবার শব্দ শুনিয়া পিসী কাঁথার মধ্য হইতে মুখ বাহির করিল ও ফটিকের কাণ্ড দেখিয়া বলিল: হাঁরে হতভাগা, সমস্তদিন টো-টো করে' পূজোবাড়ীতে ঘুর্লি, কেউ তোকে এক মুঠো খেতেও বল্লে না?

ফটিক কোন জবাব দিল না। নীরবে খাওয়া শেষ করিয়া সে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিল। তারপর তোরঙ্গের মধ্য হইতে ফরসা কাপড়খানি ও জামাটী বাহির করিয়া পরিল।

পিসী বলিল: শোন্ ফট্কে, আরতি দেখেই চলে' আসিস্ কিন্তু। রাত জেগে হিম লাগিয়ে গান শুন্তে গেলে রোগে ভুগে মর্বি, তা' বলে' দিচ্ছি।

পিসীর কথার জবাব দেওয়া ফটিক কোনদিনই আবশ্যক বোধ করে না, আজও করিল না। এক বাণ্ডিল মিঠে-কড়া গোলাপী বিড়ি, একটা দেশলাই, ও একটী ঠোঙায় করিয়া কতকগুলি মশলাদার পানের খিলি পকেটে ফেলিয়া ফটিক বাড়ীর বাহির হইল। সে ভাবিল, যাত্রার দলের ছেলেরা গানের ফাঁকে ফাঁকে এই দ্রব্যগুলি পাইলে তাহার উপর অত্যন্ত খুসী না হইয়া পারিবে না।

জমিদার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেই সুমিষ্ট বাজনার শব্দ ফটিকের কাণে আসিয়া পৌঁছাইল। ফটিক বুঝিল ঐক্যতান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দাশুর উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। সেই হতভাগাটার জন্যই ত এত দেরী হইয়া গেল। হতভাগাটা নিজেও আসিল না, অথচ ফটিকেরও দেরী করিয়া দিল। ভারী ত মায়ের অসুখ! মায়ের অসুখ যেন আর কাহারও হয় না! তাহার জন্য এমন একটা সুযোগ নষ্ট করিতে হইবে না কি? এই ত তাহার পিসীও কতদিন ধরিয়া ভুগিতেছে! তাই

বলিয়া ফটিককে কি মুখ গোমড়া করিয়া দিনরাত ঘরে রুগীর পাশে বসিয়া থাকিতে হইবে না কি? ছ্যা, দেশোটার যদি কিছুমাত্র বোধ থাকে! কলিকাতার দলের গান যেন রোজই এদেশে হইতেছে! মরিবে শেষে হতভাগাটা আফ্‌শোষ করিয়া!

ফটিকের ভয় হইল, আসর হয় ত এতক্ষণে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। যে ছেলেটী 'উর্ম্মিলা'র পার্ট করিবে, সে তাহাকে ভরসা দিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহাকে দলের লোকের সঙ্গে আসরে বসাইয়া দিবে। এখন গিয়া তাহার দেখা পাইলে হয়। মেয়ে সাজিলে সে তাহাকে চিনিতে পারিবে কি না তাহাই বা কে জানে?

ফটিক দ্রুতপদে সদরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। বাজনার শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে দেউড়ির দিকে পা বাড়াইতেই দেখিল, বিস্তর লোক সেখানে ভিড় জমাইতেছে। তাহারা ভিতরে যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু জমিদার-বাড়ীর হিন্দুস্থানী পাইক লছমন্ সিং তাহাদিগকে বাধা দিতেছে। সে বলিতেছে: বড়বাবুর হুকুম, ভিতরে জায়গা কম, কতকগুলি বাজে লোক গিয়া গোলমাল করিলে গান নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং যে সকল প্রজা গানের চাঁদা আনিয়াছে, মাত্র তাহাদিগকেই ভিতরে যাইতে দেওয়া হইবে। বাকী লোক যেন এখানে হল্লা না করে।

ফটিকের মুখ শুকাইয়া গেল। লছমন্ সিং বড় সোজা লোক নয়। মনিবের হুকুম সে কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া পালন করে। তাহার নিকট দয়া-মায়ার প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

তবু মরিয়া হইয়া ফটিক বলিল: সিংজী, আমায় ভেতরে যেতে দাও। আমি ত বাবুদেরই লোক। এই ত কাল সকালে ইষ্টিশানে পোষাকের বাক্স বয়েছি; আজ সমস্ত দিন ধরে যাত্রাওয়ালাদের সাথে সাথে ঘুরেছি। না হয় তুমি গিয়ে সরকার-বাবুকে জিজ্ঞেস করো।

ঈষৎ আরক্ত চক্ষু দুইটিকে বিস্তৃত করিয়া সিংজী বলিল: তুমি লাট সাহেবের নাতি আছ কি না, তাই তোমার হুকুমে দেউড়ি ছেড়ে আমি সরকার-বাবুকে পুছ্‌তে যাই। যাও, যাও, চেঙড়া ছোকরা, এখানে হল্লা করো না। সরকার-বাবু ত এখন টাকা জমা করছে।

ফটিকের পায়ের নীচে হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া গেল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আর কোন কথা না বলিয়া সে একপাশে অন্ধকারের মধ্যে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিতাড়িত জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল: ভারী আমার বড়লোক! জমিদারী চাল দেখাচ্ছেন! গরীব প্রজার কাছে ভিক্ষে করে, গরীবের রক্ত চুষে চাঁদা আদায় করে' কোলকাতার দলের গান দিচ্ছেন। এদের যে লজ্জা বোধ হয় না, এইটেই বড় আশ্চর্য্য! চলো ভাই সব, এখানে দাঁড়িয়ে অনর্থক অপমানিত না হ'য়ে আমরা সেজ-বাবুর বাড়ীতে যাই। সেখানে আর যাই হোক্, শেয়াল-কুকুরের মত তাড়া খেতে যে হবে না, তা আমি হলপ্ করে' বল্‌তে পারি। কাজ নেই আমাদের শহরের বড় দলের গান শুনে, আমাদের দেশী দলই ভাল।

হতবুদ্ধি ফটিক কতকটা নিজের [illegible] বিমূঢ়ের মত সেই জনতার অনুসরণ করিল।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
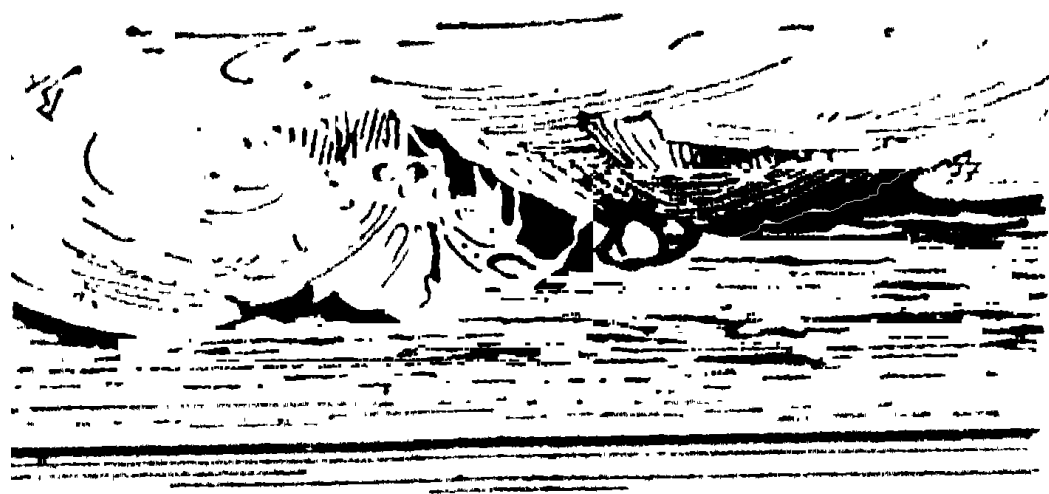
প্রেমের বিচিত্র গতি

শ্রীহরিপদ গুহ

আজ যে প্রেমের কাহিনী বল্‌তে বসেছি, এটি আমার দিদিমার মুখে শোনা। ঘটনাটা না কি তাঁর চোখে দেখা। এতে গল্পের 'টেক্‌নিক্' এবং 'রোমান্স' যথেষ্টই আছে—এখন আপনাদের ভাল লাগ্‌লেই খুসী হবো।

অনেকদিনের পুরনো কথা।

বর্ষাকাল। চারিদিক জলে একাকার হয়ে গেছে।

এই সময় বেদেনীরা নৌকোয় করে নানারকম জিনিষ, খেল্‌না এবং মেয়েদের শাঁখা, চুড়ি ইত্যাদি নিয়ে লোকের বাড়ীর ঘাটে ঘাটে নৌকো লাগিয়ে হাঁক দিতে থাকে—কই গো সোনা দিদিরা, তোমাদের জন্য ভাল ভাল শাঁখা, চুড়ি, খেলনা এনেছি, নেবে এসো।

পাড়ার কোন মেয়ে কিংবা কোন বউ যদি এ ডাক শুন্‌তে পায়, অমনি সে আনন্দে ছুটে গিয়ে তার ননদ কিংবা ভাজকে তা' জানায়। তখন দেখতে দেখতে সমস্ত পাড়ায় একটা সাড়া পড়ে যায়। বাড়ীর গিন্নী এবং বউ-ঝিয়ে সমস্ত ঘাটটি ভরে ওঠে। বর্ষাকালে এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

সেবারও ঠিক্ এই রকম একটা বেদের নৌকো এসেছিলো। নৌকোয় ছিলো দু'টি বেদিনী আর একটি বেদে। মেয়ে দু'টী দুই বোন্; আর পুরুষটী বড় বোনের স্বামী।

এদের কোনো বাড়ীঘর নেই; বার মাস এরা নৌকো-তেই বাস করে। জল কমে গেলে, এরা নদীর মোহানায় খালের ভেতরে গিয়ে থাকে।

মা-বাপ হঠাৎ মরে যাওয়ায় ছোট বোন্‌টীকে দিদি নিয়ে যায়; সেই থেকে সে তার দিদির কাছেই আছে। এদের দেখ্‌লে কিন্তু দুই বোন্ বলে কারো মনে হবে না। বড়টী যেমনই কুশ্রী, ছোটটী আবার তেমনই সুন্দরী। তার মুখের দিকে চাইলে অতি বড় সংযমীরও চোখ ফেরানো দায় হয়ে ওঠে। চাঁপাফুলের মত তার গায়ের রঙ, বড় বড় টানা দু'টী কাজল-কালো চোখ, এক মাথা কালো কুঞ্চিত কেশ কটি পর্য্যন্ত নেমে এসেছে—এক কথায় বল্‌তে গেলে সে রূপ-কথার রাজকুমারী।

বড় বোনের নাম দুলিয়া; তার বয়স প্রায় বছর কুড়ি, আর ছোট বোনের নাম ফুলিয়া; বছর ষোল-সতেরো তার বয়স।

বড়টীর পরণে একটী প্যাঁজ রঙের শাড়ী, আর ছোটটীর পরণে একখানি নীলাম্বরী।

মেয়েরা জিনিষ কিন্‌বে কি? সকলে অপলক-দৃষ্টিতে ছোট বোন্‌টীর দিকে চেয়ে থাকে। নিজেদের মধ্যে তার সম্বন্ধে কত কি বলাবলি করে। তার মুখের মিষ্টি কথা শুনে কেউ আর কোন জিনিষের দর করতে চায় না; সে যে দাম বলে, তা' দিয়েই কিনে নেয়।

সেদিন দুপুরবেলা ঠাকুর-বাড়ীর ঘাটে এসে এদের নৌকো ভিড়লো। ঠাকুর-বাড়ীর ছোট ছেলে মনোহর তখন ঘাটে বসে মাছ ধরছিল। বছর চব্বিশেক বয়স তার। ফুলিয়াকে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পলকহীন চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাড়ার মেয়েরা এসে ঘাটে জমা হ'তে লাগ্‌ল। পছন্দমত যে যার জিনিষ কিনে নিলে; এখান-কার বেচা শেষ হতেই বেদে নৌকো ভাসিয়ে অন্য পাড়ার দিকে চল্‌ল।

ঠাকুর-বাড়ীর ছোট্ট ডিঙিখানি ঘাটেতেই বাঁধা ছিল। বর্ষাকালে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই চলাচলের জন্য একখানি করে নৌকো থাকে।

মনোহর ঠাকুর হাতের ছিপটা ছুঁড়ে ড্যাঙায় ফেলে

মিস্ লীলা

দিয়ে, বৈঠেখানা নিয়ে তার ডিঙিতে গিয়ে উঠে বসল। তারপর সে ঐ বেদের নৌকোর পেছন পেছন তার ডিঙি বেয়ে চল্‌ল। এপাড়া ওপাড়া করে ঘুরতে ঘুরতে বেদেদের নৌকো এ গাঁ ছেড়ে, ভিন্ গাঁয়ের দিকে চল্‌ল।

মনোহরও তার ডিঙিখানি চালিয়ে ফুলিয়াকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের সঙ্গ নিলে।

ফুলিয়া অনেকক্ষণ থেকে ঠাকুরের রকম দেখে মনে মনে হাসছিল। এতটা পথ এসেও ঠাকুর বাড়ী যাবার নাম করে না দেখে, সে হেসে বল্‌লে—যাও ঠাকুর, এবার বাড়ী যাও। আর কতদূর তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, এখন ফেরো।

মনোহর ঠাকুর তার কথার কোন উত্তর দিলে না; শুধু মুখ টিপে একটু হাস্‌লে। ভাবটা এই যে, তার এতটা আসা সার্থক হলো; কারণ, প্রেমিকা তার সঙ্গে কথা কয়েছে।

ঠাকুর যে বেদেনীর প্রেমে অনুরক্ত হ'য়ে এতটা পথ ধাওয়া করেছে, বেদে অনেকক্ষণ থেকে তা' লক্ষ্য করে' বেশ একটু আমোদ অনুভব করছিল। তাই সে তার শ্যালিকার দিকে চেয়ে মুচকে হেসে সুর করে গান ধর্‌লে :—

মুখ ফিরিয়ে দেখলো চেয়ে, তোর বন্ধু আসে ওই!—
আয় লো কাছে, কানে কানে দুটো প্রাণের কথা কই!

ফুলিয়া তার ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁট উল্টে বল্‌লে—দেখ্ 'খালভরা', ভাল হবে না বল্‌ছি।

বেদে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগ্‌ল।

দুলিয়া এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। এবার সে মনোহরের দিকে চেয়ে বল্‌লে—যাও না ঠাকুর, বাড়ী ফিরে। রাত হ'য়ে এলো যে। আর কতদূর যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে?

মনোহর বল্‌লে—বাড়ী তো ছেড়ে এসেছি, আর সেখানে ফিরে যাবো না।

বেদেও অনেক বোঝালে তাকে; কিন্তু সে শুনলে না। ধীরে ধীরে ডিঙি বেয়ে চল্‌ল তাদের সাথে সাথে।

কারো কোন নিষেধই শুন্‌ল না মনোহর। ঐ বেদের নৌকোর সঙ্গে-সঙ্গেই চল্‌লো সে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনাহারে অনিদ্রায় দু'দিন কেটে গেল।

তারই জন্য ঠাকুরের এই কষ্ট দেখে ফুলিয়ার মনের মণি-কোঠায় ঘা লাগ্‌ল। সে নৌকো থামিয়ে মনোহরকে ডেকে বল্‌লে—ঠাকুর, তুমি হ'লে ব্রাহ্মণ, আর আমি হলেম বেদে। আমাদের তো মিলন হ'তে পারে না। কেন মিছিমিছি তুমি এত কষ্ট কর্‌ছ? যাও, বাড়ী ফিরে যাও, আমার কথা শোনো।

মনোহর হাস্‌লে; হেসে বল্‌লে—প্রেমের কাছে আবার জাত-বিচার আছে না কি? শোন নি চণ্ডীদাস আর রজকিনীর কথা? তারপর একটু থেমে বল্‌লে—বাড়ীতে আর যাব না আমি।

ফুলিয়া কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার দিদি দুলিয়া তাকে চুপ করতে বলে মনোহরকে বেশ একটু কড়া-সুরে বল্‌লে—ঠাকুর, তুমি না জাত মান্‌তে পার, আমরা মানি। তোমার সঙ্গে আমার বোনের সাদী কিছুতেই হ'তে পারে না।

মনোহর ছলছল চোখে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লে—আচ্ছা, আমি যদি বেদে হই, তবুও কি তোমার বোন্‌কে পেতে পারি না?

দুলিয়া ঝাঁজাল-সুরে উত্তর দিলে—না। তারপর তারা নৌকো চালিয়ে দিলে।...

বেদে মনে করেছিল—ঠাকুর আর তাদের সঙ্গ নেবে না, এবার বাড়ীর দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু একটু পরেই পিছু ফিরে তাকে আস্‌তে দেখে সে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। মনে মনে বল্‌লে—পাগ্‌ল না কি!

চারদিনের দিন একটা গঞ্জে এসে বেদের নৌকো ভিড়ল। তারই গা ঘেঁসে লাগল মনোহরের ডিঙি। এ' ক'দিনের অনাহারে ঠাকুর একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে; চোখ-মুখ বসে গেছে। ক্লান্তিতে দেহখানি একেবারে ভেঙে পড়ছিল। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। সে আঁজ্‌লা করে খানিকটা জল খেয়ে একটু সুস্থ হ'ল।

বেদে গিয়েছিল উপরে জিনিষ-পত্র সব কিন্‌তে। এমন সময় বেদেনীদের নৌকোর ও পাশে একখানি জেলে ডিঙি এসে লাগ্‌ল। নানারকম মাছে নৌকোখানি একেবারে বোঝাই। ডুলিয়া খুব সস্তায় মস্তবড় একটা আড় মাছ কিনে ফেল্‌লে। অত সস্তায় অতবড় একটা মাছ পেয়ে ডুলিয়ার মনে আনন্দ আর ধরে না!...

শিরদাঁড়ার কাঁটাটা উঁচু হয়ে রয়েছে, মাছটা তখনও নড়ছিল।

ফুলিয়া তার অধর কোণে হাসির রেখা টেনে বল্‌লে—আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো আমায় ভালবাস, আমার জন্য পাগল হ'য়ে এতদূর পর্য্যন্ত ছুটে এসেছ! দেখ্‌ব কেমন তোমার ভালবাসা! আমি যা' বল্‌ব, তা' তুমি কর্‌তে পারবে?

আনন্দে মনোহরের বুকের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠ্‌ল। সে দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—তোমার জন্য এ প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি!

ফুলিয়া হাসিতে ফেটে পড়ে বল্‌লে— তাই না কি?

মনোহর দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লে—হ্যা!

ফুলিয়া তাকে সেই আড়মাছটা দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে—তুমি যদি এর পিঠের ঐ কাঁটাটার ওপরে সজোরে একটা লাথি মারতে পারো, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার হবো! কিন্তু না পার্‌লে তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে—মনে থাকে যেন! তুমি রাজী আছ? তার চোখে-মুখে কৌতুকভরা হাসি।

মনোহর হেসে বল্‌লে—মোটে এই! আমি মনে করেছিলুম, না জানি কি!

তারপর সে উঠে গিয়ে মাছটার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—তোমার কথা শেষে ফেরাবে না তো?

ফুলিয়া তেজদীপ্ত স্বরে বল্‌লে—বেদেরা কখনো মুখের কথা ফেরায় না।

সঙ্গে সঙ্গে মনোহর সজোরে সেই মাছটার পিঠের ওপর একটা লাথি মার্‌লে। পায়ের পাতা ভেদ করে' কাঁটাটা বেরিয়ে গেল। রক্তে সমস্ত স্থানটা একেবারে লাল হয়ে উঠ্‌ল।

মনোহরের মুখে হাসি। ফুলিয়ার চোখে অশ্রু।

কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!

ফুলিয়া সযত্নে মনোহরের পা থেকে মাছের কাঁটাটা খুলে ফেলে, ক্ষতস্থানে কি একটা গাছের পাতা বেটে বেঁধে দিলে। মনোহরের রক্ত বন্ধ হয়ে যন্ত্রনা অনেকটা কমে গেল।

সে নৌকোয় বসে হাস্যোজ্জ্বল-মুখে ফুলিয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার মুখে বিজয়-গর্ব্বের চিহ্ন পরিস্ফুট।

একটু পরেই বেদে সব জিনিষ-পত্র কিনে ফিরে এলো। ডুলিয়ার মুখে সব কথা শুনে সে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেল।

ফুলিয়া সেদিন নিজে রান্না-বান্না কর্‌লে। সকলকে খেতে দিয়ে মনোহরের ভাত বেড়ে তাকে খেতে ডাক্‌লে।

সে বিনা দ্বিধায় তাদের সঙ্গে খেতে বসে' গেল। চারদিন পর এই সে প্রথম আহার করলে। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গেই তার ভোজন শেষ হলো।

সেদিন বিকেলে ফুলিয়া তার দিদি এবং ভগ্নীপতির কাছে বিদায় চাইলে।

ডুলিয়া কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে—তুই এ কি করলি বোন্!

বেদে তাকে অনেক বোঝালে, অনেক করে নিষেধ করলে।

ফুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে না, ওকে আমি কথা দিয়েছি।

ফুলিয়া মনোহরের নৌকোয় এসে বস্‌ল।

মনোহর ডিঙি ভাসিয়ে দিলে।

ডুলিয়া সেই দিকে চেয়ে চোখের জল মুছ্‌তে লাগ্‌ল।

তারা কোন্ অজানা দেশের দিকে ভেসে চল্‌ল। কেউ তাদের আর কোন খোঁজ পায় নি।...

শ্রীহরিপদ গুহ

ভৌতিক গল্প

অজানার বার্ত্তা

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

শ্বশুর-বাড়ীর এক চিঠি পাইয়া বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িতে হইল।

সংসারের সুখ-দুঃখের কথা, কলিকাতায় গরম কেমন, আম উঠিয়াছে কি না, ইত্যাদি মামুলী ব্যাপারের পর যে কথাটি ছিল, তাহাতে চমকিয়া উঠিতে হয়।

আমার স্ত্রীকে না কি ভূতে পাইয়াছিল, এবং সেই ভৌতিক ব্যাপার না কি এখনও চলিতেছে।

ভূত বস্তুটির সম্বন্ধে সত্য অসত্য অনেক কাহিনীই ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এবং তাহাদের অনুনাসিক কথাবার্ত্তার গল্প শুনিয়া শৈশব-জীবনে সময় সময় মনের ভিতর যে ভীতির সঞ্চার হয় নাই, তাহা নহে। এ হেন ভূত আমার স্ত্রীকে পাইয়াছে এবং এখনও ছাড়ে নাই, এ সংবাদটা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। চিঠি লিখিয়া দিলাম যে, আগামী কল্য শনিবার আমি রওনা হইতেছি।

ট্রেণ এবং নানাবিধ যানে মাইল ছয়-সাত কষ্টভোগ করিয়া শনিবার অফিস-ফেরৎ যখন সেখানে পৌছিলাম, তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ভৌতিক উপাখ্যানটার কথা আমার শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ব্যাপারটা যাহা বলিলেন, তাহা বিবৃত করিতে গেলে পূর্ব্বেকার ইতিহাস খানিকটা জানা প্রয়োজন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার বছর দুই পূর্ব্বে আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে কোন বিশেষ কারণে আমার স্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারে নাই। সেজন্য না কি শাশুড়ী-ঠাকুরাণী মৃত্যুকালে দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিন-চারদিন পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে বাড়ীর উঠানে আমার স্ত্রী হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে এবং তাহার দেহে না কি আমার পরলোকগতা শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। আমার স্ত্রীর মুখ দিয়াই তিনি নিজের পরিচয় দেন এবং কন্যাটিকে বড়ই স্নেহ করিতেন বলিয়াই তাহার দেহে আশ্রয় লইয়াছেন, এ কথাও ব্যক্ত করেন। প্রায় একঘণ্টা মূর্চ্ছিতা থাকিবার পর প্রেতাত্মা চলিয়া যান্‌ এবং আমার স্ত্রীর চৈতন্য হয়।

কাহিনীটা শুনিয়া উচ্চহাস্য আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। গঞ্জিকার প্রতি শ্রদ্ধা কতখানি তাহা শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ঘটনাটাকে আরও কৌতুকপ্রদ করিয়া তুলিলেন। তিনি বলিলেন—আমি যে আজ আসিব এ ভবিষ্যদ্বাণী না কি প্রেতাত্মা সেদিন করিয়া গিয়াছেন এবং আমার

সহিত বিশেষ করিয়া আলাপ করিবার জন্যই আজ রাত্রি এগারোটার সময় না কি তাঁহার পুনরাবির্ভাব হইবে।

ঠাট্টা করিবার সম্পর্ক তাঁহার আছে, কাজেই তাঁহার কথায় বিশেষ বিস্মিত হইলাম না। কিন্তু আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য যে এক প্রেতাত্মা বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে, এই কথাটা মনে মনে আলোচনা করিয়া খুব প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না। প্রত্যুত্তরে জানাইলাম যে, আমার আজ আসিবার সম্ভাবনা আমি নিজেই জানিতাম না, তখন প্রেতাত্মার পক্ষে সে কথা জানা যে কতখানি সম্ভব সে কথা না বলাই ভাল।

মাসটা চৈত্রের শেষাশেষি, কাজেই আহারাদির ব্যাপার মিটিতে একটু রাত্রি হইয়াছিল।

বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় ছেলেমেয়েদের লইয়া স্ত্রী শয়ন করিয়াছিল, হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনিয়া সকলে সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে, তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে আমি যে অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহারই উল্লেখ করিয়া আমার শ্যালক পু—বাবু জানাইলেন যে, হয়তো বা 'তিনি'ই আসিয়াছেন।

স্ত্রীর হাতের মুষ্টি খুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলাম, এই কথাটা শুনিয়া বলিলাম—'আপনাদের এতই যখন ভয়, তখন গয়ায় একটা পিণ্ড দিয়ে এলেই তো হয়।'

পু—বাবু জানাইলেন যে—হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা তাঁহারা সত্বর করিবেন স্থির করিয়াছেন।

সবেমাত্র তিনি এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ আমার স্ত্রী সজোরে উঠিয়া বসিল, হাতের মুষ্টি যেন মন্ত্রবলে খুলিয়া গেল। বেশ উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনার সুরে আমার শ্যালককে বলিল—'গয়ায় পিণ্ডি দেবার জন্যে যে বড় ব্যস্ত! কেন, আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছি?'

আমি অতি নিকটেই বসিয়াছিলাম, হঠাৎ এই উচ্ছ্বাস শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। ভৌতিক ব্যাপার বুঝিয়া নাসিকা কুঞ্চন ছাড়া আর কিছু করি নাই, কিন্তু আজ দেখিলাম নাসিকার পরিবর্ত্তে কপালের শিরাগুলি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

পু—বাবু ইঙ্গিতে আমাকে জানাইলেন যে—আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর প্রেতাত্মা আমার স্ত্রীর 'মিডিয়াম'-এ আবিভূর্তা হইয়াছেন।

অবিশ্বাস করা শক্ত হইল; অথচ বিশ্বাস করিতেও মন সরিতেছিল না।

পু—বাবু তখন আমাকে দেখাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন—'এ কে বল দিকি নি?'

অত্যন্ত বিজ্ঞের মত স্ত্রী একটু হাসিল এবং জানাইল যে—আমি আজ আসিব জানিয়াই তাহার মা দেখা করিতে আসিয়াছেন।

পু—বাবু প্রেতাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'দেখা করা তো হ'ল, এইবার ছেড়ে দিয়ে চলে যাও।'

এবারও যেন একটু ভর্ৎসনার সুরে উত্তর হইল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবো না তো থাকবো না কি? যাবোই তো?'

—'তবে যাও এখনিই। নিজের মেয়েকে এইরকম কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে?'

—'না, এইবার যাব।'

—'কখন যাবে?'

প্রেতাত্মা এবারে রাগ করিলেন। বলিলেন—'কেন, এত তাড়া কিসের? অত তাড়া দিলে আমি কিন্তু যাব না।'

গতিক বড় ভাল নয়, এবং প্রেতাত্মাই হোন্ বা যে আত্মাই হোন্ তাঁহাকে রাগাইয়া লোকসান ছাড়া লাভ নাই। তখন নিজের স্ত্রীকেই অত্যন্ত বিনীতভাবে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করিতে হইল। প্রেতাত্মার অধিকারিণী আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, তাঁহাকে তুমি বলা অসভ্যতার পরিচায়ক, অথচ এতগুলি লোকের সম্মুখে নিজের স্ত্রীকে আপনি বলাও একটা হাস্যকর ব্যাপার। কাজেই ভাব-বাচ্যে বলিলাম -'আর মিছামিছি দেরী করলে কষ্ট দেওয়া ছাড়া যখন আর কিছুই হবে না, তখন আজকের মত গেলে হ'ত না?'

—'যাচ্ছি, যাচ্ছি। আমি কি থাকতে এসেছি, যাব

বলেই এসেছি।' একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন,—'তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।'

তাহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

শ্যালক বলিলেন—'এইখান থেকেই যাবে তো ?'

জবাব আসিল—'না, সেদিন যেখান থেকে গিয়েছিলাম।'

উঠানে একটা আতাগাছ ছিল। সকলের সন্দেহ ছিল সেই আতাগাছটিতেই তিনি না কি উপস্থিত আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যে ভৌতিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেদিন না কি আমার স্ত্রী সেই আতাগাছের নিকটে যাইয়াই আছাড় খাইয়া পড়ে। তারপর অনেকক্ষণ পরে তার মূর্চ্ছা ভাঙ্গে!

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে স্ত্রী দুলিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উঠানের দিকে খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। উঠানের মাঝখানে সত্য-সত্যই সেই আতাগাছ তলায় আসিয়া স্ত্রী সজোরে উঠানে আছড়াইয়া পড়িল। তিন-চারজন ধরিয়া না ফেলিলে মাথা ও কপাল কাটিয়া একটা বিশ্রী কাণ্ড হইত।

সেই রাত্রে মাথায় বালতি বালতি জল ঢালিয়া, বাতাস করিয়া প্রায় একঘণ্টা পরে স্ত্রীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল।

পরদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পূর্ব্বরাত্রের কোন কথাই তাহার মনে নাই। সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা ছাড়া আর কিছুই বোধ করিতে পারে না।

বৈশাখের প্রথমে স্ত্রীকে লইয়া আমার দেশে আসিলাম। এমন কৌতূহলপ্রদ গল্পটা দেশের বন্ধুবান্ধবদের অনেকেরই নিকট করিয়াছিলাম। এই কাহিনী শুনিয়া প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সকলেই হাসিয়াছিল, এবং বোধ হয় আমাকে রাঁচীর পাগলা-গারদে পাঠাইবার জন্য চাঁদা-সংগ্রহের সংকল্প করিতেছিল।

অবশেষে আবার একদিন সত্য-সত্যই বাঘ আসিল।

সন্ধ্যার সময় বাহিরের রোয়াকে বসিয়া দশ-পনের জনে মিলিয়া চায়ের শ্রাদ্ধ করিতেছি, এমন সময়ে আমার সাত বছরের মেয়ে ফুটুরাণী আসিয়া জানাইল যে, তাহার মাতার শরীর কেমন করিতেছে—ভিতরের দিকে একবার অবিলম্বে যাওয়ার প্রয়োজন।

গেলাম।

সেই ব্যাপারের পর হইতে প্রায় প্রত্যহই ফিট্ হইতেছিল, ঔষধ ও নানাপ্রকার মাদুলী দিয়াও বিশেষ কিছুই হয় নাই। কেহ বলিতেন, হিষ্টিরিয়া, কেহ বা অন্য একটা গালভরা নাম বলিতেন।

রোজ যেমন ফিট্ হয়, আজও সেইরূপ মনে করিয়া একটু ব্লটিং পোড়াইয়া নাকে ধোঁয়া দিব মনে করিতেছি, এমন সময়ে স্ত্রী বলিল—'তোমাদের দেখতে এসেছি।'

ব্লটিংয়ের টুকরা হাত হইতে পড়িয়া হাওয়ায় উড়িয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! আমার কুশল-প্রশ্ন লইতে এ পৃথিবী হইতে নয়, একটা অজানা অজ্ঞাত জগৎ হইতে এক অশরীরি আসিয়াছেন, এ কথাটা মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না।

বাহিরে ছেলের দল তখনও চায়ের পেয়ালা লইয়া মজলিস করিতেছিল। এই সংবাদ শুনিয়া সকলেই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিতে আসিল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—'আমি কে বলুন দেখি ?"

উত্তরে তাহার পরিচয় ব্যক্ত হইল। আমার নাম করিয়া স্ত্রী জানাইলেন যে, সে আমার বন্ধু।

বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করা একটা ভয়ানক পাপের কাজ বিবেচনা করেন। কিন্তু আমার স্ত্রী অম্লান বদনে সেই পাপ অর্জ্জন করিলেন।

সুধীর তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আমার নাম কি ?'

—'সুধীর।'

সুধীর বলিল যে, আমার স্ত্রী তাহাকে চেনেন, সুতরাং নাম বলা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

সে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, আমার পকেটে কি আছে বলতে পারেন?'

প্রেতাত্মা এবার ক্ষুব্ধ হইলেন। বলিলেন—'আমার সঙ্গে কি ঠাট্টা হচ্ছে? আমি কি তোমাদের ঠাট্টার যোগ্য লোক?'

সে সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না, কিন্তু সুধীরের পকেটে নস্যের শিশি অথবা ঐ রকমের কি একটা বস্তু ছিল, আমার স্ত্রী তাহা বলিয়া দিল।

আষাঢ় মাসে কলিকাতায় আসিলাম। তাহারই মাসখানেক পরে আবার এইরূপ ঘটনা।

বন্ধুবর লোচন মিত্র নিকটেই থাকে। এই গল্প তাহার কাছেও করিয়াছিলাম। সে হাসিয়া বলিয়াছিল যে, আমাকে একটি গাঁজার কলিকা উপহার দিবে।

পুনরায় যখন আবার প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইল, তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া লোচনকে ডাকিলাম। আমাদের বাড়ী হইতে মিনিটখানেকের পথ। সে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল; আমার কথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল—জুতা না পায়ে দিয়াই আমার সঙ্গে চলিল। পথে আসিতে আসিতে বলিল—'ভূত যদি কোথাও দেবী-ঠাকুরাণীর টাকার ঘড়া-টড়ার সন্ধান দিতে পারে, তবেই বলি যে হ্যাঁ, সত্যিকারের একটা কাজ ভূতের দ্বারা হ'ল বটে! তা' নয় যত সব—'

স্ত্রীর তখনও সেই ভাব। লোচন জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, আমরা পথে আসতে আসতে কি বলাবলি কচ্ছিলাম যদি বলতে পারেন, তবেই বুঝবো যে—হাঁ।'

কিন্তু তাহার এই কথার প্রত্যুত্তরে প্রেতাত্মা খুব বিজ্ঞভাবে বলিলেন—'কি বুঝবে?'

এ কথার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। লোচন আমতা-আমতা করিতে লাগিল। প্রেতাত্মা বলিলেন—তুমি বাপু ছেলেমানুষ, এখনও তো সংসারের কিছু বোঝ না। টাকা-পয়সা, ঘড়া-জালা এ সব কি মেলে?—তা' মেলে না। রোজগার করতে শেখো, তখন দেখবে নিজের চেষ্টাতেই টাকার ঘড়া ঘরে আসবে।'

লোচন বেচারা তো অবাক্! চাহিয়া দেখিলাম—তাহার চোখে পলক আর পড়িতেছে না। পথে আসিবার সময় আমাদের দুই বন্ধুর গুপ্তকথা আর গোপন রহিল না। উপদেশটাও যে বিজ্ঞোচিত, ইহাতেও সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না।

কিন্তু লোচন হাল ছাড়িল না। সেই সময় তাহার বিবাহের আলোচনা চলিতেছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার নামটা কি বলুন তো?'

প্রেতাত্মা এইরূপ ক্রমাগত পরীক্ষায় এবার রুষ্ট হইলেন। বলিলেন—'তোমরা ভেবেছ কি মনে মনে? এবারটা তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি, কিন্তু আর কোনও কথার জবাব দেব না।' বলিয়া লোচনকে হতভম্ব করিয়া দিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার ভাবী স্ত্রীর নামটা বলিয়া দিলেন।

লোচন বলিল—আর একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করবো। দোহাই আপনার, রাগ করবেন না। আচ্ছা, নাম তো বল্লেন, কিন্তু তার হাতে কি চুড়ী আছে যদি সেইটে দয়া করে বলেন।'

বিনয় বচনে মানুষ তুষ্ট হয় জানিতাম, দেখিলাম প্রেতাত্মাও সদয় হইলেন। 'ফ্রেঞ্চ টালি' না ঐ রকমের কি একটা নাম লোচনের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শোনা গেল।

আমি বলিলাম—'আর নয়, আপনি এবার যান। আমার একটি অনুরোধ রাখুন, দয়া করে আর এ বেচারীর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, বা আসবেন না। আপনার মেয়ের মঙ্গলের জন্য এটুকু অনুরোধ কি আপনি শুনবেন না?'

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। স্ত্রী ঢুলিতে লাগিল। তারপরেই ধড়াস করিয়া পতন ও মূর্চ্ছা। তখন 'স্মেলিং সল্ট', হলুদ পোড়া প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া, মাথায় বালতি বালতি জল ঢালিয়া তারপর স্ত্রীর চৈতন্য সম্পাদন করা হইল।

কিন্তু তাহার মুখে সেই একই কথা। কিছুই মনে নাই। সর্ব্বাঙ্গে কেবল অসহ্য বেদনা।

প্রেতাত্মা বোধ হয় আমার অনুরোধ শুনিয়াছিলেন; কারণ, সেইদিনের পর আর তাঁহার শুভাগমন হয় নাই।

এই কাহিনী অনেকের কাছেই বলিয়াছিলাম। একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক মহাশয় তখন আমাদের বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন। তিনি মনস্তত্ত্ববিদ এক সাহিত্যিক ডাক্তার-মহাশয়ের পরামর্শ লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

আর একজন সুকিয়া ষ্ট্রীটের জনৈক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের নাম করিয়াছিলেন। ঔষধ অনেক খাওয়ানো হইয়াছিল, মাদুলীর তো সংখ্যা ছিল না। তবে সেদিনের পর আর কোনোদিন এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। মাদুলী কিংবা শিশির ঔষধ, অথবা প্রেতাত্মা, কাহাকে যে এজন্য ধন্যবাদ দিব জানি না। তবে আমরা ভূলোকের ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের কুশলাদি-প্রশ্ন এই লোক হইতে আসিলেই একটু নিশ্চিন্ত হই। যে লোকের কিছুই জানি না, অন্য কেহ জানেন কি না সে বিষয়েও নানা মতভেদ আছে—সেই পরলোক হইতে বার্ত্তার জন্য ব্যাকুলতা আমাদের আদৌ নাই।

কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা ওতপ্রোত করিয়াও ইহার সঠিক্ কারণটা যে কি তাহা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। ডাক্তার বন্ধুরা কেহ বা বলিতেন—'Hallucination' (অবাস্তব প্রত্যক্ষ), কেহ বা বলিতেন—"Association of ideas' (চিন্তাধারা)—কবিরাজেরা বলিতেন—'বায়ু-রোগ', হোমিওপ্যাথেরা বলিতেন—'হিষ্টিরিয়া'রই রূপান্তর। কেহ কেহ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, বিলাত এবং আমেরিকায় অনেক 'Psychic institute' (মনোবিজ্ঞানাগার) আছে, সেখানে লিখিয়া পাঠাও এবং কারণ জিজ্ঞাসা কর।

সে ঝকমারি আর ভাল লাগে না। অজ্ঞাত কারণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাক্।

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

অপরাধী কে ?

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

বাড়ীর পাশেই ছোট একখানা একতলা বাড়ী। জীর্ণ শ্রীহীন। বহুদিন ধরিয়া সংস্কারের অভাবে তাহার শীত-শুষ্ক পত্রহীন তরুর মত জীর্ণ ইট বার করা দেহখানাকে ক্রমশই জর্জ্জরিত করিয়া আনিতেছে। বর্ষার ধারা, গ্রীষ্মের খর রৌদ্র সমানভাবে তাহার উপর অত্যাচার চিহ্ন আঁকিয়া যায়। যত্ন করিয়া সে দাগ কেহ মুছিতে আসে না। বাড়ীর মালিক কে জানি না। মধ্যে মধ্যে ভাড়াটিয়া গৃহস্থ কিছু দিনের জন্য আসিয়া সেই নির্জ্জীব গৃহখানায় প্রাণ সঞ্চার করে। শিশুর হাসি, নরনারী কণ্ঠের কলস্বরে বসন্তে জাগ্রত শুষ্ক উপবনের মত লুপ্তশ্রী দেহ তাহার শ্যামল সঞ্জীবতায় সরস হইয়া উঠে। তাহারা চলিয়া যায় পূর্ব্বের নীরবতা আবার তাহাতে দ্বিগুণ হইয়া জমাট বাঁধিয়া বসে। অধিকাংশ সময়ই বাড়ীটা খালি পড়িয়া থাকে।

সকালে সেদিন কি কাজে শুইবার ঘরে এদিককার জানালার কাছে আসিতেই চোখ পড়িল পাশের সেই একতলা বাড়ীর অঙ্গনে কার্য্যরতা শ্যামাঙ্গী বধূর সুশ্রী মুখের উপর। বৌটী এই দিকেই চাহিয়াছিল, আমায় দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। শান্ত কোমল মুখখানি, বয়স খুব বেশী নয়। একখানি আধময়লা সরু লালপাড় শাড়ী ও একটা মোটা কাপড়ের সেমিজ তার পরিধেয়। হাতে দু'গাছি শাঁখা ভিন্ন দেহে অন্য আভরণ নাই। দ্বিধাবিভক্ত চুলের মাঝে সিন্দূরের রেখাটা বেশ উজ্জ্বল। তাহার বেশভূষা দেখিয়াই তাহাদের আর্থিক অবস্থা উপলব্ধি হয়, তবুও তাহার দেহ বেড়িয়া লালিত্যের এমন একটা দীপ্ত-শ্রী রহিয়াছে, যাহা দেখিলে সে যে সম্ভ্রান্ত বংশজাত এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই মনে আসে না। তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য মনটা উন্মুখ হইয়া উঠিল। সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। বধূটী বাসন মাজিতেছিল। ঘরের মধ্য হইতে শিশুকণ্ঠের রোদনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। উৎসুকভাবে বউটী মধ্যে মধ্যে ঘরের দিকে চাহিয়া ত্রস্ত হাতে তাহার কাজ শেষ করিয়া লইতেছে। একবার সে মুখ তুলিয়া এদিকে চাহিল। আমার চোখে চোখ মিলিতেই প্রশ্ন করিলাম, তোমরা কবে এ বাড়ীতে এসেছ ভাই ?

কেমন মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দিল, কাল রাত্রে।

এর আগে কোথায় ছিলে ?

বাসনগুলা কলের জলে ধুইয়া লইতে লইতে সে বলিল, আমাদের বাড়ী হুগলীতে। সেখানেই এতদিন ছিলাম। উনি মেসে থাকতেন, তা'তে বড় কষ্ট হয় বলে আমাদের নিয়ে এসেছেন। এই প্রথম আমি এখানে এলুম।

ঘরে কাঁদছে ওটী বুঝি ছেলে ? আর কি ছেলে মেয়ে ?

মেঘছায়া ঢাকা গোধূলির মত তাহার শ্যাম মুখে গভীর বেদনা ফুটিয়া উঠিল। মলিন মুখে কম্প্রস্বরে কহিল, ঐ একটী ছেলে আর কেউ নেই। হয়েছিল অনেকগুলি। কিন্তু কেউই রইল না! এরও অসুখ, জানি না ভাগ্যে কি আছে!

চোখ দু'টা তাহার সজল হইয়া আসিল। সন্তান শোক। হঁ্যা, আমিও ও বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। এ ব্যথার তীব্রতা যে কত অসহ্য তাহা ভালই জানি। মেয়েটীর কথায় মনটা আর্দ্র হইয়া উঠিল। কহিলাম, কি অসুখ ছেলের ? কোন্ ডাক্তার দেখছেন ?

আমার এ প্রশ্নে মেয়েটী কেমন যেন কুণ্ঠিত হইয়া অসংলগ্নভাবে বলিল, অসুখ, হঁ্যা অসুখ এই জর, শুধু জর আর কিছু নয়। ডাক্তার, না ডাক্তার এখন কেউ দেখছে না।

তাহার কথাগুলা কেমন লাগিল। কিন্তু এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করা সঙ্গত বোধ হইল না। পুত্রের অসুখ সম্বন্ধে সে যেন কিছু বলিতে ইচ্ছুক নয় এমনই মনে হইতেছিল।

ক্যারল টেলভিস

এ্যান্ শার্লি

ঘরের মধ্যে রোদন রবটা তখন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। বউটীর কাজ এখনও অনেক বাকী। ব্যাকুল চোখে সে শুধু ঘরের দিকে চাহিতেছিল। বলিলাম, ছেলেটী বড় কাঁদছে যে ভাই, কে আছে ওর কাছে ?

কেউ নেই দিদি, উনি তো বাইরে। আমি ছাড়া বাড়ীতে লোক নেই। রোগা ছেলে, অথচ কাজও—

সে কথা শেষ করিল না। অত্যধিক ক্ষিপ্রতায় কাজ করিতে লাগিল। আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। শিশুটীর আর্ত্ত ক্রন্দনে মনটাকে উদ্বেল করিতেছিল। খানিকটা নীরব থাকিয়া বলিলাম, ছেলেটী যে বড় কাঁদছে ভাই। ওকে আগে একটু শান্ত করে নিলে পারতে।

ম্লানমুখে চাহিয়া সে কহিল, অফিসের ভাত দিতে হবে দিদি, দেরী হ'লে চলবে না, আর ও তো সব সময়ই এ রকম কাঁদছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে গেলে চলে কই ?

দুই

কয়দিন পর। সকালবেলা চা খাইতে খাইতে সহসা স্বামী কহিলেন, দেখ এ ত বড় মুস্কিল হ'ল দেখছি। সারা রাত্তিরে একটু ঘুমোবার উপায় রইল না, এমন হ'লে বাড়ীতে থাকাই দায়।

কি লক্ষ্যে কথাটা তিনি বলিলেন, বুঝিলাম। হাসিয়া বলিলাম, এ তোমার অন্যায়, পাশের বাড়ীতে ছেলে কাঁদে বলে তুমি ঘুমোতে পার না, এ কথা শুনে লোকে হাসবে যে।

শূন্য চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন, হাসতে কষ্ট বেশী নেই, সকল কিছুতেই হাসাটা ভারী সহজ। কিন্তু কথাটা তো আমার মিথ্যে নয়, যে ভয়ানকভাবে সারা রাত্তির ছেলেটা চেঁচায়, তা'তে কুম্ভকর্ণ ধরণের লোক ছাড়া সাধারণ মানুষ ঘুমোতে পারে না। কিন্তু ওটা অমন চেঁচায় কেন বলতে পার ?

শুনি ত ওর অসুখ, কি অসুখ তাতো জানি না। কান্না দেখে মনে হয় বড় যন্ত্রণাতেই সে চেঁচাচ্ছে। নয় ?

হবে। কিন্তু আর দু'চার রাত্তির এভাবে কাটলে সত্যিই বাড়ী ছাড়বার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে।

তাই ক'রো, এখন নিজের কাজে যাও।

আমি সরিয়া এ ধারের জানালায় আসিলাম। উঁকে যাহাই বলি, কথাটা কিন্তু সত্যই। রাত্রি দিন ধরিয়া ছেলেটী একভাবে কাঁদিতেছে, সে রব ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। দিনে কাঁদে, কাঁদিল না হয়, কিন্তু রাত্রেও কি তাহার বিরাম নাই ? কেন এত কাঁদে, অস্ফুট করুণ কাতর কণ্ঠস্বর অন্তরে যেন ব্যথার ভাব জাগাইয়া দেয়। রাত্রে কি ও ঘুমায় না ? ওর চীৎকারে সত্যই আমাদের সারা রাত্রি প্রায় জাগিয়া কাটে। একটানা সুরে বাহিয়া চলা করুণধ্বনি যেন সুপ্তির বক্ষে পড়িয়া তাহাকে দীর্ণ করিয়া দেয়। শুনি ছেলেটী অসুস্থ, কিন্তু কি ওর অসুখ ? পিতা মাতা তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থাও কি করে না ? এত যে কাঁদে, তাহার কারণ নিশ্চয়ই দারুণ যাতনা, কিন্তু সে জন্য ওদের কিছু করিতেও তো দেখি না। বউটীকে কয়দিন জিজ্ঞাসাও করিয়াছি, উত্তর সে দেয় নাই। শিশুর কি অসুখ করিয়াছে কিছুতেই সে বলিতে চাহে না। ইহারই বা হেতু কি ? তারপর ঐ শিশুর পিতা, তাহাকে তো কখন দেখি নাই। সে কখন বাড়ী আসে কখনই বা যায়, চোখে পড়ে না। রুগ্ন পুত্র ও সংসারের সমস্ত কাজ লইয়া একাকিনী বউটী সর্ব্বদা বিব্রত ক্লিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহার স্বামীকে তাহার কষ্টের ভাগ লইতে একবার দেখি না। কেমন লোক সে। বধূটী খানকতক কাপড়-জামা লইয়া কলতলায় আসিতেছিল। আমার দিকে চোখ পড়িতে অল্প একটু হাসিল। বলিলাম, তোমার ছেলে কেমন আছে ভাই ? কাল রাত্রে বড় কাঁদছিল।

হ্যাঁ, কাল জরটা বেড়েছিল খুব। এখনও তেমনই আছে, কমে নি।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলাম, ওর চিকিৎসা কি হচ্ছে ভাই ? এত অসুখ—

কাপড়গুলা টবের জলে ডুবাইয়া বউটী ম্লানমুখে উত্তর দিল, চিকিৎসা ? চিকিৎসা কিছুই হচ্ছে না।

আশ্চর্য্য ! এত অসুখ ছেলের, অথচ বলে তাহার চিকিৎসা হইতেছে না। ইহারই বা কারণ কি ? বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়িল—অর্থের

অনাটন, অবস্থায় কুলায় না। হয়তো তাই পুত্রের চিকিৎসা হয় না। কিন্তু তাহাও কি সম্ভব? যত দরিদ্রই থাক না কেন, তাহার যন্ত্রণা চোখে দেখিয়া, অহোরাত্র-ব্যাপী এই করুণ রোদন কানে শুনিয়া, রুগ্ন সন্তানকে বিনা চিকিৎসায় রাখিয়া দিতে কেহ পারে কি? কি জানি, কি এদের রকম।

অঙ্গন সন্নিহিত দরজাটা খুলিয়া এক যুবক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে বেশ ধনবান বলিয়াই মনে হয়। গায়ে দামী মুগার পাঞ্জাবীতে সোনার বোতাম। বামহস্তে রিষ্টওয়াচ। পায়ের জুতাটার দাম কম করিয়াও আট দশ টাকা হইবে। মাথার চুলের কারুকার্য্য দর্শনযোগ্য। কে এ লোকটা, এদের আত্মীয় কেহ? তাহাই সম্ভব। যেই হউক এ ভাঙ্গা বাড়ীতে ঐ ম্লান আভরণহীনা বউটীর কাছে লোকটীকে নিতান্ত বেমানান দেখাইতেছে যেন।

একটা পরুষ কণ্ঠ কানে আসিল, এখনও মাছের ঝোল নামে নি? কেন, সকাল থেকে কি হচ্ছে যে, রান্নাটাও শেষ হয় নি? কি ছাই দিয়ে খাব আমি?

লোকটী আসিতেই আমি জানালা হইতে সরিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু কথাগুলা কানে যাইতেই কৌতূহল অসহ্য হইয়া উঠিল। জানালার একধার হইতে চাহিয়া দেখি—সেই লোকটা ভীত ত্রস্ত বউটীকে লক্ষ্য করিয়া তর্জ্জন করিতেছে। এ তবে অভ্যাগত কেহ নয়, সম্ভব ঐ বউটীর স্বামী। এই সুবেশধারী সৌখীন লোকটী ঐ নিরাভরণা বধূর স্বামী! বিস্ময় যথেষ্টই হইল। সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার আগ্রহ উদগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বউটীর কি কথার উত্তরে তাহার স্বামী পূর্ব্বের মত কণ্ঠস্বরেই কহিল, না দেরী কর্ত্তে পারব না, এখনই আমি যাব। থাক, চাই না ভাত। ও সব ছাই-ভস্ম দিয়ে খেতে পারব না। রোজ এক ওজর হয়েছে ছেলের অসুখ, ছেলের অসুখের দোহাই দিয়ে কোন কাজ হয় না। দুনিয়ায় ছেলের অসুখ যেন কারও কখন হয় নি। আর ঐ এক ভাল আপদ হয়েছে! মরবেও না! আপদ শেষ হয়ে গেলে তো রেহাই পাই।

শিহরিয়া উঠিলাম। এই কি পিতা? অসংকোচে আপন সন্তানের মৃত্যু-কামনা করিতেছে!

লোকটী আবার বলিল, হ্যাঁ, ডাক্তার দেখাব বই কি। টাকার তো আমার শেষ নেই, চারদিকে ছড়ান রয়েছে, তাই ঘটা করে ছেলের চিকিৎসা করি। কেঁদে, কেঁদে তা' করব কি, ডাক্তার সরকারকে নিয়ে আসব, না রায়কে 'কল' দেব। বাপের বাড়ী থেকে মাসহারা ব্যবস্থা করে আস নি তো! যাক আমি চল্লুম, ন'টা বাজল বোধ হয়।

ক্ষীণ মৃদু কণ্ঠে বউটী কি বলিল, শুনিলাম না। শুনিলাম তার স্বামীর উগ্র কণ্ঠের হুঙ্কার। হ্যাঁ, ফিরতে রাত্তির তো হ'তেই পারে। একটা ভাল বই দেখাচ্ছে, আমরা ক'জন যাব। রাত্রে ফিরতেও পারি, নাও ফিরতে পারি। কি? ভয় করে? আহা, কচি খুকী! রোগা ছেলে? তা' আমি কি করব? সব কাজ ছেড়ে ছেলে নিয়ে তোমার আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকব না কি? না, রাত্রের খাবার কর্ত্তে হবে না, আমি হোটেলে খাব। না, পয়সা নেই। কি ছেলের বালি নেই? না থাক, একটু জল খাইয়ে রেখে দাও। আমি এখন বালি আনতে ছুটি আর কি!

এবার বউটীর কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শোনা গেল, ভয়-বিহ্বল-কণ্ঠে সে কহিল, জল খাইয়ে রাখব কি? ঐ রোগা ছেলে এক ফোঁটা দুধ পর্য্যন্ত পায় না, একটু বালি খেয়ে আছে, তাও আজ সকাল থেকে পায় নি। বালি নেই আমি তো কাল থেকেই বলছি।

লোকটী দাঁত মুখ খিঁচাইয়া উঠিল। তবে আর কি, আমার মাথা কিনে নিয়েছ। পারব না, আমি তোমাদের পিণ্ডির খরচ জোগাতে। নিজেদের পথ নিজেরা দেখে নাও গিয়ে। যা' আনব সব যাবে ওদের শ্রাদ্ধে। দিন-রাত্তির কর খালি ওদেরই তদারক। আমি বেটা গরু-গাধা, কেবল খেটেই মরি। ঝাড়ু মার। বকিতে বকিতে লোকটী উঠানে নামিল।

ব্যাকুল-কণ্ঠে বউটী কহিল, তুমি সত্যিই চলে যাচ্ছ? বেলা তো বেশী হয় নি, বালিটা এনে দিয়ে যাও। সারাদিন না খেয়ে ও কি বাঁচবে?

বাঁচবে, বাঁচবে। মরবার ছেলে ও নয়, তা' হ'লে এত

দিনে মরে ভূত হয়ে যেত। না, বেলা হবে কেন, মোটেই বেলা হয় নি। থিয়েটারের টিকিট ক'খানা কিনে রাখতে হবে, সে খেয়াল আছে? এক টাকার টিকিট পেলে হয়। যে ভিড় হচ্ছে!

গভীর বিস্ময়ে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। বধূটীর সংসার সুখের সমস্ত ইতিহাসটাই নিমেষে আমার চক্ষের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই তাহার নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব, ইহ-সংসারে একমাত্র আপন-জন, সুখ-দুঃখের অংশ ভাগী স্বামী! তাই দেখি বউটী সর্ব্বদাই অতি ম্লান, বিষণ্ণ। আমি মনে করি,ছেলের অসুখই বুঝি কারণ। কিন্তু না, তাহা ছাড়াও আরও কিছু আছে। নিজেকে বাতায়নের অন্তরালে একান্ত গোপন করিয়া রাখিলাম। বউটী যাহাতে আমায় না দেখে। দুর্দ্দশা লাঞ্ছনার সাক্ষ্য কেহ থাকে এ মানুষ চাহে না। আমায় দেখিলে বেদনার মাত্রা তাহার বাড়িবে শুধু। লোকটী ঘরে গিয়াছিল, একখানা পাঁচ টাকার নোট মণিব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিতে দিতে আবার বাহিরে আসিল। মিনতিভরা-কণ্ঠে বউটী কহিল, এই তো কাছেই দোকান, একবার যাও না। না খেয়ে কি করে থাকবে ও? রোগা ছেলে—

বলেছি পারব না, কেন বারবার জ্বালাচ্ছো। এমন আপদে পড়েছি, বেরোবার সময় যত হাঙ্গাম। কিছুতেই আমি এখন বার্লি আনব না। ছেলে তা'তে যাক্, আর থাক্। সরো, যাই।

ও গো, যেও না, বার্লিটা এনে দাও! না খেয়ে সত্যিই মরে যাবে, কি চেহারা হয়েছে ওর দেখেছ? এর ওপর—

কিছু হবে না, কিছু হবে না, আমার সময় নেই। দাও, দরজা দাও।

লোকটা সত্যই বাহির হইয়া গেল। বধূটী কাঠের মত সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। সকালের দিকে এ ঘরে বড়-একটা থাকি না, তাই এ অবধি এ লোকটাকে দেখিও নাই, কথাও কাণে যায় নাই। আজ এত অল্প সময়ের মধ্যে যে পরিচয় তাহার পাওয়া গেল, এ অতুলনীয়! রুগ্ন পুত্র অচিকিৎসায় অনাহারে মরুক, সে চলিল থিয়েটারের টিকিট কিনিতে। রাত্রে ফিরিবে কি না তাহারও স্থিরতা নাই। অসুস্থ শিশুটীকে লইয়া বউটীকে এই প্রায় অচেনা পল্লীর মধ্যে একা থাকিতে হইবে। এ কি রকম মানুষ? স্বামী কখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, লক্ষ্য করি নাই। আমি ফিরিয়া চাহিতেই উত্তেজিতভাবে কহিলেন,একেবারে জানোয়ার। ছেলের ওষুধ-পথ্য দেবার পয়সা নেই, বাবুয়ানী করবার, হোটেলে খেয়ে থিয়েটার দেখবার পয়সা আছে, মানুষ না কি?

ও, তুমিও শুনেছ। সত্যি, লোকটা কি! কিন্তু সে যাই হোক্ আমি এ দেখে কি করে থাকি বল তো, ছেলেটা না খেয়ে থাকবে? তারপর এইভাবে বিনা চিকিৎসায় মরবে।

কি করবে তুমি? ওদের ছেলে, ওরা যদি—

ব্যাকুলভাবে কহিলাম, দেখে স্থির হয়ে থাকি কি করে, আমিও তো ছেলের মা।

কি কর্ত্তে চাও বল?

ওদের বাড়ী যাই, বলি বউটীকে। ও যদি সম্মত হয়, তা' হ'লে আমরাই ওর ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করব, কি বলো?

ভাল। কিন্তু উনি কি রাজি হবেন? আমরা কে? ক'দিনের পরিচয়? আমাদের সাহায্য কেন নেবেন?

এ বিষয়ে সন্দেহ আমারও যথেষ্ট ছিল, তবু চোখের উপর এ দৃশ্য দেখিয়া নীরব, স্থির থাকাও যে যায় না। বউটী তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া। কি নিবিড় ব্যথায় তাহার মুখখানি আচ্ছন্ন! ঘরের মধ্য হইতে আসিতেছে শিশুর করুণ ব্যথাতুর কণ্ঠস্বর! ওধারের পাঁচীলে একটা কাক তারস্বরে চেঁচাইতেছে। শুভ্র শরত রৌদ্রের খানিকটা আসিয়া উঠানে নামিয়াছে। বধূটীর মুখে-চোখেও তাহার একটা ঝলক পড়িয়াছে। সেই দীপ্ত আলোকে তাহাকে দেখাইতেছিল মূর্ত্ত বিষাদের মত। দুঃসহ ব্যথার পীড়নে সে যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। পুত্রের রোদন রবও বুঝি তাহার কাণে যাইতেছে না।

তিন

দ্বার খুলিয়া সম্মুখে আমাকে দেখিয়া বধূটি অত্যন্ত

বিস্মিত হইল, বিব্রতও হইল কিছু। সহসা কথা কহিতে পারিল না। ভিতরে আসিয়া মুক্ত দুয়ারটা আমিই টানিয়া দিয়া কহিলাম, ভারী আশ্চর্য্য হয়েছ আমার দেখে, না?

হয়েছি বই কি দিদি। আমার বাড়ীতে আপনি আসবেন, এ ভাবতেও পারি নি। চলুন, ঘরে চলুন, এমন অসময়ে যে?

এলুম তোমার ছেলেকে দেখতে? কই সে?

পুত্রের উল্লেখেই তাহার মুখখানা ম্লানিমায় ছাইয়া গেল। কহিল, ঐ ঘরে একটু ঘুমিয়েছে বোধ হয়। চলুন।

তাহার সঙ্গে আসিয়া সম্মুখের ঘরটায় ঢুকিলাম। বাহিরের মত ঘরের ভিতরও জরা জীর্ণ। ভিত্তি গাত্র হইতে চুণ-বালির প্রলেপ কবে যে ঝরিয়া পড়িয়া তাহার শীর্ণ কঙ্কাল-সার মূর্ত্তিকে বাহির করিয়া দিয়াছে তাহা নির্ণয় করাই দুরূহ। একখানা তক্তপোষ ভিন্ন ঘরে অন্য কিছু আসবাব নাই। তাহারই উপর সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার শয্যায় পড়িয়া আছে একটী ক্ষুদ্র শিশু। ছেলেটীকে এই প্রথম দেখিলাম আমি। তাহার দিকে একবার চাহিয়াই ব্যথায় আতঙ্কে আমার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। কি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য এ! দেখিলে তাহাকে তিনমাসের বেশী বয়স বলিয়া মনে হয় না। গায়ের রংটা একদিন হয়তো শুভ্রই ছিল, আজ দেখিয়া তাহা অনুমান করা কঠিন। উপযুক্ত আলো হাওয়া ও জলের অভাবে চারা গাছ যেমন না বাড়িয়া এক-ভাবেই থাকে, পরে ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়, ইহারও অবস্থা তেমনই। তাহার দিকে চাহিলেই গভীর বেদনা মনকে নাড়া দেয়। অতিক্ষীণ দেহ অনাবৃত, কিন্তু কি ভীষণ ক্ষতে পরিপূর্ণ! শিহরিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম। বহুদিন পূর্ব্বে এক প্রতিবেশিনীর অঙ্গে দেখিয়াছিলাম এই ক্ষত। এ কি বস্তু সেই হইতে জানা হইয়াছিল। ছেলেটির অহর্নিশি ধরিয়া সকাতর ক্রন্দনের কারণ অনুভব করিলাম। আমার মুখে চোখে হয়তো একটা এমন কিছু ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ত্রস্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার অন্য সন্তানরা কি এই অসুখেই মারা গেছে?

সরম-রাঙা-মুখে, সংস্কোচ-বিজড়িত কণ্ঠে সে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, এ অসুখ তোমরাও আছে বোধ হয়; এ কি তোমার স্বামীর দান?

সে কথা কহিল না। আমি আবার সেই প্রশ্ন করিলাম। এবার নীরবে সে মাথা হেলাইল।

বলিলাম, সে যাই হোক্, কিন্তু ছেলেটীর চিকিৎসা হয় না কেন বলতো? পয়সার অভাবটাই কি সত্যি? ঠিক্ বল দেখি?

সে নীরব রহিল। তাহার পিঠের উপর একটা হাত রাখিয়া যতটা সম্ভব কোমল-কণ্ঠে কহিলাম, তোমাদের সাংসারিক বিষয়ে কথা বলছি, এজন্যে তুমি কিছু মনে করো না, আজ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তোমাদের ক'টা কথা আমার কাণে গেছে। শুনে স্থির থাকতে পারি নি। সেই জন্যে এত কথা বলছি, তুমি এতে রাগ করো না।

আমার হাত দুইটী ধরিয়া বধূটী কহিল, কি বলছেন আপনি, আপনার কথায় রাগ করব? এত হীন আমি? এখনে এসে পর্য্যন্ত আপনার কাছে যা' মিষ্ট কথা শুনেছি, তেমন বহুদিন শুনি নি। আপনি সত্যিই আমার দিদি।

বেশ; দিদি যা' বলে, সেগুলো শুনবে তো?

বলুন।

কিছুক্ষণ মৌন রহিলাম। কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করি? ছেলেটী জাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কান্না আরম্ভ করিল। বউটী সন্তর্পণে তাহাকে তুলিল। ব্যথিত-দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিলাম, দেখো ভাই, ছেলেটীকে এভাবে বিনা চিকিৎসায় রেখে ভাল হচ্ছে না, অসুখ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ওর জন্যে চেষ্টা করা দরকার।

সে ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, সে সবই বুঝি দিদি, কিন্তু কি করব বলুন? উনি কিছুতে ডাক্তার আনতে চান না। হুগলিতে থাকতে একবার ডাক্তার এসেছিল। তিনি ওকে যা' তা' বলে গেলেন। সেই অবধি আর ডাক্তার ডাকেন না।

কেন যে চিকিৎসক যাহা তাহা বলিয়া গিয়াছেন বুঝিলাম, কিন্তু সে তিরস্কার তো উহার প্রাপ্য। ইহাও সহিবার

ক্ষমতা নাই ? শুধু এই জন্য একমাত্র পুত্রকে নিশ্চিত মরণের মুখে আগাইয়া যাইতে দেখিয়াও স্থির নিশ্চিন্ত আছে ? এত অমানুষ ! বলিলাম, তোমার মা বাবা আছেন তো ? ভাই বোন ?

কেউ না দিদি, কেউ না। বরাত সেদিকে খুব ভালই।

তোমার নাম কি ভাই ?

নাম ? শীলা। নাম ধরে কেউ তো ডাকে না, ভুলেই গেছি।

বলিতে গেলাম, কেন তোমার স্বামী। কথাটা উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। স্বামীর স্নেহ-আদরের নমুনা ক্ষণপূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেই অভাগিনীর জীবন-খাতার সব কয়টা পৃষ্ঠাই তো চোখে পড়িয়াছে। আর এ প্রশ্ন নিরর্থক ! বলিলাম, তুমি যদি কিছু মনে না কর শীলা, তা' হ'লে খোকার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি কর্ত্তে পারি। তোমার স্বামী কিছু জানবে না।

ব্যাকুল আগ্রহে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল, কি করে হবে সে ?

আমি ডাক্তার আনব এই রকম সময় যখন তোমার স্বামী থাকবে না।

মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখ দু'টা দীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই অসীম নৈরাশ্যের ব্যথা তাহার শ্যামল মুখে ছায়া ফেলিল। সে কহিল, সে হবে না দিদি ! যদি কোনমতে টের পান তিনি তা' হ'লে আমায় আস্ত—

কথা সে শেষ করিল না। আমি একটু জোর দিয়াই বলিলাম, কিন্তু ছেলেটার জীবনের কাছে অন্য কিছু তোমার বড় করে দেখা উচিত নয় শীলা। এখনও সময় আছে, হয়তো ভালরকম চেষ্টা কর্লে—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে সে বলিল, কি বলছেন দিদি, তবে রণু কি আমার বাঁচবে না—তাদের মত ও আমায় ছেড়ে যাবে ! আমার যে আর কেউ নেই ! ওকে হারিয়ে আমি বাঁচব কি করে !

আমিও মা, মাতৃ-হৃদয়ের এ ব্যথা তো আমার অজানা নাই। সস্নেহে তাহার পিঠে হাত রাখিয়া কহিলাম, ও কি কথা ! বাঁচবে না কেন ? তাই তো বলছি ভাই, তুমি অমত করো না, আমি কাল ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসব।

কিন্তু তাঁর ফি ? আমার কাছে—

ও সে তোমায় বলি নি বুঝি ? তাঁর ফি লাগবে না। আমাদের আত্মীয় তিনি। এমনই দেখবেন।

ছেলেটা একভাবে কাঁদিতেছিল। কাপড়ের মধ্য হইতে 'হরলিক্সে'র বোতলটা বাহির করিয়া কহিলাম, এইটা তৈরী করে ওকে খাওয়াও ভাই !

শীলা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অবস্থা যাহাই হউক আত্মসম্মান বোধ যে তাহার একান্ত প্রখর, তাহা বুঝিতে ছিলাম। স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলাম, রোগা ছেলেকে দেখতে এলুম, মাসীমা হ'য়ে শুধু হাতে তো আসা যায় না, তাই এটা এনেছি। এতে তোমাকে অত কুণ্ঠা বোধ কর্ত্তে হবে না।

সে উত্তর দিল না। দেখিলাম অশ্রুতে তাহার চোখ দু'টা আবিল হইয়া উঠিয়াছে।

চার

গভীর রাত্রে একটা উচ্চ কণ্ঠরবে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া যাইতেই ত্রস্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া শব্দটার উৎপত্তি-স্থল নির্ণয় করিতে লাগিলাম। বিশেষ বিলম্ব হইল না; শীলাদের বাড়ী হইতেই এ ধ্বনি আসিতেছে। তাহার স্বামীরই কণ্ঠস্বর। এত রাত্রে আবার কি হইল ? উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। আমার ঘরের নীচেই তাহাদের ঘর। কথাগুলা কাণে স্পষ্ট আসিতে লাগিল। শীলার কথার উত্তরে তাহার স্বামী প্রভু হুঙ্কারের সহিত কহিল, ঘুমিয়ে পড়াই বা হয় কেন ? একটু আর জেগে থাকা যায় না। তিনঘণ্টা ধরে পথে দাঁড়িয়ে রোজ আমি কড়া নাড়ব ? খাবার সময় তো একটু ক্রটী দেখি না, কাজের বেলাই যত ওজর ! নবাব বাপ আর কিছু দিক্ না দিক্, নবাবী ঘুমটী দিয়েছে ষোলআনা ! রাজকন্যে খাটে শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছেন, আর আমি আছি বাইরে পড়ে। এসব মেয়ে-মানুষের ওষুধ হচ্ছে খালি ঝাঁটা। অসুখ অসুখ, বার মাস অসুখ। মরেও না তো যে আপদ যায়। জ্বালিয়ে খেলে, আমায় জ্বালিয়ে খেলে।

প্রভু বোধ হয় স্তব্ধ হইলেন। শীলার মলিন মুখখানা যেন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। আহা বেচারী! রাত্রের মত 'পালা' শেষ হইল ভাবিয়া শুইতেছি, নৈশ নীরবতার বক্ষ চিরিয়া আবার হুঙ্কার উঠিল—বড় যে লম্বা লম্বা কথা হয়েছে, মনে ভেবেছ কি, তাই শুনি? সারাদিন খেটে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, ও ভারী তো খাটুনি, তার আবার কথা। খাটবে না তো কি সিংহাসনে বসিয়ে পূজো কর্ব বলে তোমায় এনেছি না কি? না, মোমের পুতুল, 'গ্লাসকেসে' সাজিয়ে রাখব? দেখো বারণ কচ্ছি আর একটী কথা যদি শুনি তা' হ'লে জুতোর বাড়ি মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব। কিছু বলি না বলে ভারী সাহস হয়েছে, না? কি, জোরে কথা বলব না? কেন, কার ভয়ে, কিসের জন্যে? আমার বাড়ীতে আমি চেঁচাব, আমার স্ত্রীকে শাসন কর্ব, কে তা'তে কি বলবে। বেশ করব চেঁচাব, আরও বেশী করে চেঁচাব। কে কি করে দেখি।

কথা ও কাজে তাহার সামঞ্জস্য আছে। কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছিল। তেমনই ভাবে সে বলিতে লাগিল, আমার স্ত্রী, আমি যদি তাকে খুন করে এইখানে রাখি, তাই বা কে কি কর্ত্তে পারে? কে কি বলতে পারে?

কথাটা সত্যই। সে স্বামী, স্ত্রীকে মারিবার কাটিবার অধিকার তাহার আছে। সে শক্তি তাহাকে দিয়াই বুঝি কন্যার অভিভাবকেরা কন্যাসম্প্রদান করিয়াছেন। অন্য কাহারাও তাহাতে কথা বলিবার ক্ষমতা নাই। বাবু বোধ হয় ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া পরক্ষণের জন্য শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন। ছেলেটী কাঁদিতেছিল। আমার চোখের সম্মুখে না হইলেও তাহাকে ভুলাইবার জন্য যে একটা প্রবল চেষ্টা চলিতেছে, তাহা বেশ অনুভব করিতেছিলাম। শিশুর পিতা হয়তো শয্যা লইয়াছিল। ক্রন্দনের শব্দে বিরক্ত হইয়া কহিল, হচ্ছে কি? সেই থেকে ওটাকে ঠাণ্ডা করা গেল না? সারাদিনের পর বাড়ী এসে একটু যে ঘুমোব সে উপায়ও নেই। কাল থেকে বাড়ী আর আসব না। যাও ওকে নিয়ে বাইরে যাও। যাও বলছি।

ভীতকণ্ঠে শীলা কহিল, এই অন্ধকারে বাইরে কোথায় যাব?

চুলোয়! যেখানে খুসী যাও। এঘর ছাড়। ঘুমোবার সময় কান্না সহ্য হয় না।

ঠিক্ কথা। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত থিয়েটার দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া রুগ্ন পুত্রের রোদন অসহ্য তো লাগিবেই! দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিলাম। তিমিরাচ্ছন্ন গভীর রাত্রে শীলা পুত্র লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিল।

পাঁচ

আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক রমেশবাবুকে লইয়া পরদিন মধ্যাহ্নে শীলার গৃহে আসিলাম। স্বামীও সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকে গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া শীলাকে খবর দিতে চলিলাম। ঘরের মাঝখানে একটা আধছেঁড়া কম্বল পাতিয়া সে শুইয়াছিল। আমার আহ্বানে উঠিয়া বসিতেই, তাহার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিলাম—শীলা, কি হয়েছে তোমার?

জ্বর হয়েছে দিদি, আর—

আর কি?

আর আমারও তো ঐ অসুখ আছে। মাঝে একটু ভাল ছিলুম; ক'দিন হ'তে আবার বড় বেশী হয়েছে।

গায়ে তাহার জামা-সেমিজ ছিল না। পিঠের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছে। বড় বড় বীভৎস ক্ষতগুলা তাহার মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। একটা অস্বস্তিকর শিহরণ তড়িত শিখার মত দেহের উপর বহিয়া গেল। বিহ্বল ভাবটা কাটিলে প্রশ্ন করিলাম, তোমার স্বামী কি তোমারও কোন ব্যবস্থা করে না; এই কষ্ট তোমার দেখেও স্থির হয়ে থাকে?

নতমুখে সে নীরব রহিল। ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসটা বক্ষে চাপিয়া বলিলাম, ডাক্তারবাবু এসেছেন, নিয়ে আসি তাঁকে।

আসুন। আমি ওঘরে যাচ্ছি।

কি রকম? তোমাকেও দেখবেন ডাক্তার, বসো তুমি।

হাত দু'খানা যুক্ত করিয়া কাতরকণ্ঠে সে কহিল, আমায়

ক্ষমা করুন দিদি। ছেলের জীবনের মূল্য আমার সব কিছুর ওপর, তাই ওঁর অমতে ওর চিকিৎসায় রাজি হয়েছি। কিন্তু আমি ? আমি মরে গেলেও তাঁর বিনা সম্মতিতে নিজের চিকিৎসা কর্ত্তে পারব না।

তাহার কণ্ঠের স্বরে এমন নিশ্চল-দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল, যাহাতে দ্বিতীয়বার অনুরোধের সাহস আমার হইল না। সে কহিল, আর একটা কথা, ডাক্তার জানতে চাইবেন, খোকার এ রোগ এসেছে কোথা হ'তে ? আপনি বলবেন, ওর মার কাছ থেকে।

মার কাছ থেকে ! কি বলছ শীলা ?

কুণ্ঠিত চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া সে কহিল, আপনি দিদি, তাই অসংকোচে আপনাকে সব কথা বলেছি। কিন্তু অন্যের কাছে তাঁকে হীন করি কেন ?

প্রশংস-নেত্রে এই সল্প-শিক্ষিতা গ্রাম্যমেয়েটীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি মহান অন্তর তাহার ! ঐ নিষ্ঠুর স্বামী, উহার উপর এত মমতা ? উহার সমস্ত কলঙ্কের কালি অকুণ্ঠায় আপন দেহে মাখিতেছে ! অথচ যাহার জন্য এই হীনতা স্বীকার করে, সে উহাকে কি দিয়াছে ? এই দারুণ ব্যধি, যন্ত্রনা এ ত তাহারই দান। প্রতিকারের চেষ্টামাত্র সে করে না, তবু এত আকর্ষণ তাহার উপর। অভাগিনীকে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলাম, আচ্ছা ভাই, তার দুর্ণাম যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা কর্‌ব। কিন্তু তুমি বসো, ডাক্তারকে দেখাও। যে অবস্থা তোমার হয়েছে শীলা, এখনও প্রতীকার না করলে বাঁচবে না যে।

কি যে বলেন দিদি, ভারী তো জীবন, এর জন্যে আবার চেষ্টা ! যত শীগগির এর শেষ হয় ততই মঙ্গল।

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আমি ডাক্তারবাবুকে আসিতে বলিলাম। স্বামী ও রমেশবাবু আসিলেন। রোগীর দিকে চাহিয়াই চিকিৎসক মুখ বাঁকাইলেন। পরীক্ষা অন্তে কহিলেন, 'হোপলেস, লাষ্ট টাইম।'

আশা যে নাই, সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়াছিলাম। আহা, কিছুদিন আগেও যদি এর ব্যবস্থা হইত ! ব্যথা-কাতর নয়নে ছেলেটীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। চিকিৎসক কহিলেন, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, এনে খাওয়ান। আশা অবশ্য নেই, তবু—

ছয়

শিশুর পিতাকে গোপন করিয়া চিকিৎসা চলিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে ঔষধ লইয়া গিয়া বার দুই খাওয়াইয়া আবার ঔষধ সঙ্গে লইয়াই বাড়ী আসিতাম। ঔষধ ঘরে রাখিবার সাহসও শীলার ছিল না। শীলার অসুখও ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে। চোখের উপর বিনা চিকিৎসায় সে মরিতেছে, প্রতীকার করিবার কোনও উপায় নাই। আমার এ কষ্ট ক্রমেই অসহ হইয়া উঠিতেছিল। কেন জানি না, এই কয়টী দিনেই তাহাকে বড় বেশী ভালবাসিয়াছিলাম। তাহার দেহের ক্ষতগুলা অতি ভীষণ হইয়া উঠিতেছে, জরও খুব বেশী। তবু তাহার সংসারের কাজে এক তিল বিচ্যুতি হইবার উপায় নাই। তাহার স্বামীকে একদিন বলিতে শুনিলাম, মেয়েমানুষের এমন অসুখ হ'তে পারে না, যার জন্যে সে কাজ বন্ধ করে শুয়ে থাকবে। নিয়মমত খাটতে না পার, পথ দেখো। ওসব অসুখ-বিসুখ বায়না আমার কাছে চলবে না।

সত্যই তো, স্ত্রীলোকের শরীর আবার শরীর ? না সে মানুষ ? মরুক বাঁচুক খাটিতেই হইবে। না পারে তাহার পথ সে দেখিয়া লউক। বাংলাদেশে অন্য কিছু লাভ করিবার পথে যত বাধাই থাক, স্ত্রী-লাভের পথ চির-অবারিত। এ বস্তুটী এ দেশে বড় সুলভ।

মধ্যাহ্নে গিয়া যতটা পারি শীলার সাংসারিক কাজের সাহায্য করিতাম। প্রথমটা সে কুণ্ঠা বোধ করিত, তারপর বাধ্য হইয়াই আমার এ সহায়তা লইত। না লইয়া উপায় ছিল না। নহিলে স্বামীর কাছে তাহার অব্যাহতি নাই। ছেলেটীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার যাতনা এবার অবসান হইয়া আসিয়াছে। আর সে কাঁদে না। কাঁদিতে পারে না। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া নীরব হইয়াছে। মাত্র অতি অস্ফুট একটা ধ্বনি তাহার ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। বড় বড় চোখের স্থির-দৃষ্টি মেলিয়া অবশভাবে শয্যার উপর পড়িয়া থাকে। ক্ষতগুলা আরও

বাড়িয়াছে। দেহটা শুদ্ধ ত্বকে আবরিত একখানা কঙ্কাল। কি করুণ সে মূর্ত্তি! পুত্রের অবস্থা শীলা ঠিক বুঝে নাই। ডাক্তার দেখিতেছে, তাহার ছেলে এবার সারিয়া উঠিবে, এই তাহার ধারণা। মাতৃহৃদয়ের সে সরল বিশ্বাসে আঘাত করিতাম না। ক্ষুব্ধচিত্তে শুধু বিশ্বনিয়ন্তাকে বলিতাম, তাহার এ ধারণা সত্যই হউক।

শীলার স্বামীর সেই একই ভাব। আজকাল বাড়ীতেও বড় একটা আসে না। তাহাও একপ্রকার ভাল। বেচারীর নিগ্রহ কম হয়। একদিন অফিস যাইবার সময় বলিতেছে শুনিলাম, ছেলেটা যে আর চেঁচায় না, হ'য়ে এল না কি? যাক, রাত-বিরেতে যেন না মরে, হাঙ্গামের শেষ থাকবে না তা' হ'লে।

শীলা অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিল। রাগে আমার সারাদেহ জ্বলিতেছিল। অভাগা শিশু, ওর দিকে চাহিয়া আমরা চোখের জল রোধ করিতে পারি না, আর পিতা ও, উহার কোন কিছু দুঃখ নাই! হায় ভগবান, কত অদ্ভুত জন্তুই যে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ! অনেক বলিয়াও শীলাকে চিকিৎসায় সম্মত করিতে পারিলাম না। অভাগিনী মরিতে বসিয়াও স্বামীর অপ্রিয় কাজ করিতে চাহিল না। জানি না বাংলার মাটি ভিন্ন আর কোথাও ইহা সম্ভব কি না! আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে নিশ্চিত মরণের দিকে সে আগাইয়া চলিল। আহা সে কি অসহ্য যন্ত্রনা! একান্ত ধৈর্য্যের সহিত কোনমতে নিজেকে স্থির করিয়া রাখিতে চাহিলেও দিনের পর দিন সেই দারুণ ব্যাধি তাহার দেহে নির্ম্মম চিহ্ন আঁকিয়া যাইতে লাগিল। সে দিকে চাহিয়া অশ্রু রোধ করা ক্রমশঃ দুরূহ হইয়া উঠিল।

সাত

সেদিন শিশুটীর গায়ে হাত দিয়াই রমেশবাবু চমকিয়া উঠিলেন।

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দেখলেন ডাক্তারবাবু?

আর কি বড় জোর আধ ঘণ্টা। আহা, বড় কষ্ট পেয়েছে, এবার শান্তি পাবে! তবে আমি কিছুই কর্ত্তে পারলুম না এই আক্ষেপ। আর কিছু দিন আগেও যদি আমার হাতে আসত!

অবশ স্খলিত দেহে ছেলেটীর পাশে বসিয়া পড়িলাম। নীরব নিথর দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে। দৃষ্টি স্থির। কিন্তু কি করুণ, কি মর্ম্মস্পর্শী! প্রবল শ্বাস তাহার অস্থি-পঞ্জর কাঁপাইয়া বহিতেছে। প্রতিক্ষণে শঙ্কা হইতেছিল, সে বেগে এই ভাঙ্গাখাঁচা এইবার বুঝি একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়! এ দৃশ্য দেখা যায় না। মরণ তাহার হাত বাড়াইয়া আসিতেছে জানিতাম, কিন্তু এত শীঘ্র যে শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইবে ভাবি নাই। সজলকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কোনো আশা নেই?

কিছু না। এখনি মারা যাবে।

পাশের ঘরের বন্ধ দুয়ারটা খুলিয়া গেল। বিশৃঙ্খলা বেশে ছুটিয়া আসিল শীলা।

কি বলছেন, কি বলছেন আপনারা! রণু বাঁচবে না! এখনি মারা যাবে! সত্যি, সত্যি বলুন ডাক্তারবাবু?

কথা কয়টা বলিয়াই ক্লান্তিভরে সে বসিয়া পড়িল। সস্নেহে তাহাকে নিকটে টানিয়া লইলাম। কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব—বলিবার মত কিছু আছে কি? আকুলভাবে কাঁদিয়া সে কহিল, দিদি, আপনি বলুন, সত্যি ও চলে যাবে? আমার যে আর কেউ নেই, ওকে হারিয়ে আমি কি করে বাঁচব! ওকে আপনারা সারিয়ে দিন! আমি যে বড় আশা করে আছি, চিকিৎসা হচ্ছে এবার ও ভাল হয়ে যাবে! দিন, ডাক্তারবাবু ওকে বাঁচিয়ে দিন!

দুই হাতে মুখ ঢাকিলাম। অশ্রু ও হাহাকার নিত্য দর্শনে অভ্যস্ত চিকিৎসক রুমালে চোখ মুছিতেছিলেন। ছেলেটীকে দুইহাতে ধরিয়া বক্ষে তুলিয়া মর্ম্মন্তুদকণ্ঠে শীলা বলিতে লাগিল, রণু, মাণিক আমার! সত্যি কি তুই চলে যাবি! ওরে সোণা আমার, আমি কি নিয়ে থাকব! আমার যে কেউ নেই! তুই যাস নি, যাস নি রে!

কি কর—কি কর শীলা, মেরে ফেলবে ওকে? দাও —দাও। তাহার বাহুবেষ্টনী হইতে ছেলেটীকে লইয়া পূর্ব্ব স্থানে শোয়াইয়া দিয়া বলিলাম, ডাক্তারবাবু দেখুন তো।

'ষ্টেথিস্‌কোপ'টা একবার তাহার বক্ষে দিয়াই চিকিৎসক

উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। একবার আমার দিকে চাহিয়াই শীলা বলিয়া উঠিল, আপনি অমন করছেন কেন, কি হ'ল ? রণু, রণু, সত্যিই তা' হ'লে চলে গেল ? রইল না—রাখতে পারলেন না !

শীলা বোন্‌টী আমার, এ ভগবানের বিধান ! মানুষের কোন ক্ষমতাই এখানে কাজ করতে পারে না ! তোমার রণু তাঁরই পায়ের তলায় গিয়েছে !

গিয়েছে—সত্যি গিয়েছে ! ভগবান—ভগবান !

তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই আমি তাহাকে ধরিয়া মেঝের উপর শোয়াইয়া দিলাম। রমেশবাবু সরিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন, ইনিও তো দেখছি খুবই অসুস্থ !

হাঁ, ওরও অবস্থা ভাল নয়, দেখুন দেখি।

নিবিষ্টচিত্তে কয় মিনিট ধরিয়া শীলার দেহ পরীক্ষার 'পর রমেশবাবু গম্ভীরমুখে কহিলেন,—শেষ অবস্থা !

চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম, কি বলছেন ? শেষ অবস্থা কি ? না—না অসম্ভব ! এখনও চেষ্টা করলে হয়তো ও সুস্থ হয়ে উঠবে। দেখুন না ভাল করে !

ভাল করেই দেখেছি, কোন আশা নেই। এই ভীষণ রোগের বিষে সারাদেহ ওর বিষিয়ে গেছে। তারপর অনিয়মিত খাওয়া, শরীরের উপর অমানুষিক অত্যাচার, পরিশ্রম, মনের কষ্ট নানারকমে জীবনী-শক্তি একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে—তবু এতদিন কোনও মতে চলেছিল, এবার আর নয়। এই ওর শেষ ! ওঃ—একজন লোকের জন্য কতগুলো নির্ম্মল জীবন যে নষ্ট হয় ! দেশে ছেলে-মেয়ে বে দেবার সময় অভিভাবকেরা খোঁজে—পাত্রীর রূপ, তার বাপের টাকা, আর পাত্রের অর্থ-উপার্জ্জনের ক্ষমতা, কিন্তু আসল জিনিষ যা'—সবল স্বাস্থ্য—তার খবর কেউ রাখে না। এই সব শোচনীয় মরণ অনেক সময় তারই পরিণাম !

কয়-মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া রমেশবাবু আবার বলিলেন—এই যে মেয়েটী প্রাণভরা আশা নিয়ে, এই দারুণ কষ্ট সয়ে আস্তে আস্তে মরণের বুকে ঝরে পড়ছে—এর জন্যে দায়ী কে ? ও তো নিরপরাধ, নির্ম্মল ! কার দোষে ওর এ শাস্তি ? যারা এসব ব্যাধি সত্ত্বেও বিয়ে করে অন্য একটী নিষ্পাপ জীবনকে অকারণে এই শাস্তির অংশীদার করে নেয়, দোষ তাদের বেশী, না যে সব অভিভাবকেরা পাত্রের চরিত্র সম্বন্ধে কোন খবর না নিয়েই তার হাতে মেয়ে দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করে, তাঁদের।

অপরাহ্নের রক্তিম আলোর একটী শিখা আসিয়া পড়িয়াছিল শীলার রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে, রুক্ষ চুলে। তাহার মাথাটা অঙ্কে লইয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। স্বামী বাড়ী ছিলেন, উপরের ঘর হইতে ব্যাপারটা দেখিয়া এদিক-কার ব্যবস্থা করিতে তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইচ্ছা করিয়াই শীলার চেতনা ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিলাম না। যতক্ষণ অচেতন থাকে, ততক্ষণই ভাল। দু'চারিজন প্রতিবেশীসহ মৃত শিশুর দেহ লইয়া স্বামী চলিয়া গেলেন। শিশুর পিতা কোথায় কে জানে ! পশ্চিম আকাশের গায়ে সূর্য্য হেলিয়া পড়িল। অপরাহ্ন ক্রমশঃ সন্ধ্যার বুকে ডুবিয়া যাইতেছিল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ভগ্ন জীর্ণ বাড়ীটার মধ্যে শীলাকে লইয়া একাকী বসিয়া রহিলাম। মূর্চ্ছাহতা অভাগিনীর দিকে চাহিয়া একটা প্রশ্ন কেবলই চিত্ত আলোড়িত করিয়া জাগিতেছিল—এই যে হত্যা,—হাঁ, হত্যা ভিন্ন আর কি বলা যায় একে ?—এই শিশুহত্যা—নারীহত্যা—ইহার জন্য দায়ী কে ? এ অপরাধ কাহার ?

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠান

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রীদের সংস্থা; নাম তার নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠান। উপস্থিত সতেরোটি মেয়ে সভ্য-তালিকায় নাম লিখাইয়াছে এবং আরও অনেকেই নাম লিখাইব লিখাইব করিতেছে, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না। কেন না, সভার আইন কানুন ভারী কড়া।

যথা—নাম লিখাইবার সময় প্রত্যেককেই এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তাহারা চিরকুমারী থাকিবে, যতই প্রলোভন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া যে কোনও পীড়ন বা প্রয়োজন আসুক না কেন, তাহারা থাকিবে অটল; ছেলের বিবাহের নামে ছেলের বাপেরা এতকাল ধরিয়া মেয়ের বাপেদের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে—কসাইসুলভ নৃশংস মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া মেয়েদের মুখ নীচু করিয়া রাখিয়াছে, ইহারা মুখ তুলিয়া তাহার প্রতীকার করিবে—সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়া ছেলের বাপেদের ধারালো মুখ ভোঁতা করিয়া দিবে। ইহার জন্য যে কোনও প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা, ছল, চাতুরী, কৌশল বা আন্দোলন চালাইবার প্রয়োজন হইবে, তাহারা তাহা করিতে কিছুতেই পেছ্‌পাও হইবে না।

কাযেই যাহারা একেবারেই বে-পরোয়া, তাহারাই হুড়মুড় করিয়া এই সাংঘাতিক প্রতিষ্ঠানে ভিড়িয়া পড়িয়াছিল। আর, যাহারা অভিভাবকের তোয়াক্কা রাখিত, পিছনে প্রতিবন্ধক ছিল, অর্থাৎ ভাই বা পরিজনদের বিবাহ প্রসঙ্গে যাহাদের অভিভাবকেরা পণপ্রথার ছুরি সানাইতে অতি সচেতন, সে সব মেয়ে মনের ইচ্ছা সত্ত্বেও দলে ভিড়িতে পারিতেছিল না। তবে তাহাদিগকেও দল বাঁধিয়া সভার আনাচে-কানাচে ঘুরিতে দেখা যাইত।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের একতালার এক নিরিবিলি অংশে ছুটির পর প্রত্যহই নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠানের বৈঠক বসে। প্রতিষ্ঠানের সতেরোটি মেয়েই মহোৎসাহে সভায় যোগ দেয়। সতেরোটি সভ্যার মধ্যে দশটি স্কটিশ চার্চ্চের ছাত্রী, সাতটি আসে অদূরবর্ত্তী বেথুন হইতে।

প্রতিষ্ঠানের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে থার্ড ইয়ারের ছাত্রীসঙ্ঘ। ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্রীসংখ্যা তিন, ফোর্থ ইয়ারের পাঁচ এবং ফিফ্‌থ ইয়ারের মাত্র এক; বাকি আট্‌টিই থার্ড ইয়ারের এবং ইহারা প্রত্যেকেই বি, এস, সি বিভাগের।

ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্রী শ্রীমতী অনীতা সেনগুপ্তা সব দিক দিয়াই দলের সকলের জ্যেষ্ঠা, সুতরাং সে-ই নারী-প্রগতি প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট এবং থার্ড ইয়ারের প্রতিভাশালিনী ছাত্রী শক্তিবোস এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরসাধিকা ও সেক্রেটারী।

ক্লাশ যেদিন একটু আগে আগে ভাঙ্গে, সেদিন প্রতিষ্ঠানের সভা একটু ভালভাবেই জমে। গান, বক্তৃতা, উপদেশ কিছুরই অসদ্ভাব হয় না। বেথুনের স্কুল বিভাগের ছোট ছোট মেয়েরা সভায় আসিয়া গান গায়। গানগুলি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের অনুকূলেই রচিত, গান রচনায় সেক্রেটারী শক্তির অসামান্য শক্তি,—প্রত্যেক গানের প্রতি ছত্রটি এমনভাবে রচিত—পণপ্রয়াসী ছেলের বাপেদের বুকে যাহাতে ভীমরুলের হুলের মত ফুটিয়া জ্বালা দিতে পারে!

শনিবার দুইটার পরেই বৈঠক বসিয়া থাকে। আজও বসিয়াছে। শ্রোত্রীর দল ক্রমশঃই বাড়িতেছিল, এবং আশে পাশে দুই চারিজন শ্রোতাও যে একান্ত ঔৎসুক্যের সহিত ঘুরিতেছিল না, এমন কথা বলা যায় না। ফলারের বাড়ীতে লুচির সুবাসে আকুল হইয়া অনিমন্ত্রিত পেটুকের দল যেভাবে আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহাদেরও অবস্থা অনেকটা সেইরূপ। এ সভায় তাহাদের প্রবেশ নিষেধ। প্রথম প্রথম ছেলেরদলও এদিকে খুব উৎসাহ-

ভরেই ঝুঁকিয়াছিল, কিন্তু এ পক্ষ তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, কাযেই সম্পূর্ণভাবে তাহাদিগকে 'বয়কট' করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ছেলেদের রোক তাহাতে আরও বাড়িয়া গিয়াছে,—সুহৃযোগীতার সূত্রপাত করিতে কোন বৈঠকেই তাহাদের ছল, কৌশল ও প্রয়াসের ত্রুটি দেখা যাইত না;—আজও তাহারা যথাযথভাবেই সতর্ক, সচেষ্ট ও সচেতন।

প্রথমেই মিলিত কণ্ঠের উদ্দীপনাপূর্ণ সুদীর্ঘ 'কোরাস্' গান প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ঝঙ্কার দিয়া ব্যক্ত করিয়া দিল। গানের কথায় শুধু যে কসাইসুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন পণ-পিয়াসী পাযণ্ড ও তাহাদের বংশধরগণের উপর তীক্ষ্ণ আক্রমণ ছিল তাহা নয়—দেশের নেতৃগণকেও রেহাই দেওয়া হয় নাই; যেহেতু, তাঁহারা যে সকল বিষয় লইয়া আন্দোলনে উন্মত্ত, দেশের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার তুলনায় সে সমস্তই একান্ত অকিঞ্চিৎকর!

গানের পরই বৈঠকের কাজ আরম্ভ হইল। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী নীলিমা মুখার্জ্জী সেই তারিখের দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় মন্তব্যের চিহ্নিত অংশটুকু বৈঠকে বিবিধ আলোচ্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া পড়িতে উঠিল,—'মহাত্মা গান্ধী যদিও প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ সাহেবা গত পঁচিশে আগষ্ট দিল্লীর কুইন্স গার্ডেনে পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উৎসব সমাগত নরনারীবর্গকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।'

বৈঠকের সেক্রেটারী শক্তি বোস তৎক্ষণাৎ উঠিয়া এই সংবাদটুকুর উপর এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিল,—আমি প্রস্তাব করিতেছি, নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতীয় নারীসমাজের গৌরবস্বরূপ শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ সাহেবাকে লিখিয়া জানান হউক,—যেহেতু, পতাকার অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব এবং তাহা উড়াইবার বিধি-ব্যবস্থা যখন শাসন-বিভাগের সদয় মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তখন এই প্রতিষ্ঠানের বিবেচনায় উক্ত অনুষ্ঠানটি রাজ্যহীন রাজার মুকুট-উৎসবের মতই হাস্যকর। আপনার হাতে যদি উপস্থিত আর কোনও কাজ না থাকে, তাহা হইলে পতাকার দাণ্ডা হইতে হাত দুইখানি সরাইয়া—কুমারী মেয়েদের পিষাই করিবার জন্য দেশের বুকে পণপ্রথার যে জাঁতা ঘুরিতেছে, তাহা থামাইতে সচেষ্ট হউন।

যুগপৎ সকলেরই কণ্ঠ ঝঙ্কার দিল,—'হিয়ার', 'হিয়ার'! সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিল। প্রেসিডেণ্ট সেনগুপ্তা সহর্ষে হাত তুলিয়া কহিলেন,—'থ্যাঙ্ক-য়ু'!

বলা বাহুল্য শক্তি বোসের এই প্রস্তাবটি সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমেই গ্রাহ্য হইয়া গেল।

বৈঠকে তখন উৎসাহ ও উত্তেজনার একটা উদ্দাম প্রবাহ বহিয়াছে।

থার্ড ইয়ারের একটি দুঃসাহসী ছেলের ঠিক এই সময় বৈঠকের মধ্যস্থলে প্রবেশ। বয়স বড় জোর একুশ-বাইশ, চোখে চশমা, পরিচ্ছেদের পরিপাট্য প্রচুর, একটি চক্ষু কিঞ্চিৎ বক্র, সোজা কথায় যাহার আখ্যা হয়—ট্যারা, গোঁফের নিদর্শন পাইবার উপায় নাই, সন্তর্পণে তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিবার লক্ষণ যদিও দেখা যায়। ছেলেটির হাতে একটি কপিং পেন্‌সিল, মাথায় 'সেলুলয়েডে'র সাদা টাপি।—

বৈঠকের প্রেসিডেণ্ট প্রিন্সিপালের সহিত মুলাকাৎ করিয়া হুকুম জারী করাইয়া লইয়াছিল যে, তাহাদের বৈঠকে কলেজের কোনও ছেলে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না।

আগন্তুক ছেলেটির আকস্মিক উপস্থিতি বৈঠক-বিহারিণীদের চক্ষুর উপর কৌতুকবিজড়িত বিস্ময়ের রেখা ফুটাইয়া তুলিল।

প্রেসিডেণ্টের কণ্ঠ হইতে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন হইল,—'হোয়াট ইফ্'!

ছেলেটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেক্রেটারীর দিকে চাহিয়া কহিল,—ক্লাসে আপনার পেন্‌সিল্‌টা ফেলে এসে ছিলেন, তাই দিতে এসেছি—এই নিন!

এই ক্লাসেরই আর একটি ডেঁপোমেয়ে দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্লেষের সুরে কহিল,—সর্ব্বরক্ষে!

প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করিল,—পেন্‌সিলটায় বুঝি খোদাই করা আছে যে ওর অধিকারিণী কুমারী শক্তি বোস ?

ছেলেটি উত্তর দিল,—নাম না থাকলেও এটি যে ওঁরই তা আমি জানি।

অনীতার দৃষ্টি শক্তির মুখে পড়িতেই সে কহিল,—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই অনীতা দি, আমার নিজের বই, খাতা, পেন্‌সিল সম্বন্ধে অনেক সময় আমি নিজেই যা জানি না, এরা তাও জানেন !

ছেলেটি ইহাতেও অপ্রতিভ না হইয়া কহিল,—আপনার এই পেন্‌সিলটা যে একটু 'স্পেসাল' রকমের—

শক্তি একটু কঠিন হইয়া কহিল,—ক্লাসে কিছু ফেলে এলে তার তদারক করতে আছে মাইনে করা বেয়ারা, আপনার এতটা 'ফেভার' করবারও কোনো দরকারই ছিল না,—আপনি যদি এই ভেবে এসে থাকেন যে এর জন্যে আমার কাছ থেকে একটা 'থ্যাঙ্কস্' পাবেন, সেটাও আপনার মস্ত ভুল !

ছেলেটি এবার মুখে একটু হাসি টানিয়া কহিল,—আপনার হাতের জিনিস, ফেলে এসেছিলেন, আমি সেটা পৌঁছে দিলুম, এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড—হ্যাণ্ড এণ্ড ইন গ্লোভ উইথ'—

ছেলেটির মাথার উপর হাতের পেন্‌সিলটির সজোরে ঘা' দিয়া শক্তি কহিল,—'সাট্ আপ্, গেট আউট, প্লীজ'।

ছেলেটি বোধ হয় এতটা প্রত্যাশা করে নাই। তাহার কাঁচা রগটির উপর পাকা পেনসিলের আঘাতটি রূঢ় হইয়াই বাজিয়াছিল। শক্তির দিকে আর্ত্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া আহত স্থানটির উপর হাত রাখিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অনীতা কহিল,—একবারে মেরে বসলি শক্তি,—'বাই দি ষ্ট্রং হ্যাণ্ড' !

শক্তি কহিল,—তবুও এদের লজ্জা নেই, দেখ্‌লে না—কি রকম করে চেয়ে গেল ! একবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

উর্ম্মিলা রায় সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী ; সে কহিল,—সত্যি ! ট্রাম থেকে নেমে ক্লাস পর্য্যন্ত আসাই হয়েছে মুস্কিল। অপরাধের মধ্যে হাত থেকে একখানা 'নোটবুক' পড়ে গিয়েছিল 'ষ্টেয়ারকেসে'র [illegible] অমনি দশজন ভক্ত ছুট্‌লো সে'খানা কুড়িয়ে [illegible] হাতে দিতে ; এক বেচারার পট্ করে চশমার একখানা কাঁচই ভেঙ্গে গেল হুড়োহুড়িতে ; একটা 'সীনই ক্রিয়েট' করে ফেললে তখনি। আমি তখন 'বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা'—হাসব, না পালাব, ভেবেই পাই না।

শক্তি কহিল,—চৌরাস্তার কোনো 'ক্রাউডী' মোড়ে এ রহস্য আরো বেশীরকম উপভোগ করবার।

অনীতা প্রশ্ন করিল,—কি রকম ?

শক্তি কহিল,—আস ত' বাড়ীর 'কারে', কি বুঝবে বল ! ইচ্ছে করেই এক একদিন মোড়ের ওপর ট্রাম থেকে নেমে পড়ি ; ট্রামের ভেতরে ত আমরাই একমাত্র হই সবারই দ্রষ্টব্য বস্তু। তারপর, যেমন রাস্তায় নামি, একবারে 'ষ্টর্ম অন্ দি রোড সী'—গাঙের ওপর দিয়ে জাহাজ একখানা 'পাস' করলে, ডিঙ্গিগুলোর যে দুর্দ্দশা হয়—ঠিক তাই আর কি ! সবাই টলমল ! সাইকেল পড়ে রিকসার ঘাড়ে, ফুটপাথের ওপর মাথা ঠোকাঠুকি, ট্রাম, ট্যাক্সী চাপা প'ড়তে প'ড়তে কেউ হয় ত 'হেয়ার ব্রীথ্ স্কেপ্' 'অ্যাকসিডেণ্ট' যে হয় না—তাও বলা যায় না ! তাই ভাবি মেয়েদের এমন 'সিরিয়স অ্যাটাক্‌সন্', বিয়ের বেলাতেই একবারে 'নট এনিথিং অফ্ ইম্পটেন্স !'

অনীতা কহিল,—এটা হচ্ছে আমাদের সমাজের সহজাত-সংস্কার। এখন তোদের দেখে যারা হোঁচট খেয়ে মরে, তাদের কারুর সঙ্গে যদি কখনও বিয়ের বাঁধন পড়ে, তা' হ'লে তখনই দেখতে পাবি তাদের 'অ্যাপিয়ারেন্স' 'কোয়াইট ডিফারেন্স',—কনে যেন কেনা বাঁদী, আর তার বাবা একতোড়া টাকার সঙ্গে সালঙ্কারা সুন্দরী কন্যা দান করে যেন চোর-দায়ে পড়েছেন ধরা। 'সেম, সেম্—'

শক্তি কহিল,—তবুও এরা শিক্ষার গর্ব্ব করে, দেশ দেশ করে মহরমের আলেমদের মত বুক চাপ্‌ড়ায়, কোথাও ত মিটিং হ'লে আর রক্ষে নেই, দেখবে সব 'সীট' এরাই ভরিয়ে ফেলেছে, 'ক্ল্যাপের' ঠেলায় বক্তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দেয়, অথচ সমাজের বুকের ওপর এত বড় যে অন্যায়ের পাহাড় খাড়া হয়ে রয়েছে, তার দিকে কারুর

ভ্রূক্ষেপ নেই,—ওদের 'হাই এজুকেসন, য়ুনিভারসিটির ডিপ্লোমা' গুলো জড়ো হয়ে এ অন্যায়ের পাহাড় দিন দিন আরো উচুঁ করে তুলেছে।

অনীতা দৃঢ়স্বরে কহিল,—এখন পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার করবার গুরুভার পড়েছে আমাদের হাতে।

শক্তি কহিল,—এ রকম অন্যায় চুপ করে সহ্য করাও যে অন্যায়।

এই সময় এক উর্দ্দীপরা দরোয়ান সেলাম বাজাইয়া দাঁড়াইল; তাহার হাতে ছিল খানকতক চিঠি। কহিল, হুজুর নে ইয়ে সব ভেজ দিয়া।

অনীতা প্রশ্ন করিল,—মোকাম পর আয়া থ্যা?

'জী হুজুর'—বলিয়া তিনখানি লেফাফাবদ্ধ ডাকঘরের মোহরাঙ্কিত চিঠি অনীতার হাতে দিল।

অনীতা চিঠি কয়খানির উপর চক্ষু বুলাইয়াই কহিল, —গুড্ নিউস্, দি ফ্রুট্‌স্ ফার্ষ্ট গেদার্ড ইন্ এ সিজন অফ্ আওয়ার এড্‌ভারটাইজ্‌মেণ্টস্।

একাধিককণ্ঠে উল্লাসধ্বনি উঠিল,—'হুর্‌রে!'

সংবাদপত্রে নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠান এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিল,—ঘুষ লওয়া ও ঘুষ দেওয়া যেমন তুল্য অপরাধ, পুত্র-কন্যার বিবাহে পণের আদান-প্রদানের অপরাধও তদ্রূপ। পণের প্রভাবে যাঁহারা বিব্রত, শুভ-বিবাহের নামে যে সকল অর্থপিশাচ কন্যাপক্ষের সহিত দর কসাকসি করিতেছে, সত্বর তাহাদের বিবরণ লিখিয়া পাঠান, অবিলম্বে প্রতীকার হইবে। কন্যা বা কন্যাপক্ষের পত্র ও পরিচয় বিশেষভাবে গোপন থাকিবে। পণপ্রথার উচ্ছেদ ও কন্যাপক্ষের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি।

অনীতাদের বাড়ীর ঠিকানাতেই নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দরোয়ান শুধু চিঠি তিনখানি আনে নাই। অনীতার গাড়ীও আনিয়াছিল। তাহাকে গাড়ীতেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে চিঠির দিকে মনোযোগ দিল। সভ্য-গণকেও সে দিকে উৎকর্ণ হইতে দেখা গেল।

অনীতা কহিল,—আমি তা' হ'লে চিঠি ক'খানা পড়ি, তোমরা শোনো; অবশ্য চিঠিতে যে সব নাম ঠিকানা থাকবে, তার কতক কতক নানা কারণে আমি এ বৈঠকে প্রকাশ করব না।

শক্তি কহিল,—তাই উচিত।

প্রথম চিঠির বয়ান ও বিষয় বস্তু এইরূপ:—এই হতভাগা দেশের হতভাগিনী কুমারী কন্যা ও তাহাদের অসহায় পিতাদিগকে আপনারা অর্থপিশাচ, হৃদয়হীন পুত্র-ব্যবসায়ী-দের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমিতি খুলিয়াছেন। কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিবেন কি? যদি পারেন, আপনাদের চেষ্টা যদি সফল হয়, তাহা হইলে আপনারা শত কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনের অধিক কায করিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালা দেশে বরণীয় হইবেন। আমার নাম শ্রীমতী অনুপমা মিত্র। বাবার নাম ঠিকানাও নীচে দিলাম। আমার বয়স এখন সত্যই সতেরো; কিন্তু দেখাশুনার সময় প্রার্থীদের মন বুঝিয়া তাহার হ্রাস-বৃদ্ধিও হয়। যাহারা এমন ডাগর-ডোগর মেয়ে চান—গিন্নাই সংসারের হাল ধরিতে পারে, তাহাদের বলা হয় আঠারো-উনিশ; আবার যাঁরা বয়সের দিকে একটু রক্ষণশীল, তাঁরা শোনেন বয়স আমার পনরো। বিবাহের কথা আমার একরকম পাকা হইয়াছে, যদিও বরপক্ষের দাবীর টাকা সংগ্রহের উপায় এখনও পাকা হয় নাই। ছেলেটি—কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে; বাড়ী কলিকাতার উপকণ্ঠে—বেহালায়। ছেলের বাবা রেল আফিসে চাকরী করেন, অবস্থা তাঁদের মোটামুটি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যেমন হয়। আমাকে দেখিয়া তাঁদের পছন্দ হইয়াছে; যেহেতু আমার রূপ আছে, গৃহস্থালী কায-কর্ম্ম জানা আছে। খাটিবার শক্তি ও আছে। আমাকে তাঁহাদের কুলবধূর সম্মান দিতে তাঁহারা এই সর্ত্তে সম্মত হইয়াছেন যে, আমার বাবাকে নগদ তিনটি হাজার টাকা বিবাহের আগেই গুণিয়া দিতে হইবে। তাহার একটি পয়সা কম হইলে তিনি আমাকে লইতে পারিবেন না। বিধাতা আমাদিগকে কন্যারূপে সৃষ্টি করিয়া পিতামাতার কতবড় গলগ্রহ করিয়াছেন বুঝুন। ইহার পর ছেলে আসিলেন নিজে তাঁর ভাবী-সহধর্ম্মিনীকে রীতিমত যাচাই করিয়া দেখিতে। সঙ্গে ছিলেন তিনটি বন্ধু! সে পরীক্ষার নদীটুকুও পার হইয়া

গেলাম। বাবা তখন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন, হাতে ধরিয়া নিজের অবস্থা জানাইয়া পনের টাকা কিছু কমাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বাবার মুখের উপর সেই নরাধম নিষ্ঠুরের মত কি উত্তর দিল শুনিবেন?—আমাকে আপনার 'কোর্টে' পেয়ে আপনি যে এ-ভাবে 'ডিষ্টার্ব্ব' করবেন, তা' স্বপ্নেও ভাবি নি। আপনার জানা উচিত, বাবার কথার উপর আমার কোনও কথা থাকতে পারে না।—টাকা সম্বন্ধে বাবার কথার উপর তিনি কোনো কথা কহিতে পারেন নাই, কিন্তু বাবা যে পাত্রীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছেন, নির্ব্বিচারে তাহাই মানিয়া লইতে পিতৃভক্ত পুত্রের চিত্তে কিছুমাত্র আবেগ উঠে নাই। তবুও আমার বাবা এই হৃদয়হীনের মোহে মাথা রাখিবার আস্তানাটুকু বন্ধক দিয়া দাবীর টাকা সংগ্রহ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! সত্যই কি আপনারা কোনও প্রতীকার করিতে পারিবেন?

পত্র-লেখিকার অন্তরের গভীর উচ্ছ্বাস সভার সমবেত তরুণী ও কিশোরীদের চিত্তগুলি ব্যথায় ভরাইয়া দিল। শক্তি বোসের মুখ দিয়া আবেগভরে মর্ম্মস্পর্শী স্বর বাহির হইল,—এর প্রতীকার আমাদের কর্‌তেই হবে।

দ্বিতীয় পত্রের লেখিকা হাতীবাগানের এক ভদ্র মহিলা। তিনি লিখিয়াছেন,—আপনাদের বিজ্ঞাপন যখন কাগজে দেখিলাম, তাহার পূর্ব্বেই আমার হাতের তীরটি ছুটিয়া গিয়াছে। মেয়ে পার করিবার ভাবনা আমার বছরখানেক হইল কাটিয়াছে, কিন্তু পরের ঘরে যথা-সর্ব্বস্বের সহিত নিজের মেয়েকে বিলাইয়া দিয়াও পরের ছেলেকে আপনার করিতে পারি নাই, উপরোক্ত সাধ করিয়া স্বহস্তে খাল কাটিয়া যে বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর নিষ্কৃতির কোনও উপায় না দেখিয়া আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি। কন্যা দিবার দায়ে যাহারা বিপন্ন, আপনারা তাহাদের বিপদের প্রতীকার করিবেন জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রচুর টাকার সহিত সালঙ্কারা কন্যাদান করিয়াও যাহাদের নিষ্কৃতি নাই, কল্পতরু ভাবিয়া অর্থপিশাচেরা যাহাদের উপর যখন তখন শাঁকের করাত চালাইতেছে—তাহার কোনও প্রতীকার কি আপনারা করিতে পারেন না? আমার কন্যার রূপ আছে, বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, গৃহস্থঘরের মেয়ের যে যে গুণ থাকা দরকার, তাহার কোনটির অভাব নাই। কিন্তু তবু, অভাগিনী স্বামী ও শশুর-শাশুড়ীর স্নেহ সহানুভূতি কিছুমাত্র পায় নাই। স্বামীর শাসনের কথা শুনিলে আপনারাও হয়ত অবাক্ হইবেন। সমবয়সী ভায়ের সঙ্গেও তাহার বাক্যালাপ নিষেধ। মাসতুতো পিসতুতো মামাতো ভাই-ভগিনী-দের মধ্যে কথাবার্ত্তা দোষণীয়, এমন কথা আপনারা কখনও শুনিয়াছেন কি? কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট, মামাতো ভায়ের সহিত আমার মেয়েকে কথা কহিতে দেখিয়া জামাতবাবাজী এমন খাপ্পা হইয়া উঠেন যে, সেই হইতে তাঁহার ফিটের সূত্রপাত হয়। এ রোগের দাওয়াই আপনারা বাতলাইতে পারেন? আমার বেয়ান কিন্তু ছেলের রোগ সারাইবার ও সমস্ত ক্ষতিপূরণের ভার আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। বেই আমার ঠুঁটো জগন্নাথ, টাকা উপায় করেন ও বেহানের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। বেয়ান আমার একধারে সব; বিচার, শাসন এবং ব্যবস্থা তিনটি 'পাওয়ার'ই নিজের হাতে ধরিয়া তাঁর সংসার-সাম্রাজ্য চালনা করেন। আপনারা ভাবেন, পুরুষের চোখে চামড়া নাই, যতকিছু অত্যাচার তাঁহারাই করেন; কিন্তু ইহা ভুল। তারা উপলক্ষ মাত্র। ছেলের বাবা শুধু মেয়ের বাবাকেই আঘাত দেয়, ছুরি চালায়; কিন্তু ছেলের মা একঘায়ে বাপ-মা দু'জনকেই জবাই করে। যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, আমি নীচে ঠিকানা দিলাম, একবার আপনাদের কেহ আমার বেয়ানের সঙ্গে দেখা করুন, কথা পাড়ুন। তাহা হইলেই বুঝিবেন তিনি কি চীজ এবং মেয়ে পার করিয়া আমরা কত সুখী।

চিঠি শেষ হইতেই ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী নবতারা ভাদুড়ী মন্তব্য প্রকাশ করিল,—দি ওয়েভ অব দি মুভ্‌মেণ্টস্ মুভিং ডিফারেণ্ট পার্টস।'

শক্তি বোস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—'বাট দি সারকামটেন্সেস ক্রিয়েটিং এ স্পেশ্যাল পাথ্ ফর্ আস্।'

তৃতীয় পত্রের লেখিকা দশ বৎসরের এক বালিকা। সরোজনলিনী-বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে লিখিয়াছে—

আমার দাদুর নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তিনি দায়রার হাকিম, অনেককে জেলে পাঠাইয়াছেন, কত লোকের ফাঁসী দিয়াছেন। কিন্তু আপনারা শুনিয়া অবাক হইবেন, পেনসন লইয়াও দাদুর ফাঁসী দিবার হাত-শুড়শুড়ুনি এখনো থামে নাই, তাই তিনি আমার মতই একটি মেয়ের গলায় ফাঁসী পরাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ এই সহরেরই এক গরীব গৃহস্থের ষোল বছরের মেয়েকে এই বয়সে দাদু বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়াছেন। দাদুর বয়স এখন আশী, তাঁর সাত ছেলে, এগারোটী মেয়ে, একুশটি নাতি-নাতনী এবং নাতীদের ছেলে মেয়ের সংখ্যা বারো। দু' পক্ষের ঠিকানা দিলাম। বিয়ের কথা-বার্ত্তা পাকা; এখন যাহা কিছু করিবার আপনারা করুন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বৈঠকে স্থির হইয়া গেল,—তিনখানি পত্রের বর্ণিত তিনটি বিভিন্ন 'কেস'ই নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠানের বিচার্য্য বিষয়গুলির অন্তর্গত হইল।—

এই তিনটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়া নারীপ্রগতি-বাহিনী কতটা কৃতকার্য্য হইল, তাহা জানিবার জন্য গল্প-লহরীর পাঠক-পাঠিকাদের সহিত আমাদেরও সমান আগ্রহ রহিল। ভবিষ্যতে খবর সংগ্রহ হইলেই পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
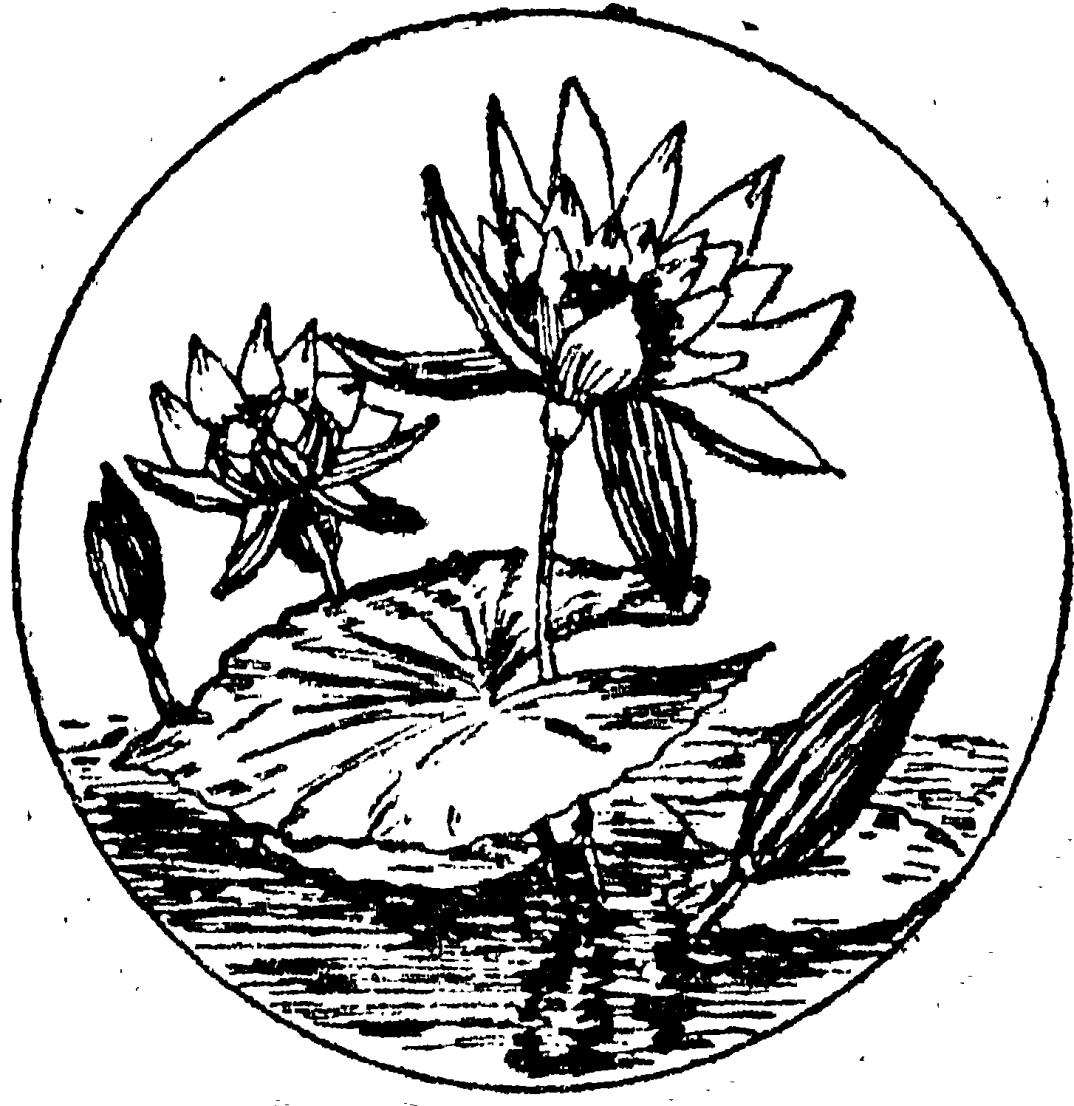
দমকা হাওয়া

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

এক

বিবাহ-সম্বন্ধে আমার মতভেদ ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, ছেলে একটু 'লায়েক' হইলেই, অথবা মা সরস্বতীর কোঠার দু'-একটী সিঁড়ি পাড়ি দিতে পারিলেই বাড়ীর অভিভাবকেরা তাহার বিবাহের জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়েন। মেয়েরা এ লইয়া তাহাকে পীড়াপীড়ি, মান-অভিমান করেন। অনেকেই ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ইহাতে রাজী হন। ফলে, অনেক সংসারে আয়ের পথ না থাকায় অভাব-অনটন আসিয়া পড়ায় মা-ষষ্ঠীর কৃপার দান, সংসারের আনন্দ 'নন্দদুলাল'রা আহারের দুগ্ধ, রোগের পথ্য অভাবে জীর্ণশীর্ণ হইয়া অকালে ইহলীলা সংবরণ করে। গোটা সংসার রুদ্রের তাণ্ডব লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হয়! বাংলার অধিকাংশ সংসারই এই—এমনি অশান্তিময়!

কথাটা অহরহঃ মনের মধ্যে পীড়া দিত বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সাবলম্বী না হইয়া কোনমতেই ওপথে পা দিব না। কিন্তু স্নেহময়ী বৌদিদিকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতাম না। অতি ছোটবেলায় মা মারা যান, সেই অবধি তিনি আমাকে মায়ের স্নেহ-যত্ন দিয়া মানুষ করিয়াছেন। তাঁহাকে মায়ের অধিক মনে করি। তাই বলিয়া তাঁহার এই অন্যায় অনুরোধটী যে ঘাড় পাতিয়া লইব, এমন প্রবৃত্তিও আমার ছিল না।

সেদিন এই লইয়া বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। বৌদিদির দূরসম্পর্কীয়া একটি বোন্ আছে। বৌদি'র ইচ্ছা আমিই তাহাকে বিবাহ করি। বাবার তাহাতে খুবই সম্মতি। বৌদি' বলেন, সে না কি খুবই সুন্দরী ও শিক্ষিতা—একবারে রাজ-যোটক! ইহাকে বিবাহ করিলে আমি সুখী হইতে পারিব—তাহার সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত তিনি অগ্রিম দিতে পারেন।

আমি নানাপ্রকার যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করিতেই তিনি রাগের সহিত বলিলেন, তোমার ইচ্ছেটাই কি বলো না বাপু?

আমি হাসিলাম। বলিলাম, রাগ ক'রো না বৌদি',—উপার্জ্জনের পথ না ক'রে বিয়ে আমি করবো না।

বৌদি' আর একটু চটিলেন; কহিলেন, তোমার অভাব কিসের শুনি?

তা' নয় বৌদি, নিজের উপার্জ্জনের সুখ বেশী।

তাই না কি! আমার মনে হয়, এ কথাই সব নয়!

মানে?

বৌদি' একটু থামিলেন। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তাই তোমার মনে ধরচে না। তোমাদের এখন চাই চশমা চোখে, জুতো পায়ে, ব্লাউজ পরা মেমসাহেবটী— আল্‌তাপরা ঘোম্‌টাটানা মেয়ে কি আর ভাল লাগে।

বৌদি'র রাগ-রক্ত মুখের দিকে চাহিয়া খুব খানিক হাসিলাম। পরে বলিলাম, দোষ কি বৌদি'! এরাও ত' মানুষ?

মানুষ নয়, বাপ্‌রে! সংসারে ওরা ছাড়া মানুষ আর আছে না কি?

কষ্টে হাসি থামাইয়া কহিলাম, তা' ছাড়া, আমারও ত' একটা মত বা পছন্দ আছে?

তা' নেই! থাক্ ভাই,—আমি আর বলতে চাই নে। তোমার মত নিয়ে তুমি থাকো। আমি তোমার কে যে আমার কথা শুনবে? কিন্তু বলছি বাবু, আমার আর ঝকি পোয়াবার যো নেই, ঠাকুর-বামুন ডাকো—আমার কি মাথা ব্যথা যে গুষ্টিশুদ্ধ পিণ্ডি চট্‌কাবো? থাকতেন যদি মা—বলিয়া রাগে দুঃখে অভিমানে বৌদি' ফুলিয়া ফাঁপিয়া একপশলা বৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেলেন।

দুই

বাহিরে বসিবার ছোট্ট ঘর। পাশ দিয়া পাড়াগেঁয়ে স্বল্প-পরিসর মেঠো রাস্তা আঁকিয়া-বাঁকিয়া আম্রকাননের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। পথের ওপারে গুটীকয়েক মুকুলিত আম্রবৃক্ষ, ফাল্গুনের উতল হাওয়া তাহারই গন্ধে দিশাহারা হইয়া লতাপাতা দোলাইয়া লুটোপুটী খাইতেছে। এধারে সজিনা গাছটী ফুলে ফুলে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। মণ্ডলদের বুড়া ছাগলটী তাহারই শিকড়ে বাঁধা থাকিয়া ঘাসপাতা অভাবে শুইয়া পড়িয়া গাছের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটী বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছে। পথ জনশূন্য—সারা পাড়াটা যেন মধ্যাহ্নে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল গাছের শাখে, বাড়ীর ছাদে দু'-একটা পাখী বেসুরা কলরব করিতেছে।

বি-এ পরীক্ষার বেশী দেরী নাই। মধ্যাহ্নের নিদ্রা সুখ উপেক্ষা করিয়া তাই পড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে ছিলাম। মনের মাঝে সে দিনের বৌদি'র ব্যথা-কাতর চোখ দুইটী অকারণ বারে বারে ভাসিয়া উঠিয়া এক অননুভূত বেদনার সৃষ্টি করিতেছিল। নিজের মতই বজায় রাখিব, অথবা স্নেহময়ী বৌদি'কে সন্তুষ্ট করিব এই কথা ভাবিতে গিয়া যখন দিশাহারা হইয়া পড়িয়া ছিলাম, তখন কিসের একটা শব্দে মুখ ফিরিয়া চাহিতেই দেখি—পনের ষোল বছরের একটী তরুণী—প্রকাণ্ড একটা গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগ হাতে, একেবারে ঘরের দোরে দাঁড়াইয়া! কড়া রৌদ্রে তাহার সুগৌর মুখখানি তাতিয়া তাম্রাভ হইয়া উঠিয়াছে। এবং শ্রমরক্তিম মুখ ও কপালের আশেপাশে দু'-একফোঁটা ঘাম যেন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

চাইতেই তিনি অসঙ্কোচে কহিলেন, হ্যাঁ, দেখুন, বোসেদের বাড়ী কোন্‌টা?

বোসেদের?—প্রশান্ত বোস?

হ্যাঁ! কোন ধারে বাড়ীটা বলতে পারেন কি?

হ্যাঁ। কিন্তু ……

ভুল করেছি! তা' বেশ। যাতে এখন ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে পারি তাই বলুন না? আর দাঁড়াতে পারছিনে।

ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সৌজন্য দেখাইয়া ইহাকে বিশ্রাম করিবার কথা বলা উচিত কি না ভাবিতে ছিলাম, তরুণী অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিলেন, ও. আপনি তা' হ'লে জানেন না। মিছিমিছি কেন দেরী করিয়ে দিলেন বলুন তো?…ভারি অন্যায়!

না না, এই রাস্তা দিয়ে ওই বাগানটা পেরিয়ে-মাঠের ভিতর দিয়ে সোজা পথ। কিন্তু বড্ড ঘুরে…

তরুণী চলিতে চলিতে কহিল, তা' হোক্।

হয়ত' অসুবিধে হ'বে,…অসময়…অপরিচিত…

না না, কিছুমাত্র না!

কিন্তু আপনি নারী, বিশেষতঃ—

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে আমাকে পোড়াইয়া দিয়া তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, নারী!… পুরুষই মানুষ, আর মেয়েরা কিছু নয়, না? বলিয়া আর একবার অগ্নিদৃষ্টিতে আমাকে ভস্ম করিতে চাহিয়া তিনি সোজা পথ ধরিয়া গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি অপলক-দৃষ্টিতে তাঁহার চলা পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া স্থাণুবৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিলাম। জীবনে অনেক কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছি—কিন্তু এমনটী কোথাও দেখি নাই। এ যেন এক প্রহেলিকা! প্রশান্তর সহিত আমার খুব মিশামিশি আছে। যতদূর জানি তার মহিলা বান্ধবী ত' দূরের কথা, কোন আত্মীয়ার কথাও মনে হয় না শুনিয়াছি। ঘরে বাহিরে মা ও ছেলে—এই লইয়াই যেন বিশ্ব সংসার। অথচ যখন ওই প্রশান্তর বাড়ীর পরিচয়টুকু সংগ্রহ করিয়াই তিনি মিলিটারী মেজাজে চলিয়া গেলেন—তখন প্রশান্তর সহিত তাঁহার যে বিশেষ হৃদ্যতা আছে, সে বিষয়েও আমার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ব্যাপারটী কিছুই নয়, এবং ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবারও আমার কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তাহার আকস্মিক প্রবেশ ও সদম্ভে মিলিটারী গতিতে প্রস্থান, সমস্ত অন্তরখানিকে বিপুলবেগে দোলাইয়া দিয়া গেল।…

এমনটী আর কোনদিন চোখে পড়ে নাই। তাই, যতই সমস্ত ঘটনাটী তোলপাড় করিতেছিলাম—ততই যেন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলাম।...তাঁহার সদর্প উত্তরের মাঝে লক্ষ্য করি নাই, তিনি সুন্দরী কিংবা কুৎসিত। এইবার সেই কথাটা চকিতে মনে পড়িতে সমস্ত অন্তরখানি ভুলের গভীর ব্যথায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। যদি আর একবার...

তিন

কিন্তু সেই হইল কাল। ভুলিব বলিয়া যতই চিত্ত স্থির করিতে যাই, মনের পাতায় পাতায় সেই রৌদ্রদগ্ধ শ্রমক্লান্ত মুখখানি আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে। চিন্তার মাঝে কোন্ এক অলক্ষ্য দেবতা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর মধু বর্ষণ করিয়া দেন, আমি তন্ময় হইয়া যাই! পরীক্ষা পাশের পড়াটা তাই নিরর্থক পণ্ডশ্রম হইয়া পড়িল। ঘরের কেদারাখানা বাহিরে আসিয়া পড়িল। মুখের সাম্‌নে বই ধরিয়া সমস্ত দিনটা আমার সারা দেহ মন উন্মুখ হইয়া এই পথের পানে চাহিয়া রহিল...যদি সে আসে!

...বারান্দায় আরাম কেদারায় বুকের উপর বইখানি রাখিয়া এমনি সেদিনও পড়িয়াছিলাম। মন যে কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছিল, তাহা কেবল মনই জানে! অকস্মাৎ বিপুল পুলকে কাণে বাজিল, নমস্কার!

চমকিয়া চাহিয়া দেখি গত দিবসের তরুণী, সেই গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ ব্যাগ হাতে—তেমনি চলার পথে দাঁড়াইয়া।

মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্যথা আনন্দোচ্ছ্বাসে গলিয়া জল হইয়া গেল—এবং এমনি অভিভূত হইয়া পড়িলাম যে, নমস্কারটা ফিরাইয়া দিবার কথাও ভুলিয়া গেলাম।

তিনি একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, একবার আমার দিকে চাহিলেন, তারপর 'নমস্কার' বলিয়া তাঁহার হাত-ব্যাগখানি কপালে ঠেকাইয়া মৃদু হাসিয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তে আমার জড়তা দূর হইয়া গেল। আগাইয়া গিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিলাম—এদিকে?

ষ্টেশনে চলেছি। প্রশান্তবাবুদের দেখ্‌তে এসেছিলাম। এখন বাড়ী যাচ্ছি। ছ'টায় ট্রেণ বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু দীর্ঘ পথ—একটা কুলি?

কুলি কেন? এই তো বেশ যাচ্ছি!

কষ্ট হ'বে, যদি অনুমতি দেন, তবে আমি...

আমার মুখের কথা শেষ হইল না। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহিনীর মত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। চোখে তাঁহার সেই দীপ্ত বিদ্যুতের তেজ—মুখ তাঁহার কঠোর নির্ম্মম! আমি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম!

তিনি পুনরায় চলিতে লাগিলেন।

বাধা দিয়া মরিয়া হইয়া বলিলাম, না হয় চলুন, একটু এগিয়ে দিয়েই আসি।

তিনি নিরতিশয় বিরক্তির সহিত তীব্র কঠোর-কণ্ঠে বলিলেন, মশায়, ভদ্রতাটাও কি শেখেন নি? ছি! বলিয়াই হন্‌হন্ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তাঁহার এই সুস্পষ্ট তীব্র উক্তি আমার মনের উপর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ বহাইয়া দিল। প্রবল উত্তেজনায় স্নায়ুসমূহ মুহূর্ত্তে অবশ হইয়া আসিল। কয়েক মিনিট বিস্মিত, স্তব্ধ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, পর-ক্ষণেই অন্তর-বাহিরে তেমনি একটি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিলাম এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া শুধু কি এক উন্মাদনার বশেই তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

চার

যখন ষ্টেশনে পৌছিলাম, তখন ট্রেণ আসিতে কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। কিন্তু ষ্টেশনের জন-সমুদ্রে তরুণীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। ক্ষুণ্ণ হইলাম। ভ্রম হইতে পারে ভাবিয়া গোটা প্ল্যাট্‌ফরমটা এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত বার তিনেক পাড়ি দিলাম। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল না। হতাশ ও ক্লান্তির অবসাদে মন ভরিয়া উঠিল।

অনতিকাল পরে সমস্ত ষ্টেশনকে কাঁপাইয়া দিয়া ট্রেণ আসিয়া থামিল। বিপুল জন-সমুদ্র প্রবল বন্যার উচ্ছ্বাসের মত ছুটিয়া চলিল। ইহারই আকর্ষণে একবারে একটা ট্রেণের কামরার দরজার নিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই দেখি, ঠিক পাশের গাড়ীর

হাতল ধরিয়া তিনি উঠিতেছেন। বুকের রক্ত দ্রুত নাচিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে ব্যর্থতার বিপুল অবসাদ সার্থকতার বিজয় আনন্দে হাসিয়া উঠিল। চকিতে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। যাহাতে তাঁহার লক্ষ্য পথে না পড়ি, রুদ্ধ নিশ্বাসে কামরাটায় ঢুকিয়া পড়িলাম।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কোন অনির্দ্দিষ্টার সন্ধানে কোথায় ছুটিয়াছি কে জানে; অসীম উৎসাহ তাই চিন্তার বিপরীত টানে মাঝে মাঝে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল।

চলিয়াছি ত' চলিয়াছি-ই। হঠাৎ নীলমণিগঞ্জে গাড়ী আসিতেই চমকিয়া চাহিয়া দেখি—তরুণী নামিয়া গেট পার হইয়া দ্রুত চলিয়াছেন। লাফ দিয়া নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু গেট পার হইতে গিয়া বাধা পাইলাম, টিকিট? মনের অবস্থা তখন চিন্তা করিবার মত নয়। পকেট হইতে গোটা কয়েক টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতেই স্মিতহাস্যে সে অভিবাদন করিল। গরীব বেচারা! বোধ হয় এমন ধারা কোনদিন ভাগ্যে জোটে নাই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া উন্মুক্ত গেট পার হইয়া সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তরুণীর চলা-পথ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অনুসরণ করিলাম।

তরুণী দেখিতে পান নাই। কিন্তু এমনি অনুসরণ ভদ্রতা সঙ্গত কি না তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে পারিলাম না। মনের উন্মত্ত অবস্থা তখন ন্যায়-অন্যায় চিন্তার বাহিরে। গ্রাম অপরিচিত—কৈফিয়ৎ দিবার মত আমার কিছুই নাই। কাহারও সহিত পরিচিতও নহি—কোথায় চলিয়াছি তাহাও জানি না। দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে তাই একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা আমাকে বারবার নাড়া দিতে লাগিল।

তরুণীর গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। আমি তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া দূরে দূরে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছটার কাছেই একটা বাঁকের মোড়ে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তিনি অদৃশ্য হইতেই, দ্রুত চলিতে গিয়া একবারে তাহার সাম্‌নে গিয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িলাম।

বিষম একটা বিপদের আশঙ্কায় তরুণী অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই আমাকে চিনিতে পারিয়া বিস্মিত ভীত রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন, আপনি!

পলকে আমার সমস্ত উৎসাহ ভাসিয়া গেল। বিপদের গভীর আশঙ্কায় পদ-নখর হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। কি কৈফিয়ৎ দিব? আমার বলিবার কি-ই বা আছে? কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। অনেক চেষ্টায় অস্ফুট স্বরে যাহা বলিলাম, তাহা তাঁহার বোধগম্য হইল কি না জানি না। শুধু তাঁহার কঠোর স্বরে চমকিয়া চাহিয়া দেখি—তাঁহার দৃঢ়মুষ্টিতে আমার একখানি হাত বদ্ধ রহিয়াছে।

তিনি বলিলেন, গুণ্ডামী করা দেখাচ্ছি! ভদ্রলোকের ছেলে ইতরোমীতে ত' বেশ পেকে উঠেছেন? পিছু নিয়েছিলেন কেন?

মাথা নুইয়া পড়িল। মিনতির সহিত কহিলাম, আমায় বিশ্বাস করুন, কোন কু-মতলব আমার নেই।

নেই ত সেই পলাশপুর থেকে এখান অবধি ধাওয়া করেছন কেন বলুন তো?

অন্যায়—বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। আমি ত্রুটী স্বীকার কর্‌ছি।

বাঃ! বেশ মজা! মেয়েদের পেছনে পেছনে তেড়ে আসা—আর ধরা পড়ে ত্রুটী স্বীকার। মন্দ নয়। ভাল, তাই কর্‌বেন—নিকটেই থানা, ত্রুটী, মার্জ্জনা যত কিছু সব ওখানে…বলিয়া তিনি সজোরে আমাকে টানিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে বাধা দিয়া ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলিলাম, একটা কথা…

তরুণী থামিলেন,—বলুন!

কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ করিলাম, তারপর কহিলাম, আপনাকে মিথ্যে বোঝাবার দুষ্প্রবৃত্তি আমার নেই। আপনি বিশ্বাস না করুন, আমি সত্যই বল্‌ব। কতবড় অন্যায় আমি করেছি তা' মর্ম্মে মর্ম্মে এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু ভগবান জানেন, এর মধ্যে আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। শুধুএকবার আপনাকে দেখ্‌বার, আপনার পরিচয় নেবার কৌতূহলই আমাকে এই এতদূর টেনে

এনেছে। আপনার অনাড়ম্বর সহজ-সরল ব্যবহার—আপনার দীপ্ত সদম্ভ উক্তি, আমাকে মুগ্ধ করেছিল।—দোষ আমি করেছি সত্য, কিন্তু এর বেশী কোন উদ্দেশ্যও আমার ছিল না।

একটু থামিলাম। তাঁহার মুষ্টি মধ্যে আমার হাতটা তখনও আবদ্ধ। একমুহূর্ত্ত তাঁহারই দিকে চাহিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস অতিকষ্টে চাপিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, আপনাকে যা' বল্‌বার বলেছি, আর আমার দুঃখ নেই; অপরাধের শাস্তি নিতে আমি প্রস্তুত। চলুন, কোথায় যেতে হবে···

তিনি কি ভাবিলেন, জানি না। ধীরে ধীরে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,···আচ্ছা যান্, কিন্তু মনে থাকে যেন।

চলিয়া যাওয়াই হয় ত আমার উচিত ছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কিন্তু আপনার পরিচয়?

কেন? এবার যেন তাঁহার কণ্ঠস্বরে উগ্রতা কিছু কম। আপনাকে ত' সব বলেছি।

ও, শিক্ষা তা' হ'লে আপনার এখনও যথেষ্ট হয় নি। তাঁহার ঠোঁটের কোণ বহিয়া বিদ্রূপের ক্রূরহাসি যেন ফুটিয়া উঠিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। একবার তিনি আমার দিকে তীব্রভাবে চাহিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার হাতব্যাগের ভিতর হইতে একখানি সুদৃশ্য কার্ড বাহির করিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, যান্, ফিরে যান্। আর এক পা যদি আসেন—তা' হ'লে আপনার লাঞ্ছনার শেষ থাক্‌বে না···বলিয়াই কিন্তু তিনি নিজেই সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে ওধারের কতকগুলি কাঁঠাল গাছের অন্তরালে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পাঁচ

নীরবে কয়েকমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম। মন ভারাক্রান্ত, উদাস। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাপিয়া যেন কি একটা গভীর অবসাদ চাপিয়া বসিয়াছে। চলিতে গিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস সেই অপরিচিতা তরুণীর চলা-পথের উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল। শুধু হাতের সেই ক্ষুদ্র কাগজটকু অদম্য কৌতূহলে আমার এই ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহখানিকে ষ্টেশনের মুখে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আলোর ধারে কাগজখানি মেলিয়া ধরিতেই আমার অন্তর বাহিরে পুলকের বান ডাকিয়া গেল। আমার পরিশ্রমের অবসাদ, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অশেষ লাঞ্ছনা, সবই যেন পাওয়ার গভীর আনন্দের পুলক-পরশে মন্ত্রমুগ্ধের মত কোথায় মিলাইয়া গেল।

'কুমারী প্রতিমা রায়, কলিকাতা বেথুন কলেজ!' ক্ষুদ্র কাগজটুকু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কতবার পড়িলাম। কতবার কতভাবে তাঁহাকে মনের মত করিয়া ভাবিলাম। কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। তৃষ্ণা যেন বাড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র কাগজখানি হৃদয়ের জলন্ত অগ্নিকে নিভাইতে ত পারিলই না, বরং আরও উস্কাইয়া দিল।

সমস্ত রাত্রির অনিদ্রা লইয়া যখন ভোরে বাড়ী ফিরিলাম, তখন বৌদি'র অনুযোগের আর সীমা রহিল না। কিন্তু তাঁহার সহস্র অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার মত অবস্থা বা সাধ্য আমার ছিল না। তাই নিরুত্তরে আমার পড়ার ঘরখানি আশ্রয় করিলাম।

ক্ষণিকের তুচ্ছ একটা ঘটনা সময়ে মনকে এমনি অভিভূত—সমস্ত চিন্তাশক্তিকে এমনি কেন্দ্রীভূত করিয়া ফেলিতে পারে, হয়ত তাহা পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না; কিন্তু নিজের জীবনের ঘটনা লইয়া জগতের কিছুই যে তুচ্ছ, অসম্ভব নয়—এই সত্যটাই আজ নূতন করিয়া মনপ্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিলাম। আমার সমস্ত দিনের কাজকর্ম্ম জুড়িয়া এই অপরিচিতা কোথাকার কোন্ প্রতিমা রায় এমনি একটা চিন্তাপ্রবাহের সৃষ্টি করিল যে, আশু বি-এ পরীক্ষার পড়াটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলাম; এবং জানালার ধারে বসিয়া আকুল-আগ্রহে কাহার প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন ঐ পথের দিকে চাহিয়া কাটাইয়া দিতে লাগিলাম।

ছয়

সেদিন সকালে বাড়ীতে যেন কি একটা বিশেষ উৎসবের আভাষ পাইলাম। সংসারের কোথায় কি

ঘটিতেছে ইহা ভাবিবার বা দেখিবার সময় আমার ছিল না। কি একটা কাজে বৌদি' ঘরে ঢুকিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি বৌদি' ?

বৌদি' হাসির লহর তুলিয়া আমাকে অপ্রতিভ করিয়া দিয়া বলিলেন, এই হয়েছে! বলে 'যার বিয়ে, তা'র মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!' এও দেখ্‌ছি তাই। বিয়ে—ও গো, তোমার বিয়ে!

বিয়ে! সাপ দেখিয়া মানুষ যেমন ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে, এই একটী কথায় আমিও তেমনি হইয়া পড়িলাম। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলাম, কিন্তু তোমার ত' কিছুই অগোচর নেই বৌদি'! বি-এ......

বাধা দিয়া বৌদি' বলিলেন, তা' আমি কি কর্‌বো? কি জানি কি হয়েছে, কি করেছ, বাবা ত জেদ ধরে বসেছেন, আর একটুও দেরী নয়! বিয়ে তিনি দেবেনই!

শিহরিয়া উঠিলাম। তবে কি আমার এ দুর্ব্বলতার কথা তিনি জানিতে পারিয়াছেন! এ বিবাহ কি শুধু বিপথগামী পুত্রকে বশে আনিবার অস্ত্র বিশেষ! লজ্জায় কুণ্ঠায় কেমন হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া ভয়ে ভয়ে বলিলাম, যদি না করি?

স্পষ্ট উত্তর—ত্যাজ্যপুত্র!

'গুম্' হইয়া বসিয়া রহিলাম। বাবাকে জানিতাম। তিনি সহজে কোন কথা বলেন না, কিন্তু বলিলে তাহা কোনমতেই খণ্ডন হইবার নহে। তবুও শেষ চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, তা' হ'লে তুমিই কি সুখী হ'তে পার্‌বে বৌদি' ?

তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, আমি যে ভাই পরাধীন!

বাবা ত তোমার কথা ঠেলেন না বৌদি'! তুমি চেষ্টা কর্‌লেই হয়।

বৌদি' কি ভাবিলেন। তাহার পর ধীরভাবে বলিলেন, কিন্তু তোমার আপত্তিটাই বা কি ঠাকুরপো, লোকে বিয়ে কি করে না? না, বিয়ে করে কেউ বি-এ পরীক্ষা দেয় না?

কাতর চোখ দুইটী বৌদি'র মুখের উপর রাখিয়া বলিলাম, কিন্তু আমারও ত' একটা মত আছে?

নিশ্চয়ই! কিন্তু সঙ্গত হওয়া চাই।

আমিও তা' জানি বৌদি'! কিন্তু যদি অসঙ্গত না হয়?

অবশ্য আমরা শুন্‌বো।

শুন্‌বে?

নিশ্চয়ই!

বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতহস্তে বৌদি'র হাতে কাগজখানি দিয়া ব্যাকুল আগ্রহে উন্মুখ হইয়া অপলক-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

পলকে তাঁহার মুখ বিদ্রূপের হাসিতে ভরিয়া গেল। কাগজখানি আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া নিষ্ঠুরভাবে তিনি বলিলেন, মাপ করো ভাই! ওসব প্রেম-ট্রেমের কথা বাবাকে বল্‌বার দুঃসাহস আমার নেই। তোমার ব্যথা তুমিই বলো। ও মা, অবাক-কাণ্ড! তাই ত ভেবে পাই নে—ঠাকুরপো আমার কড়িকাঠ গোনেন কেন? ভেবেছিলেম, বুঝি কাব্যি-রোগে ধরেছে! ও মা, এখন দেখছি, একেবারে রোগের রাজা—পেরেম......বলিয়া আর একবার নিষ্ঠুর হাসিতে আমাকে দাবাইয়া দিয়া তিনি দ্রুত চলিয়া গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমার তাসের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমার আশা আনন্দ এক ফুৎকারে আকাশে মিলাইয়া গেল। অকস্মাৎ সমস্ত বুক তোলপাড় করিয়া পরলোকগতা মার কথা মনে পড়িল এবং তাঁহার বিস্মৃতির স্মৃতিটুকু বিপুল স্নেহধারায় আমার অন্তর সিক্ত করিয়া দুই চোখ বাহিয়া অঝোরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সাত

অবাধ্য বালক যেমন আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া অবশেষে পিতামাতার কঠোর শাসনে নিরুপায় হইয়াই তিক্ত কুইনাইন গলধঃকরণ করে, আমিও তাহাই করিলাম। আমার চিন্তার মানসী প্রতিমা, কল্পনার কল্প-সুন্দরী, আমার জীবনের সুখ,—প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া মাঘের এক চন্দ্র-করোজ্জ্বল রজনীতে বিপুল বাদ্যভাণ্ড ও জাঁকজমকের সহিত অবশেষে বৌদি'র বোন্‌কেই জীবন-সঙ্গিনী করিতে চলিলাম।

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিন্তু কোনমতেই সুখী হইতে পারিলাম না। সমস্ত অন্তর জুড়িয়া না পাওয়ার একটা তীব্র ব্যথা নিরন্তর আমাকে অসুখী করিয়া তুলিল। বিবাহ বাড়ীর আনন্দ-উৎসব, হাস্য-পরিহাস একটা বিদ্রূপের মত অহরহ আমাকে গভীর যন্ত্রণায় বিঁধিতে লাগিল।

নির্দ্ধারিত সময়ে বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। শুভ-দৃষ্টির সময় ইচ্ছা করিয়াই মুখ নামাইয়া রাখিলাম।

রাত্রি গভীর হইতে চলিয়াছে। অন্তরের এই মর্ম্মন্তুদ বেদনা লইয়া মাথায় যন্ত্রণা হওয়ার অজুহাতে বাগানের একটা নির্জ্জন স্থানে চুপ করিয়া পড়িয়াছিলাম। কাহার স্নেহ-পরশে চাহিয়া দেখি, বৌদি'।

পরম যত্নে আমার মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি আমার ব্যথা-কাতর মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া যেন গভীর ব্যথায় বলিলেন, দোষ আমি যতই করে থাকি না কেন, পরে তুমি যে শাস্তি দেবে তাই মাথা পেতে নেব। কিন্তু আত্মীয়-পরিজনের কাছে আজ আমাকে অপমান করো না ভাই!......চলো—তাঁরা বসে আছেন।

ধীরে ধীরে বৌদি'র পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া স্থির কণ্ঠে কহিলাম, অপমান ত' দূরের কথা বৌদি', তোমাকে অসম্মান করার সাধ্যও আমার নেই। কষ্ট আমার যাই হোক্, জীবন দিয়ে তোমার দেওয়া দান আমি বহন করবো। তুমি শুধু এই আশীর্ব্বাদ করো যেন কোন অবস্থাতেই তোমাকে না ভুলি!

নীরবে তাহার অনুগামী হইলাম। শয্যায় আসিয়া ঘোমটাপরিবৃতা নববধূর পাশে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া বসিলাম। আমার অসুখের কথা শুনিয়া পাড়ার মেয়েরা নিরুৎসাহে একে একে চলিয়া গেলেন।

বৌদি' নব-পরিণীতা বধূর বাঁ হাতখানি আমার হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, বেণু, ভাই, নে তোর জিনিষ বুঝে নে। আজ থেকে আমি খালাস।...বলি ও ঠাকুরপো, চোখটা ছাই খোলই না। প্রতিমার ত' বিসর্জ্জন দিয়েছ-ই, তাই ব'লে বীণার আবাহনের দু'টো গান শুনতেও কি আপত্তি?

বৌদি'র ঠাট্টায় না হাসিয়া পারিলাম না। মুখ তুলিয়া চাহিতেই অকস্মাৎ বধূর উন্মুক্ত মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, বৌদি' বাঃ, এ কি!

বৌদি' হাসিয়া বলিলেন, বীণা!

বীণা! না প্রতিমা? কিন্তু এ সব তোমারই কারসাজি বৌদি'। নিজের বোন্‌কে দিয়ে এমন করে হায়রান করা, এ আর যেই ক্ষমা করুক, আমি কিন্তু তা' পারবো না।

তা' বই কি! ক্ষ্যাপা কুকুরের মত মেয়েছেলেদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে—আর আমি জুটিয়ে দিয়েছি কি না, তাই! আয় রে বীণা, ও ওর প্রতিমার ভাবনাই ভাবুক্—তুই মিছে কেন ওখানে ব'সে থাকিস? বলিয়া সমস্ত ঘরখানি অমল হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া বীণাকে টানিতে গিয়া বৌদি' নিজেই ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নিরালা ঘরে বীণা আর আমি। পরিপূর্ণ আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে বীণার ডানহাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইতেই দেহমনে এক অননুভূত শিহরণ বহিয়া গেল। মৃদুস্বরে ডাকিলাম, বীণা...

বীণা কথা কহিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে নত হইতেই তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া জোর করিয়া মুখের কাপড় খুলিয়া দিলাম। হাসিয়া কহিলাম, কই গো, থানা-পুলিশ ডাকবে না?

অদম্য হাসির প্রবল উচ্ছ্বাস চাপিতে গিয়া সে আরও বুকের কাছে মিশিয়া গেল,—একটা ফুটন্তপদ্ম যেন আমার যৌবন-নিকুঞ্জে তাহার শতদলের দিগন্তপ্লাবী সুগন্ধ বিলাইয়া দিল।

বাইরে তখনও নহবতের মিঠাসুর অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিতেছে। খোলা জানালা দিয়া ফোটা ফুলের সুগন্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ার সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে। অমল-ধবল জ্যোৎস্নার একটা রেখা স্বর্গগতা মা'র প্রশান্ত স্নেহাশীর্ব্বাদের মতই বীণার গায়ে মাথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

ক্ষণিকা

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

'সিনেমা' দেখা একটা বাতিক ছিল তার।

সপ্তাহে অন্ততঃপক্ষে দুটো দিন—শনিবারের রাত্রি আর রবিবারের সন্ধ্যা—এতো বাঁধা আছেই; তা' ছাড়া, এর মধ্যে আবার বাড়তি ছুটিছাটাগুলোও বাদ পড়ে না কখনো।

ওদিকে মাইনে তো মোটে পঁয়ত্রিশ,—তা' থেকে পাঁচ দশ টাকার বেশীই বেরিয়ে যায় এই খেয়ালের ঝোঁকে। কিন্তু এই বাজে খরচের জন্যে লোকটাকে দোষ দেওয়াও যায় না। বেচারা অমলের নিঃসঙ্গ, নীরস জীবনযাত্রার ওই-টুকুই যে ছিল বৈচিত্র্য আর আনন্দ।

ব্যাঙ্কের কেরানী, হাড়ভাঙা খাটুনী, 'রিডাক্‌সনে'র ফাঁড়াটা কোনোমতে কাটিয়ে এই পঁয়ত্রিশটী টাকা বজায় রাখতে খাটুনী তার বেড়ে গিয়েছে আরো। অফিস হতে ফিরতেই বেলা প্রায় কাবার, উপরন্তু সময় সময় 'এক্সট্রা' কাজ পড়লে খাতাপত্র বাড়ীতেও আনতে হয় এবং রাত জেগে—এম্‌নি জেগেই আস্‌ছে।

এ রকম 'রুটিনে'-বাঁধা একঘেয়ে দিনগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে একটুকু পরিবর্ত্তন যদি না আসে, তা' হ'লে জীবনটা নেহাৎ মরুভূমি হ'য়ে যায় যে!—কাজেই ..

এই চিত্রগৃহের প্রবল আকর্ষণ কাটানো অনেকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ক্ষণিকের হ'লেও সেই সব ছায়া-জগতের প্রাণীগুলির কল্পিত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না অলকের বিমুগ্ধ মনকে উধাও ক'রে নিয়ে যায় সে কোন্ অদেখা কল্পলোকে, কোন্ অজানা ভাবের রাজ্যে, সেথাকার নায়ক হয় সে নিজে, পাশে থাকে তার প্রেম-বিহ্বলা তরুণী, যার আদর-সোহাগ, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন ওর পিয়াসী, উপবাসী চিত্তকে কখনো কাঁদায়, কখনো হাসায়, পুলক-বেদনার বিচিত্র অনুভূতিতে।

ছবিঘরের বাইরে এসেও ছায়ার মায়া অলককে ছাড়তে চায় না। সে রাতের তন্দ্রার আবেশ ওর মধুর বিহ্বল হ'য়ে ওঠে রঙীন্ স্বপনের মদির মোহে। জীবনে এইটুকু 'এন্‌জয়' না যদি করলে তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি?

সেদিন কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটী। 'পিক্‌চার প্যালেসে' নতুন একটা ছবিও দিয়েছে; ছবিখানা খুব ভাল না কি।

অলক বেলা থাক্‌তেই টিকিট কিনে রেখেছিল, পাছে দেরী হয়ে যায়।

'ইভ্‌নিং শো' শেষ হ'তে না হ'তে ছবিঘরে ভিড় জমতে লাগল। উপর নীচের সব 'সীট'গুলিই ভর্ত্তি হ'য়ে গেল দেখতে দেখতে। একটা আট আনার 'সীটে' ঠাসাঠাসির মধ্যে বসে' অলক,—একটু আড়ষ্টভাবে, যেহেতু বামদিকে ঠিক তার পাশের সীটেই বসে একটী অপরিচিতা তরুণী, হাতের বাহারে জাপানী পাখাখানা ঘন ঘন নাড়ছিলেন। বয়স চব্বিশ পঁচিশের মধ্যে। শ্যামল বর্ণ, পরণে একখানি ফিকে সবুজ রংয়ের সাড়ী, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মুখে চোখে একটা স্নিগ্ধ লালিত্য, বেশ লাগে দেখতে।

অলক আড়ে আড়ে চায় তার দিকে। এলাহাবাদে সে এতকাল রয়েছে, কিন্তু এ মেয়েটীকে কোনোদিন দেখে নি, তবু মনে হ'ল—এ যেন তার অচেনা নয়—

সেই জন্যই বুঝি মনটা উৎসুক হয়ে উঠেছিল অপরিচিতার সাথে একটুকু আলাপ করবার জন্য—মেয়েটীও পাখার আড়াল থেকে কেবল তার দিকেই...

এ যে তরুণ মনের ধর্ম্ম!

ইচ্ছা থাক্‌লে সুযোগের অভাব হয় না।

তরুণীর হাত থেকে পাখাখানা হঠাৎ ফস্‌কে পড়ে অলকের পায়ের গোড়ায় এবং সেটা শশব্যস্তে তুলে দিতেই অলক পায় একটী সস্মিত মধুর ধন্যবাদ!

তা'তেই এগিয়ে যায় অনেকখানি।

তরুণী মুখের কাছে পাখা নাড়তে নাড়তে বলে—উঃ, এই গরমে এত তাড়াতাড়ি এসে খামকা—

অলক একটু হেসে বলে—আমি যে আপনার চেয়েও আগে এসেছি। দেরীতে এলে কিন্তু 'সীট' পাওয়া দায় হ'ত,—দেখছেন না কি রকম ঠাসাঠাসি!

খানিক চুপ ক'রে থেকে তরুণীর মুখপানে তাকিয়ে আস্তে একটু হেসে সে আবার বলে--দেখুন,—আপনাকে যেন এর আগেও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—

—ঠিক্!—আমারও তাই—কিন্তু মনে পড়ছে না কবে কোথায় যে দেখেছি—

—এই 'সিনেমাতে'ই হয় তো। আপনিও আমার মত 'সিনেমা' দেখতে ভালবাসেন বুঝি?

চঞ্চল চটুল আঁখি দু'টী অলকের মুখের পানে তুলে তরুণী মৃদু হেসে বলে—আপনার খুব ভাল লাগে দেখতে?

—ওঃ! খু-উ-ব! ছুটীর দিন তো একটাও বাদ পড়ে না!—আপনার?

—আমার অবশ্য অতটা নয়,—সামর্থ্যে কুলোয় না আর কি? তবে যেদিন মনটা বড় খারাপ লাগে, সেদিনই বেরিয়ে পড়ি।

—বেশ করেন। বাস্তবিক, মন ভোলাবার জিনিষ এমনটী আর কিছু নেই। আপনার বাড়ীতে আর কে—

—আমি আর আমার এক মাসীমা, ব্যস্—আর কেউ নেই।

চকিতে অলকের দৃষ্টি পড়ে তরুণীর সিঁদুরহীন শুভ্র সীঁথির দিকে। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—আপনার নাম?

—মিস্ হেনা—

—বাঃ! সুন্দর নামটী তো? নামের চেয়ে নামের আগের শব্দটী আরো মিষ্টি শোনায় যেন!—আগ্রহও বেড়ে যায়—বেশী রকম। আমার নাম অলক,—আমারও কেউ নেই সংসারে, একেবারে একা।

একটু হেসে, একবার এদিক ওদিক দেখে অলক কুণ্ঠিতভাবে বলে—এই দেখুন, মিস্—

—শুধু হেনাই বলুন না।

বুকটা দুলে ওঠে অলকের। যা' বল্‌তে চায় তা' ভুলে যায় যেন। এইটুকুতেই এত...এ যে আশার অতীত!

তার বাক্যহারা মুখের পানে তাকিয়ে হেনা অকারণেই ফিক্ ক'রে একটু হাসে। জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলেন?

উত্তরে অলক কি যে বল্‌বে তা' ভেবে ঠিক করবার আগেই আলোগুলো 'হুস্' করে নিভে গেল সমস্ত অন্ধকার করে দিয়ে। পর্দ্দার ওপর নাটক, নাট্যকার ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম দেখিয়ে 'প্লে' আরম্ভ হল—রূপলেখা।

দু'জনেরই দৃষ্টি ও মন উধাও হয়ে গেল ছবির দিকে।

পল্লীবালা সুলেখা আর অরূপের সরল প্রাণ-গলানো আদর-সোহাগ, মান-অভিমানের মধুর অভিনয় ভারী সুন্দর, ভারী মিষ্টি লাগছিল।

যেখানটায় সরলা সুলেখা রাজবাড়ীর যাওয়ার আনন্দ ভুলে গিয়ে, আসন্ন প্রিয়-বিরহ সম্ভাবনায় ব্যথিতা, বিবশা হয়ে দয়িতের কাঁধে মাথা রেখে উদাস ম্লানমুখে, ছল ছল চোখে দরদভরা মোহময় সুকণ্ঠে গান করছে—

—চলে যায়,—চলে যায়,—মরীচিকা মায়া অজানা—

সেখানে অলকের বুক কাঁপিয়ে সশব্দে ঝরে পড়ে একটা গাঢ় আকুল দীর্ঘনিশ্বাস। আবার তারি প্রতিধ্বনি যেন চকিতে জেগে ওঠে তরুণী হেনার মরমের কোন্ গোপন গহন তলে। নিঃশব্দে সেটা চেপে নিয়ে সে চায় অলকের ভাব-বিহ্বল অপলক আঁখির পানে।

মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি মরীচিকার মায়াজালে আবিষ্ট, মুগ্ধ হয়ে তাদের কখন যে কেটে যায়, তা' জানতে পারে না। তারপর সহসা এক সময় আলোগুলো 'দপ্' করে জ্বলে 'ইণ্টারভ্যালে'র বড় বড় অক্ষর ক'টা চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তখন চমক্-ভাঙা হয়ে ওরা দেখে—এ কি!

অলকের বাঁ হাতটা হেনার চেয়ারের পেছনে একেবারে তার পিঠের সঙ্গে লেগে—আর হেনার 'সেণ্টে'র গন্ধে ভুর-ভুরে শাড়ীর আঁচলখানা অলকের কোলের ওপর—কেমন করে কি জানি! চুপি চুপি—

জো মরিসন্ ও টবী উইং

মেরিয়ন নিক্সন
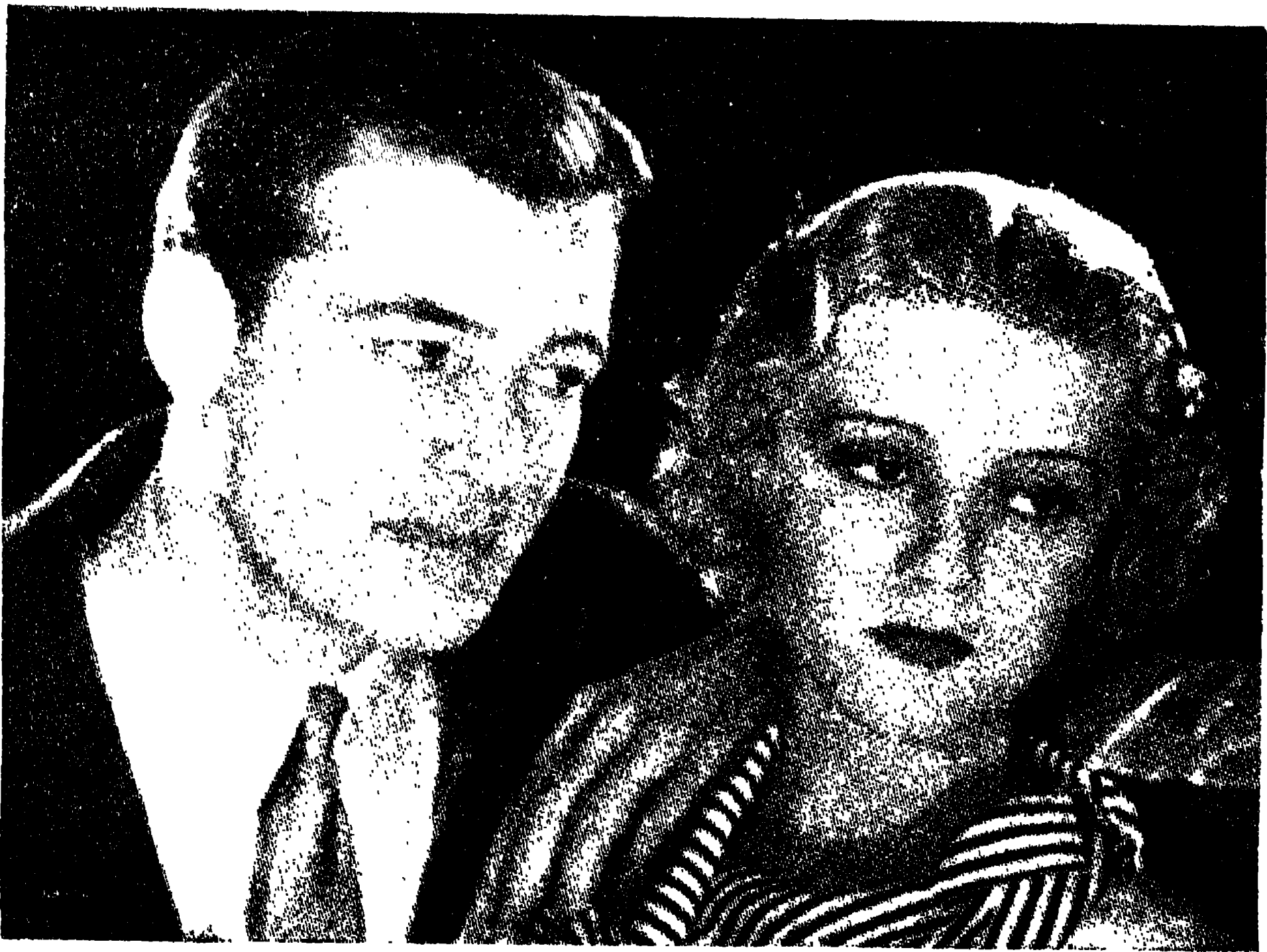
"আওয়ার বেটার্"-এর একটী দৃশ্য

—ওঃ! 'আই অ্যাম্ স্যারি'—

বলে অলক হাতখানা সরিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি। হেনাও সসঙ্কোচে আঁচল টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসে। খানিকক্ষণ দু'জনের মুখে কথা ফোটে না। তারপর এক গ্লাস 'লাইম্ জুস সোডা' হেনার হাতে দিয়ে, আর এক গ্লাস স্বয়ং পান করতে করতে অলক জিজ্ঞাসা করলে—কিছু ফল-টল কি 'আইসক্রীম'...

—না না, ধন্যবাদ! এতো খাবার সময় নয়।

গেলাসে একবার চুমুক দিয়ে, বরফের টুক্‌রোগুলো নাড়তে নাড়তে অলকের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে হেনা মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—আচ্ছা অলকবাবু—

—কি? কি বলছেন?

অলক হেনার মুখপানে তাকায় সোৎসুকে। একটু-খানি মৃদু হাসি হেসে হেনা বলে—আপনি বিয়ে করেন নি বুঝি?

—উহুঁ!

—কেন বলুন তো?

হেনার চটুল চাহনিতে, মিষ্টি কথার স্বরে, পাতলা ঠোঁট দু'খানির কোণে চাপা সেই হাসিটুকুতে কী মধুর মাদকতা! অলকের মুখের কথা আটকে যায় যেন!

আপনাকে দেখে তো মনে হয় না যে, আপনি নারী-বিদ্বেষী, তবে কোন রকমে যদি আঘাত পেয়ে থাকেন—এই, কোন মেয়ের কাছ থেকে···

—না না, সে সব কিছু নয়—

বাকী সোডাটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে অলক বলে—আমার জীবনে ওরকম ঘটনাই ঘটে নি—এ পর্য্যন্ত। সেটা আমর সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা' বলতে পারি না—

—তা' হলে···বিয়ে না করার কোন একটা হেতু—

—হ্যাঁ, হেতু আছে বই কি?—আমার যা' অবস্থা, তা'তে বিয়ে করে যে পোষায় না মিস হেনা! পঁয়ত্রিশ টাকার কেরানী, তার পক্ষে এ রকম আশা কি স্বপ্ন নয়?

কথা র সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে বেরিয়ে আসে একটা চাপা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস।

—হুঁ—এটা ভাববার কথা বটে,—কিন্তু—এমনও তো হতে পারে—

একটু থেমে কুণ্ঠা-জড়িত মৃদুকণ্ঠে হেনা আবার বলে—আমার একটী বান্ধবী—আমার সাথেই কাজ করে সে জানেন? তার কথা—

—আপনি কাজ করেন বুঝি? কি কাজ?

—এম্‌নি—টাইপিষ্টের,—কি করি বলুন? সংসারে এমন কেউ আত্মীয়জন নেই তো যার কাছে আমি—

—মাপ করবেন—আপনি কি বিবাহিত...

হেনা সসঙ্কোচে মাথা নেড়ে 'না' বলে।

—বাহ্‌বা! আশ্চর্য্য মিল দেখা যায় যে!

অলক পরম উৎসাহে জিজ্ঞাসা করে—আপনার বান্ধবীর কথা কি বলছিলেন?

—হ্যাঁ, সুমিত্রাও বিয়ে করব না করব না করেছে যাঁকে, তাঁরও আর্থিক অবস্থা ভাল নয়; কিন্তু দু'জনের উপার্জ্জনে বেশ তো চলে যাচ্ছে ওদের সংসার,—দু'টীতে সুখে আছে, খুবই সুখে—

অলকের মন নেচে ওঠে আনন্দে। আঃ! সুমিত্রার স্বামীর মত সৌভাগ্য তারও যদি...

আবার ছবি আরম্ভ। সেই অরূপ—সেই সুলেখা! কিন্তু এবার অলকের ছবির চেয়ে পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকেই লক্ষ্য ছিল বেশী। দ্রুত দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তরুণী হেনার মুখে চোখে যে হর্ষ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতি, মধুর ভাবের উচ্ছ্বাস জেগে উঠছে, সেটাই ছিল যেন অলকের পরম লোভনীয়।

বন্দিনী সুলেখা যখন প্রিয়তমকে ব্যাকুল বাহু-বন্ধনে ধরবার ব্যর্থ প্রয়াসে কারাগৃহের কঠিন লৌহ গরাদের ফাঁকে হাত বাড়িয়ে আকুলি-ব্যাকুলি করছে—শিথিল আঁচল তার অবলুণ্ঠিত। আলুলায়িত কেশ, দু'টী চোখে দরবিগলিত ধারা—

অলক দেখে, হেনা তখন রুমালে চোখ মুছছে।

—হেনা!

সহসা আত্মবিস্মৃত হয়ে হেনার কোলের ওপর রাখা হাতখানা আস্তে মুঠোর মধ্যে চেপে, তার দিকে একটুকু ঝুঁকে অন্যের অশ্রাব্য স্বরে, গাঢ়কণ্ঠে বলে—আপনার সেই বন্ধুটীর মত—আমাদের জীবনেও সম্ভব হয় না কি?—

—কেন হয় না? অবশ্য যদি, যদি আপনার কোনো বাধা—

—না,—এতে বাধা-বিপত্তির হেতু কিছু নেই। তা' হ'লে কথা রইল, কেমন? এ শুধু মুখের কথা নয় হেনা—

কাছাকাছি দর্শকদের মধ্যে অনেকেই ফিরে ফিরে চাইছে দেখে অলক হেনার হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে। কথা বলার সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। কিন্তু অলকের মন বলছিল তখন—

আমি তোমারেই যেনভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার—
জনমে জনমে, যুগে যুগে, অনিবার!—

খেলা ভাঙ্‌লে বাইরের দিকে যেতে যেতে অলক আর একবার সকলের অলক্ষ্যে হেনার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বলে—মনে থাক্‌বে তো? আজকের কথা—

—ওঃ! নিশ্চয়! বিশ্বাস হয় না বুঝি?

অলকের দিকে ফিরে ফিক্ করে হেসে নমস্কার করে হেনা। পরক্ষণেই পিছনে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সে রাত্রে অলকের শয্যাকণ্ঠকী হওয়াই উচিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য! হেনার হাসিমাখা মিষ্টি মুখখানি ধ্যান করতে করতে সে কোন্ সময় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙে বেলা সাতটায়। উঠোন রোদে ভরে গিয়েছে তখন। চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে হন্তদন্ত হয়ে উঠে বসে অলক। চকিতে মনে পড়ে যায় হেনাকে স্বপ্নের মত এলোমেলোভাবে; তারপর স্পষ্ট তার শেষ কথাটী পর্য্যন্ত যেন কাণে বাজে—'বিশ্বাস হয় না?'

কিন্তু সে কোথায় থাকে ঠিকানাটাও জিজ্ঞাসা করতে মনে হ'ল না যে! কোন্ জাতের মেয়ে সে,—হিন্দু না ক্রীশ্চান—কিছুই তো জানে না ছাই! যাকে জীবনের সাথী করবে বল্‌লে সে...কী অদ্ভুত ব্যাপার!

তাড়াতাড়ি স্নান-আহার সেরে অলক যখন অফিস ছুটল, তখন এই আশ্চর্য্য ঘটনা স্মরণ করে আপন-মনেই খুব একচোট হেসে নিলে। আচ্ছা পাগল তো! এও যেন বায়স্কোপের একটা ছবি দেখা!

শ্রীপূর্ণশশীদেবী

'লাভে ব্যাঙ্ অপচয়ে ঠ্যাঙ্'

শ্রীসাহাজী

ধনদাসের ছিল মস্ত জমিদারী, আর গরীবদাস কোরত তার মোসাহেবী। গরীবদাসেরও যে জমিজিরেৎ ছিল না; তা' নয়; কিন্তু বুদ্ধির দোষে সে সব বিক্রমপুরে দিয়ে ইদানীং সে সুরু কোরেছিল মোসাহেবী। বহুদিন তাদের ছেলেপিলে হয় নি। কিন্তু ভগবানের কৃপায় হোল যখন, তখন দু'জনেরই ছেলে হোল, আর ভূমিষ্ঠও হোল তারা একই দিন। এজন্য বন্ধুর ছেলেটিকে ধনদাস একটু স্নেহের চক্ষেই দেখত।

ছেলের বয়স যখন পাঁচ বছর হোল, তখন ধনদাস দিল তার কোষ্ঠী তৈরী কোরতে। বন্ধুকে বোল্‌লে, "তোর ছেলেরও একটা তৈরী কোরিয়ে নেনা?"

সে বোল্‌লে, "গরীবের ছেলের আবার কোষ্ঠী কি হবে?"

ধনী বন্ধু হেসে বোল্‌লে, "ভয় নেই হে, খরচটা না হয় আমিই দোব।"

ফলে, দু'টী ছেলেরই কোষ্ঠী তৈরী হোয়ে এল। ধনদাস দু'খানা কোষ্ঠীই তন্নতন্ন কোরে দেখে বোল্‌লে, "ভাই, তোর ছেলের আর আমার ছেলের দু'জায়গায় বেশ মিল দেখা যায়। এই দ্যাখ,—প্রথম, ন বছরের সময়,উভয়েরই 'বর্ষফলং—লাভঃকিঞ্চিৎ চতুষ্পদম্।' দ্বিতীয়, ষোল বছরের সময়, উভয়েরই 'বর্ষফলং—রক্তপাতোঙ্গ—হানিশ্চ'।"

গরীবদাস হেসে বোল্‌লে, "কোষ্ঠী আমি মানি নে।"

ধনদাস চেঁচিয়ে উঠল, "কোষ্ঠী মানিস্ নে, 'ভাইপার', নাস্তিক, তোকে খুন কোরব আমি।" বোলেই সে ঘুসি উঠাল।

কিন্তু পরক্ষণেই হাত নামিয়ে নিয়ে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হোয়ে বোল্‌লে, "কোষ্ঠী মানিস্ নে, আহাম্মক তুই! জানিস্, বাংলার ঠিকুজিতে তুর্কী আক্রমণ লেখা ছিল। মিথ্যে হোয়েছিল তা'? পরম ভট্টারক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ লক্ষ্মণ সেন খিড়কী দিয়ে পালিয়ে গিয়ে কি বুদ্ধিমানের কাজই না কোরেছিলেন? মনোরমা 'অল্প বয়সে পীরিতি করিয়া' সহমরণে গিয়েছিল। শ্রী ও প্রিয় প্রাণহন্ত্রী হোয়েছিল। (১) বঙ্কিমবাবু মানতেন, আর, কীটস্য কীট তুই মানিস্ নে?"

গরীবদাস চুপ কোরে রইল। কিন্তু ন' বছর আর ষোল বছরের কথা দু'জনেরই মনে থেকে গেল।

ক্রমে দু'জনের ছেলেই যখন নয়ে গিয়ে পা দিলে, দেখা গেল, ধনদাসের ছেলে তখন হাতীতে চোড়ে ফূর্ত্তি কোরে বেড়িয়ে বেড়ায়, আর, গরীবদাসের ছেলে ছিপ্ হাতে বিলে ঝিলে মাছ ধোরে বেড়ায়। এদিকে হোল কি? নাতি হাতী চোড়তে ভারি ভালবাসে শুনে, তার দাদামশাই তার জন্য শাদা হাতীর এক বাচ্ছা পাঠিয়ে দিলেন, আর ঠিক সেই দিন গরীবের ছেলে মাছ ধোরতে গিয়ে ধোরে নিয়ে এল মস্ত এক কোলা ব্যাং। ধনদাস হেসে বোল্‌লে, "কোষ্ঠীর কথা না কি মিথ্যা, দেখলি তো এখন।"

গরীবদাস মনের দুঃখে চুপ কোরে রইল।

এদিকে দেখতে দেখতে ষোল বছরও এসে পোড়ল। ধনদাসের ছেলের তখন ইস্কুলে পড়াশুনা করে, আর গরীবদাসের ছেলের গাছে গাছে পাখীর ছানা পেড়ে দিন যায়। একদিন হোল কি? কলম কাটতে গিয়ে ধনদাসের ছেলের আঙুল গেল কেটে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতেই দু'দিনে তা' ভালো হয়ে গেল, আর আম পাড়তে গিয়ে গরীবদাসের ছেলের গা গেল ছোড়ে; ঠ্যাং গেল ভেঙে। সে ঠ্যাং তার আর সারল না। ধনদাস আবার একদিন হেসে বোল্‌লে, "কিহে ভায়া, দেখলে?"

গরীবদাস এবার তেলে বেগুণে জলে উঠলো—"দেখলুম বৈকি, লাভে ব্যাঙ্ আর অপচয়ে ঠ্যাঙ্।"

"কী, এতবড়ো আস্পর্দ্ধা! জ্যোতিষে অনাস্থা!"

ধনদাস গরীবদাসের কাণমলা দিয়ে নিজের জমিদারী হোতে তাকে বের কোরে দিলে এবং অনন্যকর্ম্মা হোয়ে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রচার কোরতে থাকল। ফলে, বৎসর না ঘুরতেই তার জমিদারীতে বোদ্ধা বোদ্ধা কেউ আর রইল না। 'জ্যোতিষ' আর 'আশ্চর্য্যি'তে পথ ঘাট হাট মাঠ ভোরে উঠল।

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ও "সীতারাম" দ্রষ্টব্য

শেষ চিহ্ন

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

হাবড়ার অনতিদূরে বেলুড়ের নিকট গঙ্গার ধারে আমার এক মাড়োয়ারী বন্ধুর একটা সুন্দর বাগান আছে। বাগানটী একেবারে গঙ্গার উপরে; গঙ্গায় নামবার জন্য বেশ বড় একটা ঘাট আছে। বাগানটী নিতান্ত ছোট নয়। তার মধ্যে একটী মনোরম দোতলা গৃহ আছে। আমার বন্ধু অবসর সময় এই বাগানেই যাপন করেন।

এক রবিবার অপরাহ্নে তাঁর বিশেষ আগ্রহে তাঁর সঙ্গে এই বাগান দেখতে গিয়েছিলাম।

আমরা যখন বাগানে পৌছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; সূর্য্য অস্ত গিয়েছেন।

সদর গেট দিয়ে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেই সারথী মোটর থামিয়ে ফেলল। বন্ধুবর মোটর থেকে নেমেই বললেন, "দাদা, এখানেই একবার নামতে হবে। আমার বাগানের প্রধান যা' দ্রষ্টব্য, এখানেই তা' রয়েছে।"

আমি তার কথামত মোটর থেকে নেমেই দেখলাম, ডানপাশে একটা চাঁপা গাছ। গাছটা খুব বড নয়; বোধ হয় আট দশ বছর তার বয়স হবে। সেই গাছটার চারদিক অতি উৎকৃষ্ট জয়পুরী মার্ব্বল পাথর দিয়ে বাঁধানো বেদী, আর সেই বেদীর উপর অনেকগুলি ফুল ছড়ানো রয়েছে। দেখেই বুঝতে পারলাম, সেইদিনই বেদীটিকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে—ফুলগুলি তাজা রয়েছে। আমরা যখন সেই গাছতলায় গেলাম, তখন একটা লোক সেই বেদীর উপর একটা প্রদীপ দিচ্ছিল।

আমি বন্ধুবর অর্জ্জুনমলকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা কি এই চাঁপা গাছটাকে দেবতা বলে পূজো কর?"

অর্জ্জুন বলল, "দেবতা মনে করি না, তার চেয়েও বড় বলে মনে করি। এ গাছের ইতিহাস পরে বলছি, এখন এখানে প্রণাম হই।" এই ব'লে অর্জ্জুন সেই বেদীর সম্মুখে গিয়ে নতশিরে প্রণাম করল।

আমি যদিও কিছু জানতে পারলাম না, তবুও বন্ধুকে প্রণাম করতে দেখে আমিও প্রণাম করলাম।

তারপর বন্ধুবরের বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। একটু বিশ্রাম করবার পর অর্জ্জুনমল ঐ চাঁপা গাছের ইতিহাস আমাকে বল্‌ল—

"আপনি জানেন দাদা, কোলকাতায় আমাদের কারবারের হেড অফিস। হিন্দুস্থানের নানা সহরেও আমাদের শাখা অফিস আছে। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর সহরেও আমাদের আড়ৎ আছে। সেখানে আমাদের লোহা লক্কড়ের ব্যবসা আছে। সেই ব্যবসা উপলক্ষেই বিলাসপুরের ধনী বাঙালী কন্‌ট্রাক্‌টর বাবু হরিহর বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। হরিহরবাবু আগে ওখানকার ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে কাজ করতেন। তারপর চাকরী ছেড়ে দিয়ে কন্‌ট্রাক্‌টরী আরম্ভ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই খুব পসার করেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি বিলাসপুরে প্রকাণ্ড বাড়ী করেছেন; তখন সেখানে তাঁর খুব পদ প্রসার। আমি কার্য্যোপলক্ষে যখনই বিলাসপুরে গিয়েছি, তখনই প্রায় প্রত্যহ একবার করে হরিহরবাবুর বাড়ী গিয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার এমন হৃদ্যতা হয়েছিল যে, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা আমার সুমুখে আসতেন, আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করতেন। আমি যে কয়দিন বিলাসপুরে থাকতাম, হরিহরবাবুর বাড়ী না গিয়েই পারতাম না—তাঁরা আমাকে এতই অনুগ্রহ করতেন।

"বছর দশেক আগে একবার পূজার পূর্ব্বে হরিহরবাবু আমাকে চিঠি লিখ্‌লেন যে, তিনি অনেকদিন বাঙলা দেশে আসেন নি। দেশে তাঁর বাড়ীঘরও নাই। তবুও তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা যে, একবার দেশে আসেন। তাই হরিহরবাবু আমাকে অনুরোধ করেছেন, গঙ্গার ঠিক্‌

উপরে সহরের বাইরে আমি যদি তাঁর জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করে দিই, তা' হ'লে তিনি বড়ই বাধিত হবেন। একথাও তিনি জানালেন যে, তাঁরা মাস দু'য়ের বেশী থাক্‌বেন না। ছোট বাড়ী হলেও চলবে; তাঁর পরিবার ত বড় নয়—তিনি, তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা সুরমা, আর দাসদাসী চার-পাঁচজন।

"তাঁর চিঠি পেয়ে আমি জবাব দিলাম যে, তাঁর জন্য বাড়ী ভাড়া করতে হবে না। আমার এই বাগান-বাড়ীতে তিনি যতদিন ইচ্ছা বাস করতে পারেন। যে কয়টা ঘর আছে, তা'তে তাঁর ক্ষুদ্র পরিবারের স্থানের অভাব হবে না।

"হরিহরবাবু আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে, পূজোর দিন দশেক আগে আমার এই বাগান-বাড়ীতে এলেন এবং আমার ঘর-দুয়ার ও বাগান এবং বাগানের গায়েই গঙ্গা দেখে তাঁরা খুব আনন্দিত হলেন। তাঁর মত বন্ধুকে অতিথিরূপে পেয়ে আমিও কৃতার্থ হয়ে গেলাম। আমার একখানি মোটর তাঁদের জন্যই এই বাগানে রেখে দিয়েছিলাম। তাঁরা প্রতিদিনই সহর দেখতে যেতেন। আমি সব সময় তাঁদের সঙ্গী হ'তে পারতাম না; কিন্তু থিয়েটার প্রভৃতি দেখতে যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে না নিয়ে তাঁরা যেতেন না।

"সপ্তমী পূজার দিন তাঁরা বারাকপুর অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন; আমিও তাঁদের সঙ্গী ছিলাম। ফেরবার সময় কাশীপুর নার্সারীতে নেমেছিলাম। সেই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটা ছোট চাঁপাগাছ দেখে সুরমা সেইটে কিনতে চাইল। আমি মনে করলাম, গাছটা বোধ হয় বিলাসপুরে নিয়ে যাবে, তাই কিনছে।

"গাছটা কিনে নিয়ে আমরা যখন মোটরে উঠলাম, তখন সুরমা বল্‌ল, 'কাকাবাবু, এ চাঁপা গাছটা কি করব জানেন? কাল হচ্ছে মহাষ্টমী। কাল আপনার বাগানের একপাশে আমি এই গাছটা পুঁতব। আমরা চ'লে গেলে এই গাছটা দেখে আমাদের কথা আপনার মনে হ'বে।

"হরিহরবাবু বল্‌লেন, 'ভায়া, সুরী তোমার বাগানে তার স্মৃতি-চিহ্ন রেখে যাবে।'

"আমি বল্‌লাম, 'বেশ, তাই হবে। আজই বাগানে গিয়ে কোথায় গাছ পুঁতবে, সেই স্থানটার মাটী ঠিক করে রাখ্‌তে হবে।'

"বাগানে পৌছিয়েই, যেখানে চাঁপা গাছ দেখলেন, ঐ স্থানটাই স্থির করলাম এবং মালীকে ডেকে মাটি ঠিক করে রাখতে বল্‌লাম।

"পরদিন—মহাষ্টমীর দিন সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বেলা প্রায় আটটার সময় চাঁপা গাছটী যথাস্থানে পুঁতবার জন্য সকলে সমবেত হলেম। পূর্ব্বদিনের ব্যবস্থামত আমিও আটটার আগেই কোলকাতা থেকে এসেছিলাম। সুরমার এমন একটা শুভ-অনুষ্ঠানে বাজনা না থাক্‌লে অঙ্গহানি হবে মনে করে আমি আগের রাত্রিতেই কোলকাতায় গিয়ে এক দল ব্যাগ-পাইপ বায়না করেছিলাম। তারাও আটটার পূর্ব্বেই এসে পড়ল।

"মালীরা আগের রাত্রেই মাটী ঠিক্ করে রেখেছিল, গভীর গর্ত্ত করে কাদা করেছিল। আমরা সকলে উপস্থিত হলে ব্যাগ-পাইপ বেজে উঠ্‌ল। সুরমা চাঁপাগাছটি দুই হাতে তুলে ধরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিল; আমরা সকলে জয়ধ্বনি করলাম।

"তখন সুরমা বল্‌ল, 'এখনও কাজ শেষ হয় নি। গাছ বসানো হয়েছে। এখন এই গাছটি প্রদক্ষিণ করতে হবে—কেমন কাকাবাবু?'

"আমি এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে আমরা সার বেঁধে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করলাম। সুরমা বল্‌ল, 'একবার দু'বার নয়, সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হবে।'

"ছয়বার প্রদক্ষিণ হয়ে গেল, সাতবারের পর হঠাৎ সুরমা চাঁপা গাছের উপর পড়ে গেল। 'কি হলো, কি হলো' ব'লে আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম। বাজনা থেমে গেল। সুরমার মা দৌড়ে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। সুরমা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

"তখনই ধরাধরি ক'রে তাকে বারান্দায় এনে শুইয়ে দেওয়া হলো। মোটর ছুটল কোলকাতায় ডাক্তার আন্‌তে। মেয়ের জ্ঞান সঞ্চারের জন্য আমরা যা' জানি তা' করতে লাগ্‌লাম।

"প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ক্ষণেকের জন্য সুরমার জ্ঞান-সঞ্চার হলো। সে চোখ মেলে বল্‌ল, 'মা, আমার চাঁপা গাছ।' তারপরই সব শেষ।

"অষ্টমীর দিন তার সাধের চাঁপা গাছ প্রতিষ্ঠা ক'রে মা সুরমা বিশ্বজননীর কোলে চলে গেল।

"হরিহরবাবু সেই রাত্রের গাড়ীতেই তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিলাসপুর চলে গেলেন, কিছুতেই আর থাকলেন না। যাবার সময় ব'লে গেলেন, তিনি জয়পুর থেকে উৎকৃষ্ট মার্ব্বেল পাঠিয়ে দেবেন। সেই মার্ব্বেল দিয়ে যেন সুরমার এই শেষ স্মৃতি-চিহ্ন বেদী রচনা করা হয়। আর ব'লে গেলেন, এই বেদী যেন প্রতিদিন ফুল দিয়ে সাজানো হয় এবং প্রতি সন্ধ্যায় এই চাঁপা গাছের তলায় যেন প্রদীপ দেওয়া হয়।

"আজ এই দশ বছর মহাষ্টমীর দিন হরিহরবাবু আর তাঁর স্ত্রী এখানে আসেন। হাবড়ায় গাড়ী থেকে নেমেই এখানে আসেন। সারাদিন এই চাঁপা গাছতলায় বসে থাকেন। এক মিনিটের জন্যও ওঠেন না; একবিন্দু গঙ্গাজলও মুখে দেন না; কারও সঙ্গে কথাও বলেন না। রাত্রের মেলেই বিলাসপুর চলে যান। আমি সঙ্গে-সঙ্গেই থাকি। যাবার সময় শুধু আমাকে আলিঙ্গন করে বলেন, 'ভাই অর্জ্জুন, আমার মায়ের চাঁপা গাছ!' তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় না।

"সেই থেকে আজ দশ বছর তাঁরা ঠিক মহাষ্টমীর দিন এখানে আসেন। আমি আজ দশ বছর হরিহরবাবুর আদেশ-মত সুরমার এই শেষ স্মৃতি-চিহ্ন প্রতিদিন ফুল দিয়ে সাজিয়ে আস্‌ছি, আর প্রতি সন্ধ্যায় ঘৃতের প্রদীপ দেবার ব্যবস্থা করেছি। দাদা, সুরমার এই শেষ স্মৃতি-চিহ্নকে আমি দেবতারও অধিক ভক্তি করি!" এই বলেই সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল।

শ্রীজলধর সেন

হাস্য-কৌতুক

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

শিক্ষক-মশায় ক্লাসের ছেলেদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন। তিনি বল্‌লেন—"আচ্ছা, পৃথিবীর সমস্ত ভাল লোকের রং যদি শাদা হ'ত, আর সমস্ত খারাপ লোকের রং যদি কালো হ'ত, তা' হ'লে তোমাদের কা'র কি রকম রং হ'ত?"

কতকগুলি ছাত্র বল্‌লে—শাদা। কতকগুলি স্বীকার কর্‌লে—তারা কালো হ'ত। কিন্তু একজন ছেলে এতক্ষণ চুপ করে' থেকে বল্‌লে—"স্যার, আমি তা' হ'লে ডোরা কাটা হতুম।"

*   *   *

খেলার মাঠে দর্শকেরা নিশ্বাস বন্ধ করে' আছে। 'ফরওয়ার্ড' 'গোলে'র কাছে বল নিয়ে গিয়ে 'সেণ্টার' কর্‌লে। 'সেণ্টার ফরওয়ার্ড' লাফিয়ে উঠ্‌ল। 'গোল' নির্ঘাত। কিন্তু 'সেণ্টার ফরওয়ার্ডে'র টেকো মাথায় বল লেগে বল 'পোষ্টে'র বাইরে চলে' গেল। দর্শকেরা 'এঃ' করে' বসে' পড়্‌ল। একজন 'গোল পোষ্টে'র কাছ থেকে বলে উঠ্‌ল—"টেকোকে এর পরের দিন থেকে মাথায় খড়ি মেখে মাথা খস্‌খসে করে' আন্‌তে হবে—যা' পিছল মাথা—ওতে বল কি ঘোরান যায়?"

*   *   *

ম্যাজিষ্ট্রেট—"তুমি পোষ্ট-অফিস ক্লার্ককে মেরেছে কেন?"

আসামী—"আজ্ঞে স্যার, আমি স্ত্রীকে টেলিগ্রাম কর্‌ছিলাম। টেলিগ্রাম লিখে ওর হাতে দিতে দেখলাম, ও পড়্‌ছে, আমি আর চুপ করে' থাক্‌তে পার্‌লাম না।"

*   *   *

ছাত্র—"স্যার, বি-এ পাশ করে' আমি কি পড়্‌ব বলুন ত?"

প্রোফেসার—"সকালবেলা উঠেই খবরের কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার 'কর্ম্মখালি' কলমটা রোজ ভাল করে' পড়ো।"

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

বিপ্লব এখনও বাধে নাই

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

অজয়ের সঙ্গে মমতার বিবাহ হইয়া গেল। সেদিন বৌ দেখিয়া সকলেই একবাক্যে কহিল, হ্যাঁ, বৌ সুন্দরী বটে!

মমতা সুন্দরী। শুধু এইটুকু বলিলেই তার সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। এই ছিপ্ছিপে স্নিগ্ধ মেয়েটীকে একবার দেখিলে আর ভুলিবার উপায় নাই। ওর নাক, মুখ, চোখ, এমন কি ওর গালের পাশে ছোট তিলটী পর্য্যন্ত অতুলনীয়! ওর গায়ের রং অত্যন্ত ফর্সা, কিন্তু ফ্যাকাশে নয়। ওর চুলের সঙ্গে বৈশাখের কালো মেঘের উপমা হয় ত দেওয়া চলে। বয়স ওর উনিশ, কিন্তু যৌবনের উদ্দাম চঞ্চলতা তাহাতে নেই। ওর কথা বারবার শুনিতে সাধ হয়। কথার মাঝে যে এমন মিষ্টতা থাকিতে পারে, তাহা ওর কথা না শুনিলে যেন কল্পনাও করা যায় না। ও হাসিলে ওর গালে টোল খায়, উহাতে উহাকে আরো লোভনীয় করিয়া তোলে।

মমতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অজয়ের বুকখানা বার-বার ফুলিয়া ওঠে। আনন্দ হয় নিজের ভাগ্যের কথা ভাবিয়া। মনে মনে সে কেবল হাসিয়া মরে এই ভাবিয়া যে মমতার দিক্ দিয়া সে হইয়াছে আজ তাহার বন্ধুদের ঈর্ষার পাত্র।

অজয় মমতাকে লইয়া কত আকাশ কুসুম রচনা করে।

মমতা কিন্তু এ বিবাহে সুখী হইতে পারে নাই। অজয়ের কুৎসিৎ মুখখানার পানে চাহিলে তার সারা অন্তর শুধু বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে।

অজয় কুৎসিৎ হইলেও সে যে তাহার স্বামী, তাহার দেবতা, ইহা সে কিছুতেই ভাবিতে পারে না। অসুন্দরকে সে চিরদিনই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

অজয় কিন্তু ইহা বোঝে না। তথাপি সে নিজের রূপের জন্য মমতার কাছে লজ্জিত হইয়া থাকে। নিজের রূপের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তাই সে নিজের এই দৈন্যকে ঢাকিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। স্নো মাখিয়া, পাউডার ঘসিয়া সে নিজেকে সুন্দরতর করিতে প্রয়াস পায়।

মমতা হাসে, অজয়ের পর ওর যেন একটু অনুকম্পা হয়। ভাবে, তাহাকে বিবাহ না করিয়া অজয় যদি আর কাহাকেও বিবাহ করিত, তাহাতে হয় ত সে সুখী হইতে পারিত।

অজয় কিন্তু মমতাকে লইয়াই মাতিয়া থাকে। বর্ষার দিনে মমতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কবিতা লেখে। লেখা শেষ হইলে মমতাকে ডাকিয়া শুনাইতে বসে।

অজয় কবি। সে সুন্দর করিয়া কবিতা লিখিতে পারে। মমতাকে লইয়া সে যে কোন কবিতা লেখে, তাহাই হইয়া উঠে সুন্দর, অপূর্ব্ব।

মমতার কিন্তু তাহা ভাল লাগে না, তথাপি সে কবিতা শুনিতে বসে; মানে, কবিতা শুনিবার ভান করে। দৃষ্টি তাহার বাহিরের দিকে আবদ্ধ থাকে। বৃষ্টিধারার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মন হইয়া যায় উদাস, ভুলিয়া যায় সে নিজের সত্তাকে, কাহার একখানি মুখ তাহার মুখের পানে বারবার আসিয়া যেন উঁকি মারিয়া যায়।...

কবিতা পড়া শেষ করিয়া অজয় মমতার পানে চায়, কি বলিতে গিয়া যেন চুপ করে, হয় ত সে বলিতে চায় মমতার কাছে কেমন লাগিল তাহার এই কবিতা, কিন্তু মমতার দিকে চাহিয়া তাহার আর কিছু বলা হয় না, মমতার উদাস দৃষ্টি তাহার চোখে পড়ে, অজয় চঞ্চল হইয়া উঠে।...সে লক্ষ্য করিয়াছে মমতা মাঝে মাঝে এমনি উদাস হইয়া পড়ে, মনে হয় যেন অন্তরে কি এক ব্যথা

সে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অজয় কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুধু ব্যথিত হইয়া উঠে।

মমতার মুখের পানে সে কেবল চাহিয়াই থাকে। কি বলিবে, তাহাও যেন খুঁজিয়া পায় না। তাই চিত্ত তাহার শুধু মথিত হইতে থাকে।

কোনপ্রকারেই অজয়কে ভালবাসিয়া মমতা নিজেকে সুখী করিতে পারিল না। যাহাকে ভাল বাসিয়া নিজেকে সুখী করিতে পারিত, সে অজয় নয়—অমরেশ।

মমতা তাহার কুমারী-জীবনে এই অমরেশকে কামনা করিয়াছিল তাহার সমগ্র অন্তর দিয়া। সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক কিছু সুখছবি কল্পনায় গড়িয়া তুলিত এই সুদর্শন যুবকটীকে কেন্দ্র করিয়া।

অমরেশ ছিল মমতাদের কি এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। অবস্থা তাহার ভাল ছিল না বলিয়া মমতাদের আশ্রয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। এই প্রিয়দর্শন ছেলেটী যেমনি ছিল মেধাবী, তেমনি ছিল চঞ্চল; কিন্তু তাহার সেই চঞ্চলতা প্রকাশ পাইত মমতার কাছে বেশী করিয়া। মমতার বই লুকাইয়া, খোঁপা খুলিয়া দিয়া নানাপ্রকারে সে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। মমতা ইহাতে বিরক্ত বোধ করিত না, বরং ইহা তাহার ভালই লাগিত। যেন ইহার অপেক্ষায়ই সে বসিয়া থাকিত।

দিন যায়।

তারপর দেখা গেল অমরেশের চঞ্চলতা গিয়াছে কমিয়া, হঠাৎ যেন দুইজনে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বের মত অমরেশ মমতাকে তেমন করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায় না। মমতাও যেন অমরেশকে এড়াইয়া চলে। হঠাৎ দেখা হইলে দুইজন দুইজনের দিকে চাহিয়া থাকে। দুইজনের চোখে মুখে কিসের যেন এক প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, কিন্তু কেহই কাহাকেও কিছু বলিতে পারে না।

পড়িবার ঘরে বই খুলিয়া খোলা জানালা দিয়া অমরেশ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। একখণ্ড মেঘের আড়ালে চাঁদ তখন লুকোচুরি খেলে। সেই চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অমরেশের কেবলই মনে হয় আর একখানা চাঁদপানা মুখের কথা। ভাবে, তাহাকে সে কি পাইতে পারে না! কিন্তু কিসের অধিকারে তাহাকে সে দাবী করিবে—করিলেই বা পাইবে কেন? এ তাহার দুরাশা বই ত নয়। মমতার কাছ হইতে সে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে।

মমতার অভিমান হয়। অমরেশ কেন তাহাকে অবহেলা করে! কিসে সে অমরেশের এত উপেক্ষার পাত্র। অমরেশই যদি তাহাকে এমন করিতে পারিল, তবে সেই বা কেন তাহার কথা ভাবিয়া মরিবে! মমতা প্রতিজ্ঞা করে, অমরেশের কথা সে আর কিছুতেই ভাবিবে না। কিন্তু একটু পরেই সে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া যায়, আবার তাহাকে ভাবিতে সুরু করে।

এমনি করিয়াই দিন গড়াইয়া যায়। দুইজনের মনের কথা দুইজনেই ধীরে ধীরে বুঝিতে পারে। তথাপি তাহারা একই বাড়ীতে পরস্পর নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় থাকিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়াও থাকা দুরূহ। শেষে অমরেশই একদিন মমতার পিতার কাছে গিয়া মমতাকে ভিক্ষা চাহে। বলে, আপনার আশীর্ব্বাদ পেলে মমতার সম্মতি চাইব?

মমতার পিতা অমরেশের কথা শুনিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন। তারপর হোহো করিয়া খানিকটা হাসিয়া লন। অতঃপর বলেন, আমার বাড়ীতে ত উপন্যাস চলবে না। অতএব আজই খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেল নাগাৎ একটা মেস ঠিক্ করে এস। অর্থাৎ, এখান হইতে সরিয়া পড়।

অমরেশ মাথা নীচু করিয়া সেখান হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে। মাথার মধ্যে তখন তাহার জ্বালা করিতেছে। নিজেকে ধিক্কার দেয়। বলে, ঠিক্ হয়েছে—এ তার উপযুক্তই হয়েছে!

তখনই সে রাস্তায় বাহির হয়। খানিক ঘোরাঘুরি করিয়া একটা মেসও সে ঠিক্ করিয়া ফেলে। এখানে

ডরোথি লী

সে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারিবে না। এখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

সে তাহার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসে। তাহার যাহা কিছু আছে, এখনই সব গুছাইয়া লইতে হইবে, খাওয়া-দাওয়ার পূর্ব্বেই সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া মমতাকে সেখানে দেখিতে পায়। তাহাকে দেখিয়া তাহার ব্যর্থতার ব্যথা যেন আরও বেশী করিয়া বাজিয়া উঠে। তথাপি একবার বৃথা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, চল্‌লাম মমতা, আজ আমার ছুটী হয়ে গেল।

অমরেশের দিকে না চাহিয়াই মমতা বলে, জানি।

অমরেশ আর কোন কথা বলে না। বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্যে বইগুলি গুছাইতে থাকে। অমরেশ তাহার ছোট ফটোখানা দেওয়াল হইতে খুলিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিতে যায়। সেইদিকে চাহিয়া মমতা বলে, ওটা থাক্।

অমরেশের বুকখানা একবার দুলিয়া ওঠে। ছবিখানা সে আবার দেওয়ালেই টাঙাইয়া রাখে।

বাক্সটা বন্ধ করিতে করিতে অমরেশ যেন নিজ মনেই বলে, ডাক্তার হয়ে বেরুন এবার আর হ'ল না। এরপর পরীক্ষা দেওয়া ত আর সম্ভব হবে না।

মমতার কাঁদিতে ইচ্ছা করে। সে তাহার গলা হইতে সরু হারগাছা খুলিয়া অমরেশের পায়ের তলায় রাখিয়া দিয়া বলে, না, পরীক্ষা দিও।

হারগাছা হাতে করিয়া অমরেশ উঠিয়া দাঁড়ায়। একটু সরিয়া আসিয়া সেটি মমতার গলায় পুনরায় পরাইয়া দিয়া বলে, তোমার এ দয়ার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। তোমাকে আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে মমতা।

মমতা অমরেশের মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলে।

মমতার চোখের জল অমরেশকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়। হয় ত একবার দ্বিধা করে, হয় ত করে না, পরমুহূর্ত্তে দুই হাত বাড়াইয়া মমতাকে সে তাহার দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলে। মমতার অশ্রুসিক্ত মুখখানার উপর বারবার চুম্বন করিয়া বলিতে থাকে, এই রইল আমার বেঁচে থাকার সম্বল হয়ে।

দিন যায়, মাস যায়, বছরের পর বছর কাটিয়া যায়। ইহার মধ্যে অমরেশের খোঁজ আর কেহ লয় নাই, হয় ত তাহার কথা এবাড়ীর সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিতে পারে নাই শুধু একজন। তাহা তাহার বাক্সের মধ্যে অমরেশের ছোট ফটোখানা দেখিলেই বুঝা যায়।

ভুলিতে পারুক আর নাই পারুক, শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু মমতাকে অমরেশের আশা ছাড়িতেই হইল। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার অভিমত প্রকাশ করার শক্তি বা সাহস তাহার নাই। শুধু তাহার কেন, এবাড়ীতে তাহা কোনদিন কাহারও দ্বারাই সম্ভব হয় নাই। সুতরাং মমতাও শেষদিন পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে শুধু পিতার খেয়ালে নিজেকে বলি দিতে চলিয়াছে।

...বিবাহ রাত্রে অজয় মন্ত্র উচ্চারণ করে। বলে, "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত মনুচিত্তন্তে হস্ত !"

শুনিয়া মমতার হাসি পায়। ভাবে, কাহার হৃদয় কে চাহিতেছে।

শুভ-দৃষ্টির সময় অজয়ের মুখের দিকে ও ইচ্ছা করিয়াই চাহে না। আজ তাহার কাছে শুভ-দৃষ্টির কোন অর্থই হয় না।

বাসর জাগিতে ওর প্রবৃত্তিতে বাধে। শয্যার একপার্শ্বে সে নির্জ্জীবের মত শুইয়া থাকে। অজয় যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, জাগিয়া থাকিয়াই ও তখন ভাবিয়া মরে।...ভাবিয়া ভাবিয়া ও আশ্চর্য্য হইয়া যায়, যাহাকে সে কোনদিন কোন মুহূর্ত্তের জন্যও কামনা করে নাই, আজ তাহার উপর তাহারই দাবী হইল সকলের উপরে।...অমরেশের কোন দাবী তাহার উপর আর রহিল না।

জাগিয়া থাকিয়াই সারাটি রাত্রি মমতার কাটিয়া যায়।

এম-এ পাশ করিয়া অজয় এতদিন বসিয়াই ছিল। কিন্তু বসিয়া থাকিবার দুঃখ তাহাকে পাইতে হয় নাই। তাহার পিতা তাহার জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অজয়ের সারাজীবন বসিয়া থাকিলেও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। তথাপি ইহা সে পছন্দ করে না, তাই এতদিন ধরিয়া শুধু 'এ্যাপলিকেশন' করিয়াছে। তার অন্তরের একান্ত কামনা সে প্রোফেসর হয়। অজয় ইংরাজী সাহিত্যের এম-এ; কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে ও বেশী ভালবাসে। ওর ইচ্ছা সারাজীবন ও শুধু সাহিত্য লইয়াই থাকিবে। ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করিবে, তাহাদের বুঝাইয়া দিবে যে, তাহাদের সাহিত্য বিদেশী কোন সাহিত্য হইতে ন্যূন নহে।

শেষে একদিন ওর এ কামনা সফল হয়। ডাক আসে কাশী হইতে।

অজয় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠে। ওর যেন কেন মনে হয়, এই যে কাজ জুটিল এ শুধু মমতার ভাগ্যে। নহিলে কই এতদিন এত চেষ্টা করিয়াও সে ত কিছু জুটাইতে পারে নাই। মমতাকে যেন ওর আজ আরও ভাল লাগে।

অজয় মমতার কাছে যায়। হাসিয়া তাহাকে সংবাদ দেয়। বলে, তোমার ভাগ্যে আমার এ কাজ হ'ল মমতা। তারপর বলে, সত্যিই তুমি এ ঘরের লক্ষ্মী।

মমতা অজয়ের উৎসাহদীপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে, অজয় চাহিতেছে এ সংবাদে সেও তাহার মত উৎসাহিত হইয়া ওঠে।

অজয় জিজ্ঞাসা করে, এতে তুমি সুখী হও নি মমতা?

মমতা অভিনয় করে। বলে, হ্যাঁ, হয়েছি ত।

অজয় খুসীতে ভরিয়া যায়।

তারপর সুরু করে কাশীর গল্প। বলে, বাংলার বাইরের এই সহরটী কত যে সুন্দর ও নয়নাভিরাম না দেখ্‌লে তা' বোঝবার উপায় নাই। অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় গঙ্গা, তার পাড়ে নানা আকারের বাড়ী আর মন্দিরগুলির পানে চাইলে যেন ইন্দ্রপুরীকে স্মরণ করিয়ে দেয়—দূরে রামনগরের রাজবাড়ীটিকে কি এক রহস্যের আধার বলে মনে হয়।

অজয় বলিয়া যায়, সন্ধ্যার কাশী সে যেন আরও সুন্দর আরও আনন্দদায়ক। মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা-কাঁসর, সন্ধ্যা-বন্দনার গীতি মনে প্রাণে এক নব পুলকের সঞ্চার এনে দেয়।

মমতার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া অজয় বলে, এই কাশীর বুকে, গঙ্গার ঠিক্ পাড়ে তোমায় নিয়ে বাঁধব ছোট একখানি গৃহ। সেখানে থাক্‌ব শুধু তুমি আর আমি। জ্যোৎস্না-রাত্রে গঙ্গা কি করে হাসে তা' দেখবে তুমি। তুমি আমার পাশে বসবে—তোমার পাশে বসে আমি লিখ্‌ব কবিতা—নাম হবে তার জ্যোৎস্না-রাত্রের গঙ্গা। বলিতে বলিতে অজয় চক্ষু বোজে। চক্ষু বুজিয়া সে যেন জ্যোৎস্না-রাত্রের গঙ্গাকে দেখিতে পায়।

মমতা অজয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অজয়ের এই যে সুখ স্বপ্ন ইহা তাহার আজ ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হয় না। ওর মনে কেন যেন আজ প্রশ্ন জাগে যে, প্রত্যেক স্বামী প্রত্যেক স্ত্রীকেই কি এমনি ভালবাসে! অজয় তাহাকে ভালবাসে ইহা ভাবিতেই মমতা যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তি বোধ করে এই ভাবিয়া যে, এ ভালবাসায় কি ফল হইবে। অজয়ের এই ভালবাসার কোন প্রতিদান মমতা যে কোনদিন দিতে পারিবে না ইহা ত সে জানে—তবে?

মমতা ভাবে, অজয়কে সে সব খুলিয়া বলে। বলে, বৃথাই তোমার এ ভালবাসা! কিন্তু ভাবিলেও ইহা বলিতে পারে না। মমতা হঠাৎ আবিষ্কার করে। এই সত্যকথাটি বলিতে তাহার আজ বাধিয়া যায়। আর তা' বাধিয়া যায় শুধু অজয় বেদনায় একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে ভাবিয়া।

অজয় চক্ষু মেলে। মেলিতেই দেখিতে পায় মমতা তাহার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

চোখচোখি হইতেই মমতা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে।

অজয় তাহা লক্ষ্য করে না। আপন আবেশেই মমতাকে ডাকে, মমতা!

মমতা উত্তর দেয়, উঁ:।

অজয় আর কিছু বলে না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। তারপর মমতার দিকে চাহিয়া আবার ডাকে, এই—

মমতা ভাবে, আবার তাহাকে অভিনয় আরম্ভ করিতে হইবে। হয় ত করিতে হইবে অনেকক্ষণ ধরিয়া। কিন্তু কেন যেন অভিনয় করিতেও আজ ওর ভাল লাগে না। বলে, কি ?

অজয় কিছু না বলিয়া শুধু হাসিতে থাকে। সে হাসি তৃপ্তির, সে হাসি জয়ের। অজয় ভাবে, সে সম্পূর্ণ জয় করিয়া লইয়াছে এই মেয়েটীকে। এ শুধু তাহারই—শুধু তাহারই।

বাতাসে মমতার মাথার কাপড়খানা ফেলিয়া দিয়াছে। কাণের দু'টা ঝুমকা দুলিয়া দুলিয়া ওর গাল দু'টীকে বার-বার স্পর্শ করিয়া যায়। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া অজয়ের ভারি ইচ্ছা করে, ঠিক্ এই মুহূর্ত্তেই মমতার গালে দু'টা চুম্বন করিতে। অজয় তাহার মুখখানা মমতার মুখের কাছে লইয়া যায়—কিন্তু…

অজয়ের যেন কেমন একটা খট্‌কা লাগে। মমতার মুখের পরিবর্ত্তন যাহা ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হইয়া গেল, তাহা আজ অজয়ের চোখে পড়ে। আপন খেয়ালে সে এতদিন ছুটিয়াছিল। আজ হইতে হইল সংযত। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে তাহার প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগিয়া গেল, সে কি এতদিন ভুল বুঝিয়াছিল! মমতা কি এ বিবাহে সুখী হয় নাই! তাহার মত তাহাকে কি মমতা ভালবাসিতে পারে নাই!

মমতার মুখের পানে সে চাহে। তার মুখের ভাষা সে কেবলই পড়িতে চেষ্টা করে।…

কথা বলিতে অজয়ের এই পরিবর্ত্তন মমতাও লক্ষ্য করে। সে অস্বস্তি বোধ করে। মমতা ইহা যেন চাহে নাই।

অজয় মমতার চোখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার মনের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে। বলে, তুমি কি সত্যি সুখী হও নি মমতা!

মমতা বলে, পাগল—এই বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকে।

অজয় ভাবে, সত্যিই ত সে পাগল। নহিলে মমতাকে সে কি করিয়া এ সব প্রশ্ন করিয়া বসিল। মমতা তাহাকে কি ভাবিল। মমতার পরিবর্ত্তন, সে হয় ত তাহার নিজের চক্ষের ভুল—হয় ত তাহার মনের কল্পনা।

এই আপন-ভোলা লোকটী আবার সব ভুলিয়া যায়। দুই হাত দিয়া মমতার হাত দু'খানি ধরিয়া বলে, আমার এ কথায় সত্যিই তুমি অভিমান কর নি! ও ধরিয়া লয়—এ কথা শুনিবার পর তাহার উপর মমতার অভিমান করাই স্বাভাবিক।

মমতা বলে, না, করি নি ত।

অজয় খুসী হইয়া উঠে। দুই হাত দিয়া মমতার মুখ-খানা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলে, লক্ষ্মী—সত্যি তুমি লক্ষ্মী!

এবার ও মমতার মুখের উপর তাহার নিজের মুখখানা চাপিয়া ধরে।

অভিনয় বুঝি বা একদিন সত্য হইয়া দাঁড়ায়।…

কাশী আসিবার পর মমতা তাহার নিজের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নিজেই যেন অবাক হইয়া যায়। প্রত্যহ কলেজ হইতে ফিরিয়া অজয় মমতাকে লইয়া গঙ্গার বুকে নৌকায় করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাতে মমতা খুব আনন্দ পায়। তাহার মনে হয়, ইহার জন্য সে যেন প্রত্যহ অজয়ের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে!…

নৌকায় উঠিয়া মমতা মুখর হইয়া উঠে। অজয়ের সঙ্গে তখন যেন কথা কহিয়া সে ক্লান্ত হয় না। সন্ধ্যা হইয়া যায়, আকাশে চাঁদ উঠে, ওরা তখনও নৌকায় বসিয়া থাকে। মমতার পিছন হইতে চাঁদের খানিকটা আলো আসিয়া অজয়ের মুখে পড়ে। মমতার মনে হয় কালো হইলেও অজয় বোধ হয় কুৎসিৎ নয়।…

মৃদু টানে ওদের ছোট নৌকা ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলে। হাল হাতে করিয়া অজয় মমতার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। ভাবে, জীবন যে এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে তাহা সে ত কোনদিন কল্পনায়ই আনিতে পারে নাই।…

মমতার নিকট হইতে সে কতটুকু পাইয়াছে। তাহার মাপ-কাঠি নাই; যেটুকু পাইয়াছে, তাহাতেই সে হইয়া রহিয়াছে বিভোর। পাইয়াছে কি পায় নাই, তাহার চিন্তাও তাহার মনে বড় একটা উঠে না—এমনি আত্মহারা সে।

বেনীমাধব-ধ্বজা পর্য্যন্ত আসিয়া অজয় বলে, এইবার ফেরা যাক্, কি বলো?

আকাশের দিকে চাহিয়া মমতা বলে, না, আরো একটু।

অজয় হাসিয়া বলে, সারারাত্রি কি তবে ভেসে চল্‌বে?

চাঁদের আলোয় মমতাকে বুঝি পাগল করিয়াছে। উত্তর দেয়, মন্দ কি।

অজয় হাসিয়া বলে, বেশ চলো ভেসে, অনন্তের উদ্দেশে তবে পাড়ি মারি।

মমতাও হাসে। বলে, বেশ ত চলো না। তারপর হাসিতে হাসিতেই বলে, আচ্ছা, অনন্তের উদ্দেশে আজ যাত্রা নাই বা হ'ল। ঐ ছোট পুলটা পর্য্যন্ত চলো আজ যাওয়া যাক্।

তাহাদের ছোট নৌকা আবার ভাসিয়া চলে।

আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মমতার গান গাহিতে ইচ্ছা হয়। ও আপনার মনে গুণগুণ করে। শুনিয়া অজয় বলে, উহুঁ, আস্তে নয়, গলা ছেড়ে।

মমতা সলজ্জ হইয়া বলে, বারে, আমি বুঝি গান গাইছিলাম!

অজয় হাসিয়া বলে, মান্‌লাম। কিন্তু এখন গাইতে ত দোষ নাই। তারপর আবদার করিয়া বলে, না, সত্যি গাও না একটা!

গাহিতেই ও চায়। অজয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, কি গাইব?

অজয় বলে, তোমার যা' খুসী।

মমতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে অজয়েরই লেখা একটা গান গায়। ওর মনে হয়, অজয় ইহাতেই সব চেয়ে তৃপ্তি পাইবে। গায়—

মোর মিলন মালায়, আজি নিশীথ নিশায়
ওগো প্রণয় পাগল, তুমি দিলে দোল্,
তুমি হে নিলে তারে ভরা জ্যোছনায়।
মম প্রাণের ঘরে, আজি সোহাগ ভরে
তব মনের ফাগুন, প্রিয় জ্বালাল আগুন,
আমারে রাঙিয়ে দিল প্রেমের নেশায়।

নিজের লেখার মাঝে যে এত মাধুর্য্য থাকিতে পারে তাহা অজয় কোনদিন ভাবিতেই পারে নাই। মমতা গান গাহিয়াছে, আর, অজয়ের লেখা গান গাহিল এই প্রথম। অজয়ের মনে হইল, মমতার কণ্ঠে যেন আজ তাহার গানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল। ও ভাবে, এখন হইতে মমতাকে সে শুধু তাহার নিজের গানই গাহিতে বলিবে।

এমনি করিয়া অনেক রাত্রে তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসে।

গল্প হয় ত এইখানেই শেষ করা যাইত, কিন্তু অমরেশের দেখা পাই নাই বলিয়া এ গল্পের জের আরো কিছুদূর টানিতেই হইবে।

অমরেশকে আর মমতার তেমন করিয়া মনে হয় না। মাঝে মাঝে যখন হয়, হয় ত কোন চিন্তায় তাহা আবার ঢাকা পড়িয়া যায়, নয় ত বিগত রাত্রের স্বপ্নের ক্ষীণ স্মৃতির মত মনের মাঝে একটু ভাসিয়া থাকে।

ওদের এই ছোট সংসারে অনেক কাজ মমতা নিজের হাতেই করে। করিয়া যেন আনন্দ পায়। রোজ সকালে সে অজয়কে নিজের হাতে চা করিয়া দেয়। দুপুরে অজয়ের কবিতাগুলো একটা খাতায় পরিষ্কার করিয়া লেখে। অজয় বলিয়াছে, সে তাহার প্রথম কবিতার বইখানা মমতার নামেই উৎসর্গ করিবে। উৎসর্গ-পত্রও লেখা হইয়া গিয়াছে।

এমনি ভাবেই উহাদের বিবাহিত জীবনের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। এ সংসার এখন মমতার খুব মন্দ লাগিতেছে না। অজয়কেও তাহার সহ্য হইয়া গিয়াছে।... তাহার কোন যাচ্ঞাই আর সে অপূর্ণ রাখে না। অজয়ও মমতাকে লইয়া বিভোর হইয়া থাকে।

অজয়কে মমতা সহ্য করিয়া লইয়াছে ইহা সে জানে; কিন্তু ইহারই মধ্যে সে যে অজয়কে ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে, তাহা সে এতদিন তেমন করিয়া বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিল সেইদিন—যেদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পথে অজয় মোটর চাপা পড়িয়া ফিরিয়া আসিল। কলেজের কয়েকটী ছাত্রই তাহাকে পথ হইতে অজ্ঞান ও আহত অবস্থায় লইয়া আসিল।

অজয়ের কপালের খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। তাহারই রক্তে মুখখানা একেবারে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। সেইদিকে চাহিয়া মমতার বুকখানা একেবারে মুস্‌ড়াইয়া গেল। চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল।

ছাত্রদের একজন মমতাকে প্রবোধ দেয়। বলে, আপনি ভাববেন না মিসেস্ সেন, ডক্টর দাশকে 'কল্' দেওয়া হয়েছে। তিনি এলেন ব'লে। মনে হয় 'সারে'র, আঘাত তেমন গুরুতর হয় নি।

বিছানার উপর অজয়ের অসাড় দেহটার দিকে চাহিয়া মমতার মন কোন প্রবোধ মানে না। অজয়ের মুখের রক্ত সে সযত্নে মুছাইয়া দেয়। তাহার মুখের দিকে সজল চক্ষে চাহিয়া থাকে। অজয়ের চোখ মুখ মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হইয়া উঠে। হয় ত ভিতরে তাহার অশেষ যন্ত্রণা হইতেছে। মমতা অস্থির হইয়া পড়ে।

ডাক্তার আসে। ছেলেরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে। বিছানা হইতে মমতা নামিয়া আসে। ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই সে বিস্ময়ে একেবারে অবাক হইয়া যায়!...মুখ হইতে শুধু বাহির হয়, 'অমরেশ দা'!

এই দীর্ঘকাল পরে, এ সময়, এ স্থানে, এ অবস্থায় মমতার দেখা পাইয়া অমরেশও অবাক হইয়া যায়, সেও বিস্ময়ে বলে, তুমি!...

অজয়ের আঘাত লাগিয়াছিল মাথায়। ডাক্তার বলিয়াছে, ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে কিছুদিন সময় লাগিবে।

অজয়ের জ্ঞান হয়, আবার মাঝে মাঝে কেমন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ওর শুশ্রূষার একান্ত প্রয়োজন। ডাক্তার একজন নার্স পাঠাইয়া দিয়াছে। তথাপি, মমতা অজয়ের বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে চাহে না।

...আজ অজয় অপেক্ষাকৃত ভালই আছে ও অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঘুমাইতেছে। তাহার পার্শ্বে মমতা বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। সম্মুখে গঙ্গা, ও পারে বালুচর। দূরে আবছায়া গাছের সারি, তাহারই মাথায় আকাশ। কালো মেঘে আজ তা' ছাইয়া দিয়াছে। ঐ আকাশের মতই তাহার হৃদয়েও ধীরে ধীরে কালো মেঘ আসিয়া জমাট বাঁধিতেছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই। কল্পনায় সে চলিয়া গিয়াছিল বহুদূর। অতীতের কয়টা পৃষ্ঠায় ও তখন চক্ষু বুলাইতেছে। মমতা তখন যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা এখন ওর আর ভাবা উচিত নয়, ওর নিজেরই তা' মনে হয়। ও আর ভাবিবে না ভাবিয়া, না ভাবিয়াও থাকিতে পারে না। মমতা অজয়ের একখানা হাত দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরে, —ও যেন অজয়কে স্পর্শ করিয়া নিজের এই দুর্ব্বলতাকে দূর করিবার চেষ্টা করে।...

ধীরে ধীরে অজয় সুস্থ হইয়া উঠে। ডাক্তার প্রত্যহই আসে। আসিয়া অনেকটা সময় এ বাড়ীতে কাটাইয়া দেয়। ডাক্তার মমতার সঙ্গে গল্প করে। কথা দিয়া সে কথার জাল বুনিয়া চলে। মমতা ভাবে, সেদিনকার অমরেশ ছিল চঞ্চল, আর আজিকার অমরেশ হইয়াছে চপল। অমরেশের এই কথার জালে মমতা ধীরে ধীরে যায় আটকাইয়া,—খুলিতে গিয়াও সে বাঁধন সে যেন খুলিতে পারে না। সে বুঝিতে পারে না যে, অমরেশ ধূমকেতুর মতই তাহার জীবনের পথে বারবার আসিয়া উঁকি মারিতেছে, বুঝিতে পারে না যে, এ ভাল নহে, এ স্বাভাবিক নহে।

ডাক্তার গল্প করিয়া যায়। বলে, পরীক্ষা সেইবারই দিয়েছিলাম। কিন্তু কি কষ্টে যে তা' সম্ভব হয়েছিল সেটা কেবল আমিই জানি।

ডাক্তার বলিতে থাকে, পরীক্ষার ফল হ'ল ভালই। পাশ করবার পরে এখানকার হাসপাতালে একটা কাজও জুটে গেল। এই নিয়েই ত বেঁচে আছি এতদিন।

অমরেশ মমতার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া

চাহিয়া দেখে সেদিনকার মমতা ও আজিকার মমতার মাঝে প্রভেদ হইয়াছে অনেকখানি। মমতা যেন আরও সুন্দর হইয়াছে, আরও লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে।...হঠাৎ অমরেশ জিজ্ঞাসা করে, আমার সেই ছবিটা—সেটা বোধ হয় বহুদিন আগেই ভেঙে ফেলেছ,না ?

ডাক্তার আপন-মনেই হাসিতে থাকে।

ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে বলিতে পারিলেই মমতা বোধ হয় বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু তা' পারিল কই ? শুধু নীরবে, নত চক্ষে চুপ করিয়া থাকে।

ডাক্তারের বুঝিতে বাকী থাকে না যে, মমতার হৃদয়ের দ্বার এখনও তাহার জন্য রুদ্ধ হইয়া যায় নাই।

ডাক্তার প্রলুব্ধ হইয়া উঠে।

অমরেশের চোখের দিকে চাহিয়া মমতা ইহা বোঝে, তাই কথার প্রসঙ্গ ঘুরাইতে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—বিয়ে তোমার কবে হ'ল অমরেশ দা' ?

বিয়ে ?—অমরেশ হাসে। এ হাসির অর্থ যেন এই—সবাই তোমার মত অকৃতজ্ঞ ত নয় মমতা !

মমতা চুপ করিয়া থাকে। অজয় আর অমরেশ দুই-জনেই তাহার মনের মাঝে আজ হাঁটিয়া বেড়ায়।...অজয়কে সে সবে ভালবাসিতে সুরু করিয়াছিল, এমনি সময় অমরেশ আসিয়া দাঁড়াইল তার সে ভালবাসার পথে বুঝি বা প্রাচীর তুলিতে।...ওর জীবনের পথ হইতে অমরেশকে সরিয়া যাইতেও সে বলিতে পারে না ; অথচ, এমনিভাবে তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকিতেও যেন কেমন সঙ্কোচ হয়।

অমরেশ ডাকে, মমতা !

মমতা চোখ তুলিয়া চায়।

অমরেশ বলে, বিধাতার খেয়ালে এই দুটো জীবন কেমন ব্যর্থ হয়ে গেল ; অথচ, আমরা ত কোন অপরাধই করি নি।

ডাক্তার বুঝি ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাই এক বিবাহিতা নারীকে সে শুনাইতে বসিয়াছে কবেকার সেই প্রেমের ইতিহাস।

মমতার এই মুহূর্ত্তে অমরেশের পানে চাহিতে কেমন যেন ভয় করে। ভাবে, অতীতের সেই সব কথা কেন ও উঠায়, উঠাইয়া বা কি ফল, কি চায় সে মমতার কাছে আজ ?

ডাক্তার আগাইয়া আসে। আসিয়া মমতার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লয়। ডাকে, মমতা !

মমতা চক্ষু বুজিয়া অজয়কে স্মরণ করে।...

মমতার গালের ছোট তিলটার দিকে ডাক্তার চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া ডাক্তার তাহার সংজ্ঞা হারায়।...যাহা উচিত নয়, যাহা একান্তই অশোভন, সে আজ তাহাই করিয়া বসে। বহুদিনের আগেকার একদিনের মত ডাক্তার আজ দ্বিতীয়বার মমতাকে নিমিষের মধ্যে তাহার আলিঙ্গনের ভিতর বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহার চোখে, মুখে, কপালে বারবার চুম্বন করিতে থাকে।

আলিঙ্গন মুক্ত করিলে মমতা ডাক্তারের নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। যাহার আলিঙ্গনে, চুম্বনে একদিন সে হইয়াছিল আত্মহারা, আজ তাহারই চুম্বনে সে হইয়া পড়িল নির্জ্জীব, নিস্পন্দ ; সে আজ নিজেকে বোধ করিতে লাগিল অশুচি।...অমরেশের সুন্দর চেহারা তাহার চক্ষে হইয়া উঠিল কুৎসিৎ, কদর্য্য।...

মমতা শুধু অমরেশের দিকে চাহিয়া ব্যথাভরা চক্ষে বলে—তুমি এই—তুমি এই অমরেশ দা' !

অমরেশেরও সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। ও লজ্জিত হয় তাহার ভিতরের নগ্নরূপ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া। ও হইয়া উঠে চঞ্চল। মমতা যদি তাহাকে কটুভাষায় তিরস্কার করিত, হয় ত তাহাতে সে এমন বোধ করিত না, কিন্তু মমতার এই মৃদু ধিক্কারে সত্যই তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। অমরেশ মাথা উঁচু করিয়া মমতার মুখের পানে আর চাহিতেই পারে না।

অজয়—অজয়—অজয়—মমতার বুকের মাঝে এই মুহূর্ত্তে শুধু অজয়ই নাচিয়া বেড়ায়।...অমরেশ সেখানে নাই, অনেক দূরে সে তখন সরিয়া গিয়াছে।...

অমরেশ উঠিয়া দাঁড়ায়। এই ভুলের জন্য ওর দুঃখ হয়, অনুশোচনাও হয়। মমতাকে উদ্দেশ করিয়া সে অন্য-দিকে চাহিয়া বলে, ক্ষমা চেয়ে আর অপরাধ বাড়াব না। যদি পার আজকের এই দিনটার কথা ভুলে যেও।...আমি

বিদায় নিলাম। ভগবানের কাছে আজ শুধু এই কামনাই করি, তোমার জীবন-পথে আর কোন মুহূর্ত্তেই যেন না এসে দাঁড়াই।...

সে চুপ করে। একটু পরে আবার বলে, অজয়-বাবুর সঙ্গে আর দেখা করলাম না, তা' করতেও আর আমি পারব না। আমি বুঝেছি, তাঁর চেয়ে অনেক— অনেক ছোট আমি!...তুমি শুধু তাঁকে বলো, আমি তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে গেছি।

অমরেশ বাহির হইয়া যাইতে যাইতে একটু থামে। কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলে, যাবার বেলায় এই আশীর্ব্বাদই আমি করে গেলাম মমতা, তোমার জীবন পুণ্যের হোক্, সুখের হোক্।

সে বাহির হইয়া যায়।

মমতা সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে। অমরেশের যাইবার পথের দিকে চাহিয়া তাহার দুই চোখ তখন জলে ভরিয়া আসে। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া অজয়ের ঘরে আসে। অজয় তখন ঘুমাইতেছিল। মমতা অজয়ের ঘুমন্ত মুখের পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকে। চক্ষু তাহার আবার অশ্রুতে ভরিয়া যায়।...

তারপর মমতা অজয়ের পায়ের উপর ধীরে ধীরে তাহার মাথাটী রাখে। বিবাহের রাত্রে অজয়ের কণ্ঠে যে মন্ত্র শুনিয়া তাহার পাইয়াছিল হাসি, আজ তাহার মনে এই মুহূর্ত্তে শুধু এই কামনাই জাগে অজয়ের মত সেও আজ বলে, "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত মনুচিত্তন্তে হস্ত!"

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

হাস্য-কৌতুক

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

মালী—"বাগানের ফটকে কি নোটিশ লেখা আছে তুমি দেখ নি?"

স্কুলের ছাত্র—"হ্যাঁ, দেখেছি। দেখ্‌লুম, গোড়াতেই বড় বড় করে "প্রাইভেট' লেখা আছে। তখন আমার এমন লজ্জা হ'ল যে, আমি আর পড়লুমই না।"

* * *

—"প্রত্যেকবার ঘোড়া টেপবার সময় আপনি যদি চম্‌কে ওঠেন, আপনি কিছুতেই বন্দুক ছোঁড়া শিখ্‌তে পার্‌বেন না।"

—"আমি কি আর ছোঁড়ার জন্যে চম্‌কে উঠি—ঘোড়া টিপ্‌লেই আমার মনে পড়ে' যায় চারআনা খরচ হ'ল।"

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য
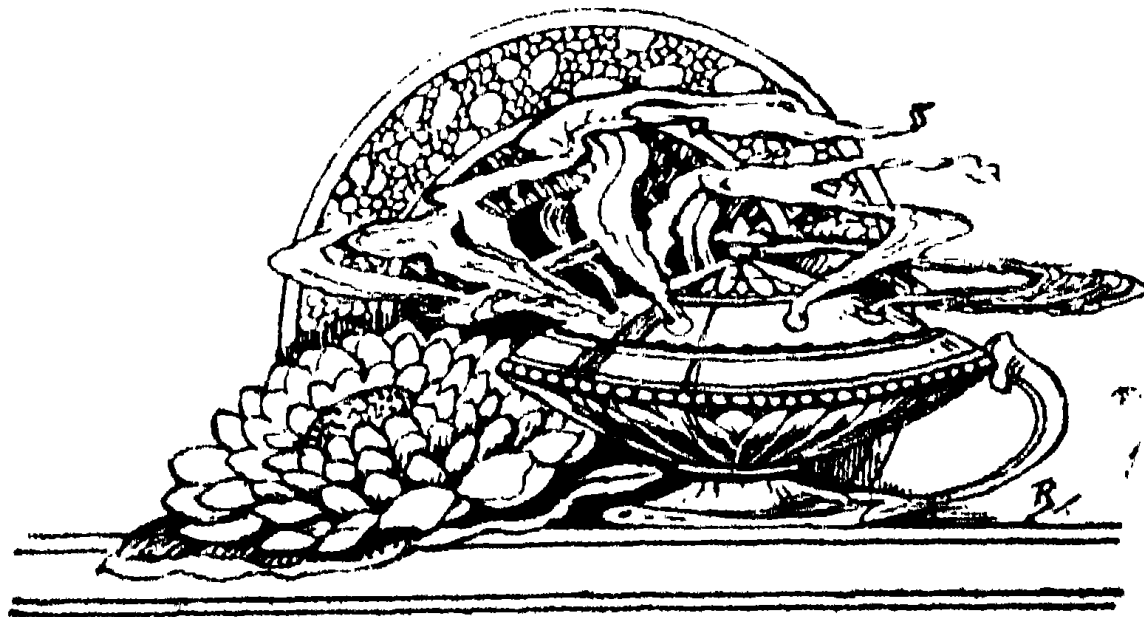
ভূদেববাবুর গল্প

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস, এফ্-আর-ই-এস্

পুণ্যশ্লোক ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের মুখে ভূদেববাবুর অনেক গল্প শুনিয়াছি। এগুলি বোধ হয়, সমস্তই মুকুন্দবাবুর ভূদেব-চরিত বা তদ্বিরচিত অন্যান্য গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে; তথাপি মহাত্মগণের পুণ্য-কাহিনী চিরদিন আমাদের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ এই মনে করিয়া কতকগুলি এইস্থানে সংগৃহীত হইল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই

শৈশবে জননীর নিকট সৎশিক্ষা লাভ

শৈশবে ভূদেব তাঁহার মহীয়সী জননীর নিকট সৎশিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার চরিত্র গঠনের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, শৈশবে কোন নীচজাতীয় ক্রীড়া-সঙ্গীর অনুকরণে তিনি জননীকে আদর করিয়া একবার নীচজনোচিত ইতর ভাষায় সম্বোধন করেন। তাঁহার নীচজাতীয় ক্রীড়া-সহচরের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল জননীর আদর, ভূদেবের অদৃষ্টে জুটিয়াছিল ভৎর্সনা ও প্রহার। সেই অবধি তিনি বুঝিয়াছিলেন, উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করা দোষাবহ।

রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

আর একবার শৈশবে তিনি শিশুসুলভ চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পিতৃদেবের পাদুকা পায়ে দিয়াছিলেন। ভূদেব-জননী স্বামীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং

পাছে শিশুর অজ্ঞাত অপরাধে তাহার অকল্যাণ হয়, সেইজন্য সেই পাদুকা পুত্রের মস্তকে বহন করাইয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

ছাত্র-জীবনে মহানুভাবতা

কোনও বিদ্যালয়ে পাঠকালে ভূদেববাবুর সহপাঠী ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ খুল্লতাতের এক শ্যালক। ইহার নাম ছিল ছিরু। ইনি ভূদেববাবুদের বাসাতেই থাকিতেন এবং পাঠে অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন। পুরস্কার বিতরণের সময় ভূদেব প্রথম পুরস্কার পাইলেন এবং ছিরু কিছুই পাইলেন না। গৃহে প্রত্যাগমনকালে ছিরু ভূদেবকে বলিলেন, "তুমি পিতার একমাত্র সন্তান, তুমি পুরস্কার না পাইলে কেহ কিছু বলিবে না, কিন্তু আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি, আমি পড়াশুনায় অমনোযোগী জানিতে পারিলে আমাকে তোমাদের বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবে। ইহার এক উপায় আছে, তোমার পুরস্কারের বইগুলি আমাকে দাও, যেন আমিই পাইয়াছি।" বইগুলিতে ভূদেবের নাম লিখা ছিল, তিনি বুঝিতে পারিলেন না কি বলিয়া উহা ছিরুর পুরস্কাররূপে প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু কোমল-হৃদয় বালক ভূদেব তাহার কাতর প্রার্থনায় দ্রবীভূত হইয়া বইগুলি তাঁহাকে দিলেন এবং সমস্ত ব্যাপার গোপন রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। ছিরু পুরস্কার গ্রন্থগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় আঁটা ভূদেবের নাম লিখা লেবেলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিজের নাম লিখা লেবেল সংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং বাটীতে আসিয়া সকলকে সগর্ব্বে তাঁহার পুরস্কার দেখাইলেন। ভূদেব কিছুই পুরস্কার পান নাই বলিয়া ভর্ৎসনা ভোগ করিলেন। কিছুদিন পরে ভূদেবের এক খুল্লতাতের নিকট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ভূদেবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিলে, খুল্লতাত মহাশয় বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ছিরুর কথা বলিতেছেন, সেই ত প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে, ভূদেব ত কোন পারিতোষিক পায়নাই।"

প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "সে কি মহাশয়, ছিরু ত অমনোযোগিতার জন্য প্রসিদ্ধ, সে আবার পুরস্কার পাইবে কি, ভূদেবই পুরস্কার পাইয়াছে।"

অতঃপর সমস্ত ঘটনাই প্রকাশ পাইল, এবং ভূদেবের পিতা পুত্রের কৃতিত্বের জন্য যত না হউক, তাঁহার মহানুভাবতার পরিচয়পাইয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।

পিতৃভক্তি

হিন্দু কলেজে পঠদ্দশায় শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় একদিন ভূগোল পড়াইতেছিলেন। পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি এক তরল মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠেন, "পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।"

রামচন্দ্র মিত্র

পিতার পাণ্ডিত্যের প্রতি বালক ভূদেবের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্কুল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ছুটিয়া তাঁহার পিতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?"

তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।"

এই বলিয়া তিনি গোলাধ্যায় পুঁথির নিম্নলিখিত বচনটি দেখাইয়া দিলেন—

"করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।"

ভূদেব সংস্কৃত বচনটি টুকিয়া লইলেন এবং পরদিন সগর্ব্বে রামচন্দ্রবাবুকে উহা দেখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার পিতৃদেব জানিতেন যে, পৃথিবী গোল, এবং তিনি পুথি

হইতে শ্লোকটি দেখাইয়াছেন। তখন রামচন্দ্র স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা' তোমার বাবা বলিবেন বই কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

ব্রাহ্মণোচিত তেজ

হরিতকী বাগানে বাস করিবার সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার খুল্লতাতের প্রতিনিধিরূপে ভূদেবকে যজমানের বাড়ীতে পূজাদি করিতে হইত। একবার এক যজমানের বাটীতে ঘটোৎসর্গ করাইতে গেলে যজমান তাঁহার মন্ত্র শুনিয়া বলিল, "মন্ত্র ঠিক হইতেছে না।"

তিনি দ্বিতীয়বার মন্ত্র পড়াইতে সেবারেও যজমান ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল। ইহাতে ভূদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। আসিবার সময় বলিয়া আসিলেন যে, "মন্ত্র ঠিক হইতেছে বা না হইতেছে, তজ্জন্য আমি দায়ী; তোমার ভক্তি বিশ্বাস থাকিলে ভুল মন্ত্রেও ঈপ্সিত ফললাভ হইত।"

ভূদেব চলিয়া আসিলে যজমান তাঁহার উচিত বাক্যগুলি ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন ভূদেবের কথাই ঠিক। তখন তিনি স্বীয় জননীকে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা ভূদেবকে বশীভূত করিয়া পুনরায় নিজ বাটীতে আনাইয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

অসীম বিদ্যানুরাগ

বাল্যকালে ভূদেব 'পুস্তকের কীট' ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সহপাঠী গৌরদাস বসাক লিখিয়াছেন যে, হিন্দু কলেজে টিফিনের ছুটীর সময় কেহ কেহ গল্প-গুজব করিত, কেহ বা অথাদ্যাদি ভোজন করিত। ভূদেব এই অবসরকালে আহারও করিতেন না, গল্প-গুজব বা বিশ্রামও করিতেন না, তিনি ক্লাসে বসিয়াই গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন।

একবার ভূদেবের একখানি ইংরাজী অভিধানের প্রয়োজন হয়। তিনি ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণা হইতে সঞ্চিত সামান্য অর্থ লইয়া চীনাবাজারে একটি পুস্তকের দোকানে উক্ত গ্রন্থখানি ক্রয় করিতে যান। কিন্তু বইখানির মূল্য অনেক বেশী বলিয়া কিনিতে পারিলেন না। নানা দোকানে ঘুরিয়া পুনরায় সেই পুস্তকের দোকানে আসিলেন। পুস্তক-বিক্রেতা তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া এবং তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া বলিল, "তোমার পড়াশুনায় খুব আগ্রহ দেখিতেছি। তোমাকে বইখানি বিনামূল্যে দান করিতেছি।"

গৌরদাস বসাক

ভূদেব বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি তাঁহার সঞ্চিত মুদ্রা কয়টি প্রদান করিয়া বলিলেন, "অবশিষ্ট টাকাটাই আপনার দান বলিয়া গ্রহণ করিলাম। যেটুকু ব্যয় করিবার আমার ক্ষমতা আছে, সেটুকু আমি গ্রহণ করিব না।"

পুস্তক-বিক্রেতা ভূদেবের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "তোমার পাঠে যেরূপ অনুরাগ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় তুমি পুস্তকের খুব যত্ন লইবে। আমার দোকানে অনেক পুরাতন পুস্তক বিক্রয় হয়, সেগুলি নষ্ট না করিয়া ফেরৎ দিলে তোমাকে পড়িতে দিতে পারি।"

অতঃপর ভূদেব এই সদাশয় পুস্তক-বিক্রেতার নিকট হইতে পুরাতন পুস্তক আনিয়া পাঠ করত আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ই অপব্যয়

ভূদেববাবুর এক পুত্র যখন হাবড়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, তখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভূদেব বাবুর সহপাঠী গৌরদাস বসাক মহাশয়গণও তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একদিন কাছারী বন্ধ হইবার পর বঙ্কিমবাবু ও গৌরদাসবাবু এক একখানি গাড়ী ডাকাইয়া বাড়ী গেলেন দেখিয়া ভূদেববাবুর পুত্রও কলিকাতায় কোন কার্য্যের জন্য গাড়ী ডাকাইয়া গেলেন। মাসের শেষে ভূদেববাবু তাঁহার পুত্রদের খরচের খাতা দেখিয়া এই অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। পুত্র বলিলেন, "অন্যদিন পদব্রজে হাবড়ার পুল পার হইয়া ট্রামে কলিকাতায় কাজে যাই, কিন্তু সেদিন দুইজন সহকর্ম্মী গাড়ী ডাকাইলেন দেখিয়া তাঁহাদের সমক্ষে গাড়ী ডাকাইয়া ফেলিয়াছিলাম।" ভূদেব তখন আর কিছুই বলিলেন না। পরবর্ত্তী ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভূদেব তাঁহার পুত্রকে জানাইলেন যে, সেদিন তিনি সেই পরিণত বয়সে হাবড়ার পুল পদব্রজে পার হইয়া ট্রামে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মাত্রই অপব্যয়। এইরূপ মিতব্যয়িতার ফলেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ভূদেব মৃত্যুকালে প্রধানতঃ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দেড় লক্ষের অধিক টাকা দান করিয়া 'বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ডে'র সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর প্রতি শ্রদ্ধা

একবার হিন্দুকলেজের ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে একটী প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হয়। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিখ্যাত নেতা রামগোপাল ঘোষ মহাশয় পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন্। ভূদেবের সহপাঠী কবিবর মধুসূদন দত্ত ঐ পরীক্ষা দিতে প্রথমে অসম্মত হন। তিনি বলেন, "বাঙ্গালীর দত্ত পুরস্কারের জন্য আবার পরীক্ষা দিব কি?" ভূদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মধু ও কথা ঠিক নয়, বাঙ্গালীর পুরস্কার বলিয়াই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।" মধুসূদন ভূদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভূদেবের অনুরোধানুসারে পরীক্ষা দেন।
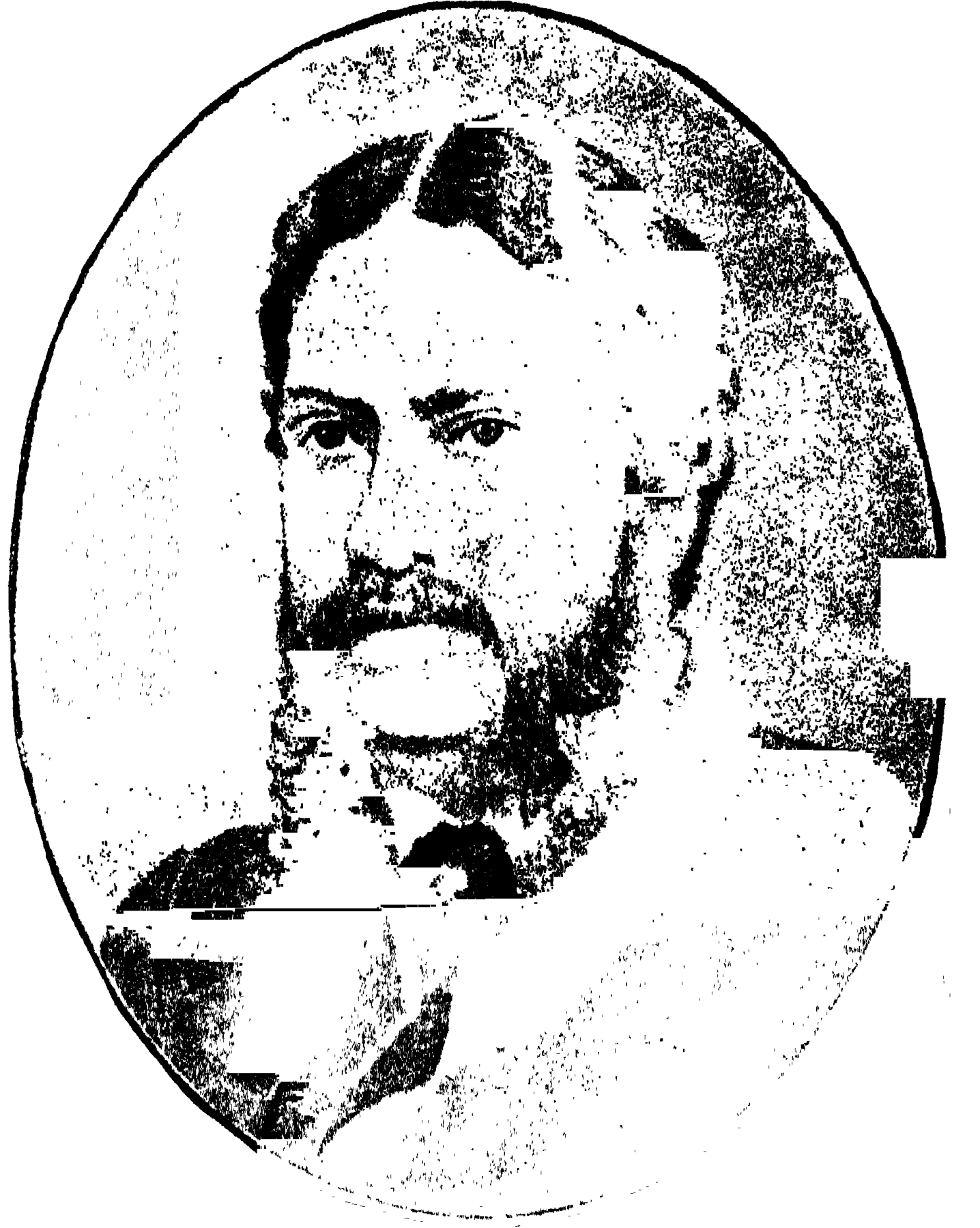
মাইকেল মধুসূদন

পরীক্ষায় মধুসূদন প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্য পদক লাভ করেন।

জীবনের লক্ষ্য

বাল্যকালে একবার ভূদেব, মধুসূদন ও আবদুল লতিফ এই তিন বন্ধুর মধ্যে ভবিষ্যতে তাঁহারা কে কি হইতে চাহেন তদ্বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। মধুসূদন বলেন যে, তিনি

দেশবিখ্যাত কবি হইতে চাহেন। বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও চতুর্দ্দশ পদাবলীর প্রবর্ত্তক মধুসূদনের এই আকাঙ্ক্ষা বিফল হয় নাই! আবদুল লতিফ বলিয়াছিলেন, তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইতে চাহেন। নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, সি-আই-ই তাঁহার সময়ে রাজকার্য্যে

নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, সি-আই-ই

অতুলনীয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ভূদেব বলিয়াছিলেন যেন তিনি অণুমাত্রও দেশের কোন কাজে লাগিতে পারেন। বিশ্বনাথ ফণ্ডের স্থাপয়িতা, চিন্তাশীল লেখক, ঋষিকল্প জ্ঞানী ও পূত-চরিত্র সাধু ভূদেবের আকাঙ্ক্ষাও যে সফল হইয়াছিল তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

অতিথি দেবতা

ভূদেব অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র-গণকেও শৈশবাবধি আচারনিষ্ঠ করিয়াছিলেন। একদিন ভূদেবের প্রতিবাসী একজন মুসলমান ভদ্রলোক গড়গড়ায় তামাক খাইতে খাইতে ভূদেববাবুর সহিত কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন। গৃহমধ্যে টেবিলের উপর গড়গড়াটি রাখিয়া মৌলবী-সাহেব প্রথমে গৃহমধ্যে এবং পরে বারান্দায় বাহির হইয়া কথাবার্ত্তা কহেন। বাটী ফিরি-বার সময় তিনি গৃহমধ্য হইতে গড়-গড়াটি আনিবার উপক্রম করিলে ভূদেব তাঁহার পুত্রকে গড়গড়াটি আনিয়া দিতে বলিলেন। মুসলমানের উচ্ছিষ্ট গড়গড়াটি কিরূপে স্পর্শ করিবেন পুত্র এইরূপ ভাবিতেছেন দেখিয়া ভূদেব পুনরায় পুত্রের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া গড়গড়াটী আনিতে আদেশ দিলেন। পুত্র গড়গড়া আনিয়া দিলে মৌলবী-সাহেব প্রস্থান করিলেন। তখন ভূদেব তাহার পুত্রকে বলিলেন, "অতিথির জাতি বর্ণ ধর্ম্ম বিচার করিতে নাই। স্বয়ং হিরণ্য-গর্ভ বা ব্রহ্মা আসিয়াছেন গৃহীকে এইরূপ মনে করিয়া অতিথি সৎকার করিতে হয়। অতিথি সৎকারে ত্রুটি হইলে আর হিন্দুয়ানী রহিল না। মুসলমান স্পৃষ্ট গড়গড়া স্পর্শ করায় তোমার দোষ হয় নাই, না করিলে তোমার পাপ হইত। তোমার শরীর অপবিত্র হইয়াছে আজ যদি এইরূপ মনে হয়, গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে পার।"

কলীন্ মুর

রমা দেবী

ডিরেক্টর বলে দিলেন,—"তোমার যুগ কেটে গেছে; এখন আর তোমাকে নিয়ে ছবি তোলা হবে না।"

সেকালে ছিল কলীন্ মুর্ সব চেয়ে নাম করা অভিনেত্রী। তার সাপ্তাহিক বেতন ছিল বার হাজার পাঁচশ' ডলার। তারপর আর তা'কে কেউ এত দিতে চায় নি। কলীনের নাম শুনে ফিল্ম কোম্পানী মুখ ফিরিয়েছিল অশ্রদ্ধায়। কিন্তু যেখানে তাকে একদিন বিমুখ হয়ে ফিরতে হয়েছিল, সেখানেই আবার সে বিজয় গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হলিউডের ডিরেক্টরের ভবিষ্যৎ বাণী অসত্য হয় নি—কারণ, নিউইয়র্কে যখন সে প্রথম ষ্টেজে নামল, তখন সে সাফল্য লাভ করতে পারলে না। তারপর সে ফিরে এল আবার হলিউডেই। যে দর্শকবৃন্দ একদিন তার অভিনয় দেখে বিদ্রূপ করেছিল—হলিউডের 'এল্ ক্যাপিটাল্' থিয়েটারে 'চার্চ্চ মাউস' বই-এ প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে সেই দর্শকবৃন্দকেই সে চমৎকৃত করলে। তার অসাধারণ সাফল্য সারা হলিউডে চাঞ্চল্য এনে দিলে।

যে সময় কলীনের অভিনয় প্রশংসার চরমে পৌছল, সেই সময় হলিউডের তিনজন ফিল্ম প্রোডিউসার গোপনে তার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করবে বলে তার ড্রেসিং রুমে আসছিল। কিন্তু ড্রেসিং রুমের দরজার কাছেই তিনজনের পরস্পর দেখা হয়ে যায়, আর তাতেই তারা খুব অস্বস্তি বোধ করে। তাদের তিনজনের মনোভাব জেনে কলীন নিশ্চয়ই হেসেছিল এই ভেবে যে, দু'বছর আগে যারা তাকে বলেছিল, "তোমার অভিনয় করার যুগ কেটে গেছে; তোমার অভিনয় সেকেলে ধরণের—তা' এ যুগে আর চলবে না," আজ তারাই এসেছে তাদের বিভিন্ন কোম্পানীর সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করবার জন্যে।

কলীনের মর্ম্মস্পর্শী আনন্দভরা অভিনয় দেখবার পর তার প্রথম স্বামী জন্ ম্যাক্ করমিক্ একটা প্রকাশ্য চিঠি লেখেন, "আমি জানতুম যে, কলীনের মধ্যে মেধা আছে, কিন্তু সে যে একজন এতবড় অভিনেত্রী তা' তার অভিনয় দেখবার আগে ভাবতে পারি নি।"

সমস্ত হলিউডের লোকজন ম্যাক্ করমিকের সঙ্গে একমত হ'ল। তারা সকলে সবিস্ময়ে দেখলে যে, প্রশংসার একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিয়ে, অন্য এক কলীন মুর তাদের সামনে। কৃতকার্য্যতার প্রভাবে তার সারা দেহ উদ্ভাসিত।

দু' বছর আগে যে 'ফুট লাইট এণ্ড ফুল্স্'-এ নেমেছিল। 'বেল্ আয়ার' তার সখের বাড়ী। তার আর তার স্বামী জন ম্যাক্ করমিকের তৈরী প্ল্যান—কিন্তু এত সখের বাড়ীতে কলীনের দিন এতকাল চোখের জলে আর দুঃসহ ব্যথায় কেটেছিল। সুবিস্তৃত লনের উপর এখন দেখা যায় টেনিস কোর্ট, আর সেই কোর্টে পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে খেলছে কলীনের দ্বিতীয় স্বামী এ্যাল স্কট্ আর ডিরেক্টর মার্ভিন্ লি রয়। বাগানের অন্যদিকে লম্বা লম্বা গাছের নীচে পুকুরের নীলজল টলটল করছে। আশপাশের ঝোপ থেকে দু'-চারটে পাতা পড়ছে, আর তার চাপে নীলজল আকাশের কোলে কেঁপে উঠছে থর-থর করে। আর তারই ধারে আনন্দের প্রতিমূর্ত্তির মত বসে থাকতে দেখা যায় কলীন্ মুরকে।

কলীন্ তার এক বন্ধুর কাছে বলেছে, "আমি আর জন্ এই বাড়ীতে একদিনের জন্যেও একসঙ্গে থাকি নি। এখন আমি এ কথা বলতে পারি, কিন্তু তখন কয়েকটী লোক ছাড়া আর কেউই এ বিষয় কিছু জানত না। বাড়ীটা শেষ হবার আগেই আমি জন্‌কে ছেড়ে মা বাবার কাছে চলে এসেছিলুম।

"জন্ একাই সেই বাড়ীতে থাকত। কোন অতিথির সমাগম হলে, আমি সেখানে যেতুম, আর তাদের পরিচর্য্যা করতুম। তারা সব চলে যাবার পরই আমি আবার আমার মায়ের কাছে ফিরে আসতুম। হলিউড্ থেকেই আমরা এমনি করে আসছি। এই ভাবেই ঐ বাড়ীতে আমরা দু'জনেই খুব অশান্তিতে বাস করতুম।

আমাদের সাত বৎসর বিয়ে হ'ল। জন্ আমার জন্যে যা' করেছে তা' সবই আমি জানি। সে যখন আমায় নিয়ে এল, তখন আমি অনভিজ্ঞ সরলা বালিকা মাত্র। তখন আমি সবেমাত্র অভিনয় করতে নেমেছি। জনই আমাকে পরিচালনা করে, আমাকে ভাল ভাল 'পশ্চার' শিখিয়ে করলে ফিল্ম ষ্টার; কিন্তু নারী-হিসাবে সে যে আমাকে চাইত তা' নয়; সে ভালবাসে মনে প্রাণে সেই কলীন্‌কে, যে ফিল্ম ষ্টার। আমার সঙ্গে সে ফিল্ম-সম্বন্ধীয় কথাই বেশী বলত। খেলাধুলার ধার ধারত না। আমরা দু'জন অনেকদিন থেকেই ঠিক্ করেছিলুম, ইউরোপে বেড়াতে যাব। যখন ইউরোপে গিয়ে পৌঁছলুম, সে এমন ভাব দেখাতে লাগল যে, সে যেন একলা এসেছে বেড়াতে। আমি যে তার সঙ্গে এসেছি, আমি যে তার স্ত্রী এ সে যেন মোটেই মনে করে না। আমি একজন ফিল্ম ষ্টার, এই জন্যেই সে আমার সঙ্গে কথা কয়। তারপর আমার ফার্ষ্ট ন্যাশানাল্'-এর সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যায়, আর সঙ্গে জনের যাওয়া-আসা বন্ধ হয়। তারপর তার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করতে আমি বাধ্য হই।

"বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার পর জগৎ আমার কাছে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি তখন আমার বন্ধু ভারজিনিয়া ভ্যালির সঙ্গে নিউইয়র্কে চলে গেলুম—আর সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে লাগ্‌লুম। অনেক লোকের সঙ্গে মিশতে লাগ্‌লুম। যখন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ষ্টেজে নেমে আমি প্রশংসা পেলুম, তখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারলুম।

"অসুখকর অতীতকে যে স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলে, সে-ই জীবনকে নূতন করে পায়, সে-ই জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে, তা' হ'লেই তার প্রতিটী দিন কাটে সুখের মধ্য দিয়ে।

"তারপর আমি এ্যাল্ স্কটের সংস্পর্শে এলুম। সে একজন নিউইয়র্কের যুবক দালাল। হলিউডে এসেছিল চার্লস্ ফ্যারেলের সঙ্গে দেখা করতে। এ্যাল্ স্কট আমায় শিখিয়েছিল, কি করে' খেল্‌তে হয়, কি করে' হাস্‌তে হয়, কি করে' দিনটীকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হয়। সে আমায় বলেছিল, যে পৃথিবীতে কিছুই সত্য নয়, কিছুই সুখকর নয়—শুধু 'পুরুষ আর নারী'—এই হচ্ছে সত্য আর এই হচ্ছে সুখকর। যে জীবনের উপর একদিন বিতৃষ্ণা এসেছিল, যে জীবনকে একদিন অসুখকর, অপ্রয়োজনীয় বলে' মনে করেছিলুম, যে জীবনের কাজকে একদিন শীঘ্র থামিয়ে দিতে চেয়েছিলুম, এ্যাল্ স্কটের সান্নিধ্যে সেই জীবনেই এক অভূতপূর্ব্ব মুক্তির আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেললুম—নূতন চোখে দেখ্‌তে শিখ্‌লুম পৃথিবী কি বিরাট, কি সুন্দর!

"আমাদের ভালবাসা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় নি। আমাদের ভালবাসা এসেছিল বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসের মত ধীরে ধীরে। আমরা ছিলুম প্রথমে সঙ্গী—পরে ক্রমে ক্রমে এই ভালবাসার পথে আমরা দু'জনেই অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লুম। এ্যাল্ বড় সুখী—সে সব সময়ই হাসে। কিছুতেই সে এতটুকু বিরক্ত হয় না বা তাকে কখনও বিমর্ষ দেখা যায় না। বরং আমি যদি কিছুতে বিরক্ত হই, তা' হ'লে সে হেসে উড়িয়ে দেয়। তারপর ফ্লোরিডার ফোর্ট পিয়ার্স নগরে পনের ফেব্রুয়ারী আমাদের বিয়ে হয়।

"বিয়ের কয়েক সপ্তাহ পরেই, আমি হেন্‌রী ডাফির কাছ থেকে 'চার্চ্চ মাউস' প্লেতে নামবার জন্যে একটা চিঠি পাই। সত্যি বলতে কি, আমি এ্যাল্‌কে বিয়ে করার পর কাজের কথা একেবারেই ভুলে গেছলুম। যে কলীন্ কাজ থেকে এক মুহূর্ত্ত ছুটি পেত না, সেই কলীন্ কাজ একেবারে ভুলে গেল। এ্যাল্ চায় যে, আমি সব সময়ই খেলি; আমি কাজ করি, এটা সে মোটেই চায় না; বরং আমি যদি অভিনয় করা বন্ধ করে' দিই তা' হ'লে সে সুখীই হয়। কিন্তু সে জানে যে, চিত্র-জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছে আমার বরাবরই। প্রথম প্রথম আমি অভিনয় করতে গিয়ে অকৃতকার্য্য হয়েছিলুম, কিন্তু পরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমি একজন ভাল অভিনেত্রী হই। আর এখন সব অভিনয়ই আমার ভাল হয়।"

বন্ধু যখন তাকে ছেলেমেয়ের কথা জিজ্ঞেস করে, কলীন্ তখন বলেছিল—"আমি তিনটী ছেলেমেয়ে চাই—আর আশা করি, আমার সব ছেলেমেয়েই এ্যালের মত সব সময় খোস্‌মেজাজেই থাকে।"

কলীন্ ছোটবেলা থেকেই কাজ আরম্ভ করে। তার বিরাট অট্টালিকার সুবিস্তৃত লনের উপর টেনিস কোর্ট, নীল আকাশের তলায় পুকুর—সবই ছিল। কিন্তু সে টেনিস খেলা শেখ্‌বার বা পুকুরে সাঁতার কাটা শেখ্‌বার অবসর পেত না। তার প্রথম স্বামী তাকে কেবল কাজ করতেই শিখিয়েছিল, আর তার দ্বিতীয় স্বামী তাকে এখন কেবল খেলা করতে শিখিয়েছে।

কলীন্ তার বন্ধুকে বলেছে, "এ্যাল্‌ই একমাত্র লোক, যাকে পেয়ে আমি মরুভূমির মাঝে জল পেয়েছি, আর কোন লোক যে আমায় এত সুখী করতে পারে তা' আমার মনে হয় না।"

রমা দেবী
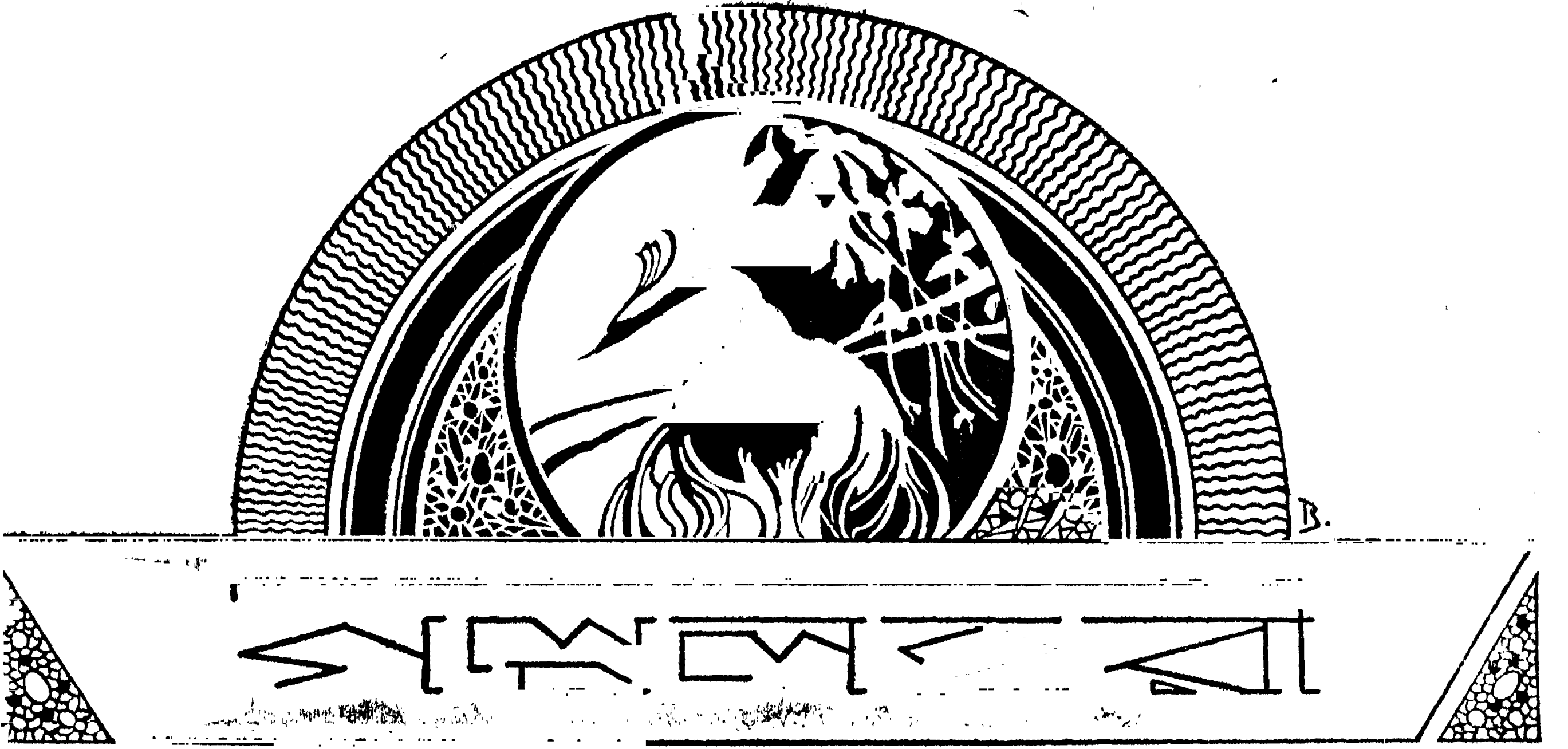
একাদশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ | অষ্টম সংখ্যা

মায়ের প্রাণ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেক দিনই অভাবের তাড়নার মধ্যে সে জাগিয়া উঠে। উঠিয়া শুনে সেই, একই সুরে বাঁধা গান—নাই, নাই। মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও বুকে সে কতখানি মুক্তির আস্বাদের লালসায় পাগল হইয়া উঠে, তা জানেন শুধু তার অন্তর নিবাসী মুক পাষাণ নিষ্ঠুর ভগবান। হায়! সাধনার ফল স্বর্গের আলো ছেলেপুলেগুলিকে নামাইয়া আনিয়া সে যখন পেট পুরিয়া তাদের খাইতে দিতে পারে না, তখন এ বাঁচিয়া থাকা কেন?

কিন্তু সে অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতেও সে পারে না। গৃহিণী শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে, "এত অভাবের সংসারে ছেলে জন্মান কেন, এই উঠেই যে খেতে চাইবে কি দেব তাদের? তাও কি একটা, ভুলিয়ে রাখব—গণ্ডায় গণ্ডায়। মা লক্ষীর কৃপা নেই, যষ্ঠীর খুব আছে...তা তাতে লোকের কি, তারা ত অফিস আদালতে বেরুবে, মর শালী তুই··· সারাদিন কি করে যে কাটে, তা আমিই জানি...বলি ধান কিছু কিনে দাও, তা সে কথা কানে শুনলে যে মহা-পাতক হবে।"

পল্লীগ্রাম। ধান কিছু কিনিয়া দিলে অনায়াসে মুড়ী তৈয়ার হইতে পারে তা সে জানে। সতী মুখে যতই বলুক, গতর খাটাইতে এতটুকু আলস্য সে যে করে না, কথাটাও বড় ঠিক্···কিন্তু দৈনিক সব খরচের হিসাব মিলাইতে গিয়াই না সে ফাঁপরে পড়ে,—চাল নাই, দাল নাই, গরুর খড় নাই, এত নাইএর ভিতর একটার অনাটন মিটাইতে সে ভরসা পায় না, আবার নূতন কিছু হাঙ্গামা জুটাইয়া কাজ কি? আয় ত তার বাঁধা ধরা কিছু নয়, পল্লীগ্রামের রেজেষ্টারী অফিসের মুহুরী, মক্কেল

জুটাইতে পারে, তবেই দু পয়সা। নহিলে ..সে নহিলে কথাটা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে !

সেদিন দিনের কাজ সারিয়া আসিয়া সে বলিল, "শুনছ গা! আজ বেমক্কা গোটা পঁচিশ টাকা পাওয়া গেছে, কি করা যায় বল ত? কাহন কত খড় কিনে চণ্ডীমণ্ডপটা ছাওয়াই, না নবনে যা বলছিল তাই শুনি। ভেবে কূল-কিনারা কিছু পাচ্ছি না, তাই তোমার কাছে যুক্তি নিতে এলুম।"

সতীর সদা পরুষ মুখখানা হঠাৎ তৃপ্তির আনন্দে কোমল হইয়া আসিল। ধীরভাবে স্বামীর কথাগুলা শুনিয়া সে বলিল, "নবনে কি বলে ?"

শীতল চক্রবর্ত্তী আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিল ; কেন না, ভাবিবার অংশী একজন সে আজ পাইয়াছে। দারিদ্র্যের রুদ্র তাড়নে সতীর দৈনিক মেজাজটাকে এতটাই রুক্ষতায় ভরাইয়া রাখে যে, নিজের স্নেহ-ভালবাসার পাওনাটা কোন দিনই সে সেথায় আশা করিতে পারে না; তা বলিয়া দোষও সে দেয় না—দিনের সকল দিকের ছেঁড়া সুতায় জোড়াতাড়া দিয়া যাহাকে চলিতে হয়, তার পক্ষে এ ভাব কত বড় যে স্বাভাবিক সে তা জানে ; আর জানে বলিয়াই তার দেওয়া সকল পরুষ কঠোর ভাষাগুলো নির্ব্বিবাদে সে হজম করিয়া যায়। কোনদিন, কোন ছলে প্রতিবাদ সে তুলে না। আজ সেই পত্নীর মুখে শান্তি কোমল ভাব দেখিয়া আনন্দ উৎসাহে প্রাণ তার ভরিয়া উঠিল···

ধীরকণ্ঠে সে বলিল, "নবনে বল্লে, চক্রবর্ত্তী-মশাই, রায়েরা পুকুরটা জমা দিতে চায়, তুমি নাও, বকরায় তোমার আমার করা যাবে। জমির খাজনা জমিই দেবে চক্রবর্ত্তী-মশাই, সে জন্যে ভেব না, অভাবের সংসারে ছেলেপুলে-গুলো ভাতের পাতে মাছ খেতে পাবে সেইটেই কি বড় লাভ নয় ?"

চিন্তিত ভাবে সতী জিজ্ঞাসা করিল, "জমা কত ?"

"তা বড় বেশী নয়, আমি যদি নিই ত বছরে গোটা ষাটেক টাকায় ওরা ছেড়ে দিতে পারেন..."

খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া সতী বলিল, "যে চাপ তোমার মাথায় ভগবান চাপিয়েছেন, তারি জ্বালায় পাগল, কাজ নেই সাধ করে আর ভাগ জুটিয়ে···"

"তা হ'লে...অমলীর সে চুড়ী ক'গাছা কি আছে...এই সুযোগে পার ত কিনে নাও, একসঙ্গে একদিনে এতগুলো টাকা যে কখন হাতে আসবে, আমার পক্ষে তা স্বপ্ন। আজ সে স্বপ্ন সত্য হয়েছে, বাকী ওটুকুও..."

"না, শীত আসছে ছেলেপুলেগুলোর দোলাই এক-আধ-খানা করে কিনে দাও, আহা বাছারা ছেঁড়া কাপড় গায়ে বেঁধে বেঁধে ক'বছর বেড়িয়েছে..."

"আমি বলি তা নয়, ক'বছর যা চলে এসেছে, আজও তাই চল্‌তে পারে, আমার ঘরে এসে গায়ে ত কোনদিনই কিছু উঠলো না...না না, আপত্তি করো না, অমলীকে ডাকাই..."

"গায়ে গয়না পরবার বয়েস আর আমার নেই। সাত ছেলের মা, লজ্জা তোমার কিছু না থাক্‌তে পারে, আমার আছে—বেঁচে থাক ওরা সাত ভায়ে! সাত দিক থেকে যখন আসবে, তখন···"

"অত আশা করো না গিন্নী, মনে রেখ আজকালকার ছেলে ওরা..."

"যাও, আমার ছেলেপুলের নিন্দে আমার সামনে তুমি করো না—তোমার মুখ থেকে এলেও আমি তা সইব না!"

দুই

"দেখ, দেখ মা, কতগুলো মাছ ধরে এনেছি, তবু বাবা তার ভাল ছিপটায় আমায় হাত দিতে দেবে না..."

মাছ দেখিয়া অন্তরে আনন্দ হইলেও সতী তা মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না, একটু রুক্ষস্বরে বলিল, "কার পুকুরে মরতে গিয়েছিলি হতভাগা, এমনি গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে··· ?"

"ইস্, দিলেই হ'ল কি না! গাল রাস্তায় পড়ে রয়েছে, মুখ নেই আমি দিতে পারব না ?"

মায়ের মুখে প্রসন্ন একটু হাসির রেখা ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল। গম্ভীর মুখে সে বলিল, "বড় মন্দ

যুক্তি নয়, লোকের পুকুর ওজাড় করতেও করবি, গাল খেতে তারাই খাবে !"

নন্দলাল বিকৃত মুখে বলিল, "তা খাবে বই কি। জটের খাল থেকে ধরে আনলেও মাছগুলো যদি তাদের পুকুরের হয়,—খাবে না ?"

আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়া মাতা কহিল, "জটের খাল ? বলিস কিরে হতভাগা, একা সেই ততদূরে গেছলি !..."

"খাব না ! তোমার থোড়, ডুমুর, কলমী শাক রোজ মুখে রুচবেই এমন ত কোন কথা নেই !..."

সতী আর কিছু বলিল না, আঁস বঁটি লইয়া উঠানের ছাই গাদার নিকটে গিয়া মাছ কুটিতে বসিল। দাওয়ার এক পাশে বসিয়া তার হাতের কাজে দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে নন্দলাল বলিয়া উঠিল, "খাব ত মাত্র দু বেলা, অত কুচুচ্ছ কেন ?"

মা হাসিয়া বলিল, "বেলা দুটো হতে পারে, কিন্তু মুখ ত আর একটা নয়, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সবাই ত খাবে ?"

"কেন, কেন, খাবে কেন ? ধরতে যেতে পারে না ! না না, আমি ধরে এনেছি, আমি একা খাব, কারুকে ভাগ দিতে পারব না।"

ভৎসনা মাখা কণ্ঠে মা বলিল, "ছি বাবা, দেব না কি বল্‌তে আছে, তুমি বড়, সব বিষয়ে বড় হতে হবে। তোমারি ত সব কচি কচি ভাই..."

নন্দলাল বারবার মাথা চালিয়া বলিতে লাগিল, "না না, হোক্ কচি কচি ভাই, জন্মে পর্য্যন্ত আমি কেবল ভাগ দিয়েই আসছি, কেন না আমি নিরেট বোকা। না, এবার থেকে আর বোকা থাকব না, যেখান থেকে পারে ওরা নিয়ে আসুক। এবার থেকে পুরোপুরি আমি ভোগ-দখল করব, ও ভাগাভাগিতে আর আমি নেই।"

মাতার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই সে না পুত্রগর্ব্বে প্রতিবেশিনীকে বলিয়া আসিয়াছিল, "আমার সাত ছেলে, ভাবনা কি ? সাতজনে সাত মুটো আন্‌বে, ভাগাভাগি করে খাবে। ওরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে এ দৈন্য দুর্দ্দশা আর আমাদের থাকবে না।"

কিয়ৎকাল পরে স্মিত হাস্যে মাতা কহিল, "আচ্ছা, ভায়েদের না দিস্ তোর, ওকে ত দিবি..."

দাঁতমুখ খিঁচাইয়া পুত্র উত্তর দিল, "কেন, কেন দেব কেন, আমায় ছিপে হাত দিতে দেয়..."

"বেশ, তাকে না দিস্, আমি মা হই, এত কষ্ট কচ্ছি আমায় ত দিবি ?"

এবার আর প্রতিবাদ তুলিতে না পারিয়া পুত্র নন্দলাল খানিক 'গুম' হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর নিজ হাতে কতকগুলো মাছ আলাদা করিয়া দিতে দিতে সে গাঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই নাও। এই, এই, আমার সামনে বসে খেতে হবে কিন্তু ; বকুরা নিয়ে ছেলেপুলেকে খাওয়াবে, তা হতে দিচ্ছি না।"

পুত্র গৌরবে মাতার অন্তর আবার স্ফীত হইয়া উঠিল। আঁস হাতের কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়া নিজ বাহু বেষ্টনীর ভিতর সে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিল।

তিন

বৎসর কয়েক পরের কথা। নন্দলাল বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া জিনিষগুলা দাওয়ার উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—"অবাক কল্লে মা, দু বেলায় দেড়পো দাল উঠিয়ে দিলে ! এমন বেমক্কা খরচ যদি কর, তোমার সংসার চালাতে আমি পারব না।"

কাচুমাচু মুখে সতী বলিল—"কি করব বাবা, আর ত তরকারী কিছু নেই, কাজেই দালটা একটু বেশী ওঠে..."

"ওঠে উর্ঠুক্, তোমরা চালাও, আমায় কিছু বল্‌না, তোমার কুপুষ্যিদের পেট চালাতে আমি পারব না।"

মা কথা কহিল না, নীরব ধৈর্য্যের আশ্রয়ে পুত্রের এতবড় অনুযোগের ধাক্কাটা সে সহ্য করিল। মাস-কতক হইল নন্দলাল পিতার সহিত মুহুরীগিরির কাজে বাহির হইতেছে। রেজিষ্ট্রার দীননাথবাবু এ স্বল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ মুহুরীর দিকে একটু স্নেহের টান দেখানয় পিতার

অপেক্ষা আয়টা তার দ্বিগুণ। অনেক আবেদন নিবেদনের ফলে আজ তিনদিন হইল সংসারের তরিতরকারীগুলোর ভার সে নিজের স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দলাল হঠাৎ কোপপূর্ণ মনে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, হঠাৎ বাবুরা এমন নবাব হলেন কোত্থেকে তা বল ত? এতদিন ত লঙ্কা-গোলার জলে চলত, আমিও ত তোমাদের তাই খেয়েই এত বড়টা হয়েছি—আজকাল তা আর রোচে না কেন?"

সহসা উত্তেজিত হইয়া মাতা বলিয়া উঠিল, "কেন, কেন, রুচবে কেন তাই বল, তোরা দুই বাপ বেটায় রোজগার করছিস না, চিরকাল আমি সেই লঙ্কা গোলা তেঁতুল গোলা ভাত খেতে যাব কেন?"

পুত্র দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "যেমন ভাগ্যি নিয়ে এসেছ! তার বেশী চাও—পাবে কোথায়? ......আমার রোজগারের কথা বলছ, দুদিন পরে আমার নিজের সংসার ত বাড়বে, তখন তোমাদের মুখ চেয়ে থাকতে গেলে ত চলবে না, কাজেই বলা। অত হাত বাড়িও না রাশ টান...নইলে আমার আর কি, পরে নিজেদেরই পস্তাতে হবে!"

হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে আসিতে শীতল চক্রবর্ত্তী বলিল, "সেই ভাল নন্দলাল, এ কুপুষ্যির জন্যে মিছে পয়সা উড়িয়ে কিছু লাভ নেই, তুমি আলাদা হয়ে পড়ো..."

সতী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "কি বলছ তুমি, পাগল হলে!"

শীতল চক্রবর্ত্তী বেশ শান্ত কণ্ঠেই বলিল, "পাগল হই নি গিন্নী, পাছে হতে হয় তার জন্যেই সাবধান হচ্ছি; তবু ওদের দুটো দুটো চারটে মুখ দু বেলায় যদি কমে কতটা হাল্কাই হব।"

"ছিঃ, তুমি কি! ছেলের উপর রাগ..."

বাপ বিষাদভরা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা নয় গিন্নী, শেতল বড় শেতল! তাই ছেলের মুখে এত কথা শুনেও অপর ছেলেগুলোকেও এখন থেকে ঘাড় ধরে না বিদেয় করে দিয়ে তাদের পুষতে চাচ্ছে। ভয় নেই, ও নেমকহারামের দল কেউ তোমার আপনার হবে না। বিদেয় কর গিন্নী, বিদেয় কর। কাল সাপ যখন ফণা তুলেছে, ছোবলাবেই; তার আগে আরও দুধকলা দিয়ে, পাপের হাত থেকে নিস্তার হও।"

"কি বলছ তুমি,—ছেলে পাপ..."

"পাপ বলে পাপ, মহাপাপ...আগের দিনে বল্ ত বটে, ছেলে হয়ে পুন্নাম নরক হতে ত্রাণ করে। আজকালের দিনে কিন্তু তা নয়—উল্টে ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাত শ' নরক হাঁ করে গেলবার জন্যে..."

রাগত কণ্ঠে সতী বলিয়া উঠিল, "ছেলে একটা কি না কি কথা বলেছে ত অমনি গায়ে বিষ ছড়িয়ে গেল! এত হিংসা যদি তোমার, আর পাঁচজনকে নিয়ে আদালতের কাজ চালাও কি করে?..."

শীতল হাসিল। তারপরে বড় শান্ত কণ্ঠে বলিল, "যে অবুঝ, তাকে আর কি বোঝাব গিন্নী! এই বেলা অঙ্কুরে ছাড়তে পারতে, ভালই হ'ত, এরপর অনেক দণ্ডাতে হবে... কিন্তু বৃথা বলা! একটা কথা ও ঠিকই বলেছে, ভাগ্য! কপালের লিখনের জন্যে নারায়ণকে যখন পাথরে লুকিয়েও শনির দাঁত সহ্য করতে হয়েছে, তখন তুমি আমি কোন্ ছার!"

* * *

বড় ছেলে নন্দলাল পিতৃআজ্ঞা পালনে অবহেলা করে নাই। একটা শুভদিন দেখিয়া অন্যত্র বাসা বাধিয়াছে। শোনা যায়, লক্ষ্মীছাড়ার ঘর ছাড়িয়া লক্ষ্মীও না কি তাহার উপর কৃপা করিয়াছেন। পুত্রের এ ব্যবহারে শীতল চক্রবর্ত্তী যত হাসিয়াছে, লক্ষ্মী তত 'গুম' হইয়া গিয়াছে।

চার

আরও কয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দিনটা রবিবার। রেজেষ্টারী অফিস বন্ধ। শীতল চক্রবর্ত্তী উঠানে বসিয়া ছেঁড়া গায়ের কাপড়খানি রিপু করিতেছিল। শীত আসন্ন প্রায়, এখানিকে জোড়া তাড়ায় ব্যবহার যোগ্য না করিয়া লইলেই নয়।

সতী বোধ হয় বাহিরে কি কাজে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শুনছ, সুরো আমাদের ঘোষেদের বড় আম বাগানটা জমা নিয়েছে।"

"তবে আর কি, যেখানে যত নোড়ানুড়ি আছে তার সিন্নি চড়াও। আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি, ও বাগান জমা নেওয়া নয়, তোমার আমার জ্বালানোর সমিধ সংগ্রহ।"

"দেখ, মিছে বকো না। ছেলেপুলের কাজ এত নোঙরামীর চোখে দেখাটা কিন্তু এক চোখোমীর কাজ।"

ঠিক এক সপ্তাহ পরে মেজ ছেলে সুরসুদন নিকটে আসিয়া বলিল, "এটা কিন্তু বড় অন্যায় মা, বাগান নিয়েছি তোমার ছেলেদের হুটোপুটি করবার জন্যে নয়, যাকে তাকে নিয়ে আবাগেরা যাবে..."

"গিন্নী! গিন্নী! ভারত শুনেছ, ওই যে হিন্দু নারীর পরম শিক্ষার বই গো! শুনেছ, না শুনে থাক ভাল করে শুনে নাও, ইহজন্ম ত বটেই, পরজন্মের কিছুকাল পর্য্যন্ত কথাগুলো স্মরণ থাকবে..."

"দেখুন, এই জন্যেই বড় দা আলাদা হয়েছেন। ভাল কথা বলতে এলে আপনি যদি এমনি করেন...নাচার!"

"আলাদা হয়ে পড়ো সুরো, আলাদা হয়ে পড়ো, এমন সুযোগ আর পাবি না রে···গিন্নী গিন্নী, বলেছি ত, সমিধ সংগ্রহ, এ আর কিছু নয় সমিধ সংগ্রহ।"

সুরসুদন কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "না, আপনাদের ব্যবহারটা নেহাৎ ইয়ে···ওর মুখে শুনতে পাই পেট পুরে খেতেই পান না···বড় দা' কতদিন বলেছেন, বেরিয়ে আয়। এতদিন তা পারি নি কর্ত্তব্য ভেবে,—বেশ আপনি নিজেই যখন আজ সে কর্ত্তব্যের বাঁধান ছিঁড়ে দিয়েছেন, আমি করব কি! ভাল কথা, লোকে জিজ্ঞেস করতে এলে এই কথাই বলবেন..."

সদর্পে সুরসুদন সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

হাসিয়া শীতল চক্রবর্ত্তী বলিল, "দেখেছ গিন্নী, একটা একটা করে খসছে! পাখী খুঁটে খেতে শিখেছে আর কেন, এইবেলা মানে মানে বাকীগুলোর মায়া পার যদি কাটিয়ে ফেল! কেউ থাকবে না, বুঝলে, কেউ থাকবে না! উড়তে না পারার ওয়াস্তা, শুধু উড়তে না পারার ওয়াস্তা! ডানায় ভর দিয়ে মুক্ত বাতাসে যেতে আসতে যেদিন পারবে, সেদিন তুমি, তুমি বলে আর পুঁছবে না, তাই বলি সময় থাকতে মায়া ছাড়।···"

সতী বিষাদভরা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা হয় না—আমি যে মা! তোমারি মুখে ত চণ্ডীর ব্যাখ্যায় শুনেছি, মায়া হয়ে মা আমার এমনি মায়ার আসন ছড়িয়ে রেখেছেন, ক্ষিদেয় বুক জলে গেলেও ঠোঁটের আগার দানাটা ঘেটবার উপায় নেই, মুখে নিয়ে কচি বাছার মুখে পৌছে দিতেই হবে...বুঝছ, এ আমাদের কর্ত্তব্য, এই মায়া, আর এ আছে বলেই আমরা মা। তা ছাড়া, ওরা ত অন্যায় কিছু করে নি—ছেলেমানুষ আমাদের বোঝা কাঁধে বইতে যদি নাই পারে, দোষ দেওয়া চলে না ত। আশীর্ব্বাদ কর—ওরা সুখী হোক্। আমার তুমি রইলে ভাবনা কি বল?"

"বুঝেছি, বুঝেছি সতী, এতদিন পরে বুঝেছি তোদের আসন কেন এত উঁচু! কেন শাস্ত্র, ব্যাখ্যার হিসাবে বলে গেছে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী!' শুধু এই জন্যে, শুধু এই জন্যে, পৃথিবীর সৃষ্টির বিশ্বের সব ধ্বংসের মুখে নেমে যেতে পারে—কিন্তু না, মা নয়! যদি কিছু থাকে এই মা থাকবে। "আজ নতুন আলো জ্বালিয়ে দিলে সতী! না, এভাবে এমন করে মা শব্দটার অর্থ কোনদিনই আমি করতে পারি নি, পারতুম না, পারব না। ঠিক্ ঠিক্, মা, মা-ই থাক্‌বে!···"

সতী কোন কথাই বলিতে পারিল না, নীরবে স্বামীর পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দু' দিনের পরিচয়

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য, বি-এ

বালীগঞ্জের মোড়ের কাছে একটা ট্যাক্সী-চালক পাঞ্জাবী মুসলমানের সহিত একজন রমণীর বাক্য-বিনিময় শুনিয়া একটা বড় বাড়ীর গেট খুলিয়া একজন যুবক বাহির হইয়া আসিল। সে সটান গাড়ীর ঠিক্ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া হিন্দীতে বলিল, "এঁদের কোথায় নিয়ে যাবি ?"

গাড়ীর মধ্য হইতে একজন প্রৌঢ়া রমণী বলিলেন, "আমাদের মিছিমিছি অনেক ঘুরিয়েছে বাবা। লোকটাকে ভালো ব'লে মনে হ'চ্চে না।"

যেমন করিয়া ঘোড়ার রাশ ধরিয়া ঘোড়াকে দাঁড় করাইয়া রাখে, তেমনি মোটরখানার হেড্ লাইটের উপর হাতখানা রাখিয়া যুবকটী বলিল, "আপনারা দয়া ক'রে একটু নামুন ত' ?"

গাড়ী হইতে একটী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা প্রৌঢ়া, একটী তের চৌদ্দ বছরের বালিকা এবং তাহারই হাত ধরিয়া একটী ন' দশ বছরের ছেলে নামিয়া ফুটপাথের উপর দাঁড়াইল। যুবকটী কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই প্রৌঢ়া রমণীটি বলিলেন, "আমরা আসছি বাবা, এলাহাবাদ থেকে। বিশেষ এক কাজেই কোলকেতায় এসে পড়েছি। একজন আত্মীয়ের বাড়ী যাবো। আমরা বারমাস এলাহাবাদেই থাকি—সেইখানেই আমাদের ঘর বাড়ী, কোলকেতার পথ ঘাট বাড়ী চিনি নে।"

যুবকটি তখন ট্যাক্সী-চালকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ব্যস্ত ছিল। অনেকক্ষণ বাক্য-বিনিময়ের পর, তাহার ব্যায়ামপুষ্ট ঘুঁসিটা বেশ জোরেই ড্রাইভারটার উপর লাগাইয়া দিল। এমন জোরে লাগাইল যে, অতবড় দীর্ঘ বপুখানি অনায়াসেই রাস্তার উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তারপর অদূরবর্ত্তী একজন পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, বালিকাটীর দুটী সুন্দর আয়ত চক্ষু যেন অজস্র ধারায় তাহার উপর অন্তরের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা বর্ষণ করিতেছে। যুবকটী বলিল, "আপনারা কোথায় যাবেন ? আপনাদের আত্মীয়ের বাড়ী কোথায় ?"

প্রৌঢ়া রমণীটি বলিলেন, "আহিরীটোলায়। কত নম্বর রে শুভা ?"

বালিকাটি তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর করিল, "তা আমি কি জানি ?"

প্রৌঢ়াটি বলিলেন, "এমন বিপদেও মানুষে পড়ে বাবা ! তার ওপর, সঙ্গে একটা পুরুষমানুষও নেই। এলাহাবাদ থেকে কোলকেতা পর্য্যন্ত ট্রেণে আমাদের লোক ছিল। আর হাওড়া ষ্টেশনেও লোক থাকবার কথা ছিল। তাকে আগে খবর দেওয়া হয়েছিল। সেও চিঠিতে জানিয়েছিল যে, হ্যাঁ, সে, এই ট্রেণে হাওড়ায় থাকবে। কেন যে সে আসতে পারে নি তাও বুঝতে পারছি না বাবা, হয় ত' অসুখ বিসুখই বা করলো ? একখানা ট্যাক্সী করলুম। কিশোর বললে, আর শুভাও বললে, 'আহিরীটোলায় গেলেই বাড়ীর পথ চিনে নিতে পারবে।' কিন্তু গেরো ছাখো বাবা ! ট্যাক্সীওয়ালাটা যে আমাদের কোথায় নিয়ে এলো—"

আকস্মিক দুর্বিপাকে অনেকের মুখই অমন খুলিয়া যায়। প্রৌঢ়া রমণীটির বোধ হয় তাহাই হইল। তিনি আরো বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু যুবকটী বাধা দিয়া বলিল, "সে সব কথা পরে শুনবো 'খন্। এতো রাত্রে আজ ত' আর আহিরীটোলায় সেই আত্মীয়ের বাড়ী খোঁজা হ'তে পারে না। আজ আমার বাড়ীতে থাকুন। তারপর কালকে আমি বাড়ী খুঁজে আপনাদের পাঠিয়ে দেবো। আসুন। এই মুটিয়া, ইধার আও।"

জিনিষগুলি মুটের মাথায় দিয়া তাহারা তাহার বাড়ীতে

ঢুকিল। যাইতে যাইতে যুবকটি বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন। ছেলেটী আপনার—"

মুখের কথা না ফুরাইতেই প্রৌঢ়া বলিলেন, "ও আমার বোন্‌পো, আমার ওই শুভা ওর বড় বোন্। তোমার নামটি কি বাবা?"

—"আমার নাম চন্দ্রকান্তি মুখুয্যে।"

বাড়ীর ভিতর দোতলায় তাঁহাদের লইয়া গিয়া চন্দ্র একখানা সুন্দর প্রশস্ত ঘর খুলিয়া দিল। এবং তাহাদের জিনিষপত্তরগুলি ঘরের কোণে গুছাইয়া রাখিল। তারপর তাঁহাদের বিছানা বাঁধা লগেজের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ রাত্রে কিন্তু কোন উপায় দেখছি না—দোকানের খাবারই খেতে হবে।"

সশব্যস্তে প্রৌঢ়াটি বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, আমরা সব খেয়েছি। বর্দ্ধমানে খাবার-দাবার খাওয়া হয়েছে। পেট এখনো দম্‌সম্। আর আমার ত' রাত্রে—বিধবার খাওয়া—"

চন্দ্র পা দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "আপনার না হয় ক্ষিধে নেই, কিন্তু এই ছেলেমানুষকে দোকানের খাবার খেয়ে রাতটা থাক্‌তে হবে। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, না কিশোর?"

বালকটী সত্যই হোক্ আর লজ্জার খাতিরেই হোক্, প্রচণ্ডভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে মাসীমার কথার সমর্থন করে। শুভার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোড়দি'র ক্ষিদে পেয়েছে ঠিক।"

শুভা হাসিয়া ছোট ভাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না না।"

রমণীটি বলিলেন, "তা বাবা, এতবড় বাড়ী তোমাদের খালি দেখছি কেন?"

চন্দ্র বলিল, "আমাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলেই পশ্চিমে গেছে হাওয়া খেতে। শুধু আমি আর আমার এই বোন্ আছি একজামিন ব'লে। সেই জন্যে ত' আরো মুস্কিল—খাওয়া-দাওয়ার ভারী অসুবিধে। একে ত' আমি উড়ে বামুনের হাতের রান্না খেতে পারি না—যার তার হাতের ছাই-পাঁশ রান্না কোনোকালেই খেতে পারি না—তার ওপর আমাদের বামুনের দু' দিন হ'ল জ্বর হয়েছে। এ দু' দিন এক রকম উপোস ক'রেই আছি।"

প্রৌঢ়াটী বলিলেন,"কেন, তোমার বোন্ রেঁধে দিলেই ত' পারে? তুমি দুটো রেঁধে ভাইকে দাও না কেন মা?"

কনক হাসিয়া উঠিল, "দিই ত'—কাল রেঁধে দিই নি দাদা তোমাকে? কি করবো বলুন? দাদার মুখখানি এমন, রান্না একটু যদি কম-বেশী হ'লো ত', ব্যস্। আর মুখে করা চলবে না।"

চন্দ্র বলিল, "সে আড়ম্বর কত, জানেন? পাকশিক্ষা ব'লে একখানা বই কিনে আনালুম। সেইখানা হাতে ক'রে আমার কর্ম্মিষ্ঠা বোন্ ত' রান্না ঘরে ঢকলো। তার পর শুনুন। বইখানা দেখে দেখে ত' রান্না করতে লাগলো। বইয়ে যেমনটি লেখা, ঠিক তেমনটি করে রান্না করা চাই কি না? 'কুড়ি মিনিট নাড়াচাড়া করিতে হইবে', ত' ঘড়ির কাঁটা ধ'রে ঠিক কুড়ি মিনিট খন্তি দিয়ে অনর্গল নাড়া,'আঁধ কাঁচ্চা নুন' ত', নিক্তি দিয়ে ওজন ক'রে নেওয়া ইত্যাদি কোনো ত্রুটিই হ'লো না। অর্দ্ধেক রান্নার পর—আমারও দুর্ভাগ্য, কন্‌কিরও দুর্ভাগ্য—বইয়ের পাতাটা হঠাৎ উল্টে গেলো। মহামুস্কিল! সে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দু'জনে পড়ে পাঁচ-ছ' মিনিট ধ'রে খুঁজে বের করলুম। তারপর কড়ার দিকে চেয়ে কন্‌কিকে ওগুলো উঠোনে রাখ্‌তে বললুম। কেন না, ঝিয়ের ছাইয়ের দরকার হয়। তারপর—"

সকলেই হাসিতেছিল। শুভা একটা অসংবরণীয় হাসির প্রাবল্য রোধ করিতে গিয়া ভয়ানক কাসিতে লাগিল। চন্দ্র বলিল, "সেদিন কিন্তু কন্‌কির ওপর ভারী রাগ হয়েছিল—পোড়ারমুখী এমন অপদার্থ! সত্যি, রান্না একটা শিল্প এ মনে ক'রে প্রত্যেক মেয়েরই জিনিষটা রীতিমত শেখা উচিত—আমি ত' তাই মনে করি। মেয়েমানুষ রাঁধতে জানে না—কথাটা বড্ড মর্ম্মান্তিক! কেমন, নয়, বলুন?"

প্রৌঢ়াটি হাসিয়া বলিলেন, "তা বই কি বাবা।" তারপর শুভার দিকে ফিরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কাল সকালে দুটো রেঁধে খাওয়াস্ ত' শুভা।"

এমনি অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা গল্পগুজব হইল, যা জীবনে প্রথম এবং হয় ত' বা শেষ পরিচয়ে বড় একটা হয় না, এবং হওয়াও হয় ত' বা উচিত নয়। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহারা পথহারা, ওই যুবকটীর অনুকম্পার উপর সকল রকমেই নির্ভরশীল, এবং চন্দ্রও ভুলিয়া গেল, তাঁহারা তাহার একদিনের আশ্রিত, পরদিন হইতে হয় ত' আর জীবনে কোনোদিনই সাক্ষাৎ ঘটিবে না।

পরদিন সকালে চন্দ্র ডাকিল, "মাসীমা!"

ডাক শুনিয়া শুভা বিস্মিত দৃষ্টিতে চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। মাসীমাও বিস্ময়, প্রশংসা এবং স্নেহমাখানো চোখ দুইটী অমলের মুখের উপর সংন্যস্ত করিলেন। তিনি যে এক রাত্রে ওই হৃদয়বান শিক্ষিত যুবকটীর এত আপনার হইয়া গিয়াছেন, এই অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ তাঁহার নারী হৃদয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় অমৃত সিঞ্চন করিল। ডাকিলেন, "কেন বাবা?"

—"কাল রাতে কোনো অসুবিধে হয় নি?"

—"না বাবা।"

—"কিন্তু এ বেলা খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করবো মাসীমা?"

—"সে ব্যবস্থা আমিই সব ক'রে দিচ্ছি বাবা। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। শুভা রাঁধবে'খন। যা ত' মা, স্নান করে এসে দুটো চড়িয়ে দে—তোর চন্দ্র দাদাকে দুটো রেঁধে—"

'তোর চন্দ্র দাদাকে' কথাটী মাসীমা চন্দ্রের প্রতি এবং তাহারও প্রতি স্নেহাতিশয্যেই উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শুভা মাসীমার ওই নিষ্প্রয়োজন স্নেহের প্রাবল্যটুকু মনে মনে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত সে তাহার আনত মুখখানা মাসীমার দিকে ফিরাইয়া চাহিল, কিন্তু ওই প্রৌঢ়া রমণীটি সে পথের ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি সস্নেহ দৃষ্টিতে শুভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যা না মা, করবি কখন? শুন্‌ছিস, চন্দ্র আজ ক'দিন রান্নার অভাবে খায় নি?"

শুভা আর কোনো কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। চন্দ্র শুভার মাসীমার সঙ্গে সেইখানেই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। খানিক পরে শুভা স্নান সারিয়া সিক্ত বস্ত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্র প্রকৃতপক্ষে শুভাকে কাল হইতে একবারও ভাল করিয়া দেখে নাই। আজ যখন শুভা অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন সে চোখ দুইটাকে ফিরাইতে পারিল না—শুভাকে এমনই শিশির-স্নাত ফুলটীর মত সুন্দর দেখাইতেছিল। শুভা উনানের ধারে বসিয়া গেল, আর কনক তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিয়া গেল। উনান ধরাইতে অনর্গল ফুঁ দিয়া যখন শুভা রান্নাঘরের বাহিরে আসিল, চন্দ্র দেখিল, ধোঁয়ায় তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। এই শরণাগত ভদ্রপরিবারবর্গকে সে আজ তাহার এমন হীন কাজে লাগাইয়াছে—বিশেষতঃ, এই ছোট মেয়েটীকে—এই আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তরটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার মাসীমার মুখে শুনিয়াছিল, এ এলাহাবাদে একজন মস্ত বড় উকীলের মেয়ে। নিজ হাতে রান্না করা, উনান ধরানো, হয় ত' কেন, নিশ্চয়ই অভ্যাস নাই। অথচ, ইহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া সে এই কাজই করাইয়া লইতেছে। নিজেদের বাড়ীতে গিয়া হয় ত' এ কথা সকলের সঙ্গে গল্প করিবে। তাঁহারা ভাবিবেন, একজন অভদ্র ব্যক্তির বাড়ীতে ইহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। ছি ছি ছি!

শুভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি দরকার ছিল নিজে উনুন ধরাবার? ঝিকে বললেই ত' হতো?"

চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শুভা জবাব দিল, "উনুন মাসীমা ধরিয়ে দিয়েছেন।"

শুভা সবই করিল। রান্নাবান্না ত করিলই, এমন

কি চন্দ্রের ঠাঁইটা পর্য্যন্ত করিল। কনক কতবার তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সে তা'তে স্বীকৃত হয় নাই।

চন্দ্র আহারে বসিল। বসিয়াই লক্ষ্য করিল, এই তুচ্ছ কার্য্যটার ভিতর, অর্থাৎ ঠাঁই করার ভিতরও কেমন একটা পারিপাট্য, একটা সৌষ্ঠব রহিয়াছে। আসনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জলের গেলাসটা কেমন বা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তারপর কুণ্ঠিতপদে যথন ওই বালিকাটী সম্মুখে থালা হাতে করিয়া পরিবেশন করিতে আসিল, তথন তাহার মুগ্ধদৃষ্টি বারেকের জন্য শুভার সুন্দর মুখথানির প্রতি সংন্যস্ত হইল। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা লইয়া সে আজ থাইল। কনককে ডাকিয়া বলিল, "কন্‌কি, পোড়ারমুখী, রান্নাটা ওর কাছ থেকে শিখে নে। কোনো কাজের হ'লি নে তুই।"

দুপুরবেলা আহিরীটোলায় সে তাহাদের আত্মীয়ের সন্ধানে গেল। গেল অবশ্য শুভার মাসীর তাগাদায়। সে জানিত, আজ কোনোমতেই সেই আত্মীয়ের সন্ধান বাহির করিতে পারিবে না, এবং একথা জানিত বলিয়াই সে সন্ধান বাহির করিতে পারিল না। কারণ, এ বেলা শুভার হাতের রান্না থাইবার অসংবরণীয় প্রলোভনের কাছে তাহাদের আত্মীয়ের সন্ধান করা কাজটা শুধু অকিঞ্চিৎকর নয়, ক্ষতিকরও। সন্ধান হইলেই ত' তাহারা চলিয়া যাইবে।

বিকালবেলা ফিরিয়া আসিয়া নিজের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দেথিল, শুভা একথানা চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছে। ঘরের মেঝেতে তাহার ছায়া পড়াতে শুভা ফিরিয়া চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। চন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিস্মিত হইল। একবেলার মধ্যে ঘরটীর রূপ যেন বদলাইয়া গিয়াছে। ঘরের মেঝে ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে—টেবিলের উপর বইগুলি সুন্দরভাবে গুছানো, কলমদানীতে কলমগুলি সাজানো। এমন কি, দেয়ালে ঝুলানো নিজের ফটোথানা, যা' দু' বৎসরের ধুলা ও ঝুলে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, সেটি পর্য্যন্ত আজ এক অজ্ঞাত হস্তের নৈপুণ্যে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। টেবিলের কাছে গিয়া দেথিল, রঘুবংশ থোলা। এই বইটীই সে পড়িতেছিল। পাতা উল্টাইয়া দেথিল, নাম লেথা কুমারী শুভা চট্টোপাধ্যায়। এত অল্প বয়সে সে রঘুবংশ পড়ে! বইয়ের পাতার পাশে ছোট ছোট করিয়া লেথা নোটগুলি পড়িয়া দেথিল তাহার সংস্কৃতে জ্ঞান খুব ভালই। চেয়ারথানির উপর বসিয়া পড়িয়া চন্দ্র ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, শুভার কথা। যেদিক দিয়াই বিচার করিতে লাগিল, দেথিতে পাইল, কৈশোর-যৌবনের সঙ্গমস্থলে দণ্ডায়মান ওই অনিন্দ্য বালিকা মূর্ত্তিটী এক ভবিষ্যমান নারীর সমস্ত রত্নসম্ভার লইয়া তাহার চোথের সম্মুথে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

কাল রাত্রে রাস্তার উপর সেই ট্যাক্সীর দুর্ঘটনা—তারপর শুভা ও তার মাসীমার তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া পড়া—সমস্তটাই তাহার কাছে একটা মস্ত বড় রহস্য—শুধু রহস্য নয়, বেদনার কারণও বটে। দু' দিন আগে জগতে যাহাদের অস্তিত্বের কথাও সে অবগত ছিল না, তাহারা আজ তাহাদের বাড়ীতে তাহাকে রাঁধিয়া থাওয়াইছে; তাহাকে এবং সেও তাহাদিগকে, আপনার করিয়া লইয়াছে। আবার কাল এই তিনটি কণিকা বিশ্বসংসারের জনসমুদ্রে কোথায় চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে! দু' দিনের আসা, দু' দিনের যাওয়া, এই বহুপ্রচলিত সরল সত্যটুকু সে আজ বড় মর্ম্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করিল।

"—চন্দ্র, বাবা, আহিরীটোলার কোনো থবর পেলে না?"

"—কেন মাসীমা?"

"—না মাসীমা। কালকে যেমন ক'রে পারি খুঁজে বার করবো।"

"—তাই করো বাবা, শুভা ভারী ব্যস্ত হয়েছে।"

"—ও, তা' ত' হবে।" তারপর সপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ও একটু ব্যস্ত হতেই পারে—বেচারীকে হাঁড়ি পর্য্যন্ত ধরতে হচ্ছে।"

কথাগুলি শুভাকে শুনাইবার জন্যই চন্দ্র বলিয়াছিল;

কারণ দোরের পাশে শুভাও দাঁড়াইয়াছিল। মাসীমা হাসিয়া উঠিলেন। তারপর শুভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুইই বল্ না?"

"—কি মাসীমা?"

—"আমার শুভা বলছে, তা' নয়। ওর বাড়ীতে সব কি ভাবছে, সেই জন্যেই ব্যস্ত হয়েছে। বলছে, মাঝে মাঝে এসে না হয় রেঁধে খাইয়ে যাবে।"

চন্দ্র হাসিয়া বলিল, "এটা প্রতিশ্রুতি বলে মনে ক'রে নিতে পারি ত'?"

অস্ফুট এবং সস্মিত উত্তর আসিল, "হ্যাঁ।"

পরদিন চন্দ্র সমস্তদিন ঘুরিয়া তাহাদের সেই আহিরীটোলার আত্মীয়ের সন্ধান বাহির করিল। যে ভদ্রলোকটীর ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবার কথা ছিল, তিনি হঠাৎ কি একটা রোগে সেইদিনই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর সুস্থ হইয়া শুভাদের খোঁজ করিতেছিলেন, কিন্তু এই দু' দিন কোনো সন্ধানই পান নাই। তারপর যখন চন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাহারা তাহাদেরই বাড়ীতে সসম্মানে রহিয়াছেন, তখন তিনি চন্দ্রকে মাথায় কিংবা কোথায় রাখিবেন তাহার কোনো কিনারা করিতে পারিলেন না, এবং সাশ্রুনেত্রে হৃদয়বান যুবকটীর উপর অন্তরের অজস্র অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। চন্দ্র তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিল।

বিকালবেলা চন্দ্র তাহার পড়িবার ঘরে একেলাটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। শুভাদের সেই আত্মীয় ভদ্রলোকটী আসিয়াছেন। আজ রাত্রে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। চন্দ্র পড়ায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনের মধ্যে বেদনার সহিত এই কথাটী বারংবার ঘুরিয়া মরিতেছিল, "কে ইঁহাদের মাথার দিব্য দিয়া আসিতে বলিয়াছিল, আর কেই বা এমন করিয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিল?"

শুভার মাসীমা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "আজ বিকালে আমরা যাচ্ছি। তোমাকে অনেক কষ্ট দিলুম, তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছো বাবা—তোমাকে আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবো?"

চন্দ্র মুখ তুলিয়া দেখিল, শুভা আনতমুখে মাসীমার পিছনে দাঁড়াইয়া। সেও বোধ হয় ওই কৃতজ্ঞতাটুকু নীরবে জানাইতেই আসিয়াছিল। হাসিয়া বলিল, "লাভ ত আমারই—আপনার আশীর্ব্বাদ পেলুম। আমি আর আপনাদের কি করেছি? করেছেন বরঞ্চ আপনারা। আপনারা দু' দিনে আমাদের বাড়ীটাতে একটা শ্রী এনে দিয়েছেন। দেখুন ঘরটার দিকে চেয়ে—কি ঘরই ছিল, আর কি হয়েছে—যেন হাস্‌ছে।"

মাসীমা নিরতিশয় আত্মপ্রসাদের সহিত বলিলেন, "শুভাই আমার শ্রী। ও যেখানে পা বাড়ায়, সেইখানেই শ্রী আপনিই ফুটে ওঠে।"

শুভা আরক্ত মুখখানা উঁচু করিয়া মাসীমার দিকে চাহিল। একটা কথার উত্তরে কথা কিরূপ শুনায়, তা' না ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্নেহের প্রাবল্যে মাসীমা এইভাবে অনেক কথাই যার তার কাছে বলিয়াছেন, এবং শুভা ইহার জন্য কতবার সরল-হৃদয়া রমণীকে সতর্ক করিবার জন্য বেশী কথা কহিতেই নিষেধ করিয়া দিয়াছে। কালও চন্দ্রের সম্মুখে এই ধরণের একটা কথা বলিয়াছেন, আজও শুভা যে ভয় করিতেছিল, ঠিক তাই হইল। চন্দ্র না থাকিলে হয় ত' সে মাসীমাকে ইহার জন্য বকাবকি করিত, কিন্তু নিরুপায় হইয়া আরক্ত মুখখানা নত করিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ঘরের মেঝে খুঁটিতে লাগিল।

চন্দ্র শুভার এই মনোভাবটুকু বুঝিল। কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "সত্যি, আপনাদের যেন ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দু'টি অন্নদান করতে। দু'টি উপবাসীর মুখে আপনারা অমৃত দিয়ে গেলেন—অমৃত, কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছি নে।"

মাসীমা শুভার আপাদমস্তক স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বুলাইলেন। বলিলেন, "তোর রান্না আমার চন্দ্রের বড় ভাল লেগেছে। এলাহাবাদ ফিরে যাবার আগে আর একদিন এসে রেঁধে চন্দ্রকে খাইয়ে যাস্ ত' মা?"

চন্দ্র একটা প্রত্যুত্তরের আশায় শুভার আনত মুখখানার

দিকে চাহিল। শুভা কোনো কথা বলিল না; শুধু একটা সম্মতি-ব্যঞ্জক হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠে একবার স্ফুরিত হইয়া উঠিল। কনক দাদার পাশেই ছিল। বলিয়া উঠিল, "সত্যি, আজ আপনারা যাচ্ছেন, আপশোষ হচ্ছে যে, মা ফিরে এলে মাকে এই রত্নটী একবার দেখাতে পারলুম না। আমি বলছি আজকে আর কালকে এই মাত্র আর দুটো দিন যদি—"

মাসীমা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না মা, আর এক মুহূর্ত্তও নয়। কি কুক্ষণেই ঘরের বাইরে পা দিয়েছিলুম, এমন বিপদ মানুষের হয়! শুভার বাবা একজন মস্ত উকীল, মস্ত লোক, আমাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে তিনি হয় ত' এতক্ষণ কত কি কচ্ছেন!" বলিয়া তিনি ওই কাল্পনিক বিপদের কথা স্মরণ করিয়া সত্যসত্যই শিহরিয়া উঠিলেন।

চন্দ্র নিজেই তাঁহাদের বিছানা-পত্তর, সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক গুছাইতে লাগিল। শুভার বইগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া তুলিল। দেখিল, নানান রকম সংস্কৃত বই, এবং কোনো কোনটাতে সুন্দর অক্ষরে লেখা কুমারী শুভা চট্টোপাধ্যায়। শুভা পাশেই ছিল। তাহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে বড় কৌতূহল হইতেছিল—কিন্তু অযাচিত হইয়া কথা বলিবার জন্যই কথা বলাটা কেমন দেখাইবে ইহা ভাবিয়া সেই কৌতূহলটুকু সংবরণ করিল। তার চেয়েও আর একটা বড় বাধা, সে তাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে 'আপনি' না 'তুমি'। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের ভিতর অনেক আখড়াই দিয়া, শুভার দিকে চাহিয়া বলিল, "এগুলো কি পড়ার বই?"

শুভা একটা কাপড় পাট করিতে করিতে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"—কোন্ পড়ার? ইণ্টার মিডিয়েট না—"

"—না, মধ্য।"

চন্দ্র আর কোনো কথা না বলিয়া জিনিষ-পত্তর গুছাইয়া দিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ বিকালের পূর্ব্বেই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন! ঘরের টেবিলের উপর সুবিন্যস্ত বইগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিল, আবার দু' দিন পরে বইগুলি তেমন ছড়ানো এলোমেলো হইয়া থাকিবে, আর কেউ ত' পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া রাখিবে না? ঘরের মেঝে অমন সুন্দর পরিষ্কার করিয়া দিবে না? অথচ ওই শুভা মেয়েটীর অস্তিত্ব দু' দিন আগে সে জানিত না, দু' দিন পরেও হয় ত ভুলিয়া যাইবে। আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশের মত তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের উপর এই যে একটা আকস্মিক রহস্যের স্ফুরণ হইয়া গেল—ইহা ক্ষণিক হইলেও, হয় ত' স্মৃতিটুকু জীবনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বহন করিতে হইবে!

বিদায় মুহূর্ত্তে শুভা প্রণাম করিতে গেল। চন্দ্র প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই বালিকাটী আনতমুখে তাহার দুই পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রও হেঁট হইয়া মাসীমার পা দু'খানি স্পর্শ করিল। মাসীমা সিক্তচক্ষে চন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন।

তখনো বালীগঞ্জ এভিনিউ নির্জ্জন। ট্যাক্সীখানার চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ চন্দ্র ট্যাক্সীখানার দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, উহারা তাহার অন্তর-পথ বাহিয়া অমনি করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই দিনই রাত্রে চন্দ্রের বাড়ীর সকলে পশ্চিম হইতে আসিয়া হাজির হইলেন। মা কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ছেলেকে একটা সুসংবাদ দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "চাঁদু, পশ্চিমে তোর একটা বিয়ের যোগাড় ক'রে এলুম। এলাহাবাদ কোর্টের উকীলের মেয়ে। চমৎকার মেয়েটি! রূপে গুণে! এখনও পড়ে—গান-বাজনা, শিল্প—আর রান্না, সে কি সুন্দর তা' কি বলবো তোকে! আমাকে একদিন নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করে খাইয়েছিল।"

"আমি সামনের মাসেই বিয়ে দেবো—কথা দিইছি, যদি তোর দাদার মেয়ে পছন্দ হয়। তাঁরা দিন তিনেক হলো ওই জন্যই কোলকাতায় এসেছেন।"

চন্দ্র মূঢ় দৃষ্টিতে কনকের দিকে চাহিল। কনকও হতবুদ্ধির মত দাদার চাহনির অর্থ নির্ণয় করিতে লাগিল।

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য

সাপের জাত

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

নিদারুণ গ্রীষ্মের পর সন্ধ্যা মাথায় করিয়া এক পশলা বৃষ্টি বেশ একটা শান্ত উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়ায়, অভয় সাজগোজ করিয়াই পাথরের টেব্‌লের সামনে একখানি চেয়ার টানিয়া পাখা খুলিয়া বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কী যেন ভাবিতেছিল।

অল্প কিছু পূর্ব্বে কে যেন ধূপদানে ধূপটী জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে—মনমাতান সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। অভয় হঠাৎ ধূপদানটী টানিয়া লইয়া জ্বলন্ত ধূপটির মুখে ফুঁ দিয়া খেলা করিতে লাগিল। কিছু পরে একখানি প্যাড টানিয়া লইয়া বসিল।

বোধ করি সে কবিতা লিখিতেছিল—মন তখন তাহার কোন্‌ রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল বলা কঠিন, কিন্তু তাহারই চেয়ারের অদূর পার্শ্বস্থিত কৌচখানির উপর 'ধপাস্‌' করিয়া পতনের একটা শব্দে সে বিসদৃশভাবে চমকিয়া উঠিল—তাহার ভাবের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পত্নী সুলেখা। সদ্য প্রসাধন শেষ করিয়া লোভনীয় সাজে আপনাকে সজ্জিতা করিয়াছে। পরণে তার আধুনিক রুচিসম্মত মাজেণ্টা রং-এর সিল্কের ছাপা শাড়ী—হাতে সদ্য-আহরিত টকটকে লাল একটী সুবৃহৎ গোলাপ—পায়ে শাদা জরির ষ্ট্র্যাপ লাগানো ক্রেপ্‌সোল্‌ স্যাণ্ডেল।

কলমটী টেব্‌লের উপর রাখিয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে অভয় বলিল: কি ব্যাপার, বৃষ্টি মাথায় করে কোথাও চল্‌লে না কি?

সুলেখা সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া হস্তস্থিত গোলাপটী আপনার গালে বুলাইতে লাগিল। কিছু পরে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল: আমি শুধু একটা কথা তোমাকে জিগেস করতে চাই।

অভয় বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া পত্নীর দিকে খানিক চাহিয়া রহিল। পত্নী আর কোন কথা বলিল না দেখিয়া বলিল: কি বলো?

গোলাপটীর পাপড়িগুলি এক একটী বিচ্ছিন্ন করিতে করিতে সুলেখা বলিল: এই রকমই চলবে না কি?

—কি রকম?

গাম্ভীর্য্য দ্বিগুণ বাড়াইয়া সুলেখা বলিল: তাও খুলে বলতে হবে? রকমটা কি সত্যিই তুমি জানো না?

অভয় আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। কিছু পরে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল: আজ তোমার কী হয়েচে বলো ত?

স্বামীর রূক্ষতায় বিচলিতা হইয়া বোমার মতো ফাটিয়া সুলেখা বলিল: হবে আবার কি? দুপুরে কলেজ থেকে ফেরবার সময় ট্যাক্সিতে করে আর কাকে নিয়ে এসেছিলে শুনি?

কতকটা শান্ত হইয়া অভয় বলিল: ও, হতভাগা মেয়েটা বুঝি এসে লাগিয়েচে তোমায়? হ্যাঁরে ঝুনু—

সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা ঝরণা—ওরফে ঝুনু, বোধ করি অদূরেই কোথাও খেলা করিতেছিল। পিতৃ আহ্বানে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গম্ভীরকণ্ঠে সুলেখা বলিল: ওটুকু মেয়ের ওপর অত তম্বী কিসের? ঝুনু তুমি যাও, খেলা কর গে।

ঝুনু একবার পিতার এবং একবার জননীর মুখের দিকে চাহিয়া অপরাধীর মতো ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

নিম্নকণ্ঠে অভয় বলিল: মেয়ে জাতটাই ভগবানের একটা গোলমেলে সৃষ্টি। গণ্ডগোল পাকাতে এদের যুড়ি আর কেউ নেই। তারপর সুলেখাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: কেন, তোমায় বলি নি, আমাকে 'য়্যাসিষ্ট' করবার জন্যে ছায়াকে হাসপাতাল থেকেই 'য়্যালট্‌' করেচে। ওর-ও বাড়ী ত এইদিকে, তাই আমার ট্যাক্সিতেই এসেছিল।

ভ্রূকুটী করিয়া সুলেখা বলিল: শুধু হাসপাতালে, না

বাড়ীতে-ও 'য়্যাসিষ্ট' করবার জন্যে বড়সাহেব ব্যবস্থা করে দিয়েচেন? সেখানে তবু দরজা জানলা খোলা থাকে, বাড়ীতে কি সেগুলোও বন্ধ করে 'য়্যাসিষ্ট' করবার কথা না কি?

—দরজা জানালা বন্ধ ছিল, একথা তোমায় কে বলেছে? ঝুনু? হঁ্যারে—

বাধা দিয়া সুলেখা বলিল: কেবল ওকে নিয়ে পড়ছ কেন? ও কিছুই বলে নি আমায়। আমি নিজে কি কাণা, না কালা? ঝুনুর মুখে খবর পেলুম তুমি ফিরেছ। কিন্তু ভেতরে আসতে দেরী হচ্চে দেখে, বাইরে কি করছ দেখবার জন্যে গিয়ে দেখলুম, দরজা বন্ধ ভেতর থেকে দু'জনার গলার আওয়াজ আসছে—মাঝে মাঝে হাসির হররা-ও চলছে।

ব্যাপারটা লঘু করিবার উদ্দেশ্যে অভয় হাসিয়া বলিল: ও, এই। হাঁ হাঁ, আজ হাসপাতালের একটা রুগীর রাক্ষুসে খিদের কথা আলোচনা হচ্ছিল বটে। কিন্তু জানলা বন্ধ ছিল, এ কথা তোমায় কে বললে? দরজা ত শুধু ভেজান ছিল।

দ্বিগুণ বিরক্তির সুরে সুলেখা বলিল: থামো, থামো, খুব হয়েচে। আমি সব বুঝি।

ছায়ার সহিত অভয়ের কোন গূঢ় সম্পর্ক ছিল কি না বলা কঠিন, কিন্তু পত্নীর কথায় হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে অভয় বলিল: তোমাদের 'বোঝা'র মানে করতে আমি ত ছেলেমানুষ, অনেক বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত পর্য্যন্ত হেরে গেছেন। একজন পুরুষের পাশে একজন মেয়েকে দেখলেই—

বিপুল জোরে বাধা দিয়া সুলেখা বলিল: তোমার মুখে ও কথা শোভা পায় না। তারপর টেব্‌লের পাথরের উপর হাত ঠুকিতে ঠুকিতে রুদ্ধ রোষে সে হাতের একগাছা শাখা গুঁড়া করিয়া ফেলিল।

তাহার একখানা হাত ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া অভয় বলিল: ও কি হচ্ছে? সত্যি, আমি দেখচি তুমি দিন দিন যেন ছেলেমানুষ হচ্চ। যাক্—কতকগুলো টাকার ক্ষতি যা' করবার তা' ত হোল—আর কি বক্তব্য আছে বলো দিকি?

রাগিলে সুলেখার জ্ঞান থাকিত না। রুদ্ধরোষে ফুলিতে ফুলিতে গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল: আমি এখুনি বায়োস্কোপে যাব।

বিস্ময়ের সুরে অভয় বলিল: এখন বায়োস্কোপে যাবে কার সঙ্গে?—কোথায়?

—কার সঙ্গে আবার? ঠাকুরপোর সঙ্গেই যাব। কোথায় যাব তা' এখনো ঠিক করি নি, তবে যেখানকার টিকিট পাব, সেইখানেই ঢুকে পড়ব।

—তা' ছ'টার শো ত কোন্‌কালে আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন গিয়ে আর কি হবে?

ভ্রূকুটিপূর্ণস্বরে সুলেখা বলিল: ছ'টা অনেক আগে বেজে গেছে তা' আমি জানি, আমরা সাড়ে ন'টার ট্রিপে যাব।

দ্বিগুণ বিস্ময়ে অভয় বলিল: সাড়ে ন'টার ট্রিপে! তোমার মাথা খারাপ হলো না কি? অজয়ের কিসের বয়েস—ওর সঙ্গে এতরাত্রে যেতে চাও তুমি কোন্ দুঃসাহসে!

—বি-এ পড়বার মতো বুদ্ধি হয়েচে যে ছেলের, তাকে তুমি এখনো হয় ত নিজের কোন স্বার্থের খাতিরে ছেলেমানুষ করে দেখতে পারো, কিন্তু আমি বলব, সে আমায় আগলাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েচে।

গম্ভীরকণ্ঠে অভয় বলিল: কিন্তু আমি বলচি—না, যাওয়া হবে না।

উচ্ছ্বসিত রোষে সুলেখা বলিল:—একথা বলবে তা' আমি জানি। কিন্তু এখুনি যদি সেই নার্স মাগী এসে বলত, চলুন, বায়োস্কোপে যাওয়া যাক্, তা' হ'লে বিনা দ্বিধায় মোটরে উঠে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে হয় ত গাড়ীতে 'ষ্টার্ট' দিতে বলতে।

অভয় হঠাৎ যেন একটু দমিয়া গেল। পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল: দেখ, বড্ড 'লিমিট্' ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমি কিছু শুনতে চাই না। তোমার কোথাও যাওয়া হবে না এখন। যেতে হয় কাল আমার সঙ্গে যেও।

হঠৎ কৌচ্ ছাড়িয়া লাফাইয়া দাঁড়াইয়া সুলেখা বলিয়া উঠিল: তোমার মতো অমন সঙ্কীর্ণ মনের লোকের সঙ্গে

যাওয়ার চাইতে আমার মতে শুধু বায়োস্কোপে কেন, কোন যায়গাতেই না যাওয়া ভালো।—বলিয়া রিষ্টওয়াচটী খুলিয়া টেবিলের উপর সজোরে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। ঘড়িটি অভয়ের গায়ে লাগিয়া টেব্‌লের উপর ছিটকাইয়া পড়িল।

পত্নীর আচরণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অভয় 'গুম্' খাইয়া বসিয়া রহিল, । পরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল :—যাবার মত দিলেই খুব বড়-মনের লোক হতুম নিশ্চয়।...পর মুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া প্যাড্ মুড়িয়া একটী কোট টানিয়া গায়ে দিতে দিতে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

সুলেখা ছাদের হাতায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিল। সে উপস্থিত থাকিবে এবং তাহারই চোখের সম্মুখে স্বামী এইরূপ অবহেলা দেখাইয়া চলিয়া যাইবে, ইহাকে কিছুতেই তার মন প্রশ্রয় দিতে চাহিল না—সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না।

তাহার বিবাহের প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতুল অজিত ম্যাট্রিক পাশ করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থ বিলাতে গিয়াছিল—দীর্ঘদিন পরে প্রবাস হইতে আজ ঘরে ফিরিয়াছে। তাহার নিকট যাইবার জন্যই সুলেখা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। মাঝে হইতে হঠাৎ কি হইয়া গেল! কিন্তু মুহূর্ত্তে সে নিজেকে স্থির করিয়া লইল। এই অজিতকে কেন্দ্র করিয়াই সে স্বামীকে সমুচিত শিক্ষা দিবে মনস্থ করিয়া অজয়কে একখানি গাড়ী ডাকিতে বলিয়া দিল। অজয়ের নিকট এ সম্বন্ধে সে কোন কথা লুকাইল না এবং তাহাকে এখনি মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিতে হইবে এ কথা-ও বলিল।

—দাদাকে অজয় যথেষ্ট ভয় করে। অথচ, বৌদি'কেও কম ভালবাসে না। তাই সমস্যায় পড়িয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে সে বৌদি'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পাঞ্জাবীর একটা প্রান্ত ধরিয়া খেলা করিতে করিতে সুলেখা সহাস্যে বলিল : ভয় নেই গো, ভয় নেই তোমার। এ-খবরটা, অর্থাৎ, তুমি যে আমায় নিয়ে যাচ্ছ এ-কথাটা যাতে সম্পূর্ণভাবে অপ্রকাশ থাকে, সেই চেষ্টাই তোমাকে করতে হবে। আমার কাছ থেকে এ খবর যে বেরুবে না, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকো। তিনি ফিরে নিশ্চয়ই তোমায় আমার কথা জিগেস করবেন, তখন বলো, গাড়ী ডাকিয়ে কোথায় চলে গেছি—রামদাসকেও সেইরকম শিখিয়ে যাব। আমার এক মামা বিলেত গেছেন এইমাত্র তিনি জানেন—কখনো তাকে চোখেও দেখেন নি। তা' ছাড়া, মামা যে ফিরেছে, সে খবরও তিনি জানেন না। অতএব নির্ভয়ে তুমি আমায় পৌঁছে দিতে যেতে পারো। ট্যাক্সি করে যেতে-আস্‌তে আর কত সময় লাগবে?—অবশ্য তার মধ্যেই যদি উনি ফিরে আসেন এবং হাতে-নাতে পথে আমাদের আবিষ্কার করেন, সে হলো স্বতন্ত্র কথা।

ইহার পরিণাম কি হইতে পারে না ভাবিয়া নিতান্ত কৌতূহলের বশেই শেষ পর্য্যন্ত অজয় বলিল : বেশ, তা' হ'লে একখানা টাক্সি ডেকে আনি, কি বলুন?

ট্যাক্সি আসিলে কন্যাকে লইয়া, বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য রামদাসকে একটু টিপিয়া দিয়া সুলেখা অজয়ের সহিত গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

'বউমা'র এই লুকোচুরির কোন হেতু খুঁজিয়া না পাইলে-ও বৃদ্ধ রামদাস রাজায় রাজায় যুদ্ধের পরিণামের প্রভাব মনে মনে কল্পনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শূন্য বাড়ী আগ্‌লাইতেই মনোনিবেশ করিল। দাদাবাবুর জীবন-যাত্রার পথে কোথায় যেন একটা খট্‌কা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে তাহার ছাপান্ন বছরের অভিজ্ঞ জীবনে বিলম্ব হইল না।

* * *

সুলেখাকে আরো একটু বেশীরকম ক্রুদ্ধ করিবার মানসে একটা জরুরী কাজের অছিলায় ছায়াকে লইয়া ইচ্ছা করিয়া একটু বেশী রাত্রেই অভয় বাড়ী ফিরিল। চির-প্রথামত রামদাস দ্বার খুলিয়া দিল।

ছায়াকে দেখিয়া অভয় বলিল : চলুন, আপনি ওপরেই বসবেন চলুন। বাইরে ঘরে আর এত রাতে বসে কাজ নেই। আমি একটু শুধু জলটল খেয়ে নেব। ততক্ষণ আপনি ওদের সঙ্গে গল্প করবেন 'খন।

অগত্যা ছায়া তাহাকে উপরে অনুসরণ করিল। সুলেখা উপরেই আছে এবং তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিবার জন্য নিশ্চয় এখনও জাগিয়াই আছে কল্পনা করিয়া নিতান্ত অবান্তরভাবে উচ্চকণ্ঠে অভয় বলিল: নিশ্চয়ই এখানে আপনার খুববেশী অসুবিধা হবে না। এই বাড়তি খাটুনিটুকু যাতে আপনার পুরোমাত্রায় উশুল হয়, সে ব্যবস্থা কাল করে দেব।...

দ্বার ভেজান ছিল—ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। 'সুইচ' টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বিছানার দিকে না চাহিয়াই অভয় বলিয়া চলিল: আপনি ততক্ষণ একটু খাটের ওপর বসুন, আর কষ্ট হয় ত, না হয় একটু গড়িয়ে নিন্।—বলিয়া আড়-চোখে বিছানার দিকে চাহিল। আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, তাহাদের আলাপে সুলেখা ক্রোধে ফুলিতে থাকুক। কিন্তু শূন্য শয্যা দেখিয়া হঠাৎ তাহার বুকটা বারেকের জন্য যেন 'ছ্যাঁৎ' করিয়া উঠিল। ঝুনুর ক্ষুদ্র স্থানটুকুও খালি পড়িয়া রহিয়াছে।

এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া ঝড়ের বেগে সে পাশের ঘরে অজয়ের অনুসন্ধানে গেল। দ্বার ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে বন্ধ। আরো একটু দমিয়া গিয়া ডাকাডাকি করিয়া সে তাহাকে তুলিল। তাহার মুখে পত্নীর যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিল, তাহাতে সে মোটেই সুখী হইতে পারিল না। বৌদি'র ইঙ্গিত মতো অজয় বলিল: অভয়েরই এক বন্ধুর সহিত তাহার যাইবার কিছু পরে বৌদি' বায়োস্কোপ দেখিতে না কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছেন।

অভয় তখন ছুটিল ভৃত্য রামদাসের কাছে। বেচারী তাহার ময়লা বিছানাটা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া মাত্র পুনর্ব্বার শয়নের যোগাড় করিতেছে, অভয় ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল: হ্যাঁরে, তোর বৌমা কোথায়?

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বের বৌমার সতর্ক বাণী তাহার স্মরণ-পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ রীতিমত ভয় পাইয়া থত-মত খাইয়া বলিল: তিনি মোটরে করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তবে যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা সে সঠিক জানে না।

সংবাদ শুনিয়া অভয় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল। ইদানীং সংবাদ-পত্রে মেয়েদের দুঃসাহসের যেরূপ নমুনা সে আজ কয়দিন হইতে পাইতেছে, তাহাতে সুলেখা সম্বন্ধে কতগুলি কুচিন্তা আসিয়া একযোটে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

* * *

মাতুল হইলেও অজিত সুলেখা অপেক্ষা বয়সে কয়েক মাসের ছোট। তাই তাহাদের সম্পর্ক ঠিক মামা ভাগ্নীর মত ছিল না; অর্থাৎ, কথাবার্ত্তায় আচরণে তাহারা ঠিক্ সমাজ নিয়ম মানিয়া চলিত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুলেখা মাতুলকে চাপিয়া ধরিল: মামা, তুমি বিলেত থেকে ঘুরে এয়েছ, আজ বাদে কাল কোন অফিসের বড়সাহেব হয়ে বসবে, তখন হুকুম চালাবার অনেক লোক পাবে, আজ পাঁচ মিনিট মাত্র আমার হুকুম শোন, এই শুধু আমার মিনতি।

তাহার পিঠে আস্তে একটি চাপড় মারিয়া অজিত বলিল: এই ক'বছরেই অনেক কথা শিখে গেছিস সুলি—আগে যে মুখ দিয়ে কথা বেরোত নারে তোর? তা' বেশ, আজ রাত্তিরের জন্যে তুই-ই না হয় আমার মনিব হ'।

হাসিয়া সুলেখা বলিল: রাজী ত? তবে শোন। প্রথম নম্বর আমাকে এখুনি আমাদের বাড়ী পৌঁচে দিতে হবে। পৌঁচে দেবে বটে, কেন্তু সেখানে আজ আমার মামা হ'তে পারবে না। সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অজিত লাফাইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল: তবে কি তোর চাকর হবো না কি?

ভ্রূকুটী করিয়া সুলেখা বলিল: ধ্যেৎ! চাকর কেন হবে? হবে আমার বন্ধু, যাকে বলে 'ফ্রেণ্ড।'

হাসিয়া অজিত বলিল: ব্যাপার কি বল দিকি! অভয়কে 'এপ্রিল ফুল'-টুল করবার মতলব করেছিস্ না কি? তোর কথা শুনে আমার বিলেতের ঐ দিনকার স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে।

বাধা দিয়া সুলেখা বলিল: দোহাই তোমার মামা, সে না হয় আর একদিন শুনব, আজ তুমি আমার কথাগুলো শোন লক্ষ্মীটি।

গম্ভীর হইবার ভান করিয়া অজিত বলিল: বেশ, তাই

না হয় হবে। তবে আমি তৈরী হয়ে নি কি বল্? শুধু তোমার 'ফ্রেণ্ড' হলেই হবে ত, না শেষ পর্য্যন্ত শান্তিস্বরূপ অভয়ের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিস? বিলেতে মেয়েদের যা' সব কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখেচি—

বাধা দিয়া স্থলেখা বলিল : ফের বিলেতের কথা? বলেছি না, ও সব কথা আর একদিন শুনব।

* * *

ভৃত্য রামদাসের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উৎকণ্ঠা-পূর্ণ চিত্তে অভয় পুনরায় উপরের ঘরে আসিল। ছায়া তখনও খাটের একপ্রান্তে স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় অজিতকে লইয়া স্থলেখা ধীরপাদক্ষেপে উপরে আসিয়া পাঁচিলের আড়ালে আবছা অন্ধকারে দাঁড়াইল। অভয় ঘরে ঢুকিতেই ছায়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল : দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনার কাছে কাজ করছি বলে যে আপনি এমন করে আমায়...এ আমি একবারও ভাবতে পারি নি। পেটের দায়ে এবং স্বার্থের খাতিরে কাজ করতে বেরিয়েছি বলেই যে আপনার স্ত্রী আছেন বলে ওপরে নিয়ে এসে আমায় অপমান করবেন, তা' হবে না। আমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়াব না। দরকার হ'লে আপনার ব্যবহারের কথা ওপরওয়ালাকে জানিয়ে চাকরীতে ইস্তফা দেব। তবু—

ঠিক্ সেই সময় সুপরিচিত খিল্‌খিল্ হাসির শব্দে তাহার মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া গেল।

—আসুন রমেনবাবু, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।—বলিয়া অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঘরের ভিতর আনিয়া উপস্থিত করিল।

অবাক্-বিস্ময়ে ছায়া এবং অভয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্থলেখার মুখে চোখে যেন হাসি উছলিয়া পড়িতেছে। এ যেন এক অদ্ভুত প্রহসন!

পুতুলের মতো অজিত আসিয়া পাশে দাঁড়াইতেই, অভয় কট্‌মট্ করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিল।

বিন্দুমাত্র না দমিয়া স্থলেখা বলিল : ইনিই সম্ভবতঃ তোমার হাসপাতালের সেই নার্স? তা' রাতদুপুরে ব্যাপার কি, কোন অসুখ-বিসুখ···

থতমতভাবটা একটু সামলাইয়া উচ্ছ্বসিত রোষেই অভয় বলিল : ব্যাপার আমার?—না, তোমার? এ আমি কোনদিন কল্পনাও করি নি স্থলেখা!

বিদ্রূপের স্বরে স্থলেখা বলিল : কিন্তু করাই উচিত ছিল। অন্ততঃ, নিজের দিক্‌টা ভেবে দেখ্‌লে এ জন্যে অত দুঃখ-ও থাকত না।

এতবড় খোঁচাটা নীরবে হজম করা ছাড়া পথ রহিল না। সত্যই বড় দুঃখে অভয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল : আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না, বিনা দোষে তোমাদের দু'জনার চোখেই আমি অপরাধী হয়ে রইলুম! আমাকে ভুল বুঝে রাগ করে তুমি গেলে বন্ধু নিয়ে হাওয়া খেতে, আর ভাগ্যে এত সব ছিল বলেই বোধ করি, আমি-ও তোমাকে আরো রাগাব কল্পনা করে নিতান্ত অপ্রয়োজনে এমন সময় ওঁকে এখানে এনে হাজির করলুম। তুমি নেই দেখে উনিও··

স্থলেখা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল : থাক্, আর দুঃখ করতে হবে না তোমায়। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর সব কথাই শুনেছি, আর শুনে অবধি মনে মনে লজ্জাও পাচ্ছি! তোমার ভুল উনি বুঝ্‌তে পেরেছেন, সে জন্য উনি তোমায় ক্ষমা করবেন। আমার অজিত মামার নাম ত শুনেচ, ইনি আমার সেই অজিত মামা। আজই সকালে উনি বিলেত থেকে ফিরেচেন। দেখা করতে যাবার জন্যে সকালেই আমাদের দু'জনকে নেমন্তন্ন করে গিয়েছিলেন। তুমি ত কোন কিছু না বলে রাগ করে কোথায় যেন চলে গেলে, অগত্যা আমিই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেছলুম। যাক্, এখন তাড়া তাড়ি উঠে একটা বড় গোছের পেন্নাম করে ফেলো দিকি!

অবাক্-বিস্ময়ে অভয় অজিতের দিকে চাহিয়া রহিল। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর মাতাইয়া অজিত বলিয়া উঠিল : তুই বিলেতের মেয়েদের-ও হার মানিয়ে দিলি স্থলি! সাধে কি কবিরা তোদের নাম দিয়েচেন—'সাপের জাত!'

শ্রীকার্ত্তিক শীল

সন্ধ্যার অতিথি

শ্রীতারাকুমার সান্যাল

বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা। সারা প্রাবৃটাকাশ কাজল মেঘে ছাওয়া। পল্বল ভরে ওঠে বৃষ্টির জলে। আঁকা-বাঁকা বিসর্প-গতি পল্লী-পথ ডুবে যায়। দমকা হাওয়ায় তরু-শীর্ষ কাঁপে—প্রথম-প্রায় ভীরু কুমারীর মত।

সে দুর্য্যোগে অপরিসীম এক শূন্যতা কাঁদে বাইরের আকাশে বাতাসে। আলো কোথাও নেই···সব অন্ধকার—শুধু ভিজে মাটির গন্ধ ভেসে আসে সজল বাতাস বেয়ে। প্রলয়ের দূত যেন নেমে আসে এতদিনের পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে তার নির্দ্দয় প্রহরণ দিয়ে। মানুষের সামান্য কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না সেদিন।

কবিগুলোর ওপর রাগ হয়। এর মধ্যে সৌন্দর্য্য তারা খুঁজে পায় কোথায়। এর চেয়ে কোলকাতা ত' ঢের ভাল—থাকুক্ সেখানে পাটের কল,—থাকুক্ বাড়ীর পাশে বিরাট কারখানা,—তবু মৃত্যুর মত এমন নীরবতা সেখানে নেই—এমন ভয়াবহ স্তব্ধতা নেই—এমন সীমা-হীন শূন্যতা নেই।···

ধীরে ধীরে ডাকি—দুলারীর মা, চায়ের জল চাপিয়েছ কি ?—উত্তর আসে—না বাবু; দুলারী না ঘুমোলে ত' হবার উপায় নেই। কিন্তু দুলারী ঘুমোয় না। অগত্যা বলে উঠি—ওকে আমার কাছে দিয়ে তুমি চা করো।

দুলারী আসে। ছোট একটা ছেলে। চুল-গুলো গভীর কালো—শিশু-সুলভ সারল্য সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। তাকে বসিয়ে দিই ছোট চৌকীখানার 'পরে—যেখান হতে দেখা যায় বাইরের বিরাট, কালো আকাশটাকে—জানলার গরাদ ধরে সে দাঁড়ায় তার কচি পায়ে ভর করে। বাইরে তখন চলে ভৈরবের প্রলয় লীলা। ঝাউ-গাছগুলো ঝড়ে ভেঙ্গে যায়,—নারকেল গাছ দুলে ওঠে—সে তাই দেখে নিষ্পলক নেত্রে।

ঘরের মধ্যেটা পুঞ্জ অন্ধকারে ভরা। ধীরে ধীরে উঠে আলো জ্বালি,—সারা ঘর সে আলোয় হাসে। রাত জাগা একটা পাখী কেঁদে ওঠে সকরুণ সুরে—সে সুর দূর হতে দূরান্তরে মিলিয়ে যায়।

ঝিমুনি লাগে আমার তন্দ্রালস চোখে। পেছন ফিরে বসি। স্তব্ধতায় সে ঘর ভরা—কেবল দুলারীর চঞ্চলতায় সে স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায় মাঝে মাঝে। দু' তিনটে মিনিট কেটে যায় এই ভাবে।

হঠাৎ দুলারী যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে—কে যেন তার কণ্ঠ-রোধ করে। সে অস্ফুট তীব্র আর্ত্তনাদ কেঁদে বেড়ায় আকাশে বাতাসে।

আমার তন্দ্রা ছুটে যায়—নিমিষে পেছন ফিরি। কিন্তু এ কী! কার অদ্ভুত কালো ছায়া-মূর্ত্তি চলে বেড়ায় যেন। কে যেন জান্‌লার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়—কার দৃঢ় ভুজ বন্ধনে যেন দুলারী কেঁপে ওঠে। দু'খানা হাত জান্‌লা দিয়ে এসে তার কণ্ঠ রোধ করে যেন।...বুঝি অশরীরী কোনও প্রেতাত্মা এ। আশঙ্কায় আমার মুখ শাদা হয়ে যায়—কাগজের মত। তবু সাহসে ভর করে বলে উঠি—কে ওখানে··· ?

লাণ্ঠানের খানিকটা মৃদু আলো বাইরে বিকীর্ণ হয়। সে ক্ষীণালোকে দেখা যায়—স্পষ্ট এক মানুষের মুখ—কোঠরাগত নিষ্প্রভ তার চোখ জ্বলে ওঠে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে—লম্বা চুল,—মুখের শ্রী নষ্ট হয়ে যায় অসংখ্য গোঁফ-দাড়িতে। সে মুখখানা হেসে ওঠে। বলে—অতিথি,—ভেতরে যেতে পারি কি ?

আমার প্রায়-স্পন্দন-হীন বক্ষ আবার সজাগ হয়ে ওঠে ওই সামান্য কথায়। অস্পষ্ট কম্প্র-স্বরে বলে উঠি—আসুন। সে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে। ভিজে লম্বা চুল বেয়ে জলধারা গড়ায়। একগাল হেসে সে বলে—জাঙ্গী-পাড়ায় যাব মশায়! দু'ক্রোশ বই ত' নয়—কিন্তু

যে ঝড় জল—যেতে আর দিলে কই, তার উপর অন্ধকার...।

অশরীরী প্রেতাত্মা তবে নয়, মানুষ, আমারি মত মানুষ সে...আমারি মত জাগ্রত হৃৎপিণ্ড তারও অন্তরে কম্পিত হয়। দুঃখে-সুখে আমারি মত কাঁদে, হাসে—আমার মত বিস্মিত হয় ওঠা-নামার বৈচিত্র্যে। আঃ, কী তৃপ্তি! অনাবিল আনন্দে বুক দুলে ওঠে। নিঃসঙ্গ জীবনে দু'দণ্ড কথা কইবার সঙ্গী পাই। ঝিমিয়ে-আসা মন ক্ষণিক সঙ্গ লাভের আনন্দে উৎসাহ-শীল হয়ে ওঠে। ভাবি কত ভুলেই না ভরা মানুষের এই চোখ। সারা দেহে আনন্দের হিন্দোল বয়ে যায়।...

হেঁ, হেঁ, বিড়ি আছে মশায়—সে বলে ওঠে।

উঠে বসি, সিগার-কেশটা এগিয়ে দিই। বলি—তা' ভিজে জামাটা খুলে টাঙ্গিয়েই দিন্ না—গুকোগ্ ততক্ষণে—দুলারীর মা, চা তোমার হল, দু'কাপ নিয়ে এস শীঘ্রি।

এঁ্যা, চা! তা' ভাল মশায়—বলে সে চারিদিকে চায় চঞ্চল ভাবে। ছেলেটি কী আপনার—দুলারীকে নির্দ্দেশ করে সে বলে ওঠে।

আজ্ঞে না,—বাড়ীর ঝির,—আমি বিবাহই করি নি।

করেন নি...বেশ, বেশ মশায়...করবেনও না। ওর মত পাপ দুনিয়াতে আর নেই। শেষে আমার মত অবস্থাও ত' হতে পারে বিয়ে করে...তা এ কি আপনার বসত বাড়ী? সে বলে ওঠে।

আজ্ঞে না, আমার বাড়ী কোলকাতায় কালীকিষণ লেনে। হপ্তাখানেক হল বদলী হয়ে এসেছি এখানে।

দুলারীর মা ঘরে ঢোকে—চায়ের পেয়ালা নিয়ে। বলে উঠি—দুলারীকে ভেতরে নিয়ে যাও—এখানেই হয় ত ঘুমিয়ে পড়বে।

হেঁ, হেঁ, আমার একটা ছেলে ছিলো মশায়—ঠিক্ ওই রকমই—তাই তো ওকে আদর করছিলাম বাইরে থেকে—কিন্তু কেঁদে ফেল্‌লে ও ভয় পেয়ে। শুনবেন আমার কাহিনীটা।—সে বলে ওঠে। দু'চোখ তার জলে ভরে যায়—কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সে অশ্রু ধারা।

সহানুভূতির স্বরে বলি—শুন্‌বো, কিন্তু চা-টা জুড়িয়ে যেতে পারে,—আগে খেয়ে নিন।—

অতিথি সুরু করে—

পাগল আমি নই মশায়, কিন্তু এ তারি পূর্ব্বাবস্থা। পাগল হলে কোনও কষ্ট থাকে না মানুষের—সব সে ভুলে যায়, নিজের নামও। ভোলার নেশা তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু এ অবস্থাটাই বড় ভয়ানক,—তা হোক, হেঁ হেঁ, শুনুন মশায়।

জাঙ্গীপাড়ায় আমার বাড়ী ছিল। বাপ কিংবা মা কেউ তখন বেঁচে নেই। এত বড় পৃথিবীতে আমি তখন একা, নিতান্তই একা, সম্বল কিছু নেই—থাকার মধ্যে ছিল অকৃত্রিম বন্ধু সলিল, অবস্থা তার ভালই। হাত পেতে দাঁড়ালাম তার কাছে।

বিমুখ আমায় করলে না—সে যাত্রায় বেঁচে গেলুম তার সাহায্য আর অনুকম্পা পেয়ে—মনে মনে তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

দুটো বছর কেটে যায়। আমার অবস্থার উন্নতির সুরু হল। অমনি ছুটে এল পাড়াপড়শীর দল। বিয়ের জন্যে তাগিদ সুরু করে নিত্যই। ভাবি—কথাটা মন্দ নয়—একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য কিছু দরকার—তা ছাড়া রোগ-দুঃখে দেখবে কে?

সলিল মেয়ে দেখে আসে,—পছন্দও হয়।

ফাল্গুনেই শুভপরিণয় শেষ হয়ে যায় চাঁপাডাঙ্গার যমুনার সঙ্গে।

তারপর কী সুন্দর আর মধুর লাগলো এই জীবনটাকে। জীবনকে সুন্দর করে দেখা সেই আমার প্রথম আর সেই আমার শেষ। দিনগুলো আনন্দেই কাটে। সলিলকে ভুলি নি তা বলে। সে প্রত্যহ আসে আমার কাছে আর কলহাস্যে আমাদের বাড়ী আনন্দ-মুখর করে তোলে। তার সরল অকৃত্রিম ব্যবহারে যমুনারও ভালবাসা গিয়ে পড়ে তার ওপর।

সলিল বলে ওঠে,—আচ্ছা বৌদি, যেদিন তোমায় দেখতে যাই অমন করে হেসে পালালে কেন ?

কি জানি কেন যমুনার মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে।

সে তামাসায় আমিও যোগ দিই,—বলি,—জানিস না বুঝি, বর চিনতে যে তোর বৌদি ভুল করেছিল। সলিল হাসে,—আমিও হাসি। যমুনা কিন্তু চটে যায়। রাগে চোখ দুটো লাল করে আমার দিকে তাকায়—কী সুন্দর সে কটাক্ষ !

এমনি হাসি-তামাসার মধ্যে দিয়ে দুটো বৎসর গড়িয়ে যায়।

একদিন আমার এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে দেহের তন্ত্রীগুলো বেজে ওঠে। শিশু বাড়ে শশীকলার মত। কত রঙীন কল্পনা দোলা দেয় মনকে। আমি বলে উঠি—যমু, পূজো ত আসছে, খোকার কিছু পোষাক নিয়ে আসি কোলকাতা থেকে, দু একটা কাজও সেরে নেব অমনি। সে সায় দেয়। পরের সকালেই বেরিয়ে যাই। কিন্তু দুদণ্ড তিষ্টুতে পারি না সেখানে—খোকার মুখটা বারবার মনে পড়ে যায়। তার আধো-আধো ভাষা কানের চারপাশে বাজতে থাকে মিষ্ট সুরে। অগত্যা ফিরেই আসি দুদিন পরে।

রাঙামাটির পথ বেয়ে চলি। রাঙ্গচিতায় ঘেরা আমার বাড়ীটা দেখা যায়। ভাবি—যমুনা হয় ত' তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালায় এখন। খোকা জেগে আছে হয় ত'—আমায় দেখে এখুনি ছুটে আসবে মাতালের মত অসংলগ্ন পা ফেলে।

ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করি, নিথর, নিস্পন্দ সব। বুকটা নিমিষে কেঁপে ওঠে। ডাকি—যমু। উত্তর আসে না। কেবল প্রতিধ্বনি আমায় ব্যঙ্গ করে। সন্ধ্যার বাতাস হাহারবে গড়াগড়ি দেয় শূন্য প্রাঙ্গনের পরে। সীমা-লেখাহীন রিক্ততা গুমরে কাঁদে জমাট অন্ধকারের মাঝে।

কথাগুলো শেষ করে অতিথি হাঁপিয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে যায়। সজল চোখের দুবিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নিশির শিশিরকণার মত।—কই, জল ত ধরলো না এখনও, —ধরবেও না বোধ হয়;—হেঁ হেঁ, যদি অনুমতি করেন ত' এখানেই আজকের রাতটা—সে বলে ওঠে।

ঘড়িতে তখন নটা বাজে।

আমার মনও সহানুভূতিতে ভরে যায়। বেশ ত' আপনার অসুবিধে না হলে মাঝের ঘরটা ছেড়ে দিতে পারি—ওই যে দুলারীর মা'র পাশের ঘরটা,—কিন্তু তারপর কি হল,—আমি জিজ্ঞাসা করি।

—তারপর হেঁ, হেঁ,...বুঝতে পারেন নি বুঝি, আমার অকৃত্রিম বন্ধু সলিলের সঙ্গে সে পালিয়েছে—আমার খোকাকে নিয়ে। কত খুঁজেছি আমার খোকাকে,—কিন্তু আজও পাই নি। এবার কান্না রোধ করবার সামর্থ্য তার থাকে না ; ছোট ছেলের মত হাউহাউ সে কাঁদে।

রাত গভীর হয়ে ওঠে। মাঝের ঘরে বিছানা পাতা হয় নবাগতের জন্যে। আমার চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসে। শুয়ে শুয়ে ভাবি এই অরন্তুদ জীবনেতিহাস। ভাবি—সংসারে এমন অনেক লোকই আছে—গভীর আঘাতের সংস্পর্শে এলে যারা প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। একটু স্নেহ-অনুকম্পার প্রত্যাশী হয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কে খোঁজ রাখে তাদের। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি কখন।

ভোরের সোণালী রোদে তখন ঘর ভরে ওঠে। বিহঙ্গ কলকণ্ঠে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক। গত রাত্রের দুর্য্যোগের স্মৃতি মনেও থাকে না। কী একটা কোলাহলে জেগে উঠি। ঘুম ভেঙ্গে যায়। কার যেন কাতর ক্রন্দনে বায়ু-স্তর ভারী হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি ছুটে যাই। এ কণ্ঠস্বর দুলারীর মা'র। আমার মাথা ঘুরে যায়—শিরায় শিরায় রক্ত ছোটে। কী বীভৎস, কী করুণ সে দৃশ্য! কে দুলারীকে যেন কণ্ঠরোধ করে মেরেছে। আঙ্গুলের রেখাগুলো ত' স্পষ্ট ফুটে ওঠে। দুলারীর মা কাঁদে অঝোর ধারায়।

মাতালের মত টলতে টলতে বেরিয়ে যাই। অনেক

লোকজনে সে স্থান ভরে যায়। পারলেন না মশায় ধরে রাখতে—ইনসপেক্টর বলে ওঠে আমায় দেখে।

বিমূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করি,—কাকে?

কেন, পাগ্‌লা পাতঞ্জলকে,—রামদীন,—কটা খুন করলো একে নিয়ে? পাঁচটা না?—ইনসপেক্টার বলে ওঠে।

—হাঁ বাবু পান্‌ঠো—মল্লিকবাবুকে লেড়কা; এক,—পঞ্চানন বাবুকো; দো,—আউর...

চেঁচিয়ে উঠি—পাগলা পাতঞ্জল!—কে সে?

—চেনেন্ না তাকে, মাথায় লম্বা লম্বা চুল,—বাঁদিকের ভ্রূর ওপর কাটা দাগ। ক্রোশ দুয়েক উত্তরে থাকে। লোকে বলে তার একটা ছেলে ছিলো—ভালবাসতো তাকে প্রাণের চেয়েও—তারই বউ না কি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যায়—সেই শোকে সে পাগল। কথা-বার্ত্তায় বোঝ্‌বার উপায় নেই কিন্তু। বেশ কথাবার্ত্তা কইবে। কিন্তু ছেলেপুলে দেখলেই ওই রকম ভাবে মেরে রাখে—খুনের নেশা জেগে ওঠে। নিজের ছেলে হারিয়েছে, অপরের দেখলে হিংসে হয়—তাই ভাবে এদেরই বা থাকে কেন তবে।...চেনেন্ না বুঝি তাকে? ইন্‌সপেক্টর বলে ওঠে।

—চিনি, আমি তাকে চিনি—এ ত' পাতঞ্জল নয়। এ যে আমার সন্ধ্যার অতিথি! ঝড়ের বেগে ছুটে যাই মাঝের ঘরে। হাহা করে ঘর-খানা হেসে ওঠে।... অতিথি নেই।

গত সন্ধ্যার একটা ছবি ভেসে বেড়ায় আমার চোখের সামনে—

দুলারী দাঁড়িয়ে থাকে জান্‌লার ধারে—নীরব নিস্পন্দ সব...বাইরে ঝড়বাতাসের তুমুল মাতামাতি। কার কালো ছায়া-মূর্ত্তি ঘুরে বেড়ায়—প্রকাণ্ড দু'খানা হাত এগিয়ে আসে তার কণ্ঠরোধ করতে।

আমার মাথাটা ঘুরে ওঠে। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি অর্থহীন ভাবে। শুধু দুলারীর মা'র অন্তর্ভেদী কাঁদনের সুর আমার কানের চার পাশে বেজে ওঠে—ফিরে আয়, তুই ফিরে আয় ...!

শ্রীতারাকুমার সান্যাল
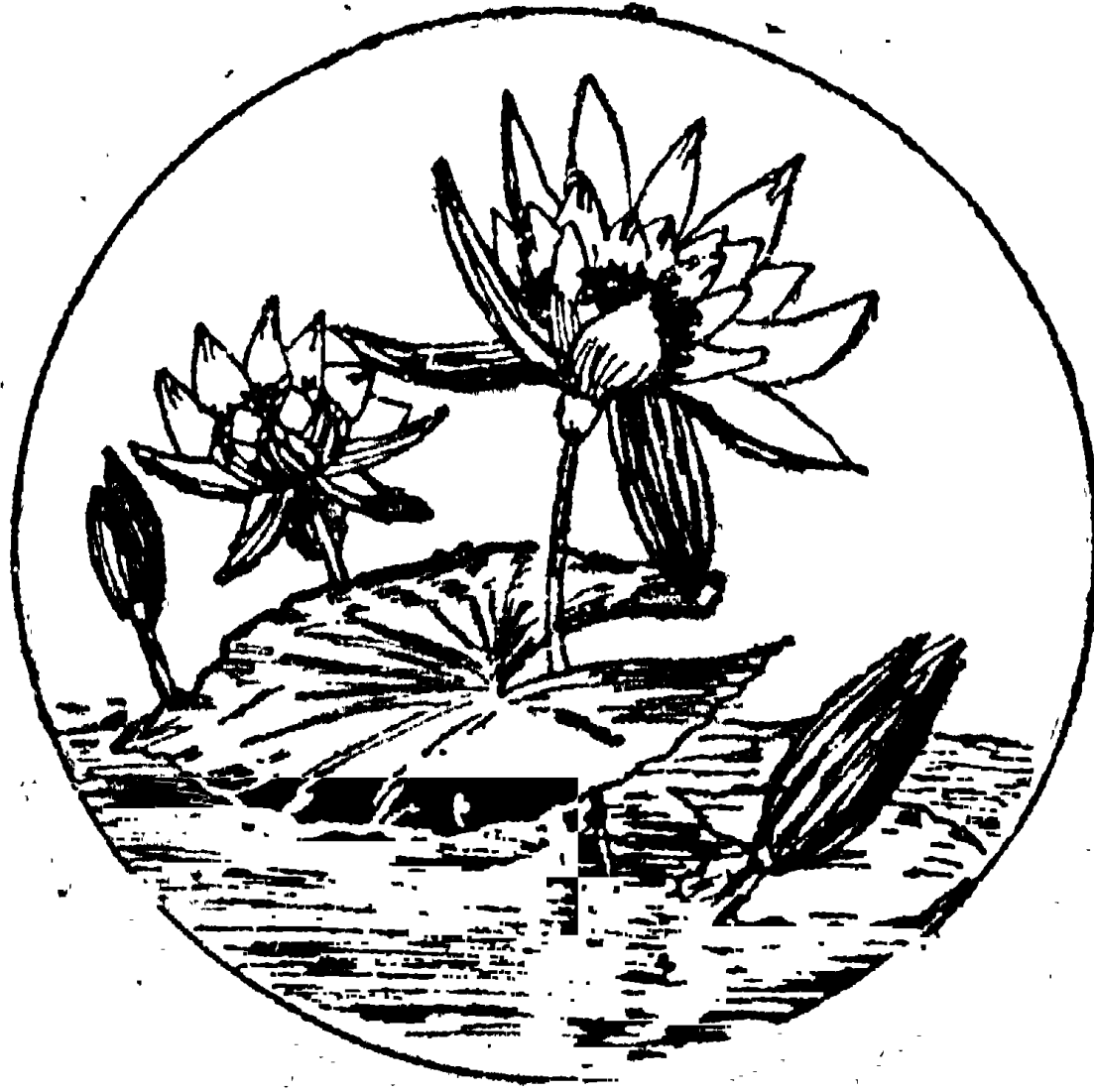
চোর

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

নিঝুম নিশীথের কালো অন্ধকার। পল্লীপ্রান্তের নিরালা কুটীরখানি সেই কৃষ্ণতায় নিজেকে ঢাকিতে পারিয়া একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছে। যা হোক তবু, কয়েক ঘণ্টার জন্যও নিজের জীর্ণ দরিদ্র দেহখানিকে লোকচক্ষুর ব্যর্থ কুটিল করুণা হইতে—তাচ্ছিল্যের—নিন্দার করুণা হইতে সে বাঁচাইতে পারিল তো।

যদি ভাবা যায় যে, ওই ঘরখানির ভিতরে পাতা আছে এক শয্যা, না ভাবিয়া যার বিশেষণ দেওয়া যায় 'দুগ্ধফেননিভ', আর সেই শয্যার কোলে নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় রহিয়াছে কোনো এক খেয়ালী লক্ষপতি, তবে তা হবে খাপছাড়া কল্পনা। এবং সত্যই যদি তাই হয়, তবে সে হয় রীতিমত 'রোমান্স।'

কিন্তু কুটীরের ভিতরের বিনিদ্র বেকার যুবকটি—আপনার রূপের এবং অর্থের অতি দৈন্য লইয়া রোমান্সের স্বপ্নও কোনোদিন দেখার দুঃসাহস সে করে না।

দীনেশের ঘুম পাইতেছিল না। পাওয়া অসম্ভব। দুইদিন ধরিয়া উদরে শুধু মাত্র সলিলের শূন্যতা লইয়া ঘুমাইতে কেহ পারে? দুইদিনই,—আজ রাত্রিটা কাটিয়া গেলেই পরিপূর্ণ দুইদিন সে উপবাসী। পরশু রাত্রে নিজের শেষ পয়সাখানি দিয়া সে চিঁড়া কিনিয়া খাইয়াছে। মুড়ি নয়—মুড়কী নয়—চিঁড়া, কারণ তা বেশীক্ষণ পেটে থাকিবে।

কিন্তু এক পয়সার সে চিঁড়া কোন্‌কালে পেটের আগুনে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তারপর যতবার ক্ষুধার তীব্রতা অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, ততবারই সে শুধু জল খাইয়াছে—শুধু জল। আর কিছু না। এই জল পাওয়ার জন্য ভগবানকে যত দিয়াছে, তার বেশী ধন্যবাদ দিয়াছে সে পুকুরের মালিককে। কারণ জলের জন্য তিনি পয়সা নেন না। নেন না কেন? দীনেশ বিস্মিত হয়। এবং তার চেয়েও বেশী করিয়া সে ধন্যবাদ দিয়াছে দেশের শাসককে, কারণ জলের উপর 'ট্যাক্স' বসাইয়া পুকুরের মালিককে তার দার দাম নিতে তিনি বাধ্য করেন নাই। অসীম দয়া!

পুকুর যাঁর দয়া তাঁর সত্যই আছে। তা না হইলে নিজের ভুখাকাতর দেহখানিকে দীনেশ রাখিত কোথায়? অনেক জায়গায় ব্যর্থ ঘুরিয়া এখানে আসিয়া মাসিক তেরো টাকা মাহিনায় কাপড়ের কলের কুলিগিরিটি জুটাইতে পারিয়া ভারী ভাবনায় সে পড়িয়া গিয়াছিল, থাকিবে কোথায়।

এ ভদ্রলোক তখন তাঁর শূন্য বাগানবাড়ীর জীর্ণ কুটীরখানি তাকে থাকিতে দিয়াছেন। দীনেশ বর্ত্তিয়া গিয়াছে। দুইমাস হইল চাকরীটি তার নিতান্ত বিনা কারণেই গিয়াছে। কর্ম্মচারী কমাইয়া মিলের কর্ত্তৃপক্ষ খরচ কমাইয়াছেন। হাজারো টাকা যেখানকার আয়, মাসিক তেরো টাকা বেশী খরচ করিয়া দীনেশকে প্রাণে বাঁচার সুযোগ দিলে কি এমন ক্ষতি তাঁদের হইত, তা সে বুঝে না।

গত কালও সে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়াছে। তিনি তাঁর পুরাতন পরিচিত বহু-উচ্চারিত সেই জবাব দিয়াছেন, চাকরী খালি নাই এবং সত্বর-ভবিষ্যতে খালি হওয়ার সম্ভাবনাও একেবারে নাই। দীনেশ সারা দিনের উপবাসী, তা শুনিয়াও চারটি পয়সাও তাঁর হাতে উঠে নাই।

যাঁদের আছে তাঁরা, যাদের নাই তাদের উপরে এত নির্দ্দয় কেমন করিয়া হইতে পারে! আশ্চর্য্য! পেটের ক্ষুধায় নাড়িভুঁড়ি যখন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে, তখনো মুখ ফুটিয়া লোকের দুয়ারে ভিক্ষা চাওয়ার মত

দুঃসাহস কেন সে করিতে পারে না, একথা ভাবিয়াও দীনেশ কম বিস্মিত হয় না।

আজিকার সন্ধ্যা পর্য্যন্তও কাহারো কাছে সে হাত পাতিতে পারে নাই, হয় তো ক্ষুধার দাহন সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই বলিয়াই। এখন, কোনো লোকের দেখা মিলার সম্ভাবনা এখন নাই। থাকিলে, এ অবস্থায় দীনেশ হয় তো যার তার কাছে হাত পাতিয়া বলিতে পারিত,—একটা পয়সা দয়া করে আমায় দিন, খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি। কিন্তু জনহীন রাতে কোথায় মানুষ। ভিখারী আসার সম্ভাবনায়ই বা কোন পুণ্যকামী এখনো জাগিয়া আছে? কেহ নাই।

উঃ! আর সে পারে না। ক্ষুধায় সে মরিয়া যাইতেছে। তাই বা যাইতেছে কই? মরিলে তো বাঁচিত সে, বাঁচিত।

কষ্টে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরের কোণে গেল। মাটির কলসীতে জল আছে। এক গেলাস ঢালিয়া লইল। ঢক ঢক করিয়া নিঃশেষে গিলিয়া ফেলিল। পেটের ভিতর একটা মোচড় খাইয়া গেল। এবং একটু পরেই বমি হইয়া সব জল বাহির হইয়া গেল। মাথা ঘুরিয়া উঠিল। ভগবান! জল, বিনা পয়সার জল তার পেটে থাকিবে না?

দীনেশের ভয় হইল। সত্যই সে মরিয়া যাইবে? অথচ একটু আগেই সে মনে করিয়াছিল, মৃত্যুর চেয়ে বড় কাম্য এ অবস্থায় তার আর থাকিতে পারে না কিছু।

হতভম্ব হইয়া কতক্ষণ সে বসিয়া রহিল। কিছুই ভাবিতে পারিল না। মাথার ভিতর কতগুলি পোকা যেন কিলবিল করিয়া ঘুরিতেছে। নড়িবার কোনো চেষ্টাও সে করিল না। হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া রহিল।

জল, শেষে জলও সে খাইতে পারিবে না?

আবার একগ্লাস জল সে ঢালিল। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া খাইতে লাগিল। তার মনে হইয়াছিল একবার যে, খালিপেটে অতগুলি জল একেবারে খাইয়াছিল বলিয়াই বমি হইয়াছে। ধীরে ধীরে সবটুকু জল সে খাইয়া ফেলিল। তারপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, এবারে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়ায় তাই অনুভব করিতে চাহিল। নড়িল না। পাছে নড়াটাই যদি বমি হওয়ার একটা কারণ হইয়া দাড়ায়। ওই জলটুকুকে তার সবখানি চেষ্টায় পেটের ভিতর জমাইয়া রাখিতে চাহে। বাঁচিতে চাহে সে।

কতক্ষণ কোনো উপদ্রব দেখা গেল না। একটু পরেই কিন্তু পেটে মৃদু বেদনা সে অনুভব করিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিছানায় আসিল। পেটের তলায় বালিশ চাপা দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। তাতে একটু আরাম পাওয়া গেল। ক্রমে ব্যথাটা আর বোধ হইল না এবং দীনেশের দুটি চোখ পাতলা একটু ঘুমের আমেজে মুদিয়া আসিল।

কতক্ষণই বা? পনেরো মিনিট। তারপরই সে জাগিয়া গেল। কেমন অস্বস্তি বোধ করিয়া সে উঠিয়া বসিল। হঠাৎ আবার বমি হইয়া সবগুলি জল পড়িয়া গেল। বিছানা ভাসিয়া গেল। একটু সামলাইয়া নীচে নামিবার অবকাশটুকুও সে পাইল না।

বমি করিয়া দীনেশ হাঁপাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। সত্যই কি বাঁচিবে না? কি খাইয়া বাঁচিবে?

কি করিবে—এখন সে করিবে কি? কি করা উচিত? কে বলিয়া দিবে। কিছু ভাবিয়া স্থির করার মত অবস্থা নয় তখন।

অনাহারে মৃত্যু কি রকম? আর কতক্ষণ পরেই তার দেহটি নিঃসাড় হইয়া পড়িবে না কি। তারপর হয় তো নিঃশ্বাসও পড়িবে না। পরদিন যদি কেহ কোন কাজে আসে এদিকে, তবে আবিষ্কার করিবে যে দীনেশ মরিয়াছে। তারপর তার মৃতদেহটাকে গোর দেওয়া হইতে পারে অথবা গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইবে হয় তো। আর, কেহ যদি না দেখিতে পায়, তবে তার শবদেহটি এই ঘরেরি ভিতরে—এই বিছনারি উপরে পচিয়া গলিয়া থাকিবে। শিয়াল কুকুরে মহাআনন্দে তা কাড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।

দৃশ্যটি কল্পনা করিতে তার সারা শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল।

মা বাবা দীনেশের নাই। ভাইবোন আত্মীয়স্বজন সবাই এখন হয়তো ভাবিয়াই পাইতেছে না যে, কেন সে দুইমাস ধরিয়া টাকা পাঠান বন্ধ করিয়াছে। চাকরী যাওয়ার পরে সে একখানি চিঠিও বাড়ীতে লেখে নাই। লিখিয়া লাভ নাই। তার বেকারত্বের দুঃখ বুঝার কেহ সেখানে নাই।

কিন্তু এমন করিয়া সে মরিতে পারে না। অসম্ভব। আর সে এমনই বা কেন? নিজের উপরে তার রাগ হইল। পেটের ক্ষুধায় যখন মরিয়া যাইতেছে, তখনো লোকের কাছে চাহিতে কেন সে পারে না!

দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এত রাত্রিতে সে যাইবে কোথায়? বাজারে খাবার দোকান অনেকক্ষণ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে নিশ্চয়ই। খোলা থাকিলেই কি বাকীতে সেখানে খাবার পাওয়া যাইবে? যাইবে না? দোকানদার কি এত নিষ্ঠুর যে, দুই দিনের উপসী জানিয়াও কিছু তাহাকে খাইতে দিবে না।

দীনেশ বাহির হইয়া পড়িল।

দুই দিনের উপবাসী। কি অকর্ম্মণ্য শরীর তার? কত রাজবন্দী যে কত দিন ধরিয়া অনশনে থাকে, তারা তো মরে না। আর দুই দিনেই সে মরিয়া যাইবে?

কিন্তু রাজবন্দীরা অনশনে থাকিতে পারে, একটা উত্তেজনা থাকে বলিয়া। দীনেশ কিসের উত্তেজনা লইয়া বাঁচিবে। উপার্জ্জনহীন জীবনে কোন উত্তেজনা নাই। নিরাশার শীতলতায় এমনি সে মরিয়া থাকে। তাই দুদিনের উপবাসকে সে সহিতে পারিতেছে না।

আর দিনের পর দিন অনাহারে থাকিয়া নাকের ডগায় নিশ্বাসটুকু লইয়া বাঁচিয়া থাকায় তাহার কি লাভ? তার চাইতে কিছু খাবার পাইয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারিলে পাঁচ জায়গায় চাকরীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারে সে।

দীনেশ চলিতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীর। পা উঠিতে চায় না। না, আরো দুর্ব্বল হইলে তার চলিবে না। নূতন চাকরীর খোঁজ তাকে করিতে হইবে।

পথের দুইপাশের বাড়ীগুলি নিঃশব্দ ঘুমন্ত। এসব বাড়ীর লোকগুলি কি নিশ্চিন্তেই না ঘুমাইতেছে। দীনেশের মত দুর্দ্দশায় পড়িয়া ঘুমাইতে পারে না বলিয়া কেহ জাগিয়া নাই।

খাবার দোকানে যাইয়া দোকানীকে হাঁকডাক করিয়া যদি জাগাইয়া তোলা সম্ভব হয়, সে খাবার দিবে কি? যদি না দেয়—

একটা কাঁচা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দীনেশ দাঁড়াইল। মিলে যখন সে কাজ করিত, তখন এ বাড়ীতে একদিন খাওয়ার নিমন্ত্রন পাইয়াছিল সে। এ বাড়ীর একটি ছেলেও মিলে কাজ করিত। অন্য মিলে এখন ভাল কাজ সে পাইয়াছে। তার বিবাহে এ মিলের সব বাঙালী কর্ম্মচারীকে সে নিমন্ত্রন করিয়াছিল।

সেদিনকার ভোজ্যগুলির দৃশ্য মনে ভাসিয়া উঠিতেই দীনেশের ক্ষুধা যেন হাজারগুণ বাড়িয়া উঠিল।

আচ্ছা, ওদেরকে ডাকিয়া জাগাইলে কেমন হয়? জাগাইয়া যদি সে খাইতে চায়, তবে কি দিবে না ওরা? যদি জানায় যে, দুইদিনের সে উপবাসী তবু দিবে না, নিশ্চয়ই দিবে। বাঙালী কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে?

বাড়ীটার চারিদিকে প্রাচীর নাই। কাঁটাতারের বেড়া আছে। বড় বড় কাঁচা ঘরগুলি—করগেট টিনের চাল। অবস্থা মন্দ নয় ওদের। পাকা বাড়ী করিতে পারে শীঘ্রই। বাঁশের তৈয়ারী ফটক খুলিয়া দীনেশ বাড়ীতে ঢুকিল।

কোন দিকে টুঁ শব্দটী নাই। ঘরগুলিও যেন ঘুমাইতেছে। সম্মুখে গিয়াই বাঁদিকে ওদের রান্নাঘর। নিমন্ত্রনে আসিয়া দীনেশ দেখিয়াছে।

ওই ঘরের এককোণে নিশ্চয়ই রহিয়াছে একটি হাঁড়ী—সে পিতলের হোক আর এলুমিনিয়ামেরই হোক। মাটিরও হইতে পারে। তার আশেপাশে আছে তিন চারিটি

লোহার কড়াই, কয়টি বাটি, হাতা, খুন্তী—এমনি রান্নার সব সরঞ্জাম।

দৃশ্যটী দীনেশ যেন দেখিতে পাইতেছে।

হাঁড়িটির মুখের ঢাকা খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে চার্‌টিখানি ভাত তার তলায়। বাঙালীর বাড়ীর হাঁড়িতে, দীনেশ জানে, একজন লোকের ভাত অন্ততঃ থাকেই। আর একটি কড়াইতে হয়তো ঢাকা আছে একটু তরকারী; আরেকটিতে একটু মাছের ঝোল।

মাছের ঝোল!

দীনেশ ডাকিয়া উঠিল,—কে আছেন বাড়ীতে?

আর না ডাকিয়া সে থাকিতে পারে নাই। কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠ। কেহই সাড়া দিল না। সেই একটুখানি শব্দে নিথর নিশীথ থম্‌থম্‌ করিয়া উঠিল। ভয়ে ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল দীনেশের মন। চুপ করিয়া সে দাঁড়াইল খানিকক্ষণ।

ক্ষুধা। তার কাছে ভয় মানিল পরাজয়। ওই ঘরের হয়তো ওই কোণটিতে আছে ভাত তরকারী—

তার মনে আসিল নূতন ভাবনা। না, ওদেরকে ডাকিয়া জাগাইয়া কাজ নাই। এত রাতে ঘুম ভাঙার বিরক্তিতে দীন-বাৎসল্য তাদের যদি ঢাকা পড়িয়াই যায়?

আর একটুও শব্দ না করিয়া দীনেশ পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া চলিল—রান্নাঘরের দিকে।

জাগিয়া কেহ নিশ্চয়ই নাই। থাকিলে তার ডাকে সাড়াই দিত। দীনেশ খাইতে আরম্ভ করিলে কেহ যদি টের পাইয়া যায়? যাইলেই বা। অতখানি ক্ষুধা লইয়া একজন লোক তাদের বাড়ীতে দুটি ভাত খাইতে দেখিলে মনে তাদের দয়ার উদয় হওয়াই তো উচিত। আর তাদের স্বজাতিই দীনেশ।

হাতড়াইতে হাতড়াইতে ভাতের হাঁড়িতে তার হাত ঠেকিল। পুলকে অন্ধকারে দুটি চোখ তার জ্বলিয়া উঠিল। ভগবান!

আ-স্তে, খু-উ-ব আস্তে হাঁড়ির মুখের ঢাকা সরাইয়া সে ভিতরে হাত দিল। সত্য তার অনুমান। ভাত আছে অনেক।

তরকারী? যদিও এ দারুণ ক্ষুধা লইয়া তরকারীর খোঁজ করা তার পক্ষে সঙ্গত নয়; তবু তরকারীর খোঁজ সে করিল। মিলিয়া যায় যদি তো সোনায় সোহাগা।

মিলিল। পাশে একটি ধামার তলায় একখানি ছোট রেকাবীতে—এনামেল করা লোহার রেকাবী, তা বুঝা গেল—পাওয়া গেল দুইটি তরকারী। কি তরকারী কে জানে? তরকারী—ভাতকে মুখরোচক করিয়া তোলার দুইটি উপাদান—ব্যস্‌!

দীনেশ সেই রেকাবীতেই ভাত তুলিয়া লইল। ক্ষুদ্র রেকাবীতে যা ধরিল তা ছাড়া হাঁড়ির মুখের সরায় করিয়াও লইল। তাকে যে অনেক খাইতে হইবে। কি প্রচণ্ড তার ক্ষুধা!

ভাত তরকারী উনুনশাল হইতে একটু তফাতে লইয়া রাখিয়া সে খাইতে বসিল।

একটা তরকারী একটু খারাপ হইয়াছে। হোক। খারাপ-ভাল দেখার অবস্থা তার নয়। গপাগপ কয় গ্রাস সে গিলিল।

তৃপ্তি—আঃ, কি তৃপ্তি!

একটু খাবার জল হইলে ভাল হয়। সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কাছেই—হাতের নাগালের মধ্যে কি একটা অন্ধকারে একটু চক্‌চক্‌ করিতে লাগিল। ঘটি বা গেলাস বা এমনি কিছু হইতে পারে। দীনেশ হাত বাড়াইল।

হাত ঠেকিয়া কি কতগুলি বাসন-কোসন পড়িয়া ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল। তার বুকের ভিতর খচ্‌ করিয়া উঠিল।

—কে—কে! সঙ্গে সঙ্গেই রব উঠিল। বেশী দূর হইতে নয়। সেই ঘরেরি ভিতর হইতে। রান্নাঘরেই যে সে বাড়ীর ঝি শোয়, তাতো দীনেশের জানা থাকা সম্ভব নয়।

দীনেশ কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। ভয়ে সে ছুটিয়া

পলাইতেও পারিল না। মনকে সে বুঝানর চেষ্টা করিল যে, তার অবস্থা জানিলে দয়াই ওদের হইবে। কিন্তু কার অদৃশ্য হাত তার বুকের ভিতরের হৃৎপিণ্ডটিকে এমন জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, নিশ্বাস তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিতে চায়।

ছঁ—অ—ৎ করিয়া দিয়াশলায়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল। ধরা পড়িল দীনেশ। ঝি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, —চোর—চোর! মুহূর্ত্ত কয়েক। তারপরেই হুড়হুড় করিয়া বাড়ীর লোক সব ছুটিয়া আসিল।

হাতে হাতে চোর ধরার উত্তেজনায় দীনেশের নিজের কথাটা কাহারো কানে গেল না। হিড়হিড় করিয়া সবাই তাকে টানিয়া আনিল উঠানে। তারপর যে প্রহার চলিল, অমন দুর্ব্বল দেহে তারপরেও মানুষের বাঁচিয়া থাকা দেহের দৃঢ়তার বিস্ময়কর প্রমাণ।

মার থামিতে একজন বলিয়া উঠিল,—এ যেন চেনা চেনা ঠেকছে?

দীনেশের আশা হইল। এতক্ষণে চিনিতে পারিয়াছে যা হোক। আরেকজন লোক আলোটি তার মুখের কাছে ধরিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল,—এ যে ঠাকুরবাগানের লোকটি হে।

দীনেশের আশা এবার জোর পাইল। মিথ্যা আশা কিন্তু। একজন মন্তব্য প্রকাশ করিল,—কাপড়ের কলটা হয়ে চোর-ছ্যাঁচোড়ে গাঁ ভর্ত্তি হয়ে গেল দেখছি।

দীনেশের কান ধরিয়া আগের লোকটি বলিল,—চুরি করবার আর জায়গা পাও নি বাপধন। যে গাঁয়ে থাকো শেষে সেই গাঁয়েই চুরি? চলো এবার থানায়।

দীনেশের এবার আশার ধারা গেল উল্টা দিকে। যাক্, জেল যদি হয় তো খাইয়া বাঁচিতে অন্ততঃ পারিবে সে।

প্রবীণ গোছের একজন লোক তখন গল্প ফাঁদিয়াছেন—কেমন করিয়া চোরেরা আজকাল গেরস্তের ভাত আগে মারিয়া পেটঠাণ্ডা করিয়া তারপর চুরি করে এবং কতবড় সেয়ানা আজকাল চোরেরা হইয়াছে—তাই লইয়া।

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রতীক্ষার শেষ

শ্রীপ্রকাশ বসু

পূর্ব্বদিগন্তে উদয়োদ্যত রবির মৃদুল আভায় একরাশ সাদা পালকের মতো হাল্কা মেঘ গোলাপী হয়ে উঠ্‌ল। ভোরের বাতাস পুষ্প পরিমলে ভরা,—ভোরের আকাশ নিশার শেষ আর প্রত্যুষের মিলন মুহূর্ত্তটির লজ্জানিবিড় অরুণিমায় রঙীন্।

অর্ণবের ঘুমের ঘোর তখনো কাটে নি—অন্য ঘরে কণিকা তার মধুর তরুণ কণ্ঠে প্রভাতী ধরেচে। তার গানের সুর অর্ণবের তন্দ্রালস কাণে স্বপ্নস্নিগ্ধ মধুরিমায় ভরে উঠ্‌ছিল, সে ভাব্‌ছিল—"যদি পৃথিবীটা শুধু ঘুমে জাগরণে মেশা প্রভাতী গানের সুরে ভরা হতো—" কিন্তু সম্মুখেই পড়ে আছে দীর্ঘ নিরানন্দ অলস দিনটি। তার মুখে অতৃপ্তি ও ক্লান্তির রেখা ধীরে ফুটে উঠ্‌ল।

খানিক পরে যখন সে নীচে নেমে এল, তখন কণিকা বিচিত্র চিত্র আঁকা সৌখীন পেয়ালায় চা ঢালছিল; অর্ণব বল্লে,—"বৌদি, আজ সকালে ত বেশ গাইছিলে; আমার ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল!"

অর্ণবের দাদা অসিতরঞ্জন ঈষৎ হেসে খবরের কাগজখানা নামিয়ে রেখে বল্লেন,—"তোর ত ভাল লাগ্‌বেই—আমার এদিকে ভোরের ঘুমটা একেবারে মাটী—"

বেচারী কণিকার শুভ্র ললাট অরুণাভ হয়ে উঠ্‌ল; সে বাঁ হাতে অবাধ্য চুলগুলি কাণের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে, অসিতের পেয়ালা শূন্য দেখে বল্লে,—"আর এক পেয়ালা ঢেলে দেবো?"

অসিত মৃদু হেসে বল্লেন,—"ঘুম ভাঙানোর ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ?" বলে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পুনরায় বলে উঠ্‌লেন—'থাক্, অন্যদিক দিয়ে পূরিয়ে নেবো।" বলে বেরিয়ে গেলেন বেড়াতে।

অর্ণবও প্রাতরাশ শেষ করে ওপর তলায় নিজের বস্‌বার ঘরে চলে গেল।

আজ কিছুদিন এঁরা বাংলা ছেড়ে এই সুদূর বিদেশে এসেছেন। এখানে আসার কারণ, একঘেয়ে বাংলায় থেকে তাঁদের মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই যদি এই সুদূর বিদেশে কিছু নূতনত্ব পাওয়া যায় এই আশায়।

অর্ণব ওপরে তার ঘরের জান্‌লার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে দেখ্‌লে,—সাম্‌নে সুপ্রশস্ত লাল রাস্তাটা দুদিকেই অনেক দূর চলে গেছে। খানিক দূর অন্তর অন্তর ছবির মতো সুন্দর এক একটা বাংলো; আর তাদের মাঝে মাঝে দু একটা বড় সুদৃশ্য অট্টালিকা,—চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া, বাগানে ঘেরা, অসংখ্য তরুলতায় সযত্নে সাজানো।

অর্ণবদের নিজেদের বাড়ীখানিও এই প্রকার একটি সুরম্য অট্টালিকা। অর্ণব তখনো সেখানে দাঁড়িয়েছিল—কণিকা নিঃশব্দে ওপরে এসে বলে উঠ্‌ল,—"কি দেখা হচ্ছে ঠাকুরপো।"

সে ফিরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হেসে বল্লে,—"কই? বিশেষ কিছুই তো নয়!"

কণিকা তার নিবিড় ভোমরা কালো চুলের গুচ্ছ আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে, জানলার কাছে সরে এসে বল্লে,—"ঠাকুর পো, বল্‌তে পারো, সাম্‌নের ঐ বাংলোটি কাদের? কেউ ত নেই—থাক্‌লে কিন্তু বেশ হতো!"

অর্ণব অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌লে,—"না, জানি না ওটা কার বাংলো।"

অসিত, কণিকা ও অর্ণব কয়েক দিন হল এখানে এসেচেন। অসিতের সদা প্রফুল্লচিত্ত কিছুতেই অপ্রফুল্ল হয় না। তিনি সকাল সন্ধ্যে বেড়িয়ে বেড়ান স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। সঙ্গীর অভাব তার কোথাও হয় না; এখানেও তিনি অনেকগুলি বন্ধু আবিষ্কার করে ফেলেচেন। কিন্তু কণিকা সে অভাব একটু বোধ করছিল। তবে অর্ণবের

কথা স্বতন্ত্র,—তার এক জ্যোৎস্নাময় ছাড়া বোধ হয় দ্বিতীয় বন্ধু আর কেউ ছিল না। আর সেও এখন কোলকাতায়; কাজেই দীর্ঘ দিনগুলো তার নিতান্তই অসহ্য হয়ে উঠেচে।

সেদিন সে ওপরের বস্‌বার ঘরে একটা বড় সোফায় আরামে হেলান দিয়ে একটা মাসিক পড়ছিল, কিন্তু তার মন ছিল অন্য দিকে। সে ভাবছিল অনেকদিন আগেকার কথা,—তার মুখে বিষণ্ণ হাসির আভাস ফুটে উঠ্‌ল।...

তরুণ জীবনের প্রভাতে,—উচ্ছ্বাসের সেই প্রথম তরঙ্গে—এমন একটি সময় প্রায়ই আসে, যখন ফাল্গুনের সবুজের উন্মেষের সঙ্গে, আকাশের আলো আর বাতাসের শিহরণের সঙ্গে, হৃদয়ও বসন্ত মাধুরীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে! তখন শুক্লাত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না প্লাবনের মাঝে, স্বচ্ছ প্রভাতের স্নিগ্ধ শ্যামলতার মাঝে, স্তব্ধ প্রদোষের গভীর শান্তির মাঝে, সুন্দরের সহিত আত্মার প্রথম পরিচয় হয়! তরুণ অর্ণব কৈশোরের প্রান্তে উপনীত হয়ে একদিন অকস্মাৎ এই পরিচয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল।

—কিন্তু জগৎ কঠোর বাস্তবতায় পূর্ণ; সোনালী স্বপন গোধূলির স্বর্ণরাগের মতো অচিরে বিলীন হয়; রেখে যায়, —একটা পুঞ্জীভূত অন্ধকার, যেটা জ্যোতিরুৎসবের পরেই বড় দুঃসহ হয়ে ওঠে।...অর্ণবের সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। তীব্র বিরক্তি ও অতৃপ্তি তার মন তিক্ত করে তুল্‌ল।

দুই

যখন অসিতরা এখানে এলেন, তখন জ্যোৎস্নারও আসবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে তার আসা হল না; ঠিক হল দিন কতক পরে সে আস্‌বে।

সেদিন বিকেলে কোন খবর না দিয়েই জ্যোৎস্না হঠাৎ এসে পড়ল। রাতে খাওয়ার পরে সবাই ওপরে ড্রয়িংরুমে এসে বসেচে। কণিকা আপন মনে পিয়ানো বাজাচ্চে; অসিত জ্যোৎস্নার কাছ থেকে কল্‌কাতার আধুনিকতম খবরগুলি জেনে নিচ্চেন। অর্ণব বসেছিল এক পাশে; একটু পরে সে জান্‌লার পাশে সরে এসে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল, —"বৌদি, এদিকে এসো একবার।"

কণিকা উঠে এলে অর্ণব বল্লে,—"ওই বাংলোয় আলো জ্বল্‌চে দেখ্‌চো?—নিশ্চয়ই আজ বিকেলে কেউ এসেচেন।"

অসিত তাদের দিকে চেয়ে বল্লেন,—"ব্যাপার কি?"

কণিকা তাঁকে ব্যাপারটি জানালে, তিনি বিজ্ঞভাবে হেসে বল্‌লেন,—"ওটা ত আমাদের মুরারীবাবুর বাংলো, তিনিই এসেচেন সম্ভবতঃ।"

কণিকা বল্‌লে,—"মুরারীবাবু কে?"

অসিত বল্‌লেন,—"তিনি বাবার বন্ধু; এখন চাক্‌রী থেকে অবসর নিয়েচেন, তাই বোধ হয় এখানে এসেচেন বেড়াতে।"

অর্ণব বল্‌লে,—"হাঁ বুঝেচি,—আমি তাঁকে আমাদের বাড়ীতেই বোধ হয় বার কতক দেখেচি।"

কণিকা গল্পের সাথী পাবার আশায় মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল; তার উৎসাহ এরি মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক কমে গেছে—বৃদ্ধ মুরারীবাবুর সঙ্গে ত গল্প করা চলে না, অন্ততঃ তাঁর স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয়া থাক্‌লেও হতো—কণিকা তাই ভাব্‌ছিল।

জ্যোৎস্না হঠাৎ বলে উঠল,—"ছাখো অর্ণব, আমার এতক্ষণে মনে পড়েচে,—আমি যখন ষ্টেশনে নামি, তখন আমার পাশের ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট থেকে একজন বৃদ্ধ ও একটি তরুণী নাম্‌লেন। তাঁরাই হয়ত এসেচেন ওখানে—"

কণিকার নির্ব্বাণোন্মুখ আশা দীপ আবার জ্বলে উঠল, অসিত জ্যোৎস্নাকে বল্‌লেন,—"ঐ বৃদ্ধটিই মুরারী-বাবু—"

অর্ণব কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত মৃদুকণ্ঠে জ্যোৎস্নাকে বল্‌লে,—"তুমি যে আমায় ভাবিয়ে তুল্‌লে হে—আমাদের বাড়ীর পাশেই এক তরুণী!—জ্যোৎস্না, আমি তোমার জন্য চিন্তিত, বিশেষ যখন—"

অর্ণবের কথা শেষ করতে দিল না, জ্যোৎস্নার সুপুষ্ট হাতের একটি বিশিষ্ট আঘাত অর্ণবের পিঠে সশব্দে পড়্‌ল।

সে উচ্চহাস্যের সহিত বল্‌লে,—"আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে, কে কার জন্য চিন্তিত !"

অর্ণবের মন্তব্যটুকু অসিতের কাণে যায় নি,—হঠাৎ উচ্চ হাসি ও একটা শব্দ শুনে, মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে তিনি জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—"কি হল ?"

জ্যোৎস্না অতি ভাল মানুষটির মতো বল্‌লে,—"না, বিশেষ কিছু নয়—"

তার পরদিন বিকেলে সবাই বেড়াতে বেরিয়ে তাদের পাশের বাংলোর সাম্‌নে দিয়ে যাচ্চে, এমন সময় হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল মুখ একজন যুবক ও একটি তরুণী বাংলো হতে বার হয়ে অসিতদের সাম্‌নে এসে পড়ল। কণিকা বিস্মিত হয়ে ডেকে উঠল,—"লহরী !—"

লহরী তখনও তাকে দেখে নি, পরিচিত কণ্ঠে নিজের নাম শুনে চম্‌কে চাইতেই সে কণিকাকে দেখতে পেলে।

অসিতরঞ্জন তাদের বল্‌লেন,—"তোমরা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ, না—?" তারপরেই কণিকাকে বল্‌লেন,—"তোমার বন্ধু ও কলেজের সহপাঠী লহরী যে মুরারী-বাবুরই কন্যা, তা আমি জানতুম,—কিন্তু তুমি নিজে তা জান্‌তে না; তাই আমি ইচ্ছে করেই কিছু বলি নি—বিশেষ অন্যায় করি নি—কি বল লহরী? চিন্ময়, তুমি ফিরলে কবে? আমি জান্‌তুম তুমি এখনো অক্সফোর্ড-এ।"

চিন্ময় এতক্ষণ অনেকগুলি বিস্ময়ের ধাক্কায় নির্ব্বাক্ হয়ে গেছিল, এখন সে সহাস্যমুখে বল্‌লে,—"সম্প্রতি সেখানের পড়া শেষ করে কল্‌কাতা এসে বাবার অসুস্থতা হেতু এখানে এসেচি।" তারপর জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে বল্‌লে,—"দেখুন, আপনাকেও আমি চিনি; স্কটিস চার্চ্চ কলেজে আই-এস-সি পড়বার সময় আপনাকে দেখিছি আমাদের সঙ্গে পড়্‌তে।"

জ্যোৎস্না হেসে বল্‌লে,—"আমারও ঠিক্ তাই মনে হচ্চে।"

অসিত মুরারীবাবুর কথা জিজ্ঞেস করায় চিন্ময় বল্‌লে,—"বাবা আজ আর বেরুলেন না—আমাদের বল্‌লেন একটু ঘুরে আসতে।"

খানিক পরেই সবাই গল্প জুড়ে দিয়েচে দেখে অসিত-রঞ্জন বল্‌লেন,—"যখন এইখানেই দেখা হয়ে গেল, তখন একসঙ্গেই যাওয়া যাক।"

অর্ণব এতক্ষণ নীরবে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল; সকলে অগ্রসর হলে সেও সকলের পশ্চাতে চল্‌ল।

ঘণ্টা দুই পরে যখন তারা ফিরল, তখন সবায়েরই আলাপ বেশ সহজ হয়ে এসেচে,—অর্থাৎ চিন্ময় ও জ্যোৎস্না পুরাণো বন্ধুর মতোই গল্প করতে করতে আগে আগে চল্‌ছিল; লহরী, কণিকা ও অসিতরঞ্জন তাদের পশ্চাতে, অর্ণব এক্‌লা সবার শেষে।

তিন

চিন্ময়দের সাথে এদের ঘনিষ্ঠতা যেরূপ দ্রুতবেগে বেড়ে উঠ্‌ল, তা কল্‌কাতায় গত কয়েক বৎসরের আলাপেও হতে পারে নি, বাংলার বাইরে, বিদেশে, এরকম হঠাৎ পাওয়া বন্ধু যদি বাড়ীর পাশেই আবিষ্কৃত হয়, তবে সে সৌহৃদ্যের আর কল্‌কাতার বিরাট কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে কেতাদুরস্ত ভদ্রতা রক্ষার তফাৎ অনেক।

দুপুরবেলা অসিতদের ড্রয়িংরুমে প্রায় রোজই এই তরুণ তরুণীদের বৈঠক বসে। হাসি কোলাহল, গান গল্পের জমাট মজলিসের আর অফুরন্ত বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্চে।

...এতদিন কণিকাই পিয়ানো বাজাত,—অর্ণব নিতো সেতার। লহরী এসে অবধি পিয়ানোর ভারটা কণিকা তারই ওপর দিয়েচে, অর্ণব আর লহরী দুজনে রোজ দুপুরে নূতন নূতন সুর বাজায়। কিন্তু গান গাইবার বেলা, এক জ্যোৎস্না ছাড়া আর কেউ অব্যাহতি পায় না। প্রথম দিন জ্যোৎস্নাকে অনুরোধ করায় সে বলেছিল, যে, তাকে গাইতে বল্লে সে কল্‌কাতা ফিরে গিয়ে কালোয়াৎ-এর কাছে শিখে আসবে।

প্রবাসের দীর্ঘ দিনগুলি অর্ণবের কাছে এখন আর কর্ম্মহীন নিরানন্দ ক্লান্তি নিয়ে উপস্থিত হয় না।

একদিন বিকেলে রোদের তেজ কম্‌বার আগেই

জ্যোৎস্না আর চিন্ময় গুপ্ত, ষড়যন্ত্র করে অনেক দূরে একটা জায়গায় যাবার জন্য বেরিয়ে পড়্‌ল। তারা ভাল করেই জান্‌ত যে, মেয়েদের নিয়ে বার হলে অর্দ্ধেক পথেই সন্ধ্যা হবে। কাজেই তারা বুদ্ধিমানের মতো সরে পড়েচে। অর্ণবকে সঙ্গে নিতে জ্যোৎস্নার সাহস হল না। কারণ অত ক্রোশ মাঠ জঙ্গল ভেঙ্গে, দুটো ঝর্ণা পার হয়ে সেখানে যাবার কথা শুন্‌লে, অর্ণব তার প্রতি এমন দু'একটি মধুর বিশেষণ প্রয়োগ করত, যে, শেষে সবাই ভাব্‌তো সত্যিই বুঝি জ্যোৎস্নার মাথার গোলমাল হয়েচে।

আরো খানিক পরে রোদ কম্‌লে অসিত একজনের বাংলোয় ব্রীজ খেল্‌তে গেলেন।

জ্যোৎস্না ও চিন্ময়ের খোঁজ করে তাদের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তখন অর্ণব, বৌদি ও লহরীর খোঁজে এসে দেখ্‌লে তারা মুরারীবাবুর বাংলোর বারান্দায় বসে বেশ নিশ্চিন্তভাবে গল্প করচে। সে বলে,—"জ্যোৎস্না, দাদা, চিনু, সবাই যে যার সরে পড়েচে—আর তোমাদেরও তো কোথাও যাবার উদ্যোগ দেখচি না; আমি একটু ঘুরে আসি।"—এই বলে সেও বেরিয়ে পড়্‌ল।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে অর্ণব দেখলে বাড়ীটা তখনো নিস্তব্ধ। সে বুঝ্‌লে দাদা বা ওরা দুজন, কেউ ফেরে নি। সে ওপরে বস্‌বার ঘরে এসে দেখ্‌লে কণিকা খোলা জানলার ধারে বসে আছে। তার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য ঢালা সুন্দর মুখে ঈষৎ হাসির আভাস। তার খোলা চুল বাতাসে উড়ে কপালের ওপর এসে পড়েচে। অনেক কৌতুক খেলার খনি বড় বড় টানা চোখ দুটি চেয়েছিল দূরে আকাশের পানে,—সেখানে লক্ষ তারা দীপালী জ্বেলে দিয়েছে। লহরী টেবিলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটা উপন্যাস নিয়ে তার পাতা ওল্টাচ্ছিল। অরুণ রঙে রঙীন রেশমের ঝালরে ঢাকা আলোর লালিমা তার শুভ্র ললাটে মৃদু আদরের স্পর্শ এঁকে দিয়েচে।

অর্ণব দরজায় দাঁড়িয়ে মুহূর্ত্তের জন্য তার দিকে চেয়ে, —ঘরের নিস্তব্ধতা চকিত করে ডাক্‌লে,—"বৌদি, চুপ্‌চাপ্‌ সব কি হচ্চে ?"

লহরী তার অতর্কিত প্রবেশে চম্‌কে উঠে উপন্যাসখানা বন্ধ করে সরে এল। অর্ণব ঈষৎ হেসে বল্লে,—"বৌদি, বল্‌তে পারো, লোকে আমায় দেখে মাঝে মাঝে চম্‌কে ওঠে কেন ?'

লহরী অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মতো ম্লান মুখে বল্লে,—"সেটা অবশ্য আপনার দোষ নয়; দোষ লোকেরই। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলে হঠাৎ আপনাকে আস্‌তে দেখে—"

"যথোচিত অভ্যর্থনা করতে পারি নি"—এটুকু কণিকা শেষ করে দিল।

লহরী বলে উঠ্‌ল,—"কি যে বলো তুমি"—তারপর অর্ণবকে বল্লে,—"তাই আপনাকে আসতে দেখে চম্‌কে উঠেছিলুন।"

অর্ণব বল্‌লে,—"যাক্‌,—ওদের ফিরতে বোধহয় দেরী হবে; ততক্ষণ একটু বাজানো যাক্ আসুন।"

যখন তারা দুজনে রবীন্দ্রনাথ রচিত—"আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন"—গানখানির সুরপুঞ্জে ঘরখানি ভরিয়ে তুলেচে, তখন অসিত নিঃশব্দে ওপরে এসে কণিকার পাশে সোফায় বস্‌লেন।

চার

লহরীর ছুটী ফুরিয়ে এসেচে,—দুদিন পরেই তার কলেজ খুল্‌বে,—কাল মুরারীবাবুরা কল্‌কাতায় ফিরে যাবেন।

অসিত এখনো কিছুদিন থাক্‌তে চান্‌। অর্ণব আর জ্যোৎস্না এম্‌-এ পাশ করে অবধি বড় কিছু করচে না, তাদেরো ফিরে যাবার কোন তাড়াতাড়ি নেই।

কিন্তু অর্ণবের এক একবার মনে হচ্ছিল, তাদেরো ফিরে গেলে ভাল হতো।

আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনায় সবাই একটু বিষণ্ণ হয়ে উঠেচে। দুপুরবেলা অর্ণব বসবার ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, বৌদি একলা পিয়ানো বাজাচ্চে—আর কেউ সেখানে নেই। জিজ্ঞেস করে সে জান্‌লে যে চিন্ময়, জ্যোৎস্না ও

অসিত মুরারীবাবুদের জন্য একখানা কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ কর্‌তে ষ্টেশনে গেছেন। লহরীর কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে বৌদি বল্লে,—"সে বোধ হয় যাবার আয়োজনে ব্যস্ত—তা তুমি একবার দেখে এসো না; যদি বিশেষ ব্যস্ত না থাকে তবে ধরে নিয়ে এসো।"

কণিকা লহরীকে দেখে বল্‌লে,—"কি গো, যাবার আমোদে আমাদের ভুলে গেলে না কি?"

প্রচ্ছন্ন স্নেহের আঘাতে লহরীর মুখ ম্লান হয়ে এল; অর্ণব তাড়াতাড়ি বল্‌লে,—"না, উনি দু একটা চিঠি লেখা শেষ করেই আস্‌ছিলেন—আর আমিও ঠিক সেই সময় গিয়ে পড়লুম।"

কণিকা মৃদু হেসে বলে উঠল—"লহরী তোমাকে ওকালতির কিছু দক্ষিণা দিয়েচে বুঝি?"

পাঁচ

কাল লহরীরা চলে গেছে। অর্ণব ভাব্‌ছিল,—"কাল যখন তাদের বিদায়ের পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে চিন্ময়ের অনুরোধে একটা গান গাইছিলুম, তখন একজনের গভীর দৃষ্টি নিবিড় কালো পল্লবের আড়ালে সজল মাধুর্য্যে ছল্‌ছল্‌ কর্‌ছিল। একটিবারমাত্র তার দৃষ্টি আমার চোখের ওপর রেখে সে নিজের নয়ন আনত কর্‌লে।...কিন্তু কিসের এ অশ্রু?—কেন?"

*　　*　　*　　*

প্রায় একমাস কেটে গেল। অর্ণবের মনে আজ একটা কথা তাকে উত্যক্ত, অশান্ত করে তুলেচে, সে সদাই ভাব্‌চে—"কিন্তু সে কি—? নাঃ, এর একটা মীমাংসা চাই,—অনিশ্চিতের ঘূর্ণীদোলায় আমার যে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার যোগাড় হয়েচে!"

*　　*　　*　　*

মাস তিনেক পরে তারা কল্‌কাতায় ফির্‌ল। জ্যোৎস্না এখন একটা প্রোফেসারী পেয়েচে স্কটিস্‌ চার্চ্চ কলেজে, এখন সে আর একটা গুরুতর কাজের সঙ্কল্প করেচে।... কাল কণিকা ও অসিতরঞ্জন দুজনেই চিন্ময়দের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলেন; অর্ণব যায় নি...একটা কাজের ওজর দিয়েছিল। সেদিন কণিকা এক্‌লা লহরীর কাছে গিয়েছিল, সেদিনও অর্ণব যায় নি। কি একটা সঙ্কোচ তার দেখা করাটা প্রতিদিনই পিছিয়ে দিতে চায়!...

*　　*　　*　　*

সেদিন বিকেলে অর্ণব বেড়াতে যাবার জন্য নেমে আস্‌বার উদ্যোগ কর্‌চে, এমন সময় চিন্ময়দের 'ডজ-কার'-খানা তাদের দরজায় এসে থাম্‌ল।...অর্ণব একটু বিপদে পড়ল, এতদিন না দেখা করার কি সঙ্গত কারণ সে তাদের দেখাবে?—সে যখন নিঃশব্দে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ কর্‌ল, তখন চিন্ময় অসিতের সঙ্গে প্রকাণ্ড তর্ক জুড়ে দিয়েচে, লহরী তাকে দেখেই মৃদু অনুযোগের স্বরে বলে উঠ্‌ল,—"আচ্ছা, আপনি একদিনও আমাদের ওখানে যান্‌ নি কেন বলুন তো?"

অর্ণব তার কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বল্লে,—"আপনার এক্‌জামিন-এর পড়ার ব্যাঘাত হবে বলে আমি আর বিরক্ত কর্‌তে যাই নি।"

মৃদু হেসে লহরী বল্লে,—"আপনি ত দেখচি খুব পরার্থপর! আমি কি সারাদিনই বই হাতে করে বসে আছি না কি? তা ছাড়া আমাদের একজামিন তো শেষ হয়ে গেছে কবে!"

অর্ণব তখন তার স্বচ্ছধরণের সুযুক্তিগুলির নিতান্ত অযোগ্যতা দেখে বলে ফেল্লে,—"আচ্ছা, যাব একদিন,—পাছে পড়ার ব্যঘাত হলে দোষ দেন, এই ভয়েই এতদিন যাই নি—"

কণিকা সেই সময়ে হঠাৎ সেখানে এসে পড়ে বলে উঠল,—"না, তা ভালই করেছে;—কিন্তু, রাগ কোরো না ঠাকুর পো, সেদিন অত করে সাধলুম যাওয়া হল না, আর এখন লহরীর সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ হচ্ছে—"

সেই দিন রাত্রে, তেতলার বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে অর্ণব তার অমীমাংসিত সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোন রকমেই কোন উত্তর পাওয়া গেল না। সে মনে মনে স্থির করলে—উত্তর তার চাই-ই,

অনিশ্চিতের সান্ত্বনায় নিজেকে সে ভুলিয়ে রাখতে আর রাজী নয়।

সহসা মাথায় কার কোমল স্পর্শে চমকে ফিরে দেখলে—বৌদি! কণিকা বল্‌লে,—"ঠাকুরপো, বসে বসে কি এত ভাবনা হচ্ছে?—ঘুমোতে যাও, অনেক রাত হয়ে গেছে—"

পিতৃগৃহ হতে নূতন সংসারে এসে অবধি কণিকা এই আপন ভাবে মগ্ন দেবরটির সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় নিজের হাতে নিয়েছিল; সে পিতার একমাত্র কন্যা; ভাই ছিল না বলেই ভ্রাতৃস্নেহ কি, তা সে জানত না। অর্ণবের বিষণ্ণ-সুকুমার মুখ সহজেই তার সুপ্ত ভ্রাতৃস্নেহ জাগিয়ে তুলল। জননীর মৃত্যুর পর প্রায় বার বৎসর পরে, আবার প্রভাত হতে সন্ধ্যা অবধি ছোটবড় প্রতি বিষয়টিতে স্নেহ-প্রবণ নারীহস্তের আন্তরিক যত্নের স্পর্শ বুঝতে পেরে অর্ণবের মন নবাগতা বৌদির ওপর সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। তাদের অকপট বিমল সৌহৃদ্য অসিতরঞ্জনকে এক গুরুতর চিন্তা থেকে মুক্তি দিলে। তিনি ভেবেছিলেন যে, তার ভাইটি যেমন জগৎ সংসার থেকে দূরে সরে যায়,তেমনি যদি নিজের বৌদির সান্নিধ্য হতেও নিজেকে দূরে রাখে, তবে সে বেচারী এই নিঃসঙ্গ আত্মীয় বন্ধু শূন্য সংসারে কি করে দিন কাটাবে? কিন্তু অর্ণব, জনসংঘ থেকে দূরে থেকেও, লোকচরিত্রের অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারত; সেটা তার অভিজ্ঞতার ফল নয়,—তীব্র অন্তর্দৃষ্টির স্বাভাবিক শক্তি মাত্র! তরুণী কণিকার কৌমুদীর মতো অম্লান সৌন্দর্য্যের আড়ালে যে একখানি অগ্নি অম্লান সুন্দর হৃদয় লুকানো আছে তা সে কদিনের পরিচয়েই বুঝেছিল; তাই সে, তার স্নেহের বন্ধনে নিজেকে ধরা দিয়ে অনেক দিন পরে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

ছয়

লহরীই সহাস্য মুখে অর্ণবকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। চিন্ময় বাড়ী ছিল না, জ্যোৎস্না তাকে টেনে নিয়ে গেছে। মুরারীবাবু গেছেন তাঁর প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে, লহরী ঈষৎ হেসে বল্‌লে,—"আপনি যে এত শীগ্‌গির কথাটা রাখবেন তা আমি ভাবি নি।"

অর্ণব অন্যমনস্কভাবে বল্‌তে যাচ্ছিল—"কেন?" কিন্তু তা না বলে অন্য দু একটা কথার পর যখন সে বল্‌লে—"আজ তবে আসি, চিনুকে বল্‌বেন আর একদিন আস্‌ব, যেন সে রাগ না করে—"

তখন লহরী আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌ল,—"বেশ লোক তো আপনি! ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যেতে চান—সে হচ্চে না, দাদা তা হলে আমায় বেজায় বকবে—আপনি বসুন, আমি এখুনি আস্‌ছি—"

অর্ণব অগত্যা একটা চেয়ারে বসে পড়ল, একটু পরেই লহরী নিজের হাতে প্রচুর আহার্য্যপূর্ণ একটি রেকাবী নিয়ে এল।

অর্ণব মনে মনে স্থির কর্‌লে, আজ যখন তাকে সেখানে বস্‌তেই হল, তখন সে তার অমীমাংসিত উত্তরটা না নিয়ে কিছুতেই উঠ্‌চে না।—তা সে যার সাহায্যেই হোক্!—কিন্তু নানারকমের গল্প করে ঘণ্টাখানেক কাটিয়েও বেচারী অর্ণব কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না কথাটা কি করে তোলা যায়! নিজের এরূপ বিরাট অজ্ঞতায় তার নিজের লজ্জা হচ্ছিল! অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে সে হঠাৎ বলে ফেল্‌লে,—"দেখুন, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি—"

লহরী হেসে বল্‌লে,—"যার মীমাংসা আপনি করে উঠ্‌তে পারচেন না!"

অর্ণব খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌লে,—"ঠিক তাই! শুধু একটি লোক সে সমস্যাটির মীমাংসা কর্‌তে পারে—"

লহরী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে,—"কে?"

অর্ণব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি লহরীর মুখের ওপর রেখে বল্‌লে,—"তুমি!"

লহরী অত্যন্ত অবাক হয়ে শুধু বল্‌লে,—"আমি?"

এমন সময় চিন্ময় ঘরে ঢুকে বলে উঠল,—"হ্যালো, ফ্রেণ্ড, কতক্ষণ! আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ! ব্যাপার কি? তারপর—?"

অর্ণব বল্‌লে,—"তোমাদের মত রাজামানুষদের সঙ্গে

আমাদের কি পোষায় ? এই তো প্রায় দু তিন ঘণ্টা বসে আছি, কতক্ষণে হুজুরের শুভাগমন হবে, এ অধমের সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য !

দু এক কথা কইতে কইতে চিন্ময়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে অর্ণব চলে গেল, সে চলে গেলে পর লহরী সেইখানে অনেকক্ষণ বসে রইল।—সে অর্ণবের সমস্যার কথাটা ভাবছিল, কিন্তু কোন অর্থই সে বুঝতে পারলে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, অর্ণবের একটি কথা,—"তুমি"—সেই একটি কথাই আঁধার পথে বিজলী চমকের মতো পথিকের পথ নির্দ্দেশ করলে।

সাত

দু'একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অর্ণবের সমস্যাটি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তোলা রইল। লহরী আই-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করেচে। চিন্ময় সস্ত্রীক চলে গেছে রেঙ্গুনে একটা চাকরী পেয়ে।

এদিকে জ্যোৎস্নার সঙ্কল্পটা সফল হয়েছে,—স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের কৃতি ছাত্রী রমলা দেবী, যাকে সে এতদিন কলেজে পড়িয়ে এসেচে, তারই সাথে শুভ-পরিণয় হয়েছে ! জ্যোৎস্না তাই আজকাল সময়াভাবে অর্ণবের ওখানে বড় একটা যেতে পারে না।

নিঃসঙ্গ অর্ণব নিজের ওপর আর অনেকেরি ওপর অভিমান করে দীর্ঘ দেশ ভ্রমণে বার হ'ল।...তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। অনেক প্রভাত, মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণে জ্বলে উঠে স্তিমিত সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবে গেছে।

লহরী সেই দূর পশ্চিমে, তাদের বাংলার বারান্দায় বসে কত কি ভাবছিল। মুরারীবাবু খাওয়া শেষ করে শয্যায় আশ্রয় নিয়েচেন। চিন্ময় প্রায় মাসখানেক হল রেঙ্গুন থেকে সপরিবারে ফিরে এসেচে। সে নীচের একটা ঘরে বসে রেঙ্গুন আফিসের কি একটা কাজ করচে। লহরী একটা চিঠি হাতে করে নীচু বেতের চেয়ারটায় এসে বসল! স্নান সিক্ত এলো চুলের গুচ্ছ তখনো তার শুকায় নি। কালো রেশমের মতো অজস্র, দীর্ঘ, নরম চুলের রাশি তার পিঠের ওপর ও দুহাতের ওপর ছড়িয়ে পড়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়েচে।

চিঠিখানা কণিকার! সে লহরীকে নিয়মিত চিঠি দিয়ে এসেচে; শেষ চিঠিতে সে লিখেছিল,—"ঠাকুরপোর দেশভ্রমণও এখনো ফুরোয় নি—কবে হবে তাও জানি না। ঠিক কথা,—তোমাকে কি কখন সে চিঠি লেখে না ? কারণ সে আমার চিঠিতে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে পাঠায়..."

লহরী উত্তরে লিখেছিল,—"আমাকে কেন লিখবেন্ তিনি ? আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কি তাঁর দেশভ্রমণ শেষ হয়ে যাবে ?"

কণিকা চিঠিখানা পড়ে মনে মনে হেসে বলেছিল,— "তা হতেও পারে।"

গত বৎসর প্রবাসে যখন কণিকার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেল, সেই সময়ে সেখানেই কবে একদিন কণিকা তার দেবরটির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও চিন্তা-প্রবণতার কথা প্রসঙ্গে নিতান্ত পরিহাসের ভাবেই লহরীকে বলেছিল,—"তুমি যখন সাম্‌নে থাকো, তখনই শুধু, ঠাকুরপো গম্ভীর হতে ভুলে যায়!"

সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রাশির নিম্নে যাদের চিত্ত প্রবীণ হয়ে উঠেচে, তাদের চেয়ে স্বভাব কোমল তরুণ হৃদয়ের উদ্যত সহানুভূতি যে অধিকতর উচ্ছ্বসিত, আগ্রহ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌বে—সে তো খুবই স্বাভাবিক!...কাজেই সেদিন লহরী সে কথাটা শুধু পরিহাসের ভাবেই নিতে পারলে না। তার নিতান্ত অনভিজ্ঞ চিত্ত একটা অসম্ভব রকমের প্রতিজ্ঞা করে ফেল্‌লে। সে মনে মনে বল্‌লে—"আমিই তবে ওই মুখে চিরদিনই হাসির রেখা ফুটিয়ে রাখ্‌বো—"

আজ এই দূর প্রবাসে বসে ধূসর আকাশের দিকে চেয়ে, সে সেই কথাটাই ভাবছিল—হায় রে! আজ তার প্রতিজ্ঞা সে কি করে রক্ষা করচে। আজ তার নিজের মুখে কে হাসি ফোটায়!

তার দৃষ্টি সজল হয়ে উঠল। সহসা চিন্ময়ের আহ্বানে চম্‌কে উঠে সে কণিকার অপঠিত চিঠিখানায় মনোনিবেশ কর্‌ল।

আট

ট্রেণের জান্‌লার ওপর মাথাটা রেখে অর্ণব বসেছিল। সে বাংলায় ফিরে চলেচে; আজ তার বল্‌তে ইচ্ছে হচ্চে, —"ওগো, আর না—আর না; সব আশাই তো ছেড়ে দিয়েচি—"

একটি বড় ষ্টেশনে এসে ট্রেণ থাম্‌ল। অর্ণব মাথাটা বাড়িয়ে গ্যাস্-পোষ্টে লেখা ষ্টেশনের নামটি দেখলে;—দেখলে, এটা সেই বহু পুরাতন ষ্টেশন, এখানে নেমেই তাদের সেই পশ্চিমের বাড়ীতে যেতে হয়। এখানে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে, তাই সে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বেড়াবার জন্য নেমে পড়ল।

চিন্ময় কোন কোনদিন বিকেলে ষ্টেশনে বেড়াতে আসে—আজও এসেছিল। হঠাৎ অর্ণবকে ষ্টেশনে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে তার কাছে এসে বলে উঠল—"অর্ণব যে!—কোত্থেকে?"

সে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে চিন্ময়কে দেখে সাগ্রহে তার দিকে কর প্রসারিত করে বল্‌লে,—"তুমি এখানে আবার কবে এলে?"

—"কেন, লোকে কি আর আসে না?—কিন্তু তুমিও তো এসেচ?"

—"না, আমি কল্‌কাতা যাচ্চি!"

—"সত্যি না কি?…ওসব হচ্চে না। যখন আমার হাতে ধরা পড়েচ, তখন সহজে ছাড়চি না। এখন আপাততঃ কল্‌কাতার প্রাসাদে না গিয়ে এই গরীবের কুটীরে—"

অর্ণব ত্রস্ত শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে,—"তাও কি হয় না কি? কতদিন পরে বাড়ী যাচ্চি!"

চিন্ময় এবার হেসে বল্‌লে,—"তা ঠিক্!—মাস দশেক যখন তাঁরা অপেক্ষা করতে পেরেচেন, তখন আরও দুচার দিনে কিছু এসে যাবে না। ও হে বলো না, কি নামিয়ে নেবে, সময় হয়ে এল যে!"

* * *

অর্ণব কল্‌কাতা ফিরেচে।

বসন্ত প্রভাত। তরুবীথির শাখায় শাখায়, মুঞ্জরিত সবুজ পাতার আড়ালে পাখীগুলি প্রাণের সবটুকু আনন্দ তাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠে ভরে তুল্‌চে। দখিণ বাতাসের সঙ্গে অসংখ্য সদ্য ফোটা ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আস্‌চে।

অর্ণব তার পুষ্পোদ্যানের পথে পথে বেড়িয়ে তরল হীরের মতো ভোরের শিশিরে ভেজা নিবিড় লাল গোলাপ তুল্‌ছিল। অধরে তার মৃদু হাসির রেখা,—মেঘ্‌লা দিনের বর্ষণের পর, দিনান্তে বৃষ্টি ধোওয়া অম্লান রোদটুকুর মতোই মধুর! তার আয়ত নয়নের গভীর দৃষ্টি তৃপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল;—বিষাদের কণাগুলি অশ্রু লেখায় ধুয়ে গিয়ে আজ হাসির আলোয়, মণিকণার মতো দীপ্ত হয়ে উঠেচে! তাদের বিচ্ছুরিত আভা অর্ণবের চোখের কোলে আলোর অঞ্জন এঁকে দিয়েচে।

কক্ষতলে পাতা নরম পুরু কাজকরা কার্পেটের ওপর লঘুপদক্ষেপে একটুও শব্দ না করে একটি তরুণী অর্ণবের পড়বার ঘরে এসে দাঁড়াল। দেখলে, টেবিলের ওপর অর্ণবের একটা ডায়েরী পড়ে রয়েচে,—বেগুনী ভেল্‌ভেটে বাঁধানো, সোণার বন্ধনী আঁটা, একখানি খাতা, মলাটের ওপর ঠিক মাঝখানে সোণার জলে আঁকা লহরীর বুকে একটি সুসজ্জিত অর্ণব, যেন সমতালে নাচ্‌ছে! ঈষৎ হেসে, সে খাতাখানা খুল্‌তেই সাম্‌নে পড়ল—দশই অক্টোবর।

তারিখটা দেখে সে পড়তে আরম্ভ করলে;—

"মঙ্গলবার!…দীর্ঘ একটি বৎসর পরে। কতদিন নির্ব্বান্ধব দূর প্রবাসে বিনিদ্র নিশীথে, আমি কত প্রকারে সেই একই কথাটির উত্তর পেতে চেষ্টা করেচি।… যার দুদিনের পরিচয় আমার নিরানন্দ নিকষে সোণার রেখা এঁকে দিয়েচে সে কি?… কতবার ভেবেচি আমি যাবো, —যাবো—আমার আধখানা বলা কথাটা শেষ করে একটা উত্তর নেবো—কিন্তু একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা, একটা ব্যর্থতার ভয়, বিরাট কালো অশুভ ছায়ার মতো আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে আমার উদ্যত উদগ্রীব চরণ, উৎকণ্ঠ উৎসুক লেখনী স্থগিত করেচে।

"আজ আবার দেখা হবে…অনেকদিনের পর। শত

শত চিন্তার ফেনিল আবর্ত্তময় উদ্বেল তরঙ্গ সংঘাত আমার হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত করে তুলেচে।

"...মুরারীবাবু সস্নেহ সাদর অভ্যর্থনায় আমার সমস্ত সঙ্কোচ ঘুচিয়ে দিলেন; তাঁর উদার হৃদয়ের সরল আন্তরিকতা অমল জলের মতোই স্বচ্ছ,—কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা নেই!

"...অনেক চেষ্টা করেও লহরীর ব্যবহারে বা অভ্যর্থনায় অপ্রত্যাশিত পরিচিত অতিথির আগমনজনিত স্বাভাবিক আনন্দের আভাটকু ভিন্ন আর কিছুই আবিষ্কার কর্‌তে পারলুম না।"

পাঠিকা পাতা উল্টে ফেল্‌লে।—

"বুধবার! দুপুরবেলা; লহরী এসে বল্‌লে,—'এতদিন ঘুরে ঘুরে কি দেখলেন বলুন।' মুরারীবাবু এরি মধ্যে নিদ্রামগ্ন হয়েচেন। চিন্ময় বিশেষ কোন কাজের জন্য ঘণ্টাখানেকের অবসর চেয়ে নিয়েচে। অনেকক্ষণ গল্প করে কেন জানি না, হঠাৎ বলে উঠলুম,—'আজ সন্ধ্যের ট্রেণেই বাড়ী যাচ্চি।'

"ক্ষুদ্র একটি নিমিষের জন্য লহরীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কিন্তু তখনি সে স্বাভাবিক পরিহাসের স্বরেই বল্‌লে,—'কল্‌কাতা যাবার জন্যে বুঝি এতদিন পরে মনটা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেচে।'

"আমি বল্লুম,—'ব্যস্ত মোটেই নয়। আমি অনায়াসে এখানে মাসখানেক কাটিয়ে দিতে পারি—'

"লহরী বলে উঠ্‌ল,—'তবে থাকচেন না কেন?'—

"কেন থাকচি না?—এ যে বিষম প্রশ্ন! কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে আমি আমার ব্যথিত দৃষ্টি তার শান্ত সুন্দর কালো চোখের ওপর রেখে বল্লুম,—'শুন্‌তে চাও?'

"বিস্মিত, চকিত লহরীর কণ্ঠ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল, একটি ছোট অস্পষ্ট—'হ্যাঁ'—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নিবিড় রক্তিমায় তার আকণ্ঠ রঞ্জিত হয়ে গেল।

"আমি বল্লুম,—'তবে শোন; তোমাকে একদিন আমার একটা অমীমাংসিত সমস্যার কথা বলেছিলুম,—মনে আছে?—আমার এখানে না থাক্‌বার কারণ, সেই প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত, কেন না তার উত্তর নির্ভর কর্‌চে তোমারি ওপর!—'

"লহরীর হাত দুখানি তার কোলের ওপর বাতাসে শিউরে ওঠা পাতার মতো কাঁপছিল। তার শুভ্র ললাটে স্বেদবিন্দু চন্দন লেখার মতো ফুটে উঠ্‌ল। আমি অগ্রসর হয়ে তার কম্পিত হাত দুখানি আমার তপ্ত মুঠির মধ্যে চেপে ধর্‌লুম। একটু বাধা দেবার শক্তি তার ছিল না,—সে অবসন্ন হয়ে আসছিল। আমি অনুনয়ের স্বরে বল্লুম—'আজ আমার অনেকদিন অপেক্ষা করে থাকা কথাটার উত্তর দেবে, লহরী?'

"সে চমকে চোখ তুল্‌লে; তার মুখ কুঙ্কুম লালিমায় রাঙা হয়ে উঠে শুভ্র যূথিকার মত শাদা হয়ে গেল।

"আমি আবার বল্লুম,—'লহরী, উত্তর দেবে না? আমার পথের শেষ,—প্রতীক্ষার শেষ, কি এখনো হয় নি? এবার আর বাংলায় একা ফির্‌চি না, হয় তোমায় সঙ্গে নেবো, নয়, যে পথে এসেচি, সেই পথেই ফির্‌ব!'

"একটি দীর্ঘ মুহূর্ত্ত সোৎকণ্ঠ অপেক্ষায় কেটে গেল।... তারপর গলানো মণির মতো, অজস্র শুভ্রোজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু তার চোখ হতে আমার হাতের ওপর ঝরে পড়ে তাদের পুষ্পমাল্যের মতো সাগ্রহে বেষ্টন করে ধরল। বন্যার স্রোতের মতো পুলক প্লাবনে আমার বিগত বর্ষচয়ের সমস্ত তিক্ত ক্লান্তি, বিরক্তি, অতৃপ্তি নিঃশেষে ধুয়ে গেল,—রেখে গেল একটা সিক্ত সরলতা! ধীরে লহরীকে আমি আমার বাহু বেষ্টনের মধ্যে বন্দী কর্‌লুম।

"...সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা;—সন্ধ্যালগ্নে আমাদের শুভ পরিণয় হয়ে গেল!—স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নায় আকাশ বাতাস ভরে গেল! মুরারীবাবু আমাদের মস্তকে ধান দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন; বল্‌লেন,—'তোমাদের যাত্রাপথ শুভ মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক'!"

শ্রীপ্রকাশ বসু

বুদ্ধির দৌড়

শ্রীপান্না বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে, একখানা নভেল নিয়ে সবেমাত্র প্রতিমা শুয়েছে ;—এমন সময় কানে এলো—"বৌদি ঘুমিয়েছ না কি ?"

স্বর খুবই পরিচিত ! প্রতিমা ধড়মড় করে উঠে পড়ল ! ভেজান দরজা ঠেলে পরিমল ঘরের ভেতর ঢুকে বল্‌লে—"কী ব্যাপার—ঘুম ?"

প্রতিমা হেসে বল্‌লে—"ঘুম কোথা ভাই ? এইতো সবে খেয়ে উঠলুম ! বসো—"

"হ্যাঁ বসছি" বলে খাটের ওপর বসে—পরিমল বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বল্‌লে—"এই খেয়ে উঠলে মানে ? বেলা দুটো বাজে—"

প্রতিমা জবাব দিলে—"সংসারের কাজ সেরে উঠতে এমনি দেরী হয়েই থাকে ! তারপর তুমি—এই রণরণে দুপুরে কোথায় বেরিয়েছ ?"

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে পরিমল বল্‌লে—"তুমিও যেমন বৌদি। আমরা হচ্ছি কুলী কাছারি মানুষ, রোদ্দুর বিষ্টি দেখতে গেলে চলে ?"

প্রতিমা বল্‌লে—"নাঃ, তা কি আর চলে ? একেবারে লোহার শরীর কোরে এসেছ ; তবু যদি না একমাস আগে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগতে।"

হো হো করে হেসে পরিমল বল্‌লে—"ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আবার একটা অসুখ ? যাক্—পিসিমা কোথায় ?..."

প্রতিমা বল্‌লে—"মা এই খেয়ে দেয়ে ওঘরে শুয়েছেন। কেন—দরকার আছে কিছু ?"

পরিমল বল্‌লে—"না, পিসিমাকে কোন দরকার নেই ! তোমার ও বাড়ীর খবর কি ?"

ও বাড়ী অর্থাৎ প্রতিমার বাপের বাড়ী। বৌদি ফিক্ করে হেসে ফেলে বল্‌লে—"হঁ্যা গো হঁ্যা, তুমি যার কথা জিজ্ঞেস কোরছ সে ভাল আছে—রিণা ভাল আছে।"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পরিমল বল্‌লে—"বা রে, আমি বুঝি তার কথা জিজ্ঞেস করছি ? তোমার বাবা মা কেমন আছেন—"

বৌদি বল্‌লে—"থাক্ মশাই, থাক্—আর বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হবে না ! আগে তো কই কখন ভুলেও তাঁদের খবর নাও নি। আর আজ যেই রিণার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হোল অমনি তাঁদের খবরের জন্যে ব্যস্ত হয়েছ, কেমন ? আমি কচি খুকী, না ?

পরিমল ঘাড় হেঁট করে হাসতে হাসতে বল্‌লে—"নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সোজা কথাকে এমন বাঁকা করে ধরো।"

প্রতিমা হেসে ফেলে বল্‌লে—"ঐ ভাই আমার কেমন দোষ। যাক্, হাতে ওটা কি বই ?"

পরিমল বইখানা প্রতিমার হাতে দিলে,—একখানা পাতা উলটিয়েই সে আবার ফিক করে হেসে ফেল্‌লে, বল্‌লে—"ব্যাপার কি ঠাকুরপো ! গহনার ক্যাটলগ নিয়ে ঘুরছ ?"

পরিমল একটু হতাশভাবে বল্‌লে—"না, তোমার দ্বারা হবে না দেখছি ! কোথায় ভেবেছিলাম তোমার 'হেল্‌প' একটু নেবো, তা তুমি যা ঠাটা স্থরু করেছ তার ঠেলায় দেশ ছেড়ে পালাতে হোল।" বলে সে উঠে দাঁড়ালে।

প্রতিমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরে বল্‌লে—"থাক, আর রাগ কোরতে হবে না ! আচ্ছা, আমি আর ঠাট্টা কোরব না,—এখন বল—কি করতে হবে বলছিলে।"

পরিমল বসে পড়ে বৌদির মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

প্রতিমা বল্‌লে—"বল না কি বলছিলে ?"

পরিমল একটু হাসলে, পরে বল্‌লে—"নাঃ, শুনলে তুমি খেপাবে!"

বৌদি কথাটা আদায় করবার জন্যে একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"না, তুমি বিশ্বাস করো আমি কিছু বলব না!"

পরিমল বৌদির মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"কিন্তু খবরদার আর কাউকে বোলতে পারবে না! এমন কি পেসাদ দা'কেও নয়। সে শুনলে আর আমার কোলকাতায় থাকতে দেবে না!"

বৌদি বল্‌লেন—"না গো না—তুমি নিশ্চিন্ত থাক!"

পরিমল এবার ইতস্ততঃ করে বল্‌লে—"ঐ বইখানার ভেতর থেকে—একটা আংটী আর একটা ক্রচের ডিজাইন তোমার বোন্‌কে পছন্দ কোরে দিতে বলবে! কাল তুমি ও বাড়ী যাবে আমি জানি! আমি দিন দুয়েক পরে বইখানা তোমার কাছ থেকে আনিয়ে নেবো।

বৌদি এতক্ষণ অনেক কষ্টে হাসি চেপেছিল; এইবার হেসে ফেললে, বললে—"ওঃ এই ব্যাপার! আর এরই জন্যে এত দিব্যি, এত সর্ত্ত!"

পরিমল বল্‌লে—"সে যাই হোক, কিন্তু খবরদার! যদি আর কাউকে বলো—তা হলে মজা দেখবে, কিন্তু! আমি সব ভেস্তে দেবো।"

বৌদি বল্‌লে—"কি ভেস্তাবে শুনি?"

পরিমল বল্‌লে—"আসল জিনিষ—অর্থাৎ বিয়ে!"

ঠোঁটটা একটু উল্টে, অবজ্ঞার সুরে বৌদি বল্‌লে—"ইস্‌! ভারি মুরোদ! দৌড় আমার জানা আছে!"

আরও আধ ঘণ্টা থেকে পরিমল উঠে পড়ল।

পরিমলের বাবা জ্ঞানদা চাটুর্য্যের অবস্থা খুবই ভাল! কোলকাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী, দুখানা মোটর, চাকর-চাকরানীতে বাড়ী ভর্ত্তি! নদীয়ার কাছে তাদের মস্তবড় জমীদারী আছে! কোম্পানীর কাগজ ও ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণও বিশিষ্ট রকমের!—তার ওপর সম্প্রতি তিনি কোলকাতার 'নটরাজ থিয়েটার'টীর স্বত্ব কিনে নিয়েছেন! পরিমল তার 'ফাইন্যানসিয়াল সেক্রেটারী।' তা ছাড়া, পরিমলের নিজেরও একটা 'হার্ডওয়ার বিজনেস' আছে—তার আয়ও বেশ মবলক ধরণের! সংসারে জ্ঞানদাবাবুর স্ত্রী, একমাত্র ছেলে পরিমল ও একটী মেয়ে মায়া।—মায়ার বিয়ে আজ তিন বছর হ'ল হয়ে গেছে। সে শ্বশুর-বাড়ীতেই আছে, শ্বশুর-বাড়ী এলাহাবাদে!

প্রতিমার স্বামী প্রসাদ পরিমলের পিসতুতো ভাই। কিন্তু মামাতো পিসতুতো ভাই হলেও দুজনের ভেতর প্রীতি ছিল অটুট! এবং উভয় উভয়ের সঙ্গে ব্যবহার কোরত ঠিক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। ফলে প্রসাদ দুবছরের বড় হলেও পরস্পরের ভেতর হাসিঠাট্টা ইয়ারকি অবাধে চলত।

প্রসাদের বিয়ে বছরখানেক হলো হয়েছে! প্রতিমার একান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টাতে তার মেজ বোন্ রিণার সঙ্গে পরিমলের বিয়ের ঠিক হয়েছে! অবশ্য এই ইচ্ছার পেছনে ছোট একটু ইঙ্গিত ছিল—সেটা পাত্র ও পাত্রী উভয়ের প্রতি উভয়ের গোপন অনুরাগ।—

বিয়ের প্রায় সবই ঠিক, কেবলমাত্র আশীর্ব্বাদ, আর দিন স্থির টুকুই বাকী। সেটা কেবল প্রতিমার বাবার অফিসের ছুটি পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। তা হলেও এটা ঠিক যে, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সব পাকাপাকি হয়ে যাবে।

প্রতিমার বাপের বাড়ীতে আসার দুদিন পরে বিকেল-বেলা—তার দাদামশাই এলেন। দাদামশাই থাকেন শিবপুরে। খুব কমই এখানে আসেন।

প্রতিমার মা নানান কথার পর, রিণার বিয়ের খবর সবিশেষ দিলেন। দাদামশাই একটু খুঁৎখুঁতে মানুষ। সব শুনে তিনি বললেন—"দেখ মা, সব ভাল, কিন্তু ঐ যে বললে ছেলে থিয়েটারে প্লে করে—"

কাছেই প্রতিমা বসেছিল, সে বললে—"না দাদু, সে কেন প্লে করতে যাবে। সে সেক্রেটারী, টাকাকড়ির ব্যবস্থা সে করে—"

দাদামশাই বললেন—"তা হলেত আরও ভাল। টাকা যদি হাতে থাকে, তা হলে আরও ভয় পা পিছলোবার।"

প্রতিমা মুখটা একটু ভার করে বললে—"না দাদু, ঠাকুরপো সে ধরণের ছেলে নয়। সিগারেট পর্য্যন্ত সে খায় না, তার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাবাই অন্যায়।"

দাদামশাই বল্‌লেন—"আরে পাগলী, আমি কি বল্‌ছি

সে খারাপ! হাজার হলেও এ বিয়ের ব্যাপার। ভাল কোরে সব খবর নিতে হবে! ঐ থিয়েটারের লোকদের স্বভাব চরিত্র প্রায়ই বিগড়ে থাকে! বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না! ভেতর থেকে খবর নিতে হয় খুব ভাল কোরে! আর তোর ত সবে একবছর বিয়ে হয়েছে! তার ওপর সে থাকে কোলকাতায় আর তোরা থাকিস বেহালায়! কতটুকু খবর তার রাখতে পারিস বল্?"

প্রতিমা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—"আমি একবছরের সঠিক খবর জানতে পারবো না—আর আপনি দুদিনে কি করে সব ঠিক খবর যোগাড় কোরবেন?"

দাদামশাই হেসে বল্‌লেন—"ঐ তো মজারে! এই কোরেই ত মাথার চুল পাকালুম!"

এমন সময় রিণা একহাতে এক কাপ্ চা, অপর হাতে এক ডিস্ জলখাবার এনে দাদুর সামনে রেখে বল্‌লে—"নিন্ দাদু, এখন তর্ক রেখে একটু গলাটা ভিজুন দেখি! তখন থেকে বক্‌বক্ করে গলাটা শুকিয়ে গেছে!—" বলে একটু হাসলে!

দাদু হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লেন—"খুব বলেছিস্! দেখ না, একজন ত তার দেওরের নিন্দে শুনে চটে লাল! তা তোর মুখটা কি রকম দেখি—চতুর্দ্দশী না অমাবস্যা?" বলে চায়ের বাটিটা তুলে নিলেন!

* * * *

ছ'দিন পরে, সন্ধ্যার সময় প্রসাদ দা' পরিমলের ঘরে ঢুকে বল্‌লেন—"ওরে ছোঁড়া, এই নে তোর 'ইষ্টি কবচ' ওর ভেতর 'মার্ক' করে দেওয়া আছে!" বলে তার সামনে সেদিনের ক্যাটলগটা ফেলে দিলেন।

পরিমলের মুখটা লাল হয়ে উঠল! সে বল্‌লে—"না, বৌদির এটা ভারি অন্যায়! আমি পইপই করে কাউকে বোলতে বারণ করেছিলাম!"

মুখটা একটু ভেংচে প্রসাদ দা' বল্‌লেন—"তা আর কোরবে না!—তা না হলে ফূর্ত্তি হবে কেন। এর মধ্যে থেকে গয়না পছন্দ করান হচ্ছে! বাঁদর কোথাকার।—"

লাফিয়ে উঠে পরিমল,প্রসাদ দা'র মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌লে—"আরে, চুপ করো। পাশের ঘরে মা রয়েছেন,—শুনতে পাবেন যে—"

নির্ব্বিকার ভাবে প্রসাদ দা' বল্‌লেন—"শুন্‌তে পাবেন বলেই বলছি! মামীমাকে তাঁর গুণধর পুত্রের কীর্ত্তির একটু পরিচয় না দিলে আমার যে পাপ হবে।"

হাত দুটো যোড় করে পরিমল বল্‌লে—"দোহাই তোমার! আর কখনও কিছু তোমার কাছে লুকোব না।"

এবার প্রসাদ দা' শান্তভাবে বল্‌লেন—"আচ্ছা, এবার তোমায় ক্ষমা করা গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্যথা করলেই—বুঝবে মজা! যাক্ এক কপ্ চা আনাও!"

পরিমল ডাক্‌লে—"যদু।"

চাকর এসে দাঁড়াল!

পরিমল বল্‌লে—"চা হচ্ছে, না?"

যদু বল্‌লে—"আজ্ঞে হাঁ।"

পরিমল বল্‌লে—"শীগ্‌গির দু কপ্ চা নিয়ে আয় দেখি,—আমায় এখুনি বেরুতে হবে।"

প্রসাদ দা' জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় বেরুবে?"

"থিয়েটারে।"

প্রসাদ দা' বল্‌লে—"আজকে ত সোমবার। প্লে নিশ্চয় নেই।"

পরিমল বল্‌লে—"না, প্লের জন্যে নয়! জন চারেক নতুন অ্যাকট্রেস্ নেওয়া হবে, আজ তাদের 'ট্রায়েল' হবে।"

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রসাদ দা' বল্‌লেন—"হুঁ।" একটু পরে আবার বল্‌লেন—"ট্রায়েল দেবে তাতে তোমার যাবার প্রয়োজন?"

পরিমল বল্‌লে—"বাঃ, আমার যাবার দরকার নেই?—মিটিং হবে, আমি সেক্রেটারী, আমার অপিনিয়ন দিতে হবে।—কত মাহিনেয় নেওয়া যেতে পারে; এই সবের মীমাংসা করতে হবে।"

গম্ভীরভাবে প্রসাদ দা' বল্‌লেন—"বটে! আমি কিছু বুঝি না, না? রোসো রিণাকে গিয়ে বোলতে হচ্ছে যে—ছোকরা ঘন ঘন থিয়েটারে যেতে আরম্ভ করেছে!..."

হো হো করে হেসে পরিমল বল্‌লে—"ওঃ! খুব লোক

তুমি! তোমার অসাধ্য কিছু নেই! কিন্তু ভয় নেই; বাবাও সেখানে থাকবেন! তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছি!"

এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে—"দাদাবাবু গাড়ী তৈরী,—বাবু ডাকছেন!"

দুজনে উঠে পড়ল!

* * * *

দিন চারেক পরের কথা!

সেদিন বুধবার। বউবাজারের সার্পেনটাইন লেনের ভেতর দাদামশাই ঢুকলেন! খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ীর রোয়াকে কতকগুলি ছোকরাকে বসে গল্প করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে বীরেন রায় কোন্ বাড়ীতে থাকেন? যিনি নটরাজ থিয়েটারে প্লে করেন?"

একটি ছোকরা তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লে—"বীরেনবাবু? ঐ সামনের বাড়ীতে থাকেন!" বলে আঙুল দিয়ে খান তিনেক পরের একখানা বাড়ী নির্দ্দেশ করে দিলে!

দাদামশাই এগিয়ে গিয়ে,—সদর দরোজা দিয়ে ঢুকতেই দেখলেন—একখানা সাজান ঘর, আর ভেতরে দুজন ভদ্রলোক বসে রয়েছেন!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাদামশাই তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—"বীরেনবাবু আছেন কি?"

ভদ্রলোক দুটীর মধ্যে একজন সহাস্যে বল্‌লেন—"ভেতরে আসুন! আমারি নাম বীরেনবাবু!"

দাদামশাই খুসী হয়ে ভেতরে ঢুকলেন!

বীরেনবাবুর বয়স দেখলে মনে হয়, বছর চল্লিশ। রঙ শ্যামবর্ণ, দাড়ীগোঁফ কামান, সুশ্রী চেহারা; চোখে কালো 'সেলুলয়েডে'র চশমা!

অপর যে ভদ্রলোকটী বসেছিলেন, তাঁর বয়েস বীরেনবাবুর তুলনায় অনেক অল্প,—বছর পঁচিশ হবে। তবে রঙ খুব ফরসা আর বেশ সুপুরুষ!

বীরেনবাবুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্‌লেন—"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

দাদামশাই যুত করে বসে, পকেট থেকে একটা পুরোনো 'সেভিং ষ্টিক'-এর কৌটা বের করলেন, এবং তার ভেতর থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে বললেন—"আমি আসছি শিবপুর থেকে; কিন্তু তা বল্‌লে আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি একটা খবর জানবার জন্যে এসেছি।"

বীরেনবাবু উৎসুকভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"বেশ বলুন! আমি সাধ্যমত 'ইনফরমেশন' দেবার চেষ্টা করব!"

দাদামশাই বল্‌লেন—"জ্ঞানদাচরণ চট্টোপাধ্যায় আপনাদের থিয়েটারের মালিক না?"

বীরেনবাবু ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

দাদামশাই বল্‌লেন—"তাঁর এক ছেলে পরিমল বলে,—ঐ থিয়েটারে কাজ করেন না?

বীরেনবাবু বল্‌লেন—"হ্যাঁ—করেন, তিনি এই থিয়েটারের সেক্রেটারী।"

দাদামশাই এবার একটু হেসে বল্‌লেন—"আমি এই পরিমলবাবুর সম্বন্ধে কতকগুলি খবর জানতে চাই!" এই বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন।

বীরেনবাবু এবার একটু নড়ে চড়ে বসে বল্‌লেন—"বেশ! কিন্তু আপনি তাঁদের খবর জানতে চান—তার কারণটা একটু ভেঙ্গে না বললে ত কিছু বুঝতে পারছি না!

দাদামশাই তাঁর সাদা দাড়ি ও গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু হেসে বললেন—"নিশ্চয়ই, বলব বই কি! অর্থাৎ,—জ্ঞানদাবাবুর ছেলে—এই পরিমলের সঙ্গে আমার একটী নাতনীর বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে!"

বীরেনবাবু এবার একগাল হেসে বল্‌লেন—"তাই বলুন, আমি এতক্ষণ অন্ধকারে ঘুরছিলুম।" বলে অপর যুবকটীর দিকে চাইলেন!

সেও উৎকর্ণ হয়ে এঁদের কথাবার্ত্তা শুনছিল! বীরেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সে একটু হাসলে!

বীরেনবাবু আবার আরম্ভ করলেন—"আপনি তা হলে পরিমলবাবুর দাদাশ্বশুর হবেন—কেমন? বেশ, এবার কি কি জানতে চান, বলুন! ছেলেটীর চরিত্র কেমন? স্বভাব কেমন? এই না?" বলে দাদামশাইয়ের দিকে চাইলেন।

দাদামশাইও একগাল হেসে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন—"ঠিক তাই!"

বীরেনবাবু বলে যেতে লাগলেন—"আমি যতদূর জানি পরিমলবাবু পাত্র হিসাবে খুব 'ডিজায়ারএবল।' অতি বিনীত স্বভাব, আর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক!—একটা সিগারেট পর্য্যন্ত খায় না! ভারি তোখোড় ছেলে—এই বয়সেই দু দুটো কারবার 'ম্যানেজ' করছে! মানে—এক কথায় ছেলেটী অতুলনীয়!" বলে সেই যুবকটীর দিকে চেয়ে বল্লেন—"কেমন হে, ঠিক বলি নি?" সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসলেন।

উত্তরে সে বল্লে—"হ্যাঁ, 'জাষ্ট এণ্ড ইমপার্শিয়েল'।"

কিন্তু কথাটি সে এমন একটী ভঙ্গীতে বল্লে, যার মানে—ব্যঙ্গ অথবা প্রকৃত—দুইই ধরা যায়!

বীরেনবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন,—বাধা দিয়ে যুবকটী বল্লে—"বীরেন দা', দশটা বাজে; আমায় এখুনি উঠতে হবে। 'কাইণ্ডলি' সেই 'ম্যানেসক্রিপ্‌'টা এনে দিন।"

বীরেনবাবু বল্লেন—"আচ্ছা, দিচ্ছি এনে।" তারপর দাদামশাইয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন—"আপনার আর কিছু জানবার থাকে ত বলুন? তার বিষয় সম্পত্তির খবর সব জানেন আশা করি?"

দাদামশাই বল্লেন—"হ্যাঁ, তা জানি, অগাধ পয়সা।—না, আর কিছু জানবার আমার নেই? তবে একটা কথা—" বলে একটু ইতস্ততঃ করে আবার বল্লেন—"আপনার এই খবরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি ত?"

বীরেনবাবু দাদামশাইয়ের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন—"নিশ্চয়ই?" সঙ্গে সঙ্গে চোখটি ফিরিয়ে যুবকটীর দিকে চাইলেন।

মনে হলো উভয়েরই ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসি খেলা করে গেল। দাদামশাইয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেটা এড়াল না।

দাদামশাই বিদায় নেবার একটু পরেই—যুবকটীর হাতে এক তাড়া খাতা দিতে দিতে সহাস্যে বীরেনবাবু বল্লেন—"একবার ভাবলুম বুড়োকে দিই সব ফাঁস করে।"

যুবকটীও হেসে বল্লে—"হতো মন্দ নয়। যাক্, আমি তা হলে এখন উঠি।" বলে সে বেরিয়ে পড়ল।

বউবাজার ষ্ট্রীটের ওপর ট্রাম 'ষ্টপে'র কাছে এসে যুবকটি দেখলে দাদামশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন! কাছে গিয়ে সে বল্লে—"ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?"

দাদামশাই ফিরে যুবকটীকে দেখে বল্লে—"এই যে আপনি? হ্যাঁ, ট্রামের জন্যেই।"

যুবকটী বল্লে—"কতদূর যাবেন? শিবপুর?"

দাদামশাই বল্লেন—"না, একবার কালীঘাটে যাব—সেইখানেই আমার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ী! আপনি কত দূর?"

যুবকটি বল্লে—"আমায় একবার ধর্ম্মতলায় যেতে হবে, তারপর থিয়েটারে।"

দাদামশাই বল্লেন—"আপনিও থিয়েটারে কাজ করেন না কি?"

যুবকটী সহাস্যে বল্লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি একজন আর্টিষ্ট।"

দাদামশাই বল্লেন—"বটে! তা আপনার নামটী জানতে পারি কি?"

যুবকটী বল্লে—"বিলক্ষণ! আমার নাম নলিনী-রঞ্জন চাটুর্য্যে।

এমন সময় একখানি ট্রাম এসে দাঁড়াল। নলিনীবাবু, দাদামশাইকে বল্লে—"আসুন, ওঠা যাক্।"

দুজনেই ফাষ্ট ক্লাসে উঠলেন। একটু পরে নলিনীবাবু দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করলে—"তারপর, পরিমলবাবু সম্বন্ধে সঠিক খবর পেলেন ত?" বলে একটু হাসলে।

দাদামশাই বল্লেন—"কেন বলুন ত নলিনীবাবু,—কিছু কি—" বলে তার দিকে উৎসুক ভাবে চাইলেন।

নলিনীবাবু একটু হেসে বল্লে—"বীরেনবাবু সবই বলেছেন, তবে একটু কাপড় পরিয়ে—এই যা তফাৎ।" বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দাদামশাইয়ের দিকে চাইলে।

দাদামশাই আগ্রহের সঙ্গে বল্লেন—"মানে?"

নলিনীবাবু এবার একটু কুণ্ঠিত ভাবে বল্লে—"দেখুন, সব ভেঙ্গে বলতে গেলে আপনার হয়ত লাভ হবে

প্রচুর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে!"

দাদামশাই যেন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন! বল্‌লেন—"ভেঙ্গে বল্‌লে আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তার মানেটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।"

নলিনীবাবু একটু হেসে বল্‌লে—"বুঝতে পারলেন না? অর্থাৎ, কথাটা আমি বলেছি তা যদি প্রকাশ হয়, তা হলে আমার চাকরীটি রাখা দুষ্কর হবে।"

দাদামশাই ব্যস্তভাবে বল্‌লেন—"পাগল হয়েছেন। এ খবর তৃতীয় ব্যক্তির কানে উঠবে না। আমায় ব্যাপারটা খুলে বলো ভাই—" বলে নলিনীবাবুর হাতটা চেপে ধরলেন!

হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে, বিনীতভাবে নলিনীবাবু বল্‌লে—"আমায় অত করে বল্‌তে হবে না। আপনাকে ভালমানুষ দেখে আমি নিজে থেকেই তো বল্‌তে চাইলুম! বিশেষ করে একটী মেয়ের সারাজীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে যখন কথা।—কেমন নয় কি?"

দাদামশাই সোৎসাহে বললেন—"নিশ্চয়ই। এ হিন্দুর বিয়ে, একবার হয়ে গেলে আর বদ্‌লাবার কোন উপায় নেই। হাজার ছেলে বদ্ হোক আর শাশুড়ী দজ্জাল হোক—।"

নলিনী বল্‌লে—"ঠিক তাই। এ যেন গাছ থেকে ফল পড়ার মত। একবার বোঁটা থেকে ফলটী খসে পড়লেই হোল,—তারপর হাজার চেষ্টা করুন আর কিছুতেই সে ফল বোঁটায় লাগাতে পারবেন না। যাক্, পরিমলবাবুর আসল ইতিহাসটী তা হলে শুনুন।" বলে সে চারিদিক একবার চেয়ে নিলে যে, পরিচিত কেউ আছে কি না,—তারপর অতিনিম্নস্বরে দাদামশাইকে সবিশেষ শোনালে। শুনতে শুনতে দাদামশাইয়ের একবার করে চোখ দু'টী বড় হয়ে উঠ্‌ছিল এবং বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি নলিনীবাবুর এই কথাগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য বলেই যেন গ্রহণ করেছেন!

কথা শেষ করে নলিনীবাবু বল্‌লে—"শুনলেন ত!"

দাদামশাই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন—"ঠিক! আপনি যা বল্‌লেন তা খুবই সত্যি এবং সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে!"

নলিনীবাবু সহাস্যে বল্‌লে—"বীরেনবাবুর কাছে সব শোনবার পর, আপনার মুখ দেখে মনে হলো, আপনি সব বিশ্বাস করতে পারেন নি—কেমন, নয়?"

দাদামশাই বল্‌লেন—"ঠিক ধরেছ! আমরা হাজার হলেও বুড়ো মানুষ, লোক ঘেঁটে ঘেঁটে চুল পেকে গেল। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া কি সহজ হে।" বলে একটু গর্ব্বিত দৃষ্টিতে নলিনবাবুর দিকে চাইলেন!

নলিনীবাবুও বেশ উৎফুল্ল ভাবে থিয়েটারী ভঙ্গীতে বল্‌লে—"নিশ্চয়ই! আমাদেরও দেখুন না, 'সাইকোলজিক্যাল পার্ট প্লে' করে করে এমন একটা 'পাওয়ার' এসে গেছে যে, লোক দেখলেই বলে দিতে পারি তার মনের কথা!"

ট্রামখানা ততক্ষণে এস্‌প্লানেডে এসে পৌঁছে গিয়েছিল! নামবার মুখে নলিনীবাবু বিনীত ভাবে আবার বল্‌লে—"দেখবেন দাদামশাই, আমার নামটা যেন প্রকাশ না হয়।"

দাদামশাই ব্যস্তভাবে বল্‌লেন—"আরে, না না, এ খবর তৃতীয় ব্যক্তির কানে উঠবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমায় ধন্যবাদ ভাই নলিনী না পরিমল—কি বোলব!" বলে সহাস্য দৃষ্টিতে পরিমলের দিকে চাইলেন! ...পরিমল স্তব্ধ হয়ে গেল!

মাথার ওপর আচমকা একটা লাঠি মারলেও বোধ হয় পরিমল অতটা চমকাত না, যতটা সে দাদামশাইয়ের কথায় চমকে উঠল! দাদামশাই তা' হলে আগাগোড়া তাকে চিনে এসেছেন, আর সে আহাম্মুকের মতন চালাকী করতে গিয়েছিল! ওঃ! কি ঠকানটাই দাদামশাই আজ তাকে ঠকালেন! তারপর এই খবর বৌদিদের কানে উঠবে, রিণা শুন্‌বে, প্রসাদ দা' শুনবে! সে আর ভাবতে পারলে না!

দাদামশাই তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন! পরিমল যেন সম্বিতহারা হয়ে গিয়েছিল, লজ্জায় মাথা তোলবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য ছিল না।

পরিমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি আমায় গোড়া থেকেই চিনতে পেরেছিলেন ?"

দাদামশাই হাসতে হাসতে বললেন—"হ্যাঁ হে চালাক দাস। বীরেনের সঙ্গে আমার আজকের চেনা নয়। ছেলেবেলা থেকেই সে মানুষ হয়েছে শিবপুরে, বুঝলে ? আর তোমাকে চিনলুম তোমার অফিসে গিয়ে, তুমি অবশ্য আমায় দেখ নি। তারপর বীরেনের বাড়ীতে গিয়ে তোমায় দেখে, একটু রগড় করতে ইচ্ছা হলো, আর বীরেনও দেখলুম তাতে বেশ যোগ দিলে। আর হোলও একবারে চমৎকার !"

এতক্ষণে পরিমলের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দ্দা সরে গেল। উঃ, বীরেন দা' কী দুষ্ট! পরিমল দাদামশাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—"হাজার হলেও —আমরা কাঁচা, আপনাদের পাকা বুদ্ধির সঙ্গে পারবো কেন? কিন্তু দোহাই দাদু, একথাটা যেন ওখানে প্রচার করবেন না। তা হলেই আমার আর রক্ষে নেই !"

হাসতে হাসতে দাদামশাই বললেন—"বটে! কিন্তু আশ্বাস খুব দিতে পারছি না।—"

এমন সময় কালীঘাটের ট্রাম এসে দাঁড়াল। দাদামশাই বসে পড়ে বললেন—"তা' হলে চললুম ভাই।—আর একটি ভাল পাত্রটাত্র পাওত খবর দিও। ওখানেত আর নাতনীটার বিয়ে জেনে শুনে দিতে পারি না, কি বল ?"

লজ্জায় পরিমল ঘাড় হেঁট করে রইল ;—কথা বলবার শক্তি পর্য্যন্ত সে হারিয়ে ফেলেছিল। তার কান দুটো লাল হয়ে উঠলো !······

শ্রীপান্না বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র-বার্ত্তা

প্রকৃতির একটী অমূল্য সম্পদকে মানবের ভৃত্যরূপে ব্যবহার করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভগবান বিবস্বান মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ সূর্য্যতাপ অপচয় হয়, তদ্দ্বারা সাতহাজার তিনশত অশ্বশক্তির একটী ইঞ্জিন চলিতে পারে।

* * *

সূর্য্য তেজকে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই মানবের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন নাই। প্রায় সতের শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের মহামানব আর্কিমিডস কয়েক খণ্ড কাঁচের সাহায্যে বিশ্ববিজয়ী রোমের নৌবহর ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। সতের শত সাতচল্লিশ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক তিনশত খণ্ড কাঁচের সাহায্যে দুইশত ফিট দূরবর্ত্তী এক বনে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিলেন। ইহার পর জর্ম্মানীর ড্রেসডেন নগরে এক বৈজ্ঞানিক কতকগুলি দর্পণ চক্রাকারে সন্নিবিষ্ট করিয়া একটী সৌরতাপ-যন্ত্র প্রস্তুত করেন। ইহাতে এরূপ তাপ কেন্দ্রীভূত হইত যে, দুই সেকেণ্ডের মধ্যে যে কোন ধাতু গলিত হইয়া জলবৎ দ্রব হইয়া যাইত।

ভৌতিক গল্প

মায়া

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

জ্যৈষ্ঠ মাস। সন্ধ্যা উতরে গেছে। কোলকাতার ভীষণ হট্টগোলময় একটী রাস্তা। 'কুলপি বরফ', 'বেলফুল মালা' ইত্যাদি চীৎকারে পাড়া মুখরিত। প্রতীপ বসে আছে নিজের ঘরে, কিন্তু মন তার ছুটে চলে গেছে কোনও এক ছায়া সুনিবিড় শান্ত পল্লীর নিভৃত কুটীর প্রান্তে। থেকে থেকে উৎসুক চোখে রিষ্টওয়াচের পানে চাইছে আর নিঃশব্দে হাতের চুরুটটা নিঃশেষ করছে। পাশে তার বেডিং, সুটকেস, ফ্লাস্ক, মেডিসিন বাস্ক ইত্যাদি ছড়ান রয়েছে। এমন সময় ঘরে ঢুকল তার প্রিয় বন্ধু অলর্ক। মৃদু হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে সে শুধালে, "কি হে যোগী,—কার ধ্যানে মগ্ন, নামটা শুনতে পাই নে?"

চম্‌কে উঠে প্রতীপ বললে, "আরে, অলর্ক যে! কবে বাড়ী থেকে ফিরলি ভাই? আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজে আজ বিদেশ যেতে হচ্ছে।"

অলর্ক বললে, "আয়োজন দেখে তাই ত বুঝছি; কিন্তু কোথায়?"

প্রতীপ পকেট থেকে একখানি চিঠি বার করে অলর্কের হাতে দিলে। অলর্ক পড়তে লাগল—

"শ্রীচরণেষু,

প্রতীপ দা', তুমি কেমন আছ? আশা করি ছোট বোন্‌টিকে একেবারে ভুলে যাও নি। আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর আমার চিঠি পেয়ে তুমি হয় ত আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, কিন্তু এই বিধাতার লীলাক্ষেত্রে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। মানুষের জীবনের কখন যে কি মুহূর্ত্ত আসে, তা কেউ বলতে পারে না। আমার জীবনে এসেছে এখন ভীষণ অশুভ মুহূর্ত্ত, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। উপযুক্ত চিকিৎসা অভাবে আজ পাঁচদিন হ'ল, আমার বুক ছেঁড়া খুকুমণি আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে! খোকাটী ভুগছে। স্বামীর শরীর ভাল নয়। এই ভীষণ দারিদ্র্য সংগ্রামের সঙ্গে আমি একলা আর যুঝতে পারছি নে ভাই। তুমি ডাক্তার, শুনেছি খুব নাম করেছ, আমায় তুমি আগে বড় স্নেহ করতে, সেই অধিকারে আজ আমার এই বিপদের দিনে তোমায় ডাকছি। আগে দুটী ভাইবোনে ছিলাম ত বেশ, একসঙ্গে কলেজ যাওয়া, সিনেমা যাওয়া, গল্প করা, তারপর ভাগ্যের মোড় গেল ঘুরে, তুমি দিলে সমুদ্রে পাড়ি, আর আমার ভাগ্য আমায় দান করলে, একটী অজানা অচেনা নবীন বন্ধু, তারপর আরও অনেক কিছু—কিন্তু থাক ভাই, আর লিখব না। নিশ্চয় করে এস, মোটে দেরী কোর না। প্রণাম নিও। ইতি,

অভাগিনী

প্রবাহিনী"

চিঠিখানি শেষ করে অলর্ক প্রতীপের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "মনে পড়েছে। সেই প্রবাহিনী চৌধুরী, তোর গাড়ীতে রোজ কলেজ আসত? আহা, সত্যি বড় দুঃখ হয় ভাই তার জন্য! তুই কি আজই যাবি?"

প্রতীপ বললে, "নিশ্চয়! কিন্তু কেন জিগ্যেস করছিস?"

অলর্ক বললে, "ওই গ্রামে আমার এক মামা আছেন। তুই যদি কাল যেতিস, তা' হলে কিছু কিনে দিতুম তাঁর জন্য! তিনি আমায় বড় ভালবাসেন। একটা দিন অপেক্ষা করবি ভাই?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রতীপ বললে, "তাতে কি হয়েছে ভাই, বেশ, কালই তবে যাব।"

রাত্রি তখন প্রায় বারটা। ছোট্ট একটী ষ্টেশনে ট্রেণ থামতেই, প্রতীপ নেমে পড়ল। নীরব নিস্তব্ধ প্ল্যাটফরম। দূরে দূরে কেরোসিনের বাতিগুলি ঠিক প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। না আছে একটা কুলী, না আছে ভাড়াগাড়ী, একেবারে অজ পাড়াগাঁ। প্রতীপের মনটা মুসড়ে গেল। এক হাতে টর্চ্চ আর একহাতে স্যুটকেস নিয়ে সে হন্‌হন্ করে গাঁয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। সহসা তার পিছন থেকে একটী মেয়ে বল্‌লে, "ও পথ ভুল প্রতীপ দা', ওদিকে যেও না। উঃ, আমি কতক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছি তোমার জন্য!"

চমকে উঠে প্রতীপ বললে, "এ কি প্রবাহিনী, তুমি! এখানে একলা গাছতলায় দাঁড়িয়ে, সঙ্গে কেউ আসে নি?"

প্রতীপ কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সে মেয়েটী সত্যই প্রবাহিনী। কিন্তু বিশ্বাস তাকে করতেই হোল। একবার যাকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে চেনা যায়, তাকে কি কখনও মানুষ ভুলতে পারে? খিলখিল করে হেসে উঠে প্রবাহিনী বললে, "ভয় পেয়েছ, নয় প্রতীপ দা'? আমি না এলে তুমি কেমন করে বাড়ী চিনে যেতে বল ত? ঠিকানাটাও লোকে আনে ত। যাক, এস আমার সঙ্গে।"

তার পিছনে যেতে যেতে টর্চ্চ ফেলে প্রতীপ তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল, প্রবাহিনী অনেকখানি রোগা হয়ে গেছে। চুলগুলি বড় রুক্ষ। বাতাসের সাথে সমান তালে নাচছে। কিন্তু তার চিঠিখানি যে সে আনে নি প্রবাহিনী তা বল্‌লে কি করে? পকেটে হাত দিতেই সে শিউরে উঠল, তাই ত ও কি অন্তর্য্যামী। তার মনে কেমন যেন একটু সন্দেহ হতে লাগল। সেই নির্জ্জন আঁধার পথে তার সঙ্গে যেতে কি জানি কেন তার গাটা ছমছম করে উঠ্‌ল। প্রবাহিনী ভদ্রঘরের কুলবধূ হয়ে এত রাত্রে পথে বেরুল কেমন করে? পরক্ষণেই মন বলে উঠল, "না না, সে কি কখনও হতে পারে? প্রবাহিনী যে তাকে ভালবাসে, সে ভালবাসা স্বর্গের নন্দন কাননের পারিজাত পুষ্পের ন্যায় চির সুগন্ধময়, চির পবিত্র, চির অমর। রাত্রে পাড়াগাঁয়ে চলা অনভ্যস্ত প্রতীপ পথে কষ্ট পাবে বলে, সে সমস্ত সরম ভীতি ত্যাগ করে তাকে নিতে এসেছে।"

প্রতীপের চিন্তাজাল ছিন্ন হোল, "ও কি প্রতীপ দা', তুমি যে একেবারে পিছিয়ে গেলে, তাড়াতাড়ি পা চালাও—"

প্রতীপ লজ্জিত হয়ে ছুটতে সুরু করে দিল। বললে, আমি আর পারছি না প্রবা, আর কতদূর যেতে হবে?"

একটী দেবদারু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে প্রবাহিনী বললে, কষ্ট হচ্ছে প্রতীপ দা'? কিন্তু আমার কষ্ট যদি জানতে!"

তা বটে! নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথাটা তার এতবড় করে দেখা উচিত হয় নি। লজ্জিত হয়ে সে বললে— "তোমার ছেলেটি কেমন আছে প্রবা? কর্ত্তার কাছে তাকে রেখে এসেছ বুঝি?"

প্রবাহিনী হেসে উঠ্‌ল। কী অস্বাভাবিক সে হাসি! হঠাৎ তার মনে হোল ভারী করুণ স্বরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে ভয়চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে লাগল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। ভীষণ অন্ধকার। মনে হচ্ছে যেন, একটা বিকট দৈত্য তার কালো ডানায় সমস্ত আলো লুকিয়ে রেখেছে। শুধু ঝোপের ভিতরকার ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত গান শুনে তবুও একটু ভরসা

হয়, মনে হয় পৃথিবীর চেতনা বুঝি এখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। বিনিয়ে বিনিয়ে সেই করুণ কান্না প্রতীপকে পীড়া দিতে লাগল। সে প্রবাহিনীকে ডাকতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক। কম্পিত হাতে টর্চ্চটা জ্বালতেই তার উজ্জল আলোয় প্রতীপ স্পষ্ট দেখলে—অদূরে দাঁড়িয়ে প্রবাহিনী কাঁদছে। কোলে তার একটি সুন্দর শিশু।

এ শিশু কোথা থেকে এলো! প্রবাহিনীর সঙ্গে ত কেউ ছিল না। ভাল করে আর একবার দেখবার আগেই হাতটা শিথিল হয়ে টর্চ্চটা মাটীতে পড়ে গেল।

প্রতীপ ভয়ে চীৎকার করে উঠলো, "প্রবা, প্রবাহিনী!"

প্রবাহিনী মৃদুকণ্ঠে বললে, "কি প্রতীপ দা', এই ত আমি রয়েছি। ভয় পেলে না কি? আমি মেয়ে মানুষ, আমার ভয় হয় না, তোমার এত ভয়!"

সত্যই ত! প্রতীপ নিজেকে সংযত করে নিলে। মনের দুর্ব্বলতা কত মিথ্যা বিভীষিকাই না সৃষ্টি করে! সে ধীরে ধীরে টর্চ্চটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বললে, "সত্যিই ভয় পেয়েছিলুম প্রবা, তুমি যখন সঙ্গে রয়েছ, আর ভয় করব না আমি।"

প্রবাহিনী বললে, "সহরে লোক, পাড়াগাঁয়ে ত আস নি কখনও, ভয় পাবারই কথা। প্রথম আমি যখন শ্বশুর-বাড়ী ঘর করতে আসি, তখন তোমার চেয়েও বেশী ভয় ছিল আমার। তখন রাস্তায় বেরুন ত দূরের কথা দাওয়ায় পর্য্যন্ত একলা বেরুই নি। আচ্ছা প্রতীপ দা', কোলকাতায় এখন তেমনি ট্রাম চলে, তেমনি মটরের হুড়াহুড়ি হয়, মেয়েরা তেমনি পড়তে যায়। এ কবছরে সব যেন আমি ভুলে গেছি।"

ছোট কথাটির মধ্যে যে জীবন-যুদ্ধে পরাজিতার কতবড় বেদনা লুক্কায়িত আছে, তা বুঝতে প্রতীপের বাকী রইল না। সে, সে কথা না তুলে অন্য কথা পাড়ল, বললে, "জামাইবাবু কি করেন প্রবা?"

"করেন না, করতেন বল! বেশী কিছু নয়, পাড়াগাঁয়ে লোক যা করে, জমি-জিরেৎ ভোগদখল, গল্প-গুজব, তাস-পাশা। আর জমীদারের সেরেস্তায় হিসাব নবীশি। কাটছিল মন্দ না, বেশ ছিলুম।"

"তারপর..."

"তারপর কোথা থেকে এল কাল জ্বর, চাকরী গেল, হাতে পয়সা না থাকলে যা হয়ে থাকে, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' আর কি! কিন্তু ঘিও জুটল না, লাভে জমিগুলো অন্যের ঘরে উঠল। তোমার ত অনেক পয়সা, লোকজনও ত রেখেছ, ওঁকে কি তোমার ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখতে পার না! বলতুম না, ভুগে ভুগে এমন হয়েছে, বোধ হয় আর বাঁচবেও না। তুমি না দেখলে.."

প্রতীপ হেসে বললে, "যদি তোমার না কষ্ট হয়, আমার আপত্তি নেই নিয়ে যেতে।"

"কষ্ট, আমার?" প্রবাহিনীর হাসির শব্দ প্রতীপের কানে এসে বাজল। সে বললে, "আঃ বাঁচলুম! কথা দিলে ত প্রতীপ দা'?"

"দিলাম বই কি প্রবা!"

প্রবাহিনী একটা জরাজীর্ণ পোড়োবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, "এই আমার বাড়ী। তুমি সামনের ফটক দিয়ে ঢোক।"

প্রতীপ বললে, "তুমি!"

"বৌ যে, খিড়কী দিয়ে যেতে হয়, জান না"—বলে মৃদু হেসে প্রবাহিনী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

প্রতীপ দাঁড়ালো। সে বাড়ীতে জনমানব বাস করে বলে বিশ্বাস করা দায়। থমকে সে কয়েক মিনিট চেয়ে রইল। তারপর দরজা খোলা দেখে ধীরে ধীরে অত্যন্ত সঙ্কুচিত পদে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করল। সিঁড়ির পাশে একটী ছোট কুঠ্‌রী—তাকে ঠিক ঘর বলা চলে না—তাতে একটী আমকাঠের তক্তাপোষের উপর একটী জীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি বসেছিল। ঘরে আলো ছিল না। প্রতীপ টর্চ্চের সাহায্যে তাকে আবিষ্কার করলে। ঘরে ঢুকে সে বিনীত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার নাম কি দিলীপ বাগচী?"

দিলীপ তার পানে চেয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

তার মুখ দেখে মনে হয়, বয়স বড়জোর বছর ত্রিশের বেশী নয়। চেহারা এককালে বোধ হয় সুন্দরই ছিল, কিন্তু এখন তার ছাইয়ের মত গায়ের রং, হাড় বার করা নাক, কোটরাগত চোখ, ভাঙ্গা গাল—দেখে মনে হয়, একটী অতি সুন্দর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। প্রতীপ বললে, "নমস্কার।"

ঠিক তেমনইভাবে বসে দিলীপ হাত তুলে প্রতি নমস্কার করে বললে, "আপনার নাম?"

"শ্রীপ্রতীপ চৌধুরী।"

দিলীপ সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, "কি বললেন, প্রতীপ চৌধুরী? আপনি কি কোলকাতা থাকেন? ডাক্তার কি আপনি?"

প্রতীপ বললে "হ্যাঁ তাই।"

সে বুঝতে পারলে প্রবাহিনীর কাছে দিলীপ তার কথা শুনেছে।

সহসা দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনি এসেছেন, সত্যই এসেছেন? কিন্তু অন্ততঃ কালও যদি আসতেন! সে আপনাকে দেখলে বড় খুসী হ'ত!"

সবিস্ময়ে প্রতীপ বলে উঠল—"হ'ত কি বলছেন!"

"ঠিকই বলছি ডাক্তারবাবু, সে আপনাকে একবার দেখ্‌বার আশায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পথ পানে চেয়েছিল। চলুন এখন একবার তার কাছে, তবু যদি সে শান্তি পায়।"

দিলীপের নির্দ্দেশমত বাইরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রতীপ চীৎকার করে উঠল। দিলীপ বললে—"ও ঠিকই করেছে ডাক্তারবাবু, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে নিজের চোখের ওপর যার ছেলে মেয়ে মরে, তার পক্ষে এর চেয়ে আর ভাল ব্যবস্থা কি হতে পারে বলুন। আজ সকালে এ দৃশ্য দেখা থেকে কেবলই ভাবছি, এ ভাল হয়েছে, এ ভালই হয়েছে!—"বলতে বলতে তার কণ্ঠে আর ভাষা সরল না।

প্রতীপ আর একবার দৃষ্টি তুলতেই দেখলে—বারান্দার ছেলেদের খাটানো দোলনার দড়িতে প্রবাহিণীর দেহলতা ঝুলছে। সুন্দর মুখখানি—বীভৎস—ভয়াবহ হয়ে উঠেছে!…

পরদিন দিলীপকে নিয়ে প্রতীপ কলকাতা রওনা হ'ল। চোখে রইল অফুরান অশ্রু!

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

বিচিত্র-বার্ত্তা

শুনিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়, প্রায় ৫০০০০০০০০০০০০০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ পড়িয়া আছে, অথচ তাহা ভোগ করিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। মানবের কল্যাণে এ বিপুল সম্পদকে নিয়োজিত করিবার উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যিনি এ কার্য্য করিবেন, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হইবেন সন্দেহ নাই—কিন্তু 'হু ইজ্‌ টু বেল্‌ দি ক্যাট্‌?' অর্থাৎ, ঘণ্টা বাঁধে কে? সমুদ্র জলে এই স্বর্ণ মিশ্রিত আছে।

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের কোন টেলিফোন কোম্পানী ঠিক বেলা তিন ঘটিকার সময় প্রত্যেক টেলিফোনে ডাকিয়া বলে যে, যদি আপনার কিছু ক্রয়-বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়, নূতন চাকরের প্রয়োজন হয়, কোন জিনিষ হারাইয়া থাকে, কোন হারাণ জিনিষ পাইয়া থাকেন, যদি কোন বিপদ-আপদের সম্ভাবনা থাকে, তবে টেলিফোন কোম্পানীকে সংবাদ দিবেন। আমরা সকল কাজ ফেলিয়া আপনাদের সহায়তা করিব।

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুসরণ]

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেরো
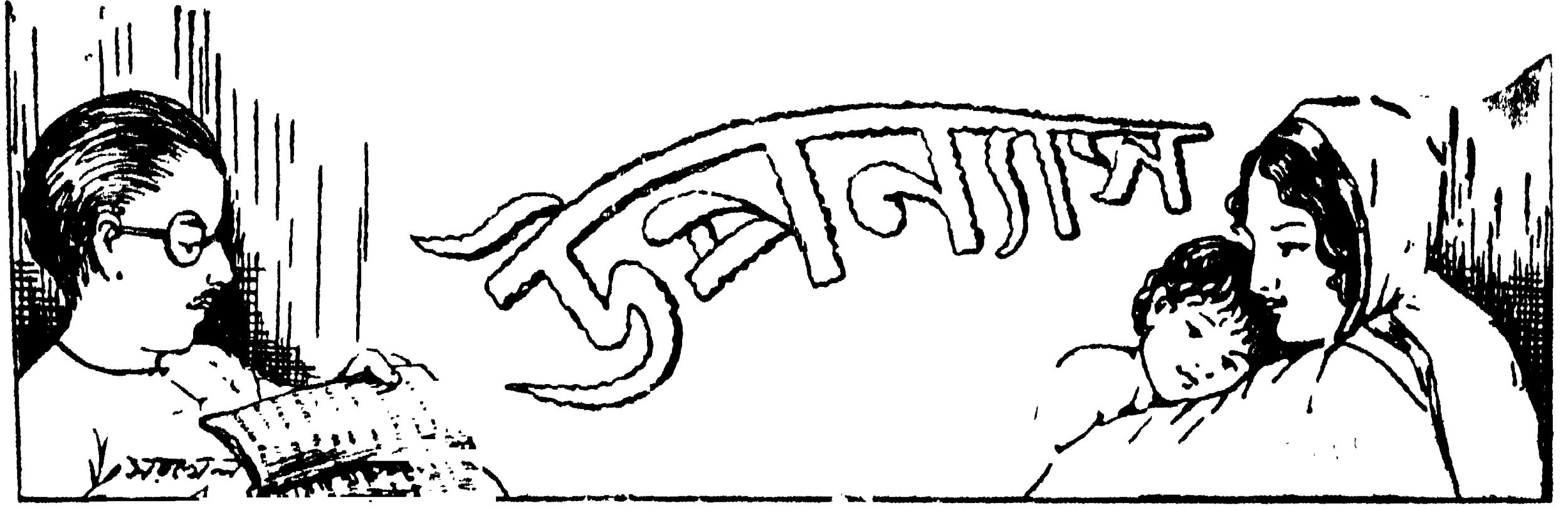
হাওড়া ষ্টেশনের নিকট গাড়ীটা আসিয়া যখন দাঁড়াইল, তখনও সরযূর হুঁস্ হয় নাই। গাড়োয়ানের ডাকে অজয়ের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেই সে সরযূর দিকে চাহিয়া বলিল—গাড়ী ষ্টেশনে এসে পৌচেছে—আমরা কোথায় যাব সরযূ?

প্রশ্নটা যত সোজা, উত্তর দেওয়া কিন্তু ততটা নয়। সরযূর মুখ হইতে অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বাহির হইয়া আসিল—কোথায় যাবো?

কাল রাত্রি হইতে আজ এই কতক্ষণ পর্য্যন্ত সে শুধু ভাবিয়াছে কোথায় যাইবে? কোথায় গেলে তাহার চিন্তার অবসান হইবে। কিন্তু প্রশ্নই জাগিয়াছে—উত্তর মিলে নাই। পৃথিবীর মধ্যে আশ্রয়-স্থল তাহার আর যে কোনস্থানে আছে ইহা সে ভাবিয়া পায় নাই।

ভূপালীর কথা বারবার মনে হইয়াছে—কিন্তু শেফালীর অফুরন্ত স্নেহধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া আর একজনকে হারাইবার সাহস তাহার হয় নাই, তথাপি বোধ হয় সে ভূপারই কথা স্মরণ করিয়াই হাওড়া ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে গাড়ী ভাড়া করিয়াছিল।

মধ্যপথে কি জানি কেন হঠাৎ মনে হইল সেখানে যাওয়া তাহার হইবে না। তবে সে যাইবে কোথায়?

গাড়োয়ান হাঁকিল—এখানে গাড়ী আর কতক্ষণ দাঁড়াবে বাবু, না নাম্‌লে পুলিশে ফাইন করে দেবে।

তাই ত! সরযূ তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। তারপর অজয়কে নামাইয়া লইয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ষ্টেশনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল।

মনে পড়িল—পিতার কথা! জীবনের যাত্রাপথের শেষ সীমায় আসিয়া ব্যাচারী শ্রান্ত অবসন্ন হৃদয়েই বিশ্বনাথের পদপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন।

তাঁহাকে বিব্রত করিবার কল্পনাও তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহাকে ছাড়া সে এ দুর্দ্দিনে দাঁড়াইবেই বা কোথায়? অজয়ের মুখখানির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মমতার বেদনায় তাহার সারা অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল! শিশুর মত অসহায় এই লোকটার প্রতি দৃষ্টি যে তাহাকে দিতে হইবেই। নিজের দিকটা না হয় নাই ধরিল—কিন্তু অজয়কে লইয়া একটা স্থানে আশ্রয় না লইলেই যে নয়।

মেয়েদের টিকিট ঘরের সাম্‌নে আসিতেই সহসা সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর কাশীর দুইখানা টিকিট কিনিয়া লইয়া—প্লাটফর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইল। আর বিলম্ব নাই, এখনই বেনারসগামী একখানি গাড়ী ছাড়িবে। রেলের নির্দ্দেশসূচক লাল আলোটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া সাধারণের

নিকট:গাড়ী ছাড়িবার সময়টা প্রতি মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্ট করিয়া মনে পড়াইয়া দিতেছে।

জনস্রোতও উন্মত্তবেগে সেইদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সরযূও অজয়কে লইয়া সে জন-প্রবাহের মধ্যে মিশাইয়া গেল। তারপর একখানি ইন্টার ক্লাশের কামরায় ঢুকিয়া পড়িয়া অজয়কে একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়া বসাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অজয় এতক্ষণ কথা কহে নাই, এইবার কহিল, বলিল—কাশীতে আমরা কোথায় যাব সরযূ?

হাসিতে চাহিয়া সরযূ বলিল—বাবার কাছে যাবো অজয় দা'।

অজয় কি বুঝিল, কে জানে! সে আর কথা কহিল না।

ঘণ্টা দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

* * *

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছে। এবং রাস্তার দূরত্ব অনুযায়ী যাত্রী সংখ্যাও হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়জন গাড়ীর মধ্যে আছে, তাহারাও নিদ্রাসুখ অন্বেষণে ব্যস্ত।

অজয় শুধু উন্মুক্ত জানালা-পথ দিয়া নিঃসীম আকাশ ও অস্পষ্ট পৃথিবীর মধ্যে যোগসূত্র গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর একটা জানালায় মুখ দিয়া সরযূও চাহিয়া আছে। প্রকৃতির সহিত তাহাদের অন্তরও যেন মূক হইয়া গিয়াছে। অন্তরের অন্তরালে কি কোন ঝড় উঠিয়াছে, কে জানে!

সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাসে সরযূর দৃষ্টি ফিরিয়া অজয়ের দিকে পড়িল। সে দেখিল, একরাশ চোখের জলে তাহার সারা মুখখানি ভাসিয়া চলিয়াছে। সরযূ কহিল—সারারাত বসে থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে অজয় দা', তুমি শুয়ে পড়!

অজয় কথা কহিল না। সরযূ নিজে আর একটু সরিয়া গিয়া তাহাকে স্থান করিয়া দিতে দিতে বলিল—শুয়ে পড় লক্ষ্মীটি, সারারাত বসে থেকে অসুখ হলে কে দেখবে বল ত? এই ত কালও দেখেছি তোমার গাটা গস্‌গস্ করছে। ও কি, ছেলেমানুষের মত চোখে জল কেন! আমরা মেয়েমানুষ কাঁদতে পারি, তাতে লজ্জাও নেই, কিন্তু তোমার কাঁদলে কি চলে? ছিঃ! কথা শোন! শোও, শুয়ে পড়, জায়গাই নেই শোবার? নাই রইল, কোলেই মাথাটা থাক—বলিয়া সরযূ পরম যত্নে অজয়কে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিল।

এবারও অজয় কথা কহিল না। শুধু তাহার চোখের জল প্রবলবেগে বাহির হইয়া আসিয়া সরযূর উপাধান সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

সরযূ আর বাধা দিল না, তাহার মৌন বেদনার নীরব সাক্ষী হইয়াই যেন বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

* * *

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেনারস ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। অন্য যাত্রীদের সহিত সরযূও নামিয়া পড়িল। অধিকাংশ লোকই বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন মানসে চঞ্চল! সরযূর সে বালাই ছিল না, সে সবার পশ্চাতে ধীরে ধীরে ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা এক্কাওয়ালা সরব চীৎকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া কুলীর মাথা হইতে মোট্টা একরূপ ছিনাইয়া লইয়া গাড়ীতে তুলিতে তুলিতে—চলিয়ে মায়ীজী, বাঙালী ধর্ম্মশালায় এখনই পৌঁছে দেব আমি—বলিয়া একরূপ জোর করিয়াই তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া লইল!

সরযূ বলিল—ধর্ম্মশালায় নয়, 'গনেশ মহাল্লা'য় নিয়ে চল তুমি।

গণেশ মহাল্লার উদ্দেশ্যে গাড়ী ছুটিল।

সরযূর মন তাহার পূর্ব্বেই শুধু গণেশ মহল্লায় নয়, তাহার একান্ত পরিচিত একখানি গৃহে গিয়া উপনীত হইয়াছে।

রাস্তার নিকটেই তাহাদের বাড়ী। সেইখানে আসিতেই, গাড়ী দাঁড় করাইয়া সরযূ তড়তড় করিয়া নামিয়া পড়িল। এবং অজয়কে সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়াই একেবারে গলির মধ্যে ঢুকিয়া গেল। যখন বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন বৃদ্ধ সত্যজিৎবাবু বারান্দায় বসিয়া

গীতার কি একটা অধ্যায়ের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু দৃষ্টির সল্পতা প্রযুক্ত বারবার তাহা ব্যাহত হইতেছিল। সরযূ তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িতেই, কে? কে? বলিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

আমি সরযূ! চিন্তে পারছেন না বাবা?

ওঃ সরযূ। সব ভাল ত মা, অমর কই? তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস্ বুঝি? না, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। যা যা, না থাক, আমিই তাকে নিয়ে আসছি। চোখের আর সে জোর নেই মা, যে, ছুটে যাবো। বলিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহিলেন। সরযূ বাধা দিয়া বলিল—সে আসে নি বাবা। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

সে আসে নি! বৃদ্ধ বিস্ফারিত নয়নে একবার ভাল করিয়া কন্যাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তবে একা তুই কেমন করে এলি মা? ঝগড়া করেছিস্ বুঝি?

একা নয়, অজয়বাবু সঙ্গে এসেছেন। দাঁড়ান, তাকে গাড়ী থেকে নিয়ে আসি আমি বলিয়া তাঁহার শেষ কথার উত্তর না দিয়াই সরযূ সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

বৃদ্ধ তাহার গমন-পথটার দিকে অর্থহীন-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

চৌদ্দ

পরিচয়-পর্ব্বটা কোন রকমে সমাধা হইয়া গেল। বৃদ্ধ সত্যজিৎ কন্যার অনুরোধ সত্ত্বেও আর বাড়ী বসিয়া রহিলেন না; বাজার করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঘণ্টাখানেক পরে যখন ফিরিলেন, তখন একা নহে, সঙ্গে একটা চাকর ও তাহার মাথায় একরাশ আনাজ-পত্র, চালডাল, নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষে ভরা।

সরযূ কহিল—এ কি করেছেন বাবা? একেবারে সব বাজার ঝেঁটিয়ে এনেছেন যে।

সত্যজিৎ বলিলেন—ঝেঁটিয়ে কোথায় মা, যা নইলে একেবারেই চল্‌বে না, তাই নিয়ে এলুম। দু'চার দিন ত থাকৃবি এখানে—ঘরে যে কিছুই নেই।

সরযূ হাসিতে চাহিয়া বলিল—এখনই তাড়াতে চান কেন বলুন ত? দু'চার দিন কেন, দু'চার বছর থাকৃব বলেই ত এখানে এসেছি আমি।

ভ্রূ কুঞ্চনে বৃদ্ধের চোখের চশমা দুইটী নামিয়া আসিয়াছিল—তিনি সেটাকে যথাস্থানে সংরক্ষিত করিতে করিতে বলিলেন—অধিকার হারিয়েও অধিকার করবার মোহ রাখার নামই যে দুঃখ মা, অমরের হাতে যেদিন তোকে তুলে দিয়েছি, সেদিন থেকে তুই তারই। আমার কল্পনাও থাকা উচিত নয়।

আচ্ছা সে তখন বোঝা যাবে, থাকে কি না। এখন রান্নার যোগাড় করি ত!

সরযূ ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিল।

চাকরটাকে মায়ীজীর আদেশ মত কাজ করিবার উপদেশ দিয়া বৃদ্ধও বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিনি যখন ফিরিলেন, তখন মধ্যাহ্নকাল অতীত প্রায়। সরযূ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—বেশ লোক যা হোক, এখনও ঘুরছেন, কখন খাবেন বলুন ত? বড় হয়ে বকৃতে পারি না কি না, তাই বাড়িয়ে তুলেছেন।

হাসিতে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিলেন—আমার জন্যে বসে আছিস্? তাও ত বটে, আমার বলে যাওয়াই উচিত ছিল। আমি খাব না মা, মিসিরজীর কাছে এই ত খেয়ে আস্‌ছি আমি।

সরযূর মুখে সপাং করিয়া কে যেন একটা চাবুক মারিল। পাণ্ডুর মুখ দিয়া সহসা তাহার কোন ভাষাই প্রথমটা বাহির হইল না, বহুকষ্টে ঢোক গিলিয়া ধীরকণ্ঠে সে বলিল—মিশিরজী!

হ্যাঁ মা, শেষের দিন কটার সেই ত সঙ্গী আমার। নিজের করবার শক্তিও নেই, উৎসাহও নেই। মিশিরজী...

ওঃ বলিয়া অন্য কোন কথা না শুনিয়াই সরযূ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। বৃদ্ধ খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে দরজার নিকট আসিয়া

দেখিলেন, অজয়কে একখানি আসনে বসাইয়া সরযূ ভাত মাখিয়া খাওয়াইয়া দিতে সুরু করিয়াছে।

তাঁহাকে দেখিয়া অজয় একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, বলিল—সরযূ না থাকলে না খেয়েই মরতে হ'ত কাকাবাবু, এমনই করে ও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু কি লাভ এ বেঁচে থাকায়!

লাভ লোকসান পরে বোঝা যাবে, এখন খাও ত! বসো না বাবা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

না মা, একটু গড়াতে হবে, নইলে শরীর টেঁক্‌বে না। বলিয়া সত্যজিৎবাবু বাহির হইয়া গেলেন। একটা অপ্রসন্নতার ছায়া যেন তাঁহার সারা মুখখানির উপর খেলা করিতে লাগিল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তখন সরযূর ছিল না। সে অভুক্তকে আহার করাইতে ব্যস্ত রহিয়া গেল।

* * *

দিন দুই কাটিয়া গিয়াছে। সরযূ বলি বলি করিয়াও সত্যজিৎবাবুকে তাহার বর্ত্তমান জীবনের কথা বলে নাই। কতকটা পিতার মনে বেদনা না দিবার জন্যও বটে, আবার কতকটা ঠিকমত সে অবসর তাহার মিলে নাই বলিয়াও বটে। কেন না, সকল সময়ই বৃদ্ধ ফাঁকে ফাঁকে থাকিয়াছেন। পিতার এই মায়াজয়ের প্রচেষ্টা দেখিয়া সরযূ কখন হাসিয়াছে, কখন সহানুভূতিতে তাহার সারা অন্তর ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

বহুদিন হইল মা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। একটী ভাই ছিল, সেও নাই। জ্ঞাতি কুটুম্ব বলিতে অনেকে আছেন সত্য, কিন্তু নিজের সংসার লইয়াই তাঁহারা বিব্রত। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়? অমর অবশ্য তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন মতেই রাজীহন নাই। কুটুম্বের নিকট কি চিরদিন থাকা চলে! তিনি জোর করিয়াই পেনসনের টাকা কয়টী সম্বল করিয়া কয় বৎসর হইল কাশীতে আসিয়া উঠিয়াছেন, এবং ওপারের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এপারের মায়া এড়াইবার এই যে প্রচেষ্টা, ইহাকে উপেক্ষা করাও ত যায় না।

কিন্তু ইহা ছাড়াও যে আর একটা দিক থাকা সম্ভব, তাহা সরযূর মনেও পড়ে নাই। যখন পড়িল, তখন সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া অন্য কোন পন্থাই খুঁজিয়া পাইল না।

সত্যজিৎ বাড়ী ছিলেন না, পিওন আসিয়া তাঁহার নামের একখানি চিঠি দিয়া গেল। বাবাকে চিঠি লিখিবার মত কে আছে ভাবিয়া না পাইয়া কৌতূহলবশে সরযূ লেফাফাখানি হাতে লইতেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। পত্রখানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে এবং ইহা লিখিয়াছে যে অমর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে এখানে চিঠি লিখিল কেন? কি তাহার প্রয়োজন!

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াই সরযূ পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল। অমরই লিখিয়াছে বটে। পড়িতে পড়িতে সরযূর মুখ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ সত্যজিৎবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাইয়াছে:— আপনার কন্যার সহিত আজ বৎসরাধিক আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাদের খবর লইবার কৌতূহলও আমার অল্প। তবে কয়দিন পূর্ব্বে তাহারা আমার এখানে আসিয়াছিল—কিন্তু একান্ত কর্ত্তব্য বোধেই তাহাদের এখানে রাখিতে পারি নাই। প্রণত

অমর

অনর্থক হরপগুলার উপর চোখ রাখিয়া সরযূ অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। কতবার যে সেখানি পড়িল, তা সে নিজেই জানে না। তারপর ধীরে ধীরে সেখানি পিতার শয্যায় রাখিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

খানিক কি ভাবিয়া চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল— দুখানা ঘর দেখে দিতে পার লছমন্?

লছমন উনানে আগুন দিয়া আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে। সে বলিল—কাশীতে ঘরের ভাবনা কি মা, এখনই দেব, কিন্তু কার জন্যে?

দরকার আছে—অন্য কাজ আমি করে নেব খন, তুমি ঠিক করে এস, বুঝেছ? ভাড়া তিন চার টাকার বেশী না হলেই ভাল হয়।

লছমন ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অজয় বলিল—ঘর কি হবে সরযূ?

সরযূ হাসিতে চাহিয়া বলিল—যেতে হবে না আমাদের? বা রে, আপনার লোকের কাছে বারমাস থাকতে আছে না কি?

অজয় ব্যস্তভাবে কহিল—কিন্তু এমন আশ্রয় ছেড়ে যাওয়াও যে উচিত নয় সরযূ! তা ছাড়া, উনিই বা কি মনে করবেন!

মনে কি করিবেন সে কথা না ভাবিলেও এস্থান ত্যাগ করা যে উচিত নয় ইহা কি সরযূ জানে না, কিন্তু কতবড় দুঃখে যে আজ তাহাকে যাইতে হইতেছে ইহা প্রকাশ করিবার সুযোগও যে তাহার নাই। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল, প্রাণপণ প্রযত্নে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে বলিল—তবু যেতেই হবে অজয় দা', আপনার লোকের বাড়ী তিনদিনের বেশী থাকতে নেই, তাতে মান্য থাকে না। সত্যি নয় কি? বলিয়া সে কোন রকমে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

প্রতিবাদ করিবার শক্তি অজয় হারাইয়া ফেলিয়াছে, কাজেই সে চুপ করিয়া গেল।

* * *

সারা বাড়ীটার মধ্যে যেন কি একটা বিপ্লব সুরু হইয়াছে। বৈকালের দিকে সত্যজিৎবাবু যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন একটা প্রবল ঝঞ্ঝার আলোড়নে তাঁহার সমস্ত অন্তর বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মুখখানি শুষ্ক, বিবর্ণ; দুইদিন পূর্ব্বেও তাঁহার শরীরে যে শক্তি ছিল, আজ যেন কে তাহা নিঃশেষে হরণ করিয়া লইয়াছে। একান্ত পথ না চলিলে নয় বলিয়াই যেন তিনি প্রতিদিনকার মত বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইতেছেন।

সরযূ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সত্যজিৎ উদাস অর্থহীন দৃষ্টিতে সরযূর মুখের পানে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

সরযূ মৃদুকণ্ঠে কহিল—আপনি বেড়িয়ে ফিরে এলে হয় ত দেখা নাও হতে পারে, তাই পায়ের ধুলোটা নিয়ে রাখি বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ে হাত দিতে গেল। কিন্তু সত্যজিৎবাবু ত্রস্তে খানিকটা পিছাইয়া গেলেন। সরযূ সবিস্ময়ে মুখখানি তুলিয়া একবার পিতার হৃদয়ের অন্তস্থলটা অবধি দেখিয়া লইতে চাহিল। তাঁহার ক্ষমাহীন মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—আপনি আমার ছোঁয়া খান্ নি, হয় ত তার যোগ্যও নই, কিন্তু পায়ের ধুলো নেবারও কি অধিকার নেই আমার?

বৃদ্ধের জলদগম্ভীরকণ্ঠ হইতে শুধু উচ্চারিত হইল—না!

সরযূ এতটুকু বিচলিত হইল বলিয়া বুঝা গেল না। সে ধীরকণ্ঠে বলিল—অজয়বাবুকে লছমন নতুন বাড়ীতে রাখতে গেছে, সে এলেই আমি চলে যাবো, ততক্ষণ যদি না অপেক্ষা করতে পারেন, চাবীটা...

বোধ করি দৃষ্টি শক্তিটা আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই কোন মতে পথ চিনিয়া চলিতে চলিতে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন—মিশিরজী, হাঁ, মিশিরজীর কাছেই পাঠিয়ে দিও ওটা।

বৃদ্ধ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সরযূ শূন্য আকাশটার পানে চাহিয়া একবার হাসিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরগুলিতে চাবী দিয়া নিজেদের অবশিষ্ট বাঁধা পুঁটুলিটা লইয়া সদর দরজার সামনে আসিয়া লছমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রথমে গ্রামের ভিতর একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু কালের অশ্রান্ত স্রোতে ক্রমে ক্রমে তাহা বিলীন হইল। সরমাকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কেহ বলেন—"সোমত্ত মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী ঘর করতে গিয়ে স্বামী ত্যাগ করে চলে এলে কি রকম কি রকম যেন ঠেকে।"

কেহ বা বলেন—"বিয়ের সময় নিশ্চয়ই কেউ মন্দ করেছে।"

অনেকের মতে ও সব বাজে কথা, ভিতরে কিছু আছে।

পুনরায় কথা উঠে—"ওর স্বামী যে দুর্ব্ব্যবহার করতে পারে, এত বিশ্বাস হয় না। সংসারে আর কেউ নেই, থাক্‌লেও বা বোঝা যেত তারাই পীড়ন করে।"

পল্লী-মেয়েদের ধারণা যখন স্বামী উচ্চশিক্ষিত, সহরে থাকে, গভর্ণমেণ্ট চাকুরী করে, দেখতে-শুনতেও ভাল, তখন এরূপ ব্যাপার তাহার দ্বারা ঘটিতে পারে না। উহাদের মধ্যেও আবার অনেকে বলেন—"ঈশ্বরের ইচ্ছে অভাব তো কিছু নেই, কোল্‌কাতায় বাড়ী আছে, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, তবে কেন এ রকম হয়।"

দুই একজন বৃদ্ধা বলেন—"বোধ হয় ওর সহর ভাল লাগে না।"

দুই একজন প্রৌঢ়া বলেন—"না তা' নয়, মা ছেড়ে থাকতে পারে না, ওর মায়ের ঐ ত একটি মাত্র মেয়ে।"

সারাদিন কাজের মধ্যে থাকিয়াও সরমার মা এবং বউদিদি স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা সরমার জন্য চিন্তাকুল।

উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলে। মা বলেন—"বুঝ্‌লে বউমা, আমার মেয়েরও দোষ আছে। বরের সঙ্গে বনিয়ে-সনিয়ে ঘর না করলে মেয়ে-ছেলের অশেষ দুর্গতি। সব পুরুষই যে এক রকম প্রকৃতির হবে, তার ত কোন মানে নেই। সুরেন যা' না পছন্দ করে, তা' কর্‌বার কি দরকার?"

বউদিদি বলেন—"তোমার জামায়েরও দোষ আছে মা। অতটা বাই কিন্তু পুরুষের ভাল নয়।"

মা বলেন—"ছেলেবেলা থেকেই ও কেমন যেন স্বাধীন প্রকৃতির। দেখেছি, যার তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলা ওর একটা অভ্যেস। কত বুঝিয়েছি, বকেছি, অবাধ্য মেয়েকে আর কত শাসন করা যায়? বড় হয়েছে, বেশী কিছু বল্‌তেও পারি না—"

প্রত্যুত্তরে বউদিদি উত্তেজিতা হইয়া কহিলেন—"তা' বলে কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক সামান্য ব্যাপারে স্ত্রীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় না। আজ যদি আমাদের পয়সা থাকতো তেমন—"

মা কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কহিলেন—"পয়সা থাকলেই কি মা কেলেঙ্কারী করা উচিত, না সবাই তা' করে—"

শ্রাবণের ধারার মত মায়ের চোখ দিয়া অনর্গল অশ্রুপাত হয়। আষাঢ় সন্ধ্যার কাজল মেঘের মত মুখখানি লইয়া বউদিদি আবার সংসারের কাজে চলিয়া যান।

সরমা ভাবে—"মরণ ছাড়া আর তার জুড়োবার স্থান কোথায়?"

সারা দিনরাত ধরিয়া তাহার কাতর ম্লান মুখখানি কুটীর প্রাঙ্গণে অন্ধকারকে যেন মূর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, অশ্রু-নদীর সজল গাথা শুনাইয়া বুঝি বাউল বাতাস বনে বনে ফিরিতেছে। সে ভাবে—"সত্য তার মরণই মঙ্গল!"

পরক্ষণে আবার মনে হয়—"কি তার অপরাধ! মরবেই বা কেন? কি এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়েছে, যাতে করে তাকে নিয়ে এত চোট? কারো খায় না, পরে না, কারো কথায় থাকে না—তবু কেন সবাই তার কথা আলোচনা করে? ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, লোকের তা'তে কি?"

অবসর পাইলেই মা আসিয়া বলেন—"আমার পেটের মেয়ে হয়ে শেষে তুই শত্রু হাসালি—বাপ-পিতামোর নাম ডোবালি। আজ যদি কর্ত্তা বেঁচে থাক্‌তেন ত কিছুতেই তোকে ক্ষমা করতে পার্‌তেন না।"

সরমা চুপ করিয়া থাকে। বউদিদি বলেন—"স্বামীর ঘর কর্‌তে পার্‌লে না ঠাকুরঝি! ছি ছি, স্বামী যা' অপছন্দ করেন তা' না কর্‌লেই পার্‌তে! একরাশ টাকা দিয়ে তোমায় বিয়ে দেওয়া গেল, শেষে এই সর্ব্বনাশ কর্‌লে? এখনও যে দেনা শোধ যায় নি?"

অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া সরমা ম্লানমুখে কহিল—"তুমি কি বল্‌তে চাও বউদি'—স্ত্রী আর ক্রীতদাসী এক?"

বউদিদি বলিলেন—"কিছুই বল্‌তে চাই না, তোমার মত নভেল-পড়া নভেলী মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভই হবে না—নভেলের ক্রিয়া যে তোমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, তা' বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে কি জানো, স্বামী ভিন্ন নারীর আপনার বল্‌তে কেউ নেই! সেই স্বামীর কাছ থেকে তুমি যখন চলে এসেছ, তখন তোমার স্থান যে কোথায় হবে ভেবে পাই না।"

এই কথার পর সরমা আর কোন কথা কহিল না।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়, মানসিক যন্ত্রণায় অধীরা তরুণী কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য আনিতে পারে না। কেহই তাহাকে সান্ত্বনা দেয় না। সে আপন-মনে বলে—"এবার বোধ হয় পাগলই হয়ে যাব।"

তাহার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে বনের পাদপশ্রেণী শিহরিয়া উঠে, পাখীর কূজন থামিয়া যায়, নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া তীরে আছড়াইয়া পড়ে।

কত রজনী সরমা বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিয়াছে এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে—"এবার আমায় তোমার কাছে ডেকে নাও ঠাকুর!"

ঈশ্বর কিন্তু সাড়া দেন না—তিনি কি নিষ্ঠুর!

নদীর ধারে মালঞ্চ-ঘেরা পর্ণ-কুটীর সরমার পিত্রালয়। আশপাশে তুই-একখানি করিয়া কুটীর ইতস্ততঃভাবে বিক্ষিপ্ত। মধ্যে বাঁশবন ও আম্রকুঞ্জ। পিতা জীবিত নাই। একটি মাত্র ভ্রাতা, তাও বিদেশে চাকুরী করেন। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া তিনিও বিশেষভাবে মর্ম্মাহত। বউদিদি তাঁহার পত্র দেখাইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সরমা কহিল—"বুঝেছি বউদি', পৃথিবীতে আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই! সম্পর্কীয় দেওরের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছি, থিয়েটারে গিয়েছি—এইতো আমার অপরাধ! বলি কেউ কি তা' যায় না? তা'তেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল—"

বউদিদি কহিলেন "ঠাকুরজামাই ও সব পছন্দ করে না, এটা ত বোঝা উচিত—"

সরমা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—"আমাকে সে বিশ্বাস করতে পারলে না—ঈশ্বরের নামে শপথ কর্‌লুম, তবু না। তার আমি কি করতে পারি বলো ত? এখানে এলাম, তোমরাও আমাকে অবিশ্বাস কর্‌ছো—বিচার করে' বলো কি আমার অপরাধ!"

ঘরে তখন টিক্‌টিকির শব্দ উঠিল—"ঠিক, ঠিক্!"

মা পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে সব শুনিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—"তুমি যে বরাবরই বেহায়া কি না, তারই পরিণাম। এখন কেঁদে কি হবে? চরিত্রে অপবাদই যে মেয়েদের মস্ত বড় কলঙ্ক—"

সরমা নীরব হইল। বাপের বাড়ীতেও সহানুভূতি না পাইয়া সে আরও আঘাত পাইল। সে আপন-মনে বলিতে লাগিল—"কি করে আবার তার কাছে ফিরে যাবো! গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে দরজায় খিল দিতেই ত মনের ঘৃণায় চলে এসেছি—সে ত

আর আমায় ঘরে নেবে না! আমাকে যদিক খুন করতো, বিষ খাইয়ে মারতো, তাও যে ছিল ভালো।"

জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সরমা বিশেষ চিন্তাতুর। নারী-জীবনের স্বাধিকার না থাকিলে সবই বিড়ম্বনা। প্রশ্ন উঠে—বাস্তবিকই কি নারী-জীবনের স্বাধিকার আছে? তাহার মন বলিয়া উঠিল—"স্বাধিকার আছে কি না দেখা যাক্, এমনভাবে আর থাকা চলে না।"

গ্রামটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; মধ্যে মধ্যে শিবা ও সারমেয় সম্প্রদায়ের কোলাহল উঠে মাত্র। কতিপয় বাদুড়ের পক্ষ তাড়নার অস্ফুট শব্দ অন্ধকার রজনীর স্তব্ধ হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। সরমা একাকী বাটী হইতে বাহির হইল। পথ বাহিয়া সে চলিল ষ্টেশনের দিকে—উদ্দেশ্য কি তাহা কিছুই স্থির হয় নাই, তবে কলিকাতায় ফিরিয়া না গেলে কোন মতলবই ঠিক্ করিতে পারিতেছে না। জনহীন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সে যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন রাত্রি তুইটা। টিকিট কাটিবার সাহস হইল না, পাছে ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে সন্দেহ করিয়া ট্রেণে না উঠিতে দেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ট্রেণ আসিল। একটি তৃতীয় শ্রেণীর খুব ছোট নির্জ্জন কামরার দরজা খুলিয়া দেখিল, কেহ নাই; কেবল একটি ভদ্রলোক বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছেন। সন্তর্পণে সে তাহাতে উঠিল। অন্তরে ভয় হইতেছিল—ভদ্রলোক কিরূপ প্রকৃতির, তাহা কে জানে! আবার ভাবিল—"সর্ব্বহারার আর কিসের ভয়? ভাবনার মধ্যে দিয়েই ত তার চলার পথ। এখনই ভয় পেলে চল্‌বে কেন?"

দরজা খোলার শব্দ পাইয়া ভদ্রলোকটী চাহিয়া দেখিলেন—একটী পরমা সুন্দরী তরুণী একাকিনী ট্রেণে উঠিতেছে, সঙ্গে কেহই নাই। একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। সরমা পার্শ্ববর্ত্তী বেঞ্চে গিয়া বসিল। ট্রেণ চলিতে সুরু করিল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। ভদ্রলোক কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিতেছিলেন না। এত রাত্রে একা কোন বাঙালী ভদ্র রমণী যে বাড়ীর বাহির হইতে পারে, ইহা তাঁহার কোনমতেই বিশ্বাস হইতেছিল না। অবশ্য প্রগতি-উপাসিকা তু'-দশজন আজকাল দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের গোত্রে ইঁহাকে ফেলা কোনমতেই যায় না; কেন না, লজ্জা, ভয় এবং অনভ্যস্ততার সমস্ত লক্ষণই ইঁহার মধ্যে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। তবে? নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িয়া ইনি এভাবে যাইতে বাধ্য হইতেছেন—কিন্তু কি সে বিপদ?

স্থির থাকিতে না পারিয়া সহসা তিনি সরমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন?"

সরমা কোন উত্তর দিল না।

—"অপরিচিতা কোন স্ত্রীলোককে প্রশ্ন করা উচিত নয়, তবু করছি এই কারণে যে, আমার মনে হচ্ছে আপনি বড় বিপন্না। যদি আমার দ্বারা আপনার কোন সাহায্য করা সম্ভব হয়, আমি করতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমাকে নিজের ছেলের মতই বিশ্বাস করতে পারেন।"

মুহূর্ত্তে সরমার বুক হইতে যেন একখানা ভারী পাথর খসিয়া গেল।

তাহার নিকট হইতে ভদ্রলোকটী ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথাই জানিয়া লইলেন। সরমা জানিতে পারিল, তিনি 'সিউয়িং মেশিন কোম্পানী'র একজন বিশেষ পদস্থ কর্ম্মচারী।

তিনি কহিলেন—"বেশ ত আপনি যদি স্বাধীনভাবে থাকতে চান, আমি সে ব্যবস্থা করে দেব। আপনাকে আমাদের 'লেডি ক্যানভাসার' করে নেব। উপরন্ত, গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়েদের সেলায়ের কাজ শেখালে বেশ তু'পয়সা রোজগারও করতে পারবেন।"

সরমা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তথাপি সসঙ্কোচে বলিল—"কিন্তু এখন আমি থাকব কোথায়? বুঝতেই ত পেরেছেন, আমার আর কোথাও জায়গা নেই।"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন—"তার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে। উপস্থিত আমার বাসাতেই উঠবেন; তারপর ধীরে-সুস্থে একটা ব্যবস্থা করে নিলেই হবে।"

সরমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—আচ্ছা।

দীর্ঘ দশবৎসর পরের কথা।

মধ্যাহ্নকাল। একখানি দ্বিতলবাড়ীর একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া দুইটী স্ত্রীলোক কথোপকথন করিতেছিল। একজনকে আমরা চিনি—সে সরমা। অন্যজন অপরিচিতা।

অপরিচিতা বলিল—"একজিবিশনে বেড়াতে গিয়ে ত আপনার কথায় মেশিনটা কিনে ফেল্‌লুম, এখন শিখ্‌তে পারলে হয়।"

—"শিখ্‌তে পারবেন বই কি। আমি ত রইলুম। কোন ভাবনা নেই আপনার। আজকে—"

—"আবার আপনি। বল্‌লুম না আমাকে মাধুরী বলেই ডাকবেন। এত পারেন, আর আমার নামটা মনে রাখ্‌তে পারেন না? তারপর আপনার গল্প বলুন। স্বামী তাড়িয়ে দিলেন, বাপের বাড়ী চলে গেলেন, তারপর—"

—"আবার তারপর।"

—"তারপরই ত গল্প, বলুন না শুনি।"

"মরাই উচিত ছিল, কিন্তু মরতে পারলুম না, ইচ্ছা হ'ল না। মেয়েরাও মানুষ কি না ভগবানের বিচারে, তাদেরও স্বাধিকার বজায় রেখে বেঁচে থাকা চলে কি না দেখতে একদিন রাত্রে বেরিয়ে পড়লুম। সত্যি মাধুরী, মেয়েরাও মানুষ, তাদেরও বাঁচার প্রয়োজন আছে—নইলে রেলে অমন মহাপ্রাণের দেখা পাব কেন! তাঁর দয়ায় পেলুম এখানে চাকরী। কিন্তু এসব শুনে তোমার কি লাভ ভাই?"

—"দুনিয়াটাকে তুমি বুঝি শুধু লাভ আর লোকসান খতাবার যন্ত্র বলেই জেনে নিয়েছ দিদি? তাই কেবল তারই খোঁজ করছ।...ভাল কথা, কাল আসা চাই কিন্তু। কাল থেকে কাজ শিখতে হবে। বাজে বাজে দুটো দিন কেটে গেল। এরপরও হয় ত বাজেই যাবে, তবু—"

—"দোষ ত তোমারই বোন্, বেশ, কাল সকাল সকালই আসব। বাজে গল্প তুল্‌লে বকুনি খেতে হবে কিন্তু।"

হাসিয়া সরমা উঠিয়া পড়িল।

মাধুরী অর্থহীন-দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরমা না চিনিলেও প্রথম পরিচয়েই মাধুরীর বুঝিতে বাকী ছিল না যে, সে তাহার কে। বিনা অপরাধে বহিষ্কৃতা হওয়ায় স্বভাবতঃই সরমার জন্য একটা মমতা মাধুরীর বুকে জমা হইয়াছিল। এমন কি, শুধু এই কারণেই অদ্যাবধি স্বামীর সহিত সে প্রাণ খুলিয়া ঘর পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। কারণে অকারণে নিজে দগ্ধ হইয়াছে, সুরেনকেও দগ্ধ করিয়াছে।

আজ সেই সরমাই তাহার ঘরে নিজে আসিয়া হাজির হইয়াছে। আশ্চর্য্য আর কাহাকে বলে!

কিন্তু কি অমায়িক তাহার ব্যবহার, কি ভদ্র তাহার গতিবিধি!

ইচ্ছা করিয়াই আজ আর মেশিনটা মাধুরী তুলিয়া অন্যত্র চাপা দিয়া রাখিল না। সুরেন্দ্র কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া মেশিনটা যাহাতে দেখিতে পায়, এমনই করিয়া রাখিয়া দিল।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হইতে ফিরিয়া সম্মুখে সেটাকে দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

মাধুরী হাসিয়া বলিল—"এটা কিনে আন্‌লুম। কাল থেকে একজন মেয়ে-মাষ্টারও এঁরা দিয়েছেন। মাসে পনের টাকা করে দিলেই চলবে।"

সুরেন অপ্রসন্ন-মুখে কহিল—"আবার খরচ! মেয়েটা বড় হচ্ছে, তার বিয়ের কথা ভাবছ না কেন মাধুরী! দেনার দায়ে সেদিন বাড়ীখানা বিক্রী হয়ে গেল, এখনও বুঝে না চল্‌লে—"

—"পথে বস্‌তে হবে। কিন্তু আমি তার কি করব? যা' ন্যায্য তাই করি। এর কমে কোন ভদ্রলোক ঘর করতে পারে।"

—"তা বটে!" বলিয়া সুরেন চুপ করিয়া গেল।

হয় ত প্রথমা পত্নীর কথা এখন মাঝে মাঝে সুরেনের মনে পড়ে। দোষটা তাহার যত বড় করিয়া সে দেখিয়াছিল, ততটা না দেখিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হইত না ভাবিয়া সে অনুতপ্ত হয়—কিন্তু উপায় কি ?

বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার শূন্যঘর পূর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দ্বারা অন্তরের অভাব মোচন হয় নাই।

এ স্ত্রী অতি আধুনিকা এবং স্বাধীন প্রকৃতির। সুরেনের কোন অস্তিত্বই সে স্বীকার করে না। তবু একদিন সুরেন বলিয়াছিল—"দেখো, যার তার সঙ্গে থিয়েটার বায়স্কোপে যাওয়া, ট্রামে চেপে মাঠে হাওয়া খাওয়া ভাল নয় ; অন্ততঃ, গেরস্থ-ঘরে চলে না।"

মাধুরী উত্তর দিয়াছে—"তবে ভাল কি শুধু ভগবানের দেওয়া আলো-বাতাস না নিয়ে 'থাইসিসে' মরা ?"

সুরেন বলিয়াছিল—"ও তোমার ভুল ধারণা মাধুরী, এতদিন ত মেয়েদের ওসব রোগ ছিল না।"

—"তাই তার প্রয়োজনও হয় নি। এখন হয়েছে, কাজেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যা' ভাল বুঝব করব, ইচ্ছে হয় ঘর কর, না হ'লে অন্য ব্যবস্থা করতেও ত তুমি খুব পটু—সরমার মত বদনাম দিয়েই না হয় বিদেয় করো একদিন।"

লৌহ-শলকার মত কথাগুলা সুরেনের অন্তঃস্থলে গিয়া বিঁধিয়াছে, কিন্তু সে একটী প্রতিবাদও আর করে নাই। সত্যের আঘাত বুঝি মানুষকে এমনই করিয়াই পঙ্গু করিয়া ফেলে।

কয়দিনের শিক্ষায় মাধুরী শেলাই সম্বন্ধে কতটা শিক্ষিতা হইয়াছিল বলা যায় না, তবে সরমার হঠাৎ জ্বর হওয়ায় তাহা ভুলিয়া যাইতেও বিলম্ব হয় নাই। সরমা পত্র-দ্বারা জানাইয়াছিল—দুই-চারিদিনের মধ্যে পথ্য পাইলেই সে আসিবে, তবে সেখানে গিয়া সে যেন তাহাকে বদনাম না দিতে পারে, সে বিষয় নজর রাখা চাই, ইত্যাদি···।

কিন্তু যেদিন পথ্য পাইয়া সে মাধুরীর বাড়ী আসিয়া হাজির হইল, সেদিন মাধুরী শয্যা লইয়াছে।

সুরেন অচৈতন্য স্ত্রীর মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সরমাকে দেখিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুট-কণ্ঠে বলিল—"সরমা, তুমি এখানে !"

সরমা বজ্রাহতের মত খানিক চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—"ওর অসুখ জানলে আস্‌তাম না, ভাল হলে খবর দিতে বল্‌বেন। সেলাই শেখাতে এসেছিলাম আমি।"

কিন্তু তাহার চলিয়া যাওয়া হইল না। ঠিক্ সেই সময় একটু চৈতন্য হওয়ায় মাধুরী চোখ চাহিতেই সরমাকে দেখিতে পাইল। বলিল—"আমার পাশে বসো না দিদি !"

সুরেন ধীরে ধীরে সে ঘর ত্যাগ করিয়া গেল। সরমা মাধুরীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মুখের কঠোরতা মিলাইয়া যায় নাই। সেদিকে লক্ষ্য করিয়া মাধুরী হাসিয়া বলিল—"ধরা পড়ে রেগে গেছ, না ? কিন্তু বোন্ বলে যখন স্বীকার করে নিয়েছ, তখন আর ফেল্‌বে কেমন করে বল ত ?"

হাসিতে চাহিয়া সরমা বলিল—"ফেল্‌ব কেন, পাগল ! আগের সরমা কবে মরে গেছে—তার বিষয় কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামার সময়ও নেই, উৎসাহও নেই। এখন আমরা দু'টি বোন্ আছি বই ত নয়। কিন্তু হঠাৎ জ্বর করে' বস্‌লি কেন বল্ ত ?"

—কেন আবার, তোমাকে জ্বালাব বলে !" বলিয়া মাধুরী হাসিল।

সরমা তাহার তপ্ত ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"জ্বালানো ত পরে, এখন নিজে ত জ্বল্‌ছিস্, বেশ, তা' হ'লেই হ'ল।"

মাধুরী আর কথা কহিল না। বোধ হয় কথা কহিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়া আসিতেছিল বলিয়াই সে নীরবে পড়িয়া রহিল।

সরমা একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তারপর আপনাকে অসীম বলে সংযত করিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিন কয়েক পরের কথা।

সেদিন রাত্রে মাধুরী সুরেনকে কহিল—"তুমি যতই আমায় লুকোও না কেন, ডাক্তাররা নিশ্চয়ই আমায় জবাব দিয়েছে। এ যাত্রা বোধ হয় বাঁচবো না। আমি ভাব্ছি কি জানো, মেয়েটা দু'বছরের মাত্র। ওকে মানুষ করে বড় করে তুল্তে অনেক দিন লাগ্বে। তুমি ত একা মানুষ কর্তে পারবে না—শিশুপালন মেয়েরা ভিন্ন পুরুষদের দ্বারা অসম্ভব। আর বিয়ে কর্তে যেয়ো না; তা'তে মোটেই সুখী হবে না—বরং সরমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে নিয়ে আসি। ও এতদিন বাইরে বাইরে কাটালো—এর জন্য দায়ী কে? তুমিই ত। ও ত তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। একদিন অগ্নি সাক্ষ্য করে দেবতার সাম্নে শপথ করেছিলে—ওকে নিয়েই সংসার-ধর্ম্ম পালন কর্বে। সে শপথ ভঙ্গ করেছ, তা'তে তোমার মস্ত বড় পাপই হয়েছে।"

সুরেন তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"ও কথা থাক্ মাধুরী, তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তা' ছাড়া, সরমা কি আর এ ঘরে আস্বে? ও যে ভারী জেদী মেয়ে—"

মাধুরী বলিল—"সে ব্যবস্থা আমি কর্বো 'খন। তবে তুমি আর তার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করো না, তাকে ঘৃণা করো না। বাইরেটা ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করো, সত্যি সুখী হবে।"

আর না আসিবার সঙ্কল্প করিয়া এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেও অদৃশ্য আকর্ষণের টান সাম্লাইতে না পারিয়া সরমা আবার একদিন মাধুরীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধুরী বলিল—"কেমন পারলে না এসে? বোন্‌কে ভোলা সহজ কি না? ও গো শুন্‌ছ? কে এসেছে দেখো" বলিয়া সুরেনকে ডাকিয়া মাধুরী তাহাকে সরমার পাশে বসাইল।

সরমা আপত্তি করিতে যাইতেছিল। মাধুরী কহিল—"হাজার হোক্ ও ত তোমার স্বামী, যদি বা ভুলে বা পাঁচজন বন্ধুর পরামর্শে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকে, তার কি ক্ষমা নেই? নারী হয়ে পুরুষের মত কঠোর হয়ো না। তা' ছাড়া—অনাথা এই মেয়েটা, এর ওপরও কি তুমি দয়া কর্বে না দিদি?"

সরমা শেষের কথাটায় অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

মাধুরী পরম যত্নে মেয়েটাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। বলিল—"আমার ডাক এসেছে—চলে যাচ্ছি। আমার কোলের মেয়েটাকে তুমি মানুষ করো—আজ হ'তে তুমিই ওর মা! সংসারের কিছুই জানে না, আমার কথা ওর স্মরণও হবে না, ও জান্বে—তুমিই ওকে পেটে ধরেছ। এই স্বামী, এই সংসার তোমারই—মাঝে একটা ব্যবধান ঘটেছিল মাত্র! মনে ভেবো ওটা স্বপ্ন!"

"হঠাৎ মাধুরীর দম বন্ধ হইয়া আসিল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

আজ সরমা মা হইয়া সংসার দখল করিয়াছে।

ইহাই তাহার পরম তৃপ্তি! সিঙ্গার কোম্পানীকে জানাইয়া দিয়াছে—সে আর চাকুরী করিবে না এবং বাহিরের সমস্ত সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবে। সর্ব্বহারা নারী আজ সে নয়—আজ সে মাতৃত্বের আসন পাইয়াছে এবং ইহাই লাভ করিবার জন্য বুঝি তাহার অন্তরের অন্তরালে ছিল গোপন সাধনা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মোটর ডাকাতি

ডাক্তার শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, এল্‌-এম্‌-এফ্‌

পিস্তল ক্রয়

একটি যুবক—সুশ্রী, সুবেশ, বলিষ্ঠ, সুপুষ্ট ও সুদীর্ঘ—ভদ্রলোক কি? যুবক কোন দোকান হইতে একটি পিস্তল কিনিল; অন্যান্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষও লইয়া ধীর-স্থিরপদে এস্‌প্ল্যানেড জংশন অভিমুখে চলিল।

মাঘ মাস। বেলা একটা পঞ্চাশ। এস্‌প্ল্যানেড জংশনের এস্‌প্ল্যানেড হোটেল হইতে অপর একটি সমবয়স্ক যুবক বাহির হইয়া তাহাকে বলিল, "নীহার, ওয়ান ফিফ্‌টি।"

হাতের ঘড়ি দেখিয়া প্রথম যুবক নীহার বলিল, ওয়ান ফিফ্‌টি—তারপর সব ঠিক? আজই যাচ্ছ সুবোধ?"

"হাঁ, এখানে আর ভাল লাগছে না, কোন সুবিধেও হ'ল না, আজই পালাব।"

"কোথায়?"

"কানপুরে প্রথমে, তারপর দেখা যাবে।"

"একা?"

"দারোগা মনোহর রায় পেছু নেবে মনে হয়।"

"দারোগা?"

"আমার পরম আত্মীয়।"

নীহার হাসিয়া একখানি ট্যাক্সির দিকে লক্ষ্য করিল—গাড়ীখানি তাহাদের দিকে ধীর গতিতে আসিতেছিল। ট্যাক্সি থামাইয়া সুবোধকে টানিয়া সে গাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইল।

"আরে, একেবারে ট্যাক্সি! যা' কথা ছিল, তার কি হ'ল?"

"আজ নয়, অপর জায়গায় অন্য কাজ আছে; আজ নতুন কাজে যাব।"

"কোথা?"

"গোপীমোহন বসুর লেন, বাগবাজার।"

"হঠাৎ?"

"ওঠ, বল্‌ছি।" বলিয়া নীহার সুবোধকে লইয়া গাড়ীতে বসিল। সফা'র দুইজনকে লইয়া ছুটিল—পশ্চাতে বসিয়া দুইবন্ধু যুক্তি করিল, সিগারেট পুড়াইল।

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "পিস্তলটার দাম কত?"

নীহার দাম বলিল।

"বেশ সস্তা। তারপর, তোর হঠাৎ এ নতুন প্ল্যান্‌টার উদ্দেশ্য?"

"খুব গভীর বা মারাত্মক এমন কিছুই নয়—একটা খেয়াল।"

বাড়ীর ভিতরে

গোপীমোহন বসুর লেনে একখানি সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে ট্যাক্সি থামিয়া গেল। সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ী?"

"হঁা, দেখ্‌ছিস না নম্বর?"

"তা' বটে, কার নাম লেখা সাইনবোর্ড রয়েছে না?"

"হঁা, এস্‌ ঘোষ—বি-এল্‌। এই অল্প ক'দিনেই ট্যাব্‌লেট্‌ পর্য্যন্ত আটকান হয়ে গ্যাছে দেখ্‌ছি।"

"বেশ, তুই তা' হ'লে যা', আমিও সরে পড়ি, কাজ আছে অনেক।"

"কি কাজ?"

"দারোগার সন্ধান রাখ্‌তে হবে; সে সত্যই যায় কি না জানা চাই—সেইমত ব্যবস্থা করতে হবে আমায়।"

"আচ্ছা যা'।"

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দুইজনে দুইদিকে চলিয়া গেল—সফারকে নিকটেই কোন সুবিধামত স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নীহার সম্মুখস্থ বাড়ীর মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিল—নিতান্ত পরিচিতের মতই তাহার গতি।

মোটর ডাকাত

ভোজপুরী বিশালবপু দ্বারোয়ান পথরোধ করিল। "আপ কোন হ্যায়, কাঁহা যাতে হেঁ?" বলিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নীহারের মুখের দিকে চাহিল।

"ভিতরমে ; বড়ী বহিনসে মূলাকাৎ করনেকে লিয়ে। সুরেনবাবু মেরা বনহুই হ্যায়।"

একগাল হাসিয়া দ্বারবান পথ ছাড়িয়া বারান্দায় যেখানে রৌদ্র আসিতেছিল, সেখানে গিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় তিনটা। বাড়ীতে পুরুষেরা কেহই নাই। গৃহকর্ত্তা কোর্টে ও ছেলেরা স্কুলে। থাকিবার মধ্যে গৃহিণী ও তাঁহার দুই-তিনটি কন্যা। বড় মেয়ে নীহারবালা আই-এস্-সি পড়িতেছে ; শরীর অল্প খারাপ থাকায় আজ দুই-তিনদিন কলেজ যায় নাই।

যুবক নির্ভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল। কত সহজে মানুষ এই সব নির্ব্বোধ দ্বারবানদের প্রতারিত করিতে পারে চিন্তা করিয়া মনে মনে হাসিল। উপরে উঠিবার সিঁড়ি নিকটেই দেখিতে পাইয়া স্থিরচিত্তে উপরে উঠিতে লাগিল—পকেটের জিনিষগুলির মধ্যে দু'-একটি বাহির করিয়া হাতে লইল। সম্মুখেই সিঁড়ির দরজা বন্ধ থাকিতে দেখিয়া ডাকিল, "'বড়দি'—আমি নীহার।"

চমকিত হইয়া গৃহিণী কন্যাকে বলিলেন, "কে ডাক্‌ছে তোকে, দেখ্ ত নীহার।"

ঘরের সম্মুখের দালানের উপর মাদুর পাতিয়া গৃহিণী কন্যাদের লইয়া রৌদ্রে শুইয়াছিলেন। কন্যা নীহারবালা একপাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের রসাস্বাদ করিতেছিল—অবিবাহিতা সে।

মাতার কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। বই রাখিয়া আগন্তুককে দেখিতে গেল। সিঁড়ির রুদ্ধ দরজা খুলিয়া 'মামাবাবু' বলিতে গিয়া তাহার বাক্যলোপ হইল। উন্মুক্ত দরজা পথে দাঁড়াইয়া পিস্তল হস্তে এক যুবক। ভদ্রবেশধারী দুর্দ্দান্ত দস্যুকে দেখিয়া ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মোটর ডাকাতির কথা সেই সময় প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইত—সংবাদ-পত্রে নীহারবালা এরূপ অনেক ঘটনার বৃত্তান্ত পড়িয়াছে—ছুটিয়া গিয়া সে মাতাকে বলিল, "মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! মামা নয়, কোন খারাপ লোক—মোটর ডাকাত।"

"এ্যাঁ! এাঁ! বলিস কি! ও মা!" গৃহিণী মহা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ছোট মেয়েরা ঘুম হইতে উঠিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিল।

"আরে, পালাও কেন? ব্যাপার কি?" বলিয়া যুবক তেমনই ধীরপদে গৃহিণীর নিকট অগ্রসর হইল—পিস্তল তাহার দক্ষিণ হস্তেই ছিল।

তারপর—?

গৃহিণীর ভয়ার্ত্ত চীৎকারে চিন্তিত যুবক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। নীহারবালা তখন আর সেস্থানে ছিল না, শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সম্মুখস্থ টেবিলের একটা পেরেকের খোঁচায় তাহার শাড়ীর একাংশ ছিঁড়িয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর ক্রন্দন ও চীৎকার, সুদূর বাহিরে ভোজপুরী দ্বারবানের তুমুল নাসিকা গর্জ্জন সমানে চলিয়াছিল।

কাঁপিতে কাঁপিতে শুষ্ককণ্ঠে গৃহিণী কোনরূপে বলিলেন, "বাবা, প্রাণে মের না! পিস্তলটা পকেটে রাখ—আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দাও! সোণাদানা যা' খুসি নিয়ে যাও।"

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই হার, চুড়ী, বালা ও একগোছা চাবি যুবকের দিকে ফেলিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, অজ্ঞান হইয়া মাদুরের উপর পড়িয়া গেলেন। শিশুরা ভয়ে চুপ করিল।

ভ্রূ অধিকতর কুঞ্চিত করিয়া যুবক নিমিষে একবার হাত-ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিল—গৃহকর্ত্তার তখনও আসিবার সময় হয় নাই। একবার চারিদিক চাহিয়া গহনাগুলি এক এক করিয়া তুলিয়া একস্থানে জমা করিল। তারপর—?

তরুণীর ত্বরা

দারোগা মনোহর রায় থানায় বসিয়া রিপোর্ট লিখিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল। 'রিসিভার' লইয়া তিনি ডাকিলেন, "হ্যালো, কে আপনি?"

"আমি উকিল এস্ ঘোষের বাড়ী থেকে কথা বল্‌ছি।"

"আমি মনোহর রায়। শ্যামবাজারের সাব ইন্সপেক্টার। পুলিস থানা থেকে বল্‌ছি।"

"আপনি যত শীগ্‌গির পারেন লোকজন নিয়ে আমাদের সাহায্য করুন। কোন এক ভদ্রবেশধারী দুর্দ্দান্ত দস্যু পিস্তল দেখিয়ে আমাদের গহনা-পত্র নিয়ে যাবার জন্য এসেছে—একখানা ট্যাক্সিও বাড়ীর বাইরে দেখেছি। বাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই—আসুন, শীগ্‌গির।

"মোটরে এসেছে? মোটর ডাকাত?"

"তাই। সাংঘাতিক লোক—দুর্দ্দান্ত দস্যু।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন—আমরা যাচ্ছি—আপনার নাম-ঠিকানা।"

নাম ও ঠিকানা বলিয়া তরুণী টেলিফোন্ ছাড়িয়া দিল। জানালা দিয়া পুনরায় বাহিরের ট্যাক্সিখানি একবার দেখিয়া লইল। তারপর হঠাৎ তাহার চক্ষের সম্মুখে বিরাট অন্ধকার জমিয়া উঠিল—চেতনা লোপ হইল—টলিতে টলিতে সে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

দারোগার হাতে

পিস্তল প্রভৃতি পকেটে রাখিয়া চিন্তিতমনে ধীরপদে যুবক দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কোলাহল শুনিয়া এবং কয়েকজন লোকের সিঁড়িতে উপরে উঠিবার পদশব্দে বিস্মিত হইয়া একপাশে একটা থামের নিকট গিয়া সে দাঁড়াইল—আগন্তুকেরা যাহাতে তাহাকে দেখিতে না পায় এই ইচ্ছায় সে ঐরূপে আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিল বোধ হয়।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দারোগা মনোহরবাবুর কুটিল চক্ষের শ্যেন দৃষ্টিতে যুবকের কলকৌশল নিমিষেই ব্যর্থ হইল। দারোগা তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলেন—সঙ্গী কনষ্টেবল তিনজন ও সন্ত্রস্ত নিদ্রোত্থিত ভোজপুরী দ্বাররক্ষক তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। পলায়নের আর পথ রহিল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া যুবক বলিল, "কে মশায় আপনি? এ-ভাবে আমায় অপমান করতে সাহস করছেন—এর ফল কি জানেন? ভদ্রলোককে এরূপ অপমান?"

হাসিয়া দারোগা বলিলেন, "তা' বটে—ভদ্রলোক নম্বর ওয়ান! রামজী, হাতকড়ি লাগাও—দেখো, যেন ভদ্র-লোকের অপমান করো না!"

"সাবধান দারোগাবাবু, এখনও আপনাকে নিষেধ করছি, অপমান করবেন না আমাকে—আমি দস্যু বা ডাকাত নই।"

"বালাই, ষাট! আপনাকে দস্যু বলে কে—আপনি হলেন গ্যাঁড়াতলার পকেটমারের খুড়তুতো ভাই! দয়া করে এখন থানায় চলুন, খুব খাতির করা যাবে সেখানে। এখানে কেন এসেছেন?"

"ভুল হয়েছিল—দিদি এই বাড়ীতেই থাকেন, এই মনে করেই এসেছিলাম—অন্য উদ্দেশ্যে আসি নি।"

"এই রকমেই যে আপনারা দিদির বাড়ী, পিসী, মাসী সকলের বাড়ীই গিয়ে থাকেন তা' জানি। এখন তবে দয়া করে একবার শ্বশুর-বাড়ীই না হয় চলুন। মোটর ত বাইরেই আছে।"

"চলুন। তবে জান্‌বেন—এর জন্য আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে—আমি চোর-ডাকাত কিছুই নই।"

"ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা। রামজী, লে চল শালাবাবুকো।"

ভোজপুরী দ্বারবান হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল, "শালা বদমাস্—মারকে ছাত্‌ু বানা দেঙ্গে।"

উকিলের জেরায়

প্রবীন ও বিজ্ঞ উকিল সুরেন ঘোষ সেই সময় বাড়ী আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার আগমন জানিয়া গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন। কন্যা শয়ন-ঘর হইতে বাহিরে আসিল। কন্যার মুখে আদ্যন্ত সমস্ত শুনিয়া তিনি বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

দালানের চেয়ারে বসিয়া সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক, তোমার নাম?"

"শ্রীপ্রেমনীহার বসু।"

"লেখাপড়া কিছু করেছ?"

"হাঁ, যৎসামান্য। গত বৎসর ইংরাজীতে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম হই।"

নীহারবালা বাপের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত দস্যু এম্ এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটিতে প্রথম

হইয়াছে—নামটাও সে শুনিয়াছিল কি? বিস্মিতা কুমারী ক্ষণেকের জন্য যুবকের দিকে চাহিল—ভদ্রবেশধারী দুর্দ্দান্ত দস্যুর এই প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় চেহারা! সত্যই কি এ দস্যু—যদি সত্য না হইত! নীহারবালা আর একবার দেখিল।

সুরেনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "এ বাড়ীতে আসবার কারণ?"

"দিদির সঙ্গে দেখা করবার জন্য।"

"আগে আর এ বাড়ীতে এসেছিলে?"

"না, দিদিরা আজ ক'দিন হ'ল কোলকাতায় এসেছেন—তাঁরা লাহোরে থাকেন।"

"তাঁরা যে এ বাড়ীতেই এসেছেন, তা' কিসে জান্‌লে?"

"দিদি লিখেছিলেন।"

"—নং গোপীমোহন বসুর লেন এই ঠিকানাই দিয়েছিলেন? তোমার ভগ্নীপতির নাম ও পেশা কি?"

"শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এল্—লাহোরের উকিল।"

"সৌরেন! সেই আমুদে সৌরেন তোমার ভগ্নীপতি! হাঁ, সে লাহোরেই গেছে বটে। বেশ মোটা, সুশ্রী চেহারা—নয়?"

"হ্যাঁ—আপনি চেনেন?"

"সে কথা যাক্—পিস্তল প্রভৃতি এনেছিলে কেন?"

"ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দেবার জন্য। ও সব খেলার জিনিষ—টিনের।"

"দেখি?"

সুরেনবাবু পিস্তল চাহিলেন, কিন্তু দারোগাবাবু তাহা নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিলেন। এসব মারাত্মক জিনিষ এখন বাহির করিতে দেওয়া উচিত নয় বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উকিলের ধমকে আর কিছু বলিলেন না। পিস্তল দেখিয়া সুরেনবাবু চকিত কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এতেই ভয় পেয়েছিলে মা?"

কন্যা পিস্তলটীকে বিশেষভাবে দেখিয়া লইল।

মিনতি

যুবক যেরূপ ধীর ও নিশ্চিন্তমনে উত্তর দিতেছিল, তাহাতে দারোগাবাবু নিতান্ত বিস্মিত এবং উকিলের উপর বিরক্ত হইতেছিলেন। নীহারবালা লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া মাঝে মাঝে সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—সত্যই কি সে দস্যু!

সুরেন উকিল হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি বিবাহ করেছ?"

মোটর ডাকাত বিবাহিত কি না তাহা জানিবার প্রয়োজন কি? বিজ্ঞ ও প্রবীণ উকিলের এই অসংলগ্ন প্রশ্নে দারোগাবাবু নিতান্ত বিরক্ত হইলেন; কিন্তু নীহার-বালা তাহার সমস্ত শ্রবণ-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া উত্তরের অপেক্ষায় রহিল—'হাঁ' কিংবা 'না' এই দুয়ের প্রভেদ কত! দু'টী অক্ষরের কত শক্তি!

যুবক বলিল—"না।"

পিতা হঠাৎ কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন; কন্যা বুঝিল না পিতা কি দেখিতেছেন—ধীরস্বরে কাতর কণ্ঠে কুমারীর মুখ হইতে বাহির হইল, "হাতকড়ি খুলে দাও বাবা, খুলে দাও!"

মিনতি দস্যুর জন্য।

নীহারবালা

মনোহরবাবু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অপর একটি যুবক সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সহিত একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন। একজন চাপরাশী দুইজনকে দারোগাবাবুর নিকট লইয়া গেল।

যুবক দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দারোগাকে দেখিয়া বলিল, "মনোহর দা', করেছেন কি—কা'কে হাতকড়ি দিয়েছেন, খুলুন—খুলুন।'

বন্দী যুবক আগন্তুকের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "কে, সুবোধ?"

"হাঁ ভাই। দারোগার সন্ধানেই আমি গিয়েছিলাম, থানায় শুনলাম সব ঘটনা—তাই তৎক্ষণাৎ তোর বাবাকে নিয়ে আমি এখানে এসে পড়লাম।"

"বাবাকে নিয়ে?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ততক্ষণে উপরে উঠিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া দারোগাবাবু চক্ষের নিমেষে বন্দীকে মুক্ত করিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি, কেদারবাবু!"

রায়বাহাদুর কেদারনাথ বসু পুলিস বিভাগে বহুকাল কার্য্য করিয়া পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দারুণ বাত ব্যাধিতে একবারে পঙ্গু হওয়ার কয়েক বৎসর পরে কার্য্য হইতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই অবসর লইতে হইয়াছিল। তিনি অনেকেরই পরিচিত ছিলেন।

"শুন্‌লাম আমার ছেলেকে আপনারা ডাকাত মনে করে বন্দী করতে এসেছেন, কাজেই আসতে হ'ল।"

উকীল সুরেন ঘোষের আদেশক্রমে ভৃত্য একখানি চেয়ার আনিয়া কেদারবাবুকে বসিতে দিল। চেয়ারে বসিয়া তিনি সুরেনবাবুকে সকল ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেনবাবু সমস্ত কথা বলিলেন—তাঁহার অনুপস্থিতিতে নীহারের আগমন, পিস্তল প্রভৃতি অপরিচিত যুবকের হস্তে দেখিয়া কন্যার সতর্কতা ও পুলিশকে টেলিফোন্ করার কথা বলিয়া তিনি একবার কন্যার দিকে চাহিলেন। কেদারবাবুও দেখিলেন। লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা নীহারবালা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শাস্তির আয়োজন

সুবোধ বলিল, "নীহারের সঙ্গে আমি আজ তিনটার ম্যাটিনিতে বায়োস্কোপ দেখ্‌বার জন্য একটা পঞ্চাশ মিনিটে এসপ্ল্যানেড হোটেলের সুমুখে দেখা করবার বন্দোবস্ত করি। নীহার সময় মতই আসে; কিন্তু তার মতের পরিবর্ত্তন দেখি। সে বলে, বায়োস্কোপে সে যাবে না। তার দিদি তাকে অনেকদিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন, কিন্তু এতদিন সেকথা তার মনে ছিল না—আজ হঠাৎ মনে হওয়ায় সে দিদির বাড়ী যাবে বলে কিছু খেল্‌না আর ওই টিনের পিস্তলটা ছয় আনায় কিনেছিল। বায়োস্কোপ যাওয়া বন্ধ হওয়ায় এবং আমারও এই অঞ্চলে বাড়ী বলে' নীহার আমাকে নিয়ে ট্যাক্সি করে' বাগবাজারে তার দিদির বাড়ীতে আসে। বাড়ীর নম্বর যা' আমায় নীহার বলেছিল, তা'তে এই লেনের ঠিক্ এই বাড়ীখানাই বোঝায়।"

কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহরবাবুর কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"উনি আমার আত্মীয়। তা' ছাড়া, আজ কোন তদন্তের জন্য রাত্রির ট্রেণে রাণীগঞ্জ যাবেন শুনেছিলাম, তাই সঠিক্ সংবাদ জান্‌বার জন্য যাই। আমাকেও আজ রাত দশটার গাড়ীতে কানপুরে একটা কাজের চেষ্টায় যেতে হবে। ভেবেছিলাম, একসঙ্গে যাব দু'জনে।"

সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার জামায়ের এখানকার ঠিকানা কি?"

"আহম্মুক ছেলে রাস্তার ভুল করেছে মশায়! বাড়ীর নম্বর ঠিক্ এই বটে, তবে সৌরেন থাকে গোপীনাথ দের লেন, বউবাজারে, আর বাবু এসেছেন গোপীমোহন বসুর লেন, বাগবাজারে। ইংরাজিতে এম্-এ পাশ করেছেন, দে আর বসুর তফাৎ কি আর সাহেবদের মনে থাকে মশায়!"

উকিলবাবু বলিলেন, "আমাদের সকলেরই ভুল হয়েছে। আমার সাইন বোর্ডে 'এস্-ঘোষ—বি-এল্' লেখা আছে, আপনার জামাইও নামের পরিচয়ে 'এস্ ঘোষ বি-এল্'—কাজেই নীহারের ভুল হওয়ার আশ্চর্য্য কিছুই নেই।"

"একটুও না—জেল যাওয়াও আশ্চর্য্য নয়! এস্ ঘোষ দেখ্‌লেই ভগ্নীপতি ভাববেন, এতেই বা আশ্চর্য্যের কি আছে!"

"যাক্, আমাদের ক্ষমা করবেন কেদারবাবু। প্রথম দিকে ঘটনাটা যেরূপ দাঁড়িয়েছিল, তা'তে আমাদের বিশেষ দোষও নেই।'

"বিলক্ষণ, দোষ নেই আপনার তা' মানি! কিন্তু আপনার ওই মেয়েটি বড় দোষমুক্ত নন্—উনিই যত নষ্টের গোড়া—সব গণ্ডগোল ত ওই বেটীই করেছে। একটা ভাল লগ্ন দেখে আমি বেটীকে রীতিমত শাস্তি দেবার আয়োজন করছি শীগ্‌গিরই।"

"আমরা আপনার শাস্তি ঘাড় পেতে নিচ্ছি কেদারবাবু। এ রকম উপযুক্ত পাত্র—"এই বলিয়া সুরেনবাবু কন্যার দিকে চাহিলেন।

কিন্তু কন্যা কোথায়? নীহারবালা পলাইয়াছে—পিতার কথায় নিমেষে সেই ভদ্রবেশী দুর্দ্দান্ত দস্যুর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াই, উচ্ছ্বসিত, সমর্পিত হৃদয় লইয়াই কন্যা পলাইয়াছে। পলায়ন বুঝি বন্ধনেরই পূর্ব্বাভাষ!

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

'স্মৃতি শুধু জেগে রয় অতীত কাহিনী কয়'

ভ্যালেন্‌টিনো স্মরণে

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

আকর্ণ লম্বা দু'টী টানা চোখ ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে এল। চাউনির মধ্যে চেতন মানুষের বক্তব্য যেন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। যন্ত্রণার সাড়া সারা শরীরের কোন কোন অঙ্গকে তখনও নাড়া দিয়ে যাচ্ছে—দু'জন ডাক্তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে, একজন নাড়ি দেখ্‌ছেন। ডাক্তারদের পাশেই ইন্‌জেক্‌সনের দরকারী জিনিষ-পত্র তৈরী করে', চার-পাঁচজন নার্স ইঙ্গিতের অপেক্ষায় সশঙ্কিত হয়ে রোগীর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রুডির বিশ্বস্ত ম্যানেজার জর্জ্জ উল্‌ম্যান কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন একটা বলবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু প্রয়াস তাঁর বোধ হয় ব্যর্থ-ই হ'ল—কানের কথা মনে আর পৌঁছল না।

হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে' রুডল্‌ফ হোহো করে' হেসে উঠলেন—বোধ হয় বাঁচাবার এই ব্যর্থ প্রয়াসে, ডাক্তারদের উদ্দেশে এটা তাঁর বিদ্রূপেরই হাসি। স্তিমিত চোখ দুটো আবার যেন বাইরে আসতে চাইল—দৃষ্টি তাঁর এলোমেলো—কার দিকে যে তিনি চাইছেন, কি যে চাইছেন, কিছুই বোঝা যায় না। হাসির পর থেকেই অনর্গল তিনি কি বক্‌তে আরম্ভ করলেন। সচেতন মানুষ সে কথার 'খেই' খুঁজে পায় না, মানে বোঝে না। ডাক্তার-রা বলে 'ডিলিরিয়ম।' ভাষা কখনো ইংরাজী, কখন ইতালী—কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগ নেই—অথচ, প্রত্যেকটার মানে আছে।

তখন রাত বারটা বেজে গিয়েছে।

অবিশ্রাম রাত্র জাগরণের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ উল্‌ম্যান মাথায় আইস্‌ব্যাগ ধরে' তখনও বসে'—যদি সংজ্ঞা ফিরে আসে এই আশায়। অতর্কিতে চোখ দিয়ে বৃদ্ধের দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে এল—তাঁর মনে হ'ল ভ্যালেন্‌টিনো যেন চুপ করলেন—জ্ঞান যেন তাঁর ফিরে এসেছে—তিনি যেন উল্‌ম্যানকে কি বল্‌তে চাইছেন, বল্‌তে পারছেন না।

ধীরে ধীরে তিনি ভ্যালেন্‌টিনোর মুখের কাছে তাঁর মুখটা নিয়ে গেলেন। দৃষ্টি অপলক! চাউনির মধ্যে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই—দীর্ঘাকার বিরাট রোমীয় পুরুষ যেন তাঁর সারা শরীরটাকে আজ মন থেকে মুক্ত করে' হংস-ধবল গদির বিছানায় বহু যুগের বিশ্রাম নিতে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছেন। কয়েক সেকেণ্ড সেই অদ্ভুত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ একটা আতঙ্ক উল্‌-ম্যানের ভেতর থেকে চীৎকার করে উঠল—একবার তিনি যেন ছুটে পালাতে চাইলেন, পরক্ষণেই আবার ভ্যালেন্‌-টিনোকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন—পাশেই দু'জন নার্স তখনও অপেক্ষা করছিল, তারা বৃদ্ধকে ধরে' ফেল্‌লে—ডাক্তার-রা বাঁ পাশের ঘর থেকে ছুটে এল—উল্‌ম্যান সাধারণ মানুষের মতই চীৎকার করে' কেঁদে উঠলেন।

পলিক্লিনিক হাসপাতালের করুণ বারটা ঘণ্টা দশ মিনিট আগেও নিকটস্থ জনসাধারণকে রাত্রের বয়স সম্বন্ধে সতর্ক করে' দিয়েছে। কিন্তু তারপরই সেই কুয়াসাচ্ছন্ন গভীর রাত্রে এক ভীতিপ্রদ করুণ আর্ত্তনাদ 'চার্চ্চ বেলে'র ভেতর দিয়ে আকাশ বাতাস ভরিয়ে নিকটস্থ সকলেরই কানে কানে

বলে দিয়ে গেল—'আজ আর ভ্যালেন্‌টিনো নেই!' শয্যা-পার্শ্বে প্রেমিকা প্রেমিককে আতঙ্কে বেষ্টন করে' চমকে উঠল—দলে দলে নিউইয়ার্ক সহরের শিল্পী, দার্শনিক, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র একইভাবে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে পলিক্লিনিক হাসপাতালের রুদ্ধ দ্বারে গিয়ে বিশ্বপ্রেমিককে দেখ্‌বার জন্য কত কাকুতিই না করতে লাগ্‌ল! তারপর অদর্শনের হতাশায় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হাজার হাজার লোক মুক্ত আকাশের তলে, পথের ধারে বাকী রাতটুকু অতি সহজভাবেই শারীরিক অস্বস্তিকে অস্বীকার করেই কাটিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন, মঙ্গলবার।

ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর এসে চিত্র-জগতের অনুপমকে দেখ্‌বার আশায় আকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু শোকে সারা আকাশ আজ মুহ্যমান। আলোর দেবতার চোখ দু'টী জলে ভরে' উঠল—সঙ্গে সঙ্গে দু'-একফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল। আকাশে বাতাসে, পথে ঘাটে একটা হারানোর সুর, একটা হাহা শব্দ, একটা বিষাদের গান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা এমেরিকাকে আচ্ছন্ন করে' ফেল্‌লে। নগর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে একটা পাগলা হাওয়া সশব্দে 'নেই, নেই' বলে' বয়ে গেল।

বিভিন্ন নগর হ'তে, পল্লী হ'তে, মেয়ে পুরুষ, শিশু যুবা-বৃদ্ধ হাজারে হাজারে পথ ঘাট ছেয়ে ফেলেছে। রূপকুমার ও রূপকুমারীদের আনন্দ উচ্ছ্বসিত মায়াপুরী হলিউড যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে, কোন্ রূপার কাঠির স্পর্শে অচেতন স্তব্ধ মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। হাসপাতালের ভেতর ও বাহিরে লক্ষাধিক লোকের জনতা, পুলিশের সুবিচারকে তুচ্ছ করে' রুডিকে শেষ দেখ্‌বার আশায় শবের সঙ্গ নিয়েছে। হাসপাতাল থেকে উনপঞ্চাশ ষ্ট্রীটে একটার্স চার্চ্চ যেতে পথের দু' ধারে বাড়ীগুলিকে ফুলে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে—পথে মানুষ আর মানুষ!

একদিন যে দুরন্ত ছেলে সারা পৃথিবীটাকে তোলপাড় করে' ফেলার আনন্দে, নিত্য-নূতন রংঙের স্বপ্নে মসগুল হয়ে দেশ ছেড়ে আটলান্টিকের অপর পারে নূতন জগতের খোঁজে অকুল সমুদ্র-যাত্রা করেছিল—আজ সে আবার হলিউড এমেরিকা ও সারা পৃথিবীর বাঁধন ছিঁড়ে প্রেম-প্রীতি, প্রিয়-অপ্রিয় সব তুচ্ছ করে' কোন্ অজানা দেশে যাত্রা করেছে তা' কে বলতে পারে।

বাল্যে টরেণ্টের সেনাস্কুল 'দ্যন্তে এ্যালেগেরি'তে এবং পরে পেরুজোয়ার 'কলেজিযো ডেলাসিপেএঞ্জা' থেকে কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিতাড়িত ভ্যালেন্‌টিনো—জেনোয়ার কৃষি-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালের উচ্ছৃঙ্খল ভ্যালেন্‌টিনো—ভাগ্য পরীক্ষার আশায় মণ্টিকার্লোতে জুয়া খেলায় সর্ব্বস্বান্ত ভ্যালেন্‌টিনো—দুঃখ দরিদ্রতায় উত্যক্ত, চাকরীর জন্যে পেট ভরে' দু'বেলা দু'টী খাবার জন্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত ভ্যালেন্‌টিনো এবং তারপর শেষ চূড়ান্ত প্রশংসিত, পৃথিবীর চিত্র-জগতে শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল তারকা ভ্যালেন্‌টিনো আজ সব যুক্তি-তর্ক, সুখ দুঃখ, সুনাম দুর্নাম ও মান-অভিমানের বাইরে।

মানুষ এম্‌নি করেই একটা উপলক্ষকে অবলম্বন করে' চলে' যায়। কিন্তু পশ্চাতে যা' কিছু রেখে যায়, তাই হয়ে ওঠে তখন তার অবর্ত্তমানের পুঁজি বা সম্বল। দীর্ঘ ন'টী বছর কেটে চলেছে, কিন্তু আজও ইউরোপ এবং এমেরিকার ছায়া-চিত্র-জগতের নরনারী ও জনসাধারণ চব্বিশ এ আগষ্টের কথা স্মরণ করে—আজও প্রতি বৎসরের ঐ দিনটীতে স্বপ্নের অলকানন্দা, সকল রূপ রস গন্ধের নন্দনকানন হলিউডের কিন্নর-কিন্নরীরা সেই অপরূপের বিরহ চিন্তায় ঠিক্ তেম্‌নি করেই চম্‌কে ওঠে এবং সমবেত হয়ে, বেভার্লি পাহাড়ের ওপর ভ্যালেন্‌টিনোর 'কটেজ'টী ও গির্জ্জার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত পথটী শাদা ফুলে ভরিয়ে তোলে, তাঁর মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করে।

মৃতের প্রতি শ্রদ্ধায় নিজেদের গৌরবই বৃদ্ধি পায়। অতীত গৌরব স্মরণে নিজের স্মৃতিই মাজ্জিত হয়—আর গুণী-জীবনের আলোচনায় জাতি, সমাজ ও শিল্পের উন্নতি হয়। আজ আমি ভারতবাসী, তথা বাঙালীর তরফ হ'তে প্রেমিক শিল্পীর প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা তাঁর এই বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসবে, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে সমানভাবেই সেই অজানা দেশে পাঠালাম।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বেতারে কিশোরীদের নাট্যাভিনয়

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

পরিচালনায়

'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকাভিনয়ে

বাগবাজার-পল্লীর

'ব্যোমকালী-বালিকা-সঙ্ঘ'

সঙ্ঘের বালিকাগণ প্রত্যেকেই সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও অল্প-বয়স্কা। গত শুক্রবার, ত্রিশ-এ আগষ্ট বেতার অভিনয়ে ইহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

বালিকাদের পরিচয়—কুমারী সবিতা মুখোপাধ্যায়, কুমারী শিবানী মুখোপাধ্যায়, কুমারী ঈশানী মুখোপাধ্যায়, কুমারী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কুমারী জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তী, কুমারী মাধবী চট্টোপাধ্যায়, কুমারী প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী রেণুকা মজুমদার, কুমারী প্রতিমা সেনগুপ্তা, কুমারী শোভারাণী রায়, কুমারী আরতি সেন, কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়, কুমারী অলকা সেন, প্রভৃতি।

যাঁহারা সঙ্গীতবেত্তাদের সংবাদ রাখেন, আধুনিক সঙ্গীত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও সঙ্গীত শিক্ষাদানে সুনিপুণ, সুকণ্ঠ গায়ক নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁহাদের অবিদিত নাই। কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন সংস্থা ও বহু বিশিষ্ট পরিবারে সঙ্গীতাচার্য্যরূপে ইনি সুপরিচিত। এই উৎসাহী, মিষ্টভাষী, অমায়িক সুরশিল্পী বাগবাজার-পল্লীর অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিশোরী কন্যাদিগকে লইয়া এই নির্ম্মল সঙ্গীত সঙ্ঘটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বালিকারা সকলেই নারায়ণবাবুর ছাত্রী। তাঁহার কন্যা কুমারী সবিতা মুখোপাধ্যায়ও এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্তা। 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে' 'কয়াধু'র ভূমিকায় ইহার অভিনয় নিখুঁত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

'রেড মর্নিং' চিত্রের একটী দৃশ্যে
ষ্টেফি ডুনা।

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

একাদশ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪২ | নবম সংখ্যা

দর্পের সমাধি

শ্রীমতী সরযূবালা গুহ

আমি বন্ধ্যা! শিশু মুখের মাতৃ-সম্ভাষণ আমার মত অভিশপ্তা ভাগ্যহীনার জন্য নয়।

আমারই তাঁবেদার ঝি-চাকর, আশ্রিত, প্রজা সবাই সভয়ে আপন আপন শিশুকে দূরে টানিয়া লইয়া যায়। আমি বুঝি সব, কিন্তু বলিতে পারি না কিছুই।

তিনটী ছেলে পথের ধারে খেলা করিতেছিল। কি মধুর তাহাদের বাল্য-চপলতা! দূর বাতায়ন পার্শ্বে আমি—হ্যাঁ, দেওয়ালের আবরণীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া। তাহারা নিম্নে, এতটা ব্যবধান, কিন্তু সে ব্যবধান দূরত্বের সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল না—যেন হাত বাড়াই-লেই আমি কোলে লইতে পারি।

পারি কি? নিজের অন্তরের নিকট এ প্রশ্নে আমি পরাজিত। বুকের ভিতর হইতে নির্ম্মম বাণী তন্মুহূর্ত্তে আমাকে ভালরূপে সজাগ করিয়া দেয়, মনে পড়ে—আমি কি?

একটি খেলনা, তাই লইয়া বিবাদ—"ওরে বাছা, ঝগড়া করিস নি—এই নে টাকা, কিনে আন্।"

চিলের মত তাহাদের মায়েরা আসিয়া 'ছোঁ' মারিয়া আমার সম্মুখ হইতে ছেলেদের দূরে লইয়া পলাইল। আমার দেওয়া দানে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিল না।

ব্যথায় বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তথাপি ইহাই যে আমার একান্ত পাওনা বোধে মুখ বুজিয়া বুক চাপিয়া শ্বাসরোধ করিলাম।

—"ও কি, ও কি, ও কি গো, আহা! দুধের শিশু, কি অপরাধ তার ভগবান! আমি রাক্ষসী, হতভাগিনী! পাইক, পাইক, দরোয়ান!"

কিন্তু আমার হুকুম আর ত কেহই শুনিবে না—তবে কি, তবে কি শিশুটী কেবল স্পর্শ দোষেই মারা যাইবে।

—"রক্ত, রক্ত, ওঃ, কি রক্ত! এত রক্ত ওই শিশু দেহে থাকতে পারে কি? ও গো, রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমার পাপের দণ্ড আমিই ভোগ করব! শিশু ও বমনে ক্লান্ত; আর না, আর না, হে ভগবান!"

চোখের উপর দেখিতে হইল মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে শিশু কোরকটীকে চিরদিনের জন্য লুকাইয়া ফেলিল।

সবার অনুরোধ রাখিতে হত্যা দিয়াছিলাম।

আশ্রিত অনুগতেরা বুঝাইয়া দিল—না, দয়াল বৈদ্যনাথ কোনদিন কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। এতবড় রাজ্যের রাণী আমি, পুত্র অভাবে শেষে কি পরে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিব?

গর্ব্বিতা! অর্থমদ আমায় মনুষ্যত্বের বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। আমি ভাবিতাম, এই বুঝি ন্যায্য পথ। হুকুম যাহারা করে তাহারা ভাবে না, ভাবিতে পারে না, সেই হুকুম সে নিজে কতটা প্রতিপালন করিতে সক্ষম—পদমর্য্যাদা বাধা দেয়।

জাঁক-জমকের সহিত দেবতার পায়ে ভিক্ষার অঞ্জলি দিতে আসিলাম। সঙ্গে কিংখাপ-মকমল, হীরা-মাণিক, লোক-লস্কর যাহা আসিল তাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। কাঙ্গাল ভাব ত দূরের কথা—অবাক হইয়া লোকজন বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে!

দেবতার পশ্চাতে চরণামৃতের স্থান; হিন্দু মতে অতি পবিত্র। ঘৃণায় আমার কিন্তু বমনোদ্বেগ হইল। শত কলস জলে স্থান মার্জ্জনা করাইয়া মকমলের শয্যায় প্রসাদ কামনায় শয়ন করিলাম। শত দাসদাসী চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া পাহারায় রহিল।

চিরদিন উপবাসে অনভ্যস্ত। ধনলোভী পুরোহিত ধনী যজমানের মন রাখিতে ব্যবস্থা দিলেন—চরণামৃত পান, দেবতার প্রসাদ-ভোজন, ভোজনের মধ্যেই গণনীয় নহে।

প্রথম দিন কাটিয়া গেল দেবতা রাজ-আদেশের বাধ্য নহেন দেখিয়া মনে বিরক্তি ধরিল।

দ্বিতীয় দিন অন্য কোন্ দেশের অধিপতি পূজা দিতে আসিলেন। বিশ লক্ষ বিল্বদল তাঁহার সঙ্কল্প। শুনিয়া মনে হইল, সামান্য বিশ লক্ষে নাম কিনিতে চায়। থাক্, প্রতিশোধ পরে দিব—আশী লক্ষে ওর সঙ্কল্প যদি না ভূমিস্মাৎ করিতে পারি, তবে আমার রাণী পদবীই বৃথা!

দূরে কে যেন কাহাকে বলিল—"এমনি করে কি হত্যে দেয় না কি বোন্—এর নাম কি কায়মনে ডাকা? আড়-চোখে বেলপাতার চুপড়ী গুন্‌ছে শুধু। মাগী উঠে যায় না কেন?"

আমার হুকুমে মেয়েটীর শাস্তির ব্যবস্থা হইল।

একটী একটী করিয়া বিশলক্ষ গণিয়া শেষ করা অসম্ভব। না, পাণ্ডারা তাহা করেও না; সাজির মাপ আছে, তাহাতেই কম-বেশ়ী হিসাব হয়। সঙ্কল্পচ্যুত হইবার ভয়-ভাবনা মোটেই থাকে না।

অতবড় উঠান কেবল সাজিতেই ভরিয়া গেল। তন্দ্রার ঘোর আমায় বুঝিলাম না, পরে কি হইল। চক্ষু খুলিতেই দেখি সম্মুখে পাতার পাহাড়। ষাঁড়ে খাইতেছে। ছেলেরা চারিদিক বেড়িয়া লুকাচুরী খেলা খেলিতেছে।

হুকুম দিতে যাইতেছি—পাতা তুলিয়া শিবগঙ্গা বুজাইয়া দিক্; আমার বাতাস রোধ করা কেন?

মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—একটা তাল পাকান বেলপাতার নুটি আসিয়া সবেগে আমার কোলে পড়িল।

জ্বলিয়া উঠিলাম। আমার আদেশে জমাদার এক অতি সুকুমার শিশুর কান ধরিয়া নিকটে আনিয়া দাঁড় করাইল। হয় ত পাণ্ডাদের পুত্র, নয় ত অন্য কাহারও সন্তান। কিন্তু সে সময় উত্তেজনা অন্ধ করিয়াছিল—নহিলে অমন মনোহর কমনীয় দেহে কি করিয়া বেত্র-প্রহারের আদেশ দিয়াছিলাম।

নিমকের চাকর নিমকহালাল হয়—না, এ ক্ষেত্রেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? কিঙ্কর অক্ষরে অক্ষরে আমার দণ্ডাদেশ প্রতিপালন করিল।

স্মৃতি

শ্রীমতী কণিকা বসু

—"রোজই তাকে রাস্তায় ঠিক আমার জান্‌লার সাম্‌নে অপর দিকে ফুটপাতের ওপর বসে থাকৃতে দেখি। তার দেহটী শীর্ণ, পরণের কাপড়খানি শতছিন্ন তালি দেওয়া, মুখখানি শুকিয়ে গেছে, চোখ দু'টী ছলছল করছে, মাথার চুলগুলি রুক্ষ—বোধ হয় অনেক দিন হ'তে তেলের স্বাদ পায় নি। অত দারিদ্র্যের মধ্যেও তার আভিজাত্যের গৌরব পরিস্ফুট রয়েছে। বয়স তার দশ কি এগারো হবে।

—"তার মুখখানি যেন কত চেনা, সে যেন কত আপন, কিন্তু তবুও তাকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি না। কিন্তু আজ প্রতিজ্ঞা করে জান্‌লার ধারে বস্‌লাম—ওকে ডাক্‌বোই ডাক্‌বো। কিন্তু কাজে তা' আর হয়ে উঠ্‌লো না। আজ বিকেল হতেই বৃষ্টি নেমেছে। আমি জান্‌লার ধারে বসে আছি—কিন্তু সে আসে নি।

—"সেও এমনি এক বাদলার দিন। সে আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাক্‌তো। দেখ্‌তাম যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন, মনে হ'ত, যেন একযোড়া কালো চোখ আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন বয়স আমার একুশ কি বাইশ হবে, আর তার পনেরো কি ষোল। দেখ্‌তে তাকে মন্দ নয়। লম্বা টানা চোখ, যোড়া ভুরু, ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রং ফরসা—মোটের ওপর সে সুন্দরী। তারা আমাদের বাড়ীর পাশে আসবার কিছুদিন বাদেই দেখি যে, আমাদের বাড়ীতে তাদের আসা-যাওয়া আরম্ভ হয়েছে। মাঝে মাঝে সে একাই আসতো এবং আমার পড়ার ঘরে আমার বই-খাতা ঘাঁট্‌তো। মাঝে মাঝে আমার বইগুলো নিয়ে পিয়নের কাজ কর্‌তো। তাদের মধ্য থেকে ছোট ছোট চিঠি পেতাম। তা'তে তার নাম জান্‌লাম রাণী। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার পড়ার ঘরে দেখা হয়ে যেত। দু'টো কথা ব'লেই সে বেরিয়ে যেত।

—"এই রকম ভাবেই তার সঙ্গে আমার আলাপ। আমিও তার সঙ্গে চিঠি বিনিময় কর্‌তাম। এই আলাপ ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হলো। যত দিন যেতে লাগ্‌ল, তত যেন তাকে পাবার জন্য আমার মন ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে তার যৌবনের উপর কলঙ্কের রেখা টেনে দিলাম। তারপর জানাজানির কিছুদিন বাদে শুন্‌লাম, সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে আমিও একদিন বেরিয়ে পড়লাম। সে আজ বছর দশ কি এগার হবে।

—"তারপর একদিক মেঘলা করে আছে, কিন্তু বৃষ্টি নেই। আজ দেখ্‌লাম, সে চুপ করে অন্যদিকে চেয়ে কি ভাব্‌ছে। আমি জান্‌লাটি খুল্‌তেই সে আমার সাম্‌নে এসে একটুকরো কাগজ দিলে। কাগজটীর ওপর দেখ্‌লাম আমার নাম। আশ্চর্য্য বোধ হলো! ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তোমাকে কে দিয়েছে?'

—"সে বল্‌লে—'মা।'

—"আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'তোমার মা কোথায় থাকেন?'

—"আমার বাড়ীর সাম্‌নে একটী অন্ধকার ছোট গলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বল্‌লে—'ওইখানে।'

"—'আমাকে চিন্‌লেন কি করে?'

"—'আমি জানি না, আমাকে শুধু দিতে বল্‌লেন।'

"—'তোমার মায়ের নাম কি?'

"—'বলতে বারণ আছে। একটু তাড়াতাড়ি আসুন, মায়ের বড় অসুখ—বোধ হয় বাঁচবেন না।'

—"আমি তাড়াতাড়ি অফিসের ছাড়া জামাটী পরে চটী যোড়া পায়ে গলিয়ে বল্‌লাম—'চলো।'

—"সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো; আমিও চল্‌লুম।

—"কিছুক্ষণ পরে একটা খোলার ঘরের সাম্‌নে এসে হাজির হলাম। সে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ কর্‌লে। আমাকে ডাকলে। আমি প্রবেশ করে দেখ্‌লাম যে, ঘরের মধ্যে একটী হ্যারিকেন্‌ জ্বল্‌ছে। অপর দিকে দেখ্‌লাম যে, একটী জীর্ণ বিছানার ওপর একটী রমণী শুয়ে আছে। দেখে মনে হয়, পূর্ব্বে তার সৌন্দর্য্য ছিল, এখন আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। রমণী ঘুমোচ্ছিল। আমাদের গৃহ-প্রবেশের শব্দে জাগরিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'পতু, বাবা, এলি ?'

"—'হ্যাঁ মা। সেই বাবুটী এসেছেন।'

"—'এসেছেন ? কই বাবা, ডাক্‌ না তাঁকে।'

—"গলার স্বরটা পরিচিত হলেও কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আস্তে আস্তে তার জীর্ণ বিছানার একপাশে বস্‌লাম। রমণী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'তুমি এসেছ ?'

—"তারপর একটু থেমে আবার বল্‌লে—'আমি জানি তুমি আস্‌বে, তাই তোমাকে ডেকেছি। আমার অনেক কথা—'

—"আমি বিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লাম যে, সেই রমণীই আমার যৌবনের রাণী! সে আমার বিস্মিত চাহনির দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বল্‌লে—'চিন্‌তে পার্‌ছো না ? আমি তোমার রাণী। এবার হয়েছে ?'

—"আমি রাণীকে বাধা দিয়ে বল্‌লুম—'রাণী, আমার এত কাছে থেকেও তুমি এতদিন আমাকে খবর দাও নি ? আমি যে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি। এখনও আমি তোমার আশায় বসে আছে। আজও আমি অবিবাহিত। বলো রাণী, কেন এ রকম ভাবে নিজেকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিলে—আমায় কেন খবর দাও নি ? আমি কি আস্‌—'

—"রাণী বাধা দিয়ে বল্‌লে—'যা' হবার তা' হয়েছে। এখন শোনো—সেই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর কেটে গেছে। দু'দিন বাদে আমি তোমার বাড়ীর কাছে গিয়ে শুন্‌লাম যে, তুমিও না কি বেরিয়ে পড়েছ। আমার তখন দুঃখ হলো—কেন তোমাকে খবর দিই নি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হলো যে, হয় ত মিথ্যা কথা। তুমি বড়লোকের ছেলে, তুমি কি দুঃখে বেরোতে যাবে—বড়লোকের কুৎসা ত সহজে রটে না। কিছুদিন বাদে হাসপাতালে পতু হলো। সেখানে মাস-খানেক থেকে শরীরে বল পাবার পরই আমি ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। ভদ্রলোকেব মেয়ে আমি। কি করি—লজ্জার মাথা খেয়ে একজনের বাড়ী চাকরী নিলাম। তারপর আজ দীর্ঘ দশ বছর তাদেরই অন্নজলে পতুকে মানুষ করেছি। ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। আর আমি না খেয়ে খেয়ে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেছি। এখন তুমি যদি ওকে—'

—"আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম—'তোমার কোন ভাব্‌না নেই। তুমি শুয়ে থাকো।'

—"পতুকে তার মায়ের কাছে বসিয়ে আমি ডাক্তার ডাক্‌তে বেরিয়ে গেলাম।

—"পতু মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'মা, উনি কে ? তুমি ওঁকে ডেকেছিলে কেন ?'

—"মা বল্‌লে—'পতু, উনিই তোমার বাবা। আমি ত মরে যাব, তুমি ওঁর কাছে থাক্‌বে। ওঁকে অমান্য করো না। এতদিন…'

—"আর তাকে কথা শেষ কর্‌তে হলো না।

—"কাশ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো এবং মুখ দিয়ে চাপ চাপ রক্ত উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে কাশিরও শেষ হলো যখন, তার দেহটাও তখন নিশ্চল পাথরের মত হ'য়ে গেল। পতু আছাড় খেয়ে মায়ের বুকের ওপর পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

—"অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলুম। ঘরের মধ্যে ঢুকে সেই দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম!

—"রাণীর শীতল বুক থেকে তখন ধীরে ধীরে তার স্মৃতিটী তুলে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লাম। এই আমার জীবনের সম্বল রাণীর দেওয়া স্মৃতি!…"

শ্রীমতী কণিকা বসু

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুসরণ]
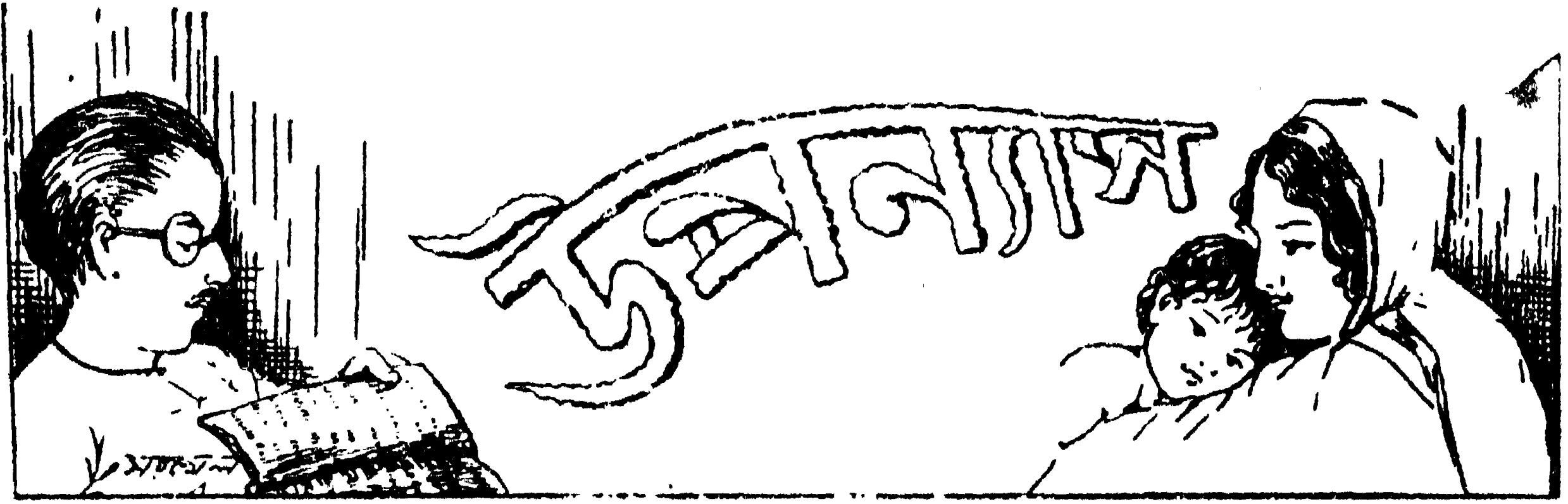
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পনেরো

ভুলিব বলিলেই যদি ভোলা সম্ভব হইত, তাহা হইলে বোধ করি সংসারে এত বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনাই থাকিত না।

যতটা সহজ এবং সরলভাবে অমর বর্ত্তমান জীবনটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিল, ঠিক্ ততটা কেন, তাহার কণামাত্রও সে সফল হইল না। সরযূর এই নিলিপ্ত ব্যবহারটুকই তাহাকে পর্ব্বাপেক্ষা বিচলিত করিয়া তুলিল। মনের গহন তলে ঘুমান অনেকদিনের অনেক কথাই তাহার স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

বিবাহের পর ফুলশয্যার রাত্রে যে কয়টি কথা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একান্ত অকারণেই উঠিয়াছিল, আজ কারণের দিনে তাহাই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিব্রত, বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

সেদিন অজয়কে লইয়াই ছিল তাহাদের আলোচনার বিষয়। অমর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বন্ধুর প্রশংসাবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পত্নীও যাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে ওই আত্ম-ভোলা লোকটীর প্রতি সদয় ব্যবহার করে তাহার জন্য রীতিমত অঙ্গীকার করাইয়া লইয়া ছাড়িয়াছে।

সরযূ লাজুক মেয়ে নয়—বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয়া। স্বামীর এই অহেতুক উচ্ছ্বাসের ফল যে ভাল নাও হইতে পারে ইহা ধরিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। সে বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। বলিয়াছিল—মানুষের মন বড় চঞ্চল, তাই আজিকার যাহা সত্য, কালিকার পক্ষে প্রয়োজনে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া দাঁড় করাইতে সে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না। বিশেষ, মেয়েদের লইয়া যে কত ঘটনা ঘটে, তাহার ত কথাই নাই। বাহিরের বন্ধুত্ব বাহিরে বাহিরেই মানায়, অন্তঃপুরে না ঢুকানই মঙ্গল।

কিন্তু অমর তাহা স্বীকার করে নাই। কিংবা মানুষ সে, ও দুর্ব্বলতাকে না মানাই তাহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। বিশেষতঃ, অজয়কে লইয়া কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে ইহা সে কল্পনায়ও আনিতে চাহে না।

তথাপি সরযূ বলিয়াছিল—শতাব্দী গৌরব লইয়া বাদ-বিতণ্ডার অন্ত নাই। আজও বহু বিগত শতাব্দীকেই মানুষের চরম উন্নতির দিন বলিয়া অনেকে পূজা করিয়া থাকেন। উপমা দিতে হইলে রাম রাজত্বের উল্লেখ হইতে বিলম্ব হয় না। সীতার অগ্নি-পরীক্ষাকেই সমাজ ধর্ম্মের জলন্ত সাক্ষ্য বলিয়া নাক নড়িয়া উঠে। তা' ছাড়া, সত্যকথা বলিতে কি, আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে উন্নতি হইলেও মানুষ যে দুর্ব্বল প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারিয়াছে ইহা সত্য নহে, এবং কোনদিনে

কোন কালেও যে পারিবে না, ইহা স্থির নিশ্চিত। তবু যদি অমর জেদ করে, তাহাতে সে প্রতিবাদ করিতে পারে না—কেন না, মহাভারতে যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় তাহাদের মূল্য নিরূপণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন ; বর্ত্তমান যুগে তাহার পরিবর্ত্তনের অঙ্কুরও দেখা যায় নাই। তবে স্বামী-দেবতার কথা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে আজ তাহাকেও প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, অজয়ের সহিত মেলামেশা লইয়া কোনদিন কোন কারণেই সে কোন কৈফিয়ৎ দিবে না। অমর সকৌতুকে বলিয়াছিল—তথাস্তু !

সেদিনকার সেই সরযূ আজও তেমনই আছে—কিন্তু অমরের সে সুখ আজ কোথায় ?

শেফালীর নিকটও স্বামীর হৃদয়-বিপ্লবের কথা লুকান ছিল না, তাই সরযূদের প্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রযত্নে দূরে সরাইয়া রাখিলেও অনুতাপের তাহার অন্ত নাই। সেই ত স্বেচ্ছায় এ বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। স্বামীর নিতান্ত অনিচ্ছায় কেনই বা সে জোর করিয়া এতবড় কাণ্ড ঘটাইয়া বসিল। বসিল যদি ত, শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতেই পণ করিল না কেন ?

অমরের সেবায় তাহার অন্তর চিরজাগ্রত ত ছিলই, তাহার উপর আরও সহস্রগুণ সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। সে হৃদয়ের অপূর্ণ অংশটুকু দু' হাত দিয়া, যেন সে এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণ করিয়া দিতে চায়। কিন্তু তাহা যে কোন-ক্রমেই তাহার দ্বারা সম্ভব নয়, তাহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হয় না।

তাই সেদিন যখন পূর্ব্বেরই মত আনন্দপূর্ণ-কণ্ঠে আসিয়া অমর তাহাকে ডাকিল—শেফা ! তখন শেফার সারা অন্তর কি এক অপূর্ব্ব রসে বিভোর হইয়া গেল। সে দীপ্ত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর পানে ফেলিয়া বলিল—কি ?

—ও কি সত্যি ?

—কি সত্যি গা ?

—ক্ষান্তর মা যা' বল্‌লে—

আবীর রঙে শেফার গাল দু'টি কে যেন 'খপ্‌' করিয়া আসিয়া ছোপাইয়া দিয়া গেল। সে কাপড়ের খুঁট্‌টা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—ও মা, এরই মধ্যে বলে দিয়েছে ! তোমার ছেঁড়া জামাটা না হয় আস্তই হ'ল—গরীব বামুনটাকে দিয়েছিলুম তাই—

অমর শেফাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—সে অত বোকা নয় যে, একটা জামার খবর আমায় দেবে। আমায় খবর দিয়েছে—

সই-এর ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নের খবর বুঝি ? তা'—

—তা' বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলে, না ? না, সে ও কথা বলে নি, সে বলেছে তোমার নিজের ছেলের—

—ওঃ, তাই বুঝি খানিক আগে আমাকে একখানা নোট দেখিয়ে গেল। বলে, বাবু দিয়েছে, আর হাসে···

—তা' দিতে হবে বই কি শেফা। আমাদের বংশধর আস্‌ছে, তার সম্মানের জন্য এটুকু না করলে সে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে ?

—তা' বটে বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া শেফা বলিল—কিন্তু যে আন্‌ছে, তাকে কি দেবে ত কই বল্‌লে না ?

—ওঃ, তা' বলা হয় নি বটে এতক্ষণ। তার জন্যে এনেছি যে বলিয়া পকেট হইতে একছড়া নেক্‌লেশ বাহির করিয়া অমর শেফালীর সম্মুখে ধরিল।

মুক্তাগুলা যেন ঝক্‌মক্ করিয়া দুলিয়া উঠিল। শেফা পরম বিস্ময়ে সেগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—ভারী, ভারী চমৎকার কিন্তু ! কত নিলে গা ?

—কত আর—পাঁচশো।

—পাঁ—চ—শো ! ও মা, এতগুলো টাকা নাহক্ খরচ করে এলে।

—কর্‌লাম বই কি, তবে এ আমার টাকা নয়।

—তোমার নয় ?

—হ্যাঁ গো। আজ ক্ষান্তর মা যখন বেরুবার মুখে খবর দিলে, তখন পকেটে যা' ছিল তাকে তাই দিয়ে দিলুম বটে, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম—যদি বেশী কিছু পাই, তা' হ'লে তোমার জন্যে যা' হোক্ একটা কিছু আন্‌তেই হবে। যা' পাব আজ—তোমার। দেখি শেফুরাণীর বরাত বলে ত বেরিয়ে পড়্‌লুম। তারপর না দেখা না শোনা হঠাৎ একেবারে পাঁচশো টাকা আগুড়ি দিয়ে এক জমিদার তার

একটা ''কেস্' আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। অনেক টাকার দাবী 'কেস্'টা ও শক্ত, তা' হোক্—এ 'কেস্' আমি জেতাবই! একেবারে বেণীমাধব দত্তর দোকান থেকে এটা নিয়ে এসে বাড়ী উঠেছি। একটু জলখাবার বন্দোবস্ত কর শেফা। জমিদারের ছেলে, তায় মুন্সেফ্—'কেস্' সম্বন্ধে আলোচনা করতে এখানে আজ সন্ধ্যার পরই আসছেন; তাঁকে একটু যত্ন-আত্তি করা ত উচিত।

কাজের কথায় শেফালীর অন্তরটা যেন নাচিয়া উঠিল। সে বলিল—নিশ্চয়! কিন্তু বাজারের খাবার একটীও আনা হবে না, সব আমি কর্‌ব—কি বলো?

—বেশ ত!

শেফালীর উৎসাহ কিন্তু মুহূর্ত্তেই শিথিল হইয়া গেল। সে বলিল—কিন্তু...

—আবার কিন্তু কি শে—

—আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমার রান্না পছন্দ হবে ত—

—না হ'লে তাঁরই বরাত মন্দ বল্‌তে হবে। আমি ত আগেই বলেছি শেফা, তোমার হাতে খাবার ভাগ্য সকলের থাকে না—দেখ্‌লে না, একদিনও থাক্‌তে পার্‌লে না, সরে পড়তে হ'ল। এ ধর্ম্মের সংসার শেফা, এখানে ভগবানের দয়া না পেলে কেউ সেঁধুতে পারবে না।

কোথা হইতে কোথায় গিয়া কথাটা দাঁড়াইল শেফালীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু কি বলিবে তাহাও সে প্রথমটা ঠিক করিতে পারিতেছিল না, তাই খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—ও কথা বলো না। আর যাই হোক্, তিনি দিদি, গুরুজন, তাঁর নিন্দে শুন্‌লেও আমার পাপ হয়!

—হওয়াই ত উচিত কিন্তু সত্যি কথা ত নিন্দে নয় শেফা, বরং মিথ্যে কথাকে সত্যি করে ধরে নিলে নিন্দে আছে! ক' দিন আমিও ওসব ছাইপাঁশ ভেবে মাথা গরম করেছিলুম। আজ ঠিক্ করেছি, অন্যায় যা' তা' চিরদিনই অন্যায়—তাকে কোন কিছুর মোহেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। যেমন করেই হোক্, তার স্মৃতি পর্য্যন্ত মন থেকে মুছে ফেল্‌তে হবে। যাক্ ও কথা, তোমায় কি কি আনিয়ে দিতে হবে বলো ত?

শেফালী মনে মনে হাসিল কি না কে জানে! কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করিল না।

সে প্রসঙ্গ যতটা চাপা পড়ে, ততই ভাল ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া স্বামীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিয়া গেল।

কিন্তু তাহার চেষ্টাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিতে বিধাতা পুরুষ কৃপণতা করিলেন না।

ষোল

সন্ধ্যার পর অতিথি সমাগমে সারা বাড়ী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাকরটা অকারণে একবার উপর একবার নীচে করিতে লাগিল।

কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া শেফালীও একবার আড়াল হইতে জমিদারের ছেলেটিকে দেখিয়া গেল।

মোকর্দ্দমার কথাবার্ত্তা শেষ হইল। জলযোগ-পর্ব্বটা না সারিয়া কোনমতেই বিদায় লওয়া সম্ভব নয় বুঝিয়া অতিথি বাধ্য হইয়া অমরের সহিত উপরের ঘরে আসিয়া বসিল।

শেফালীকে সত্যই রন্ধনে দ্রৌপদী বলা চলে। এই সল্প সময়ের মধ্যে সে যে আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে অমর পর্য্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিল।

খাইতে বসিয়া অতিথি কণ্ঠও বারবার মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল।

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অতিথি বলিল—দেখুন অমরবাবু, এখানে আসা পর্য্যন্ত একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব বলে ভাব্‌ছি, কিন্তু অশোভন হবে ভেবে জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস করি নি। যদি ভরসা দেন—

অমর সাগ্রহে বলিল—বিলক্ষণ, সচ্ছন্দে বলুন আপনার কি বলবার আছে। কিন্তু হবার কি আছে এতে।

অতিথি মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—এখানে আসা থেকে আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে

যাচ্ছিল—এখন ওপরে এসে খেতে বসে আরও গুলিয়ে যেতে বসেছে। এমন করে ত রাঁধতে পারতেন বলে একজনকে আমি জানি—তিনি সরযূ দি'। মাপ করবেন, কুসুমপুর গ্রামে গিয়ে আমার তাঁর সঙ্গে দৈবচক্রে আলাপ হয়। আনন্দের বিষয়—এই বাড়ীর ঠিকানাই তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এখানে এলেই তাঁর দেখা পাব। এরপর কোন চিন্তাই আস্‌ত না, কিন্তু ক'দিন আগে আমার স্ত্রীর একখানা চিঠি এই ঠিকানায় এসেছিল, সেখানা ফেরৎ পাওয়ায় মুস্কিলে পড়েছি। আরও মুস্কিলে পড়েছি এই ভেবে—সরযূ দি' এখানে থাকলে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তেন না, এ কথা বিশ্বাস করাই শক্ত। আরও একটা কথা মনে হচ্ছে—অজয় দা'ই বা কোথায়? দিদি ত তাঁকে ছাড়া এক মিনিটও থাক্‌তে পারেন না! আহা, বেচারীর দু' হাতই···

অমরের মুখখানি মড়ার মত শাদা হইয়া গিয়াছিল। সহসা তাহার নিজের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—দুটো হাতই...

—তাও বুঝি জানেন না? কলে কাজ কর্‌তেন, একদিন অসাবধানে দুটো হাতই ওঁর কলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল—অনেক বলে-কয়ে হাজার তিনেক টাকা কোন রকমে আদায় করা গেছল। যাক্, কোথায় গেলেন বলুন ত?

আর্ত্তকণ্ঠে অমর বলিল—জানি না!

—জানেন না? এখানে কি আসেনও নি না কি—আশ্চর্য্য!

বাহিরের দরজাটা নড়িয়া উঠিল। অমর সেদিকে লক্ষ্যও করিল না। দৃঢ় পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল—কিন্তু কুলটাকে রাখা সম্ভব নয় বলেই তারা এখানে থাক্‌তে পারে নি।

—কুলটা! অসীমের হাত হইতে খাবার থালার উপর পড়িয়া গেল। সে ততোধিক দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—অসম্ভব! আপনি কি বল্‌ছেন, সরযূ দি' কুলটা···অযথা একজনের নামে অমন করে বলা উচিত নয়—আপনি আপনার কথা প্রত্যাহার করুন অমরবাবু।

—কিন্তু সে একজন নয়, সে আমার স্ত্রী! মিথ্যা বলা আমার স্বভাব নয়। ওই যে অজয়ের কথা বল্‌লেন, ও ছিল আমার বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু, ওরই সঙ্গে অনেক দিন হ'ল বাড়ী ছেড়ে গেছে। এসব রেঁধেছেন, আমার এ বাড়ীর সত্যকার গৃহিণী যিনি, তিনিই। যদি খেতে অসুবিধা হয়, অনুরোধ করব না—তবে কিছু না ফেলে গেলেই বেশী আনন্দিত হব। কেন না, তিনি আপনার জন্যে অনেক—

—না না, ফেলে যাব কেন, খাচ্ছি আমি বলিয়া অসীম মাথা হেঁট করিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার অন্তরে যে প্রবল ঝড় বহিতে সুরু করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার মত শক্তি তাহার ছিল না—কোন মতে সবগুলা খাইয়া ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কোন রকমে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বাহিরে আসিয়া উন্মত্তের মত জনস্রোতের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিয়া তিক্ত চিন্তার হাত এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ এমন একটা বিসদৃশ ঘটনা যে ঘটিতে পারে এজন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না—বিশেষ করিয়া শেফালীর সারা শরীর যেন লজ্জায় ভাঙিয়া যাইতে চাহিতেছিল। সে প্রাণপণ প্রযত্নে স্বামীকে প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াও যখন পারিল না, তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া অনেকক্ষণ বারান্দায় নির্জ্জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সন্তর্পণে চোরের মত যখন এক সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখনও পাষাণ মূর্ত্তির মত অমর খাটের উপর বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল—তুমি শুনেছ শেফা, অজয়ের দুটো হাতই কলে কাটা গেছে। এখনো চন্দ্র-সূর্য্যি উঠ্‌ছে, এতবড় অত্যাচার সহ্য হবে কেন?

শেফালী কথা ত কহিতে পারিলই না, কোন্‌দিকে ঘাড়·· নাড়িবে ঠিক্ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্যার পরে

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

সবাই বলে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না?

না না, কে বলেছে? বেশ ভালো আছো তুমি।

আমি শুনেছি, কাল্‌কে কারা বলাবলি কর্‌ছিল। তোমরা ভেবেছিলে, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তুমি ঘুমোও।

কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেলে কি সব কথা মনে থাক্‌তো? আমি তো কিছুই ভুলি নি। সব বল্‌তে পারি, সব মনে আছে—একটির পর একটি– সব।

তা' তো থাক্‌বেই। তুমি ঘুমোও।

ঘুমোতে চাইতো। ঘুম যে আসে না। চোখ বুজ্‌লেই সব কিছু চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।

কথা কোয়ো না। দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে।

তোমরা দেখো, আমি ঠিক্ বেঁচে যাবো।

তা' তো যাবেই। তুমি ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে।

তোমরা আমাদের বাঁচাতে এসেছো, না? শুনেছ, বন্যার জলে আমরা মারা যাচ্ছি, তাই ছুটে এসেছো। তোমরা খুব ভালো। খুব দয়া তোমাদের। কিন্তু কেন এলে?

যাদের বাঁচাতে এসেছো তারা তো বাঁচ্‌তে চায় না। কি নিয়ে তারা বাঁচ্‌বে—বানের জলে আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র সব হারিয়ে বেঁচে থাক্‌তে কি ইচ্ছে হয়? আচ্ছা, মরে গেলে কি তাদের দেখা পাওয়া যাবে?—খোকার—মণির—এদের?

* * *

বাইরে বিষ্টি হচ্ছে, না?

হ্যাঁ।

সেদিনও বিকেলে এমনি বিষ্টি হচ্ছিল। নদীর জল ফুলে উঠেছিল। চারদিকে জল ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্প জল, পায়ের পাতাও ডোবে না।

কথা কোয়ো না। এইতো চোখ বুজেছিলে। আবার বোজো তো?

বুজেছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় জল আরো বেড়েছিল। বেশী নয়। আমাদের উঠোনেও ওঠে নি। গাঁ-শুদ্ধ লোকই ভেবেছিল জল আর বাড়বে না। চারদিকে কত দিন ধরে বিষ্টি হয় নি। আর ওইটুকু বিষ্টিতেই নদী ক্ষেপে উঠবে, তা' কেউ আন্দাজ কর্‌তে পারে?

তুমি কথা কইলে আমি চলে যাবো, বুঝ্‌লে?

রাগ করো কেন? কথা বল্‌লে সত্যি আমি মর্‌বো না।

সন্ধ্যের একটু পরেই খেতে বসেছি। আমরা আগ্‌রাত্তিরেই খাই। বেশী রাত কর্‌লে বড্‌ডো তেল পোড়ে। গরীব মানুষ। খাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে আঁচাতে এলাম। দেখি, ও মা, জল উঠোনে উঠেছে।

তুমি কি বকবক্ করে বক্‌বেই শুধু?

না। হাঁড়িকুঁড়ি, বাসন-কোসন সব মণি মাচায় তুলে রাখ্‌লো। তারপর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। আমরা শুয়ে পড়লাম। জল ঘরের ভিত পর্য্যন্ত উঠবে ভাবিও নি। ভেবেছিলাম, নদীতে জোয়ার এসেছে। নেমে যাবে একটু পরেই। বাদ্‌লার দিন। ঘুম এলো চেপে।

বেশ তুমি কথাই কও। আমি চল্‌লাম।

না না, যেয়ো না। বেশ, এই চুপ কর্‌ছি।

* * *

দুপুর রাত্রে হঠাৎ জেগে গেলাম, বুঝ্‌লে। চারদিকে লোকজন চেঁচাচ্ছে। শুন্‌তে পেলাম—বান আস্‌ছে—বান আস্‌ছে। শিউরে উঠলাম।

আগে কি মোটেই বুঝতে পারো নি—বান আস্‌বে বলে।

নাঃ, কক্ষণো তো দেখি নি বান। এ গাঁয়ের কেউও ত দেখে নি। কি করে বুঝ্‌বো? ভেবেছিলাম, জোয়ারের জল। একটু বেশী জোয়ার হয়েছে।

তারপর?

মেঘের ডাকের মত শব্দ শুন্‌তে পেলাম। সে শব্দ আর থামে না। ক্রমেই এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। তাড়াতাড়ি খোকাকে বুকে তুলে নিলাম। আচম্‌কা জেগে সে কেঁদে উঠ্‌লো। মণির হাত ধরে এক টান মার্‌লাম। ধড়মড়িয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। তার হাত ধরে টেনে উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, পাহাড়ের মত কালো একটা ছায়া ছুটে আস্‌ছে—অনেকখানি জুড়ে। দু'দিকে তার সীমা নেই। কী তার হুঙ্কার! বুদ্ধি ঠাওরাতে পার্‌লাম না। সময় কোথায়?

খোকাকে বুকে চেপে ধর্‌লাম—খুব জোরে। মণির হাত ধরে নিয়ে গেলাম নারকোল গাছটার গোড়ায়। বল্লাম—গাছটা জড়িয়ে ধরে থাকো—শক্ত করে। কিছুতেই ছেড়ো না।

তাই সে কর্‌লো। দেখ্‌তে পেলাম, ভয়ে সে কাঁপছে। খোকাকে বুকে করেই আমিও জড়িয়ে ধর্‌লাম গাছটা। আমার চাপ খেয়ে খোকা চেঁচিয়ে উঠলো।

জল এসে পোড়লো। মণির একটা আর্ত্তনাদ শুন্‌লাম, আর কিছু না। তারপর কি হলো বল্‌বার ক্ষমতা নেই। দম আট্‌কে আস্‌তে লাগ্‌লো। গাছ ছেড়ে দিলাম। খোকাকে ছাড়লাম না। পা বাড়িয়ে নিয়ে হাতড়ে দেখ্‌লাম মণি নাই। সে ভেসে গেছে—জলের সঙ্গে ভেসে গেছে!

সর্ব্বনাশ! আমিও যে গল্পে মেতে উঠেছি। কেঁদো না ভাই, কেঁদো না। লক্ষ্মী ভাইটি, কেঁদো না।

কাঁদ্‌বো না। তুমি বিয়ে করেছো বাবু? কর নি, না? তবে কেমন করে বুঝ্‌বে? বুঝ্‌বে না। মণি যে আমার কি ছিল, তা' বুঝ্‌বে না। তাকে আর দেখ্‌তে পেলাম না। আমার আশপাশ দিয়ে কত স্ত্রীলোক ভেসে গেছে—কিন্তু মণিকে আর দেখ্‌তে পেলাম না!

সে হয় তো বেঁচে আছে। ভাল করে খোঁজ কর্‌লে পাওয়া যাবে। তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তোমায় সঙ্গে করে খোঁজ কর্‌বো। আমরা তো চিনি নে। কথা কোয়ো না। তা' হ'লে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠ্‌বে। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতো।

পাওয়া যাবে? ভালো করে তুমিই খোঁজ কর না বাবু। তার মাথার চুল বেঁকা বেঁকা। সিঁথের মাঝখানে একটা ফোড়া কাটার দাগ আছে। গায়ের রঙ ফর্‌সা। কপালের বাঁদিকে একটা তিল আছে—

না, পাওয়া যাবে না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি—মণিকে আর পাব না। আচ্ছা, কোথাও দেখেছো বুঝি তার মরা দেহটা পড়ে আছে? আর গাঁয়ের লোক বুঝি বল্‌ছিল যে, ও মণি?

আমি কিছু বোল্‌বো না। তুমি চুপ করে ঘুমোও।

আচ্ছা, আমি চুপ কর্‌ছি। তুমি বলো।

না, আমি ঘরে থাক্‌লে তুমি কিছুতেই চুপ কর্‌বে না।

যেয়ো না—যেয়ো না। আচ্ছা যাও। বুঝেছি, তুমি থাক্‌তে পার্‌ছো না এখানে। কিন্তু মণিকে যদি দেখ্‌তে পেয়ে থাকো, একবার বলো। তার দেহটা সৎকার করা হয়েছে শুন্‌লেও যে আমি শান্তি পাব। সে নেই, তাতো আমার মনই বল্‌ছে।

*　　*　　*

ও কি?

ওষুধ খাও।

না। জানো বাবু, আমার খোকা মর্‌বার সময় একটু ওষুধ পায় নি।

খাও।

না। ওষুধ খেয়ে আমি কার জন্যে বেঁচে উঠ্‌বো?

ইচ্ছে করে না বাঁচা যে পাপ ভাই।

হোক্ পাপ। আমার বুকে যে আগুন জ্বল্‌ছে, পাপ কি তার চেয়ে বেশী করে পুড়িয়ে দিতে পার্‌বে আমায়।

খাও, লক্ষ্মীটি।

তুমি অমন করে কেন বলো। আমি তোমার কে? কেন আমায় বাঁচাবে? না, খাব না ওষুধ।

তুমি রাগ করছো? আচ্ছা দাও; খাচ্ছি ওষুধ।

এই তো ভাল মানুষ।

খোকাকে বুকে করে আমি ভেসে যাচ্ছিলাম, বুঝ্‌লে? খোকার তখন জ্ঞান নাই। আমি আর পারছিলাম না। ভগবানের দয়া। দয়া! যাক্। দেখ্‌লাম, কাছে গিয়ে ভেসে যাচ্ছে একখানা তক্তপোষ। উঠে বস্‌লাম তার ওপর। খোকাকে কোলের উপর শুইয়ে দিলাম।

কথা কোয়ো না।

কিছুতেই খোকার জ্ঞান হয় না দেখে আমি কেঁদে ফেল্‌লাম।

চুপ করো।

তক্তপোষে উঠেছিলাম সকালবেলা। আমার সারা দিনের কান্না বোধ হয় ঈশ্বর শুন্‌তে পেলেন। বিকেলবেলা খোকার জ্ঞান ফিরে এল।

ঈশ্বর! ঈশ্বর কি সত্যই আছে বাবু?

একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর না।

* * *

রাত তখন শেষ হয়ে এসেছিলো। চারদিকে অথৈ জল। তার মাঝে তক্তপোষের উপর বসে আমি ভাস্‌ছি। আমার কোলে খোকা ছট্‌ফট্ করছে। তার ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে তখন। কলেরা। বুঝ্‌তে পার্‌লাম। বন্যার ওই জল সারাদিন সে খেয়েছে। তেষ্টা পেলেই খেয়েছে। তার চেয়ে ভাল জল কোথায় পাবে?

আবার বুঝি কথা কইতে আরম্ভ করলে।

কলেরা হ'ল তার। আমিও তো খেয়েছি সে জল—আমার কেন হলো না?

একটু থামো না। বকে বকে মাথা যে গরম করে তুলেছ। ঘুম আস্‌বে কেমন করে?

আমার কোলে খোকা ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল। জল জল ব'লে সে চেঁচাতে লাগ্‌ল। অনবরত চীৎকার। সে জল কি কলেরা রোগীকে দেওয়া যায়? না দিয়েও পার্‌লাম না। না দিলে সে গড়িয়ে তক্তপোষের ধারের দিকে চলে যায়—জলের দিকে। একফোঁটা ওষুধ পাবার তো উপায় নেই।

সেই জলই খেতে দিলে?

তবে আর কি দেবো? জানি সে জলে অপকার কর্‌বে। অশিক্ষিত একেবারে নই আমি বাবু। চাষা হলেই কি মূর্খ হয়? কিন্তু বুঝ্‌লাম, বাঁচবে না। ভাবলাম, মরার সময় জল না পেয়ে যাবে কেন? ভগবানের দেওয়া সেই অথৈ জল আঁজলা আঁজলা তাকে খাওয়াতে লাগ্‌লাম বাবু।

উঃ!

পরদিন দুপুরবেলা সে আর জল খেতে চাইল না। আর চাইবে না কোনদিন। আমার কোলের ওপর সে মরে গেল—আমার চোখের সাম্‌নে!

কেঁদো না ভাই। ও সব মনে করে কি হবে?

আর আমি এখন ওষুধ খাচ্ছি। জল খাচ্ছি। উঃ! খোকা! খোকা! ফিরে আয়! ওরে, ফিরে আয়! ভাল জল তোকে খেতে দেবো। ওষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে তুল্‌ব তোকে। আয় বাপ্ আমার, আমার কোলে আয়! ওরে ফিরে আয়—

ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! শীগ্‌গির আসুন একবার। আবার প্রলাপ বক্‌ছে। কি যে করি! খালি কথা কইবে।

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

বড় দিন

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী

নদীর ধারে কাঠুরেদের পল্লী।

চারধারে ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গল। মাঝখানে ছোট এক এক ফালি উঠান ঘিরে গুটিকতক ঘর। মাটির দাওয়া, খড় দিয়ে ছাওয়া—তাও পর্য্যাপ্ত নয়। চালের ওপর কোথাও বা একটা কুম্‌ড়া, লাউ বা শশার মাচা। এই ঘরগুলায় বাস করে পাঁচ সাত ঘর কাঠুরে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, বালক-বৃদ্ধ সকলে মিলে। তাদের গৃহস্থালীর আস্‌বাব দু'-চারটে মাটির হাঁড়ী-কলসী, পিতল-কাঁসার দু'-চারখানা বাসন-কোসন, ছেঁড়া ময়লা কাঁথা, কাপড়-গামছা, আর গৃহস্থের পোষ্য দু'-একটা গরু-ছাগল, কুকুর-বিড়াল নিয়ে।

তেল পুড়িয়ে আলো জালবার সঙ্গতি নেই তাদের কারুরই; তাই ভগবানের দেওয়া আলোর সদ্ব্যবহার করে তারা পুরামাত্রায়। সকলেরই সেরে নিতে হয় সন্ধ্যার আগেই তাদের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম, খাওয়া-দাওয়া। তারপর পুরুষেরা হয় ত দড়ি পাকায়, কিংবা সখ কারো নেহাৎ বেশী হ'লে, সামর্থ্য ও সঙ্গতি থাক্‌লে মাছধরার জাল বোনে, নয় ত দু'-চারজন একত্র বসে একটু-আধটু গাল-গল্প করে। তাও নিজেদের সুখ-দুঃখেরই কথা—স্বল্প আয়ে অভাব মেটে না তারই কথা। তিন-চার মাইল দূরের সহরের বাবুদের কথা—যারা সস্তাই শুধু খোঁজে, গরীবের দুঃখ-বেদনার কথা কিছুতেই বুঝ্‌তে চায় না একটুও। যে বাবুরা চায় দু' আনার কাঠ ছ' পয়সায় কিন্‌তে, যারা বোঝে না তার কি করে ছ'পয়সা, দু' আনায় চাল মিল্‌বে, বোঝে না যে, পরিবারে তার ছ'টি লোক খেতে—বুড়ো মা, তিনটি ছেলে, আর তারা স্বামী স্ত্রী—তাদের মুখে দিতে দু' আনার চাল পর্য্যাপ্ত নয়। যে বোঝা বইতে তার হয় গলদঘর্ম্ম, সেই বোঝাই মনে হয় না বাবুদের কাছে যথেষ্ট বড়। রোজের পর রোজ সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে, আর দা-কাটা তামাক টানে, নয় ত বসে বসে ঝিমোয়।

কেউ যদি দু'-পাচসের ধান কেন্‌বার সংস্থান কর্‌তে পারে, তবে মেয়েরা পাতার জ্বালে তাই সিদ্ধ করতে বসে; নয় ত চেটাই বিছিয়ে ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। সারাদিনের খাটুনীর পর চোখ আসে ঘুমে জড়িয়ে। ছেলেমেয়েগুলি সুরু করে বিরক্ত করতে। ভাইবোনের সেই চিরন্তন রেষারেষি, ঝগড়া-নালিশ, মান-অভিমান।

'মা ফের এদিকে বল্‌ছি'—হয় ত বল্‌লো একটা ছেলে।

তার আবদারে ঘুম-জড়ান চোখেই মা হয় ত নিলে তাকে কোলের কাছে একটু টেনে; অমনি আর একটির হ'ল অভিমান এবং সুরু কান্নার। মা এর ওপর রাখে একটা হাত, তার ওপর আর একটা, তখন হয় ত ঘুমন্ত কোলের ছেলেটা ওঠে কেঁদে, মাই দিতে হয়। এর মাঝেই হয় ত অন্য ছেলে দুটো পড়লো ঘুমিয়ে, কিংবা করলো সুরু নিজেদের মধ্যেই ঝগড়াঝাটি, মারামারি। ছোট ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে না পেরে মা হয় ত ওঠে ধম্‌কে, নয় ত উঠে দেয় লাগিয়ে ঘা কতক দুটোরই পিঠে। ওঠে কান্নার কলরোল। কোন মা হয় ত বলে রূপকথা—জ্যোছনা রাতে নদীর বুকে চাঁদের আলো মিলে সৃষ্টি করে তার 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড'—সুন্দর। তারপর একে একে সবাই পড়ে ঘুমিয়ে, চন্দ্রতারা থাকে তাদের দিকে চেয়ে। ...

আধভাঙ্গা এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো পাঁকাটির বেড়ায় ফাঁকের অন্ত নাই; ওপরে আলো ফুটতে-না-ফুটতেই ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে ঢোকে; তাই ঘরের অধিবাসীদের চোখ কচ্‌লে বিছানা ছেড়ে ধড়মড় করে উঠতে হয়—গৃহস্থালীর দিনের কাজ আরম্ভ করবার সূত্রপাতে। অবশ্য-কৃত্য নিত্যকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ছোটে ঘাটে জলের

কলসী নিয়ে, ছেলেরা নিয়ে চলে তাদের পোষা গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া যা' থাকে দু'-একটা। সকালেই উনুন ধরিয়ে হয় ত চা দিতে হয় চাপিয়ে, দুটো ভাতে ভাত বা আর কিছু; নয় ত পান্তা কি দু'টী মুড়ী খেয়ে পুরুষেরা চলে যায় নিজের কাজে। একেবারে কিছু না খেয়ে কি করে কাটবে ওদের সারাটা দিন—প্রথমে বনে, কাঠ কাটতে এবং সেখান থেকে তিন মাইল দূরে সহরে নিয়ে বিক্রী করবার চেষ্টায় ঘুরতে। সহজে যদি বিক্রী হয়, তবে ত কোন কথাই নাই, পয়সায় যেমন কুলায় চাল-ডাল এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক সওদা যথাসম্ভব সেরে ফিরে চলে বাড়ীর দিকে। বিক্রী যার হয় না, সে ঘোরে সহরের পথে পথে যতক্ষণ না তার পা ওঠে অবাধ্য হয়ে, সূর্য্য না পড়ে পশ্চিম গগনে ঢলে। শেষটায় বেচতে তাকে হয়ই—দাম যাই হোক্। নইলে ছেলেপিলে খাবেই বা কি, আর ফিরবেই বা কি করে মাথায় বয়ে অতবড় বোঝার ভার সারাদিনের পর ক্ষুধার্ত্ত ক্লান্ত দেহে। ফিরে গিয়ে হয় ত দেখবে মেয়েরা বসে আছে দিনের কাজ শেষ করে পথের দিকে তাকিয়ে, আর ছেলেগুলির চলছে তখনও দাপাদাপি।

এই তাদের সংসার, এত সামান্য তাদের অভাব। এমনি ভগবানের বিচিত্র লীলা যে, কেউ কুটোটি পর্য্যন্ত না নেড়ে দিব্যি চর্ব্ব্যচষ্য লেহ্যপেয় দিয়ে উদর পূর্ণ করছে, আর কেউ হয় ত সারাদিন খেটেও পারছে না একমুটো চালের সংস্থান করতে। আর কিছুই চায় না তারা, নদীতে জল আছে, গাছে পাতা আছে, কুমড়া আছে, লাউ আছে, শশা আছে, হয় ত আটদিন আগে যে নুন কেনা হয়েছিল, তারও খানিকটা এখনও আছে—আরও দিন দু'-তিন বোধ হয় তাতেই চলবে, এক ফোঁটা দুধ—তাও ঘরে হয়, সময় থাকলে মাছও দুটো ধরা যায়। কিন্তু তাও জোটে না, এই ত তাদের দুঃখ।

স্ত্রী পুরুষে ঝগড়া হয়, মান-অভিমান চলে। ক্ষুধার সময় ক্রোধের উদ্রেক হয় সহজেই, তাই কোনদিন দেয় লাগিয়ে ঘা কতক পরিবারের পিঠেই।

এমনি চলতে চলতে এল তাদের সেদিন—যেদিন বছর বছরই আসে বর্ষার প্রারম্ভে। যেদিন পাহাড়ে নদীটাতে ঢল আসে হু হু করে নেমে, ভেসে আসে অজস্র কাঁচা শুকনা ছোটবড় গাছ, কাঠ। জল নদীর বুক ছাপিয়ে উপচে ওঠে, তলিয়ে দেয় আশপাশের ছোট বড় গাঁগুলি দু'-একদিনের মত।

এদিনটা তাদের বড় দিন, বড় সুখের দিন। এদিন জমা কাঠ ধরে যে যত বেশী পুঁজি করে রাখতে পারবে, তার হবে তত বেশী সুবিধা, ততবেশী অর্থাগম। হয় ত বা তারই থেকে দু' পয়সা বাঁচিয়ে সে দিতে পারবে পরিবারকে একখানা রূপার গয়না বা ছেলেকে একখানা রঙিন দোলাই। এই দিনটার দিকে চেয়ে তারা মাসের পর মাস দেয় কাটিয়ে, আশা নিয়ে, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—যা' হয় ত হবে না পূর্ণ কোনদিনই। তবু আশায় থাকে।

ভোর হ'তে-না-হ'তেই ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ জমল এসে নদীর পারে খেয়াঘাটার সামনে—নিতান্ত অসমর্থ ছাড়া যার কেউ রইল না তাদের ঘরে। সমস্ত পাড়াটা হয়ে গেল স্তব্ধ এবং জনশূন্য।

আগের রাত্রি থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সকাল থেকেই সুরু হ'ল ঝড়ের মাতন, বৃষ্টির জোরও বাড়তে লাগল ক্রমে। তা'তে নূতনত্ব নেই কিছুই, এমনই হয় বরাবর।

দুর্য্যোগের দিনে মাঝি মাত্র একবারটি পারে যাবে—সরকারী 'ডাক্' পার না করলেই নয়। এপার থেকে ওপার এবং ওপার থেকে এপার—নইলে ঘাট হয়ে যাবে বেহাৎ। সকাল থেকেই পারার্থীরা এসে জমতে থাকে—সেই খেয়ার প্রত্যাশায় থাকে বসে। সন্ধানী মুড়কীওয়ালাটা চিঁড়ে-মুড়কী নিয়ে এসে উপস্থিত হয়—বিক্রীও হয় মন্দ নয়, দরও পায় বেশ।

নিষ্কর্ম্মা লোকগুলার কাজ থাকে না; কর্ম্মী যারা, তাদের অনেকে সেদিনের মত নিষ্কর্ম্মা। সবাই এসে জড়ো হয় ঘাটের পাশে উঁচু টিলাটার ওপর। কারও মাথায় থাকে ছাতা, কারও বা শুধু গামছাখানা ভাঁজ করা, আর

কেউ বা নিতান্তই নগ্নশির—তার চুল বেয়ে ঝরে পড়ে বৃষ্টির জল, মুখ বুক সব একাকার করে দিয়ে।

সেখান থেকে ভাটির দিকে দেখা যায় বাঁকের মাথায় অদূরে কাঠুরে-পল্লী, ক্ষেত-খামারে, নদীর চড়ায় জল থইথই, কাঠরেদের উঠানেও জল উঠি উঠি করছে। মাঝে মাঝে শোনা যায় গৃহবদ্ধ পালিত পশুদের দূরাগত অনতিস্পষ্ট করুণ প্রশ্ন—ঘরেই কি থাক্‌ব আজ আমরা বদ্ধ! কিন্তু আজ সময় নেই তাদের মালিকদের সেদিকে কান দেবার, আজ তাদের বড় দিন।

যেমনই দেখ্‌তে পায় আস্‌ছে ধর্‌বার মত একটা গাছ বা কাঠ ভেসে, অমনি বলিষ্ঠ সবল পুরুষের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর জলে—ধরবার আশায় যেতে থাকে স্রোতের অনুকূলে জোরে সাঁত্‌রে। ছুঁতে পার্‌লেই স্বত্ব জন্মে যায়। যে ছোঁয়, সে তাতে দড়ি বেঁধে ফেরে; অপরে ফেরে আগেই। ঝগড়া-ঝাটী হয় না, মারা-মারি ধরাধরি হয় না, সন্দেহ যদি কখনও হয়, মীমাংসা হয় তার সহজেই, আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় না। পুরুষেরা দড়িটা নিয়ে সাঁত্‌রে ফেরে পারের দিকে; স্রোতে তাদের ঠেলে ভাটির দিকে। পারের লোকগুলি থাকে তার সঙ্গে দৌড়ুতে। দড়িটা পারে পৌঁছে দিয়েই তারা খালাস। তারা করে বিশ্রাম, অপেক্ষা করে আবার নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার আশায়। ততক্ষণ অন্যেরা সেগুলি পারে টেনে তুলে স্তূপীকৃত করে। ক্ষুধার সময় এক ফাঁকে দু'টি কিছু মুখেও দিয়ে নেয়।

এম্‌নি চলেছে সকাল থেকে—যেমন চলেছে বছরের পর পর বছর খেয়াঘাটের জমায়েৎ পারার্থীদের সাম্‌নে কাঠুরে-পাড়ার অধিবাসীদের জীবন-যুদ্ধের এক পর্ব্ব। ভেসে যায় পোকা-মাকড়, সাপ-খোপ নদীর স্রোতের সঙ্গে তীর বেগে—যেমন ভেসে যায় গাছ ও কাঠ। বোধ হয় ভেসে আস্‌ছে একটা বেড়াল—শোনা যাচ্ছে তার অতি করুণ মিউমিউ শব্দ। ক্রমে অস্পষ্ট স্পষ্টতর। বোধ হয় কেমন করে জলে পড়ে গেছে। অই দেখা যাচ্ছে, একটুক্‌রো কাঠ আঁকড়ে, পারের থেকে দূরেও নয় বেশী। একদল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে আন্‌ল।

কয়েকজন পারার্থী পারের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'ভাঙন ধরেছে!'

সবাই উঠ্‌ল এক সঙ্গে চম্‌কে। ছুট্‌ল প্রাণের ভয়ে—আর ভাঙ্গন-ধরা শিথিল মূল প্রকাণ্ড চাপড়াটা হঠাৎ এতগুলো মানুষের ছুটে চলার নাড়া সাম্‌লাতে অসমর্থ হয়ে লোকগুলো পালাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ধ্বসে পড়লো।

'নদী যেন আজ রাক্ষসী হয়েছে। খেয়েছিল এখনই এতগুলি লোককে'—তারা বলাবলি করছিল।

দুপুরের কাছাকাছি বৃষ্টি এল ধরে, থাম্‌ল বাতাসও, কিন্তু নদীর জল কমবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 'ডাক্‌' এসে ততক্ষণ পৌঁচেছে। লোকগুলি উঠেছে খেয়াতে। গুণদড়ি বেঁধে খেয়া নৌকো টেনে নিয়ে চলেছে উজানের দিকে—অন্ততঃ এক মাইল উজান ঠেলে না গেলে ওপারের ঘাটে যাবে না নৌকো লাগানো। সাঁতারু কাঠুরেরাও চলেছে সে নৌকোয় দেখ্‌তে যদি পায় সংগ্রহ করবার মত কাঠ, তা' হ'লেই তারা লাফিয়ে পড়বে জলে। কাঠুরেদের দৃষ্টি উজানের দিকে নদীর জলে, পারার্থীদেরও অনেকের।

একটা কাঠ আস্‌ছে ভেসে।

বেশ বড়। অই যাচ্ছে দেখা—অই পড়লো বলে এসে নৌকোর সাম্‌নে। শাল কাঠই হবে হয় ত, দামী কাঠ। ডাল নেই, পাতা নেই, তীরের মত সোজা, জলের ওপর ভেসেও নেই বেশী।

চল্‌তে লাগ্‌ল জল্পনা-কল্পনা—হয়ে গেল গাছটার দামও আন্দাজ।

চোখের পলক ফেল্‌তে-না-ফেল্‌তেই গাছটা এসে পড়লো নৌকোর সাম্‌নে। পড়লো সব ক'জন কাঠুরে এক-যোগে লাফিয়ে। পারার্থীদের এবং কাঠুরেদের আত্মীয়-স্বজনের সমবেত দৃষ্টি পার থেকে হয়ে রইল নৌকো এবং ওদের উপর নিবদ্ধ। দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে স্রোতের টানে গাছটা গেল প্রায় পাঁচশ হাত ভাটির দিকে ভেসে। বোধ হয় গাছ এবং কাঠুরেদের মধ্যের ব্যবধান এখন আর দশ হাতও নয়—কিন্তু ভেসে যাচ্ছে তারা তীরের বেগে। তিনজন কাঠুরে গেছে এলিয়ে—তারা কাঠটাকে অই ধর্‌ল বলে।

হঠাৎ গাছটা উঠ্‌ল নড়ে, খাড়া হয়ে উঠ্‌ল পিঠে এক সার বর্ষাফলকের মত কাঁটা, তারপর সেকেণ্ডখানেকের মধ্যে একটা ভীষণ তোলপাড়! পারার্থীরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'কুমীর, কুমীর!'

শোনা গেল দূরাগত বুকফাটা কান্নার অস্পষ্ট একটা সম্মেলিত আর্ত্তধ্বনি—আর দেখা গেল, যে দু'জন কাঠুরে একটু পিছনে ছিল, তাদের তীরে পৌঁছাবার একটা প্রাণপণ আগ্রহ।

কতটুকু সময়ই বা, কিন্তু তারই মাঝে নদীবক্ষ আবার শান্তভাব ধারণ করেছে—যেন কিছুই ঘটে নি।

বিস্মিত স্তব্ধ করুণার্দ্র পারার্থীদের নিয়ে খেয়া নৌকো চল্‌তে লাগ্‌লো পারের দিকে।

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী

ছায়া ও কায়ালোক

সঞ্জয়

[চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর প্রবলভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। গল্প-লহরীর পাঠক-পাঠিকার সুবিধা-কল্পে এই স্তম্ভের সৃষ্টি করা হইল। দেশী ও বিলাতী সমস্ত নূতন ছবির এবং থিয়েটারের নূতন পুস্তকের আলোচনা বিশদভাবে ইহাতে দিবার চেষ্টা করা হইবে। সুপরিচিত 'সঞ্জয়' এই স্তম্ভ নিয়মিত লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গঃ লঃ সঃ]

থিয়েটার বায়স্কোপের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই একটা ভয় হয় যে, অভিভাবকরা মনে করেন, আমাদের এই লেখাই না কি পতঙ্গের মতো ছেলে-পিলেকে আকর্ষণ করে। এই কথার মূলে কতোখানি সত্য, তার বিচার তথাকথিত ছেলে-পিলে ছাড়া আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তার আরো একটা প্রমাণ কোলকাতায় 'মেট্রো-সিনেমা' খোলা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই, কাগজে ছবির কোন অভিমত বেরোবার আগেই যে রকম দর্শক সমাগম হয়েছে এবং হচ্ছে, তখন আর এ বিষয়ে আমাদের কিছু প্রতিবাদ করবার প্রয়োজন থাকে না।

*

'মেট্রো-সিনেমা' খাস য়্যামেরিকান্ কোম্পানী। তাঁরা টাকার জোরে কারুরই তোয়াক্কা রাখেন না। শোনা যাচ্ছে ওখানকার প্রতি জিনিষটী বিদেশী; দেশী কোন জিনিষেরই তাঁরা সংস্পর্শ রাখ্‌বেন না। এমন কি, অন্যান্য থিয়েটার বায়োস্কোপের মতো কোন 'ট্রেড্-শো'-ও করবেন না। তাঁদের ছবির নাকি ও-সবের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দশ দিন আগে পর্য্যন্ত যখন 'গ্লোবে'র তত্ত্বাবধানে ছিল, তখন অবধি ও-সবের প্রয়োজন ছিল। দেশটা তবু য়্যামেরিকা নয়—কোলকাতা। কিমাশ্চর্য্যম অতঃপরম্!

*

কবির কথাই মনে পড়েঃ 'শীতের হাওয়ায় বসন্ত-ফুল ফোটে যদি মনের বনে!'—কোলকাতায় দেখছি বড়-দিনের আমেজ লেগে সমস্ত থিয়েটার বায়স্কোপ মেতে উঠেছে। যেন বড়দিনের পরবটা খ্রীষ্টানদের ছেড়ে হিন্দু-দেরই একচেটে হয়ে উঠ্‌বে! প্রথমতঃ থিয়েটারের কথাই ধরা যাক্—শিশিরবাবুর 'নাট্য-মন্দিরে' তাঁর 'রীতিমত নাটক', 'মিনার্ভায়' 'শিবার্জ্জুন', 'নাট্য-নিকেতনে' 'নরদেবতা', 'রঙ-মহলে' 'চরিত্রহীন' এবং 'রূপ-মহলে' 'আবুলহাসান'—প্রত্যেক জায়গাতেই নতুন নাটক খোলা হয়েছে ও হচ্ছে। বায়স্কোপ প্রতিষ্ঠানগুলির ত কথাই নেই, তাঁরা নিত্য নতুন ছবি নিয়েই মেতে আছেন—তার সঙ্গে নতুন নতুন বাড়ীর পরিকল্পনা-ও চলেছে। আমরা সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, এই প্রার্থনা করি।

*

'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম' কোম্পানীর মিঃ চামেরিয়া এবং মিঃ বি, এল্, খেম্‌কা মিলিতভাবে 'প্যারাডাইস্' সিনেমা প্রতিষ্ঠা করছেন। দু'জনারই লক্ষ্য না কি 'মেট্রো'কে-ও উঁচিয়ে যাবার। তাঁদের চেষ্টাও সফল হোক্।

*

'বিংশ-শতাব্দী' চিত্রের বিখ্যাত পরিচালক ড্যারিল জানুক্ য়্যাবিসিনিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে 'জিব্রাল্টার' নামে একখানি ছবি তুলছেন, খবর পাওয়া গেছে।

শিশু অভিনেত্রী শার্লি টেম্পলকে 'ক্যাপ্টেন জ্যানুয়ারী' নামক ছবিতে শীঘ্রই দেখা যাবে। একজন আলোকস্তম্ভ-রক্ষী একখানি বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে একটি মেয়েকে রক্ষা করার পরের ঘটনা নিয়েই বুঝি এই বইখানির গল্প লেখা হয়েছে।

*

নতুন বইগুলি দেখে, আসছে সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। আজ এই পর্য্যন্ত।

সঞ্জয়

ঋণ-শোধ

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী, এম-এ

বড় রাস্তার ধারে সরু গলি, ভিতরে পশ্চিম মুখে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার মোড় হইতে গলির শেষ সীমা দেখা যায় না। দু'ধারে খানকতক পাকাবাড়ী তারপর খানকতক মাঠকোঠা, তারপরে খোলার ঘরের বস্তি। বস্তিতে বাস করে হরেক রকমের মানুষ। মেয়েরা সকালে উঠিয়া সরকারী কলের কাছে জটলা করে, চেঁচামেচি করে, পুরুষেরা উঠিয়া কেহ যায় চটকলে, কেহ যায় পাটের গুদামে, কেহ বড় রাস্তায় পান-বিড়ির দোকানে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া খায়-দায়, নেশা করে, হল্লা করিয়া গান-বাজনা করে, কোনদিন বা মেয়ে-পুরুষে ঝগড়া, গালি-গালাজ করে, এ ওকে পিটাইয়া দেয়—আবার দু'দণ্ডেই ভাব হইয়া যায়। এমনই জীবনযাত্রা কতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার ঠিক নাই।

গলির মোড়ে একটা গ্যাসপোষ্ট, তাহার পরে দু'ধারে যে কয়েকখানি পাকাবাড়ী—তাহার বাসিন্দারা সন্ধ্যাবেলা সাজগোজ করিয়া শীর্ণ মুখে রঙ মাখিয়া নিকেলের গহনাগুলিকে 'ব্রাসো' দিয়া মাজিয়া ঘসিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়ায়, কেহ বা আবার একটা বিড়িও ধরাইয়া লয়। কাহারও বা দু'একঘণ্টার পরই দাঁড়াইবার কাজ মিটিয়া যায়, কাহাকেও বা অনেক রাত্রি অবধি অপেক্ষা করিতে হয়, অনেকে আবার ক্ষুণ্ণমনে বকিতে বকিতে একাই ঘরে ফিরে।

প্রথম শীতটা পড়িয়াছে, সেদিন সকাল হইতে সারাদিন টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, পথ কাদায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে; অসময়ের বর্ষণে সমস্ত প্রকৃতি যেন একটা দারুণ অস্বাচ্ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে। সন্ধ্যার দিকে একটু ধরণ হইয়াছিল, রাস্তায় পথিকেরা চলিতেছিল সভয়ে, কখন কোন্ মোটরের তীব্রগতি কাদা ছিটাইয়া জামা কাপড় নষ্ট করিয়া দেয়। সন্ধ্যার একটু পরেই মালতী প্রসাধন সারিয়া গলির মোড়ে গ্যাসপোষ্টটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তায় জনস্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে—গাড়ী ঘোড়া মোটর বাসের যাতায়াতের বিরাম নাই; ফুটপাতে চলিতে চলিতে কেহ কেহ মালতী ও তাহার সঙ্গিনীদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাইতেছে। ও ফুটপাতে একটা রেষ্টুরেণ্ট—নানান ধরণের লোক যাইতেছে আসিতেছে, বসিয়া আড্ডা জমাইতেছে।

এমন করিয়া রাত্রি বাড়িতে লাগিল—মালতী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমে ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতেছিল—না, আজ আর তাহার ভাগ্যে কিছুই রোজগার হইল না। মধ্যে মধ্যে একটা দমকা জলো বাতাস আসিয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছিল।

রাত্রি প্রায় বারটা বাজিতে চলিল—দোকান পশারী ঘর বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিল, তাহার সঙ্গিনীরাও যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল। মালতী একা দাঁড়াইয়া রহিল। এক একবার তাহার মনে হইল ঘরে ফিরে, কিন্তু তখনই মনে পড়িল হাত একেবারে কপর্দ্দক শূন্য, আজ কিছু না হইলে কাল উপবাস দিতে হইবে। কিন্তু পথের ও চেহারা দেখিয়া আজ যে কিছু হইবে বলিয়া তাহার মনে হইল না—শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহার অত্যন্ত কষ্টও হইতেছিল।

আরও দশ-পনের মিনিট অপেক্ষা করিয়া অনাগত ভবিষ্যতের উপর কালিকার ভার দিয়া সে গৃহে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দেখিল দূরে একটা লোক টলিতে টলিতে আসিতেছে;—মালতীর মনে একটু আশা হইল। ভাবিল,—ও যদি সব মদে উড়াইয়া না থাকে, তাহা হইলে কালিকার খরচের একটা উপায় হইবে।

লোকটী একটু অগ্রসর হইতেই মালতী গ্যাসপোষ্টের তলা ছাড়িয়া একটু রাস্তায় নামিয়া আসিল—তাহার পর হাতের চুড়িগুলি একটু নাড়াচাড়া করিয়া, একটু কাশিয়া, পথিক-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। লোকটী তাহার প্রায় কাছে আসিয়াই পড়িয়াছে এবং বোধ হয় ছাড়াইয়া যাইতেও পারে, মালতী মরিয়া হইয়া একটু আগাইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"আসুন না।"

লোকটী তাহার কথা শুনিতে পাইল বোধ হয়; কারণ, থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল ও টলিতে টলিতে আসিয়া পড়িল একেবারে মালতীর গায়ের উপর। মালতী একটু সরিয়া আসিয়া গ্যাসপোষ্টের কাছে দাঁড়াইল—লোকটী পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ তিনদিন কিছু খাই নি, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পাচ্ছি না।"

মালতী অগ্রসর হইয়া লোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল একটী সতের-আঠার বৎসরের ছেলে, মুখখানি অতি সুকুমার, দারিদ্র্য ও উপবাসের চিহ্ন তাহাতে যেন ফুটিয়া রহিয়াছে, গায়ে একটা মোটা কাল ছেঁড়া অলেষ্টার—দূর হইতে তাই তাহাকে অত বড় দেখাইতেছিল। ছেলেটী মালতীর মুখের দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া আবার বলিল—"যদি কিছু দেন দয়া করে, আর ক্ষুধা সহ্য করতে পারছি না।" এই বলিয়া ছেলেটী সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

মালতী এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল—তাড়াতাড়ি সে ছেলেটীর কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিল—"এস আমার সঙ্গে।"

দোতালায় নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সে ছেলেটিকে বসিতে বলিল, তারপর তাহার পাশের ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল, সেখানে তখন নারকীয় কাণ্ডের অভিনয় হইতে ছিল, মালতী দরজায় একটু শব্দ করিয়া ডাকিল—"কুসুম।"

দুই একবার ডাকে সাড়া মিলিল না, তখন সে একটু উচ্চ কণ্ঠেই ডাকিল—"কুসুম।"

—"কে ?" বলিয়া একটী কিশোরী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—"কে মালতী দিদি ? কি মনে করে ? আজ যে একা—ঘরে কেউ নেই ?"

মালতী বলিল—"না।"

কুসুম বলিল—"তা' ডাকৃছ কেন ? কি দরকার ?"

মালতী নিম্নকণ্ঠে বলিল—"একটা টাকা ধার দে না ভাই—বড় দরকার।"

বিস্মিত কুসুম বলিল—"টাকা! এত রাতে কি হবে ?"

মালতী বলিল—"অত খোঁজ দিতে পারি না, দিস ত দে—শীঘ্র শোধ করে দেব।"

কুসুম ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটা টাকা আনিয়া মালতীর হাতে দিতেই সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, কুসুম অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার পর নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

মালতী রাস্তায় নামিয়া সম্মুখের রেষ্টুরেণ্ট হইতে কিছু খাবার ও এক পোয়া গরম দুধ কিনিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ছেলেটী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে, চোখের কোণ দিয়া তাহার জল গড়াইতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই মালতী একবার বলিল—"আহা!"

একটী এনামেলের ডিসে খাবারগুলি সাজাইয়া দিয়া দুধটা একটা কাঁচের গেলাসে ঢালিয়া সে ছেলেটীর মাথায় নাড়া দিয়া ডাকিল—"শুনছ, খেয়ে নাও।"

ছেলেটীর বোধ হয় তন্দ্রা আসিয়াছিল, চম্‌কাইয়া উঠিয়া চাহিতেই দেখিল সম্মুখে সাজান খাদ্য। সে একবার কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে মালতীর দিকে তাকাইয়া নিশ্চুপে সব খাবার ও দুধটা খাইয়া ফেলিল। মালতী একদৃষ্টিতে তাহার খাওয়া দেখিতেছিল। ছেলেটী খাওয়া শেষ করিয়া জলপান করিয়া একটী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল—"আঃ!"

মালতীর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খাওয়ার পর ছেলেটী সুস্থ হইয়া বলিল—"আপনি আজ

আমাকে বাঁচালেন, তিন দিন পেটে কিছু ছিল না, শুধু কলের জল খেয়েই কাটিয়েছি, আজ ত মনে করেছিলাম রাস্তাতেই মরে পড়ে থাক্‌ব—তা' আর হোল না—আপনি আমায় সে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করলেন—"বলিয়া ছেলেটী একটু ম্লান হাসি হাসিল।

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে মালতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল—সে অন্য দিকে তাকাইয়া চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল—"এখন ত সুস্থ হয়েছ, তা' হ'লে বাড়ী যাও—যেতে পারবে ত? থাক কোথায়?"

ছেলেটী হাসিয়া বলিল—"রাস্তায়।"

মালতী সব বুঝিল, বুঝিয়া বলিল—"তা' হ'লে এখন কি করবে?"

ছেলেটী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ওই ফুটপাথে কোন জায়গায় শুয়ে থাক্‌বো 'খন।"

চম্‌কাইয়া উঠিয়া মালতী বলিল—"এত শীতে ফুটপাতে শুয়ে থাক্‌বে? মারা যাবে যে?"

ছেলেটী একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"পনের দিন ত এইভাবেই কাটছে, মারা ত এখনও যাই নি—আর তাই যদি হয়, তার আর উপায় কি? ঘর যার নেই, পথই যে তার সম্বল।" এই বলিয়া ছেলেটি দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

মালতী দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, তারপর বলিল—"আচ্ছা, দাঁড়াও।"

ছেলেটী ফিরিয়া দাঁড়াইতে মালতী নিজের বিছানার দিকে তাকাইল, তারপর ছেলেটীর কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইয়া দিল—তাহার পর আল্‌না হইতে তাহার একখানা ধোয়া কাপড় আনিয়া দিয়া বলিল—"এইটা পরে শুয়ে পড়।"

ছেলেটী বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"সে কি! আপনি কোথায় শোবেন?"

—"সে হবে 'খন, তুমি শুয়ে পড় ত দেখি?"

তিনদিনের পর খাদ্য পেটে পড়ায়—ছেলেটীর চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল, সে আর কথা না বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল—মালতী পরম যত্নে একান্ত মমতার সহিত লেপটী তাহার গায়ে ঢাকিয়া দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। মালতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া নিদ্রিত ছেলেটীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; পাশের ঘরে ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল—মালতীর চেতনা ফিরিয়া আসিল শুইতে হইবে, সে তাহার বিছানার দিকে চাহিল, সেখানে যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু লেপ যে একটা? খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে শয্যার একপাশে শুইয়া পড়িল ও লেপটীর একপ্রান্ত টানিয়া গায়ে দিল।

দুই

পরদিন প্রভাতে ছেলেটীর ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই মালতী উঠিয়া পড়িল; হাত মুখ ধুইয়া কাপড় কাচিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল ছেলেটী উঠিয়া নিজের কাপড় জামা পরিতেছে; মালতীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বলিল—"এবার আমি যাই, কাল রাত্রে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।"

মালতী বিশেষ কিছু বলিল না, ছেলেটী দরজা পার হইয়া যাইতেই মালতী ডাকিয়া বলিল—"তা কোথায় যাচ্ছ এখন?"

ছেলেটী বলিল—"দেখি, যদি কোথায় কোন কাজের সুবিধা করতে পারি, ক্ষুধা ত আছে?"

মালতী হাসিয়া বলিল—"তা' আছে বৈকি? এত সকালেই সেটা পেয়েছে না কি?"

ছেলেটীও একটু হাসিয়া বলিল—"না, তা' না পেলেও পাবে ত এক সময়।"

মালতী বলিল—"যখন পাবে, তখন দেখা যাবে 'খন, এখন বসো দিকি একটু—"

ছেলেটী ফিরিয়া আসিয়া মালতীর কাছে দাঁড়াইল—পূর্ণযৌবনা মালতীর পাশে রোগা ছেলেটীকে নিতান্তই ছোট দেখাইতেছিল। তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মালতী বলিল—"দাঁড়িয়ে রইলে যে, বসো না। এই

দেখো, কি ভুলো মন, একটা রাত্রি বাস করলে, তবুও নামটী জানা হ'ল না।" তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"তোমার নাম কি ভাই ?"

ছেলেটী অনেকদিন এমন মমতাপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে নাই, সে বিস্মিত দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমার নাম অরুণ।"

—"বা, বেশ নামটী ত! তা' অরুণ, তোমার কি কেউ নেই ?"

—"না।"

—"তুমি এখানে এলে কি করে—এ সহরেই কি তুমি বরাবর আছ ?"

—"না, মাত্র তিনমাস হ'ল এসেছি।"

—"তার আগে কোথায় ছিলে ?"

অরুণ দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"আচ্ছা, সব বলছি, শুনুন।"

অরুণ বলিতে লাগিল—

—"বাস আমাদের পাড়াগাঁয়ে। ছোটবেলায় আমার বাপ মা মারা যান, দাদামশাই আমায় মানুষ করেন; বাপ মা মরা ছেলে বলে দাদামশাই একটু বেশীই আদর দিতেন, তারই ফলে ছেলেবেলায় লেখাপড়া ভাল করে শিখি নি। দাদামশাই ছিলেন একজন শিল্পী, তিনি খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন, ছোটবেলায় তাঁর সাহায্যে এসে ওদিকে আমারও বেশ একটু ঝোঁক গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন খুব ঠাণ্ডা লাগায় অসুস্থ হ'য়ে দাদামশাই শয্যা নিলেন—শয্যা ছেড়ে তিনি আর উঠলেন না। সে আজ প্রায় বছরখানেকের কথা। মরবার আগের দিন আমায় ডেকে বল্লেন—'অরুণ, তোর জন্যে ত কিছু সম্বল রেখে যেতে পারলাম না দাদা—আমার অবর্ত্তমানে তোর বড় কষ্ট হবে যে রে!'

—"তাঁর দু'চক্ষু দিয়ে হুহু করে জল ঝরতে লাগ্‌ল, আমারও চোখ শুক্‌নো ছিল না। আমার আবাল্যের সহচর একমাত্র আশ্রয়স্থল আজ আমায় ছেড়ে যাচ্ছেন। আমার মনে তখন কি হচ্ছে—তা ত' বুঝতেই পাচ্ছেন। নিজের বেদনা ঢেকে রেখে তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম—'তুমি ভেব না দাদু, পুরুষ আমি, আমার উপায় ঠিক করে নেব।'

—"দাদু যেন একটু আশ্বস্ত হলেন, তারপর বল্লেন—'দেখো, সহরে আমার একজন বন্ধু আছেন, তিনি একজন নামজাদা চিত্রকর। আমার বাক্সে তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখে রেখেছি, আমার মৃত্যুর পর সেখানা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি তোমার একটা-না-একটা ব্যবস্থা করে দেবেন—তাই যেয়ো যেন।'

—"পরের দিন ভোরবেলা তাঁর মৃত্যু হোল। তাঁর যা' কিছু সামান্য পুঁজি ছিল, তাই দিয়ে আমার ছ'মাস কোনরকমে চলে গেল—তারপর হঠাৎ একদিন সেই চিঠিখানার কথা মনে পড়ে গেল। দেশের বাড়ী ঘর দোর বেচে হাতে কিছু টাকা নিয়ে মাস তিনেক হ'ল এই সহরে এলাম—ঠিকানা খুঁজে দাদামশাইয়ের বন্ধুর বাড়ী গেলাম—গিয়ে শুন্‌লাম, মাসখানেক আগে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে।

—"চক্ষে অন্ধকার দেখলাম। অপরিচিত স্থান—কোথায় যাই, কি করি ভেবে পেলাম না। হাতে যা' টাকা ছিল, তাই দিয়ে একটী হোটেলে একখানা ঘরভাড়া করে থাক্‌তে লাগলাম আর কোন চাকরীর চেষ্টা করতে লাগলাম। হাতে যা' ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে গেল, হোটেলের ভাড়া বাকী পড়ল, ম্যানেজার আর থাক্‌তে দিলে না, বার করে দিলে। তারপর থেকেই পথে পথে ঘুরছি—কোনদিন খাদ্য জুট্‌ছে, কোনদিন জুট্‌ছে না, কলের জল খেয়েই কাটাচ্ছি—আমার কালকের অবস্থা ত দেখেছেন ?"—বলিয়া অরুণ একটু মৃদু হাসিল।

মালতী এতক্ষণ তার কাহিনী শুনিতেছিল, তাহার চক্ষু দু'টী জলে ভরিয়া আসিয়াছে, অরুণ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। অপরিচিতা নারীর করুণা দেখিয়া তাহারও চোখে জল আসিল। মালতী বলিল—"যতদিন কিছু না কাজের সন্ধান করতে পার এখানেই থাক, বুঝলে ত ?"

মালতী উঠিয়া কক্ষান্তরে গেল। অরুণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সারাদিন অরুণের এক প্রকারে কাটিল—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল—মালতী বেশভূষা করিয়া কোথায় চলিয়াছে। অরুণকে দেখিয়া বলিল—"এই যে এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে—তোমর কথাই ভাবছিলাম—আমায় এখুনি বেরতে হবে। তুমি ভাই খুব পয়মন্ত, অনেকদিন এতটা রোজগার হয় নি; এই নাও ছুটী টাকা, যা' ভাল লাগে কিনে খেও আর এই ঘরে শুয়ে থেকো। আমার আস্‌তে হয় ত অনেক রাত হবে—কোন জিনিষ নিয়ে সরে পড়ো না যেন।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া সস্নেহে অরুণের চিবুকটা নাড়িয়া দিয়া ঘূর্ণি হাওয়ার মত মালতী বাহির হইয়া গেল। অরুণ অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাস্তায় মোটরের শব্দ শুনিয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল, একখানি বৃহৎ মোটরে মালতী ও আরও চার পাঁচ জন লোক হাসিতে হাসিতে কোথায় চলিয়াছে। অরুণ জানালা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু রাত্রি বাড়িলে অরুণ কিছু খাবার আনিয়া খাইয়া লইল, তাহার পর মালতীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে থাকিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানে না। মালতী ও তাহার সঙ্গীরা তখন পুলিশের হাজতে।

পরদিন সকাল বেলা শয্যাত্যাগ করিয়া অরুণ দেখিল, মালতী আসে নাই। সে বিষম ভাবনায় পড়িল। পরের ঘর, অপরিচিত সে—সে কি করিবে? এমন সময় বাড়ী-ওয়ালী আসিয়া তাহাকে মুক্তি দিল। সে মালতীর ঘরে তালা চাবি বন্ধ করিয়া অরুণকে চলিয়া যাইতে বলিল। অরুণ ধীরে ধীরে আবার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল—সম্বল মালতীর দেওয়া টাকা দুইটীর কিছু অংশ।

তিন

পনের বৎসরের পরের কথা।

প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট অরুণ গুপ্ত তাহার সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে বসিয়াছিল—বেলা প্রায় সাতটা, চাকর আসিয়া টেবিলের উপর এক পেয়ালা গরম চা ও সেদিনের কাগজখানা রাখিয়া গেল; মিঃ গুপ্ত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া চক্ষের সম্মুখে কাগজখানি মেলিয়া ধরিল। পাশে ছোট টিপয়টার উপরে একটা পিতলের ফুলদানিতে এক জোড়া তাজা ফুল মালি কখন রাখিয়া গিয়াছে; একটী সুমিষ্ট স্নিগ্ধ গন্ধে ঘরটী ভরিয়া উঠিয়াছে। অদূরে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর একটী চিনে মাটীর সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি; তারই পাশে একটী ধূপদানিতে দু'টী সুগন্ধি ধূপ পুড়িয়া পুড়িয়া গন্ধ বিলাইতেছে। দেওয়ালে অরুণের অঙ্কিত নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ছবি—কোনটী মা ও ছেলের, কোনটী প্রণয়ী প্রণয়িনীর, কোনটী বা একটা ঝড়ের দৃশ্যে ঝড়ের মাঝে পাখা মেলিয়া একটী পাখী উড়িয়া যাইতেছে—নিপুণ শিল্পীর রেখার টানে টানে পাখীটী কি গতিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! দেওয়ালের ধারে বড় বড় দুটী আলমারি; তাহাতে নানাপ্রকার বই। ঘরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড টেবিল; তাহার চারিধারে সাজান কয়েকখানা গদি-আঁটা চেয়ার। তাহারই একটীতে বসিয়া মিঃ গুপ্ত চা পান করিতেছিল এবং সংবাদ-পত্র পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে এক স্থানে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মনযোগের সহিত সে স্থানটী পড়িতে লাগিল—"অভিনেত্রীর শোচনীয় পরিণাম। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, সহরের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মালতী বাঈয়ের সহসা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। গত একমাস হইল মালতীর গৃহে চোর ঢুকিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যায়, পুলিশে সংবাদ আসে, কিন্তু পুলিশ আজ পর্য্যন্ত চুরির কোন কিনারা করিতে পারে নাই। ডাক্তার অভিমত দিয়াছেন—টাকার কথা ভাবিতে ভাবিতে না কি তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে—চিকিৎসার্থ তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।"

সংবাদটির নীচে অভিনেত্রীর একটী হাফ্‌টোন ফটো দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ গুপ্ত ভাল করিয়া ফটোটী দেখিতে লাগিল। তাহার পর কাগজটী টেবিলের উপর রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিল, তাহার পর সোফারকে মোটর আনিতে হুকুম করিল।

হাসপাতালে গিয়া অরুণ ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার নিকট শুনিল, রোগিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। হঠাৎ মানসিক আঘাতে ঐরূপ হইয়াছিল—সারিতে কিছু দিন লাগিবে; তবে লাগিলেও একেবারে সুস্থ হইবে না, যত্ন করিয়া সেবাশুশ্রূষা করিলে রোগ আর বাড়িতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়।

অরুণ, ডাক্তারের কথা শুনিয়া বলিল—"আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, আমি যদি এঁকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাই? তা'তে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি?"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপত্তি? না, তেমন কিছু আপত্তি নেই, তবে রোগ যে একেবারে সারবে, তা' বলতে পারি না। তা' ছাড়া, এ রকম রোগীকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে নিজেরাই যে বেশী বিব্রত হয়ে পড়বেন।"

অরুণ বলিল—"তা' হোক্, আপনাদের আপত্তি নেই ত?"

ডাক্তার বলিলেন—"না।" তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, রোগিনী কি আপনার কেউ হন্?"

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে ধীরকণ্ঠে বলিল—"উনি আমার মা।"

মালতীকে লইয়া অরুণ বাড়ী আসিল এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিল। অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। মালতীর মাথা এখনও বেশ সারে নাই; তবে অরুণের বাড়ীতে সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—তাহার মনে লাগিয়া আছে অরুণ তাহার কোন পূর্ব্ব প্রণয়ী। *

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

* মোপাসার ভাবানুসরণে

নানাকথা

সাহিত্য-রসিক

অনেক রকম চুরির খবর পাওয়া যায়—কিন্তু মা সরস্বতীর জন্য চুরি বোধ হয় এই প্রথম শোনা গেল। সম্প্রতি পুলিশের কৃপায় খবর পাওয়া গিয়'ছে, চব্বিশ পরগণার বরাহ-নগরের পালপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে ইংরাজি ও বাংলা মিলাইয়া প্রায় একশত ত্রিশখানি বই চুরি হইয়াছে। ঘরে অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিষ-পত্র থাকা সত্ত্বেও চোর মহাপ্রভু সে দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই।

জাগ্রত দেবতা

সাহীবাগের নিকটস্থ একটি হনুমান মন্দিরে কয়েকটী চোর চুরি করিতে আসিয়াছিল—কিন্তু মন্দির চত্বরে প্রবেশ করিতে না করিতেই একজন দেবতার কোপে পড়িয়া সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্য চোরেরা শক্ত ঠাঁহ দেখিয়া দে চম্পট। হনুমানজী যে অমর এ কথা আর একবার ভাল করিয়া প্রমাণ হইয়া গেল।

বিজ্ঞান-প্রিয়।

বিজ্ঞানের যুগ পড়িয়াছে। কাজে কাজেই সকল বিষয়েই বিজ্ঞজনের দৃষ্টি এদিকে পড়িবে বই কি। সম্প্রতি একটী খবর পাওয়া গিয়াছে—বিলাতে অবশ্য কিছুই নয়, কিন্তু এদেশে—অভিনব বলিতে হইবে। গত বিশ-এ নভেম্বর চন্দননগরের একটী বাড়ী হইতে না বলিয়া জিনিষ-পত্র লইতে আসিয়া লৌহগরাদে ও তালা অক্সি-এসিটেলিন গ্যাসের আগুনে গলাইয়া—চোর মহাশয়রা সচ্ছন্দে গৃহ-প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মালপত্র লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

যৌতুক-কৌতুক।

এখানে বিবাহে যৌতুক ফাঁকি দিলে বরকে সম্প্রদান আসন হইতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়—বিবাহ হইয়া গেলে অনেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, বড় জোর তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রতিশোধ লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু নিউগিনি সহরের এক ব্যাচারী 'পাপুয়ান' বর নববধূর জন্য যথারীতি যৌতুক দেয় নাই বলিয়া সেখানকার মিমিকা গ্রামের তিন জন 'পাপুয়ান' (আফ্রিকাবাসী এক আদিম জাতি) তাহাকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে।

ছায়ার মায়া

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পাঁচ নম্বর ডাউন ট্রেণখানা চলিয়া গেল। মহাদেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

রৌদ্র নাই, বর্ষা বৃষ্টি নাই, গাড়ীর শব্দ শুনিলেই ফ্লাগ্ লইয়া বাহির হইতে হইবে—অম্নি করিয়া হাত উঁচু করিয়া নাড়াইতে হইবে—এর আর বিরাম নাই।

এগার বছর ধরিয়া সে এই গেট্ম্যানের কাজ করিতেছে। সেই একটানা একঘেয়ে কাজ—খাটের কোণ হইতে সযত্নে গোল করিয়া পাকান ফ্লাগ্খানি বাহির করিয়া নাড়ান, গেট্ খোলা, বন্ধ করা, কাজ সারিয়া সামান্য খাওয়া, ছারপোকায় ভর্ত্তি পানের পিচ ও চূণের দাগওয়ালা ছোট্ট একটা ভাঙ্গা খাটিয়ায় আরও ছোট্ট একটা কুঠুরীতে রাত কাটান, নিতান্ত বৈচিত্র্যবিহীন—সামান্য কুলির দৈনন্দিন মামুলী জীবনে অস্বাভাবিক নহে।

বুকিং অফিসের সাম্নে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বোর্ডে বড় বড় হরপে লেখা—ঝুম্‌ঝুম্‌পুর।

ষ্টেশন হইতে পোয়াটাক রাস্তা দূরে মহাদেবের ছোট কুঠুরী। সেই কোন মান্ধাতার আমলে একবার চুণকাম করা হইয়াছিল। বর্ষায়, রৌদ্রে এখন যে তাহার কোন রং হইয়াছে তাহার নামোল্লেখ করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ষ্টেশন হইতে দূরে থাকিলেও মহাদেবকে খাতির করিত সকলেই। আপদে বিপদে তাহার সাহায্য পায় নাই এমন লোক ষ্টেশনে খুব কমই আছে। কুলি হইতে বাবুরা পর্য্যন্ত তাহার সেবা পাইয়া থাকে।

মহাদেবের কুঠুরীর পাশেই প্রকাণ্ড লোহার গেট্। মাঝ দিয়া গেটের এপাশ হইতে লাইনের ওপাশ দিয়া বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে সেই দূরের কুসুমপুর পর্য্যন্ত। কুঠুরীর পিছনে কতকগুলি পান বিড়ির ও মিঠাইয়ের দোকান।

পাঁচ নম্বর ট্রেণটাকে মহাদেব বড় ভালবাসিত। এইটী চলিয়া গেলে বেশ খানিকটা সময় সে লম্বা ছুটি পায়।

আজ কয়েকদিন হইতে তাহার আবার গান শিখিবার প্রচণ্ড সখ হইয়াছে। পিছনের পানের দোকানের এক ছোক্‌রা একটা অল্পদামী হারমোনিয়াম লইয়া দিনরাত 'হুঁ' করিয়া মাথা নাড়াইয়া চেঁচাইতে থাকে—"বিনোদিনী, আজ তুমি যেও না যমুনায়—"

শেষের কথাটীর উপর অসম্ভব রকমের টান দিয়া, সুরের নানারকম গিট্‌কিরি কাটিয়া ছোক্‌রা আশে পাশের লোকগুলিকে নানা শ্রেণীর রস পরিবেশন করিয়া থাকে।

অবশেষে সেই হইয়াছে মহাদেবের সঙ্গীত শিক্ষক।

পাঁচ নম্বর ট্রেণটা চলিয়া গেলে ঘরে তালা মারিয়া সে মহানন্দে পানের দোকানে হাজির হইয়া হাসিয়া বলে, "আজ্‌কে দাদা সা—রে—গা—মা—টা শেষ করে দিতেই হবে।"

ছোক্‌রা বিদ্‌খুটে লাল্‌চে দাঁত বাহির করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলে, "তোমার মত ছাত্তোর—বুঝ্‌লে মহাদেব দা', আমি আর দেখি নি। কি উয্যুগ! তুমি শিখ্‌তে পারবে।"

ছোক্‌রা নিজেকে প্রকাণ্ড একটা তানসেন ঠিক করিয়া নিয়াছে। অবশ্য মহাদেবও দুই এক সময় তাহার অদ্ভুত গিট্‌কিরি শুনিয়া তাহাকে একটা বড় রকমের গায়ক ঠিক করিয়া, নিজেকে এমন গুরুর চেলা ভাবিয়া গর্ব্বও অনুভব করিয়া থাকে।

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মহাদেবের বড় একটা অসুখ

বাধিয়া গেল। রেলের ডাক্তার আসিয়া দুইদিন দেখিয়া গিয়া বাবুদের বলিয়া গেলেন—"অসুখ বড় সুবিধার নয়। আত্মীয় থাক্‌লে এখনি খবর দিন্।"

বাবুরা জমাদারকে এ বিষয় দেখিতে বলিয়া কর্ত্তব্য মুক্ত হইলেন।

পোর্টার, পয়েণ্টস্‌ম্যান্, রেলের কুলিরাও মহাদেবকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। উপকার তাহারা ত' কম পায় নাই। দেশে আত্মীয় বলিতে বউ লক্ষ্মী আর পাঁচ বছরের ছেলে ছোট্‌কা ছাড়া মহাদেবের আর কেউ ছিল না। সুতরাং কুলিরা মিটিং করিয়া বউ ছেলেকে দেশ হইতে আনাইবার প্রস্তাব করিল। এই বিষয়ে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষীণ স্বরে মৃদু প্রতিবাদ করিয়া সে বলিয়াছিল, "আমার এমন কীই বা হয়েছে, ও দু'দিনেই সেরে যাবে। মিছিমিছি কত ভাবনা নিয়ে ছুটে আস্‌বে ওরা! হয় ত' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শরীরটাই মাটি কর্‌বে। সামান্য অসুখে ওদের বড্ড ভাবনা চিন্তা হয়।"

তথাপি তাহার ক্ষীণ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া কুলিরা দেশ হইতে বউ ছেলেকে আনাইল।

সহকর্ম্মীদের সাহায্যে, লক্ষ্মীর সেবায় মহাদেব সে যাত্রা কোনক্রমে কাটাইয়া উঠিল।

কয়েকদিন বাদেই মহাদেব সুস্থ হইয়া গেল। লক্ষ্মী তাহার পা জড়াইয়া বলিল, "আর আমাদের দেশে যেতে বলো না! বিদেশে, বিভুঁয়ে একা একা তোমায় আমি থাক্‌তে দিত পার্‌বো না। কত কি বিপদ আসে, তা' কি কেউ বল্‌তে পারে। এত খাটুনী, রাঁধা, বাসন মাজা—না গো না, আমি পার্‌বো না!"

মহাদেব প্রথমে আপত্তি করিল, "অতটুকু ঘরে থাকার ভয়ানক অসুবিধা, তা' ছাড়া, ছেলেটা অসম্ভব রকমের দুরন্ত—কবে যে কি করে বসে! এ লাইনে মানুষ গরু প্রায়ই গাড়ী চাপা পড়্‌ছে, না লক্ষ্মী, তোদের থেকে কাজ নেই।"

লক্ষ্মী কিন্তু সকল অসুবিধা সহ্য করিতে রাজী—ছেলেকে সে বাহির হইতে কখনও দিবে না, কাঁদিয়া কাটিয়া অবশেষে সে মহাদেবকে রাজী করাইল।

দিন বেশ যায়। পাঁচ নম্বর ট্রেণ যাইবার পর মহাদেব আড্ডায় আর যায় না। লক্ষ্মীর কাছে বসিয়া গল্প করে, ছেলে লইয়া খেলা করে—বেশ আনন্দেই মহাদেবের সময় কাটিয়া যায়।

পাঁচ নম্বর ট্রেণ সন্ধ্যায় আসে। সেইটা চলিয়া গেলে মহাদেব লাইনের ওপাশের রাস্তার বাঁ' পাশে যে প্রকাণ্ড দীঘিটা আছে, তাহাতে চিরদিনের অভ্যাসমত একটা ডুব মারিয়া সা—রে—গা—মা—র সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাসায় ফেরে।

ঘরে আসিয়া দেখে কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে। একখানা ভাঙ্গা কোরোসিন কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া লক্ষ্মী কাজকর্ম্ম সারিয়া বসিয়া আছে। মহাদেব আসিলে তবে গরম ভাত হাঁড়ি হইতে বাড়িয়া দিবে। ঠাণ্ডা ভাত আবার মহাদেব খাইতেই পারে না।

ছোট্‌কা এত বড় বাঁদর, কোথা হইতে মুখে চুণকালি মাখিয়া আসিয়াছে, লক্ষ্মীর সাম্‌নে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলে, "শুন্‌বে মা।"

শুনিয়া মহাদেব ত' হাসিয়াই খুন।

খাইতে বসিয়া কত গল্প, কত হাসি! ছোট্‌কা স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার আবার বাবার সহিত খাইতে না বসিলে চলিবে না—একগ্রাস ভাত মুখে লইয়া এখানে ওখানে দৌড়াইয়া যায়। একবার হয় ত' হঠাৎ ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পয়েণ্টস্‌ম্যান পঞ্চানন তাহার লাল আলো জ্বালাইয়া লাইনের ওপাশ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। ছোট্‌কা তাহাকে চেঁচাইয়া বলিল, "এই পঞ্চাদা', মা যা' পুঁটি ঝাল রেঁধেছে! খাবে ত' এসো এখুনি। আর শোন, কাল আমরা সব যাচ্ছি মহেশের মেলায়—মার্‌বেল ত' পাঁচটা কিন্‌বোই—"

পঞ্চাননের অত কথা শুনিবার সময় নাই, হাসিয়া দুই একটা কথার উত্তর দিয়া সে হয় ত' বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছোট্‌কার তখনও কথা শেষ হয় নাই, "কাল

রাতে এসো, বাঁশী বাজিয়ে শোনাব। আমার জন্য দুটো মাকাল ফল এনো ত পঞ্চা দা'—ভারি সুন্দর দেখতে—"

ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী মহাদেবকে বলে, "দেখছো ছেলেটার কাণ্ড! বড্ড লক্ষ্মীছাড়া—"পরে ছেলের উদ্দেশ্যে কড়াস্বরে বলে, "এই ছোট্‌কা।"

"উঁ।"

"ঘরে আয় শীগ্‌গির হতচ্ছাড়া, এঁটো মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে আর ইয়ার্কি মারতে হবে না—আয় বল্‌ছি।"

ছোট্‌কা আসিয়া বাপের সাম্‌নে 'হাঁ' করিয়া দাঁড়াইল। মহাদেব একটু মাছ ভাত মুখে পূরিয়া দিতেই আবার বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় প্রচণ্ড একটা কিল অকস্মাৎ তাহার পিঠে পড়িল।

মহাদেব 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিল, "তোর বড্ড বাড়াবাড়ি, ছেলেমানুষ—"

"ছেলেমানুষকে কি কর্‌তে হয় না হয় সেটা আমি ভাল বুঝি।" লক্ষ্মী রাগিয়া বলে।

মহাদেব চুপ করিয়া যায়; ভাবে, হয় ত' ইহাতে তর্ক করিবার কিছুই নাই।

ছোট্‌কাকে তখন মহাদেব লাইনের ধার দিয়া ঘুরাইয়া আনে। ছোট্‌কা কান্না থামাইয়াছে; কারণ, বাবা নিজে বলিয়াছে, মেলায় লক্ষ্মীকে নেওয়া হইবে না, একা সে বাপের সহিত যাইবে। কিন্তু বাপের সঙ্গে এমন একটা রফা শেষ পর্য্যন্ত তাহার মনঃপূত হয় নাই। মাকে সঙ্গে না লইলে চলে না। মনটা বড় খুঁতখুঁত করিতে থাকে; সে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "মা-টাকে নেওয়া যাক্‌ গে—বুঝ্‌লে বাবা, কেবল একটা জিলিপী তুমি আমায় বেশী দিও, তা' হলেই হবে।"

মহাদেব হাসিয়া বলে, "সেই ভাল।"

পাঁচ নম্বর ট্রেণটা বড্ড বেশী দমে চলে। মানুষ গরু কত যে কাটিয়া চলে, তাহার আর ইয়ত্তা নেই। সেইদিন রায়েদের দু'টা মস্ত বলদ কাটা পড়িল, ঐ ত গত শুক্রবারে জমাদার পরাণকেষ্টর অতবড় জোয়ান ছেলেটা লাইন পার হইতে গিয়া মরিল—নাঃ, মহাদেব ঝকমারি করিয়াছে উহাদের আনিয়া। ছোট্‌কা মোটে কথা শুনে না, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া ঐ লাইনের দিকে যাইবেই, কবে কি করিয়া বসে।

লক্ষ্মীর উপর ছেলের ভার দিয়া মহাদেব নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। সকল সময়েই নিজে তাহাকে চোখে চোখে রাখে। ভয়ে সে বেশীক্ষণ বাহিরে আসিতে পারে না; হয় ত হঠাৎ একটা মালগাড়ী আসিয়া পড়িবে—গাড়ীর ত আর অন্ত নাই।

লক্ষ্মী বলে, "তুমি এত ভেব না ত।"

বাধা দিয়া মহাদেব ব্যস্ত হইয়া বলে, "না—না, তুই বুঝিস্‌ না, আমার বড্ড ভয় করে।" পরে অনুনয়ের সুরে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলে, "তোর এত কাজ করতে হবে না। তুই ওকে খুব চোখে চোখে রাখবি, বলা ত যায় না, এই ত সেদিন..."বিড়বিড় করিয়া আরও কি বলিতে বলিতে আকাশের পানে চাহিয়া সে প্রণাম করিতে থাকে।

গাড়ী আসিবার সময় হইলে সে বারবার লক্ষ্মীকে বলিতে থাকে, "তুই এই দোরগোড়ায় বোস, ও যেন বেরুতে না পারে।" পরে ছেলেকে আদর করিয়া বলে, "পাগলামী করিস্‌ নি বাবা, গাড়ী আসবার সময় বেরোস্‌ বুঝি? কথা শুন্‌লে,—দেখ্‌, এই এত বড় একটা নাট্টু কিনে দেব।"

গেট বন্ধ করিয়া ফ্ল্যাগ নাড়িতে নাড়িতে সে বারবার দুয়ারের দিকে চাহিতে থাকে—কোন্‌ ফাঁকে আবার লক্ষ্মীকে ডিঙাইয়া বাহির হইয়া না আসে!

গাড়ী চলিয়া গেলে ঘরে আসিয়া ছোট্‌কাকে দেখিলে তবে সে শান্তি পায়।

ভোরের ট্রেণটা চলিয়া গিয়াছে। মহাদেব গিয়াছিল ষ্টেশনে। ফিরিবার পথে ছেলেবেলার বন্ধু বিষ্টুর সাথে হঠাৎ দেখা। সেই অম্বিকা গুরুর পাঠশালায় হাতে মুখে কালী মাখিয়া লুকাইয়া দুইজনে কত কামরাঙা, বেতফল খাইয়াছে ...নষ্টচন্দ্রের রাত্রে নকুড় ঠাকুরের বাগানে বাতাবী লেবু,

শশা চুরি...সেই বাল্যবন্ধু বিষ্টুর সাথে দেখা। বিষ্টু আজ-কাল ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর কাজ করে। গল্প করিতে করিতে দেরী হইয়া গেল। বিষ্টু বড় ব্যস্ত, আর একদিন আসিবে বলিয়া সে কাজে চলিয়া গেল। এত বেলা হইয়া গিয়াছে তাহা মহাদেবও টের পায় নাই। একটা অজানা আশঙ্কা লইয়া সে ঘরের পানে ছুটিল।

বাসার ধারে আসিয়া দূর হইতেই সে ডাকিয়া উঠিল, "ছোট্‌কা—এই ছো—"

লক্ষ্মী বাসন মাজিতেছিল, ময়লা হাতে সে বাহির হইয়া বলিল, "খাবারের দোকানীর ছেলে মন্‌কুর সাথে একটু বাজারে গেছে। বড্ড কান্নাকাটি করছিল—তা' যাক্‌ গে না, ছেলেমানুষ—"

মহাদেব রাগিয়া উঠিল, "দুত্যরি, বারণ করলেও শুন্‌বি নে তোরা—" ঘরে না ঢুকিয়া সে বাজারের দিকে ছুটিল।

মন্‌কু দোকানে বসিয়া প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ' করিয়া মুড়ির মোয়া চিবাইতেছিল। মহাদেব যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে মন্‌কু, ছোট্‌কা কোথায় রে?"

মন্‌কু খানিকটা মোয়া গলাধঃকরণ করিয়া ঢোক গিলিয়া কহিল, "এইখানেই ত আমরা খেলছিলুম, তা' ছোট্‌কা বললে, ভাল খেলার জিনিষ আনবে। ইদিকে সে ছুটে গেছে।" হাত বাড়াইয়া বাজারের দক্ষিণের পচা পুকুরটা সে দেখাইয়া দিল।

মহাদেবের সর্ব্বশরীরটা কাঁপিয়া উঠিল। এখনও কোন ট্রেণ আসে নাই, তথাপি সে দৌড়াইয়া লাইনটা দেখিয়া তবে পচা পুকুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

বাজারের দক্ষিণে যে পুকুরটি পচা পুকুর নামে খ্যাত, তাহা যে কে কখন করিয়াছিল কেহই তাহা বলিতে পারে না। বৃদ্ধেরাও বলিয়া থাকেন যে, ছেলেবেলা হইতে তাহারাও ঐ একই রকম দেখিতেছেন। জলের উপর কলমীলতার ধাপ এত পরিমানে জমিয়াছে যে, জল দেখিবার উপায় নাই। কলমীর ফুল, অন্যান্য বুনো লতার লাল নীল ফুল ধাপের উপর, পাড়ের উপর ফুটিয়া আছে। চারিদিকের পাড়ে দাঁড়াইবার উপায় নাই—বেত কচুর ঝোপে ভরিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র মদনের দোকানের পিছন দিয়া ঐ সুড়ি পথটুকু ধরিয়া ঘাটে নামা যায়।

মহাদেব হাঁপাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে ভয়ে ভয়ে ব্যগ্রভাবে তাকাইতে লাগিল—নাঃ, কোথাও জন-মানব নেই। মহাদেবের চোখ দিয়া জল বাহির হইল। দম বন্ধ করিয়া সে চেঁচাইয়া ডাকিল, "ছোট্‌কা!"

কেমন একটা বিশ্রী প্রতিধ্বনি আসিল মাত্র। জ্ঞান-শূন্য হইয়া আবার সে চেঁচাইয়া উঠিল, "ছোট্‌কা—"

ও পাড়ের কলমীর ডগাগুলি নড়িয়া উঠিল, তাহার ঝোপ হইতে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "এই—"

মহাদেব বন-বাদাড় ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। ও পাড়ে গিয়া দেখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলমী ডগার ঝোপের একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া ছোট্‌কা নিশ্চিন্ত মনে কলমীর ফুল ছিঁড়িতেছে—পাশে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে কলমীর ফুল।

গালের উপর 'ঠাস' করিয়া এক চড় মারিয়া মহাদেব তাহাকে বলিল, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, এর মধ্যে মরতে এসেছ কেন? সাপখোপ থাকে এর মধ্যে জানিস? ফের যদি আসবি, তবে মেরে খুন করবো।"

রাগের মাথায় আরও কয়েকটা চড় চাপড় মারিতে মারিতে মহাদেব তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

পথে ছোট্‌কার এই অবস্থা দেখিয়া মন্‌কু হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। ছোট্‌কার কী রাগ! বাপের অলক্ষ্যে তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া মন্‌কুকে প্রতিশোধ নিবার ভয় দেখাইল। পরে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের সহিত চলিল।

বাসায় আসিয়া ছোট্‌কার ক্রন্দন আরও বাড়িল। মহাদেব রাগের মাথায় বলিল, "কিচ্ছু খেতে দিস নে আজ, দেখুক না মজাটা!"

লক্ষ্মী সায় দিয়া বলিল, "কক্ষনো না, খেতে দেবো আবার!"

কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে মহাদেবকে চুপিচুপি ছোট্-

কাকে একখানা পাঁউরুটী দিতে দেখিয়া লক্ষ্মী হাসিয়াই বাঁচে না।

কয়েকদিন ধরিয়া ছোট্‌কা ভীষণ বায়না ধরিয়াছে যে, গাড়ীকে নিশান দেখাইবে। মহাদেব বিরক্ত হইয়া সেদিন তাহাকে লইয়া গেল। গাড়ীর শব্দ পাইলে মহাদেব ছোট্‌কাকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। ছোট্‌কার কী আনন্দ! দূর হইতে গাড়ীটা 'ভস্ ভস্' শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে। ছোট্‌কা নিশান ঘুরাইতে লাগিল—আঃ, কী আরাম! গাড়ীর মধ্যে কতকগুলি ছোট ছেলেমেয়ে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল, তাহাদের দিকে ছোট্‌কা জিব বাহির করিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিল—করিয়াই কী হাসি!

মহাদেব তাহাকে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, "ছিঃ, অমন করতে নেই!"

ছোট্‌কার আজ বুক ফুলিয়া উঠিল—ভারি না কাজ, তার আবার ভয়!

আটটা বাজিয়া গেল। পাঁচ নম্বর গাড়ীটা বড় লেট্ করিতেছে। কুলি-মহলে নানারকম গুজব উঠিল। মাতব্বর পোর্টার আশু আসিয়া বলিল, "নয়ানগঞ্জের ওপাশে ট্রেণখানা আউট লাইন হয়েছে, আজ আর রাতের মধ্যেও আসছে না।"

গুজবটা খুব প্রবল হইয়া উঠিল।

মহাদেবও খবরটা শুনিয়া আসিল, এখন আর মালট্রেণ আসিবার সম্ভাবনা নাই। বাসায় আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিল, "আমরা একটু ময়নামতীর হাটে চল্লাম লক্ষ্মী। দেখি, ছোট্‌কার জন্য যদি একটা জামা কিনতে পারি। এ পর্য্যন্ত ছেলেটা একটা জামাও পরতে পারে নি, আজ দেখি যদি পারি।'

নদী পার হইয়া তবে হাটে যাইতে হয়, তাহারা চলিয়া গেল।

ছোট্‌কার আজ মহা আনন্দ! বাবা নাই বাড়ীতে, মা কাজে ব্যস্ত,—তাকে আজ পায় কে! কতদিন বাবার সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া সেই দূরের লাইনের পাশে নীলু চক্রবর্ত্তীর মাঠে ছেলেদের সে খেলা করিতে দেখিয়াছে। বড় ইচ্ছা তাহার হয় উহাদের সহিত একটু ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায—কী যে আনন্দ তাহাতে! কিন্তু বাবার এত ভয় যে, কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আজ মহা সুযোগ! লুকাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

পথ ত আর কম নয়। কোনরকমে সে মাঠে আসিয়া পৌঁছাইল। মহানন্দে মালকোঁচা মারিয়া সে ছেলেদের সহিত 'বুড়ির চি' খেলিতে গেল। ছোট্‌কা যে দৌড়াইতে পারে—বাপরে! সব ছেলেরা ত অবাক! একদিনেই নাম কিনিয়া ছোট্‌কা সর্দ্দার খেলোয়াড় হইয়া গেল। ছোকরার দল তাহাকে ঘিরিয়া বলিল, "এই ভাই ছোট্‌কা, রোজ আসবি ত?"

ছোট্‌কা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"নিশ্চয়ই।"

হঠাৎ দূরে গাড়ীর শব্দ শুনা গেল। ছোট্‌কা খেলা থামাইয়া চাহিয়া দেখে, পাঁচ নম্বর ট্রেণ হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সর্ব্বনাশ! নিশান দেখাইবে কে? বাবা ত সেই দূরের হাটে, মা ত পারিবেই না - তবে হ্যাঁ, সে নিজে পারিবে—ভারী না কাজ!

ছেলেমানুষ হইলেও ছোট্‌কা বাবার বিপদ বুঝিল। হিতাহিত জ্ঞান তাহার নাই, সোজা পথ ভাবিয়া লাইনের মাঝ দিয়াই সে ছুটিয়া চলিল। গাড়ীর পূর্ব্বে সে নিশ্চয়ই পৌঁছাইতে পারিবে। নিতান্ত ছেলেমানুষ! বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার দুইখানি ছোট পায়ের চাহিতেও ঐ দানব-যন্ত্রের পাগুলি কত শক্তিশালী! ছোট্‌কা পিছন ফিরিয়া গাড়ীর ও তাহার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান মনে মনে মাপিয়া ভাবিল—নিশ্চয়ই আগে পৌঁছাইবে। ভীষণ বেগে সে দৌড়াইতে লাগিল।

কিন্তু দানব-যন্ত্র যে হঠাৎ একবারে পিছনে আসিয়া

পড়িয়াছে—তাহার উষ্ণ হাঁপ্ ছোট্‌কার পিঠে লাগিতেছে —দম যেন বন্ধ হইয়া যায়। লাইন হইতে সে সরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার পা যেন আট্‌কাইয়া গিয়াছে। নিজের বিপদ সে এইবার বুঝিতে পারিল। হতভাগ্য শিশু বিকট ভয়ে মায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিল, "মা—মা!"

মায়ের সাধ্য নাই তাহাকে অঞ্চলতলে লুকাইয়া আজ বাঁচাইয়া রাখে! নিষ্ঠুর যন্ত্রটা একটুও দ্বিধা বোধ করিল না, তাহার কোমল দেহের উপর দিয়া অমন পাষাণের ভার চাপাইয়া দেহটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গেল।

পাশের রাস্তা দিয়া হাট ফেরৎ লোকের দল চলিয়াছে। লাইনের উপর সদ্য কাটা শিশু দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল। ক্রমশঃ ভীড় বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নানা গবেষণাও চলিতে লাগিল।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, মহাদেব ছুটিয়া চলিল। আজ তাহার মনে একটা তৃপ্তি আসিয়াছে ; কারণ, ছোট্‌কার বহু-আকাঙ্ক্ষিত একটা রঙিন জামা আজ কিনিতে পারিয়াছে। পথে বিষ্টুর সহিত আবার দেখা, সে কাজে চলিয়াছিল। বলিল, "মহাদেব যে, হাট থেকে ফির্‌ছো দেখ্‌ছি। তোমার নিশেন দেখালে কে তবে?"

মহাদেব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নিশেন—কেন?"

বন্ধু বলিল, "বাঃ, এই ত কিছু আগেই তোমাদের পাঁচ নম্বর ট্রেণ চলে গেল, বড্ড লেট্ করেছে আজ। আরে শুনেছ মহাদেব, ঐদিকের কোন্ লাইনের 'পরে একটা নেহাৎ বাচ্ছা না কি কাটা পড়লো—তোমাদের এদিকে এসব বড্ড বেশী।" বলিতে বলিতে বিষ্টু আগাইয়া চলিল।

মহাদেবের সর্ব্বশরীরে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। তাহার পা আর চলিতে চাহে না—দৌড়াইতে গেলে পড়িয়া যায়। আছাড় খাইতে খাইতে মাতালের মত হইয়া সে ভীড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের একটা লোককে চুপিচুপি অপরাধীর মত শুষ্ককণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

ঠোঁট উল্‌টাইয়া লোকটি বলিল, "চিন্‌তে ত পারছি নে, দেখো না এগিয়ে।"

আগাইয়া দেখিবার সাহস তাহার নাই। দুর্ব্বল পা দুইটী দেহের ভার আর বহিতে পারিল না, 'ধপ্' করিয়া সে ভীড়ের পিছনে বসিয়া পড়িল।

রেলওয়ে কুলীর দল আসিয়া পড়িয়াছে, এইবার আর চিনিতে কাহারাও বাকী রহিল না। জমাদার আগাইয়া মহাদেবকে ধরিল, "কী আর করবি ভাই, সবই অদেষ্ট! আয়, এদিকে আয়।"

মহাদেব টলিতে টলিতে তাহার পিছন পিছন চলিল।

সেই লাল পেড়ে ধুতিখানা মালকোঁচা মারা রহিয়াছে ···গলার কবচটা ও পাশে গিয়া পড়িয়াছে·· ···দেহটা থেঁতলাইয়া গিয়াছে—মহাদেব উন্মাদের মত একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

কুলীর দল মৃতদেহটাকে লইয়া চলিয়া গেল। জমাদার মহাদেবের জ্ঞান কোন রকমে ফিরাইয়া তাহাকে বাসার দিকে লইয়া চলিল। পথে কোন কথা মহাদেব কহিল না, মধ্যে মধ্যে উন্মাদের মত চেঁচাইয়া উঠে—মুখ দিয়া অদ্ভুত-ভাবে ফেনা পড়িতেছে—চোখ দুইটী অসম্ভব রকমের লাল! পাগল হইয়া যাইবে না ত!

বেচারী মা! খবরটা সেও পাইয়াছে। এক মাত্র পুত্র, কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাঁপাইয়া গিয়া জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া আছে। মন্‌কুর মা, দিদি, ওরা সব সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে। জ্ঞান একটু হইলেই তাহাদের ঠেলিয়া লক্ষ্মী দৌড়াইয়া বাহির হইতে যায়। পুত্রশোক! এক মাত্র পুত্রের মৃত্যু!

রাত্রি অনেক হইয়াছে। মহাদেব মাটীতে পড়িয়া। ওপাশে লক্ষ্মী গোঁয়াইতেছে—তাহার উষ্ণ নিশ্বাস মহাদেবের মুখে আসিয়া লাগে। কিসের একটা ছায়া হাত

ইসারায় ডাকে যে—হ্যাঁ, ঐ ত মহাদেবকেই ডাকে। খাটের তলা হইতে ছোট্‌কার টিনের ভেঁপু, কাঠের ঘোড়া, রঙিন জামা যেন শূন্যে নাচিতেছে—এই যে তার চোখের সাম্‌নে, একেবারে সাম্‌নে। ঘরের কোণ হইতে কে যেন ডাকিয়া উঠিল—"বাবা—!"

মহাদেব কান পাতিয়া শুনিল।

বাহিরে ভীষণ দুর্য্যোগ। ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি অজস্র ধারায় পড়িতেছে। ঝড়ের অশ্রান্ত হুঙ্কার যেন সমগ্র ঝুমঝুম্‌পুরটাকে আজ উল্‌টাইয়া ফেলিবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কড়্‌কড়্‌ করিয়া মেঘের ভীষণ আর্ত্তনাদ—উপযুক্ত লগ্ন! আবার যেন কোণ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "বাবা—!"

মহাদেব লাফাইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া ডাকিল, "লক্ষ্মী, উঠে আয়।"

লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল না, যন্ত্রচালিতের মত সে উঠিয়া স্বামীর সহিত সেই দুর্য্যোগে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

গেঁয়ো সুঁড়ি পথ দিয়া বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া তাহারা দুইজন চলিয়াছে—তাহাদের চলার পথ যেন শেষ হইবার নয়। বিদ্যুতের আলোয় তাহাদের দেখা যায় দূরে—বহুদূরে মাঠের মাঝে। ক্রমশঃ মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিল—আর দেখা গেল না। কোন্‌ অনিশ্চিত ঐ ছায়ার আহ্বান আজ তাহারা শুনিল—কোন্‌ ছায়ার মায়ায় আজ তাহারা ঘরের মায়া কাটাইল—কে জানে!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অদর্শনে

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, বি-এল্

কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই নীলাম্বু শুনিলেন, পত্নী নীলিমা, বন্ধু সুকুমারের সহিত মটর চড়িয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

খানিক হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভৃত্য পদকে প্রশ্ন করিলেন,—কিছুই বোলে গেল না, কোথায় যাচ্ছে তারা?

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পদ উত্তর করে,—কি কোরে জান্‌ব বাবু, আমায় তো বলে যান নি, মা-ঠান।

—তুই জিজ্ঞেস্ কর্‌লি না কেন?

—আজ্ঞে, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে, এই কথা জিজ্ঞেস কর্ত্তে যাব? সেদিন আপনি অফিসে ছিলেন, ফির্‌তে আপনার রাতও হয়েছিলো। ওই কি বলে, সকুবাবু কোথা থেকে তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে এসেই মা-ঠানকে বল্লেন,—ইঞ্জিরিতে কি দু'-একটা কথা—বলতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম,—মা-ঠানকে হঠাৎ না-বলা, না-কওয়া সকুবাবুর সঙ্গে চলে যেতে দেখে শুধুলুম,—কোথা যাচ্ছেন বাবু আপনারা, আমাকে বোলে যান,—বাবু শুধুলে বোল্‌তে হবে। অমনই সকুবাবু নাক মুখ পাকিয়ে ধমকে উঠলেন, বল্লেন কি,—তুই চাকর, চাকরের মত থাক্‌বি, তোর অত কথায় দরকার কিরে উল্লুক। গোটা দুই ঘুসি মার্‌তে পেলে ছাড়েন না, এমনই তরা ভাব আর কি! কি বোল্‌ব বাবু, আমার সেদিন যা' দুখ্‌খু হয়েছিলো, ইচ্ছে কর্‌ছিলো,—

বলিয়াই পদ নীরব হইল।

নীলাম্বু সাগ্রহে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন,—তারপর?

—তারপর তাঁরা দু'জনা বেরিয়ে গেলেন। আপনি বাবু বাড়ী আস্‌বার এক ঘণ্টা আগে তাঁরা ফিরেছিলেন, মা-ঠান বল্লেন,—বাবু ফের্‌বার আগেই যখন ফিরে এইছি, তখন আর তোর জেনে দরকার কি,—কোথায় গেছিলুম। যা' বোল্‌তে হয় বাবুকে আমরাই বোলব অখন্। তুই চুপ থাক্। তা' বাবু, ওই কি একদিন, অমনই ধারা কদ্দিনই না হয়েছে।

—অ্যাঁ! বলিস্ কি? কই এদ্দিন তো আমায় কিছু বলিস্ নি?

বলিতে বলিতে নীলাম্বুর মুখ সহসা বিবর্ণরূপ ধারণ করিল।

—আপনার কাছে কি নিরালা যেতে ফুর্‌সুৎ পেয়েছি বাবু। আপনি ঘরে থাকলে,-মা-ঠানের ফরমাস্ সার্‌তেই আমার সময় ফুরিয়ে যায়।

'ওঃ' বলিয়াই নীলাম্বু ইজিচেয়ারে সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া দিলেন। মুখের ঘর্ম্মটুকু পর্য্যন্ত মুছিতে তাঁহার হস্ত দুইটা উঠিতেই চাহিতেছিল না যেন।

নীলাম্বুর অসহায়ভাব দেখিয়া ব্যথিত পদ ত্বরিৎ-গতি ফ্যান্‌টা খুলিয়া দিল। ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ শব্দে ফ্যান্‌টা মনোবেদনা প্রকাশ করিয়া অবিরত ঘুরিতে লাগিল।

অফিসের স্বেদ-সিক্ত পোষাক ছাড়া হইল না। নীলাম্বু যেন গভীরাতঙ্কে ডুবিয়া গেলেন।

অতি মৃদুভাবে পদ প্রশ্ন করিল,—চায়ের জল চড়াই গে বাবু?

নীলাম্বু ঈষৎ নড়িয়া চড়িয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, যা'। তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?

পদ কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল,—বলা যায় না।

নীলাম্বু ভাবিতেছিলেন, তিনি কী 'গুখুরী' কাজই না করিয়াছেন স্ত্রী-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্য হইয়া ও বিবাহ করিয়া। আবার শুধু তাই? সভ্যগণের অনুরোধে অমন

সুশীলা পত্নী নীলিমাকেও তৎসঙ্ঘের সভ্যাশ্রেণীভুক্ত করিয়া? ছিঃ!

বেশী দিন নয়, একটী বৎসর পূর্ব্বে যে নীলিমা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছিল, সে-ই আজ পুরুষ বন্ধুদিগের সহগতি-বিধি সযত্নে গোপন রাখে এবং রাখিতে চেষ্টাও করে। কেন? বংশদণ্ডের কোন্‌স্থলে যে ঘূণ ধরিয়াছে, তাহা নীলাম্বু ভাবিয়াই পাইলেন না।

পদ চায়ের সরঞ্জাম সমূহ আনিয়া টেবিলে রাখিল। নীলিমার পরিবর্ত্তে আজ পদ চায়ের জল ঢালিয়া চা প্রস্তুত করণে রত হইল। বিপরীতমুখী চেয়ারখানা শূন্য দেখিয়া নীলাম্বুর বুকখানার ভিতর যেন 'হা হা' করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—তাঁহার হাহাকারের বিনিময়ে বন্ধু সুকুমার নীলিমাকে লইয়া কী আনন্দেই না মুহূর্ত্তগুলি কাটাইতেছে?...

চায়ের কাপে দুই এক চুমুক দিবার পর মস্তিষ্কটা সতেজ হইলে তাঁহার মনে পড়িল,—স্ত্রী-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের তিনিও একজন সভ্য। তাঁহার পক্ষে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধ এরূপ চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নাই?......

পদকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—তোর মা-ঠান এলে বলিস্ নি যে, আমি তাঁর খোঁজ নিচ্ছিলুম,—তিনি গেছেন কোথায়।

ভৃত্য 'ফ্যাল্‌ফ্যাল্' করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

নীলাম্বু একটু উচ্চকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন,—বুঝেছিস্ তো? না, শুধু শুধু বোকার মত 'হাঁ' কোরে তাকিয়ে থাক্‌বি।

কলের পুত্তলিকার ন্যায় সে অস্ফুটভাবে উত্তর করিল—হাঁ।

দুই

অতঃপর চা পানের পর একাকী ওই নির্জ্জন বাটীতে কি করা যায়?—নীলাম্বু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে তখন জাগিতেছিল,—স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণাম কি এমনইতর অশান্তিকর, না তাহার সঙ্কীর্ণ চিত্তের জন্যই তিনি শুধু অশান্তি উপভোগ করিতেছেন? সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল,—স্ত্রী-স্বাধীন আমেরিকা ও ইউরোপের কথা। সেখানকার পুরুষরাও তো বিবাহের নামে শত হস্ত পিছাইয়া পড়ে বটে, কিন্তু তাহার কারণ কি, ওই'জন্যই, না অন্য কিছুর জন্য?

একযোড়া চড়ুই পক্ষী কিচিরমিচির করিয়া কলহ করিতে করিতে সহসা তাঁহার শয্যার উপর গিয়া পড়িল। তাহাদিগের কলরবে আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্টিপাত করিতেই নজরে পড়িল,—শয্যার পড়িয়া থাকা একখানা রঙিন হ্যাণ্ডবিলে। দূর হইতে বড় বড় অক্ষরের লেখা দেখা যাইতেছিল,—'স্বপ্নরূপ টকি।'

ত্বরিৎ-গতি উঠিয়া পড়িয়া হ্যাণ্ডবিলখানা হস্তগত করিয়া তিনি পাঠ করিলেন,—'স্বপ্নরূপ টকি'তে গ্রেটা-গার্ব্বোর 'ফ্রেণ্ডস্ কিস্' নামক উচ্চ-প্রশংসিত অপূর্ব্ব রোমান্টিক ছবি অদ্য হইতে প্রদর্শিত হইতেছে।

'ফ্রেণ্ডস্ কিস্' নামক উপন্যাসখানা তাঁহার পড়া আছে। সিনেমা বক্সের উপর অন্ধকারে বসিয়া বন্ধুর সহিত বন্ধু-পত্নীর প্রণয়োপাখ্যান হইতে গল্পটী আরম্ভ। কে যেন তাঁহাকে বলিয়া উঠিল,—ছিঃ!

পদকে হাঁক দিয়া ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁরে, এ কাগজখানা এখানে কে আনল রে?

—আজ্ঞে, বাবু, আমি তো আনি নি। মনে পড়ে সকুবাবুর হাতে অমনিতর রঙিন কাগজ একখানা ছিল।

নীলাম্বুর মনের ফাঁকে সহসা যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বলিয়া উঠিলেন,—ওঃ!

তাঁহার স্থির ধারণা জন্মিল,—ঠিকই হইয়াছে, উহারা দুইজনে ওই ছবিখানা দেখিতে তিনটার 'শো'য় নিশ্চয়ই গিয়াছে।

রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন,—সন্ধ্যা প্রায় পৌনে ছ'টা বাজে, এতক্ষণে তো 'শো' শেষ হইবারই কথা। তবে?...

'শো' দেখিবার পরই হয়ত তাহারা আর কোথাও বেড়াইতে গিয়া বসিবে। আর তিনি একটী সুন্দর সন্ধ্যা

একাকী বৃথাই নষ্ট করিবেন। তাঁহার বুকখানা যেন সহসা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।...

কিন্তু কোথায় গেলে তাহাদিগের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে? তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, এই মুহূর্ত্তেই নীলিমাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—তাঁহার সঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া 'টকি' দেখার আনন্দটুকু কী সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারে, না সত্যই করিয়াছে সে?

ক্ষিপ্রহস্তে ধুতি পির্‌হান্ পরিয়া ছড়ি হস্তে ট্যাক্সি ডাকিয়া নীলাম্বু 'স্বপ্নরূপ টকি'র উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

তিন

ট্যাক্সিখানা 'টকি'র দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার যেন মনে হইল—সুকুমার নীলিমার কোমল বাহু ধারণ করিয়া ফুটপাথের অপর পার্শ্বস্থ একটা মটরে গিয়া উঠিয়া বসিল। 'ফ্রেণ্ডস্ কিস্' 'শো' দেখিবার পরই ঐরূপ বাহুদেশ ধারণ! দেহের সমস্ত রক্ত যেন তাঁহার মাথার উপর চন্‌চন্ করিয়া চড়িয়া বসিল।

সুকুমারদিগের গাড়ী হইতে নীলাম্বুর গাড়ীর মধ্যে বিস্তর মটর, রিক্সাদির ব্যবধান। তদুপরি ট্রাম, বাস পার্শ্বদেশ হইতে ঘনঘন যাতায়াত করিতেছে। ফুটপাতের উপর দিয়া পদব্রজে যাইতে গেলেও বিস্তর পথচারীদের জনতা সহ্য করিতে হয়।

'শো'টা যে মাত্র কয়েক মিনিট আগে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তবু ভাল যে—দেখা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বড়ই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে যে!

জনতার মধ্যে চীৎকার তুলিয়া ডাকা বড়ই অভদ্রতা-জনক,—নীলাম্বু মস্তকের উপর সিল্ক রুমালখানা উড়াইয়া নীলিমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃথা! বোধ হইল নীলিমার একবার দৃষ্টি পড়িল বা, কিন্তু সে গ্রাহ্যও করিল না।

'হুড'-ফেলা অন্ধকারময় মটরের গদীর উপর উভয়ে বসিয়াই সহসা যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এ কী স্বেচ্ছাকৃত বিদ্রূপ,—না তাঁহার অস্তিত্বের অসম্ভাবনায় উভয়ের মধ্যস্থ প্রাণখোলা আনন্দ-বিকাশ? কে জানে!

নীলাম্বু স্বচক্ষে দেখিলেন,—নীলিমা যেন হাসিতে উছল হইয়া সুকুমারের গায়ের উপর প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। কী বিড়ম্বনা! এটুকু পর্য্যন্তও তাঁহাকে দেখিতে হইল!

ভদ্রতার মাথা খাইয়া নীলাম্বুর মুখ হইতে সহসা বাহির হইয়া গেল,—সুকুমার! সুকুমার!

জনতার দৃষ্টি সহসা তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় মস্তক অবনত করিয়া জনতা ঠেলিয়া তিনি অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। মনে হইতেছিল,—তিনি জনতার চাপে ওই দণ্ডেই নিষ্পেষিত হইয়া যাইবেন।

হাঁ, এতক্ষণে তাঁহার অস্তিত্বটুকু উহাদিগের মনে জাগিয়াছে নিশ্চয়ই। ওঃ 'ফ্রেণ্ডস্ কিস্' কী জঘন্য ছবিই না হইবে উহা!

নীলিমাদের গাড়ী ধরিবার পূর্ব্বেই, 'ঘস্ ঘস্ গোঁ—ও' শব্দে গাড়ীখানা সহসা দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে ফুটপাথের জনতা কিঞ্চিৎ পাতলা হইয়া আসিয়াছিল। সজোরে সম্মুখস্থ দুই একজনকে ঠেলিয়া আসিয়াই তিনি একটা ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িলেন। ট্যাক্সি-চালক সরোষ আদেশ শুনিল,—চালাও, ঐ নীল মটর ধরা চাই।

মোড় ঘুরিবার পূর্ব্বেই নীলিমাদের গাড়ী দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। ট্যাক্সি-চালক প্রশ্ন করিল,—উ গাড়ী তো ভাগা, আব্বি কাঁহা যায় গা?

নীলাম্বু উত্তর করিলেন,—পোলক্ ষ্ট্রীট্—নং ...

চার

যথাসময়ে সুকুমারের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া গাড়ী থামিল। তিনি ক্ষিপ্রপদে মটর হইতে নামিয়া পড়িলেন।

সুকুমার অবিবাহিত;—একাকী একটী ভৃত্যসহ নীচের দুই কামরা ঘর ভাড়া লইয়া বাস করেন। উপরের কোঠাগুলিতে বাড়ীওয়ালা জগদীশবাবু সস্ত্রীক বাস

করেন। জগদীশবাবুর ঘরগুলি বিজলীবাতির আলোয় আলোকময়; কিন্তু সুকুমারের ঘরগুলি শুধু অন্ধকারময় নহে,—তাঁহার সদর দ্বার পর্য্যন্ত ভিতর হইতে বন্ধ।

এইবারে উহারা যাইবে কোথায়? নিশ্চয়ই সন্ধ্যার অন্ধকারে উহারা এইখানেই লুকাইয়া আছে। আবার শুধু তাই? হয়ত নিষিদ্ধ প্রেমালাপও চলিতেছে বা! কী উৎসন্নকর ও 'টকি'গুলা! আজই কি না তাহাদিগকে ওই ছবিখানা দেখাইয়াছে তাহারা? কী ভয়ানক!

কম্পিতকণ্ঠে নীলাম্বু হাঁকিলেন,—সুকুমার! সুকুমার! সুকুমার! 'কাকস্য পরিবেদনা',—কেই বা সাড়া দেয়?

বটে! তাহারা অন্ধকারে লুকাইয়া প্রেমালাপ করিবে, আর তিনি কি না বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু মুহূর্ত্ত গণিবেন?

সরোষে ভীম-শব্দে তিনি পুরাতন কবাট জোড়াটার উপর হস্তপদ চালাইতে লাগিলেন। বেচারী কবাট!

লাথি-কিল চড়-ঘুসির চটাপট্ শব্দে জগদীশবাবু দোতলার জানালা হইতে হাঁকিলেন,—কে? কে? কে মশাই আমার দরজা-জানালা ভেঙ্গে ফেল্‌লেন?

সহসা সচকিত হইয়া নীলাম্বু স্থির হইয়া উত্তর করিলেন,—এই দেখুন না মশাই, সুকুমারবাবু ঘরে লুকিয়ে বসে আছেন,—এত ডাক্‌ছি তবু উত্তর দিচ্ছেন না।

সরোষে জগদীশবাবু উত্তর করিলেন,—জবাব দিচ্ছেন না বোলে মশাই, আপনি আমার কবাট জোড়াটা ভেঙ্গে ফেল্‌বেন না কি?

উভয়ের কথা কাটাকাটিতে ইতিমধ্যে পথে দু'-একটা লোক জমিতে সুরু করিল। রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ ফুট-পাথের উপর বসিয়া সুকুমারের ভৃত্য মিঠু কোন্ দেশ-ওয়ালার সহিত আলাপ করিতেছিল। জনতা জমিতে দেখিয়া সেও আসিয়া পড়িল। নীলাম্বুকে মিঠু চিনিত; সে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

মিঠুর অভিবাদনও বুঝি বা সুকুমারের শিখান অভিনয় মাত্র।

সরোষে কম্পিত-কণ্ঠে নীলাম্বু বলিলেন,—দরজা খোল্, তোর বাবুকে এখনই চাই।

মিঠু ত্বরিৎ-গতি অন্যলোকের বাটীর ভিতর দিয়া গিয়া সদরের দ্বার ভিতর হইতে খুলিয়া দিতে দিতে বলিল,—বাবু তো সেই দুটোয় বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি হুজুর। বোস্‌বেন কি?

মিঠুর অপেক্ষা না করিয়াই নীলাম্বু 'সুইচ্' টিপিয়া আলো জালিলেন। যেন বড় পরিশ্রম হইয়াছে, এই অছিলায় সুকুমারের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আবার একটা 'সুইচ্' জালিলেন। শয্যার দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন,—উহা রচিত হইবার পর এ যাবৎ পর্য্যন্তই অ-কলুষিত রহিয়াছে। তবে?

ইতিমধ্যে জগদীশবাবু উপর হইতে হাঁকিলেন,—মিঠু! অ মিঠু! বাবুটীকে বসিয়ে রাখ্, আমি যাচ্ছি, গিয়ে দেখতে চাই উনি কত বড় লোক—আমার দরজা জোড়্‌টা ভাঙ্গলেন কেন, আর কতখানি?

সুকুমারের কক্ষ দুইটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল,—নীলিমারা এখানে নাই। অতএব আর বৃথা অপেক্ষা করিয়া লাভ কী? ইতিমধ্যে জগদীশ-বাবুর হাঁক-ডাক শুনিয়া তাঁহার ভয় হইল,—কি জানি, ভদ্রলোক আসিয়া এখনই যদি কোনও হাঙ্গামা সত্যই বাধাইয়া বসেন।

নীলাম্বু ত্বরিৎ-পদে সুকুমারের গৃহ হইতে রোয়াকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সদর-পথে অবতরণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক্ এমন সময়ে জগদীশ নীচে নামিয়া আসিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিরাট বপু আন্দোলিত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিলেন,—ধর্, ধর্, লোকটা পালায়। পুলিশ! পুলিশ!

নীলাম্বু আর যায় কোথায়? তিনিও ছুটিতে আরম্ভ করিলেন।

জগদীশবাবু ছুটিতে গিয়া রোয়াকের উপরিস্থ পিচ্ছিল রসাল আম্রবীজের উপর পা দিয়াই ভীষণ শব্দে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দেহে বিষম চোট্ লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কিন্তু বলিতেছিলেন,—পুলিশ! পুলিশ! শা' পালায়...

এতক্ষণে নীলাম্বু গাড়ীতে উঠিয়াই চম্পট্ দিয়াছেন।

খানিকদূর ট্যাক্সিখানা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবার পর চালক জিজ্ঞাসা করিল,—কাঁহা যায় গা বাবু?

স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্য হইলেও নীলিমার কাণ্ড-কারখানা তাঁহার চিত্তে একটা অকরুণ বিশ্রীভাব জাগাইতেছিল এবং তদুপরি সহসা একটা বিসদৃশ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে যেন 'বিসুভিয়াসে'র লীলা চলিতেছিল। কী ভীষণ দাহকর স্রাব সে!

বাটী ফিরিয়া গেলে জগদীশ যদি পুলিশ-সহ আসিয়া তাঁহাকে ধরে,—তাহা হইলে? ভাবিয়া তিনি স্থির করিতে পারিলেন না,—কোথায়ই বা যাওয়া যায়। আবার মটর-চালক প্রশ্ন করিল,—কাঁহা যায় গা?

ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে উত্তপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত বাণী বাহির হইয়া গেল—চুলোয়!

মোটর-চালক পাঞ্জাবী,—মাত্র কয়েক মাস হইল দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে। চুলো কথাটা কয়েকবার শুনিয়াছেও সে। চুলোকে সে চুল্লীর সামিলই করিয়া রাখিয়াছে। কয়েকটা বাঙ্গালী ড্রাইভারকেও সে নিমতলা ঘাটের চুলোয় যা' বলিতে শুনিয়াছে। অতএব সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া নীলাম্বুর আদিষ্ট চুলোর দিকে গাড়ী চালনা করিয়া দিল।

যথাসময়ে নিমতলা ঘাটের সম্মুখে আসিয়াই সে গাড়ী চালনা বন্ধ করিয়া দিয়াই বলিল,—বাবু, চুলামে আয়া।

রাত্রির অন্ধকারে মুখ বাড়াইয়া নীলাম্বু ঠাহর করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্থানটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার আগেই অন্যমনস্কভাবে বলিয়া উঠিলেন,—এ আবার কোন্ চুলোয় রে?

—কহে বাবু, নিমতলা ঘাট্‌কা চুল্লী?

এত অশান্তির মধ্যেও নীলাম্বুর ওষ্ঠদ্বয় হাস্যে বিস্ফারিত হইয়া গেল। চালক ভাবিল,—এমন সমঝদার না হইলে কী ট্যাক্সি চালান যায়?

সময় কাটাইবার জন্য নামিয়া পড়িয়াই সর্ব্ব দুঃখ-প্রশমক, মহাসাম্যকর ভাগিরথী-বিধৌত পূত স্থান দেখিতে নীলাম্বু চলিলেন।

চালক গাড়ীর 'ষ্টার্ট' বন্ধ করিয়া ছায়ার মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল,—কি জানি, সম্ভ্রান্ত হইলেও আরোহী যদি কদলী প্রদর্শন করে।

চিন্তামগ্ন নীলাম্বুকে নিশ্চল থাকিতে দেখিয়া, চালক পার্শ্বে আসিয়া তাগিদ করিল। নীলাম্বু আবার ফিরিলেন। মটর আবার নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলিল।

পথে চালক আবার প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায় গা, বাবু?

এবার আর নীলাম্বুর চুলোয় যাইতে বলিতে সাহস হইল না। পথের আলোয় রিষ্টওয়াচ নির্দ্দেশ করিল রাত্রি দশটা।

নীলাম্বু ভাবিলেন, তখনও বাটী প্রত্যাগমন করা নিরাপদ নহে, পুলিশ আসিয়া ধর-পাকড় করিলে জাগ্রত প্রতিবাসীদের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে। নীলাম্বু বলিলেন,—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে চলো, সুনীলবরণ উকীলবাবুর বাড়ী।

পাঁচ

......উকীলবাবু যখন বৈঠকখানার লোকদিগকে বিদায় দিয়া বিশ্রামের জন্য অন্দর প্রবেশের চেষ্টায় ছিলেন, এমন সময়ে 'গুড্ ইভিনিং' বলিয়া নীলাম্বু প্রবেশ করিলেন।

কলেজের সহপাঠী বন্ধুর সহিত শিষ্টাচারে খানিকটা সময় ব্যয়িত হইবার পর, নীলাম্বু বলিলেন,—দেখো ভাই, আজ এক বন্ধুর বাড়ীতে গে তার সদর ভেতর থেকে বন্ধ দেখে, অনেক ডাকবার পরও সাড়া না পেয়ে দরজায় খুব ধাক্কাধাক্কি করি, ফলে পুরাণো কবাট জোড়াটা ভেঙ্গে যাওয়ার মতন হোয়ে ওঠে, এই না শুনে দোতালা থেকে বাড়ীওয়ালা ছুটে আসে পুলিশ, পুলিশ করে—আমি পালাই। ছোটবার সময় বাড়ীওয়ালা ভাই পা পিছলে পড়ে গে বিস্তর চোট খেয়েছে, দূর থেকে দেখি রক্তও বেরুচ্ছে। চেনা বন্ধুর চাকরটা আমার বাড়ী চেনে। কাজে ভয় হচ্ছে,—পুলিশ না এসে আমার বাড়ী ঘেরাও কোরে বসে থাকে। ভয়েতে ভাই আমি বাড়ীর ধারে মোটে যেতেই পাচ্ছি না। পথে পথে মোটরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—শুধু এখন উপায় কী কি করা যায়, বল?

—ওঃ, এই ? এ আবার একটা 'কেস্'—এর জন্যে আর ভাবনা কি বন্ধু ? তোমার সে বন্ধুটী যদি থানায় গে নালিশ করেন, তবেই 'কেস' হলে হতে পারে। নয়ত এমনে তো পুলিশ আসবেই না, কারণ তুমি তো বাড়ী-ওয়ালাকে ফেলে দাও নি যে, তার নালিশে পুলিশ তোমায় ধর্ত্তে আসবে ?

—তা' বন্ধুটী এখন কি করেন তা'তো বুঝতে পারছি না। তা' ভাই, তুমি এক কাজ কর, আমার সঙ্গে একবারটী আমার বাড়ী চল—মোটর তো সঙ্গেই আছে আমার। যদি কোন পুলিশ হাঙ্গামা হয়, তুমি থাকবে দেখবে অখন। তুমি ব্যবসাদার মানুষ, তোমার 'ফি'টা আমি দিয়ে দিবো নিশ্চয়ই,—সে বিষয়ে কিন্তু করবার কিছু নেই মনে রেখো।

—ওঃ নীলু ! তোমার কাছ থেকে যদি ফি না নিলে আমার ব্যবসা অচল হয়, তা' হলে বরং ব্যবসাটা তুলে দিলেই ভাল হয় না ? তবে সময়টা বড় অসময়, এখন আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছিলুম এই যা'—খাওয়া হয় নি এখনো।

—তা' বুঝেছি তোমার কষ্ট হবে এ সময়ে। তা' বন্ধুর জন্যে আধঘণ্টাটাক সময় নষ্টই কর এই আমার অনুরোধ, কি আর বলব বল ? তুমি বন্ধু বলেই তোমার কাছে এলুম, নয়ত ফি দিলেও এত রাত্রে হয়ত কেউ যেতে চাইবে না ভাবলুম। তুমি আমার অনুরোধটুকু রাখবে, এটুকু আশা করতে পারি।

—তবে আর কি কোরব বল। বন্ধুর অসময়ে দেখার নামই হচ্ছে যখন বন্ধুত্ব, তখন চলই দেখা যাক্।

উভয়ে মটরে গিয়া উঠিলেন।

ছয়

বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইলে নীলাম্বু অগ্রে নামিতে সাহস করিলেন না, সুনীলবরণকে এক রকম জোর করিয়া নামাইয়া দিয়াই, গাড়ীর অন্ধকারে চুপিচুপি বলিলেন,—তুমি বরং চারিধারটা ঘুরে দেখে এস, কেউ কোথাও আছে কি না।

বন্ধুর খাতিরে উকীলবাবুটীকে গোয়েন্দাগিরিও করিতে হইল। কিছুক্ষণ পরে সুনীলবরণের আহ্বানে. নীলাম্বু গৃহ-প্রবেশ করিলেন। পশ্চাৎ হইতে মটর-চালক হাকিল, —বাবু, ভাড়া ?

ফিরিয়া দেয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়া নীলাম্বু দেখিলেন—সতের টাকা চোদ্দ আনা।

ওঃ, এতগুলি টাকা ভাড়া উঠিয়াছে ! সঙ্গে তো তাঁহার এত টাকা নাই। একমাত্র নীলিমার কাছেই মাহিনার টাকা সমস্ত জমা পড়ে। সে যদি এতক্ষণে নাই-ই আসিয়া থাকে ?—

মোটর-চালককে আশ্বাস দিয়া বন্ধুকে বৈঠকখানা-ঘরে বসাইয়াই নীলাম্বু চলিলেন নীলিমার অন্বেষণে। পথে পদর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। নীলাম্বু উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোর মা-ঠান ফিরেছেন ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—কখন্ ?

—আপনি চলে যাবার আধঘণ্টা বাদেই।

ওঃ, তবে 'শো' দেখার পরই ফিরিয়াছে সে। তবে তিনি বৃথাই সুকুমারের বাটী গিয়া অনর্থক একটা ফ্যাসাদ জুটাইয়া বসিয়াছেন, ফলে কপালে ঘটিয়াছে পুলিশের জন্য উৎকণ্ঠা এবং অর্থদণ্ডও ? হায় !

ইজিচেয়ারে শায়িতা, উপন্যাস-পাঠে-রতা নীলিমাকে দেখিয়া নীলাম্বু প্রশ্ন করিলেন,—এই যে ! তুমি এখনও ঘুমোয় নি যে ?

নীলিমা নিরুত্তর। তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল,—তিনিও যেন অন্তর্তাপে ফুলিতেছেন। ইতিমধ্যে মটর-চালক হাঁকিল,—বাবু, ভাড়া ?

মটর-চালকের তাড়নায়, অন্য প্রসঙ্গ নীলাম্বুর মনের মধ্যেই রহিয়া গেল। নীলাম্বু বলিয়া ফেলিলেন,—শীগ্‌গির গোটা পঁচিশ টাকা দাও তো মটর ভাড়া দেবো, কাল তোমায় দেবো অখন্।

নীলিমার স্ফীত অধর দেশ সহসা বিস্ফারিত হইল। নীলাম্বু সরোষ গর্জ্জন শুনিলেন,—এখানে কি টাকার গাছ পোঁতা আছে যে, রাত বারোটা পর্য্যন্ত ইয়ার্কি মেরে, অধীরাকে নে 'জয়-রাইড্' কোরে আস্‌বেন বাবু, আর আমি

গুণব তার খরচ? লজ্জা করে না? চলে যাও আমার সম্মুখ থেকে।

—হা ভগবান্! এই বদ্‌নাম ছিলো আমার কপালে? কোথায় আমি তোমার আর সুকুমারের খোঁজে সারা কোল্‌কেতাময় ঘুরে বেড়িয়েছি, আর কোথায় কি না, বদনাম দিচ্ছ অধীরার সঙ্গে 'জয়-রাইডে' রাত কাটিয়েছি বোলে?

অধীরা হইতেছে,—নারী-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের অপর একজন পুরাতন কুমারী-সভ্য। এই অধীরার সহিতই নীলাম্বুর বিবাহের পূর্ব্বে রীতিমত কোর্টসিপ্ চলিতেছিল বলিয়া বাজারে গুজব। পরে নীলাম্বুর নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পিতার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার পরিণয় সঙ্ঘঠন হয় নীলিমার সহিত। নীলিমা ছিলেন,—নিতান্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গৃহস্থের স্বরূপা কন্যা। বিবাহের পর, সংঙ্ঘর সভ্যা হইয়া তাহার ওই রূপই পরিণতি ঘটিয়াছিল!

নীলিমা বলিলেন,—তুমি শপথ কোরে বল্‌ছ যে, অধীরার সঙ্গে জয়-রাইডে কাটাও নি এতক্ষণ?

না, না, না। এই দিব্বি গাল্‌ছি,—না। বিশ্বাস করো। ভাল বিপদ্! আবার কি না উলটা চার্জ্জও!

নীলিমা নীলাম্বুর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন,—তোমার দিব্বি আমি বিশ্বাসই করি না। একগলা গঙ্গাজলে বসে বল্লেও,—না।

মটর-চালক পুনঃপুনঃ 'হর্ণ' দিয়াও ফল না পাইয়া পুনরায় চীৎকার করিল,—বাবু! বাবু! বাবু!

বাক্যব্যয়ে কাল কাটাইবার অবসর না পাইয়া নীলাম্বু ঝটিতি চেক বইখানা বাহির করিয়াই বৈঠকখানা ঘরে ছুটিলেন। কি জানি চেক বহিখানা শুদ্ধ যদি নীলিমা কাড়িয়া লয়েন রাগের মাথায়!

পঁচিশ টাকার একখানা চেক সুনীলবরণের নাম বরাবর লিখিয়া দিয়া নীলাম্বু বলিলেন,—ভাই, বাড়ীতে এসেও সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছি। আমার স্ত্রী বলেন, আমি না কি কোন্ এক কুমারীকে নিয়ে 'জয়-রাইডে' বেড়িয়ে বেড়িয়েছি। সেইজন্যে মটর ভাড়াটুকুও দেবেন না। কাজেই এ বিপদের সময় তোমার বন্ধুতার দোহাই দিয়ে তোমার ওপর নির্ভর করছি। শুধু তুমি আজকের ওই ড্রাইভার বেটাকে কোনও গতিকে,—নিজের কাছ থেকে টাকা দিয়ে বিদেয় কোরে দাও। কাল সকালে চেকখানা ভাঙ্গিয়ে নিও এখন।

বৈঠকখানার পার্শ্বে আসিয়া নীলিমা আড়ি পাতিয়া এতক্ষণ সব শুনিতেছিলেন। সহসা উভয়ের সম্মুখে আসিয়া নীলিমা বলিলেন,—আপনি যেই হোন্ না কেন মশাই, আপনাকে ওঁর বন্ধু বোলেই মনে কোরে জিজ্ঞেস্ করছি,—আচ্ছা, বলুন দেখি এত রাত্তির পর্য্যন্ত কোনও ভদ্দর লোক পথে পথে শুধু শুধু ঘুরে বেড়িয়ে অত টাকা মটর ভাড়া দেয়, যদি না সঙ্গে কোনও স্ত্রীলোক থাকে?

সুনীলবরণ হোহো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন, তৎপরে বলিলেন,—মিসেস্ চন্দর, আমি আপনার স্বামীর বাল্যবন্ধু, আমি জানি, উনি সেরকম প্রকৃতির লোকই নন্।

নীলিমা,—তবে কি- বোল্‌তে চান,—আমারই যত দোষ?

সুনীলবরণ,—না, তা বল্‌ব কেন?—শুনেছি না কি আপনারা উভয়েই নারী-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্য।

নিলিমা—হ্যাঁ, তা'তে আর হয়েছে কী?

সুনীল,—তাই যদি হয়, তবে অপর নারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে বাধা দেওয়াও যে আপনাদের উভয়ের পক্ষে অন্যায়, সঙ্ঘ নিয়ম বিরুদ্ধ, এটা ঠিক নয় কি?

নীলিমা—তাই বোলে কি বোলতে চান,—আমার বর্ত্তমানে, আমায় অপমান কোরে উনি অন্য নারীতে অনুরক্ত হবেন, আর আমি চুপ থাক্‌ব?

সুনীল—আমি জানি, আজকের রাত্রে উনি ওরকম কোনও দুষ্কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না। তবু যদি উনি সত্যিই ও রকম কিছু করেন, তা হলেও সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ কোরে আপনার ওরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা উচিতই হয় না—বুঝেই দেখুন না? আমি অবিশ্যি আপনাদের সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন সব জানলেও, ওর সভ্য নই,—এই-ই যা আমার দুর্ভাগ্য!

—বাধা দিয়া নীলাম্বু বলিলেন,—(বন্ধুর দিকে

তাকাইয়া) দেখলে তো ভাই আমি কি তোমার সম্মুখে, ওঁর অবাধ স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনও দোষারোপ করেছি ?

স্নীল,—ওঃ, তবে তুমিও ওই রকম একটা দোষারোপ মিসেস্ চন্দরের ওপর দিতে চাও ; অন্ততঃ, মনে মনেও এখন বুঝেছি ট্যাক্সি ভাড়ার কারণটা কী ?

নীলাম্বু মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া বলিলেন,—মনে মনে চাইলেও আমি পুরুষ বন্ধুর সম্মুখেও অন্ততঃ আমার স্ত্রীর নামে কোনও দোষারোপ করতে চাই নে,—দোষারোপ করাটাকে আমি আত্ম-অপমানকর বোলেই মনে করি।

ইতিমধ্যে মটর-চালক আবার হাঁকিল। স্নীলবরণ উঠিয়া পড়িয়াই যাইতে যাইতে বলিলেন,—দেখুন, আপনারা উভয়েই ওই সজ্ঘটা ত্যাগ করুন, তবে যদি পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাসটুকু ফিরে পান। সজ্ঘটা যুবক-যুবতীদের ছেলেখেলা বই আর কিছু আমার মনেই হয় না। বিশুদ্ধ দাম্পত্য-প্রেমের পক্ষে ওটা শুধু অপমানজনক নহে,—ওটার হন্তারকও।

নীলাম্বু সাগ্রহে বলিলেন,—তুমি যা' বলেছ ভাই। ওই অতগুলো টাকার বিনিময়ে আমিও আজ এই সত্য-টুকুর অভিজ্ঞতা লাভ কোরেছি। ভগবানকে ধন্যবাদ !

সজ্ঘ-ত্যাগে নীলাম্বু যদি অধীরার সঙ্গ বিচ্যুত হয়েন, তাহা হইলে নীলিমার পক্ষে মন্দই বা কি? সেও তো একটা বিরাট অশান্তি হৃদয়ে পোষণ করে।

নীলিমাও সানন্দে বলিলেন,—বেশ ত, আমিও সজ্ঘ ত্যাগ কোরতে খুব রাজী আছি—যদি উনি শপথ করে বলেন যে, ভবিষ্যতে অধীরার সঙ্গে আর তেমন করে অন্তরঙ্গতা রাখবেনই না উনি ?

তাই হবে নীলু তাই-ই হবে। এসো, বড্ড রাত হয়েছে, বলিয়া নীলাম্বু নীলিমার হস্তধারণ করিয়া স্নীলবরণকে বিদায়-জ্ঞাপন করতঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নীলিমার অদর্শনে যে মেঘ নীলাম্বুর চিত্তে জমাট হইয়াছিল, তাহা বুঝি এতক্ষণে উড়িয়াই গেল...

পথে যাইতে যাইতে স্নীলবরণের মনে প্রশ্ন জাগিতে-ছিল—সভ্যতার পূর্ণ আলোক পাইয়া এবং স্বাধীন প্রেমের স্নযোগ লাভ করিয়াও এই সব দম্পতী সাংসারিক শান্তি-লাভ করিতে পারেন না কেন, ইহাই আশ্চর্য্য লাগে !

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বাতাস দিল দোল

শ্রীশচীন্দ্র বসু

এমন অনেক ঘটনা জগতে ঘটে থাকে দৃশ্যতঃ যার কোনো কারণ নেই,—জল পড়া, পাতা নড়ার মত যা সহজ নয়। নভেলের অনেক ব্যাপার আমরা অসম্ভব বলে বিশ্বাস কোরতে চাই না, কিন্তু অনেক সময় চোখের সামনে এমন কিছু ঘটতে দেখা যায়, যা তার চেয়ে অবিশ্বাস্য, তার চেয়েও অহেতুক। যে জিনিষকে আমরা স্বর্গীয় বলে অভিহিত করে থাকি, হৃদয়ের কোমলতম অংশে যার স্থান, তার ফল যে কি রহস্যময় ও অচিন্তনীয় হতে পারে একটি ঘটনায় আমি তাই বোলব। এখন স্পষ্ট অনুভব কোরতে পারি জীবনের স্বল্প শান্ত প্রবাহের নীচে এমন অনেক আবর্ত্ত আছে, যার খোঁজ আমরা নিজেরা জানি না, অথচ যা আমাদের ভাগ্য পরিচালনা করে।

তের চৌদ্দ বছর যখন বয়স,—সেই যখন কণিকা চ্যাপ্টা লম্বা বেণীটা কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর ফেলে ছুরুর এক সুন্দর ভঙ্গীসহকারে নেচে বেড়াতো,—তখন থেকে মর্ম্মরের সঙ্গে তার আলাপ। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তার বাল্যের সে উচ্ছলতা কমে এসেছে। হয়তো বা কতকটা মর্ম্মরের স্পর্শের প্রভাবে সে উৎসব এবং উন্মেলতা ততটা পছন্দ করে না। কোথাও বড় বেশী সে যায় না এক কলেজে ছাড়া। যখন বাড়ীতে বসে কাপড়ে ফুলতোলা বা 'সঞ্চয়িতা' থেকে টুকরো টুকরো কবিতা পড়া আর ভালো লাগে না, তখন সে চলে আসে মর্ম্মরের কাছে। মর্ম্মর থাকে সহরের এক অনাখ্যাত প্রান্তে একটা কাঠের বাড়ির দোতালার একটা একটা ঘরে। ঘরের একদিকে তার সামান্যতম আসবাব-পত্র নিতান্ত অগোছালভাবে ছড়ানো আর একদিকে দু'-তিনটি ছোট টুল, একটা ইজেল, তুলি, রং আর ক্যান-ভ্যাস। ঘরের সামনে ছোট্ট একটি বারান্দা। যেখান থেকে দেখা যায় ধূলোভরা রাস্তাটা আর দূরের ধূম উদ্গীরণী কারখানার চিমনী। কণিকা যখনই আসে, দেখে ও বসে বসে তুলি চালাচ্ছে অথবা হয়তো জানালা দিয়ে চেয়ে আছে; তখন তার চোখ দু'টি দেখলে মনে হয় যেন ওর সমস্ত আত্মা ও ছড়িয়ে দিচ্ছে জগতে ওই চোখের মধ্য দিয়ে। তার চেহারা পার্থিব অর্থে দেখতে গেলে সুন্দর নয়, মাঝারি রকম তার দৈর্ঘ্য, সাদা ফ্যাকাশে রং, তেলহীন চুলগুলি নিজেদের খুসীমত অবিন্যস্ত হয়ে আছে। কিন্তু তার চোখ! আঃ, সে যখন চোখ তুলে তাকায়, তখন অন্তত মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে ভুলে যেতে হয়,—তা'তে আকাশের সুনীল কারুণ্য আর সমুদ্রের অতল রহস্য। তার এত সব যাবার জায়গা থাকতে কণিকা এখানেই আসতে ভালো-বাসে, অনেক সময় মর্ম্মর টের পায় না তার আগমন, টের পেলে একটু হেসে বলে, বোসো—তারপর আবার নিজের কাজে মন দেয়।

কণিকা ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়ায়, হয়তো বিছানাটা ঝেড়ে আবার পেতে দেয়, কাপড়টা কুঁচিয়ে রাখে, ওর আঁকা ছবিগুলি খুঁজে খুঁজে বের করে দেখে, অথবা হয়তো বসে থাকে শুধু চুপ করে। বেশী কথা কেউ বলে না, বেশী শব্দ কেউ করে না। এখানে এলে তার মনে হয়,—সে যেন বিশাল এক মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তে সূর্য্যাস্ত দেখছে, আর কোথা থেকে যেন আসছে মৃদু ধূপের গন্ধ,—অজানিত অবাস্তব কোনো উৎস থেকে।

প্রভাংশুর সঙ্গে মর্ম্মরের চেনা ছাত্রজীবনের আরম্ভে; মাঝের কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে যৌবনের আরম্ভে পড়াশুনার ক্ষেত্রেই আবার তারা একত্রিত হয় এবং নিজেদের সম্পূর্ণ অলক্ষিতে ওরা পরস্পরকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেয়। কোনোদিন ওরা নিজেদের সে

মনোভাব অপরের কাছে উচ্চারণ করে নি, কিন্তু রক্তের উষ্ণ স্রোতে এক অদ্ভুত আকর্ষণ তারা অনুভব কোরতো। বাল্য-বন্ধুত্বের ভঙ্গুরতা ছাড়িয়ে এসে তারা বয়স্কতার প্রগাঢ় আত্মীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হোলো।

তারপর মর্ম্মর চলে এলো তার কাঠের ঘরে, তার ক্যানভ্যাস আর তুলির কাছে। প্রভাংশু এসে বোললো, চল্লুম বিদেশে বছর তিনের জন্য, চিঠি লিখো।

মর্ম্মর বোললো, তার চেয়ে চিঠি না-লেখাটাই আমাদের মনে রাখার সূত্র হোক্।

—ঠিক বলেছো, প্রভাংশু বোললো, চিঠি না-লিখলে যদি ভুলে যাই তো সে-ভোলায় দোষ নেই।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে অন্যমনস্ক মর্ম্মর বোললো, ভোলা কি এত সহজ।

তার তিন বছর পর প্রভাংশু ফিরলো, সরকারী চাকরী পেল, কোলকাতায় বাসা কোরলো। কাঠের ঘরে মর্ম্মরের সঙ্গে সে দেখা কোরতে এল, তারপর প্রায় প্রতিদিনই সে আসতে লাগলো। সাধারণ বলা-কওয়া যখন শেষ হোলো, এল নিস্তব্ধতার পালা; দু'জনে বসে থাকতো চুপচাপ, আর তখন প্রভাংশু অনুভব কোরতো সেই পুরোণো আকর্ষণ, সেই রক্তের উষ্ণ তীব্র স্রোত যা তাকে ভাসিয়ে নিতো। এক-এক সময় সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো মর্ম্মরের দিকে; ভাবতো, ও কি বুঝতে পারে, ও কি টের পায় এই রক্তের সূক্ষ্ম টান! কিন্তু মর্ম্মর চিরদিনের মতই নীরব, রহস্যময়।

এমনি এক সময় সে দেখলো কণিকাকে,—ধূপের গন্ধের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে যে ম্লান সূর্য্যাস্ত দেখছে।...কণিকা চমকে উঠলো, পশ্চিমের লাল আকাশটা রংএর ভারে যেন ফেটে পড়তে চায়; উঃ কি উজ্জ্বল, কি তীব্র সে রং! শারীরিক কোনো যন্ত্রণার মত সেই রং তার চোখকে আঘাত কোরলো, তার শান্তি প্রাত্যহিক ধ্যান থেকে সে জেগে উঠলো। তার প্রতি দিনের গোধূলির সূর্য্যাস্ত দেখার ভেতর এ অভিজ্ঞতা তার হয় নি,—এত রং, এত তীব্রতা, এই আঘাত, এই জেগে ওঠা, এ তার কাছে নতুন। তার ধ্যান থেকে সে জেগে উঠে দেখলো এই তীব্রতা, এই বিরাট উত্তেজনা সে এর আগে অনুভব করে নি।

আর প্রভাংশু যেন চলতে চলতে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ালো। কোলাহলমুখর রাজপথ দিয়ে যেতে সে হঠাৎ এসে পড়লো কোন্ অজানা রহস্যময় রাস্তায়, যেখানে কোনো উৎসব নেই, চাঞ্চল্য নেই, জনতা নেই,—যেখানে চোখের সামনে প্রান্তরের শেষে ম্লান সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। সে মুগ্ধ হোলো, কিন্তু এক অদ্ভুত আশঙ্কায় বিমর্ষ হয়ে উঠলো। এ কি মৃত্যুর জগতে সে এলো! কিন্তু না, সে বাঁচাবে, এই ম্রিয়মান অস্ত-জগতকে সে তার প্রাচুর্য্য দিয়ে বাঁচাবে, তার বাঁচার স্পর্শ দিয়ে সে এখানে উৎসব গড়ে তুলবে।

মর্ম্মর তখন কণিকার ছবি আঁকছে, তার প্রাণের সবটুকু রং দিয়ে। সামনের টুলটায় কণিকা বসেছিলো, তার হঠাৎ নড়ে ওঠা দেখে সে ফিরে তাকিয়ে দেখলো দরজায় প্রভাংশু দাঁড়িয়ে। সাধারণভাবে সে ওদের দু'জনের পরিচয় করে দিলো।...

...মর্ম্মরের ছবি আর অগ্রসর হচ্ছে না, কণিকা আজ কাল আর তত আসে না। কেন আসে না, ভাববার সময় তার নেই,—হয়তো পড়া শুনো, হয়তো সময়াভাব। সে সব চিন্তা মর্ম্মরের মনকে কোনদিন পীড়িত করে নি, কণিকাকে সে সূক্ষ্ম নৈর্ব্যক্তিকভাবে মেনে নিয়েছে।

দিন কতক পর একদিন সন্ধ্যায় এল কণিকা, ওর চোখ দুটো যেন একটু অস্বাভাবিক ম্লান। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বোললো, তুমি কি রাগ করেছো?

—কেন?

—এ ক'দিন আসি নি বলে?

—না-না, মর্ম্মর হেসে বোললো, তারপর ছবির ঢাকনাটা তুলে বোললো, এসো।

—না, আজ থাক্, আজ থাক্, তুমি এখানে এসে বোসো।

মর্ম্মর ফিরে এলো, কণিকা দু'হাতের ভেতর মুখ ঢেকে বসে রইলো। অনেকক্ষণ পর এক অদ্ভুত সন্দেহে মর্ম্মর ডাকলো, কণিকা।

কণিকা মুখ তুললো; তার শুভ্র মুখের ওপর চোখের জলের ধারা বয়ে গেছে, ঝড়ে আহত পদ্মের মত। রুদ্ধ স্বরে সে বোললো, মর্ম্মর, আমি তোমায় ভালোবাসি।

মর্ম্মর বিস্ময়হীন ভাবহীন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বোললো না, তার দেহ যেমন ছিল, তেমনি নিশ্চল রইলো।

—মর্ম্মর, বিশ্বাস করো আমি তোমায় ভালোবাসি, অনেক দিন থেকে। তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না, তা' হলে আমি মরে যাবো, তুমি আমায় ধরে রাখো। ও রকম করে চেয়ে আছো কেন, আমার ভয় করে। কথা বোলছো না কেন? বলো, কিছু বলো। আমি তোমায় ভালোবাসি মর্ম্মর, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না? আঃ, তুমি কি সুন্দর করে আমার ছবি একেছো! ও ছবিটা আমায় দেবেতো, বলে কণিকা ছবিটার দিকে এগিয়ে যাবার জন্ম পা বাড়ালো।

ঘরে অন্ধকার জমছে, আলো জ্বালা হয় নি। এতক্ষণ মর্ম্মর পাথরের মত স্তব্ধ হয়েছিল, এবার সে ওর দু'হাত ধরে ওকে আবার বসালো। কতক্ষণ সে আবার বসে রইলো চুপ করে; তার চোখ বুজে এলো অপরিসীম বেদনায়, দাঁত দিয়ে সে নীচের ঠোঁট চেপে ধরলো। কিন্তু তারপর সে ফিরে এলো নিজের মধ্যে, ওকে কাছে টেনে আনলো, ওর কাপড়ের আঁচল দিয়ে সাবধানে ওর মুখ মুছে দিতে লাগলো। এবার আর কণিকা চেপে রাখতে পারলো না, ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর কোলে উচ্ছ্বসিত কান্নায়। বোলতে লাগলো, আমায় ক্ষমা করো মর্ম্মর, ক্ষমা করো।...

আর ওর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে খুব আস্তে মর্ম্মর বোললো, কেন কাঁদো কণিকা, কোনো ভয় নেই। ও আমার অনেকদিনের বন্ধু, ওকে আমি বড় ভালোবাসি। কোনো ভয় নেই তোমার, কোনো ভয় নেই।

আর কান্নার অর্গলহীন স্রোতের ভেতর থেকে কণিকা শুধু বোলতে থাকলো বারবার, আঃ, তুমি কি ভালো মর্ম্মর, তুমি কি ভালো।...

প্রভাংশুকে মর্ম্মর সেদিনের পর আর ভালো করে দেখে নি। এর ভেতর সে এসেছেও কম, আর যখন এসেছে তখন বেশীক্ষণ থাকে নি। যেটুকু থেকেছে বিশেষ কোনো কথাই সে বলে নি, এসেই যাবার জন্ম ছটফট করেছে। মর্ম্মর লক্ষ্য না করে পারে নি ওর অন্যমনস্ক-ভাব, ওর কপালে কুঞ্চন-রেখা, ওর অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধতা। ধৈর্য্যসহকারে সে অপেক্ষা করেছে হয়তো প্রভাংশু কিছু বোলবে, হয়তো ওর ভেতরকার চাপা কষ্টটা প্রকাশ করে নিজেকে হাল্কা কোরবে, কিন্তু প্রভাংশু শুধু কতক্ষণ অস্বাভাবিকভাবে ইতস্তত করে ফিরে গেছে।

প্রভাংশুর জীবনে তখন এসেছে সবচেয়ে বড় সন্ধিক্ষণ। এ পর্য্যন্ত তাকে কোনোদিন বিশেষ চিন্তার মধ্যে আসতে হয় নি। কৃতকার্য্যতাকে আদর্শ করে সে এ পর্য্যন্ত মসৃণ-ভাবে চলে এসেছে; কিন্তু এখন, যেখান থেকে সে সবচেয়ে কম আশা করেছিল সেখান থেকে এলো বাধা, এলো দ্বিধা। মর্ম্মরের কাছে সব খুলে বলাই এক-একবার সে সঙ্কল্প করেছে, কিন্তু সন্দেহ তাকে সেদিকে অগ্রসর হতে দেয় নি। যে উষ্ণ সূক্ষ্ম আকর্ষণ সে রক্তের মধ্যে অনুভব কোরতো, শুধু তার ওপরই নির্ভর কোরতে সে ভরসা পায় না। মর্ম্মর কি এতদিন পরেও এমন কঠিন সন্ধিক্ষণেও তাকে ভালোবাসতে পারবে? সে বিশ্বাস কোরতে পারে নি। আর যদিও মর্ম্মর এখনও ঠিক আগের মতই থেকে থাকে, পরস্পরের সেই অদৃশ্য আকর্ষণ যদিই বা এখনও সে অনুভব করে, তবু এ রকম অভাবিত সমস্যায় কি সে নির্ব্বিকার থাকতে পারে? আর যাই হোক্, মানুষের মনোবৃত্তি প্রতি মানুষের মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক। এবং এই কঠিন 'প্যাশন'কে মানুষের পক্ষে জয় করা সহজ নয়। কাজেই প্রভাংশু বারবার ফিরে এসেছে। কিন্তু এখন সে দ্বিধাদ্বন্দ্বের এমন চরমে এসে পৌছেছে যে, একটা কিছু তাকে কোরতেই হবে। তার হৃদয়ের উদ্বেল স্রোতকে সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, তার সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়েছে, এখন তাকে আত্মসমর্পণ কোরতেই হবে। মানুষ জীবনে অন্তত একবার এমন প্রতিজ্ঞা করে

যা সে না রেখে পারে না, এখন এসেছে সেই সময়। এখন সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করে যে, জগতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে ভালোবাসাকে আটকে রাখা যায়, এমন কিছু নেই যার জন্য সে ভালোবাসা ত্যাগ কোরতে পারে। না, না—তাকে পেতেই হবে। হয়তো এ নিতান্ত স্বার্থপরতা, কিন্তু এতে অগৌরব নেই,—কারণ সে মানুষ, দেবতা নয়। এ পাওয়া সব স্বার্থের অতীত,—এ না হ'লে তার বাঁচা অর্থহীন। আর নয়, এবার তাকে নির্দ্দয় হতে হবে, তাকে দাবী কোরতে হবে, এখন মর্ম্মরকে তার দরকার।

সেই যে সেদিন কণিকা এসেছিল সন্ধ্যায়, তার দিন-কয়েক পর মর্ম্মর বিকেলে রাস্তায় বেরুলো এমন সময় প্রভাংশুর সঙ্গে সে মুখোমুখি এসে পড়লো; থম্‌কে যেয়ে প্রভাংশু শুধু বোললো, এই যে!

তারপর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মর্ম্মর হঠাৎ বোললো, ক্ষিধে পেয়েছে, খাওয়াবে প্রভাংশু?

প্রভাংশু একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বোললো, চলো।

একটা ভালো হোটেলে ওরা যখন এসে বোসলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়ার পর মর্ম্মর বোললো, আমি আজ তোমার ওখানে যাচ্ছিলাম।

প্রভাংশু বোললো, আমিও যাচ্ছিলাম তোমার কাছে,—তোমাকে একটা কথা বোলতে হবে।

মর্ম্মর বোললো, তার আগে আমার কথাটা শেষ কোরতে দাও। তারপর একটু নীরব থেকে টেবিলের দিকে চোখ রেখে বোললো, প্রভাংশু, তোমার কাছে এ পর্য্যন্ত কোনোদিন কোন অনুরোধ করি নি, কিন্তু আজ একটা কোরবো। আমার খুব ইচ্ছা তুমি এ কথাটা রাখো।

প্রভাংশু এতক্ষণ ঠিক এই ভয়টাই কোরছিল, বোললো, তোমার অনুরোধ রাখতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে কোরবো, কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আছে যা নিজের জন্যও মানুষ কোরতে পারে না; আশা করি তেমন অনুরোধ তুমি আমায় কোরবে না।

মর্ম্মর এ কথার সোজা জবাব কিছু দিল না, অনেকক্ষণ সে চেয়ে রইলো মাটির দিকে, তারপর হঠাৎ তার চোখ তুলে তাকালো প্রভাংশুর দিকে, মৃদুস্বরে বোললো, প্রভাংশু, তুমি কণিকাকে বিয়ে করো।

প্রভাংশু চমকে তাকালো ওর দিকে, কিন্তু মর্ম্মরের চোখ যেন ওর এ দৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো,—সে-চোখের দিকে চেয়ে প্রভাংশু তার চোখ নামিয়ে নিল।

শান্ত অকৃত্রিম স্বরে মর্ম্মর বোলতে লাগলো, ওকে আমি ছোটকাল থেকে জানি, আমি বুঝতে পেরেছি ও তোমায় ভালোবাসবে। আর তোমাকেও একথা বোলতে পারি যে, ওর মত মেয়ের ভালোবাসা পাওয়া তোমার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়,—তুমি সে গৌরব হারিও না। ওকে তুমি বিয়ে করো, যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে তুমি বিয়ে করো, এতে তোমরা সুখী হবে। আর জেনো, এ বিয়েতে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না। বলো, প্রভাংশু, বলো, আমার কথা রাখবে,—বলে সে তার হাতটা এগিয়ে দিল।

অনেক, অনেকক্ষণ পর এক অদ্ভুত স্বরে প্রভাংশু বোললো, আমায় একটু সময় দাও।

পরদিন বিকেলের ডাকে মর্ম্মর তার প্রশ্নের জবাব পেল:

—মাপ কোরো মর্ম্মর, তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না,—আর মাপ কোরো এই তোমায় না বলে চলে যাওয়া। কিন্তু এর জন্য বোধ হয় আমি দায়ী নই। মর্ম্মর, তুমি যদি দেবতা না হয়ে মানুষ হতে, তুমি যদি তোমার বন্ধুত্বের বাইরে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোনোদিন টের পেতে, তুমি যদি পৃথিবীটাকে ঠিক পৃথিবী বলেই দেখতে পারতে,—তা' হ'লে হয়তো আমি বাঁচতে পারতাম, তোমার কণিকাকে বিয়ে কোরতে পারতাম। কিন্তু তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অমানুষিকভাবে অমানুষ। মর্ম্মর কেন তুমি এত উদার হতে গেলে? তুমি কি ভাবো আমি জানি না তুমি কি নিদারুণ কষ্টে সেদিন ও কথাগুলো বলেছিলে? কিন্তু কথা দিয়েই কি সব ঢাকা যায়! কোনো একটা ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে প্রকাশ না করে

পারে না। তাই তুমি যখন ওর ছবির ওপর তুলি বোলাতে, তখন তুমি আমার কাছে ধরা দিয়েছো।

—দুঃখ কোরো না মর্ম্মর, আমাদের তিনজনের একসঙ্গে বাঁচা সম্ভব নয়। চলে যেয়ে আমি যদি তোমার ত্যাগের সামান্যতম প্রতিদান দিতে পেরে থাকি, তবে সেটুকুই আমার সার্থকতা। তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে, সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ,—কিন্তু তুমি যদি পৃথিবীর মানুষ হতে, তুমি যদি মানুষের মত ভালোবাসতে, তা' হ'লে হয়তো তোমায় আরো ধন্যবাদ জানাতে পারতুম। ইতি।

...তারপর সন্ধ্যা এলো, এলো রাত। ভাষাহীন, নীরব অন্ধকারে ছায়াময় একটা প্রেতের মত সে বসে রইলো,—মাঝরাতে ক্ষীণ একটু চাঁদের হলদে আলো, জানলা দিয়ে তার পায়ের কাছে পড়লো,—তারপর আস্তে আস্তে তাও সরে গেল। তারপর আকাশের তারারা ম্লান হোলো, রাত্রি হোলো শেষ। তখন সে উঠলো।

বিকেলের আলো যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন কণিকা এলো। আজ অনেকদিন পর তার বড় ইচ্ছে হয়েছিল, অজানা উৎসহতে আসা ধূপের গন্ধের ভেতর দাঁড়িয়ে প্রান্তরের শেষে ম্লান সূর্য্যাস্ত দেখার। কিন্তু ঘরে এসে সে দেখলো তার চেহারা বদলে গেছে; ওর বাক্স আর বিছানা বাঁধা রয়েছে, সেই বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো,—দু'জনেই বুঝলো কিছু বলার আর কোন প্রয়োজন নেই। তারপর মর্ম্মর চিঠিটা দিল ওর হাতে। কিছুক্ষণ পর কণিকা বোললো, আচ্ছা, আমায় ফেলে কোথায় চলেছো?

অনেকক্ষণ পর মর্ম্মর কথা বললো,—যেন বহু যুগ সে কথা বলে নি, তার স্বর যেন তার অজ্ঞাতে বেরিয়ে এলো কোন্ সম্মোহিত অবচেতনা থেকে,—কোথায় যাবো সেকথা জিজ্ঞাসা কোরো না। এতদিন করেছি শুধু শিল্পের সাধনা, এবার কোরবো মানুষ হওয়ার তপস্যা।...হয়তো ও ঠিকই বলেছে, হয়তো আমি ওকে বড় বেশী ভালোবেসেছিলাম, হয়তো সেজন্যই ওকে হারাতে হোলো। কিন্তু সত্যিই কি তা'তে আমি সুখী হতাম না? তোমাকে দোষ দিই নে কণিকা, তুমি আমায় এত ভালোবেসেছো যে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। আমার শিল্পকে, আমার সাধনাকে তুমি ভালোবেসেছিলে। কিন্তু পুরুষ যেমন শুধু একটা সাধনাকে আশ্রয় করে বাঁচতে পারে, স্ত্রীলোকে তা পারে না। তাই তুমি যখন ওকে ভালোবাসলে, তখন আমার সব ব্যথার মধ্যেও আমি বিস্মিত হই নি। ওর ছিল স্বাস্থ্য, ছিল রূপ, ছিল বাঁচার স্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্পদ; তোমার কাছে তার প্রয়োজনও কম নয়। তাই আমি চেয়েছিলাম তোমাদের সুখী কোরতে আমার সবটুকু দিয়ে। কিন্তু ও তা নিল না, ফিরিয়ে দিল,—কারণ পৃথিবীতে জন্মে মানুষ হয়েই সে থাকতে চেয়েছিল।... হয়তো আমারি ভুল, হয়তো আমি ওকে বড় বেশী ভালোবেসেছিলাম।

—যা হবার তা' তো হোলো, কিন্তু তুমি কেন চলে যাচ্ছো?

-কেন যাচ্ছি তা নিজেও জানি না ভালো করে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমাকে যেতেই হবে।

কণিকা একটু চুপ থেকে আবার বোললো জানলার বাইরের দিকে চেয়ে,—এই একদিনের ভেতর আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম ঠিক, সে ভালোবাসায় ফাঁকি ছিল না; কিন্তু একদিন আমাকে আবার তোমার জন্য অনুতাপ কোরতে হোতো; কারণ, আমি ভালোবেসেছিলাম তোমাকে, তোমার সাধনাকে, তোমার এই ঘরকে,—যেখানে তোমার আত্মাকে আমি স্পর্শ কোরতে পারি। সে ভালোবাসাকে আমি আজ আরো বেশী করে অনুভব কোরছি,—আজ যদি তোমাকে হারাই, তবে কি নিয়ে বাঁচবো? মর্ম্মর, তুমি যদি চলে যাও তা'তে কার কি লাভ হবে? তুমি কি মনে করো সে তা'তে তৃপ্তি পাবে? আমাদের জীবনে দুঃখের অভাব নেই, তার ওপর আর মিছিমিছি বাড়িয়ে লাভ কি? যা চলে গেছে, যাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তার জন্য চিরদিন বসে থাকলেও কোন লাভ নেই।...মর্ম্মর, এমন কি কিছু নেই, যা দিয়ে আমি তোমায় তৃপ্ত কোরতে পারি, একটু শান্তি দিতে পারি?

কণিকা মর্ম্মরের একটা হাত টেনে নিয়ে মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। মর্ম্মর দেখলো ওর চোখে এবং গালে জলের ফোঁটা চক্‌চক্ কোরছে। অনেকক্ষণ পর সে বোললো, সত্যিই কি তুমি আমায় চাও?

কণিকা কোনো কথা না বলে ওর হাতটায় তার ঠাণ্ডা ভিজে গালটা রাখলো।

—বেশ তাই হবে, মর্ম্মর বোললো, শুধু আমার সন্দেহ ছিলো তুমি এখনও আমাকে চাইবে কি না। আজ আমার মনে হচ্ছে, যেন তোমাকে আরো বেশী ভালোবাসতে পারবো। হয়তো ওর চলে যাওয়াটা ভালই হোলো, হয়তো তা আমাদের ভালোবাসার আশীর্ব্বাদ। আমার মনে যে বনানী স্তব্ধ হয়েছিল, হয়তো এ না হ'লে তা জাগরণে মর্ম্মরিত হয়ে উঠতো না।

শ্রীশচীন্দ্র বসু

ডিটেকটিভ গল্প

মেকী টাকা

কুমারী সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুলিশের বিখ্যাত গোয়েন্দা তরুণকুমার ও তাহার পালিতা ভগ্নীর সংসারটা একরকম মন্দ চলিতেছিল না। কয়েকদিন হাতে বিশেষ কাজ না থাকায় তরুণ বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই। বোন্‌টিও যেন বাঁচিয়াছে। সারাদিন ধরিয়া নানারকম খাবার তৈরী করিয়া তরুণকে খাওয়াইবার তাহার যে হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে ত ব্যাচারী তরুণ অস্থির পঞ্চম।

তরুণ মৃদুকণ্ঠে দু'-একবার প্রতিবাদ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই; বরং বেশ প্রসন্ন-মুখেই অমলা বলিয়াছে, "কোন ভয় নেই দাদা, যখন লোহার গুলিগুলো এমন করে হজম করতে পেরেছ, তখন বোনের দেওয়া ক্ষীরের গোলাগুলো খুব হজম হবে।"

কিন্তু বসিয়া বসিয়া ক্ষীরের গোলা হজম তরুণের ভাগ্যে ছিল না। সেদিন সকালে উঠিতেই পিওন আসিয়া একখানি তার দিয়া গেল।

সেখানি পড়িয়া তরুণ ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

অমলা নিকটেই ছিল। বলিল, "খবর অতিমাত্রায় শুভ—দাদা, নয় কি? এবার কি খুন, না ডাকাতি?"

তরুণ সহজ সরল দৃষ্টিতে অমলার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া দিয়া বলিল, "একসঙ্গে ও দুটোই হওয়া সম্ভব দিদি, এবং আরও কিছু।"

আরও কিছু?

"জালিয়াতি। এই ছোট সহরটাই শুধু নয়, ভারত জুড়েই আবার এমন ঝড় উঠবে, যাতে লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনেও নিশ্চিন্ত হতে পারবে না—ভয়ে ভয়ে ভাববে সেটা আসল না মেকি—রাজার আপনার ঘরের, না শয়তানের কারখানার?"

অমলা চঞ্চল দৃষ্টিতে তরুণের মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে সভয়ে বলিল, "এমন ভয়ানক লোককেও তোমরা জেলের বাইরে ছেড়ে রেখে দিয়েছ দাদা!"

তরুণ হাসিল। হাসিয়া বলিল, "আইন পাপের সাজা দেয় দিদি, তার পাপ প্রবৃত্তিকে ধুয়ে-মুছে দিতে পারে না। সাজায় সাধু খুব কমই তৈরী হয়—নরপিশাচ উগ্রমূর্ত্তি ধরে বেরিয়ে আসে শত শত। তা' ছাড়া, আইন চিরদিন কাউকে আটকে রাখতে পারে না।"

"লোকটা কতদিন ছাড়ান পেয়েছিল দাদা?"

বার বৎসর। মরণ রোধ করে রাখবার ক্ষমতা মানুষের নেই। সেই মরণের কবলে শুয়ে লোকটা জেলের বাইরে এসে কবর নেয়। এ তারটা জানাচ্ছে, আবার সে দানো পেয়ে কবরের বাইরে এসেছে। বাঙলার ঘরে ঘরে জাল নোট পোরা, এমন কি ব্যাঙ্কের গভর্ণারের পকেটেও বাদ পড়ে নি। এই গতবারের কীর্ত্তি—জানি না, এবার কতদূর কি করবে!

"জানলেই যখন, আটক করাও না—"

"আইন তা' বলে না দিদি। দোষের সাজা, অপরাধের দণ্ড বিদ্রোহের শাসন আইন করবে—কিন্তু বিনা কারণে না কারুর একগাছি চুল পর্য্যন্ত সে নষ্ট হতে দেবে না।"

নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে হতাশভাবে চাহিয়া অমলা তরুণের কথা শুনিতেছিল। হঠাৎ বলিল, "কিন্তু দাদা, শ্যামাপোকা পুড়ে মরতেই জন্মায়, সেই রকম এও ত?"

তরুণ স্মিতহাস্যে বলিল, "এক কাপ চা নিয়ে আয় দিদি। পাপী জাহান্নামে যাক্, আমার ঘরে শান্তি আনন্দ বিরাজ করুক।"

"এটা কিন্তু তোমার মুখস্ত কথা দাদা, বুকের প্রার্থনা নয়। চা আনছি, খেয়ে ফাঁদ পাততে ছোট, যা' তোমার চিরদিনের কাজ। বেড়াল ইঁদুর ধরব না বলে হবিষ্যির হাঁড়ী চড়ালে কেউ বিশ্বাস করে?"

অমলা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট কয়েক বাদেই তৈরী চায়ের পেয়ালা হাতে পুনরায় ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

সবেমাত্র অরুণ ট্রে হইতে চায়ের কাপটী মুখে তুলিয়াছে, গম্ভীর পদবিক্ষেপে একটী লোক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক ধীরকণ্ঠে বলিল, "এ ভাবে অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করলে আপনার গৌরব খুব বেশী যে বাড়বে না, এ আমি জ্যোতিষের অঙ্ক না পেতেও বলে দিতে পারি অমলা দিদি। সুতরাং এক পেয়ালা চা খেতে খেতে খোস মেজাজ তরুণ ভায়ার সঙ্গে দুটো বিষয়-কর্ম্মের কথা কয়ে নেওয়া যাক্।"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "কবে ফিরলে সোলেমান? খবর কি?"

লোকটী তাচ্ছিল্য-ভঙ্গীতে বলিল, "আজই। খবর খাসা—আবার ব্যবসা করছি। ওই যে নেমন্তন্ন-পত্র এসে গেছে দেখ্‌ছি—বলিয়া তারখানি হাতে তুলিয়া লইয়া সোলেমান একবার হোহো করিয়া হাসিল।

তরুণ দারুণ বিস্ময়ে সোলেমনের মুখের দিকে চাহিল। দুষ্কৃতকারী এমন করিয়া কথা বলিতে পারে না কি? ধীর-কণ্ঠে বলিল, "কাজ ধরলে কোথায়?"

সোলেমান হাসিয়া বলিল, "সে খোঁজের ভারটুকু তোমারি ওপর ছেড়ে দিলুম বন্ধু। কাজটা এমন কিছু শক্ত ত হবে না; বিশেষ, তোমার পক্ষে। কিন্তু খবরটা পাওয়াই হ'লে শক্ত; তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম জানাতে। হাজার হোক্ বন্ধুলোক, কি বলো, হেঁ-হেঁ-হেঁ।"

তারপর চঞ্চল চক্ষে চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, "সিরাপ খাবে তরুণবাবু? বেশ ভাল তাজা জিনিষ। আজ পর্য্যন্ত যে ক'টা বেরিয়েছে, সবার সেরা। খাবে না, কেন? এক চুমুক, তাও নয়। বেশ, তবে এর গুণাগুণটা বলে যাই শোন। পানে দেহ ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ ত হবেই, আর একটু গোলাপী নেশা। এইটুকুই আমার আবিষ্কার—বুঝ্‌লে, দুদ্দোর দারগা, বড় দারগা, এমন কি পুলিস-সাহেবকে পর্য্যন্ত চাকিয়ে সার্টিফিকেট্ নেবার ব্যবস্থা করেছি। রইল বোতলটা, কি বলো? না না, লজ্জা কি? আমি ভাল জানি, পাপ কাজ তোমরা যতটা বুক ঠুকে, বগল বাজিয়ে কর, আমরা পেশাদারী হয়েও তার সিকির সিকিকে আমল দিতে পারি না। আচ্ছা, আসি তা' হ'লে। ধন্যবাদ বন্ধু, ধন্যবাদ!"

সোলেমান চলিয়া গেল। দ্বারের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অমলা বলিল, "এ কে দাদা, বুকে একটুও ভয়ডর নেই—পাপীর মন সব সময় ভয়-কাতর, তারা লুকিয়ে ফেরে, এ যে একেবারে উল্টো।"

তরুণ মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করিল; বাহ্যিক আকৃতিতে কিন্তু অন্তরের সঠিক ভাব ধরা পড়িল না।

দ্বারে বেল বাজিয়া উঠিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার কষ্টটা পর্য্যন্ত স্বীকার না করিয়া তরুণ হাঁকিল, "আসুন।"

একজন পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লোক ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "দেখুন, একবার তরুণ গোয়েন্দাকে ডেকে দিতে পারেন—আমার বড় বিপদ মশায়, বড় বিপদ!"

অমলা বলিল, "কেন, কি কথা বলুনই না, ওই ত উনি আপনার সামনেই বসে রয়েছেন।"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "উনি জানেন। আমার আমার সঙ্গে ওঁর বহুদিনের জানাশোনা, আজ নতুন নয়।"

মুহূর্ত্তের জন্য লোকটী যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আরম্ভ করিল, "এই যে, ভাল ত, নমস্কার। হ্যাঁ তা' জানি বই কি মশায়, স্বনামধন্য পুরুষ, তাই জন্যেই ত ছুটে আসা। হ্যাঁ যা' বল্‌ছিলুম, আপনি না হ'লে ভাইপোটার কোন গতিই ত হয় না দেখ্‌ছি। পরের মোটর নিয়ে বেরিয়েছে, এখনো ফিরল না।"

তরুণ মৃদু হাসিল মাত্র, কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না।

অমলার জিজ্ঞাসায় প্রৌঢ় বলিতে লাগিল, "কি আর বলি মা, সবই করে কাল গুণে। ভাইপোটা কোলকাতায় ছিল, দু'-দশপয়সা আন্‌ছিলও, কোথাকার শনি আহুতি বলে মেয়েটার চিঠি পেয়ে ছুটে এল। আমায় বল্‌লে, একবার রায়েদের মোটরটা দিতে হবে কাকা। অতশত কি জানি, দেখ্‌ছেনই ত বামুন-পণ্ডিত, ন্যাকাবোকা মানুষ। দাদার ওই এক ছেলে, বংশের দুলাল নীলমণি, কাজেই আবদার রাখ্‌তে হ'ল। তা' বাবুদের জানাইও নি। গাড়োয়ান হীরাসিং মানে-গণে, ভক্তি করে, তাকেই মাথায় হাত দে পাঠিয়েছিলুম। এত বেলা হ'ল, না এল ছেলে, না এল গাড়োয়ান—এল এই চিঠিখানা, কি করি বলুন ত?"

হাত বাড়াইয়া তরুণ পত্রখানি লইয়া পড়িল—

"কাকা,

"জীবনের মত আহুতি পরের হইয়া যাইবে, আমি তা' সহ্য করিতে পারিব না। বড়লোকের মেয়ে হইলে কি হয়, আমার মতেই তার মত। আমি—আমরা উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে মনস্থ করিয়াছি। তবে কাজটা আপাততঃ গোপনেই নিষ্পন্ন করিতে চাই। তুমি এস—আজ সন্ধ্যায় পত্রবাহক তোমায় সঙ্গে লইয়া আসিবে। খবরদার লোক জানাজানি যেন না হয়—হইলে আমি মহাবিপদে পড়িব। সঙ্গে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে ভুলিও না। তোমার অসিত"

তরুণের মুখে এখন সেই স্থির গম্ভীর হাসি। বলিল, "আপনি আমায় সঙ্গে নিতে চান্—কেমন?"

ভদ্রলোক কথাটা যেন লুফিয়া লইয়া কহিল, "ঠিক্ ধরেছ বাবা, ঠিক ধরেছ, হাজার হোক্ রাজবুদ্ধি! রাজ-কর্ম্মচারী হলেই যে রাজবুদ্ধি ধরে, তরুণবাবু তোমাতেই তার প্রমাণ! এই নাও বাবা, পায়ের ধুলো দিচ্ছি, মাথা পেতে নাও। তা' হ'লে ঠিক্ গোধূলির সময়ই আসব, কি বল বাবা?"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু চিঠি যে এনেছে, আমাকে ত সে চায় না, সঙ্গে থাক্‌লে যদি না নিয়ে যেতে চায়?"

হতাশা-জড়িত-কণ্ঠে প্রৌঢ় লোকটা বলিল, "তাও ত বটে, কথাটা ত ভেবে দেখা হয় নি। কি হবে তবে?"

তরুণ খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল, "আচ্ছা, আপনি যান্, আমি দু'ঘণ্টা বাদে আপনার সঙ্গে দেখা করব। একটা উপায় ভাবা চাইত, যাতে আমি সঙ্গে গেলেও কারুর সন্দেহ না হয়।"

প্রৌঢ় বলিল, "হয়েছে বাবা, হয়েছে। শুভ-বিবাহের কাজে নাপিত চাই ত। তুমি সেই নাপিত হয়েই আমার পিছু নিলে—বলো না, মন্দ যুক্তি কি?"

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে তরুণ হাই তুলিয়া বলিল, "এ কে জানে৷ অমু, সোলেমানের চর।"

অমলা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "তবু তুমি ওর সঙ্গে যেতে স্বীকার করলে?"

তরুণ উদাস-কণ্ঠে কহিল, "কি করি দিদি, এ গোয়েন্দা-গিরির ধারাই যে এই।"

দুই

নিঃশব্দে পত্রবাহকের সঙ্গে দুইজনে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থানটা এত নির্জ্জন যে, নিজেদের পদশব্দে মানুষ চমকিয়া উঠে। নদীগর্ভে বড় বড় কাঠ, ভেলা, সংখ্যা কত গণিয়া শেষ করা যায় না। কোন স্থানে প্রকাণ্ড স্তূপ, একটা আঁধার আবর্জ্জনার মত দণ্ডায়মান, আবার কোন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

পল্লীগ্রামের প্রৌঢ় লোকটা বলিল, "দেখ্‌ছ নাপিত ভায়া, এর পেছনে যদি গাদাখানেক লোক লুকিয়ে থাকে, নেহাৎ আশ্চর্য্যও নয়। আর তারা যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে

মুখ চেপে ধরে, 'হুঁ' করে থাকা ছাড়া উপায়ই থাকবে না। দেখো ভায়া, পা ফেলে ফলে এসো। আরে বাবা, একটা হাত-লণ্ঠনও সঙ্গে নিতে দিলি না, নিলিও না, এখন বলো ত এমন বিপদে কি মানুষে পড়ে?"

পথপ্রদর্শক অস্ফুট-স্বরে কতকগুলো কি কথা বলিল, বুঝা গেল না।

কাকা লোকটা বলিল, "শোন কথা, ভাইপোর বিয়ে বলে কি চোখ জ্বালাতে হবে না কি? কিন্তু বিয়ের পর যখন গিন্নীর নামে 'হোঁৎকা' এসে পড়বে, তখন? ও কি, ও কি!"

মুখের কথা শেষ হইল না। জনকয়েক গুপ্ত আক্রমণ-কারীর অতর্কিত আক্রমণে অতি সহজেই কাকা-মশায় মাটির উপর লুটাইয়া পড়িতে বাধ্য হইল। সঙ্গের নাপিত কিন্তু অত সহজে ধরা দিল না; বোধ হয়, সে পূর্ব্ব হইতেই আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এবার হাতের মোটা-গোছের লাঠিগাছটা হঠাৎ 'গুপ্তি'তে রূপান্তরিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

কিন্তু পিছনের একটা লোক যে এমনভাবে আসিয়া তাহাকে কায়দায় ফেলিতে পারে, তাহা তাহার বুদ্ধির না হোক্, কল্পনার অতীত ছিল—কাজেই হুমড়ি খাইয়া সম্মুখের দিকে পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আত্ম-সমর্পনে বাধ্য হইল।

কাকাবাবু তখনও অকথ্য ভাষায় গালি পাড়িতে ছিল। সেই অবস্থায় আততায়ীর দল হাতে পায়ে বাঁধিয়া তাঁহাদের লইয়া একখানি ডিঙ্গিতে চড়িয়া বসিল। নাপিতের ক্ষৌর-কার্য্যের পুঁটলি হইতে একযোড়া পিস্তল বাহির হইয়া পড়িল। দেখিয়া লোকগুলা হাসিয়া প্রায় বেদম হইয়া পড়িল। বলিল, "কি তরুণবাবু, পিস্তল দিয়ে দাড়ি কামাও না কি?"

তরুণের মুখে কিন্তু একটিও ভাষা ফুটিল না। সে যেন মূক; লোকগুলার কায়দায় পড়িয়া সে যেন ভয়ে বোবা হইয়া গিয়াছে। শত হাস্য-পরিহাসের বৃশ্চিক দংশন অম্লান-বদনে সহ্য করিতে দেখিয়া একজন বলিল, "হ্যাঁ, তা' সংযমী বটে! আধখানা কথা পাছে বাজে খরচ হয়ে যায়, ভায়ার সেদিকেও নজর আছে।

তীরে অন্ধকারে কে একজন লুকাইয়া গেল। দস্যু-দলের সতর্ক চক্ষুকে কিন্তু প্রতারিত করিতে সে পারিল না। উপর্য্যুপরি কয়েকবার গুলি ছোঁড়ার পর চঞ্চল হইয়া তাহারা প্রশ্নের পর প্রশ্নে বন্দীদ্বয়কে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কাকাবাবু তখন প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বলিল, "শেষে আমার ওপরেও তোরা বিশ্বাস হারালি?"

দলের একজন গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "কর্ত্তার হুকুম কি মনে নেই হামিদ? তিনি বারবার বলে দিয়েছেন, 'ডান হাতের কথা, বাঁ হাত যেন না জানতে পারে'—মনে নেই?"

*　　*　　*

সোলেমন অভ্যর্থনার সুরে বলিল, "আসুন বাবু, আসুন! এত শীগ্গির যে আপনাকে অতিথি পাব, সে আশা কোনদিনই করি নি।"

তিন-চারজন অনুচর ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত কাকাবাবুকে ধমক দিয়া সোলেমন বলিল, "অতিথির হাতের দড়ি দাও খুলে দাও! অতিথি বন্ধু, এ কি কথা!"

সেলাম বাজাইয়া হামিদ তরুণের হাতের বন্ধন কাটিয়া দিল বটে, কিন্তু একটা দারুণ উৎকণ্ঠা-জড়িত ভয় তাহাকে যে ভীষণ পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অন্য সকলের এবং সোলেমানের বুঝিতে বাকী রহিল না। সে হাসিয়া বলিল, "তরুণ আমাদের সে লোকই নয়; বিশেষ, হিন্দু-শাস্ত্রের মত অতিথি নারায়ণ। ওর সেবাই আমরা করে যাব, ভয় করব না। চা নিয়ে আয়রে; কিছু মিষ্টি, কলাও যেন সঙ্গে থাকে। ভাল বামুনের তৈরী লুচি-তরকারী কিছু আনাব কি? জাত মারব না ভয় নেই। হাঁ, একটা কড়ারে এখানে থাকতে হবে, খাবে-দাবে, স্ফূর্ত্তির জন্য যা' কিছু চাও পাবে—কিন্তু নজরবন্দীতে। তেতালার অংশ সব তোমায় ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে। সেখানে থেকে পালাবার চেষ্টা মানে—মৃত্যু, বুঝলে?

বন্দীর দৃষ্টি গৃহখানির সুদূর এক অংশে পড়িল। একটি

ফুলের মত মেয়ে শয্যা-শায়িতা। অন্য একখানিতে একজন সুশ্রী যুবক হতচেতন। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সোলেমান হাসিয়া উঠিল। বলিল, "বুঝলে না, ওরাই বিয়ের বর কনে—কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কিছু দূরে আমাদের একটা ঘাটি আছে, সেইখানটায় মোটর উল্টে যাওয়ায় মেয়েটা জ্ঞান হারায়। বর কনেকে ঘাড়ে নিয়ে আমাদের ঘাটিতে রেখে গিয়েছে। কি ফুলজান, চা? আচ্ছা আচ্ছা, তুলে নাও তরুণ ভায়া, মেয়েলোকের অপমান করো না। বাঃ, ইয়া, এই ত চাই! যাও ফুলজান, কিছু খাবার, বড় পরিশ্রম হয়েছে—"

অপাঙ্গে হাসিয়া ফুলজান বাহির হইয়া গেল। তার মদালস দেহের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া সোলেমান বলিল, "এটি আমারি ভাই-সাহেব, আপকা মেহেরবানসে। যদি চাও এক-আধ রাত সেবা করতে পারে—না না, আমার আপত্তি মোটেই হবে না। আচ্ছা, দাও না, আমিই নামিয়ে রাখ্‌ছি।"

তরুণ শয্যা-শায়িতার দিকে চাহিয়া বলিল, "তারপর?"

সোলেমান বলিল, "হ্যাঁ, বলি। বর চললেন ডাক্তার ডাকতে, আমার ঘাটিদার পড়লেন বিপদে; কি যে করবে ঠিকই করে উঠতে পারলে না—ভেবে চিন্তে মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে এখানে এসে হাজির। হাজার হোক্ মানুষের প্রাণ ত, অস্বীকার করি কি করে বলুন? আল্লার জীব, কাজেই আশ্রয় দিতেই হ'ল। এদিকে বর ডাক্তার ত পেলেই না, কনেও না—ফিরে এসে খালি বাড়ীখানার ওপরেই মহা তম্বী। শেষে নিজের ক্রোধ চাপতে নিজে জ্ঞানহারা। কি আর করি, মেয়েটার খাতিরে ওকেও রাখতে হয়েছে। তোমায় বলি সাহেব এই ছাতির কথা, ও আসমানের বিবিকে আমি সাদী পর্য্যন্ত করতে রাজী! হ্যাঁ বটে বটে, তোমার বড় মেহনৎ হয়েছে, একটু বিশ্রাম দরকার। যাও, এই বাবুকে তেতালা দেখাও।"

ঘরখানি ঘুরিয়া তরুণ সব কিছু পাইল। নানা শ্রেণীর গল্প-উপন্যাস, কালী-কাগজ-কলম, দুগ্ধফেননিভ শয্যা—পাইল না শুধু মুক্তির কোন আশা। সম্মুখে ত নয়ই, পশ্চাতে ঠিক বাড়ীর গা ঘেঁষিয়া নদী; সুতরাং, সে পথেও পলায়ন অসম্ভব।

খানিক আনমনে বসিয়া বসিয়া সে চঞ্চলহস্তে কয়েকখানা কাগজে কি লিখিল, তারপর বাতায়ন-পথে একে একে সেগুলি নীচে ফেলিয়া দিল। কেহ দেখিল কি?

একটা সঙ্কটজনক ধূমে শ্বাসরোধ অবস্থায় কিছুকালের মধ্যেই সে বিছানায় এলাইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে একটা পৈশাচিক হাসিতে দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল।

তিন

কে বা কাহারা দ্বারের নিকট হতচেতন এক সুশ্রী যুবককে শোয়াইয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। প্রাতে চাকরের মুখে খবরটা শুনিয়া অমলা নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাসী ভারতী ত ভয়েই অস্থির। কান্নাভরা সুরে বলিল, "তোমরা দরজা দাও গো। ভাল বুঝছি না, কাদের মড়া তার ঠিক্ নেই, কাজ কি বাপু ছুঁয়ে-লেপে।"

অমলা ধমক দিয়া বলিল, "তোর কাজে তুই যা' ত, একটা লোকের প্রাণের চেয়ে কি আমাদের ছোঁয়া-লেপাটা এতই বড়।"

দাসী কাচুমাচু মুখে বলিল, "না তা' বলছি না, তবে কাজ কি বাবু পরের খুন ঘাড়ে নিয়ে। দাদাবাবু থাকতেন, আলাদা কথা। খুনেগুলো এবার যদি আসে, আমাদেরই হয় ত খুন করে রেখে যাবে। তার চেয়ে হাসপাতালে খবর দাও, টেনে নিয়ে যাক্—বাঁচে বাঁচল, মরে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না।"

কথাটা অমলার মনে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ কলেজে ফোন্ করিল। তারপর প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য বড় এক গামলা জল লইয়া বসিল। চেষ্টা করিয়াও নাড়ী পাওয়া গেল না; বক্ষের স্পন্দনও নয়। কিন্তু কি জানি কেন অমলা তথাপি আশা ছাড়িতে পারিল না।

পাড়ার বুড়া ডাক্তার ধরণীবাবু কি কাজে তখন বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, অমলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "একে একবার দেখুন ত, আমার বোধ হচ্ছে মরে নি।"

ধরণীবাবু অতি অমায়িক লোক। হাসিতে হাসিতে

নিকটে আসিয়া বয়সোচিত কয়েকটা রসিকতার পর তিনি পরীক্ষায় বসিলেন। কিছু পরেই কিন্তু মুখ কাল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না দিদি, এতে আর কিছু নেই।"

দাসী ভারতী হাউমাউ করিয়া উঠিল। অমলা কিন্তু এক দাবড়িতে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা, দেহটায় হাত দিয়ে দেখুন, এত গরম।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তা' হয় দিদি, ইঞ্জেকসনে অনেক সময় দেহের তাপকে অন্ততঃ ঘণ্টা কতকের জন্যেও ধরে রাখতে পারে। তবে একটা কেস্ জানি—খানিকটা সুতো নিয়ে আয় ত ভারতী। এই যে কাপড় থেকেই নড়ছে যেন— ঠিক্ ঠিক্ নড়ছেই ত। আচ্ছা, দেখি ঘাড়। ঠিক দিদি, এমনি কেস্ আমি আরও দেখেছি। শপথ করে বলতে পারি, এ মরে নি—"

ঠিক এই সময়ে 'এম্বুলেন্স কার' আসিয়া পড়ায় ডাক্তারের অভিজ্ঞতার কথাটা আপাততঃ চাপা পড়িয়া গেল। পরম উৎসাহে ধরণীবাবু যুবকের দেহ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "তরুণ যখন নেই, আমি নিজেই যাচ্ছি দিদি। কিছু বলতে হবে না। সে থাকলেও যেতুম; কারণ, এ 'কেসে'র অভিজ্ঞতা আর কারুর থাক্ না থাক্ আমার আছে যে—হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রাণপণ চেষ্টা করা হবে বই কি—তবে দিদি, প্রমাই ভগবানের হাত।"

গাড়ী চলিয়া গেলে সকলে ভিতরে আসিয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেল। এত বড় কাঠের সিন্ধুকটা এমনভাবে ফেলিয়া গেল কে? একজনের কাজ ত এ নয়ই, অথচ সবার চোখে ধুলা দিয়া নিঃশব্দে এটা ফেলিয়া কি ভাবে যে পলাইল, আশ্চর্য্য!

সিন্ধুকটার উপরে একখানা কাল পরদার আবরণী, তার পরেই মোটার কাচের ডালা। পরদা সরাইয়া সকলে একযোগে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ যে দাদাবাবু!"

অমলা অস্থির চরণে ফোনের নিকট ছুটিয়া গেল। সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারের ঠিকানা-পরিচয়-পুস্তিকায় একবার মাত্র খুঁজিয়া লইয়া ডাকিল। ঠিক্ সেই সময় কে একজন তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "থামো, কা'কে চাও?"

অমলা সর্পিনীর মত গর্জ্জিয়া দাঁড়াইয়াই চমকিয়া উঠিল—এই ত তরুণ দা' তবে? উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একবার ছুটিয়া সিন্ধুকটার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—এ কি, এক মানুষ কি করিয়া একযোগে দুইস্থানে থাকিতে পারে! জিজ্ঞাসু-নয়ন তুলিয়া সে নবাগত তরুণের মুখের দিকে চাহিল।

কিন্তু তরুণ নিজেই তার এ রহস্য ভেদ করিয়া দিল। বলিল, "ও, বিনোদকে বুঝি তারা এই অবস্থায় পাঠিয়েছে। আগেই আমি সেটা বুঝেছিলুম, তাই নিজে যাই নি। ক'দিন ধরে আমার অধীনে শিক্ষানবীশি করতে ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে এক ঢিলে দুই পাখী মারবার লোভ সামলাতে পারি নি, কাজেই ওকে আমি সাজিয়ে পাঠিয়েছিলুম—কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নি, নিজে গেছলুম তাদের ঘাটি আগ্‌লাতে।"

অমলা একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া বলিল, "কিন্তু তাদের ঘাটির খোঁজ—"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, আমার কথায়ও তোমার সন্দেহ যায় নি অমলা। ঠিক ত, এত সহজে মনেই যদি নেবে, তবে আমার দিদির পদে আমিই বা তোমায় মেনে নেব কি করে। এই দেখো, মাথার ডানদিকের এ জড়ুল তোমার পরিচিত, কিন্তু ওর নেই। আর এই বুকের ডানদিকের কাটা দাগ, ওর দেখো নিশ্চিহ্ন। কেমন, এবার বিশ্বাস হ'ল বোধ হয়? এবার আমার খবর দিই, শোন।"

অঙ্গুলী নির্দ্দেশে বিনোদের অসাড় দেহটা দেখাইয়া দিয়া অমলা বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয়, শোনার আগে এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ঠিক্ অমনি অবস্থায় আর একটি ছোকরাকে ওরা পাঠিয়েছিল; ডাক্তার-দাদুর মারফতে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি।"

তরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "এর ব্যবস্থাও তাই করা দরকার। ফোন্‌টা তুমিই করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কাজ—পুলিসের বড় সাহেবকে জানাও, দু'জন

বিশ্বাসী শক্তিমান ইন্সপেক্টারের অধীনে যাটজন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী এখনই চাই।"

অমলা বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কথা অমান্য করিল না। পুলিশের কর্ত্তার নিকট হইতে উত্তর আসিল, "এতলোক আপনি নিয়ে কি করবেন ?"

তরুণ বলিয়া দিল, বলো, "এলে বলব।"

জবাব আসিল, "কিন্তু মাপ করবেন, একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের অধীনে এতটা 'ফোর্স' কিছু না জেনে ছেড়ে দিতে আমি ভরসা করি না।"

তরুণ শুনিয়া বলিল, বলো, "আমি তরুণ গোয়েন্দার স্ত্রী; এ ছাড়া, অন্য কিছু বল্‌তে পারি না। যদি আমার প্রার্থনা-মত কাজ না করেন, খুব কম দশ ক্রোর টাকার জন্যে আপনি গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী হবেন।"

উত্তর আসিল, "তিনি কোথায়—তরুণবাবু ?"

তরুণ শিখাইয়া দিল, বলো, "শত্রুরা তাঁকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় বাড়ীতে পাঠিয়েছিল, এইমাত্র হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

অপর পার্শ্ব হইতে দ্বিধা-জড়িত প্রশ্ন আসিল, "আপনি কি মনে করেন, এমন বিপদের মুখে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াটাই আমার বুদ্ধিমানের কাজ হবে ?"

"বেশ দেবেন না, ফল আপনিই ভুগুন।"

"আমি নিজে আপনার সঙ্গে যেতে চাই, কোন আপত্তি আছে ?"

"কিছু মাত্র না। আপনি বারাকপুরে নদীর ধারে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করবেন। একখানা সাধারণ বজরার জন ত্রিশেক লস্করের ওপর শুধু কড়া নজর রাখবেন। আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত খবরদার কোন কথা বল্‌বেন না।"

চার

সৈনিকের পরিচ্ছদে সত্য-সত্যই সেদিন অমলাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। ধীরপদে সে যখন মোটর হইতে নামিয়া পিস্তল হাতে দু'-একপদ অগ্রসর হইয়া চলিল, তখন কালো আঁধারের মধ্য হইতে কে একজন অস্ফুট-কণ্ঠে কি বলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অমলা ভয় ত পাইলই না, বরং বেশ একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এমনি করেই কি আপনারা খবরদারী করবেন ?"

লোকটী চঞ্চল হস্তে মাথার টুপি নামাইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। বলিল, "কি করি, আমরা যে আঁধারে ?"

অমলা বেশ একটু ঝাঁজাল-কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু ওদিকে যে লরী বোঝাই শেষ হ'য়ে এল। জানেন, এই মেকী টাকা একবার যদি তারা বাজারে ছড়িয়ে দিতে পারে, আপনার সুনাম থাকা কতটা দায় হ'য়ে পড়বে ?"

"কিন্তু আপনি ত অঙ্কুশে তা' আমায় জান্‌তে দেন নি—এখন উপায় ?"

তাহার বিব্রতভাব দেখিয়া অমলার হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে সে ভাব দমন করিয়া সে বলিল, "লোক এনেছেন ? কই, কোথায় তারা ?"

"ওই দিকে কতক ওই ঝোপটার আড়ালে, কতক ওই পল্টুনের নীচে আঁধারে।"

চঞ্চল চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিয়া অমলা মাল বোঝাই লরীখানি হইতে লুক্কাইত পুলিশ-প্রহরীদের দূরত্ব পরীক্ষা করিয়া লইল। তারপর যেন একটু নিরাশ হইয়াই ফিরিয়া কহিল, "দেখুন, কেবল আপনাতে আমাতে এই সাম্‌নের লোক ক'টাকে আটকাতে হবে, পারবেন ?"

"আমার দিক্ থেকে আমি অস্বীকারের কোন কারণ দেখছি না—কিন্তু আপনি মহিলা, এতবড় বিপদের মুখে—"

প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া অমলা অগ্রসর হইয়া গেল।

অতি সহজেই ভারবাহীগণকে অপূর্ব্ব কৌশলে করায়ত্ত করিয়া তাহারা বোঝাই লরীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। গাড়ীতে তখন দুইজনের অধিক তত্ত্বাবধারণকারী না থাকায় অতি সহজেই তাহারা তাহাদেরও আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল। তারপর অস্ফুট-স্বরে অমলা বলিল, "এখন ষোল আনা বিপদ মাথার ওপর ঝুল্‌ছে, নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ জেনেই ওরা এতটা অসতর্ক হ'তে পেরেছে। কিন্তু—ও কি !"

ধৃত লোকগুলোর মধ্য হইতে সহসা একজন চিলের মত আওয়াজ করিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুদূর মসী-আঁধার ভেদিয়া বহুসংখ্যক নিশাচর পক্ষীর সক্রোধ ধ্বনি শোনা গেল।

সতর্ক অমলা কিন্তু মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিল না, বোঝাই লরীর চাকার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ডাকিল, "ও কি এখনো দাঁড়িয়ে, পালিয়ে আসুন শীগ্‌গির এই দিক্‌টায়।"

কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আততায়ীর গুলিতে হুমড়ি খাইয়া সম্বোধিত লোকটী পড়িয়া গেল। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া অমলা বাহির হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ 'দাদা' ডাকে চকিত হইয়া সে ফিরিয়া চাহিল—দেখিল, আসল অমলা তাহারি অনতিদূরে।

যুদ্ধের একটা অভিনয় মাত্র হইল। সতর্ক প্রহরীর দল এমনভাবে দস্যুদলকে ঘিরিয়া ফেলিল যে, ভয়ে বিস্ময়ে যুগপৎ তাহারা উপস্থিত কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল। তারপর সমান তালে তাল রাখিয়া ক্রমাগত পিছু হটিয়া যাইতে লাগিল। ঠিক্ এই সময়ে একজন উচ্চতন কর্ম্মচারী একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় তাদের পশ্চদ্ধাবন গতিও রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন চক্রাকারে বসিয়া যুদ্ধ করা অথবা আত্মসমর্পণ ছাড়া আর গতি রহিল না।

সোলেমানকে হ্যাণ্ডক্যাপ পরাইয়া পুলিশ-সাহেবের আনন্দ দেখে কে!

তিনি অমলার সহিত 'হ্যাণ্ডসেক্' করিতে হাত বাড়াইলেন।

অমলাও অসঙ্কোচে হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু হাতে হাত পড়িতেই সাহেব চমকিয়া উঠিলেন—"ও ইউ—"

"ইয়োর মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট স্যার" বলিয়া মাথা হইতে পরচুলার বোঝা খুলিয়া ফেলিতেই তরুণকে চিনিতে পারিয়া সাহেব হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

সোলেমান একবার শিহরিয়া উঠিল।

তরুণের দৃষ্টিতে তাহাও এড়াইল না। সে ধীরভাবে কহিল, "চমকাবার কারণ নেই বন্ধু, তোমার নিমন্ত্রণ আমি বন্ধুভাবেই গ্রহণ করেছিলাম। তুমি আশা করেছিলে, আমাকে শেষ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কারবার চালাবে—তা' আর এ যাত্রা হ'ল না। এরপর যদি বেঁচে থাকো, আর শ্রীঘর থেকে ফিরে আস্‌তে পারো, আবার দেখা হবে বই কি? দুঃখ কি! কিন্তু ওসব কথা কইবার সময় পরে অনেক পাবো। এখন বরটীকে ত আমার বাড়ী চালান করে দিলে, কনে কোথায়?"

সোলেমান উত্তর দিল না; উত্তর দিল ফুলজান। বোধ হয় মেয়েটীর প্রতি সোলেমানের অনুরাগ তাহার প্রাণে পর্য্যন্ত টান দিয়াছিল। সে বলিল, "ওই নৌকোর মধ্যেই চোর-কুঠরিতে আছে।"

সোলেমান আগুনবর্ষী দৃষ্টিতে ফুলজানের দিকে চাহিল। কিন্তু ফুলজান তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিল না। সে বলিল, "চলুন তরুণবাবু, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তরুণ হাসিয়া তাহার অনুসরণ করিল। অমলা পাশেই ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তরুণী বলিল, "চল্ দিদি, এতটা ছুটে যখন এসেছিস্, তখন মেয়েদের সত্যিকার যা' কাজ, তাই তোকে দিয়ে করিয়ে নি।"

ফুলজানের নির্দ্দেশমত নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিতেই একটা কাঠের ঘরের মধ্যে একটী মেয়েকে দেখা গেল। সে যেন পাষাণ প্রতিমা!

তাহাকে অমলা সঙ্গে করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল।

পুলিশ-সাহেব একটা বর্ম্মামুখে দিয়া আনমনে টানিতেছিলেন। মেয়েটীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"হাউ ইজ্ দিজ্?"

তরুণ সংক্ষেপে বলিল, "মানুষ চুরী সার!"

* * * *

পাঠক হয় ত ভুলিয়া যান নাই। অমলার যত্নে এবং পল্লী-ডাক্তারের চেষ্টায় নকল তরুণ ও আসল বর হাসপাতালে থাকিয়া সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শুধু ফিরিয়া আসা নয়, মেয়েটীর সঙ্গে অমলার উদ্যোগে তরুণের বাড়ীতেই বিবাহ-পর্ব্বটা সমাধা হইয়া গিয়াছে।

সেদিন রবিবার। অমলা ও সুধা বসিয়া বসিয়া গল্প

করিতেছিল। তরুণ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সোলেমানের দশ বৎসর জেল হয়ে গেল অমু।"

দশ বৎসর!

"হ্যাঁ। কেন, কম হলেই ভাল হ'ত বুঝি? তোর দেখ্‌ছি ওটার ওপর ভারী দরদ—ব্যাপার কি বল্‌ ত?"

"দরদীই ত, ও ছিল বলেই ত তোমাদের পেলুম। সে যাক্‌। কই দাদা, বল্‌লে না যে বড়, এবার কি করে এত সহজে ওকে ধরলে—"

তরুণ হাসিয়া বলিল, "তাও তোর জানা চাই, না অমলা। একটু উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে পেরেছিলুম বলেই কাজটা অতি সোজা হয়ে গিয়েছিল।

"বুড়ো বামুন সেজে যখন লোকটা এল, তখনই বুঝেছিলুম, ওরা একটা ফন্দী এঁটেছে। ওর সঙ্গে যাওয়া সমূহ বিপদ; কিন্তু না গেলে ত সব জানা যাবে না—তাই বিনোদকে তরুণ গোয়েন্দা সাজিয়ে তার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে নিজে খুব গোপনে ছায়ার মত তাদের অনুসরণ কর্‌লুম। তরুণ ধরা পড়ল—আমিও আর একটু হ'লে পড়েছিলুম আর কি! কাণের পাশ দিয়ে ভোঁ ভোঁ করে ক'টা গুলি বেরিয়ে গেল। যাক্‌, তারা বেশীদূর এগুলো না, তাই রক্ষে!

"বিনোদকে নিয়ে গিয়ে তারা তাদের আড্ডায় তুল্‌লে। বন্দী করে তেতলার ঘরে রেখেছে বিনোদ তা' লিখে জান্‌লা দিয়ে ফেলে দিতেই আমি তা' জেনে সরে পড়লুম। ইচ্ছে ছিল, তখনই পুলিশে গিয়ে খবর দি', কিন্তু বাড়ী ফিরতে-না-ফিরতেই দেখি তাকে একেবারে মারবার সামিল করে পাঠিয়েছে। ওকে ত হাসপাতালে পাঠান হ'ল, তারপর ত সবই জানিস। শত্রুপক্ষ যখন চিরশত্রু বধ করে পরম নিশ্চিন্ত, তখন তোর পোষাক পরে আমি ছুটেছি তাদের ধরতে।

"খোঁজ নিয়েছিলুম, তাদের গুপ্তচর পুলিসের লোক সেজে আমাদের সব খবরাখবর সোলেমানকে জানাচ্ছে—তাই পুলিশের কাছেও আমার বেঁচে থাকার কথা গোপন করেছিলুম। ওখানে গিয়ে সর্ব্বপ্রথমই সেই লোকটাকে নিজের কাছে টেনে নিলুম। সে এতটা হতভম্ব হয়েছিল যে, তারই সাহায্যে একরকম বিনা রক্ত-পাতেই নৌকো পর্য্যন্ত অধিকার হ'য়ে গেল।

"রক্ষীরা জান্‌ত, সে তাদেরই লোক এবং তার শিক্ষামতই তারা এটাকে একটা খেলা মনে করে নিয়েছিল বলে বিশেষ কোন বাঁধা দেয় নি। যখন বুঝ্‌লে, তখন নিরুপায়। পুলিশ-সাহেবের সঙ্গে তুই পর্য্যন্ত যুদ্ধে নেমে গেছিস্‌! দাদাকে বাঁচাতে হবে ত?"

অমলা ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

কুমারী সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৌতিকগল্প
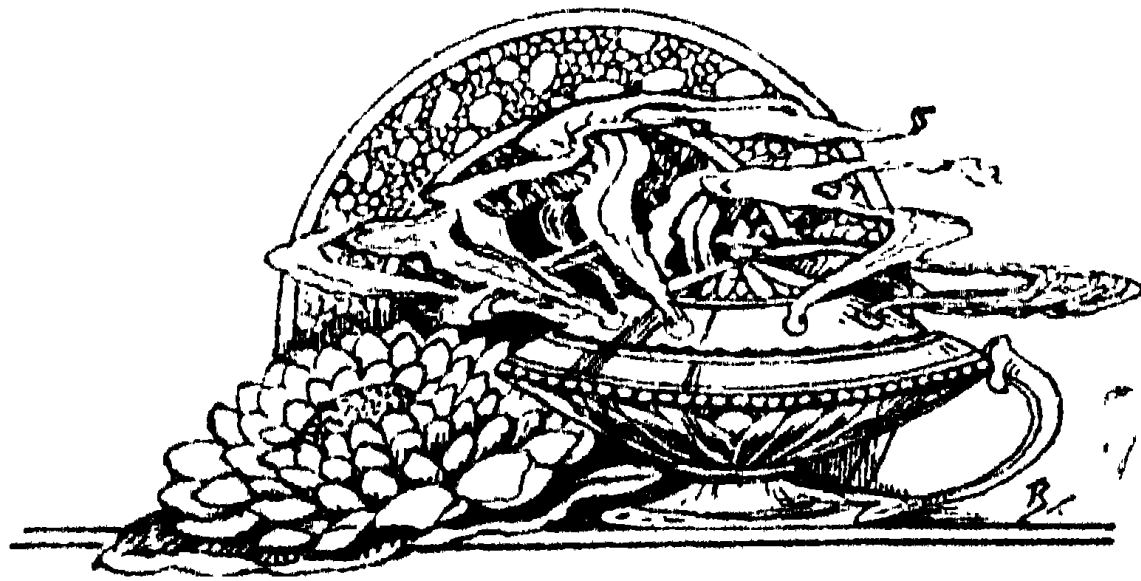
রেশম-কুঠি

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

ভূতের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার জন্য যাহারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাশি রাশি প্রমাণ-প্রয়োগ ও অজস্র যুক্তি-তর্ক অবতারণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা চিরকাল ধরিয়া তাহাদের মতবাদ লইয়া থাকুন, ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই বা তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া অনধিকার চর্চ্চাও করিতে চাহি না। কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিতে দোষ কি? যদি দোষই না থাকে, তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমি ভীরু নই। বয়স আমার সবে মাত্র বত্রিশ—যদিও বাঙ্গালীর আয়ুর দিক্ দিয়া ইহা প্রৌঢ়ত্বেরই সীমা নির্দ্দেশ করে, তথাপি নিজের সম্বন্ধে উহা আমি মোটেই স্বীকার করি না। দেহ ব্যাপিয়া আজিও যৌবনের জোয়ারই চলিতেছে—ভাটা ধরে নাই এখনও। ইহার উপর আমি পাড়াগেঁয়ে—বন-জঙ্গল আমার বিশেষ পরিচিত। আষাঢ়ের নবঘন কাজল মেঘে নিঃসীম অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিও দেখিয়াছি—সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টি-অচল পল্লীবুকে আমি নির্ভয়ে একাকী বেড়াইতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। ভূত শব্দের অর্থ কি তাহাও বুঝিতাম না, এবং উহা আছে কি নাই অত তর্ক-প্রমাণ না করিয়া 'নাইকেই' 'কায়েমমোকাম' করিয়া লইয়াছিলাম। আপনারা যেমন ভূত শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চন করেন, ঠোঁটের কোল বাহিয়া কি রকম একটা হাসি বাহির হইয়া আসে—চোখ দুইটা বহিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য উছলিয়া পড়ে, আমারও তাই পড়িত। রাত্রির গম্ভীর অন্ধকারে অতিকষ্টে পথ লক্ষ্য করিয়া শ্মশানের বুকের উপর দিয়া কতদিন ও পাড়ার থিয়েটারে যোগ দিতে গিয়াছি এবং নিশুতি রাত্রিতে একাই বাড়ী ফিরিয়াছি—একটুও মনে কখন সঙ্কোচ আসে নাই। কিন্তু...

যাক্...আসল কথাটাই বলি—

গ্রীষ্মের ছুটী প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ বন্ধু তারানাথ আসিল। বিস্মিত কম হইলাম না। সে সে যে আসিতে পারে, তাহা ধারণা করা ত দূরের কথা, কল্পনা করাও যায় না। ধনীর ছেলে—সহরের ত্রিসীমার বাহিরে পা দেয় না। পাড়াগাঁর নাম শুনিলেই তাহার চোখে-মুখে কেমন একটা আতঙ্ক ফুটিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে... কখন যদি আমাদের এখানে আসিবার জন্য প্রস্তাব করি ত সে এমনভাবে সরিয়া পড়ে যে, কথাটার মাঝখানেই আমাদিগকে দাঁড়ি টানিয়া দিতে হয়। সেই তারানাথ...

আনন্দাতিশয্যে বন্ধুকে দুইহাত দিয়া বুকের উপর জড়াইয়া চাপিয়া ধরিলাম। কহিলাম, হঠাৎ তোকে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিলে কে?...

দুর্ব্বুদ্ধি! বন্ধু স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিল, কল্পনায় ত লিখি

অনেক, এইবার পল্লী-মায়ের সত্যিকার রূপ দেখে লিখ্‌ব......

তারানাথ কবি।

তারপর কয়েকটা দিন তারানাথ আমাদের লইয়া দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিয়া দিল।

দিগন্তে বিলীয়মান মাঠভরা সবুজ ধান দেখিয়া বন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, মেঘ-কালো ইক্ষুক্ষেতগুলির সাগর-দোলান ঢেউ দেখিয়া তারানাথ আনন্দে গলিয়া গেল, বাবলা গাছের শ্যামল ছায়ায়, আকাশচুম্বী তালগাছের পাতায় পাতায় বন্ধু পল্লী-মায়ের কত কি রহস্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, পাখীদের কলতানে বন্ধু কত কি সুরের মূর্চ্ছনা অনুভব করিল—এমন কি, শিবাকুলের তারস্বরে চীৎকারে সন্ধ্যার সরব অভ্যর্থনা কল্পনা করিয়া তারানাথ মস্তবড় এক কবিতা লিখিয়া ফেলিল।

কবি তারানাথ মুগ্ধ হইয়া গেল।

আকাশ-পট বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন। দিবাশেষের বিদায় মুহূর্ত্তেই গাঢ় বেদনায় পল্লী স্তব্ধ। পল্লী-বধূরা অনেকক্ষণ জল লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে নদীজল সীমাহীন ব্যথায় আত্মহারা। নদীর ধারের পথটি ক্রমশঃ যেন জনবিরল হইয়া উঠিয়াছে। তারানাথকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া নদীর ধারে বসিলাম। সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। ওপারের পরিত্যক্ত রেশম-কুঠির গগণস্পর্শী চিমনীটার পাশে ম্লান ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। জোনাকীরা ঝাঁকে ঝাঁকে পল্লী-মায়ের অঙ্গাস্তরণে হীরার বুটি পরাইয়া দিয়া গেল। দূরে নিকটে পল্লী-মন্দির হইতে সন্ধ্যারতির কি মধুর নিনাদ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

তারানাথ মন প্রাণ দিয়া সন্ধ্যার এই নগ্ন সৌন্দর্য্য অনুভব করিল। তারপর ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিল, বড় দুঃখ হচ্ছে শিবু, যে, এই সব ছেড়ে যেতে হবে—পল্লীর রূপ এতদিন কল্পনাই করেছি, চোখে দেখি নি যে, কত সুন্দর! বিলাসিনী নগরী এর কাছে কিছুই নয় শিবু...প্রাণহীন, প্রকৃতির স্নেহস্পর্শ সেখানে নাই, মানুষের হাতেগড়া সহস্র কৃত্রিমতা সেখানে নিয়তই বিমুগ্ধ করে তোলে—এমন করে সুখ-সৌন্দর্য্যে মন প্রাণ ভরে দেয় না...

কহিলাম, থাকো না আরও দু'দিন। কলেজ খোলবার ত দেরী এখনও অনেক...

অকস্মাৎ ওপারের রেশম-কুঠিটি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। তারানাথ লাফাইয়া উঠিল। তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া বলিলাম, বসো, ও আগুন নয়।

সেই অগ্নির লেলিহান শিখা বাড়িয়া বাড়িয়া তখন আকাশ ছুঁইয়া ফেলিয়াছে। উজ্জ্বল আলোক প্রভাবে ওপারের এপারের সমস্ত স্থান দিনের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে।

আগুন নয়! তারানাথের দুই চোখ দিয়া সীমাহীন বিস্ময় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, না...ও ভূতের কাণ্ড!

ভূতের কাণ্ড! জীবনে তারানাথ যেন এতবড় আশ্চর্য্য কথা শুনে নাই। কহিল, ভূত!...ভূত আবার আছে না কি?

কহিলাম, আছে কি নাই তা' জানি নে, কিন্তু ওই আগুন জল্‌ছে এখানে প্রায় আশীবছর ধরে। এই সময়টায় বেশী জলে। লোকে বলে ওটা ভূতের কাণ্ড...

তারানাথের চোখ মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাচ্ছিল্যভরে কহিল, পড়েশুনে তুইও একটা আস্ত ভূত হয়ে গেছিস্ শিবু...ওটা যে একটা বাষ্প...ভুলে গিয়ে বুঝি ভূতের ভয়ে তুইও ভূত হ'য়ে গেছিস্।...

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ফিরাইয়া দিলাম, আরে ছোঃ, আমি না কি তাই মনে করি--তুই ক্ষেপেছিস্ তারা! কিন্তু পাড়ার কেউ মানে না ওসব—তা'রা বলে, ওখানে ভূত থাকে এবং তারা বিশ্বাস করেও খুব। জায়গাটায় বড়-একটা কেউ যায় না এবং ঐ পরিত্যক্ত কুঠির ভেতরে অনেকে যে অনেক শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, ইচ্ছে করলে তুইও অনেক শুনতে পাবি। তুই হয় ত হেসে উড়িয়ে দিবি, কিন্তু শুন্‌তে শুন্‌তে তোর গা শিউরে উঠ্‌বে নিশ্চয়।...

কথাটাকে তেমন আমল না দিয়া তারানাথ কহিল, লোকের শোনা কথায় কাজ কি...চল্ না, একবার ঘুরে আসি···বলিয়া তারানাথ সোৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

বুকের রক্তটা একবার 'ছলাৎ' করিয়া উঠিল। মনে হইল, কাজ কি বিপদ টানিয়া—ভূত আছে কি নাই তাহা লইয়া আমার কি? প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া যদি···পরক্ষণেই যৌবনের রক্ত এক ধাক্কা দিয়া সকল দৌর্ব্বল্য সরাইয়া দিল। কহিলাম, স্বচ্ছন্দে।

মুহূর্ত্তমধ্যে দুই বন্ধুর মধ্যে এই অভিযানের পরামর্শ ঠিক্ হইয়া গেল।

ও পাড়ায় থিয়েটার হইতেছিল। থিয়েটারের নাম করিয়া মা'র নিকট বিদায় লইলাম।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশ-পটে থাকিয়া থাকিয়া মেঘ জমিয়া নিঃসীম নিঃছিদ্র অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—পথের রেখাটা পর্য্যন্ত অবলুপ্ত। সমস্ত পল্লী অচেতন—কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দনটুকুও অনুভব করা যায় না। শুধু নির্জ্জন পথ বহিয়া নিরালা বাতাস বোধ করি সঙ্গীহারা হইয়াই হাহা করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

টর্চ্চের আলো ফেলিয়া দুই বন্ধু পাশাপাশি চলিয়াছিলাম—মুখে কাহারও কথা ছিল না। আসন্ন অভিযানের ভবিষ্য অভিজ্ঞতার সহস্র বিচিত্র কল্পনা উভয়ের মনে প্রাণে যেন গাঢ় স্তব্ধতা সঞ্চার করিয়াছিল। পথের রেখা কোথাও সরু, কোথাও অনতিবিস্তৃত—দুই ধার হইতে সহস্র লতাগুল্ম দুই বাহু বিস্তার করিয়া পথটাকে যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। চলিতে চলিতে কখন কখন ইহাই আমাদের গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল এবং বাধা পাইয়া সবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। ঘুমন্ত দু'-একটা পাখী হয় ত বা দু'-একটা শৃগাল সাড়া পাইয়া তারস্বরে ডাকিয়া উঠিয়া তীরবেগে ছুটিয়া পলাইতেছিল। তারানাথ চমকিয়া উঠিয়া হাতের বন্দুকটা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল।

হাসিয়া তাহাকে কহিলাম, এমন করে ভূত দেখ্‌বি না কি রে তারা—তার চেয়ে বাড়ী ফিরে চল্ ভাই, বাপ-মায়ের ছেলে, শেষটায় বিঘোরে···

ও—বলিয়া নিজের খেয়ালেই তারানাথ আবার পথ বহিয়া চলিল।

পারঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল—পার হইতে অসুবিধা হইল না। ধীরে ধীরে আসিয়া কুঠির নীচে দাঁড়াইলাম। গাঢ় অন্ধকারে বন-জঙ্গলে ঢাকা অতীতের পরিত্যক্ত সেই কুঠি যেন এক বিরাটাকার দৈত্যের মত বলিয়া মনে হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—দূরে, নিকটে অচ্ছেদ্য অন্ধকার-সমুদ্রের কৃষ্ণ-তরঙ্গগুলি দুলিয়া দুলিয়া আসিয়া সেই পরিত্যক্ত কুঠির গায়ে পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত স্থানটাকে বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে।

তারানাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া কহিল, ভূত থাক্‌বার জায়গা বটে!

অনেক কষ্টে ভিতরে যাইবার একটা পথ বাহির করিলাম। সরু পথ, মানুষ চলাচল না থাকায় নিজের চিহ্নটা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। ফণিমনসা ও কাঁটা গাছগুলিকে বাঁচাইয়া সেই পথ দিয়া চলাচল করা আরও কঠিন। তবুও চলিলাম। বোধ করি একটা সাপ নিশ্চিন্ত আরামে পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ সাড়া পাইয়া 'সড়াৎ' করিয়া পাশের বনে লুকাইয়া গেল। শিহরিয়া উঠিয়া লাফাইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিলাম, ভূতে না হোক্, সাপে খাবে দেখ্‌ছি···কি যে তোর খেয়াল তারা...

বন্ধু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বাড়ী যা' শিবু—মা'র ছেলে ...ভয় করিস্ ত এই লাইট্‌টাও নিয়ে যা'। আমি আর না দেখে ফিরছি নে...

ওরে বাবারে, এ যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! লজ্জিত হইয়া কহিলাম, আমাকে এতই ভীরু ভেবেছিস্ না কি?

ততক্ষণ আমরা কুঠির অঙ্গনের ভিতরের ছোট হল-

ঘরটীর বারান্দার উপর আসিয়াছি। ঘরটী ছোট। বন জঙ্গল চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিলেও অত্যাশ্চর্য্যভাবে ঘরটী নিজেকে বাঁচাইয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। আশীবছর হইল কুঠিটি পরিত্যক্ত বলিয়া প্রবাদ, কিন্তু দেখিয়া তা' মনে হয় না। অযত্নে হয় ত ধূলা, শুষ্ক পাতা ইত্যাদি কোথাও কোথাও জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাসের অযোগ্য এখনও হয় নাই। পলেস্তরার রং ধূম-মলিন হইলেও এখনও ঘরটী নগ্নগাত্র হইয়া দাঁত বাহির করে নাই।

তারানাথ নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, ঘুমোনো যাবে যা' হোক্।

তারানাথ ও আমি হলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কয়েকটী চামচিকা উড়িয়া গেল। তারানাথ হাসিয়া কহিল, ওদের আজ বনবাস.........

আমি হাসিয়া বলিলাম, ওদের, না আমাদের......

তারানাথ প্রত্যুত্তরে হাসিল মাত্র।

বগলের সতরঞ্চটা পাতিয়া লইয়া তারানাথ আরাম করিয়া বসিয়া পড়িল এবং দাবার ছকটা পাড়িয়া লইয়া কহিল, দু'পাটী খেলা যাক্ শিবু—ভূত দেখ্‌তেই যখন আসা, তখন জেগেই থাক্‌তে হবে—ঘুমুলে হয় ত আর দেখা হবে না।

বাহিরে তখন জোরে বাতাস বহিতেছিল এবং ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টির ছাট আসিয়া ভিতরের অনেকটা ভিজাইয়া তুলিয়াছিল। দরজা ভেজাইয়া দিয়া আসিয়া তারানাথের নির্দ্দেশমত দাবায় মনোসংযোগ করিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের খেলা বেশ জমিয়া উঠিল। বাহিরে তখন যে ঝড় আর বৃষ্টিতে ভয়ানক পাল্লা চলিয়াছে, আমরা যে বাড়ী নাই—জনমানবহীন নদীতীরের কতদিনের পরিত্যক্ত এই কুঠিতে ভূত নামক অজানা কোন ভয়ানক অশরীরী আত্মার খোঁজে আসিয়াছি—এসব কিছুই মনে হইল না। আমরা যেন শুধু খেলার নেশাতেই মজিয়া গিয়াছিলাম।

কতক্ষণ এইরূপভাবে কাটিয়াছিল তাহা মনে নাই, হঠাৎ বোধ হইল, কে যেন দ্রুত বারান্দা অতিক্রম করিয়া এই-দিকে আসিতেছে। দুইজনে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। বলিতে লজ্জা নাই, বীর বলিয়া যত বড়াই করিয়াই থাকি, অকস্মাৎ কি জানি কি এক অস্বস্তিতে মন ভরিয়া উঠিল।

চলিবার শব্দ বেশ বোঝা যাইতেছিল এবং উহা যে মানুষের, তাহাতেও আমাদের কোন সংশয় রহিল না। শব্দটী ঠিক্ একইভাবে কয়েকবার সমস্ত বারান্দাটা আড়া-আড়িভাবে চলাফেরা করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারি করিতেছে।

তারানাথ মুহূর্ত্তে সজাগ হইয়া উঠিল। বন্দুকটী তুলিয়া লইয়া সে উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। বাধা দিয়া কহিলাম, তাড়াতাড়ি কি......দেখা যাক্......

তারানাথ বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

শব্দটী আসিয়া আমাদের দরজার নিকট থমকিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, যেন ঘরে প্রবেশ করিবে কি না তাহাই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে।

উভয়ে উভয়ের দিকে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্তুত হইয়া লইলাম।

বোধ হয় এক সেকেণ্ডেরও কম—দরজাটী ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। এবং সেই খোলা-পথের দিকে চাহিয়া উভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

খোলা দরজার উপর ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল এক তরুণী—তন্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বয়স তাহার চব্বিশ কি পঁচিশ—কিন্তু সমস্ত অঙ্গ বহিয়া যৌবনের যে শ্রী লীলায়িত হইতেছে, তাহার নিকট বয়সের কথা মনেই পড়ে না।

মনে হইল, সে যেন এতক্ষণ নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিল—আমাদের প্রতি লক্ষ্যই পড়ে নাই। অকস্মাৎ এই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আতঙ্কে সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্তে বাহিরের গাঢ় অন্ধকারে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারানাথ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিশীথ অভি-সারিকা......এই তোদের ভূত, ছোঃ......

অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আবার দাবা লইয়া বসিলাম। কয়েক মিনিটের বাধা পড়ায় খেলা আর তেমন জমিয়া উঠিল না।

চতুর্দ্দিক আলোকিত ও কম্পিত করিয়া অদূরে একটা বাজ পড়িল। এবং তাহারই আলোকে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দ্বারপথে চাহিতেই এবার বিস্ময়ে নহে, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম।

কয়েক মিনিট আগে যেখানটায় তরুণী দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক্ সেইখানটায় দাঁড়াইয়া এক হ্যাটকোট পরিহিত সাহেব—তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে... বিকৃত মুখের উপর কোটরাগত চক্ষু দুইটী শুধু ভয়ানক নহে, বীভৎস!

যৌবনের মিথ্যা গর্ব্ব লইয়া যে সাহসটুকু এতক্ষণ আমাদিগকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল, এইবার বুঝিতে পারিলাম তাহা একবারেই মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মুখ তুলিয়া যে ভাল করিয়া চাহিব, সে ক্ষমতাটুকুও আর নাই।

সাহেব সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, কে টোমরা?

সেই গুরুগম্ভীর স্বরের আওয়াজে উভয়েই শিহরিয়া উঠিলাম। মানুষ যে এত গম্ভীরস্বরে কথা বলিতে পারে এবং তাহার শব্দ এমন হিমস্পর্শে বুকের চাঞ্চল্যকেও স্তব্ধ করিয়া আনে, তাহা কখন অনুভব করি নাই।......

সাহেব আবার বলিল, কে টোমরা?

তারানাথ বোধ করি এইবার উত্তর করিতে চাহিল, বেশ লক্ষ্য করিলাম তাহার অসাড় ঠোঁট দুইখানি এইবার নড়িয়া উঠিয়া ঈষৎ বিভক্ত হইল, কিন্তু ঐ মাত্র, গলা দিয়া একটা 'রা'ও বাহির হইল না।

সাহেবের চোখে মুখে যেন অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল, ভয় নেই, বলো...

জোর করিয়া কহিলাম, ভয় আমরা করি না...

সাহেব হাসিয়া বলিল, তা' জানি, কিন্তু এখানে?

মরিয়া হইয়া চোখ মুখ বুজিয়া বলিয়া ফেলিলাম, ভূত দেখ্‌তে...

ভূত দেখতে! সাহেব হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামিতে চাহে না। তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, যা' নেই, তা' নিয়ে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন?

তারানাথ বোধ করি এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিল। এইবার বলিল, তুমিই বা কি করে এখানে আস্‌লে সাহেব?

সাহেব যেন আশ্চর্য্য হইল। কহিল, আমি ত এইখানেই থাকি...তারপর কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামাইয়া কহিল, যা' ঠাণ্ডা পড়েছে...এক কাপ্ চা পেলে তোমরা নিশ্চয়ই খুসী হ'বে...

চা! এই পরিত্যক্ত কুঠিতে চা! কিন্তু কথাটা মনেও আসিল না। তারানাথ অত্যন্ত খুসী হইয়া কহিল, তার চেয়ে আনন্দের কিছু হ'বে না...দিতে পার সাহেব...

খুউব! এস না ওধারের ঘরে—সব ঠিক্ আছে।

সাহেব ফিরিয়া চলিল। এবং তাহার সাথে তারানাথ ও আমি উঠিয়া চলিলাম। খেলার সরঞ্জাম সেইখানেই পড়িয়া রহিল, টর্চ্চের কথা মনে হইল না; এমন কি, যাহার বল করিয়া আজ আসিয়াছিলাম, সেই বন্দুকটীর কথাও মনে পড়িল না। হায়রে বন্দুক!...কাজের সময় এমনি করিয়া মানুষ নিজের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটাও ভুল করিয়া ফেলিয়া যায়।

সাহেবের অনুসরণ করিয়া হলঘরের পূর্ব্ব সীমান্তের ছোট কুটুরীতে আসিয়া উভয়ে সীমাহীন বিস্ময়ে দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। আরব্য উপন্যাসে আলাদীনের কথা পড়িয়াছি—কিন্তু মনে হইল, ইহার কাছে সে যেন কিছুই নহে। ছোট ঘরটি বিশেষ করিয়া সুসজ্জিত। রাশি রাশি চেয়ার-টেবিলে ঘরখানি পরিপূর্ণ। একটু দৃষ্টি করিলে বেশ বোঝা যায়—ঘরখানি মজ্‌লিসের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

সাহেবের ইঙ্গিতে শুভ্র আস্তরণে ঢাকা একটি টেবিলের নিকট চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম—ইতঃপূর্ব্বে কে টেবিলের উপর চা ও চায়ের সরঞ্জামাদি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা আমাদের চোখেই পড়িল না। শুধু ঘরখানির অপূর্ব্ব সজ্জা—অদূরে টেবিলের উপরকার সদ্যফোটা ফুলের গন্ধ, সাহেবের স্নিগ্ধ মধুর হাসি সবগুলি মিলিয়া যেন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সাহেব বিনীত মধুর কণ্ঠে কহিল, অসময়ের অতিথি... হয় ত তোমাদের কষ্ট হবে...

আমার মুখ দিয়া অসংলগ্ন উক্তির ন্যায় বাহির হইল, কষ্ট···

সাহেব বলিল, শুধু এক কাপ চা ভিন্ন ত আর কিছু দিতে পারি নি...তারপর যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কহিল, আচ্ছা, তোমরা বসো—আমি আস্‌ছি···বলিয়া সাহেব দ্রুত অদৃশ্য হইল।

সাহেব চলিয়া গেল। আমরা সেইখানে দুইজন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। টেবিলের উপর চা-ভেজা জলের সুরভি ধূম কুণ্ডলী করিয়া করিয়া উপরে উঠিয়া মিশাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু উহা টানিয়া লইয়া পান করিবার আগ্রহ আমরা অনুভব করিলাম না। কতকটা মোহাচ্ছন্নের ন্যায় নিজেদের অস্তিত্ব ভুলিয়া সাহেবের চলা-পথের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম।

আর একবার বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল। বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া আকাশ ফাটিয়া পড়িল।

ঠিক্ সেই সময় পাশের ঘর হইতে এক মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিয়া কানে বাজিল।

দুইজনে চমকিয়া উঠিলাম।

আবার সেই করুণ, যন্ত্রনা-কাতর আর্ত্তনাদ—আবার—আবার! এবার আরও সুস্পষ্ট, আরও সকরুণ!

উভয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। উভয়েই লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলাম এবং পাশের ঘরের দিকে সবেগে দৌড়াইলাম।

ছুটিয়া আসিয়া দেখিলাম, ঘরটার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। কিন্তু বদ্ধদ্বার গৃহের ভিতর হইতে একটা অবিশ্রান্ত মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনধ্বনি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তারানাথ ছুটিয়া গিয়া দরজার কড়া ধরিয়া প্রাণপণে কয়েকবার টানিল খুলিতে পারিল না। তারপর কয়েক মিনিট ধরিয়া সবেগে কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিল—কোনই ফল হইল না। অবশেষে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—সে শব্দ শুধু বাহিরের বিকট বিপর্য্যয়ের ভীষণতা আরও একটু বাড়াইয়া তুলিল মাত্র।

আমি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। ছুটিয়া গিয়া সজোরে দরজার উপর সবুট পদাঘাত করিলাম। দরজায় কাণ রাখিয়া উৎকর্ণ হইলাম—কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গৃহাভ্যন্তরের সেই অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ তখনও তেমনি কানে বাজিতেছিল।

এইবার দুইজনে একসঙ্গে দরজার উপর সবেগে পদাঘাত করিতে লাগিলাম। জীর্ণ দরজা কয়েক মুহূর্ত্ত সে আঘাত সহ্য করিয়া এক সময় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সেই ভাঙ্গা পথে ঘরের ভিতর চাহিয়া আমরা উভয়ে একসঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, সেই ক্ষণ-দেখা মেয়েটা একপাশে অসাড় অনড় পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের রক্ত যেন কে নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে, চোখ দুইটী নিষ্প্রভ-দৃষ্টি, হিম-শীতল, অচঞ্চল। শুধু সেই অসাড় মুখের প্রতিটী রেখায় আতঙ্ক যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অদূরে সাহেবের সেই বীভৎস দেহ হিংস্র শিকারী পশুর ন্যায় হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহার দুইটী চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণিত তীব্র লালসা যেন আগুনের মতো ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার বামহস্ত ঈষৎ নমিত, কিন্তু উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে দৃঢ়াবদ্ধ পিস্তলটী বোধ করি মেয়েটীর ক্ষীণ একটু অবাধ্যতাকেও ক্ষমা করিবে না··· ··

উভয়ে শিহরিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিলাম।

কিন্তু সাহেব পলকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এবং উদ্যত পিস্তলটী আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া শুষ্ক নিষ্কম্প কণ্ঠে কহিল, যাও......

সেই শব্দের ধ্বনি শিরায় শিরায় ভূমিকম্পের ধ্বনির মত অনুভূত হইল এবং মুহূর্ত্তে বক্ষের সশব্দ স্পন্দনকেও নিস্তব্ধ করিয়া দিল। ব্যাপারটা চোখের পলকে অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হইল না। পলকে তীব্র অনুশোচনায় অন্তর ভরিয়া উঠিল। নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতায় নিজেরাই ক্ষেপিয়া উঠিলাম......হায়, বন্দুকটাও যদি কাছে রাখিতাম!······ তারানাথ গোঁয়ার এবং প্রাণের মমতা কিছু ওর আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই সাবধান করিয়া দিবার জন্য অলক্ষ্যে তাহার পিছনে একটু ঠেলা দিলাম। কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে যেন

ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। তাহার মুখের ভাব পলকে পলকে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল এবং ইহাই লক্ষ্য করিয়া আমি অন্তরে কি যন্ত্রনাই যে অনুভব করিতেছিলাম......

সাহেব আবার হিম-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, যাও......

কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না। তারানাথ আমাকে পর্য্যন্ত বাধা দেওয়ার সুযোগ না দিয়া বাঘের মত সাহেবের ওপর লাফাইয়া পড়িল—সাহেব পলকে সরিয়া দাঁড়াইল। তারানাথ নিজেকে সঙ্গে সাম্‌লাইতে না পারিয়া সবগে গিয়া দেওয়ালের উপর আছড়াইয়া পড়িল—তাহার মাথাটা সজোরে প্রাচীর গাত্রে ঠকিয়া গেল।

সে হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল মাত্র, তারপর ঘাড় গুঁজিয়া সেইখানে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল।

সাহেব হিঃহিঃহিঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। সেই তীব্র হাসির রূঢ় শব্দে আমার অন্তরের ভিতরটা তুহিনের মত জমিয়া উঠিল—মুখ ফুটিয়া যে একটা আর্ত্তনাদ করিব, সে ক্ষমতাও রহিল না।

সাহেব আসিয়া আমার অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইল। একবার মাত্র আমার দিকে তাহার অচঞ্চল হিম-শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর সে সজোরে আমার কব্জি চাপিয়া ধরিল। আমি শিহরিয়া উঠিয়া চোখ বুজিলাম। ওঃ, সে কি স্পর্শ! —একটুও যেন সে হাতে রক্ত নাই, জীবনের স্পন্দন যেন সেখানে অনুভব করা যায় না। কাঠির মত কঠিন হাড়ের বরফ-স্পর্শ আমার চামড়ার উপর যেন কাটিয়া বসিল।

আমার বুকের স্পন্দনও যেন থামিয়া আসিল, পা দুইটী অবশ হইয়া ক্রমে ক্রমে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া মেঝের সঙ্গে জমিয়া গেল—ক্ষুদ্র প্রাণটুকুও বুঝি এইবার......

যখন জ্ঞান ফিরিল, দেখিলাম, তারানাথ তখনও ঘরের কোণে তেমনি ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। সাহেব ও সেই মেয়েটী অদৃশ্য—ঘরের দরজা বন্ধ।

উঠিতে গেলাম, পারিলাম না। কে যেন সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ভারী পাথর চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে। সেই-খানে পড়িয়া থাকিয়া বিকল ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্বাধীনে আনিয়া সমস্ত ঘটনাটি আর একবার পর্য্যালোচনা করিতে গিয়াও কম আশ্চর্য্য হইলাম না। জগতে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার অভাব নাই এবং বহু মানুষের জীবনেই অকস্মাৎ বিচিত্র-ভাবে সেগুলি উপস্থিত হয়; কিন্তু কয়েক ঘণ্টার কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে আমাদের অদম্য কৌতুহল যাহা আবিষ্কার করিল, বোধ করি জগতে তাহার আর তুলনা নাই।

বাহিরে তখন অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল—ঝড়েরও বিশ্রাম ছিল না। সঘন পত্রবিশিষ্ট দীর্ঘকায় ঝাউগাছগুলির অসহায় করুণ হা-হুতাশ বিশ্রী বিভীষিকায় চতুর্দ্দিক ভারী করিয়া তুলিতেছিল—অদূরের বাঁশ-ঝাড়ের কর্কশ আর্ত্তনাদ একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। দরজা-জানা-লার ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ বিকাশ পৃথিবীর রাত্রির বীভৎস-রূপ উলঙ্গ করিয়া দেখাইতেছিল, পরক্ষণেই বোধ করি লজ্জায় শিহরিয়া উঠিয়া আবার অতল অন্ধকারে মুখ ঢাকিতেছিল। ঘরে একটীও আলো নাই—অথচ কোথায় হইতে কোন অদৃশ্য আলোকধারা সমস্ত কক্ষতল দিনের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

অকস্মাৎ সহস্র সহস্র কণ্ঠ সেই বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে কলরব করিয়া উঠিল—কাহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য ক্রুদ্ধ আক্রোশে সমস্ত স্থানটী যেন চষিয়া ফেলিতে লাগিল। ইহাদিগকে প্রতিহত করিবার জন্য ভিতরে কোন আয়ো-জন চলিতেছিল কি না জানি না, তবুও রাত্রির অন্ধকার কাঁপাইয়া বাহিরের বিচিত্র কলরবের ভয়াবহ শব্দকে পর্য্যন্ত অতল করিয়া দিয়া কোথা হইতে অবিশ্রান্ত উদ্দাম হাসি তীব্রবেগে ফাটিয়া পড়িতেছিল—হাঃহাঃহাঃ, হিঃহিঃহিঃ......

শিহরিয়া উঠিলাম। চোখের সামনে যেন মরণের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মৃত্যুর দূতগুলা বোধ করি রাত্রির এই ভীষণতার সুযোগে আমাদিগকে কুক্ষিগত করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—এ তাহারই কলরব। ভয়ে চোখ

বুজিয়া আসিল—আতঙ্কে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। ব্যাকুল চক্ষু দুইটী অকস্মাৎ জলভারী হইয়া উঠিল। বুকের ভিতর আর্দ্র বেদনা সহসা কাঁদিয়া উঠিল—কেন আসিয়াছিলাম······মাকে ফাঁকী দিয়াছিলাম······মিথ্যা বলিয়াছিলাম ······

বসিয়া বসিয়া কম্পিত চিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলাম। বাহিরের অস্পষ্ট কলবর, মৃদু গর্জ্জন যেন ক্রমশঃ সুস্পষ্ট ও অসহ হইয়া উঠিল—হাসির ধ্বনিরও বিশ্রাম নাই...মেয়েটীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর অসহায়ের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল...

সহসা মনে হইল, এই বিপর্য্যয় বোধ করি সেই মেয়েটিকে লইয়াই—বোধ করি সেই মেয়েটীকে ছিনাইয়া লইবার জন্যই বাহিরে সহস্র সহস্র কণ্ঠ উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। এই মেয়েটী পাশের গ্রামেরই হয় ত আর পাঁচজনের মত সুখে আনন্দে সংসার করিতেছিল—কল্পনায়, কত কি সুখের আনন্দে নিজের ক্ষুদ্র গৃহখানির বুকের উপর সে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিয়াছিল—অদূর ভবিষ্যতের অনাগত দেবশিশুগুলির কলতানে বোধ করি তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছিল...একদিন হয় ত সাহেবের লোলুপ দৃষ্টি সেই সংসারের উপর গিয়া পড়িল। শত সহস্র প্রলোভন হয় ত মেয়েটিকে বিচলিত করিতে পারে নাই...কিন্তু সাহেবের উদ্দাম লালসা প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই···তারপর একদিন হয় ত...

অকস্মাৎ বাহিরের সহস্র সহস্র কণ্ঠ বিকট রবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—বাড়ীখানা যেন সেই শব্দে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—ওধারের ঘর হইতে হয় ত সাহেব মরিয়া হইয়া উঠিল। সহসা সহস্র পিস্তল বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষে যেন বাহিরের বিকট গর্জ্জন মুহূর্ত্তের জন্য অতল হইয়া গেল।

তারপর সমানে চলিল সেই গর্জ্জন আর সাহেবের বিকট অট্টহাস্যের সহিত অবিশ্রান্ত বন্দুকের গম্ভীর ধ্বনি...বাহিরে মৃত্যুর আর্ত্তনাদ যেন সুকরুণ হইয়া উঠিল।

সাহসে ভর করিয়া উঠিলাম। ধীরে ধীরে গিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইলাম। জানালার একটি পাকি ভাঙ্গা ছিল—সেই ছিদ্র-পথে বাহিরের তরল অন্ধকার আমার দৃষ্টি মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিল।

কিছুই চোখে পড়িল না···শুধু মৃত্যুর আর্ত্তধ্বনির সীমাহীন ভয়—আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল।

ফিরিয়া আসিয়া জানালার পাশে অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলাম। তারানাথের অচেতন দেহের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দুইটি চোখ জলে ভরিয়া গেল। তীব্র বেদনায় অন্তর কাঁদিয়া উঠিল—কেন তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করি নাই...কেন আসিতে দিয়াছিলাম···সাহস দিয়াছিলাম···সঙ্গে আসিয়াছিলাম···যদি উহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে না পারি...কি বলিয়া একা ফিরিব...কি বলিয়া···

সত্য-সত্যই এইবার আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। একবার মনে হইল, উঠিয়া গিয়া দরজাটা ভাঙ্গিয়া দিই—দিয়া তারানাথকে লইয়া ঐ সহস্র বিপর্য্যয়ভরা আতঙ্কিতা অন্ধকারের বুক চিরিয়া চলিয়া যাই...

সহসা বিপুল বিজয়োল্লাসে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল। সহস্র সহস্র কণ্ঠ একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, মরেছে—মরেছে—সরলা মরেছে...বেশ হয়েছে···দে—দে—ঐ সঙ্গে সাহেবকেও জীবন্তে চিতায় তুলে···একা যাবে কেন ও···

সেই বিকট চীৎকারে বোধ করি সাহেবও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল...

তারপর গভীর নিস্তব্ধতা···

বাহিরের ঝড় থামিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির আর শব্দ শোনা যায় না, ঝাউগাছগুলি বোধ হয় নিরুদ্ধ বেদনায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে—ক্লান্ত পৃথিবী গাঢ় ক্লান্তিতে সবেমাত্র চোখ বুজিয়াছে...

কিন্তু এই গাঢ় নিস্তব্ধতা যেন দ্বিগুণ ভয়ে আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল—মনে হইল, এ বুঝি আর একটা ঝড়ের লক্ষণ! বাহিরের সহস্র নিস্তব্ধ কণ্ঠ বোধ করি আর একটা কল্পনাতীত ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়া নিজেরা নিজেরাই শিহরিয়া উঠিতেছে......

অকস্মাৎ দাউ দাউ করিয়া ও ধারের ঘর জ্বলিয়া উঠিল—তারপর বারান্দা—আগুনের লেলিহান শিখা বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমশঃ আসিয়া বোধ করি আমাদের জানালার

উপর ধীরে ধীরে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। বাহিরের হাজার হাজার কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বোধ করি ওধারের ঘরে আবদ্ধ সাহেব একাই প্রাণভয়ে সহস্রকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া দাপাদাপি করিতেছিল।

আগুনের উত্তাপ তীব্র অনুভব করিতে লাগিলাম। ওধারের জানালা আগুনে পুড়িয়া খসিয়া পড়িল—সেই দ্বারপথ দিয়া আগুনের দীর্ঘ প্রলম্বিত তপ্ত জিহ্বাগুলি শুধু আমাদের জন্যই বুঝি উন্মাদ হইয়া উঠিল। আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিলাম। কি করিয়া এই আগুন হইতে উদ্ধার পাইব—তারানাথকে উদ্ধার করিব ভাবিয়া পাইলাম না—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।

অসহ্য—অসহ্য—অসহ্য—দালানের বরগাগুলি জ্বলিয়া উঠিল। কোন্ সময় বোধ করি পুড়িয়া খসিয়া পড়িয়া জীবন্তে সমাধি দিবে। ভয়ে, আতঙ্কে, ঘরময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। কোনো দিক্ দিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। ওধারের জানালা-পথ দিয়া তীব্র আগুনের শিখা ঘরে আসিতেছে—এধারের দরজাও জ্বলিয়া উঠিল। অবর্ণনীয় উত্তাপে সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল—আর পারি না—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল—পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকাইয়া আসিল—চোখ দুইটী ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল...অকস্মাৎ বুকে বল আসিল—এমনভাবে কাপুরুষের মৃত্যু·· সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়া উঠিল···বিপদের কথা ভুলিয়া গেলাম। দুই হাত দিয়া তারানাথের অচেতন দেহ তুলিয়া লইয়া সদর দরজাভিমুখে ছুটিলাম......

সেই মুহূর্ত্তে দরজা পুড়িয়া খসিয়া পড়িল—একটা বিরাট আগুনের শিখা আসিয়া যেন আমাদিগকে ডুবাইয়া দিল। প্রাণভয়ে পিছনে হটিয়া গেলাম—কয়েক মুহূর্ত্ত সম্মুখের দিকে চাহিবার মত শক্তিই রহিল না।

এইবার ভাল করিয়া চাহিতেই ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম—সেই দ্বারপথে অজস্র আগুনের শিখার মধ্যে সাহেব দাঁড়াইয়া—তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে—অজস্র ফোস্কা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ভয়াবহ বীভৎসতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—চোখ দুইটী কোটর ছাড়িয়া যেন গালের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে—নাকের চিহ্নমাত্র নাই—চোয়াল দুইটী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—শুধু দুই পাটী দাঁত········ তাকান যায় না......

সাহেব বিকট রবে হাসিয়া উঠিল, হিঃহিঃহিঃহিঃ।

সেই বিকট হাসি যেন আর থামিতে চাহে না। আগুনের ন্যায় স্বেচ্ছায় প্রলম্বিত হইয়া সরীসৃপের গতিতে আমার শিরা উপশিরা বহিয়া সেই হাসির সকম্প ভীতি হিমস্পর্শে বুকের উপর বরফের মত জমিয়া উঠিল—আমার কণ্ঠ হইতে একটী ক্ষীণ আর্ত্তনাদ মাত্র ফাটিয়া পড়িল, মা—মাগো······

তারপর..... ...

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের স্মৃতি ও বেদনা লইয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, তারানাথ ইতঃপূর্ব্বেই উঠিয়া আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িলাম—সভয়ে একবার চতুর্দ্দিক চাহিলাম। কিন্তু নিজের চোখ দুইটীকেও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।······রাত্রির সেই বিশাল ভয়াবহ অগ্নি ত দূরের কথা, এক ফোঁটা ছাইও দেখিলাম না। আমরা যে ঘরে গিয়া প্রথম বসিয়াছিলাম, সেই ঘরে, সেই বিছানার উপরই বসিয়া আছি। দাবার ছকটী এখনও তেমনি সাজানো আছে; এমন কি, বন্দুকটী পর্য্যন্ত কেহ নাড়ে নাই—অথচ সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া............

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

শূন্য মন্দির মোর !

দক্ষিণারঞ্জন দত্ত, বি-এস্-সি

নাম তার মেরী। মা বিলিতী, বাপ দেশী। দুই জাতির সংমিশ্রণে তার জন্ম,—দুই জাতির সৌন্দর্য্য দিয়েই গড়া।

দুধে আল্‌তা দেওয়া তার গায়ের রঙ, পাত্‌লা ঠোঁট, টানা চোখ, নীল আকাশের মত উজ্জ্বল গভীর তার চোখের তারা। তার অজানুলম্বিত বেণী নাই, কিন্তু চুলের ভেতর যেন নদীর বুকের দোলায়মান ঢেউ খেলে চলেছে।

তার হাসি অপরূপ, চাহনি অপরাজেয়।

এমন যে সে!—একদিন যেন আকাশের বুক চিরে দীপ্তির রথে বের হলো।

তখন বায়স্কোপের ভয়ানক চল্‌তি। মেয়ার কোম্পানীতে তোড়জোড় লেগে গেছে ফিল্‌ম তুলতে। নতুন, নতুন ফিল্‌মে নতুন নতুন অভিনেত্রীর দরকার। কত কত সুন্দরী এসেছে রূপ-যৌবনের ঢেউ তুলে। মেরীও একদিন এলো।

ফিল্‌মে মেরীর খুব নাম হয়েছে। এমন এক্‌টিং, রূপের সৃষ্টি কেউ আর করতে পারে নি। এমন উন্মাদনা, মাদকতা, মোহের আবেশ কেহ কখনও আর আনে নি।

সকলে জানেন, এ রূপের স্রষ্টা তরুণ অভিনেত্রীর নাম মেরী। উর্ব্বশীর পরশ বুকে লাগিয়ে দিয়ে যেন জানিয়ে দিল সে মেরী।

ফুল যখন পাপড়ীর পর পাপড়ী মেলে ফুটে ওঠে, তখন ভ্রমরের দল ছুটে যায় মধু লুট্‌তে। বসন্তের সুষমা যখন চোখে লাগে, কোকিল ডাকে, হাওয়ায় দোল খায়, তখন নাগর চলে অভিসারে।

মেরীর ঢলঢল ভরা যৌবনের আহ্বানে তেমনি দেশ-বিদেশের কত ভ্রমর ছুটে এলো, কেউ দূর হ'তে অর্ঘ্য দিল,—তুমি সুন্দর, তুমি অপরূপ, তুমি মধুময়!

যারা তা'তে তুষ্ট নয়, তারা এলো মেরীর পরশ পেতে, তাকে বুকে নিতে। মেরী হাস্‌ল।

মেরীর এই ভক্তের দলে এমন কেউ ছিল না—যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। যাদের প্রাণে সহ্য আছে, কিন্তু ভাগ্যের দোষে শুষ্ক জীবন, রুক্ষ দেহ, তারা হয় ত দূরে, অতি দূরে স্বপ্নের মাঝে স্বপ্নময়ীকে নিয়ে মত্ত ছিল।

বাস্তব জগতে তাদের এগিয়ে আসা সম্ভব নয়,—আস্‌তেও পারে না।

যারা এলো, সবাই ধনীর দুলাল, লক্ষ্মীর বরপুত্র—প্রাসাদের ক্ষীর সর নবনীতে গড়া, অনুপম রূপ লাবণ্যময়।

মেরীকে ঘিরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্রীর, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বের হাট বস্‌ল।

ভক্তের দলে রূপের ঢেউ তুলে মেরী যখন নাচত, তখন তারা মুগ্ধ হয়ে যেত।

কাছে এসে হাত ধরে কথা কইলে আপনা ভুল্‌ত।

রাঙ্গা ঠোঁট দু'খানির উষ্ণ পরশ লাগিয়ে দিলে মাতাল হয়ে উঠ্‌ত, বুকের মাঝে অসীম তৃষ্ণা জাগ্‌ত।

আর, আর সে?...বিজলীর মত চমক্ দিয়ে চলে যেত।

চাহিদা যখন বেশী হয়, দামও চড়ে তেম্‌নি। উঁচুহারে 'বিট্‌' তুলে মেরীও তেমনি অঙ্গের পর অঙ্গ ঘুরতে

লাগ্‌ল। কিন্তু কোন অংশেই সে ধরা দিলে না—দামিনীর মত শুধু ক্ষণিকের চমক্‌ লাগিয়ে ছুটে চল্‌ল।

ইন্দ্রের চেয়ে বড়, কুবেরের চেয়ে ধনী, কন্দর্পের চেয়ে অনুপম তরুণ নাগর ওয়াট্‌ আস্‌ল। মেরী ছুটে এসে তার হাত ধর্‌ল—এস প্রিয়তম!

কিন্তু দিনের পর দিন যেতে যেতে এমন একদিন আস্‌ল, যখন প্রেমিক তার সর্ব্বস্ব দিয়েও তাকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লে না।

কেউ যদি বল্‌ত,—মেরী এ তোমার বেশ বেসাতি, বেশ! মেরী হেসে তার জবাব দিত,—মন্দ কি? গতিহীন স্থবির হ'তে যাব কেন, ছন্দবিহীন হয়ে কেন তলিয়ে যাব?...

...আমার এ ঠোঁটের পরশ ত একার নয়। এ দেহের ছোঁয়া ত একার চাওয়া নয়। এ আলিঙ্গনে একজনকে কেন বাঁধব?

...এ রূপের দোলায় দোল খাবে কত নাগর। কত ভ্রমর করবে এ মুখের মধুপান।

...এ জীবনের এই ত উপভোগ, এই ত চাওয়া। পাওয়ার মাত্রা যে আমার কানায় কানায় উপ্‌চে পড়ছে।

* * *

এমনি করে দিন চল্‌তে লাগ্‌ল।

পরে এমন একদিন আস্‌ল, যখন মেরীর অফুরন্ত পাওয়া থাম্‌ল, থাম্‌ল তার সচ্ছন্দ সাবলীল গতি!

পাওয়া যখন থামে, তখন পুঁজিতে হাত পড়ে। গতি যখন থামে, কল-কব্জায় তখন মরচে ধরে।

মেরীরও তাই হলো। যে যৌবন একদিন উদ্দাম হয়ে ছুটেছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা'তে ভাটার টান পড়ল। যে রূপ একদিন চোখ ধাঁদিয়ে দিত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা' ফেকাশে হয়ে এলো।

মেরী পমেটম মাখত, ঠোঁটে রং লাগাত, পাউডারের গেলিসে হাতমুখ ভরিয়ে দিত...

কিন্তু সেরূপ আর ফোটে কই? রূপের আলোতে চৌদিক ঝল্‌সে কই?

আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কত ঢঙের মহলা দিত সে—যদি আবার ফিরে আসে সেদিন, ফিরে আসে রূপ-যৌবন!

সব বুঝি বৃথায় যায়! ব্যর্থ হয়ে যায় তার সাধনা! যা' যায় আর বুঝি তা' ফেরে না!

এখন কেউ যে আর আসে না! যে দোরে একদিন প্রেমিকের ভীড় ছিল, আজ সে দোরে কেউই নেই। যাকে দেখ্‌তে শত চক্ষু উন্মুখ হ'ত, কেউই আর তাকে তাকিয়ে দেখে না। যার পরশ পেতে কত শতজন ধেয়ে আস্‌ত, আজ কেউই তার কাছে ঘেঁসে না—দূরে সরে যায়।

ক্রমে মেরীর যৌবনে পূরো ভাটা পড়ল—পুঁজি যা' ছিল কিছুই আর তার রইল না।

লোলচর্ম্ম, শিথিল দন্ত, পক্ককেশা মেরী! নুইয়ে পড়ল তার ঋজু দেহ, চোখ বসে গেল, স্বর হ'ল রুক্ষ।

মেরী তা'তেও দম্‌ল না—উঠে পড়ে লাগ্‌ল লোকের সঙ্গে ভাব কর্‌তে।
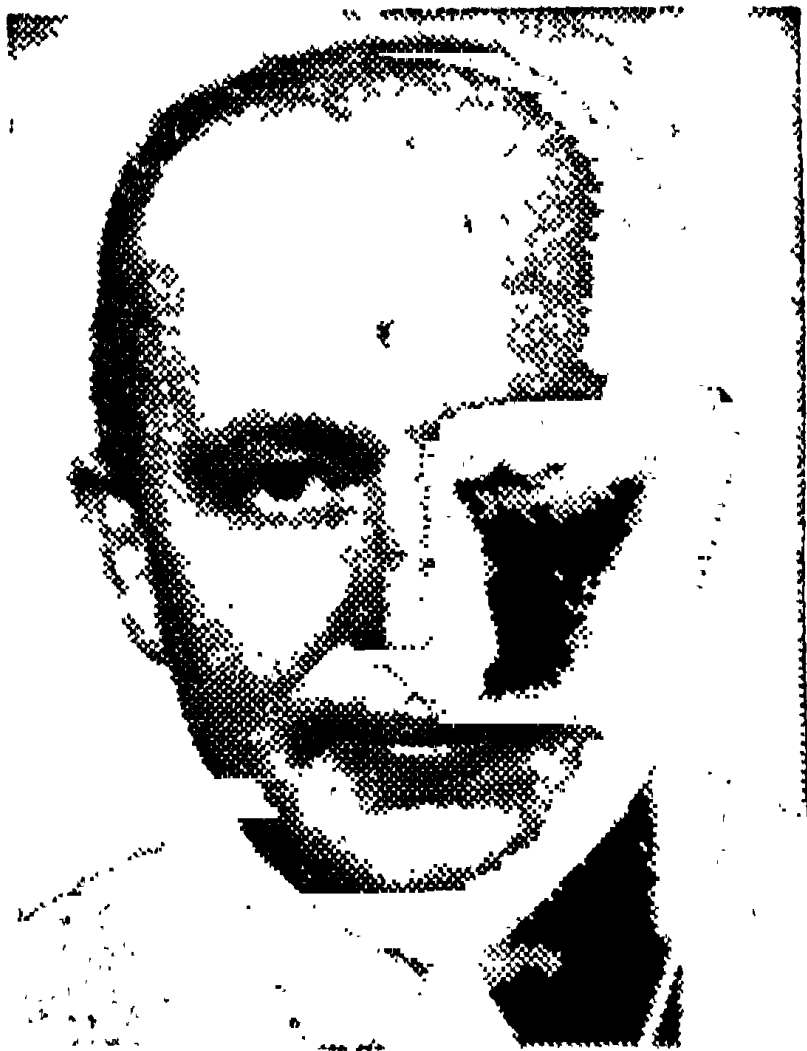
যে প্রেমের অতিথিকে একদিন তীব্র পরিহাস করেছিল, আজ কোমর বেঁধে বার হলো তাকে খুঁজে আন্‌তে।

যে পূজোর ফুল একদিন পায়ের তলায় মাড়িয়ে ছিল, যে বেদীর উপর তাথৈতাথৈ নেচেছিল, মনপ্রাণে লেগে গেল সে ফুল কুড়ুতে, সে বেদীতে আলপনা দিতে—কিন্তু তা' যেন আর হয়ে ওঠে না।

রাস্তায় একজন বালকের কাছে এগুতে সে ডাইনি বুড়ী বলে লাফিয়ে উঠ্‌ল, এক যুবক তীব্র হাসি হাস্‌ল, এক প্রৌঢ় সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌ল।

মেরী একবারে ভেঙে পড়ল—না, কিছুই নেই আর তার! আজ সে নিঃশেষে দেউলিয়ে!

বাইরে যখন এম্‌নি, তখন ভেতরের দিকে দৃষ্টি পড়ল কোথায় কিছু গড়েছে কি না!

বাইরের রিক্ততায় যখন পাষাণ চাপিয়ে দিল, তখন আপন গভীর মধ্যে তাকাল, কোথায় কোনো আশ্রয় আছে কি না, বাহিরের নগ্নতায় আঁতকে উঠে নিজের মধ্যে খুঁজতে লাগল কোথায় কোন সজীবতা মেলে কি না।

কিন্তু কোথাও কিছুই তার নেই, কাকেও সে কোনদিন ভালবাসে নাই, ভালবাসার গৃহ বাঁধে নাই, যে এসেছে, তাকে ফতুর করে তাড়িয়েছে।

এখন সে একক, একক—কেউই তার নেই।

·· সব হারিয়ে সে ভাব্‌তে আরম্ভ করেছে, যদি তার স্বামী থাকৃত, ছেলেমেয়ে হ'ত—বুক ফুলিয়ে বল্‌তে পারৃত এরাই এখন তার সব।

এ ভরা দুর্দ্দিনে, এ রক্ত-দহন অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসে আবার হয় ত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারৃত।

নিজের বুকে ভাটার টান পড়েছে, ক্ষতি কি? একটা সুন্দর সুঠাম সাবলীল ভঙ্গিমা ত পেছনে পড়ে রইল।

নিজেকে হারিয়েছে, দুঃখ কিসের? নিজের পুঁজিতে এ ত গড়ে উঠেছে—নয়নাভিরাম নন্দন কানন। নিজেকে নিঃশেষে এঁকে দিয়েছে ভবিষ্যতের ওই পরতে পরতে।

মেরী আজ বুঝতে পেরেছে তার ভুল—কি ভুলই না সে করেছে! অতীতের পুঁজি তার অতীতেই ফুরিয়েছে,

ভবিষ্যতের সম্বল শুধু ভিক্ষাব ঝুলি—যাতে কোনদিন কাণাকড়িও পড়বে না।

আজ সে বুঝ্‌তে পার্‌ছে কেমন করে সম্বল কুড়ুতে হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বড হ'তে হয়—যাতে করে সংসারের, সমাজের, বিশ্বের আনন্দ উপ্‌চে পড়ে।

সতৃষ্ণ নয়নে দেখ্‌ছে সে তার বাড়ীব আশেপাশে যোশেফাইন, ইরা, মীবা, আলেকজেন্দ্রিয়া—কত কত জন কেমন আনন্দের সহিত ঘব-করণা করছে।

তারা সংসাবী। ছেলেমেয়ে আছে, ছেলে মেয়ের ছেলে মেয়েতে ঘর ভরেছে।

ওরা ত শুধু ছোট্ট ছেলেমেয়ে নয়—যেন হীরেব টুকরো। ওরা ত শুধু কলরব করে না—আনন্দেব কল্লোল তোলে। বুড়ো ঠাকুরমাকে ঘিরে যেন আনন্দের মেলা বসিয়েছে।

ওদেব ছেলেমেয়েরা যখন 'মা মা' কবে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন কি আনন্দেব বন্যাই না বয়ে যায়! কি অমৃতই না বর্ষিত হয়!

তারও বড ইচ্ছা হয় 'মা' ডাক্ শুন্‌তে। ওই, ওই অমন করে ছেলেমেয়েকে কোলে-পিঠে, বুকে নিতে।

কিন্তু কা'কে নেবে সে—কেই বা তাব আছে। ওবা যে পর, পর, তাকে দেখে দূরে সবে যায়, ডাইনি বুড়ী বলে হাততালি দেয়।

আপন পরে এম্‌নি তফাৎ। ওঃ। ওঃ।

ও পাড়ায় ইলা থাকৃত। মৃত্যুশয্যায তাব ছেলে-মেয়েরা কি সেবাই করেছে। বিদায়-বেলায় তাদেব কি মর্ম্মভেদী কান্না।

মর্‌বার সময বুড়ীব জ্ঞান ছিল। সন্তানেব বিয়োগ-বিধুর মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওদের উষ্ণ চুম্বন সাথে নিয়ে সে চোখ বুজেছে।

তারপর কত বৎসরই না কেটে গেল। তার ওই যাবার দিনে ছেলেমেয়েরা সমাধি-স্থানে ভীড করে—পত্রপুষ্পে সাজায়, নীরবে অশ্রুর অর্ঘ্য দেয়।

সুন্দর তাদের স্মৃতির পূজা। কি সুন্দব ইলার ওই মাতৃত্বের দাবে সন্তানেব এই শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন!

কিন্তু মেবীব? যাবাব বেলায় কে কাঁদবে 'মা মা' বলে, কে দেবে তাকে বিদায় চুম্বন? বছরেব পব বছর কে কর্‌বে তাব স্মৃতিব তর্পণ?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে নীবব অশ্রুতে তাব বুক ভেসে যায়।

* * *

দিন যায়, বাত আসে। জগতেব এই চির আবর্ত্তনে একদিন সবাইকেই যেতে হবে। মেবীবও যাবাব দিন এলো।

তাব পয়সা ছিল, ডাক্তাব, নার্স, বয়, মেথব সবাই মিল্‌ল। মিল্‌ল না কেবল এতটুকু স্নেহাতুব বুক, একখানিও বিয়োগ-কাতব মুখ।

বুকচেবা নিশ্বাস ফেলে সে শেষ চোখ বুজ্‌ল।

* * *

সমাধি-স্থানের এক কোণায় তাবও স্থান হয়েছে। কে যেন দযা কবে লিখে দিয়েছে,—'শূন্য মন্দিব মোর!'

বছবেব পর কত বছব গেল। উদাস হাওয়া ওই কালো পাথবেব গা ঘেঁষে বুঝি বা করুণ স্বরে ওই লেখাব আজও মানে খুঁজে বেড়ায়।

দক্ষিণাবঞ্জন দত্ত

রংমশাল

একাদশ বর্ষ | মাঘ, ১৩৪২ | দশম সংখ্যা

আফিমখোর

প্রভা দে, সরস্বতী

আফিম তার চাই। যে ক'রে হোক্ আফিম তার চাই-ই! ছাত্রের যেমন পড়া, মায়ের যেমনি ছেলে, নটবরের তেমনি আফিম।

নটবর জাতিতে বৈষ্ণব। গ্রামের প্রান্তে তার ঘর। বেশ নিরালা জায়গাটি। অন্য বাড়ী আর একটিও নেই কাছাকাছি। পাশে ছোট চিক্‌চিকে নদী; বর্ষাকালে কিন্তু ওই নদীরই প্রতাপ খুব। স্রোতের পর স্রোত আছড়ে পড়ে; দেখলে ভয় লাগে। নদীর ওপারে শ্মশান; ধূ ধূ করে বালুর চর।......

সম্পদের ভেতর নটবরের একখানা চালাঘর, কয়েকটা কলাগাছ, একটা লেবুগাছ। বোষ্টম মানুষ, ভিক্ষে করে খায়। মাইল খানেক দূরেই নারায়ণগঞ্জ সহর। নটবর রোজ সহরে যায় ভিক্ষে করতে। পয়সা যা দু'-চারটে পায়, তা' আফিমের দোকানেই দিয়ে আসে।

তবে, নটবরের এককালে সবই ছিল। তাই ব'লে বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু ছিল না। ছিল একটি ছেলে, নাদুসনুদুস, ফুটফুটে; আ'র একটি মনের মিলে বিয়ে করা টুকটুকে বউ। প্রেম জিনিষটা তাদের ছিল একচেটে; অর্থাৎ, গ্রামের অন্য কোন দম্পতীর প্রগাঢ় ভালবাসা দেখলে, নটবর আর তার বউ কুমুদিনী দস্তুরমত চটে' যেত। আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই এতে।......

তবে, সময় সময় কুমুদিনী বল্‌ত বটে—"নবদ্বীপে গিয়ে কি জঞ্জালই কুড়িয়ে পেলাম—ছাড়তেও পারি নে!..."

নটবর হেসে বল্‌ত—"ছাড়লে ত' ছাড়াবে কুমু!..."

তাদের ছোট সংসারের আনন্দকে বাড়িয়ে দিত তাদের খোকা। ছু'বছরের ছেলের মুখে হরিনাম গান শুনে নটবর আর কুমুদিনী মনে করত সত্যিই বুঝি হরি-ঠাকুর মর্ত্তে নেমে এসেছেন। রোজ সকালে নটবর ছেলেকে নদীতে নিয়ে যেত। নাওয়া হ'লে কপালে চন্দনের তিলক কেটে দিত। ছোট ছেলে একখানা 'রাধাকৃষ্ণ নামাবলী' গায়ে দিয়ে টুকটুক্ ক'রে ঘুরে বেড়াত।

কিন্তু একদিন ওই সর্ব্বনাশা নদীই নটবরের খোকাকে আত্মসাৎ ক'রে বস্‌ল। তখন বর্ষাকাল। নদীতে জল অনেক। নটবর গিয়েছিল হাট করতে। ফিরে এসে দেখে ছেলে নেই।...কতদিন নৌকোয় চ'ড়ে সে ছেলেকেও হাটে নিয়ে যেত বেড়াতে; সেদিন আর নিয়ে যায় নি।

অনেক সন্ধান হ'ল, কিন্তু খোকার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।...পরের দিন সকালে সংবাদ পাওয়া গেল, মাইল চারেক দক্ষিণে কাদের এক মরা ছেলে ভেসে উঠেছে।...

সন্ধ্যার সময় খোকাকে পুড়িয়ে নটবর যখন বাড়ী ফিরে এল, কুমুদিনীর তখনও জ্ঞান হয় নি। বেচারা কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।......

নটবর কিন্তু কাঁদল না, জ্ঞানও হারাল না। সে শুধু নদীটার পানে এবং ওপারের শ্মশানের দিকে চেয়ে চুপ করে ব'সে রইল।...

দুই

মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝে সময় বসে থাকে না। কিছু দিন পর কুমুদিনী আবার আগেকার মতো ঘর-সংসারে মন দিল।

কিন্তু নটবর? সে যেন দিন দিন মুষড়ে পড়তে লাগ্‌ল। কোন কাজেউৎসাহ নেই—এমন কি, ভিক্ষে করতে বেরুবে, তাও তার ভাল লাগে না। শুধু দাওয়ার 'পরে ব'সে শূন্য নদীটার দিকে চেয়ে থাকে।......

আজ ক'দিন কুমুদিনীর জ্বর। কি আর করা যাবে বলো? ঘরের বেড়া বর্ষাকালে পচে গেছে; বদলানো দরকার—তা', নটবরের সেদিকে খেয়ালই নেই। জমিদার-বাড়ীতে কি একটা ব্যাপার উপলক্ষে খুব খাওয়া-দাওয়া, দান-ধ্যান হচ্ছে—কে আর এখন উঠে যায় সেখানে।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। নটবর তেম্‌নি দাওয়ায় ব'সে থাকে। একটু পরে অন্ধকার রাত্রি তার কালো জাল নিয়ে নেমে আসে। দূরের শ্মশানের বালুচর নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। নটবর আস্তে আস্তে উঠে পড়ে।

ধীরে ধীরে সে নদীর দিকে এগোতে থাকে।......আর একজনের পায়ের শব্দ কানে আসে। অন্ধকারে নটবরের হাতে চাপ পড়ে। নটবর বলে—"যাবে না সম্‌জিয়ার হাটে?"

—"বাঃ, যাবো না! ডাকো না মাঝিকে।"

মাঝি আসে ডিঙি বেয়ে। দু'জনে উঠে পড়ে।

নটবর বলে—"কত পয়সা নিলে?"

—"বারে! পয়সা ত' তোমার কাছে। সওদা করবে তুমি, আমি তো যাচ্ছি বেড়াতে—"

নটবর হেসে বলে—"কাল যে পয়সাটা নিলে, বল্‌লে—পুতুল কিনবে।"

—"ও, সেটা? সেটা আছে আমার আঁচলে বাঁধা—এই দেখো।"

মাঝিকে উদ্দেশ ক'রে নটবর বলে—"এই, সামনে এগিয়ে তবে নদী পার হবি।"

মাঝি বিরক্ত হ'য়ে বলে, "ভাড়া তো দেবে পাঁচ পয়সা, অতো ঘুরতে আমি পারব না।"

নটবর রেগে বলে—"যা, ছ' পয়সা পাবি। দেখ ছিস না সাম্‌নে শ্মশান—মড়া-টড়া দেখলে ছেলেমানুষ ভয় পাবে।"

ব'লে নটবর মনে মনে পয়সার হিসেব করতে থাকে। মোট তো সাত আনা পয়সা—তা', ডিঙি ভাড়াই তো যেতে-আসতে দশ পয়সা......ডাল চার পয়সা, তেল তিন পয়সা, পান এক পয়সা, নুন আড়াই পয়সা......

হঠাৎ আফিমখোর নটবরের পা দু'টি জলে পড়াতে তার স্বপ্ন ভেঙে যায়। উঃ, কী ঠাণ্ডা জল!

নটবর ফিরে আসে। আবার ফিরে দাঁড়ায় নদীর দিকে মুখ ক'রে। ঝিরঝির ক'রে বয়ে চলেছে নদী।

অন্ধকারে যেন একটা কালো সাপ এঁকেবেঁকে চলেছে। পাশের ঝাউগাছটা ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি কথা কইছে। পারের শ্মশানের ধারে একটা জলন্ত চুল্লীর রক্তবর্ণ লেলিহান্ জিহ্বা আকাশে প্রসারিত।...নটবরের মনে হ'ল, দু'টি তাজা চোখ ওই জলন্ত চুল্লীর দিক হ'তে তার দিকে ছুটে আসছে। অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ ক'রে নটবর প'ড়ে যায়।...

খুঁজতে খুঁজতে কুমুদিনী ছুটে আসে।

তিন

একদিন কুমুদিনী রাগ ক'রে বলে—"খালি আফিম খাবে, আর যেখানে-সেখানে পড়ে থাকবে। একটা পয়সা নেই; ঘরে ক্ষুদ্‌টির পর্য্যন্ত অভাব—অথচ, তোমার খেয়াল নেই। আমার জ্বর—"

নটবর কথা বলে না।

কুমুদিনী এবারে আরো চটে যায়। বলে গলা খাঁকিয়ে—"বলি, কথাগুলো কানে যাচ্ছে? পয়সা যা' দু'-চারটে ছিল, তাতো এ তিনদিনে তোমার আফিম খেতেই গেল—আজ খাবে কি?"

নটবর তবু নিরুত্তর।

—"এম্‌নি তো দেখি নড়ে বসতে চাও না অথচ, এ ক'দিন দিব্যি সহরে গেলে আফিম আন্‌তে। বলি, ভিক্ষে কর্‌তে কি লজ্জা করে? বাপদাদা তো আর জমিদারী রেখে যায় নি।"

কুমুদিনী বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গায়ের কাপড়টা ঠিক কর্‌তে কর্‌তে সে বল্‌ল—"আমি এই জ্বর গায়েই চল্‌লাম। রইল তোমার ঘর-দোর—"

সত্যিই কুমুদিনী যেতে উদ্যত হয় দেখে নটবর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে—"কোথায় যাবে?"

—"যাবো চুলোয়!...তোমার ছেলে মরেছে, আমার মরে নি? তবে আমারো উচিত তোমার মত আফিম খেয়ে দিনরাত ব'সে থাকা।..."

নটবর আবার চুপ ক'রে যায়। দুনিয়ায় বল্‌বার মতো কথা তার কই?

কুমুদিনী দুম্‌দাম্ শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সাম্‌নের মেঠো পথের ওপর নেমে পড়ে বল্‌ল—"আমি চল্‌লাম। কবে ফিরব বল্‌তে পারি না। এই রইল তোমার চাবি—"

নটবর হেসে বলে—"যাবে বই কি কুমু। আমাদের বৈষ্ণবের ঘরে তোমায় দুষ্‌বে কে?"

—যাব না তো কি! তুমি কি ভেবেছ না কি আমার ঘাড়ে ব'সে খাবে?..."

কুমুদিনী চ'লে গেল। নটবর আর একবারও তাকে জিজ্ঞেস করল না।

খানিক দূর গিয়ে কুমুদিনী ফিরে চাইল। দেখ্‌ল, বাতাসে তাদের কলাগাছগুলোর পাতা দুলছে; আর, একটা কাক সেই পাতার উপর বসে কা কা শব্দ ক'রে চলেছে।

কুমুদিনী থাম্‌ল। কি একটা অবাধ্য মায়ার পরশ তার বুকে দাগ কেটে বস্‌ল। চোখ দুটো এল বাষ্পাকুল হ'য়ে।...

—কি, ফিরে এলে যে?" নটবর বিস্মিত চোখে জিজ্ঞেস কর্‌ল

—"এলুম আমার খুসী। জ্বর গায়ে মানুষ হাঁটতে পারে।"

কুমুদিনী আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক-গুলো মুহূর্ত্ত গড়িয়ে গেল। দু'জনেই চুপচাপ।

খানিকবাদে নটবর কুমুদিনীর শিয়রে এসে দাঁড়াল। বল্‌লে আস্তে আস্তে—"সত্যি কুমু, আমার অন্যায় হয়েছে। মাপ কর।" তারপর কুমুদিনীর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে নটবর আবার বল্‌লে—"তোমার তো খুব জ্বর হয়েছে কুমু! আমায় বল নি কেন? আর এই জ্বর গায়েই চলে যাচ্ছিলে?..."

হঠাৎ কুমুদিনী ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু কর্‌ল।...

—"কেঁদো না কুমু। আমি এখুনি যাচ্ছি সহরে,

হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিয়ে আসব। আর, ভিক্ষের ঝুলিটা কই গো ?”

—“থাক্. আমার ওষুধ লাগবে না।”

কুমুদিনীর জলে-ভরা দুই চোখের দিকে মোহাবিষ্টের মতো খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নটবর বল্‌ল—কি যে বলে, ওষুধ লাগবে না ! রোগ হয়েছে, কষ্ট পাচ্ছ—না গো না, আমি যাই।”

—“শোন।”

—“কি ?”

—“আমার এই গা ছুঁয়ে বলো যে, আর ওই বিস খাবে না। বলো, বলো, ও গো, তোমার পায়ে পড়ি…”

নটবর আস্তে আস্তে আবার কুমুদিনীর কাছে এল। সযত্নে তার কপালের ওপরকার এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে—“এত বড় শপথ আর একদিন করব কুমু। আজ থাক্।”

—“দিন দিন তোমার চেহারা কি হচ্ছে, আয়না নিয়ে দেখেছ ?…ও গো. এমন করলে কতদিন বাঁচবে আর !…” কুমুদিনী চোখের জল মুছে বল্‌লে।

চার

এততেও নটবরের অভ্যাস বদলায় না। আফিম তার চাই-ই !

সহর থেকে কুমুদিনী ফিরে এলে নটবর শুধোয়,—“এনেছ তো ?”

আফিমের মোড়কটা নটবরের গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে কুমুদিনী বলে—“এই নাও তোমার বিষ !…লজ্জা করে না তোমার ঘরের পরিবারকে ভিক্ষেয় পাঠিয়ে নেশা করতে !”

নটবর মোড়কটা কুড়িয়ে নিয়ে একটু হেসেই বলে—“ভালই তো হচ্ছে কুমু। তুমি বেরুলে রোজগার হয় বেশী। তোমায় দেখে…”

—“কি বল্‌লে !…” কুমুদিনী রুখে ওঠে।

—“রেগো না কুমু, রেগো না। এই সেবার নবদ্বীপে গিয়ে কতো বোষ্টমীই তো দেখলুম ! হ্যাঁঃ, কিন্তু তোমার মতোটি—”

আবার নটবর হাস্‌তে হাস্‌তে বলে—“কিন্তু আমার, আমার ভেতরে তুমি কি এমন দেখলে যে, আসবার দিন ব’লে বস্‌লে—‘ও গো, আমাকেও নিয়ে চল।’.. সত্যি কুমু, এক একসময় ভাবি—”

কুমুদিনী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলে—“থাক্, আর ভাবতে হবে না। আফিম পেয়ে ফূর্ত্তি যে আর প্রাণে ধরে না !”

বেদম একচোট হেসে উঠে নটবর একেবারে চুপ ক’রে যায়। একেবারে পাথরের মত অচল অটল।

ক’ দিন পরে।

দুপুর উত্‌রে যায়। কুমুদিনী সহর থেকে ফেরে না। নটবর অস্থির হ’য়ে পড়ে—কুমুদিনীর দেখা নেই।

পশ্চিম আকাশে সূর্য্য হেলে পড়ে—না, কুমুদিনী আসে নি এখনো। নটবর ভাবে, কোথায় গেল কুমু ? ..

সারাদিন খাওয়া হয় নি। নটবর সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে পড়ল। নারায়ণগঞ্জ সহরের প্রত্যেক রাস্তা-ঘাট খুঁজেও কুমুদিনীকে পাওয়া গেল না।…

তবে কি কুমুদিনী ষ্টীমারে গোয়ানন্দ চলে গেল ?… হয় তো, সেখান থেকে গাড়ীতে নবদ্বীপে রওনা হবে।…

যা’ হোক্, সে রাত্রে নটবর আর গ্রামে ফিরে এল না। ষ্টীমার-ঘাটের মুসাফিরখানায় শুয়ে রইল। সেখানে অনেক লোক—মেয়ে-পুরুষ। নটবর তা’দের প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল—না, তারা কেউ কুমুদিনী নয়।

ভোর হ’য়ে এল। নটবর অগত্যা ঝিমোতে ঝিমোতে ষ্টীমার-ঘাট ছেড়ে সহরের দিকে পা বাড়ালে।

এর কিছুদিন পর নটবর খবর পেলে, পাশের গ্রামেই না কি কুমুদিনী আছে। কা’র এক পতিত জমিতে সে না কি একখানা চালা তুলেছে। ভিক্ষে আর সে এখন করে না। নুন লঙ্কা মসলার দোকান করেছে একটা।

নটবর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, কুমু তবে কাছাকাছিই আছে—নবদ্বীপে যায় নি রাগ ক’রে। দোকান করেছে—ভালই আছে তা’ হ’লে। কিন্তু, টাকা সে পেল কোথায় ? যাক্ গে, অত কথায় তার কাজ কি ?

তবে, যখন ভিক্ষে কর্‌তে সহরে বেরুতে হয়, তখনই নটবরের মনে পড়ে কুমুর কথা। হায়রে, সে যদি থাকত!...

কিন্তু, আফিম তার চাই। যে ক'রে হোক্ চাই ই! সারাটা রাত আফিমের গুণে কোথা দিয়ে কেটে যায় নটবরের তা' খেয়ালই থাকে না। আজকাল আফিমের মাত্রাও সে বাড়িয়ে দিয়েছে। ভিক্ষে করে চাল যা' পায়, অল্প দামে তা' বেচে ফেলে। সমস্ত পয়সা দিয়ে কেনে শুধু আফিম—তা'র বহু-বাঞ্ছিত আফিম।

তবে, যেদিন পয়সা বেশী জোটে না, অথবা চালও তেমন পাওয়া যায় না, সেইদিনই হয় মুস্কিল। উঃ, সে রাত যেন আর কাটে না!...অসহ্য মর্ম্মন্তুদ হ'য়ে রাত্তিরের ঘন মুহূর্ত্তগুলো নটবরের কানে বাজতে থাকে!...

নদীর ধারে শ্মশান। ঝাউগাছের সোঁ সোঁ শব্দ, মাছ ধরা পাখীগুলোর চিঁ চিঁ ডাক, সব মিলে যেন এক ভয়ার্ত্ত করুণ আর্ত্তনাদ! নটবরের ঘুম নেই—চোখে তার একফোঁটা ঘুম নেই।...

পাঁচ

প্রায় আড়াই বছর এরপর কেটে গেছে। এর ভেতর নটবর একদিনও কুমুদিনীর খোঁজ করে নি। লোকের মুখে শুনেছে সে না কি ভালই আছে।

এর কিছুদিন পরেই এল সেই বড় ঝড়ের দিন। সেদিন দুপুরে নটবর সহর থেকে ফিরেছে—আর যাবেই বা কোথায়? মাঠের ধূলো উড়ে চলেছে তীরেরও আগে; বাতাসকে ক'র ফেলেছে অন্ধকার। তিন হাত দূরের জিনিষ আর চেনা যায় না। শোনা যাচ্ছে শুধু শব্দ—পড়বার, উপ্‌ড়োবার, উড়ে চল্‌বার। কোন্‌দিক থেকে কি এসে গায়ে পড়বে ঠিক নেই। আকাশ যেন পৃথিবীর সাথে এক হ'য়ে গেছে; আর, সেই অস্পষ্টতার মাঝে গুম্‌রে উঠছে যুগ-যুগান্তের ক্রোধাগ্নি!...শিখা—বাতাসের তপ্ত লেলিহান্ বেগবান এক একটি শিখা যেন তাদের ধ্বংস-লীলার আনন্দে চীৎকার সুরু করেছে!...সভয়ে নটবর দেখ্‌ল, কোথা থেকে একটা উড়ন্ত টিন্ এসে তার চার-চারটে কলাগাছকে একসাথে নামিয়ে দিলে। আরও মিনিট দুই পর নটবর দেখ্‌ল—তার ঘরের চালখানা উড়ে চলেছে তীরবেগে...

নটবর থাক্‌ত একেবারে নদীর ধারে, বল্‌তে গেলে গ্রামের প্রান্তে। কিন্তু, গ্রামের প্রান্তে থেকেও গ্রামের ভেতর কি ব্যাপার চলেছে তার পরিচয় নটবর যথেষ্ট পেল। একটা মিশ্রিত কলরব শোনা যাচ্ছে—সে কলরব হাটের কলরব নয়। সে কলরব ভয়ার্ত্ত এবং মানুষের মনকে তা' মুহ্যমান ক'রে তোলে।...

ঘণ্টা দুই চল্‌ল ঝড়ের এই তুমুল প্রবাহ। তারপর এল বৃষ্টি। তেমন বৃষ্টি নটবর জীবনে কোনদিন চোখে দেখে নি। আকাশ যেন কোটী কোটী কলসীর জল একসঙ্গে সজোরে ঢেলে দিচ্ছে।

এইবারই হ'ল নটবরের মুস্কিল। তার কারণ, আজ আফিম কিনেই বড়িটা নটবর মুখে ফেলে দিয়েছিল। গ্রামে আস্‌তে আস্‌তে নেশাটাও বেশ জমেছিল। তারপর এই ঝড়—তা'তে নটবরের বড় বেশী আপত্তি ছিল না। ঘরের চালটা উড়ে গেছে বটে, বেড়াগুলোও খ'সে খ'সে পড়ছে—তা' হোক্ গে!...

কিন্তু, এই জল—বরফের মত ঠাণ্ডা জল! নটবর এতক্ষণে ঈশ্বরের ওপর সত্যি সত্যি বিরূপ হ'য়ে উঠল। কি আর করা যায়...নটবর সেই ভাঙা ঘরের আড়ালে গিয়ে ব'সে পড়ল।

ঝড় এবং জল দুটোই তখন সমান তালে চলেছে।

ঘণ্টাখানেক জলে ভিজে নটবরের খেয়াল হ'ল যে, এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে সে শীতে মরে যাবে। কোথায়ই বা যাওয়া যায়? ঝড়ে সমস্ত বাড়ীই হয় তো ভূমিসাৎ হয়েছে। তবে, জমিদারের পাকা ঘরগুলো এখনো টিঁকে আছে।

নটবর সেইদিকেই য'বে মনে কর্‌ল।

পথে নামতেই সে দেখ্‌লে সেখানে জল জমেছে। মাঠ-ঘাট জলে জলাকার! সকালে যেখানে শুকনো মাটি ছিল, বেলা চারটেয় সেখানে সাঁতার জল! নদীটাও ফুলে ফেঁপে উঠেছে এই ক' ঘণ্টায়। নদী আর মাঠকে বিভিন্ন

ক'রে চেনবার উপায় নেই। নটবরের উঠোনেও এক হাঁটু জল।

সেই মিশ্রিত কলরব এবারে চীৎকারে পরিণত হয়েছে। নটবর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, হাহাকারের সেই মর্ম্মন্তুদ-ধ্বনি — 'বাঁচাও, বাঁচাও!' 'কে আছ গো রক্ষে কর!'···মানুষ, গরু, ছাগল, মোষ, গাছের ডাল, ঘরের চাল—স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে অগুন্তি। নটবর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, আর ক' মিনিট দেরী করলেই হয় তো তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।···

নটবর তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে চল্‌ল জমিদার-বাড়ীর দিকে।

কিন্তু ওটা কি গাছের ডালের সাথে জড়িয়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলেছে? একটা ছোট ছেলে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ—ছেলেই ত'! নটবর তার ডানপাশে লাফিয়ে পড়ল। বিপুল বিক্রমে সে এগিয়ে চল্‌ল—শীগ্‌গির চাই-ই ওটাকে। কিন্তু, সেই ডালটাকে ধরবার আগেই ছেলেটা খসে পড়ে গেল তলিয়ে।

দ্বিগুণ উৎসাহে নটবর সাঁতরে চল্‌ল। ডালটার কাছাকাছি গিয়ে সে ডুব দিলে—না, কোথায় গেল সেই শিশু? নটবর ব্যস্ত চোখে চারদিকে খুঁজতে লাগল।...

ছয়

জমিদার-বাড়ী।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। আকাশ তখন অনেকটা পরিষ্কার। বৃষ্টি থেমে গেছে। ঝড়ও কমেছে।

জমিদার-বাড়ীর ওপর এবং নীচেতলার সবগুলো ঘর লোকে গিস্‌গিস্ কর্‌ছে। আশপাশের গ্রামের লোক সবাই ছুটে এসেছে এখানে। গান্ধীজি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; তথাপি, জাতি-ধর্ম্ম ভুলে সবাই একজায়গায় জড়ো হয়েছে—ভদ্রলোক, চাষা, নাপিত, কামার কুমোর, ধোপা, ইত্যাদি। কেউ কাঁদছে, কেউ ঈশ্বরকে অভিশাপ দিচ্ছে, কেউ বুক চাবড়াচ্ছে।

নীচেতলার একেবারে কোণের ঘরটার সামনে ব'সে একজন লোক। কোলে তার বছর তুইয়ের একটি ছেলে। ছেলেটিকে সে সেঁক দিচ্ছে। অনেক কষ্টে এক টুক্‌রো শুক্‌নো কাপড় এবং মাল্‌সায় ক'রে কতকগুলো টিকের আগুন সে জোগাড় করেছে। জমিদারবাবু নিজে এসে-ছিলেন—ছেলেটির অবস্থা দেখে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

লোকটির মনে হচ্ছে, ছেলেটি তার বহুপরিচিত—যদিও সে ছেলে তার নিজের নয়। ওই চোখ, ওই মুখ, ওই রং—মায় দেহের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ—সবই তার চোখে বিস্ময়ের মতো ঠেকছে!...আচ্ছা, একে কি সে চেনে? একে কি কোনদিন রাত্রে সে স্বপ্নে দেখেছে? ঠিক্ এই ছেলেটিই বছর তুই আগে নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিল না?······

হঠাৎ একটি মেয়েছেলে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদতে কাঁদতে এসে পড়ল। ছেলেকে লোকটির কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে কেঁদে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগল—কোথায় ছিলি বাবা!···তোকে যে খুঁজে খুঁজে আমি···কতজনকে বল্‌লাম, কেউ গেল না···!"

তারপর হঠাৎ লোকটির দিকে চেয়ে মেয়েটি ভীষণ আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—"এ কী—তুমি! তুমি!···তুমিই ওকে বাঁচিয়েছ? তাই বুঝি সেঁক্‌ছিলে?"

লোকটি হাসি-হাসিমুখে বল্‌লে—"হ্যাঁ কুমু, আমিই ওকে বাঁচিয়েছি। জল খেয়েছিল অনেক। গোটা কয়েক জোরে ঝাঁকানী দিতেই—"

কুমুদিনী তার ছেলেকে বুকের ভেতর চেপে ধরে রাখ্‌ল। আর ওই যে তার সাম্‌নে লোকটি আধো অন্ধকারে ব'সে আছে—তার দিকে সে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে দেখা যেন ফুরোয় না!·· যুগ-যুগান্ত ধ'রে দেখ্‌লেও যেন ফুরোবে না!...

নটবর বল্‌লে—"এ ছেলে তা' হ'লে তোমার?"

অনেকক্ষণ পরে কুমুদিনী বল্‌লে—হ্যাঁ আমার!......তোমারও। আমি চ'লে আসবার সময় ও আমার পেটে ছিল। ওকে বাঁচাব বলে চলে আসি। কিন্তু তখন ছিল অভিমান—আর সেই অভিমানের জোরেই ফিরে যেতে পারি নি।...ছেলে আমার বড় হ'য়ে উঠতে লাগ্‌ল—একেবারে যেন সেই আগেকারটী!...সেই চোখ, সেই মুখ, কত ইচ্ছে করত তোমাকে একবার দেখিয়ে আনি গে··· কিন্তু—"

নটবর কোনমতে ধৈর্য্য ধরে কুমুদিনীর এই এতগুলো কথা শুন্‌ছিল। এইবার সে উৎসাহিত হ'য়ে বলে উঠল—"তবে দাও—দাও কুমু, আমার কোলে ওকে দাও!"

খোকাকে নটবরের কোলে দিতে দিতে কুমুদিনী আবার কেঁদে ফেল্‌লে। নটবরের পা তুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌লে—"তুমি বলো আমায় ক্ষমা করলে? বলো··"

কুমুকে সস্নেহে উঠিয়ে নটবর বল্‌লে—"ছি কুমু, আজকের দিনে চোখের জল ফেলে না!...ওঠো। দেখো, খোকা কেমন মিটিমিটি হাস্‌ছে। ও গো, দেখো—দেখো!..."

প্রভা দে

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সতের
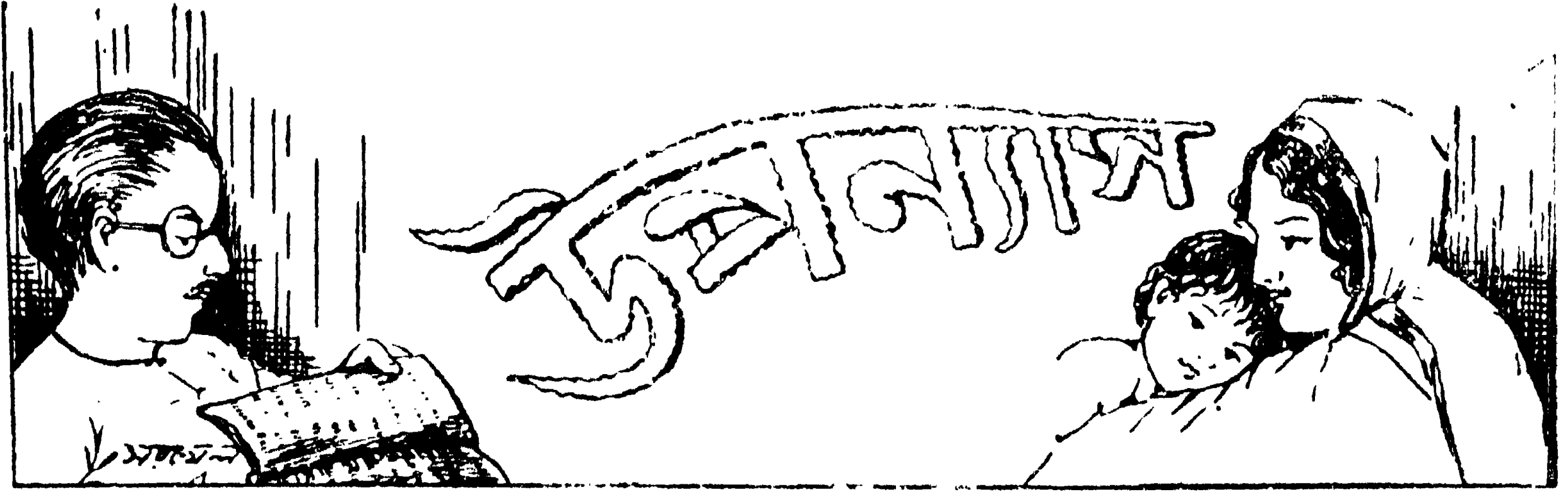
মুখে অমর অজয়ের এই নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্তের জন্য যত উল্লাসই প্রকাশ করুক না কেন, বুকের কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক থাকিয়া গিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল।

শেফালীর পানে চাহিতে গিয়া অকারণে সে ঘামিয়া উঠিল। কিন্তু চুপ করিয়া বেশীক্ষণ থাকিতেও পারিল না। হঠাৎ এক সময় 'ফস্' করিয়া বলিয়া বসিল—কিন্তু কি দেমাক দেখেছ শেফা! এতবড় দুর্দ্দিনেও বড় আদরের দিদিটি একবার মুখ ফুটে তোমার কাছে পর্য্যন্ত বল্‌তে পারলেন না যে, ওকে ছেড়ে থাকা কেন সম্ভব নয়। স্থান অকুলান হ'ত না; তবু যে আশ্রয় নিতে চাইবে, তার সব রকম করেই ত বোঝান উচিত?

তা' বটে! শেফালী কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নামাইয়া বলিল—কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখো, কত করে বললুম, কোনমতেই রাজী হলেন না থাকতে। বল্‌লেন—তোর কাছে থাকতে পাবার সৌভাগ্য সবার হয় না বোন্; এর জন্য অকারণে কষ্ট পাস্ নি। বিশ্বাস রাখিস্—তোর স্নেহের কোল ছেড়ে যেতে যে দুঃখ আমি পাচ্ছি, তা' ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেন না!

দুঃখ! উত্তেজিত হইয়া অমর বলিয়া উঠিল—দুঃখ পাচ্ছে সে? তুমি ভুল শুনেছ শেফা, একেবারে ভুল শুনেছ। কশায়ের ছুরিতে যদিও বা কোন অনুভূতি সম্ভব, তার মধ্যে তার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। তবু ভাল, তোমার কাছে থাকবার সৌভাগ্য তার মত লোকের হ'তে পারে না এটুকু জেনে গিয়েছে। বারবার আর আমাদের এ অপ্রিয় আলোচনা করতে হ'ল না।

শেফালী কোন কথা বলিল না।

অমরও একখানা আইনের বই টানিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। ঘরের স্তব্ধ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ঘড়িটা শুধু টিক্‌টিক্ করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র গাঁথিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ দেওয়ালের পানে চাহিয়া অমর বলিয়া উঠিল—এ কি! তোমার সাধের ফটোগুলো কোথায় গেল শেফা?

শেফালী ধরা পড়া চোরের মত একবার দেয়ালটার দিকে চাহিয়া বলিল—তুলে রেখে দিয়েছি। কি হবে নিজেদের ছবি টাঙিয়ে। এর চেয়ে কেমন মানিয়েছে বলো দেখি—কৃষ্ণরাধা, শিবদুর্গা মূর্ত্তি। কাল পাঁচসিকে দিয়ে কিনেছি। ঠকি নি ত?

অমর হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল—ঠকো নি নিশ্চয়, কিন্তু ঠকিয়েছ।

—ঠকিয়েছি? কা'কে?

—হ্যাঁ গো, তোমার ওই কৃষ্ণরাধাকে, শিবদুর্গাকে। তবে এই ভরসা, তাঁরা কথা কইতে পারবেন না।

শেফালীর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। সে বলিল—কি বাজে বক্‌ছ! দেবতাকে বুঝি কেউ ঠকাতে পারে?

—পারে না হয় ত! কিন্তু এসব মিথ্যার-আশ্রয় নেবার

কোন প্রয়োজন ছিল না শেফা। সে এতবড় কিছু নয়, যার জন্যে তার স্মৃতিটা অনুক্ষণ আমাকে যাতনা দেবার স্পর্দ্ধা রাখ্‌বে! পাছে তার ফটো সাম্‌নে থাকলে তার স্মৃতি মনে পড়ে, আমি কষ্ট পাই, তাই তুমি আগে থেকে সাবধান হয়ে তোমার চরিত্রই উজ্জ্বল করে তুলেছ। এটুকু পাওয়াও আমার পক্ষে বড় কম পাওনা নয় শেফা!

শেফালী প্রাণপণ চেষ্টাও কিন্তু প্রতিবাদ করিতে পারিল না। স্বামীর নিকট যে তাহার কোন প্রচেষ্টাই লুকানো নাই এ কথা যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই তাহার মাথাটা আরও নীচু হইয়া যাইতে সুরু করিল।

অমর একবার তাহার লাজ-বিনম্র মুখখানির প্রতি চাহিয়া আবেগোদ্বেল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এতে লজ্জার কিছু নেই শেফা, তোমার মত সতী-লক্ষ্মীরা নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছে, তাই বলেই এত পাপেও পৃথিবী পাষাণ হয়ে যায় নি। নইলে—

অমিত বলে শেফালী এবার নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলি‍ল—সব রসাতলে যেতো, কেমন? এমন লজ্জা দিতে পার! অমন সব কথা শুন্‌লে মেয়েদের পাপ হয়। আর কখনও অমন করে বল্‌বে ত কথাই কইব না। মা গো!—বলিয়া সে বিদ্যুৎ বেগে সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

অমর তাহার গমন-ভঙ্গীর পানে চাহিয়া একবার হাসিল। তারপর আইনের বইখানি টানিয়া লইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া অমরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া শেফালীর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। গত সুখের দিনগুলাকে আবার ফিরাইয়া পাইবার সম্ভাবনায় তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

পূর্ব্বেরই মত মক্কেলের ভীড় কমাইতে পারিলেই অমর শেফালীর নিকট ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নানা কথার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, নবাগত অতিথির কথায় তাহাদের পরস্পরের দিনগুলা কোথা দিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল, দু'জনের কেহই তাহা টের পাইল না।

অতিথি-সম্বর্দ্ধনায় কি কি অনুষ্ঠান করা হইবে তাহারও একটা মোটামুটি খসড়া প্রস্তুত হইয়া গেল। ঝি কর্ত্তা-গৃহিণীর ব্যাপার দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে সুরু করিল। কখন কখন আবার শেফালীর নিকট ধরা পড়িয়া ধমক খাইয়া কৃত্রিম মুখভার করিতেও ছাড়িল না।

মধ্যকার কয়েকটা দুর্য্যোগ রাত্রির স্মৃতি পর্য্যন্ত যেন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এ বাড়ীর সহিত সরযূ বলিয়া কাহার কোন সম্বন্ধ ছিল, ইহা যেন স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারে বোঝাই গেল না।

কিন্তু নিরুদ্বেগে অধিক দিন কাটাইয়া লইবার উপায় এ পৃথিবীতে নাই। মানুষের মত প্রকৃতিও বুঝি গল্প-পাগল; তাই ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া মানুষ যাহাকে চায়, তাহাকে দূরে রাখিয়া আবার যাহাকে চাহে না তাহাকে কাছে আনিয়া, কখন হাসাইয়া, কখন কাঁদাইয়া নিজের চিত্রিত উপন্যাসখানি বৈচিত্র্যময় করিয়া রাখিয়াছেন।

আঠার

সেদিন কি একটা উপলক্ষে হঠাৎ কোর্ট বন্ধ হইয়া গেল। অন্যান্য অনেকেই লাইব্রেরীতে বসিয়া জটলা করিতে লাগিল। অমর কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ছুটীর আনন্দটুকু উপলব্ধি করিতে আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে অপেক্ষা করিল না, বাহির হইয়া পড়িল।

যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন নীচে কেহই নাই। মধ্যাহ্নের শুষ্ক প্রকৃতির সহিত বাড়ীটাও নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন কেমন রহস্যের মত মনে হইতেছে।

অমর অত্যন্ত সন্তর্পণে উপরে উঠিতে লাগিল। উদ্দেশ্য শেফালীকে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিবে। কিন্তু তাহাকে বিস্ময়ে অভিভূত করা দূরের কথা, নিজেই হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িল। জানালা দিয়া দেখিল—শেফালীর গণ্ড বাহিয়া অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরিয়া চলিয়াছে। চিত্রার্পিতের মত সে তাহার সাম্‌নের এক-খানি পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে।

কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অমর কি ভাবিল; কিন্তু কোন কূল-কিনারাই পাইল না। কোথা হইতে এ

পত্র এমন কি দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিল, যাহার জন্য শেফার সদা-প্রফুল্ল মুখখানি শুধু মেঘাচ্ছন্ন নয়, বর্ষণ-রত !

হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়িতেই শেফালী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। মেঘাম্বরে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—বারে, কখন এলে বল ত! আচমকা দেখে এমনি ভয় হয়েছিল !

অমর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিল—ভূত হয়ে এসেছি ভেবে, না ?

—যাও, তা' কেন ?

—তবে ?

—জানি না। হঠাৎ কাউকে দেখলে 'হক্‌চকিয়ে' যায় না বুঝি ?

শেফালীর সপ্রতিভ মুখখানি অমরের বড় ভাল লাগিল। সে বলিল—আচ্ছা, তা' না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু তার আগে বলো ত কেন কাঁদছিলে ?

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত শেফালী শিহরিয়া উঠিল। চকিতে তাহার দৃষ্টি পত্রখানির উপর পড়িতেই বাজপক্ষীর মত শেফালী ছোঁ মারিয়া নিজের মুষ্টির মধ্যে চাপিয়া ধরিতে গেল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। তাহার পূর্ব্বেই অমর সেখানি তুলিয়া লইল। সে পত্রখানি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—এখানাই দেখ্‌ছি চোখের জলের কারণ—কিন্তু কেন ?

শেফালী উত্তর দিল না। অসহায়ের দৃষ্টিতে শুধু পত্রখানির পানে চাহিয়া রহিল। অমর সেদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—তোমার আপত্তি থাক্‌লে আমি পড়তে চাই না শেফা। কিন্তু বলো তুমি, কে এ চিঠি লিখেছে ?

—জানি না।

—জান না ? আশ্চর্য্য ! অথচ তারই কথার আঁচড়ে চোখে জল রাখতে পাচ্ছ না। হেঁয়ালী হয়ে উঠ্‌ল ! স্পষ্ট বলো শেফা, কে সে ?

শেফালী কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ক্রমাগত ঢোক গিলিতে লাগিল। তারপর একসময় মরিয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিল—আমার সই। কিন্তু—

—কিন্তু কি শেফা ? এ চিঠি আমার পড়বার মত নয় এই বল্‌তে চাচ্ছ তুমি ?

—তা' কেন। তুমি পড়ো। তবে—

কিন্তু তাহার তবের জন্য অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য অমরের ছিল না। সে ধীরে ধীরে পত্রখানি পড়িতে সুরু করিয়া দিল।

প্রিয় ভগ্নী !

তোমার নিকট অপরিচিতা হইয়াও পত্র লিখিতেছি বলিয়া হয় ত তুমি কত কি মনে করিতেছ। কিন্তু তোমার মনে করার অধিকার যখন আছে, তখন যত খুসী মনে করিতে পার। শুধু রাগ করিয়া নীরব থাকিও না—ইহাই একান্ত অনুরোধ।

আমার একটি অনুগৃহীত জীব আছে; তাহার মুখেই তোমার অজস্র সুখ্যাতি শুনিয়াছি—সম্ভব হইলে নিজেই ছুটিয়া গিয়া তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নয় বলিয়াই আপাততঃ আফ্‌শোষ করিতেছি।

স্বামী কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইবার সৌভাগ্য যেমনই হইয়াছিল, তেমনই শ্বশুর-মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইবার দুর্ভাগ্যও আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল—কেন, কি বৃত্তান্ত তাহা সাক্ষাৎকারে বলিব। উপস্থিত গ্রহ সুপ্রসন্ন! পাশের গাঁয়ের জমিদারের সহিত একটা মোকর্দ্দমায় জড়াইয়া পড়িয়া শ্বশুর-মহাশয় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া ত্যাজ্যপুত্রকে স্মরণ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে এ হতভাগিনীকেও। প্রায় লক্ষ টাকা বিষয়ের মালিকানা স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া মনে মনে যে খুব দুঃখিত হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। তবে নিজের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা স্বামী-দেবতাটীর সুপ্ত মন—না কি একটা কথা যেন এক মনোবিজ্ঞান-বিশারদের প্রবন্ধে পড়িয়াছি—সেই মনে অনুভব করিতেন, নতুবা তাঁহার একটা ডাকে উঠি-কি-পড়ি করিয়া একেবারে শ্বশুরের গৃহে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিতাম না। যেরূপ বুঝিতেছি, মাস দু'-এর পূর্ব্বে যে তাঁহাদের স্নেহাশ্রয় চ্যুত হইতে পারিব ইহা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে মোকর্দ্দমা তদ্‌বীর

করিতে গিয়া মহাপুরুষটী এমন কতকগুলি আজ্‌গুবী খবর আবিষ্কার করিয়া আসিয়া শুনাইলেন, যাহার মীমাংসা এখনই না হইলে পাগল হইয়া যাইব। তাই পত্র লিখিয়াই অত্যাচার সুরু করিতে হইল।

ভাই, তোমাকে চিনি না বটে, তবে আর আমি এক-জনকে জানি, যিনি শুধু তোমার দিদি নন, আমারও। সেই দিদির নামে মিথ্যা কতকগুলা কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ত ক্ষেপিয়া অস্থির!

অতঃপর তিনি ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন যে, সরল মুখ এবং তরল নারীজাতিকে জীবনে আর কখনও বিশ্বাস করিবেন না।

তাঁহার এই প্রতিজ্ঞার পিছনে কতখানি ব্যথা লুকান রহিয়াছে, তাহা অন্যে না জানুক, আমি ত জানি! তাই তর্ক তুলিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিবার কল্পনাও মনে আসিল না। নিতান্ত নিরুপায়েই তোমার দ্বারস্থ হইলাম।

পুরুষদের দেখা এবং শোনা এই দুয়েরই উপর আমার কেমন অল্প বিশ্বাস আছে; বিশেষ করিয়া মেয়েদের বিষয় হইলে ত আর কথাই নাই।

তাই মাঝে মাঝে মনে হইতেছে, কি শুনিতে জীবটী বা কি শুনিয়া আসিয়া এক বিরাট কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে।

ছেলেবেলা হইতে একান্ত অসম্ভব কিছু বিশ্বাস করিতে আমার বাধে না। কিন্তু দিদির সম্বন্ধে হীন কল্পনা কয়দিন চেষ্টা করিয়াও আমি মনকে বিশ্বাস করাইতে পারিলাম না। কারণে অকারণে তার সুন্দর, সরল পবিত্র মুখখানি মনে পড়িয়া যায়। আমি নারী হইয়া নারীর যে মনকে বুঝিয়াছি, জানিয়াছি, তাহা পুরুষের একটা কথায় বদলাইয়া লইবার যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

জীবনে অনেক দেখিয়াছি। অনেক ভুলিয়াছি। অনেক ভুলিবও। কিন্তু দিদির সেদিনের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

তিনি আমাদের ওখানে যাওয়া ঠিক্ করিয়া সমস্ত পোঁট্‌লা-পুঁটলি পর্য্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, এমন সময় তোমাদের চিঠিখানি আসিয়া পড়িল। তখনও চিঠির খবরটা জানি না। কিন্তু দিদির মধ্যে তাহার কার্য্য সুরু হইয়া গিয়াছে। যত চাড় করি, ততই যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া যায়। কিছুতেই আর গা লাগে না। কারণে অকারণে খোকাকে কোলে লইয়া আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চান। কেমন সন্দেহ জাগিল। এক সময় খোকাকে লইয়া ঘরের মধ্যে কি করিতেছেন আড়াল হইতে দেখিতে গিয়া অবাক হইয়া গেলাম। খোকাকে মুরুব্বী ঠিক করিয়া দিদি আপন-মনে কি সব বলিতেছেন, আর ঘামিতেছেন—তুই ত বল্‌লি শ্বশুর-বাড়ী যাও, কিন্তু তোর মাকে কি বলি বল্ ত? সে মনে করবে কি লোক! না বাবু, তার চেয়ে তোদের সঙ্গেই যাই, কি বল্? না। না কেন রে? ও, মাসীর কষ্ট হবে বুঝে বল্‌ছিস্ বুঝি! হাজার হোক্ ছেলে ত বটে! কিন্তু—

ঘরে ঢুকিয়া বলিলাম—কিন্তু কি দিদি?

খোকাকে বুকে করিয়া সেখান হইতে পলাইতে পারিলেই যেন সব হইল। ইহার বেশী পৃথিবীতে তিনি আর কিছু চাহেন না। কিন্তু আমাকে ত জান না বোন্, জোর করিয়া ধরিয়া বসিতেই সব বাহির হইয়া পড়িল।

চাহিয়া দেখিলাম—আবীর রঙে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীকে কতবড় মন প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিলে তবে মানুষের সমস্ত আকৃতিটাই এতটা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, ইহা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মাথাটা আপনা হইতে নত হইয়া গেল। তাঁর পায়ের খানিকটা ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিলাম—তুমি জন্ম জন্ম স্বামীর ঘর কর দিদি! যদি কখনও অবসর পাও, আমার বাড়ী পায়ের ধূলা দিও, তা' হ'লেই যথেষ্ট হবে।

দাদাটিও তেমনই! কথাটা শুনিয়া অজয় দা'র হাসি যদি দেখিতে! আমাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—কি বল্‌লে ভূপা, অমর চিঠি দিয়েছে যাবার জন্যে, ও আমি আগেই জানতুম। পাগ্‌লী মনে করে বিয়ে করেছে যেকালে, সেকালে ওরই অমরের ওপর পুরো অধিকার। আরে, আমি যে তার আগেই তাকে গ্রাস করে বসে আছি, তার খোঁজ কে রাখে বলো ত? লুকুলে চল্‌বে না, কোথায় চিঠি লুকিয়ে রেখেছিস্, শীগ্‌গির নিয়ে আয়; নইলে

অমরকে এমনই শাসন করতে শিখিয়ে দেব যে, দাদার কাছে দেখাতে পথ পাবি না।

তুমিই বলো ত বোন্, এ চিত্র সচক্ষে দেখিয়া কেহ কি পঙ্কিলতার কণামাত্রও স্বীকার করিয়া লইতে পারে।

অমর একটা রুদ্ধ নিশ্বাসে এতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়া আসিয়া সহসা হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল। এরই জন্যে বুঝি কাঁদছিলে শেফা? না, তোমাকে নিয়ে সংসারে থাকা কঠিন হলো দেখছি! ক'দিন সন্দেহ হয়েছিল, আজ তা' পরিষ্কার হয়ে গেল। এ কিছু নয় শেফা, স্রেফ্ তাদেরই চালাকী! তারাই কৌশল করে আমাদের কাছে ওই সব মিথ্যা খবর পাঠিয়ে মন ভেজাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তাদের হ'ল বলো ত? এতদিন ঘর করলে, কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারলে না যে, একবার অপরাধ করলে তাকে পৃথিবীর সকলে ক্ষমা করুক, অমর করতে পারে না—করা তার স্বভাব নয়। না, এদের সংস্রবই ত্যাগ করতে হবে দেখ্ছি! বড় উকীল হাতে করে ভেবেছে কাজ গুছিয়ে নেবে; তা' হতে দেব না। কালই অন্য উকীল ব্যবস্থা করতে বলে দেবো—বলিয়া অমর জামাটা গায়ে দিয়া আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেফালী বাধা দিল না। মমতা-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর গমন-পথটার দিকে চাহিয়া রহিল।

উনিশ

সরযূ যখন নূতন বাড়ীতে আসিয়া উঠিল, তখন সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। অজয় ঘরের জানালাটার নিকট চুপচাপ বসিয়া আছে। প্রায় অন্ধকার ঘরখানির ইতস্ততঃ জিনিষ-পত্রগুলা ছড়ান পড়িয়া রহিয়াছে।

তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালিয়া সরযূ ঘর গুছাইতে লাগিয়া গেল। একবার চারিদিকে দেখিয়া লইয়া বলিল—চাকরটার পছন্দ আছে বল্তে হবে। ঘর কেমন ঠিক্ করে একটু ভাবনা ছিল—তা' ঘর বেশ হয়েছে, কি বলো অজয় দা'?

অজয় বলিল—হ্যাঁ, বেশ ফাঁকার ওপর হয়েছে বটে। ঘর নয় সরযূ, এ একটা ছোট বাড়ী। পাড়াটা বাঙালী-টোলা নয়, এই যা'!

—তা'তে কি? বাঙালীর চেয়ে এদেশী লোকদের আমার বেশ লাগে—বলিয়া সরযূ গোপনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

অজয় বলিল—জ্যেঠাবাবুর সঙ্গে তাড়াতাড়িতে দেখা পর্য্যন্ত করে আস্তে পারি নি। তিনি কিছু বল্লেন সরযূ?

—কে, বাবা? বল্লেন বই কি অজয় দা'। তাঁর ঘুমটাই কিছু বড় ছিল না যে, একবার ডাক্তেও পারি নি বলে তিনি কত অনুযোগ করলেন।

—সে কথা আমিও ভাবছিলুম সরযূ। কাজটা ভাল হয় নি। একদিন তাঁর কাছে গিয়ে এর জন্যে ক্ষমা চেয়ে আস্তে হবে।

—বেশ ত, যেও না একদিন—বলিয়া হঠাৎ সরযূ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। খানিক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—সাম্নের দাওয়াটা কেমন সুন্দর ঘেরা দেখেছ অজয় দা', ঘর বল্লেই হয়। আমি ওখানেই শোবো, যদি দরকার হয় ডেকো, কেমন?

—আচ্ছা। কিন্তু তুমিই ঘরে শোও না সরযূ, বাইরেটায় আমি থাকব 'খন।

—তা' হ'লে কাল আর উঠতে হবে না! যে শরীর তোমার—বলিয়া সরযূ ঘরের পাতা তক্তাপোষখানায় অজয়ের জন্য বিছানা পাতিতে লাগিয়া গেল।

অজয় প্রতিবাদ করিল না। চাকরটা আসিয়া ডাকিল—মা।

—ওঃ, তুমি এরই মধ্যে ফিরে এসেছ! গরম ভাজিয়ে এনেছ ত সব? বেশ, বেশ! ধরো, এখনই নিচ্ছি আমি—বলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানাটা শেষ করিয়া সরযূ বাহিরের বাল্তীতে হাত ধুইয়া আসিয়া চাকরের নিকট হইতে খাবারগুলি নামাইয়া লইল।

অজয় বলিল—কি এল সরযূ?

—খাবার আজ রাত্রে ত আর রান্না সম্ভব নয়, তাই লছমনকে পাঠিয়েছিলুম দোকানে। সারাদিন খাটাখাটুনি, একটু সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

অজয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—এখন যে সন্ধ্যাই উতরোয় নি সরযূ, দাদাটিকে সত্যি-সত্যিই ছেলেমানুষের বেহদ্দ ক'রে তুল্লি দেখ্ছি।

—বুড়ো মানুষ না হয় হ'লে। সন্ধ্যে উতরোয় নি বুঝি, কখন উতরে গ্যাছে। বেশ ত, যদি তোমার ঘুম নাই ধরে, শুয়ে শুয়ে গল্প বলো, বসে বসে শুনব 'খন। এখনই শুতে কে বল্ছে। ক্ষিদে পায় না বুঝি?

অজয় চুপ করিয়া গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। লছমনকে সামনের চলন-পথটায় শুইতে বলিয়া সরযূ অজয়ের ঘরের সাম্নের দরজাটার উপর বসিয়া বলিল—অজয় দা' গল্প বল্বে না?

অজয়ের মন তখন তাহার দেহ ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। সরযূর আহ্বান তাহার কানে গেল না। সরযূ একবার ভাল করিয়া অজয়ের দিকে চাহিল। তারপর আবার ডাকিল—বসে বসে কি ভাবছ বলো ত অজয় দা', গল্প বল্বে না।

এবার অজয়ের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে কহিল—গল্প!

—হ্যাঁ।

অজয় চুপ করিয়া বিছানার উপর আর খানিক বসিয়া রহিল। বলিল—তুমি খেলে না সরযূ?

—খেলুম বই কি অজয় দা'। অবেলায় ভাত মুখে দিয়ে ক্ষিদে ছিল না, একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিয়েছি। সংসারে ত দু'টি লোক, অসুখ-বিসুখ কর্লেই বিপদ! গোড়া থেকে সাবধান থাকা ভাল নয়?

অজয়ের মনে পড়িল—বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টাও হয় নাই, সরযূ নিজের ক্ষুধার অজুহাত দেখাইয়াই অজয়কে সকাল সকাল খাইতে অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু মুখে সে কথা বলিতে তাহার কেমন উৎসাহ হইল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার ওষ্ঠাধরে একটা হাসির রেখা খেলিয়া গেল মাত্র।

সরযূর দৃষ্টিতে সেটুকু এড়াইল না। সে বলিল—হাস্লে যে অজয় দা'?

—একটা গল্প মনে পড়ে গেল দিদি, তাই হাসি পেলে।

—যে গল্প মনে পড়্লেই হাসি পায়, তা' বলে কাজ নেই। অন্য গল্প বলো তুমি।

—তাই বলি দিদি। একছিল রাজপুত্তুর, আর এক ছিল মন্ত্রীপুত্র। দু'জনে খুব ভাব।

সরযূ বলিয়া উঠিল—সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প সুরু করলে না কি অজয় দা'?

—মন্দ কি দিদি, সেই ত সত্যিকার গল্প।

—তা' বটে। তারপর?

—রাজা কিন্তু নামেই রাজা—তাঁর রাজ্য ছিল না। মন্ত্রীরও তাই। অনাহারী পঞ্চায়েতীতে মাঝে মাঝে ডাক পড় ত এই যা'! তবু তাদের পদবী নিয়ে কেউ কোনদিন সন্দেহ তোলে নি। এটাও কম কথা নয়।

—প্রতিদিন রাজার রাজকার্য্য অবসানে যখন বিশ্রামের সময় আস্ত, মন্ত্রীকে নিয়ে পুকুরের একটা নির্জ্জন শান-বাঁধান ঘাটে এসে দু'জনে বস্তেন। তাঁদের যে আলোচনা সে সময় হতো, তার মধ্যে দু'জনের ব্যক্তিগত জীবন-কথা ছাড়া আর কিছুই স্থান পেতো না।

—এমন কি, কেউ লুকিয়ে হয় ত একদিন থাকলে শুন্তে পেতো, যদি রাজার ছেলে হয় আর মন্ত্রীর মেয়ে হয়, তা' হ'লে রাজার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেই দেবেন। কোনো ওজর চল্বে না। অন্যদিন হয় ত শুন্তে পেতো, দু' বন্ধুতে কথা হচ্ছে মন্ত্রীর যদি ছেলে হয়, আর রাজার যদি মেয়ে হয়, তা' হ'লেও বিয়ে হওয়া চাই-ই! কেউ রোধ করতে পারবে না। ইত্যাদি। অদৃষ্ট পুরুষ অন্তরাল থেকে হাস্ছিলেন বোধ হয়। দু' বন্ধুতে একদিন দেখ্লে—দু'টি ছেলে এসে তাঁদের ঘর আলো করেছে।

—বিয়ে হওয়া সম্ভব হলো না বটে, কিন্তু বন্ধু হ'তে তাদের দু'জনের দেরী হ'ল না একদিনও। পায়ে হাঁটতে শেখার আগেই কিন্তু মন্ত্রীর ঘোড়া হারিয়ে গেল।

সরযূ বলিল—ঘোড়া হারিয়ে গেল!

—ঘোড়া বই কি সরযূ, সংসারের সব চেয়ে বড় জিনিষ যে স্ত্রী, তাকে হারিয়ে সে খোঁড়া হয়ে বসে পড়ল। রাজার চেষ্টায় সৎকারটা বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গেই শেষ হ'ল।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে তুই বন্ধুতে চেয়ে দেখ্লেন—কোন্ ফাঁকে রাণী এসে হাজির হয়েছেন। শুধু হাজির নয়, এক কোলে নিজের ছেলেটি, অন্য কোলে সদ্য মাতৃহারা তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষীরধারা পানে নিরত। সে বুঝতেই পারে নি, তার কত বড় ক্ষতি এই কতক্ষণ আগে হয়ে গেছে!

—মন্ত্রীর বুক থেকে একটা গভীর উৎকণ্ঠা নেমে গেল। পরদিন সকলে দেখ্লে রাজার বাড়ীই মন্ত্রীর ছেলে মানুষ হ'তে সুরু করেছে।

—তারপর?

—দিন যায়, রাত আসে। আবার দিন। এমনি করে ক'টি বছর কেটে গেল। রাজা আর মন্ত্রীতে মিলে যুক্তি করলেন, ছেলে মানুষ করতে হবে। ভাল দিন দেখে পড়াশোনা সুরু হয়ে গেল। বাড়ীর পাশের পাঠশালা থেকে গ্রামের বাংলা বিদ্যালয় ছেড়ে তু' ক্রোশ দূরের ইংরাজি স্কুলের পড়াগুলো তু'বন্ধুতে মিলে অনায়াসে পার হয়ে যেতে লাগ্ল।

—সেদিন কি একটা কারণে স্কুলে দেরী হয়ে গ্যাছে। তু'টি বন্ধু গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে বাড়ী ফির্ছে। শীতকাল। অল্পেই অন্ধকার। ভয়ের কোন চিহ্নমাত্র তাদের মনে রেখাপাত করে নি; কারণ, তারা তু' বন্ধুতে একসঙ্গে থাক্লে যমের মুখে যেতেও অরাজী নয়।

—হঠাৎ মন্ত্রীপুত্রের পায়ে কি যেন কাম্ড়ে দিলে। মন্ত্রীপুত্র 'উঃ' করে উঠ্তেই রাজপুত্র বন্ধুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লে—কি রে?

—কি যেন কামড়াল পায়ে।

—সাপ না কি? দেখি—বলেই রাজপুত্র একেবারে কামড়ানো জায়গাটায় নিজের কোঁচার কাপড়খানা পড়পড় করে ছিঁড়ে বেঁধে দিলে। তারপর বন্ধুর কথা বল্বার আগেই কামড়ান জায়গাটায় মুখ দিয়ে শোঁ শোঁ করে টান্তে সুরু কর্লে।

তু'টি বন্ধুর মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন। তবে নিজের মর্বার জন্যে নয়। এ ভাবছে—আমি যেতুম না হয়, কিন্তু ও কেন আমার কামড়ান বিষে মুখ দিতে এলো! ও ভাবছে—কোনমতে বিষটা বের করে দিতে পার্লে বাঁচি! আমি মরতে ভয় পাই না। ভারি ত!

—গল্পটা কেমন লাগ্ছে সরযূ?

সরযূ বলিল—বেশ!

—কিন্তু মর্ল না কেউ-ই! হঠাৎ মন্ত্রীপুত্রের পায়ের দিকে নজর পড়তেই সে বন্ধুর কাছ থেকে পা-টা টেনে নিয়ে হোহো শব্দে হেসে উঠ্ল। এবার রাজপুত্র ভাল করে চেয়ে দেখ্লে—একটা কঞ্চির মুখে তাজা রক্ত। সেইটাই সাপের রূপ ধরে পায়ে ধরেছিল।

—রাজপুত্রও হেসে উঠল। মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত মাটিতে ফেলে দিয়ে বল্লে—মিছে তোর রক্ত বের কর্লুম।

—মন্ত্রীপুত্র বল্লে—রক্ত যাক্, তোর নতুন কাপড়খানাই মাটি হ'ল!

—তারা আবার পথ চল্তে সুরু কর্লে। সেখানে পড়ে রক্তগুলো তাদের দিকে চেয়ে হাসতে লাগ্ল হয় ত।

—হাস্তে লাগ্ল!

—হাস্বে না, নইলে গল্প হবে কেমন করে দিদি।

—বাড়ীতে আসতেই রাজপুত্রের মা বল্লেন—ঠিক্ করেছিলি বাবা, নইলে মুখ দেখাতুম কেমন করে! বলে হাতের মাঝ থেকে একটা আংটী খুলে ছেলের হাতে পরিয়ে দিলেন।

—তারপর আর দিনকতক কেটে গেছে নিরুদ্বেগে। হঠাৎ একদিন রাজবাড়ীর সাম্নে লোক আর ধরে না! ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, কান্না, হট্টগোল!

—রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। ফিরে এসেছে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায়। ঘাটের লোকগুলো অনেক কষ্টে তাদের জলের ভেতর থেকে উঠিয়েছে বটে, কিন্তু তু'জনে তু'জনকে যে জড়াজড়ি করে ধরেছিল, তা' থেকে এখন মুক্তি পায় নি।

—জ্ঞান হ'তে জানা গেল, রাজপুত্র একটু-আধটু সাঁতার জান্ত, কিন্তু আজকে একটু বেশী দূর গিয়ে আর ফিরে আস্তে পারে নি। মন্ত্রীপুত্র সাঁতার জান্ত না; তবু কেমন করে জানে না বন্ধুর বিপদ দেখে তার কাছ অবধি

গিয়ে তাকে জাপটে ধরেছিল। তারপর কেউ আর কিছু বল্‌তে পারে না।

—রাজপুত্রের মা সব শুনে আশীর্ব্বাদ করে বল্‌লেন—এ আমার ছেলেরই মত কাজ হয়েছে—নইলে মুখ দেখাতুম কেমন করে! বলে নিজের গলা থেকে একছড়া হার নিয়ে মন্ত্রীপুত্রের গলায় পরিয়ে দিলেন।

—হারটা গলায় দুলে দুলে মন্ত্রীপুত্রকে উপহাস করতে লাগ্‌ল।

—উপহাস!

—নইলে প্রকৃতির বিরাট উপন্যাস যে একঘেয়ে হয়ে যায় বোন্! কিন্তু সেই মালা—

—কি হ'ল অজয় দা', অমন করছ কেন?

নিজের গলাটার দিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয় গাঢ়কণ্ঠে বলিল—কিন্তু সেই মালার জ্বালা মন্ত্রীপুত্রকে একদিন উন্মাদ করে তুল্‌লে সরযূ! সে চাইলে সে মালার কথা ভুল্‌তে—কিন্তু ভোলা দূরের কথা, দুলে দুলে ফুলে ফুলে সে শুধু তাকে ব্যঙ্গ কর্‌তে লাগ্‌ল। সে শুধু—

—ও কি, তুমি কাঁদ্‌ছ!

—কাঁদ্‌তে পারার মত সৌভাগ্য আমার কোথায় বোন্! কাঁপছি, কিন্তু চোখে জল আস্‌ছে দেখেছ?

—না আসুক, তুমি চুপ করে শুয়ে পড়ো। কতদিন ত তোমাকে বলেছি আমি, ও সব কথা ভেবো না। এখন শুধু তোমার ভরসাতেই বেঁচে আছি। তুমি যদি অমন কর—আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব! বোনের বোঝা এত যদি ভারী হয়, বলো, না হয় আত্মহত্যা করে তোমাকে অব্যাহতি দিই।

—অব্যাহতি! কিন্তু কে কা'কে অব্যাহতি দেবে সরযূ? আমি তোমাকে, না তুমি আমাকে, তাই ভেবে পাচ্ছি না।

—আর ভাবতেও হবে না। শুয়ে পড়ো দেখি।

—কিন্তু গল্প এখনও শেষ হয় নি।

—না হোক্ শেষ, আমি শুন্‌তে চাই নি! তুমি ঘুমোও। আমি তারপর শোব—বলিয়া সরযূ অজয়ের তক্তাপোষের একধারে আসিয়া বসিল।

অজয় দেয়ালের ধার ঘেঁসিয়া সরিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল—ছেলেবেলায় গল্প লিখতুম, না সরযূ?

—তাই নিয়েই ত তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বিয়ের আগে তোমার লেখা পড়তুম, আর ভাব্‌তুম তোমার কথা। এখন মনে পড়ে 'ভগ্নীহারা' লেখাটা পড়তে পড়তে কখন যে কাঁদ্‌তে সুরু করেছি, তার হুঁস্ ছিল না। আচ্ছা অজয় দা', আবার তুমি লেখো না কেন। তুমি বলে যাবে, আমি লিখ্‌ব। সাহিত্যে আমারও ত লিপিকার বলে একটা নাম থাক্‌বে। আমি জোর করে বল্‌তে পারি, আজকালকার অনেকের চেয়ে তোমার ঢের বেশী প্রতিষ্ঠা হবে অজয় দা'।

আর একজনও অমনি করে বল্‌ত! কি খেয়ালে একদিন কলেজ থেকে এসে কতকগুলো বাজে কাগজ ভরিয়েছি, তাই দেখে তার সে কি উৎসাহ! বাংলার বঙ্কিম আবার না কি ফিরে এসেছে! আজ হাস্‌ছি, সেদিন কিন্তু গর্ব্বে বুকখানা ফুলে উঠ্‌ত। কারণে অকারণে নিজের লেখা কাগজগুলা তার সাম্‌নে যেন ভুলেই ফেলে যেতুম। একদিন দেখি 'দিব্যজ্যোতিঃ' কাগজে আমার নামে একটা লেখা বেরিয়েছে। এ কি! আমি ত কোন লেখা পাঠাই নি—তবে তারা পেলে কেমন করে! খানিক পরেই কিন্তু বুঝ্‌তে পারলুম—এ কার কারসাজি! একখানা 'দিব্যজ্যোতিঃ' নিয়ে সে টিফিন-রুমে সকলকে দেখাচ্ছে, আর আমার সপক্ষে সুখ্যাতির বন্যা বহাতে সুরু করে দিয়েছে।

—সুখ্যাতির মোহ, নামের উত্তেজনা তখন আমাকে পাগল করে তুলেছিল সরযূ! ভুলেও বুঝ্‌তে পারি নি, নল রাজার দেহে শনি প্রবেশের মত ওইগুলো আমাকে একদিন সর্ব্বস্বান্ত করে দেবে!

—সেদিন থেকে মনের মিল থাক্‌লেও কাজের ধারা দু'জনের বদলে গেল। সে হ'ল বাস্তববাদী—সত্যকার মানুষ। আমি হলুম কল্পনা-প্রিয়—অবাস্তব, খেলার পুতুল মাত্র। তার সংসার চল্‌ল—মাটীর ওপর দিয়ে। আমার

চল্‌ল—আকাশের মাঝখানে। মাটীর মানুষ কল্পনার রাজ্যে সারাজীবন বাঁচতে পারে না। ফিরে আস্‌তে হবেই। যেদিন সংসারের দিকে পা বাড়ালুম, সেদিন পা পড়ল বটে, কিন্তু সাম্‌লাতে পারলে না—ভেঙে দু'খানা হ'য়ে গেল।

—ও পথে আর যেতে বলিস নি বোন্! তোর আশ্রয়ে দু'টী খাচ্ছি দাচ্ছি, বেশ আছি। তাও কি ভেঙে দিতে চাস্ না কি?

সরযূ কোন উত্তর দিল না।

অজয় আবার বলিয়া উঠিল—তবু মাঝে মাঝে লোভী মন কানে কানে বলে—মুখের দুটো কথা কিছু নয়, বুক থেকে অমর নিশ্চয় আমাদের ক্ষমা করেছে। ভয় হয়, আবার বুঝি কল্পনা ভূতগুলো আমার ঘাড়ে চেপে বস্‌ছে। আবার বুঝি মিথ্যা স্বপ্ন দেখ্‌তে সুরু করেছি।

—কে বল্‌লে মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছ অজয় দা'?

অজয়ের চোখ দুইটা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—মিথ্যা দেখি নি তবে! তোর কথা আমি তোদের সব দেবতার কথার চেয়েও বিশ্বাস করি সরযূ! তুই যদি বলিস—

—আমি মুক্তকণ্ঠে বলি অজয় দা', ক্ষমা দূরের কথা, এজন্যে সে রাগই করে নি।

—তবে তুই চলে এলি কেন বোন্?

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না, সরযূ বলিয়া উঠিল—বেটা ছেলে তুমি, তাই ধরতে পার নি অজয় দা'। ওখানে থাকা যে আমাদের কোনমতেই চলে না। শেফা ছেলেমানুষ, সবে সংসারে পা দিয়েছে—সতীন নিয়ে ঘর করবে কেন বলো ত?

অজয়ের মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে অস্ফুট-কণ্ঠে বলিল—তা' বটে।

সরযূ বলিয়া চলিল—তাদের সব অনুরোধ উপেক্ষা করে তাই ত আমি জোর করে বেরিয়ে এলুম। আমাদের ভাই-বোনের সংসার সুখে হোক্, দুঃখে হোক্, যেমন করেই হোক্ চলে যাবে—কিন্তু তার মধ্যে আর একটা লোককে জড়াব কেন? আর তার কথা যদি বলো, তা' হ'লে বল্‌তে বাধ্য হলুম—যে এক বৎসরও আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে নি, তার ঘরে থাক্‌তে ওইটুকু সময়ই যথেষ্ট হয়েছে—ওতেই আমি হাঁফিয়ে উঠেছি! এ তার তুলনায়, আমার স্বর্গবাস অজয় দা'!

অজয় বিস্ফারিত নয়নে সরযূর মুখের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলার সত্যতা নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইল। কিন্তু মিথ্যার এতটুকু রেখামাত্রও সে মুখে সে খুঁজিয়া পাইল না। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তাহার সারা বুক ভরিয়া গেল। উচ্ছল হাসিতে স্থানটা কাঁপাইয়া তুলিয়া সে কহিল—তাই বল্ পাগ্‌লী, অভিমান করে বসে আছিস্! কিন্তু এই সামান্য কথাটা বলিস্ নি ব'লে যে কষ্ট এতদিন ধরে আমি পাচ্ছি, তা' তোকে কেমন ক'রে বোঝাব বোন্! যখনই মনে পড়েছে অপমান হ'য়ে তোকে ওখান থেকে চলে আস্‌তে হয়েছে, তখনই চোখের জলে আমার মন অন্ধকার হ'য়ে গেছে। আজ এতদিনে বাঁচলাম আমি!

—তুই ভাবিস নি সরযূ, যদিও আমার কোন মূল্য নেই, তবু বল্‌ছি—অমরকে তোর কাছে ছুটে আসতেই হবে! নইলে তোদের ভগবান যে মিথ্যা হয়ে যাবেন!

সরযূ ধীরকণ্ঠে বলিল—তা' যদি আসেন, আমাদের ভাই-বোনের যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব করব বই কি অজয় দা'। শেফা ছেলেমানুষ, তার যদি কোন দায়-অদায়ে আমাদের ডাক পড়েই—না বল্‌তে তুমিই কি পারবে মনে করেছ?

অজয়ের বুক হইতে যেন অনেক দিনের অনেক জমান ব্যথা হাল্কা হইয়া গিয়াছে। সে সরল বালকের মত হাসিয়া বলিল—আমি পারব সরযূ, আমার বোন্‌কে শুধু কাজের সময় ডাক্‌লে পাঠাব কেন? মান নেই বুঝি?

—এখনই মুখে বল্‌ছ দাদা, তখন কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে। সে বোন্‌টীও তোমার কম জেদী নয়; একবার যদি ধরে, জুপার মত একেবারে না নিয়ে আর উঠবে না।

—তাই না কি! কেমন দেখ্‌তে রে?

—শুন্‌লে দুঃখ করবে, তোমার বোনের চেয়েও ঢের ভাল দাদা।

—ছাই! তোদের চোখ ত! কপালটা গড়ের মাঠ নিশ্চয়! চোখ দুটো বেরালের মত ত—আবার কটাও আছে কিছু কিছু! বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। শুধু রংটা দেখেই মানুষ ঠিক করিস কি না—ও কি! লজ্জায় মুখ নামাচ্ছিস্ যে বড়? ঠিক ধরে ফেলেছি, না? ওরে পাগলী, আর যে দোষই থাক্—সুন্দর চিন্‌তে তোর অজয় দা' অজেয় কি না আড়ালে অমরকেই জিজ্ঞেস করিস বরং। আমাকে কি আর সাধে পাঠিয়েছিল খোসামোদ করে! হাজার একটা মেয়ে দেখে তবে তোকে পছন্দ করেছিলাম। সোজা কি না! অমরের সাধ্যি কি যে, তোর মত একটা মেয়ে বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই যোগাড় করে আন্‌বে। যা', ঘুমে মাথা নেমে যাচ্ছে—ঘুমু গে যা'। আমিও শুয়ে পড়ি—বলিয়া বিজয় গর্ব্বে অজয় চোখ বুজিল।

সরযূ কোনরকমে বাহিরে আসিয়া নিজের পাতা কম্বল-খানার উপর লুটাইয়া পড়িল। আজিকার অভিনয় যে তাহার অন্যদিন হইতে সার্থক এবং সুন্দর হইয়াছে ইহা মনে পড়ায় সে এত দুঃখেও হাসি চাপিতে পারিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘাত-প্রতিঘাত

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

মনোহর চট্টোপাধ্যায়, বি-এ—সংস্কৃত টিচার।

মিঃ এ সেন, এম-এ, পি-এচ্-ডি—ইংরাজী প্রফেসর।

মিসেস্ লীলা চ্যাটার্জ্জী, বি-এ—মনোহরবাবুর স্ত্রী।

মিসেস্ রেবা সেন, বি-এ—মিসেস্ চাটার্জ্জীর সমপাঠী বন্ধু।

পূর্ব্বাভাষ

"বেশী দূর আর যেতে দেওয়া অনুচিত মনে হয় মনোহরবাবু।"

"হাঁ, সেই জন্যই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি মিসেস্ সেন।"

"যা' বলি তা' করতে পারবেন কি?"

"বলুন। চেষ্টায় না হয় দোষ কিসের?"

"বেশ, কাল এই সময় আসবেন দয়া করে, প্ল্যান ঠিক করে রাখি। কিন্তু করা চাই, না হলে ক্ষতি আমাদেরই।"

"কাল আসব—ভাল করে ভেবে রাখুন। আচ্ছা, নমস্কার।"

"প্রণাম।"

"এটা সত্যই অভদ্রতা, বর্ব্বরতার নামান্তর।"

"কোন্‌টা?"

"কোন স্ত্রীলোকের শয়ন-কক্ষে তার বিনানুমতি প্রবেশ করা।"

"আমার পক্ষেও লীলা?"

"অবশ্যই। স্বামী বলে তুমি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পার না। আমি স্ত্রী, দাসী নই—স্ত্রীর স্বাধীনতায় স্বামীরও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই।"

"আমি কিন্তু তোমাকেই ডাকতে এসেছিলাম—প্রফেসর সেন নীচে তোমায় ডাকছেন, তাই বলতে এসেছিলাম।"

"তিনি ডাকছেন—ও, থ্যাঙ্ক ইউ। তাকে বলো, আমি যাচ্ছি—আচ্ছা থাক্, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

দুই

"কথা দিয়েছি আমাকে যেতেই হবে।"

"কথা দেওয়ার পূর্ব্বে আমাকে জানালে ভাল হ'ত।"

"কেন?"

"এ রকম ভাবে কোন যুবকের সঙ্গে একা বায়স্কোপ দেখায় আমার ঘোর আপত্তি, আমি নিষেধ করতাম।"

"ও, নিষেধ করতে?"

"করতাম।"

"কেন?"

"এ রকম অবাধ মেলামেশা কোন যুবক-যুবতীর পক্ষে বিশেষ নিরাপদ নয়, তাই।"

"অর্থাৎ—"

"পদস্খলন হয়, হয়ে থাকে, হওয়া সম্ভব।"

"অতীত যুগের অতীত সংস্কার! কি ভুল ও মিথ্যা ধারণা এই পুরুষ জাতটার! আমি কথা দিয়েছি, কথার একটা দাম আছে। মিঃ সেনের সঙ্গে বায়স্কোপ যাব, তোমার মত হয় ভাল, না হয় তোমার সংকীর্ণতার গোলামী করতে পারব না—প্রমিশ ইজ্ এ প্রমিশ অলওয়েজ।"

"বেশ যা' ভাল বোঝ তা' কর।

তিন

"নাঃ, এ বড় অবসীন ছবি মিঃ সেন। আজকালকার ফিল্মগুলো এত বিশ্রী—এত নেকেড—যাচ্ছেতাই!"

"দেখুন মিসেস চ্যাটার্জ্জী, এ কথা আপনার মুখে

অর্থাৎ, আর প্রমাণ করতে হয় না বা কোটী কোটীবার তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এক পণ্ডিতের একটা বেড়াল ছিল। তার কাছে দুধ রাখলেই সে তা' খেয়ে ফেলত। পণ্ডিত ভাবনায় পড়লেন কেন এই দুটো আলাদা জিনিষকে একসঙ্গে রাখা যায় না। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর জানা গেল ওই রকম হওয়াই নিয়ম; অর্থাৎ, এ প্রকার দুটো জিনিষ একত্র রাখলেই সময় ও সুযোগমত একের লোপ হওয়াই স্বাভাবিক রীতি। পণ্ডিত বেচারা দুধকে ঢাকা চাপা রেখে বেড়ালের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।"

"অর্থাৎ, পণ্ডিতপ্রবর নিজের ভোগের জন্যই, নিজের স্বার্থের জন্যই ওই রকম ঢাকা চাপা দিয়েছিলেন।"

"সত্য। স্বামী-স্ত্রী—নিজের স্বামী, স্ত্রীকে নিজের জন্যই মনে করে, অপরের ভোগের জন্য নয়। স্ত্রীর দ্বারা স্বামীর আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হবে, স্বামীর দ্বারাও স্ত্রীর মনোভিলাষ পূরণ হবে—প্রত্যেকেরই স্বার্থসিদ্ধি; স্বামীই শুধু স্বার্থপর নয় বা হওয়া উচিত নয়। সমাজ বলে না পুরুষ তুমি ব্যভিচারী হও—পুরুষ হয়। সমাজের প্রশংসা পায় না তাতে—নিন্দাই পায়।

পাঁচ

"দেখুন আপনি, আমি ঠিক সময়েই এসেছি কি না। অল্‌ওয়েজ টু মাই ওয়ার্ড।"

"তাই দেখছি। হঠাৎ নিয়মের এ রকম ব্যতিক্রম কেন মিঃ সেন?"

"নাঃ, আপনার সঙ্গে দেখছি আমায় ঝগড়া করতে হ'ল। আপনি কি মনে করেন আমি 'লেট্ লতিফ'?"

"অলওয়েজ সো।"

"পারলাম না আপনাকে, আজই আমি আপনার নামে কেস্ আনব।"

"আজই? সন্ধ্যার সময় এখন আদালত খোলা থাকবে ত?"

"তাও বটে। যাক্, আপনার সাত খুন মাপ করা গেল—কথায় বলে সুন্দরীর জয় সর্ব্বত্রই হয়।"

"থাঙ্ক ইউ মিঃ খোসামুদে—যাক্, এর জন্য এক কাপ্ চা বেশী পাবেন—আর কিছু নয়, মনে রাখবেন তা'।"

বাইজোভ! একেবারেই কিছু নয়।"

না। দেখুন, আমাদের মাত্রা ক্রমেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে, পুরুষেরা বসতে পেলে শুতে চায় কেন বলুন ত?"

"হাসালেন আমায়। পুরুষ প্রধান যিনি, তিনিই যখন অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন—আমরা তখন কোন্ ছার।"

"না না, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়—বন্ধুত্ব পর্য্যন্তই ভাল। আচ্ছা মিঃ লতিফ, আপনি কি বেড়াল আর আমি দুধ?

"কেন বলুন ত? ও বুঝেছি, দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ। ছোটবেলায় এর মানে করেছিলাম কি জানেন—দুধ বেড়ালকে খায়। পণ্ডিত-মশায় যা' ঠেঙিয়েছিলেন—!

"বেশ করেছিলেন তিনি—এখন কি মানে করেন?"

"ভদ্রলোকের এক কথা—এখনও তাই। দুধই বেড়ালকে খায়—নয় কি?"

"তা' ত বলবেন আপনি—আমিই আপনাকে খেয়েছিলাম প্রথমে, না? বেশ, বেশ। আমায় ক্ষমা করবেন, আমার দোষ হয়েছে।"

"এ কি হঠাৎ মুখ গম্ভীর হ'ল কেন গো? না লীলা, না—আমিই দোষী!"

"যান্, গায়ে হাত দেবেন না। না—না—থাক্, আর নয়।"

"বলো লীলা, হঠাৎ এত রাগ কেন হ'ল তোমার?"

"বলব—বলব একদিন, কিন্তু আজ নয়, আজ নয়—আমায় ভাবতে দাও কোথায় দাঁড়িয়েছি আমরা, ধীরে ধীরে নিজেদের অলক্ষ্যে কোন্ পথে চলতে যাচ্ছি আমরা!"

"ভাবনা! ভাবনার কি আছে লীলা? আমি মুক্ত, স্বাধীন, তুমিও ইচ্ছা করলে তা' পার। তুচ্ছ একটা সামাজিক বন্ধন! তুমি শিক্ষিতা, হৃদয়কে অলীক বন্ধনে বেঁধে নষ্ট করায় লাভ আছে কি?

"সমাজ বন্ধন কি অলীক?"

"সমাজ যেখানে প্রাণকে, হৃদয়কে অবহেলা ক'রে শাসন

শৃঙ্খলে তাকে বেঁধে রাখতে চায়, সমাজের সে বন্ধন সেখানে ভেঙে বার হওয়া দরকার। বন্ধন ভাল, না মুক্তি ভাল লীলা?"

"নিন্, চা খান—আর এক কাপ্ নিন্। এই যে—আচ্ছা মিঃ সেন, চায়ের কাপ্‌টাকে কি ওই তরল চায়ের বন্ধন পাত্র বলা যায় না। কাপ্‌টাকে ভেঙে ফেলি যদি, আপনি চা পান করতে পারবেন কি?"

"না। আমি ত বলছি না যে, বন্ধন সকল স্থানেই দোষের। আমি বলছি যেখানে দোষের, সেখানে সে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলাই উচিত।"

"এবং এক বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে অপর বাঁধন না পরাই মঙ্গল। যদি ছিঁড়লাম, তবে আবার পরা কেন?"

"তা' নয়—অন্যায়, অমনোনীত বদল করে, মন্দ ফেলে ভাল নেওয়া উচিত।"

"ভাল এবং মন্দ! ভাল এবং মন্দ!—না আর পারি না। মিঃ সেন, ক্ষমা করবেন আমায়। ভেবেছিলাম, আজ বায়স্কোপে যাব। কিন্তু মাথাটা বড় ধরে উঠল; মনটাও ভাল নয়—আজ আর বোধ হয় আমার যাওয়া হবে না।'

"না না, আমি যেতে বলছি না—তবে বাইরের হাওয়ায় মাথাটা ভাল হয়ে যাবে নিশ্চয়। এ সব বড় বড় কথার আলোচনা না করাই ভাল ছিল আমার।"

"আজ তা' হলে আপনাকে অনর্থক এখানে ডাকিয়ে এনে আমি অপরাধ করেছি।"

"না না, তার জন্য চিন্তিত হবেন না—আপনার শরীর ঠিক থাকলেই ভাল। কোনো ওষুধের বন্দোবস্ত করব কি?"

"না, স্মেলিং সল্ট ওপরেই আছে—একটু শুয়ে থাকলেই ভাল হয়ে যাবে সব। আর এক কাপ্ চা দেব কি?"

"না, আর চাই না, ধন্যবাদ। আচ্ছা, আবার কবে সিনেমাতে যেতে পারবেন বলুন ত। বক্স রিজার্ভ করে রাখ্‌ব আগের মত? কালই চলুন না, আপনার স্বামী ত কোন বাধা দেন না।"

"সেই জন্যই কি আমার যথেচ্ছাচারী হওয়া উচিত মনে করেন—আমার একটা কর্ত্তব্য নেই কি? তিনি বাধা দেন কি দেন না তা' বুঝি না—শাসন না থাকলেও হয় ত জ্ঞানের বাধা দেন।"

"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে—আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমিও একবার মনোহরবাবুর সঙ্গে দেখা করি গে।"

ছয়

"এ কি! আজ তোমার ব্যাপার কি লীলা? আজ গালাগাল দিলে না, কটূক্তি করলে না, হঠাৎ অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত আমার পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগলে কেন? ওঠো, শান্ত হও। আমি তোমার স্বামী, চিন্তা কি লীলা?"

"বাঁধো, বাঁধো, আরও শক্ত করে বাঁধো আমাকে—এমন করে বাঁধো যেন প্রলয়ের ঝড়েও উড়ে যেতে না পারি। তুমি কেন্দ্র, তোমার পাশেই আমি তোমাকে আশ্রয় করে যেন ঘুরতে পারি—পড়ি না, নষ্ট হই না।"

"এই কথাই তোমার মুখে শুনতে চাইছিলাম লীলা। শিক্ষিতা তুমি, সহজেই ভুল বুঝতে পারবে জানতাম। আশা করি এখন বুঝতে পেরেছ যে, সংযমের বাঁধন সংসার-ক্ষেত্রে কত দরকার। সমাজের উদ্দেশ্য এই সংযমের বাঁধন দেওয়া, তবে অনেক জায়গায় হয় ত তার পথটা বড় কঠিন হয়ে উঠে, হয় ত তার নির্দ্দেশগুলো কোন স্থানে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়—কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সমাজকে অবহেলা করে ভেঙে-চুরে অন্য পথে আমরা ছুটে যাব। যে ভাল উদ্দেশ্যে কাজ করতে চায়, তার কাজটা যদি সংশোধনের দরকার হয়, তাই করা উচিত—তাকে অগ্রাহ্য করার আবশ্যক হয় না। সময়ে মতের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু কতকগুলা চিরন্তন সত্য আছে, যা' কখনও বদলাতে পারে না—যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশায় সংযমের বাঁধ ভাঙবার ভয় চিরকালই আছে এবং থাকবেও। অতি বড় সংযমীরও পতনের আশঙ্কা অসম্ভব নয়।"

"সমাজ পুরুষের সৃষ্টি—তোমাদের সমাজ চিরকালই

নারীর ওপর খড়্গহস্ত, চিরকাল তাকে পায়ের তলায় পিষে মারছে। বলতে পার কি—নারী কেন উঠবে না, কেন পুরুষের দাসী হয়ে চিরকাল পচে মরবে, সমান অধিকার কেন সে পাবে না?"

"শোন লীলা। আজ একটা তুফান উঠেছে দেখছি। নারী আজ মনে করছে সে পদদলিতা, পুরুষ তাকে রান্না-ঘরে সংসারের এক কোণে ঠেলে রেখেছে—কিন্তু সত্যই কি তাই? কতকগুলো অনাবশ্যক বাঁধন আছে সমাজের—কিন্তু তা' বলে বাঁধন যে থাকবে না তা' কি করে বলি। ছেলে যতদিন ছোট থাকে, অনেক অনাবশ্যক বাঁধনে বাপ-মা তাকে শাসন করে রাখে; বড় হলে সে সব আর থাকে না। ছেলে যখন আগুন থেকে আপনিই সাবধান হতে পারে, বাপ-মা তখন আর তাকে বেঁধে রাখে না। নিজেকে সংযত করতে পারলে, তখন আর শিক্ষা-অশিক্ষার কথা আসে না। অবাধ মেলামেশার কুফল শুধু সংযমের অভাবে; সমাজ সেইজন্যই গোড়ায় ঘা দিয়ে বলছে—'এ শিক্ষা চাই না—এমন শিক্ষা দাও, যা' মানুষের পদে দাঁড় করাতে পারে। চটকদারী এ শিক্ষা শুধু শিক্ষার প্রহসন।"

"কিন্তু বলছে শুধু মেয়েদেরই। পুরুষেরা দোষী হচ্ছে না, অপরাধ পড়ছে শুধু মেয়েদের ঘাড়ে—ঠিক কি না তুমিই বলো।"

"সমাজ পুরুষকেও অপরাধী করছে, আদালতে বিচার করছে, শাস্তি দিচ্ছে, লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ করছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ অর্থ বা বন্ধু বলে অপরাধের মুখে হাত চাপা দিচ্ছে একথা সত্য—কিন্তু সমাজ বলছে না একথা যে, পুরুষ, তোমাদের সব দোষই মাপ করব। পুরুষ ও স্ত্রীলোক অনেক সময় সমাজ শাসন থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, সমাজ তাদের ধরতে পারছে না। কার্য্য-পদ্ধতির দোষ থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের মূল উদ্দেশ্যে দোষ আছে কি?

"উদ্দেশ্য যদি ভালই হয় ত, উভয়কে সমান অধিকার সমাজ দেয় না কেন? স্ত্রীলোককে পুরুষ নিজের ভোগের জন্য আবদ্ধ রাখে কেন?

"সেই এক কথা! আজকাল মেয়েরা একটা কথায় বড় ভুল বিচার করছে। পুরুষেরা স্ত্রীলোককে শুধু ভোগের বস্তু মনে করে এ ধারণা তারা কোথায় পেয়েছে জানি না। রাম তার ছেলে যদুকে শাসন করে, বকে, মারে, কাজ করায়; যদুও খাটে, কিন্তু সে বলে না যে, আমি কেন বাবার দাসত্ব করব—বাবা ও আমার সমান অধিকার নেই যে সমাজে, সে সমাজের মুখে আগুন লাগুক। রাম জানে যদু তার ছেলে, ভৃত্য নয়; কিন্তু জানা সত্ত্বেও খাটায়, শাসন করে, শিক্ষা দেয়। যদুও জানে, রাম তার বাপ, প্রভু নয়—তাই সে কঠোর শাসন মাথায় নিয়ে খাটে, কাজ করে, শেখে, আবার ভবিষ্যতে নিজের ছেলেদের শেখায়। এই রকমেই জগৎ চলে আসছে। বিশৃঙ্খলা আসে সেইখানে, যখন মধু এসে যদুকে শেখায়—'ও বুড়ো বাপ্‌টার কথা কেন শুনিস, তুই কি ওর চাকর যে, তামাক সাজবি—তুই বোকা, তাই বাপের মার খাস, আমি হলে অমন বুড়োকে দেখে নিতাম। চল্‌ বরং একটু যাত্রা দেখি গে।' যদু ভাবে ঠিক ত—মধু ঠিক বলেছে ত। সংসারে তখন ভাঙন ধরে, যখন স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ দাস-দাসীর সম্বন্ধ বলে মনে হয়।"

"নারীকে সমাজ পুরুষের ভোগ্য মধ্যে পরিগণিত করে রেখেছে—কেন সে তা' হবে? স্ত্রীলোকের প্রাণ কি প্রাণ নয়।'

"কেন নয় লীলা। একটা কথা বলবার আছে, যা বলব তা' করবে?"

"কি? বলো।"

"একখানা ছেঁড়া ময়লা শাড়ী রয়েছে দেখছ—ঐ শাড়ী-খানা পরে আমার সঙ্গে কাল থেকে বেড়াতে চলো তুমি, আমিও ওই একখানা ধুতি পরব।"

"হঠাৎ এ কথা—লোকে বলবে কি?"

"গরীব, খেতে-পরতে পায় না, এই রকম কিছু।"

"বন্ধু-বান্ধবে?"

"হাসবে, ঠাট্টা করবে।"

"বুঝেছি তোমার যুক্তি। তুমি বলতে চাও যে, আমরা ভোগের বস্তু হতে চাই বলে পুরুষেরা আমাদের তেমন করেই রাখে। একটা অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা আমাদের

অন্তর্নিহিত আছে, যা' আমরা সব সময় বুঝতে পারি না বা অস্বীকার করি—কিন্তু সাজসজ্জা, প্রসাধন-পারিপাট্যের ভেতর দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তোলবার বিরাট আয়োজন করি। সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হতে চায় ভোগের পথে—তাই পুরুষেরা আমাদের প্রকৃতিগত সেই দুর্ব্বলতার ভেতর দিয়ে আমাদের পরাজয় করে। অন্তর চায় পরাধীনতা, কিন্তু মুখ তা' অস্বীকার করে।"

"তাই। আরও দেখো, কোন স্ত্রীলোককে কুৎসিত বা বিশ্রী দেখতে বললে তার প্রাণে যতটা ঘা লাগে, কোন পুরুষের তা' লাগে কি? পুরুষ হেসেই কথাটা উড়িয়ে দেয়; কিন্তু মেয়েমানুষ বড় যত্নে তার যা' আছে সেই রূপ ঘষে-মেজেও ঠিক রাখতে চায়। বলতে পার কি, স্ত্রীলোকের সাজ-সজ্জার, বেশ ভূষার এত বাহুল্য কেন? তুমি জান না, কিন্তু তোমার অন্তর জানে যে, সে অনেক বিপরীত রহস্য তোমাদের জ্ঞানের বাইরে অপরিস্ফুট রেখেছে।

"পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কি নিন্দনীয়?"

"না তা' নয়। কোন জিনিষের নিন্দার কথা বলছি না। আমি বলছি—সাধারণ বস্ত্রাদিতেও ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা হয়, তবে আধিক্য কেন? এর মূল কারণ কি এবং কোথায়?"

"তুমিই বল।"

"আমার মনে হয় একটা কথা। স্কুল-কলেজে যে সব শিক্ষা পাই আমরা, সে শিক্ষামত সংসার-পথে ঠিক চলি না—সংসারে এসে আমরা দেখি না, কি ও কতটা শিখেছি এবং কাজে তার তেমন প্রয়োগ করছি কি না। অনুশীলন করি না শিক্ষায় ও কাজে। আসল শিক্ষা কি তা' জানা চাই—আসল পথে তবেই ত চলতে পারব। অনাবশ্যক কতকগুলো জিনিষের লোভে বা ভারে আমরা পথভ্রষ্ট হই।"

সাত

"অমলবাবু যে, হঠাৎ এ সময়—আসুন, নমস্কার।"

"এলাম আমার বন্ধু ও আপনার বন্ধুর তাড়ায়—আপনি ত আর ডাকলেন না। এত অল্প সময়ের মধ্যে ভুলে গেলেন যে।"

"কেন, ভুলব কেন, আপনাকে দেখামাত্রই ত আপনার নাম বললাম।"

"তা' ভাল। কিন্তু মনোহর ভায়া এখন কোথায় সরে পড়লেন?"

"বসো হে বসো, আমি পালাই নি, আসছি। এই নাও এলাম—তারপর আছ কেমন?

"অমলবাবু তোমার পরিচিত তা' ত তুমি আগে আমায় বল নি। বন্ধুত্বও আছে দেখছি তোমাদের।"

"না, আগে বলি নি। বললে তোমায় ঠিকমত তৈরী করতে পারতাম কি না সন্দেহ ছিল। অমল আমার বিশ্বাসী বন্ধু, তাই তার হাতে তোমার শিক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। তোমার মতিগতি যে পথে চলেছিল, তা' থেকে ঠিক পথে আন্‌বার জন্য আমি তোমাদের দু'জনকেই লক্ষ্য করছিলাম--শুধু আমিই বা বলি কেন, অমলের স্ত্রী মিসেস্ সেন—তোমাদের রেবা সেন—তিনিই বরং আমাকে ঠিক্ পথে চালিয়েছিলেন।"

"রেবা সেন? অমলবাবু বিবাহিত? আপনি তা' আমায় লুকিয়েছিলেন অমলবাবু।"

"তাঁরই অনুরোধে। তিনি আগাগোড়া আপনার সকল কাজের ওপরই লক্ষ্য রাখছিলেন, মায় বায়স্কোপ পর্য্যন্ত—শুধু দু'-একটা ঘটনা ছাড়া।"

"ও! রেবা, সেই রেবা, যে আমাদের সঙ্গে বি-এ পাশ করেছিল—সেই নিশ্চয়। বাইরে একদম শান্তশিষ্ট, পাড়াগাঁয়ের সাদাসিদে মেয়েটি—না সাজ, না পোষাক, আর ভেতরে এত নষ্টামী। তাকে আনেন নি কেন অমলবাবু।

"আপনাদেরই তাঁর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি—দু'জনকেই যেতে হবে এখন। তুমি ভায়া তোমার ছেঁড়া ধুতিখানাই না হয় পরে যেও, আমরা ঠাট্টা করব না; আর আপনাকে এ মোটা শেলাই করা শাড়ীখানা বদলে একটা সাধারণ শাড়ী পরে আসতে হবে তা' বলে রাখছি। কি হে—আবার তর্কের জন্য কিছু চিন্তা করছ না কি?"

"মোটেই নয়। আমি ভাবছিলাম, শিক্ষিতা নারী সংযমের পথে থাকলে পুরুষের বল-ভরসা কতটা বাড়ে—শিক্ষিত নরনারীর দ্বারা সমাজ দেশের উপকারের কতটা আশা করতে পারে। যে সংসার আমার ভেঙে যাওয়ার মত হয়েছিল, তোমার স্ত্রী কত সুচারুরূপে তার পুনর্গঠন করলেন। নারীর শিক্ষা গঠনের দিকে গেলে কতটা সুশৃঙ্খলায় তা' সুসম্পন্ন হয়। এসেন্স, পমেড, পাউডার, লিপ ষ্টিকের ব্যবহার নারীর শিক্ষা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য—সংযমের পথ খুঁজে নেওয়া—এই পথেই সকলের যাওয়া চাই। নর বা নারী আজ চলেছে ভোগ-বিলাসের পথে—কোথায় শিক্ষা সে সংযমের—কে শেখায় সেই সত্য—চিরন্তন সত্য শিক্ষা। কে ঘোচাবে আমাদের এ অস্থায়ী মনোচাঞ্চল্য।"

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

প্রতিদান

কুমারী রমা দেবী

যখন সহজ শিশুর কণ্ঠে অজু দিদির গলা জড়িয়ে জিগেস করে, "দিদি, মা কোথায়?" তখন কি বলে তাকে বোঝাবে, তাই ভেবে বীথি ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে।

আজ সদ্য মাতৃপিতৃহীন অজুকে সে না হ'লে আর কেই বা বোঝাবে—আর যে তার কেউ নেই।

বীথি অজুর চেয়ে চার বছরের বড়। সে অজুকে ভালবাসে তার প্রাণের চেয়ে অনেক বেশী। সে ঠিক করলে ভাইটী আর একটু বড় হ'লেই তাকে নিয়ে সে চলে যাবে সহরে। গ্রামের পাঠশালায় অজু অল্প অল্প করে লেখাপড়া শিখতে লাগল। বীথি প্রাণপণে তাদের আহারের সংস্থান করতে লাগল।

প্রায় দু' বছর পরে দশ বছরের ভাইকে নিয়ে বীথি স্নেহভরা পল্লীর কাছ থেকে বিদায় নিলে। সে একটীবার তাদের জীর্ণ কুটীরের দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে—তার চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল মাটিতে।

নীলিমা বীথির ঝরা শিউলির মত মুখখানি দেখে তাদের আশ্রয় দিলেন। বীথিকে তিনি অরুণার পাশেই স্থান দিয়ে ফেললেন—নিজের অজ্ঞাতে। নীলিমা তাদের খুবই ভালবাসতেন; তাদের যত্নের কোনই ত্রুটী হয় নি। কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তা এসব কিছুই পছন্দ করতেন না।

কাঠের কারবারে তাঁদের উপার্জ্জন হ'ত আশাতীত। প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়েও কেন যে তিনি এই অনাথাদের এরকম কঠোর চোখে দেখলেন—তা' তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না। হয় ত কাঠের কারবারে থেকে প্রাণটা তাঁর কাঠের মতই নীরস হয়েছিল।

নীলিমা অজিতকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। স্কুলের মাহিনা দেবার সময় কর্ত্তাবাবু প্রতিমাসেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বীথি সকলের অজ্ঞাতে চোখের জল মুছতে চেষ্টা করলেও নীলিমার চোখ ঢাকতে পারত না। নীলিমা তার মলিন মুখখানি দেখে নিজের চোখের জল রাখতে পারতেন না। শীঘ্রই কর্ত্তাবাবুর অসন্তোষের আর কিছুই রইল না। অজু পাঁচ টাকা বৃত্তি পেলে। নীলিমার স্নেহে ও উৎসাহে অজিত ম্যাট্রিক পাশ করলে।

একদিন রাত্রে অজিত বারাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কর্ত্তাবাবুর কথা শুনতে পেলে—"কি হবে ঐ আপদ দুটোকে রেখে। ওরা কে যে, অত যত্ন করে ওদের রাখতে হবে।"

—"আহা! ওদের কেউ—"

—"তোমারই বা কি দরকার। ওদের নেই ত আমাদের কি।"

অজিত বীথিকে বললে—"দিদি, চলো, আর এখানে থাকব না—এত কথা আর সহ্য হয় না। আমাদেরই জন্যই ত মাসীমাকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়।"

বীথি বললে—"ছি অজু! একদিকে তুই যেমন মেসমশায়ের রুক্ষ কঠোর মূর্ত্তি দেখছিস্, তার সঙ্গে মাসীমার স্নেহ-ভালবাসাও দেখতে হয়। মা হারিয়ে আমরা মায়ের শোক ভুলেছি মাসীমার স্নেহে।"

অজু আর কিছু বললে না—শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল।

রান্নাঘরে নীলিমা বামুনকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন কি কি রাঁধতে হবে। বীথি গিয়ে দাঁড়াল নীলিমার পাশে। নীলিমা বীথির দিকে চেয়ে বললেন—"কি রে?"

—"কিছু না, এমনি এলুম।"

অন্য ঘরে গিয়ে নীলিমা বীথিকে বললেন, "হ্যাঁরে বীথি, অজু কাল রাতে তোকে কি বলছিল ?"

বীথি কিছু বলতে পারলে না; সে শুধু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল—যেন সে একটা ঘোরতর অন্যায় করেছে। নীলিমা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, "কি করি বল্; উনি কেন যে তোদের এমন করেন। হ্যাঁ বীথি, সত্যিই তোরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবি ?"

বীথি উত্তর দিতে পারলে না। তার চোখের জলে নীলিমার বুক ভেসে যেতে লাগল।

নীলিমার কাছে সব শুনে কর্ত্তা প্রফুল্ল হ'য়ে বললেন, "বেশ ত, যাক্ না।"

"তোমার ওই অনাথাদের দেখে মায়া হয় না। স্বচ্ছন্দে বললে, 'বেশ তো যাক না।' কিন্তু ওরা যাবে কোথায় ?"

নীলিমা আর বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল। কর্ত্তা গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন।

নীলিমা বললেন, "কিছু টাকা দাও।"

কর্ত্তাবাবু নীলিমার ভাব দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, "কি হবে ?"

নীলিমা তেমনি স্থিরভাবে বললেন, "ওরা চলে যাবে। তোমার কঠোর মুখের ওপর ঐ ননীর ছেলেমেয়ে টিঁকতে পারবে না।"

কর্ত্তা ভাবলেন, যদি কিছু টাকা দিলেই ওই আপদ দুটোকে তাড়ান যায়—তবে মন্দ কি ?"

যৎসামান্য কিছু পাথেয়স্বরূপ বীথির হাতে দিয়ে নীলিমা বললেন, "কি করি মা, তোমাদের মেসমশাই যে সে রকম নন্—না হলে তোমাদের যেতে বলেন। আমার আর কি জোর বলো।"

বীথি একবার সজল চোখে মাসীমার ব্যথাভরা মুখখানির দিকে চেয়ে বললে, "মাসীমা, আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার স্নেহ, তোমার যত্ন না ভুলি।"

সে আর কিছু বলতে পারলে না, তার চোখ জলে ভরে গেল। নীলিমা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

প্রতি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে অজিত খুব ভাল করে এম-এ পাশ করলে। তার পাশের খবর চিঠিতেই নীলিমা পান, আর চিঠির মধ্যেই তার অসীম করুণা ঝরে পড়ে তাদের ওপর।

এখন অজিত আর সেই ছোট অজু নয়। সে এখন স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার হয়েছে। তাদের অবস্থা ফিরে গেছে। অজিত নিজের ছেলেবেলার দুর্দ্দশা মনে করে কত অসহায় ছেলেকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছে। সকলেই অজুকে ভক্তি, মান্য, শ্রদ্ধা করে। অজিতের সুখে সুখী বীথি। নীলিমা ও বীথির মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান নিয়মিতভাবেই চলে আসছে।

হঠাৎ চিঠি আসা বন্ধ হ'ল। বীথি চিঠির ওপর চিঠি দিতে লাগল। পাঁচখানা চিঠির পর উত্তর এল নীলিমার কাছ থেকে। চিঠি পড়ে বীথি স্তম্ভিত হয়ে গেল। অজিত বাড়ী নেই। বীথির চোখের সামনে ভেসে উঠল তার মাতৃসম নীলিমার ব্যথাভরা মুখখানি—যে মুখে করুণার অভাব ছিল না, আজ সেই মুখ ভাবনায় মলিন হয়ে গেছে। বীথির মনে পড়ে গেল, অমনি ভাবনায় দুঃখে তার মাও চলে গেছেন তাদের কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়ে। কিন্তু মাসীমার কি হবে ? মাসীমা কি করেছেন যে, ভগবান তাঁকে এমনি সাজা দিলেন। বীথি আর ভাবতে পারলে না। সে অসহ্য যন্ত্রণায় চিঠিটা বুকে চেপে লুটিয়ে পড়ল।

অজিত বাড়ী এল। বীথিকে অমন করে শুয়ে থাকতে দেখে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, "দিদি !"

বীথি উঠে বসল।

তার অশ্রুসিক্ত মুখ দেখে অজিত বললে, "কি হয়েছে দিদি ?"

বীথি কিছু বললে না—শুধু চিঠিটা তার হাতে দিলে।

চিঠিতে যা' লেখা ছিল তার মর্ম্ম এই যে,—নীলিমাদের কারবারে অনেক লোকসান হয়ে গেছে—বাধ্য হয়ে কারবার বন্ধ করতে হয়েছে, আর তার ওপর ধার-দেনাও হয়েছে অনেক।

উত্তরের প্রতীক্ষায় বীথি অজিতের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চিঠি পড়ে অজিত শুধু বললে, "আচ্ছা, দেখি।"

সে ধীরে ধীরে চলে গেল।

পিয়ন টাকা দিয়ে গেল। কর্ত্তাবাবু দেখলেন, অজিত টাকা পাঠিয়েছে। তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল, কোন্ অজিত, অজিত কে? তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না, কে তাঁকে এই আসন্ন বিপদ থেকে এরকম ভাবে উদ্ধার করলে। তিনি নীলিমাকে ডাকলেন, "বলো ত নীলিমা, অজিত কে, কোন্ অজিত টাকা পাঠালে? তাকে কি চেনো?"

নীলিমার আর বুঝতে বাকী রইল না—কোন্ অজিত। নিমেষে তাঁর মুখখানি মমতায় ছেয়ে গেল।

কর্ত্তাবাবু বললেন, "বলো না, চুপ করে রইলে কেন? বলো, বলো নীলিমা, আমাদের এই দুঃখে কার প্রাণ কেঁদেছে?"

নীলিমা বললেন, "অনাদৃত, ভর্ৎসিত অজিত—যে একদিন এসেছিল তোমার কাছে আশ্রয়ের জন্যে—এই দুঃখের দিনে, এই দুঃখ থেকে উদ্ধারের জন্যে তারই প্রাণ কেঁদেছে।"

কর্ত্তাবাবু স্থিরনেত্রে চেয়ে রইলেন নীলিমার জলভরা চোখের দিকে। তাঁরও চোখ বেয়ে দু' ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

শ্রীরমা দেবী

মুক্তি
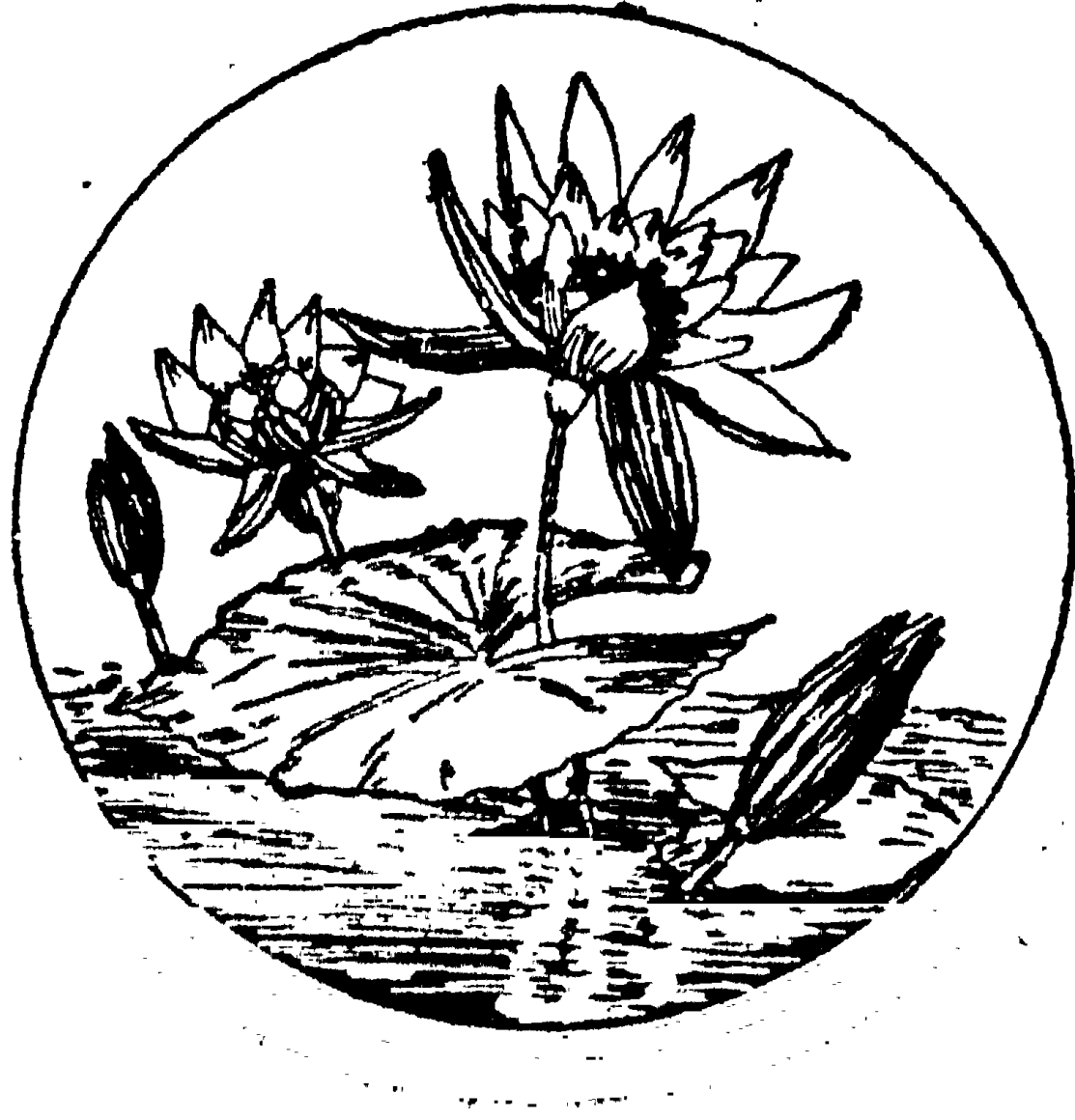
শ্রীশোভারাণী বসু

বিচারক তাহাকে বেকসুর খালাস দিলেন। সহর শুদ্ধ লোক বিচারে তাহাদের কি হয় জানিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। পতিহত্যাকারিণীর সঙ্গে একজন ডাক্তার জড়িত। প্রধান আসামী মুক্তিলাভ করিল, কিন্তু দ্বিতীয় আসামীর সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এমন সুন্দর প্রমাণ, প্রধান আসামী অকপটে দোষ স্বীকার করিল, তবু বিচারক কেন তাহাকে মুক্তি দিলেন কেহ তাহা ভাবিয়া পাইল না। বৃদ্ধেরা বিচারককের তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন; তরুণেরা প্রশংসা করিতে লাগিল। সহরে, রাস্তায়-ঘাটে সকলকারই মুখে পতিহত্যাকারিণী বীথিকা সেনের কথা। ঘটনাটা আমরা সবই জানি, সে জন্য নিম্নে তাহা ব্যক্ত করিলাম।

—"জানি জানি, তুমি আমায় ভালবাস না।" অতি ক্ষীণস্বরে রোগশয্যায় শায়িত রথীন্দ্র কথাগুলি বলিল।

বীথিকার চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল এবং সেই ভাবেই বলিল—"বাসিই না ত, একথা ত তোমায় বারবার বলেছি।"

রোগীর রোগ-পাণ্ডুর মুখ আরও পাণ্ডুর হইয়া গেল। ব্যথিতকণ্ঠে বীথিকার দিকে চাহিয়া সে বলিল—"আমি জানি বীথি, তুমি আমা হ'তে সুখী হও নি। আমি বুঝি, আমি তোমার অযোগ্য। আমার উচিত হয় নি এরকম অবস্থায় বিবাহ করা—কিন্তু বিধিলিপি!"

রথীন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া বীথিকা ব্যঙ্গভরে বলিয়া উঠিল—"এখন বুঝি অনুতাপ হচ্ছে; কিন্তু যা' অপকর্ম্ম করেছ, তার ত আর চারা নেই। বেশী কথা বলো না; ডাক্তারের বারণ। ঘুমোও"— বলিয়া গভীর স্নেহে বীথিকা স্বামীর নিকটে আসিয়া তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর উঠাইয়া লইল।

পত্নীর হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া রথীন্দ্র বলিল—"আমি মর্‌লে তুমি ত সুখী হও, আর সেই ত তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে চাও।"

বীথিকা শিহরিয়া উঠিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"না না, তুমি কি বলছ? তুমি কি আমায় এইসব বলে সুখ পাও।"

রথীন্দ্র ম্লান হাসি হাসিল। বলিল—"ছি ছি বীথি, কি বলতে কি বলেছি! তোমায় এইভাবে ব্যথা দিয়ে আমি সুখী হব! রোগে পড়ে আমি যেন কি হয়ে গেছি! এস বীথি, আমার কাছে এস!"

বীথিকা ব্যথিত স্বামীর শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

স্বামী রথীন্দ্র, পত্নী বীথিকা। আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল রথীন্দ্র যক্ষারোগে ভুগিতেছে। পত্নী বীথিকা সব ভুলিয়া গিয়া স্বামীর সেবা করিতেছে।

রথীন্দ্রের পিতা নাই, মাতা বর্ত্তমান। অবস্থা স্বচ্ছল নহে। এক রথীন্দ্রই বাড়ীতে উপার্জ্জনক্ষম ছিল। তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা রতীন্দ্র আই-এ পড়ে। বীথিকা অবস্থাপন্ন ঘরের কন্যা; তথাপি তাহার স্বামী রথীন্দ্র শ্বশুরের পয়সা লইতে রাজী নহে। এজন্য বীথিকা মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং তাহা লইয়া স্বামীর সহিত মাঝে মাঝে বেশ কলহও হইয়া যায়। রতীন্দ্রের পড়ার খরচ, স্বামীর চিকিৎসার খরচ কোথা হইতে চালাইবে বীথিকা তাহা ভাবিয়া কূল-কিনারা পায় না।

একে একে সব অলঙ্কার গিয়াছে, আর কিছুই নাই; তাই বীথিকা আসিয়া স্বামীকে বলিয়াছিল—"তুমি রাগ কর আর যাই কর, আমি এবার থেকে বাবা যে টাকাটা দিতে চাচ্ছেন সেই টাকা নেব, নইলে আমি সংসার চালাব কি করে।"

এই সামান্য কথা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর কলহ হইয়া গেল।

রথীন্দ্র রোগ-শয্যায় পড়িয়া অবধি ভাবিত, বীথিকাকে বিবাহ করা তাহার উচিত হয় নাই। এই তিন বৎসর হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে; অথচ, একটি দিনের জন্যও পত্নীকে সে সুখী করিতে পারে নাই। কি ভীষণ দারিদ্র্য! বীথিকাকে রথীন্দ্র প্রায়ই বলিত—"আমি জানি বীথি, আমি বড় হতভাগা! আমার মত হতভাগার—"

এই কথাগুলা বীথিকার গায়ে যেন আগুন ছড়াইয়া দিত। বাধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিত—"আচ্ছা, তুমি কি এই সব বিশ্রী কথাগুলো আমায় শুনিয়ে মনে শান্তি পাও? কে বলেছে আমি সুখী নই—আমার মত সুখী কে! কেন তুমি তোমার দারিদ্র্যের কথা এত ভাব, কেন আমায় এই সব শোনাও। তুমি যদি দারিদ্র্যকে হাসিমুখে সইতে পেরে থাক, আর আমি পারব না। ভুলে যাও আমি ধনীর কন্যা, তাদের আদরে লালিতা-পালিতা; শুধু ভাব, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সুখ-দুঃখের ভাগিনী। তোমার মত স্বামী ক'জনের ভাগ্যে মেলে!" শেষ কথাগুলা বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া যাইত।

রথীন্দ্র অপলক-দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে তাকাইয়া থাকিত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিত—"না বীথি, তুমি জান না তোমায় সুখী করতে না পারায় আমার কত দুঃখ! আমায় আজন্মকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং হবে। সংসারে আয় নেই, আমি পীড়িত, রতীন্দ্র ছেলেমানুষ।"

তারপর খক্‌খক্‌ করিয়া কাসিতে কাসিতে সে বুক চাপিয়া বালিসে মুখ গুঁজিত। তখন মনে হইত, বুঝি বা পৃথিবীর হাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বীথিকা করুণ ব্যথাতুর দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিত। কখন চোখে মুক্তার মত অশ্রু টলটল্‌ করিত, আবার কখন বা শূন্য ব্যথাভরা দৃষ্টি। ধনীর কন্যা হইয়াও তাহার জীবন অভি-শাপের মত দাঁড়াইয়াছিল। কিসে তাহাকে সুখী করিবে এই জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহার স্বামীকে এই কালরোগে ধরিয়াছে। এই ভাবিয়া সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না। কিছুতেই সে স্বামীর মন হইতে এ অন্ধকার ধারণা দূর করিতে পারিল না যে, সে এই দারিদ্র্যের মধ্যেই অসীম সুখী।

দুই

বীথিকার দাদা একজন ছোকরা ডাক্তারকে লইয়া বীথিকার ঘরের কাছে আসিয়া বলিল—"কইরে বীথি, কোথায় গেলি?"

ডাক্তারটি বীথিকার স্বামীর রথীন্দ্রের বয়সী হইবে; অর্থাৎ, সাতাশ-আটাশ বৎসর তাহার বয়স। বীথি বলিয়া সতীশ আবার ডাকিলেন। বীথিকা স্বামীর কাছে ছিল। দাদার ডাকে ঘর হইতে বাহির হইতেই ডাক্তারের সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। বীথির মুখে কে যেন ফাগ মাখাইয়া দিল। ডাক্তার লজ্জিত হইয়া বীথিকার মুখের উপর হইতে তাহার মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। না, হাজার দরিদ্র হইলেও ইহারা থাকিতে জানে। একথা ডাক্তারকে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

—"আজ কেমন আছ রথীন?" সস্নেহে সতীশ জিজ্ঞাসা করিল।

—"মন্দ কি, ধীরে ধীরে মরণের পথে এগিয়ে চলেছি—বুঝতেই পারছ।" ডাক্তারের দিকে চক্ষু পড়িতেই রথীন বিস্ময়ানন্দে বলিয়া উঠিল—"আরে বিজয়, তুমি!"

—"হ্যাঁ ভাই, দেখতে এলাম। এমন অসুখ আমি জানতাম না। দেখি তোমার বুকটা।"

—"দেখবে, দেখো।"

রথীন্দ্র হাসিয়া বুক পরীক্ষা করিতে দিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর হইয়া গেল। বীথিকা ব্যাকুলভাবে বিজয়ের মুখের পানে চাহিল। বিজয়ও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনার কোন ভয় নেই। রথীনকে হাওয়া বদল করাতে হবে।"

—সতীশ বোনের দিকে চাহিয়া বলিল—"কাল আর আমি আসতে পারব না বীথি। বিজয়বাবু, আপনি কাল যদি দয়া করে এসে একবার রথীনকে দেখে যান, তবে বড় উপকার হয়।"

বিখ্যাত চিত্র 'টপ্-হ্যাট্'-এর একটী দৃশ্যে
উইলিয়াম পাওয়েল ও জিঞ্জার রজার্স।

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা

—"নিশ্চয়, এ আমার কর্ত্তব্য। বন্ধুর বিপদে বন্ধু দেখবে না ত কে দেখবে।"

রথীন্দ্র মৃদু হাসিল। সে জানে, বিজয় তাহার অসুখের কথা শুনিয়াছে, বাড়ীও চেনে, কতবার আসিয়াছে, তবু রোগ হওয়া অবধি সে এখানে পদার্পণ করে নাই—আর আজ হঠাৎ তাহার এতটা কর্ত্তব্য জ্ঞান জাগিল? তাহার উত্তর বোধ হয় সে তাহার নিজের মন হইতেই পাইল।

বিজয় রথীনকে বলিল—"আমি আবার কাল আসব, আজ চল্‌লাম।" তারপর বীথিকার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিয়া সতীশের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তিন

বীথিকা স্বামীর সঙ্গে দার্জ্জিলিং আসিল। রথীন্দ্রের মা ছোট ছেলেকে লইয়া কলিকাতায় রহিলেন। বিজয় ডাক্তার রথীনের সঙ্গে গেল।

সে যাচিয়া রথীনকে টাকা ধার দিল। পিছনে তাহার কতটা স্বার্থ লুকান ছিল, তাহা একমাত্র সে নিজেই জানিত। তাহার লালসা-লোলুপ দৃষ্টি বীথিকার দিকে পড়িয়াছিল। বারবার তাহার মনে হইত—এ রত্ন রথীনের মত হতভাগ্যের গৃহে থাকিবার নহে।

ধীরে ধীরে বীথিকার মন জয় করিতে হইবে, ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে তাহার মন তাহার দিকে টানিয়া আনিবে, এই ভাবিয়া সে বন্ধুর সঙ্গে দার্জ্জিলিং গেল। বীথিকা ডাক্তারের ব্যবহারে তাহাকে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে, ধন্যবাদ দিবে ভাবিয়া পাইল না।

দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া রথীন ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীথিকার বিষাদাচ্ছন্ন মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বীথিকা বিজয়কে বলিল—"বিজয়বাবু, আপনাকে আমি কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব তা' আমি ভেবে পাই না—মুখে তা' বলাও যায় না। আপনার কাছে আমি অসীম ঋণী, তার শোধ দিতে আমি পারব না, আর তা' দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।"

তাহার কথা শুনিয়া বিজয়ের বুকে আনন্দের তুফান উঠিল। সে আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল—"এ আমার কর্ত্তব্য। বন্ধুর বিপদে বন্ধুর দেখা উচিত। রথীন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে যদি তার অসময়ে না দেখি—তবে কে আর দেখবে? আমার অসময়ে আপনারা কি আমায় দেখবেন না? এতে কৃতজ্ঞতার কিছু নেই বীথিকা দেবী।"

বীথিকা মুগ্ধ হইল। কৃতজ্ঞতার সহিত সে বলিল—"আপনি মহৎ, তাই একথা বলছেন, কিন্তু আমাদের আত্মীয়-স্বজন কখন কোনদিন আন্তরিক দূরে থাক্, মৌখিক সহানুভূতিও জানায় নি।"

মৃদুহাস্যে বিজয় বলিল—"আপনি কি আমাকে আপনাদের আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য করেন না?"

—সে কি। আপনি যে আমাদের কতদূর আপনার, সে কথা মুখে ব্যক্ত করা যায় না—সে ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি।" সবল কণ্ঠে বীথিকা বলিল।

বিজয় কোন উত্তর না দিয়া লোলুপ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় তাহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। যে ঘরে বসিয়া তাহারা কথা বলিতেছিল, সেটা বীথিকার শয়ন কক্ষের সম্মুখের ঘর। শয্যায় শুইয়া মাঝের দরজা দিয়া রথীন্দ্র বন্ধুর লোলুপ-দৃষ্টি, কথা বলিবার ভঙ্গী সব লক্ষ্য করিতেছিল। বীথিকা বিজয়ের লালসা পূর্ণ চাহনির দিকে লক্ষ্য না করিয়া সরলভাবে বলিয়া চলিল—"এ দুঃসময়ে আপনাকে আমরা ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ পেয়েছিলাম—"

—"বীথিকা দেবী, এ আপনি কি বল্‌ছেন। আমার এ ঋণ ত আপনি অতি সহজেই শোধ দিতে পারেন।"

—"সে কি। আমার কি আছে যে, আমি আপনার ঋণ সহজেই শোধ দেব?"

—"পরে বলব বীথিকা দেবী, কিন্তু আপনার স্বামী বোধ হয় বাঁচবে না—"

—"কেন, কি হ'ল? আপনি কি বলেছেন!"

গভীর আশঙ্কায় বীথিকার মুখ অন্ধকারে ছাইয়া গেল,

চক্ষু হইতে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিল—"বিজয়বাবু, বিজয়বাবু, কি বলছেন! বাঁচবে না—সব কি ব্যর্থ হ'ল! হা ভগবান!"

কাঁদিতে কাঁদিতে ছিন্নলতিকার মত সে সোফার উপর পড়িয়া গেল।

বিজয়ের মুখে তীক্ষ্ণ হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল—"হাঁ বীথিকা দেবী, রথীন বাঁচবে না; মাত্র সে একটু ভাল বোধ করছে—যেমন প্রদীপ নেববার আগে একবার উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে। আপনার স্বামী রথীন্দ্রের জীবন-প্রদীপ নেববার আগে তেমনি ভাবে জ্বলে উঠেছে। আপনি বুদ্ধিমতী, আপনাকে বোধ হয় বোঝাতে হবে না। অবশ্য আমি তাকে সুস্থ করবার চেষ্টা যতদূর সাধ্য করব; সে শক্তির কার্পণ্য আমি করব না। তবু আমার মনে হয় রথীন—"

—"থামুন থামুন, মা গো!" সোফার উপর হইতে মূর্চ্ছিত অবস্থায় বীথিকা মেজের উপর পড়িয়া গেল।

বিজয়ের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। রথীন ঘর হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বীথি, বীথি, কি হ'ল?"

তাহাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া বিজয় আয়াকে ডাকিল। তাহার সাহায্যে বীথিকাকে উঠাইয়া সোফার উপর শয়ন করাইয়া দিয়া আয়াকে মাথায় হাওয়া করিতে বলিল। আর বেশীদিন নয়, ছলে বলে কৌশলে বীথিকাকে তাহার করিয়া লইতেই হইবে। বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা শোভা পায় না—রথীনকে শীঘ্রই পৃথিবী হইতে সরাইতে হইবে।

—"কি হলো বিজয়?"

বন্ধুর গলায় সচকিত হইয়া সে বলিল—"ফিট্ হয়েছে রথীন। ভয় নেই, জ্ঞান হচ্ছে।"

রথীন ঘর হইতে বিজয় আর বীথিকার কথা কিছুমাত্র শুনিতে পায় নাই, তাই তাহাদের কথাবার্ত্তা কি হইয়াছে সে কিছুই জানিল না। বীথিকার মূর্চ্ছা ভাঙিতে সে কোন কথা না বলিয়া আয়ার সাহায্যে শয়নকক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

কেন বীথির ফিট্ হইল, এ রোগ ত তাহার ছিল না—এই ভাবিয়া রথীন চিন্তিত হইয়া উঠিল।

চার

মাস ছয়-সাত কাটিয়া গিয়াছে। বীথিকা স্বামীর সহিত পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিজয় এখন সপ্তাহের মধ্যে তিন-চারবার করিয়া তাহাদের বাড়ী আসে। রথীন্দ্রের মা বিজয়ের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পুত্রকে বলেন—"তুই বল্ না বিজয়কে তোর একটা চাকরী করে দিতে। ও ত জমিদারেদর ছেলে; ও ইচ্ছে করলে সব পারে। ছেলে নয় ত হীরের টুকরো।"

রথীন হাসে। বলে—"আজকালকার বাজারে চাকরী পাওয়া সহজ কথা নয় মা, ও কোথা থেকে চাকরী দেবে।"

মা অপ্রসন্ন-কণ্ঠে বলেন—"তোর ইচ্ছে নেই, তাই বল্—ওকে বললে কি আর পাওয়া যায় না? সংসার কি করে চলে সে আমি জানি।"

রথীন অপ্রস্তুত হইয়া বলে—"না মা, চাকরী না করলে সংসার চলবে কি করে সে আমি জানি—কতদিন আর বন্ধুর পয়সায় খাওয়া যায়। তবে মা, আর দু'দিন সবুর করতে হ'বে; শরীরটা আর একটু ভাল হোক্, তারপর আমি চাকরী যোগাড় ক'রে নিচ্ছি।"

বীথিকা আড়ালে রথীনকে বলিল—"হাঁ গা, তুমি এই শরীরে আবার চাকরী করবে না কি?"

—"নইলে সংসার চলবে কি করে।"

—"আমি বাবার কাছ থেকে নিয়ে সংসার চালাব। বন্ধুর পয়সা নিতে পারছ, আর শ্বশুরের পয়সা নিতে এত কি দোষ?"

—"অমনি নিচ্ছি না, ধার আমায় শোধ দিতে হবে। তোমার বাবার কাছ থেকে নিলে ত আর শোধ দিতে পারব না।"

কথাটা বীথিকা বুঝিল; তবু অকারণে কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া সে উত্তর দিল—"ডাক্তারের টাকা ও কি শোধ দেবার ক্ষমতা তোমার আছে? এখনো বলছি, তোমার বন্ধুর টাকা

আর নিও না; বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোমার বন্ধুর দেনা শোধ করে দাও। ভেবো না বিনা স্বার্থে তোমায় ও টাকা ধার দিয়েছে। ওর পেছনে নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক স্বার্থ লুকোনো আছে।"

বলিতে বলিতে এক ঝলক রক্ত তাহার মুখের কাছে ছুটিয়া আসিল। রথীন অবাক হইয়া গিয়াছিল। বলিল—"কি স্বার্থ আছে, তুমি জান?"

রক্তের উপর রক্ত ছুটিয়া আসিয়া বীথিকাকে কি এক রকম করিয়া দিল। সে বলিল—"হাঁ জানি। তুমি বোঝ না, এত বড় নির্ব্বোধ, ছি! ওর কাছ থেকে তুমি আর টাকা নিও না।" বলিয়া সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রথীন তখন কয়েক মিনিট ধরিয়া পত্নীর কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিল। সহসা মনে পড়িল—দার্জ্জিলিংয়ে বিজয়ের সেই চাহনি। তবে কি বীথিকা তাহারি ইঙ্গিত করিয়াছে? একে একে বিজয়ের ব্যবহার তাহার মনে পড়িয়া গেল। ছি ছি, এমন ক্ষমতা তাহার নাই যে, একটা অসচ্চরিত্রের হাত হইতে পত্নীকে রক্ষা করে! ধিক! একটা তীব্র অনুশোচনায় রথীনের সারা মন বিষাইয়া উঠিল। কয়েক মিনিট পত্নীর প্রতীক্ষায় থাকিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আটদিন পরের কথা। রথীন আসিয়া বলিল—"চাকরী ঠিক ক'রে এলাম কাপড়ের দোকানে। মাইনে পনের টাকা; ক্রমে বাড়বে। সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটা অবধি দোকানে থাকতে হবে।"

গভীর আশঙ্কায় বীথিকার মুখ পাংশু হইয়া গেল। রুদ্ধস্বরে সে বলিল—"এখন তুমি চাকরী করবে? এই শরীরে? না না, ওসব ছেড়ে দাও।"

—"আমি যা' ভাল বুঝেছি, তাই করেছি—তুমি তা'তে বাধা দিও না।"

টস্‌টস্ করিয়া তিন-চার ফোঁটা জল বীথিকার কাপড়ের উপর ঝরিয়া পড়িল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিল—"তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, চাকরী ছেড়ে দাও—এ শরীরে তুমি খাটুনি সহ্য করতে পারবে না। আমি একটা স্কুলে চাকরী ঠিক করেছি, তা'তেই আমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, মায় ঠাকুরপোর পড়ার খরচ অবধি।"

—"সে কি, তুমি আবার কবে চাকরী ঠিক করলে! কত মাইনে?"

—"ষাট টাকায় হেড মিসট্রেসের পদ খালি আছে দেখে আমি দরখাস্ত করেছিলাম। আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। তুমি ও চাকরী ছেড়ে দাও।" সে ব্যগ্র-ব্যাকুল-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

মিষ্ট কোমলকণ্ঠে রথীন বলিল—"তুমিও চাকরী কর, আমিও করি, দু'জনের আয়ে সংসার বেশ চলে যাবে।"

নিষ্ফল কাকুতি-মিনতি! বীথিকা আর কিছুই বলিল না। তাহার মনের মধ্যে অহর্নিশি বিজয়ের কথাগুলা ঝঙ্কৃত হইতেছিল—'বীথিকা দেবী, আপনার স্বামী বোধ হয় বাঁচবে না। প্রদীপ নেববার আগে যেমন উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে—আপনার স্বামী রথীন্দ্রের জীবন-প্রদীপও নেববার আগে তেমনি ভাবে জ্বলে উঠেছে।"

—"হায় ভগবান, সত্যিই কি তাই হবে! অভাগিনীর আশা-ভরসা সবই কি অস্তমিত হবে! ভগবান, সত্যিই কি তুমি এত নিষ্ঠুর!"

পাঁচ

রথীনের অসুখ এবার ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। বীথিকা তাহার কথা মনে করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য যে স্বামীর এই অসুখ বাড়িয়া উঠিয়াছে বীথিকা তাহা বুঝিল। সে প্রায় প্রত্যেক দেবতার কাছে 'মানত' করিল। বিজয় নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে বলিল—"বোধ হয় সময় এগিয়ে আসছে।"

রতীন্দ্র সামনেই ছিল; কঠিনভাবে সে বিজয়কে ধমকাইয়া বলিল—"কি বলছেন বিজয়বাবু? মিছিমিছি বৌদি'কে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? এ রকম যদি আপনি বলেন, কাল থেকে আর এ বাড়ীতে ঢুকবেন না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বিজয় বলিল—"সত্য কথা

বলেছি তা'তে রাগ করছ কেন? মিছিমিছি ওঁকে প্রবোধ দেবার দরকার নেই।"

বীথিকা কম্পিত স্বরে বলিল—"ডাক্তারবাবু, এঁকে আপনি আরোগ্য করে দিন—আমার যা' আছে, আমি আপনাকে দেব।"

—"দেবেন, ঠিক বলছেন?" পৈশাচিক আনন্দের সহিত ডাক্তার বলিল।

—"দেব, দেব ডাক্তারবাবু, আমার যা' আছে, তাই দেব।"

—"আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না, তবে ভগবানের হাত। কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা করুন বীথিকা দেবী। ভাল করতে অবশ্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না; তাতেও যদি ভাল না হয়, তবুও আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। শপথ করুন—আমি যা' বলব, আপনি তাই করবেন।"

বিস্ময়-বিহ্বলা বীথিকা মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রতিজ্ঞা করিল। ব্যাকুল হইয়া রতীন্দ্র বলিল—"কি করলে বৌদি'! জান না ও কতবড় পাষণ্ড।"

কিন্তু তখন বোধ হয় বীথিকার আত্মজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। অবসন্নভাবে শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল।

পিশাচের মত লোলুপ-দৃষ্টিতে বীথিকার মুখের দিকে দেখিয়া বিজয় রতীন্দ্রের পানে চাহিয়া সাফল্যে গর্ব্বের হাসি হাসিল।

—"বীথি, আর পারি না, বোধ হয় সময় হয়ে এসেছে।" অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়া রথীন্দ্র কথাগুলি বলিল।

বিজয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করিবার পর আরও দশ বার-দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। বীথিকা স্বামীর এই অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগ আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। স্বামীর কথা শুনিয়া তাহার মলিন মুখ আরও মলিন হইয়া গিয়া আবার অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; পরক্ষণে পুনরায় অতিশয় ম্লান হইয়া গেল। স্বামীর মুখের অতি নিকটে ঝুঁকিয়া সে বলিল—"তোমার এ যন্ত্রণা আমি উপশম করে দেব। কিন্তু তুমি বলো—তা'তে কি ওপারে তোমায় আমায় মিলন হ'বে? তোমার যন্ত্রণা আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে! আশা করি ভগবান আমায় ক্ষমা করবেন! একবার শুধু বলো—পরপারে তোমায় আমায় কি আবার মিলন হবে?"

রথীন্দ্রের রোগপাণ্ডুর মুখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উত্তেজিতভাবে সে বলিল—"পরপারে আমাদের মিলন হ'বেই—কোন বাধা, কোন বিঘ্ন আর তখন আর থাকবে না। সেখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। দাও বীথি, দাও, আমায় এ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দাও! আমি বলছি—ভগবান তোমার ক্ষমা করবেন। এস বীথি, কাছে এস!" রথীন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল।

বীথিকা স্বামীর শয্যার উপর পড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া বলিল—"ভগবান, ক্ষমা করো, আমার কোন দোষ নিও না—আবার যেন ওঁকে পাই!"

* * *

—"কর্‌লি কি সর্ব্বনাশী, হতভাগী!" রতীন, রতীন, ছুটে আয়! হা সর্ব্বনাশী, স্বামী হত্যে করলি!" রথীন্দ্রের মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের বুকের উপর পড়িয়া গেলেন।

বীথিকার মুখ কাগজের মত শাদা। হাতে একটা ছোট কাগজের টুক্‌রা। পাশে বিজয় ডাক্তার। রতীন্দ্র ছুটিয়া আসিল। দাদার মুখের দিকে একবার চাহিয়া সে বিজয়ের উপর বাঘের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। রথীন্দ্রের মা বধূর একটা হাত ধরিয়া বলিল—"রাক্ষুসী, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামী হতে করলি! কুলে কালী দিলি! বাবা রথীন রে!"

—"বলো বৌদি', কেন এ কাজ করলে? কে তোমায় এ পরামর্শ দিলে?"

মৃদুস্বরে বীথিকা বলিল—"কেউ পরামর্শ দেয় নি ভাই। তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা চোখে দেখতে না পেরে, আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে একাজ করেছি। তোমরা আমায় যা' খুসী করতে পার, আমি যে তাঁকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছি, এইতেই আমার অপার আনন্দ। পতিহত্যাকারিণী

বলে আমায় ঘৃণা করতে পার, কিন্তু মা আমায় যা' ভাবছেন, বা যা' বলছেন তা' সত্য নয় ভাই!" তাহার চোখে দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তারপর স্বামীর পানে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া মিনতিভরাকণ্ঠে রতীন্দ্রকে বলিল—"ঠাকুরপো, একবার তোমার দাদার কাছে যেতে দেবে? একবারটি দাও ভাই!"

রতীন্দ্রের কঠোর মন মুহূর্ত্তের মধ্যে কোমল হইয়া গেল। সে বলিল—"যাও বৌদি'।"

স্বামীর পানে চাহিতে চাহিতে বীথিকা অগ্রসর হইয়া চলিল। স্বামীর হিম-শীতল মুখের উপর গভীর স্নেহ-চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল। তাহার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার স্বামীর মুখের উপর চুম্বন করিয়া সে বলিল—"চলো ঠাকুরপো।"

—"কোথায়?" মন্ত্রমুগ্ধের মত রতীন্দ্র বলিল।

সস্নেহ হাসিত মুখ উজ্জ্বল করিয়া বীথিকা বলিল—"থানায় নিয়ে যাবে না?"

রতীন্দ্রের মাথা নীচু হইয়া গেল। মনে হইল, সেই অপরাধী, তাহার বৌদি' নয়। জুতার পদশব্দে সচকিত হইয়া তাহারা সকলে বাহিরের দিকে তাকাইল। দেখিল, পুলিশে বারান্দা ভরিয়া গিয়াছে।

—"আসামী কৌন হ্যায়?" দারোগাবাবু সদর্পে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রতীন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত বীথিকা আর বিজয়কে দেখাইয়া দিল। একজন কনেষ্টবল অগ্রসর হইয়া তাহাদের হাতে হ্যাণ্ডকাপ্ লাগাইয়া দিল। দারোগাবাবু মৃতের মুখের দিকে চাহিয়া একজন প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এঁর স্ত্রী?"

এই প্রতিবেশীই রথীনের মায়ের চীৎকার শুনিয়া পুলিশে খবর দিয়াছিল। সে বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

দারোগাবাবু বিজয়ের দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আজকাল হামেসাই এ রকম হচ্ছে। রামচরণ, যাও, আসামীদের নিয়ে যাও।"

মৃতদেহের নিকট পুলিশ বসাইয়া তাঁহারা সদর্পে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * *

বিচারপতির দিকে চাহিয়া বীথিকা অশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠে অকপটে সব কথা বলিয়া গেল। তাহাদের দারিদ্র্যের কথা, স্বামীর অসহ্য যন্ত্রনাভোগ, ইত্যাদি। সেই দেখিয়া সে স্বামীকে 'পটেসিয়াম সাইনাইড' খাওয়াইয়াছিল। আরও বলিল—বিজয়বাবুকে সে বলিয়াছিল এই তিনি তাহাকে বিষ আনিয়া দিয়াছিলেন; আর তিনি না দিলেও তাহাকে যোগাড় করিতে হইত। স্বামীকে যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি দিতে পারিয়াছে ইহাতেই তাহার অপার আনন্দ। তারপর অশ্রু-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল—"আমায় ফাঁসী হুকুম দিন, আমি যেন স্বামীর সঙ্গে শীঘ্রই মিলতে পারি!"

বিচারপতির রায়ে বীথিকা বেকসুর খালাস পাইল। বিজয়ের সশ্রম কারাদণ্ড হইল। 'রায়' শুনিয়া বীথিকা বাহিরে আসিয়া একবার শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিল, তারপর বিপুল জনারণ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল।

শ্রীশোভারাণী বসু
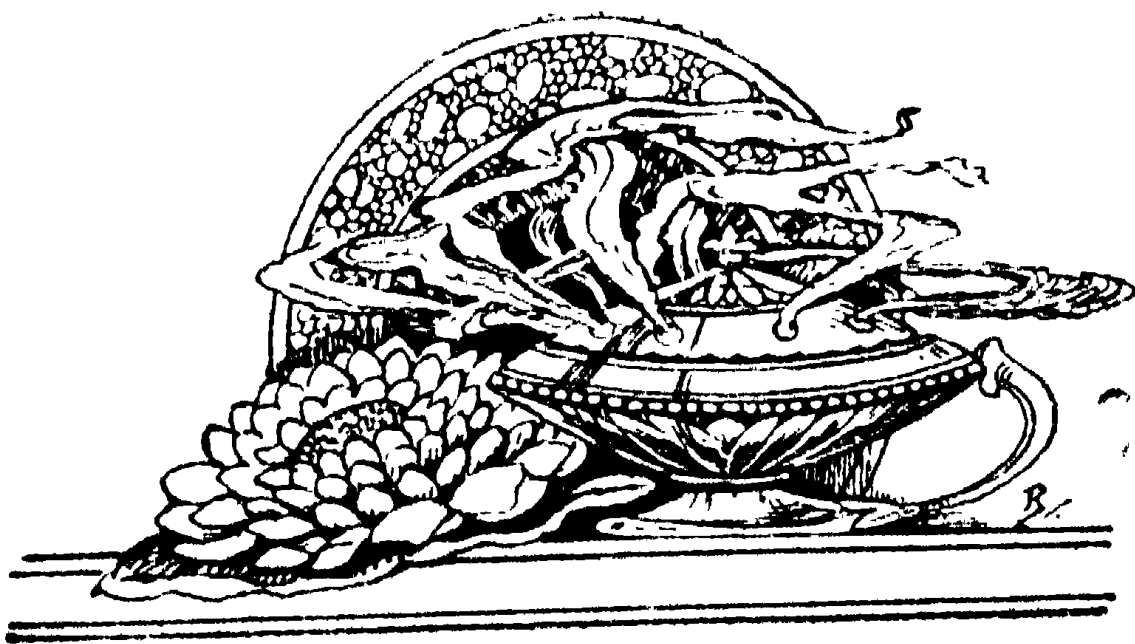
মোহভঙ্গ

শ্রীরাণী দেবী

বিকাশ ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশকরা মাত্র তার বাবা স্থরেশবাবু পুত্রের বিবাহের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন, এবং তাড়াতাড়ি একটা সম্বন্ধও জুটে গেল।

বিকাশের অবশ্য বিয়েতে অমত নেই—কারই বা থাকে। তবে পিতাকে বিশ্বাস করে এই গুরুতর কার্য্যটির ভার তাঁকে দিতে তার তরুণ প্রাণটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। তার ধারণা হ'ল, বাবা-মা দু'জনেই তাকে যেন কি একটা বস্তুতে ফাঁকী দেবার চেষ্টায় আছেন। অবশেষে সে একদিন মাকে স্পষ্টই বলে ফেল্লে, "বিয়ে কর্ত্তে আমি রাজী আছি; কিন্তু পাত্রী আমার পছন্দ মত হওয়া চাই। নইলে তোমরা যে একটা যা' তা' মেয়ে এনে আমার গলায় ঝুলিয়ে দেবে—তা' হবে না।"

পুত্রের কথা শুনে হেমলতা রুক্ষকণ্ঠে বল্লেন, "ও কথা বলিস্ নে বিকাশ!...তুই আমাদের একমাত্র ছেলে—আমাদের স্থন্দরী বউ আনতে সাধ যায় না? তুই নিশ্চিন্ত থাক্, বউ বেশ স্থন্দরীই হবে।"

বিকাশ মায়ের কথায় আশ্বস্ত না হয়ে বল্লে, "নিশ্চিন্ত থাকি আর কি করে! স্থধীরের কাছে শুনলাম, তোমরা কোন্ বড়লোকের কালো মেয়ের সাথে বিয়ে আমার ঠিক করেছ। আমি কিন্তু টাকার জন্য ওই মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে পারব না—এটা স্পষ্ট বলে রাখছি।"

হেমলতা রুষ্টস্বরে বল্লেন, "তুই ওই স্থধীরদের বাড়ী যাস্ না কি! তার একটা মামাত বোন্ আছে, ভারী বদ্নাম তার। তাদের বাড়ীর সকলের ইচ্ছে সেই মেয়েকে তুই বিয়ে করিস্, কিন্তু—"

বাধা দিয়া বিকাশ আগ্রহভরে বল্লে, "বেশ ত মা, রেখাকেই তোমার বউ কর না কেন। কেমন স্থন্দর চেহারা তার।"

হেমলতা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "স্থধীর বুঝি তোকে খুব ধরে পড়েছে? ছি! রেখাকে সবাই নিন্দে করে, স্বভাব-চরিত্র না কি তার—যাক্ গে বাবা, পরের কথায় কাজ নেই। উনি যে মেয়ে ঠিক করেছেন, সেও না কি খুব স্থন্দরী। তুই আর অমত করিস নে বিকাশ, নিজেই না হয় একবার তাকে মেয়ে দেখে আয়। অপর্ণাকে তোর পছন্দ হবে—এটা জোর করে বলতে পারি।"

বিকাশ বল্লে, "মা, রেখা এ পাড়ার সব চেয়ে স্থন্দরী, তাই সবাই হিংসে করে তার বদনাম রটাচ্ছে। আমার কিন্তু—"

সহসা কক্ষের বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হওয়ায় বিকাশের বাক্য অসমাপ্ত থাকল। স্থরেশবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

তিনি পুত্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বল্লেন, "সদাশিববাবুকে তোমার মনে আছে ত বিকাশ? বালীগঞ্জে তাঁর নাম করে না—এমন লোক খুব কমই আছে। সদাশিববাবু আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। আজ পাঁচ-ছ' বছর হ'ল তিনি মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী ও একটি মেয়ে আছে। এতদিন সদাশিববাবুর স্ত্রী মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী এলাহাবাদে ছিলেন; মাসখানেক হ'ল তাঁদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে এসেছেন। আমি খবর পেয়েই দেখতে গিয়েছিলাম—তোমার মাও সঙ্গে ছিলেন। আমরা অপর্ণাকে দেখে এসেছি। বেশ স্থশ্রী আর বুদ্ধিমতী মেয়ে। এবার আই-এ পাশ করেছে। অপর্ণার মা আমাদের বল্লেন, তাঁর স্বামীর ইচ্ছে ছিল, মধ্যবিত্ত ঘরের একটী চরিত্রবান ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দেবেন। তা' তিনি ত অসময়েই চলে গেলেন। অপর্ণার মায়ের ইচ্ছে তিনি তোমার সাথেই মেয়ের বিয়ে দেন। এখন তুমি নিজে গিয়ে একদিন মেয়ে দেখে এস। তোমার অপছন্দ হবে না—তা' বলতে পারি। এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই। বুড়ো হয়েছি, এখন

তীর্থধর্ম্ম করবার সময় হয়েছে, এইবার সেই চেষ্টাই দেখব। তোমার বিয়েটা হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ করতে পারি।" সুরেশ বাবু কথা শেষ করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

হেমলতা পুত্রের নত মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "শুনলি ত সব। এখন ইচ্ছে হলে আজকেই তুই অপর্ণাকে দেখে আসতে পারিস। আমি একটা লোক দিয়ে সেখানে খবর পাঠিয়ে দি' গে।" বলে তিনিও কার্য্যান্তরে গমন করলেন।

বিকাশ তখনই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু অমলের মেসে গিয়ে উঠল। অমল বল্‌লে, "কিরে, এই দুপুর রোদে যে বড় ছুটে এলি? বেশ আছিস ভাই। ডাক্তারী পাশ করেছিস্, এইবার একটা সাইন বোর্ড টাঙিয়ে নামটা জাঁকিয়ে বসতে পারলেই তোফা হুড়হুড় করে তোর হাতের গোড়ায় টাকা এসে পড়বে। আর আমার অবস্থা দেখ্‌ছিস—বি-এ পাশ করে এক বছর টিউশনি করে চালাচ্ছি। সকালে সাতটা থেকে দশটা, আবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা। মাসকাবারে পঞ্চাশটা টাকা পাই। কি কষ্টে যে চালাই, সে আমিই বুঝি!"

বিকাশ হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে বল্‌লে, "আরে, চাকরী-বাকরীর যা' অবস্থা হয়েছে, তা'তে তোর পঞ্চাশ টাকাই যথেষ্ট। আমি এখন কি করি তাই ভাবছি। আমাদের অবস্থাও তোর মত প্রায়। ডাক্তারী পাশ করলেই ত হয় না। তা'তে ত টাকার দরকার। সে কথা যাক্। তোর কাছে একটা পরামর্শের জন্য এই দুপুর রোদে ছুটে এসেছি। ভাই, বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন। মেয়ে না কি তাঁদের মতে সুন্দরী। আমি কিন্তু সুধীরের কাছে শুনেছি, মেয়ে কালো। মাকে সেকথা বল্‌তে গিয়ে তাড়া খেয়েছি। বাবা-মা দু'জনেই আমাকে মেয়ে দেখে আস্‌তে বল্‌লেন। তুই যাবি আমার সাথে? ঘণ্টা দু'য়ের ব্যাপার বই ত নয়। চল্ না কেন আমার সাথে। বেশী দূরে নয়—এই বালীগঞ্জ।"

অমল সোৎসুকে বল্‌লে, "বালীগঞ্জে কার বাড়ী রে?"

বিকাশ বল্‌লে, "সদাশিববাবু নামে কে একজন ভদ্রলোক বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁর মেয়ের সাথেই—"

অমল আনন্দে লাফিয়ে উঠে বিকাশের পিঠ চাপড়ে বল্‌লে, "বুঝেছি, বুঝেছি—আর বলতে হবে না। ও অঞ্চলে কে না তাঁর নাম জানে! আহা, বড় ভালো লোক ছিলেন! বড় তাড়াতাড়ি মারা গেলেন তিনি। তা' তোর বরাত জোর আছে বটে! ওই একটিমাত্র মেয়ে অপর্ণাই ত অতবড় বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। সদাশিববাবুর স্ত্রী, স্বামী মারা যাবার পর থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এলাহাবাদে বাপের বাড়ীতেই ত এতদিন ছিলেন। সম্প্রতি মেয়েটির বিয়ে দেবার জন্য তিনি বাড়ীতে ফিরে এসেছেন।"

বিকাশ সবিস্ময়ে বল্‌লে, "তুই যে দেখছি ঢের খবর রাখিস! চিনিস্ না কি তাঁদের?"

অমল বল্‌লে, "তা' অল্প-সল্প চেনাশোনা আছে বই কি। এদিকে মাসীমার দিক্ থেকে অপর্ণাদের সঙ্গে একটু সম্পর্কও আছে। তবে, আমরা হচ্ছি গরীব, আর তারা মস্ত বড়লোক; এজন্য বিশেষ রকম যাওয়া-আসা নেই। আমি নিজে ইচ্ছে করেই ওদিকটা মাড়াই না।"

বিকাশ একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লে, "আচ্ছা, সত্যি করে বল্ ত—অপর্ণা কি খুব সুন্দরী, না সাধারণ বাঙালীর মেয়ের মত?"

অমল বল্‌লে, "সাধারণ-অসাধারণ আমি ও সব কিছু বুঝি নে ভাই। তবে বল্‌তে পারি, সে সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা—তোর চক্ষে ভালই লাগবে।"

বিকাশ নাক কুঁচকে বল্‌লে, "দুত্তোর শ্যামবর্ণা! আমি চাই—আমার স্ত্রী হবে আমারই মত এমনি ফর্শা! ওসব শ্যামবর্ণ আমার পোষাবে না। মাকে বল্‌লাম, রেখার কী চমৎকার চেহারা! তাকে তোমরা পছন্দ করো; তা' করলে না—কোত্থেকে বড়লোকের কালো মেয়ে এনে আমার গলায় ঝুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। সুধীর ভাই রোজই আমাকে বল্‌ছে—তার বোনকেই যেন আমি বিয়ে করি। এদিকে মা-বাবা রাজী নন্—কি করব বুঝতে পারছি না অমল। তুই একটা পরামর্শ দে না?"

অমল বল্‌লে, "সুধীরের মামাত বোন্ রেখা দেখতে খুবই সুন্দরী ; কিন্তু তার অন্তরটাও সেই অনুপাতে কুশ্রী। রেখাদের বাড়ী আমাদের গাঁয়ে—এক পাড়াতেই। দেশের জমিদারের ছেলের সাথে কত কাণ্ড হয়েছে—গ্রামের লোক ওর বাবাকে ছি ছি করেছে—মেয়েকে শাসন না করার জন্যে। ওর বাবা শেষটা রেখাকে এনে বোনের বাড়ীতে রেখেছে—যদি তাঁরা একটা পাত্র জুটিয়ে তার বিয়েটা কোনমতে দিয়ে দিতে পারেন। তুই সুধীরের কথায় কান দিস নে। অপর্ণাকে বিয়ে কর—শ্বশুরের পয়সায় মস্ত একটা বড়লোক হতে পারবি। চল্, আমিও তোর সাথে যাব 'খন। অপর্ণাকে তুই দেখে আয়।"

মেয়ে দেখা শেষ হ'ল। বিকাশ বাড়ী ফিরে গম্ভীরস্বরে তার মাকে বল্‌লে, "আমি ও মেয়েকে বিয়ে করবো না। এই বুঝি তোমাদের সুন্দরী—রাত্রিতে ত কালো বলেই মনে হ'ল। কখনো আমি ও মেয়ে বিয়ে করবো না—রেখার সাথে আমার বিয়ে দাও মা!"

হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "তোরই ভালর জন্যে বল্‌ছি। অপর্ণার গায়ের রং তোর মতন অমন ফর্শা নয় বটে, কিন্তু চোখ, মুখ, নাক—সবই সুন্দর! আর, রূপটাই আসল নয়—গুণেও মেয়েটি চমৎকার! কী মিষ্টি নম্র স্বভাব তার!" একটুখানি থেমে হেমলতা পুনরায় বল্‌তে সুরু করলেন, "তা' ছাড়া, আরও একটা ভাববার বিষয় আছে। অপর্ণা তার পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এ বিয়ে হলে অতুল ঐশ্বর্য্য তোর হাতে আসবে। সুন্দরী মেয়ে হয় ত ঢের পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু, সবদিকে এতখানি সুযোগ-সুবিধে ঘটে উঠবে না। আমাদের অবস্থা সবটা হয় ত তোর জানা নেই। তোর পড়ার খরচ জোটাতেই আমার গায়ের গয়নাগুলো পর্য্যন্ত গিয়েছে; এখন সম্বলের মধ্যে আছে শুধু—এই বাড়ীখানি। মা-বাপ সন্তানের মঙ্গল কামনাই করে থাকেন। এ বিয়েটা হয়ে গেলে তুই ইচ্ছে করলেই বিলেতটা পর্য্যন্ত ঘুরে আসতে পারবি। আর অমত করিস্ নে বাবা—এই মাসেই বিয়ের দিন স্থির ক'রে ফেলি। কি বলিস?" তিনি আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাইলেন।

বিকাশ বল্‌লে, "তা' হ'লে তোমাদের একান্তই ইচ্ছা যে, আমি অপর্ণাকেই বিয়ে করি?"

হেমলতা বল্‌লেন, "আমাদের ইচ্ছে ত আছেই—তা' ছাড়া, মেয়ের মায়ের ইচ্ছেটাও একটু বেশী রকমই আছে। ছাখ্ বিকাশ, অপর্ণা খুব বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা; তুই তাকে বিয়ে কর্লে সুখী হবি—এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।"

বিকাশ নতমস্তকে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। তার মনের মধ্যে তখন ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। একদিকে বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, অন্যদিকে রেখার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের প্রবল আকর্ষণ! কোনটাই তার পক্ষে কম লোভনীয় বস্তু নয়। অবশেষে অর্থপ্রাপ্তি কামনাই জয়লাভ কর্ল। সেই মুহূর্ত্তে যেন বিকাশের দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের সুমধুর চিত্রখানি উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠ্‌ল—সেখানে কত পশার-প্রতিপত্তি কত মান-মর্য্যাদা...। আচ্ছন্নের মতন বিকাশ উত্তর দিল, "বেশ, আমি অপর্ণাকেই বিয়ে কর্ব। দারিদ্র্য আমার সহ্য হবে না। আমি অর্থ চাই...সমাজে দশজনের একজন হ'য়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই!...

বিয়ে হয়ে গেল।

অপর্ণার বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাবী জামাতার জন্য আধুনিক ফ্যাসনের একখানি দোতলাবাড়ী রেখে গিয়েছিলেন। বিকাশ বিয়ের পরই অপর্ণাকে নিয়ে সেই বাড়ীতে এসে উঠ্‌ল। সঙ্গে তার মা বাবাও এলেন।

ফুলশয্যার দিন রাত্রে স্ত্রীকে একান্তে পেয়ে বিকাশ বল্‌লে, "আমি এই কৌচখানায় শুয়ে থাক্‌ব—তুমি খাটে শোও।" কথা শেষ করে বিকাশ বিবাহে যৌতুকপ্রাপ্ত মূল্যবান কৌচখানাতে শুয়ে পড়ল।

অপর্ণার মুখ অবগুণ্ঠন মুক্ত ছিল। চন্দন-চর্চ্চিত ললাটের ওপর লুটিয়ে পড়া কেশগুচ্ছ একহাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে

মুহূর্তের জন্য স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তৎক্ষণাৎ চোখ নত কর্ল। সেই মুহূর্তেই সে বুঝতে পারল—স্বামীর গম্ভীর বিষণ্ণ মুখমণ্ডলে বেদনার সাথে নিদারুণ বিরক্তি মিশানো রয়েছে। কারণ অজানা থাকায় অপর্ণা অগত্যা শয্যায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজল—কিন্তু নিদ্রা এলো না। কিছুক্ষণ পরেই বিকাশ অপর্ণাকে নিদ্রিত মনে করে' কৌচ পরিত্যাগ করে শয্যার দিকে অগ্রসর হ'ল—তার লঘু পদশব্দে অপর্ণা নিদ্রার ভান করে পড়ে রইল—শুধু তার অন্তর অজানা পুলকে কম্পিত হয়ে উঠ্‌ল। শ্যামল মুখখানিতে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনিয়ে এলো।

বিকাশ পালঙ্কের দিকে একটু অগ্রসর হ'য়ে অপর্ণার শ্যামল মূর্ত্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে কতকটা নিজের মনেই বল্‌লে, "হায় রে, এরই সাথে সারাজীবন কাটাতে হবে আমাকে! জীবনে যাকে কোনদিন ভালবাস্‌তে পার্ব্ব না—এমন কি, এক শয্যায় শয়ন করার কথা মনে হলেও অন্তর আতঙ্কে শিউরে ওঠে, তাকে নিয়েই কি না কাটাতে হবে আমার সারাটা জীবন! মা-বাবা কি সত্যিই আর বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে পেলেন না?... রেখার বাবা গরীব বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে রেখা রাজেন্দ্রাণীর তুল্য!" বিকাশ পুনরায় গিয়ে পরিত্যক্ত কৌচখানাতে শুয়ে পড়ল।

বিকাশের প্রত্যেকটি বাক্য অপর্ণার অন্তরে তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ করতে লাগ্‌ল। সে বুঝলে, স্বামীর ভালবাসা তার অদৃষ্টে নেই—কোন্ ভাগ্যবতী নারী পূর্ব্বেই সেই অমূল্য রত্নটি অধিকার করে বসেছে। কিন্তু, বিকাশ তবে তাকে বিয়ে কর্ল কেন? এ কি শুধু ঐশ্বর্য্যের মোহ?...অপর্ণার দুই চোখ জ্বালা করে অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

বিয়ের দিন পনের পরেই হেমলতা বুঝতে পারলেন, পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে কী একটা ব্যাপার যেন ঘটেছে। প্রকাশ্যে তিনি কাউকেই কিছু বল্‌তে পারলেন না। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে অপর্ণার মাকে গিয়ে বললেন, "বেয়ান চলো—এইবার আমরা একটু তীর্থ-ধর্ম্ম করে আসি। সারাজীবন ত ঘর-সংসার করেই কাটল, এইবার ওদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমরা একটু পরকালের কাজ গুছিয়ে নিই।" তারপর একটু থেমে আবার বল্‌লেন, "জান ত বেয়ান, ছেলের অমতে বিয়ে দিয়েছি, এখন ওরা দু'টিতে একসঙ্গে থাক্‌লেই মনের মিল হয়ে যাবে—আমরা বরঞ্চ একটু দূরেই সরে থাকি।"

অপর্ণার মা সম্মত হলেন। দিনকয়েকের মধ্যে সস্ত্রীক সুরেশবাবু অপর্ণার মাকে নিয়ে পশ্চিম রওনা হলেন।

বিকাশ অপর্ণাকে ভালবাসতে পারে নি। তাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু বাইরের ঠাট বজায় রাখা মাত্র। অপর্ণা তা'র শয্যাগৃহ স্থানান্তরিত করেছে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে স্বামীর সাথে তা'র বাক্যালাপ পর্য্যন্ত হয় না।

বিকাশ এখনো রেখার আশা ত্যাগ করে নি। তার মনে এই ধারণা—হিন্দু-বিবাহে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ দোষের নয়। রেখা যদি আপত্তি না করে, তবে রেখাকে পত্নীরূপে লাভ ক'রে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। মনে মনে স্থির কর্ল, একদিন রেখাকে এই কথা ব'লে দেখ্‌বে—কিন্তু, পরক্ষণেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের কল্পনায় তার শিক্ষিত অন্তর সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ল—ছি ছি, আজকাল শিক্ষিত ভদ্রসমাজে স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার! পরক্ষণেই সে ভাব্‌ল, না না, তুচ্ছ লোকনিন্দার ভয়ে সে কেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখে বঞ্চিত থাক্‌বে? যে অপর্ণাকে মনে প্রাণে কোনদিনই ভালবাস্‌তে পার্ব্বে না, সেই পরম বিরক্তিকর স্ত্রীর জন্য সে কখন এভাবে স্বার্থত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বে না। সেইদিন থেকে অপর্ণার এক বাড়ীতে অবস্থিতিও বিকাশের পক্ষে অসহ্য ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌ল; অথচ, এর প্রতীকারের কোন সদুপায় সে খুঁজে পেলে না। ভাবতে লাগ্‌ল, অপর্ণার অর্থের জোরেই সে সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে—এই যে প্রকাণ্ড একটা ডিস্‌পেন্সারি ও ল্যাবরেটরী খুলে তার এতটা নাম-ডাক হয়েছে—এ সবই ওই অপর্ণার দৌলতে!...সুতরাং

তাকে তা'র 'চলে যাও' বলা চলে না। নিরুপায় বিকাশ নিজের মনের আগুনে দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল।

অপর্ণা স্বামীর মনের ইচ্ছাটা যেন বেশ বুঝ্‌তে পার্লে। নিজের মনেই ক্ষীণ হেসে বল্লে, "আমি ত তোমার ভালবাসা বা এতটুকু স্পর্শের জন্য লালায়িত নই—শুধু দূর থেকে তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন কাটাতে চাই—তাও তোমার অসহ্য বোধ হচ্ছে!"

প্রকাশ্যে সে একদিন সকালে বিকাশের চা পানের সময় বল্লে, "আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমি যদি এখ'ন থেকে চলে যাই, তা' হ'লে আপনি খুসী হন্। আপনার আপত্তি না থাক্‌লে, আমি আমাদের আগেকার বাড়ীতেই উঠে যাই।" কথা শেষ করে' স্বামী কি বলেন তাই শোনবার জন্যে সে টেবিলটা ধরে' দাঁড়িয়ে রইল।

বিকাশের এ কথা শুনে খুসী হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি বিরূপ মন যেন চুপে চুপে তাকে বল্‌ছিল—"এটা অপর্ণার অহঙ্কারের কথা। তার বাবা মেয়ের জন্য যথেষ্ট টাকা-পয়সা, দু'-তিনখানা বাড়ী রেখে গেছেন বলেই সে অন্যত্র যাবার কথা উত্থাপন ক'রে যেন নীরবে জানিয়ে দিল—তুমি কি আমার সমযোগ্য! আমি ঐশ্বর্য্যশালীর কন্যা……নিজে শিক্ষিতা……তোমার এখানে আমি থাকতে পারি না।"

বিকাশ কঠোরস্বরে বল্‌লে, "তোমার যেখানে খুসী যেতে পার—আমার তা'তে কিছু যাবে আসবে না। তুমি বড়লোকের মেয়ে, অহঙ্কার তোমার মজ্জাগত—তবে আমিও একেবারে তুচ্ছ করবার মতন নই"— বলেই সে সেখান থেকে চলে গেল।

অপর্ণা ধীরে ধীরে সেইখানে বসে পড়ল। দুই হাতে বুক চেপে ধরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "ভগবান, স্বামী যাকে এত ঘৃণা করে, সে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে কেন!"

বিকাশ সুধীরদের বাসায় গেল। সেখানে তখন ছোট-খাট একটা সান্ধ্য-মজ্‌লিস্ বসেছে। রেখা আছে, সুধীর আছে এবং একটী নবাগত যুবকও কোথা থেকে এসে জুটেছে।

রেখা বিকাশকে দেখেই মুখ গম্ভীর করে সেখান থেকে চলে গেল। বিকাশ ভাবল, এটা নিশ্চয়ই তার অভিমান। অবশ্যই রেখার অভিমান করবার কারণ আছে। বিকাশ আজ তিনমাস যাবৎ বিয়ে করেছে—এ পর্য্যন্ত সে রেখাকে একটি দিনের জন্যও দেখতে আসে নি। বিকাশের এটা খুবই অন্যায় হয়েছে। এই মুহূর্ত্তে যদি বিকাশ তাকে নির্জ্জনে পায়, তা' হ'লে সে যোড়হাতে ক্ষমা চেয়ে বলে, "আমাকে মাপ কর রেখা! আর আমি দূরে সরে থাক্‌ব না—যত শীঘ্র পারি তোমাকে আমি গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাব।"

সুধীর বিকাশের কল্পনায় বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বল্লে, "কি হে ডাক্তার, বড়লোকের জামাই হয়ে কি আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুদের একেবারেই পরিত্যাগ করলে? বসো, বসো, তোমার নতুন খবর কি? এই দেখো, আমাদের একজন বন্ধু জুটে গেছেন ইতিমধ্যে। ইনি সুবিমল রায়—উকীল। এরই মধ্যে বেশ পশার করে নিয়েছেন। সুবিমলবাবু, এঁর কথাই সেদিন আপনাকে বল্‌ছিলাম। আগে বিকাশ আমাদের পাড়াতেই থাক্‌ত, এখন বালীগঞ্জে আছে। বিয়ে করে ওর কপাল ফিরে গেছে। কি বল বিকাশ?"

বিকাশ নীরবে একটু শুষ্ক হাস্‌ল। মনে মনে সে এই সুবিমলের ওপর অকারণ বিরূপ হয়ে উঠল।

সুবিমল যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে মৃদু হেসে বল্লে, "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুসী হলাম। আপনার স্ত্রীর লেখা ভারী চমৎকার লাগে! আজকালকার সকল শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রেই অপর্ণা দেবীর রচনা বেরোয়। আমি সেগুলো খুব আগ্রহের সহিতই পড়ে থাকি। আচ্ছা, আপনি গল্প-টল্প লেখেন না কেন?"

সুধীর বিদ্রূপ করে বল্লে, "আপনিও যেমন সুবিমলবাবু, বিকাশ আবার লিখবে গল্প।…চব্বিশ ঘণ্টা মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে ওর মনটা হয়ে গেছে—নীরস—যাকে বলে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডবৎ। ওর স্ত্রী যে ওকে ডাইভোর্স করে নি—এই ঢের।" কথা শেষ করেই সুধীর হোহো করে হেসে উঠল।

বিকাশের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, তার ও অপর্ণার ভেতরের ব্যাপার জানে বলেই সুধীর ব্যঙ্গ করে সেটা সুবিমলকে শুনিয়ে দিলে। মুখে একটু শুষ্ক হাসি এনে সে বল্‌লে, "সুবিমলবাবু, আপনি সুধীরের কথায় কান দেবেন না। আমার কল্পনাশক্তি বেশ আছে; তবে সেটা যে কি করে প্রকাশ কর্ত্তে হয়, তা' আমি ভাল জানি না।"

সুবিমল কৌতুকভরে বল্‌লে, "তা' আপনার স্ত্রীর কাছে এ বিদ্যাটা শিখে নেন্ না কেন? তিনি নিশ্চয়ই আপনার মত একজন কৃতবিদ্য ছাত্র পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে কর্ব্বেন।"

বিকাশের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। একশোবার স্ত্রীর আলোচনা তার কাছে ভাল লাগছিল না।...তার তৃষিত অন্তর উদ্‌গ্রীব হয়েছিল রেখার দর্শন লাভের আশায়। একটু নড়ে চড়ে বসে বিকাশ বল্‌লে, "সুধীর, আমরা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি—আজ ভালো একটা প্লে আছে। বক্স ভাড়া করেছি। একটা চেয়ার খালি আছে, রেখা যদি যায়—"

সুধীর বাধা দিয়ে বল্লে, "সুবিমলবাবু রেখাকে নিয়ে এখনি 'গ্লোবে' যাবেন। রেখা কাপড় বদলাতে গিয়েছে; এসে পড়ল বলে। তোমার সাথে বরং অন্য একদিন যাবে। সুবিমলবাবু নতুন লোক; উনি যাতে মনঃক্ষুণ্ণ হন্, এমন কাজ আমাদের কখনো করা উচিত নয়।"

বিকাশ 'ও' বলে একটুখানি চুপ করে থেকে বল্লে "আচ্ছা, আজকে তা' হ'লে আমি যাই। হাসপাতালে একবার যেতে হবে, একটা সিরিয়াস কেস্ আছে"—বলেই সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

সুবিমল একটু হেসে বল্লে, "বিকাশবাবু, হাতে রোগী থাক্‌লে আপনারা—এই ডাক্তারেরা—আমোদ করেন কি ক'রে?"

বিকাশ দ্বারের বাইরে পা দিতে দিতে অতি কষ্টে হেসে বল্লে, "মনটাকে একটু বৈচিত্র্য দিতে হবে ত।"

রাস্তায় নেমে পড়তেই বিকাশের মুখখানা কালো হয়ে উঠল। সুবিমলের ওপর অন্তর তার ক্রোধে গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল। ওই লোকটাই বোধ হয় রেখাকে গ্রাস্ ক'রে বসেছে। জোরে জোরে পা ফেলে সে অন্যমনস্কে হাঁটতে সুরু করে দিলে। রোগীর চিন্তা তখন তার মাথায় উঠেছে। জগতের সকলের ওপর মন তার বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌ল...। এ কি বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান! কেউ কাউকে ভালবেসে একান্তভাবে পাবে না, আর যার নাম শুন্‌লেই সমস্ত হৃদয় বিষাক্ত হয়ে ওঠে—সেই তাকে নিয়েই কাটাতে হবে তার সারাটা জীবন?......না না, এ হতে পারে না! রেখাকে ছেড়ে সে বাঁচতেই পার্‌বে না—আর, রেখাও কি তাকে ছেড়ে ঐ ভুঁইফোঁড় উকীলটাকে বিয়ে করে সুখী হতে পার্‌বে? কখনই নয়! এই ত তিন মাস পূর্ব্বের কথা—রেখা নির্জ্জনে একদিন অশ্রু-ব্যাকুল-কণ্ঠে তাকে বলেছিল, "বিকাশবাবু, আমি আপনাকে ছাড়া আর কা'কেও ভালবাসতে পারব না—আপনি আমায় গ্রহণ করুন।"

বিকাশ সেদিন তাকে একযোড়া মূল্যবান ব্রেস্‌লেট উপহার দিয়েছিল। নিজের হাতে সেই প্রথম উপহার রেখার শুভ্র সুন্দর হাত দু'খানিতে পরিয়ে দিয়ে ব্যথা-বিক্ষুব্ধ-স্বরে বলেছিল, "তোমাকে সঙ্গীরূপে পাব এ যে আমার বহুদিনের বাসনা রেখা! কিন্তু, কি করবো—বাবা-মা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। আচ্ছা রেখা, অন্য কা'কেও বিয়ে করলে তুমি কি খুব অসুখী হবে?"

রেখা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "না, অসুখী আমি হব না। আমি জানি, আপনি যাকেই বিবাহ করুন না কেন, আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পার্ব্বেন না।"

রেখার সেদিনকার সেই কথা শুনে বিকাশের এত আনন্দ হয়েছিল যে, তার ইচ্ছে হচ্ছিল—রেখাকে কাছে টেনে এনে একটু আদর করে। কিন্তু, পরক্ষণেই মনে হ'ল, তা'তে মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'তে পারে—কেন না সে, যতই ভালবাসা তাদের থাকুক না কেন, সামাজিক বন্ধন তাদের পরস্পরকে যতদিন না নিকটতম কর্ব্বে, ততদিন পর্য্যন্ত তারা ভালবেসে চিরদিনই দূরে থাকবে।

রেখা সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বিকাশের কানের কাছে

ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, "আপনার বিয়ের পূর্ব্বেই কিন্তু আমায় আর একবার এসে দেখে যাবেন—বিয়ে হয়ে গেলে তখন ত আর আমার অধিকার থাক্‌বে না কিছু। আসার সময় নূতুন প্যাটার্নের একছড়া মুক্তার কলার আন্‌বেন।" কথা শেষ করেই অকস্মাৎ বিকাশের কানের কাছটিতে সে নিজের লালটুকটুকে ঠোঁট দু'খানি স্পর্শ করিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছল।

সেদিনকার সেই সুমধুর স্পর্শটি যেন আজও বিকাশের সারাদেহ রোমাঞ্চিত করে তোলে—কিন্তু, সেই রেখা আজ অতখানি নিষ্ঠুর হ'ল কেন? কেন সে আজ তার সঙ্গে একটি কথাও বল্লে না?···সে কি তার ওপর রাগ করেছে?...হয় ত তাই হবে। সে নিজে মুখ ফুটে মুক্তার কলার চেয়েছিল, আর সে কি না তা' ভুলে গিয়েছে। সেজন্য সে অভিমান করতে পারে বই কি! নাঃ, তার এ অভিমান ভাঙতে হবে। কালই মূল্যবান একটা মুক্তার কলার কিনে রেখাকে সে দিয়ে আসবে। তার সেই সুন্দর কণ্ঠে মুক্তার গহনা কি চমৎকারই না মানাবে!......

হঠাৎ মোটরের হর্ণের শব্দে বিকাশের কল্পনার জাল ছিন্ন হয়ে গেল। চকিত হয়ে তাড়াতাড়ি সে একপাশে সরে দাঁড়াল। সাঁ করে বিদ্যুদ্বেগে একখানা মোটরকার তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সেই মুহূর্ত্তে তার দৃষ্টি গাড়ীখানার মধ্যে উপবিষ্ট আরোহী যুগলের প্রতি নিপতিত হ'ল। দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সুবিমল ও রেখা বসে আছে।

সে দাঁতে দাঁত চেপে টল্‌তে টল্‌তে একখানা খালি ট্যাক্সি ডেকে বাড়ীর নম্বর ব'লে গাড়ীতে চেপে বস্‌ল।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতন সমস্ত রাতটা তারকেটে গেল। ভোরের দিকে দেহ মনের জড়তা কাটিয়ে সে যখন চোখ মেলে চাইল, তখন প্রথমেই তার চোখে পড়ল—অপর্ণার উৎকণ্ঠাব্যাকুল চোখ দু'টী!

বিকাশ বলে উঠল, "এ কি অপর্ণা, ঘরে আলো জ্বলছে কেন, তুমি মাথার কাছে বসে আছ—ব্যাপার কি? ক'টা বেজেছে?"

অপর্ণা তার স্বাভাবিক প্রশান্ত স্বরে বল্‌লে, "পাঁচটা বেজেছে মোটে। আপনি আরো একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

বিকাশ সবিস্ময়ে বল্‌লে, "পাঁচটা বেজে গিয়েছে, ঘুমোব কি! ছ'টার সময় রোজ আমি বেড়াতে যাই—যদিও রোগীদের কল্যাণে সেই বেড়ানোর সময়টুকু ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।"

অপর্ণা বল্‌লে, "আজকে আর বেড়াতে নাই বা গেলেন? শরীর যে আপনার বড্ড অসুস্থ। ডাক্তার সেন বলে গেছেন, দু'দিন আপনাকে বাড়ীতেই থাক্‌তে হবে—হাসপাতালে বা রোগীর বাড়ী যেতে পারবেন না।"

বিকাশ বিচলিত হয়ে বল্‌লে, "ডাক্তার সেন পর্য্যন্ত এসেছিলেন! সর্ব্বনাশ! আমার হয়েছিল কি? কই, আমার ত কিছুই মনে হচ্ছে না—বল্‌তে বল্‌তেই বিকাশের মানস-পটে বিগত দিবসের অপরাহ্নের ঘটনাটা স্পষ্ট ফুটে উঠল। মুখ তার আপনা থেকেই বিবর্ণ হয়ে গেল।

অপর্ণা স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে সহানুভূতিপূর্ণ-কণ্ঠে বল্‌লে, "আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন! আপনার তেমন কঠিন কিছু ব্যায়রাম হয় নি ত। কাল সন্ধ্যেবেলা আপনার চাকরটা এসে বল্‌লে, 'মা, বাবু আজকে এখনো ত বাড়ী এলেন না। আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি—আমার দেশের লোক এসেছে।' আমি বল্‌লাম, 'একটু পরেই যাস্। উনি বাড়ী এসে আগে তোকেই ডাকাডাকি করবেন 'খন।' চাকরটা একটু অসন্তুষ্ট হয়েই আমার সামনে থেকে সরে গেল। একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লে, 'মা, বাবু ভাড়াটে মোটর-গাড়ীতে করে বাড়ী এসেছেন। গাড়ীর মধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।' আমি দরওয়ান আর চাকরের দ্বারা আপনাকে ঘরে এনে শুইয়ে চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিতেই আপনি চোখ মেলে চেয়ে আবার চোখ বুজলেন। আমি তখন তাড়াতাড়ি ডাক্তার সেনকে ফোন্ করে

দিলাম। তিনি এসে আপনাকে দেখে বল্‌লেন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমেই না কি সহসা এমনি মূর্চ্ছা হয়েছে। এক ডোজ ওষুধ দুধের সাথে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।"

বিকাশ নীরবে অপর্ণার মুখের প্রতি চেয়ে থেকে মনে মনে কি যেন ভাবতে লাগল। একটু পরে ম্লান হেসে বল্‌লে, "আমাকে অচেতন দেখে তোমার খুব ভয় হয়েছিল, না অপর্ণা ?"

অপর্ণা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চুপ করে রইল।

বিকাশ বিছানার ওপর উঠে বসে দু' হাত দিয়ে জোর করে অপর্ণার মুখখানি নিজের দিকে এনে দেখল—তার চোখ দিয়ে একটির পর একটি অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে। বিকাশের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল। আপনাকে বহু কষ্টে সাম্‌লে নিয়ে অপর্ণার মুখ ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, "তোমার সাথে অনেক কথা আছে অপর্ণা, তার পূর্ব্বে 'সুইচ' টিপে আলো নিবিয়ে দাও। ওই দেখো, সূর্য্যের আলো এসে জানলার ওপর লুটিয়ে পড়েছে।"

অপর্ণা ত্বরিতে চোখের জল মুছে ফেল্‌ল। 'সুইচ' টিপে আলো নিবিয়ে দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘরের দৃশ্য বদলে গেল। উজ্জ্বল বিদ্যুতের পরিবর্ত্তে তরুণ তপনের স্নিগ্ধ কিরণ কক্ষটির সর্ব্বত্র যেন আলোর কমল ফুটিয়ে তুল্‌ল। কক্ষ-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান থেকে হাস্নাহানার মৃদু গন্ধ হাওয়ায় ভেসে এসে উভয়কে আন্‌মনা করে তুল্‌ল।

অপর্ণা মুক্ত গবাক্ষে দাঁড়িয়ে সম্মুখস্থ রাজপথের দিকে চেয়েছিল। রাস্তায় লোক চলাচল সুরু হয়েছে। কয়েকখনা 'কার' গর্ব্বভরে সাঁ করে চলে গেল। 'চাই গরম মুড়ি', 'চাই টাটকা তরী তরকারী'—ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাকে পল্লী সচেতন হয়ে উঠল। অদূরে ট্রামগাড়ীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। অপর্ণা মুগ্ধদৃষ্টিতে এই সব চেয়ে চেয়ে দেখছে। আজকে তার চোখে প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ মামুলী ঘটনাগুলি যেন কি এক অপরূপ রূপে ফুটে উঠে মনের দোলায় দোল দিয়ে যাচ্ছে। সে যেন কি একটা অমূল্য রত্ন হঠাৎ আজ খুঁজে পেয়েছে।

বিকাশ শয্যায় বসে বাতায়নবর্ত্তিনী অপর্ণার প্রতি তাকিয়েছিল। তার মনে হ'ল, আজকের এই সুস্নিগ্ধ প্রভাত—অপর্ণার নির্ম্মল অন্তরের প্রতিচ্ছবি। হায় রে, সে গৃহের এমন অমূল্য রত্ন অনাদরে পরিত্যাগ করে' মোহমুগ্ধ হয়ে কোথায় আলেয়ার পিছনে ছুটেছিল! সে শয্যা ছেড়ে নিঃশব্দে একেবারে অপর্ণার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর একখানি হাত রাখল।

অপর্ণা মুখ ফিরিয়ে একবার বিকাশকে দেখে নিয়ে পুনরায় জনকোলাহল-মুখরিত পথের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌ল। স্বামীর হৃদয়ের ভাষা যেন সেই মুহূর্ত্তেই সে পাঠ করে ফেল্‌ল। অন্তর তার দুলে উঠল।

বিকাশ অপর্ণার সুগোল বাহুখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবেগ-রুদ্ধ-কণ্ঠে বল্‌লে, "অপর্ণা, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই—তুমি বিশ্বাস করবে কি ?"

পুলকে অপর্ণার শরীর স্পন্দিত হ'ল। অস্ফুট-স্বরে সে বল্‌লে, "আপনার যা' বলবার আছে বলুন—আমি বিশ্বাস কর্‌ব।"

বিকাশ অপর্ণার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বল্‌লে, "বল্‌ছি। কিন্তু, তার পূর্ব্বে তুমি ওই 'আপনি'টা ছাড়ো ত। আমাকে 'তুমি' বলে ডাক্‌বে। 'আপনি' আমার ভালো লাগে না।"

অপর্ণার দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। সে বল্‌লে, "আপনি ত আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার দেন নি।"

বিকাশ অপর্ণাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে গাঢ়স্বরে বল্‌লে, "আমার এতদিনকার সব অপরাধ ক্ষমা কর অপর্ণা! দোষ আমি তোমার কাছে অনেকই করেছি—আজ সে সব মন থেকে মুছে ফেল। এই সুন্দর প্রভাত আমাদের উভয়েরই নিকট এক অজানা রাজ্যের সংবাদ এনে দিয়েছে—তার নাম ভালবাসা। আমি আমার অন্তরের যত কিছু গ্লানি, কালিমা, মলিনতা দূর করে দিয়ে নতুন করে জীবন-যাত্রা সুরু কর্‌ব। তুমি আমার স্ত্রী—আমার গৃহলক্ষ্মী—এই নবজীবন-যাত্রাপথে তুমি আমার হাত ধরে অগ্রবর্ত্তিনী হও অপর্ণা! আজ মনে কোন ক্ষোভ রেখো না। আজ সত্যই আমরা এতদিন পরে পরস্পরকে একান্তভাবে পেয়েছি।"

বিকাশের চোখের জল অপর্ণার মাথার ওপর ঝরে পড়ল। অপর্ণা মুখ তুলে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই তাদের পরস্পরের অধর এক হয়ে গেল।

শ্রীরাণী দেবী

মেয়ে-পাগল

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বুদোর সঙ্গে ভাব আমার অনেকদিনের। কিন্তু চার বছর আগে তার এতদূর পাগ্‌লামী প্রকাশ পায় নি, আজ যতটা পেয়েছে। আমি তাকে রোজই বলি, বুদো, ছাড় ও পথ, তা' না হ'লে কোন্‌দিন মারা যাবি। ওপথে তোর মিছে ঘোরা—কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছিস্‌?

সে শুনে হেসে বলে, আরে না ভাই, না। মানুষের একটা নেশা থাকে জানিস তো, আর সেই নেশাতেই সে জীবনটা কাটাতে চায়; যেমন তোদের সকলকার আছে চায়ের, বিড়ির, নস্যির। সেইরকম আমারো এটা হ'চ্চে নেশা; আর এটাকে নিয়েই আমার জীবন কাটাতে হবে।

আমি বল্‌ছি তোকে আর বেশীদিন বাঁচ্‌তে হবে না—তোর ওই নেশাতেই কোন্‌দিন তুই পটল তুল্‌বি।

সে বলে, পটল তো সকলেই তুল্‌বে দাদা। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলে, জীবনটা হচ্ছে সিগারেট, বুঝ্‌লি রে বাঁদর!

আমি রেগে গিয়ে বলি, তা' তো বুঝ্‌লুম, কিন্তু তোর ওই চেহারায় কোন্‌ মেয়ে তোকে ভালবাসবে তা' তুই বল্‌তে পারিস? তুই তো ঘুরে ঘুরে মারা যাচ্ছিস্‌।

সেও রেগে উঠে বলে, আমার চেহারাটা খারাপ না কি রে? তোর যেমন চোখ! বলেই বুক-পকেট থেকে একটা ছোট আরসী বার ক'রে নিজের মুখখানা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে একবার দেখে নেয়; তারপর নিজেই ব'লে ওঠে, ফাইন্‌!

আমি হেসে আর বাঁচি না! যে মুখে চোখ দুটো গেছে সেঁধিয়ে, নাকটা হয়ে উঠেছে বিশাল, গালগুলো গেছে চড়িয়ে, সে মুখেও সে সৌন্দর্য্য খুঁজে পায়! হায়, নিজের সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ! তারপর অনেক কথা হয়। নিজের কথাই সে একশোবার বলে যায়। আমার উপদেশ যে তার শোনা প্রয়োজন, তা' সে মানে না। তারপর তার যা' কাজ—অর্থাৎ, গ্রহণে ভলেণ্টিয়ারী করা, সার্ব্বজনীন দুর্গা এবং কালীপূজোয় মেয়েদের পথে দাঁড়ানো, ছাতে উঠে আরসী নিয়ে 'ফোকাস্‌' ঠিক করা, কোনো মেয়ের মাথায় ঘুঁড়ি ফেলা এবং তা'তে 'আমি তোমায় ভালবাসি' প্রভৃতি লেখা সহজভাবেই চল্‌তে থাকে। মারও যে কোনো জায়গায় খায় নি, তা' নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে সেটা তার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। সে ওটাকে দুঃখ বলে ভাবে না; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলে, ওটা হচ্ছে গৌরব।

সেদিন সকালবেলা বাইরের ঘরে বসে আছি, বুদো এসে হাজির।

আমি বল্লুম, কি রে, খবর কি?

বুদো একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বুক-পকেট থেকে আরসী আর চিরুণী বার ক'রে মাথাটা আঁচড়াতে আঁচ্‌ড়াতে বল্লে, ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে ভাই!

"কি কাণ্ড?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

বুদো বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—পরশুদিন ছাতে একজনকে ফুলশর মেরেছি। সে মাইরি খুব খুসী!···আর কাল্‌কে কি করেছি জানিস, 'ভিক্টোরিয়া বাসে' একখানা চিঠি ফেলেছি। এ গুলো তো গেল। হাতে মাইরি এখনো আটটা মেয়ে আছে। এগুলোকে নিয়ে কি করা যেতে পারে, তাই ভাব্‌ছি—তুই বল্‌ দিকি কি করি?

আমি বল্লুম, এই ভীষণ কাণ্ড! তা' আমি কি জানি। আমি তোর ও সব কথায় নেই—শেষে কি আমাকে ধ'রে ফাঁসাবে!

সে বল্লে, আচ্ছা হবে এখন, চল্লুম। ও কথা এখন

তোলা রইল, বুঝ্‌লি—বলে আরসী-চিরুণী পকেটে ফেলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লো।

আর একদিনের কথা। কলেজ ষ্ট্রীটে বিকেলবেলা একলা চলেছি। চক্রবর্ত্তী চাটুয্যের দোকানের সাম্‌নে দেখি ভীষণ ভীড়। আমিও দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। দেখি না একজন লুঙ্গিপরা ছোকরাকে আচ্ছা করে লোকে 'পেণ্ডাই' লাগাচ্ছে, আর একজন মেয়ে তাকে অজস্র গাল দিচ্ছে। মেয়েটি অবশ্য ফর্‌সা এবং ছাত্রী; কারণ, তার হাতের বই দেখেই তা' বুঝ্‌লুম।

লুঙ্গিপরা ছোকরাকে চেন্‌বার জন্য এগিয়ে গিয়ে যা' দেখলুম—তা'তে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম! এ যে আমাদের বুদো! পাশের একটী লোককে জিজ্ঞসা করলুম, ব্যাপার কি?

সে বল্লে, এই মুসলমান ছেলেটা ওই মেয়েটীকে আস্‌তে দেখেই শুকনো জায়গায় হঠাৎ পিছলে গিয়ে ওর গায়ের ওপর পড়ল—আর সে কি প্রেম নিবেদন মশায়! মেয়েটীকে গাল দিতে দেখেই তো আমরা একে জলপানি দিচ্ছি। মুসলমানদের সাহস দেখ্‌ছেন? এই রকম হিন্দু-ঘরের মেয়েদের ওপর রোজ এদের অত্যাচার চল্‌ছে মশায়, রোজ! আর এই দেখুন এটা পরচুল—ব'লে সে তার পাশের লোকের হাতের দিকে চেয়ে আমায় দেখিয়ে দিলে সেই পরচুলটা, যেটা বুদো পরে তার শিরশোভা বাড়িয়ে তুলেছিল।

আমার দুঃখ হ'ল, হাসিও পেলে। বুদোর বুদ্ধি তো কম নয়। কিন্তু বুদোকে বাঁচাতে হবে যে। কি করবো তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। হঠাৎ দেখি না পুলিস সার্জ্জেণ্ট এসে গেছে। আমি নিরাশ হলুম। বুদোকে তারা সব ধরে নিয়ে চল্লো।......

কাগজে দেখলুম, বুদোর জেল হয়ে গেছে। বড্ড দুঃখ হ'ল। ছোঁড়াটা নিজের দোষেই নিজে মর্‌লো। তা' না হলে ওই বুদ্ধিটা যদি অন্য কাজে লাগাতো, তা' হলে বোধ হয় সে উন্নতি কর্‌তে পারতো।...

দুটো বছর জলের মত কেটে গেল। হঠাৎ একদিন দেখি, বুদো আমার বাড়ী এসে হাজির। চেহারা আগেকার চেয়ে এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে। ছেলেটার প্রতি আমার বড্ড দয়া হলো। যদিও লোকে জানে সে একটা ঘৃণিত কাজ করে জেলে গেছে, কিন্তু আমি জানি সে তত অপরাধী নয়। ভাল বাস্‌তেই গেছল কিন্তু ঠিক স্থানে ভালবাসা দিতে পারে নি। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। বুদো এক মুখ হেসে 'তড়পাতে' লাগ্‌লো, এই জেলে সুবাস বোসকে দেখে এলুম মাইরি, সেনগুপ্তকেও দেখ্‌লুম, সব বসে আছে। আমি তো বাবা সুখে কাটিয়ে এলুম—কারো পরোয়া রাখি!

আমি বল্লুম, থাক্! তুই আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর—আর কখনো মেয়েদের পেছনে ঘুর্‌বি না। কি চেহারা হয়ে গেছে দেখ্‌ দিকি!...

"আরে যাঃ!"—বলে বুদো একবার লাফিয়ে উঠ্‌লো। সে যেন চেহারার তোয়াক্কাই রাখে না এই রকম ভাবটা দেখিয়ে দিলে।

তারপর বুদোকে চা-টা খাওয়ালুম। বুদো আবার কথা কইতে লাগ্‌লো—কিন্তু সেই মেয়েদেরি সম্বন্ধে। তারপর কলেজ ষ্ট্রীটে কি ঘটেছিল, সব আমাকে সত্যি করে বল্লে।

দু'-চারদিন পরের কথা।

একদিন সন্ধ্যের সময় বাইরে কে আমায় ডাক্‌লে। গিয়ে দেখলুম, একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চস্‌মা, মাথায় কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল, গায়ে এক অপরূপ পোষাক। খাঁটি বাঙালী বলা চলে না। আমি তাকে চিন্‌তে পার্‌লুম না। জিজ্ঞেস কর্‌লুম, কে? লোকটী একমুখ হেসে বল্লে, চিন্‌তে পাচ্ছ না বাবা, আমি যে বুদো!

আমি দেখে অবাক হ'য়ে গেলুম! বুদো! তার আবার চসমা হয়েছে, কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল হয়েছে, মুখখানা এমন ফরসা হয়েছে কোত্থেকে?

আমি বল্লুম, এ সব কি রে তোর মাথায়-টাতায়?

বুদো গ্যাসের কাছটায় গিয়ে আরসীখানা বার ক'রে

মুখখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে, মাথায় হচ্ছে পরচুলো, মুখে হচ্ছে পেণ্ট...কিন্তু যাই হোক্ কি রকম হয়েছে বল্ দিকি আমায় দেখ্‌তে ?

আমি উত্তর দিলাম না। বুদো বল্লে, চল্ মাইরি, এক জায়গায় যাই। একখানা 'বিউটি' তুই দেখবি। সে যা' তা' মেয়ে নয়, আই-এ পড়ে।

আমি রেগে উঠলুম। বল্লুম, তোর জেল খেটেও শিক্ষা হ'ল না বুদো! এখনো তুই সেই পথে আবার মরবার জন্যে ছুটেছিস ?

বুদো রেগে উঠলো। বল্‌লে, যা' যা', তোকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে না। না যাস্, না যাবি, আমি চল্লুম—ব'লে সে 'তোমার প্রেমে যে পড়েছে সেই তো পাগল' গানটা গাইতে গাইতে সোজা চল্‌তে লাগ্‌ল।

আমি আর থাক্‌তে পার্‌লুম না। ছোঁড়াটা কি করে দেখ্‌বার জন্যে জামাটা পরেই তার পেছন পেছন লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে লাগ্‌লুম।

বুদো চলেছে তো চলেইছে। সোজা তিলজলার দিকে। যেতে যেতে ডিহি শ্রীরামপুরের পথের মাঝে একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা বাগানওয়ালা বড় বাড়ী সাম্‌নে ছিল। তার পথের ধারের ঘরে একটী মেয়ে ব'সে পড়ছিল। সত্যই মেয়েটী সুন্দরী। তার দিকে বুদো ঘন ঘন দৃষ্টিপাত কর্‌তে লাগ্‌লো। তারপরই রাস্তার চারধারে চেয়ে একেবারে পাঁচিল টপকে বাগানে পড়্‌লো। রাস্তাটা তখন নির্জ্জন। তাই আমি ছাড়া কেউ দেখে নি। বুকটা আমার কেঁপে উঠলো একটা অজানা আশঙ্কায়। তারপর পনের মিনিট কোনো সাড়াশব্দ পেলুম না। তারপরই দেখলুম, মেয়েটী ভীষণ চীৎকার করে উঠেছে। বাড়ীর দরোয়ান মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়েছে। কর্ত্তা মোটা গলায় চীৎকার কচ্ছে, চোর চোর ব'লে। আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না—একেবারে বাড়ীর দিকে চোঁচা দৌড় !

কাগজে দেখ্‌লুম, চুরীর অপরাধে বুদোর চার মাস জেল হয়েছে। কিন্তু বুদো কি যে চুরী কর্‌তে গেছলো সে শুধু আমিই জানি।...

চার মাস কিন্তু এবারও কোথা দিয়ে কেটে গেল। কিন্তু তারপর অনেকদিনই আর বুদোর দেখা পাওয়া গেল না। হঠাৎ সেদিন শুনলুম একটা লোকের কাছে, বুদো মোটর চাপা পড়েছে। উপস্থিত মেডিকেল কলেজে আছে। আমি আর দেরী না করে তাকে দেখ্‌তে ছুট্‌লুম।

সেখানে গিয়ে দেখি, বুদো অজ্ঞান অবস্থায় প'ড়ে আছে বিছানার ওপর। তার ডান পাটা রয়েছে বাঁধা। ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লুম, বুদো প্রাণে মর্‌বে না, বেঁচে যাবে; কিন্তু ডান পা অর্দ্ধেকটা কাট্‌তে হবে। শুনে শিউরে উঠলুম !...

তারপর আর একদিন গেলুম। বুদো জেগে আছে। আমাকে ডেকে পাশে বসালে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কি ক'রে মোটর চাপা পড়লি ?

বুদো বলে যেতে লাগলো, আমি একটা মেয়ের জন্যে পাগল হয়েছিলুম মাইরি, জেল থেকে বেরিয়ে। তা', মেয়েটা খুব বড়লোকের মেয়ে। আমার দিকে ফিরেও চাইত না। ইটিলির দিকে একটা বড় বাড়ীতে থাক্‌তো। যখন কলেজ যেত, তখন মোটরে তাকে দেখতে পেতুম। আমি ভাবলুম, ওকে একদিন আমার বশে আন্‌বোই চেষ্টা ক'রে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছু হ'ল না ভাই ! কোথা থেকে এক বিলেত-ফেরৎ জুট্‌লো; সে তাকে ভাঙিয়ে নিলে—আর সেই আমায় রাত্তির বেলা একদিন মোটরে চাপা দিয়ে পালালো।

আমি বল্লুম, ওর নামে 'কেস্' কর্‌লে হয় না।

বুদো বল্লে, দূর! সাক্ষী কই ? তা' ছাড়া, ও বেটা বড়লোক।

আমি চুপ করে বসে রইলুম। বুদো আবার বল্‌লে, হ্যাঁ, একটা কথা ভাই। দেখ্, আর মেয়েদের পেছনে ঘুর্‌বো না; তার চেয়ে ভগবান বেটাকে ডেকে দেখ্‌বো। সে তো সুন্দরকেই শুধু ভালবাসে না, কালোকেও বাসে, কি বলিস্ ?

আমি তার মুখে ও কথা শুনে হাসি আর চাপ্‌তে পার্‌লুম না। বল্লুম, এত ধর্ম্মজ্ঞান কবে থেকে তোর হ'ল রে ?

বুদো বল্‌লে, না ভাই, মেয়েরা বড্ড নিষ্ঠুর, এতদিন তো ঘুরে দেখ্‌লুম।

আমি বল্লুম, তোর কথা বিশ্বাস হয় না।

বুদো বল্‌লে, দেখিস্।...

তারপর কতদিন কেটে গেছে। বুদো এখন কাঠের পা পরে চলে। ভগবানকে না কি একমনে খুব সে ডাক্‌ছে শুন্‌তে পাই। মেয়েদের ত্রিসীমানায় আর যায় না।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণ ভ্রমণ

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

পুরীধাম

সে আজ সাত বৎসরের কথা। যখন আমার পুত্ররত্ন রামগোপালকে হারাইয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে পুরী যাত্রা করিলাম। আমার পুরী যাত্রার তুইটি কারণ ছিল, একটী কারণ পুরুষোত্তমে গিয়া জগন্নাথ প্রভুর দর্শনে হৃদয়ের শোক তাপ অপনোদন করিব। দ্বিতীয় আমার স্বামী দেবতার শরীরের কিছু স্বাস্থ্যলাভ হইবে। তিনিও বৃদ্ধবয়সে পুত্র-শোকের তাড়নায় ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিলেন। হাবড়ায় ষ্টেসনে যখন উপস্থিত হইলাম তখন গাড়ী ছাড়িবার আধঘণ্টা দেরী ছিল, অগত্যা কিছুক্ষণ আমরা ওয়েটিংরুমে বসিয়া রহিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ীর ঘণ্টা বাজিল, আমরা পতিপত্নী বীণা ও কমলাকে লইয়া নয়নের জল মুছিয়া ট্রেণে উঠিলাম। আমার ছোট মেয়ে বীণা ও পৌত্রী কমলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গাড়ীতে বসিল ও বালিকা হৃদয়ের পুলক উচ্ছ্বাসে গান গাহিয়া করতালি দিয়া গাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিল। এদের তু'জনের বয়সই আট বছর। বীণা অপেক্ষা কমলা তিন মাসের বড়। ট্রেণ হাবড়া হইতে ছাড়িয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ছুটিল। মনের কষ্টে আমি পথের দৃশ্য কিছুই দেখিলাম না। ক্রমে দিনমণি পশ্চিম গগন আশ্রয় করিলেন। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। গোধূলি ললাটে তু' একটি করিয়া তারকা ফুটিল। শীতল সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর ক্ষীণ চন্দ্র একবার মাত্র দেখা গেল, তাহার পর নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিল। আমাদের নিদ্রা আসিল, কম্বল বালিশ লইয়া শয়ন করিলাম। মধ্যে মধ্যে ষ্টেসনের নাম কানে যাইতে ছিল, রাত্রি বারটার সময় গাড়ি কটক পৌছিল। ষ্টেসনটী বড়। বেশ জমকালো। অনেক খেলনা পুতুল রূপার গয়না বিক্রয় করিতে আসিল। পুরী মিঠাই সন্দেশ লইয়া হাঁকিতে লাগিল। আমি একবার ষ্টেসনটি দেখিয়া আবার শয়ন করিলাম। ক্রমে কাটজুড়ি মহানদী পার হইলাম, ভোর পাঁচটায় ট্রেণ পুরী ষ্টেসনে পৌছিল। তখন সবেমাত্র ভোরের আলো উঁকি ঝুঁকি দিতেছে। পূর্ব্বাকাশ অরুণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণ ধীরে বহিতেছে। আমাদের পাণ্ডার ছড়িদার গোপীনাথ আমাদের জন্য একখানি গাড়ি আনিয়া ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা মোটঘাট ঐ গাড়িতে তুলিয়া দিতে বলিয়া সকলে গাড়িতে উঠিলাম, কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ি স্বর্গদ্বারে কাশীপতি বাবুর বাটীর ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদের উভয়কে দেখিয়া পশুপতি ও কাশীপতি উভয় ভ্রাতার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা তুই ভ্রাতাই মুঙ্গেরে আমার স্বামীর নিকট অধ্যয়ন করিতেন, আমি তাঁহাদের পুত্রাধিক স্নেহ করিতাম। আমাদের শোক তুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত তুঃখিত হইলেন এবং অশেষ যত্ন সহকারে আমাদের আতিথ্য সৎকার করিলেন। তাঁহাদের বাসার নিকট হরিদাস মঠের সম্মুখেই আমাদের কুড়ি টাকা ভাড়ায় একটি বাসা স্থির করিয়া দিলেন। এই বাসাখানি সমুদ্রের উপর। গৃহের মধ্যে বসিয়াই সমুদ্রের গভীর কল্লোলে কর্ণ বধির হইত। প্রত্যহ পশুপতি ও কাশীপতি আসিয়া আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহারা তু'টী ভাই রৌটর জমিদার রামলাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। পুরীতে একটী বৃহৎ অট্টালিকা সমুদ্রতটে প্রস্তুত করিয়াছেন। তু'টী ভাই অতি উদার প্রকৃতি। সরল স্বভাব মিষ্টভাষী পরতুঃখকাতর ছিলেন। প্রত্যহ আমাদের জন্য ফলমূল মিষ্টান্ন তুগ্ধ পাঠাইতেন। ইহাদের সেবা যত্নে আমরা অনেকটা শান্তি পাইলাম। হরিদাস মঠে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম সংকীর্ত্তন হইত, হরিনাম শ্রবণে আমার কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত হইত। পরদিন প্রাতে আমরা সমুদ্র স্নানে গেলাম। কাশীপতি ও পশুপতি ও বধূমাতারা আমাদের সঙ্গে সমুদ্র স্নানে গেলেন। আমরা ভাবিলাম আমরা গঙ্গায় ও নদীতে যেরূপ স্নান করি এও সেইরূপ। কিন্তু সমুদ্রতটে আসিয়া দেখি অনন্ত উর্ম্মিমালাময় বিশাল সাগরবারিধি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে গর্জ্জন করিতেছে। অসীম সুনীল লহরীমালা আসিয়া তটভূমি চুম্বন করিতেছে। এই সাগর লহরী দর্শনে হৃদয় মধ্যে একটি অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। এই বিশাল অম্বুরাশি দর্শনে মনে হইল বিশ্বের বিরাট্ পুরুষ বুঝি সাগর রূপেই আমাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। সমুদ্রে নামিয়া আমরা স্নান করিতে সমর্থ হইলাম না। যতবারই স্নান করিতে চেষ্টা করি, তুরন্ত উর্ম্মিরাশি তুরন্ত বালকের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমাদের উলটাইয়া পালটাইয়া ফেলিয়া দেয়। আমরা নাকানি চোবানি খাইয়া বালি মাখিয়া কোন প্রকারে স্নান সারিলাম। কিন্তু যাঁহারা সমুদ্র স্নানে অভ্যস্ত তাঁহারা অতি সহজে ঢেউগুলির উপর লাফাইয়া লাফাইয়া

সুন্দরভাবে স্নান করেন। আমার ছোট মেয়ে বীণা দু' চারদিন সমুদ্র স্নান করিয়া এমন সুন্দররূপে স্নান করিত, আমরা সেরূপ পারিতাম না। স্নানান্তে আমরা জগন্নাথ প্রভুর দর্শনে চলিলাম। শ্রীমন্দির দর্শনে যাইতে একটী প্রশস্ত পাকা রাস্তা বরাবর গিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেকগুলি মঠ আছে, যথা বিদুর মঠ, ছাতা মঠ, জগন্নাথ মঠ, কুবের মঠ, রাধাকান্ত মঠ ইত্যাদি। এখানকার দেবমন্দির মাত্রেই মঠ বলিয়া পরিচিত। মন্দিরে যাইতে পথের দুইপাশে কাণা খোঁড়া কুষ্ঠরোগী অন্ধ আতুর ভিক্ষার্থী অনেক আছে। ইহাদিগকে সাধ্যমত কিছু কিছু দান করিয়া আমরা শ্রীমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পূর্ব্বমুখী সিংহদ্বার, দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহমূর্ত্তি। সিংহদ্বারের সম্মুখেই অরুণ স্তম্ভ। শুনিলাম অরুণ স্তম্ভের এই প্রস্তরখানি কোনারক হইতে আনীত। এই স্তম্ভটী উচ্চে পঁচিশ ফিট হইবে, সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে জয় বিজয় মূর্ত্তি দ্বাররক্ষক স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। তৎপরে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। তাহার দ্বিতীয় সোপানাবলী পার হইয়া শ্রীমন্দির দ্বারে উপস্থিত হওয়া গেল। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম শ্রীমন্দিরের উচ্চতা অনুমান একশ' পঁচিশ ফিট। শ্রীমন্দিরের চূড়াটি ধ্বজচক্রচিহ্ন সুশোভিত, তিন ক্রোশ হইতে শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা বাঁধিয়া দিতে যাত্রীরা বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। জগন্নাথ প্রভুর মন্দিরটি কুড়ি বাইশ হাত উচ্চ। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দ্বার, প্রথম সিংহদ্বার, দ্বিতীয় হস্তিদ্বার, তৃতীয় হনুমানদ্বার, চতুর্থ অশ্বদ্বার। সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণদিকে পতিতপাবন ও বামদিকে বিশ্বেশ্বর বৃষভসহ অবস্থিত আছেন। মূল মন্দিরের সম্মুখ-ভাগে জগমোহন বা নাটমন্দির। এইস্থান হইতেই যাত্রীরা জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া থাকে; এই দর্শনকে ঝাঁকি-দর্শন বলে। শ্রীমন্দিরের বামদিকে পাকশাল। সম্মুখে ভোগ মণ্ডপ। দক্ষিণ দিকে আনন্দ বাজার। আমরা শ্রীমন্দিরে গিয়া নাটমন্দিরে বসিয়া রামায়ত সাধুগণের ভজন কীর্ত্তন শুনিয়া বড়ই আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তৎপরে প্রভুর স্নান পূজা আরতি ভোগ একে একে সমস্ত দর্শন করিয়া, বেলা বারটার সময় মণিকুট্টিমে গিয়া রত্নবেদীর উপর পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলাম। প্রভুকে রত্নবেদীতে দর্শন করিতে গদীতে চারটী টাকা জমা দিতে হয়। আমরা চারটী টাকা জমা দিয়া মণিমন্দিরে শ্রীভগবানকে পূজা করিলাম। মন্দিরটী ঘন অন্ধকার। মন্দির মধ্যে একটী ঘৃতদীপ জ্বলিতেছে। তাহারি ক্ষীণ আলোকে কয়েকটি প্রস্তর সোপান অতিক্রমে দেখিলাম প্রভুর অপূর্ব্ব মহিমময় মূর্ত্তি। এই রত্নবেদী লক্ষ শালগ্রাম শিলার উপর স্থাপিত। রত্নবেদীর উপরে জগন্নাথ বলরাম ও মধ্যে সুভদ্রা সুদর্শন-চক্রসহ অবস্থান করিতেছেন। মৃদু স্নিগ্ধ আলোকে মূর্ত্তিত্রয় বেশ দেখা যাইতেছে। শ্রীমন্দির আতর চন্দন ও পুষ্পগন্ধে সুরভিত। জগন্নাথদেবের ললাটোপরি একখানি মণি জ্বলিতেছে। পাণ্ডা বলিলেন এই রত্নবেদী লক্ষ শালগ্রাম-শিলার উপর স্থাপিত। রত্নবেদীর উপরে শ্রীজগন্নাথদেব ও বলভদ্রদেব সুভদ্রা ও লক্ষ্মীদেবীও সুদর্শনচক্রসহ অবস্থিত আছেন। মন্দির মধ্যে দীপ জ্বলিতেছে। মৃদু স্নিগ্ধ আলোকে মূর্ত্তিত্রয় বেশ দেখা যাইতেছে। মন্দিরটি অগুরু-চন্দন পুষ্পগন্ধে সুরভিত। প্রভুর এই অপূর্ব্ব মূরতি দর্শনে নয়ন জুড়াইয়া গেল।

নাটমন্দিরের সম্মুখভাগে গরুড় স্তম্ভ। ঐ স্তম্ভের উপর গরুড় মূর্ত্তি। এবং মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে অনন্ত শয্যায় নারায়ণ মূর্ত্তি। আরও অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে, ভিত্তিগাত্রে একস্থানে চৈতন্যপ্রভুর ষড়ভুজ-মূর্ত্তি আছে, প্রবাদ আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রতিদিন এই গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে সন্দর্শন করিতেন—নয়নের জলে গরুড় স্তম্ভের মূলটী ধৌত হইত। তাঁহার অশ্রুধারায় এইস্থান প্লাবিত হইত। বেলা অধিক দেখিয়া আমরা মহাপ্রসাদ কিনিয়া মুটের মাথায় প্রসাদ চাপাইয়া তাহার সহিত বাসায় আসিলাম ও পরমানন্দে সকলে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

বৈকালে আমরা সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া সুনীল বারিধির তরঙ্গ উল্লাস দর্শন করিলাম। বীণা ও কমলা রাশি রাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুক্তি কুড়াইয়া আনিত। তাহার মধ্যে কত বর্ণ কত সৌন্দর্য্য! কত চিত্র বিচিত্র কারিগরী! সন্ধ্যার সময় সুনীল সমুদ্রজলে যেন কত শত হীরকখণ্ড জ্বলিয়া উঠিত। কি অপরূপ শোভা! কি মনোমুগ্ধকর ছবি! সন্ধ্যার পরেই আবার বাসায় ফিরিয়া আহার্য্যাদি প্রস্তুত করিলাম; ও রাত্রে বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা গেলাম। প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি করিয়াই শ্রীমন্দিরে যাইতাম। মন্দিরটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য মন্দির পরিভ্রমণ করিলাম। মন্দিরের ভিতরে চতুষ্পার্শ্বে বহু দেবদেবী আছে। শ্রীমন্দিরের এককোণে বিমলা-দেবীর মন্দির। বিমলাদেবী পাষাণময়ী মূর্ত্তি। ইনি বাহান্ন পীঠের মধ্যে একতম। কথিত আছে দক্ষযজ্ঞ অবসানে সতীদেহ যখন ছিন্ন হইয়া পতিত হয়, তখন দেবীর নাভি এইস্থানে পতিত হওয়ায় বিমলা পীঠ হইয়াছে। শ্রীক্ষেত্রে দেবী বিমলা ও ভৈরব ক্ষেত্রপাল। বিমলা মন্দিরেও শ্রীমন্দিরের মত সম্মুখে নাট-মন্দির আছে। অন্যদিকে একদিকে একটি সুন্দর মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত

লক্ষ্মীদেবীর মন্দির ধান্যশীর্ষ গুচ্ছে সুশোভিত। এখানে বিবিধ দেবদেবী ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত আছে। তাহার পর সত্যভামার মন্দির ও একটী ছোট মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি আছে। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে অক্ষয় বট আছেন। কথিত আছে সন্তান কামনায় এই বটমূলে বসিলে নিশ্চয়ই সন্তান লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমভাগে সক্তি মণ্ডল আছে। এখানে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। পশ্চিমদ্বারের দিকে একটী ছোট মন্দির মধ্যে মদনমোহন আছেন। তাহার সন্নিকটে রোহিণীকুণ্ড বা কাক চতুর্ভুজ আছেন। উঠানের একদিকে রঘুনাথের মন্দির ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণপদ্ম একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে আছে। এই পুরুষোত্তম তীর্থে প্রত্যহ শত শত বাঙ্গালী, মারহাট্টি, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, দক্ষিণী প্রভৃতি যাত্রীগণ দলে দলে আসিয়া জগন্নাথ প্রভুকে দর্শনার্থে আসিয়া "জয় জগদীশ" "জয় জগন্নাথ" শব্দে শ্রীমন্দির নিরন্তর মুখরিত করিতেছে। জগন্নাথ প্রভুর মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয় প্রেমে আপ্লুত হইয়া উঠে। এখানে প্রভুর সাতবার আরতি হইয়া থাকে। সমস্ত দিনের মধ্যে জগন্নাথদেবের বাহান্ন ভোগ হইয়া থাকে। বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সুপকারগণ প্রভুর অন্নব্যঞ্জন ভারে ভারে লইয়া ভোগমণ্ডপে যাইতেছে, ইঁহারা শবর জাতীয়। চিরদিনই ইঁহারাই প্রভুর ভোগ রাঁধিতেছেন; ইঁহাদের হস্ত ব্যতীত প্রভু অন্য কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। সুপকারগণ বস্ত্রখণ্ডে মুখ বাঁধিয়া প্রভুর পাক করে ও বহন করে। দশটার পরই বলরাম প্রভুর খেচরান্ন বা ঘৃতান্ন ভোগ হইয়া থাকে। তাহার পর সমস্ত দিন প্রভুর অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পরমান্ন ভোগ হইয়া থাকে, ভোগের পর ঐ সকল অন্নব্যঞ্জন আনন্দ বাজারে বিক্রয় হয়। এস্থানে মহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব মহিমা। সকল যাত্রী অসঙ্কোচে পরস্পরের মুখে মহাপ্রসাদ দিতেছে। এখানে ভেদের ধর্ম্ম নাই। জাতি বৈষম্য নাই। বর্ণ বৈষম্য নাই। এ প্রেমের ধাম। প্রেমের ঠাকুর পুরুষ ও মেয়েকে দর্শন কর আর জয় জগন্নাথ বলিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ কর। সেই দেবদুর্লভ মহাপ্রসাদ দেবতারা আকাঙ্ক্ষা করেন। আমি প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীমন্দিরে যাইতাম, প্রভুর দ্বারা ব্রহ্মমূর্ত্তি করিয়া শরীর কণ্টকিত হইত। নয়নে জল আসিত, আমরা দর্শন স্পর্শনে অনেকটা হৃদয়ে শান্তি পাইলাম। হৃদয়ের শোক মোহ কতকটা দূর হইল। শ্রীমন্দিরের নিকটেই লক্ষ্মী বাজার, এখানে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। তবে সমস্তই দুর্মূল্য, এখানে তরিতরকারী সমস্তই মহার্ঘ্য। মান্দ্রাজ হইতে আম্র ও কদলী প্রচুর আসে, কিন্তু বড় দর। এখানে বিস্তর নারিকেল, বৃক্ষগুলি ফলভারাবনত হইয়া আছে। কিন্তু এক একটী ডাব বা নারিকেল ছয় পয়সার কমে দেয় না। এখানে উপবাস করিয়া প্রভুর পূজা করিতে হয় না। পাণ্ডাগণ প্রাতেই পাণ গুয়া খাইয়া ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া শ্রীমন্দিরে আসেন। উড়িষ্যা-বাসীগণ সকলেই পাণ-গুয়ার অতিমাত্রায় ভক্ত। সন্ধ্যার পর রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত শ্রীমন্দির খোলা থাকে। ইহার পর তিনবার আরতি হয় ও ভোগ হয়। রাত্রি বারটার সময় প্রধান পাণ্ডা আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া শীলমোহর করিয়া রাখিয়া যায়। কেন না প্রভুর শ্রীঅঙ্গে বহু রত্নাভরণ ও স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসাদি আছে। তাঁহার ললাটে একটি নীলমণি আছে। এই নীলগিরিতে প্রভু নীলমাধব মূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন।

আমরা প্রতিদিনই এক একটী মঠ দেখিতে যাইতাম। পুরীধামের স্বর্গদ্বারের নিকটেই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গোবর্দ্ধন মঠ। এই মঠটি বেশ বড়। মঠের ভিতর মন্দির অভ্যন্তরে মর্ম্মর বেদিকার উপর শঙ্করাচার্য্যের শ্বেত মর্ম্মরের সুন্দর মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী অতি প্রশান্ত। এই মঠের বর্ত্তমান স্বামীজি যিনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহার নাম মধুসূদন তীর্থস্বামী। তিনি মহাপণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী, সৌম্যমূর্ত্তি প্রশান্তবদন, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার গম্ভীরাকৃতি প্রফুল্ল বদন আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। আমরা প্রায়ই শঙ্কর মঠে যাইতাম। এখানে নেপালী বাবা ছিলেন। তাঁহার সরল উদার বালকের ন্যায় মুখমণ্ডল দেখিলে বড়ই আনন্দ হইত। আমি প্রায় তাঁহার নিকট বসিয়া তত্ত্বকথা শুনিতাম। তাঁহার মধুর কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইতাম। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "মায়ী ভজন কর। একরোজ ভগবানজী মিলেগী।" তাঁহার প্রদীপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, তেজঃপুঞ্জকান্তি ও মধুর কথাগুলি বড়ই ভাল লাগিত। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন মায়ী! ভগবদ্ দর্শনে জীবকো সব সংশয় মিটযায়গি।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্ব পাপানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরবরে।

তাঁহার এই শ্লোকটি আমি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। শুনিলাম এই নেপালী বাবা না কি নেপালের উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন; জানি না কি কারণে বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক শেষ জীবন এইস্থানে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার নিকট আমার কন্যা বীণা বেদান্ত স্তবগুলি বলিত; তিনি অতি পুলকিত হইয়া বলিতেন "বাচ্চা তেরা ভক্তি পূরা হায়।" স্বর্গদ্বারের আধমাইল দূরে টোটা গোপীনাথ মঠ। এই বিগ্রহ মূর্ত্তি বড় সুন্দর। শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যপ্রভু অনেক সময় এই নির্জ্জন নিভৃত সমুদ্র পুলিনস্থ

টোটাতেই বসিয়া সাধন ভজন করিতেন। টোটা তাঁহার প্রিয় স্থান ছিল। এই সমুদ্র সৈকতভূমি বড় শান্তিময় স্থান। সাগর বারিধির কল্লোলে অহরহ কর্ণ বধির হইত। সেই অনন্ত নীলাম্বুরাশি দেখিতে দেখিতে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মহারা হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। তরুণ অরুণ কিরণে যখন দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তখন আমি ধীরে ধীরে বাসায় আসিতাম ও সমুদ্র স্নান সমাপন করিয়া বীণা ও বামনকে লইয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিতাম। প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া বড়ই শান্তি পাইতাম। সমুদ্রতটে বসিয়া কোন কোনদিন মৎস্য-জীবীদিগের মৎস্য ধরা দেখিতাম। সুমন্দ শীতল মলয়ানিলে দেহ মন জুড়াইত। দেখিতাম সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে ঐ সকল ধীবরগণ প্রত্যহ এক একখানি বৃহৎ কাষ্ঠ বা ভেলা লইয়া কেমন অদম্য উৎসাহে মৎস্য ধরিতেছে। সে দৃশ্য বড় মনোহর। তাহারা এই উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠিতেছে, ডুবিতেছে, কতবার তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়াও আবার উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। প্রাতে শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া দেখিতাম রামায়ৎ সাধুগণ ভজন করিতেছেন। ভজন শেষ হইলে স্নান পূজা আরতি দর্শন করিয়া দশটার মধ্যে মহাপ্রসাদ লইয়া বাসায় ফিরিতাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম জগন্নাথ প্রভুর নব কলেবর হইবে। এই উপলক্ষে চারিধারের সাধু সন্ন্যাসীগণ দলে দলে আসিয়া পুরীধামে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই পুরুষোত্তম ধামে প্রেমের ঠাকুর জগন্নাথদেব পরব্রহ্মরূপে বিরাজিত। এখানে আনন্দের হাট, আনন্দের বাজার, এখানে জাতিভেদে জলাঞ্জলি দিয়া সকলেই পরস্পরকে অন্ন বিতরণ করিতেছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দিনচর্য্যা-রচয়িতা আমার স্নেহভাজন পুত্র-প্রতিম ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল পুরীতে ছিলেন। প্রতিদিন বৈকালে সাধুমার স্বর্গদ্বারের 'প্রিয়ধাম' নামক আবাসে বসিয়া আমাদের গীতা শ্রবণ করাইতেন। আমরাও প্রত্যহ সাধুমার বাটীতে যাইতাম। সন্ধ্যার পরই ভজন কীর্ত্তন হইত। আমার ছোট মেয়ে বীণা খুব ভাল গান করিতে পারে, সেও রোজ সাধুমার সহিত গানে যোগ দিত; কোন কোনদিন সাধুমা ও আমরা সাগর পুলিনে গিয়া গল্প করিতাম। মনে হইত সেই বিশাল সাগর যেন উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। ফেনিল ধবল উর্ম্মিমালা একটির পর আর একটি আসিয়া তটভূমি সিক্ত করিতেছে। তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে মহোর্ম্মি যেন উচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ভৈরবগর্জ্জন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে গোধূলী ললাটে দু'একটি করিয়া তারকা ফুটিত—তাহা চাহিয়া দেখিতাম। আমাদের উপর অনন্ত আকাশ আর সম্মুখে অসীম সাগর, সমুদ্র তীরে এক প্রকার জীব আছে যারা সন্ধ্যা হইলে জোনাকীর মত জ্বলিয়া থাকে। সাগর কূলের এমন সুন্দর স্থান, এমন নীলাম্বুরাশির মনোহারিণী শোভা আর কোথাও দেখি নাই। আমার ভক্ত সন্তান নিজে মরণের পথে গিয়া আমাদের অমৃতের পথ দেখাইয়া দিয়া গেল। প্রিয়ধাম নিবাসিনী সাধুমা আমাদের অতিশয় স্নেহ করিতেন, আমি অনেক সময় তাঁহার নিকট কাটাইতাম। এবার নব কলেবর হইবে। প্রভুর এই নব কলেবর দর্শন উপলক্ষে বহু সাধু সন্ন্যাসী আগমন করিতেছে। শুনিতেছি চারিধামের সাধু একত্র হইবেন, প্রত্যহই শত শত সাধু বৈষ্ণবগণ সাগর তটভূমিতে আশ্রয় লইতেছেন। তাঁহাদের কেমন শান্ত সৌম্য গম্ভীর মূর্ত্তি। এইরূপ সহস্র সহস্র সাধুমণ্ডলী যখন পুরীতে আসিলেন পুরীধাম তখন বৈকুণ্ঠপুরীর ন্যায় শোভমান হইয়া উঠিল। আমি একত্র এত সাধু কখন দেখি নাই। পুরী ষ্টেসন হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত পথের দুই পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ ছাতার মধ্যে সাধুরা, দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া ইহাদের আস্তানা পড়িয়াছে। আমি প্রাতে উঠিয়া সাধু দর্শনে যাইতাম। পুরীর সকল মঠগুলি সাধুবৃন্দতে পূর্ণ হইয়াছে। নব কলেবর দর্শনে এবার পৃথিবীর যাত্রী আসিতেছে। যাত্রীরা পাছে পানীয় জলের কষ্ট পায় এজন্য সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্বর্গদ্বার হইতে ষ্টেসন পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে জলের পাইপ বসাইয়া দিয়াছেন। আগামী কল্য রথযাত্রায় প্রভুর নব কলেবর দর্শন হইবে। রাস্তার দুই পার্শ্বের দোকান ও দোকানের ছাদ সমস্ত ভাড়া হইয়া গেছে। আমরা একটি দোকানে বসিয়া দেখিব বলিয়া তিন টাকায় তিনখানি টিকিট কিনিলাম। এমন ভীষণ জনতা স্রোত রাস্তার উপর চলিয়াছে যে, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই মানুষের মাথা দেখা যাইতেছে। এমন জনতা কখন দেখি নাই, রাস্তার দুই ধারে পঞ্চাশ হাজার লোক দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটির সর্দ্দি গরমী হইল; এক একজন জনতায় নিষ্পেষিত হইয়া মরিল। কাহারও সাধ্য নাই একপদ অগ্রসর হইবে। জনতার মধ্যে মধ্যে ঘোড়ায় করিয়া পুলিশ পাহারা দিতেছে, বেলা এক প্রহর হইল তখন জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ধূম আরম্ভ হইল। শঙ্খ ঘণ্টা তুরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু এবার নব কলেবর বলিয়া অতিরিক্ত যাত্রী হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

* 'ব্রহ্মবিদ্যা', পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয়, চতুর্থ সংখ্যা, আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল।

ক্ষুধা

শ্রীবিমল সেন

বম্বে।

কিঙস্ সারকেল অবধি গিয়া, সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া শরৎ গৃহে ফিরিতেছিল। চওড়া রাস্তা। সহরের বাহিরে—এ অঞ্চলে এখনও বেশী বাড়ী-ঘর তৈরী হয় নাই। সমুদ্রের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়াতে শরীর জুড়াইয়া যায়।

শরৎ আপন-মনে সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; দেখিতে পাইল, সামনের রাস্তার চৌমাথায় অনেক লোকের ভীড়। মোড়ের উপর একটা রেঁস্তোরা আছে। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লোকেরা হিহি করিয়া হাসিতেছে। ভীড়ের ভিতর হইতে একজনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরও শোনা গেল।

বড় সহরে একটু কিছু হইলেই রাস্তায় ভীড় জমিতে দেরী হয় না। শরৎ ভীড় বাঁচাইয়া যাইতেছিল, এমনি সময় সেই জনতার ভিতর হইতে কে যেন বাঙলায় বলিল—ছেড়ে দাও না বাবা, আর কত রসিকতা করবে?

সঙ্গে আবার সেই কর্কশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের গর্জ্জন, দুমদাম প্রহারের শব্দ এবং আশপাশের লোকেদের হিঃহিঃহিঃ...

জনতা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরৎ যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইবারই কথা।

বাঙালীই বটে। মদের নেশায় একবারে বেসামাল। গায়ে পুরাতন একটা কোট। পরণে, ছেঁড়া না হইলেও অত্যন্ত অপরিষ্কার ধুতি। বয়স অনুমান করা কঠিন। পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হইবে।

দুইজন লম্বা চওড়া ইরাণী—সম্ভবতঃ ঐ রেঁস্তরারই কর্ম্মচারী—লোকটির দুই বাহু ধরিয়া সোজা করিয়া রাখিয়াছে। আর একটা ইরাণী লোকটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রাব্য গালাগালি দিয়া যাইতেছে। তাহার এক হাতে তিনটা কেক্। অন্য হাতে বাঙালী লোকটির কোটের পকেট হইতে আর একটা কেক্ বাহির করিয়া সে আবার বিরাশী শিক্কা ওজনের এক ঘুসি তাহার পিঠে বসাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীটি নিতান্ত গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল—আহা, অত জোরে কেন? সইয়ে সইয়ে যত খুসি মেরে যাও না বাবা—কে বারণ করছে?

সামনের ইরাণী এইবার যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে যে, এইবার লোকটাকে থানায় লইয়া যাওয়া হউক।

ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া লইতে শরতের দেরী হইল না।

লোকটা মাতাল...দুশ্চরিত্র...হয় ত বা ভাগ্যহীন। চেহারা দেখিয়া অবশ্য দয়া আসে না। তবু, চোখের উপর একজন বাঙালীর এ অপমান শরৎ সহিতে পারিল না। ইরাণীর কাছে গিয়া হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে? ওকে মারছ কেন?

ইরাণী জানাইল যে, লোকটা চোর। রেঁস্তরায় আসিয়া চা-বিস্কুট প্রভৃতি খাইয়া, দুই পকেটে কেক্ বোঝাই করিয়া সরিয়া পড়িতেছিল। ভাগ্যে একজন ধরিয়া ফেলিয়াছে, নাহিলে আজ তাহার প্রায় এক টাকার লোকসান হইয়া যাইত।

শরৎ পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া ইরাণীর কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—এই নাও। এতে আশা করি, তোমার লোকসান আর কিছু থাকবে না। ওকে ছেড়ে দাও।

তারপর, মাতালটার হাত ধরিয়া বাঙলায় বলিল—এস, বেরিয়ে এস আমার সঙ্গে।

বাঙলা কথা শুনিয়া লোকটা অনেক চেষ্টা করিয়া মাথা তুলিয়া ঘোর রক্তবর্ণ চোখের পাতা টানিয়া টানিয়া শরতের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। শেষে একটা শুষ্ক

হাসি হাসিয়া বলিল—তুমি বাঙালী? তাই ত বলি!… তা' দেখ ভায়া, বৌটাকে কোনদিন কিছু খেতে দিতে পারি না। উপোস করে কাটায় প্রায়ই। তাই, আজ দুটো কেক্ কিনে নিয়ে যাচ্ছিলুম। হুঁ, বলে কি না যোগ্যতা নেই কিছু! আরে মোলো, খেতে পাস না, তা' আমাকে জানতে দিয়েছিস কখনও? তা' ত বলবে না—পাছে রাগ করি। হা রে মুখ্যু, নিজের পেট আগে, তারপর স্বামী, তা' জানিস?

বলিয়া শরৎকেই যেন এ প্রশ্ন করিয়া সে তাহার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। তা' এই ছুঁচো ব্যাটারা বলে কি না পয়সা দিই নি।—এতবড় 'ইনসল্ট' আমাকে করলে মশাই! …এই হোটেলওলা, তোম্ কেৎনা টাকা মাঙতা হায়? আমাকে কি ভেবেছ? পয়সা নেই?

বলিয়া বীরবিক্রমে ডানদিকের পকেটে হাত প্রবেশ করাইয়া দিতেই ছেঁড়া পকেটের ভিতর হইতে হাত বাহির হইয়া পড়িল। সেই দিকে একবার দেখিয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—মণি ব্যাগঠো হারায় গিয়া দেখছি।…আচ্ছা, তোম্ তিন ডজন কেক্ ভেজো…আভি ভেজো—চোদ্দ নম্বর ঘাস্‌লেটওয়ালা বিল্ডিং, প্যারেল ভিলেজ। হরিশ মুখুয্যে হামারা নাম হায়—সবাই চেনে বাবা।

প্যারেল ভিলেজ সেস্থান হইতে দুই মাইল দূরে।

শরৎ তাহার হাত ধরিয়া একটু টানিয়া বলিল—আচ্ছা, এখন চলো, বাড়ী যাওয়া যাক।

অদূরে একটা ফিটন্ দাঁড়াইয়াছিল। গাড়োয়ানকে ডাকিয়া ধরাধরি করিয়া শরৎ, মুখুয্যেকে বসাইয়া দিল। তারপর রেঁস্তরা হইতে কিছু কেক্ এবং বিস্কুট কিনিয়া আনিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—চলো, প্যারেল ভিলেজ।

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর হঠাৎ শরৎ চাহিয়া দেখিল মুখুয্যের দুই গাল বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—ও কি, আবার কান্না কেন?

এ কথার জবাব না দিয়া শরতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখুয্যে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—কেঁদেছি, না? কথাটা বৌকে গিয়ে একবার বলো ত ভায়া। বলে কি না আমি ওর জন্যে কেয়ারই করি না।…কেয়ারই যদি না করি ত, এ চোখের জল এল কোত্থেকে শুনি?

…একটু থামিয়া বলিল—কিন্তু বেশী বোকো না ভাই…আহা ভারি ভাল মানুষ—লক্ষ্মীর মত বৌ। খেতে দিতে পারি না; তবু মুখ ফুটে কখনও কিছু বলে না।

শরতের মন বিষাদে ভরিয়া উঠিতেছিল। হায় বঙ্গ-জননী, এই দূর প্রবাসে তোমার হতভাগ্য দু'টি ছেলে-মেয়ের এ কী দারুণ দুর্গতি!

তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—একটি অপরিসর ঘরের মেঝেতে ছিন্ন মলিন বস্ত্রে, অনশনে অর্দ্ধমৃত মুখুয্যের বৌ পড়িয়া পড়িয়া হয় ত ভাবিতেছে—কোথায় কোন্ দেশে সে জন্মিয়াছিল…আর আজ কোথায়, কি অবস্থায় ভাসিয়া চলিয়াছে!…হয় ত সে দিন গোণে।

প্যারেল ভিলেজে বহু অনুসন্ধানের পর ঘাসলেটওয়ালা বিল্‌ডিং-এর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। পুরাতন চারিতলা বাড়ী। লাইট নাই। সারি সারি পায়রার খোপের মত ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়াই বোঝা যায় যে, এখানে দরিদ্র গৃহস্থদের বাস।

মুখুয্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একজন লোকের সাহায্য ব্যতীত উহাকে এখন উপরে তোলা অসম্ভব। তাই সে গাড়োয়ানকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। সাম্‌নেই সিঁড়ির কাছে কাহাদের ছেলে কখন যে একটা নোংরা কাজ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এখনও তেমনি রহিয়াছে। একটা ঘরের সাম্‌নে দুইটি মারাঠি মেয়ে বসিয়া বিড়ি তৈয়ারী করিতেছে। আর একটি মেয়ে হাঁটুর উপর জোরে মালকোঁচা আঁটিয়া বালতীতে জল লইয়া শরৎকে প্রায় ধাক্কা মারিয়া চলিয়া গেল।

এক ঘরে কাহারা বিষম ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছে।

'বম্বে ডাক্'-এর বিশ্রী বোটকা গন্ধে শরতের মাথা ধরিয়া উঠিল।

চোদ্দ নম্বর ঘর তিনতলায়—কোণের দিকে। কড়া নাড়িতে ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না; কিন্তু হাতের আঘাতে দরজাটা একটু খুলিয়া গেল। শরৎ দেখিল, ছোট একটি ঘর, জিনিষ পত্রে বোঝাই। এক-দিকে একটা হ্যারিকেন মৃদুভাবে জ্বলিতেছে।

এমনি সময় পাশের ঘর হইতে একটি লোক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা স্বাভাবিক নহে। নেশায় পা দুইটা টলিতেছিল। তাহার ঠিক পিছনে বাহিরে আসিল একটি মেয়ে। বাহিরে আসিয়া শরতকে দেখিতে পাইয়া দুই-একটি কথা বলিয়াই সেই মাতাল লোকটাকে বিদায় করিয়া দিল। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে আবার নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

ওই মেয়েটি যে কোন্ জাতীয়া তাহা বুঝিতে শরতের একটুও বিলম্ব হইল না। ইহারা প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ করে। সারাদিন বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া তাহাদের হীন ব্যবসা চালায়। অথচ, ইহাদের ঘরের পাশের ঘরেই হয়ত ভদ্রলোকের বাস—স্ত্রী-পুত্র লইয়া তাহারা নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে।

এখানে বহু বাড়ীতে এই ব্যাপার। আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু অনতিবিলম্বে সেই ঘর হইতে আর একটি মেয়ে বাহিরে আসিল। তরুণী, পরণে গাঢ় লাল রঙের সাড়ী। মাথায় কাপড় নাই। কোঁকড়া চুলের মস্ত বড় খোঁপায় সাড়ীর মতই চারিটা লাল গোলাপ ফুল। ঠোঁট দু'টি টুকটুক করিতেছে। অত্যন্ত সুশ্রী চেহারা।

বাহিরে আসিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শরতের আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া, আঁচলটা খোঁপার উপর তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কাকে চান?

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া শরৎ বলিল- হরিশ মুখুয্যে এই ঘরে থাকেন?

তরুণী জিজ্ঞাসা করিল—কেন বলুন ত?

—তাঁকে নিয়ে এসেছি। একেবারে সংজ্ঞাহীন অবস্থা। নীচে গাড়ীতে আছেন। তাঁর স্ত্রী কোথায়? আর একজন কারুর সাহায্য না পেলে...

এইটুকু শুনিয়াই তরুণীটি সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—এসে পড়েছেন? আপনি দেখতে পেয়ে নিয়ে এলেন বুঝি?...আচ্ছা, একটু সবুর করুন। এখন নীচে যাবেন না, আমি এক্ষুনি আসছি।

বলিয়া ক্ষিপ্রপদে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। যাইবার সময়ে জানাইয়া গেল যে, সেই মুখুয্যের স্ত্রী।

শরৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই কি উপোস করিয়া কাটাইবার মত চেহারা? যে পাশের ওই জঘন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল সেই কি মুখুয্যের 'লক্ষ্মীর মত বৌ?'

অনতিবিলম্বে তরুণীটি যখন আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার সাজ-পোসাকের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দামী সাড়ীর বদলে নোংরা কালোপেড়ে সাড়ী পরিয়াছে। মাথায় গোলাপ ফুল নাই। খোঁপা এলাইত। ঠোঁটের রঙটি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

যেন ওস্তাদ বহুরূপী।

একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—এইবার চলুন, নিয়ে আসি গিয়ে।

সিঁড়ির দুই ধাপ নামিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল—ওর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝি?

শরৎ বলিল—না, রাস্তায় বেসামাল অবস্থায় দেখে বাড়ীতে পৌছে দিতে এসেছি।

সহসা তরুণীটি একেবারে যেন শরতের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। কানের কাছে মুখ আনিয়া চাপাকণ্ঠে বলিল—তা' হলে এসব কথা ওকে বলবেন না।

—কোন্ কথা?

—এই ওপরে এসে যা' যা' দেখলেন—আমি ওই ঘরে গেছলুম, কি ভাবে ছিলুম, এই সব আর কি।

বলিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া আবার বলিল—আপনার ত দেখছি খুব দয়ার শরীর। এ গরীব বেচারীকেও এইটুকু দয়া করলেনই বা! কি বলেন?

বলিয়া সে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে এমন করিয়াই চাহিল যে, শরৎ মুহূর্ত্তকালের জন্য পা বাড়াইতে ভুলিয়া গেল।

অতিকষ্টে ধরাধরি করিয়া হরিশ মুখুয্যেকে ঘরে আনা হইল। তাহার স্ত্রী ঘরের মেঝেতে মাদুর আর বালিশ পাতিয়া দিয়া বলিল—নিন্, শুইয়ে দিন।... .. মা গো, আর পারি নে আমি! নিত্যি এই দুর্ভোগ!

শোয়াইয়া দিতেই মুখুয্যে যেন মড়ার মত এলাইয়া পড়িল।

কর্ত্তব্য যেটুকু ছিল শেষ হইয়াছে। আর এখানে দেরী করা উচিত নহে মনে করিয়া কেক্-এর ঠোঙাটা বাড়াইয়া ধরিয়া শরৎ বলিল—এই নিন্, এটা রাখুন।

অদূরেই আরও একটা মাদুর পাতা ছিল। অঞ্চলের প্রান্ত দিয়া একটু ঝাড়িয়া লইয়া মুখুয্যের বৌ বলিল—বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?......কি ওতে?

বসিবার ইচ্ছা শরতের আদৌ ছিল না। কিন্তু কথার জবাব দিতে গিয়া তাহাকে সমস্ত ব্যাপারটাই বলিতে হইল। ভাবিয়াছিল, স্বামীর এ হেন দুর্গতির কথা শুনিয়া বৌটি হয় ত লজ্জিত এবং দুঃখিত হইবে। কিন্তু কথা শেষ হইতেই সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—আপনার তা' হলে আজ ভারি ভোগান্তি হ'ল ত। পয়সা নষ্ট, সময় নষ্ট, পরিশ্রম—অথচ কোন লাভই নেই—না?

একটু থামিয়া আবার বলিল—কি দিয়ে যে আপনার সেবা করি, ভেবে পাচ্ছি না। আপনি আমার আজ কী উপকারটাই যে কর্‌লেন!

বলিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া উঠিয়া গেল। তারপর এক গেলাস জল এবং ডিসে করিয়া দুইটা কেক্ আনিয়া শরতের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল—গলাটা একটু ভেজান—পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

শরৎ অনেক আপত্তি করিল। কিন্তু কোন আপত্তিই চলে না দেখিয়া অগত্যা সে একটা কেক্ তুলিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল—উনি এখানে কি করেন?

বৌটি জবাব দিল—আগে বেশ ভাল চাকরীই করতেন। দু'জনের এক রকম করে চলে যেত। কিন্তু মাতলামো করে চাকরীটি গেল। এখন কোন এক তেলের কারখানায় কাজ করেন। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে—তাও নেশা—তা'তে অর্দ্ধেক যায়।

আরও একটু অনুসন্ধান করিয়া শরৎ জানিল—বরানগরে মুখুয্যেদের বাড়ী। সেখানে তাহার কাকা, কাকীমা এবং এক বড় ভাই আছেন। তাঁহাদের অবস্থা ভাল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কাকার সহিত ঝগড়া করিয়া বৌকে লইয়া মুখুয্যে বোম্বাই চলিয়া আসে।

খাওয়া শেষ হইতেই শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—এইবার আসি—রাত হ'ল।

বৌটি মহা আপত্তি করিয়া বলিল—কোথায় রাত হ'ল? বসুন না আর একটু; এক্ষুনি কোথায় যাবেন—বা!

কিন্তু শরৎ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—মাপ করুন, আর দেরী করতে পারব না।

তারপর হঠাৎ যেন কি ভাবিয়া সে বলিল—কিন্তু একটা কথা আপনাকে না বলে থাকতে পারছি না। হরিশবাবু আপনাকে ষোল-আনা বিশ্বাস করেন, আর ভালবাসেন—তা' আমি এই একদিনেই টের পেয়েছি।

বৌটি সহসা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি যেন থামিতে চাহে না। বলিল—সত্যি?···মস্ত একটা জিনিষ আবিষ্কার করে ফেলেছেন ত দেখছি। কিন্তু ও কথা থাক্। কাল আসবেন ত?

—না।

—আচ্ছা, কাল নাই বা হ'ল। পরশু?...বলে যান। আসতেই হবে আপনাকে। এখন ত আলাপ-পরিচয় হ'ল—এখানে কোন বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না। আসবেন—কেমন?...বলুন।

কোনপ্রকারে 'আচ্ছা' বলিয়া শরৎ দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। ফিরিবার পথে শরৎ বোধ হয়

সহস্রবার বলিয়াছে যে, ও বাড়ীমুখো আর কখনও হইবে না। বাঙালীর প্রতি তাহার যেটুকু করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সে করিয়াছে। আর কেন?

সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিল যে, ঐ বৌটি মুখুয্যের মাতলামো এবং সরল বিশ্বাসের সুবিধা পাইয়া কোন্ পথে পা বাড়াইয়াছে। দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটনও হয় ত কতকাংশে দায়ী। তবু দুঃখ হয়—এরা বাঙালী।

এই দূর দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাত্মীয়দের ভিতর পড়িয়া দারিদ্র্যের তাড়নায় এইভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে।

মুখুয্যে মাতাল। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তাহার কি গভীর ভালবাসা! অথচ, ভিতরে যে কত কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে,—ঐ হতভাগা লোকটা তাহার কোন সন্ধানই রাখে না। সে কি একবারও ভাবিতে পারে যে, তাহার স্ত্রী অভিসারের সাজে সাজিয়া নিত্য সন্ধ্যায় ওই গণিকার ঘরে কিছুক্ষণ করিয়া কাটাইয়া আসে?

হায়রে, দুনিয়ায় ইহাই বুঝি সবার চেয়ে বড় ট্রাজিডি!

দিন কয়েকের পর হঠাৎ একদিন বিকালে ট্রামে হরিশ মুখুয্যের সহিত তাহার দেখা।

পোষাক পরিচ্ছদ ঠিক হিন্দুস্থানীদের মত। বাঙালী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। কোট এবং পাজামা তেলকালীতে অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরতকে দেখিতে পাইয়াই একটু অল্প হাসি হাসিয়া হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া বলিল—নমস্কার!...ভাল আছেন?

—ঘাড় নাড়িয়া কুশল জানাইয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল—আপনার খবর কি? কারখানা থেকে ফিরছেন বুঝি?

—হ্যাঁ, এই এখন ফিরছি।

তারপর, একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিতান্ত কুণ্ঠার সহিত বলিল—আপনার সেদিনের সমস্ত দয়া আর অনুগ্রহের কথাই আমার স্মরণ আছে। আপনি না এসে পড়লে জেলেই যেতে হ'ত।...সেদিন মনে বড় আঘাত লেগেছিল—তাই। নইলে অতটা হীন আমি এখনও হয় নি। নেশা করি বটে, কিন্তু পরের অপকার শুধু সেই দিনই করতে গেছলুম।

শরৎ নীরবে বসিয়া রহিল।

মুখুয্যে বলিতে লাগিল—কি অবস্থায় যে আছি, সে ত সেদিন দেখেই এসেছেন। আমি অতি হতভাগা—...অমন লক্ষ্মীর মত বৌ পেয়েছিলুম বলেই এখনও টিকে আছি, নইলে এতদিনে কবে হয় ত পথে-ঘাটে মরে পড়ে থাকতুম।...আজকাল ওই ত আমার সবার বড় দুঃখু। ভাবি, ওকে কেন মিছিমিছি মরতে এর ভেতর টেনে আনলুম।

শরৎ হঠাৎ বলিল—ওঁকে দেশে কেন পাঠিয়ে দিন না—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে?

—হ্যাঁ, এবার অগত্যা তাই করব ভেবেছি।...কাকার ওপর রাগ করে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'ল—আর নয়।

শরৎ উৎসাহিতভাবে বলিল—সেই সব চেয়ে ভাল।...যদি আপত্তি না থাকে, তা' হ'লে, আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আপনি ওকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

হাত দুইটা একত্র করিয়া আবার একবার কপালে ঠেকাইয়া মুখুয্যে সবিনয়ে বলিল—ঋণের বোঝা আমার অনেক ভারী—সে আর বাড়াব না। কাকাকেই লিখব। খবর পেলে তিনি নিজেই হয় ত এসে নিয়ে যাবেন।

একটা বড় মোড়ে আসিয়া ট্রাম দাঁড়াইল। দু'জনকেই এবার দুইদিকে যাইতে হইবে। মুখুয্যে তৃতীয়বার নমস্কার জানাইয়া বলিল—আসি তা' হ'লে। বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি; তবু এক-আধদিন যদি যান, বড় খুসী হব।...বৌ-এর মুখে আপনার প্রশংসা ধরে না... যাবেন একদিন।

আচ্ছা বলিয়া নমস্কার জানাইয়া শরৎ অন্য ট্রামে গিয়া উঠিল।

সম্মতি জানাইলেও শরৎ কখনও আর ওখানে যাইবে না। তাহা এক প্রকার স্থিরই করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজিকার কাজ সকাল সকাল শেষ করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই সে যখন নিজেকে ঘাস্‌লেট্‌ওয়ালা বিল্ডিং-এর ফটকের সম্মুখে দেখিতে পাইল, তখন আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল—ওই পথভ্রষ্ট, অসহায় স্বদেশবাসীর প্রতি তাহার সব কর্ত্তব্য এখনও একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ মুখুয্যেকে বলিয়া-কহিয়া যত শীঘ্র সম্ভব তাহার বৌকে দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থাটা সে করিয়া দিতে পারে।

চৌদ্দ নম্বর ঘরের কাছে আসিয়া কড়া নাড়িতে ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে সাড়া আসিল—কে ?

গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া শরৎ বলিল—এই আমি।...হরিশবাবু আছেন ?

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল মুখুয্যের বৌ। আজও তাহার অভিসারের সাজ। খোঁপায় ফুল পরাইতে পরাইতে আসিয়া বলিল—আলাপটা কি শুধু ওর সঙ্গেই হয়েছিল ?...এ গরীব বেচারীকে বুঝি একেবারেই মনে নেই ?...আসুন, ভেতরে আসুন।

শরৎ ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতেই, বৌটি ঘরের দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। কিন্তু ঘরে মুখুয্যেকে না দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত কণ্ঠেই শরৎ জিজ্ঞাসা করিল—হরিশবাবুকে দেখছি না যে ? কোথায় তিনি ?

মুখুয্যের বৌ শরতের মনের ভাবটা যেন বুঝিয়া লইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর মাদুরটা মেঝেতে পাতিতে পাতিতে বলিল—আজ মাস-পয়লা ; এসেই বেরিয়েছেন।...আজ কি আর তাঁর টিকি দেখতে পাবেন! নেশা করে কোন্ চুলোয় পড়ে থাকবে কে জানে!...বসুন। অমন করছেন যে ? ভয় করছে না কি ?

অদ্ভুত ব্যাপার! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে লোকটী নিজের মনের দুঃখ এবং পশ্চাত্তাপের বোঝা তাহার কাছে উজাড় করিয়া দিতেছিল—যে দোষের জন্য নিজেকে সে হাজারবার দোষী করিয়াছে—এইটুকু সময়ের ভিতর সেই লোকের এ কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ও বিষের কী নির্ম্মম আকর্ষণী শক্তি!

—বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ ?

শরৎ বসিল বটে, কিন্তু এইভাবে বন্ধ ঘরের ভিতর সম্পূর্ণ অনাত্মীয়া পরস্ত্রীর সহিত বসিয়া গল্প করাটা তাহার আদৌ ভাল মনে হইতেছিল না। তাই রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল—দোরটা খুলেই রাখুন না। গরম হচ্ছে বড়।

—ও মা, গরম কোথায় পেলেন ?...আচ্ছা, দাঁড়ান।

বলিয়া ঘরের কোণ হইতে পাখাটা তুলিয়া লইয়া আবার শরতের কাছে আসিয়া বসিল। শেষে খোঁপা হইতে একটা গোলাপ ফুল খুলিয়া লইয়া বলিল—পরিয়ে দিই ?

শরৎ আপত্তি জানাইয়া বলিল—না, ও আপনার খোঁপাতেই মানাবে ভাল।

—ইস্, তাই বুঝি!...দিই, পরিয়ে দিই।

বলিয়া আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া নতজানু হইয়া সে ফুলটা শরতের কোটের 'বাটন হোলে' পরাইয়া দিতে লাগিল।

একটু দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই।

যেন কতকালের চেনা।

শরৎ এই অসমসাহসী মেয়েটির দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ফুল পরান তাহার আর শেষ হইতে চাহে না।

খোলে—আবার পরায়—তবু যেন অপছন্দ!

শরতের কপাল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

রুমাল দিয়া কপালটা মুছিতেই মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিল—বাবাঃ, লোকের কাছ থেকে সেবা আদায় করে নিতে আপনি দেখছি পাকা ওস্তাদ! এতই গরম লেগেছে ?

বলিয়া এতক্ষণে ফুল পরান শেষ করিয়া সে হাওয়া করিতে বসিল।

শরতের সমস্ত অন্তর অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এইভাবে এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা উচিত নহে। কিন্তু উঠি উঠি করিয়াও কেন সে বসিয়াই রহিল, তাহা বোধ হয় সে নিজেও জানে না।

—কি ভাবছেন বলুন ত?

—কি আর ভাবব।

শরৎ মুখ ফিরাইয়া লইল।

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি। ভাবছেন—এ মানুষটা একেবারে বয়ে গেছে, না?

—না, তা' অবশ্য ভাবছি না। তবে—আমার যদিও বলার কোন অধিকার নেই, তবু মনে হয়, আপনি ভুল করছেন। মারাত্মক ভুল, যাতে আপনার ভাল না হবারই সম্ভাবনা বেশী।

সে হাসিয়া উঠিল।

বলিল—আচ্ছা, আমাকে দেখে কি কলের পুতুল বলে মনে হয়?...কলের পুতুলকেও চালাবার জন্য দম্ দিতে হয় তা' জানেন?

শরৎ একটু তিক্তকণ্ঠে বলিল—জানি। কিন্তু, হরিশবাবুর আপনার প্রতি যে অগাধ ভালবাসা, তা'তে আপনি ইচ্ছা করলে তাঁকেও শোধরাতে পারতেন, নিজেও অনেক কিছু পেতে পারতেন।

মুখুয্যের বৌ বলিল—শুধু মুখের ভালবাসা নিয়ে কেউ আজো অবধি সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। আপনি কিছুই জানেন না, তাই একথা বল্‌লেন। সে পুরুষ নামের অযোগ্য। কিন্তু, আমি সুস্থ, সবল—ঈশ্বর আমাকে যে জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তার দ্বারা আমার সে কাজ সফল হবে না। যাক্, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এলেন, আসুন একটু গল্প-গুজব করি—তা' নয়, আপনি কেমন যেন!

বলিয়া সহসা শরতের অত্যন্ত নিকটে মাদুরের উপর এলাইয়া পড়িয়া, একটা হাই তুলিয়া বলিল—দেহটা আজ ভাল নেই। কেমন যেন ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করছে।

ছোট একটি ঘর। দরজা বন্ধ। পাশে একটি সুন্দরী, সুসজ্জিতা, এলাইত তরুণী। শরতের বুকের স্পন্দন যেন থামিয়া আসিতে চাহে। নিতান্ত শঙ্কিত কণ্ঠে সে বলিল—তা' হ'লে, আপনি এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমি যাই।

কথাটা বলিতে বলিতেই উঠিতে গিয়া কোটের পিছনে টান পড়াতে তাহাকে আবার বসিয়া পড়িতে হইল। চাহিয়া দেখিল, মুখুয্যের বৌ-এর চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি! নারীর চোখের এ দৃষ্টি পুরুষ সহিতে পারে না। তাহাদের এ মূর্ত্তি শরৎ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

বুকের ভিতর তাহার ধড়ফড় করিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিল—যেতে দেবেন না না কি?

—না, দেব না।...শুনুন একটা কথা...

—কি বলুন।

—আর একটু সরেই আসুন না কাছে। খেয়ে ত আর ফেলব না।

তারপর, কাতর কণ্ঠে বলিল—দয়া করুন, আমার যে কোন ক্ষিদেই মেটে না—পেটের ক্ষিদে, মনের ক্ষিদে, দেহের ক্ষিদে—কি করে বেঁচে থাকি বলুন দিকি?

শরৎ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—আপনাদের দেখে স্বদেশবাসী বলে আমার দয়া এসেছিল; তাই, ভুল করে সাহায্য করতে এসেছিলুম। এখন দেখছি নাহক্ খানিকটা পণ্ডশ্রম করে মলুম। যাক্, আপনি বরং ওই পাশের ঘরে গিয়ে বসুন—ক্ষুধার কতকটা হয় ত উপশম হতে পারে।

মুখুয্যের বৌ-এর কণ্ঠস্বর সহসা অসম্ভব রুক্ষ হইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তীব্র দৃষ্টিতে বিষ ঢালিয়া বলিল—আপনি তা' হলে শুধু নীতিকথা শোনাতেই এখানে এসেছিলেন বুঝি?

ক্রোধে শরতের অঙ্গ কাঁপিতেছিল।

বলিল—না, নীতিকথার বাইরে চলে গেছেন আপনি। দুনিয়ার সব পুরুষই হরিশবাবুর মত সরল নয়—আমার মত মানুষও আছে—এই কথাটা আজ আপনাকে শিখিয়ে যাচ্ছি।

মুখুয্যের বৌ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—সশব্দে দরজাটা খুলিয়া দিয়া, দুই চোখে যেন আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে বলিল—বেরিয়ে যান্ ঘর থেকে।...ওই পথে সোজা নেবে যান্। আমার জন্যে মাথা ঘামাবার আপনার প্রয়োজন নেই।

শরৎ দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল।

পথে মুখুয্যের সহিত দেখা। বেসামাল অবস্থা। পা টলিতেছে; হাতে একটা পোঁটলা।

শরৎ পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মুখুয্যে দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইল। জড়িতকণ্ঠে বলিল—ব্যস্ত আছ বুঝি ভায়া?...দেখা হ'ল?...আচ্ছা, তা' যাও। কিন্তু, আবার এসো...রোজ এসো...দু'বেলা—কেমন?

বলিয়া এক কদম অগ্রসর হইয়াই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আজ কিন্তু মাল টানি নি ভায়া।—মাস-পয়লা—তবুও। এই দেখো, সাড়ী কিনে নিয়ে যাচ্ছি। গিয়ে বলব—তুই একবার একটু হাস্ ত, আমি দেখি।......

শরৎ ততক্ষণে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবিমল সেন

দাম্পত্য-কলহ

কুমারী সান্ত্বনা গুহ

নব-বিবাহিত স্বামী স্ত্রী। বছরখানেক একটানা মিলনানন্দের পর হঠাৎ একদিন তাহাদের হৃদয়-আকাশে বিরহের মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

কি একটা সামান্য কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সেদিন কলহ হইয়া বেশ একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিল; দুই জনের মধ্যে বাক্যালাপ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। শয্যার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পাশ বালিশ পড়িয়া দুইজনকে ব্যবধান করিয়া রাখিল।

গভীর রাত্রি।

হঠাৎ স্বামী পেলবকুমারের নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল—শুধু পাশ বালিশটা পড়িয়া আছে; শয্যা একেবারে শূন্য। কোথায় গেল তবে স্ত্রী—লেখা?

তাহার বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। তবে কি সে অভিমানভরে কোথাও চলিয়া গেল! এই চিন্তাটা মাথায় আসিতেই তাহার বুকটা একেবারে কাঁপিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া বাহিরে গেল। দেখিল—সদর দরজা তেমনই ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে। তাহার বুকটা একটু হাল্কা হইল; মনে হইল, স্ত্রী তবে বাড়ীতেই আছে—কিন্তু সে গেল কোথায়? প্রত্যেকটি ঘর সে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও লেখার দর্শন পাইল না। শুধু মায়ের ঘরটা সে দেখিতে পারিল না; কারণ, ভিতর হইতে সেটা বন্ধ ছিল।

লেখা তবে গেল কোথায়? ছাতে কিংবা বাথরুমের ভিতর গিয়া আত্মহত্যা করে নাই তো! আত্মহত্যার চিন্তাটা মাথায় আসিতেই সে ঠক্‌ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ছুটিয়া সে ছাদে গেল। কিন্তু ছাদ একেবারে খালি; সেখানে কেহই নাই। পেলব তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল।

বাথরুমের দরজাটা ভেজান ছিল। পেলব ভয়ে ভয়ে সেটা একটু ঠেলিতেই খুলিয়া গেল; আর সেই মুহূর্ত্তে সভয়ে 'ভূত—ভূত—ও মা গো!' বলিয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া লেখা হুড়মুড় শব্দে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা ভীত গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল।

আচম্‌কা এইরূপ একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় পেলবও খুব ভয় পাইয়া 'পেত্নী—পেত্নী!' বলিয়া লেখার পাশে পড়িয়া গিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

গভীর রজনীতে এই অদ্ভুত গোঁঙানী শুনিয়া পেলবের মাতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সভয়ে তাড়াতাড়ি কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিলেন।

পুত্র এবং পুত্রবধূকে এভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

শ্বশ্রূকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়াই লেখা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গায়ে মাথায় ভাল করিয়া কাপড় টানিয়া দিল।

পেলবও উঠিয়া মাকে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

মাতা সব শুনিয়া হাসি গোপন করিতে না পারিয়া মুখে কাপড় দিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

শুনিয়াছি—ইহার পর এই দম্পতী আর কখন মান-অভিমান করে নাই।

সান্ত্বনা গুহ

গৃধিণীর পালক

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক শীল

এতো বড়ো বিয়োগ-ব্যথা নির্ব্বিবাদে সহ্য করা নির্ম্মলের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সংসারের একমাত্র অবলম্বন দুঃখিনী বিধবা জননীর শেষ কার্য্য সদ্য শেষ করিয়া সমগ্র জগত তাহার নিকট স্নেহ-মায়া-মমতা-শূন্য ভীষণ অন্ধকারময় এক বিরাট জেলখানা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গ্রামের বুকে বসন্তের সবুজ আগমনী, তাহাও যেন অর্থহীন—সম্পূর্ণ প্রাণহীন মনে হয়। শুক্লা-দ্বাদশীর প্রোজ্জ্বল চাঁদখানা;—তাহাও যেন সলাজ হাসির সেই মাদকতা হারাইয়া ফেলিয়াছে! খরস্রোতা শীর্ণা সুবর্ণরেখা;—কিসের ব্যথায় সে-ও যেন ম্লান হইয়া পূর্ব্ব শক্তিতে দুকূলে আছাড় খাইয়া পড়িতে পারিতেছে না! এতো বড়ো দুনিয়ায় যেন তাহার আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই—যেন তাহার নিজের ভার বহন করিতে নিজেই সে হাঁফাইয়া উঠিতেছে। বহুক্ষণ নদীতটে একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া অবশেষে উঠিয়া সে স্নান করিবার জন্য নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

স্নানান্তে উঠিয়া সিক্তবস্ত্রেই সে বনপথ ধরিয়া সোজা পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। না, সে কোথায় যাইবে বা যাইতেছে, তাহা ঠিক করিবার কোন প্রয়োজন-ই আর নাই। কাহার জন্যই বা সে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইবে? 'নিমু' বলিতে যে জননী দিশাহারা হইয়া যাইতেন,—দশ মিনিটের অদর্শনে ভাবিয়া আকুল হইতেন,—তিনিই যখন এক কথায় মমতার এত বড় গণ্ডী কাটাইয়া তাহাকে ফেলিয়া চিরতরে চলিয়া যাইতে পারিলেন, তখন তাহারই বা আর সেই বাড়ীর উপর আকর্ষণ কিসের?.........সেই মাটীতে জননীর শেষ-স্পর্শ আছে?—তা' থাক্, কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করে না। অগ্নির লেলিহান স্পর্শ দিয়া যে-সম্বন্ধ সে নিজের হাতে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপর এত দরদ কিসের?

গরবী?—হাঁ নিঃসহায় এই মেয়েটার জন্য একটু মায়া হয় বটে। তারা বড় গরীব। ঠিকমত দু'বেলা দু'টী অন্নও জুটে না!...হোক্ তারা গরীব—নিঃসম্বল, কিন্তু মেয়েটী সত্যই ভারী সুশীলা!—শান্ত উজ্জ্বল চক্ষু দু'টী ব্যথার বাষ্পে সদাই যেন ম্লান।...জননীর বড় ইচ্ছা ছিল, সেই দুঃখিনী মায়ের বুক ছেঁড়া ধন গরবীর সহিত নির্ম্মলের জীবন-সূত্র গ্রথিত হয়, কিন্তু বিধাতা যখন অকালে তাঁহাকেই তুলিয়া লইলেন, তখন সে কথা পূর্ণ করিবার সার্থকতা তাহার কী আছে? না, সে গরবীর চিন্তা মাত্র মনে আনিবে না। অভাগী তার ভাগ্য-লিপির ফল কড়ায়-গণ্ডায় উপভোগ করুক।

এইভাবে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে হঠাৎ তাহার চেতনা হইল, অদূরে দিগন্তের কোল রাঙা করিয়া চির-নবীন অতিথি লাজনম্রবেশে অশ্বত্থ শাখার ভিতর অনেক-খানি ঢলিয়া পড়িয়াছেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, দু'ধারে বন-পথের ভিতর কোথাও কোন লোকালয় বা বসতি আছে বলিয়া বোধ হইল না। অথচ, আর কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা। তার বিভীষিকাময়ী ধূসর আচ্ছাদনে সমস্ত গাঁখানা ঢাকিয়া ফেলিবে, তখন এই অপরিচিত পথে সে আপনাকে কিভাবে রক্ষা করিবে, কিছুতেই তাহা ভাবিয়া কিনারা করিতে পারিল না। খুব জোরে জোরে পা চালাইয়া সে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটী জরাজীর্ণ ভগ্ন কুটীর দেখিয়া সে মনে মনে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং রাত্রের মত আশ্রয় মিলিবে ভাবিয়া আশ্বস্ত হইল। দ্বার খোলাই পড়িয়া আছে, সে দু'-একবার কড়া ধরিয়া নাড়া দিল। কোন সাড়া না পাইয়া অবশেষে সতর্কভাবে ভিতরে ঢুকিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল: কে আছ গো?........ তাহাতেও কোন উত্তর না পাইয়া আরো কিছুদূর অগ্রসর

হইয়া উঠানের প্রায় মধ্যস্থলে আসিয়া একটু জোর দিয়া ডাকিল : কে আছ গো বাড়ীতে ?

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ একটু গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই একটী শৃগাল সম্মুখের ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। নির্ম্মল ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।—শেষ পর্য্যন্ত সে কি এক-খানি পোড়ো বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইল ? সারাদিন অনাহারে—শোকে—দুঃখে—দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত চিত্তে একেই সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর নিজের উপস্থিত অবস্থার কথা কল্পনা করিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া উঠানের উপর ঢলিয়া পড়িল।

যখন তাহার চেতনা হইল, তখন দেখিল গত সন্ধ্যার সেই চিরনবীন অতিথি পূর্ব্বাকাশ নূতনভাবে রাঙাইয়া তুলিয়াছেন। পাখীর দল প্রাণে টাট্‌কা স্ফূর্ত্তি লইয়া পূর্ণ উদ্যমে সঙ্গীত বিতরণ এবং খাদ্য আহরণে যোগ দিয়াছে।

গত সন্ধ্যার সেই বিভীষিকাময়ী দৃশ্য নির্ম্মলের চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল জননীর বিদায়-বেলার সেই ক্ষীণ চক্ষু দু'টী। জননীর মৃত্যু যেন নূতন করিয়া তাহার মানস-পটে পুনর্ব্বার প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। সুদীর্ঘ একুশ বৎসরে যে-মায়ের কোল ছাড়িয়া একটী রাতও সে বাহিরে কাটায় নাই, আজ তাঁর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত বাঁধন শিথিল করিয়া সংসার তাহাকে একেবারে সকল দিক্ দিয়া কাঙাল করিয়া দিল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। হায় মা জননী, স্নেহ-মমতা'র কী কঠিন আবেষ্টনীতেই না তোমরা সন্তানকে ঢাকিয়া রাখো!

অঙ্গের সিক্ত বসনখানি দেহের উত্তাপেই কখন শুকাইয়া গিয়াছে খেয়াল নাই ; অথচ, বেশ মনে পড়ে, পাঁচ-সাতটা বৎসর পূর্ব্বে একদিন সে স্কুল হইতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাড়ী আসিয়াছিল। তাহাতে তাহার জননী কত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।—কত সে অনুযোগ—অভিমানের পালা! যদি জ্বর হইয়া পড়ে—সেই ভয়ে কিরূপ সশঙ্কিত ভাব!......

সত্য-সত্যই সেবার পরদিন তাহার জ্বর হইল। সেদিনটা তাঁহার কিভাবে কাটিয়াছিল সে তাহা ভালই জানে।—অনর্গল বকাবকি করিয়া—কবিরাজের কাছে ছুটাছুটি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, শেষ পর্য্যন্ত অভিমানভরে ভাত না খাইয়াই কাটাইয়াছিলেন। অথচ আজ ? আজ তাঁহার অভুক্ত 'নিমু' পথের ধূলায় লুটাপুটি খাইতেছে, তাহাকে একটু আদর করিতে—একটু সোহাগ দেখাইতে—এমন কি একটা সান্ত্বনার বাণী শুনাইতেও আজ তাহার কেহ নাই!

কর্ত্তব্যশীল জঠর আপনার কাজ ভুলে নাই—নাড়ী জ্বালাইয়া বারবার আহার্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। শোকের তীব্রতা ক্ষুধা কতকটা প্রশমিত রাখিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু এখন যেন তাহাও কোন বাধা-ই মানিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু এই বনপথে কে তাহাকে আহার্য্য দিবে ? অভাবের দিনে জননীর মুখে কয়েকবার শুনিয়াছিল—'জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি'—কিন্তু আজ সে-কথা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে তার দ্বিধা আসিয়া পড়িল। ভারাক্রান্ত দেহ ও মন লইয়া শেষে সে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে পুনরায় পাড়ি দিল। উদ্দেশ্য,—যদি কোন লোকালয় মিলিয়া যায়—যদি একমুঠা অন্ন মিলে!

হঠাৎ অদূরে একটী ফলভারাবনত পেয়ারা গাছ দেখিয়া আনন্দে-বেদনায় তার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। জননীর কথা বর্ণে বর্ণে কত সত্য! পেট ভরিয়া কয়েকটী পেয়ারা খাইয়া সে জঠরানল শান্ত করিল, তারপর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ নজরে পড়িল, প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে একটী মৃত গরুকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটী শকুনি ঠোক্‌রা-ঠুক্‌রি সুরু করিয়া দিয়াছে। গরুটীর যে-দিকটী মাটীর উপরে আছে, তাহার মাংস খাইয়া তাহারা অস্থিসার করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু উল্টাইয়া ফেলিয়া বাকী অর্দ্ধ কাজে লাগাইবে, সকলের সমবেত শক্তিতেও তাহা কুলাইয়া উঠিতেছে না।

একটা বিভীষিকার আকার লইয়া ব্যাপারটা তাহার

চক্ষে প্রথমতঃ ধরা দিলেও শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবিয়া সে যাইয়া গরুটীকে অন্যদিকে উল্টাইয়া দিল। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ বোধ হয় সর্ব্বপ্রকার জীবের মধ্যেই আছে। শকুনিগুলি কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। পর মুহূর্ত্তে তাহাকে চমকিত করিয়া একটী প্রকাণ্ড গৃধিনী অশ্বত্থ গাছ হইতে উড়িয়া নামিয়া আসিয়া তাহার গায়ে গা-মাথা বুলাইয়া বারবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল—যেন কি বলিয়া সে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না। পরে আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে একটী খুব ধবধবে শাদা পালক তাহার পায়ের কাছে ছাড়িয়া দিয়া করুণ-নয়নে তার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এই অনাস্বাদিত অভিনব ব্যাপারে নির্ম্মল প্রথমটা একপ্রকার অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু অন্যান্য শকুনি অপেক্ষা এই গৃধিনীর আকারে পার্থক্য এবং সে আসিতেই মুখের খাবার ছাড়িয়া সারবন্দী হইয়া অন্যান্য শকুনিকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া তার সন্দেহ হইল, এই গৃধিনীই সম্ভবতঃ ইহাদের রাণী। রাণীর অমাত্যদিগের খাদ্য আহরণে সাহায্য করার জন্য রাণী সম্ভবতঃ তাহাকে ঐ পালকটী পুরস্কার দিতে চায় ভাবিয়া সে পালকটী তুলিয়া হাতে লইল। হাতে লইতেই গৃধিনী আর একবার তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, পায়ে গা-মাথা বুলাইয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে উড়িয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল মৃদু হাসিল মাত্র।

আরো কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অদূরে একটী প্রকাণ্ড 'হাট' দেখিয়া নির্ম্মলের নিরাশ অন্তঃকরণে আশার রেখা ফুটিয়া উঠিল। সূর্য্যদেব প্রায় মধ্য গগনে আসিয়া তীব্র কিরণে পৃথিবী দগ্ধ করিতেছেন, তৃষ্ণায় তাহার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কাহারো নিকট কোন জলপাত্র আছে বলিয়া লক্ষ্য হইল না; অথচ, কাছে এমন একটী পয়সা নাই যাহা দিয়া কিছু খাবার সামগ্রী কিনিয়া সে পিপাসা মিটাইতে পারে। দু-এক-জনের নিকট নিজের দুরবস্থার কথা বলিয়া সে কিছু সাহায্য ভিক্ষা চাহিল,কিন্তু সকলেই মুখ ঘুরাইয়া অক্ষমতা জানাইল।

একটী পেঁপে গাছে কয়েকটী কাঁচা পেঁপে ঝুলিতেছে দেখিয়া অবশেষে সে তাহাই আহরণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি মালকোঁচা মারিয়া কাণে পালকটী গুঁজিয়া খুব সতর্কতার সহিত গাছে উঠিয়া পড়িয়াই হাতের কাছে দুই-চারিটা যাহা পাইল ছিঁড়িয়া লইল। কেহ তাহার কার্য্যকলাপ দেখিল কি না দেখিবার জন্য যেমন সে হাটের দিকে মুখ ফিরাইল, তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না! এক লহমা পূর্ব্বে যে-হাট জন-সমাকীর্ণ ছিল, নিমেষ মধ্যে তাহা অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে!—সমস্ত মানুষ প্রত্যেকেই এক এক রকমের পশুতে পরিণত হইয়াছে।—কাহারো মাথায় প্রকাণ্ড শিং—কাহারো হাতীর ন্যায় শুঁড় ঝুলিতেছে—কাহারো প্রকাণ্ড গজদন্ত—কাহারো হনুমানের ন্যায় লাঙ্গুল—কাহারো ছাগলের ন্যায় গাল-পাট্টা—কেহ বা অবিরত ঘোড়ার ন্যায় কাণ নাড়িতেছে! তবে পাখীর সংখ্যাই বেশী। এ যেন এক অভিনব চিড়িয়াখানা! অথচ, আশ্চর্য্যের কথা,যে-যাহা বিক্রয় করিতেছিল, সে-সব জিনিষের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেগুলি ঠিকই আছে।

ক্ষুধার তাড়না এবং মানসিক নানাবিধ বিপর্য্যয় এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে কল্পনা করিয়া ক্ষিপ্রপদে গাছ হইতে নামিয়া সে চক্ষু দু'টী ভালরূপ মার্জ্জনা করিয়া লইল। অসাবধানে হাত লাগিয়া কাণ হইতে পালকটী মাটীতে পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্যের কথা, পালকটী পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে পূর্ব্বেকার জনমানবপূর্ণ হাট দেখিল। তাহার মনে দ্বিধা আরো প্রবল হইয়া উঠিল। তখন ইহা পালকটিরই গুণ কি না দেখিবার জন্য পুনর্ব্বার সে তাহা কাণে লাগাইল। লাগাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষগুলি আবার সব পশু হইয়া গেল। তাহার বিস্ময় সহস্র গুণ প্রবল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, হাটের মানুষগুলিও নিশ্চয়ই তাহাকে কোনো একপ্রকার জন্তু দেখিতেছে।—অথবা ইহার ভিতর কোনো অদৃশ্য-শক্তির ইঙ্গিত আছে?···

মনে মনে নানাবিধ মুসাবিদা করিতে করিতে পালকটী কাণে রাখিয়াই সে সমস্ত হাট ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। যতদূর দেখা যায়, হাটের সমস্ত স্থানই জন্তু সমাকীর্ণ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য সে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া গেল।

হঠাৎ হাটের অনতিদূরে একটী ছোট কুঁড়ে ঘরের ভিতর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে অবাক্ হইয়া দেখিল, তাহার ভিতর একটী মুচি জুতা তৈয়ারী করিতেছে,—মুচিটি কিন্তু কোন জন্তুতে পরিণত হয় নাই। বিস্ময়ে আপনা হইতে মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল: এত বড় হাটে শুধু একটী মানুষ, আর বাকী সব পশু!...

নিজের উচ্চারণে নিজেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্বমুখ নিঃসৃত ঐ কথাগুলি দৈববাণীর মতোই তাহার কর্ণে গিয়া আঘাত করিল। মনে মনে বলিল, বোধ হয় ইহাই ঠিক, পশু বলিয়াই উহাদের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাই নাই। অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন এই পালকটী যাহাকে মানুষ বলিয়া জানাইয়া দিতেছে, একবার তাহার নিকট বেদনার কথা বলিয়া দেখি!...

মুচিটি একজোড়া খুব সৌখীন জুতা তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত ছিল। নির্ম্মল গিয়া দাঁড়াইতেই সাদর আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়া সে তাহাকে একখানি জলচৌকী অগ্রসর করিয়া বসিতে দিল.

নির্ম্মল প্রথমে নিজের অনাহারের কথা এবং পরে মাতৃ-বিয়োগের যাবতীয় ঘটনা কিছুই তাহার নিকট অপ্রকাশ রাখিল না। দেখিল, মুচিটির চোখ দিয়া টস্-টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

হাতের কাজ সরাইয়া রাখিয়া চোখ মুছিয়া তাহাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া বলিল: ভাই, আমি ছোট-জাত, আমার তৈরী ভাত তোমাকে ত দিতে পারব না। বাতাসা-মুড়কি যা' ঘরে আছে, প্রথমে তা' খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও, তারপর আমি সব জোগাড় করে দিই, তুমি দুটী চালে-ডালে ফুটিয়ে নিও। আমার একখানা ঘর হলেও যতদিন ইচ্ছা তোমার এখানে থাকবার কোনো অসুবিধে হবে না; কেন না, আমার সংসারে আর কেউ-ই নেই।

কি জানি, কিসের বেদনায় নির্ম্মলের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কেবলি ভাবিতে লাগিল: এই পালক বুকে লইয়া দেখে বলিয়াই কি শকুনির দৃষ্টি এত প্রখর।

কিছুদিন পরে।

সদ্য-সমাপ্ত জুতাজোড়া হাতে লইয়া বংশী মুচি উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল: চলো নির্ম্মলবাবু, তোমাকেও রাজ-বাড়ীতে নিয়ে যাই। রাজা বাহাদুরকে বলে-কয়ে যদি কোন কাজে বহাল করিয়ে দিতে পারি।

বংশীর একটী পুরাতন খাকি রংয়ের কোট গায়ে দিয়া নির্ম্মল শেষ পর্য্যন্ত রাজবাড়ীতে চলিল। পালকটী কাণে দিয়া একবার রাজসভার মূর্ত্তিটি দেখিয়া লইবার লোভ কিন্তু সে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাই বংশীকে কিছু না জানাইয়া পালকটী পকেটে রাখিয়া দিল।

** রাজপুত্রের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া রাজ-বাড়ীতে মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। প্রাসাদখানি নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য দিয়া সাজানো হইয়াছে।

জুতাজোড়া হাতে লইয়া বংশী রাজসভায় প্রবেশ করিল। মন্ত্রণা-গৃহে অমাত্য পরিবেষ্টিত রাজা কী সব কূট মন্ত্রণার সমাধান করিতেছিলেন, বাহিরের কাহারো তাহা জানা ছিল না।

রাজা ও রাণী পাশাপাশি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, পক্ক কেশ প্রধান মন্ত্রী গালে হাত দিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন, অন্যান্য কয়েকজন প্রধান এবং পদস্থ উচ্চ কর্ম্মচারী চারিদিকে কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় নির্ম্মলকে লইয়া বংশী প্রকাণ্ড এক সেলাম করিয়া জুতাজোড়া রাজার সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়াইল।

জুতা দেখিয়া রাজা ও রাণী বিশেষ প্রীত হইলেন এবং তাহার জুতা তৈয়ারীর খুব প্রশংসা করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন: ইহার জন্য কত দাম দিতে হইবে?

পুনরায় একটী প্রকাণ্ড সেলাম ঠুকিয়া নির্ম্মলকে

দেখাইয়া বংশী বলিল : আমার কোন দাম চাই না মহারাজ, আপনি কোন কাজে এই অসহায় ছেলেটীকে লাগিয়ে দিন, এই আমার প্রার্থনা !

বংশীর দেখাদেখি নির্ম্মলও রাজা-রাণীর উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিল।

রাজা হাসিয়া বলিলেন : এই কথা ? তা' আর কি ?... পরে প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : বংশীর ওই লোকটীকে যে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দিন মন্ত্রী-মশাই।

নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া নির্ম্মলের কি খেয়াল গেল, পকেট হইতে একবার পালকটী বাহির করিয়া সে কাণে দিল। নিমেষের মধ্যে যেন প্রলয় ঘটিয়া গেল! অমন সুন্দর রাজসভা মুহূর্ত্তে একটী পশুর বৈঠকে পরিণত হইল। নির্ম্মল দেখিল, সম্মুখের সিংহাসন জুড়িয়া রাজার স্থানে বসিয়া রহিয়াছে এক প্রকাণ্ড গর্দ্দভ এবং রাণীর সামনে বসিয়া আছে বিরাট আকারের একটী ঘুঘু পক্ষী—গায়ের রং অসম্ভব রকম পীত—এমন হলুদে ঘুঘু সচরাচর নজরে পড়ে না! প্রধান মন্ত্রীর স্থান জুড়িয়া একটী বৃদ্ধ ভেড়া দাঁড়াইয়া লাঙ্গুল নাড়িতেছে। রাজপুত্র হইয়াছে একটী রামছাগল—গায়ের কালো লোমগুলি চক্‌চক্‌ করিতেছে এবং মুখভর্ত্তি দাড়ি নাড়িয়া স্ফূর্ত্তির সহিত সে কি যেন চিবাইতেছে। অন্যান্য আমলাবৃন্দ কেহ হইয়াছে ভল্লুক, কেহ ব্যাঘ্র এবং কেহ বা অন্য কিছুতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বংশী মুচির কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, সে যেমন ছিল তেমনই আছে!

বারেকের জন্য নির্ম্মলের ভয়ানক হাসি পাইল ; কিন্তু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া পালকটী পকেটে রাখিয়া রাজার উদ্দেশে ধীর নম্রকণ্ঠে সে বলিল : মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি বংশীকে ছেড়ে কোথাও থাকব না।

সভাশুদ্ধ সকলে উদ্ধত যুবকের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন – সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। বংশী পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বংশীকে লক্ষ্য করিয়া রাজা কহিলেন : ব্যাপার কি বংশী ? ঐ বাচাল যুবক বলে কি ?

বংশী রাজরোষে পতিত হইবার ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিছু দণ্ডাদেশ জাহির হইবার পূর্ব্বেই হাতজোড় করিয়া নির্ম্মল বলিয়া উঠিল : আমি আপনার চরণে অপরাধী—তা' আমি জানি মহারাজ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন দণ্ডাদেশ প্রদান করবার আগে একবার এই পালকটী আপনার কাণে দিয়ে ঘরখানির অবস্থা পরীক্ষা করতে অনুরোধ করছি।—বলিয়া পালকটী রাজার হাতে দিল।

সভাশুদ্ধ সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইয়া গেলেন। বাতুল যুবকের কথায় রাজা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কাণে পালক দিয়া কিন্তু নিমেষে তাঁহার সে হাসি থামিয়া গেল। অপরিবর্ত্তিত বংশী এবং নির্ম্মলকে দেখিয়া বারবার তিনি নিজের দিকে দেখিতে লাগিলেন।

রাজার ভাবান্তর দেখিয়া রাণী হঠাৎ পালকটী লইয়া নিজের কাণে দিয়া প্রথমে বিস্ময়ে অভিভূতা এবং পরে হাসিয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল : কি আশ্চর্য্য !

এইরূপে একে একে সভাশুদ্ধ সকলেই একবার করিয়া পালকটী কাণে লাগাইয়া স্বীয় মূর্ত্তি দেখিয়া লইলেন। সকলেই বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন।

রাজা হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছু পরে নির্ম্মলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তুমি ঠিকই আবিষ্কার করেছ যুবক, যে দেশের রাজা নিজে গর্দ্দভ, মহিষী যার হলুদে ঘুঘু এবং মন্ত্রী যার মেষ, তার অধীনে কাজ নেওয়া তোমার মতো মানুষের শোভা পায় না। তুমিই আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে দিলে।

তারপর বংশীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন : সকলে শুনে নাও, আজ থেকে বংশী মুচি হবে এ রাজ্যের রাজা এবং এই স্পষ্টবক্তা হবে তার মন্ত্রী।

নতজানু হইয়া বংশী বলিয়া উঠিল : ওর ঔদ্ধত্য ক্ষমা করুন মহারাজ। আপনারা সকলে যে যেরকম আছেন তেমনি-ই থাকুন। আমরা যেমন মানুষ আছি সেই রকম থাকতে দিন। আপনার ওই আসন এমনি-ই কঠিন যে, ওর সংস্পর্শে এলে কালই আর আমাদের মানুষ দেখতে পাবেন না।

সকলে বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া বংশীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীকার্ত্তিক শীল

ছায়া ও কায়ালোক

সঞ্জয়

'গল্পলহরী'র পাঠক-পাঠিকাদের ইংরাজী নববর্ষের শুভ অভিবাদন জানাচ্ছি। নবীন বর্ষ আমাদের প্রাণে নব-প্রেরণার সঞ্চার করুক্, ইহাই আমাদের কামনা।

*　*　*

বড়দিনের আসর কোলকাতায় কাট্‌ল মন্দ নয়। ইংরাজী চিত্র-গৃহগুলি ভাল ভাল ছবি দেখিয়ে কে-কাকে টেক্কা দেবে, এ নিয়ে বেশ উঠে-পড়ে লেগেছিল। সত্যিই তাই, কেউ ই অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটী করে নি। 'কম্পিটিশন' হলে দর্শকেরাই লাভবান হয়, এতে-ও তাই হয়েছিল। অবশ্য, পেছনে টাকার গন্ধের কথা আর নাই-বা বললুম।

*　*　*

'প্লাজা সিনেমা' বড়দিনের বাজারে প্রত্যহ তিনবারের বদলে চারবার করে ছবি দেখিয়েছেন এবং পয়সাও বেশ পিটে নিয়েছেন বলে মনে হয়। কারণ বড়দিনের আসরে তাঁদের 'স্ক্রুজ' বলে ছবিখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল। এই ছবিখানিতে স্যার সেমুর হিক্স-এর অভিনয় অতুলনীয় বললে চলে, তার ওপর চার্লস ডিকেন্সের লেখা গল্প। এই বইখানি আমাদের বেশ ভাল লেগেছে।

*　*　*

'মেট্রো সিনেমা' কোলকাতার দানা-পানি পেটে পড়ে একটু নরম হয়েচে বলে মনে হয়। আগেকার গরম সুর একটু মিইয়ে এসেচে বলেই মনে হচ্চে। অদূর ভবিষ্যতে যে এরা স্বাভাবিক অবস্থাই প্রাপ্ত হবে, তাতে আমাদের অবিশ্বাস নাই। বড়দিনের বাজার তাদের বিমুখ করে নি। একে নতুন ধরণের শ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ তার ওপর তাদের কোন ছবিকেই বাজে বলা যায় না, কাজেই শেষ উদ্দেশ্য টাকার দিক্ দিয়ে, এরাই বোধ করি সকলের চেয়ে সফল হয়েচে।

*　*　*

আর কে-ও এল্‌ফিনিষ্টোন'ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেছিল। পঁয়ত্রিশ সালের এদের ছবি-ই বোধ হয় সব ফিল্ম কোম্পানীকে গড়ে পরাজিত করেছে। উক্ত বছরে কয়েক-খানি শ্রেষ্ঠ ছবি ওরা দেখিয়েছে।

*　*　*

'মেট্রো'র ছবি হাতছাড়া হয়ে গিয়ে 'গ্লোব থিয়েটার' একটু মনমরা হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য কয়েকটী বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানী এদের ছবি দিয়ে সাহায্য করায় বড়দিনের আসর এদেরও মন্দ কাটে নি। তবে, ভেতরের সব খবর জানা সম্ভব নয়।

*　*　*

ভাল ছবি দেখানো নিয়ে 'ফক্স ফিল্ম কোম্পানী'র আগে একটা সুনাম ছিল। এমন দিন-ও চলে গেছে, যখন দর্শকবৃন্দ শুধু 'ফক্সে'র ছবি দেখানো হবে শুনে নির্ব্বিচারে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে গেছেন। কিন্তু আজ কিছুদিন যাবৎ 'ফক্স' কোম্পানী আমাদের বড় নিরাশ করছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁদের তোলা কোনো ছবিই বেশ আকর্ষণকারী হচ্চে না। ফলে, কোম্পানী তাঁর পূর্ব্ব সুনাম বজায় রাখতে পারছেন না। 'প্লাজা সিনেমা' ত ওঁদের ছবির এজেন্সী ছেড়েই দিয়েছেন। উপস্থিত 'ম্যাডান থিয়েটার্স' ওঁদের বই দেখাচ্ছেন। 'ফক্সে'র কলিকাতাস্থ ম্যানেজার মিঃ মেয়ার ছবির উৎকৃষ্টতার দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিচ্ছেন। ফলে, বড়দিনের বাজারে বহুদিন বাদে 'কালিটপ্' বলে একখানি সত্যই সুন্দর ছবি আমরা ম্যাডানে দেখে এসেছি। বইখানি যে সুন্দর হয়েছিল, তার প্রমাণ উপর্য্যুপরি কয়েক সপ্তাহ ছবিখানি এক পল্লীতে চলেছিল। 'ফক্স কোম্পানী'কে পূর্ব্ব সুনাম ফিরে পেতে হ'লে, ভাল ভাল ছবির সৃষ্টি করতে হবে।

*　*

'আর কে ও'র যুগান্তকারী চিত্র 'ইনফরমার' এর একটী দৃশ্যে—ম্যাকলাগান ও মার্গট গ্রেহাম

'এম্পায়ার থিয়েটার' নাচ, গান প্রভৃতি রকমারী প্রোগ্রাম দিয়ে বড়দিনের বাজার মন্দ কাটায় নি। তবে চিত্র-গৃহটীর আগা-গোড়া সংস্কার না করলে, এই আধুনিকতার যুগে ওদের অন্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত হবে।

* * *

বিগত একুশ-এ ডিসেম্বর 'প্যারাডাইল্ সিনেমা'র শুভ-উদ্বোধন হয়ে গেল। অনেক সাংবাদিক এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। 'মেট্রো সিনেমা'-কেও উঁচিয়ে যাবার চেষ্টা হলে-ও, আসলে মিঃ ক্ষেমকা ও চামেরিয়া জয়লাভ করতে পারেন নি, একথা বলা বোধ করি বাহুল্য। তা' হলে-ও এঁদের যন্ত্রপাতি খুব আধুনিক এবং উচ্চশ্রেণীর আমরা 'সিনেমা'টীর দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

* * *

দক্ষিণ কলিকাতা ছেড়ে এবার উত্তর দিকে আসা যাক্। 'চিত্রা' এখনো তাঁদের 'ভাগ্যচক্র' নিয়ে মেতে আছেন। বইখানি যে ভাল হয়েছে, একথা বহুবার বহুলোক বলেছে, কাজেই ও নিয়ে আর সমালোচনা করবার কোনো প্রয়োজন নাই। ছবিখানির অভিনয় এত উচ্চাঙ্গের এবং সুন্দর হয়েচে যে, আশা করা যায়, এই এক ছবিই 'নিউ-থিয়েটার্সে'র ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে।

* * *

'উত্তরা' বড়দিনের বাজারে 'প্রফুল্ল' ছবিখানি দেখিয়ে-ছেন এবং এখনো দেখাচ্ছেন। এই বইখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হয় নি বাঙলায় বোধ হয় এমন সহর এবং গ্রাম কমই আছে। বইখানির আগাগোড়া বড় করুণ কাহিনী-ভরা। ছবি হিসেবেও বইখানি সে-সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতাই এই ছবিখানিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু অভিনয় হিসেবে আমরা সব জায়গায় খুসী হতে পারি নি। বইখানিতে এত বেশী করুণ-রসের সমাবেশ আছে, যাতে করে জায়গায় জায়গায় একটু বীভৎসতার মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে। আধুনিকতার ছাপ-লাগা মেয়েরা এই রসটুকু প্রাণ দিয়ে উপভোগ করবেন কি না সন্দেহ। ছবি গ্রহণ এবং রেকর্ডিং-এর দিক্ দিয়েও ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নি।

* * *

'রূপবাণী'তে 'কণ্ঠহার' ছবিখানির উদ্বোধন হয়ে গেছে। 'রাধা ফিল্ম কোম্পানী' ছবি তোলার দিক্ দিয়ে যে ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, এ-ছবিখানিকে তার একটা প্রমাণস্বরূপ ধরা যেতে পারে। এই নাটক-খানিও থিয়েটারের যুগে বহুবার অভিনয় হয়ে গেছে। 'রাধা ফিল্ম কোম্পানী' ছবিখানির মধ্যে আধুনিক কালোপযোগী অনেক মাল-মশলার জোগান দিয়ে ছবি-খানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলেছে। তাই কিছুকাল ধরে 'রূপবাণী'র দ্বারে জনসমাগম হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

* * *

মাণিকতলার মোড়ে 'ছায়া' ওদিকে অমৃতলালের নাট্য-লীলা 'খাস দখল' খুলে দিয়েছে। এ বইখানিও মন্দ হয় নি। এর বিশদ আলোচনা বারান্তরে করবো।

* * *

'রঙমহলে' শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' বইখানি খোলা হয়েছে। নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। শরৎচন্দ্রের এই বিখ্যাত উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দেওয়া কত কঠিন, তা' সহজেই অনুমান করা যায়। এই নাট্যরূপ দেবার সময় যোগেশবাবু শরৎ দা'র সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু আমরা মোটেব ওপর নাটকের 'কিরণময়ী', 'দিবাকর' এবং 'সতীশ'কে ঠিক্ তাদের উপন্যাসের রূপে দেখতে পাই নি। 'কিরণময়ী' চরিত্রটী সব চেয়ে গোলমাল হয়েচে। তাঁর নাটকে 'কিরণময়ী' চরিত্রটী কোথা-ও ফুটে উঠতে পায় নি। অথচ শরত দা'র এই 'কিরণময়ী' চরিত্রটীই সব চেয়ে অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

তবে যোগেশবাবু নাটকের মধ্যে একটী নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন উপীনের পিতা শিবপ্রসাদ। যোগেশবাবুর এই সৃষ্টিটা সার্থক হয়েচে, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি। এই চরিত্র অভিনয় করেছেন নাট্যকার স্বয়ং। তাঁর অভিনয়-ও খুব উঁচুদরের হয়েচে। অভিনয়ের দিক্ দিয়ে 'উপেনে'র ভূমিকায় মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয় এবং 'হারানে'র ভূমিকায় নরেশবাবুর অভিনয় ভাল লেগেছে। 'সতীশে'র ভূমিকায় রতীনবাবুর অভিনয় এবং 'দিবাকরে'র ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের অভিনয় মোটেই ভাল হয় নি। ধীরাজবাবুকে কোন স্ত্রী-চরিত্রে নামালে কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ করতেন।

সঞ্জয়

একাদশ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪২ | একাদশ সংখ্যা

পরাজয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গীতাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতাম। সে অন্ধ ভালবাসার প্রতিবন্ধক কোন কিছু থাকিতে পারে, তা' কোনদিনও ভাবিবার অবকাশ পাই নাই—আর সেই না পাওয়ার ভুলে আজও বুকের মাঝে রক্ত-অশ্রুতে আমি কাঁদিতেছি।

ঝড়ের রাতে ভয়ে শিশু আমি মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া ছিলাম। জাগিয়া দেখিলাম ফুটফুটে মেয়েটা মার অঙ্ক আমার সায়ত্ব অধিকারে এজমালী মৌরস পাট্টা বসাইয়া নিশ্চিন্তে হাসিতেছে। মনে রাগ বা বিরক্তি আসিল না, বিস্ময়ে অবাক হইয়া শুধু তার হাসি আর খেলা দেখিতে লাগিলাম।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেরে অতু!"

পরাজয় স্বীকার করিতে পারিলাম না, বলিলাম, "খুকী।"

মা ও বাবা ঐক্যতানে হাসিয়া উঠিলেন। দুষ্ট মেয়েটাও দেখাদেখি তাহাতে যোগ দিল। থাকিতে পারিলাম না, লজ্জার হাত এড়াইতেই যেন ছোট্ট হাত দু'টি দিয়া মার মুখ চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কে মা?"

বাবা বলিলেন, "তোর খেলার সঙ্গী।"

মা বলিলেন, "তোর বোন্।"

মার কথা মানিতে পারি নাই, বাবার ক্ষুদ্র ইঙ্গিত-টুকই বড় করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ছিলাম। সেদিন হইতে সুকুমারী আমার খেলার সাথী হইয়াই ছিল, এবং মনে প্রাণে আমি অনন্ত তৃপ্তির অধিকারী হইয়াই ছিলাম।

বাগানের ছোট গাছটী হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ সব আমাদের সে বাল্য খেলার সাক্ষী। তারা দুইটী বালক বালিকার কলহাস্যে পরস্পরের কাছে পরস্পরের লুকোচুরী খেলার প্রতিভূ হইয়া জানি না পাদপ হৃদয়ে সুখ তৃপ্তির সুরসাল অমৃত আস্বাদ করিত কি না, তবে হাসিয়া আপনাদের মঙ্গল আশীষস্বরূপ ফুলপাতার অঞ্জলি শতবার মাথায় দিয়া দু'টী বাল-হৃদয়ের সৌরভ সুষমা আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিত। এ আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি।

সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গীত শিক্ষা বাবা নিজে দিতেন। আমার বাঁশী এবং সুকুমারীর কণ্ঠ মিলিয়া যে একটী সুরের অবতরণা হইত, বাবা নিজে তা' উপভোগ করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না, বান্ধব মণ্ডলীকে ডাকিয়া আনিয়া সে রস পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেন। ইহাতে আমরাও পুরস্কৃত হইতাম কম নহে, ঘরের 'সো' কেসের মধ্যের পদক, উপহারের দ্রব্যগুলি এখনও তার জলন্ত স্মৃতি বহন করিয়া পুরাতন কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

মার কাছে শিক্ষা পাইতাম শিল্পকলা, দেয়ালের এবং আলমারীর অনেক কিছুই সাক্ষী প্রমাণ হইয়া আমায় যেন জ্বালাইতেই এখন সজাগ হইয়া আছে। আমি সেগুলার দিকে তাকাইতেও পারি না, দূর করিয়া ফেলিয়াও দিতে পারি না, অন্য কেহ হাত দিলে রাগিয়া মারিতে যাই।

বিদ্যার প্রতিযোগিতা চলিত, আমরা পরস্পরের ছল ধরিয়া পরস্পরকে হারাইতে চাহিতাম। সুকুমারী হারিয়া গেলে কাঁদিত, আমি সহ্য করিতে পারিতাম না, জিতিলে বারবার জেদ ধরিয়া বলিত, "তোমরা বুঝছ না, আমি ছেলেমানুষ বলে বলছ, কিন্তু জিতেছি আমি নয় দাদা, অতীন দা'।"

দুই

দেখিতেছি ঝড়ের মধ্য দিয়াই আমার এ জীবন। এক ঝড়ে বাবাকে হারাইয়া ছিলাম, অন্য এক ঝড়ের রাতে মা আমাদের ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন, আমরা দু'টীতে একই ব্যথায় গলাগলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে মা সেই ঝড়ের রাতের সমুদয় অশনি আমার মাথায় ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, "সুকুমারীকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম বাবা, ভাল পাত্রে তাকে সমর্পণ করো। ও তোমার বোন্ নয়, আমার কুড়ান পালিত মেয়ে।"

হঠাৎ কিছুই বুঝিলাম না, ভ্যাবাচাকা খাইয়া বলিলাম, "ও কোথায় যাবে মা, আমাদের ঘর ওরই ত ঘর, এখানেই থাকবে।"

মা কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু না তা' আর বলা হইল না, একটা ঘড়ঘড় শব্দের সহিত বাহিরের ঝড়ের ভীম গর্জ্জনের বিকট শব্দ মিশাইয়া সব শেষ করিয়া দিয়া গেল।

কত বুঝাইয়াছি, কিন্তু সুকুমারীর সেই এক কথা, "একত্র মায়ের দুধ টেনে খেয়েছি, একত্র এক কোলের ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব করেছি। না, সে ক্ষেত্রে অন্য সম্পর্ক আসতেই পারে না দাদা, তুমি ভাই আমি বোন, দিতে হয় অন্য যে কোন জায়গায় বিলিয়ে দিও, ঘরে রেখ না, শেষে কি—"

শিহরিয়া উঠিয়া সে ঝরঝর বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিত, কথা শেষ করিতে পারিত না। আমি বিরক্ত হইতাম। নারী জাতির উপর একটা বিকট আক্রোশে অন্তর ক্রমে ক্রমে পূর্ণ করিয়া তুলিল, তবু সুকুমারীকে টলাইতে পারিলাম না। জিভ কাটিয়া সে বলিত, "ছি দাদা! আমি তোমার ছোট বোন যে! ওসব কথা বল্‌লে পাপ হয়, জানো।"

বুঝিলাম, মরুজীবন যাপন করিতেই আমার জন্ম, এ জীবনে উষ্ণার দীর্ঘশ্বাস বহন আমার চিরন্তন নিয়তি। সে নিয়তির সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা যখন মানব শক্তিতে নাই, তখন বিফল আক্রোশ লইয়া কালযাপন করাই আমার অখণ্ড বিধিলিপি।

বিধিলিপির প্রত্যবায় হইল না, মেডিকেল কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র অমিয়কুমারের হাতে সুকুকে তুলিয়া দিয়া আজীবনের ব্রহ্মচর্য্য ও নারীজাতির উপর খড়্গহস্ত

হইবার কঠিন সঙ্কল্প লইয়া জগতের বিপক্ষে দাঁড়াইলাম।

পয়সার আমার অভাব ছিল না, সুন্দরী পাত্রীর দুর্ভিক্ষও জগতে প্রচারিত হয় নাই, তথাপি নিকট বন্ধুর উপদেশ, সুকুর অনুযোগ, ভগ্নীপতির পরিহাস নির্ম্মম কঠোর হইয়াই উপেক্ষা করিলাম।

দেখিলাম অনেক সময় সুকু আমাকে তর্কে হারাইতে আসিয়া কাঁদিত, ক্ষোভের স্বরে বলিত, "এক মায়ের দুধের ধারার কি কোন দাবী নেই দাদা!"

আমি নির্ম্মম কণ্ঠেই বলিতাম, "না।"

সে উপায়হীন ভাবে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিত, হয় ত কোন কিছুর প্রতীক্ষায়। কিন্তু না, সে প্রতীক্ষার দিন যে নিজেই পায়ে দলিয়া চলিয়া দিয়াছে তার উপর আর মায়া কেন?

কিন্তু সে কেন যে কেন, তা' বুঝিতাম না। বুঝিতাম না তাহার মায়াই আমায় তাহার উপর এতটা বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল, "আচ্ছা দাদা, বোন্‌টা বলে ত একবার দেখতেও যাও না, এবার ভাগ্যে এলে দেখব, কেমন না যেয়ে পার?"

তিন

কালরূপী ভাগিনেয়ই তাহাকে হত্যা করিয়া রাখিয়া গেল; নিজে ত বাঁচিলই না, সুকুকে লইয়াও যমে মানুষে টানাটানি চলিল।

নিজে ডাক্তার লইয়া সাতরাত সাতদিন শিয়রে বসিয়া তার চিকিৎসা করাইলাম। আপদ কাটিয়া গেলে সেই বোন্‌ই হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও দাদা, এদেরও ত একটা কর্ত্তব্য আছে, সেটা এদেরি করতে দাও।

খানিক 'গুম্' হইয়া থাকিয়া রাগ করিয়াই উঠিয়া আসিলাম। আমার মনের কথা কিন্তু দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই তার নিকট ধরা পড়িয়া গেল, মুখে কিছু না বলিলেও মুচকি হাসি হাসিয়া সে কেবল আমার পায়ের দিকে তার শীর্ণ হাতটা বাড়াইয়া দিল, রোধ করিতে পারিলাম না।

রাস্তায় তখন প্রকৃতির তাণ্ডব চলিতেছিল, সে কুহক ভালই লাগিল, বৃষ্টির শীতল স্নিগ্ধ সলিল আরামদায়ক অনুভব করিলাম, ভাবিলাম, এই জন্যই বলে, ঘর ভেঙ্গে বাইরে চল। বনে যোগী ঋষিরা কি করেন জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, এ অমৃত যদি ওঁরা ভোগই না করেন তবে তাঁদের সর্ব্বত্যাগের মধ্য দিয়া বিশ্ব উপভোগ বৃথা।

ভেকের কলরব মিঠাই লাগিতেছিল, যেন বিশ্ব বৈতালিক হইয়া তারা নবাগত বরষার স্তুতি গান গাহিয়া চলিয়াছে। বলিতেছ, "ওগো অরূপ! ওগো বিশ্বরাজার প্রেরিত দূত! নির্ম্মল করিতেই তোমার নামিয়া আসা। এসো, এসো, জগতের সব আবিলতা ধুইয়া মুছিয়া স্নিগ্ধ শান্তিতে পরিণত করিয়া দাও।"

ঘরে আসিয়া নির্ম্মম নিষ্ঠুর হস্তে গোলাপদান হইতে ফুলগুলা তুলিয়া ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। শুনিয়াছি, পুস্তকে পড়িয়াছি, তা' ছাড়া অনুভব করিয়াছি, সে স্ত্রীজাতি, অতএব বিনা বিচারে আমার নিকট সে যে পরিত্যজ্য হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

কিছুদিন সুকুমারীর চিত্র আমার মনোজগত হইতে মুছিয়া ফেলিলাম,—ফেলিলাম বলিতেছি, কিন্তু পারিলাম কি?

রাত্রে কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছিল না, সেদিন দুপুরে অমিয়র বাড়ীর ভৃত্য দিনু আসিয়া কাঁদিয়া জানাইয়া গেল, "আমি কিছু ভাল বুঝছি না বাবু! অতবড় রোগ, তার চিকিৎসা বাবু কি না নিজে করছেন, মা ঠাকরুণ বলছেন বটে ভালই হচ্ছে, আমি কিন্তু সে ভালর 'ভ' ও দেখতে পাচ্ছি না। আপনি মার পেটের ভাই থাকতে দেখবেন না, বোন্‌টা বেঘোরেই যাবে?"

বলিয়া দিয়াছিলাম বটে, "কি করব দিনু বিধিলিপি!"

বৃদ্ধ অভিমান করিয়া বলিয়া গেল, "আমি তোমাদের অভিমান-টভিমান বুঝি না বাবু, বলে যাচ্ছি, যদি চাষীর ছেলে হই, তোমাকে সে বাড়ীতে যেতেই হবে, দেখতেও হবে।"

সারারাত যাহাকে ভাবিব না ভাবিয়াছিলাম, তাহারি ব্যথা কাতর মুখখানি ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের সব ক'টি

স্নায়ুকেই দুর্ব্বল করিয়া দিল, আমার পৌরুষ আমার কাঠিন্য আমার নারী বিদ্বেষ কোথায় উবিয়া লয় হইয়া গেল। সঙ্কল্প লইলাম পরদিন প্রসিদ্ধ ডাক্তার লইয়া দেখিতে যাইব এবং ভগ্নীপতির এ অন্ধ একগুঁয়েমীর বিরুদ্ধে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বাঁকাপথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিব।

কিন্তু অন্ধ গরিমা লইয়াই এখন অমিয় বলিল, "আমার দেওয়া ঔষধ কি ঔষধ নয় বলতে চান, বড় বড় ডাক্তার এর পর আর কি ব্যবস্থা করতে পারে।"

তখন শুধুই বিস্মিত হইলাম না, ভয় পাইলাম। গোয়ার্ত্তুমি আর কাহাকে বলে, এইভাবে একটা প্রাণ লইয়া ভাঁটা খেলা সে কেবল সেই করিতে পারে, কারণ সুকুর মূল্য আমার অপেক্ষা বড় করিয়া সে কোনদিন দেখে নাই, দেখিতে পারে না।

যাহা হউক, আমার ডাক্তারের দেওয়া ব্যবস্থা মত ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বাহিরে পাতার উপর বৃষ্টি পতনের ঝির্‌ঝির্ শব্দের কুহক, ঠিক যেন শোকার্ত্তের করুণ ক্রন্দন ধ্বনির মত শোনাইল। মাথার উপর দিয়া অসময়ে পেচক ডাকিয়া গেল। কোনদিন এসব দুর্দ্দৈব বিশ্বাসী নহি; তবু, কেমন যেন আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

চার

কয়েকদিন পরে, প্রাণটা কেমন যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। কারণ হাতের কাছে কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া ভগ্নীকে দেখিতে চলিলাম।

সুকুমারী তার জ্যোতিহীন চক্ষুর মধ্য দিয়া আমাকে যেন সেই পূর্ব্বেরই মত করিয়া দেখিয়া লইতে চাহিল। প্রাণের অফুরন্ত কথায় সে যে কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, তা' বলিয়া শেষ করিতে পারি না। কিন্তু এ কি সত্যই কৃতজ্ঞতা, না আমার ভুলের দণ্ড। কিছুই বুঝিলাম না।

মুখ চূণ করিয়া সেদিন ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম, অমিয়র ব্যবহারও যেন ভিন্ন প্রকারের। আমার নিয়োজিত ডাক্তারের ভুলে তাহারই প্রদত্ত ঔষধে নিজে আমি সুকুর দৃষ্টির অপলাপ করিয়াছি, তাহার জন্য অনুযোগ, না, এক লহমার জন্যও কাহার মুখে বাহির হইল না, তথাপি অনু-শোচনায় আমি মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলাম।

বুকের নির্ম্মম বেদনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বিদেশে পলাইলাম, কিন্তু কোথাও তিষ্ঠাইতে পারিলাম না। আজ সুকুর চিরদিনের নেভা মুখখানি আমার বুকের ভিতর হইতে জাগিয়া উঠিয়া বারবার যেন দেশের পথে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

সুকুর বাটিতে নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছিলাম, কে এক ষোড়শী দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, "শুনছেন? আমার একটু কাজ কর্ত্তে পারেন?"

অপরিচিতার নিকট এভাবে সম্বোধন শুধুই বিস্ময়ের বিষয় নয়, রীতিমত অদ্ভুতও। থতমত খাইয়া হঠাৎ কি উত্তর দিব, ভাবিয়া পাইলাম না।

মেয়েটী প্রতি কথার উপর বেশ জোর দিয়াই বলিল, "আপনি বেটাছেলে না! অসহায় মেয়ে হয়ে আপনার কাছে সাহায্য চাইছি, জবাব কচ্ছেন না, কেমন পুরুষ আপনি?"

ধীরকণ্ঠে বলিলাম, "বলুন কি করিতে হবে?"

মেয়েটী বলিল, "এ বাড়ীর গিন্নী সুকুমারীর বড় বিপদ! তাকে রক্ষে কর্ত্তে হবে।"

চঞ্চল হইয়া বলিলাম, "কে, কে, সুকু, আমার বোন্, কি বিপদ তার, বল বল?"

মেয়েটী জোর করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপর যেন একটু আশ্বস্ত হইয়াই বলিল, "দেখুন, করতে হবে দুটো কাজ, না করলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না, প্রথম, আমায় নিয়ে পৌছে দিয়ে আসতে হবে আমার বাবার কাছে। দ্বিতীয়, শুনেছি আপনি চিরকুমার, কিন্তু তা' আর থাকা চলবে না। আমার গলায় ঘণ্টা করে পরতেই হবে, না না দিদির সতীন আমি হ'তে পারব না।"

মেয়েটী ছুটিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। দু'চারিটা কথা, কিন্তু বলিবার বা বুঝিবার কিছুই আর বাকী রহিল না।

একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার প্রবল উত্তেজনায় অমিয়র ঘরের দিকে পা বাড়াইলাম। দিনু পথে বাধা দিল,

তার সেই চির কৃতজ্ঞ চক্ষু দু'টি তুলিয়া বলিল, "এসেছেন, আঃ বাচলুম! মা ঠাকরুণকে এখান থেকে নিয়ে যান, নইলে, তিনি আর বাঁচবেন না।"

বিমর্ষ মুখে বলিলাম, "একবার চিকিৎসায় অন্ধ করেছি দিনু! আবার! প্রাণটুকু বাকী, না না আমি তা' পারব না!"

দিনু বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলছেন মামাবাবু! মা আপনার দেওয়া একটা ওষুধ কি খেয়েছেন? বাবু যা' দিয়েছেন, তাই ধন্বন্তরী বলে মুখে পূরেছেন, আপনার দেওয়া সব ওই খিড়কীর পুকুরে।"

সব বুঝিলাম, কিন্তু বুঝিলাম না, নারীর এরূপে মিথ্যার উপর দিয়া আত্মহত্যার কারণ কি?

দিনু বলিতে লাগিল, "এবার ওনারা হেমা দিদিকে আনিয়েছে, বড় ভাল মেয়ে, মার যত যত্ন আত্তি ওই করে, করুক, কিন্তু সতীন হবে ত, সে কিন্তু বড় বিশ্রী হবে মামাবাবু! মা বুঝেছেন সব, কিন্তু তবু মুখ ফুটে কোন কথাটী বলছেন না। এখন মাকে বাঁচাতে যদি চান—"

"আমায় নিয়ে এই দণ্ডে যাত্রা করুন—" বলিয়া সেই পূর্ব্ববর্ণিত মেয়েটী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার আর অস্বীকার করিলাম না। সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া তার ডান হাতখানি ধরিলাম।

মেয়েটী মুচ্‌কিয়া দুষ্টামীভরা হাসি হাসিল, বলিল, "দেখবেন, মনে থাকে যেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

সে জবাব দিল, "হায় হায়, আপনি এই বিদ্বান্! কেবল মোটামোটা বই ঘাঁটাই সার! সেকালের রাজপুতের মেয়েদের হাত ধরলে কি হ'ত বলুন ত?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমি রাজী!"

পাঁচ

কি ভাবে জল ঝড়ের মধ্য দিয়া অমিয় হিমুকে সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া ঘরে তুলিতে আসিল এবং তৎপূর্ব্বেই কি ভাবে হিমুর অথবা আমার আইবুড়া নাম খণ্ডন হইয়া গিয়াছিল, তাহা এস্থলে না বলিলেও ক্ষতি নাই। তবে এটুকু বলিয়া রাখা ভাল, মুখ চুণ করিয়া অমিয় ডাক্তার যখন ফিরিয়া চলিল, তখন আগু বাড়াইয়া হিমু তাকে শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে বধির করিবার জোগাড় করিল।

হঠাৎ সে বলিয়া বসিল, "ও গো শুনছ?"

আমি মাথা নাড়া দিয়া বলিলাম, "না, একটা কথাও নয়; কারণ, আমার সঙ্গে যে দুটো কড়ার ছিল, তা' শোধ হ'য়ে গেছে। এবার আমার ছুটী।"

হিমু হাসিয়া লুটাপুটি, বলিল, "ইস্ তাই না কি! এখন শত হুকুম বাকী তা' জান!"

মোগলাইভাবে সেলাম ঠুকিতেই হইল; কারণ, গাঁটছড়ার বাঁধন তখন আল্‌গা হয় নাই। বলিলাম, "ফরমাইয়ে, বান্দা হাজির!"

হিমু রঙ্গভরা হাসি হাসিয়া বলিল, "ইস্, রঙ্গ কত! আচ্ছা, তাই তাই, নিয়ে চল আমার দিদির কাছে। ঠাকুরজামায়ের পৌঁছাবার আগে, বুঝলে।"

বলিলাম, "দেখি জোগাড় করে, আলাদীনের মাটির প্রদীপটা যদি পাই।"

দূরে সোফার 'হর্ণ' দিতেছিল। হিমু বলিল, "বেশী দূর তার জন্যে যেতে হবে না, ওই যে।"

* * * *

প্রথম ভয় কাটিয়া গেলে সুকু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "এ তুই কি করলি বল ত হিমু! একেবারে ব্রহ্মচারীর ধ্যানভঙ্গ!"

হিমু জোর করিয়া মাথা নাড়া দিয়া বলিল "না দিদি, মদন ভস্ম অনেক আগেই শিব ঠাকুরটী করে বসেছিলেন, তবে ভিক্ষের চাল, সিদ্ধি গাঁজা গুছিয়ে গাছিয়ে রাখবারও ত একজন চাই ভাই-"

বলিলাম, "তাই আমার পরাজয় সুকু! আজ জোর করে ও ওর আসন দখল করে নিয়েছে।"

হিমু রাগিয়া বলিল, "আচ্ছা করে এবার কানটায় নাড়া দিয়ে দাও দিদি, ভগ্নীপোত যে, কিছু দোষ হবে না তোমার।"

সুকুর বুকের পাথর নামিয়া গিয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। এখন আর জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই—আমি নারী বিরুদ্ধবাদী। হিমু আমার পরাজয়ের মধ্য দিয়া জয় করিয়া লইয়াছে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক !"

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন দত্ত, বি-এস্-সি

এ গল্পের খাতিরে বলা নয়, নিছক সত্য কথা। এখনও বেঁচে আছে। ইচ্ছা হলে এসে দেখে যেতে পার, কেমন করে কালের কোলে তার ছবিটি ফুটে উঠেছে।

শত বছরের বৃদ্ধ ভিখারী, দৃষ্টিহীন, ক্ষীণ ভঙ্গুর দেহ, চলতে পারে না, হাত পা কাঁপে, গা কাঁপে। দু' পা এগিয়ে যেতে হয় ত এক পা পেছিয়ে যায়।

তবুও চলতে হয়, পেটের দায় বড় দায়।

সম্বল তার ভিক্ষার ঝুলি, একখণ্ড যষ্টীর একপ্রান্তে বেঁধে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিয়েছে, অন্য প্রান্তে একখানি ছোট ঘণ্টা, যা বাজিয়ে 'ফয়া'র পূজারীরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ডান হাতেও তার একখণ্ড যষ্টী, তা দিয়ে দেহের ভার রক্ষা করে, উঁচু নীচু আধপাকা, আধকাঁচা চম্পক নগরের পথঘাট নির্দ্দেশ করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়।

চোখে ভাল দেখতে পায় না, রাত্রিকালে পূরো অন্ধ, দিনের বেলার তীব্র আলোতে চারিদিক ঝাপসা দেখে, তাইতেই পথ চলে।

চলার পথ তার বেশী দূর নয়, ঐ যে 'পেগোডা'র দোর থেকে তার আরম্ভ হয় আর এ পাড়ার কোথায় না কোথায় তার শেষ হয়।

হয় ত সকালে বেরিয়েছে, সূর্য্যদেব হেলে পড়লে দেখতে পাবে রাস্তার ঐখানে সে দাঁড়িয়ে আছে।

সূর্য্য ডুবল, আঁধার ঘনিয়ে এলো, একটির পর একটি তারকা আকাশ পথে ফুটে উঠল। তখন তার আর চলবার উপায় নাই, রাস্তার ঐ বাঁকে হয় ত সে দাঁড়িয়ে আছে, না হয় কোন গাছতলায় বসে আছে।

অজানা, অচেনা কেউ ঐ পথ দিয়ে চলতে ভয়ে 'মা-গো মা' চীৎকার করে ওঠে, পাড়ার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়িয়ে আসে, হয় ত বা তার প্রেতাত্মার মত মূর্ত্তি দেখে ভয়ে ভয়ে দূরে সরে যায়।

ব্রহ্মদেশ ফুঙ্গীর দেশ, দয়ার অবতার বুদ্ধদেব তাদের উপাস্য। কারো কারো প্রাণে এখনও দয়া মায়ার অভাব নাই। ভিখারীকে কেউ খেতে দেয়, কেউ বা হাত ধরে মন্দিরের দ্বারে তার সেই চিরপুরাতন জায়গায় রেখে আসে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মুখে তার একই রব, 'ফয়া'র গীতি। শত দৈন্যে, সহস্র আঘাতে লক্ষ উপেক্ষায় কেঁপে কেঁপে বের হতেছে একই কথা—"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক !"

ঘণ্টাতে মাঝে মাঝে ঘা দেয়। যেন জানিয়ে দেয়, "ও গো, তোমরা আমার 'ফয়া'র পূজার আয়োজন কর !"

*　　　*　　　*

রাস্তায় বের হলে প্রথম প্রথম তাকে সবাই ভিক্ষা দিত, এখন কেউ বা দেয়, কেউ বা দেয় না।

কেনই বা দেবে ! রুক্ষ, জীর্ণ শীর্ণ, নোংরা অন্ধ ভিখারী ! কত দিন আর তার চাওয়া মেটাবে, তাকে খেতে দেবে !

এ যুগ সুন্দরের যুগ, সুন্দর উপাসনার যুগ। জগতের যত ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, জীর্ণবাস, শীর্ণকায়, গলিত অঙ্গ, পলিত কেশ অন্ধ ভিখারীকে আমল দেবার যুগ নয়।

এরা মরে মরুক। মনে হবে এই ড্রেণটা সাফ্ হ'ল, দূরে সরে যাক্, মনে হবে সাম্‌নের দুর্গন্ধ, গুমট আবহাওয়া হাল্‌কা হয়ে এসেছে।

তবুও আশ্চর্য্য, এমন যুগে এসে সে বেঁচে আছে। দিনের পর দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। চম্পক নগরের পথেঘাটে আজও তাকে দেখতে পাবে।

* * *

একদিন,—বর্ষার একদিন, সকাল হতে আকাশ মেঘে ঢাকা, ঝুপঝুপ বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট বড়ই পিচ্ছিল, পা দিতেই পা সরে যায়, লোক বিরল। বৃদ্ধ মংপো সকাল হতে ভিক্ষায় বের হতে পারে নি।

কখন বৃষ্টি থাম্‌বে, চারিদিক ফরসা হবে, ভিক্ষায় বের হতে হবে। প্রতীক্ষায় তার সারাদিন কেটে গেল।

কিন্তু পেটে খিদে, বড়ই খিদে, নাড়ী ভুঁড়ি বা ছিঁড়ে যায়!

তার আগের দিন কিছু পেটে পড়েছিল, তারপর রাত গেল, দিনও যায় যায়, আর থাকতে না পেরে ভিক্ষায় বের হ'ল।

মাথার ওপর তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশের বুক চিরে ক্ষণে ক্ষণে বিজুলী দিক্ বিদিকে ছুটে চলেছে, রাস্তার দু'দিকের নালা তখন বর্ষার জলে কাণায় কাণায় পূর্ণ। এদিক ওদিক দু'চারটে ভেক বিকট চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। বুড়োর আর বেশী দূর যেতে হ'ল না, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল।

পাশের বাড়ীর একটা কুকুর এই পড়ার শব্দে চম্‌কে উঠে ঘেউ ঘেউ করে উঠল; ওদিকের আর একটা কুকুর বৃষ্টি বাদল উপেক্ষা করে তাড়িয়ে আস্‌ল।

বৃদ্ধ মংপো তখন সংজ্ঞাহীন। মুখে গোঁ গোঁয়ানী, নালার অতি নিকটে উপুড় হয়ে পড়ে।

পাশের বাড়ীতে থাকে মা মেয়াসীন, এক বর্ষীয়সী ব্রহ্ম-রমণী। কুকুরের শব্দে চকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরাতে দেখতে পেল অদূরে সংজ্ঞাহীন ভিখারী পড়ে আছে।

—"আঃ মলো, এ আবার মরতে এলো এখানে। এ দুদ্দিনে শেয়াল কুকুরও বের হয় না। এ বের হয়েছে ভিক্ষা করতে না মরতে। ও পোথিন ও পোথিন, তোরা দেখ্ না, বুড়োটা মরেছে না বেঁচে আছে।"

গৃহকর্ত্রীর আদেশে দু'-চারজন লোক গিয়ে ভিখারীকে ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে তুল্‌ল।

ভিখারী তখন সংজ্ঞাহীন, পরিধানের ছেঁড়া লুঙ্গী, গায়ের ছেঁড়া জামা আরও ছিঁড়েছে। কাপড়ে জামায় মাথায় মুখে চোখে গায়ে কাদায় কাদা!—যেন ভূত সেজেছে!

এই করুণ দৃশ্যে দয়াবতী রমণীর কোমল প্রাণ কেঁদে উঠল। ভৃত্যদের আদেশ দিল, কাদা ধুইয়ে দিতে, নতুন লুঙ্গী জামা বের করে পরিয়ে দিতে।

কতক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর তার সংজ্ঞা ফিরে এলো, মুখে রব ফুটল—"ফয়া, ফয়া!" অতি ক্ষীণ অতি করুণ স্বরে বুক চিরে কেঁপে কেঁপে বের হ'ল—"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক হে ভগবান!"

এক আধদিন নয়, কত কতদিন আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে। ঐ পাড়া পড়শীর দয়ায় ফিরে পেয়েছে শত বছরের জীর্ণ দেহখানি।

সজল কণ্ঠে তখন সে প্রার্থনা করেছে—"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক হে ভগবান!"

* * *

বৃদ্ধ ভিখারীর জীবন কাহিনী তোমরা হয় ত কেউই জান না, কোন নবীন যুবক কোন প্রৌঢ় কোন বৃদ্ধ দয়া করে তার কাছে দাঁড়ালে মাঝে মাঝে সে বল্‌তে আরম্ভ করে—"দেখছ বাবুজী, এই দুঃখী ভিখারীকে? শুনবে তার জীবন কাহিনী? আমার দয়াল প্রভুর অপার করুণায় এই শত বছরের জীবনখানি কেমন করে ভরে উঠেছে?"

ভিখারীর কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়, পাগল বলে উপহাস করে, নিষ্ঠিবন ত্যাগ করে।

তা' করুক, তাতে তার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। শত উপেক্ষা, সহস্র লাঞ্ছনা, লক্ষ গঞ্জনা সহা মনের ওপর আর কোন বিকারই জন্মায় না।

বলতে থাকে—"বাবুজী, তখন তোমরা এই পৃথিবীর আলো ছায়া দেখ নাই। তোমাদের সহর এই চম্পক নগর তখন ছিল জঙ্গলময় পাড়াগাঁ। অধিবাসী তখন যারা ছিল, এখন তাদের কেউই নাই। তাদের দু'-চারজন ছিল ধনী, আর সবাই দুঃখী দরিদ্র।

—"আমার বুদ্ধজীর মন্দিরে তোমরা যে দলে দলে

চলেছ, কত দূর-দুরান্তর হতে নরনারী এখানে শিকো (পূজা দিতে) করতে আস্‌ছে, তখন তার অস্তিত্বই ছিল না। শুধু এখানে কেন, শত মাইলের মধ্যে কোন 'পেগোডা'ই তখন ছিল না, শিকো করতে তখন যেতে হ'ত পনের দিনের পথ মেহেলাতে।

—"আমার বাবা ছিলেন এখানকার লুজী (জমিদার)। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান, বিস্তর জায়গা জমি ছিল আমাদের।

—"বাপের একমাত্র ছেলে আমি, অতুল সম্পত্তির ভাবী অধিকারী। বয়স যখন কৈশোরের সীমা পেরিয়ে যৌবনের দিকে ঢলে পড়ল, তখন কত শত কুমারী এল আমার সঙ্গে ভাব করতে।

—"আমাদের দেশের রীতি বাবুজী, তাতে দোষ নাই, ছেলেরা মনের মত মেয়ে চুরি করে নিয়ে বিয়ে করে। বিয়ে করে সুখের ঘর বাঁধে, সংসারী হয়, আমার কিন্তু সেই প্রবৃত্তি কোনদিনই জাগত না, মেয়েদের সাথে মেলামেশা হাসি-তামাসা আমার মোটেই ভাল লাগত না, তাদের প্রতি উদাসীনতারও অন্ত ছিল না, সঙ্কল্প করেছিলাম, বিয়ে করব না।

—"মন সব সময় উড়ুউড়ু করত, লোকালয়ের কোলাহল সহ্য হত না, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হ'ত।

—"আমাদের চম্পক নগরের সীমানা টেনেছে ঐ ছোট নদী। আজ যেমন বিলাতী পানায় বুজে যেতে বসেছে; তখন কিন্তু এমনটি ছিল না। বুকখানি ছিল তার পরিষ্কার, জল ছিল স্বচ্ছ, আকাশের প্রতি রেখাটি তাতে প্রতিবিম্বিত হ'ত।

—"নদীর ঐ সুনীল জলের কি আকর্ষণ ছিল জানি না, আমায় যেন সব সময় কাছে টেনে নিত, সারাদিন, হয় ত বা রাতের অনেকখানি নদীর কূলে কূলে ঘুরে বেড়াতুম, আর আঁকতুম কত স্বপন ছবি, যার কথা আজ মনে নাই।

—"আমার এই উদাসীনতায় মা বাপের অনুযোগের আর অন্ত ছিল না, তাঁরা চাইতেন আমার মনকে সংসারের মধ্যে বেঁধে দিতে, তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা আগ্রহ ছিল আমি যেন সংসারী হই, সুখে থাকি।

—"কিন্তু পথের ডাক যার পড়েছে, ঘরে তার মন টিকবে কেন, মনের বাঁধন যার খুলেছে বাইরের শৃঙ্খলে কেনই বা সে ধরা পড়বে!

—"মা বাপের অনুযোগও আর বেশীদিন সইতে হ'ল না। তিনদিনের জ্বরবিকারে দু'জনই একে একে স্বর্গে চলে গেলেন।

—"তখন আমার কি বা বয়স,—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বুঝি হবে। সংসারের বাঁধন যা' ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে গেল! যাক্, এদিকে নিশ্চিন্তও আমি!

—"এবার কেউই আমায় বিরক্ত করতে আসবে না, চলায় বাধা দেবে না, ঘরের বাইরের, বিষয় বিত্তের উপদেশ আর দিতে আসবে না।

—"ভাবলুম, এবার হতে পাব অখণ্ড অবসর, মন যা চায় তাই করেই বেড়াব।

—"ছোটকাল হতে একই পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি,—নদীর ঐ আঁকাবাঁকা তীর, মনের খোরাক জুটেছে আকাশের ঐ নীলিমা হতে, প্রাণ নাগরদোলায় নেচেছে নদীর বুকের ঐ ঢেউগুলির ওঠা নাবার সাথে সাথে।

—"এবার হতে ঐ পথে চলব, শান্তি কি পাব না? মন প্রাণ কি তৃপ্ত হবে না?

—"দু'-চারদিন নদীর তীরে তীরে ঘুরে বেড়ালুম, ঘুম পেলে গাছতলায় আশ্রয় নিতুম, আঁচল ভরে জল পান করে তৃষ্ণা মেটাতুম, এমন করে দিন চলল।

—"কিন্তু গতি যেখানে বাধাহীন, চাওয়ার বস্তু যেখানে সুলভ, উপভোগের সুযোগ ষোলআনা, সেখানের গোলাপী নেশা যেন ফিকে হয়ে আসে, হাল্কা হয়ে যায় তার আকর্ষণ।

—"মা বাপের শত বাধা উপেক্ষা করে যাকে পাবার এত ইচ্ছা হ'ত, আজ অবাধ সুযোগে তাকে পেয়ে পাবার নেশাই আর রইল না।

—"তাই নদীর তীর আর ভাল লাগল না, দু'-চারদিন কাটিয়ে ঘরে ফিরে এলুম।

—"বাবুজী, আজ দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি, মানুষ শুধু দুই পথেই চলে শান্তি পেতে পারে,—এক পথ সংসারের, অন্য প্রবজ্যায়। কেউ সংসার, পুত্র কন্যা নিয়ে সুখী হয়, কেউ বা গেরুয়া পরে শান্তি পায়।

—"আমার ঐ দুয়ের একটিও সইল না। বলেছি ত সংসারী হতে পারলুম না, জীবন উঠল হাঁপিয়ে।

—"আমার এই হাঁপিয়ে ওঠা জীবনে, এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমার 'ফয়া'জী যেন আমার পথ নির্দ্দেশ করে দিলেন।

—"সেবার বুদ্ধদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে দলে দলে লোক মেহেলার দিকে ছুটেছিল। তাদের যেতে পনের দিন, ফিরতে পনের দিন। তখন রেলগাড়ীর সৃষ্টি হয় নি; তার কৃপায় চলার ছন্দ দ্রুততালে বেড়েও যায় নি। পায়ে হেঁটে তখন চলতে হ'ত।

—"পথে তখন কত কষ্ট, পানাহারের কত কষ্ট! চোর ডাকাতের কত উপদ্রব! তার ওপর মহামারী লাগলে আর কথাই নাই—এ যাওয়া তখন অনেকের শেষ যাওয়াতে পরিণত হ'ত।

—"তাদের কথা বসে বসে ভাবছি, এমন সময় যেন শুনতে পেলুম, কে যেন ভিতরে বসে বল্‌ছে, 'বিষয়-বিত্তে তোমার যখন দরকার নেই, কি হবে আর তার পাহারা দিয়ে? বিলিয়ে দাও না পরের তরে। গগনভেদী দেবতার মন্দির গড়ে উঠুক। দলে দলে নরনারী যুগ-যুগান্তর দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে শান্তি পাবে।'

—"রুদ্ধকণ্ঠে বললাম—'তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হবে হে ভগবান!'

—"তারপর পনের-কুড়ি বছর গেল। এই মন্দির গড়ে তুলতে আমাদের যেখানে বাস্তুভিটা ছিল, সেখানেই হয় এর পত্তন। আমাদের সমস্ত বিষয়-বিত্ত দিয়ে এর কলেবর গঠিত হয়।

—"ইচ্ছা ছিল মন্দিরের অদূরে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আমার গ্রামের ভাই বোন্, আমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর আনন্দ উৎসব প্রাণভরে একবার দেখব, তারপর বিদায় নেব।

—"কাজেও করেছিলাম তাই, কিন্তু সেবার 'মিন্‌ভুর' মহামারীতে আমিও ছিলাম সেখানের অতিথি। বহুমাস ভুগতে ভুগতে চলার ক্ষমতা যখন লুপ্ত হয়ে গেল, তখন কোথায়ও আর যেতে পারলুম না। চির পঙ্গু হয়ে ফিরে আসতে হ'ল আমার 'ফয়া'জীর দোরগোড়ায়।

—"তারপর থেকে শত বছর ধরে মন্দিরের পাহারায় বসে আছি।

—"কতদিনে আমার এ পাহারার শেষ হবে জানি না! জানি না আর কতদিন পরে আমার 'ফয়া' বুদ্ধজী তাঁর কাছে আমায় টেনে নেবেন!"

বৃদ্ধের বলা তখন থামে। থমকে দাঁড়ায় ক্ষণিকের তরে চারিদিকের বাস্তব জগতে। আর তার বুক মথিত করে এক ঝলক আকুল হাওয়া দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যায়।...

* * *

নিশীথ রাতে চরাচর যখন সুপ্ত হয়, প্রকৃতি হয় স্তব্ধ মসীমাখা, তখন হয় ত মাঝে মাঝে শুনতে পাবে ঘণ্টার ধ্বনি, আর হয় ত তার সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষীণ অতি করুণ স্বরে বার হচ্ছে সেই পুরাতন কথা,—"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক হে ভগবান!"

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন দত্ত

মাতৃত্বের অপমৃত্যু

ননী মুখোপাধ্যায়

ঝির্ ঝির্ ঝির্—শ্বেত জ্যোছনার নিরমল ধারা ঝরে পড়ে ধরিত্রীর বুকে—স্নিগ্ধ, শুভ্র, স্বচ্ছ,—প্লাবনে প্লাবনে ধুয়ে দিয়ে যায় ধরণী মেয়ের বুকখানি—তপ্ত ধরার বুকখানি ভরে যায় ফুর্‌ফুরে শীতল হাসিতে···হাসিতে। চাঁদ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে—এই শুভ্র পুলকিত ধরার পানে··পুলকে পুলকে আরও হাসি উছ্‌লে উছ্‌লে পড়ে। চাঁদ চুপে চুপে হাতছানি দিয়ে যেন ধরাকে ডেকে বলে—"আয়—আয়—ওরে আমার অনেক দূরের সাথী, আমার নিভৃত এই বুকের কাছে আয়।—আয়—ওরে আমার অনেক দূরের প্রিয়া, তোর কণ্ঠে থুয়ে অলস বাহু,—চুপে চুপে...কাণে কাণে...করি আমার প্রেমের গুঞ্জরণ...।"

ধরণী হেসে বলে—"যাবো—যাবো যাবো—।"

চাঁদ হেসে বলে—"চুপ্—চুপ্—চুপ্—অত জোরে নয়...ওরা জেগে উঠ্‌বে যে,—আমিই আস্‌ছি তোমার কাছে"—

মাঝের ব্যবধান রচে বিরহ।···ধরিত্রী ফিক্ ফিক্ করে বিলাতে থাকে তা'র শুভ্র হাসির ঢেউ···যৌবন যেন তা'র উছ্‌লে উছ্‌লে পড়ে। সে যেন হেসে বলে—"আস্‌বে কেমন করে, কতদূরে পালিয়েছি বলত।"

চাঁদ হেসে বলে—"তাইতো!—তুমি বড় দুষ্টু!"

ঘুম্ ঘুম্—ঘুমন্ত ধরণী ঘুমায়, রজনী ঘুমায়...ধরণী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখে, তা'র সেই সোণালী স্বপনের মাঝে সে যেন শোনে, চাঁদের প্রেমের বুলি,—মনে হয় চাঁদ যেন নেমে এসেছে ধীরে ধীরে তা'র বুকের' পরে... তা'র অলস আঁখিতে যেন ধীরে ধীরে অধরের পরশ বুলাচ্ছে...তার শীতল পরশ সে যেন অনুভব করে হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দনে।

চাঁদ শুধু চেয়ে থাকে অনিমেষে ফুটন্ত এই ধরণীর পানে...আর নীরবে উপভোগ করে তা'র উছলে পড়া অনন্ত যৌবনের মাধুর্য্যটী।

নিঝুম সুপ্তিজড়ান তৃপ্তি বিরাজ করে ধরণীর ঘুমন্ত কোমল বুকের মাঝে। মলয় সমীরণ হিল্লোলে হিল্লোলে কম্পনের নাচন তুলে নেচে নেচে চলে যায় ধরণীর বুকের ওপর দিয়ে—যেন তা'কে একটু শীতল কর্‌বার জন্যই এই নাচনের প্রয়োজন···তরুরাজি···বনবনানী ধীরে ধীরে ধীরে বুলায় তা'দের পল্লবের চামর...অলস ঘুমে ধরণী যায় ঘুম···

পাশের বাড়ীর কচি শিশুটী ঘুমের মাঝেই কি যেন এক অর্থহীন স্বরগের আধ আধ ভাষায় কেঁদে ওঠে···

মণিতা ঘুমের মাঝেই কোমল বুকের বসনখানি শিথিলতর করে দেয়...কাকে যেন সান্ত্বনা সুধা পান করাবার জন্য...অলস বাহুখানি প্রসারিত করে—আবার সঙ্কুচিত করে আনে কা'কে যেন আরো নিবিড় করে বুকের কাছে টেনে আন্‌বার তরে···আর একখানি দিয়ে ধীরে ধীরে শয্যার উপর আঘাত হানে, যেন কা'র গণ্ডে মৃদু মৃদু আঘাত হেনে ঘুম পাড়াবার জন্য।

হঠাৎ তন্দ্রার নেশা যায় কেটে—মণিতা ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসে—ব্যথাতুর নীরব কণ্ঠে মনে মনে বলে—"কই! কই! কই! সে কোথায়? যে এসেছিল তা'র ঘুমের মাঝে!...এই না সে কাঁদ্‌ছিল ঘুমাতে ঘুমাতে...আহা!—এই না সে কাঁদ্‌ছিলো এক ফোঁটা দুধের জন্য···কত ক্ষুধা না জানি বাছার পেয়েছিলো।

মণিতা তা'র নিজের বুকের দিকে তাকায়...সে যেন দেখ্‌তে চায়, সেখানে কচি অধরের সিক্ত পরশটুকু লেগে

আছে কি না।···বাতায়ন হ'তে নীলিমার বুকে বসে চাঁদ দেখে—আর হাসে।...

নিজের অজ্ঞাতেই মণিতা শয্যা থেকে নামে, সে যেন ঘরের প্রত্যেকটী জায়গায় আতিপাতি করে কাকে খোঁজে··· আঁখিতে তখনও থাকে তন্দ্রার আমেজ... মণিতা ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে যায়, তা'র যেন মনে হয় সে বোধ হয় বাইরে পড়ে গেছে...

পাশের বাড়ীর ছেলেটী তখনও কেঁদে চলেছে...বধূটীও উঠে বসেছে, কচি শিশুটীকে শান্তভাবে তুলে নিয়েছে নিজের কোলের উপর...বধূটী শিশুকে দুধ দিচ্ছে...কচি অধর দু'টী—বৃন্তটীকে হাল্‌কাভাবে আঁকড়ে ধরেছে··· নরম ছোট অধর ঈষৎ ঈষৎ নড়ছে...শিশুটী অতি শান্ত-ভাবে চোখ বুজে পান কচ্ছে কোমল বুকের সুধা...

মণিতার নিদ্রার আবেশ যায় কেটে···সে নিজের ভুল বুঝতে পারে নিজের শুভ্র বসনের দিকে নজর পড়তেই —বুকের অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসে একটী দীর্ঘশ্বাস—বুকভরা নীরব ব্যথা নিয়ে মণিতা ধীরে ধীরে শয্যায় ফিরে আসে।

শয্যার বুকে মণিতা এসে লুটিয়ে পড়ে...আঁখি হ'তে অঝোর ধারায় ঝরে অশ্রুর ধারা...মণিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তা'র পিপাসিত হৃদয়খানি ভরে ওঠে অপূর্ণ মাতৃত্বের ব্যথায়।

মণিতা ভাবে আমার হৃদয়ে মাতৃত্ব ভরে উঠেছে কাণায় কাণায়...অথচ সেখানে একটীও কমল কুঁড়ী কেন ফোটে না.. ভাব্‌নার উত্তর আসে, শুধু আঁখির অঝোর ধারায়।...

মণিতা উপাধানটাকে আঁকড়ে ধরে বুকের সাথে, কি যেন অসহ্‌ এক বেদনা নিয়ে···একটা দমকা বাতাস জগতের বুকের উপর দিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে চলে যায়··· মণিতা জাগে...চাঁদ হাসে···বিধবা কাঁদে ..

উষার আলোক মুছে দেয় রাতের স্নিগ্ধতার সুষমা। ফুলো ফুলো রক্তাভ চোখে মণিতা উঠে আসে শয্যা থেকে... ভোরের শীতল জলে অবগাহন করে, আন্‌মনে এসে বসে পূজার আসনটীতে···মন বসে না...একঘেয়ে সেই রুদ্র পটের মাঝে সে ত পায় না তা'র বাঞ্ছিতকে...হাতের গঙ্গা-জল হাতেই থেকে যায়...একটীও পুষ্প সে পারে না শুষ্ক দেবতাকে অঞ্জলি দিতে...তা'র চরণে একটীও প্রণতি জানাতে ...মণিতা ভাবে এত আমার জন্য নয়...কেমন করে এই নীরস অনুষ্ঠান নিয়ে কাটল অসহ্‌ জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি ?...পূজার ভিতর মণিতা কোনও সান্ত্বনা পায় না, বিরক্তিতে মন ওঠে তা'র ভরে...সে ভাবে—আমার সারা দেহের এই পঞ্জীভূত পরিপূর্ণতা এই মূক প্রাণহীন পটের কাছে ডালি দিয়ে দিয়েই কি দিন কাটাতে হবে ?...কেন আমার জন্য এই কঠোর বিধান ? প্রাণের মহা সত্যটীকে চাপা দিতে হবে অনিচ্ছার এই মিথ্যা আবরণ দিয়ে ?— এই বুভুক্ষ হৃদয় কাটাতে হবে কি একাদশীর কঠোর প্রহসনে ?...অসহ্‌...অসহ্‌···মণিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ..একটা চাপা কান্না বুকের মাঝে গুম্‌রে গুম্‌রে মরে।

বৌদি' গেছে কলতলায়...মণিতা যায় তার ঘরে। ছোট্ট সুকোমল প্রাণীটুকু অঘোরে ঘুমাচ্ছে···ঘুমের মাঝেই অভ্যাসবশতঃ কচি অধর অল্প অল্প নড়ছে···মণিতা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে এই ক্ষুদ্র লোভনীয় প্রাণীটির দিকে... মাতৃত্বে হৃদয় হয়ে ওঠে ভরপূর···মণিতা সম্বরণ করতে পারে না, আবেগভরে তুলে নেয় তা'কে কোলের উপর··· একেবারে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে তাকে বুকের সাথে... চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় ছোট আননখানি,—তবুও যেন পরিপূর্ণ শান্তি পায় না, এত আর তা'র হৃদয় ছেঁচা সুধা নিঙ্‌ড়ানো সাত রাজার ধন একটী মাণিক নয়...এত নয় তার পবিত্র প্রেমের লুক্কায়িত কুঁড়িটী···

তবুও একে নিয়ে খেলা করে...মণিতা যেন একটু সান্ত্বনা পায়, কচি কচি হাত দুটোকে টেনে নেয় বুকের মাঝে, তা'র মুখের উপর নিজের মুখ আল্‌তোভাবে চেপে বলে—"ওরে আমার সোণা"—দন্ত শূন্য মুখে শিশুটী গাল-ভরা হাসি হাসে। মণিতাও হেসে হেসে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে—'আহা—হা, আহা—হা, কত হাসি,—কত

হাসি আমার সোণার!" শিশুটী আরও হাসে, মণিতা পরিপূর্ণভাবে তা'র নরম মাথাটাকে টেনে নেয় নিজের বুকের কন্দরে। সাধ মেটে না, আবার কোলের উপর ফেলে পায়ের নাচুনীতে ধীরে ধীরে নাচায়, আবার তুলে নেয়, আবার চুমু খায়, তবুও পূর্ণতা পায় না,—বৌদি' এসে বলে—"ঠাকুরঝি! এত বেলা হলো, এখনও একে নিয়ে বসে বসে খেলা করছ,—রান্নাঘর যে একেবারে ছিরকুষ্টি হ'য়ে আছে"—

"যাই"—বলে শিশুটীকে সন্তর্পণে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে—অপরাধের ছায়ামাখা মুখে মণিতা উঠে পড়ে।...

কাজে মন বসে না, সে ভাবে—এত বড় জগত, কত তার সুখ, সাচ্ছন্দ্য···কত উপভোগ্য দিয়ে গড়া সে, কেবল তা'র জন্যই নির্দ্দিষ্ট শুধু পূজা আর রান্নাঘর, বাইরে তখন ভিখারীটা গায়—"সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণ নাম জপ মন।" মণিতা রাগে ফুলে ফুলে ওঠে···বিদ্রোহী মন তার ভিখারীটাকে জগত হ'তে তাড়িয়ে দিয়ে আস্‌তে চায়... সে বাটীটাকে দুম করে মেঝেয় ঠুকে দেয়, সমস্ত রান্নাঘর চুপ করে হাসে...মণিতার মনে হয় সে এই ঘৃণ্য আব-হাওয়া থেকে পালিয়ে যায়...বাল-বিধবা ষোড়শী তরুণীর মন ভরে ওঠে বিতৃষ্ণায়, পাশের বাড়ীর শিশুটী কাঁদতে থাকে···মণিতা কাজ বন্ধ করে চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে শোনে...আর মনে মনে আত্মবিস্মৃত হয়েই বলে চলে—"তাই...তাই...তাই!"

জগতের দিন কেটে যায়, মণিতার দিন কাটতে চায় না...সেখানকার অপেক্ষায় ভীরু হিয়া নিয়ে দিন গুজরাণ করে অতি কষ্টে...তা'র দেহের ক্ষুধা নিয়ত তাকে পীড়া দেয়...মন চায় কার পরশ···বাতায়ন ধারে বসে অসীমের পানে সে চেয়ে থাকে...সেই সীমাহীন দিগন্তের পারে পিয়াসী হিয়া কাকে যেন খোঁজে···অভুক্ত কামনা তার প্রয়োজনের দাবী মিটাতে চায় পরিপূর্ণ রূপে। মণিতা উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে কোন চিরকাম্য প্রয়োজনীয় অতিথির দুরু দুরু আগমন ধ্বনি শোন্‌বার জন্য...

তারপর শুভ মুহূর্ত্তে হয় তার আগমন, অচেনা তরুণ অতিথি এসে আঘাত হানে মণিতার হৃদয় দ্বারে ...মণিতা সে দুয়ার উন্মোচন না করে থাক্‌তে পারে না...মণিতা অচেনাকে বরণ করে নেয় হৃদয় মন্দিরে, অতি সন্তর্পণে, অতি গোপনে...ভীরু কম্পিত হিয়া নিয়ে...।

কতকালের বিরহের পর সে যেন ফিরে পায় হারানো সাথী, এর জন্যই সে যেন এতকাল অপেক্ষা করেছিল, তবুও ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়, একটু জোর গলায়ও একটী ভালবাসার কথা উচ্চারণ করবার অধিকার তার নেই। সে ভাবে—কেন আমার এই ভীরুতা? জগতের সকলে যে জিনিষকে পবিত্র বলে আখ্যা দেয়—আর সেইটুকুর দাবী আমি করলেই এত দোষ কেন? সকলে দিনের আলোয় সারা আত্মীয় পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে দয়িতের সাথে পারে মধুর হাস্য-আলাপে মুখরিত থাক্‌তে, জ্যোৎস্নালোকে পুষ্পবিতানে সকলের জ্ঞাতসারে—সমাজের চক্ষে সুন্দরের প্রতীক হয়ে—পবিত্র প্রেমের অভিনয় করে দিন কাটাতে···আর আমার জন্যই বা নির্দ্দিষ্ট গহন আঁধার, ঝড়ের রাত...সংস্কোচ ভীতি, এমন ধারা লুকোচুরী খেলা কেন···কিসের অপরাধ আমার? এ কি আমার পাপ? কই, আমিত কারো শান্তিতে আঘাত হেনে কিছু করছি না,—তবুও ওরা আমাকে এমন করে সামনে রেখে এমন করে অনশনে রেখে শান্তি পায় কেন? চোখের উপর ভেসে ওঠে কঠোর সমাজ...সেখানে তা'র জন্য এত-টুকু দরদ এতটুকু মমতা নেই—না, এত বড় নিপীড়ন মণিতার সহ্য হবে না।

সে তার যৌবন সাথীর কণ্ঠ কোমল বাহুখানি দিয়ে ঘিরে বলে—"ওগো, চল আমরা এখান হতে চলে যাই—আমরা দু'জনে নীড় বাঁধবো কোন একটী ক্ষীণতোয়া নদীর তীরে...নির্জ্জন পল্লীর বুকে···সেখানেত আমাদের বলবার কেউ থাক্‌বে না"—

মণিতার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট তৃণের কুটীর···সরল একটী পরিবার...ছোট ছোট শিশু···কচি কচি মুখ···

হৃদয়ের শেষ কামনাটুকু উজাড় করে'···তীব্রভাবে

মণিতাকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে অতিথি বলে—"তাই চলো"—

যাবার দিন হ'য়ে যায় ঠিক, মণিতা অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করে সেই শুভ বাঞ্ছিত দিনটীর জন্য...দিন আসে, মণিতা প্রস্তুত হয়...কিন্তু অতিথি আসে না। মণিতা ভাবে হয়ত কোনও কারণ ঘটেছে। অবশেষে মণিতা নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারে...বুঝ্‌তে পারে সে আর আস্‌বে না। নিজের অসহায় দেহটীর উপর মণিতার বড় মমতা হয়—সে বলে—"তুমি অসহায়, তাই তোমার এতটুকু মূল্য নেই...তোমাকে কেউ ভালবাসে না, তোমার এই কলঙ্কিত দেহভার বয়ে সমাজ চক্ষে কেউ পতিত হ'তে চায় না, অথচ তোমার উপর অত্যাচার কর্‌তে সকলেই ভালবাসে।"

মণিতার বড় মায়া হয় নিজের উপর, সে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়, তবুও আকাঙ্ক্ষা মেটে না...দ্বিতীয়ের মিটলেও···তৃতীয় তা'কে নিয়ত আকর্ষণ করে, সারা মাতৃত্ব নিয়ে মণিতা অপেক্ষা করে তা'র জন্য···আবার সেই একঘেয়ে প্রকৃতি...সেই একা একা ···।

কিছুকাল যায় মণিতা অনুভব করে কে যেন এতকাল পরে তা'র ডাকে সাড়া দিয়েছে...পুলকে পুলকে ভরে ওঠে তা'র দেহ, লজ্জা, অপমান, কলঙ্কের কথা মণিতার মনেই হয় না...

একটী, দু'টী করে মণিতা দিন গোণে...কবে সে তা'র দেখা পাবে, তা'রি হিসাব করে একান্তে বসে, আর মনের মাঝে রচে হাজার হাজার স্বপ্ন। মাতৃত্বের লক্ষণ তা'র সারাদেহে অল্পে অল্পে ছড়িয়ে পড়্‌তে থাকে···আর তা'রি পুলকের শিহরণ জাগে তা'র দেহের আবর্ত্তে আবর্ত্তে।

কত বাসনা হৃদয়ের মাঝে কুণ্ডলী পাকায়...সে ঘুমায় তা'র দেহের নিভৃত কন্দরে, তা'র রক্ত মাংসের সাথে এক হ'য়ে। মণিতা অনুভব করতে চায় তা'র অস্তিত্ব, কাণ পেতে শুন্‌তে চায় তা'র বাণী···মণিতা নিজেকে বড় সাবধানে রাখে, আহা! তা'র যদি আঘাত লাগে, সে যদি না বাঁচে! মণিতা নিজের মনে মনে ভাবে—ও কি খেয়ে থাকে এতদিন? আহা! না জানি কত ক্ষিধে লেগেছে ওর! তার বক্ষসুধা ভরে ওঠে. কাণায় কাণায়...!

প্রতীক্ষা...প্রতীক্ষা...প্রতীক্ষা··· অসহ্য প্রতীক্ষা নিয়ে দিন কাটাতে হয়। কত দেখার সাধ, অথচ হাজার চেষ্টাতেও দেখবার উপায় নেই, কত আদর করবার ইচ্ছা, অথচ কিছুতেই নাগাল পাবার উপায় নেই...মণিতা কল্পনায় দেখে,—গৌরবর্ণ কায়া, দুধে আলতায় ফেটে পড়া গণ্ড, টুক্‌টুকে লাল ঠোঁট, কচি হাত পায়ের তালু, হালকা মাথার চুল, মিষ্টি মধুর হাসি, অর্থহীন বিচিত্র টুক্‌রা টুক্‌রা আওয়াজ···কচি হাত পা'র নাড়াচাড়া... আর মাঝে মাঝে অর্থহীন ভাষায় কেঁদে ওঠা। মণিতা কল্পনাতেই তুলে নেয় তাকে বুকের মাঝে সান্ত্বনা দেবার জন্য, তবুও থাকতে হয় অসহ্য প্রতীক্ষা নিয়ে।

জানাজানি হয়ে যায়, তবুও চির বাঞ্ছিত দিনটী আস্‌তে আপত্তি করে না। কলঙ্কের অসহ বোঝা চারিদিক থেকে চেপে ধরে মণিতাকে...তবুও মণিতা মুখ বুজে সহ্য করে সমস্ত মৃত্যু জালা সেই একটী মুখ দেখবার আশায়। কলঙ্কের মৃত্যু বাণ বিচরণ করে সারা বাড়ীখানি ভরে, আঘাতে আঘাতে তাকে জর্জ্জরিত করে তোলে—তবুও মণিতা কাঁদ্‌তে পারে না গলা ছেড়ে, সকলে যেন ওর গলা চেপে ধরে বলে—"চুপ! জানাজানি হয়ে যাবে যে।" সারা-বাড়ীটাতে বিরাজ করে একটা থম্‌থমে ভাব—সব জিনিষগুলোই যেন ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বলে—"চুপ! চুপ! চুপ!"

ওরা কি যেন একটা ওষুধের নাম করে, মণিতা ভয়ে শিউরে উঠে!—হত্যা! না—কিছুতেই নয়, সে কিছুতেই ওকে মর্‌তে দেবে না,—কিসের অপরাধ ওর!

—এইত সেবার বৌদি'র ছেলে হ'ল,—বাড়ীর লোকের আহ্লাদ আর ধরে না! বৌদি'রই বা কত আদর! মুখে অরুচি, ভালমন্দ খাবার, সাধ-আহ্লাদ, পাশ করা ধাত্রী, কত সতর্কতা, কত আনন্দ, ঘটা করে ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন—আর তার বেলাই বা কেন এত চুপ! চুপ! কেনই বা এত ষড়যন্ত্র, কেনই বা এত বিষাদের ছায়া?

তার মাতৃত্ব কি মাতৃত্ব নয়, তার প্রেম কি প্রেম নয়? তার সন্তানের কি এতটুকু অধিকার নেই জগতের মাঝে! কি পাপে পাপী সে? যে, তাই তার এই শাস্তির বিধান? আর তারই বা এমন কি দোষ? ছোটবেলায় সে বিধবা হয়েছে এই! তার শিশুর পিতার পরিচয় নেই এই! নাই বা থাকলো, গেলো পরিচয়ে প্রয়োজন কি? যে সৃষ্টির রহস্য থেকে প্রত্যেক নরনারী জন্মগ্রহণ করেছে, এও ত ঠিক সেই ভাবেই এসেছে, এই কি তার যথেষ্ট পরিচয় নয়!

না—না—না—সে যেমন করে হোক্ তাকে বাঁচাবে! কিন্তু বাস্তবের কাছে মণিতাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হয়, সেখানে কোন যুক্তি তর্ক খাটে না—

ওরা জোর করেই নিঝুম রজনীর বুকের মাঝ দিয়ে নিয়ে যায়—সন্তর্পণে—লুকিয়ে লুকিয়ে—নিষ্পাপ শিশুটীকে। বোধ হয় হত্যা করে কোনও 'ডাষ্ট্‌বিনে' নিক্ষেপ করবার জন্য...মণিতা এত বেদনার মাঝেও আবার নতুন করে নতুন ব্যথায় কেঁদে লুটিয়ে পড়ে মাটীর বুকে হাহাকার শব্দে। ওরা ওর মুখ চেপে ধরে...কাঁদতে দেয় না...জানাজানি হয়ে যাবে যে!

দিন কেটে যায়—মণিতাকে কাঁদ্‌তে হয় লুকিয়ে লুকিয়ে একান্ত নীরবে···কেঁদে কেঁদে তার আঁখির বারি শেষ হয়ে যায় তারপর বেরিয়ে আসে বুকের রক্ত জল হয়ে।

কি সুন্দর সে দেখতে হয়েছিল! তাকে একটুও আমাকে কোলে নিতে দেয় নি, তাকে একটুও আমাকে আদর করতে দেয় নি, তার সেই কণ্ঠ একটীও ভাষা, একটীও শব্দ উচ্চারণ করতে কিংবা মা বলতে পায় নি, আমার এতদিনের জমিয়ে রাখা বুকের দুধ একটুও তার মুখে দিতে পারি নি··· সে আমার মরেছে অভুক্ত হয়ে, জান, ওরা আমার নিষ্পাপ হৃদয় ছেঁড়া মাণিককে, আমার চিরকালের জমিয়ে রাখা মাতৃত্বকে হত্যা করেছে জোর করে।

মণিতার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে এই সমস্ত অত্যাচারীর সৃষ্টিকর্ত্তার উপর— তার মনে হয়, সে যদি তাকে নাগালের মাঝে পায়, তা' হ'লে একবার তার বুকের রক্ত পান করে দেখে, তৃপ্তি পায় কি না।

মণিতা কাঁদে, আর কাঁদে...তবুও এতটুকু সান্ত্বনা, এতটুকু দরদ এতটুকু সহানুভূতি পায় না কারো কাছ থেকে। পায় অবহেলা, অনাদর, ঘৃণা।

দিন রাত সে যেন কাকে দেখে, কেমন পিপাসিত ক্ষুধার্ত্ত মুখে তার পানে চেয়ে থাকে...বলে—"মা—মা—এক ফোঁটা দুধ।"

মণিতার মন দিন রাত শুধু উচ্চারণ করে—"হত্যা—হত্যা—হত্যা!"

তবুও দিন কাটে...দিন যায়, রাত আসে···মণিতা ঘুমের মাঝে পাশের বাড়ীর শিশুটীর কান্না শুনে তেমনি করে বুকের বসন শিথিল করে দিয়ে হস্ত প্রসারিত করে... কাকে যেন বুকের কাছে টেনে আন্‌তে চায়, কিন্তু কাউকে না পেয়ে...কি যেন এক হারানোর আশঙ্কায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসে.. তারপর নির্ম্মম বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে ভুল যায় তার ভেঙে···সে তখন হাহাকার করে কেঁদে ওঠে, তার মাতৃত্বের অপমৃত্যুর বুকভাঙা ব্যথা কাঁদায় নিঝুম রজনীকে·· একটা ঝড়ো হাওয়া কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মাটির বুকে আছড়ে পড়তে পড়তে পৃথিবীর এক-প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়......

ননী মুখোপাধ্যায়

পতিব্রতা

শ্রীরাণী দেবী

আজকাল তরুণদের বাঁধা বুলি 'বিয়ে কর্ব্ব না' কথাটা শুনে সাধারণে বিস্ময় বোধ কর্ল না বটে, কিন্তু তার বাবা ভয়ানক চটে গেলেন। ছেলেকে কাছে ডেকে এনে রাগত স্বরে বল্‌লেন, "বিয়ে কর্ব্বি না কি রকম কথা! তোর ঊর্দ্ধতন বাহান্ন পুরুষ বিয়ে করে এসেছেন। আজকালকার ছোক্‌রা তুমি, দু'বছর কলেজে পড়ে খ্রীষ্টানী চাল দেখাতে এসেছ? হিন্দুর ছেলে...তায় আবার কুলীন ব্রাহ্মণ... একটা কেন, দশটা বিয়ের অধিকার আছে। আজকাল অর্থকষ্ট বলেই লোকে একটার বেশী বিয়ে করে না।... বিয়ে তোকে কর্ত্তেই হবে!"

কুনাল যদিও বি-এ পাশ করা ছেলে, তথাপি বাপের কাছে বীরত্ব প্রকাশ করাটা এখনো সে কোনমতেই পেরে ওঠে না। তখনকার মতন সে চুপ করে রইল।

শান্তশীলবাবু মনে ভাব্‌লেন, ছেলে বিয়ে কর্ত্তে রাজী হয়েছে। তখন তিনি আরো কয়েকটা উপদেশ বিয়ের সম্বন্ধে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

নিরুপায় কুনাল বিয়ে কর্ল।

শুভ-দৃষ্টির সময় অন্তরের রুদ্ধ আক্রোশ যেন মাথা খাড়া করে উঠ্‌তে চাইল। বহুকষ্টেও সে ক্রোধ দমন কর্ত্তে পার্ল না, তাই সে নত নয়নে থাকল। কারও কথা সে কানে তুল্ল না, শত অনুরোধ উপেক্ষা করে কুনাল চোখ নীচু করে রইলো...শুভ-দৃষ্টি তাদের হ'ল না।

দুই

বিয়ে করে কুনাল বৌ নিয়ে বাড়ী এলো।

ফুল-শয্যার দিন কক্ষ নির্জ্জন হলে পরে সে ফুলাভরণে সজ্জিতা স্ত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে মৃদু পরিষ্কার কণ্ঠে বল্‌লে, "আমাদের শুভ-দৃষ্টি হয় নি দেখে তুমি কি খুব আশ্চর্য্য হয়েছে সীতা? আচ্ছা, আমি তোমাকে এর কারণ খুলেই বল্‌ছি। বিয়ে কর্ত্তে আমার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না; দেশের দুঃখ প্রতিনিয়ত আমাকে কর্ম্মের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে ইঙ্গিত করছে। ঘরে আমি থাকতে পার্ব্ব না। বাবা আমার মনের কথা কিছু বুঝলেন না, জোর করে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর কথায় বিয়ে কর্লেও সংসারী আমি হব না। কালই আমি এখান থেকে চলে যাব,—হয়ত আর জীবনে তোমার সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎই হবে না।"

নব-বধূ বালিকা নয়; শিক্ষিতা তরুণী সে। স্বামীর এই সংক্ষিপ্ত কথা ক'টি শুনেই সে যেন আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি মনশ্চক্ষে বারেকের জন্য দেখতে পেল। চকিতের জন্য স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তৎক্ষণাৎ চোখ নীচু করে শুষ্ক স্বরে বল্লে, "আপনি তা' হ'লে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবেন?"

কুনাল ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্লে, "গ্রহণ কর্লে তবে ত পরিত্যাগের কথা উঠ্‌বে? গ্রহণ কর্লুম কখন তোমায়? দু'-চারটে মন্ত্র পড়লেই আদান-প্রদান হয় না কি? আমি তোমাকে আগে থেকেই বলে রাখ্‌ছি—আমার আশা তুমি কোরো না। আমি আর আস্‌ব না।"

সীতা একটু সময় চুপ করে থেকে ধীরভাবে বল্‌লে, "আপনি তা' হলে আমার জন্যই ঘর-ছাড়া হ'তে চলেছেন? তার চেয়ে—আমিই এখান থেকে চলে যাব, আপনি মা বাবার কাছে থাকুন; শুধু শুধু তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে কি?"

কুনাল এই প্রথম স্ত্রীর মুখের প্রতি তাকালো। কিন্তু তখনই চোখ সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "তা' হয় না সীতা, ঘর ছাড়া আমাকে হতে-ই হবে। দেশ আমাকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকছে। শত শত নরনারী অনাহারে রোগে শোকে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর পানে ছুটে চলেছে,

কেউ তাদের প্রতি ফিরে তাকায় না···ধনীরা পায়ের ওপর পা দিয়ে আরামে দিন কাটাচ্ছে...। তাই আমরা—কলেজ-ফেরৎ কয়েকটি ছেলে মিলে একটি দল গঠন করেছি...পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে সেখানকার দুঃস্থ লোকদের দুর্দ্দশা থেকে উদ্ধার কর্ব্ব। কত আশা ছিল...বাবা কিছু বুঝলেন না, জোর করে—"

সীতা বাধা দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্লে, "যে সব ছেলেরা এসব কাজ করে, তারা সকলেই কি অবিবাহিত? কারও কি বিয়ে হয় নি? না, অনেকেই আপনার মত স্ত্রী পরিত্যাগ করে—"

কুনাল অন্তরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌ল; উষ্ণভাবে বল্লে, "থামো সীতা, খোঁচা মারা কথা ব'লে কোন লাভ নেই। অপরে যা' খুসী তাই করুক গিয়ে—আমার তাতে কিছু যাবে আস্‌বে না। আমি নারীকে কর্ম্মের অন্তরায় বলে মনে করি। নারী শুধু প্রলোভনের জাল পেতে নির্ব্বোধ মানুষকে শক্তিহীন করে তোলে। আমাকে তুমি কোন কিছুতেই ভুলিয়ে আটকে রাখতে পার্ব্বে না সীতা, গৃহের বন্ধন আমার আল্‌গা হয়ে গেছে...।"

সীতার মুখ দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল, গভীর উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌ল, বল্লে, "আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা এত হীন? ছিঃ ছি, নারীকে তুমি এত ঘৃণা কর!·· সে কথা আবার বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে বেশ জোর গলায়ই প্রকাশ কর্চ্ছ?...এই তোমার শিক্ষার পরিণাম? নারী সম্বন্ধে হীন মনবৃত্তি নিয়ে তুমি কর্ব্বে দেশের সেবা!...আজ হ'তে আমিও প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি,—মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার এ ঘৃণার ভাবটা দূর করাব। নারীকে তুমি একদিন না একদিন অবশ্যই শ্রদ্ধা কর্ব্বে। আমাকে তখন তোমার বড় বেশী করে প্রয়োজন হ'য়ে উঠ্‌বে—যখন কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতা বারবার তোমাকে ধিক্কার দেবে।"

একসঙ্গে এতগুলি কথা ব'লে সে স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি তাকালো।

কুনাল স্ত্রীর কথায় একটু বিস্মিত হ'ল, এবং এই তেজস্বিনী মেয়েটির অন্তরের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়ায় তা'র নিজের মনে একটু আগ্রহের উদ্রেক হ'ল, তখনই নিজেকে কৌতূহল থেকে মুক্ত ক'রে সীতার রাগদীপ্ত সুন্দর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সহজ কণ্ঠে বল্লে, "বেশ, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরো। আপাততঃ আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোব। তুমি খাটের ওপর শোও; আমি এদিকের এই ইজিচেয়ার-খানায় বেশ ঘুমোতে পার্ব্ব। একটা রাত্রি মোটে... আমার এতে কষ্ট হবে না।"

সীতার মুখ অপমানে কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। চোখ নীচু ক'রে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবল, পরে মৃদু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে বল্লে, "আমি কাউকে বিব্রত কর্ত্তে চাই না, আমি এ ঘর থেকে চলে যাচ্ছি"—ব'লে সীতা আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ধীরপদে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। বক্ষের মধ্যে তখন তার আহত নারীত্ব বিদ্রোহ ঘোষণা কর্চ্ছে।

তিন

দশ বছর অতীতের কোলে বিলীন হ'য়ে গেছে। ভূ-কম্প বিধ্বস্ত মজঃফরপুর অঞ্চলের সহস্র সহস্র নরনারীর মর্ম্মন্তুদ হাহাকার দেশবাসীর হৃদয়ে আঘাত কর্ল—সে আহ্বানে শত শত কর্ম্মীরা সাড়া দিল—প্রিয় পরিজন পরিত্যাগ ক'রে দলে দলে লোক ছুটল—ভাগ্য কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত অসহায় নরনারীর সাহায্য কল্লে।

মজঃফরপুরে সহরের মাঝখানে একটি ধ্বংসস্তূপের অদূরে ছোট একটা ক্যাম্প তা'তে আছে কয়েকজন যুবক কর্ম্মী। যদি এতে হতভাগ্য মানুষগুলি একটু স্বস্তি পায় সেই আশায়।

এই স্বেচ্ছাসেবক দলের মধ্যে কুনাল ছিল প্রধান। কুনাল এখানে আহতের সেবা কর্ত্তে এসেছে—কিন্তু পূর্ব্বের মত এখন আর সে কোন কাজেই উৎসাহ পায় না। চারদিকের বিধিব্যবস্থা দেখে সে এখন অনেক কিছু বুঝ্‌তে শিখেছে। একলা যে সব কাজ কঠিন বলে মনে করে—অনেক সময় এমন সব জনহিতকর কাজ সে ছেড়ে দেয়। বস্তুতঃ, এই সব কর্ম্ম সহজ এবং সহনীয় হ'য়ে উঠ্‌ত—যদি সীতা পাশে থাকত।

কুনাল এখন জানতে পেরেছে, নারী শুধু খেলার

আহতদের আর্ত্তনাদে কান পাতা যায় না।—ভাল করে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করা হয় নি—সেচ্ছাসেবকবৃন্দের সংখ্যা কম—আরো লোক চাই।

বিনয় এসে বল্লে, "এই যে আপনি এসেছেন কুনাল-বাবু। আমরা এতক্ষণ আপনার অপেক্ষা কচ্ছিলাম। এদিকে কাজ ঠিক মত হচ্ছে না—একে লোক কম, তার ওপর যারা আছে তারাও ইচ্ছে করেই কাজে মন দিচ্ছে না। আপনি এসেছেন দেখে ঐ দেখুন সব ছেলেরা কেমন তাড়াতাড়ি করে যে যার কাজ কচ্ছে। সত্যি, আপনাকে সকলেই কেমন সমীহ করে চলে।"

কুনাল বল্লে, "বিনোদকে বলে দাও কোলকাতার তার জানাশোনা যে সব ছেলে আছে, তাদের সকলকেই এখানে দু'-একদিনের মধ্যে আস্‌বার জন্য তার করে দিক্।"

বিনয় কুনালের আদেশ বিনোদকে জানাবার উদ্দেশ্যে চলে গেল।

কুনাল এতক্ষণ একরূপ ছিল, এখন একলা হতেই তার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। মিসেস চ্যাটার্জ্জি যে সীতা, এটা সে কমলকে দেখে নিঃসন্দেহে বুঝে নিয়েছে। সীতার সাথে তখন সাক্ষাতের জন্য তার মন অধীর হয়ে উঠল। দু'এক পা সামনে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল একটি মহিলা তার দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে। শঙ্কায় আনন্দে কুনাল বিচলিত হয়ে পড়ল। না জানি সীতা তাকে দেখে কতই খুসী হয়ে উঠবে।

দূর থেকেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি একটু হেসে বল্লে, "আপনি! আপনার কাছেই যাচ্ছি। অজিতবাবু বল্লেন, আমার যে সব জিনিষের প্রয়োজন হবে আপনাকে জানাতে। আপাততঃ আমাকে কয়েক বাণ্ডিল তুলো এনে দিন।" বলতে বলতে সে কাছে এসে কুনালের মুখের দিকে চেয়েই একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো। তাঁর মুখ তখন মৃতের মত বিবর্ণ। সীতা কুনালকে চিনেছে।

কুনাল কিন্তু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, বল্লে, "সীতা! তুমি আমাকে দেখে খুবই আশ্চর্য্য হয়েছ, নয় কি?...কিন্তু আমি পূর্ব্বেই জানতে পেরেছি যে, তুমি এসেছ।"

সে অনেক কিছু মনের আবেগে বল্‌তে যাচ্ছিল, সহসা সীতা সহজভাবে বল্লে, "হ্যাঁ, আপনাকে আমি চিনেছি। আচ্ছা, আমি তা' হ'লে এখন চল্লুম, হাতে অনেকগুলি কাজ আছে। মেয়েদের চিকিৎসার ভার আমার উপরেই কি না।" বলে সে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

কুনাল ব্যগ্রস্বরে বল্লে, "একটুখানি সময় দাঁড়াও সীতা, আমার অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

সীতার মুখ এবার কঠিন হ'ল; বল্লে, "এ সব অবান্তর কথা শোন্‌বার জন্য আমি কোলকাতা ছেড়ে কাজের ক্ষতি করে এখানে আসি নি। আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কারও বাজে কথা শোনবার সময় নেই।" বলে সে অকুণ্ঠিত চোখে কুনালের ব্যথা-মলিন মুখের প্রতি চেয়ে পুনরায় ততোধিক কঠোর স্বরে বল্লে, "মরণাহতের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত—এ সময় আপনার সৌখীন দুঃখের কথা তুলে রাখুন। এখানে আপনি আছেন জানলে আমি কক্ষনো আসতুম না।"

কুনাল ভগ্নস্বরে বল্লে, "যাক্ যাক্, আর আমি কিছু শুনতে চাই নে তোমার কাছে। সীতা, আমার অপরাধ যে কত বড় তা' কি আমি জানি না! আমাকে আরো সহ্য কর্ত্তে হবে! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আর আমি—"

পাঁচ

সীতার তখন বিশ্রামের সময়! সে ছোট একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল। তার পাশেই অনুরূপ চেয়ারে কমল উপবিষ্ট ছিল।

সীতা বহুক্ষণ কি চিন্তা কর্ল, অবশেষে মৃদুস্বরে বল্লে, "কমল, আমি যদি কালকে এখান থেকে চলে যাই, তবে তুমি এখানে থাকতে পার্ব্বে ত? এখানে কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি কোলকাতায় যেতে পার্ব্বে। কেমন, থাকতে ভয় কর্ব্বে না ত?"

কমল ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না দিদি ভাই, ভয় কিসের! আমি খুব থাকতে পার্ব্বো। তুমি মনে কোচ্ছ—আমি এখনো ছোট্ট আছি? আমায় কি কাজ কর্ত্তে হ'বে

তুমি বলে যেও, আমি প্রাণপণ যত্নে সে কাজ কর্ব্ব। কিন্তু তুমি চলে যাবে কেন দিদি ভাই? মেয়েদের চিকিৎসা মেয়েদেরই করা উচিত। তুমি আরো দু'-চারদিন থেকে গেলে ভাল হ'ত।"

সীতা ব্যথাভরা কণ্ঠে বল্‌লে, "সবই বুঝি কমল, কিন্তু তবু আমাকে যেতে হবে এখান থেকে। ভগবান যে অন্যরূপ ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, না গিয়ে আমার উপায় নেই।"

কমল বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বল্‌লে, "ও কথা বলছ কেন দিদি ভাই! কি এমন দরকার যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হ'বে?"

সীতা অন্তরের চাঞ্চল্য দমন ক'রে সহজ কণ্ঠে বল্লে, "আচ্ছা, তা' হ'লে বল্‌ছি কমল। তুমি এই স্বেচ্ছাসেবক-দলের সেক্রেটারীকে দেখেছ?"

কমল উৎসাহপূর্ণ স্বরে বল্লে, "কে কুনালবাবু ত? হ্যাঁ, তাঁকে দেখেছি। ভারী চমৎকার স্বভাব তাঁর! আমাকে ডেকে নিয়ে কত কথা বল্‌লেন। বল্লেন, 'তোমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হ'লে আমাকে জানাবে'।"

সীতা আরক্ত মুখে বল্লে, "ঐ—তিনিই—হ্যাঁ, দশ বছর পূর্ব্বে তাঁর সাথে আমার বিয়ে হয়! তারপর বড় হয়ে তুমি সবই শুনেছ। বুঝেছ, কেন আমাকে পালাতে হবে?"

কমল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সীতা বল্লে, "জীবনে কোনদিন আমি তাঁকে ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্ব না। চিরদিন এমনি দূরে দূরে থেকেই আমার কাজ আমি করে যাব। কারও সাহায্য নেব না, বা কাউকে সাহায্য কর্ব্ব না।"

কমল দিদির আরক্ত মুখের প্রতি তাকিয়ে ধীরভাবে বল্লে, "দিদি ভাই, কুনালবাবুকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। উনি মনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন তোমার ব্যবহারে। তুমি ওঁর সাথে ভাল করে কথা বল।"

সীতা চাপা তীক্ষ্ণস্বরে বল্‌লে, "চুপ কর কমল, তুমি ছেলেমানুষ—সব তাতে কথা বল্‌তে এসো না।"

কমল সহসা উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে, "কিসের ছেলেমানুষ আমি! তুমি নিজের অন্যায় বুঝতে পার্চ্ছ না বলে সবাই-কেই নির্ব্বোধ মনে করো না। কুনালবাবু অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছেন—তুমি জেদ করে তাঁকে তাড়িয়ে দেবে? এতদিন যা' হয়ে গিয়েছে তার আর কি হবে। এখন তোমরা একসঙ্গে ঘর-সংসার কর। সমাজের কাছে তুমি যে কুনালবাবুর স্ত্রী—এটা ত স্বীকার কর্ত্তেই হবে।"

সীতার মুখ এবার পাংশু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পূর্ব্বের পরিত্যক্ত ইজিচেয়ারখানাতে অবসন্নের মত বসে পড়ল। উভয় হস্তে মুখ ঢেকে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে, "তা' হ'লে উনি আইনের জোরে অধিকার দাবী কর্ত্তে এসেছেন—আমি—আমি কি একেবারেই জড় পদার্থ—নিজের ওপর কোন অধিকার, কোন সত্তা আমার নেই!—সে যখন খুসী পরিত্যাগ কর্ব্বে—যখন খুসী কাছে ডাকবে—আমি কি এত তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছি যে—!"

কমল দিদির আর্ত্তকণ্ঠে বিচলিত হ'ল। স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে সে বল্‌লে, "দিদি ভাই, রাগ কোর না আমার ওপর। আমি তোমার চেয়ে অনেক ছোট—তোমাকে আর কি বোঝাব বল!—আমি তোমার জন্যই তোমাকে বল্‌ছি, কুনালবাবুকে তুমি মার্জ্জনা কর।"

ঝড়ের গতিতে সে বাইরে চলে গেল এবং কতক্ষণ পরে কুনালের হাত ধরে ক্যাম্পের ভেতর জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার সেইরূপ ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল।

কুনাল কম্পিত পদে সীতার দিকে অগ্রসর হয়ে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। সীতার হস্তে আবৃত মুখখানি দেখে তার নিজের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। কুনালের মনে হ'ল সীতার ঐ শুভ্র সুন্দর হাত দু'খানি একবার স্পর্শ করে—কিন্তু না, সে অধিকার তার নেই!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সীতা নিজেকে সম্বরণ করে মুখ তুলে দেখতে পেল—সামনেই কুনাল তার ব্যথা-কাতর চোখ মেলে সীতার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এ ছাড়া নিকটে বা দূরে আর কেউ নেই।

সীতা চম্‌কে উঠে চেয়ার ছেড়ে একটু পিছনে সরে দাঁড়ালো।

কুনাল ক্ষীণ হেসে বল্‌লে, "আমাকে দেখে আপনি ভয় পাবেন না মিসেস চ্যাটার্জ্জি, আমি চলে যাচ্ছি এখনি। যাবার পূর্ব্বে আমি বলে যাচ্ছি, আমার মূর্খতার জন্যই আপনার এই অপমান হ'ল। আমি আগে বুঝতে পারলে— যাই হোক্, আপনি আমাকে মার্জ্জনা কর্ব্বেন। নমস্কার।"

কুনাল প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হ'ল।

সীতার দুই চোখ সহসা অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠল— কুনালের এই অভিনব আচরণে! সত্যই কি সে তার কেউ নয়? নাঃ, নিজের দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নয়! সে কুনালকে চায় না।

মুখে সীতা যতই কঠোরতা প্রকাশ করুক না কেন, অন্তরে তার বাহ্যিক আচরণের বিরুদ্ধ ভাবই ক্রমশঃ মাথা খাড়া করে উঠছিল। সুতরাং স্বামীর এই নিঃসম্পর্কীয় কথায় সে ভিতরে ভিতরে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হ'ল, তবু সে সর্ব্বনাশা অহঙ্কারকেই উচ্চ আসন দিল। একটু গর্ব্বিত ভাবেই সীতা বল্‌লে, "নমস্কার। আমি আপনাকে মাপ করলুম।"

কুনাল ক্যাম্পের বাইরে এল। কমল খুব নিকটেই ছিল। সোৎসুক হয়ে বল্‌লে, "কি হ'ল কুনালবাবু, দিদির অভিমান দূর হয়েছে ত?"

কুনাল কমলের কথার উত্তর না দিয়েই বল্‌লে, "আমি কালকেই এখান থেকে চলে যাব। কমল, তুমি আমার হয়ে এখানকার কাজটা চালিয়ে দিও। আমি আজকাল অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। কোন কাজেই আর উৎসাহ পাই না ভাই।"

অন্ধকারের মধ্যে কমল কুনালের মুখ না দেখতে পেলেও তার কাতর কণ্ঠস্বরে সবই বুঝ্‌ল। কুনালের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সনিশ্বাসে বল্‌লে, "ঠিক কথাই বলেছেন কুনালবাবু! আপনার কালই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, নইলে আরো আঘাত হয় ত পাবেন।"

ছয়

ছ' মাস কেটে গেছে।

সীতা কোলকাতার এক হাসপাতালের কর্ত্তৃত্ব হাতে পেয়েছে। কমল তা'র দিদির কাছে থেকেই বি-এ পড়ছে। সেদিন কলেজ-ফেরৎ কমল শুষ্কমুখে এসে বল্‌লে, "দিদি ভাই, একটা খুব খারাপ সংবাদ আছে—বল্‌ব?"

সীতা তখন 'কলে' যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কমলের কথা শুনে বিবর্ণ মুখে বল্‌লে, "কি হয়েছে কমল? বীণার কিছু হয়েছে না কি?"

বীণা সীতার বন্ধু; ভবানীপুরে থাকে।

কমল সহসা রুষ্টকণ্ঠে বল্‌লে, "এ সংসারে বীণা ছাড়া আর কোনও আপনার লোক তোমার নেই কি দিদি ভাই? না, তার বিপদ-আপদ কিছু হতে পারে না?"

সীতা ব্যাকুল হয়ে বল্‌লে, "এখন ঝগড়া রেখে দে কমল, কার কি হয়েছে খুলে বল্। নইলে বুঝ্‌ব কি করে?"

কমল ভগ্নকণ্ঠে বল্‌লে, "কুনালবাবু আজ দু'দিন যাবৎ মেডিকেল কলেজে আছেন। তোমার খোঁজ কচ্ছেন— যাবে তুমি? তাঁর অবস্থা খুবই সাংঘাতিক।"

সীতার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো; পায়ের তলার মাটিটা বুঝি বা এক্ষুণি চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। এক হাতে শক্ত করে কমলের হাতটা চেপে ধরে ব্যথা-দীর্ণ-কণ্ঠে বল্‌লে, "সত্যি···সত্যি বল্‌ছিস কমল, তিনি আমাকে দণ্ড দেবার জন্য আহ্বান কর্চ্ছেন?···যাব কমল, আমি শাস্তি নিতে প্রস্তুত হয়েছি।—চল্, এক্ষুণি সেখানে যাব।"

* * *

মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে উভয়ে প্রবেশ করা মাত্র শিক্ষার্থী একটি ছাত্র এসে কমল ও সীতাকে কুনালের শয্যার কাছে নিয়ে গেল।

কুনাল তখন অজ্ঞান। ডাক্তার এবং ষ্টুডেন্টরা মৃদু-স্বরে রোগ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলছিলেন।

সীতা কুনালের মুখখানির দিকে তাকিয়ে বিবর্ণ মুখে ডাকল—"কমল!" সাথে সাথে সে কমলের একখানি হাত চেপে ধর্‌ল।

কমলের পরিচিত একটি ছেলে অগ্রসর হয়ে এসে কমলকে বল্‌লে, "কুনালবাবু তোমার আত্মীয় বুঝি? গত পশুদিন একটা বাড়ীতে আগুন লাগায় উনি সেই

বাড়ীর একটি ছোট ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুমুখে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসেছেন। বড় মহৎ অন্তঃকরণ এঁর। কিন্তু কি কর্ব্ব, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়েছে।"

অগ্নিদগ্ধ—মৃত্যু-পথযাত্রীর যন্ত্রনা-কাতর মুখখানি দেখে সীতার অন্তরে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করতে লাগ্‌ল। কোথা হতে তখন তার দুই চোখ অনন্ত অশ্রু সায়রের সৃষ্টি করে তুল্‌ল—বুঝি বা এ কান্নার শেষ নাই। নত হয়ে সে স্বামীর জ্বরতপ্ত ললাটের উপর হাত রেখেই চম্‌কে উঠল।

ডাক্তার বিষণ্ণভাবে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, জ্বরটা খুবই। জ্বর ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে—জ্ঞানও হবে। ঐ জ্বরটা ছ'ড়বার সময়ই খারাপ কিছু হবার সম্ভাবনা। আজকের দিনটা কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পার্লে আমরা আশা করতে পার্ব্বো—উনি এ যাত্রা ভাল হয়ে উঠবেন।"

কুনাল যন্ত্রনা-কাতর শব্দ করে চোখ মেলে চাইল। মুখের অবস্থা তা'র অতি ভয়ানক! উভয় গণ্ডের ফোস্কা-গুলা গলে গিয়ে মুখের চেহারা ভীষণ হয়ে উঠেছে। তার দুই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সীতা বুঝতে পারল—সর্ব্বনাশা অগ্নি কুনালের প্রায় সমস্ত দেহেই তার দংশনের চিহ্ন রেখে গিয়েছে। এমন একটা মহৎ প্রাণ সত্যিই কি চিরবিদায় নিতে বসেছে? সে কি আর কুনালের কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাবে? "হে ভগবান, আমার সব কিছুর বিনিময়ে আজ ওঁকে বাঁচিয়ে তোল! আমি যেন ওঁর কাছে মার্জ্জনা চাইতে পারি!"

কুনালকে চোখ মেলতে দেখে সীতা স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে, "আমায় চিনতে পারছ?—আমি সীতা।"

কুনাল প্রথমে মনে কর্ল—এ বুঝি স্বপ্ন! পরক্ষণেই বুঝ্‌লে, এ স্বপ্ন নয়—এ সত্য! সত্যই সীতা তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে।

কুনাল সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়েও ক্ষণেকের জন্য যেন দেহের সমস্ত যন্ত্রনা ভুলে গেল। শিশুর মত আনন্দে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে শক্তি সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে সে বল্‌লে, "তুমি—তুমি—সীতা!...এ তা' হলে স্বপ্ন নয়! আঃ, আর আমার মরণে এতটুকু দুঃখ নেই! তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো সীতা, আমি—"

বাক্য তার শেষ না হতেই সীতা স্বামীর শয্যার পাশে লুটিয়ে পড়ে আর্ত্তকণ্ঠে বল্‌লে, "আর বলো না আমায়! আমি রাক্ষসী—স্বামীকে হত্যা করতে বসেছি—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই! আমার জীবন দিলে যদি তুমি বেঁচে ওঠো—"

ডাক্তার সীতাকে বল্‌লেন, "এ কি করছেন আপনি! দেখছেন আপনার স্বামী কি রকম দুর্ব্বল—যখন তখন 'হার্ট ফেল' কর্ত্তে পারেন। এ অবস্থায় ওঁকে অতটা উত্তেজিত করা আপনার উচিত কি? আপনি একটু স্থির হোন্। আমি আপনাকে আশা দিচ্ছি, উনি এ যাত্রা ভাল হয়ে উঠবেন। সঙ্কট মুহূর্ত্ত কেটে গেছে। আর ভয় নেই। এই দেখুন জ্বরটা কমে এসেছে।"

সীতা চোখ মুছে উঠে গিয়ে কুনালের শয্যা ঘেঁসে দাঁড়ালো। মনে মনে সে বল্‌লে, "তাই হোক ভগবান! আমাকে স্বামী সেবার সুযোগ দাও!"

কুনাল সীতার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "শুন্‌লে সীতা, আমি না কি এবার ভাল হয়ে যাব। দেখো, আবার কিন্তু আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না যেন!"

সীতার চোখ দু'টিতে অশ্রু টলমল করে উঠল। নীরবে সে কুনালের রোগমুক্তির জন্য বোধ করি আপন অন্তর-দেবতার কাছে প্রার্থনা করছিল।

শ্রীরাণী দেবী

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুসরণ]

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুড়ি
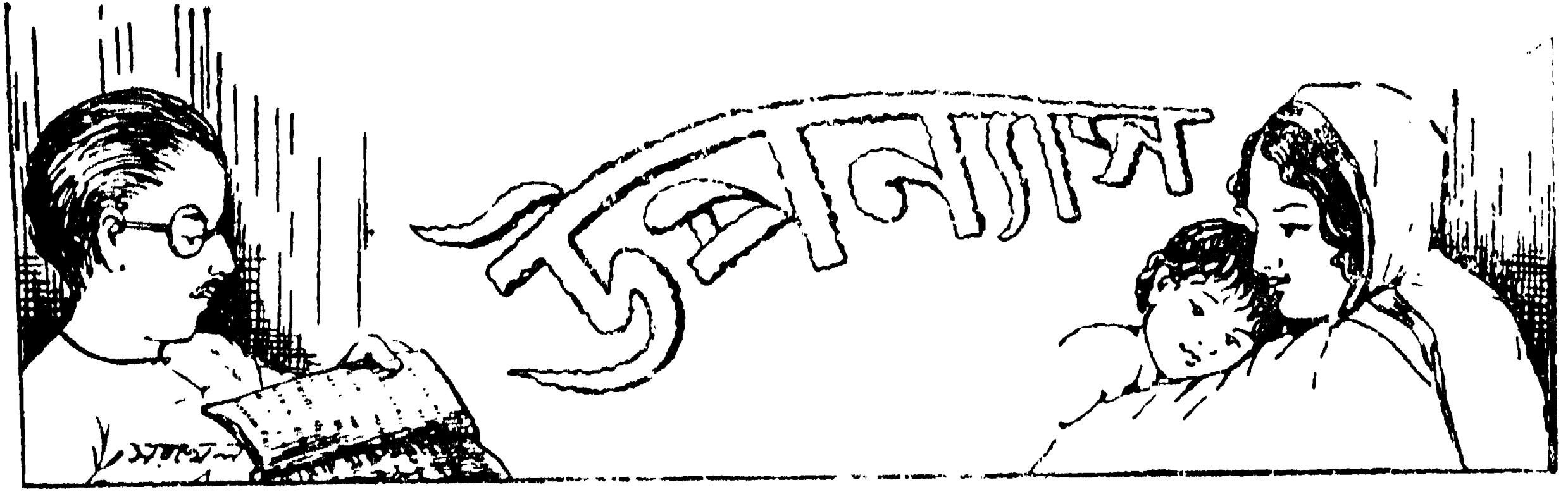
অন্য উকিল করিবার প্রয়োজন অবশ্য হইল না। যেমনি আকস্মিক মোকর্দ্দমার উৎপত্তি হইয়াছিল, তেমনিই অকস্মাৎ সেটা মিটমাট হইয়া গেল। লাভে হইতে পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে ব্যবধান কাঁটার মত বিঁধিতেছিল, তাহার চিহ্নমাত্র আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অবশ্য ইহার মধ্যে ভূপালীর কম কৃতিত্ব ছিল না। তাহার প্রাণঢালা সেবা যত্নে ভুলিয়া বৃদ্ধ রামজীবনবাবু অবশ্যই একদিন তাহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

ভূপালী জিব কাটিয়া বলিল—অমন কথা বল্‌বেন না বাবা, বরং দোষ ত আমারই, আমিই যদি জোর করে আপনার কাছে এসে পড়তুম, তা' হ'লে কি আপনি ফিরিয়ে দিতে পারতেন।

—তা' হয় ত তখন পারতুম। তখন ত তোকে চিনি নি! চোকে ঠুলি পরেছিলুম যে! কিন্তু ক'দিন এসে তুই আমাকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেছিস। মা, তুই চলে গেলে কেমন করে বুড়ো ছেলেটার দিন চল্‌বে বল্ ত? অমন করে কেই-ই বা না বল্‌তে মুখের কাছে সব জুগিয়ে দেবে, কেই বা—

—চুপ করুন বাবা, মা শুনলে এখনই রেগে যাবেন। মেয়েকে বলবেন, এমনই লোক বটে! নতুন মেয়েকে বাড়াতে হবে ব'লে এতবড় বদনাম তাঁর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।

রামজীবনবাবু হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন—ঠিক বলেছিস্ মা, ঠিক বলেছিস্, ও কথা ভাবাই হয় নি বটে। কিন্তু বদনাম চাপাই নি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোর মারও ওই ভাবনা ধরেছে। বিশ্বাস না হয় এখনই মীমাংসা করে দিচ্ছি। ও গো, শুন্‌ছ?

প্রসন্নময়ী সাম্‌নেই নাতিকে কোলে করিয়া বসিয়া হাসিতেছিলেন। বলিলেন—বৌমা ঠিক ত বলেছে, আমি দেখি না যেন!

—দেখ না! রামজীবনবাবু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—দেখ না কে বল্‌ছে। দৃষ্টি খারাপ হয়েছে বলে আপাততঃ দেখ্‌তে পাচ্ছ না তাই ত বল্‌ছিলুম এতক্ষণ।

—ও মা তাই না কি! তা' বয়স ত হচ্ছে, অমন হয়েই থাকে। তবে চোখের জোর কমে এসেছে, তা' চশমা পরা দেখ্‌লেই ধরা যায়। যাক্, আমাদের ঝগড়ায়

বেচারীকে আর জড়াই কেন। সত্যি বৌমা, তুমি এসেছ তাই বাবুর টিকিটি দেখ্‌তে পাচ্ছি। নইলে বার-বাড়ীতে বসে বসে ছায়ের তামাক আর তামাক! যতগুলো অকেজো মিলে কি যে করেন তাও জানি না। খাবার তাগাদা দিয়ে দিয়ে একেবারে হাল্লাক হ'লে তবে যদি বাড়ী ঢোকেন।

ভূপালী হাসিয়া বলিল—এ কিন্তু বাবা আপনার অন্যায়।

—কি অন্যায় মা, বাড়ী ঢুকি না? ওঁর কথা শুনিস্ নি। ওঁরই হুঁস্ থাকে না, যত সব রাজ্যের পাথরের নুড়িনোড়া জুটিয়েছেন, তাই নেড়ে উঠ্‌তেই বেলা তিন প্রহর হয়ে যায়। আমায় ডাক্‌বেন কখন।

—ঠাকুর-দেবতা নিয়ে অমন করে ঠাট্টা করো না, ভাল হবে না—বলিয়া প্রসন্নময়ী মুখ ঘুরাইলেন।

ভূপালী হাসিয়া বলিল—যাই বলুন বাবা, অমন করে খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার করলে বাধ্য হয়ে আমায় এখানে থাকতে হবে। মা ভালমানুষ, ধমকাতে পারেন না, কিন্তু আমি—

তাহার কথা শেষ হইল না। ঠাকুরমার কোল হইতে খোকা হঠাৎ হাত নাড়িয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—আঃ আঃ!

—ও সোনা, তুমি ধম্‌কে দেবে, তাই দে দাদু, তাই দে। আমরা রেহাই পেয়ে বাঁচি। তা' ছাড়া, তোরই ত ধমক দেবার পালা। বাবু রাগ করে এমন ধনকে চোখে পর্য্যন্ত দেখেন নি কতদিন—বলিয়া প্রসন্নময়ী তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

রামজীবনবাবুর চোখ দুইটা বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে নাতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভূপালী কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া হঠাৎ মার কোল হইতে পুত্রকে তুলিয়া লইয়া শ্বশুরের কোলে দিতে দিতে বলিল—দিন ত বাবা শাসন করে। এখনই আমাদের কথার ওপর কথা বল্‌তে আসে দুষ্টু!

রামজীবন পৌত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন; কিন্তু যে জল চোখের কোণ ভিজাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা আর রোধ করিতে পারিলেন না—আশীর্ব্বাদীর মত নাতির মাথায় টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

শুইতে আসিয়া অসীম বলিল—তোমাদের দেশ কোথায় ভূপা?

ভূপালী বলিল—কেন বলো ত?

—এমনি জিজ্ঞেস করছি'।

—মজিদপুর।

—না, ও পুর-টুর নয়, আখ্যা-টাখ্যা হবে নিশ্চয়—বলিয়া অসীম গম্ভীর হইয়া গেল।

ভূপালী সবিস্ময়ে বলিল—পাগ্‌ল হ'লে না কি? আখ্যা-টাখ্যা কি বল্‌ছ সব?

—ঠিকই বলছি ভূপা, নিশ্চয় তোমার বাড়ী কামাক্ষা। নইলে এমন করে জ্যান্ত মানুষগুলোকে ভেড়া বানিয়ে রাখ্‌তে পার কখন?

এতক্ষণে ভূপালীর মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল—তাই বলো, কেন কা'কে আবার ভেড়া করলুম?

—তাঁর নাম মুখে আন্‌লে পাপ হয়। সত্যি ভূপা, বাবাকে এমন করে ক'দিনে তুমি কি মন্ত্রে বশ করলে বল্‌তেই হবে। শুন্‌ছি খোকার অন্নপ্রাশন্ন উপলক্ষ্য করে দশখানা গাঁ নেমন্তন্ন হবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ভূপালীর সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। সে বলিল—এ মন্ত্র নয় গো, এ মন্ত্র নয়, ঠাকুরপোর হাতে যে গরীব দুঃখীদের জন্যে খোকার ভাতের তোলা টাকাগুলো দিয়েছিলুম, এ তাদেরই আশীর্ব্বাদ।

—তাই না কি? আমার কাছ থেকেও সে ছোঁড়া কম নিয়ে যায় নি। আমি কি পেলুম বল ত?

—তুমি কি পেলে বল্‌তে হবে না কি! বাবা মা—আবার কি চাও?

—তা' বটে! কিন্তু সে ছোঁড়া?

ভূপালী বলিল—ঠাকুরপো এর চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছে—পেয়েছে আনন্দ! আর তোমার মত দাদা পাওয়াও ত তার নেহাৎ কম পাওয়া হয় নি।

—এইবার তোমার যুক্তিটা চরমে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি।

ও কথা থাক্, সময়ও বেশী নেই। তোমার কা'কে কা'কে আনাবে বল ত, কালই তার ব্যবস্থা করতে হবে।

—ঠাকুরপো।

—তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না। বাবার ছাড়পত্র আজই চলে গেছে। এ দেউড়ীতে সে অবাধ প্রবেশ লাভ করবে। অন্য কেউ থাকে ত বল? স্কুলের বন্ধু, পাড়ার কেউ বা কোন আত্মীয়কে যদি আন্‌তে চাও—তোমার দাদাকে চিঠি দেওয়া হয়ে গেছে। তোমার বাবাকে আনতে বাবা নিজে যাবেন।

—সত্যি?

—তাই ত শুন্‌লুম।

ভূপালী স্বামীর পায়ের উপর হঠাৎ নিজের মাথাটা ঠেকাইয়া তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল। অসীম বলিল—এ কি হ'ল ভূপা?

—গুরুদক্ষিণা ফেলে রাখ্‌তে নেই, তাই আগেই দিয়ে দিলুম। যে খবর তুমি শোনালে, এর চেয়ে গৌরবের খবর আর আমার কি আছে বল ত? মনে মনে শুধু এই দিনটীর স্বপ্ন দেখেছি এতদিন ধরে।

—কিন্তু তোমার বাবা যদি না আসেন?

—তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন। যদি বা না আসেন, তাতেও দুঃখ নেই আমার। আজ হোক্, দু'বছর পরে হোক্, দশ বছর পরে হোক্ সংস্কারের পাথর ঠেলে তাঁকে সত্যের কাছে মাথা নামাতেই হবে। সে জন্যে নিশ্চিন্ত আছি আমি।

—তোমার নিশ্চিন্ত থাকাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলুম না। এখন বর্ত্তমানে নেমে এলেই অধীন ধন্য হয়—কা'কে কা'কে বলবে ঠিক কর।

ভূপালী চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর বলিল—না, কাউকে মনে পড়ে না আমার। মামার বাড়ীর দেশে একজনকে ভারী ভাল লেগেছিল, বড় ভালবাসতুম তাকে। কিন্তু সে স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্য তার সঙ্গে 'সই' পাতিয়েও ছিলুম। কিন্তু তারপর কোথায় গেল সে, আর কোথায় এলুম আমি। বেঁচে আছে কি না তাই জানি না।

—চমৎকার! 'সই' ভাগ্য মন্দ হয় নি। কিন্তু তাঁকে খুঁজতে যমপুরী পর্য্যন্ত যাবার উৎসাহ বা শক্তি আমার নেই, কাজেই এইখানে ইতি করা গেল—বলিয়া অসীম শয্যা আশ্রয় করিল। ভূপালীও তাহার পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। খানিক এপাশ ওপাশ করিয়া বলিল—ও গো, শুন্‌ছ?

অসীম তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল—কি?

—বাব্বা, বাব্বা, বালিশে মাথাটা ঠেকেছে না ঠেকে নি অমনি ঘুম! এত ঘুমুতেও পার!

—তা' পারি। মিছিমিছি জেগে কি হবে? কেন, কোন কাজ আছে না কি?

—না থাক্‌লে আর ডাক্‌ছি।

—বলো।

—আচ্ছা, 'সই' এর গ্রামে একখানা চিঠি দিলে হয় না?

—ঠিকানা ত জান না বল্‌লে।

—তা' বটে! কিন্তু তার মামাদের বাড়ীর ঠিকানা ত জানি, সেখানে লিখলে তারা তাকে পাঠাবে না?

—পাঠাতে পারে, আবার নাও পারে।

—তা' যা' বলেছ, এমনই চশমখোরই মত বটে তারা। তাদের জঘন্য ব্যাপার দেখলে তুমি অবাক হয়ে যেতে। কত আর বয়স, বছর বার হবে কি না সন্দেহ, তাকে দিয়ে একবাড়ী লোকের রান্না রাঁধিয়ে তবে দু'টি খেতে দিত।

—তবু খেতে দিত, অনেকে ত তাও দেয় না।

—না দেওয়ারই সামিল। আমিই কি ছাই তা' জানতুম! একদিন বেড়িয়ে ফিরছি, পথে দেখি একটী মেয়ে আমার দিকে 'হাঁ' করে চেয়ে আছে। বল্লুম—কি দেখ্‌ছ বল ত, মেয়েদের পায় জুতো কেন তাই বুঝি?

মেয়েটী হেসে ফেল্‌লে। বল্‌লে—জুতো আমিও পরতুম ভাই, তার জন্য নয়, নতুন লোক দেখে দাঁড়িয়েছিলুম।

দু'জনে কথা কইতে কইতে পথ চল্‌তে লাগ্‌লুম। মামার বাড়ীর প্রায় সাম্‌নেই তাদের বাড়ী; সে বাড়ীতে ঢুকে গেল। যাবার সময় বল্‌লে—আবার দেখা হবে ভাই, এখন চল্লুম।

—আচ্ছা এস—বলে বাড়ী ঢুকেই মামীমাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলুম। মামীমা ত শতমুখে তার প্রশংসা করতে লাগলেন। বল্লেন—বছর দুই হ'ল ওর মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছেন। কেউ নেই, মামার বাড়ীতে এসে উঠেছে। যেমনই ছেলেবেলায় সুখ ছিল, তেমনই হয়েছে ওর দুঃখ! যার নিজের জন্য ছিল পাঁচ-সাতটা চাকর বাকর, সেই আজ ঝিয়ের বেহদ্দ—কিন্তু মুখে 'রা'টি শোনে নি কেউ আজ পর্য্যন্ত।

তার কথাগুলো কেমন প্রাণে ছাপ দিয়ে গেল। পরদিন সকাল হতে-না-হতেই মেয়েটীর খোঁজে গিয়ে দেখি, রান্না-ঘরে কোমর বেঁধে সে বেচারী চড়াতে লেগে গেছে। মুখে বল্লে—বসো না ভাই, কিন্তু তার চোখ যেন না বসার কথাই অনুরোধ করছে বোধ হ'ল। তখন চলে এলুম। দুপুরবেলা নিরিবিলিতে গিয়ে গল্প করতে লাগলুম। কি গো, ঘুমুলে না কি?

—প্রায়। তোমার 'সই'-এর গল্প আর কতক্ষণ চল্বে?

—গল্প কোথা। কথা বল্লেই গল্প হ'ল। আর বল্ব না, কালই চিঠি দিয়ে দাও তাদের ওখানে—কেমন?

—তাই দেব—বলিয়া অসীম হাই তুলিল।

—নাও, ঘুমোও। আমার যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই, বকে মরি। ঘুমুই বরং, তাতে কাজ দেবে—বলিয়া ভূপালীও চোখ বুজিল।

একুশ

পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবটা সুচারুরূপেই সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভূপালীর বাপই যে শুধু আসিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার মা ও অন্যান্য সকলেই এ শুভানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। কয়দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। কন্যার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াছে—অসীমের কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতার বাড়ী হইয়া তবে সে যাইতে পাইবে।

অসীমের ছুটীরও শেষ হইয়া আসিয়াছে। দু'-এক দিনের মধ্যেই তাহাকে যাইতে হইবে। ভূপালীর মনে যে বাড়ীর কল্পনামাত্র ছিল না, কয়েকদিনে তাহার প্রত্যেক ইটখানি পর্য্যন্ত যেন তাহার একান্ত আপনার হইয়া গিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে। একদিন সে মনে মনে দিন গণিয়াছিল কবে ছুটির সময় ফুরাইয়া যাইবে, সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। আজ দু'হাত দিয়া সেই দিনগুলাকে ফিরাইতে আনিতে পারিলে সে আর কিছুই চাহে না।

এমনই হয়। মানুষের মনের গহনতলে কত কামনা যে লুপ্ত থাকিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া মারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। তাই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহা না হইলে তাহার বাঁচিয়া থাকা দুর্ঘট বলিয়া মনে হয়, হয় ত মুহূর্ত্ত পরে তাহার চিন্তাও তাহার নিকট ভাল লাগে না। আবার জীবনে যাহার কল্পনাও সে মনের কোণে স্থান দেয় নাই, তাহাকে পাইবার জন্য সময় বিশেষে এতটা কাঙালপণা করিয়া বসে যে, ভাবিলেও লজ্জায় মাথা নীচু হইয়া যায়।

কয়দিন কাজের হট্টগোলে কাটিয়াছে, তাই ভূপালী চেষ্টা করিয়াও অপূর্ব্বের সহিত বসিয়া দু'দণ্ড কথা কহিবার অবসর পায় নাই। সেদিন সুযোগ পাইয়া সে অপূর্ব্বকে ধরিয়া বসিল, বলিল—সমস্তদিন কোথায় থাকো বলো ত? আজ আর পালাতে পাচ্ছ না, বসো, কথা আছে।

অপূর্ব্ব হাসিয়া সামনের পাতা চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল। বলিল—অতবড় দুর্নাম দিও না; তোমার কাছ থেকে পালাব কোথায় বৌদি'?

ভূপালী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—পালাবে কোথায় সে তুমিই জানো। একবার সিং নড়লে ত আর রক্ষে নেই। আচ্ছা ঠাকুরপো, একখানা চিঠি লিখেও কি খবর জানাতে নেই। বন্যায় না হয় গেলে সাহায্য করতে, আপনার লোক মলো কি বাঁচল সে খোঁজ নিতে তোমাদের শাস্ত্রে বাধা আছে মানলুম, কিন্তু যাদের জন্যে গেছ, তাদের জন্যেও ত খোঁজ নিতে পারতে।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—সত্যি, সময় পেয়ে উঠি নি বৌদি'। টাকার চেয়ে দেখলুম কাজের লোকের অভাব ঢের বেশী। তাই সেইদিকেই ঝোঁক পড়ে গেছল, নইলে

আর যে লজ্জাই থাক, তোমার কাছে হাত পাত্‌তে কখনও লজ্জা পেতুম না।

ভূপালী বলিল—থাক্, আর মন রাখতে হবে না। সেখানের সব কাজ মিটে গেছে ত?

অপূর্ব্ব ধীরকণ্ঠে বলিল—অনেকটা। তবে আরও বেশী সেখানে করার দরকার আমি মনে করি নি, তাই চলে আস্‌ব আস্‌ব কর্‌ছিলুম, বাবার চিঠি পেয়ে সটান এখানে এসে উঠেছি।

—ভালই করেছ ঠাকুরপো। তুমি না এলে খোকার ভাতই আমার নিস্ফল হয়ে যেত। সেখানে ভারী কষ্ট সবার, না?

—কষ্ট বই কি বৌদি'। দেখলে চোখে জল সাম্‌লানো যায় না। কিন্তু তার চেয়েতেও ঢের বেশী কষ্ট—

অপূর্ব্বকে চুপ করিতে দেখিয়া অধৈর্য্যভাবে ভূপালী বলিল—চুপ করলে কেন ঠাকুরপো, বলো, তার চেয়েও বেশী কি কষ্ট?

অপূর্ব্বের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মধ্যে যেন কান্নার ভাগই বেশী মাখান রহিয়াছে। সে বলিল—নিজেদের অমানুষ হওয়ায়। দেশটা দিনে দিনে পলে পলে মরতে বসেছে বৌদি'—বুঝি এর উদ্ধার নেই।

ভূপালী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি! ভগবানের মারে যারা মরতে বসেছে, মানুষ তারা হবে কোথা থেকে? অভিমানই বা কর কার উপর।

—মরুক তাতে দুঃখ নেই বৌদি', কোন জাতি চিরদিন বেঁচে থাকতে আসে নি—কিন্তু, মরার মত মরুক, এইটুকুই না আমি চাই। পরাধীনতার লজ্জা লজ্জা নয় বৌদি', ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন বিজিত অন্য দিন জেতার আসন পেয়ে থাকে। এর জন্য দুঃখ কি! দুঃখ সেইখানে, যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব এসে তিলে তিলে নর কঙ্কালগুলোকে গ্রাস করে। বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। তাদেরই সাহায্যের জন্যে আমরা ছুটে চলেছি। হাত পাততে জোয়ান লোকগুলোর বাধছে না একটুও। কিন্তু যদি বল—ভাই, এই চিঁড়েগুলো ওদের ওখানে দিয়ে এস। অমনিই মুখ বেঁকে যাবে। বলবে—কি আমায় কুলী পেয়েছ! যাদের আত্ম-সম্ভ্রম এত নিম্নগামী, তাদের উপায় কি বলো ত?

ভূপালী বলিল—উপায় কি জানি না, কিন্তু তাদের মানুষ করবার ভার যে তোমাদেরই উপর, একথা ভুললে চলবে না ভাই!

—চলবে না বুঝি। চেষ্টাও করতে হবে জানি। তবু মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়ি। মনে হয়, এদের সাহায্য করতে এসে অন্যায় করেছি। দয়া তাদের প্রাপ্য নয়—শাস্তি এদের উপযুক্ত পুরস্কার।

—এ তোমার নিছক অভিমানের কথা ভাই!

—অভিমান! তাই হবে হয় ত। কিন্তু যদি কখন এ জাত জাগে, ধ্বংসের মধ্য দিয়েই জাগবে বৌদি, নইলে নয়। যে জাত ধর্ম্মের নামে কতকগুলো কুসংস্কার, বৈশিষ্ট্যের নামে কতকগুলো লোকের সুযোগ সুবিধা নিয়ে দলাদলি করে' গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, তাদের জন্যে ধর্ম্মের দেবতাও লজ্জায় মুখ ঢাকতে জায়গা পান না। কিন্তু অনেক বাজে বকা হয়ে গেল, তোমার কথা ত কই শোনা হ'ল না।

ভূপালী হাসিল। বলিল—হোক্ বকা, তোমার কথা শুন্‌তে আমার ভারী ভাল লাগে ঠাকুরপো। আমি অবশ্য মানি না বেশী কিছু, তবু শুনেছি ধর্ম্মের নামে কুসংস্কার শুধু আমাদেরই একচেটে অধিকার নয়, যাদের নিয়ে এত কথা বলছ, তাদেরও অনেক আছে।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—কুসংস্কার হ'ল দুর্ব্বল চিত্তের প্রক্রিয়া বৌদি', তাই তা' পৃথিবী থেকে একেবারে লোপ পেয়ে যেতে পারে না। কিন্তু দেখ্‌তে হবে সেইগুলোই জীবনের মুখ্য সম্পদ হয়ে উঠেছে কি না। গৌণ যা' তা' নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অক্ষমদের আত্মপ্রসাদ হয় ত কিছু কিছু লাভ হয়, কিন্তু তাই ত চরম নয় বৌঠান। ধরো, তাদের হয় ত একটা কুসংস্কার আছে, তেরজন এক টেবিলে খেলে বৎসরের মধ্যে একজন মারা যাবে। তারা পারৎপক্ষে তা' খায়ও না। কিন্তু সেই তেরজনে খাওয়ার প্রয়োজন যদি এসেই পড়ে, মরার কথাটা তাদের মনেও থাকে না।

আসল কি তা' জান, তারা সবার চেয়ে প্রয়োজনটাকেই বড় বলে জানে ; কিন্তু আমরা তা' জানি না। আমরা সংস্কারটাকেই পূজো করতে ভালবাসি।

ভূপালী ধীরকণ্ঠে বলিল—হয় ত তোমার কথা সত্য, কিন্তু কতবড় ঝড় ঝাপ্‌টার মধ্য দিয়ে এদেশ আজও টিকে আছে, তা' কি ভাব্‌বার নয় ঠাকুরপো। ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিরা, জ্ঞানীরা সেদিন যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ কি তার দিকে জগৎ বিস্ময়ে চেয়ে নেই ?

—হয় ত আছে বৌদি', তাঁদের গৌরব করতেই বা মানা করছে কে ? কিন্তু এইটুকু কোন কিছুরই বিনিময়ে ভুললে চলবে না যে, কালধর্ম্ম সব ধর্ম্মের ওপরে। তার সঙ্গে পা ফেলে না চল্‌তে পারলে কোন জাতিই জাতি হয়ে উঠ্‌তে পারে না। টিঁকে থাকাটাই পৃথিবীতে সব নয় ; বানরেরাও তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনো টিকে আছে। অনেক অসভ্য জাতি আজও অর্দ্ধ উলঙ্গ অর্দ্ধ পশুর বেশে প্রায় লোকদৃষ্টির অন্তরালে সগৌরবে বিচরণ করছে। কিন্তু তা'তে কি এসে যায়। হয় ত বলবে—তাদের পিছনে উত্থানের ইতিহাস যখন নেই, তখন পতনের মর্ম্মই বা তারা উপলব্ধি করবে কেমন করে ? বেশ, সে কথাই স্বীকার করে নিলুম—কিন্তু অতীত গৌরবের জের টেনে চলার মত আত্মপ্রবঞ্চনা আর কি আছে বৌঠান ? ট্রয়রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের উত্তরাধিকারীরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুদ্রা খরচ করে' ভগ্নাবশেষ স্মৃতিচিহ্নগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে—সম্মানার্থে। কিন্তু তাই করেই তারা জাতির দায়ীত্ব ভুলে চুপ করে বসে নেই। তারও চেয়ে মহান পদচিহ্ন পরবর্ত্তীদের জন্যে রেখে যাওয়ার উদ্যোগে জীবনান্ত হতেও তারা পেছুচ্ছে না। এই ত জাতির প্রতি সত্যকার সম্মাননা।

এই সময় অসীম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল—কি ব্যাপার! একেবারে জোর আসর চলেছে যে তোমাদের। ওদিকে অপার জন্যে কতকগুলি ছেলে এসে খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছে। কি বল্‌ব বলো ত ?

অপূর্ব্বের মুখখানি নবোঢ়া বধূর মত দাদার আগমনে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ভূপালী তাহা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—দু'দণ্ড বসে যে ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বল্‌ব, তার যো নেই ? একটু পরে আস্‌ছে। তারা বাইরের ঘরে বসুক ততক্ষণ।

অপূর্ব্ব নিজেই বাহির হইয়া যাইতেছিল, অসীম বাধা দিয়া বলিল—আচ্ছা, তাই বলে দিচ্ছি। তোদের কথা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিয়ে আয় বরং—বলিয়া সে নামিয়া গেল।

ভূপালী বলিল—ওরা কারা ঠাকুরপো ?

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—আমারই মত ক'টা ভবঘুরে বৌদি'। আমার কাছে এসে ধরে বসেছে, এ গাঁয়ের কাছাকাছি কোন মেয়ে স্কুল নেই, যেমন করেই হোক একটা করে দিতে হবে।

—তা' কি ঠিক করলে ?

—কিছুই করি নি বৌদি', ভাবছি। বাবাকে গিয়ে ধরব, যদি মাস মাস কিছু দেন, আর একটা বাড়ী—

ভূপালী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—বাবাকে ধরতে তোমার ভয় করবে না ঠাকুরপো? এমনই ত তাঁর সাম্‌নে আস না। উনি সেদিন এই নিয়ে কত হাসাহাসি করছিলেন।

অপূর্ব্ব ধীরকণ্ঠে বলিল—ভয় সত্যিই আমার করে, কিন্তু কাজের সময় কি জানি ও সব কথা মনেই থাকে না বৌদি'।

—কিন্তু বাবা যদি না দেন ?

—তোমাকে ধরব।

—বারে, বেশ লোক ত ! আমি কোথায় পাব ?

—তা' জানি না। বাবাকে ধরবে, দরকার হয় দাদাকে ধরবে। তোমরা না দিলে আমি কার কাছে যাব বল ত !

ভূপালীর চোখ দুইটা বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—তাই হবে ঠাকুরপো। তুমি বলো বাবাকে, তিনি যদি না দেন, আমি ধরব 'খন। এমন সৎকাজে না বললেই হ'ল কি না। কিন্তু—

—কিন্তু কি বৌদি' ?

—তা' হলে ত তুমি এখানেই থাকবে ভাই, আমার সঙ্গে যাবে না ত ?

তাহার এই বালিকা-সুলভ বলার ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব হাসিয়া ফেলিল। বলিল—একটা স্কুল হবে, তার জন্যে আমাকে এখানে থাকতে হবে কেন? যারা উদ্যোগী, তাদের যদি চেষ্টা না থাকে, গ্রামের লোক যদি এটা না চায়, একদিন ত উঠে যাবেই; তার জন্যে আফ্‌শোষ করে' লাভ?

—কিন্তু না চাইলেই ছেড়ে দেব? না না, তাদের চাওয়াতেই যে হবে। ওষুধ গেলার মত করে যে গেলাতে হবে ভাই! বুঝিয়ে দিতে হবে—শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এ ছাড়া বেঁচে থাকা, না বাঁচারই নামান্তর।

অপূর্ব্ব হাসিল; উত্তর করিল না।

সপ্রতিভ কণ্ঠে ভূপালী বলিল—হাস্‌লে যে? ভুল বলেছি বুঝি? তা' হবে। কিন্তু যেদিন থেকে তোমার সংস্পর্শে এসেছি, সেদিন থেকে পাগলের মত এই সবই ভেবে মরছি। ভুল-ভ্রান্তি থাকবেই, শিখিয়ে দিতে হবে ত তোমাকে।

অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না না, ভুল তুমি বল নি বৌদি'। বরং তোমার মত মেয়ে যত আমাদের ঘরে আস্‌বে, ততই দেশের সুদিন ভেবেই হাসছিলাম আমি।

—থাক্‌, বাজে বক্‌তে হবে না; লজ্জা দিতে আছে বুঝি গুরুজনকে। যাও, কিন্তু এখনই এসে বাবা কি বল্‌লেন বলে যেও কিন্তু।

—আচ্ছা—বলিয়া অপূর্ব্ব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

ঠাকুরপো এবং বৌদি'র চেষ্টায় রামজীবনবাবুকে বাধ্য হইয়াই 'প্রসন্নময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে'র জন্য জমি হইতে আরম্ভ করিয়া ইট কাঠ চুণ সুরকী করিয়া সব ব্যয়ই বহন করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইল। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রীই প্রয়োজন; তবে বিশেষ করিয়া না জানাশোনা লোক রাখা হইবে না বলিয়া মাষ্টার রাখাই আপাততঃ স্থির হইল। অদূর ভবিষ্যতে যে শিক্ষয়িত্রী রাখিতেই হইবেই, ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। বৃদ্ধ রামজীবনবাবু স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিতেও রাজী ছিলেন, কিন্তু ভূপালীর জেদে তাহা আর সম্ভব হইল না। সে অসীমকে ধমক দিয়া নিজেই তাহা পাঠাইবার অঙ্গীকার করিয়া সাশ্রুনয়নে শ্বশুর এবং শাশুড়ীর পদধূলি মাথায় দিয়া স্বামীর সহিত তাহার কর্ম্মস্থানের দিকে অগ্রসর হইল।

রামজীবনবাবুর কাতরতা দেখিয়া সে ঠিক করিয়াছিল, এখন আর যাইবে না, কিন্তু তাহা হইল না। বৃদ্ধ পুত্রের অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া জোর করিয়াই তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। কথা রহিল—'প্রসন্নময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে'র উদ্বোধন দিনে তাহাকে লইয়া আসিয়া অসীম কিছুদিন থাকিয়া যাইবে। ভূপালীর জেদে অপূর্ব্বকেও তাহাদের সঙ্গী হইতে হইল।

বাইশ

যান-পথ শেষ করিয়া যখন তাহারা তাহাদের কর্ম্মস্থানের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চাকরটা ষ্টেশনেই গিয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া জিনিষ-পত্র নামাইতে সুরু করিয়া দিল। ফিরজা রঙের একখানি শাড়ী পড়িয়া একটী কিশোরী বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভূপালীকে প্রণাম করিয়া খোকাকে কোলে টানিয়া লইল।

ভূপালী হাসিয়া বলিল—কেমন আছ শোভা? বাবা কেমন আছেন?

মেয়েটী মৃদুকণ্ঠে বলিল—আমরা ভাল আছি দিদি, পথে কোন কষ্ট হয় নি ত?

—যদিও বা হয়ে থাকে, তোর চাঁদমুখ দেখে সব দূর হয়ে গেছে। চল্‌, ভেতরে যাই—বলিয়া কিশোরীকে একরূপ টানিয়া লইয়াই ভূপালী বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

হতভম্বের মত অপূর্ব্ব খানিক সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বাহিরের ঘরে উপবেশন করিল। অসীম পরিচিত দুই-একজনের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব্ব যদিও ভাল করিয়া মেয়েটীকে দেখে নাই, তথাপি চেনাশোনার মধ্যে যে কেহ হইবে ইহা সে ধরিতেই পারিল না। তাহার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। সে আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া মেয়েটী কে ইহার আবিষ্কারে লাগিয়া গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবিবারও অবসর তাহার হইল না, দরজার পাল্লাটা 'ঠক্' করিয়া উঠিতেই সে চাহিয়া দেখিল—কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে মুখ ফিরাইল। কিন্তু সে ভাবে থাকাও তাহার সম্ভব হইল না। মেয়েটী তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—অমন করে মুখ ফেরাচ্ছেন যে! চিন্তে পারেন নি বুঝি? তা' নাই পারুন, দিদি পার্‌লেই হ'ল। দিদি বল্‌লেন—আপনাকে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে, চা'র যোগাড় করছেন, এখনই হয়ে যাবে।

অপূর্ব্ব মেয়েটীর দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই চমকিয়া উঠিল। বলিল—তুমি! তুমি এখানে কবে এলে?

মেয়েটী হাসিয়া বলিল—আপনি চলে যাবার পরই। বাবার অবস্থাও ভয়ানক হয়ে পড়েছিল। দিদি নিজে গিয়ে জোর করে আমাদের টেনে এনেছেন। আপনি জানেন না?

অসহায়ের মত ঘাড় নাড়িয়া অপূর্ব্ব বলিল—না।

কিশোরী বলিল—আচ্ছা লোক কিন্তু আপনি, একবার খোঁজও নিলেন না, রইলুম কি গেলুম! কিন্তু যা' ভেবে পালাতে চাইলেন, তা' ত আর হ'ল না, সেই ঘাড়েই এসে পড়লুম ত?

—না না, তা' নয়, কাজে পড়ে—

—ও কথা একদম শুনিস্ নি শোভা। যত কাজই থাক্, মানুষ ইচ্ছে করলে একবার দেখা করতে পারত না। তোর হাতে ওকে ছেড়ে দিলুম। যদি সায়েস্তা করে দিতে পারিস্, জান্‌ব শিবপূজোর ব্রত তোর মিথ্যা হয় নি—বলিয়া ভূপালী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার এই ছোট্ট পরিহাসটুকু অন্য দুইটী প্রাণীর যে কোথায় গিয়া আঘাত করিল, তাহা সে দেখিয়াও দেখিল না। বেচারী শোভা লজ্জায় লাল হইয়া 'সট্' করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অপূর্ব্ব সরক্তিম কণ্ঠে বলিল—কি যে বল বৌদি'!

—অন্যায় হয়ে গেছে না কি ভাই? না, শোভার কাছে আমার হয়ে তুমিই মাপ চেয়ে নিও। চা-টা টপ্ করে নিয়ে আয় ত শোভা, আর যেতে পারি না আমি—বলিয়া ভূপালী একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

শোভা মাথা হেঁট করিয়া চায়ের কাপ দুইটী আনিয়া হাজির করিল। একটি দিদির হাতে তুলিয়া দিল। অন্যটী অপূর্ব্বকে দিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার গমন-ভঙ্গীটা এমনই অদ্ভুত হইয়া উঠিল যে, ভূপালী না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

ভূপালী বলিল—কাপ্ ভাঙলে কিন্তু ভাল হবে না ভাই! যেই ফেলুক, দাম দু'জনকেই দিতে হবে।

অপূর্ব্ব শোভার হাত হইতে সেটা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—তোমার বিচার দেখ্‌ছি মন্দ নয় বৌদি', কাজীও হার মেনে যায়।

—যায়ই ত। তোর চা কই শোভা?

—আমি ত খাই না দিদি।

—চা খাস্ না? না, তোকে নিয়ে চল্‌বে না দেখ্‌ছি। আজকাল ও কথা বল্‌লে লোকে অসভ্য বল্‌বে।

শোভা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই অপূর্ব্ব বলিল—তা' বলুক। যে যা' খায় না, তাকে তা' খেতে অনুরোধ করাও উচিত নয় বৌদি'।

—তথাস্তু! তোমার অসভ্য নিয়ে বাস করতে অসুবিধা না হ'লে, আমারও হবে না। কিন্তু চা নাই খেলে, কোলকাতা থেকে নবীনের রসগোল্লা যে নিয়ে এলে, তাও ত দুটো খেতে পারে, অভ্যাগতদের দিতে পারে, না তাও পারে না?

ভূপালী অপূর্ব্বের দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে বলিল—ভারী ভাল মেয়ে ঠাকুরপো! যেদিন এসেছে, সেদিন থেকে একটী কাজেও আমায় হাত দিতে দেয় নি। কেবলই কি আমার, উনি বলেন—ওর যত্নে খোকারও না কি শ্রী ফিরে এসেছে।

অপূর্ব্ব বৌদি'র ওকালতীর অর্থ কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিল না। বলিল—কেমন করে ওদের বাসা ঠিক্ করলে বৌদি'?

ভূপালী হাসিয়া বলিল—কেন, তুমি না এনে দিলে বুঝি পারি না আমি। ওঁর আদালতের পেস্কারবাবুর কাছ থেকে ঠিকানা আনিয়ে যেদিন দু'জনে গিয়ে হাজির হলুম, সেদিনকার কথা ভাবলেও ভয় হয়। ওর বাপের চেহারা ত দেখেইছ, তার উপর ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া—দুটো বুকই ধরে গেছে। একটা পয়সা নেই, পথ্য নেই, চিকিৎসা নেই, মেয়েটা শুধু তাঁর শিয়রে বসে হাপুস্নয়নে কাঁদছে। আসবে না কিছুতেই, শেষে বাবা কথা বল্‌তে তবে এলো। অনেক কষ্টে বেচারী বেঁচে গেছেন বটে, কিন্তু ডাক্তারে বলেন, কোনদিন হঠাৎ হার্টফেল কর্‌বেন। সারা একেবারে আর সম্ভব নয়।

দ্বারের নিকট পদশব্দ হইতেই ভূপালী চুপ করিয়া গেল।

শোভা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল—বড় দা' কোথায় গেলেন বৌদি'?

—তাঁর জন্যে চিন্তা করতে হবে না শোভা, প্রথম মুন্‌সেফের বাড়ী উঠেছেন নিশ্চয়। কিন্তু তোর কষ্ট, আমাদের কি রাক্ষস পেয়েছিস না কি? দাও ত ঠাকুরপো, তোমার থেকে দুটো, আর আমি দিচ্ছি আমার থেকে। খেতে অমন করলে—না, দেখ্‌বি মজা, সে কথাটা বলে দেব এখনই। ভাল চাস্ ত—হ্যাঁ, এই ত লক্ষ্মী মেয়ের কাজ।

অপূর্ব্বর হাত হইতে মিষ্টিগুলা হাত বাড়াইয়া লইতে শোভা মরমে মরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু প্রগল্‌ভা দিদির মুখ হইতে না জানি আরও কি লজ্জার কথা বাহির হইবে ভাবিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে হাতটা বাড়াইয়া দিল। অপূর্ব্ব তাহার হাতে মিষ্টি দিতে দিতে বলিল—আদেশ অমান্য করছি না বৌদি'। কিন্তু বল্‌তে হবে সে কথাটা কি, যার জন্যে ইনি এক কথায় একেবারে লক্ষ্মীটি হয়ে গেছেন।

—তা' উনির মত হ'লে বল্‌তে পারি ভাই! নইলে—কি লো, বল্‌ব?

শোভা তাহার বড় বড় চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া ডাকিল—দিদি!

—না ভাই, আজ মত হ'ল না। এরপর অনুমতি পাও ত জানিও, বলব 'খন আমি—বলিয়া ভূপালী উঠিয়া দাঁড়াইল।

শোভা তাহার আগেই ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভূপালী বলিল—মেয়েটা বদ্ধ পাগল! না ঠাকুরপো?

অপূর্ব্ব ঢোক গিলিয়া বলিল—বোধ হয়।

ভূপালীর নয়নে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে কহিল—শোভার বাবার সঙ্গে দেখা করবে না ঠাকুরপো?

অপূর্ব্ব বলিল—করব বই কি বৌদি'। তিনি কি বাড়ী আছেন?

ভূপালী দেঁতোর হাসি হাসিল। বলিল—বাড়ী ছাড়া আর থাকবেন কোথায় ঠাকুরপো। বিছানা থেকে উঠে বাইরে আস্‌তে পারেন না ত।

—ওঃ—বলিয়া অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভূপালী বলিল—পূবদিকের ঘরখানা ওঁদের দিয়েছি। তুমি চলো, এখনই আস্‌ছি আমি।

অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে বৌদি'র নির্দ্দেশিত ঘরের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজাটা ভেজান রহিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধ নাই; ঈষৎ ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে। এবং সেই ফাঁক দিয়া ভিতরের কতকটা অংশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

অপূর্ব্বর পা দুইটা কে যেন মুহূর্ত্তে অনড় করিয়া দিল। পিতার মাথার একপ্রান্তে শোভা বসিয়া আছে। ঘরের অন্ধকার স্তিমিত দীপালোক তাহার সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়া তাহাকে যেন কল্পনার পরীর মত করিয়া তুলিয়াছে। অপূর্ব্ব অভিভূতের ন্যায় সেইদিকে চাহিয়া রহিল। চেষ্টা করিয়া এ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। কতক্ষণ পরে যখন সম্বিৎ ফিরাইয়া পাইল, তখন অনুতাপে, লজ্জায় তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। চোরের মত কোন রমণীকে লুকাইয়া দেখিবার মত এতবড় নির্লজ্জতা তাহার মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া সে মরমে মরিয়া গেল।

ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যায়—কিন্তু বৌদি'র নিকট কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমানাথবাবুর দরজাটা খুলিবার জন্য হাত দিল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার উৎসাহ নিবিয়া গেল। ফিরিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ভূপালী প্রশ্ন করিল—এ কি, এরি মধ্যে ফিরে এলে যে বড়, দেখা হ'ল না?

—না।

ভূপালী পুনরাবৃত্তি করিল—না কি গো। ঘরে আলো জ্বলছে। শোভা কোথায় গেল?

—ওখানেই আছে হয় ত। ডাকলুম না, কালই দেখা করব।

—ওঃ পোড়া কপাল! শোভাকে দেখে বুঝি পালিয়ে এলে? না ঠাকুরপো, তোমায় মত মুখচোরা নিয়ে কোন কাজ হবে না। চলো, আমি যাচ্ছি। কিন্তু কতদিন বৌদি'কে আড়াল করে চলবে বলো ত ভাই?

হাসিতে চাহিয়া অপূর্ব্ব বলিল—যতদিন পারি। কিন্তু যাই বলো আজ আর উঠছি না আমি—কাল দেখা করব।

—তাই করো—বলিয়া ভূপালী হাসিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে চা দিতে আসিয়া কিন্তু ভূপালী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। কোথায় অপূর্ব্ব! তাহার শূন্য শয্যায় একখণ্ড কাগজ যেন তাহার অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে।

—বৌদি', তোমার নিকট বলিতে লজ্জা নাই যে, তোমাকে আড়াল করিয়া বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প দেখিয়াই এখান হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইলাম। ও মেয়েটির মধ্যে কি আছে জানি না, তবে আমাকে একদিনে এক মুহূর্ত্তে এতটা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল যে, ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। শুনিলে হয় ত তোমারই কষ্ট হইবে যে, তোমার একান্ত প্রিয়পাত্র, যাহাকে তুমি অত্যন্ত গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে কর, সেই দেবর লক্ষণ চুরী করিয়া একটী অনূঢ়া কিশোরীকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেও লজ্জানুভব করে নাই।

—জীবনের মেয়াদ অল্প—কিন্তু কর্ম্মের সীমা-পরিসীমা নাই। বসিয়া বসিয়া স্বপ্ন-বিলাস রচনা করিবার প্রবৃত্তি হইল না, তাই চলিলাম।

—এখান হইতে কোথায় যাইব জানি না। হয় ত স্কুল-প্রতিষ্ঠা দিনে আবার দেখা হইতে পারে। অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি,

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
অপূর্ব্ব

ভূপালী বারবার পত্রখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল—শোভা!

শোভা সন্তর্পণে আসিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। ভূপালী হাসিয়া বলিল—অত লজ্জার দরকার নেই, পাখী পালিয়েছে।

শোভা কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। বারবার অপূর্ব্বের শূন্য শয্যার পানে চাহিতে লাগিল।

ভূপালী আর কিছু বলিল না, পত্রখানি শোভার পানে আগাইয়া দিল। শোভা রুদ্ধ নিশ্বাসে সেখানি পড়িয়া ফেলিয়া সাশ্রুনয়নে ভূপালীর পানে চাহিল। ভূপালী বলিল—চোখে জল কেন পাগলী! তীর ব্যর্থ হয় নি—ধরা পড়বার আগে একবার শেষ চেষ্টা বই ত নয়!

তথাপি শোভা কোন উত্তর দিল না।

ভূপালী নিজের বুকের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া বলিল—কথা কোস্ নি কেন শোভা? ছোঁড়াটা আস্ত পাগল, না রে?

শোভা এবারও উত্তর দিল না। তবে উদ্গত অশ্রু রোধ করিবার মানসে প্রাণপণ যত্নে নিজের ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিকার

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী চট্টোপাধ্যায়

—কাঁদাচ্ছ কেন খোকাকে—ওকে আমার কাছে দাও। এস বাবা এস, আমার কাছে এস—এই ব'লে বিনতা ছেলেকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়ালে।

মণীশ ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে বল্‌লে—না, তোমার কাছে যাবে না; অত যত্ন তোমায় দেখাতে হবে না। যাও, নিজের কাজে যাও।

বিনতা অশ্রুভরা চোখ দু'টিতে স্বামীর পানে চেয়ে অতি স্নিগ্ধ ও প্রশান্তকণ্ঠে বল্‌ল—যাকে তুমি যত্ন দেখানো বল্‌ছ, তাকে আমি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করি।

কথাটা শেষ করেই রোরুদ্যমান শিশুকে স্বামীর কোল থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে; কিন্তু মণীশ প্রাণপণে খোকাকে বুকে চেপে ধরল।

বিনতা অভিমানভরাকণ্ঠে বললে—তুমি খোকাকে আমার কাছে দেবে না? আচ্ছা, কেন বল ত? এ রকম ক'রে ওদেরকে আমার কাছ হ'তে দূরে রাখবার কি উদ্দেশ্য তা' বল্‌তে পার? ওদেরকে আমার হাতে সঁপে দিতে তোমার এত ভয় কিসের? ওরা ছেলেমানুষ, অল্প বয়সে মাতৃহারা হয়েছে, ওরা যাতে মাতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত না হয়, সেইজন্যই ত আমাকে বিয়ে করে আন্‌লে। কিন্তু তুমি আমাকে মোটেই ওদের কাছে ঘেঁস্‌তে দিচ্ছ না। তুমি রাগ করো না। তোমার পায়ে পড়ি লক্ষীটি, বলো না কেন তুমি ওদেরকে আমার কাছে মানুষ হতে দিচ্ছ না।

বিনতা এই ব'লে স্বামীর পা দুটি ধ'রে একটু ক্ষীণ উত্তরের আশায় উদ্বিগ্ন চিত্তে মণীশের পানে চেয়ে রইল।

মণীশের তখন অত্যন্ত রাগ হয়েছিল। সে রাগত-ভাবেই বল্‌লে—দেখ বিনু, ওদের প্রতি তোমার এত দরদ কিসের বল্‌তে পার?

উত্তরে বিনতা ক্ষিপ্ত হয়ে বল্‌লে—ওরা আমার পেটের ছেলে নয় বটে, কিন্তু তাই ব'লে কি তুমি বলতে চাও যে, ওদের প্রতি আমি মাতৃস্নেহ দেখাতে পারব না? তা' যদি হয়, তবে তুমি ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে আমায় গ্রহণ করলে কেন? আমি যেদিন তোমার ঘরে এসেছি, সেইদিন থেকে সমীর আর অমিয়কে নিজের পেটের ছেলে ভেবে সাদরে ও স্নেহে কোলে বসিয়েছি। এখন আমিই ওদের 'মা', ওরাই আমার ছেলে, ওরাই আমার সব। মায়ের কাছে ছেলে যে কি তা' যদি তোমরা জান্‌তে, তা' হলে আমার এত অনুনয়-বিনয়ের উপর এই রকম কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে আমার প্রাণে আঘাত দিতে পারতে না। যাক্‌। এখন ওদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি ওদেরকে আমার হাতে তুলে দাও; আমি ওদেরকে আমার মনের মত ক'রে গড়ে তুলব। এই ব'লে বিনতা স্বামীর কোল থেকে ছেলেকে নেবার জন্যে ব্যগ্র-ভাবে হাত বাড়ালে।

কিন্তু বিনতার এত কাকুতি-মিনতি, কাতর প্রার্থনা বুঝি সব পাষাণে প্রতিহত হয়েই ফিরে এল। বিনতার কোন দাবী-দাওয়া মণীশের হৃদয়ে গ্রাহ্য হ'ল না। স্ত্রীর আবদার ও অভিমান সবই স্বামীর কঠিনতায় ভেসে গেল।

মণীশ কিন্তু ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে বিনতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লে—বেশী বাড়াবাড়ি করো না বিনু। ভাল হবে না বলছি।

বাইরে থেকে কে একজন কর্কশস্বরে ব'লে উঠল—আহা, যেন কতই দরদ! যেন ভিজে বেড়ালটি! মণীশকে ভালমানুষ পেয়েছ কি না, তাই মন গলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বল্‌তে বল্‌তে একেবারে ঘরের ভেতর মণীশের প্রথম পক্ষের শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী এসে খোকাকে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে চ'লে গেলেন।

বিনতা বিস্ময় স্তম্ভিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে

চেয়ে রইল। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন মণীশ কোলকাতায় চ'লে গেল। বিনতার সঙ্গে একটা কথাও কইলে না, একবার দেখাও করলে না। বিনতাও স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার ঔৎসুক্যকে কোন রকমে ঠেকিয়ে অভিমানভরা মন নিয়ে লুকিয়ে রইল। কিন্তু মণীশের যাত্রার পর বেদনাবিদ্ধ প্রাণ নিয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। একা আর কোনমতেই থাক্‌তে পারছিল না সে; রান্নাঘরের মধ্যে যেন হাঁফিয়ে উঠছিল। তাই তার আলো-বাতাসহীন ছোট ঘরখানির মধ্যে বড় ছেলে সমীরকে ডেকে নিয়ে এসে নিজের শয্যাটার উপর বসিয়ে তাকে বুকে চেপে ধ'রে বন্দিনীর মতই একান্ত পরাধীনতায় শুয়ে পড়ল। সেদিন সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। সারাদিন ঘর থেকে বেরুল না; জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করলে না। মাঝখানে শুধু একটিবার বেরিয়ে সমীরকে খাইয়ে নিয়ে পুনরায় দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল।

—হাঁ মা, তুমি না কি আমাদের নিজের মা হও না?

বিনতা গভীর স্নেহভরে পুত্রের মুখ চুম্বন ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—কে বল্‌লে রে? তোর কি মনে হয়? বিনতার চোখে তখন মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত হয়ে উঠল।—তাই ত হই বাবা, মা কি কখন অন্যের হয়?

তাদের কথার মাঝখানে বাধা পড়ল।—বলি হাঁ গা বড় মানুষের মেয়ে, আজ আর কি ঘর থেকে বেরুবে না? সমীর, তুইও কি ঘরের ভেতর সারাদিন মায়ের সোহাগে গলে পড়ে থাক্‌বি?

বিনতা সপত্নী জননীর এইরূপ খরতর বাক্যগুলি শুনে ও উগ্র প্রচণ্ড মূর্ত্তির দিকে চেয়ে ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। চোখ দুটো বুজে সমীরকে প্রাণপণ শক্তিতে বুকে চেপে ধ'রে একান্ত নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়ে পড়ে রইল। মণীশের শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী তা' দেখে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে মুখ বিকৃত ক'রে বললেন—বলি হাঁ গা, শুনতে কি পাচ্ছ না, কাণের মাথা কি একেবারেই হজম ক'রে ফেলেছ? আমার কথাটা কি গেরাহ্য হ'ল না। আমার বউগুলো নাকে দড়ি দিয়ে খাটছে, আর তুমি পায়ের ওপর পা দিয়ে ফিরিঙ্গীদের মত বিছানায় বসে ছেলেকে নিয়ে সোহাগ করছো। তবু যদি স্বামী ভালবাসত! ছেলেকে যে খাইয়ে নিয়ে এলে, এখন নিজে দু'টি পিণ্ডি গিলবে চলো। না বাপু, এ আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! মণীশ এবার এসে যা' হয় একটা ব্যবস্থা করুক। না করে, নিজের ঘরবাড়ী আছে, সেখানে চলে যাব। সুবি মারা গেল, তাই ভাবলুম, ছেলেগুলোকে একবার দেখে আসি; ও মা, এ যে একেবারে হিতে বিপরীত হ'ল! জামাই বাবাজীবন ত এরই মধ্যে পর হয়ে যায় নি। যে একটা বেটাছেলে, উপায়ক্ষম, এত হাঙ্গাম পোয়াতে পারবে কেন, তাই মনে করলুম, দিনকতক গিয়ে সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে আসি; তারপর একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে সংসারটা গুছিয়ে তার হাতে দিয়ে চলে যাব। জামাই আমার তা' সইতে পারলে না; দুটো দিন না যেতে যেতে সাত তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে ছেলেমেয়েগুলোকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে বিদেশে গিয়ে দিব্যি মনের সুখে বাস করছে। সব ওই ছুঁড়িটার ওপর ভার দিয়ে আমি ত আর নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তা' এত অপমান সয়ে কে থাকবে বাপু! তোমায় দিয়ে তার এত অপমান করবার কি দরকার ছিল। নিজে বলে গেলে ত হ'ত। না বাছা, আমারই ঘাট হয়েছে। আমি আর কিচ্ছুটি বলব না। আজই মণীশকে একখানা চিঠিতে সব কথা খুলে লিখে দিই। তুমি বাপু তোমার সংসার কর, আমার আর দরকার কি? ছেলে দুটো ভেসে যাবে বলেই ত করা, তা' ওরা এখন মা চিনেছে, আর আমাকে দরকার কি? ছোটটা আবার আমার ন্যাওটো; আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না। তা' মরুক্ গে, আমার আর জ্বালাতন হওয়া কেন? বল্‌তে বল্‌তে আর একবার ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে ঘরের দিকে চেয়ে চলে গেলেন।

বিনতা অপরাধীর মতই খানিক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর ধীরে ধীরে একবার সমীরের পানে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। সমীর মায়ের চোখে জল দেখে

তার বালক-সুলভ কোমলস্বরে ডাক্‌লে—মা! তোমায় দিদিমা অত বক্‌ছে কেন? আমি কিন্তু এবার বাবা এলে বলে দোব ঠিক্‌, দেখো তুমি। তোমায় শুধু শুধু দিদিমা বকে মা, তুমি আর কেঁদ না। তোমার চোখে জল দেখলে আমার বড্ড কষ্ট হয়। আমি আগে বড় হই, তারপর তোমায় নিয়ে গিয়ে কোলকাতায় মস্ত বাড়ী করে থাক্‌ব শুধু দু'জনে, বুঝ্‌লে মা। সবাই তোমায় যা' বকে, তা'তে আমার বড্ড কষ্ট হয়। মা, তুমি কেন বাবাকে বলে দাও না, তা' হলে বাবা ওদেরকে খুব বকে দেবে। তোমায় ওরা আর বকবে না তা' হলে। বেশ জব্দ হবে, না মা? বলেই সমীর একটু মুচকে হাসলে। তারপর তার তর্জ্জনীটা খাড়া করে বল্‌লে—তুমিও কিন্তু বোলো, তা' না হলে বাবা আমার কথা বিশ্বাস করবে না।

বিনতা সমীরকে স্নেহভরে কাছে টেনে নিয়ে বললে—ছি বাবা, কারও নামে কিছু বলতে নেই! ওরা তোমার গুরুজন হন্‌।

—বা রে, তোমায় ওরা শুধু শুধু বকবে, আর তুমি বুঝি চুপ করে থাক্‌বে? আমি ঠিক্‌ বল্‌ব, দেখো তুমি।

—না বাবা, ও কথা বলতে নেই। ওঁরা ত শুধু শুধু আমায় বকেন না; আমি একটা দোষ করে ফেলেছি কি না তাই বক্‌ছেন। উনি আমার মা হন্‌ কি না।

—তুমিও ত আমাদের মা হও; কই, একটুও ত বকো না। খুকু সেদিন তোমার একটা খেল্‌না ভাঙলে, তুমি ত ওকে বকলে না—বলেই মার মুখ পানে চেয়ে একটু হাসলে।—হুঁ হুঁ, ওই কথা বলে আমায় ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, না?

বিনতা এই অবোধ শিশুকে উত্তর দেবার মত কোন কথাই খুঁজে পেলে না, নির্ব্বাক হয়ে শুধু চেয়ে রইল। এইটুকু ছেলের এত ভালবাসা তাকে! এই ছেলেটিই তাকে এত দুঃখের মধ্যে গভীর সান্ত্বনা ও পরম শান্তি দেয়। একে নিয়েই যে সে তার বেদনাময় উপেক্ষিত জীবনে চরম তৃপ্তি লাভ করে আছে। বলতে গেলে সমীরই তার জীবনের একমাত্র সম্বল!—সমীর বাবা আমার, লক্ষ্মী মাণিক আমার, গুরুজনের নামে কারও কাছে নালিশ করতে নেই—বলে সমীরের মুখ চুম্বন করলে। তারপর একটু অভিমানের সঙ্গে বল্‌লে—তা' হ'লে খুব দুঃখ হবে আমার, বুঝলি?

একটা সামান্য কিছুতে অনেক সময় অনেক বড় বড় কাণ্ড ঘটে যায়; তাই বিনতার সেদিনকার সেই অন্তর বেদনা, নিভৃত কান্নার শব্দটুকুর ফলও ভবিষ্যতে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে তাকে বড় রকমেই আঘাত করে গেল। মণীশ ছুটিতে বাড়ী আসতেই শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী সেদিনকার সমস্ত ঘটনা সত্য-মিথ্যায় সাজিয়ে নিয়ে জামায়ের কাছে বলতে সুরু করলেন। মণীশের মেজাজ একেই ভাল ছিল না; মাতাল হয়েই বাড়ী এসেছিল। তারপর স্ত্রীর নামে এতগুলা কথা শুনেই বিনতার প্রতি তার রাগটা আরও সপ্তমে চড়ে গেল। সে একেবারে স্ত্রীর ঘরে, যেখানে বিনতা সমীর ও অমিয়কে ঘুম পাড়াচ্ছিল সেইখানে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকলে—বিনু, তোমার নামে এ সব কি শুনছি! তুমি না কি সংসারের একটা কাজও কর না, খাবার সময় খাও, আর লোকের সঙ্গে বিনা কারণে ঝগড়া কর?

বিনতা হঠাৎ স্বামীর আগমন এবং এই রকম কর্কশ কথা শুনে 'থ' হয়ে গেল। স্বামীর পানে বিমূঢ়ের মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর অতি সহজ-ভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কখন এলে তুমি? আমি ত কিছুই জানি না।

মণীশ সে কথার কোন জবাব না দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে বিছানায় গিয়ে বসে বল্‌লে—ছোটলোক কোথাকার! কিসের জন্যে তুমি ওদের সঙ্গে ঝগড়া করেছ। ছেলেদেরকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করা হচ্ছে। কালই তোমাকে আগে বিদায় করে তবে অন্য কাজ।

বিনতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কাঁকে কি বলছ, আমি ত তোমার একটি কথাও বুঝতে পারছি না।

মণীশ বিনতার উত্তরে রেগে গিয়ে টল্‌তে টল্‌তে বিছানা থেকে উঠে বিনতাকে একটা লাথি মেরে বল্‌লে—আবার ন্যাকামী! তারপর তার কথা কইবার সামর্থ্য ক্রমে লুপ্ত হয়েই একেবারে থেমে গেল।

বিনতা শুধু অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে ধীরে ধীরে সেখান হ'তে চলে গেল।

সেইদিনই সেই ঘটনার মীমাংসা কিছু হ'ল না। পরদিন মণীশ প্রভৃতি সকলে মিলে একটা নির্জ্জন ঘরে বসে বিনতার বিরুদ্ধে আলোচনা করছিল। বিনতাও এদের কথা শোনবার জন্য পাশের ঘরের দেওয়ালে কান রেখে শুন্‌ছিল। মণীশের উচ্চ স্বরই বেশী শোনা যাচ্ছিল —হ্যাঁ, ওদের দুটোকেই আমি এবার কোলকাতায় নিয়ে যাব।

এইটুকুই বিনতার কানে গেল; কাদেরকে নিয়ে যাবে তা' ভাল করে বুঝতে পারলে না। আন্দাজে ধরে নিলে তাকে। অমনি তার বুকখানার ভেতর একটা করুণ আর্ত্তনাদ যেন সমস্ত মন ছাপিয়ে উঠল। আর কিছু শোনবার তার ইচ্ছা হ'ল না। কিন্তু হঠাৎ মণীশের বড় সম্বন্ধীর কণ্ঠস্বর শুনে মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হলো। আবার কথা শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। মণীশের বড় সম্বন্ধী মণীশের দোকানের ম্যানেজার ও ভাগ্য-বিধাতা। তিনি তাঁর ভগ্নীপতি মণীশকে লক্ষ্য করেই বলছিলেন —তোমার হিসাব-পত্র তোমাকে আজই এখুনি বুঝিয়ে আমরা চলে যাব। এই নাও তোমার দোকানের চাবি— বলে চাবির গোছাটা ফেলে দিলেন।

মণীশের ছোট সম্বন্ধী আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারছিলেন না, তাই তিনিও বল্‌তে সুরু করলেন—এখন কি করে যাওয়া হয় বলো ত? জামাইবাবু একা সব দিক্ সামলাতে পারবেন কেন? একে ত সবদিন দোকানে যেতে পারেন না; মাতাল হয়ে পড়ে থাকেন। এ সময় যদি আমরাও চলে যাই, তা' হলে উনি কি রকম মুস্কিলে পড়বেন। না না, এখন রাগ করে চলে যাওয়া হতেই পারে না! তারপর যদি যাওয়াই একান্ত স্থির কর, তা' হলে দাদা তোমায় আমি বলে রাখছি যে, দোকানখানি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। কষ্ট ত ওঁর হবে না, কষ্ট হবে সমীর আর অমিয়র। তাদের পথে বসিয়ে আমাদের চলে যাওয়া একেবারেই হতে পারে না।

তার কথা শেষ হতে না হতে গিন্নী অমনি সুর বদলে বল্‌লেন—শেষে কি ওরা আমার পথে বসবে! না না সতীশ, তার চেয়ে একটু সহ্য করেই না হয় দিনকতক আরও থাকো। বাছারা যে আমার কষ্ট পাবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না। তারপর ছোট ছেলের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ, নিতাই ঠিকই বলেছে সতীশ। সুবি অনেক মিনতি করে বলেছিল বলেই এত অপমান সহ্য করে জামাই-বাড়ীতে পড়ে আছি। তারপর জামাতার দিকে আনন্দ-সহকারে তাকিয়ে বললেন—মণীশ, তুমি তা' হলে তাই কর; ওকে (বিনতাকে) বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তা' না হলে বাছারা আমার মরে যাবে। এই তোমায় বলে রাখছি বাবা, যে, ওই হারামজাদী মাগীই তোমাদের সকলকে পথে বসিয়ে তবে ছাড়বে।

—মা, বাবা বলেছে আমাদের কোলকাতায় নিয়ে যাবে। শুনছ মা?

বিনতা মুখ গুঁজে বিছানায় পড়ে কাঁদছিল। তারই চাপা আওয়াজ শুনতে পেয়ে সমীর মায়ের মুখের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আবদারের সুরেই বল্‌লে—মা, তুমি বুঝি রাগ করেছ, তাই সাড়া দিচ্ছ না? মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিতে দিতে সমবেদনার সুরেই আবার সে বল্‌লে—ও মা, তুমি বুঝি কাঁদছ? একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার বল্‌লে—কেন মা, আমরা চলে যাব বলে বুঝি তোমার মন কেমন কচ্ছে; না, বাবা বকেছে? কাল তোমায় যে সব্বাই বকছিল তা' আমি শুনিছি। আচ্ছা মা, তোমায় ওরা অত বকে কেন? আমি ভাবছিলাম, বাবাকে বলে দোব। আমায়ও খুব বকেছে কি না, তাই বল্‌তে সাহস হচ্ছে না।

বিনতা মুহূর্ত্তে নিজের সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে সমীরকে কোলে তুলে নিয়ে বসালে; তারপর স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বল্‌লে—বাবা, তুমি আমার জন্যে কিচ্ছুটি বলো না।

সমীর সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে মায়ের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—মা, বাবা

যখন আমাদের নিয়ে যাবে, তখন তোমায়ও যেতে হবে কিন্তু। তা' না হলে আমি শুধু একা বাবার সঙ্গে থাক্‌তে পারব না।

বিনতা সস্নেহে সমীরকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে—ছি বাবা, ও সব কথা কি বলতে আছে! উনি তোমাদের কত ভালবাসেন, কত যত্ন করেন, কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবেন। স্কুল গিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌লে তবে ত আমায় কোলকাতায় নিয়ে যাবে।

তর্জ্জনীটা বিনতার মুখের কাছে তুলে সমীর আবদারের স্বরে বল্‌লে—তুমি না গেলে আমি যাচ্ছি না—সে তুমি দেখে নিও।

সভয়ে চারিদিক চেয়ে বিনতা বল্‌লে—সমীর, তুমি এইবার বাইরে যাও বাবা। কেউ দেখতে পেলেই এখুনি বক্‌বে। তোমাদের আমার কাছে আসতে বারণ করেছে মনে আছে? আর ও বেলার মত গোল করো না, চুপ করে খেয়ে উঠে যাবে, কেমন?

—না মা, আমি তোমায়—

বাধা দিয়ে বিনতা বল্‌লে—লক্ষ্মী ছেলে, তুমি আমায় যদি ভালবাস, তা' হলে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবে। যদি না শোন, তা' হলে বুঝ্‌ব, তুমি আমায় একটুও ভালবাস না।

সমীর শুধু ম্লানমুখে বল্‌লে—মা, আমি তোমার হাতে খেতে বড় ভালবাসি, ওরা তাও খেতে দেবে না! কাল তো চলে যাব, আজকের দিনটা শুধু—

—টুকু, এখানে কি করছিস রে বলতে বলতে মণীশ ঘরের ভিতর ঢুকে মাতা-পুত্রে গভীর আলাপ করতে দেখে রেগে সমীরের পিঠে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে উদ্ধতকণ্ঠে বিনতাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে—তোমাকে না আমার ছেলেদের সংস্রবে থাকতে বারণ করেছিলাম, সে কথা কি একেবারেই হজম ক'রে ফেলেছ?

বিনতা সঙ্কুচিতা হয়ে সমীরকে কোল থেকে নামিয়ে অপরাধীর মত বল্‌লে—সমী, তু—মি বাইরে যাও।

মণীশ তেমনি কর্কশকণ্ঠে বল্‌লে—তোমার হাতের কোনও জিনিষ ওদের খেতে দেবে না। তারপর সমীরের হাতটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লে—তোমরা ওর হাতের কোনও জিনিষ খাবে না। যদি খাও, তা' হলে তোমাদের ভয়ানক মারব।

সমীর মুখে কিছুই বল্‌লে না, শুধু ফোলা ফোলা চোখ দু'টি একবার বিনতার দিকে ফিরিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

বিনতা স্বামীর দিকে একটু এগিয়ে এসে ব্যথিত-কণ্ঠে বল্‌ল—আমার কাছে ওরা থাকলে তোমরা অমন কর কেন? আমি কি ওদের মেরে ফেলব?

—বিশ্বাস কি?

বিনতা ছলছল চোখে স্বামীর শ্রীহীন মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে; তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লে—আচ্ছা, এ অন্ধ বিশ্বাস তোমাদের কিসে হ'ল?

মণীশ পরুষকণ্ঠে বল্‌লে—কোনও পুরুষ কোনও নারীর কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়।

বিনতা ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে—যদি তোমার ছেলেদের কোনও অধিকারই আমায় না দেবে, তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন? তোমার ছেলেদের ভার নেবার আমি অনুপযুক্ত কিসে?

মণীশ এইবার একটু নিম্নস্বরে বল্‌লে—সে সব আমি বুঝি নে, আমার বিয়ে করা ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে। যাক্ গে, তুমি কালই তোমার মায়ের কাছে চলে যাও।

বাধা দিয়ে বিনতা বল্‌লে—আমি আর সেখানে যাব না, আমায় কেটে ফেল্‌লেও আর সেখানে যাব না। তুমি ত আমায় দেখেই বিয়ে করেছিলে, এখন তবে কেন আমায়—অশ্রুতে তার আর কণ্ঠস্বর বেরুল না। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আবার বল্‌লে—আমি মায়ের কাছে কেন যাব, আমার কিসের অভাব? আমার অধিকার কেনই বা ছাড়ব? সংযত কণ্ঠে বিনতা কথাগুলি বলে ফেল্‌লে।

মণীশ উদ্ধত কণ্ঠে বললে—জানো, তোমায় বিয়ে করে সমাজে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই?

—কেন, আমি এমন কি দোষ করেছি যার জন্য—

মণীশ ঠিক তেমনি সুরেই বল্‌লে—কেন জান না, তোমার এবং তোমার মায়ের দুশ্চরিত্রের কথা—বলে মণীশ একটু শ্লেষের হাসি হাস্‌ল।

বিনতার চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো—কি বললে! ছিঃ, তুমি এত নীচ! আমি কল্পনা করতে পারিনি যে, তোমার মুখ থেকে এরকম কথা শুনবো! লোকের কথায় বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে এতবড় একটা কথা মুখে আনলে কেমন করে? আজ একটা অসহায়া বিধবার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপ করছ! আমার মা তোমার মা কি ভিন্ন? আর মাতৃ-চরিত্রে দোষারোপ করা যে মহাপাপ, এ জ্ঞানটুকুও কি হারিয়েছ? তুমি যতই আমার চরিত্রের ওপর দোষারোপ কর, তবুও আমি 'তোমার' তুমি 'আমার'।

মণীশ ক্ষিপ্তের মত বিনতার চুলের মুঠি ধরে পিঠে একটা লাথি বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে—কি যত বড় মুখ, তত বড় কথা!

বিনতা এই আকস্মিক আঘাতে একবারে লুটিয়ে পড়ল। তখন তার কণ্ঠস্বর হতে শুধু একটা আর্ত্তনাদ উঠছে। সমীর তখন বোধ হয় বাইরেই ছিল। সে এই আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে এল। মণীশ তখন ঘর থেকে বাইরে চলে গেছে। কিন্তু সমীর কিই বা করবে; তার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যেটুকু হয় সেইটুকু দিয়েই সে তার মাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলে। অভাগিনী মায়ের জন্য তার বালক হৃদয় সত্যই যে কাঁদে। বিনতা এই বালকের হৃদয় থেকে যেটুকু স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছে, ততটুকু সে আজ পর্য্যন্ত নিজের স্বামীর কাছ থেকে পায় নি। কেনই বা করবে না? বিনতা ত তাদের মায়ের চেয়ে কম ভালবাসে না।

সে এই নতুন সংসারে এসে ঐশ্বর্য্য এবং আসবাবপূর্ণ গৃহসজ্জা দেখতে পেয়ে কেমন একটা দীনতা বোধ করত। তবুও অন্তরের পিপাসা এবং বয়সোচিত ধর্ম্মে সে কিছুমাত্র পরিতৃপ্ত বা সুখী হয় নি। সবই যেন তার পরিহাস বলে বোধ হ'ত। কে যেন তার সামনে সব সাজিয়ে রেখে তার হাত দু'টী লৌহ শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। সবই তার, অথচ সবই অধিকারের বাইরে। তার ছেলেদের ওপরও তার কোন জোর নাই। তাই তার অন্তরাত্মা একটুও সন্তুষ্ট হতে পারে নি—সবই যেন কেমন ঠেক্‌ছিল। সে তার জীবনে স্বামীর কাছ থেকে কখনও সাদর সম্ভাষণ লাভ করে নি; শুধু লাঞ্ছিত অনাদৃত ও অপমানিত হয়েই সে তার জীবন কাটাচ্ছে। সে পাওয়ার মধ্যে একটা জিনিষ পেয়েছিল। শুধু জননীর উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েই সে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করেছিল এবং একাগ্র হৃদয়ে সমস্ত মাতৃস্নেহ ঢেলে দিয়ে এই দু'টী মাতৃহারা শিশুকে তার নিজ বক্ষে সাদরে এবং সস্নেহে টেনে নিয়েছিল।

বিনতার দুঃখ-স্রোতের একমাত্র অবলম্বন ছিল সমীরের সুন্দর মুখ ও মধুর মাতৃ-সম্বোধন। তাই এত দুঃখের মধ্যেও তার কষ্ট বোধ হ'ত না। কর্ম্মের অবসরে সে নিবিড় আনন্দে নিজের ঘরখানিতে সমীরকে নিয়ে বিশ্রাম মুহূর্ত্তটি উপভোগ করত। সমীরের সঙ্গে কথা কয়েই সে তার আদর-আবদার যা' কিছু সব মিটিয়ে নিত। তাও আবার লুকিয়ে লুকিয়ে। সেজন্য বেচারী সমীর মার পর্য্যন্ত খেয়েছে, সেও যথেষ্ট লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু তাদের বন্ধন একদিনের জন্যও শিথিল হয় নি। বিনতা এই ছোট ছেলেটার অসীম স্নেহের পরিচয়ে ক্রমেই মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল। এবং পুত্রগর্ব্বে তার সারা বুকখানা ভরে উঠেছিল। সমীর চলে যাওয়ায় সে বাঁধনহারা হয়ে স্বামীর ব্যবহারে নিজেকে অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে ক'রে নির্জ্জনে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে নিজের কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করত।

—হ্যাঁ রে মণীশ, অমন সুন্দর বৌটাকে অত অযত্ন করিস কেন? তুই ওকে মেরে ফেলবি দেখ্‌ছি।

—গেলেই ভাল, ওকে আমার দরকার নেই।

—দরকার নেই ত বিয়ে করলি কেন?

—বিয়ে ঠিকই করেছিলাম, কিন্তু আমি আর এখানে ওকে রাখব না; ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব—তুমি কি জান না দিদি, ওর মায়ের চরিত্র খারাপ।

—ও কথা আমি বিশ্বাসই করি না। ওর মা কি রকম ভাল-মানুষ ; মুখে 'রা'-টী পর্য্যন্ত নেই। সতী-লক্ষ্মীর নামে অমন মিছে বদনাম দিতে নেই রে, ওতে মহাপাপ হয়।

মণীশের এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী মাঝে মাঝে মণীশদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন। এবারে অনেকদিন পরে এসে বিনতাকে একলা দেখে মণীশকে অানিয়েছেন।

বিনতার শুষ্ক ম্লান মুখ, যৌবনভরা দেহ, মাথার এক-রাশ এলোমেলো চুল যেন তাকে একখানি বিষাদ প্রতিমায় পরিণত করেছে ; তার উপর আবার একটা ঝিয়ের সঙ্গে এই পরিণত বয়সে থাকায় সে যেন সব সময়ই শঙ্কিত হয়ে থাকত। মাঝে মাঝে মণীশ বাড়ী আসে বটে, কিন্তু পাছে বিনতা খাবারের সঙ্গে বিষ দেয়, এই ভয়ে স্ত্রীর হাতে কিছু খায় না।

বিনতা স্বামীর সন্দিগ্ধ হৃদয়ের কুটিলতাভরা ব্যবহারে মরমে মরেই থাকে। মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় নেই। সে বলতেও চায় না।

বিনতা আড়ালে দাঁড়িয়ে এই সব কথা শুনছিল এবং তার মনে হচ্ছিল, সে যেন মায়া-মুগ্ধ। কথাবার্ত্তা শেষ হলে মণীশ বেরিয়ে চলে গেলে, বিনতা তার ননদের কাছে গেল। দালানে তার ননদ বসেছিলেন। তিনি বিনতাকে দেখেই সহানুভূতপূর্ণস্বরে বল্‌লেন—না, ওকে ব'লে কিছু হ'ল না। তা' তুমি কিছুদিন একটু কষ্ট সয়ে থাক। তারপর দেখো বৌ, তোমারই একদিন সব হবে—একথা মিথ্যা হবার নয়, তা' আমি বলে রাখলাম।

—দিদি, আমায় ত তা' সইতেই হবে, এ ছাড়া অন্য উপায় ত আমার নেই।

করুণায় আর্দ্র হয়ে তিনি বল্‌লেন—আহা! তুমি ভগবানকে ডাকো, তিনি নিশ্চয়ই তোমার ডাকায় তুষ্ট হয়ে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!

বিনতা এইটুকু সহানুভূতি পেয়ে আর অশ্রু চাপতে পারলে না। সে কোনোদিন কারও কাছে সান্ত্বনা পায় নি, কেবল আঘাতের ওপর আঘাত সহ্য করেই আসছে। সে মনে মনে ভগবানকে ডাক্‌লে—ঠাকুর, আমায় আরও সহ্য করবার শক্তি দাও! সে আমায় আঘাত করে করুক, কিন্তু তুমি আমায় সব সহ্য করিয়ে আমায় শক্তিশালী কর—আমায় মানুষ কর!

—মা!

বিনতা ঘরের ভিতর নিজের জীবনের বিস্ময়কর ঘটনাবলী একে একে আপনার মানস-পটে আঁকছিল। হঠাৎ মা ডাক শুনে ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল যে, সমীর এসেছে। বিনতা সমীরকে আশীর্ব্বাদ ক'রে জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে সমু, মাকে এতদিন পরে কি মনে হ'ল? যা' হোক, তোরা ভাল ছিলি ত?

সমীর মাকে প্রণাম ক'রে নিতান্ত অপরাধীর মত নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

—খোকা এল না কেন রে?

সমীর নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিনতা অতি মাত্রায় বিস্মিত হ'ল এবং কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—উত্তর দিচ্ছিস্ না যে? সব ভাল ত?

সমীর কম্পিতকণ্ঠে মায়ের হাত দু'টী ধরে বল্‌লে—বাবার বড় অসুখ, তাই তোমায় নিতে এলুম মা।

এই দুঃসংবাদ শুনে বিনতা একেবারে বসে পড়ল ; পরে কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে তাঁর?

—বাবার 'লিভারে'র দোষ হয়েছে ; কিন্তু কেউ মদ ছাড়াতে পারে নি—তুমি যদি শেষ চেষ্টা ক'রে ছাড়াতে পার, তাই তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

বিনতা গাঢ়স্বরে বল্‌লে—আমার সেবা তিনি কি নেবেন বাবা?

—যখন তোমায় আমি নিতে এসেছি, তখন তোমার কোনও ভয় নেই। ওদের এখন খুবই মজা চলছে। বাবার হাতে একটী কাণাকড়িও নেই ; সবই ওদের হাতে। বাবার হাতে যা' কিছু ছিল, তাও তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন—বাবা এখন সম্পূর্ণ পরাধীন।

বিনতা একেবারে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এ্যাঁ, কি বল্‌লি! তোদের জন্যও কিছু রাখেন নি?

—না মা, কিচ্ছু নয়।

চার বৎসর পরে দেখা।

অবগুণ্ঠিতা বিনতা স্বামী যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে ঢুকে শয্যাপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছ?

মণীশ কটমট ক'রে বিনতার দিকে চাইলে—কে তুমি? ও, তা' তোমাকে কে এখানে আসবার কথা বলেছে এবং কেই বা নিয়ে এলো?

বিনতা সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লে—এ কি, তুমি নিজেকে একেবারে মাটী ক'রে ফেলেছো! কি হয়েছে তোমার?

মণীশ সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল। বিনতা চার বৎসর পরে স্বামীর সেই পুরাতন সম্ভাষণ শুনে তার সুপ্ত অভিমান চাপতে পারলে না, তার অভিমান উদ্বেল হয়ে উঠলো। এখনও এই কথা! কিন্তু সে মুখে কোনও জবাব না দিয়ে পাশে গিয়ে বসল।

—মা, খোকা তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

বিনতা চমকে উঠে বল্লে—এস বাবা এস, বেঁচে থাকো। পরে সমীরের দিকে চেয়ে বল্লে—সমীর, খুকীকে এখনও খবর দাওনি কেন? আজই তাকে নিয়ে এস। এতবড় অসুখ—

তার কথা আর শেষ হতে পেলে না। মণীশের শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী বড় ছেলের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী বল্লেন—মণীশ, তুমি আমাদের এমনি ক'রে অপমান করাচ্ছ কেন?

মণীশের বড় সম্বন্ধী সতীশ চাবির গোছাটা মণীশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—হিসাব-নিকাশ, চাবি সব টুকুর হাতে দিয়ে চাকরের মত ভাগ্নের দোকানে খাটব?

হঠাৎ বিনতার দিকে চোখ পড়ায়, গিন্নী ক্ষিপ্তের মত ব'লে উঠলেন—তাই ত বলি, টুকুর কি আর এত বুদ্ধি হয়েছে যে, আপনার মামাকে এমন করতে পারে? তারপর মণীশের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্লেন—তবে আর ভাবনা কি? উনি যখন মা সেজে এসেছেন, তখন দেখছি এদের আর পথে না বসিয়ে ছাড়ছেন না। কথায় বলে আপনার লোকের চেয়ে করে যে, তারেই বলি ডান। এও যে তাই দেখছি।

সতীশ ব্যঙ্গের সুরে ব'লে উঠল—তোমার ছেলে যখন হিসাব নেবার উপযুক্ত হয়েছে, তখন আমরা মিথ্যা ভূতের বোঝা ঘাড়ে ব'য়ে মরি কেন? আজই সব বুঝিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাই।

সমীর এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মায়ের নামে মিথ্যে দোষারোপ করা হ'ল দেখে সে দিদিমা প্রভৃতির হীন ধারণার প্রতিবাদে বেশ একটু উগ্রস্বরেই ব'লে উঠল—না জেনে খামকা আপনারা মায়ের নামে যা' তা' বলছেন কেন? আপনারা যাবেন বল্ছেন, যান্। আমিই চাবি চেয়েছি, আমিই নেব—ব'লেই সে চাবির গোছাটা তুলে নিল।

মণীশ এতক্ষণ চুপ করেছিল। এইবার উঠে ব'সে রূঢ়স্বরে সমীরকে বল্লে—ওর হাতে চাবি ফিরিয়ে দে শীগ্‌গির। আমি পড়ে আছি, এ সময় ওরা চলে গেলে আমার কি অবস্থা হবে জানিস্?

—না, আমি আর ও চাবি ছোঁব না; তোমাদের যা' ইচ্ছা কর গে—বলেই সতীশ বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

মণীশ অনুনয়ের সহিত বল্লে—ও ছেলেমানুষ, ওর কথায় কি রাগ করে সতীশ? তুমি চলে যেও না, আমি অনুরোধ করছি।

সতীশ দরজার কাছ থেকে পুনরায় সেই চাবিটা নিতে আসবার জন্য ফিরেছে, অমনি বিনতা চাবিটা তুলে নিয়ে ধীরভাবে বল্লে—আজ আমি আমার সব হারানো অধিকার নিলুম—তার সঙ্গে এই চাবিটাও। এ আমায় নিতেই হবে। সমীর এখন বেশ বড় হয়েছে; ওইসব চালিয়ে নিতে পারবে 'খন। তারপর সতীশের দিকে চেয়ে বল্লে—দাদা, আপনি আর কষ্ট করবেন না। ওদের ভাল-মন্দের ভার আপনি আমার হাতে দিয়ে কিছুদিন অবসর নিয়ে, বোনের এই ছোট্ট আবদারটুকু রাখুন। তারপর গিন্নীর দিকে চেয়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বল্লে—মা,

আমি আপনার মেয়ে, আমার একটা কথা রেখে কন্যার মনের বাসনা পূর্ণ করুন। যদি যেতেই হয়, ওঁর অসুখ সারলে যাবেন—বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘরের বাইরে চলে গেল।

বিনতার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সকলেই অতি মাত্রায় বিস্মিত হ'ল। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারা সকলেই যে মেয়েটিকে এতদিন অত্যাচারে, অবিচারে, তিরস্কারে জর্জ্জরিত করেছে, অথচ সব সময়েই নীরব থেকে সে সবই সহ্য করেছে, সে আজ কেমন করে সকলকে ধাঁধা লাগিয়ে এমনটা করে গেল। তারা কল্পনা করতে পারলে না যে, তার এত শক্তি কোথা লুকিয়েছিল!

—আচ্ছা মা, তোমার মতন ভালমানুষের মুখ দিয়ে এত কথা কি করে বেরুল? আজ তুমি আমায় একবারেই অবাক করে দিয়েছ! ওদের গুমর এবারে ভেঙেছে, কিন্তু তোমার এতটা সাহস হ'ল কি করে?

বিনতা স্নেহার্দ্র স্বরে বল্লে—বাবা, পুত্রের মঙ্গল কামনায় সব মায়েই এ সাহস দেখাতে পারে, শুধু আমিই নই।

—মা, বাবা ডাকছেন, চলো।

বিনতা স্বামীর কাছে গিয়ে বল্লে—আমায় ডাকছ?

"হ্যাঁ, তোমায় ডেকেছি, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

বিনতা স্বামীর এমন সাদর সম্ভাষণ কখনও লাভ করে নি। তাই আজ এই মিষ্ট আহ্বানে তার নারী-জীবন যা' মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও নিতান্ত ব্যর্থ বোধ করেছিল—এখন এই সামান্য কথায় তা' সার্থক হয়ে উঠল। বিনতা অসঙ্কোচে স্বামীর বিছানার এক প্রান্তে বসল।

মণীশ অনেকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বেশ মোলায়েম সুরেই ডাকলে—"বিনু, আজ আমি তোমায় ভাল করে চিনতে পারলাম! তোমার দেবীত্ব আমার অন্ধ চোখ দেখতে পায় নি! আজ আমার চোখ খুলে গেছে! সমীর সব আমায় বলেছে। বিনু, আমি অতি মূর্খ, শিব বুঝে শবের পূজা করেছি। তোমার প্রতি অতি নিষ্ঠুরের কাজ করেছি। কিন্তু তুমি প্রতিবাদ না করে নির্ব্বিবাদে সব সহ্য করেছ। তোমার ক্ষমা এবং সৎ ব্যবহারে আমার ভুল ভেঙেছে। তোমার নারী-মর্য্যাদার অবমাননা করেছি, তাই আজ আবার তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে তোমার হাতেই সব অধিকার তুলে দিতে চাই। তুমি কি তোমার হৃদয়ে এ অধমকে স্থান দিতে দ্বিধা করবে?

—মণীশ, ও বেলা কি খাবে বাবা? বলিতে বলিতে মনীশের শ্বশ্রু-ঠাকুরাণী ঘরে ঢুকতেই বিনতা অন্য ধার দিয়ে বাইরে চলে গেল।

—ওবেলা একটু দুধ খাব।

—আচ্ছা বল্‌তে বল্‌তে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিনতা রান্নাঘরে ছিল। তিনি রান্নাঘরে যেতেই বিনতা তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে বল্লে—মা, আমার ওপর রাগ কর্ব্বেন না। আমি কি আপনার মেয়ে নই, আমার ওপর আপনারা রাগ করে চলে যাবেন কেন? মেয়ে বলে আমার যত দোষ সব ভুলে যেতে হবে। আর আপনারা গেলেই আমি যেতে দোব কেন? আমি একলা থাকতে পারব না মা। আপনাদের দয়াতেই আমি অমন সোনার চাঁদ দু'টী ছেলে পেয়েছি। আপনি আমায় ক্ষমা না করলে আমি আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো—বলে বিনতা পায়ে মাথা রাখলে।

—ওঠো মা, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় গ্রহণ করলুম! আমার এক মেয়ে হারিয়ে আর এক মেয়ে পেয়েছি—বলে তার হাত ধরে তুলে সমীর এবং অমিয়কে তার হাতে দিয়ে বল্‌লেন—মা বিনু, সুবি আমার হাতে এ দু'টী যাবার সময় দিয়ে গেল, আর বলে গেল—মা, এদের তুমি মানুষ করো। কিন্তু আমার আর বেশী দেরী নেই, কোন্‌দিন ডাক আসবে আর চলে যাব। এ দু'টীকে এখনও মানুষ করতে পারলুম না, তাই তোমাকেই আমার সুবি ভেবে তোমার হাতেই এদের দিলুম। তুমি তোমার মনের মত করে গড়ে নিও।

বিনতার করুণ কথাগুলো শুনে মনীশের শ্বশ্রু-ঠাকুরাণী এই কথাগুলি আবেগভরে বলে ফেললেন।

দু' মাস পরে।

একদিন সন্ধ্যার পর বিনতা কাজ সেরে মণীশের কাছে গেলে সে স্ত্রীকে তার কাছে আসতে বল্‌লে। বিনতা কাছে গেলে, মণীশ তখন আবার তার গত দুঃখের কথা বলে যেতে লাগ্‌ল। বিনতা তার সেই আত্মগ্লানি শুনে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না। কেঁদে উঠে স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। মণীশ তখন বিনতার মাথা নিজ বক্ষে স্থাপন করে আবার বলতে লাগ্‌ল—বিনু, তোমার মত স্ত্রীকে আমি অনাদর করেছি, তারই শাস্তি দেবার জন্য ভগবান বোধ হয় আমার ওপর নিদয় হয়ে আমার স্বাস্থ্য খারাপ করেছিলেন। তোমার সেবা-যত্নে আমি আমার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পেরেছি এবং তোমার ঐ সেবাপরায়ণ করস্পর্শে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আমি তোমায় আর কোথাও যেতে দেব না—আমার হৃদয়-রাজ্যে তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে মহিমামণ্ডিত মনে করব—বলে মনীশ আবেগভরে বিনতার ওষ্ঠপ্রান্তে একটী চুম্বন রেখা এঁকে দিলে।

বিনতা নিজেকে মনীশের বক্ষ হতে মুক্ত করে তার পা ধরে বলতে লাগল—আমি এ সব ভালবাসি না। ব্যাহ্যিক জিনিষকে আমি বড় তুচ্ছ বোধ করি। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন গভীর ভেতর থেকে হিন্দুর স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যা' কর্ত্তব্য তা' করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে পারি। তুমি আমার দেবতা, দাসীকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দেওয়া যে পূর্ণ অধিকার আমি পেয়েছি, তার উপযুক্ত হয়ে চল্‌তে পারি—বলে বিনতা স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করলে।

মণীশ তখন বিনতার মাথায় হাত রেখে বল্‌লে—আমি আজ প্রাণ খুলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, জীবনে যেন আমার দেওয়া কোনও অধিকার হতে তোমায় বঞ্চিত হতে না হয়! কিন্তু আমায়ও ত তোমার সঙ্গী করবে বিনু! আমায় সঙ্গী করে তোমার আদর্শ শিখিও! আমার আশা পূর্ণ করো! আমায় মানুষ করে তুলো!

—তোমার আশীর্ব্বাদ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলুম! বলে বিনতা স্বামীকে পরিপূর্ণ ভক্তির সহিত প্রণাম করলে।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী চট্টোপাধ্যায়
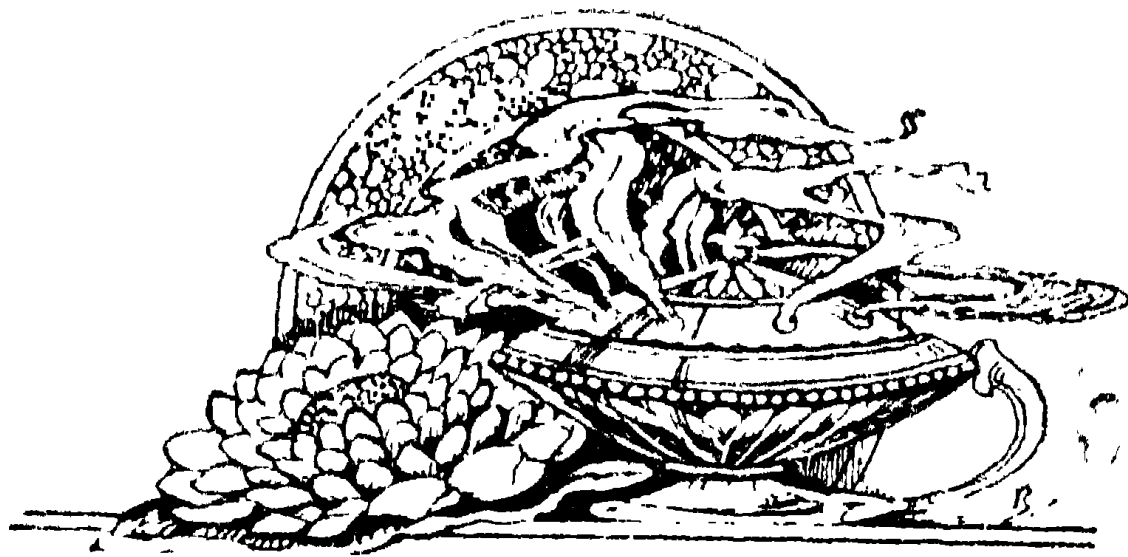
চাষার মেয়ে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

এক

"কই গো দিদিঠাকরুণ" বলিয়া কেষ্টার বৌ গোবরমাখা ছোট্ট একখানি দেশী তাঁতের শাড়ী হাঁটু পর্য্যন্ত টানিয়া-টুনিয়া পরিয়া মুখুয্যেদের বড়বাবুর বাড়ীতে ঢুকিল।

দিদিঠাকরুণ, বাড়ীর গৃহিণী সুপ্রভা তখন রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠকর্ ঠকর্ করিয়া কি রান্না করিতেছিলেন, আর পাশের 'মেউ মেউ' করা বিড়ালটাকে এক-একবার ঘুঁটের শব্দ করিয়া 'ছেই ছেই' 'দূর দূর' করিয়া তাড়া দিতে দিতে কপালের ঘাম মুছিতেছিলেন।

দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের আমপাকা গরমে গাছের পাতা হইতে নীচের জল পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইবার যোগাড় হইতেছিল। তরকারী, হাঁড়ি, ঘড়া-ঘটীর মধ্যে কোনোরকমে কোণঠাসা হইয়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া সুপ্রভা আগুনের সঙ্গে মিতালী করিতেছিলেন। কেষ্টর বৌ-এর ডাক যখন তাঁহার কাণে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এক ঝাপ্‌টা পশ্চিমে বাতাস আসিয়া উনানের ধোঁয়া হাঁড়ির মধ্যে তাল পাকাইয়া তুলিয়া, সুপ্রভার কপালের ঘাম মুছাইবার জন্য হাত বাড়াইতেই বুঝি বা সুখ স্পর্শে তাঁহার চোখ বুজাইয়া দিল। বামহস্তে চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে সুপ্রভা "কে গা?" বলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমি বোন্।" বলিয়া কেষ্টর বৌ তাহার ক্ষুদ্র তালি দেওয়া আঁচল হইতে কতকগুলি পাকা আম ও গোটাকতক কলা বাহির করিয়া পিঁড়েতে নামাইয়া দিতে দিতে, "আমার জীবনধনের জন্য এনেছি বোন্। কোথায় বাবাজীবন?" বলিয়াই সে তাহার আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বাড়ীর এপাশ-ওপাশ, এঘর-ওঘর খানাতল্লাসী করিয়া যখন ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন জীবনের মায়ের কথাতেই আশ্বস্ত হইতে হইল যে, জীবন এখনও বাড়ী ফিরে নাই; এবং সে বাড়ী ফিরিলেই সুপ্রভা তাহার মায়ের উপচার তাহার পাতে দিবেন।

জীবন, মুখুয্যেদের বাড়ীর একমাত্র ছেলে। কিন্তু তাহার দুই মা। তাঁহারা সৎমা নহেন। দুইজনেই মা; দুইজনেরই সমান অধিকার—এবং দুই মায়েরই সমান আনন্দ যে, তাঁহারা জীবনের মা। এক সুপ্রভা গর্ভধারিণী, আর এক কেষ্টার বৌ পাড়ার নিঃসন্তান চাষার মেয়ে। কথাটা যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিবেন, তাহারা নিশ্চয়ই পল্লী-জীবনের খোঁজ রাখেন, কিন্তু এমন অনেকে আছেন, পল্লী-ভ্রমণকারী সহরের মানুষ, যাঁহাদের চোখে ব্যাপারটা হেঁয়ালীর মত ঠেকিতে পারে, সে কথাটার সদ্য প্রমাণ হইয়া গেল, যখন পাড়ার রমেশ মিত্রের এক শালী মনোরমা, রমেশবাবুর কন্যা মিনিকে সঙ্গে করিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া "কই দিদি, কেমন আছেন? অনেক দিনের পর" বলিয়া বাড়ী ঢুকিয়া রান্নাঘরের উপর সুপ্রভার সামনে গিয়া 'ধপ্' করিয়া বসিয়া পড়িল। সুপ্রভা শ্লথ কাপড়খানিকে টানিয়া আনিয়া কথা বলিবার পূর্ব্বেই কেষ্টর বৌ কথা পাড়িয়া বসিল—"কবে আসা হ'ল ভাই?"

'ভাই' কথাটা সহরবাসিনী মনোরমার কাছে সত্যই হেঁয়ালীর। এক নীচজাতীয়া নোংরা মাটীওয়ালীর মত মেয়ে তাহাকে 'ভাই' বলিবার স্পর্দ্ধা রাখে কেমন করিয়া! তবু মনোরমা চাপিয়া গিয়া সহজভাবেই উত্তর দিল—"ভাল।"

সামনেই পাকা আম কলা পড়িয়া আছে। কোনো সহরবাসিনীর পক্ষে সে ক্ষেত্রে দাম জিজ্ঞাসা না করা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু দাম জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া আর একটী নূতন ধাঁধার সৃষ্টি হইয়া গেল। বায়ু-পরিবর্ত্তনের অভিজ্ঞতা নূতন করিয়া তাহার কাছে আসিল। সুপ্রভা উত্তর দিলেন—"কেনা নয় বোন্, ঐ ঈশানী দিদি এনেছে।"

ভাই-ভগ্নী, মাতৃ-পিতৃহারা। ঈশানীকে সহরের মেয়ের কাছে 'দিদি' বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেওয়ায় তাঁহার মধ্যে নাড়া দিয়া উঠিল কি না কে জানে! মনোরমা বুঝিল না।

মনোরমা প্রশ্ন করিয়া বসিল—"তোমাদের কি গাছ আছে গা?"

ঈশানী কি উত্তর দিবে সহসা খুঁজিয়া পাইল না। আম কলার গাছ থাকিবার কল্পনাও সে করিতে পারে নাই। দু'বেলা দু'মুঠা নুণ-ভাত আর জল জুটিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। যে একটী ছোট্ট চারা আমগাছ বাড়ীতে হইয়াছিল, তাহা জমীর মালিক জমিদারবাবু স্বত্ব আইনে আম ধরিবার পূর্ব্বেই বেড়া দিয়া দখল করিয়া আসিতেছেন। আবার এই কয়টী আম কিনিয়া দিবারও সামর্থ্য তাহার নাই। কিন্তু সে যে কুড়াইয়া আনিয়া 'ভেট' দিতে আসিয়াছে, এ কথাটা একজন অর্দ্ধ-পরিচিতা মানিনীর কাছে কেমন করিয়া এজাহার করে? তবু সত্য কথা বলার অভ্যাসটা সংস্কারে রহিয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া ফেলিল—"না গো দিদি, মাঠে শসার বীজ বসাতে গিয়ে আমতলায় পেয়েছিলাম; আর এই কলার কথা, সে আমাদের কোথা হতে নিয়ে এসেছে। গরীব লোক আমরা, যা' সাধিতে কুলোয়—"এই কথা বলিতে বলিতে একটু লজ্জার হাসি যে তাহার ঠোঁটের ফাঁক দিয়া ফুটিয়া না উঠিল, তাহা নহে।

শুধু 'ভাই' বলাতেই শেষ হয় নাই। আবার এ বাড়ী যে এক মূহূর্ত্তে কেমন করিয়া বৃন্দাবন হইয়া গেল, যশোদার কেমন করিয়া উদ্ভব হইতে পারে, একথা মনোরমার স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ মনের কাছে মাত্র কূয়াসারই সৃষ্টি করিল।

মনোরমার অবাক মুখ দেখিয়া সুপ্রভার বুঝাইয়া বলিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। হঠাৎ মাঝ হইতে বলিয়া ফেলিলেন—"দিদি, ও আমার জীবনের দুধ্-মা কি না! অল্পবয়সে আমার ছেলে হওয়ায় আমার ভাল দুধ ছিল না। যখন ঈশানীর সে সোনার গোপাল সাতদিনেই মায়া কাটিয়ে চ'লে গেল, তখন আমার গোপালই ঈশানী দিদির ঘাড়ে চাপ্‌ল। চাপ্‌ল কেমন করে বলি? সে নিজেই ঘাড়ে নিলে। আমরা বুঝলাম,—আমাদেরও দরকার, তারও দরকার; তাই ছেড়ে দিলাম। সেই হ'তে জীবন আমাদের কাছে ভাগ হয়ে গিয়েছে—বুঝি, ওরই বেশী।

ও......! মনোরমার বিস্ময়ভরা মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। একটা চাষার মেয়েকে 'নার্স' করিয়া ছেলে মানুস করিয়াছিল, তাহার জন্য পয়সা লউক বা না লউক, ইহাতেই ছেলের পর্য্যন্ত দুই সতীনের স্বামী ভাগ হইয়া গেল; এমন কি, ছোটলোক আসিয়া 'ভাই', 'দিদি' পর্য্যন্ত বলিতে লাগিল। বড়দের এতখানি নামিয়া আসিয়া ঐ অসভ্যদের সঙ্গে এক জমিতে দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি?

মনোরমা মনের ভাব চাপিয়া ফেলিবার অবসর খুঁজিতেছিল, এমন সময় কেষ্টর বৌ "যাই দিদি, সে আবার মাঠ হতে আসবে" বলিয়া চলিয়া যাওয়ায় মনোরমা কিছু বলিবার অবসর পাইল। কিন্তু ঈশানী থাকিবার সময়ই মনোরমা বলিয়া ফেলিয়াছিল—"এতে ছেলে খারাপ হয় না?"...যে মাতৃহৃদয় সঙ্কোচের বাঁধন একটু একটু করিয়া ছিন্ন করিয়া পুরাদমে দেওয়া-নেওয়ার হিসাব খুলিয়া বসিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারের দ্বার হঠাৎ একটু খুলিয়া গিয়া 'ছোট জাতে'র প্রাণকে বুঝি একটু দমাইয়া দিল। তাই ঈশানী মুখখানা কালো হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িল।

মনোরমা অবসর পাইয়া বলিল—"তোমরা যে কি করে এ সব পার দিদি, তা' আমি বুঝি না। ভদ্রলোকের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে ওদের তফাৎ আছে। ছেলেদের নবীন পাতলা মনটাকে যেমন করে নোয়াবে, তেমনি হবে। আমরা কিন্তু ভাই ছেলেদের ভাল আবহাওয়ার মধ্যে রাখতে পছন্দ করি।"

সুপ্রভা তাহার কথা শুনিয়া শুধু একটু হাসিলেন। তাহা ছাড়া উপায় কি? বলিলেন—"ভাই, তোমাদের নীতিশাস্ত্র আমরা অত বুঝি না। তবে কি জান, আমাদের মনে কিছু বাধে না। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বামুনেরই হোক্, আর যারই হোক্, চাষার ঘরে পিঁড়েয় বসে, মাঠে খেলে গেয়ে বেড়ায়, সেটা আমাদের বেখাপ

দেখায় না। আর খারাপ হওয়ার ভয়ও আমরা করি না।"

যুক্তি-তর্কহীন ভাবের ভাষায় মনোরমার গা কেমন কেমন করিতে লাগিল। সে একটু ঠোঁট বাঁকাইয়া হাতের চুড়ি কয়গাছি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"যাই দিদি, এখন তোমাদের কথা তোমরাই বোঝ।"

সুপ্রভা আবার একটু হাসিয়া বলিলেন—"রাগ করো না ভাই, আবার এস।"

একটু বক্র হাসি হাসিয়া মনোরমা বলিল—"নিশ্চয় দিদি, তোমাদের ঘরের অনেক কথা শেখবার আছে।" আর একবার মুখ টিপিয়া হাসিয়া মিনিকে সঙ্গে করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দুই

অনেক দিন পরের কথা। জীবন এখন স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে যাইবে। বাক্স-বিছানা মাথায় করিয়া কেষ্ট আজ তার স্ত্রীর রত্নকে বিদায়ের পথে আগাইয়া দিতে চলিল। বাড়ী চণ্ডীমণ্ডপ—মা জগদম্বার পাদপীঠ। সুপ্রভা অশ্রু মুছিতে মুছিতে বেদিকার ধুলি লইয়া জীবনের মাথায় তুলিয়া দিল। ঈশানীকে ডাকিয়া মায়ের ধুলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে ডাকিল। "ঈশানী দিদি, আয়। ছি, এখন দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেমন করে বোন্! জীবন যে আমাদের পড়তে চলল; তার কত উন্নতি হবে, কত পয়সা সে উপায় করবে; আমাদের মা বলবে, রাণী করে রাখবে। আয় ভাই, আয়, আশীর্ব্বাদ কর।"

ঈশানীও আসন্ন বিদায় ব্যথাকে চাপিবার জন্য আজ একমাস হইতে রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া এমনি করিয়া নিজেকে স্বান্তনা দিয়াছে। গ্রামের সখীদের ধরিয়া ধরিয়া বলিয়াছে—"আমার ছেলে, আমায় রাণী করবার জন্য পড়তে চল্‌ল। আমি যে তার মা। আমার কাঁদলে চলবে কেন? আমি যে মা।"

কিন্তু এই শেষ কথা কয়টী উচ্চারণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার প্রাণে আত্মপ্রতারণার কথা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কাঁদিলে চলিবে কেন? সত্য কথা। কিন্তু না কাঁদিয়াই বা পারে কেমন করিয়া? স্বামীর সঙ্গে আমোদ করিয়া তাহাকে বাবা সাজাইয়া কতবার ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কত মায়ার রঙ্গিন জাল বুনিয়া উর্ণনাভের আনন্দলাভ করিয়াছে। কিন্তু কোথায় রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে বাঁশবন হইতে কি একটা শব্দ ভাসিয়া আসিতে শুনিয়াছে। সেটা কিছুই নয়—শুধু একটা আওয়াজ। কিন্তু তাহার মধ্যেই আছে 'নাই! নাই!' কি যেন নাই! কেন নাই? কোথা নাই? কি নাই? তাহার ঠিকানাও যে নাই। কিন্তু কেবল নাই। তাহার নিদ্রাতুর প্রাণের মধ্যে হঠাৎ কি একটা ঝাঁকানি দিয়া উঠিয়াছে; মর্ম্মে মর্ম্মে, প্রাণে প্রাণে শুধু এই কথাই বলিয়া দিয়াছে—'কিছু নাই—নাই!' আর এই নাই নাই বুলি তাহার প্রাণে প্রত্যয় আনিয়া দিয়াছে—যেন তাহার কিছু নাই, কিছু যাইতে বসিয়াছে। শত ব্যথা সত্ত্বেও সে নিজেকে কোনমতে সাম্‌লাইয়াছে। লোকের কাছে জানিতে দেয় নাই।

কিন্তু সুপ্রভা যখন তাহাকে বারবার জিদ করিতে লাগিলেন, তখন অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া সমস্ত গণ্ড ভিজিয়া বান ছুটিতে লাগিল।

তাহার কাঁদিবার বিশেষ কিছু ছিল না। সে কথা সে পূর্ব্বে নিজেকে বুঝাইয়াছিল, এখনও তাহা বুঝাইতে পারিত; এখনও ক্রন্দন অন্ধকারের জন্য চাপিয়া রাখিতে পারিত—কিন্তু এখন যে আসন্ন বিদায়ের মূর্ত্ত ছবি—এক মূহূর্ত্তেই তাহার চির আদরের দুলালকে কোথায় সরাইয়া লইবে—কতদিনের জন্য কে জানে!

অথচ তাহার নির্ব্বাক হইয়া হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? সে ত হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেই পারিত। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিবারই বা তাহার শক্তি কোথায়? যেদিন হইতে জীবনের উপ-নয়ন হইয়াছে, সেদিন হইতে তাহার ঘরের কোণে বসিয়া জীবনের খাওয়ার শেষ হইয়াছে; সেদিন হইতে মনোরমার সেই পুরাতন কথার খোঁচা তাহার সম্বিতে নিত্যই একটু একটু করিয়া বিঁধিয়াছে। সখীরা কহিয়াছে—"পরের ছেলে, বামুনের

ছেলে মানুষ করা পাপ। তা'তে আশাও মেটে না; শেষে প্রাণ যেমন তেমনি খাঁ খাঁ করে—সুখ আসে না।" শত্রুরা খোঁচা মারিয়া মা হওয়ার অস্তিত্ব বুঝাইয়াছে; কেহ বা কুৎসিত আলোচনা পর্য্যন্ত করিতে ছাড়ে নাই। সর্ব্বত্রই তাহার যে মা হওয়া চলে না, মাত্র তাহার বহুরূপীর সাজ পরা, সে এই কথাই শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহার বুভুক্ষিত মাতৃপ্রাণ আশার বিরুদ্ধে স্বতঃই আশা করিয়া, জীবনের পুত্রত্বের দোহাই দিয়া যতই আপনাকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ততই বহিরাগত সংশয়ের ঢেউ আসিয়া তাহার প্রাণের সমস্ত শক্তি লুটিয়া 'খাঁ খাঁ' 'হাঁ হাঁ' রব তুলিয়াছে। 'চলে না, চলে না' শুনিয়া যেন তাহার সারা জীবন অচল হইয়া গিয়াছে। তাহার রক্ত-মাংসের দেহের সমস্ত আলোড়ন যেন পাথর হইয়া পড়িয়াছে। তাই তাহার হাত উঠিল না, মন সরিল না। আশীর্ব্বাদ করা তাহার চলে না; মায়ের দাবীতে যেন কোথায় আঁচড় পড়িয়াছে। সুপ্রভার শত চেষ্টার বিক্ষোভে তাহার অশ্রু সহস্রগুণই হইয়া উঠিল। তাহার পায়ের তলায় পৃথিবী যেন অশ্রুস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কূল-কিনারা পাইবার জন্য সে ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল্ লাগাইয়া উপুড় হইয়া সোঁতসেঁতে মাটীতে পড়িয়া অশ্রু-স্রোতেই বুঝি আজ আশীর্ব্বাদ জানাইল।

তিন

আজ দুই-তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। জীবন ছুটীর সময় বাড়ী আসে। সকলের জন্য যাহা হয় কিছু আনে। কখনও কাপড়, কখনও বাক্স, ইত্যাদি। কিন্তু কলিকাতার আবহাওয়া; তাহাতে তখন স্বরাজ আন্দোলনের গূঢ়নীতি জীবনের প্রাণে বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সমস্ত বড় বড় চিন্তা ও ভাবের মধ্যে, সুরুচি সুচালের মধ্যে তাহার মন গড়িয়া উঠিবার উদ্যম করিতেছে। গ্রামের চাষা-ভূষাদের প্রতি দরদ থাকিলেও, তাহাদের দুর্নীতি কুচাল কুরুচির সমালোচনা করিতে শিখিয়া চাষার মেয়েকে 'মা' বলিবার সামঞ্জস্যটা সব সময় বজায় রাখিবার কথা তাহার মনে জাগে না। যতই বয়স বাড়িতেছে, যতই তাহার সভ্যতার সঙ্গে মেশামেশি হইতেছে, ততই যেন সেই পুরান 'মা' বলাটাকেও কিছু কুনজরে দেখিতেছে। চাষা 'মা' ত দূরের কথা—আপন বাপ-মায়ের প্রতিও অনেকের প্রথম আলোকে সুনজরে তাকান সম্ভবপর হয় না।

এবার পূজার ছুটীতে জীবন খবর না দিয়াই বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ রাত্রেই বাড়ী আসিয়া হাজির।

সকালে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। অনেক চাষা বাগ্দী মুচিকে ডাকিয়া তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাহার দুধ-মায়ের কথাও মনে আসিয়াছে। মনে করিয়াছে, খবর নেয়। কিন্তু কোথায় যেন একটু বাধিয়াছে। গরীব-দুঃখীকে সাধারণভাবে দয়া দেখান সহজ, কিন্তু যেখানে নিজের প্রাণের সঙ্গে সম্পর্ক জড়ান, অথচ যেখানে সর্ব্ব-সাধারণ্যে প্রাণের সেই গভীর আবেগ ভালবাসার নির্লজ্জ প্রকাশ নিজের সম্বন্ধেই পাইবার আশা আছে, সেখানে নব্যতন্ত্রের যুবকের আবছাওয়ামাখা সুমার্জ্জিত মন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে বোধ হয়। তাই জীবন চাষা মায়ের সাক্ষাতে সহজে আসিল না।

ঈশানীও 'আসে আসে', 'দেখি দেখি' করিয়া আর থাকিতে না পারিয়া গ্রামের মধ্যে রাজপথের ধারে যেখানে জীবন বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ করিতেছিল, সেইখানেই আসিয়া হাজির। ধরা পড়িবার ভয়ে জীবনের মুখটা একটু কালো হইয়া গেল।

—"হ্যাঁ গো, এসে হতে দেখা দিতে নাই! মা বলে একটুও মনে পড়ে না? আমি পথ চেয়ে—"

জীবনের মুখ বিরক্তিতে ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। সে শুধু জোর করিয়া মুখ তুলিয়া 'উঃ হু' করিয়াই কালো মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া গল্পে মন দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একটা চাষার মেয়ে তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, এতবড় নির্লজ্জ উক্তি বন্ধুবর্গের মাঝখানে কোন্ তরুণের মাথা হেঁট করিয়া না দেয়? তাহাতে বন্ধুদের আড়চোখের চাহনি আছে। তাহার প্রাণের মধ্যে যে আলোড়ন, যে সংশয়, বিরক্তি লজ্জার হুটোপুটি

চলিতেছিল, তাহাকে চাপিয়া ফেলিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে আর একখানা মুখ যে তাহার জীবনের সমগ্র ব্যর্থতায় পুড়িয়া কালো হইয়া মাটীতে মিশিতে চাহিতেছিল, তাহার খোঁজ কেহ রাখিল না। কাহার পায়ের তলায় পৃথিবী সরিয়া গেল, কাহার চোখের আলো নিবিয়া গেল, কাহার সমগ্র ইন্দ্রিয় বোঝার চাপে মুহ্যমান হইয়া পড়িল, সে কথা অপরে কেমন করিয়া ভাবিবে?

কিন্তু জীবনের ফিরিয়া চাহিবার ইচ্ছা তাহার নিজের বিরুদ্ধেই জাগিয়া উঠিলেও সে তাহা পারিল না। আর সেই চাষার মেয়ে তাহার চোখের জল চাপিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া ঘরে খিল্ দিয়া আবার সেই যাত্রার দিনের মতই কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। সেদিন সেই যাত্রার বিদ্ঘুটে গাড়ীর বাঁশী তাহার অস্থি-পঞ্জরের মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া বাজিয়া তাহার সব তোলপাড় করিয়াছিল, আর আজ সেই জীবনের গম্ভীর তুচ্ছ আলাপ তাহার সমস্ত অঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার অস্থি-পঞ্জর গুঁড়াইয়া দিতে লাগিল। মাথা তাহার পায়ের সঙ্গে মিশিয়া গেল, বুক তাহার পিঠের সঙ্গে এক হইয়া গেল।

চার

জীবন বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিয়াছে। এই কয়দিনের মধ্যেই ভয়ে সংশয়ে লজ্জায় ঈশানীর স্থির হইয়া গিয়াছে যে, তাহার সার্থকতা গ্রহণে নয়—দানে। তাহার অচল জীবন কোনরকমে জোড়াতাড়া দিয়া জীবনের মুখের ভালবাসার দ্বারাও, তাহার মুখের দুটো কথাতেই কোনরকমে চল হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া কোথা হইতে কতগুলো উড়ো ছাই, ভুল দোষের আবর্জ্জনা আসিয়া তাহার মনটাকে নাড়া দিয়া দিয়া এখন সংশয়ে শক্ত কাঠ করিয়া দিয়াছে; তবু ভুল দোষের মাঝখানেই তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, সকলের অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়ের সমস্ত রস দিয়া তাহার পুত্র-স্নেহের মালঞ্চ সাজাইতে হইবে। বড়লোকের সঙ্গে ভালবাসার কারবার ছোটলোকের মৌনতার মধ্যেই শোভা পায়।

কিন্তু পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই অবাঞ্ছনীয় লজ্জা কি তাহাকে শান্তিতে বাস করিতে দিবে? কখনও কি তাহার মনের মধ্যে একটা অলোড়ন তুলিবে না?

জীবনের বিবাহে ঈশানী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াছে। নিজে না খাইয়া সকলকে ডাকিয়া খাওয়াইয়া, আমোদ দিয়া, ভ্রমরের মত স্থানে অস্থানে আপনাকে বাহিয়া কত আনন্দ পাইয়াছে। বধূমাতাকে কোলে লইয়া, চুমু খাইয়া, পায়ের ধূলি লইয়া আপনার সার্থকতা বাঁচাইয়াছে। তবু কি সে তাহার বিশ্রামের মাঝখানে একটা শূন্যতার বিরাট ব্যাপ্তির আবেশ অনুভব করে নাই?

সুপ্রভা জীবনকে ডাকিয়া আনিলেন। বধূমাতাকে সঙ্গে করিয়া জোর করিয়া আনিয়া ঈশানীর দিকে লইয়া আসিতেছিলেন। ঈশানীর ভয় হইতেছিল, আবার কোথায় কি করিয়া বসে; আবেগের ঝোঁকে কি কথা বলিয়া ফেলে। সে আপনাকে যথাসাধ্য সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুপ্রভা আসিয়া বলিলেন—"দেখো দিদি, জীবন, বৌমা তোমারই। তুমিই এদের নিয়ে ঘর করবে। আমি মাত্র শুধু তোমাদের দেখব, বেশ হবে দিদি!

ঈশানীর দেহ রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। জীবন তাহারই! এই নিঃসন্তান জীবনে সে তাহারই সম্বল। পুলকে পুলকে তাহার পা টলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সত্যই কি—তাহাকে কি তাহার এমনি করিয়া পাওয়া চলে! সে চুপ করিয়া কাপড়টুকু একটু টানিয়া একটু ঝাড়িয়া একটী ঝুড়ি তুলিবার অছিলায় বসিয়া পড়িল। টলিয়া যাওয়া পুলকের পর জিভ কাটা লজ্জায় তাহাকে বসাইয়া দিল কি?

বিবাহ করিয়া জীবন কলিকাতা গিয়াছে। বসন্ত আসিয়াছে। নূতন জীবন নূতন প্রেম, নূতন অভিজ্ঞতা! জীবনে কোথায় কাহার গতি, কোথায় কাহার স্থিতি, কোন স্থিরতা নাই। এক অলক্ষ্য হইতে আর এক অলক্ষ্যের দিকে যাত্রা। কোথায় তাহার কিনারা কে জানে! কেনই বা যাত্রা তাহাই বা কে জানে! কিন্তু যাত্রারও পরিসমাপ্তি নাই। দুঃখ-সুখের মধ্য দিয়া নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া পদক্ষেপ।

এই যাত্রার মাঝখানে যাহার যতটুকু পাওনা, সে ততটুকু বুঝিয়া লয়। শাশ্বত নীতি হইতেছে, সকলের কিছু কিছু সংগ্রহ করা। সেই সংগ্রহ হইতেছে, মানবের প্রাণ-মন, ভালবাসা, স্নেহ-ভক্তি। তাই বুঝি বিবাহের সার্থকতা; বিশ্ব মিলনের অংশচ্ছবি। আর অনন্ত যাত্রার পাথেয় হইতেছে বিবাহে পাওনা। জীবনের তরুণ প্রাণে যখন এইভাবে রং ধরিতেছিল, তখন হঠাৎ বসন্তের বাতাস আসিয়া প্রাণের মধ্যে একটা উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়া একটা অভাবের সৃষ্টি করিয়া দিল। সবই আছে, সবই পাওয়া আছে, কিন্তু সবেরই মধ্যে যেন একটা দূরের নিশ্বাস, দূরের টান আসিয়া ওলট-পালট করিয়া দিয়া সুখের মধ্যেও বেদনার সৃষ্টি করিতেছিল।

জীবনের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, জীবনকুমারের কল্পনা কত দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত; কত ভাষা, কত ভাব, কত কালের মধ্যে কি তল্লাস করিয়া ফিরিত। বেদনার সুর ধরিয়া থাকিলেও যৌবনের তাজা প্রাণে সেটা স্থায়ী নহে। পরিপূর্ণতা দিনে দিনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রে মেসের ঘরে দরজা খুলিয়া শুইয়া শুইয়া ভাবের আবেগে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিত না। জানালা দরজা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া গায়ে মুখে পড়িত। তাহার ঘর-সংসার, আত্মীয়-বন্ধু সবই মনে পড়িয়া যাইত। কোথাও এতটুকু ছেদ নাই; পিতা, মাতা, স্ত্রী, ধন, মান, বিদ্যা সবই। সর্ব্বত্রই শান্তি সুখ বিরাজিত। সর্ব্বত্রই একটানা আনন্দের স্রোত বহিত। ভাবিতে ভাবিতে কখনও বা কোনো শব্দে বা কোনো কারণে যদি হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, তখন স্বপ্নের মাঝে একটা ছেদ পড়িত। দেখিত দুই কূল ভরিয়া নদী ছুটিয়াছে, কিন্তু কোথায় হঠাৎ এক 'চটান' বালির চর ধূধূ করিতেছে প্রচণ্ড বাতাসে—বা 'ছ্যোঁৎ' করিয়া উঠিত। কিন্তু কেন? কিসের এ বালির চর? এ কি চোরাবালি যে, তাহাকে ডুবাইয়া মারিবে? কেন এর সৃষ্টি? কোনোদিন ঘুমের ঘোরে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিত ওই চোরাবালির ভয়ে। পাছে মা ঐ চোরাবালিতে পড়িয়া যান। নীতি শিক্ষার কঠোরতা তখন তাহার থাকিত না। প্রাণের আবেগে আচম্বিতে সম্বিতের তলদেশ হইতে আত্মপ্রকৃতি 'বুদ্‌বুদ' তুলিত। ঐ 'মা' নাম, ঐ বিশ্বসংসারের একটী শাশ্বত স্নেহের প্রতিমা তাহার মনে জাগাইত। কাহার আর একটা অস্পষ্ট আভা সেই মাতৃদেবীর পাশেই ভাসিয়া উঠিত। তাহার মুখ মলিন, রুক্ষ কেশ, শ্লথ ছিন্ন বসন; সমস্ত বুক কিসের চাপে মাটীর দিকে নোয়াইয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষের কোণ হঠাৎ ভিজিয়া উঠিত। যাহার অস্তিত্ব এতকাল যেলো আনাই সে স্বীকার করিয়াছে, অথচ বর্ত্তমানে সে তাহার পাশ হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া গিয়াছে, তাহারই দূরাগত ক্রন্দনধ্বনি তাহার কাণে আসিয়া বাজিত। তখন রাত্রি যেন অন্ধকারে তাহার বুকে আসিয়া চাপিবার উদ্যোগ করিত।

একদিন চিঠির বাক্সে হাত দিতেই তাহার নামের একখানা কার্ড হাতে পড়িল। কার্ডখানি আদ্যোপান্ত এক নিমিষে জীবন পড়িয়া গেল। তাহাতে মা লিখিয়াছেন—

"বাবা জীবন, তোমার দুধ-মায়ের বড় অসুখ; বোধ হয়, এ যাত্রা আর উঠবে না। ডাক্তার রোগ ধরতে পারে নি। অথচ দিদি দিন দিন শুকিয়ে রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ী আর বড় আসত না। সবদিন বোধ হয় পেতো না। আমার ইচ্ছা, তুমি বাবা পত্র পাঠ এখানে চলে এস। নইলে তার ঋণ শোধ হবে না। ইতি,

আশীর্ব্বাদিকা

মা

তাহার ঋণ শোধ হইবে না। এ কথা আজ জীবনের চিত্তে নূতন রূপ ধরিয়া আসিল। যাহার ক্রোড়ে আজীবন পালিত, যাহার স্তন্যে তাহার দেহ পুষ্ট, তাহার সরল ত্রুটীর অজুহাতে, তাহাকে আজ অন্তরের গোপন কোণ হইতেই সরাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; অথচ, তাহার ঋণের এক পয়সাও স্বীকার করিবার কথা মুখেও আনে নাই। প্রাণের মধ্যে যেন তার শত শত মশাল ধরিয়া গেল; একটা তীব্র অস্বস্তিতে দেহ পুড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যার

গাড়ীতেই যাত্রা করিয়া জীবন রাত্রি তিনটার সময় বাড়ী পৌছিল।

পাঁচ

মুখুয্যে-বাড়ীর হাঁকাহাকিতে, লোকজনের পদশব্দে ভোরের বেলায় পাড়ার প্রায় সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

রাত্রি নয়টা হইতেই ঈশানীর দৌর্ব্বল্য বাড়িয়াছে, এবং একটু শ্বাসকষ্টও হইয়াছে। এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে একরকম ঝিমাইয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা বিষাদের হাসি হাসিত; কাহাকেও কারণ বলিত না। আজ দুই দিন হইতে তাহার মুখে 'জীবু, জীবু' শব্দও দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শোনা যায়। রাত্রির ঘুমের মধ্যেও 'এই যে আমার জীবু', 'এই যে আমার ছেলে', 'এই যে বাবা আমি', 'আমাকে ভুলো না', 'রাগ করো না', 'ঘৃণা করো না', 'সোণা ছেলে আমার!' এই রকম কথা সময়ে সময়ে শোনা যাইত। পূর্ব্বে যখন জীবন বাড়ীতে পত্র দিত, তখন ঈশানী তাহাদের বাড়ী গিয়া আড়ি পাতিয়া শুনিত, তাহার কথা কিছু আছে কি না। কিন্তু কোথাও না, ঘুণাক্ষরেও না। অভিমান তাহাকে জ্বালা দিত। তবু কোনোদিন কোনো কথা বলে নাই। আজ তাহার মাথায় একটা বিকার চাপিয়াছে; লোকের সাক্ষাতেও চক্ষু লাল করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছে—"জীবু আমায় সুখে রাখবে, চিঠি দেবে, কত কি আমার জন্য আনবে, আমি রাণী হব।" পাশের লোক অবাক হইয়া চাহিয়াছে। এত মায়া!

জীবন বাড়ীতে বসিয়া মায়ের কাছে সেই রাত্রেই সকল কথা শুনিতেছে। আর বলিতেছে—"মা, আমায় আগে কেন বলো নাই? ওর রোগ আমি বুঝেছি।"

এমন সময় জীবন হঠাৎ "কে? কে ও? লাঠিতে ভর দিয়ে, অন্ধকারে হাঁফাতে হাঁফাতে? কে ও, মা!" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

মা "কইরে, কই?" বলিয়া সরিয়া গিয়া "ঐ যাঃ, ঈশানী দিদি তোর কথা ভেবেই বুঝি উঠে এসেছে! অস্ফুটে বলিয়া ফেলিলেন।

ঈশানী বিকৃতস্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল "কে ঐ—আমা—র—জী—বু! আয়—আয়—!" বলিয়া বধূমাতা ও জীবনের পায়ের গোড়ায় আছড়াইয়া পড়িল। মুখ দিয়া অস্পষ্ট শব্দ হইতে লাগিল। একটা গোঁ গোঁ শব্দের মধ্য হইতে এই বোঝা গেল, সে বলিতেছে—"বাঁচালে বাবা, তোমাদের দেখে মরব! গঙ্গায় দিয়ো জীবু বাবা আমার! আমি তোমার মা!"

আবার সেই অনুযোগ। জীবন এই এত কাণ্ডের মধ্যে কোনমতে স্থির ছিল, কিন্তু শেষের কথাগুলির দিকে আর পারিল না। আছড়াইয়া পড়িয়া "মা গো! তুমি কেন চললে গো!" বলিয়া হাত ছুঁড়িয়া শব্দ করিয়া উঠিল। বধূ রমাও আচম্বিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ঈশানীর শীর্ণদেহ চোখের জল মুছিতে মুছিতে নিজের বুকের মধ্যে তুলিয়া লইল। রমার বুকে তাহার বুক, জীবনের কোলে তাহার মাথা। সুপ্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মুখে চোখে জল দিতে লাগিলেন। শেষে ঈশানীর চেতনা (বুকের স্পর্শেই বোধ হয়) কিছু জাগিয়া উঠিল। ঈশানী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"বাবা জীবু, আমার শেষ সময় তোমাদিকে সুখে দেখে যাচ্ছি, তাতে আমি সুখী। কিন্তু আমার শ্রাদ্ধের কি হবে, পিণ্ডি কে দেবে?" বলিতে বলিতে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—"মা বলে—ম—নে করবে—?" পরে চুপ।

জীবন হাউহাউ করিয়া দুরন্ত বেগে কাঁদিয়া উঠিল। "কেন চল্‌লে মা! আমাদের সুখ দেখ্‌লে না মা!" বলিয়া বধূ রমাও কাঁদিয়া উঠিল।

ঈশানীর চক্ষু স্থির হইল; ব্যাকুলতা, কাতরতা মুছিয়া গেল। স্থির ধীর দৃষ্টিতে নব-দম্পতীর প্রতি চাহিয়া রহিল। চোখ দিয়া ফোঁটা কতক জল গড়াইয়া পড়িল। রমা তাহা আপন আঁচলে মুছাইয়া লইল। ঈশানীর বুক এখন ঠাণ্ডা, বুঝি বা শেষ রাত্রির মতই। হঠাৎ সে দমকা মারিয়া উঠিয়া পড়িল—"পারবি মা, পারবি, আমাকে বাঁচাতে পারবি! আমি বাঁচব মা, তোদের সুখ দেখব মা, বাঁচা, বাঁচা!" বলিয়া হাউহাউ করিয়া

কাঁদিয়া উঠিল—"কেন বলিস নাই মা, আগে বলিস নাই! আমি বাঁচতাম—তোরা মা বলিস, ভালবাসিস শুনলে! বাঁচতে আমার বড় সাধ!" আবেগ উথলিয়া উঠিল।

জীবন স্থির। সে করিয়াছে কি? তাহাদের মুখের কথা শোনাতেই যে বাঁচিত, তাহাকে—এই দীন বুভুক্ষিত মাতৃ-হৃদয়কে অনায়াসে ছিন্নবস্ত্রের মত ছাড়িয়া সে চলিয়া গিয়াছে!

ঈশানীর কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতেছিল। সে বলিতে লাগিল—না বাবা, আমার আর বাঁচা চলবে না! মরণেই সুখ! আবার কি করে ফেলব! আবার কত কষ্ট পাব! না মা, আঃ, এ সোণার স্বর্গ হতে আর নামব না! যেন এই সুখেই মরি! তোরা মা বলি—স্! ভাল—বাসি—স—!" বলিতে বলিতে ঈশানীর শেষ নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া থামিয়া গেল।

অসভ্য চাষার মেয়ের প্রাণে এত ভালবাসা! সে তাহার স্বামীকে ছাড়িয়া আসিয়া পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া মরিল!

* * * *

মনোরমা কাল সহর হইতে আসিয়াছে। ভোরে হঠাৎ কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া সবই শুনিয়াছে। তাহার ছলছল চোখের নীচে কম্পিত ওষ্ঠ হইতে শুধু বাহির হইল—"আশ্চর্য্য!" সে বলিতে যাইতেছিল—"এখানে আকাশের ফুল মাটিতে ফোটে, মূকের মুখে ভাষা ছোটে, আকাশ নীচে নেমে আসে, মাটির বুকে কোল দেয়! কোথাও ছেদ নাই, সবই পরিপূর্ণতা! এখানে মরণই মঙ্গল!"

রাত্রি শেষ হইল। নূতন দিনে ঈশানীর চির আকাঙ্ক্ষিত নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

আমার প্রবাসের বান্ধবী

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

পশ্চিমের নিভৃত এক পল্লীতে পার্ব্বত্যের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে সাঁওতালদের বাঁশীর সঙ্গে সুর মিশিয়ে জীবনের সুর বাজছিল—হয়তো ছন্দের মাধুর্য্যও ছিল। এমনি সময় পেলাম কেয়া দিদির এক চিঠি, তাঁর ছোট মেয়েটীর অন্নপ্রাশন—আমাকে যেতেই হবে।

বেশ আনন্দ হ'ল। ওঃ, কত, কতদিন, ভাবতেও মনে পড়ে না, দেখি নি সেই বাঙলা মায়ের শ্যামলা শ্রীরূপখানি! ক্ষণকালের মধ্যে মনটা ভীষণ লুব্ধ, চঞ্চল হয়ে উঠলো—আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে পেতে।

স্বামী করেন রেলের কাজ। ডাক্তার তিনি। ছুটী তাঁর দেবতার আশীর্ব্বাদ; পেতে হ'লে সাধনা চাই। সুতরাং, আর এ সুবর্ণ সুযোগ প্রত্যাখ্যান না ক'রে, তখনই লিখে দিলুম কেয়া দি'কে, "জ্যোৎস্না দা'কে পাঠিও—যাব।"

কয়েকদিন পরে যার নাম বলে—বাধা-বিপত্তি—চলার পথের সেই প্রিয় সাথীদের ঠেলে, অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক্ ভোরবেলাটী এসে পৌছলুম কেয়া দি'র বাড়ী। নিরালা-বাসী চিত্ত আমার ক্ষণকালের জন্য সহরের হট্টগোলে, কেমন যেন বিমনা হয়ে গেল; সবই মনে হতে লাগলো নতুন, চির নতুন, অপূর্ব্ব রহস্যে ঢাকা। কিন্তু জনতা ও নিরালা এ দু'টীর মধ্যে কা'কে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায় এ সমস্যার সমাধান বড়ই জটিল হ'য়ে উঠলো। তাই তো ওই যে উঠোনের একপাশে কলের জলের বিরামহীন গতি, ছড়ছড় শব্দ, ওটা কি মনে করিয়ে দেয় না, ও বাবা, এ যে রীতিমত সংসার—ওরই মধ্যে ভরিয়ে তুলতে জীবনটার কি সৃষ্টি? তার চেয়ে দূরে, মাঠের এক প্রান্তে পাতকো আর মন্দ কি? বাড়ীখানি রেল লাইনের ধারে—ষ্টেশনের ওপর। অনবরত ট্রেণ চলার বিকট শব্দে মনের ছন্দ পতন ঘটে; তবে খুঁজলে আবার 'আর্ট'ও মেলে যথেষ্ট।

কেয়াদি'র ছেলেমেয়ে পাঁচ-ছয়টী। উৎসবের বিশেষ আড়ম্বর ছিল না; সন্ধ্যের পূর্ব্বেই মিটে গেলো যা' কিছু শুভ-অনুষ্ঠানাদি। দূরের আত্মীয়-স্বজনেরা চলে গেলেন; কেবল পাশের ক'টী বাড়ীর—দিদির জনকয়েক মেয়ে-বন্ধুর—তখনও আহার-পর্ব্ব শেষ হয় নি।

"থাক্ মা থাক্, আর দিও না—" এক মাঝারি বয়সের লম্বা মত, গাল তোবড়ানো গিন্নী গোছের মানুষ পাশে আহারে রতা নিজের পুত্রবধূর পাতে খানকয়েক লুচি তুলে দিয়ে আমাকে বল্লেন, "এরাই এখন খাবে-দাবে; আমরা শুধু চোখ সার্থক ক'রে দেখ্ব, কি বলো মা?"

তাড়াতাড়ি তাঁর ছেলের বৌ-এর পাতে আরও খান-কয়েক লুচি দিতে, সে ঘোমটার আড়াল থেকে আমার পানে তাকিয়ে মৃদু কটাক্ষ হান্লে।

শাশুড়ীর খাওয়া হয়ে গেছলো; তিনি উঠে পড়লেন। বধূটী আমার দিকে কেন যেন বারবার তাকাতে লাগ্লো। মনে হ'ল—স্পষ্টই ও কিছু বল্তে চায় আমাকে। কিন্তু সংসারের চিরন্তন রীতি অনুসারে ওর ঠোঁটের দুয়ার রুদ্ধ; বধূর এ সকল নির্লজ্জতা না কি গুরুজনের সম্মান হানি করে।

খাওয়ার পর আঁচিয়ে সে মুখ মুছছিলো। অজান্তে মাথার কাপড় পড়ে গেল। ভালো ক'রে চোখ মেলে দেখলুম ওর পানে। বয়স বেশী নয়, উনিশ কুড়ি। মুখ-শ্রী ভারী চমৎকার! যদিও রং সেই শ্যাম্লা—যাকে বলি আমরা ময়লা—ছেলের বিয়ে দিতে দিই দর চড়িয়ে—হয় তো বা মনে মনে অবজ্ঞাও করি—কিন্তু অন্তর তলের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত ওর ওই সৌন্দর্য্যে টলমলে আনন-মুকুরখানির সঙ্গে হয় তো ডালিম রঙেরও তুলনা চলে না।

আমার প্রতি ওর ঘন ঘন দৃষ্টির মধ্যে অবরুদ্ধ ওষ্ঠের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশের যে ব্যাকুলতা ছিল, মনে মনে তা' সুস্পষ্ট উপলব্ধি ক'রে এগিয়ে গেলুম তার কাছে। সে এক হাঙ্গাম—'আপনি' আর 'তুমি'র সমস্যা নিয়ে—কি বলবো ওকে? ওই যেখানটায় থাকে বয়সের অল্প ব্যবধান, 'আপনি' সম্বোধনটা সেখানে লাগে আমার

কাছে ঠিক চির রুগ্নের ওষুধ খাওয়ার মত। শুনেছিলুম ওর শাশুড়ীর কথার ফাঁকে, বিবাহ না কি হয়েছে তার এই ফাগুনে—সুতরাং 'তুমি' বলা চলে।

জিজ্ঞেস করলুম স্নিগ্ধকণ্ঠে, "তোমার নাম কি ভাই?

বউটী মৃদু হেসে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে, খুব আস্তে আস্তে বল্‌লে, "হাস্‌নুহানা। বড্ড বড় নামটা, না? মা কি না বড্ড ফুল—"

এমনি সময় সন্ধ্যা হতে ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে উঠলো। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাস্‌নুর শাশুড়ী বল্‌লেন, "চল বৌমা, এবার ওঠা যাক্।"

হাস্‌নু আমার মুখের দিকে তৃপ্তিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে, নিজের মুঠোর মধ্যে আমার একখানি হাত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে মিনতির স্বরে বল্‌লে, "আপনাকে আমার বড্ড ভাল লাগলো—যাবেন একদিন আমাদের বাড়ী।"

সম্ভব শাশুড়ী বধূর শেষ কথা কয়টী শুনতে পেয়েছিলেন। সায় দিয়ে তিনিও বল্‌লেন, "হ্যাঁ, যেও মা একদিন। এই তো এই কাছেই রেলের কোয়ার্টার—দু' মিনিটের পথ।"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম—যাব।

পরদিন বিকেল হতে-না-হতেই উপস্থিত হলুম গিয়ে ওদের বাড়ী। সদর দরজা খোলাই ছিল। সাম্‌নে কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে বাড়ীখানির ভেতর দু' দণ্ড তাকিয়ে রইলুম। হ্যাঁ, চেয়ে দেখবার মতই—এমন কোনও সংসারের সরঞ্জামাদি নেই, যা' ওখানে না পাওয়া যায়। ভাঙা বাল্‌তী, মগ, খয়া ঝাঁটা, চুপড়ি, লণ্ঠন, থলে, চট্, ছেঁড়া কাঁথা, তালি দেওয়া কাপড়, টুক্‌রো ন্যাকড়া ইত্যাদি থরে থরে সাজানো রয়েছে। বাড়ীখানি দোতালা। ওপর নীচে দু'খানি 'খুপ্‌রী'—সম্মুখে তার একটু ক'রে বারান্দা। সিঁড়ির পাশেই রান্নাঘর। নীচেকার বারান্দা থেকে একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর পর্য্যন্ত তিন হাত লম্বা, দু' হাত চওড়া উঠোন; তার মাথায় টিনের চাল বেঁধে খড় বোঝাই করা হয়েছে—তারই আওতায় দাঁড়িয়ে আছে এক গরু। পাশেই ওদিকে কলতলায় যেন বেসুরো বীণায় ঝঙ্কার তুলে ঝি একগোছা বাসন এনে রাখলো। আমার দিকে একবার তাকিয়ে আর সময় না নষ্ট ক'রে বাসনের ওপর হাত দু'টী 'মেলে'র মত চালাতে লাগলো।

এমনি সময় হাস্‌নুহানা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে—হাত ওর কয়লামাখা। "ও, আপনি এসেছেন!" আনন্দের অজস্রতায় উছলে উঠে আমাকে হাত ধরে বাড়ীর মধ্যে এনে বারান্দার একটা কাঠের পিঁড়িতে বসতে দিয়ে কয়লামাখা হাতখানি ধুয়ে এসে সিঁড়ির নীচে রাখা ভাঁড়ার থেকে ময়দা নিয়ে আমার পাশে মাখতে বসলো। তখন ধোঁওয়ার কুণ্ডলীতে সমস্ত স্থানটা ভরে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি একাই সব করছ—তোমার বড় ননদটী, ছোটটী, শাশুড়ী এঁরা সব কোথায়?"

"ননদেরা বায়স্কোপে গেছে, কি একটা নতুন ছবি এসেছে দেখতে, শাশুড়ী ও পাড়ায় বেড়াতে গেছেন।"

ঝি এসে বল্‌লে, "ওপরের ঘরখানা মুছে দেবো ত বৌমা, মেঝেয় তো শোওয়া হবে—"

"সে হবে 'খন রূপীর মা, তুই আগে গরু খুঁজে আন্‌গে যা'—বাবা ডিউটী থেকে ফিরে ভীষণ রাগ করবেন।"

ঝি চলে যেতে বল্‌লুম, "ওপরের ঘরে কে কে শোও ভাই, কার দরকার ঠাণ্ডা মেঝের?"

হাস্‌নু একটু হেসে বল্‌লে, "সকলকারই ভাই—যে গরম ঘরে! একধারে—মা, আমি, দুই ননদ আর বুলু শুই—ওধারের বিছানায় বাবা শোন্।"

ও শাশুড়ীর কাছে শোয় শুনে ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলুম, ও তখন বলেই চলেছে, "নীচেকার ঘরে দেওর দু'টী থাকে; উনি বাড়ী এলে ওরা বন্ধুর বাড়ী শুতে যায়।"

মনের অনেকটা ধোঁওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। একটু হেসে ওর চোখের দিকে দৃষ্টি রেখে বল্‌লুম, "আর তুমি বুঝি তখন নীচে আস?"

ভারী মিষ্টি এক মুখের ভঙ্গী করলে সে। ওরই নাম না কি লজ্জা—মানায় প্রত্যেককেই চমৎকার!

বুঝলুম, হাস্নুর স্বামী বিদেশে চাকরী করেন। সংসারের আরও দু'-চারটী ওকে প্রশ্ন করলুম, কিন্তু কেন যেন ও আমার সে সব প্রশ্নের অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে জবাব দিতে লাগলো—অথচ কি যেন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আকুল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সম্ভব সে কিছু বল্‌তে চাইছে আমার কাছে। অনেকক্ষণ ভাবলুম, ও আমার কাছে কি পেতে পারে? মিনিট দশেক পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলুম, "হ্যাঁ ভাই হাস্নু, এখানে থাক্‌তে তোমার ভাল লাগে?"

মনে হ'ল কথাগুলো কি আশ্চর্য্য অনুমানে ভর ক'রে, কি শুভক্ষণেই না বলেছিলুম! মুহূর্তের মধ্যে ওর চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব গেল বদলে—চপল হয়ে উঠলো ঠোঁটের প্রান্ত কথার উচ্ছ্বাসে, "না ভাই, আমার এখানে মোটেই থাক্‌তে ভাল লাগে না—সেখানকার কোয়ার্টার কেমন চমৎকার! প্রাইভেট চাকরী কি না। আমরা ভাই পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে।"

"তা' ওখানে যাওনা কেন?"

"তা' কি হয়। শাশুড়ী বলেন, ছেলেমানুষ বৌ একা কি থাক্‌তে পারবে।"

যত সব অস্বাভাবিক আপত্তি! ভীষণ রাগ ধরলো। বল্লুম, "বর কি বলে?"

"তিনি?"

সলজ্জ মুখখানি নত করে হাস্নু বল্লে, "লেখেন, কত কি দুঃখ করেন"—বলে সে আবার সেই মিনতিমাখা আকুল দৃষ্টি আমার মুখে ন্যস্ত করলে।

আর কি বলি—শুনেছি নব-বিবাহিতা মেয়েরা না কি প্রিয়তমের প্রেমপত্রগুলি ভালবাসে খুব প্রকাশ করতে। বললুম, "বরের চিঠি পাও ভাই?

"তা' পাই বৈকি।" বেশ সপ্রতিভভাবে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে বললে সে, "রোজই তো একখানি করে লেখেন।"

সত্যি না কি! আমাকে দেখাবে না?

"হ্যাঁ, দেখাবো।"

ওঃ, সে কি মুক্ত উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর তার! যেন অজস্র জোয়ারে পরিপূর্ণ।

তবে ভাই, এখানে পারবো না, কাল দুপুরে আপনার ওখানে নিয়ে যাব।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম ওর এই গুমরে মরা আকুল রহস্য। আর মিনিট তিনেক পরে শাশুড়ী ফিরে এলেন। হাস্নু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে রান্নাঘরে বিলিয়ে দিল। শাশুড়ী বললেন, "নাও বৌমা, ধর তোমার ছেলেকে।"

তোমার ছেলে, অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। "কখনই এ হাস্নুর পেটের ছেলে নয়—তবে ওর সতীন ছিল না কি? হ্যাঁ, তাইতো কেয়া দি'র কথার আভাসে সেই রকমই ফুটেছিল। কঠিন প্রশ্ন জাগলো মনে—তা' হলে হাস্নুর আরাধ্য দেবতাটী সন্তানের জনক—তবে সে কি সত্যিকারের মন দিতে পেরেছে হাস্নুকে? কৃষ্ণা তিথির চাঁদ কি পারে নদীর বুকে জোয়ার আন্‌তে? শিশু বালকটীর পানে আর একবার তাকিয়ে দেখলুম, কোথায় যেন এ মুখ দেখেছি। মনে পড়লো না। হাস্নুর শাশুড়ীকে কালকে ওকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে যখন বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন ঘন ঘন মনে হতে লাগল, হয়ত বা আমার সংস্পর্শে কারো অন্তর তৃপ্তি-সুখে পূর্ণ হয় নি কখনও, হাস্নুকে কি পেরেছি খুশী করতে?

হ্যাঁ, কয়েকদিন হ'ল আমার নূতন বান্ধবীর হৃদয়-দেবতার লেখা তাঁর বিরহী চিত্তের মিলন প্রতীক্ষিত উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এক ডজন প্রণয়-লিপি পড়েছি। তা' বেশ—নিতান্ত অরসিকও অজান্তে বলে উঠবে, "মন্দ আর কি! যেন বিচিত্র এক অনুভূতিতে মনটা কাঁপিয়ে তোলে।"

সত্য কথা, বিচিত্র অনুভূতি। ওই বিচিত্র অনুভূতিতে নারীর অন্তর যদি না পূর্ণ রইলো, তবে সংসারে থাকবে সে কি নিয়ে? হোক্ না কেন তার স্বামীর অন্তর নিঃস্ব, ফাঁকা, শুধু শূন্যতায় পূর্ণ, ওই নিয়েই যে হাস্নুকে সংসারে বাঁচতে হবে। যা' হোক্, পুরুষের ধৈর্য্যের সীমা! মনে যে তুমুল যুদ্ধ-তর্কের সংগ্রাম চলছিল, সে ভাবটাকে প্রকাশ না করে হাস্নুর

হাস্নুহানার মতই ফুল্ল গন্ধময় মনকে হালকা রসিকতায়, আমোদে ভরিয়ে তুল্লুম। সে এক-একখানি চিঠি পরম যত্নে ভাঁজ করে বুকের মধ্যে রাখ্তে রাখ্তে, সলজ্জ মুখখানি নত করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

দিন তিনেক পর একদিন বিকেল বেলা স্বামীর এক-খানি চিঠি পেয়েছি। পড়ছিলুম। কেয়া দি' ওইখানে বসে কোলের মেয়েটিকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। স্বামীর মন কয়েকদিন হতে ভীষণ তিক্ত হয়ে আছে ওপরওয়ালাদের মধুর বাক্য বর্ষণে। আমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে জানিয়ে কয়েক লাইন পর লিখেছেন, "আচ্ছা যুথি, একই রক্তে-মাংসে গড়া, সেই একই বিধির তৈরী তো সব মানুষেরই সৃষ্টি—তবে মানুষ কেন মানুষের ওপর চোখ রাঙিয়ে পূর্ণ অধিকারের দাবী করে বল্তে পার? মানুষের মনুষ্যত্বের চেয়ে কি শ্রেষ্ঠ হ'ল তার অর্থ সম্পদটাই? সেইটেই অকুণ্ঠিত মনে মেনে নিতে হবে? না, সে হয় না—কেন মানবো? শুধু কি ওই তুচ্ছ অর্থের লিপ্সায়? আচ্ছা যুথি, কবিদের কল্পনাকে কি কোনও মতেই বাস্তবে পরিণত করা যায় না? যদি যেতো, বেশ হ'ত, না? 'ওমরে'র মতটা আমার বেশ লাগে কিন্তু; তোমার কেমন লাগে বলো ত? ওই যে ওইখানটা ভারী মিষ্টি লাগলো আমার—

"এইখানে এই তরুতলে, তোমায় আমায় কুতূহলে
এ জীবনের যে ক'টা দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র, অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।
থাকবে তুমি আমার পাশে, গাইবে সখী প্রেমোচ্ছ্বাসে
মরুর মাঝে স্বপ্ন স্বরগ করবো বিরচন
গহন কানন হবে লো সই নন্দনেরই বন!

"রাগ করো না যুথি, অনেকখানি ঘা খেয়ে তবে লিখেছি।"

আর পড়া হ'ল না, এমনি সময় হাসনুর ছোট ননদ শুভা এসে বল্লো আমাকে, "যুথিকা দি', মা আমার গঙ্গার ওপারে মানত দিতে গেছেন, বড় দাদা দিদিকে নিয়ে কোল্কাতায় শঙ্কর 'ডান্স' দেখাতে গেছেন, বৌদি' আপনাকে একবার ডাকছেন, তাঁর অনেক কাজ কি না—"

"ও তোমার বড় দাদা এসেছেন বুঝি? মুহূর্ত্তের মধ্যে হাসনুর সুখমত্ত মনের চঞ্চল আমোদে পূর্ণ মুখখানি চোখের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে ভেসে উঠলো। 'সুটকেস্' খুলে চিঠিখানি ডায়েরীর পকেটে ঢুকিয়ে রেখে, জুতো জোড়াটা পায়ে দিয়ে দিদিকে বল্লুম, "ঘুরে আসি একবার, কি বলো দিদি?"

শুভা তখন লাফাতে লাফাতে বাইরে চলে গেছলো। দিদি ওর গমন-ভঙ্গীর পানে তাকিয়ে অদ্ভুত ধরণের মুখ বিকৃত করে খুব মিহি-সুরে বল্লেন, "যত সব ঢলুনে আদিখ্যেতা! এখুনি চল্লেন ষ্টেজে নাম্তে।"

শুনেছিলুম, শুভা না কি চমৎকার অভিনয়, আবৃত্তি, গান ইত্যাদি কর্তে পারে। এই ত সেদিন কোন্ ক্লাবে সুনির্ম্মল বসুর 'সামিয়ানা' আবৃত্তি করে একটা কাপ্, গোটা চারেক মেডেল পেলো। উৎসুক হয়ে জিগ্গেস করলুম দিদিকে, "সত্যি না কি! আজকে কোথায় এবং কি 'প্লে' করবে?"

আমার আগ্রহ দেখে ভীষণ চটে উঠলেন দিদি, "কোথায় আবার, এই তো পরের ইষ্টিসনেই 'মানময়ী' না কি যে পার্ট নিয়েছে।"

দিদির বিকৃত মুখখানির পানে তাকিয়ে ভীষণ হাসি এল। দিদি কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলে বল্লেন, 'তুমি বোঝ না যুথি ওসব। আমাদের বাঙালীর সংসারে মেয়েদের অত উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতায় প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই ভাল নয়।"

বল্তে চাইলুম, "এর মধ্যে তুমি খারাপ কোথায় পেলে দিদি। এও ত একটা শিল্প। শুভার শিল্পের মধ্যে যদি একটা ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত থাকে, তাকে কি বিকাশ হতে দেওয়া উচিত নয়? মনের উচ্ছৃঙ্খলতা সেটা অসংযমী চিত্তের আর একটা রূপ; যার নিজের মনের সংযম নেই, সংসারের রুদ্ধ কবাটও তাকে আয়ত্তে আনতে পারে না।"

কিন্তু কথার উত্তর দিলুম না। দিদির মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ইচ্ছা হ'ল না। বেরিয়ে পড়লুম হাস্নুর উদ্দেশে।

হাস্নু আমারি প্রতীক্ষায় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। দেখ্লুম তাকিয়ে, তার রূপ যেন আজ শরৎ-শ্রীর মত অপরূপ লাবণ্যে ঝল্মল করছে। সাজের বিশেষ কিছুই ঘটা ছিল না। পরণে একখানি লালটুকটুকে কাবেরী সাড়ী, চুলটা আঁচড়ান পরিষ্কার করে, কপালে একটা ছোট সিঁদূরের ফোঁটা। এইতেই ভারী চমৎকার মানিয়েছে ওকে! "ও একদিনের আনন্দেই যে তোর দেহ-শ্রী টল্মল্ করছে। তারপর খবর কি সব বলবি ত?" ওর দিকে তাকালুম কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে।

"সব বলব ঘরে চলো ভাই"—বলে সে আমায় টান্তে টান্তে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে অনর্গল স্রোতে দাম্পত্য-প্রণয়ের খুঁটিনাটী গল্প করতে লাগল। আজ ওর অফুরন্ত সময়। দীর্ঘদিন পরে ছেলে বাড়ী ফিরেছে, মা নিজেই রাঁধবেন। ঔৎসুক্য

না চাপতে পেরে কথার ফাঁকে জিগ্‌গেস করলুম, "এবার তোমার জন্যে কি আন্‌লেন ভাই?"

"আমার জন্যে?" খুসী হয়ে হাস্নু চৌকীর নীচ থেকে একটা কাঠের বাক্স বের ক'রে দেখালো আমায়—একটা রূপোর মিনে করা ঝুম্‌কো, রোল্‌ড গোল্‌ডের সেফ্‌টি পিন্‌, পাউডার, স্নো, গন্ধ তেল এই সব। বল্‌লুম, "তা' হ'লে সত্যিই বরটী তোমায় খুবই ভালবাসেন—তাই নয়?"

"তা' বাসেন বৈকি?"

ওকে তৃপ্তি দিতে মুখে যাই বলি না কেন, মনের মধ্যে কিন্তু তুমুল দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল—তা' হলে, আসল কোন্‌টা? ভোরের রঙিন আকাশের চেয়ে কি বেলা শেষের দিগন্তের বিচিত্র শোভাটাই মধুর? কয়েকদিনের মত আজও চিন্তা করলুম একটু। না—এ সমস্যার সমাধান বড়ই জটিল। যাক্‌ গে, আর তো আছি মাত্র দুটো দিন; ফুরিয়ে এসেছে রিটার্ণ টিকিটের মেয়াদ। তার চেয়ে আমার এ প্রবাসের দু'দিনের বান্ধবী সরলমনা হাস্নুর সাথে প্রাণ ভরে দুটো গল্প করে নি। চিন্তা থেকে জাগিয়ে তুলে হাস্নু বল্‌লে, ফিরে গিয়ে আমায় ভুলে যাবে না যুথিকা দি', চিঠি লিখবে তো?"

হেসে বল্‌লুম, "মিষ্টি লাগ্‌বে বরের চিঠির মত?"

তারপর এমনি ধরণের তরল হাস্য-পরিহাসে পূর্ণ হ'ল আমাদের বাকী দিন দুটো। যাত্রার সময়ও ঘনিয়ে এল। সেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে ফিরবো—গিয়েছি তার সঙ্গে দেখা করতে। নিস্তব্ধ দুপুরবেলা নীচে জনপ্রাণীর চিহ্ন না পেয়ে সোজা গেলুম ওপরে উঠে।

দেখলুম শ্বাশুড়ী, ননদ, বধূ সকলেই মেজেয় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। হাস্নুকে ডাকবো কি ভাবছি, এমনি সময় দৃষ্টি গিয়ে পড়লো, টাঙানো একখানি ফটোর ওপর। ছবিখানি যুগলমূর্ত্তি; পাশাপাশি দম্পতী বসে আছে হাসিমুখে। স্ত্রীর একখানি হাত স্বামীর মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ। আর একবার ফটোখানির পানে ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম—হ্যাঁ, এই ত সেই পুষ্পল মৈত্র না—আমার ফার্ষ্ট ইয়ারের সহপাঠী—সেই ত বটে! তবে ওই কি হয়েছে হাস্নুর স্বামী? পাশে তা' হলে ওই মেয়েটি কে? হাস্নুর সতীন না কি? সম্ভব সেই হবে। মায়ের সম্পত্তি ওই চোখ দুটাই পেয়েছে তার সন্তান। স্মৃতি-পটে বিস্মৃত, কত পুরোনো অস্পষ্ট দু'-একটা রেখা ফুটে উঠ্‌লো। সেই সেদিন, বছর চারেক আগে একদিন, আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে বোটানিকেলে বেড়াতে গিছলুম। বান্ধবীরা ছিল 'বোটানি'র ছাত্রী। ডুবে গেল তারা নিজের কাজে। আমি কাজ না পেয়ে চুপ করে বেনিয়ন গাছের তলায় এক বেঞ্চে বসে রইলুম। "আশা করি কিছু মনে করবেন না, দুটো কথা বলবো আপনাকে।" ভীষণ চম্‌কে উঠে, পিছন ফিরে দেখলুম, পিছনে দাঁড়িয়ে আমার সহপাঠী পুষ্পল মৈত্র। আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "আপনি এখানে যে, তা' কি বলবেন, বলুন।" "মীরার কাছে শুনলুম, আপনি এখানে এসেছেন—" "তা কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলুন?" বান্ধবীদের ঠাট্টার আশঙ্কায় ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলুম। বললে সে, "এমনি করেই কি যুথি তুমি আমাদের ভালবাসার অসম্মান করবে—তর সইল না তোমার—ভেবেছিলুম পাশ করে তোমাকে ভিক্ষে চেয়ে নেব—" "দেখুন, আমি ও সমস্ত কিছু জানি নে—বাবা যে কি করছেন, তিনিই জানেন—মন্দ যে করবেন না এইটেই মানি।" এমনি সময় দূরে বান্ধবীদের কলহাস্য শুনে সে বল্‌তে বল্‌তে চলে গেল, "দেখি আর একবার চেষ্টা করে।" আজও মনে পড়ে তার সেই ব্যথা টল্‌মলে ম্লান মুখখানি!

জানি না আরও কতক্ষণ এ সমস্ত ভাবতুম, হাস্নু জেগে উঠে আমায় ফটোখানির পানে তাকিয়ে থাকতে দেখে বল্‌লে—বুঝলে যুথিকা দি,' ওই আমার সতীনের ছবি—বেশ সুন্দর দেখতে ছিলেন, না? নীচেকার ঘরে বড্ড ড্যাম্প কি না, তাই উনি ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

শ্বাশুড়ি ঘুমচ্ছিলেন, হাস্নু নীচু গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে অসম্ভব রকমে সতীনের প্রশংসার মুখর হয়ে উঠলো। আমি কিন্তু আজ এই আসন্ন বিদায় মুহূর্ত্তে ওর সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা বলতে পারলুম না। ওর হাসিমাখা প্রফুল্ল মুখখানি আমার চোখের সুমুখে কেবল ব্যথা-সজল হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। হায়, একদিন কি ওর এই কোমল মনটা লুটিয়ে পড়বে না চূর্ণ হয়ে! ওঃ, কি অসীম বিশ্বাস, গভীর ভালবাসা স্বামীর 'পরে নির্ভর করেছে সে। সংসারের সব ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করা যায়, কিন্তু যাকে ভালবাসা যায় প্রাণের মত, তার দেওয়া আঘাতটা বড় কঠিন হয়ে বুকে বাজে। একান্ত আপনার জনের আবরণে ঢাকা অন্তরখানি নিয়ে সংসারে বাস করাটা বোধ হয় সব চেয়ে কঠিন শাস্তি—জীবনটা তার সত্যই অভিশপ্ত!

সন্ধ্যার পর কৃষ্ণা-অষ্টমীর দুর্ভেদ্য জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেণখানা পশ্চিম প্রান্তে ছুটতে লাগল; তার সঙ্গে আমার সাম্‌নে বায়স্কোপের 'রিলে'র মত তিনখানি 'ফিল্ম' যেন নৃত্য সুরু করে দিল। তা' হলে আসল কোন্‌টা?

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

দক্ষিণ ভ্রমণ

পুরীধাম

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

বেলা আটটা হইতেই সমবেত জনতা পুরীর রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইল। এরূপ বিপুল লোক সমাগম একত্র কখন দেখি নাই। তিন ক্রোশব্যাপী ভীষণ জনতা-স্রোত চলিয়াছে। বেলা একটার সময় সেই ভীষণ জনতা-স্রোত ভেদ করিয়া ৺বলরামদেবের ও সুভদ্রা দেবীর দুই-খানি নানাবর্ণের ধ্বজা-পতাকাঙ্কিত সুসজ্জিত রথ পথে বাহির হইল। তাহার পশ্চাতে জগন্নাথদেবের সুন্দর সুদৃশ্য গরুড়ধ্বজ রথখানি ধীরে ধীরে চলিল। অমনি কোটী কোটী কণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি হইল। সাধু সন্ন্যাসিগণ রথের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। বৈষ্ণব সাধুগণ সংকীর্ত্তনের রোল তুলিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে রথের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কুড়ি-পঁচিশ হাজার রামায়ৎ সাধুগণ ভজন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। মঙ্গলবাদ্য শঙ্খধ্বনিতে দিক মুখরিত হইয়া উঠিল,আমরা নয়ন ভরিয়া প্রভুর অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই দিব্য দেব-রথ তিনখানি সিংহদ্বার হইতে প্রশস্ত রাজপথ দিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে একক্রোশ দূরে গুণ্ডিচা বাড়ী চলিয়া গেল। এই স্থানে পুরুষোত্তমদেব অষ্টাহ বাস করিয়া থাকেন, ঐ কয়েকদিন শ্রীমন্দির শূন্য থাকে। ভোগ-রাগ-আরতি সমস্তই গুণ্ডিচা বাড়ীতেই হইয়া থাকে। এই সময় প্রভুর মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী একাকিনী থাকেন, পঞ্চমীর দিন এখানে হোড়া পঞ্চমী ও লক্ষ্মীবিজয় উৎসব হইয়া থাকে। অর্থাৎ জগন্নাথ প্রভু, সুভদ্রা ও বলদেবের প্রতি লক্ষ্মীদেবী কুপিতা হইয়া একটু অভিমান করিয়া থাকেন। বাদ্য শঙ্খ তুরী ভেরী ধ্বজাপতাকা লইয়া লক্ষ্মীদেবীর পারিষদগণ তাঁহাকে স্বর্ণ চতুর্দ্দোলে বসাইয়া গুণ্ডিচা বাড়ীতে লইয়া গিয়া জগন্নাথ দেবের সহিত মিলন করিয়া দেন। রথযাত্রাটি পুরীর প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য। সিংহদ্বার হইতে তিনখানি বিচিত্র রেশমীবস্ত্র-আচ্ছাদিত রথ বড় দাণ্ডা নামক বৃহৎ রাস্তা দিয়া মোটা মোটা রশির দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। জগন্নাথ প্রভুর রথ বাইশ হাত, বলভদ্রদেবের রথ বাইশ হাত ও সুভদ্রাদেবীর রথ একুশ হাত উচ্চ। জগন্নাথদেবের রথখানির চাকা সোণার। এই রথ তিনখানি পনের শত কি ষোল শত লোক টানিয়া থাকে এবং রথ গুণ্ডিচা বাড়ীতেই অষ্টাহকাল থাকে। সেই স্থানে ভোগ-রাগ হইয়া থাকে। পুনর্যাত্রার সময় প্রভু আবার শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। ঐ সময় জগন্নাথ প্রভুর পাকশালাটির সংস্কার হইয়া থাকে। চুলাগুলি ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া গড়া হইয়া থাকে। জগন্নাথ প্রভুর চারিটি পর্ব্ব প্রধান। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় চন্দন-যাত্রা আরম্ভ হয়। দু'-একদিন মদনমোহনকে পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া নরেন্দ্র সরোবরে বজরায় তুলিয়া জলবিহার হইয়া থাকে। তাহার পর জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমার দিন জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হয়। এই সময় জগন্নাথ প্রভুকে মণিকোঠা হইতে স্নান মন্দিরে আনা হয় এবং সমস্ত তীর্থ-বারি দ্বারা তাঁহার বিপুল সমারোহে স্নানযাত্রা হইয়া থাকে। স্নানযাত্রার পর প্রভুর নবযৌবন হইয়া থাকে। গুণ্ডিচা বাড়ীর নিকটেই বিন্দুতীর্থ বা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর আছে।

তৎপরে আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা হয়, এবং ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রভুর দোলযাত্রা হইয়া থাকে। তাহার পর অন্য অন্য ছোট কত উৎসব হইয়া থাকে। আমরা

রথযাত্রার পরেই সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে চলিলাম। পুরী হইতে সাক্ষীগোপাল কয়েক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। এই ষ্টেসনের নামটিও সাক্ষীগোপাল। সাক্ষীগোপাল সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে যে, বৃন্দাবনে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যাকে একটী ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গোপালদেবকে সাক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাহার পর অন্য পাত্রে কন্যার বিবাহ স্থির করিলে সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গোপালকে বলিলেন, প্রভু! এই কন্যা আমার পুত্রের বাগ্‌দত্তা পত্নী, তুমি ইহার সাক্ষী আছ। এক্ষণে আমার সহিত চল। ব্রাহ্মণের একান্ত ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া গোপাল বলিলেন, ব্রাহ্মণ! তুমি অগ্রে অগ্রে চল, পশ্চাতে আমার নুপূরধ্বনি শুনিতে পাইবে। ব্রাহ্মণ গোপালের ভাবে বিভোর হইয়া বৃন্দাবন হইতে সাক্ষীগোপালকে লইয়া আসিলেন। কিন্তু সহসা নুপূরধ্বনি নাই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ যেমন পশ্চাৎ ফিরিলেন, অমনি গোপাল অন্তর্হিত হইয়া বলিলেন, এই স্থানেই আমি সাক্ষীগোপালরূপে রহিলাম। তুমি পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন কর। সেই পর্য্যন্ত এই বিগ্রহটি সাক্ষীগোপাল বলিয়াই বিখ্যাত। ষ্টেসনের অনতিদূরেই সাক্ষীগোপালের মন্দির; মন্দিরটি অতি সুন্দর। মন্দিরাধিষ্ঠিত সাক্ষীগোপালের ভুবনমোহন মূর্ত্তিটি অতি কমনীয়। এমন রূপ, এরূপ চক্ষুর মধুরভঙ্গী কোন বিগ্রহের দেখি নাই। এখানে কিশোর শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। সর্ব্ব আভরণে শ্রীমূর্ত্তি ভূষিতা। মন্দিরাঙ্গনে সুন্দর নধর তমালবৃক্ষ আছে। এই স্থানে সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তমাল ছায়াতলে আসিয়া বসিলাম। এখানে সাক্ষীগোপালদেবের মিষ্টান্ন, পক্কান্ন ও মালপোয়া ভোগ হইয়া থাকে। যাত্রীরা ভোগের মূল্য দিলে পাণ্ডারা মালপোয়া ভোগ প্রসাদ দিয়া থাকেন। আমরা সমস্ত দিন সাক্ষীগোপালে থাকিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে পুরীর বাসায় ফিরিলাম। পুরীতে পঞ্চতীর্থ করিতে হয় এবং এই পঞ্চতীর্থে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিতে হয়। একদিন আমি স্বামীদেবতার সহিত মহাপ্রসাদ লইয়া পঞ্চতীর্থে গিয়াছিলাম। প্রথম মার্কণ্ড সরোবরে স্নান করিয়া ঐ মহাপ্রসাদ দ্বারাই পিতৃপিণ্ডদান করিতে হয়। তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে পিণ্ডদান, পরে সমুদ্রতটে পিণ্ডদান করিয়া চক্রতীর্থ ও শ্বেতগঙ্গায় দিতে হয়।

পুরীতে গোপীনাথের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ, চতুর্দ্দিকে সুনীল সাগর ও বালুকাময় সাগর সৈকতে গোপীনাথের মন্দির। প্রবাদ আছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একদিন গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন, তৎপরে আর মন্দির হইতে নির্গত হয়েন নাই। গোপীনাথের অঙ্গেই তিনি লীন হইলেন, এই স্থান হইতেই তিনি চির অন্তর্হিত হইয়াছেন। এজন্য এটী প্রসিদ্ধ মঠ। শ্রীমন্দির যাইবার পথে রাধাকান্ত মঠ আছে; ইহাতে বিগ্রহ আছেন। এই মন্দির মধ্যে মহাপ্রভুর সাধনা স্থান গম্ভীরা। গম্ভীরার মন্দির সম্মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের করুণ ছবি আছে। আঠার বৎসর কাল এই নীলাচলে গম্ভীরার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব সাধন ভজন করিতেন। এই গম্ভীরা নিরন্তর তাঁহার হরিধ্বনিতে মুখরিত থাকিত। প্রতিদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই গম্ভীরার অঙ্গনে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত থাকিতেন। গম্ভীরার মধ্যে মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি আছে। তাঁহার দুইখানি কাষ্ঠ পাদুকা, একটী ভগ্ন কমণ্ডলু ও পাঁচশত বৎসরের সেই জীর্ণ গলিত কন্থা আজিও সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা বৃদ্ধ পূজারীকে বলিলে তিনি মহাপ্রভুর নিদর্শনগুলি দেখাইলেন। রাধাকান্ত মঠের নিকট সিদ্ধ বকুল মঠ—এটি দেখিবার জিনিষ—কত কাল, কত যুগ বহিয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ বকুল বৃক্ষটি একভাবেই হেলিয়া আছে। এই সিদ্ধ বকুল সম্বন্ধে একটি পাড়ার ছেলে একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি লইয়া আমাদের নিকট পাঠ করিল যে, শ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত হরিদাস এই স্থানটিতে বসিয়া প্রখর সূর্য্য কিরণে সমস্ত দিন দগ্ধীভূত হইয়া নিত্য তিন লক্ষ জপ করিতেন। একদা শ্রীগৌরাঙ্গদেব আসিয়া দেখিলেন ভক্ত হরিদাস প্রখর সূর্য্য কিরণে বসিয়া একাগ্রমনে জপ করিতেছেন। তিনি দন্তধাবন করিয়া বকুল কাষ্ঠটি ঐখানে ফেলিয়া দিলেন। পরদিন সকলে দেখিল ঐ স্থানে নধর বকুল বৃক্ষ হইয়াছে। সেই বকুল ছায়াতলে বসিয়া হরিদাস নিত্য জপ করিতে

লাগিলেন। এক সময়ে জগন্নাথদেবের রথচক্র গঠনের প্রয়োজনবশতঃ ঐ বকুল বৃক্ষের উপর রাজকর্মচারীদের দৃষ্টি পড়িল এবং রজনী প্রভাতেই বকুল বৃক্ষ ছেদনের পরামর্শ হইল। হরিদাস যখন শুনিলেন প্রভাতেই বকুল বৃক্ষটী কুঠারাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইবে, তখন ভক্ত মহাত্মা হরিদাস বকুল বৃক্ষকে বলিলেন, যদি তুমি সিদ্ধ-দেহ লাভ করিয়া থাক, এই রজনীতেই এই দেহ ত্যাগ কর। হরিদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ বৃক্ষটি নিশা মধ্যেই ভূমে পতিত হইল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল ঐ সুন্দর বকুল বৃক্ষটি এককালে সারশূন্য হইয়া হেলিয়া পড়িয়া আছে। প্রাতে আসিয়া বকুল বৃক্ষের অবস্থা দেখিয়া ইহা সারশূন্য, গঠনের অযোগ্য বলিয়া কেহ ইহাকে স্পর্শও করিল না। ভক্ত হরিদাস পরমানন্দে এই বকুলের ছায়াশীতল তলে বসিয়া নাম জপ ও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তদবধি এই বৃক্ষ সিদ্ধ বকুল বলিয়া বিখ্যাত হওয়ায় এই স্থানে একটি মঠ স্থাপিত হইল। পুরীধামে এইরূপ অসংখ্য মঠ আছে ও গৌরাঙ্গদেবের অনেক নিদর্শন আছে। আমি প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া সাগরকূলে আসিয়া দাঁড়াইতাম। উষার আলোকে যখন পূর্ব্বদিক সুরঞ্জিত হইয়া উঠিত, দেখিতাম সমুদ্রবক্ষ হইতে যেন একটি হৈম কলস বা স্বর্ণকুম্ভ ধীরে ধীরে গগনপথে উদিত হইতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! কি সুন্দর শোভা! দেখিতে দেখিতে ঐ হেম কলসটি স্বর্ণ থালের ন্যায় লোহিতবর্ণ পূর্ব্ব গগন রঞ্জিত করিয়া দিবাকর দেব দর্শন দিতেছেন। এই অপূর্ব্ব শোভাটি প্রতিদিন দর্শন করিয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিতাম।

কয়েক দিন পুরীতে থাকিয়া আমার ভুবনেশ্বর যাইবার ইচ্ছা হইল। ঐ সময় সা বাবুর মাতা ভুবনেশ্বর তীর্থে চলিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। পুরী হইতে রেলপথেই ভুবনেশ্বর চলিলাম। পুরী হইতে পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে চলিলেন। আমরা রাত্রে পাণ্ডার বাসায় উঠিয়া জলযোগাদি করিয়া শয়ন করিলাম। প্রাতে পাণ্ডাঠাকুর ভুবনেশ্বর দর্শন করাইতে চলিলেন। সেই পাণ্ডা আমাদের সংকল্প করাইয়া বিন্দুসরোবরে স্নান করাইলেন। পুরাণে লিখিত আছে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতির যাবতীয় তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগ্রহ করিয়া এই বিন্দুসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিন্দুসাগর মহাতীর্থ বলিয়া কথিত আছে। স্নানান্তে আমরা ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ দর্শনে মন্দির মধ্যে চলিলাম, মন্দিরটি অতি বিশাল প্রস্তর গঠিত। মন্দিরের উচ্চতা কত ফিট তাহা জানি না। কিন্তু মন্দিরটিতে স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির আকার ভঙ্গী চমৎকার। এরূপ স্থাপত্যশিল্পকলা সচরাচর দেখা যায় না। ভুবনেশ্বর মন্দিরকেই বড় দেউল বলিয়া থাকেন, এই মন্দিরের চূড়ায় স্বর্ণ কলস ও ধ্বজা শোভিত। এই লিঙ্গরাজ মন্দিরটি সর্ব্বপ্রধান মন্দির। মন্দিরের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা, মন্দিরের দক্ষিণে অনেকগুলি ভগ্ন মন্দির অট্টালিকার চিহ্ন আছে। সেই দ্বারের সম্মুখভাগে পূজার দ্রব্য ও ধূপ দীপ কর্পূরাদি বিক্রয় হইতেছে। মন্দিরের গাত্রে অষ্ট সখী, অষ্ট দিক্‌পাল ও কার্ত্তিক গণেশের মূর্ত্তি আছে এবং মকরবাহিনী ও যমুনাও আছেন। বড় দেউলের মধ্যে পার্ব্বতীদেবীর অতি সুন্দর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ভিতরে যেন অন্ধকার বোধ হইল। এক কোণে একটী ঘৃত দীপ জ্বলিতেছে। আমরা পাণ্ডার হস্তে পূজা-উপহারগুলি প্রদান করিলাম, পাণ্ডা আমাদের নাম গোত্র বলিয়া পূজা করিলেন। আমরা ভক্তিভাবে ভুবনেশ্বর দেবকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিলাম। মন্দিরটি যেমন বৃহৎ সেইরূপ অপূর্ব্ব কারুকার্য্য শোভিত। এই প্রাচীন মন্দির দর্শন করিলে মনে হয় এরূপ চমৎকার শিল্পনৈপুণ্য জগতে পূর্ব্বে কতই না ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

'ব্রহ্মবিদ্যা', পঞ্চদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল।
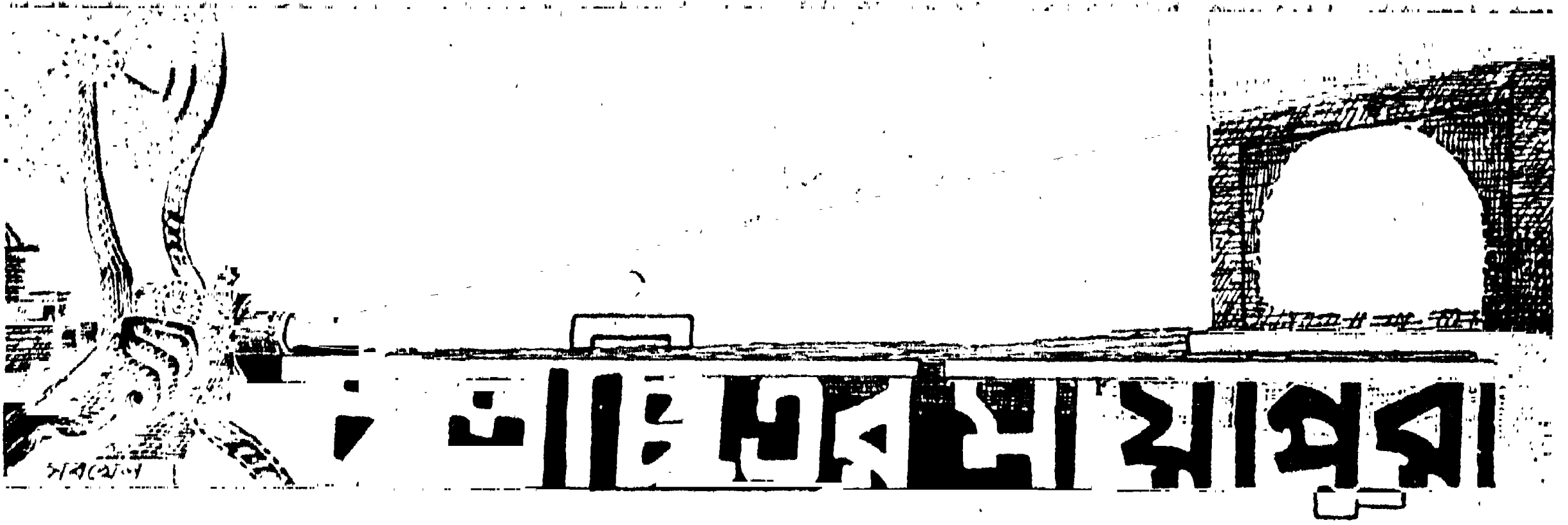
খেলার খেয়াল

শ্রীমতী কমলারাণী ঘোষ

ছবির পর্দ্দায় কোন প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দেখতে যেমন দর্শক উৎসুক হয়ে ওঠেন, তেমনি সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রিয় ব্যায়াম বা খেলার খেয়ালের কথা জানতে উৎসুক হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়—বরং স্বাভাবিক। আজ কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীর খেলার খেয়ালের কথা বলব।

"এ সাউণ্ড মাইণ্ড ইন্ এ সাউণ্ড বডি।" হলিউডের প্রায় প্রত্যেক ষ্টুডিওর ম্যানেজার এই ইংরাজী প্রবাদটার ওপর বেশী জোর দেন; অর্থাৎ, শরীর সুস্থ না থাকলে, মনের অবস্থা স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়। তাই ওখানকার প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে শরীর সুস্থ রাখবার জন্য যে কোন একটা ব্যায়াম করতে হয়। তা' যার যেমন খুসী। তবে মোটামুটী সাঁতার জানা, ঘোড়ায় চাপা, বন্দুক ছোড়া ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ প্রত্যেককেই শিখে রাখতে হয়। কেন না, কখন কোন্ ছবিতে উপরোক্ত কোন্ জিনিষটার দরকার হয়ে পড়বে, তার ত ঠিক নেই। তা' ছাড়া, ইংরিজী ছবিতে ও সব জিনিষের সমাবেশ একটা অতি সাধারণ ব্যাপার বলা যায়। সিনেমা-প্রিয়রা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে, তাঁদের প্রিয় অভিনেত্রী গ্রেটা গার্ব্বো মুষলধারে বারিপাতের মধ্যে একা বেড়াতে ভালবাসেন। সেই সময়ে কোন সঙ্গী—এমন কি, ছাতা পর্য্যন্ত সঙ্গে রাখতে তিনি নারাজ।

নরমা শিয়ারার দু'হাতে ভর দিয়ে একেবারে সিধে খাড়া হয়ে থাকতে পারেন। এই খেলাটাই তাঁর সব চেয়ে প্রিয়।

গ্রুচো মার্ক্স খুব লাফাতে ভালবাসেন।

রবার্ট মণ্টগোমারি বাড়ীর পুকুরের ওপর জাল টাঙিয়ে সাঁতার দিয়ে দিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলতে ভালবাসেন। এই খেলায় অবশ্য তাঁর সঙ্গী খুব কমই জোটে। কাউকে না পেলেও, তবু তিনি নিজে নিজেই খেলা করেন।

'মেট্রো সিনেমা'য় 'ব্রডওয়ে মেলডি অফ্ ১৯৩৬' ছবিখানি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ঈলেনর পাওয়েল বলে অভিনেত্রীটীর সুন্দর ব্যায়াম কৌশলের প্রশংসা না ক'রে পারবেন না। সত্যিই তাই, এই অভিনেত্রীটি জিমনাষ্টিক এত ভাল জানেন যে, যে কোন বিখ্যাত ব্যায়াম বীরকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে পারেন। একথা বলার উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি সত্যই কোন ব্যায়াম বীরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছেন বা করেছেন, তবে সত্যিই তিনি খুব ব্যায়ামকুশলী। এই প্রসঙ্গে হলিউডের আর দু'জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম করা যেতে পারে। তাঁরা হচ্ছেন বিখ্যাত চিত্র 'টপ হ্যাটে'র নায়ক-নায়িকা ফ্রেড য়্যাস্টেয়ার ও জিঞ্জার রজার্স। ব্যায়াম কৌশলে এঁরা দু'জনেও কম যান না।

জোয়ান ক্রফোর্ড, জীন হার্লো এবং নেলসন এডির প্রিয় খেলা হচ্ছে ব্যাডমিণ্টন। একটু অবসর পেলেই এবং একজন সঙ্গী জুটে গেলেই নিদেন দু'-চারবারও এঁদের বল পেটা চাই।

টেনিস্ খেলায় ক্লার্ক গেবল এবং অভিনেত্রী এলিজাবেথ এ্যালেন একসঙ্গে দাঁড়ালে হলিউডের বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়দেরও হার স্বীকার ক'রে যেতে হয়। অভিনেত্রী এ্যালেন আবার ভাল ক্রিকেটও খেলতে পারেন।

তাঁর এই প্রিয় খেলাটী খুবই প্রয়োজনে লেগেছিল। উক্ত ছবিখানির একটী দৃশ্যে ষ্টুডিওর চোদ্দ ফুট হ্রদে নায়িকা মরিন ও' স্যালিভ্যানের ডুবে যাওয়া জিনিষের উদ্ধারকর্ত্তা হিসেবে উনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

টেড্ হিলি বলেন, তাঁর সব চেয়ে প্রিয় খেলা হচ্ছে রৌদ্রে ঘুমান।

এড্না মে অলিভার বলেন, সাইকেল ছাড়া তাঁর এক দণ্ড চলে না।

'য়্যানা ক্যারানিনা' পুস্তকের শিশু অভিনেতা ফ্রেডি

য়্যানা ক্যারেনিনা চিত্রে গ্রেটা গার্ব্বো ও ফ্রেডি বার্থলোমিউ

ওয়ালেস্ বেরী মাছ ধরতে পেলে আর কিছু চান না। একটু ফাঁক পেলেই ছিপ নিয়ে তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করা চাই।

ব্রিয়ান আর্ণ এরোপ্লেনে উড়ে বেড়াতে ভালবাসেন।

পল লুকাস তাঁর দেশীয় (হাঙ্গেরী) খেলা ভারোত্তলন (ওয়েট্ লিফটিং) সব চেয়ে পছন্দ করেন।

জনি উইস্মুলার ডুব সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসেন। 'টারজন এস্কেপ্স' ছবিখানি তোলার সময়

বার্থলোমিউ বলে যে তার একখানা বড় ফল কাটা ছুরি, বাইসাইকেল এবং বক্সিং দস্তানা থাকলেও, সে ভবিষ্যতে একজন ফুটবল খেলোয়াড় হবে।

এ ছাড়া, ঘোড়া পোষার এবং রেস্ খেলার সখ ক্লার্ক গেবল্, স্পেন্সার ট্রেসি, মে ওয়েষ্ট, বি ক্রস্বি, এবং পরিচালক ওয়ালটার জে রুবেনের পুরোদস্তর আছে।

শ্রীমতী কমলারাণী ঘোষ

ছায়া ও কায়ালোক

সঞ্জয়

থিয়েটার-মহলে কে সব চেয়ে বড় অভিনেতা, এই নিয়ে অনেক বাক্-বিতণ্ডা হয়ে গেছে। কতক লোক আছেন, যাঁরা শিশিরবাবুর নামে অজ্ঞান হয়ে যান, আবার অহীন্দ্রের তরফেও ও রকম প্রশংসাবাদী কম নেই। কিন্তু গোড়াতেই আমরা একটা ভুল করে বসি। সেটা হচ্ছে: দু'জনের অভিনয়ের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। শিশির-বাবুর অভিনয় হচ্ছে কাটা কাটা ছোট 'ডেলিভারী'র মধ্য

জন্ বোল্‌স্

দিয়ে দর্শকের মনে মায়াজালের সৃষ্টি করা, আর ঠিক সেই জায়গায় অহীন্দ্রের হচ্ছে গুরুগম্ভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে দর্শকের মনে একটা গভীর রেখাপাত করা। কাজেই ঠিক এক তুলাদণ্ডে ফেলে এই দু'জনের অভিনয় সাফল্যের কথা তুলনা করা চলে না। তবে একথা হাজার বার স্বীকার করতে হবে, দু'জনেই বেশ বড়দরের অভিনেতা—যদিও দুজনার 'টাইপ পার্ট' সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এবং একথাও স্বীকার করতে হবে, এই রঙ্গমঞ্চকে আমাদের সমাজের মধ্যে টেনে আনতে এই দু'জনেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্রণী। কেন না, এমন একদিন ছিল, যখন বাঙলার নাট্যশালা ছিল সমাজের সম্পূর্ণ বাইরে—যখন থিয়েটারের নামে লোকে ভুরু কুঁচকে বলত—গাঁজার আড্ডা। রঙ্গমঞ্চের ঐ প্রকৃষ্ট অপবাদ দূর করার পথে বোধ করি শিশিরবাবুই সকলের প্রণম্য। শিশিরকুমার তাঁর নব নব অবদানের মধ্য দিয়ে জগতকে জানিয়ে দিয়েছেন, নাট্যশালা গাঁজার আড্ডা নয় —ওটাও একটা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাস্থল। অনেকে হয় ত এই কথায় ত্রুটী ধরে বলবেন: গিরীশবাবু কি ওকথা প্রকাশ করেন নি? আমরা নতশিরে একথা স্বীকার কবি সাধক কবি গিরীশচন্দ্র হলেন নাট্যশালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা, নট-গুরু এবং নব নব রচনার মধ্য দিয়ে নাট্যশালাকে তিনি অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন, কিন্তু নাট্যশালার পূর্ব্বোক্ত অপবাদ শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগে পর্য্যন্ত কেউই দূর করতে পারেন নি। শিশিরকুমারের নটজীবন খুব বেশী দিনের নয়, কিন্তু এই অল্প দিনেই যেন তিনি সমস্ত নাট্যজগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন—এমনই তাঁর নট-প্রতিভা!

অহীন্দ্রনাথেরও নট-প্রতিভা কম নয়, একথা আমরা আগে একবার বলেছি। তিনিও আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু আমরা, অর্থাৎ চিরপিপাসু দর্শকদলের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন কিছুতেই মেটে না। তাঁরা যতই পান, তার চেয়ে বেশী পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠেন। এইই বুঝি অবিনশ্বর ধারা। তাই এক এক সময় মনে হয়, হয় ত অহীন্দ্রনাথ এবং শিশিরকুমারের নাট্য-জগতকে দেবার আরো অনেক কিছু ছিল। হয় ত

তাঁরা সময়ের কার্পণ্য করে অনেক শক্তির অপব্যবহার করেছেন। এর উত্তর কে দেবে?

* * *

রচেল হাড্‌সন্

আজ কিছুদিন যাবৎ আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় হয়ে উঠছে। সেটি হচ্ছে—চিত্র-জগতের সঙ্গে রঙ্গালয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কি না? অনেকে বলবেন—নিশ্চয় আছে। সবাক যুগ প্রচলন হবার পর থেকে আমরাও ওকথা অস্বীকার করি না; কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার যো নেই যে, এই দু'টী জিনিসের 'টেক্‌নিক্' সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু থিয়েটারের নামকরা অভিনেতাগুলিই সিনেমার আসর জাঁকিয়ে বসার দরুণ এখন কোন বাঙলা ছবি দেখতে গেলে ষ্টেজের প্রতিলিপি দেখেই ফিরে আসতে হয়। তার জলন্ত নিদর্শন ছবির পর্দ্দায় শিশিরকুমারের 'সীতা', সতু সেনের 'মন্ত্রশক্তি', তিনকড়িবাবুর 'প্রফুল্ল' ইত্যাদি। কিন্তু একথা অস্বীকার করলে চলবে না, থিয়েটার এবং চিত্রে অভিনয়ের পার্থক্য আছে। তাই ষ্টেজের 'টেক্‌নিক্' নিয়ে সৃষ্ট আমাদের বাংলা ছবিগুলি তেমন পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠবার সুযোগ পায় না। আমরা বাঙলা ছবির পরিচালকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

* * *

'ছায়া' সিনেমায় 'সনোরে পিকচার্সে'র প্রথম অবদান স্বর্গীয় অমৃতলালের প্রহসন 'খাসদখল' দেখে সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের খুব বেশী আনন্দ হয় নি। তার প্রধান কারণ—রেকর্ডিং বড় নিম্নশ্রেণীর হয়েছে। এত খারাপ আওয়াজ হবার কারণ আমরা ঠিক করে উঠতে পারলুম না—ভারতীয় শব্দযন্ত্র বলেই না কি?

লরেল

চানী দত্ত বইখানি পরিচালনা করেছেন। এদিক দিয়েও তিনি আমাদের নিরাশ করেছেন। গল্পটী ঠিক মতো সাজাতেই পারেন নি। বইখানিতে তিনি অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটীই করেন নি; কিন্তু ফলতঃ কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। সুকণ্ঠের জন্য সুবাসিনীকেও নামান হয়েছে; কিন্তু অ-সুন্দর শব্দ গ্রহণের জন্য তাও হয়ে উঠেছে এক বিভীষিকা। 'মোক্ষদা'র চরিত্রে পদ্মাবতীর অভিনয় খুব খারাপ হয় নি বটে, কিন্তু তাঁর অপটু মুখে ইংরাজী উচ্চারণগুলো বড় বিশ্রী ঠেকে। 'গিরিবালা'র ভূমিকায় রেণুকা নবাগতা হলেও উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়লে কালে তিনি নাম করতে পারবেন বলেই আমাদের

বিশ্বাস। নলিনীবাবুর গান এবং চানী দত্তের অভিনয় মোটের ওপর আমাদের মন্দ লাগে নি।

* * * *

পুরাতন কর্ণওয়ালিস উপস্থিত 'শ্রী'তে পরিণত হয়েছে পয়লা ফেব্রুয়ারী ওদের 'তরুবালা' আরম্ভ হয়েছে। 'শ্রী'র উপস্থিত মূর্ত্তি দেখে সন্দেহ হয়, এই কি সেই বিশ্রী কর্ণ-ওয়ালিস্ থিয়েটার? আমরা প্রিয়বাবুর রুচির প্রশংসা করি।

হার্ডি
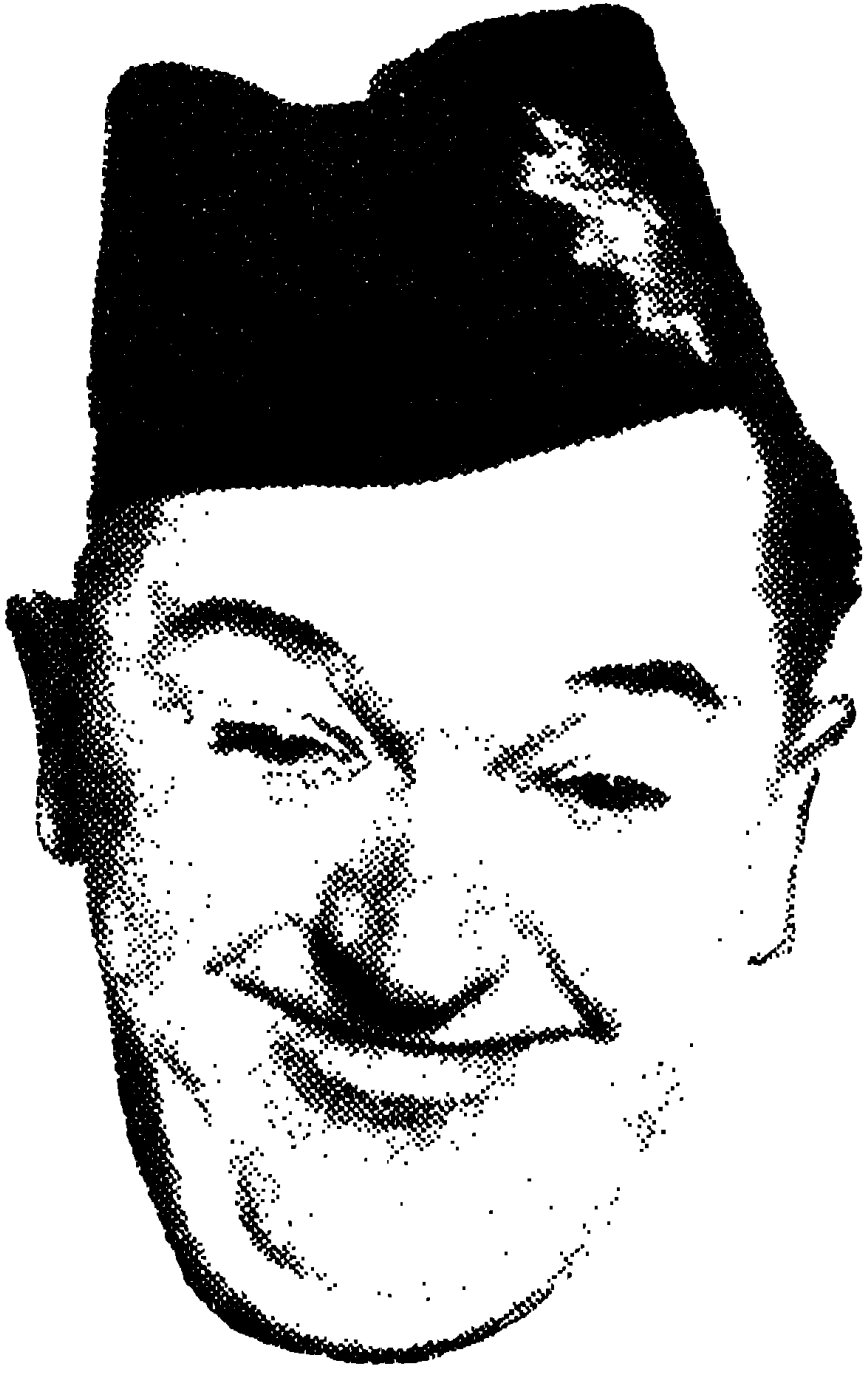
'চিত্রা'য় খুব শীঘ্রই 'গৃহদাহ' আরম্ভ হবে। প্রমথেশ বড়ুয়া এই ছবিখানির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন শুনেছি। 'নিউ থিয়েটার্স' শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' বইখানিও তুলবেন ঠিক হয়েছে। 'বিলাস' করবেন পাহাড়ী সান্যাল, 'নরেন'—বিশ্বনাথবাবু, 'রাসবিহারী'—অমর মল্লিক, 'বিজয়া'—চন্দ্রাবতী। সাইগল না কি গান গাইবেন। আশা করা যায় বইখানি ভালই হবে।

* * * *

'রাধা ফিল্মে'র 'কৃষ্ণ সুদামা' শুনছি মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে। এঁদের পরবর্ত্তী ছবি হবে নাকি 'কেলোর কীর্ত্তি।' ফণী বর্ম্মা বুঝি রূপ দেবেন। বন্ধুবর সুধীরেন্দ্র সান্যাল হঠাৎ 'রাধা ফিল্ম' ছেড়ে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া'য় যোগ দিলেন কেন জানি না। কিন্তু 'রাধা ফিল্ম' যে একজন সুযোগ্য লোক হারালেন, তা'তে ভুল কিছুই নেই।

* * * *

সাহেব-মহলে 'ম্যাডানে' 'ফক্সে'র ছবি 'ওয়ে ডাউন ইষ্ট' এবং 'প্লাজা'য় 'লরণা ডুন্' এই দু'খানি ছবি আমাদের খুব ভাল লেগেছে। 'মেট্রো'র ছবিখানিও মন্দ নয়। 'ওয়ে ডাউন ইষ্ট' চিত্রে 'য়্যানা'র ভূমিকায় রচেল হাডসনের অভিনয় খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। 'লরণা ডুন্' চিত্রে নাম ভূমিকায় ইংরাজ অভিনেত্রী ভিক্টোরিয়া হপার এবং 'জানে'র ভূমিকায় জন লডারের অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। বইখানির গল্পাংশও সুন্দর; হপারের গানগুলি ততোধিক সুন্দর।

সঞ্চয়

একাদশ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪২ | দ্বাদশ সংখ্যা

পরিত্যক্তা

প্রকাশ বসু

বছর দু'তিন পরে এবার পূজোয় আমার সুজলা সুফলা জন্মভূমির বুকে ফিরে গিয়ে শুনলাম, গ্রামের সেই ধনী সোমেশ মিত্তিরের বাড়ীতে কে একজন পাগল না কি সন্ন্যাসীর মত ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে।

এই সোমেশ মিত্তির এক সময়ে একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। তারপর উচ্ছৃঙ্খলতার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে তাঁর অগাধ ঐশ্বর্য্য একদিন দুর্দ্দশার অতল তলে অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ তাঁর বিশাল অট্টালিকা ভগ্নপ্রায়, প্রমোদ-কানন জঙ্গলে পূর্ণ, কেয়ারীর ফাঁকে ফাঁকে মর্ম্মর নির্ম্মিত নগ্ন নারীমূর্ত্তিগুলো শৈবালাচ্ছন্ন হয়ে হেলে পড়েছে। আজ সেথায় মানুষের পরিবর্ত্তে বাদুড় ও পেচকের বাসস্থান হয়েছে। এই চিরস্মৃত লোকটিকে প্রত্যক্ষ দেখার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয় নি; কিন্তু তাঁর এই অতীত প্রমোদ-কাননটি আমার বাল্যের স্মৃতির সাথে একান্তভাবে জড়িয়ে আছে। ছেলেবেলায় কতদিন পাঁচিল ডিঙিয়ে এই বাগান থেকে পেয়ারা, জাম, আম প্রভৃতি চুরি করে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বুক ফুলিয়ে গর্ব্ব অনুভব করেছি; কত শীতের রাত্রে এই বাগানের খেজুর গাছে উঠে রসে ভর্ত্তি ভাঁড় এনে সগৌরবে সহচরদের বিলিয়েছি। আমার কৈশোরের কত অত্যাচার, কত উপদ্রব এখনো এই শ্রীহীন বাগানের গাছের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় আঁকা আছে। প্রথম জীবনের সুমিষ্ট অত্যাচারপূর্ণ দিনগুলো এই বাগানের মালিকের মত আজ সুদূর অতীতের কালো অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে। তখন শুনেছিলাম, —এই বাগানে না কি কোন্ এক স্বামী পরিত্যক্তা নারী বাস করে। তাকে একবার দেখবার জন্য কতদিন কত

চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাই নি। কেবলমাত্র একটি দিন —এক প্রচণ্ড ঝড়ের সন্ধ্যায়—এই বাগানের পাশের রাস্তা দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ওপরে দোতলার জানলার গরাদে গালটি রেখে সেই হত-ভাগিনীকে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। সেই একটি দিন মাত্র, আর কোনোদিন তাকে দেখতে পাই নি। ......তারপর কত বছর চলে গেছে,—সেই পরিত্যক্ত বাড়ীর সে জান্‌লা আজ জীর্ণ, সেই চারিদিক ঘেরা ফুলের গাছগুলো শুকিয়ে অতীতের স্মৃতি নিয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। আমার জীবনেও তারপর কত এসেছে, কত গিয়েছে, কত গড়েছে, কত ভেঙেছে। কিন্তু সেই একদিন এক দুর্দ্দান্ত ঝড়ের সন্ধ্যায় এক কুলত্যাগিনী ঘৃণিতা নারীর সেই আচম্‌কা দেখা বেদনাভরা মুখখানি আমার চোখের সাম্‌নে আজও ঠিক্ তেমনি করে জেগে আছে।

এই অদ্ভুত লোকটিকে দেখ্‌বার জন্য আমার বড় আগ্রহ হ'ল। বিকেলে চিন্ময় আস্‌তেই বল্‌লাম—"চিনু, চলো, তোমাদের সেই পাগলা জীবটিকে দর্শন ক'রে আসি।"

চিন্ময় বল্‌লে—"না, তোমার সেখানে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। তুমি যে গিয়ে তাকে খেপাবে, তা' হবে না। বাস্তবিক কি তার করুণ মূর্ত্তি!"

আমি চিন্ময়ের পিঠ চাপড়ে হেসে বল্‌লাম—"প্রতিজ্ঞা করছি—কিছু বলব না তাকে, শুধু দেখ্‌ব।"

তখন চিন্ময় রাজী হ'ল। আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

* * *

অনেকখানি পথ চলে শ্মশান পার হয়ে, গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ভাঙা ফটকের ভেতর দিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম। আমি দেখ্‌লাম, সেই নিরালা নির্জ্জন নদীতীরে অতীতের সেই ফুলে-ফলেভরা সুন্দর বাগানটি আজ বিগত যৌবনা রূপজীবিনীর দেহের মত রুক্ষ, ভীষণ! সেই ভাঙা অট্টালিকার গা ঘেঁসে কাশবনে ঘেরা ছোট নদীটি আজও তেমনি করে বয়ে চলেছে নিজের মনে—এঁকে-বেঁকে—মৃদুমন্দ তালে। এই কাশবন ও নদীর সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তর ধরে। নদী কোথাও থম্‌কে দাঁড়ায়—চম্‌কে ওঠে মুহূর্ত্তের জন্য—গতি হয় মন্দ—ছন্দ যায় ছুটে—তার-পর আবার চল্‌তে থাকে। এই কাশবন ও নদীর মধ্যে দিনরাত কত বিরহ মিলন চলে। নদী আনে বিরহের পথে মিলন......কাশবন আনে মিলনের পথে বিরহ। পূর্ণিমা রাতে হয় তাদের মিলন—সারারাত ধরে চলে তাদের মিলন্তিকা। কিন্তু মিলনে আনন্দ হয় না। নদী হয় শীর্ণা—ছন্দ হয় মন্দ—গতি হয় ক্ষীণ।......কাশবনে ভাঙনের পালা সুরু হয়—নুয়ে পড়ে—শুকিয়ে যায় প্রকৃতির দুর্দ্দান্ত প্রখর তাপে। তারপর বসন্তের দখিণা মলয় তাদের প্রাণে তোলে গানের রেশ, ধরণী হয়ে ওঠে রঙান —জ্যোছনায় সারা জগৎ হয়ে ওঠে রূপালী।......তারা নিজের নিজের সত্ত্বা আবার ফিরে পায়—পরস্পরকে পরস্পরের মাঝে বিলীন করে দেয়। তাদের সম্বন্ধ হয়ে ওঠে আরও গাঢ়, আরও নিবিড়। নদী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কাশের বনকে আলিঙ্গন করে।

তারপর বাড়ীটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মনে হ'ল—এক-দিন যাঁর সজ্জিত বিলাস-কক্ষ লীলাময়ী তরুণীর আবেশ-বিহ্বল চরণ চুম্বনে পুলকিত হয়ে উঠত, কত চঞ্চল চোখের চাহনি, কত তরল হাসির উচ্ছ্বাস, কত আশমানী ওড়নার শিথিল অঞ্চল যার বাতাসকে একদিন মাতাল করে তুল্‌ত —আজ সেথায় শুধু মৃত্যুর মত একটা বিরাট গম্ভীর স্তব্ধতা যেন 'হাঁ' ক'রে কা'কে গিল্‌তে চায়।

চম্‌কে উঠে অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই দেখ্‌লাম—অদূরে সেই পাগলকে, বসে আছে নদীর তীরে—গালে হাত দিয়ে। দৃষ্টি তার নদীর ওপারে শ্মশানের প্রতি। আমি দেখলাম, পরণে তার আধময়লা একখানা ধুতি ও গায়ে একটা অর্দ্ধছিন্ন চাদর।

তখন দিনান্তের শেষ আভাটুকু সাঁঝের আকাশ হ'তে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। কর্ম্মচঞ্চল দিনের ব্যস্ত কোলাহল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে। আমি দিনের ক্ষীণ আলোকে দেখ্‌লাম—তার চুলগুলি রুক্ষ, অযত্নবিন্যস্ত—দৃষ্টি উদাস, ব্যথিত।

তার আনত মুখের দিকে চাইতেই কেমন যেন একটু থম্‌কে গেলাম। ঝড়ের রাতের প্রভাতের মত তার সারা মুখখানার ওপর কেবল যেন ছিঁড়ে যাওয়া, ভেঙে পড়া, উড়ে যাওয়ার চিহ্ন আঁকা। মনে হ'ল, তার ঐ মৃদু স্পন্দিত বুকখানার মধ্যে যেন একটা রুদ্র ভীষণ আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে আছে—কে জানে সেথায় কি দাহ, কি জ্বালা গোপনে তার বুকখানাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে!

চলে না এসে দাঁড়িয়ে রইলাম—তার কি ব্যথা তা' জান্‌বার বড় আগ্রহ হ'ল। অদূরে সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে শ্মশানে একটা সদ্য প্রজ্বলিত চিতা দাউদাউ করে জ্বলে উঠ্‌ল। পাগল অনিমেষ নয়নে কিয়ৎক্ষণ সেই দীপ্ত চিতার পানে চেয়ে থেকে একটা চাপা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। তারপর আমাদের তার পাশে সেই নির্জ্জন জঙ্গলপূর্ণ নদীতীরে আসন্ন অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে ভদ্র বিনীতভাবে বল্লে—"আপনারা এখানে এই সময়ে দাঁড়িয়ে কেন? আমার কাছে কি কোন দরকার আছে?"

আমি বল্লাম—"না, বিশেষ কিছুই নয়; তবে আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে ও গোপনে দু'-চারটে কথা কইতে পারলে মন্দ হয় না।"

পাগল এক পা অগ্রসর হয়ে বল্লে—"বেশ তো, যে কোনোদিন একটু গভীর রাত্রে ঐ ভাঙা বাড়ীতে আস্‌বেন। কিন্তু, আমার একটি অনুরোধ—আপনি একলা আস্‌বেন।"—বলে সে একটা বিষাদের হাসি হাস্‌ল।

আমি সম্মতি জানিয়ে আর অনর্থক কথা না বাড়িয়ে তার ভদ্রতার প্রতিদানে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করে চিন্ময়কে নিয়ে ফির্‌লাম।

... ...

বাড়ী ফিরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম আজ কিছুতেই কাছে ঘেঁস্‌তে চাইল না। কেবলই মনে হতে লাগ্‌লো—কখন গভীর রাত্রি হবে। বিনিদ্র নয়নে চুপ করে বিছানায় পড়ে আছি—ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা জানিয়ে দিল, আমার মনও ব্যগ্র হয়ে উঠ্‌ল। ঠিক কর্‌লাম—আর একটু রাত হলেই যাবো। ঢং করে একটার ঘণ্টা বাজ্‌তেই উঠে দাঁড়ালাম।

গ্রাম নিশুতি। নিকষ-ঘন নিশীথ রাত্রে চলেছি নির্জ্জন পথে একা—জানি না কোন্ অদম্য আকর্ষণে। চারিদিক নীরব, নিঝুম—কোথাও সাড়া শব্দটি নেই—আছে কেবল ঝিঁঝির ঐক্যতান, বাতাসের হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস, আর মাথার ওপর ঐ নিশাচর তারাগুলো নির্নিমেষ নয়নে চুপটী করে বসে।

অতি সন্তর্পণে অন্ধকার হাত্‌ড়ে সেই বাড়ীতে প্রজ্বলিত মিট্‌মিটে আলোর ক্ষীণ রশ্মিটুকুকে সম্বল করে সেখানে এসে পৌছলাম। ঘরে ঢুকে দেখি—নিব নিব প্রদীপটি তখনও বাইরের ভীষণ গাঢ় অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে জ্বালিয়ে রেখেছে। আর তারই সাম্‌নে বসে আছে সেই পাগল লোকটি—যেন ধ্যান মগ্ন ভোলানাথ।

আমার পায়ের শব্দে তার ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। সে পিছন ফিরে তাকিয়ে বল্লে—"আসুন। এত রাত্তিরে এসেছেন? আমি ভাবি নি যে, আজই আপনি আস্‌বেন।"—বলে সে বস্‌বার জন্যে তার শতছিন্ন কম্বলখানি পেতে দিল। আমি নিঃশব্দে গিয়ে বস্‌লাম।

কিছুক্ষণ দু'জনেই স্তব্ধ। আমি একবার তার প্রতি চেয়ে বলে উঠলাম—"আজ না এসে থাক্‌তে পার্‌লাম না; আমার যে বড্ড জান্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।"

পাগল বল্লে—"কি জান্‌তে চান আপনি?"

আমি নিঃসঙ্কোচে বল্লাম—"কি আকর্ষণ এ বাড়ীতে আপনাকে টেনে এনেছে?"

পাগল একটু হাস্‌লে,—সে হাসি যেন অনেক দিনের অনেক অশ্রুর বাষ্প জমা মেঘের সজল বর্ষণ। সে বল্লে—"এই ঘরখানি যে আমার জীবনের মহাতীর্থ! এর চেয়ে বড় তীর্থ ত আমার কোথাও নেই—স্বর্গেও নয়—ঈশ্বরের চরণেও নয়।" কি ভেবে আবার সে বল্‌লে—"আপনি বিয়ে করেছেন?"

আমি বল্‌লাম—"না।"

পাগল জিজ্ঞাসা করলে—"জীবনে কোনদিন কোনো নারীকে প্রকৃত ভালবেসেছেন—যেমন করে আলো আঁধারকে ভালবাসে, মেঘ বিজলীকে ভালবাসে, হাসি কান্নাকে ভালবাসে ?"

আমি বল্‌লাম—"না—ঠিক বোধ হয় নয়।"

পাগল বল্‌লে—"আমি কিন্তু বেসেছিলাম। শুধু ভালবেসে ছিলাম নয়—দু' পায়ে সে ভালবাসাকে থেঁতলে ফেলেছিলাম ! তাই সে আজ সারা জগৎ ঘিরে অক্ষয় অমর হয়ে আছে। আমার সে অপমানের পূর্ণ অর্ঘ্য দেবতার চরণে গিয়ে পৌঁচেছে।"

তার দুই চক্ষের অবরুদ্ধ অশ্রু গাল বেয়ে ঝর্‌তে লাগল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে পুনরায় বল্‌তে লাগ্‌লো—"যখন আমার বিয়ে হয়, তখন আমি কুড়ি বছরের। তার আগে কোনদিন প্রাণের চোখ দিয়ে কোনো নারীর পানে চাই নি। সেই একদিন দীপালোকিত উৎসব-রাতে সপ্ত আয়তির কলহাস্য কুহরিত ছাঁদনাতলায় লাল চেলীর নীচে দু'খানি লজ্জা-কম্পিত কালো চোখের কুণ্ঠিত আয়ত দৃষ্টির সঙ্গে যখন আমার শুভদৃষ্টি হ'ল, তখন কি নিবিড় মৌন মহিমা যে সেই স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টি হ'তে ঝরে পড়ছিল, ভাষায় তার কণামাত্রও প্রকাশ করা যায় না। এই নিঃসঙ্গ জীবনের কত নিদ্রাহারা রাতে শয্যা ছেড়ে উঠে ওপরে অন্ধকার আকাশের পানে চেয়ে বিধাতার কাছে বলেছি—"দয়াময়, এই জীবনই যদি মানুষের শেষ না হয়, যদি পর-জন্ম বলে কোনো জিনিষ তোমার সৃষ্টিতে থাকে, তা' হলে আর কিছু চাই না দয়াময়,—একটিবার—শুধু একটিবার—তুলসীর মূলে সন্ধ্যা প্রদীপের মৃদু কম্পিত শিখাটির মত, লাল চেলীর নীচে সেই দু'খানি কালো চোখের সেই সলজ্জ-চকিত চাহনি আমায় দেখ্‌তে দাও !—সাধ যে আমার এখনো মেটে নি !"

বাসর রাতের ভোরের বেলা যখন নির্জ্জন ঘরে শুধু তার সেই আনন্দ-বিহ্বল মূর্ত্তিখানির দিকে চেয়ে বসে-ছিলাম, তখন কণ্ঠের মধ্যে নিখিল জগতের সমস্ত ছন্দ, সুর, লয় তান এক করে আমি ডাক্‌লাম—"রমা !"

সে আমার কাছে সরে এসে আমার বুকের ওপর তার উচ্ছ্বসিত বুকখানি এগিয়ে দিয়ে, আমার গালের ওপর তার লজ্জারক্ত গালটি রেখে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—"ডাক্‌ছ ?"—বলে সে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল।

আমি তার রক্তিম ওষ্ঠে সুমধুর একটি স্পর্শ এঁকে দিয়ে তাকে বাহুপাশে বদ্ধ করে বল্‌লাম—"রমা, আমাদের এ প্রেম, এ মধুর মিলন কি চিরকাল এমনি অটুট হয়ে থাক্‌বে ?"

রমা আমার মুখের পানে তার আয়ত চোখ দু'টি তুলে ধরে বল্‌লে—"কেন থাক্‌বে না গো ! কি হয়েছে তোমার ! না, না—ও কথা এখন বোলো না !"

আমি কথাটা বলে নিজে নিজেই শিউরে উঠ্‌লাম। এই বাসর-ঘরে হাসির দেওয়ালীর মাঝে জীবনের প্রভাতে কেন যে সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল তা' বুঝ্‌তে পারলাম না। আজ সত্যই সে সন্ধ্যা আমার জীবন-পথে নেবে এসেছে।...

তারপর আমার এই আল্‌গা জীবনটা কি প্রেম, কি যত্ন, কি সেবা দিয়ে যে সে ছেয়ে রেখেছিল—একটু কণা-মাত্রও ফাঁক কোথাও ছিল না। আজ যখন জীবনের সেই সব হারানো দিনগুলোর কথা ভাবি, তখন মনে হয়, যেন সব সত্য নয়, বাস্তব নয় !—একটা স্বপ্ন—সুখ স্বপ্ন—একটা নিদ্রা-বিরল রাত্রির ক'টি অলস মুহূর্ত্তের জন্যে তারা এসেছিলো একদিন আমার ঘুমন্ত জীবনে—যৌবনের কল্পলোক হ'তে! পরিপূর্ণ আনন্দ পেয়েছিলাম, তাই রাখ্‌তে পারি নি। তাই আরো অধিক আনন্দ পাবার আশায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আজ ভগবানকে বলি—"বিধাতা, মানুষকে যত পেরো দুঃখ দিও, পরিপূর্ণ সুখ দিও না, তা'তে নশ্বর মানবের তৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়। অপূর্ণ রেখে তার সুখকে বেঁচে থাকৃতে দিও, পূর্ণ করে তাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলো না !"

আমারও ঠিক্ তাই হ'ল। আমি যৌবন মদে মত্ত প্রাণটি ভাসিয়ে দিলাম ভরা আবেশে। তখন আমার মনে আর এক নতুন প্রাণের অনুভূতি এল। রমার কথা ভুলে

গেলাম। তার ব্যবহার, তার কথাবার্ত্তা যেন আমার প্রাণে বিষ ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। তাই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে অসময়ে, অকারণে, অযথাভাবে তার নব জাগরিত কচি প্রাণটির মাঝে ঘা দিতে লাগ্‌লাম। তার রূপকে ত্ু' পায়ে থেঁতলে জর্জ্জরিত করে ফেল্লাম। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে আহতা হরিণীর মত একটা মুহূর্ত্ত আমার হিংস্র মুখের দিকে কাতর নয়নে চেয়ে ক্লান্ত চরণে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে সেই স্বামী পরিত্যক্তা, অবমানিতা, নির্য্যাতিতা নারী কোথায় কোন সুদূর সাগর পারে সংসারের আকাশ হ'তে খসে গিয়ে দিশাহারা আঁধারে পাড়ি দিলে। তার খোঁজ পর্য্যন্ত কর্‌লাম না। কিন্তু আমার মর্ম্মের মাঝে যার সোণার আসন বিধাতা পেতে রেখেছেন, আমার নিভৃত অন্তর দেউলে যার পূজার পঞ্চ প্রদীপ নির্নিমেষে জল্‌ছে, আমার পরমাত্মার নাদলোক হ'তে যার সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে,—আমার সাধ্য কি তাকে ঠেলে দেই!

তাই একদিন আমার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের রাতে সেই কোটী সাবিত্রী, লক্ষ সীতার রক্তে গঠিত সেই সতী আমায় স্বপ্নে দেখা দিলে—যেমন করে একদিন তাকে সেই বিয়ের রাতে সম্প্রদান-সভায় হোমানলের দীপ্ত আলোয় আবেগ-কম্পিত হাতে তার গৌর সীমন্তে আয়তির গৌরব রেখা এঁকে দিয়ে, তার সেই সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত রক্তাভ মুখখানি দেখেছিলাম,—ঠিক সেই রকম সদ্য-বধূরূপেই সে আমায় দেখা দিলে। ঘুম ভেঙে গেল, বুকের মাঝে একটা নীরব ব্যথা বেজে উঠ্‌ল। সারারাত খাড়া হয়ে বসে কাটালাম।...

পরদিন থেকেই খুঁজতে লাগলাম। কত বছর ধরে ভারতের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত খুঁজেছি, কিন্তু সে-অবমানিতার সন্ধান পাই নি।

খানিক থেমে ভাঙা জান্‌লার ভেতর দিয়ে বাইরের থম্‌থমে অন্ধকারের পানে চেয়ে যেন ঘুমের ঘোরে পাগল বলে উঠ্‌ল—"দেবি, ক্ষমা চাইবার কোনো পথ আমি রাখি নি, তবু জানি আমি ক্ষমা চাইবার আগেই তুমি ক্ষমা কর্‌বে!"

তারপর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে পুনরায় বল্‌লে—"অনেক খোঁজাখুঁজি করে যখন নিরাশ হয়ে ব্যাকুল অন্তরে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ কার মুখে শুন্‌লাম যে, সেই অভিমানিনী রমা আমার, এই বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে তার সেই নশ্বর দেহ এই ঘরে ত্যাগ করেছে! এর বাতাসের স্তরে স্তরে তার কতদিনের কত বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস জমাট হয়ে আছে! সেই চিরসতী স্ত্রী আমার, অভিমানিনী রমা আমার,—উঃ, কি ভীষণ যন্ত্রণা!..."

পাগল বেরিয়ে গেল বাইরের সেই ঘনঘোর আঁধারের মাঝে।

প্রকাশ বসু
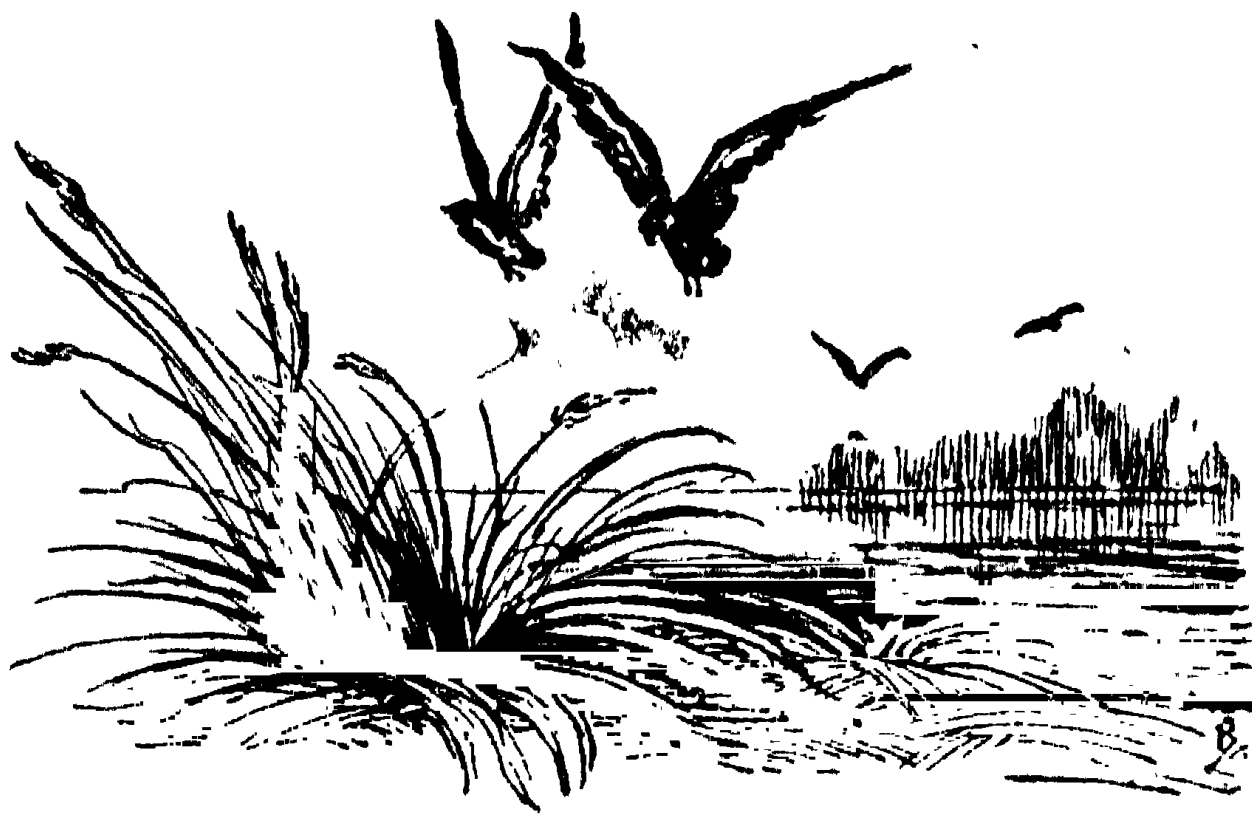
পল্লী-শ্রী

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

মানুষ মানুষকে এমন করিয়া বলে না, বলিতে পারে না। কিন্তু বলিল যে, সেও মনুষ্য পদবাচ্য, আর নীরব নিথর হইয়া শুনিয়া গেল যে, সেও মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে লোকটার ধৈর্য্য, কটু কথা সহ্য করিবার শক্তি যে অপর পক্ষের কটূক্তি করিবার অপর্য্যাপ্ত শক্তির মত অসাধারণ এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে না সহিয়াই বা তাহার উপায় কি? বাঁধিয়া মারিলে সহে ভাল। উপায় তাহার নাই—তাহার সহ্যশক্তি বেশী না হইলেই ক্ষতি। বক্তব্যটুকু শেষ করিয়া উত্তমর্ণ সত্যনাথ দত্ত-মহাশয় অধমর্ণ অমিয়কুমারের দিকে চাহিয়া কহিলেন—তুমি যে বাবু নয় রাম, নয় গঙ্গা কিছুই বলো না। আমি যে এত বকে মরলুম, তা' একটা জবাব দাও। লাট সাহেবের মত নিজের খেয়ালেই নিজে বসে আছ। বলি, আমি কি তোমার খাস তালুকের প্রজা? না খামার-বাড়ীর চাকর? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব তাই শুনি?

এতক্ষণ পর অমিয় কথা কহিল—অনর্থক দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই সত্যকাকা, আপনার টাকা উপস্থিত দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যদি দয়া করে দুটো বছর আর অপেক্ষা করেন—

কথা শেষ হইবার আগেই সত্যনাথ ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—এতদিন কাটল একটা পয়সা দিলে না, দু' বছর পরই বা তুমি কি এমন জজ্-মেজিষ্টার হবে বাপু, যে, টাকা দেবে।

—কাকা ম্যাজিষ্ট্রেট হব না নিশ্চয়, তবে একটা বছর পরে এম-এটা পাশ কর্ত্তে পার্লে হয় ত চাকরী একটা জুটবে। তখন—

সবেগে মাথা নাড়িয়া সত্যনাথ কহিলেন—না না, ও কোন কাজের কথা নয়। এক বছর যাবে এখনও, তারপর তুমি এম-এ পাশ কর্বে, তারপর চাকরী হবে, তবে দেবে আমায় টাকা! ভাঁওতা আর কা'কে বলে। এ কি একটা কথার মত কথা। এক বছর পরে পাশ যদি তুমি না কর? ধর, নয় করলেই, এই ত বাজার, চাকরী যে পাবে তারই বা ঠিক কি? বি-এ এম-এ পাশ ত এখন পথে-ঘাটে ছড়ান রয়েছে। কিম্বা ধর, তুমি যদি মারাই যাও, জীবন মরণের কথা এ কি বলা যায়? তখন? তখন ত আমি সমূলে হারাব। না বাবু, আমি স্পষ্ট বলছি, এই এতকাল কোনও রকমে চুপ করে আছি, আর পারব না। এই মাসের সাতাশে তারিখে তিন বছর পূরে যাবে, এর আগে টাকা দাও ভাল, না হয় আমি বাধ্য হয়েই বাড়ী-ঘর বেচে কিনে নেব। অতগুলো টাকা জলে ডোবাতে ত পারব না।

অমিয় উত্তর দিল না। শূন্য বিভ্রান্ত নয়নে সম্মুখস্থ লোকটীর দিকে চাহিয়া একভাবে বসিয়া রহিল। পিতৃঋণ যে ভাবে হউক পরিশোধ তাহাকে করিতেই হইবে, কিন্তু উপায় কই? সম্বলের মধ্যে এই বাড়ীখানি, আর বিঘা কত ভূমি। তাহার বিনিময়ে ঋণমুক্ত হওয়া চলে, কিন্তু তারপর—

তিন বৎসর আগে কন্যার বিবাহের সময় ভদ্রাসনখানি গ্রাম্য মহাজন সত্যনাথ দত্তের কাছে বন্ধক রাখিয়া যখন তাহার পিতা দুই হাজার টাকা লইয়াছিলেন, তখন তিনি কল্পনাও করেন নাই যে, মৃত্যু একেবারে তাঁহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উপার্জ্জন তাঁহার মন্দ ছিল না। অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্যে কিছু সঞ্চয় না হইলেও বুঝিয়া চলিলে এ কয়টা টাকা দিয়া দিতে তাঁহার বেশী দিন লাগিবে না ইহাই ছিল তখন তাঁহার ধারণা। ভবিষ্যতের বুকে কি নিহিত আছে মানুষ যদি বুঝিতে পারিত! কন্যার বিবাহের দুই মাস পর নিতান্ত অসময়ে যখন তাঁহার উপর হইতে আহ্বান আসিল, তখন অকৃতী পুত্র ও পত্নীর চিন্তা

হইতেও এই ঋণভারই তাঁহার পক্ষে অধিক অশান্তিকর হইয়া উঠিল।

অশান্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তেই তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইল। পরপারে গিয়া এ অশান্তির দহন হইতে তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন কি না কে জানে!

সে লোকে তাঁহার যাহাই ঘটুক, এখানে কিন্তু মহাজনের তাগিদ ও বাক্যবাণে অস্থির হইয়া উঠিল তাঁহার পত্নী ও পুত্র। শুধু টাকার জন্য নহে, দুষ্ট লোক বলিয়া এই বাড়ীখানির উপর সত্যনাথের কিছু লোভ আছে। তাগিদের জ্বালায় অধীর হইয়া বাড়ীখানি ছাড়িয়া দেয় ইহারা, এই না কি তাঁহার মনের ইচ্ছা। তাই আজ তিন বছর ধরিয়া অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে—তবু ইহারা শোনে কই?

এখন তাঁহার শেষ কথা শুনিয়াও অমিয় কথা কহিল না। সত্যনাথ এবার নিতান্তই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—কি রকম লোক হে তুমি, টাকা দেবে, না আদালতে গিয়ে নালিশ কর্ত্তে হবে?

অন্তঃপুরের দিক্‌কার রুদ্ধ দুয়ারটা খুলিয়া গেল। শুভ্রবাসা অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটু উৎসাহের সঙ্গেই সত্যনাথ কহিলেন—এই যে বৌঠান। আচ্ছা বৌঠান, তুমিই বল দেখি, এইটে কি তোমাদের উচিত কাজ হচ্ছে? দরকারের সময় টাকা নিয়ে এখন আমায় এই অকূল পাথারে ফেলেছ। আমি গরীব মানুষ, আর কতকাল টাকাগুলো ফেলে রাখব তাই বলো দেখি। সুদে আসলে তিন হাজার টাকা হ'ল যে, তা' খেয়াল রাখ?

ধীরস্বরে অন্নপূর্ণা কহিলেন—রাখি বই কি, ঋণ আমার কত আছে মনে রাখব না।

—শুধু মনে রাখলে ত হবে না, দেবার ব্যবস্থা ত করা চাই। আমি কিন্তু আজ স্পষ্ট বলে যাচ্ছি, আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারব না। এই মাসের পঁচিশ তারিখের মধ্যে টাকা পাই ভাল, না হয় কোর্টেই যাব।

—পঁচিশ তারিখের মধ্যেই টাকা পাবে ঠাকুরপো।

অমিয় ও সত্যনাথ দুইজনেই চমকিয়া অন্নপূর্ণার দিকে চাহিলেন। তিনি আগের মতই দৃঢ়স্বরে কহিলেন—আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর, তোমার সব টাকাই দিয়ে দেব।

এই জন্যই এতক্ষণ ধরিয়া জোর তাগিদ চালাইলেও সেই প্রার্থনীয় বস্তু পাইবার সংবাদে সত্যনাথ একটুও তুষ্ট হইলেন না। অপ্রসন্ন-মুখে কহিলেন—সত্যি দেবে, না চালাকী করছ। তা' হলে—

পুনরায় জোরের সঙ্গেই অন্নপূর্ণা কহিলেন—চালাকী করব কেন। এতদিন দেবার মত অবস্থা ছিল না, তখন ত বলি নি দেব। উপায় হয়েছে—

কথা শেষ হইবার আগেই অধীরভাবে সত্যনাথ কহিলেন—হঠাৎ কি উপায়টা হ'ল, তাই—

—সে শুনে কোন লাভ হবে না ঠাকুরপো, তুমি তোমার টাকা পাবে এই শুনে যাও।

—পাব? কিন্তু যদি না পাই?

সহজ শান্তকণ্ঠে অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন—তখন তোমার যা' ইচ্ছে করো, বারণ করব না।

—সে ত আগেই বলে রেখেছি, তিন বছর অপেক্ষা করেছি, আর পারব না। ওই তারিখে টাকা দাও ভাল, না হয় কোর্টেই যাব।

—তাই হবে, এখন তবে এস ঠাকুরপো।

সত্যনাথ তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সত্যই ইহারা টাকা দিতে পারিবে এমন বোধ হয় না, আবার মিথ্যা বলিতেছেন তাহাও মনে করা দুরূহ। ব্যাপারটা কি জানিয়া লইবার ইচ্ছা তাঁহার উগ্র হইয়া উঠিলেও অন্নপূর্ণার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিবার মত সাহস তাঁহার হইল না। সমুদ্রের মত একটা বিরাট গাম্ভীর্য্য এই বিধবা নারীর সর্ব্বাঙ্গে বেড়িয়া রহিয়াছে। সেদিকে চাহিয়া কেমন একটা সম্ভ্রম-বিজড়িত ভয়ে আপনা হইতেই চিত্ত ভরিয়া উঠে। ক্ষণপূর্ব্বে ইহারই অসাক্ষাতে অমিয়কে যে কথাগুলা বলিতেছিলেন, ইঁহার সম্মুখে তাহা ইচ্ছাসত্ত্বেও পুনরুত্থাপনের শক্তি সত্যনাথের হইল না। পুত্রাপেক্ষা জননীকেই সে কথাগুলা শুনাইলে কার্য্যকর হইত, ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিলেও উচ্চারণ করিবার সাহস আর তাঁহার হইল না। ক্ষণেক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি

বলিলেন—কথাটা বল্‌তে কি হানি ছিল বৌঠান। শুনলে বোঝা যেত—

ঈষৎ হাসিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—আমি সত্যি বলছি কি না। বেশ বিশ্বাস না হয়, শুনেই যাও—এই মাসে ছেলের বিয়ে দেব; দিয়ে কিছু পাব—তোমার সব টাকাই সুদে-আসলে তাই দিয়ে শোধ করব।.

আর অবিশ্বাস করা চলে না। সত্যনাথ মুখটা বাঁকাইলেন। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—কত টাকা পাবে যে, আমার দেনা শোধ হবে?

—তা' চার-পাঁচহাজার হবে বই কি। ছেলে ত আমার রূপে গুণে বিদ্যায় কিছু নিন্দের নয়। কেন পাব না।

সত্যনাথ উত্তর দিলেন না। অন্নপূর্ণা কহিলেন—বেলা হয়ে যাচ্ছে, তা' হলে এস ঠাকুরপো।

ঠাকুরপো লাঠিটা লইয়া অপ্রসন্ন-মুখে পা বাড়াইলেন। অন্নপূর্ণার মুখে মৃদু হাসির একটা রেখা ফুটিয়া উঠিল।

অমিয় এতক্ষণ মৌন ছিল। সত্যনাথ ফিরিতেই মায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওকে ত তাড়ালে, কিন্তু কথাটা কি সত্যি মা?

অল্প হাসিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—তোর মা কি মিথ্যে কথা বলে অমি!

—তা' জানি, কিন্তু পাবে কোথায়?

পোষ্টকার্ডে লিখিত একখানা চিঠি, যাহা এতক্ষণ অন্নপূর্ণার হাতে ছিল, সেইখানা পুত্রের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন—পড়ে দেখ্, তোর মামা লিখেছেন।

চিঠিখানা না লইয়া আগ্রহভরে অমিয় কহিল—কি লিখেছেন মামবাবু?

—তোর মামীমার দাদা তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চান। আমাদের অবস্থার কথা সবই ত তাঁরা জানেন, তাই তিনি বলেছেন নগদ তিন হাজার টাকা দেবেন। যাতে এ দায় থেকে আমরা রেহাই পাই, সেই জন্যে তোর মামাই অবিশ্যি এ ব্যবস্থা করেছেন। মেয়ে আমার দেখা, তোকেও তাঁরা কতবার দেখেছেন, সব ঠিক্ করেই দাদা চিঠি দিয়েছেন। বিয়ের দিনও ঠিক হয়েছে। সাম্‌নের এই সতেরই তারিখ। যত শীগ্‌গির হয়, ততই ভাল। কি বলিস?

ম্লান একটু হাসির সঙ্গে অমিয় কহিল—কিন্তু মা, এ যে তোমার ছেলে বেচা হবে।

পুত্রের মুখের কালিমা জননীর মুখেও ছায়া ফেলিল। মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া তিনি কহিলেন—সেটা বুঝি, কিন্তু এ ভিন্ন উপায় কি অমি?

—উপায়? উপায় বাড়ীটা ছেড়ে দেওয়া।

অতর্কিত আঘাতে আহত যেমন আতঙ্কে সচকিতে ফিরিয়া চায়, তেমনই ভাবে চমকিয়া মা কহিলেন—ছেড়ে দেব? বাড়ী? এই বাড়ী? না না—আমি সে পারব না বলেই এত হীনতা স্বীকার কর্চ্ছি। এতদিন ধরে ওর কাছে এত অপমান সয়েও স্থির হয়ে আছি। এই বাড়ী, এ যে আমার কত প্রিয়, তা' তুই কি করে জানবি বাবা! বউ হয়ে প্রথম এই বাড়ীতেই আমি এসেছি, এই বাড়ীতেই স্বামীকে চিনেছি, এই বাড়ীতেই তোরা আমার কাছে এসেছিস, এই বাড়ীর ওই ঘরে আমার বড় ছেলে সুপ্রকাশ আমায় ছেড়ে চলে গেছে! এখনও ও ঘরে গিয়ে আমি যেন তার সান্নিধ্য অনুভব করি! তারপর এইখানেই আমার জীবনের সব সুখ-সৌভাগ্যের শেষ হয়েছে তোর বাবাকে হারিয়ে! হারিয়েছি, তবু মনে হয়, এই বাড়ীতে এখনও তাঁর স্পর্শ লেগে আছে! এখানকার বাতাসে তাঁর গলার স্বর বাজছে! তাঁকে হারিয়েও তবু এইখানে আজও তাঁকে অনুভব করছি! কিন্তু এ বাড়ী ছাড়লে—না, না অমিয়, সে আমি পারব না!—তুই এ বিয়েতে আপত্তি করিস নি!

জননীর সজল চোখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে অমিয় কহিল—আপত্তি ত আমি করি নি মা, কথাটা শুধু বল্‌ছিলুম—

বিমনা অন্নপূর্ণা কহিলেন—আমারই কি ইচ্ছে যে, তোর বউ, আমার ঘরের লক্ষ্মী, সে আসবে টাকার বদলে, এর সঙ্কোচ আমার বুকে আগুনের রেখা হয়ে চিরদিন আঁকা থাকবে, তবু এ আমায় করতেই হবে বাবা! এ বাড়ী ছাড়ব, এ কল্পনাও আমি করতে পারি না যে! আর

সত্য দত্তও এমন লোক নয় যে, আর সময় দেবে আমাদের। যা' বলেছে ও করবেই।

অমিয় কিছু বলিল না। অন্নপূর্ণা আপন-মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আর কিছুদিন সময় দিলেও না হয় হ'ত। তা' এ ত কিছু অন্যায় আমি করছি না। ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা সবাই নেয়—বরপণ-নিবারণী-সভায় গিয়ে যাঁরা লেকচার দেন, তাঁরা পর্য্যন্ত। তবু আমি ত চাই নি কিছু। তাঁরা অবস্থাপন্ন, নিজে থেকেই দিতে চেয়েছেন। এ আর অন্যায় কি ?

জননীর এই আত্মগত কৈফিয়ৎ শুনিয়া অমিয় হাসিল। জীবনে যাঁহারা অন্যায় কণামাত্রও করেন নাই, অবস্থার বিপাকে তাঁহাদের বাধ্য হইয়া বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করিতে হইলে নিজের কাছেই নিজের কুণ্ঠার সীমা থাকে না। মনকে তাই সহস্র মন্ত্রনার মধ্যেও প্রবোধ দিতে হয়। এ বাড়ী ছাড়িতে মায়ের মনে যে কতখানি বেদনা লাগিবে, অমিয়ের তাহা ভালই জানা ছিল। প্রস্তাবটা তাহার তেমন মনঃপূত না হইলেও শুধু মায়ের কথা ভাবিয়াই সে হাসিমুখে কহিল—এ ভালই হ'ল মা। দু'বেলা সত্যকাকার মিষ্টি কথার হাত থেকে রেহাই পাব। আমার কোন আপত্তি নেই, তুমি যা' ভাল বোঝ কর।

অন্নপূর্ণা অন্যমনে কি ভাবিতেছিলেন। বোধ হয় ভাবী গৃহলক্ষ্মীর আগমন কল্পনার সঙ্গে তাঁহার অতীত বধূ-জীবনের সুখের দিনগুলির স্মৃতি অন্তরে জাগিয়া মনটা বিচল করিয়াছিল।

জননীকে লক্ষ্য করিয়া অমিয় কহিল—কি ভাবছ মা, চলো বাড়ীর মধ্যে যাই।

মা চমকিয়া উঠিলেন। সত্যই ত এতক্ষণ বাহিরের ঘরে রহিয়াছেন। সম্মুখের পথ দিয়া কত পরিচিত লোক যাইতেছে, হয় ত তাঁহাকে দেখিয়াছে। যত বয়সই হউক, গ্রামের বধূ তিনি। গভীর সঙ্কোচে ত্রস্তপদে তিনি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। অমিয় খর রবিকর-উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল।

জলন্ত চুল্লীর উপর ভাতের হাঁড়িটা চাপাইয়া দিয়া অন্নপূর্ণা তরকারী কুটিতে বসিলেন। একখানা চিঠি হাতে অমিয় কাছে আসিয়া কহিল—মামাবাবু লিখেছেন, কাল আসবেন তাঁরা।

ব্যস্তভাবে বঁটিখানা কাত করিয়া রাখিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—তোকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আসছেন ত ?

—তাই ত লিখেছেন। চারজন আসবেন।

জননী পুলক-দীপ্ত মুখে কহিলেন—তা' হলে যা' কিছু আয়োজন ত আজই করে ফেলতে হয় বাবা।

অমিয় লজ্জারক্ত-মুখে কহিল—আমি পারব না কিছু।

তাহার দিকে চাহিয়া গভীর স্নেহে মা হাসিয়া কহিলেন —তোকে কিছু কর্ত্তে হবে না। তুই শুধু একবার ও বাড়ীর নন্তুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে। যা' কেনবার তাকে দিয়েই আমি আনাব। আর দেরী করিস নে বাবা, সে হয় ত খেলতে বেরিয়ে যাবে, তাকে ডেকে দে।

অমিয় চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণার নিজস্ব কয়টী টাকা ছিল। ভাবী বৈবাহিকের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে তাহাই আনিবার জন্য তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—দিদি, কি করছ ?

অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দেখিলেন। মলিন-বসনা এক বিধবা রমণী আসিয়া দাঁড়াইল। হাসিমুখে অন্নপূর্ণা কহিলেন—এস রমার মা, সকালে কি মনে করে ভাই ? বসো।

—আর বসব না। তোমায় বলতে এলুম, রমার বিয়ে আজ, যাবে তুমি। অমিয় কই ? তাকে বলে যাই। তোমরা ছাড়া আপনার কেউ বা আমার আছে!

তাহার শেষের কথাগুলা না শুনিয়াই সবিস্ময়ে অন্নপূর্ণা কহিলেন—আজ রমার বিয়ে! এমন হঠাৎ কেন ? পাত্র কি রকম ?

ক্ষুন্নকণ্ঠে রমার মা কহিলেন—দায় উদ্ধার যে করে হোক্ হয়ে গেলেই হ'ল, এর আর হঠাৎ কি। পাত্র আমাদের উপযুক্তই। দ্বিতীয় পক্ষ; শুনেছি বয়স হয়েছে। একটী পয়সা নেবে না। মেয়ে কালো, এর

চেয়ে ভাল ত আমাদের জুটবে না। কিছু খরচ নেই, তবু আম-কাঁঠালের বাগানখানি বিক্রী কর্ত্তে হ'ল। রুলি চেলী দিয়ে কন্যেদান কর্লেও তারও ত একটা খরচ আছে। পাড়ার লোক দু'-পাঁচজনকেও ত বলতে হবে।

অন্নপূর্ণা কথা কহিলেন না। সমদুঃখী ভিন্ন অপরে কখন পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। বিধবা রমণীর দুর্দ্দশায় অন্নপূর্ণার সমবেদনার অন্ত ছিল না। তাঁহার বাড়ীর অতি নিকটেই ইহাদের পর্ণ কুটীর। একটী মাত্র কন্যা লইয়া অল্প বয়সে স্বামীহারা এই নারীটী সামান্য বিঘা কত জমির শস্য সম্বল এবং প্রতিবেশীদের করুণার উপর নির্ভর করিয়া এই দীর্ঘ দশটী বৎসর কাটাইয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে অন্নপূর্ণা একজন। স্বামী থাকিতে ইহাদের তিনি যথেষ্ট সাহায্য সর্ব্ব বিষয়ে করিয়া আসিলেও তাঁহার মৃত্যুর পর অন্নপূর্ণার নিজ সংসারে অনাটনের আবির্ভাবে ইচ্ছাসত্ত্বেও আর বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না, অর্থের দিক্ দিয়া। সে ক্রটীটুকু সামর্থ্যে পুরাইয়া দিবার চেষ্টা মাতাপুত্রের যথেষ্টই ছিল। মেয়েটীর এই আকস্মিক বিবাহের সংবাদ ও পাত্রের বর্ণনা শুনিয়া অন্নপূর্ণার মনটা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায়ই বা কি? সহায়-সম্বলহীনা দীনা বিধবা নারীর রূপহীনা কন্যাকে কোন্ সুপাত্রই বা গ্রহণ করিবে? মনকে বুঝাইতে গিয়াও অন্নপূর্ণা শান্তি পাইলেন না। প্রতিবেশিনীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—ছেলেটীর বয়স কি রকম হবে?

—তা' ত জানি না দিদি, আমি ত দেখি নি। ওপাড়ার ওই দত্ত-মশায় আর নগেন কাকাই সব ঠিক করেছেন। তাঁরা ত বলেন—বয়স বেশী নয়, বড় মেয়ে, মানাবে। তা' কিরকম হবে কে জানে! আর হলেই বা কচ্ছি কি? যে করে হোক্ মেয়েটাকে পার কর্ত্তে ত হবে? গরীবের ভাগ্যে যা' হয় তাই ভাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাকুক! আচ্ছা, আমি যাব'খন।

—এ বেলার রান্না-খাওয়া সেরেই এস দিদি। দু'-চারজন যা' খাবে তার ব্যবস্থা ত কর্ত্তে হবে। তুমি ছাড়া—

—অত করে বল্‌ছ কেন ভাই! আমি এখনি যাচ্ছি। অমিকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, অমির যে বিয়ে। এই মাসের সতেরই। কাল আশীর্ব্বাদ।

রমার মা উঠিয়াছিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পুলকিত কণ্ঠে কহিল—তাই না কি! কই, শুনি নি ত কিছু।

—হঠাৎ ঠিক্ হ'ল যে, তাই জানতে পার নি।

—বেশ হচ্ছে দিদি! তোমার একা ঘরে বউ একটা আসুক! এখন তবে যাই, সব কাজই পড়ে আছে। তুমি এখনই এস।

ত্রস্তপদে রমার মা স্থান ত্যাগ করিল। অন্নপূর্ণা উঠিয়া কক্ষান্তরে গেলেন।

দরিদ্র গৃহের বিবাহের আয়োজন শেষ হইতে বেশী সময় লাগিল না। প্রতিবেশিনী আরও দুই-একজন রমণীকে লইয়া অন্নপূর্ণা ভিতরের সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করিলেন। বাহিরের কাজে রহিল অমিয় ও তাহার জন দুই সমবয়সী বন্ধু। সন্ধ্যার পরই লগ্ন। পাত্র গ্রামান্তরের লোক। বেলা থাকিতেই জনকতক বরযাত্রীসহ তিনি উপনীত হইলেন। পাত্রীপক্ষের যে ক'টী মাতব্বর ব্যক্তি এ বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আসিয়া সাদর অভ্যর্থনায় আপ্লুত করিয়া বরকে যথাস্থানে বসাইলেন। সন্ধ্যা হইতে তখনও অল্প বিলম্ব আছে।

সস্তা দামের একখানি লাল চেলী পরাইয়া মেয়েটীকে কাষ্ঠাসনে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা কাছে বসিয়া ময়দা মাখিতেছিলেন। রমার জননী কন্যার পাশে বসিয়াছিল। একমাত্র সন্তানের জীবনের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিনটীতে যে তাহার পিতার স্নেহাশীস্‌ভরা দৃষ্টি অমৃত স্পর্শে অভিসিক্ত হইল না ভাবিয়া উচ্ছল অশ্রু তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। কন্যারও চোখে জল। অন্নপূর্ণা তাহাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেও ঘন ঘন চোখ মুছিতেছিলেন।

অমিয় আসিয়া কহিল—মা ওঠো, বর দেখবে চলো!

পুত্রের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—দেখ্‌ব 'খন, ব্যস্ত কি এত।

—না মা, না, তুমি এখনি চলো।

তাহার মুখের ভাব, কথার ভঙ্গী, অন্নপূর্ণাকে বিস্মিত করিল। নীরবে উঠিয়া তিনি পুত্রের সঙ্গে চলিলেন। বাহিরে যেখানে বর বসিয়াছে, সে স্থানটা যাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় এমন একটা স্থানে জননীকে আনিয়া অমিয় বলিল—ওই যে লাল চেলী পরে, ওই পাত্র।

স্তম্ভিতের মত অন্নপূর্ণা সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। এই বিবাহের বর? কম করিয়া ধরিলেও ষাট-পয়ষট্টি বৎসরের কম তাহার বয়স নয়। এই শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত ওই সরস শ্যামল লতিকাটীকে জড়াইয়া দিতে হইবে? এই তাহার জীবনের আশ্রয়? কিন্তু কতক্ষণের জন্য? উহার জীবনের যাহা কিছু সবই ত নিঃশেষ প্রায়। একটা উতল হাওয়ার স্পর্শেই হয় ত এ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তারপর একটা আশাময় তরুণ জীবন ব্যর্থতার নিষ্পেষণে শুকাইয়া ঝরিয়া যাইবে।

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—অমি, এ বিয়ে যারা ঠিক করেছেন তাঁদের একবার ডেকে আন ত। দত্ত-মশায় আর ও পাড়ার নগেন সরকারই বুঝি এর ঘটক, ডাকো তাঁদের।

অমিয় চলিয়া গেল। একটু পরেই হুঁকা হাতে সত্যনাথ দত্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্র সরকার আসিয়া অন্নপূর্ণার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—আপনারা দেখে-শুনে এই বুড়োর হাতে মেয়েটাকে দেবার ব্যবস্থা করেছেন?

এ প্রশ্নের জন্য ইঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। সরকার-মহাশয় উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দত্ত কহিলেন—বুড়ো, বুড়ো আবার কোথায়? বছর চল্লিশ বয়স। এ কি বেশী?

অন্নপূর্ণা অল্প একটু হাসিয়া কহিলেন—বেশী বই কি। তা' ছাড়া, এঁর বয়স চল্লিশ, কুড়ি-বাইশ বছর আগে থাকতে পারে, এখন নেই। ওই বুড়োর হাতে—

কথা শেষ হইবার আগেই সত্যনাথ রাগিয়া কহিলেন—কি বারবার বুড়ো বুড়ো করছ, বুড়ো আবার কোথায়? একটা পয়সা খরচ করবার ক্ষমতা নেই, কালো মেয়ের এর চেয়ে ভাল বর পাবে কোথায়? ওর পক্ষে এ ভালই হচ্ছে। পয়সা আছে, খেয়ে-পরে মেয়েটা সুখে থাকবে।

—কিন্তু সে খাওয়া-পরার ভাগ্য ওর ক'দিন থাকবে?

এবার সরকার-মহাশয় কথা কহিলেন—মেয়ের মা ত কিছু বলছে না, তোমার পরের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন বৌমা। তোমার ত মেয়ে নয়।

তাঁহার দিকে চাহিয়া শান্তকণ্ঠে অন্নপূর্ণা কহিলেন—আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি কাকা, আপনার নিজের মেয়ের জন্য এই রকম পাত্র কি আপনি নিয়ে আসতে পারতেন? পরের দায় উদ্ধার কর্ত্তে কি শেষে এই বুড়োকে—

দাঁত মুখ খিচাইয়া সরকার কহিলেন—বেশ ত এ বর তোমাদের পছন্দ না হয়, আঠার বছরের ছোকরা খুঁজে এনে বিয়ে দাও না—আমাদের কি? অনাথা বিধবার ধেড়ে মেয়ে হয়ে আছে, তাই দয়া করে আমরা পাত্তর জুটিয়ে এনে দিলুম। সে যদি তোমার ভাল না লাগে, অন্য ব্যবস্থা কর। তবে মনে থাকে যেন মেয়ের গায়ে হলুদ হয়েছে, এই লগ্নে বিয়ে না হলে জাত যাবে। এ পাত্তরে বিয়ে না দাও, যেখান থেকে পার ছেলে এনে আজ রাত্রেই বিয়ে দাও। কি বলো দত্তজা?

অন্নপূর্ণা তাহার টাকা দিয়া দিবেন বলাতেই সত্যনাথ তাঁহার উপর অত্যন্ত চটিয়াছিলেন, আজ এখন তাহার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। সরকারের কথা সমর্থন করিয়া জোর গলায় কহিলেন—সে কথা বল্‌তে। ইচ্ছে না হয়, এ বিয়ে দিও না। কিন্তু আজ রাত্রে মেয়ে পাত্রস্থ করতেই হবে—সে ব্যবস্থা করে অন্য কথা বলো। হুঁ, মুখে অমন 'আলুনি' আদর দেখাতে সবাই পারে, কই এতকাল পার নি একটা বর খুঁজে দিতে। এই ছেলেই কি পড়তে পায়! কত করে হতে পায়ে ধরে তবে না বিয়েতে রাজী করেছি। বলে বুড়ো—হুঁ!

রমার মাতা কলরবে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছিল। অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল—গরীবের মেয়ের ভাগ্যে এর বেশী হবার আশা নেই দিদি! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, নোয়া-সিঁদুর পরে রমা আমার দু'দিন হেসে-খেলে বেড়াক।

—কিন্তু ওই বুড়ো বরে—ওরও ত জীবনে একটা আশা আছে।

—তুমিও যেমন, গরীবের মেয়ের আবার আশা! কোন মতে আইবুড়ো নাম খণ্ডালেই হ'ল। ওর ভাগ্যে যদি সুখ থাকবে ত আমার—

উচ্ছ্বসিত অশ্রুতে বিধবার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মলিন বসনের আঁচলে সে চোখ মুছিতে লাগিল।

অমিয় জননীর কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষণেক কি ভাবিয়া লইয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—একে যেতে বলুন আপনারা। এই লগ্নেই রমার বিয়ে হবে আমার ছেলে অমিয়র সঙ্গে। গরীব হলেও অমি মূর্খ নয়, অক্ষমও নয়। নিজের পরিশ্রমে মা আর স্ত্রী প্রতিপালন কর্ত্তে সে পার্ব্বে। এ বুড়োর চেয়ে পাত্র হিসেবে আমার ছেলে যে ভাল, একথা আপনারা অস্বীকার কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

কয় মুহূর্ত্ত কেহই কথা বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট কণ্ঠে রমার মা বলিল—দিদি, এ কি বলছ তুমি! আমার মেয়ের এমন ভাগ্য হবে যে—

তাহার কথা অসম্পূর্ণ রাখিয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—অমু, তোর এতে সম্মতি আছে?

জননীর পদধূলি মাথায় লইয়া অমিয় কহিল—তুমি যা' বল্‌বে মা, তাতেই আমি সম্মত।

—তবে চল্ কাপড়টা ছেড়ে আসবি। আপনারা বুড়োকে বিদায় করুন।

পুত্রসহ তিনি ফিরিতেই দত্ত কহিলেন—কিন্তু আমার টাকা? বলেছিলে যে, ছেলের বিয়ে দিয়ে আমার দেনা শোধ কর্ব্বে, তার কি হবে? সেটা বলে যাও।

অন্নপূর্ণা ফিরিলেন। স্মিতমুখে কহিলেন—সে ত বলাই আছে, টাকা না পেলে আমার বাড়ী-ঘর তুমি নিও। তাই করবে।

দত্ত কহিলেন—টাকা তা' হলে দেবে না?

—কি করে আর দিই। চলো অমিয়, লগ্ন হয়ে এল।

জননীর সঙ্গে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অমিয় কহিল—কিন্তু বাড়ী গেলে তোমার যে ভারী কষ্ট হবে মা!

—তা' হোক্ বাবা! একটা বালিকা জীবন ব্যর্থতার নির্ম্মম আঘাত হতে রক্ষা করে সার্থকতায় ভরিয়ে তুল্‌তে সে কষ্ট আমি ভুলে যাব! আয় তুই।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

ভৌতিক গল্প

বিয়ের রাতে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল

যোগেশবাবুর হাতে কোনো কাজের ভার যদি দাও, তা' হ'লে তিনি প্রাণপণে কাজটা ভাল করে করার চেষ্টা ত করেনই, উপরন্তু এত চীৎকার এবং ছুটোছুটী করেন যে, লোক তার কাজের চাইতে কাজের আড়ম্বরেই ভড়কে যায়। এ বিষয়ে তিনি আমাদের মেজ গোঁসায়ের সমকক্ষ।

এ হেন যোগেশবাবুর ছেলের বিয়ে হচ্ছে মগবার জমিদার চারুবাবুর একমাত্র মেয়ে কমলার সঙ্গে।

ডাক্-হাক চীৎকারের আর অন্ত নেই!

ভাঙা গলা, ময়লা কাপড় এবং নতুন একটা সিল্কের পাঞ্জাবী পরে যোগেশবাবু বর এবং বরযাত্র নিয়ে ট্রেণে চাপ্‌লেন। এঞ্জিনের ঠিক পেছনের কামরাখানাই ছিল তাঁর রিজার্ভ করা। গাড়ীর ভেতর বর এবং বরযাত্রীদের বসিয়ে তিনি নিজে গিয়ে একটা জান্‌লার ধারে বস্‌লেন। কিন্তু বসেও তাঁর ছুটী নেই। যারা ট্রেণে তুলে দিয়ে ফিরে যাবে, তাদের মারফৎ বাড়ীতে তিনি বহুতর উপদেশ পাঠিয়ে দিলেন—এক-একটা কথা অন্ততঃ দশবার করে বল্লেন, কিন্তু তবুও যেন নিশ্চিন্ত হতে পাল্লেন না। ট্রেণটা ছাড়ার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে সেই সব আলোচনাই হ'ল।

বরের বন্ধুদের মধ্যে কেউ বা হাস্‌লে, কেউ বা দু'-একটা রসিকতাও কর্‌লে।

যোগেশবাবুর বন্ধু অভিজিৎবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার কথা কইলেন। বল্‌লেন—'যোগেশ, তোমার কাপড়খানা একবার বদলে নিলে হ'ত না।'

যোগেশবাবু বাক্স থেকে নতুন একখানা কাপড় বার করে খুলে তাকে কোমরে জড়ালেন। মাড় দেওয়া কাপড়ের কোঁচাটা ফুলে এক কাঠা জমী যেন জুড়ে রইলো। চাদরখানার ভাজ আর খোলা হ'ল না। দোকানের টিকিট আঁটা চাদরখানা হাতের তলায় চেপে নিয়ে চুপ করে বস্‌লেন।

লিলুয়া পার হয়ে গাড়ীটা তখন বেলুড়ের পথে চল্‌ছে। ই আই রেলের গাড়ী বড় মজার। এখানা প্যাসেঞ্জার হলেও লিলুয়া, বেলুড় এবং বালীতে দাঁড়ায় না। একবারে থামে গিয়ে উত্তরপাড়ায়। কাজেই গাড়ীখানা বেশ জোরেই চলেছে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর চল্‌তি ট্রেণের হাওয়াটা বড় মধুর লাগ্‌লো। যোগেশবাবু একটা বিড়ি ধরালেন।

কিন্তু বরাৎ যার খারাপ, তাঁর বিপদ পদে পদে।

......ভীষণ একটা শব্দ হয়ে সমস্ত গাড়ীখানা কোথা

দিয়ে কেমন করে যে মাঠের ওপর ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো। এবং ও ধারের 'বাফার'টা ভেঙে গাড়ীর দেওয়াল ভেদ করে বর এবং বরযাত্রীর দল যেখানে ভীড় করে বসেছিল তার ভেতর কেমন করে মুষলের মত এসে পিষে দিলে, তা গাড়ীর লোক বোঝবার কোন অবকাশ পেলে না। কাৎ হওয়া গাড়ীর তলায় চলে গেলেন পুরুত-মশায়, আর খোলা জান্‌লা দিয়ে যোগেশবাবু ছিট্‌কে গিয়ে পড়্‌লেন মাঠের মাঝখানে—এঞ্জিনের আঘাতে টেলিগ্রাফের ভারী থামটা উপ্‌ড়ে গিয়ে যোগেশবাবুর কোমরের ওপর পড়লো।

কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘট্‌তে বোধ হয় এক সেকেণ্ডেরও বেশী সময় লাগে নি।

যেখানে যত আলো ছিল, সমস্ত গেল নিবে। গাড়ীর জীবিত প্যাসেঞ্জারেরা প্রাণপণ চীৎকার করে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। ই আই আরের পাশাপাশি যে ক'টা লাইন পাতা আছে, সবগুলো জুড়ে এই আপ্‌ প্যাসেঞ্জার এবং কোনো একটা অনামুখো ডাউন মাল গাড়ী যে কেন এই ভয়ানক কোলাকুলি করলে, তার কারণ নির্ণয় করার জন্যে পরে অবশ্য মোটা মাইনে দিয়ে অনেক বড় বড় সাহেব এনে ভর্ত্তি করা হয়েছিল, কিন্তু তা'তে উপস্থিত হতাহতদের কষ্ট কিছুই লাঘব হয় নি।

দুই

সাড়ে আটটার ট্রেণে বর আস্‌বে। আটটার সময় চারুবাবুর লোকেরা গাড়ী এবং আলো নিয়ে মগরা ষ্টেশনে এসে বসে আছেন। বরযাত্রী প্রায় যাটজন হবে; কোল্‌কাতার লোক, উপযুক্ত অভ্যর্থনা ত করা চাই।

রেলের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেল।

পৌনে ন'টা—ন'টা—স' ন'টা—

গাড়ীও নেই, লোকও নেই, কোনো পাত্তাই নেই।

চারুবাবুর ছোট ভাই ওঁদের অভ্যর্থনা ক'রে আনবার জন্যে ষ্টেশনে গেছলেন, তাঁর ত আর উৎকণ্ঠার সীমা নেই—টিকিট-ঘরে যে কতবার খবর নিতে গেলেন তার ঠিক নেই—কিন্তু মাষ্টার-মশায়ের সেই এক কথা, ট্রেণ লেট্‌ আছে।

সাড়ে ন'টার সময় চাকরের হাতে হ্যারিকেন দিয়ে স্বয়ং চারুবাবু ষ্টেশনে এসে হাজির হলেন।

—'কি হ'ল রে, এঁরা সব কোথায়?'

ভাই বল্‌লেন—'এরা ত দূরের কথা, ট্রেণই নেই যে।'

—'সে কিরে, ট্রেণ নেই কি, সাড়ে আটটার গাড়ী এখনও এসে পৌঁছয় নি?'

—'না।'

সকলেরই চোখে মুখে কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা।

গ্রামের মধ্যে চারুবাবুর মান্য ছিল খুব—তিনি সো া টিকিট-ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

ষ্টেশন-মাষ্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখ কাঁচুমাচু করে বল্‌লেন—'চারুবাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

চারুবাবু বল্‌লেন—'আচ্ছা, কথা পরে হবে 'খন—এখন আমার লোকজনের কি হ'ল বলো দেখি।'

বিয়ে বাড়ীতে মাষ্টারও নিমন্ত্রিত, কাজেই তাঁর চক্ষুলজ্জাও আছে। চারুবাবুর চেয়ারের কাছে এগিয়ে এসে অতি মৃদুস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা, আপনার জামাই কি কোল্‌কাতা থেকে সাড়ে ছ'টার গাড়ীতেই আস্‌বে বলে ঠিক্‌ ছিল।'

মাষ্টারের ভূমিকা এবং হাবভাবে চারুবাবুর উৎকণ্ঠা তখন অনেক বেড়ে গেছে। বল্‌লেন—'হ্যাঁ, কেন বলো দেখি।'

এধার ওধার চেয়ে দেখে মাষ্টার খুব ভয়ে ভয়ে চারুবাবুর কানের কাছে মুখ দিয়ে বল্‌লেন—'দেখুন, আমাদের হ'ল চাকরী, আমাদের ত এসব বলা উচিত নয়, ওই ট্রেণখানা বেলুড়ে একটা মাল গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে।'

—'এ্যা, বলো কি হে!'

—'দোহাই চারুবাবু, দোহাই, একটু আস্তে! নইলে আমার চাকরী—'

চারুবাবু তখন হতাশ হয়ে পড়েছেন—'না মাষ্টার, তোমার চাকরীর কথা বল্‌ছি না, আমি না হয় কাউকেই

এ কথা বল্লুম না, কিন্তু—আমার যে সব তৈরী হে, কি করি এখন।'

সহসা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে চারুবাবুর ভাই এসে ডাক্ দিলেন—'দাদা, শীগ্‌গির এসো, বর এসেছে।'

মাষ্টার এবং চারুবাবু দু'জনেই ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌লেন—'বলিস্ কিরে, কোথায়?'

ভজা চাকর লণ্ঠন না নিয়ে অন্ধকারেই ছুটে এসেছে খবর দিতে। বর এবং বরকর্ত্তা বাসে করে একেবারে চারুবাবুর বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছেন।

—'মা রক্ষা করেছেন, মা রক্ষা করেছেন!' বল্‌তে বল্‌তে চারুবাবু তাঁর দল নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুট্‌লেন।

তিন

ষ্টেশন থেকে চারুবাবুর বাড়ী যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এঁরা যখন বাড়ীতে এসে পৌঁছলেন, তখনও শাঁখ বাজ্‌ছে।

চারুবাবুর বাড়ীর সকলেই প্রায় ষ্টেশনে গিছ্‌লো—কেবল তাঁর এক জ্ঞাতি কাকা ছিলেন বাড়ীতে। বুড়ো বাতে ভুগ্‌ছেন বলে আর ষ্টেশনে যেতে পারেন নি। তিনিই বেরিয়ে এসে বরপক্ষদের অভ্যর্থনা করছেন।

যোগেশবাবু অলবড়েড হলেও রসিক বটে। চারুবাবুকে আস্‌তে দেখে তিনি সোজা এগিয়ে এসেই এক সেলাম করে বল্লেন—'আসুন, আসুন—চারুবাবু আসুন, চারুবাবু আসুন—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, বস্‌তে আজ্ঞা হোক—'

চারুবাবু বাড়ীতে না থাকার দরুণ একেই লজ্জিত হয়ে পড়েছেন, তার ওপর যোগেশবাবু বল্লেন—'আচ্ছা চারুবাবু, এ আপনার কি ব্যাপার, আমরা আর কতই বা খাব যে, আপনি আমাদের দেখে এম্‌নি করে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলেন—আমরা ত ফিরেই যাচ্ছিলুম—তা' না হয় আপনি আমাদের একটা খাবার দোকানই দেখিয়ে দিন না—'

চারুবাবুর জ্ঞাতি কাকা সুরেনবাবু বুড়ো হয়ে মুখ একটু আল্‌গা হয়ে গেছে। পাত্রকে লক্ষ্য করে সকলকে শুনিয়ে তিনি বল্‌লেন—'এ শালা বর ত বড় ভাল ছেলে নয় হে। বাড়ীতে যখন কেউ নেই, সেই সময় অত সেজেগুজে কি কর্‌তে আস হে ছোক্‌রা—তোমার মৎলবখানা কি?'

বরের এক বন্ধু দল থেকে বলে উঠ্‌লো—'ঠানদি'র খোঁজে।'

অট্টহাস্যে সুরেনবাবু ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'ভায়া, তুমি কিন্তু বড় ঠকেছো—ঠানদি'র খোঁজ কর্ত্তে গেলে ত এখানে চল্‌বে না, তোমাকে তা' হলে পরপারে যেতে হবে—কেমন, সাহস আছে?'

চারুবাবুর সঙ্গে তখন যোগেশবাবুর কথা হচ্ছে—'হ্যাঁ, বড় বিপদ হয়ে গেল। বেলুড়ে আমাদের গাড়ী ত গেল লাইন থেকে পড়ে—তারপর আমাদের দলের ভেতর দু'-একটি ছেলের সামান্য চোটও লেগেছে।'

চারুবাবু বল্‌লেন—'তাই না কি, খুব বেশী লাগে নি ত?'

—'না বেশী লাগে নি, তবুও 'কলিসন্'টা ভাগ্যিস ষ্টেশনের কাছে হয়েছিল, তাই গাড়ী-টাড়ীগুলো একটু পরেই পাওয়া গেল। আমাদের দলের বেশীর ভাগ ছেলেই বাড়ী ফিরে গেল; কেবল নেহাৎ যারা আপ্‌না-আপ্‌নি, সেই ক'জনই এসেছে। বাস্‌খানাও সময় বুঝে একশ' টাকা ভাড়া চেয়ে বস্‌লো। তা' আমরা আর কি করি, বাধ্য হয়ে—'

চারুবাবু বল্‌লেন—'বেশ করেছেন, বেশ করেছেন! আপনারা যে কষ্ট করে সময় মত আস্‌তে পেরেছেন, সেই যথেষ্ট! ও একশ' টাকার জন্যে ভাব্‌বেন না, ও আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।'

চারুবাবুর ভাগ্নে তখন জলখাবার এনেছে — সিঙ্গাড়া, নিম্‌কি, রসোগোল্লা, আর গরম গরম চা।

বরপক্ষীয়দের মধ্যে একজন বলে উঠ্‌লো—'আহা, এ সব আবার কেন হাঙ্গাম কর্ত্তে গেলেন!'

আর একজন বল্‌লেন—'রাত্তির ত হয়েছে, আমাদের একেবারে বসিয়ে দিলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।'

তাঁর কথায় সায় দিয়ে যোগেশবাবু চীৎকার করে

বল্লেন—'হ্যাঁ, চারুবাবুর যত সব কুমংলব—দু' পয়সার চা খাইয়ে আমাদের সব খিদে মেরে দেবেন—সে সব হচ্ছে না চারুবাবু।'

চারুবাবুর ভাগ্নে বাড়ীতে গিয়ে চারুবাবুর ছোট ভাইকে বল্লে—'ছোট মামা, এরা সব কোল্‌কাতার ছেলে, সিঙ্গাড়া সন্দেশ খেলেও গরম চা ত কেউ ছুঁলে না। সিগ্রেট দিতে গেলুম, তাও নিলে না। কি ব্যাপার বলুন দেখি?'

ছোট মামা তখন মিষ্টির হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। তিনি বল্লেন—'কে জানে!'

চার

বরকে নতুন জোড় পরিয়ে আসনে বসান হ'ল।

মেয়েদের দল এসে দালানের একপাশে ভীড় করে দাঁড়ালো। বৌয়েরা জান্‌লার পাশ থেকে বরকে লুকিয়ে দেখ্‌ছে। সকলেরই মুখে এক কথা—এমন সুন্দর বর না কি এ গাঁয়ে কখনও আসে নি। সুরেনবাবুর নাত্নীর সঙ্গে এ বাড়ীর পাত্রী কমলার ভারী ভাব। সে তখন পিঁড়েয় বসা কনের কানে কানে বরের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

স্ত্রী-আচারের বেদীর ওপর বর এসে দাঁড়ালো।

এয়োরা পাক ঘুর্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু বরণের সময় বরণডালা নিয়ে বরের গায়ে ঠেকাতেই সে যেন কেমন করে শিউরে উঠ্‌ল—এটা অনেকেই দেখ্‌লে। এতে কিন্তু কেউ কিছু ভাবলে না। বরণডালায় এমন ত কিছুই নেই; সাধারণ নিয়মে যা' থাকে, তাই আছে—তবে বরণডালার পিদিমটা একটু বেশী করে জ্বলছিল।

ও দিকের ঠাকুর-দালানে বরযাত্রীদের খাবার জায়গা করে' তাঁদের ডাকৃতেই বরকর্তা যোগেশবাবু বল্লেন—'চারুবাবু, দালানে আবার খাবার বন্দোবস্ত করলেন কেন—ঠাকুর-দালানে খাওয়াটা কি উচিত?'

চারুবাবু বল্লেন—'কেন, দালান ত আমাদের ভাল।'

যোগেশবাবু বল্লেন—'আহা, এটা বুঝ্‌ছেন না—পূজোর দালানকে আমরা ঠাকুর-মন্দিরের সঙ্গে সমান বলেই মনে করি। খেতে বস্‌লে এটো-কাঁটা ফেল্‌তেই হবে। সে সুবিধে হবে না চারুবাবু। আপনি ওই দালান ছাড়া উঠোনে কি যেখানে হয় বস্‌তে দিন, তা'তে আমাদের কোনো আপত্তি নেই—কিন্তু ঠাকুর-দালানে নয়।

সুরেনবাবু গোঁড়া হিন্দু। তিনি মনে মনে ভারী খুসী হলেন।

এদিকে বরের চারপাশে কনেকে ঘোরান হ'ল সাতপাক।

তারপর কনেকে বরের সাম্‌নে এনে পিঁড়িটাকে খুব উঁচু করে তুলে ধরে সকলেই উলু দিয়ে উঠ্‌লো। নাপিত একটা চাদর নিয়ে বর কনের মাথার ওপর ঢাকা দিয়ে দিলে।

কনের বুকের ভেতর কেমন যেন গুর্‌গুর্ কর্‌ছে।

নাপিত তখন বরের একটা হাত ধরে তার ওপর কনের একখানা হাত রাখলে—হাতে হাত পড়তেই কনে যেন কেমন শিউরে উঠ্‌লো।

এই কি হাত—উঃ, এ যেন একটা বরফের চাঁই—মানুষের হাত কি এত ঠাণ্ডা হয়!

তার ওপর আর একটা হাত নাপিত দিয়ে দিলে।

হাত দু'খানা কি ঠাণ্ডা আর শক্ত! হাতের চেটোয় যেন মাংস বলে কোন জিনিসই নেই। ঠাণ্ডা হাতের ভেতর হাত পড়ে কমলার সমস্ত শরীর যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কান, চোখ, মুখ সব হিম হয়ে কপাল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়তে লাগলো।

এমনি ভাবে আর একটু থাকলে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

নাপিত তখন আপন-মনে ছড়া বল্‌ছে। কমলা কিন্তু আর শুভ-দৃষ্টির অপেক্ষা কর্ত্তে না পেরে এমন ঠাণ্ডা যার হাত তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে।

একবার দেখেই তার মাথাটা ঘুরে গেল! পা থেকে সারা অঙ্গ হ'ল রোমাঞ্চ! এ কি মানুষের চেহারা!

সমস্ত মুখের মাংস তার চুপ্‌সে চোয়ালের ভেতর ঢুকে গেছে, আর যে চামড়াখানা মুখের হাড়টাকে ঢাকা দিয়ে

রেখেছে, সেখানা যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে কুঁচকে রয়েছে। নাক এবং মুখটা যেন থেঁতলে গিয়ে একটা রক্তের জমাট ডেলা হয়ে গেছে, আর সেই জমাট রক্তপিণ্ডের দু' পাশ থেকে টকটকে লাল রঙের দুটো চোখ যেন আমূল বেরিয়ে এসেছে।

একবার দেখেই আঁতকে উঠে কমলা আর একবার দেখলে—সেই মুখ আবার হাস্‌ছে।

চোখ নামাতে গিয়ে এবার নজর পড়্‌লো বরের বুকের দিকে। সেখানকার জামাটা ছিঁড়ে কে যেন লোহার শলাকা দিয়ে বুকের চাম্‌ড়াটাকে উপড়ে পাকিয়ে পেটের কাছে ঠেলে জড়ো করে দিয়েছে, আর সেই চামড়া খোলা বুকের ওপর কঙ্কালের সাদা হাড়গুলো প্রেতের বড় বড় বীভৎস দাঁতের মত বিকট হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। সেই হাড়গুলোর চতুর্দ্দিকে রক্তের চাপ, আর খোলো খোলো মাংস তার চারিদিকে ডেলা পাকিয়ে ঝুল্‌ছে।

এরপর কমলার চিন্তা এবং দৃষ্টিশক্তি যখন ফিরে এল, তখন তাকে বাসর-ঘরে বসান হয়েছে। সে বেচারা টেরও পায় নি যে, সম্প্রদানের জায়গায় বসে বর ঠিকমত মন্ত্র পড়তে পারে নি বলে পুরুত-মশায় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, এবং নারায়ণের মাথায় জল দিতে গিয়ে বরের হাত কেঁপে সেই জল প্রদীপে পড়ে দীপ নিবে গেছে।

ওদিকে যারা পরিবেশনের কাজে ছিল, তারা এসে ভাঁড়ারে চারুবাবুর ছোট ভাই যিনি ভাঁড়ারী হয়েছিলেন, তাঁকে বল্‌লে—'ছোটবাবু, কোল্‌কাতার লোক যে এত খায় তা' আমাদের জানা ছিল না। উঃ, প্রায় দুশো লোকের মাছ-মাংস এই কুড়িটা লোকে শেষ কর্‌লে! এক-একজনে এক এক গাম্‌লা করে মাছ খাচ্ছে।'

ছোট বাবু একটু হেসে বল্‌লেন—'বলিস্‌ কি রে, আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে তা' হলে ঠকিয়েছে বল্‌।'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়, ওদের খাওয়া একটা দেখ্‌বার জিনিষ!'

প্রতিবেশী একটি ছেলে খালি বালতী নিয়ে ফিরে এসে বল্‌লে—'ছোট কাকা, ওরা চিংড়ী মাছের খোলা শুদ্ধ চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে গো! এত মাছ খেলে, কিন্তু পাতের কাছে একটু কাঁটা পর্য্যন্ত নেই!'

ওদের খাওয়া দেখে চারুবাবু ত অবাক্‌! যোগেশ-বাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—'বেই-মশায়, আপনাকে আর কি দেবে?'

যোগেশবাবু বল্‌লেন—'না, আর কিছু চাই না, যথেষ্ট হয়েছে।'

চারুবাবু মনে মনে বল্‌লেন—'তবু ভাল।' কিন্তু প্রকাশ্যে বল্‌লেন—'সে কি বেই-মশায়, আপনি ত কিছুই খেলেন না—এরকম লজ্জা করে গেলে কখনও চলে। ওরে নেপাল, বেই-মশায়কে—'

যোগেশবাবু হেঁ হেঁ করে হেসে বল্‌লেন—'আচ্ছা দাও, দাও—একটা, একটা—আচ্ছা দুটো—আচ্ছা, আচ্ছা—'

পাঁচ

এ বাড়ীর কাজকর্ম্ম চুকিয়ে সুরেনবাবু যখন নিজের বাড়ীতে ফিরে গেলেন, তখন রাত প্রায় একটা।

সুরেনবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে অনেকদিন; সুতরাং, দোতলার কোণের একটা ছোট ঘরে তিনি তাঁর ফরসী, লাঠি এবং কবিরাজী ওষুধ-পত্তর নিয়ে বসবাস করেন। সেকালের আমলের ভাঙা ক্যাশবাক্স, ধুলো ধরা বড় বড় ফাইল, দরকারী হিসেবের খাতা, আর সাবেকী রুয়ে খাওয়া সাহেব মেমের ছবির মাঝখানে সুরেনবাবুর নড়বড়ে তক্তাপোষ, তা'তে পিঁপড়ে আর আরশোলায় ভর্ত্তি। বিছানার তলায় যে সব দরকারী কাগজ আছে, সেগুলো পাছে হারিয়ে যায়, সেই ভয়ে বউমার শুদ্ধ সে বিছানায় হাত দেওয়া নিষেধ; কাজেই বুড়োর ঘরের দুরবস্থা।

এ হেন সুরেনবাবুর বিয়ে-বাড়ীর রোশনাই দেখে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবার ইচ্ছে হচ্ছে।

তা' আর এমনই বা কি? এই সব ধুলো-টুলো ঝেড়ে একটা খাট পাতলেই ত ঘরটা বেশ হয়, আর চুলে ভাল করে কলপ দিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে একখানা কালপাড়

কাপড় পরলে এখনও যা' চেহারা আছে, তা'তে নিশ্চয়ই মেয়েরা ভুলে যায়। তা' ছাড়া, এরকম ত হয়েই থাকে। এই ত ও পাড়ার পান্নু, সে ত তাঁদের চেয়ে কত বড়, কিন্তু কেমন তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে—

ভাবতে ভাবতে সুরেনবাবুর কাশি এলো—এই কাশিটাই ত তাঁর রোগ।

কাশ্‌তে কাশ্‌তে উঠে একবার বাইরে যাবার দরকার হ'ল।

সুরেনবাবুর বারাণ্ডা থেকে চারুবাবুর বাড়ীর সবটাই বেশ দেখা যায়।

এতক্ষণে বাড়ীটা সব চুপচাপ হয়েছে। কেবল যা' বাসর-ঘরের আলোগুলো জ্বল্‌ছে। বর খুব ভালো গান জানে—বাসর-ঘরে মেয়েদের একেবারে মশ গুল করে রেখেছে।

কিন্তু ওদিকে—এ্যা! ওগুলো কি?

সুরেনবাবু চোখটা একবার ভাল করে মুছে নিলেন। চারুদের ছাতে ও সব কারা?

ঠিক্ যেন মানুষের মত দেখ্‌তে, অথচ মানুষ বল্‌তেও ইচ্ছে হয় না। এম্‌নি ধারা একটা আকৃতি, কাঠির মত সরু লম্বা লম্বা দু'খানা তার পা, সে ওদের ছাদের ওপরের লম্বা আকাশ পিদ্দিমের বাঁশখানা হাতে চেপে ধরে একেবারে একটা পা সেই বাঁশের মাথার ওপর চাপিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সেই পচা বাঁশটার মাথায়, আর তারপরই প্রায় বিশ হাত লম্বা তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে আকাশ থেকে একটা উড়ন্ত পেঁচাকে ধরে নিয়েই ছাতের ওপর লাফিয়ে পড়লো। সেই পেঁচাটার কি ভীষণ চীৎকার! কিন্তু তখনই মানুষের মত সেই অদ্ভুত জীবটি সেই পেঁচার ঘাড়টি ভেঙে তার রক্তটুকু সব চুষে খেয়ে ফেল্লে।

ওধারে নারকোল গাছের যেখানটা একেবারে গভীর অন্ধকার হয়ে আছে, সেখান থেকে সাটপরা একখানা হাত লম্বা হয়ে এসে ওই পেঁচাভোজী মূর্ত্তির কাঁধের ওপর পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হ'ল। সুরেনবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন তার কথা। সে যেন বল্‌লে—'দাদা, পাড়াগাঁয়ের এমন সব ভালমন্দ পাখী ছেড়ে পেঁচার রক্ত খাচ্ছো কেন?'

লোকটি তার ধপ্‌ধপে শাদা দাঁতের পাটীর ওপর রক্তমাখা জিবটি বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে—'না ভাই, এদের বিয়ে-বাড়ীতে আজ বড় বেশী খাওয়া হয়ে গেছে কি না, তাই পেটটা ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে পেঁচার রক্তটা খেলুম। তোমার চাই, দেবো একটা ধরে?'

নারকোল গাছের জমাট্ অন্ধকার থেকে ভারী এবং খোনা গলায় উত্তর এল—'না ভাই, থাক্। যদিও আমাদের কবরেজ-মশায় পেচকারিষ্ট খেতে বলেন বটে, কিন্তু আমার ভাই মোটেই ভালো লাগে না—বড় তেতো। তার চেয়ে পাখীর ডিম খুব ভাল। গোটাকতক খাও না, দেবো?'

সুরেনবাবুর বিশ্বাস ছিল তিনি খুব সাহসী। সত্যিকার সাহসীও বটে। কিন্তু এবার তাঁর সর্ব্বশরীরে যেন কেমন একটা কাঁপুনী এল।

চারুদের উঠোন থেকে পাত্রের বাপ যোগেশবাবু দেওয়াল ধরে কেমন 'টুক্' করে উঠে এলেন ছাদের ওপর। হাতে তাঁর কতগুলো মরা পায়রা। অম্‌নি যেন কোথা থেকে সরু সরু অসংখ্য আঙুল এসে মরা পায়রার ঠ্যাং এবং পালক ধরে টানাটানি কর্‌তে লাগ্‌লো।

গম্ভীর প্রকৃতির অংশুজিৎবাবুর কেবলমাত্র মুখখানাই দেখা গেল। শূন্যের ওপর একখানা মুখ যেন ভাস্‌তে ভাস্‌তে বল্‌লে—'যোগেশ, তুমি বড় অন্যায় করছো, একদিনে কি ভদ্রলোকদের সমস্ত সাবাড় করবে।'

যোগেশ এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু খুব রাগতভাবে বল্‌লেন—'আমার ছেলেটা এতবড় গাধা, শুভ-দৃষ্টির সময় মেয়েটার কাছে তুই এক মিনিট ঠিক্ থাকৃতে পারলি নি!'

দোতলা থেকে গড়াতে গড়াতে ভাঁটার মত লাল দুটো চোখ যেন কার্ণিশ বেয়ে ছাতে উঠে এল, আর সেই চোখ দুটোর মাঝখান থেকে একটা অদ্ভুত রকমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'বাবা, কিছু মনে করবেন না। কনের নধর নিটোল টমেটোর মত চেহারাটি দেখে আমার এত আমোদ হয়েছিল যে, তা'তে আর মুখোস আমি রাখতে

পারি নি, আমার নিজের চেহারাখানা একটিবার বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা'তে আর হয়েছে কি? গান-টান্ করে এখন আমি সব ঠিক করে নিয়েছি।'

...বাসর-ঘরে বরকে চোখ বুজ্‌তে দেখে একজন তাকে ডেকে বল্‌লে—'ঘুমোলে চল্‌বে না।'

বর অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে চোখ চেয়ে বল্‌লে—'না, ঘুমুই নি ত।'

সুরেনবাবুর ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল। দু'হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে নিজের পৈতেটা জড়িয়ে ধরে চীৎকার করবার চেষ্টা কর্‌লেন।

কিন্তু চীৎকারের চেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই চারুবাবুর ছাতের ওপর কতকগুলো চোখ যেন অন্ধকারে দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সেই সঙ্গে চারুবাবুর ছাতে এক পা আর সুরেনবাবুর বারাণ্ডায় তাঁরই সাম্‌নে এক পা দিয়ে নারকোল গাছের অন্ধকার থেকে সেই সার্টপরা ছেলেটি বিনা ভূমিকায় সুরেনবাবুর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

তার পেটের উপর কিচ্ছুটি নেই। যেন মনে হয় কোন রকম অস্ত্র দিয়ে তার পেটের চামড়াখানা ছিঁড়ে তার ভেতরের নাড়ীভুঁড়িগুলো সব টেনে বার করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, গলা থেকে পা অবধি যা' অবশিষ্ট আছে, সে সব জমাট্ রক্তে একেবারে কালো হয়ে গেছে।

সুরেনবাবুর সাম্‌নে এই মূর্ত্তি এসে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে ঘাড় তুলিয়ে বল্‌লে—'কি হে সুরেন, চেঁচামেচি করে তুমি আমাদের ধরিয়ে দিতে চাও না কি?'

সুরেনবাবুর ঠিক্ পেছনেই একটা খোনা আওয়াজ হ'ল। বল্‌লে—'ঠাকুর্দ্দা, তুই যে বড্ড বলেছিলি পরপারে গিয়ে ঠান্‌দির সন্ধান কর্ত্তে—কেমন, এখন তোর পরপারে যেতে ইচ্ছে হয়—ঠান্‌দির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে সাহস আছে?'

যেন একটা ভারিক্কি লোকের কথাও শোনা গেল পাশ থেকে। সে বল্‌লে—'আহা, সুরেনবাবুকে কিছু বলিস্ নি রে। শেষটায় যদি গোলমাল হয়ে পড়ে, তা' হলে আমাদের কনেটাকে নিয়ে যাওয়ার বড় অসুবিধে হবে।'

সেই সার্টপরা ছেলেটি সুরেনবাবুকে বল্‌লে—'ঠাকুর্দ্দা, এইমাত্র তোমার না কি বিয়ে করবার ইচ্ছে হচ্ছিল। তা' বেশ, চলো, এবার তোমায় ঠান্‌দির কাছে নিয়ে যাই। কেমন, রাজী আছ ত?'

কান্নার সুরে সুরেনবাবু 'রাম রাম' বল্‌তে গিয়ে ভেউভেউ করে কেঁদে ফেল্‌লেন।

সেই ভূতের দল এইবার একসঙ্গে হেসে উঠলো। তখন মনে হ'ল, যেন একটা প্রকাণ্ড দৈত্য আকাশ পাতাল জুড়ে একটা বিকটাকার 'হাঁ' করে সুরেনবাবুকে আস্ত গিলে ফেল্‌বার জন্যে এগিয়ে আস্‌ছে। মুখের ভেতরটা তার কী ভীষণ অন্ধকার! আর তার নিশ্বাস এতই ঠাণ্ডা যে, সুরেনবাবুর বুকের পাঁজরা শুদ্ধ যেন সেই নিশ্বাসের স্পর্শে একেবারে হিম হয়ে গেল।

শীতকালের রাত্তিরে উঠোনে পড়ে থাক্‌লে লোহার সাঁড়াশী যেমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হয়, সেই রকম সাঁড়াশী দিয়ে সেই দৈত্যটা সুরেনবাবুর গলাখানা চেপে ধর্‌লে। সেই চাপের মধ্যে সুরেনবাবু স্পষ্ট অনুভব কর্‌লেন পাঁচটা আঙুল। আঙুলের গাঁটগুলো গলার শিরার ওপর যেন লোহার মত চেপে ধর্‌লে। সুরেনবাবুর মুখের শিরাগুলো সবুজ হয়ে ফুলে উঠলো, আর সমস্ত মাথাটা যেন অসহ্য যন্ত্রণায় ভেঙে পড়লো। এমন সময় আর একটা লোহার হাত যেন সুরেনবাবুর হাঁটুর তলায় যেয়ে পড়লো এবং 'চট্' করে অতবড় লোকটাকে সেই দৈত্যটা মাটী থেকে ছাড়িয়ে উঁচু করে ধর্‌লে।

কে যেন পাশ থেকে বল্‌লে—'দে শালাকে পুকুরে ফেলে।'

একজন বল্‌লে—'না না, নারকোল গাছের মাথার ওপর যেখানে ডাব ঝুল্‌ছে, সেইখানে গলায় কাপড় বেঁধে দিয়ে আয় বুড়োটাকে ঝুলিয়ে।'

আর একজন বল্‌লে—'আয় ভাই, সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খেয়েই ফেলি।'

কিন্তু সেই ভারিক্কি লোকটি বল্‌লে—'না, শেষটা গোলমাল হলে আমরা আর কনেটাকে পাব না। আহা, মেয়েটার কি নধর শরীর—ঠিক যেন আইসক্রিম সন্দেশ!'

সঙ্গে সঙ্গে ভূতদের জিব সব একসঙ্গে ভিজে উঠলো।

কাজেই তারা বিবেচনার কাজ করলে। নিঃশব্দে

সুরেনবাবুর ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে সজোরে চৌকীর ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই ভূতের দল ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুরেনবাবু স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেন, ঘরের বাইরে কে যেন 'ঝনাৎ' করে শেকল তুলে দিলে।

সুরেনবাবুর চারিদিকে গভীর অন্ধকার, এবং বাইরে একটা চাপা হাসির ভীষণ শব্দ।

ছয়

বর বল্‌লে—'বা রে, কেবল কি আমিই একা বিয়ে করেছি যে, শুধু গান গাইব। আপনাদের মেয়েরও ত উচিত দুটো গান শোনানো।'

সুরেনবাবুর নাতনী ছিল প্রধান পাণ্ডা। সে বল্‌লে—'ওর গান শুনে শুনে আমাদের ভাই অরুচি হয়ে গেছে। আজ আমরা নতুন মানুষ পেয়েছি; তাকে আমরা আজ এক মিনিটও ছুটী দেব না।'

কনের ছোট মাসী এসে বাসর-ঘরে বসে আছে সন্ধ্যে থেকে। কিন্তু তার ভারী ভয়, পাছে কেউ বরের কাছে তার 'শাশুড়ী' পরিচয়টা দিয়ে ফেলে।

সে অনেকক্ষণ চুপ করেছিল। এতক্ষণ পরে কথা কইবার সুযোগ পেয়ে সে বল্‌লে—'তা' না হয় কনেও একটা গান শোনাও না ভাই। পরে ত একা একা শোনাবে, আজ না হয়—'

একটি মেয়ে বল্‌লে—'দেখ্‌বি, বলে দেবো।'

সে অম্‌নি ত্রস্ত হয়ে বল্‌লে—'না ভাই, না না।'

বরও যেন কেমন একটু ভড়কে গেল। কি গোপন কথা নিয়ে ওরা এত লুকোচুরী কচ্ছে গো—তবে কি ওরা—

ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজলো।

যোগেশবাবু একতোলা থেকে ডাক দিলেন—'চারুবাবু, চারুবাবু, উঠেছেন না কি ?

মনের আনন্দ জোর করে চেপে রেখে বর বল্‌লে—'এ কি, ও যে বাবার গলা, ডাকছেন বুঝি।'

একটি মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চারুবাবুকে ডেকে দিতে।

কিছুক্ষণ পরে সেই মেয়েটি ফিরে এসে বল্‌লে—'কি অন্যায় ভাই আমাদের এই বরের বাপের! বল্‌লেন কি যে, রাত থাকতে তিনি তাঁর ছেলে বউকে নিয়ে যাবেন।'

বাসরের সবাই গেল ক্ষেপে। একযোগে সকলেই এতে আপত্তি জানালে। সেই মেয়েটি বল্‌লে—'কি জান ভাই, ওদের সব নতুন শাস্তর। উনি বল্‌ছেন—বাড়ী ফিরে সকাল সকাল না কি সব কুসুমডিঙেয় বসতে হবে; নইলে কি সব বারবেলা-টেলা আছে। জানি না বাপু, কি সব কাণ্ড এঁদের!'

শালীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন প্রবীন, অর্থাৎ যাঁরা কি না গিন্নীর দলে গিয়ে ছোটদের ধমক দেন, আবার সুবিধামত তাদের সঙ্গে রসিকতাও করেন, তাঁরা এখন এক একটা মাতব্বরের মত গম্ভীর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাতারাতি বর কনে নিয়ে যাওয়ার অত্যাচার কখনই তাঁরা সহ্য করবেন না।

যোগেশবাবুর অনুরোধ তখন আজ্ঞার মত শোনাচ্ছে। তিনি দালানের দরজায় বসে চারুবাবুকে স্পষ্ট করে বল্‌লেন—'বেই-মশায়, আপনি ভালই বলুন আর মন্দই বলুন, এখানে বেশী দেরী করা আমাদের কোনোমতেই চল্‌বে না। এখান থেকে এমন সময় আমাদের বেরুতে হবে, যাতে কলকাতায় গিয়ে সূর্য্যোদয়ের মধ্যেই আমরা পৌছতে পারি।'

চারুবাবু বল্‌লেন—'দেখুন, সবই ত বুঝলুম, কিন্তু—'

দরজার আড়ালে চারুবাবুর স্ত্রী ছিলেন দাঁড়িয়ে। এঁদের পর্দ্দা বড় বেশী। তিনি চারুবাবুকে চুপিচুপি বল্‌লেন—'বেই-মশায়কে বুঝিয়ে বলো, তিনি যেন রাগ না করেন। তাঁর জিনিষ তিনি ত নিয়ে যাবেনই, কিন্তু আমাদের প্রথাটাও ত দেখতে হবে। সূর্য্যোদয়ের আগে আমরা কখনও মেয়ে-জামাই পাঠাই না—'

এমনি করে আরও কতক্ষণ কাটলো। তারপর যোগেশবাবুর অনুরোধ যেন অত্যাচারে পরিণত হ'ল।

তিনি বল্‌লেন—'চারুবাবু, তা' হলে আপনার মেয়েকে আপনি রাখুন—আমার ও রকম বউও চাই না, এ রকম কুটুম্বও চাই না!' তারপর চীৎকার করে বল্‌লেন—

'আমার ছেলে সে রকম নয়, সে এখুনি ও বউকে ত্যাগ করে দিয়ে উঠে চলে আসবে।'

এক বাড়ী কুটুম্ব। সকলেই জেগে উঠেছেন। চাকর-বাকর সকলেই ভয়ে 'কাঠ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারুবাবুর স্ত্রী গেলেন চটে। আড়াল থেকে জোর গলায় হেঁকে বল্লেন—'এ কিঁ রকম সব কথাবার্ত্তা শুনতে পাই—উনি কি আমাদের মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবেন না কি?'

বাসর থেকে সবাই বেরিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দোতলায়। সুরেনবাবুর নাত্নী চুপিচুপি পাশের মেয়েটিকে ডেকে বল্লে—'ভাই, আমার যেন গায়ের ভেতর কেমন কাঁপছে।'

সে বল্লে—'আমারও।'

এদিকে বাসরে বর কনে একা আছে। বর আস্তে আস্তে কমলার মাথার কাপড়টা হাত দিয়ে একটু তুলে ধরে বল্লে—'তোমার ভয় কচ্ছে?'

শুভ দৃষ্টির সময়ের কথাটা কমলার মনে পড়ে গেল—সে বসে বসে ঘামতে লাগ্‌লো।

বর কনের কাপড়টা ধরে নাড়তে নাড়তে হঠাৎ তার হাতে বাঁধা মৃত্যুঞ্জয় কবচটা দেখতে পেলে।

—'এঁ্যা, এটা কি আবার!'

কমলা নিরুত্তর।

—'আরে ছি ছি ছি, এগুলো তোমরা এখনো পরো। এসব ফেলে দাও, ফেলে দাও। এসব পরে কোলকাতায় গেলে লোকে যে পাগল বলবে।'

কমলা তখনও কোন কথা কইলে না। বর আবার বল্লে—'দেখো, তুমি এক কাজ কর, তোমার এই কবচটা খুলে তুমি আলমারীর মাথার ওপর রেখে দাও, কেমন? 'চট্' করে, নাও, উঠে পড়।'

কমলা তখন ঘাড় হেঁট করে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে। বল্লে—'না, মা বকবে।'

শুনে বর ত হেসেই অস্থির। সে বল্লে—'সে কি, তুমি এতবড় হয়েছ, এখনও তোমায় মা বকবেন? আরে ছি ছি ছি, এও কি একটা কথা হ'ল! তা' যাক্, তুমি তা' হলে এক কাজ কর, ঐ কবচখানা খুলে এই জানলা গলিয়ে ফেলে দাও। দাও ফেলে, লক্ষ্মীটি!'

কমলা এবার রীতিমত ভয় পেয়েছে। ঘাড় হেঁট করে ধরা গলায় সে বল্লে—'না।'

'বর তখন কমলার খোঁপায় হাত দিয়ে খুব আদর করে বল্লে—"ছি, অমন কথার অবাধ্য হতে আছে! আমি ত শুনছি, তুমি অমন নও; তবুও কেন আমার সঙ্গে একগুঁয়েমী কচ্ছো। ছিঃ! কথা শোনো, গুরুজনে যা' বলে তা' শুনতে হয়।'

টং টং করে ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। পূবদিক তখন পরিষ্কার হয়ে আসছে। নেপথ্যে যোগেশবাবু ভীষণ গর্জ্জন করে উঠলেন। চারুবাবুকে সম্বোধন করে তিনি বল্লেন—'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। আজ আপনার মেয়েকে পাঠালেন না বটে, কিন্তু কেমন ওকে রাখতে পারেন তাই দেখে নেবো!' তারপর নিজের দলবলের দিকে চেয়ে বল্লেন—'চলো হে।' সেই সঙ্গে ভ্রূকুটী করে একবার যেন চারুবাবুর অনুচরদের দিকেও চেয়ে দেখ্‌লেন।

চারুবাবু কোন উত্তর দিলেন না, কেবল নেপথ্যে নিজের স্ত্রীর দিকে একবার ফিরে চাইলেন। এক-একবার তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল মেয়েকে পাঠাবার। শেষটা কি এই তুচ্ছ ব্যাপারে—কিন্তু ততক্ষণে যোগেশবাবুরা দরজা পার হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন।

বর তখন ক্ষেপে গেছে। শুভ-দৃষ্টির সময় যে চেহারা কমলার চোখে পড়েছিল, এখন তার চেয়ে আরও বিকট চেহারা করে বর কনের খোঁপা নিজের পাঁচটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে তর্জ্জন করে বল্লে—'ফেল্ পোড়ারমুখী, মাদুলীটা ফেল্ বল্‌ছি!'

কনে তখন চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

বারাণ্ডা থেকে মেয়েরা বাসর-ঘরে ছুটে গিয়েই দেখ্‌তে পেলে—পশ্চিম দিকের জান্‌লার রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে এক-খানা সরু লম্বা পা বাইরের বড় রাস্তার ওপর নামিয়ে দিয়ে বর তখন তার বাপের পাশে গিয়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল।

পূবদিকের আকাশ তখন সূর্য্যোদয়ের আনন্দে রঙীন হয়ে উঠেছে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতুলের প্রমোশন্

শ্রীমণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

ছাত্র-জীবনের বড় বড় 'এ্যাম্বিশনগুলিকে' ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া সেগুলিরই একটা বিকলাঙ্গ গলায় ঝুলাইয়া আজ সুদীর্ঘ পনেরো বৎসর যাবৎ নবগ্রামের পোষ্ট আফিসে ত্রিশ টাকা মাহিনায় কেরাণীগিরি সম্বল করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। বহুদিন পূর্ব্বেই মাতা পিতা এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভগ্নীর বিবাহও দেওয়া হইয়াছে। এখানে আছি একটি ছোটখাট খড়ের ঘর ভাড়া নিয়ে। ইহার সংলগ্ন একটি ছোট চালা আছে, তাহাতেই রান্নাবান্নার কাজ চলে। গয়লা, জেলে প্রভৃতি মাসিক বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিয়াছি, দুধ মাছ প্রভৃতি বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া যায়। রান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করে কাদম্বিনী। সে আমাদের বৃদ্ধা দাসীর কন্যা। বার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া মাতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তারপর এই সুদীর্ঘ পাঁচ ছয় বৎসর কাল আমার সঙ্গেই প্রবাসে কাটাইয়াছে।

নোটীশ আসিয়াছে সপ্তাহ কাল মধ্যে পোষ্টাল ইন্স্পেক্টর মিঃ পি ব্যানার্জ্জী ইন্স্পেক্‌সনে আসিবেন। এই উপলক্ষে পোষ্ট আফিসে মহা হৈচৈ কর্ম্মব্যস্ততা লাগিয়া গিয়াছে। আফিস ঘর সজ্জিত করা হইয়াছে। অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ কিছু কিছু আমোদ-প্রমোদ এবং স্বল্প জলযোগের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। আমি কোন কার্য্যেই যোগদান করি নাই। কেন উৎসাহের সহিত কার্য্য করি নাই তাহা বলিতে পারিব না। মনেতে যেন কেমন একটা আলস্যের ভাব আসিয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ কাল কেরাণীগিরি করিয়া শক্তি, উৎসাহ, উদ্যম সমস্তই যেন চলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বোপরি মিঃ পি ব্যানার্জ্জীর নামটা মনে হইলেই যেন কেমন একটা ঘৃণার ভাব হৃদয়ে জাগরিত হয়। যেন মনে হয়, এতগুলি নিরীহ সরলপ্রাণ কর্ম্মচারী অজ্ঞাতভাবে একটা অসৎ অনুপযুক্ত লোকের অভিনন্দনের আয়োজন করিতেছে। জানি না কেন এই কথা বারবারই মনে হইতেছে এবং সেইজন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মনিবের অভিনন্দনের আয়োজন করিতে পরিতেছি না। বোধ হয় এই কারণ যে, মানুষ ততক্ষণই অপরকে অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দন করিতে পারে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নিকটে জ্ঞাত থাকে যে, অভিনন্দিত ব্যক্তি প্রকৃতই অভিনন্দন যোগ্য।

যাহা হউক, ইতিমধ্যেই সস্ত্রীক ইন্স্পেক্টর-সাহেব আসিয়া পৌছিলেন। উৎসব, বাদ্য এবং প্রশেসন্ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করা হইল। আফিস-ঘরে পৌছিয়াই ইন্স্পেক্টর-সাহেব জানাইলেন যে,পশ্চিমে আরও অনেক পোষ্ট আফিস পরিদর্শনের কার্য্য বাকী থাকাতে তিনি সন্ধ্যার গাড়ীতেই নবগ্রাম ত্যাগ করিবেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খাতাপত্র, ফাইল প্রভৃতি দেখিয়া লইলেন। যে সমস্ত কর্ম্মচারী মাহিনা বৃদ্ধি বা কর্ম্মোন্নতির আশায় প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া অভিনন্দনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহারা নিরাশ হইল। বিদায় গ্রহণ করিবার সময় ইন্স্পেক্টরবাবু তাহার ক্ষুদ্র অভিবাদনে বলিয়া গেলেন যে, আজকালকার কর্ম্মচারীদের মধ্যে না কি সৎলোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না; অধিকাংশ কর্ম্মচারীই সততা রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না এবং সেইজন্যই তাহাদের উন্নতি এত সীমাবদ্ধ। তিনি অনেক কর্ম্মচারীরই পিঠ চাপড়াইয়া কর্ম্মে উৎসাহিত করিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—সততায় লক্ষ্য রাখো, কর্ম্মী হও, প্রভুভক্ত হও।

বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। মিঃ পি ব্যানার্জ্জীর উপদেশ এবং বক্তৃতাটা আমার কাছে যেন কেমন সারহীন, শঠতাপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে হইল,

যেন একটা ময়লার কুণ্ড হইত কৃত্রিম পদ্মফুলের গন্ধ প্রবাহিত হইয়াছিল। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। পর পর সেই একই কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতে লাগিল আমাদের সেই প্রতুল, আজ মিঃ পি ব্যানার্জ্জী-রূপে আমাকে সৎ এবং বিশ্বাসী হইবার জন্য উপদেশ দিয়া গেল। তাহার কাছে আজ আমি একজন অজানা অপরিচিত নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী। হায় ভবিতব্য! ভাবিতে ভাবিতে শৈশবের, কৈশোরের অনেক কথাও মনে পড়িয়া গেল। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম রবিবাবুর 'দুই বিঘা জমি।' সর্ব্বস্বহারা ভিখারী উপেনকেই প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারবাবু চোর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে উপেনের মুখের সেই দু'টি মর্ম্মবিদারক করুণ পঙ্‌ক্তি মনে পড়িল—

"তুমি মহারাজ সাধু হ'লে আজ,
আমি আজ চোর বটে!"

ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িলাম। চিন্তা-ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। দিনে ঘুমাইতে অভ্যস্ত নহি, কাজেই অধিকক্ষণ ঘুম হইল না। কিন্তু যতক্ষণ নিদ্রামগ্ন ছিলাম, একথা ঠিকই বলিতে পারি, বেশ শান্তিতেই ছিলাম। প্রকৃতির কোলে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এবং দেহটাকেও এলাইয়া দিয়া ঘুমানো বাস্তবিকই সুখের। বিশ্বের সুখ, দুঃখ, কৌতূহল কিছুই থাকে না। থাকে এক অনাবিল গভীর শান্তি।

পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কাদম্বিনী হ্যারিকেন্ দিতে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া তুলিল। দিনে ঘুমাইতে আমাকে সে কখনও দেখে নাই, তাই একবার জিজ্ঞেস্ করিয়া গেল—এত ঘুমুচ্ছ যে দাদাবাবু, অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

আলস্যের ভাব কাটাইয়া বলিলাম—না, অসুখ করে নি কাদু। হ্যাঁরে, কি রান্না করবি এবেলা?

—মাছের ঝোল বসিয়ে দিয়েছি দাদাবাবু।

আমি বলিলাম—ভেবেছিলুম আজ রুটি খাব, আচ্ছা, ঝোল্ যখন চাপিয়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গে ভাতই করে ফেল্।

কাদু চলিয়া গেল।

উঠিয়া চোখ মুখ ধুইয়া আসিলাম। সামান্য ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। বোধ হয় অমাবস্যা আর পূর্ণিমার মাঝামাঝি কোনও একটা তিথি হইবে। ঘরের চালেতে খড়ের উপর চন্দ্র-কিরণ পড়িয়াছে। আশ-পাশের ছোট বড় গাছগুলি সামান্য বায়ুর আঘাতে কাঁপিতেছে। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঘরখানাকে বেশ দেখায়। একটা সিগারেট্ মুখে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পাইন কাঠের হাল্কা ইজি চেয়ারখানা কাদু বাহিরে আনিয়া দিল। সুদীর্ঘ দেহখানাকে তদুপরি এলাইয়া দিলাম। দিবসান্তে, সারাদিনের সমস্ত কথা মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া একটা আলোড়ন উপস্থিত করিয়া দিল। মনে পড়িল আবার প্রতুলের কথা। প্রতুল, সে আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী, সহকর্ম্মী, আর এখন সে আসিল মিঃ পি বানার্জ্জীরূপে হ্যাটকোটধারী অপরিচিত মনিব সাজিয়া! আবার কবে দেখা হইবে, আর হইলেই বা চিনিতে পারিবে কি না কে জানে! এখনও বোধ হয় গাড়ী ছাড়ে নাই, ষ্টেশনে গেলে দেখা হইবে। আবার ভাবিলাম, গিয়াই বা কি হইবে? আমাকে চিনিতেই পারিবে না, আর চিনিতে পারিলেও আমার পোষাক-পরিচ্ছদ এবং নিম্ন পদের কথা ভাবিয়া অপরিচিতের ভান করিয়া থাকিবে।

কাদম্বিনীর মাছের ঝোল হইয়া গিয়াছিল। এবার ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া আসিয়া বলিল—দাদাবাবু, তুমি বসে বসে কি ভাবছ, কোনও কথাও বলছ না, আর হাসি-খুসীর ভাবও নেই। আজকে কে এসেছিল দাদাবাবু তোমাদের আফিসে, কোন গোলমাল হয় নি তো?

হাসির ভাব টানিয়া বলিলাম—তুই তো জানিস কাদু, আজ আমাদের আফিসে ইন্‌স্পেক্টর-সাহেব এসেছিলেন। না, কোন গোলমাল হয় নি, গোণ্ডগোল হবে কেন, সমস্ত ঠিকই দেখে গেছেন তিনি।

কাদু এত সহজে ছাড়িবার মেয়ে নয়, আবার

বলিল—তা' হলে অমনি করে বসে আছ কেন দাদাবাবু, বলবে না আমাকে ?

বলিলাম—না, কিছু না কাদু, ভাবছি দু'টি জীবনের কথা। একটির সঙ্গে একটির তুলনা কচ্ছি; কী সাদৃশ্য গোড়াতে! আর প্রান্তে বৈসাদৃশ্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত!

কাদু বুঝিতে পারে নাই কিছুই, তাই সমস্ত খুলিয়া বলিবার জন্য সে চাপিয়া ধরিল, যেন ইহা তাহাকে জানিতে হইবেই, তার পক্ষে অতীব দরকারী, পরম প্রয়োজনীয়।

ওদিকে হাঁড়ির ভিতরে ভাত ফুস্‌ফুস করিয়া উঠিল। কাদু তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। ফেন গালিবার জন্য হাঁড়িটাকে এক বিচিত্র উপায়ে থালার উপর কাৎ করিয়া বসাইয়া দিয়া চট্ করিয়া ফিরিয়া আসিল। আবার তাহার সেই আব্দার! তাহাকে বলিতেই হইবে। বলিল—দাদাবাবু, অন্যদিন তো তুমি সব কথাই আমাকে বলো, আজ বলছ না কেন? তোমার কথা শুন্‌লে আমিও যে তোমার দুঃখের অর্দ্ধেক পরিমাণ ভার নিতে পারি দাদাবাবু।

আমি কহিলাম—দুঃখ কিছুই নয় কাদু, অনেকদিনের পুরানো একটা ঘটনা মনে পড়াতে সামান্য একটু আশ্চর্য্য হয়েছি মাত্র। আচ্ছা, শুনবি তো শোন্।

আমি বলিলাম—সে অনেকদিনের কথা। তখন বাবা-মা জীবিত ছিলেন। কমলপুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়তুম। ক্লাসেতে ছাত্র বেশী ছিল না; অনুমান আট-দশজন হবে। এর মধ্যে আমি প্রায় অধিকাংশ পরীক্ষাতেই প্রথম হতুম, আর দ্বিতীয় হয়ে দাঁড়াত আর একটি ছেলে, তার নাম প্রতুল। পড়াশোনার ব্যাপার নিয়েই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ক্রমশঃ দু'জনের মধ্যে খুব ভাব হ'ল। ক্লাসে আমরা একত্র বস্‌তুম, আর দু'জনের সঙ্গে দু'জনের দেখাশোনা না হলে আমাদের একটি দিনও যেন কাটত না। প্রতুলকে আমি নাম ধরেই ডাকতুম, সে ডাকত আমায় দাদা বলে। বেশ সুখেই আমাদের দিন কাট্‌ত।

তখন বর্ষাকাল, খোলা মাঠে বৃষ্টিতে ভিজে আমার একবার হঠাৎ জর হয়ে গেল। ক'দিন স্কুলে যেতে পারি নি। হপ্তা দু'-এক পরে স্কুলে গেলাম, কিন্তু প্রতুলকে আর দেখ্‌তে পেলাম না। অনেক চেষ্টা-চরিত্র, খোঁজ-খবর কর্‌লাম। মাষ্টার-মশায়দেরে জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পেলাম না। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে কেউ বল্লে—লম্পটের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বল্লে—বোকারাম না বুঝে দুষ্কর্ম্ম করে ফেলেছে, এবার বুঝবে মজা! যা' হোক্, সকলের মন্তব্য শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে, প্রথম শ্রেণীর ক'জন দুর্দ্দান্ত দুশ্চরিত্র বালকের পাল্লায় পড়ে, প্রতুল ভদ্রপাড়ার রায় কমলকিশোর দত্ত-সাহেবের মেয়ে মিস্ চামেলী দত্তের সংস্রবে না কি কোন দুষ্কর্ম্ম করেছিল এবং দত্ত-সাহেবের রিপোর্টে হেডমাষ্টার মশায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ক'টির সঙ্গে তাকেও স্কুল থেকে 'রাসটিকেট্' করে বের করে দিয়েছেন।

কাদু উস্‌খুস করিয়া একটু নড়িয়া বসিল। বলিল—হ্যাঁ দাদাবাবু, আমাদের গৌরাঙ্গ পাঠশালা থেকেও একটি মেয়েকে দুষ্টুমীর জন্যে বের করে দিয়েছিল।

আমি বলিলাম—তারপর অনেকদিন গেল, প্রতুলের কোন খোঁজ-খবর নেই। তার বাবার সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল। বৃদ্ধ বল্লেন যে, প্রতুল না কি আর পড়বে না। বর্ত্তমানে মামাবাড়ীতেই আছে এবং ভবিষ্যতেও সেখানেই থাকবে, এবং তাঁদের জমিজমা ও তেজারতির কারবারে সাহায্য করবে।

আমি ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করলুম। উচ্চশিক্ষার জন্যে কলেজে ভর্ত্তি হওয়া ঠিক্ করলুম। তারপর হঠাৎ একদিন পথেতে দেখা হ'ল প্রতুলের সঙ্গে। রাস্তার ধারে একটা বিড়ির দোকানের প্রজ্জলিত দড়িতে উবু হয়ে নিজের মুখের বিড়িতে আগুন ধরাচ্ছিল। আমাকে দেখে সেই অবস্থাতেই বাঁ হাত তুলে ডাকলে। আমি এগিয়ে গেলাম। প্রথমে চিনতে পারি নি। তার চেহারা পূর্ব্বেও সুশ্রী ছিল না, কিন্তু এখন তার চেয়ে অনেক বেশী

বিশ্রী হয়ে গেছে। তার পোষাক-পরিচ্ছদ পূর্ব্বে অপরিষ্কার থাকলেও এখনকার মত এত ছেঁড়া, নোংরা, এবং সহস্র রকমের দাগ ও দুর্গন্ধময় ছিল না। পায়ে জুতো নেই, মাথায় বোধ হয় অনেকদিন তেল পড়ে নি, তাই চুল রুক্ষ হয়ে গেছে। সমস্ত মুখে দাড়ি এবং ময়লাতে যাচ্ছেতাই দাগ পড়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—দাদা, আমি প্রতুল। চিনতে পাচ্ছ তো?

আমি বল্‌লুম—চিন্‌তে পেরেছি। কিন্তু প্রতুল, এতদিন ছিলে কোথায়, আর এখনই বা এ অবস্থায় কোত্থেকে এসেছ?

প্রতুল শুক্‌নো হাসি হেসে বল্লে—এতদিন মামাবাড়ীতে ছিলাম দাদা। কিন্তু দেখলাম, সেখানে আমার পোষাবে না, তাই চলে এলাম। দেখ্‌ছ না কি চেহারা কি হয়ে গিয়েছে!

প্রতুল আরও জানালো যে, এ ক'দিন যাবৎ কমলপুরেই অবস্থান কচ্ছে। টাকা-পয়সার খুবই অভাব। এমন কি খাওয়া-দাওয়াও না কি রীতিমত হচ্ছে না। কোনমতে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, লজ্জায় না কি আমার সঙ্গে দেখা করে নি।

আমার সঙ্গে দেখা না করাতে আমি ধমক দিয়ে তাকে বল্‌লাম—প্রতুল, এ তোমার অন্যায়। এত কষ্ট পাবার আগে আমার কাছে যাওয়া তোমার নিতান্ত উচিত ছিল। তুমি শত অন্যায় অপরাধ কল্লেও আমার কাছে সর্ব্বদাই নির্দ্দোষ, একথা জেনো।

প্রতুল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। আমার পকেটে দুটো টাকা ছিল, বের করে তার হাতে দিয়ে বল্‌লাম—প্রতুল, এখন বাড়ীতে যাও। চুল ছেঁটে, জামা-কাপড় পরিষ্কার করে খেয়ে-দেয়ে নাও গে। তোমার কোন ব্যবস্থা করবার চেষ্টা আমি করব।

প্রতুল প্রথমে ইতস্ততঃ কর্চ্ছিল, তারপর টাকা দুটো নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

এদিকে আমি বাড়ীতে এসে বাবাকে ধরে বস্‌লাম তাঁদের পোষ্ট অফিসে প্রতুলকে একটা চাকরী ঠিক করে দেবার জন্যে। প্রতুলের বরাত ভাল, চাকরীর কথায় বাবা বল্লেন যে, তখন পোষ্ট অফিসে একজন বেয়ারার পদ শূন্য যাচ্ছে। উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক পেলেই নিযুক্ত করে দেবেন। পাঁচ টাকা মাইনেয় প্রতুল সেই পদে ঢুকে পড়ল। বাবা বলে দিলেন যে, প্রতুল লেখাপড়া জানা ছেলে, তিনমাসের মধ্যেই চেষ্টা করে তিনি তাকে পনেরো টাকা মাইনেয় একটি পিয়নের পদ নিয়ে দেবেন।

কিছুদিন পরে আমি কলেজে ভর্ত্তি হলাম। পড়াশুনা চল্‌তে লাগ্‌ল, আর এদিকে প্রতুল খড়ের ছোট্ট পোষ্ট-অফিসের ঘরখানা দু'বেলা ঝাঁড় দিয়ে, বাবুদের খাতাপত্র এগিয়ে দিয়ে, তাদের ফাই-ফরমাস খেটে তা'র কাজ চালাতে লাগ্‌লো। প্রতুলের চাকরীর শীঘ্রই উন্নতি হ'ল, কিন্তু আমার হ'ল এদিকে মহা সর্ব্বনাশ! ক্রমাগত সাতদিন বিসূচিকার অসহ্য যাতনা ভোগ করে' পিতৃদেব তুলসীতলায় তাঁর জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর আর কি। অদৃষ্টে যা' ছিল তাই হ'ল, পড়াশুনা গেল—জীবনের উচ্চাশা উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমস্তই অতলে তলিয়ে গেল। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃ চাকরী নিয়ে পোষ্ট অফিসে ঢুকে পড়লাম। জীবন-সংগ্রামের যা' কিছু চেষ্টা উদ্যম সেই হ'ল প্রথম, আর সেই শেষ। আজ অবধি পোষ্ট অফিসের চিরপ্রিয় ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরিই আমার উপর তার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং প্রকৃত স্নেহ প্রমাণ কর্ত্তে বিদ্যমান রয়েছে।

কাদু এতক্ষণ কাণ পাতিয়া অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেছিল, এবার উঠিয়া ঘরেতে হ্যারিকেনের শিখাটা কমাইয়া দিয়া আসিয়া আবার বলিল—বলো।

আমি আরম্ভ করিলাম—তখন কমলপুর পোষ্ট অফিসে কর্ম্মচারী ছিলুম সবশুদ্ধ আমরা তিনজন। আমি, প্রতুল, এবং বৃদ্ধ পোষ্ট মাষ্টার তারিণীবাবু। প্রত্যেকেরই আলাদাভাবে নির্দ্দিষ্ট করা কাজ ছিল, আর আমরা খুব শৃঙ্খলার সহিত সকলেই নিজেদের কাজ করে যেতুম। সন্ধ্যাবেলা অফিসের কাজ সমাপ্ত হলে দোর বন্ধ করে বাড়ী চলে যেতাম। যেদিন অফিসের বেশী টাকা-পয়সা থাকত, সেদিন প্রতুল খাওয়া-দাওয়ার পর অফিস-

ঘরেই মাচানের উপর শুয়ে থাকত। সেখানে তার জন্যে একটা বিছানা সর্ব্বদাই গুটানো থাকৃত।

এভাবে আমরা সকলেই বেশ সুনামের সহিত কাজ করে যাচ্ছিলুম। কিন্তু শেষ কালটায় প্রতুলের কাজে কোথাও কোথাও ত্রুটি দেখা যাচ্ছিল। গ্রামের চিঠিপত্র বিলি করবার আগে মাঝে মাঝে দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে গ্রামবাসীদের চিঠিপত্র, এন্‌ভেলপ্ প্রভৃতি খুলে পড়্‌তে দেখা যেত। ক্রমশঃ লোকজনের কাছ থেকে পোষ্টমাষ্টার-মশায়ের কাছে তা'র দু'-একখানা অসততার অভিযোগও এল।

বৃদ্ধ তারিণীবাবু প্রতুলের পিঠে হাত চাপড়ে স্নেহের স্বরে বল্লেন—প্রতুল, তোমরা ছেলেমানুষ, কাজ কর্ম্ম শেখ নি, তাইতে লোকে অভিযোগ কচ্ছে। দেখো বাবা, ভুলচুক যেন কোথাও না হয়, পোষ্ট অফিসের কাজ, বড় দায়িত্বপূর্ণ।

আমিও প্রতুলকে বুঝিয়ে বল্লুম—পরের চিঠি খুলে পড়া তোমার অন্যায়।

ক'দিন পরের কথা। সেদিন রবিবার। কাজেই রায় কমলকিশোর দত্ত-সাহেবের নামে যে চার হাজার টাকার মনিঅর্ডারটি এসেছিল, তা' তাঁকে খালাস করে দেওয়া গেল না। এত টাকার দায়ীত্ব এভাবে নেয়াও চলে না, কাজেই বিকেলবেলা তারিণীবাবুর বাড়ীতে গিয়ে টাকার কথাটা আবার ভাল করে পরিষ্কার-ভাবে জিজ্ঞেস কল্লুম। তারিণীবাবু হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন—তোমরা ছেলেমানুষ, সহজেই ভয় পেয়ে যাও। কাজ করে করে বুড়ো হয়ে গেলুম বাবা, কমল-পুরের পোষ্ট অফিস থেকে একটি পয়সা এদিক-সেদিক হয় নি। তোমার ভয় নেই কিছু, নিশ্চিন্ত মনে বসে থাক গে।

কথা শেষ করে চলে আসছি, এমন সময় পেছন থেকে মাষ্টারবাবু ডেকে বল্লেন—শোন বাবা, একটা কথা শোন। আমি ফিরলুম্। উনি আস্তে আস্তে বল্লেন—কী অধঃপতনই না হয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের! কাছে আসতেই আমার হাতে দুটো কাগজ ফেলে দিয়ে একটু স্পষ্ট করেই বল্লেন—আচ্ছা, দেখ তো বাবা, পোষ্ট অফিসের ডেস্ক্-এর নীচে এ সব চিঠি কোত্থেকে আসে। আমি আজ কুড়িয়ে পেলাম। ছি, ছি, কি দিনকালই না পড়েছে!

আমি চিঠিগুলি খুলে পড়লাম। আগেরটি গোলাপী রং-এর প্যাডের কাগজে লেখা। প্রেয়সী লিখেছে তার প্রিয়তমকে। অসংযম উচ্ছ্বাস আর লালসাপূর্ণ আবেদনে ভরা। দ্বিতীয়টি আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ছে। একটি নীল প্যাডের পুরু কাগজে লেখা চিঠি। প্রেমাস্পদ কর্ত্তৃক প্রেয়সীকে লেখা।

মিস্ চামেলী দত্তের করকমলে—

প্রিয়তমে!

চামেলী-কুঞ্জ চিরতরে মন হরণ করে বসে আছে। তথায় অন্য কোন পুষ্পের গন্ধমাত্রও প্রবেশ করতে পারে না। প্রেয়সী প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার তরে মন উতলা ভাবে ঘুরছে। কিন্তু প্রিয়তমে, আজ মধ্যরাত্রির *** থেকে তোমায় বঞ্চিত কর্ত্তে বাধ্য হলুম। পিতৃ আদেশে অন্যত্র চলে যাচ্ছি। এ ক্ষুদ্র লিপি দ্বারা পূর্ব্বেই জানিয়ে দিলুম, একা এসে যেন রাত্রিকালে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে থেকো না। গুণ্ডা বদমাইসের তো অভাব নেই। কালই ফিরে আসব। তোমায় একেবারে রেহাই দেব বলে মনে করো না। নিশীথ রাতে বকুলতলায় সুদে-আসলে পাওনা-গণ্ডা আদায় করে ছাড়বো। ইতি,

তোমার মনপ্রাণী সুধীর

পড়া শেষ হতেই তারিণীবাবু আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বল্লুম—মাষ্টার-মশায়, এ চিঠিগুলা আমার কাছে থাক্ এখন, এগুলোর খোঁজ-খবর নিয়ে যা' কিছু বিহিত কর্ত্তে হয় আমিই করব।

বেরিয়ে পড়লাম। এ যে প্রতুলের কাণ্ড এটা বুঝতে আর বিন্দুমাত্রও বাকী রহিল না। সে ছাড়া চিঠিপত্র খুলবে আর কে? চামেলী নামটাও পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়লো যে, কমলকিশোর দত্ত-সাহেবের মেয়ের নামই তো চামেলী, যার সংশ্রবের রিপোর্টে প্রতুলকে

ইস্কুল থেকে 'রাসটিকেট' করা হয়েছিল। দুর্ভাগার কথা ভাবলুম। এখন চাকরীও যাবে, আর সমস্তই যাবে! বেচারা প্রতুল! আবার তাকে রাস্তায় বেরুতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, বাড়ীতে ফিরে এলাম। দাওয়াতে পা দিতেই মা বল্লেন যে, বিকেলবেলা হারু (মেসোমশায়ের চাকর) না কি এসে খবর দিয়ে গেছে যে, মাসীমার কলেরা হয়েছে। অবস্থা শোচনীয়, তাই মাকে দেখতে চায়। খবর পেয়ে অবধি মা তো কেঁদেই অস্থির। একমাত্র স্নেহময়ী বোন্ সেও বুঝি এবার বিদায় নেয়।

মা'র কান্না থামালুম। বল্লুম—কেঁদে কি হবে মা, যা'র যখন ডাক আসবে, যেতেই হবে। দেখ্ছো না চোখের উপর বাবা চলে গেলেন—তারপর সেদিন অনুলতাও চলে গেল আমাদের সমস্ত মায়া কাটিয়ে!

রাত্রি বারোটায় একটা গাড়ী ছিল। দু'খানা কম্বল আর একটা সুটকেশ সম্বল করে মা-ছেলেতে বেরিয়ে পড়লুম্। ষ্টেশন তিন মাইল দূর। শীতের দিন, তার ওপর রাত্রিবেলায় এতটা হেঁটে যেতে হবে! কম্বল দুটো দু'জনে গায়ে জড়িয়ে নিলুম। ষ্টেশনের পথের ধারে রায় কমলকিশোর দত্ত-সাহেবের বাড়ী। প্রকাণ্ড শাদা বাড়ী। কার্ত্তিকের শিশিরে ভিজে চন্দ্রকিরণে জলজল কর্চ্ছে। তারই সুমুখে ফুলের বাগান। স্থানে স্থানে বেঞ্চি পাতা। তখন শেফালী ফুলের গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশে ভেসে আসছিল। হঠাৎ কিসের একটা গোঁয়ানো শব্দে পাশে ফিরে তাকালুম। চোখে পড়ল একটা মানুষের দেহ। বেঞ্চির ওপর দোলায়মান অবস্থায় উপবিষ্ট। ক্ষণে ক্ষণে এদিক-ওদিক কাঁপছে। জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলছে। ভাবলুম, পাগল বা মাতাল, তাই ঠাণ্ডাতে বসে বসে বাজে কথা বকছে। কিন্তু অস্পষ্ট চামেলী নাম শুনে একটু কৌতূহল হচ্ছিল, সন্দেহও হচ্ছিল। যেন মনে হচ্ছিল পরিচিত স্বর। যাক্, বাধ্য হয়েই কৌতূহল চেপে সরে পড়তে হ'ল। মা সঙ্গে, আর ওদিকে রাত্রিও এগারটা বেজে এল। গাড়ীর দেরী মাত্র এক ঘণ্টা।

মাসীমার বাড়ী নাছিরাবাদে। কমলপুর থেকে সাত মাইল দূরে। খুব শীঘ্রই পৌছে গেলাম। মাসীমার অবস্থা তখন অনেকটা ভালোর দিকে ফিরে গিয়েছিল। তাঁকে অনেক পরিমানে সুস্থ দেখে আমি ভোর পাঁচটার গাড়ীতে ফিরে এলাম। ষ্টেশনে নেমেই মনে পড়ল সেই লোকটার কথা। গায়ের কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে হেঁটে চল্লুম। সেই লোকটাকে দেখবার জন্যে ভাল করে বাগানের ভেতরটা একবার তাকিয়ে নিলুম। কেউ নেই। বেরিয়ে এলাম। খুব শিশির পড়ছিল, পথ ঘাট সব ভিজে গেছে। হঠাৎ দেখ্লুম দূরেতে একটা লোক মাটিতে বুক ঘসে ঘসে পথ হাঁটছে। তখনও সকাল হয় নি, রীতিমত অন্ধকার ছিল, তাই প্রথমে তাকে চিনতে পারলুম না। এগিয়ে গেলুম। ভাল করে তাকিয়ে বল্লুম তুমি কে? আমার গলার স্বর শুনে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই সে যেন একেবারে দমে গিয়েছিল। চুপ করে রইল। তার বাকরুদ্ধ হয়ে এসেছে—কথা বল্তে পাচ্ছে না। আমি চিনলুম, সেই প্রতুল।

আম্তাআম্তা করে সে বল্লে—দাদা, অফিস ঘরেতে ঘুমিয়েছিলুম, হঠাৎ গুণ্ডারা আমাকে মেরে এই রাস্তার ওপর এনে ফেলে গিয়েছে।

তার কথা আমার মোটেই বিশ্বাস হ'ল না, উপরন্তু মনে পড়ে গেল সেই চিঠি দুটোর কথা—যা'তে প্রণয়ী তার প্রণয়িনীকে জানিয়েছে বিদায় সম্ভাষণ। সেই রাত্রে বকুল বাগানে তাদের সাক্ষাৎ হবে না। আর প্রতুল সেই চিঠিই গোপন করে রেখেছে।

আমি বজ্রকণ্ঠে প্রতুলকে বল্লুম—মিথ্যাবাদী! তুমি সত্যি কথা বলো, নয়তো তোমাকে আমি জেল খাটাবো। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করো না প্রতুল, আমি সমস্তই জানি। মধ্যরাত্রে তুমিই সুধীর সেজে চামেলী দত্তের জন্যে অপেক্ষা করছিলে। আর তুমিই সুধীরের চিঠি গোপন করে, আবার ভুলক্রমে সেগুলো অফিস ঘরেই ফেলে রেখে এসেছ।

প্রতুলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল! ব্যথা-জর্জ্জরিত দেহে কেঁপে কেঁপে হঠাৎ সে মাটিতে আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে উঠে বসল। জিজ্ঞেস্

বল্লুম—প্রতুল, সত্যিকথা বল্‌বে, না অধঃপাতে যাবে, কোন্‌টা চাও?

প্রতুল ভাল করে সোজা হয়ে বসে বল্লে—দাদা, আমি আশৈশব তোমার সহচর! তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নেই! আমি সমস্তই তোমাকে বলব।

প্রতুল যা' বল্লে তার তার মর্ম্ম এই যে, কিছুদিন যাবৎ সুধীর নামক কোনও যুবক রায় কমলকিশোর দত্ত-সাহেবের মেজো মেয়ে মিস্‌ চামেলী দত্তের সঙ্গে প্রেম-পত্রাদি লিখতো। প্রতুল গোপনে সেগুলো পড়তো আর আটা লাগিয়ে পরে ডেলিভারি কর্‌ত। আগে থেকে চিঠি-পত্র লিখে মাঝে মাঝে সুধীর আর চামেলী রায়-সাহেবের বকুল বাগানে মিলিত হ'ত এবং সে রাত্রে তাদের মিলনের কথা ছিল। কিন্তু দৈবক্রমে সুধীরের আগের চিঠিখানা পড়েছিল এসে রায়-সাহেবের বড় ছেলে অতীনের হাতে। অতীন সমস্ত বুঝতে পেরে, গুপ্ত প্রেমিক সুধীরচন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্যে তার বোন্‌কে বাড়ীতে আটকে রেখেছিল। তারপর গভীর রাত্রে লোকজন নিয়ে বকুল বাগানে এসে প্রেমিকপ্রবর সুধীরচন্দ্রের স্থানে প্রতুলচন্দ্রকে দেখে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে রাস্তাতে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এত বেশী মাত্রায় প্রহার পড়েছিল যে, প্রতুল সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছিল না, তার সর্ব্বশরীরের চামড়া ফেটে রক্ত পড়ছিল। হঠাৎ আমার পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। বল্লে—দাদা, তুমি ছাড়া আমাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করবার আর কেউ নেই! তুমি আমাকে রক্ষা কর!

আমারও মন গলে গেল। শত হোক্‌, ছেলেবেলা থেকে সে আমার সহপাঠী। বল্লাম—ঘরে চলো, রাস্তায় পড়ে থেকে আর কাজ নেই।

তাকে পোষ্ট অফিস ঘরে নিয়ে গেলাম। সেখানে তার বিছানা ছিল। বল্লাম—শুয়ে থাক এই মাচানের ওপর। এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি, দশটার সময় ফিরে এসে তোমাকে বাড়ীতে পাঠাবো। এর মধ্যে যেন বেরিয়ে পড়ো না আবার। ঘরেতে টাকা-পয়সা রয়েছে।

তখন বেশ ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় লোহার সিন্দুক খুলে টাকাগুলি একবার দেখে নিলাম। ঠিকই ছিল।

বাড়ীতে এসেই চান করে নিলুম। মা মাসীমার বাড়ী থাকাতে নিজেকেই রান্নাবান্না কর্ত্তে হ'ত। খেয়ে-দেয়ে অফিসে যেতে কিছু দেরী হয়ে গেল। কিন্তু হায়, সকালবেলায় যে অফিস দেখে গিয়েছিলাম, সে অফিস আর নেই! ঘরের সোনার বেড়া ভাঙ্গা। লোহার সিন্দুকের তালা ভাঙ্গা। টাকাগুলি সব চুরী গেছে। প্রতুলের হাত পা চৌকীর সঙ্গে বাঁধা। পূর্ব্বরাত্রির প্রহারে শরীরের যে সব স্থানে থেঁত্‌লে চামড়া উঠে গিয়েছিল, মনে হ'ল সেই থেঁতলানোগুলোকে রগড়ে রগড়ে আরো রক্ত বের করা হয়েছে। মুমূর্ষু রোগীর মত সে একরকম গোঁয়ানো শব্দ কর্চ্ছিল। আমি ব্যাপার দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারলুম যে, সমস্তই প্রতুলের কারসাজি এবং সেই সমস্ত টাকা-পয়সা চুরি করেছে।

সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। ইতি-মধ্যেই প্রতুল সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, গভীর রাত্রে ডাকাতের দল ডাকঘর আক্রমন করেছিল এবং তারই ফলে এ হেন বিভ্রাট ঘটেছে। বৃদ্ধ তারিণীবাবু হাঁক ছেড়ে বল্‌লেন যে—প্রতুলের মত সাহসী লোক ছাড়া অন্য কেউ হলে এমন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের সঙ্গে না কি লড়্‌তে সাহস পেত না মধু খুড়ো, রামতনু পাল প্রভৃতি অনেক লোকই জমে গিয়েছিল। রায়সাহেবও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ কর্লেন—এমন দুর্দ্ধর্ষ দস্যু না কি সে অঞ্চলে কোনদিনও হানা দেয় নি। জীবনে যা' দেখা যায় নি, তেমনি কাণ্ডই না কি ঘট্‌ল।

আমি সন্দিগ্ধ চোখে চতুর্দ্দিক তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। হঠাৎ চোখে পড়ল ডাকপিয়নের বর্ষাটা ফলক ভাঙ্গা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। বুঝ্‌লুম, সিন্দুকের

তালা ভাঙ্গতে প্রতুলচন্দ্র ওটার সাহায্য নিয়েছে। ব্যাপারটা সকলকে বল্‌তে গেলুম। টাকা চুরী গিয়ে তারিণীবাবুর দর্প চূর্ণ হয়েছে, তাই তিনি বাধা দিয়ে বল্‌লেন—এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই বাবা, এর বিহিত আমি করব। তুমি প্রতুলের সেবা-শুশ্রূষা আর চিকিৎসার বন্দোবস্ত কর গে।

প্রতুলের দিকে তাকালুম—তার চক্ষু রক্তবর্ণ। কাছে ডেকে সে ইঙ্গিত করে বল্‌লে—যদি প্রাণের ভয় থাকে, তবে এ নিয়ে আর কিছু করতে যেও না। এখনও তোমার নাম ডাকাতের দলে পড়ে নি। যদি গোল কর, তা' হ'লে বলে দেব, আর সঙ্গে-সঙ্গেই হাতে কড়া পড়বে। তাই চাও কি?

প্রতুলের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলুম। জীবনভোর যাকে ন্যায় অন্যায়ের বিচার না করে কেবল সাহায্যই করে এসেছি, এই কি সেই প্রতুল! সামান্য টাকার জন্য সে আজ তার নির্দ্দোষ বন্ধুকে যত বড় যাতনা, কষ্ট এবং মর্ম্মবেদনা দিলে জানি না কোন মানুষ তার আশৈশব আপদ-বিপদে সাহায্যকারী বন্ধুকে এতবড় মর্ম্মবেদনা দিতে পারে কি না। একবার ভাবলুম তাকে বুঝিয়ে বলি যে, প্রতুল, অর্থই জীবনের সর্ব্বস্ব নয়। সামান্য অর্থের লোভে উন্মাদ হয়ে তুমি যে কার্য্য করেছ, মনুষ্যত্বের যে নিদারুণ অবমান করেছ, কোন মানুষ তা' করে না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার মনে হ'ল যে—অর্থের লোভে সে একবারে পাগল হয়ে গিয়েছে, এমন কি যে ক্ষণকাল মধ্যে বিবেকের এতবড় অবমাননা করে ফেলেছে, তার হয় ত বিবেক বলে কোন বালাই নেই, এবং তাকে উপদেশ দিয়ে বোঝানও হয় তো আমার পক্ষে অসম্ভব।

একটি মাত্র শব্দ না করে বাড়ী চলে এলাম। হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলুম ভবিষ্যতের দিকে। পৃথিবীতে অনবরত নানা প্রকারের লোকদ্বারা বিচিত্র রকমের সৎ-অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু সময় কারও জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে না।

দু'-একদিন পরে একখানা খবরের কাগজে দেখলাম—বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান্ আত্মত্যাগ।

"মনিবের ধনরক্ষার্থে দুর্দ্দমনীয় দস্যুদলের সহিত আপ্রাণ লড়াই। অবশেষে দস্যুদল কর্ত্তৃক লৌহ সিন্দুক ভগ্ন করে ডাক-বিভাগের চার সহস্র মুদ্রা লুণ্ঠিত।"

পোষ্টমাষ্টার তারিণীবাবুও রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে—প্রতুলচন্দ্র নিতান্ত বিশ্বাসী, সরল এবং চরিত্রবান কর্ম্মচারী। নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী হয়ে ডাক-বিভাগের ধনরক্ষার্থে সে আত্মত্যাগের যে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, ভারতের সমস্ত ডাকহরকরাদের এই দৃষ্টান্তকে আদর্শ বলে মস্তকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও "আত্মত্যাগের আদর্শ দৃষ্টান্ত" নামক একটি প্রবন্ধ দেখা গেল। সম্পাদক-মশায় লিখেছেন যে, "বর্ত্তমানে পুলিশ বিভাগের অনবধানতার জন্যই না কি এমন মারাত্মক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতুলচন্দ্র সাহসী, সরল, সত্যবাদী, রাজভক্ত এবং প্রভুভক্ত ভৃত্য বলেই স্বীয় জীবন বিপন্ন করে দস্যুদলকে বাধা দিতে গিয়েছিল। দস্যুদলের নিদারুণ প্রহারে বর্ত্তমানে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কাজেই বর্ত্তমানে অন্ততঃ পক্ষে মাসাধিক কাল তার বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন। তার চিকিৎসা-ব্যয়ও ডাক-বিভাগেরই বহন করা কর্ত্তব্য। আমরা এক্ষণে আশা করি যে, এই তরুণ সাহসী কর্ম্মচারীকে অধিক মাহিনায় উচ্চপদে উন্নীত করে ডাক-বিভাগ তার প্রতি স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে কুণ্ঠিত হবে না।"

সপ্তাহখানেক পরে একদিন পোষ্ট অফিসে বসে চিঠি-পত্রে ছাপ দিচ্ছিলুম, এমন সময় তারিণীবাবু একখানা কাগজ হাতে নিয়ে বল্‌লেন,—এই দেখো জেনারেল পোষ্ট অফিসের চিঠি এসেছে।

তিনি আমায় পড়ে শোনালেন, জেনারেল অফিসার "ডাকাতির জন্য দুঃখিত হয়েছি। আপনাদের সঙ্গে লিখেছেন—উক্ত বিষয়ে আন্তরিক দুঃখ জানাচ্ছি। অফিসের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কা'কেও দায়ী করব না।

পরবর্ত্তী মাস থেকে অফিস পাহারা দেবার জন্যে ছুটো দরোয়ান স্যাংসন্ করলাম। ইতি, বিশ্বস্ত—(স্বাঃ)"

পড়া শেষ হতেই তারিণীবাবু আনন্দের সহিত আমার হাতে গেজেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন—এই দেখো, পড়ে দেখো, প্রতুল কেমন উন্নতি করে গেল।

পড়লুম, লেখা রয়েছে—মিঃ প্রতুলচন্দ্র বানার্জ্জী স্বীয় জীবন বিপন্ন করে ডাক-বিভাগের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যে উচ্চ আদর্শ দেখিয়েছে, তজ্জন্য পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট্ তার নিকট কৃতজ্ঞ। তার চিকিৎসার্থ উক্ত বিভাগ হতে তাকে এক হাজার টাকা এবং একমাসের ছুটি মঞ্জুর করা হ'ল। তৎসঙ্গে তাকে বর্ত্তমান পদ হ'তে আড়াই শত টাকা মাহিনায় বিভাগীয় ইনস্পেক্টরের পদে প্রমোশন দেওয়া হ'ল। ছুটির পরের মাস হতেই তাকে কার্য্যে যোগদান করতে হবে।

পড়া শেষ হতেই তারিণীবাবুর দিকে তাকালুম। আনন্দে উৎসাহে বৃদ্ধের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলবার ইচ্ছে হ'ল না।

কেবলমাত্র বল্লুম—তারিণীবাবু, আমার আর এখানে চাকরী কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে না, একটা বদ্‌লীর দরখাস্ত কর্ত্তে হবে।

তারিণীবাবু গম্ভীরভাবে একটা শব্দ কল্লেন—হুঁ।

তারপর থেকে এ পর্য্যন্ত নবগ্রামেই আছি। সেই চাকরীই এখনও কচ্ছি এ সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধরে। এতদিন কোন ইন্‌স্পেক্টর আসেন নি। সেদিন যিনি হ্যাটকোট পরে মিঃ পি বানার্জ্জীরূপে এসে পিঠ চাপড়ে সৎ, সাধু এবং মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত হতে উপদেশ দিয়ে গেলেন, তিনিই সেই ডাকঘরের অর্থ অপহরণকারী, লম্পট, চামেলী রূপমুগ্ধ প্রতুলচন্দ্র।

সময়ে সময়ে ভগবানের বিচিত্র মহিমা দেখে বিস্ময়ে চম্‌কে উঠি, হতবাক্ হয়ে যাই। আজও তাই দেখ্‌ছিলুম যে, প্রতুলের ভেতর দিয়ে অকৃতজ্ঞতার একটা জ্বলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল। আশৈশব যাকে সুহৃদ ভেবে সাহায্য করে এলাম, সে মানুষ নয়, একটা নরাধম পাপিষ্ঠ। আবার অর্থবলে, ধার্ম্মিকের ভান ক'রে তার পাপপূর্ণ হাতটাকে পবিত্র নামে অভিহিত ক'রে, আমারই মাথার ওপর চাপিয়ে দিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হ'ল না।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল।

গল্প শুনিয়া কানুর ঘুম চলিয়া গিয়াছিল। সে যেন আমার বেদনাকে স্বীয় অন্তরের সঙ্গে মিশাইয়া আপনার করিয়া লইয়াছে—যেন ডুবিয়া গিয়াছে গল্পের মধ্যেই এবং বেড়াইতেছে গল্পের ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই।

একবার স্ফুটকণ্ঠে সে বল্লে—দাদাবাবু, দানকরা পুণ্যের কাজ, কিন্তু মানুষ এই পুণ্য-কাজের ফলস্বরূপ পুরস্কারের বদলে দুঃখই পেয়ে থাকে বেশী। তা'র কারণ, তাদের দানের পেছনে থাকে মস্ত একটা আশা, যাতে ব্যাঘাত লাগা কিছু আশ্চর্য্য নয়, আর সেই ব্যাঘাতের শেষ হয় একটা গভীর দুঃখে এবং মনোকষ্টে।

আমি বল্‌লাম—তা'র মানে?

কানু কহিল—এর মানে অতি পরিষ্কার দাদাবাবু। প্রতুলবাবুকে সাহায্য করবার আগে যদি তুমি একবার ভেবে নিতে যে, তাকে সাহায্য কচ্ছ সাহায্য করা দরকার বলে, অন্য কোন কারণে নয়, তা' হলে তা'র শত দুর্ব্যবহার, শত অবহেলা, শত অধঃপতনেও তোমার মনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ কিংবা যাতনা উপস্থিত হ'ত না, যেমন রাস্তার অপরিচিত লোকের উন্নতি অবনতি সুখ-দুঃখ আমাদের হৃদয়ে তেমন ভাবান্তর আন্‌তে পারে না।

আমি বলিলাম—ঠিক্ বলেছ কানু। অনেক রাত হ'তে চল্‌ল, এবার খাবার বন্দোবস্ত কর।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

কার ভাগ্যে ?

শ্রীমান্ ব্রতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপে মুগ্ধ হইয়া অলকাকে বিবাহ করি নাই। অর্থলোভে কুরূপাকে জীবন-সঙ্গিনী করি নাই। ঝোঁকের মাথায় উভয়ের যোগসূত্র একত্র গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই। তবু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—অলকা আমার গৃহলক্ষ্মী।

পুরী গিয়াছিলাম। ভ্রমণে নয়, রথে বামন দেখিয়া পুনর্জন্মের পথ রোধ করিতে নয়, সাথী হইয়া কাহারও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও নয়। গিয়াছিলাম রথ চালাইতে।

পুলিশের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী আমি—সাব্ ইন্‌স্পেক্টর। নিয়োগ-পত্র খুব বেশীদিনের নয়, তথাপি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এ দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

জনা চাল্লিশেক পুলিশ-পদাতিক লইয়া যাত্রা করিলাম। আকাশের অবস্থা সেদিন মোটেই ভাল নয়। কালো মেঘগুলার হুড়াহুড়ি ছিল না সত্য, কিন্তু একটা জমাট্ বাঁধা রুদ্ধ বেদনার গুমরান ভাব বিদ্যমান। সমুদ্র-পথ হইয়া সিং দরওয়াজায় যাইবার আদেশ পাইয়াছিলাম।

আজ অশান্ত সমুদ্রের পাগলামী কিছু বেশী করিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। জল ও আকাশ উভয়ের কোনস্থানে আরম্ভ ধরা দায়। কেবল ফেনিল তরঙ্গের উন্মত্ত রঙ্গভঙ্গে কথঞ্চিৎ পার্থক্য অনুভূতি হইতেছিল এই যা'। কিন্তু ঝড়ের প্রবলতা চক্ষু ধাঁধিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টির পথে যে বাধার সৃষ্টি করিতেছিল, তাহাতে পরীক্ষার পথ একেবারেই যে ব্যাহত হইয়া গিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

পথের উপর একজন বৃদ্ধ ইংরাজ ভদ্রলোক লাঠিতে ভর করিয়া প্রাণপণ প্রযত্নে উন্মত্ত তরঙ্গাবয়বের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মুখে তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। তাঁর সে দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া তরঙ্গায়তনের মাঝে চাহিলাম। যা' দেখিলাম তাহাতে স্থির থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া উন্মত্ত ফেনিল সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

ক্ষণিক উন্মত্ততায় কি যে করিতে গিয়াছিলাম, কি যে করিতে জীবন পণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তীরে ফিরিলাম, তাহা তখন জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত একেবারেই প্রকাশ করিতে পারিতাম না। তীরে পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাগ্রহ পথ নির্দ্দেশে আমার জয়লব্ধ রত্নটীকে সাহেবের কামরায় আনিয়া শোয়াইয়া দিয়া, আমার চাকরীর কর্ত্তব্য পথে পা বাড়াইলাম।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিন্তু এত সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না, আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এ কাজের পর একটা পেগ—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "ধন্যবাদ! জীবন থেকে ও জিনিসটা বাদ দিয়েছি—না, আপনাকে শত ধন্যবাদ!"

লোকটী তৃপ্তির স্বরে বলিলেন, "ভাল, কিন্তু এক কাপ চা।"

বলিলাম, "চা-এর অপেক্ষা কর্ত্তব্য ঢের বড়—মাফ করবেন আমায়, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।"

বলিলাম সত্য, কিন্তু অত সহজে তাঁর হাত এড়াইয়া চলিয়া আসিতে পারিলাম না। তাঁহার সযত্নে তুলিয়া দেওয়া কাপ এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সিং দরওয়াজায় আসিয়া পৌঁছিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেকখানিই পিছাইয়া গিয়াছিল। আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ঘড়ি খুলিয়া আমায় তা' দেখাইয়া দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা যে কত গর্হিত সে সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া কার্য্যে অবহেলার শাস্তিস্বরূপ ত্রিশ টাকা জরিমানা করিলেন।

অবহেলা যে করি নাই, জোর করিয়া সে কথা বলিবার সপক্ষে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না, মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। একজন প্রবীন ইন্স্পেক্টর গম্ভীর চালে বলিলেন, "বুঝেছ হে ছোকরা, এটা পুলিশ-লাইন, কাজ বজায় রেখে যা' কিছু কর কেউ আপত্তি করবে না, তবু তোমার ভাগ্য ভাল যে, সসপেণ্ড হলে না।"

দু'-চারজন সমপদস্থের শ্লেষ উক্তি কাণে আসিয়া পৌঁছাইতেছিল, অন্তরের বদ্ধ উত্তেজনা বহু কষ্টে চাপিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পাঁচ মিনিটও হয় নাই, কাহার কোমল আহ্বানে চক্ষু তুলিলাম। দেখিলাম, ম্যাজিষ্টেট স্বয়ং। ভাবিলাম, প্রবীন সহকর্ম্মীর সসপেণ্ডের আশীর্ব্বাদ বোধ হয় এতক্ষণে ফলিতে চলিল। চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া দেখিলাম আমার হেয় অবনতির প্রতিভূ হইতে কেমন উৎসুকভাবে আমার সহকর্ম্মীরা অপেক্ষা করিতেছে। হয় ত মরিয়া হইয়াই উঠিয়াছিলাম, তাই সে আঘাত বেশ প্রফুল্ল-মুখেই সহ্য করিয়া লইতে সবার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট আমার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "এই ত চাই! খুব বড় একটা আঘাত সহ্যই যদি করতে হয়, মানুষের মতই করব, কাপুরুষ হব কেন।"

তারপর সমবেত সহকর্ম্মীদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "লোকটা বড় তোখড়, না হে। পুলিশ-সাহেব জরিমানা করেছেন তাতেও ভয়-ডর নেই। আচ্ছা, এবার আমি ওকে শুধরে নিচ্ছি।"

হঠাৎ আমার দিকে আবার ফিরিয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ বাবু! তোমায় কর্ম্মচারী পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব। আমি তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই ইন্স্পেক্টর পদে উন্নীত করলুম। পুলিশ-সাহেব যা' জরিমানা করেছেন, তা' রদ করতে চাই না—কিন্তু সে টাকা আমার পকেট থেকেই ক্যাসে জমা পড়বে।"

তারপর পুলিশ-সাহেবের দিকে চাহিয়া বেশ একটু ভারী গলায় বলিলেন, "মূর্খ তুমি, অন্ততঃ এ ভদ্রলোকের সিক্ত পোষাকের ওপর নজর রেখে তোমার উচিত ছিল না কি খোঁজ করা কি জন্যে ও ওর কাজে অবহেলা করেছে। শোনো তোমরা, কমিশনার হার্ব্বাট সাহেবের একটী ছোট ছেলে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, একটী অজানা মেয়ে সে পথে যেতে যেতে দেখতে পেয়ে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে শিশুকে রক্ষা করতে ছুটে যায়। কিন্তু আজকের সমুদ্রের যে কি ভীষণ মূর্ত্তি তা' এখান থেকে শব্দ শুনে তোমরা হয় ত বুঝতে পারছ। কমিশনারের বৃদ্ধ পিতা বা ছেলের ঠাকুর দা' হিন্দুর এ উৎসব নিজের চক্ষে দেখবার জন্য ছেলের কাছে দু'দিনের জন্যে এসেছিলেন। তাঁরই সঙ্গে ছেলেটী কৌতুক-ভরে লকোচুরি খেলছিল। আমাদের এই ইন্সপেক্টরবাবু তাঁদের প্রাণরক্ষা করেছেন।"

আমার পূর্ব্বদৃষ্ট ভদ্রলোক এক স্যুট্ পোষাক হাতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "পুলিশ-লাইনের চাকরী বড় জঘন্য, তুমি এই মুহূর্ত্তে ছেড়ে দাও বাবু। তোমার কাপড়টা যে বদলান দরকার, সেদিকে কারো নজর যাচ্ছে না। তা' ছাড়া, অলকা তোমায় ডাকৃছে।"

কথাটা ঠিক বুঝিলাম না, জিজ্ঞাসুভাবে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখন ত জানিতাম না সেই অলকা, যাকে সাগর ছেঁচিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিমুখে বলিলেন, "তুমি যেতে পার বাবু। পুলিশ-সাহেব এবার বোধ হয় তোমায় অবকাশ দিতে ইতস্ততঃ করবেন না।"

মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, "তার মানে—আমি কি সাস্পেণ্ড হলুম?"

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন, "দেখছি সমুদ্রের নোনা জল এখনো তোমার মাথায় খানিক ঢুকে আছে। নাঃ, সার হার্বাট্, আমার এ দুর্বিনীত কর্ম্মচারী তার কর্ত্তব্যকেই বেশী বোঝে। এক্ষেত্রে ওর প্রাণে আঘাত না দিয়ে ঘণ্টা দুই বাদেই ওকে অবকাশ দিয়ে পাঠাচ্ছি। লেডীকে আমার হ'য়ে বলবেন, সেজন্যে তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।"

দুই

অলকার সহিত প্রথম সম্ভাষণে সে বলিল, "দেখুন ত

এদের কি উল্টো বিচার, প্রাণ বাঁচালেন আপনি, ওঁরা দিতে চান আমায় টাকা ?"

বিচারের কোন্ স্থলে যে ভুল হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না; মুখে তাহাই তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া অলকা বলিল, "সময় বুঝে আপনিও ওদের দিকে হচ্ছেন—বৈশ!"

অভিমানভরে সে তার মুখখানি ফিরাইয়া লইল। ভাবটা শুধরাইয়া লইতে কেন যে তাড়াতাড়ি বলিলাম জানি না। কহিলাম, "ওদের ছেলের জীবন-রক্ষা করতে আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন যে!"

অলকার অভিমান কিন্তু বৃদ্ধিই পাইল। সে রাগতস্বরে বলিল, "আর আপনি বুঝি ঘোড়ার ঘাস কাট্‌তে জলে গিয়ে পড়েছিলেন! বলি, তীরে এনে তুলে দিলে কে?"

শান্তকণ্ঠে বুঝাইতে চাহিয়া বলিলাম, "আমি গেছলুম আপনার জন্যে—দূর হতে ওদের ছেলেকে দেখ্‌তেও পাই নি; আর তাকে আনব বলেও জলে পড়ি নি। কিন্তু আপনি, শরীর অবসন্ন হ'লেও যখন ওকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, ছাড়েন নি, আর সেই ধরার জন্যেই তীরে আসতে পারেন নি—"

অলকা সহজ সরল কথায় উত্তর দিল, 'তা' কেন, আমি নিজেই যে সাঁতার জান্‌তুম না।"

বলিলাম, "তবে, তবে বলুন ত দুঃসাহসিকতা কার।"

অলকা বলিল, "আমি ত সে জন্যে যাই নি। গিয়েছিলুম আমার ছোট্ট ভাইটীর কথা মনে হওয়ায়—ঠিক্ ওই রকমটী হ'য়ে সে মারা গেছে কি না!"

সার হার্ব্বার্ট কোন্ ফাঁকে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাদের কথোপকথনের সবটুকুই শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, "তাই হ'ল দিদি, ও তোমার ভাই। আমার নাতনীর সৎসাহসে উৎসাহ দেবার অধিকার কি আমার নেই।"

অলকা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলি, "বেশ নাতনী বলেছেন, কথাটা ফেল্‌তে পারবেন না। বলুন ত, যে ভদ্রলোক আপনার নাতি-নাতনী দু'জনকে একসঙ্গে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তুলে দিলে, তার ব্যবস্থা কি করলেন?"

বৃদ্ধ একটু দুষ্টামিভরা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা' ওর জন্যে তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন দিদি—ও আমাদের কে?"

অলকা সলাজ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে আমার মনিবের আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন?"

আমি ও বৃদ্ধ হার্ব্বার্ট যুগপৎ বিস্ময়ে জড়িতকণ্ঠে বলিলাম, "মনিব!"

অলকা মৃদু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ মনিব—রাজবাড়ীতে চাকরী করি। রাজার ছোট ছেলে-মেয়েদের গভর্ণেস আমি।"

বৃদ্ধ হার্ব্বার্ট বলিলেন, "মোটের ওপর সেখানে যাবার আর কি প্রয়োজনে আছে দিদি?"

অলকা ধীরকণ্ঠে বলিল, "আছে। কারণ, আমি তাদের পয়সা খাই।"

হার্ব্বার্ট হাসিয়া বলিলেন, "আর আমার নাতনীকে আমি যদি চাকরী করতে না দেই।"

অলকা ধীরভাবে বলিল, "এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পাচ্ছি না। কারণ, তা'তে আপনি ব্যথা পাবেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর—এ ভদ্রলোক তোর আমার কে?"

তেজের সহিত হঠাৎ অলকা বলিয়া উঠিল, "উনি আমার স্বামী। জল থেকে জীবন রক্ষা করে সে অধিকার উনি পেয়েছেন। মাপ করবেন আপনি, উনি আমাকে আমার অন্তরের কথা বল্‌তে বাধ্য করেছেন। কিন্তু আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি, যান্—একথা প্রকাশের পর আর আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি না।"

পশ্চাৎ হইতে কৌতুকভরা কণ্ঠে কে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু সে মুক্তি জিনিষটা এত সহজ নয় অলকা। তুমি ছাড়লে কি হবে, ও ভদ্রলোক আমার হাতে বন্দী। এতবড় অন্যায়ের পর ওঁর যাওয়া হ'তেই পারে না।"

অলকার চঞ্চল বিস্ময়ভরা কণ্ঠে হয় ত বা অজ্ঞাতে শুধু দু'টি কথা বাহির হইল, "রাজা-সাহেব!"

"হ্যাঁ অলকা, সে দুর্ভাগ্য নিয়ে যখন জন্মেছি, তখন— ক্ষমা করবেন সার হার্ব্বার্ট, আমার এটা অনধিকার প্রবেশ তা' আমি বেশ জানি—কিন্তু আমার বীর গভর্ণেসের সম্মান এ ক্ষেত্রে ঢের বড়; তাই আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই। আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, ছাড়ছি না।"

বলিলাম—"আমার ডিউটী—"

পা ঠুকিয়া রাজা বলিলেন, "ড্যাম ডিউটি! আমি আপনাদের কমিশনারকে বলে আপনাকে ডিস্‌চার্জ্জ করিয়ে এসেছি। প্রস্তুত হোন্—সাতদিন বাদে আপনাদের বিবাহ; তারপরই আপনাকে বিলেত যেতে হবে।"

সহসা বাহিরের ঘোলাটে আকাশ ফাটিয়া এক ঝলক রৌদ্র বাহির হইয়া পড়িল—জানি না, আমার জীবনেও কি তাই!

অলকা কিন্তু আবার তেজের সহিত বলিল, "মাপ করবেন রাজাবাবু, আমার মত কুরূপাকে বিবাহ করে উনি যে বিব্রত হবেন, সারা জীবন জ্বলবেন, এটা আমি মোটেই চাই না!"

রাজা উপেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

আমি চক্ষু তুলিয়া আর একবার এ নারীর মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিলাম। মাথা নাড়া দিয়া উত্তর দিলাম, "আমি কিন্তু তা' মনে করি না।"

অলকা তীব্রভাবে বলিল, "আমি করি!"

রাজা উপেন্দ্রকিশোর গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বেশ, আমি তোমাদের দু'জনকেই সাতদিন ভাববার সময় দিলুম।"

অলকা তথাপি বলিল, "আমার জাতকুল ওঁর কিছুই জানা নেই। না না রাজাবাবু, ওকে যেতে দিন। ক্ষণিক উত্তেজনার জন্যে আমি নিজেই লজ্জায় মরে যাচ্ছি!"

বলিলাম, "তুমি যে জাতই হও, আমি তোমায় ব্রাহ্ম-মতে বিবাহ—"

রাজা বাধা দিলেন। বলিলেন, "না, এখন নয়, সাতদিন পরে আপনার মতামত জানাবেন। তবে এখন এইটুকু জেনে রাখুন, উনি সদ্বংশজাতা ব্রাহ্মণ কন্যা। আর এর মধ্যে বিলেত যাবার জন্যে তৈরী হোন্। আপনাকে সেখানে গিয়ে পড়্‌তে হবে।"

তিন

বাগানের মধ্যে লতাবিতানে বসিয়াছিলাম। মনের সঙ্গে হার মানিয়া চিন্তার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অলকা আসিয়া সম্মুখের বেঞ্চখানি অধিকার করিয়া বসিল। বলিল, "আজ আপনার সঙ্গে আমার কিছু বোঝা-পড়া আছে।"—

বলিলাম, "বোঝাপড়া কথাটা বড় ভয়ের হ'ল, এমনি অভয় দিয়ে যা' বল্‌বার বল্লে সুখী হবো।"

অলকা বলিল, "অসহায়া নারী আমি, তা'তে বুদ্ধিও তেমন প্রখর নয়, যদিই ক্ষণিকের ভুলে একটা বেফাঁস্ কথা মুখ দিয়ে বের করে থাকি, তার কি ক্ষমা নেই?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ক্ষণ অক্ষণের একটা কথারই দাম অনেক হ'য়ে ওঠে তা' ত জানেন। আমাদের, হিন্দুর মতে একজন 'তথাস্তু' মুনি আছেন। বলার পরক্ষণে তাঁর মুখের সেই 'তথাস্তু' বাণীটা যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে, আটক ত হবে না কিছুতেই—তা' ফলবেই।"

অলকা বেশ একটু ঝাঁঝিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনি কি পাগল হয়েছেন?"

বলিলাম, "কেন বলুন ত?"

অলকা বেশ একটু জোরের সহিত বলিল, "নইলে আমার মত একজন কুশ্রী নারীকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রে স্বেচ্ছায় জ্বল্‌তে চান!"

বলিলাম, "আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, এখন এসব কথার আলোচনা না করাই ভাল।"

অলকার উত্তেজনার মাত্রা কিন্তু ইহাতে বাড়িয়াই চলিল। সে বলিল, "আপনি বলছেন কি! আলোচনা আজ না করলে, করব কখন? রাজাবাবুর আদেশ—কাল রাত্রেই আমার বলিদান!"

বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "আপনি যদি আমাকে এত ঘৃণাই করেন, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব আপনার সঙ্গ হ'তে তফাৎ থাকৃতে। বিবাহের পর বলেন যদি দেশে আর ফিরব না; বিদেশেই জীবনের অবশিষ্ট দিন ক'টা কাটিয়ে আসব।"

অলকা জানিতে অন্যমনস্কভাবে বারকতক উচ্চারণ করিল, "ঘৃণা, ঘৃণা, না—না—না!" কিন্তু পরক্ষণেই ঢোক গিলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাই, আমি আপনাকে ঘৃণাই করি!"

মুখে বলিল বটে, কিন্তু কান্নায় তার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে মুখ চাপিয়া সে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইতে চাহিল।

আমি তার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, কেন আপনি এমন অবুঝ হচ্ছেন বলুন ত?"

অলকা খানিক স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "দেব-মন্দিরের সঙ্গে একটা জঘন্য আস্তাকুড় পাশাপাশি রেখে কল্পনা করুন ত কেমন মানায়!"

বলিলাম, "আমি আত্মীয়হীন, আপনিও তাই। পরের দ্বারে ভিক্ষা আমার এবং আপনার উপজীবিকা। আশ্রয় বল্‌তে পৈত্রিক ভিটা ছিল সত্য, কিন্তু দূর-সম্পর্কিত জ্ঞাতির কুচক্রে আজ আমি ছন্নছাড়া। এদের মুখের পরিচয়ে জেনেছি, আপনার দশাও তার ওপরে নয়। কেবল নিজের শিক্ষা ও শ্রমের ওপর নির্ভর করে আমরা দু'জনেই পথ চলেছি। তবে বলুন আপনি, কোন্ হিসেবে আপনি—"

বাধা দিয়া অলকা বলিল, "কিন্তু রূপ, এ বানরীর পাশে ও দেবকান্তি—"

নিজের হাতটা তার হাতের পাশে রাখিয়া মিলাইয়া দেখাইলাম। বলিলাম, "কি এত তফাৎ?"

অলকা বলিল, "কটা চামড়াই সব নয়, এই যে আধ-খানা কপাল, গৌরীশৃঙ্গের পাশের গভীর খাত—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "বাইরের কপালটাই সব নয় অলকা। যেটাকে যথার্থ হিন্দুমতে কপাল বলে চালনা করা হয়, সেটাকে চোখে দেখেনি কেউই কোনদিন। তোমায় স্পর্শ মাত্রে আমার পদোন্নতি হয়েছিল—"

"আর সঙ্গে সঙ্গে চির-জীবনের মত সে অন্নের সংস্থান-টুকুও ঘুচে গেল। রাজাবাবু আর কমিশনার যুক্তি করে—"

বলিলাম, "তার পরের দিকে চাও, আমার পক্ষে নিজের পয়সায় বিলাত-যাত্রা স্বপ্নের অতীত নয় কি? সেখান থেকে আই-সি-এস্ হয়ে আসা—"

"বেশ আকাশ-কুসুম নিয়েই থাকুন। এমন ত হতে পারে, সেখানে গিয়েও কিছু হ'ল না—তখন?"

হাসিয়া বলিলাম, "সে দোষ আমারই হবে না কি? গাফ্‌লতির মধ্যে দিয়ে যদি সময় না কাটাই, যদি এ জ্ঞান এ ধারণা রাখতে পারি, এই আমার ভবিষ্যৎ ভাত-ভিত্তি, তা' হ'লে ঠকে আসব না—আর সে পথে ধ্রুবতারা হ'য়ে তুমিই আমার লক্ষ্য ঠিক্ রাখ্‌বে।"

অলকা উপায়হীনভাবে বলিল, "বেশ, আগে ঘুরেই আসুন, তারপর যা' হয় হবে।"

আমি রাজী হ'লেও রাজাবাবু রাজী হইলেন না। বলিলেন, "না, বিলেতে বন্ধনহীন যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতার পথ উন্মুক্ত। তুমি ওকে সে পথে ঠেলে দিও না অলকা। বিবাহিত হ'য়ে ও যদি যায়, পিছনের টান ওকে বেঁধে রেখে দেবে। শুধুই তাই নয়, আমি তোমাদের দু'জনকেই পাঠিয়ে দিতে চাই আমার পুত্রকন্যার গার্জ্জেনস্বরূপ ক'রে—"

এ কথার পর আর কোন কথাই চলিল না।

চার

হাইড পার্কে বেড়াইতেছিলাম।

একজন যুবক দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে চাহিলাম, কিন্তু আগন্তুক পথ দিল না। বেশ একটু কাতর-মিনতিভরাকণ্ঠে সে বলিল, "আমার ভগ্নী হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়েছেন, যদি একটু সাহায্য করেন—"

ভদ্রতার খাতিরে বলিতে হইল, "কোথায়? চলুন দেখি।"

পার্কের এক নির্জ্জন কোণে এক যুবতী জ্ঞানশূন্যা অবস্থায় পড়িয়াছিলেন দেখিলাম। কেমন সন্দেহ হইল। ধীরকণ্ঠে বলিলাম—"আপনি ভুল করেছেন, আমি ডাক্তার নই।"

যুবক বেশ একটু কাতর-কণ্ঠেই বলিল, "আপনি ডাক্তার নন্ তা' জানি—কিন্তু একা বোন্‌টীকে এ অবস্থায় ফেলে রেখেও ত যেতে পারি না; তাই আপনার সাহায্য চাচ্ছি।"

বলিলাম, "পার্কে আপনার স্বজাতীয় ভদ্রলোকের ত অভাব নেই। ধন্যবাদ! আমার সময় কম।"

যুবক বেশ একটু অধীর হইয়া বলিল, "ক্ষমা করুন, হৃদয়হীন হবেন না। আমি জানি, ভারতীয়ের হৃদয়, আমার স্বজাতিকেও ভাল রকমেই চিনি আমি—তাই বিশ্বাস ক'রে অসহায়া বোন্‌টীকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পাচ্ছি না। গেলে, ফিরে এসে আর ওকে পাবার আশা থাক্‌বে না।"

হাসিয়া বলিলাম, "আপনাদের ছলনা আমার অজ্ঞাত নেই। জেনে রাখুন, আমি একজন ভারতীয় পুলিশ কর্ম্মচারী। আমার সঙ্গে এ প্রতারণার চেষ্টায় আপনারা বিপদেই পড়বেন।"

ভদ্রলোকটীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। দু'-একপদ পিছাইয়া গিয়া সে ডাকিল, "লুসি, উঠে এস। বড় ভুল হয়ে গেছে।"

মেয়েটী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পরক্ষণেই হাত বাড়াইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। এক পা হটিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "মাপ করবেন, আপনার এ চালাকী পুরনো হয়ে গেছে। তা' ছাড়া, আমি বিবাহিত।"

মেয়েটী নাক মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "সেই কুশ্রী নেটিভ মেয়েটা! জানেন, আমি—"

বাধা দিলাম। বলিলাম, "চার ফেলবার স্থান এটা নয়; তা' ছাড়া, আমার স্ত্রীকে অপমানিত করবার অধিকার আমি বোধ হয় আপনাকে দিই নি। আপনার স্বামীকে বলেছি—হ্যাঁ আমি জানি, উনি আপনার ভাই নন্, স্বামী। স্ত্রীকে চার ফেলে হতভাগ্য ভারতীয় ছাত্রদের কাছ থেকে বেশ মোটা রকম কিছু আদায় করা ওঁর এক ব্যবসা। হ্যাঁ, যা' বলছিলুম—আমি আপনার স্বামীকে জানিয়েছি, আমি পুলিশ কর্ম্মচারী।"

মেয়েটী একটু অধীর হইয়া এদিক ওদিক চাহিল। যুবক সেখানে ছিল না, দূরে হয়ত কোনস্থানে তার কৌশলী স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মেয়েটী চঞ্চল-কণ্ঠে বলিল, "আমাকে বাঁচাতে পারেন?"

আমি হাসিলাম। বলিলাম, "এ আবার এক নতুন ছলনা—কেমন?"

মেয়েটী আগাইয়া আসিয়া আমার হাতের উপর তার হাত দু'টা রাখিয়া বলিল, "সত্য, এবার আমি মোটেই ছলনা করছি না। আমাকে বাঁচান—ও নর পিশাচের হাত হ'তে আমাকে মুক্তি দিন!"

বলিলাম, "শোন লুসি। মেরী, এলিজা বিভিন্ন নামের কোন্‌টা তোমার আসল, ধরাই দায়! যাক্, সে খোঁজে আমার দরকারও নেই। তবে মুক্তি চাও, নিজে চেষ্টা কর, পরে তা' তোমায় দিতে পার্‌বে না। আমার মনে হয়, অন্য সব কিছুর মত এটাও তোমার ভণ্ডামী।"

বাধা দিয়া আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মেয়েটা ব্যাকুলতাভরা কণ্ঠে বলিল, "ও গো, না না, সত্যই আমি মুক্তি চাই! ও গো, কিসে তুমি বিশ্বাস করবে আমি কত যাতনা সহ্য করছি! অনিচ্ছায় পাপের পঙ্ক আমায় গায়ে মাখ্‌তেই হয় ওর ভয়ে—পালাতে পারি না! আমি যে কি নরকে আছি—"

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে ধ্বনিত হইল, "দেখুন, দেখুন মিসেস রায়, আপনার স্বামীর কীর্ত্তিটা ভাল করেই দেখে নিন্। তার—"

ফিরিয়া দেখিলাম, অলকার সহিত সেই পূর্ব্ববর্ণিত যুবক—এই লুসীর স্বামী, ভাই, আরও কত কি। ঠিক্ এই সময় শয়তান মেয়েটা আসিয়া আমার বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল।

বাধা দিব কি, সে মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য নিজেই আমি

রূপরেখা

চন্দ্রাবতী

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা]

[রূপরেখার সৌজন্যে

ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই স্থির ধীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনর্থক কথা বলিয়া পরিত্রাণ, জানি সেটা বিড়ম্বনা—তাই অলকার নিজস্ব বিবেচনার উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

অলকা এবার কথা কহিল। বেশ জোর গলায় বলিল, "ক্ষমা করবেন মিঃ সোয়েন, আপনাদের দু'জনের চেয়ে আমি আমার স্বামীকে ঢের বেশী করে চিনি। আপনার ভগ্নী না ভাগ্নীর সাজা অভিনয়—আমার প্রাণে সামান্যও রেখাপাত করতে পারেনি।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কঠিন হস্তে মেয়েটাকে সরাইয়া দিয়া বলিলাম, "শুনলে ত, তোমাদের সব চাতুরীই ফেঁসে গেল। যাও, ফিরে যাও। শীকারের অভাব হবে না। তবে শুনে রাখ, আমাদের সাম্‌নে আর কোনদিন এলে তোমাদের পুলিশে দেব।"

বাড়ীতে আসিতে আসিতে অলকাকে সব বলিলাম। শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "আচ্ছা, তুমি কি হৃদয়হীন! অমন সুন্দরী নারী যেচে এসে—"

তার মুখে চাপা দিতে বলিলাম, "কেন তাকে প্রত্যাখান করতে পারলাম জান? তোমার কথায়ই বলি, একটা ডায়মন কাটা মুখ এ বুকের ভেতর সব জায়গাটুকুই জুড়ে বসে আছে—অন্যের ছায়াপাতের স্থানও সেখানে নেই!"

অলকা একটা ছেলেমানুষী করিয়া ফেলিল। অমন প্রকাশ্য স্থানে, অমন শত চক্ষুর সাম্‌নে ঠিক্ হিন্দুর মেয়ের মতই ব্যবহার করিয়া বসিল।

পায়ের উপর হইতে তাকে বুকে তুলিয়া বলিলাম, "ছি! বিদেশ—তোমার সতী-সাবিত্রীর আচার-ব্যাভার এখানে কেউ বোঝে না, চলেও না। ও সব কি করছ, লোকে বলবে কি?"

অলকা গাঢ়কণ্ঠে বলিল, "বলবে, অলকা তার স্বামীর যথার্থ রূপ এতদিনে চিন্‌তে পেরেছে। আগে ভাবত সে, বুঝি শুধু দেবতার সঙ্গলাভ করে ধন্য হয়েছে। এখন জান্‌লে, তুমি তার চেয়েও—"

কথাটা শেষ করিতে দিলাম না। লজ্জিতা দূরে সরিয়া পলাইতে পলাইতে বলিল, 'আঃ, ছিঃ, তুমিও সময় সময় কম ছেলেমানুষ হও না, কি যে কর!"

*　　*　　*　　*

বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলাম, রাজাবাবু আসিয়াছেন। তিনি হাসিতে হাসিতে অলকাকে বলিলেন, "এবার সব দিক্ দিয়ে সুশান্ত জয়ী হ'ল অলকা! এই নাও সনন্দ, ও বেশ ভাল হয়েই পাশ ক'রে বেরিয়েছে।"

অলকা তাড়াতাড়ি বলিল, "এই মাত্র আর একদিকেও পাশ করে এসেছেন, তা' বোধ হয় জানা নেই আপনার।"

সহাস্য মুখে উপেন্দ্রকিশোর বলিলেন, "জানি, আর জানি বলেই ওর গৌরবে আজ আমি যথার্থই গৌরব অনুভব করছি।"

অলকা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি জান্‌লেন কি করে?"

উপেন্দ্রকিশোর হাসিলেন মাত্র, এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমায় ছাড়তে পারব না সুশান্ত। গভর্ণমেণ্ট তোমায় খুব ভাল চাকরী দেবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি—না, ভেবে দেখলুম, তোমায়, তোমাদের ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ থেকে আমার সামান্য রাজত্বের ম্যানেজার পদে তোমায় বাহাল করলুম। আশা করি, প্রত্যাখ্যানের আঘাতে তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।"

কথা বলিতে পারিলাম না, কেবল তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার কাজ অলকাই কিন্তু সারিয়া লইল—মেয়েদের এ গুণটা খুবই আছে। মুখে কোন কথা না বলিয়া সে সটান রাজাবাবুর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

আড়ালে সেদিন অলকাকে বলিলাম, 'হ্যাঁ গো, এবার বলো ত তোমায় বিয়ে করে জিতেছি, না হেরেছি!"

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার সতীন লুসিকে ডেকে দিচ্ছি, জিজ্ঞেস করে দেখো তাকে"—বলিয়াই সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শ্রীব্রতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিছক গল্প

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল্

বি-এ পাশ করিয়া অনিল আজ প্রায় দুই বৎসর হইল এক সওদাগরী অফিসে চাকরী করিতেছে। মাহিনা পঞ্চাশ টাকা। তাহাতে মেসের খরচা নির্ব্বাহ করিয়া দেশে কিছু পাঠাইতে হইলে আপনার হাত-খরচা বলিয়া আর কিছুই থাকে না। অথচ, বাড়ীতে টাকা না পাঠাইলেও নয়।

তাই সে ছোটখাট রকমের একটা 'টিউশানি' খুঁজিতেছিল। মাহিনা দশ-পনের টাকা যাহা পাওয়া যায়—তবে খাটুনি কম হওয়া চাই। কেন না, সারাদিন অফিসের পর সন্ধ্যাবেলা পরিশ্রম করিবার মত মন মেজাজ আর থাকে না।

খুঁজিতেছেও সে আজ অনেকদিন। কিন্তু সুবিধামত পায় নাই। হয় মাহিনা অত্যন্ত কম, না হয় খাটুনি বেশী, আর না হয় মেস্ হইতে অনেক দূর।

আজ রবিবার। তাই নিশ্চিন্ত আলস্যে অনিল বসিয়া বসিয়া একখানি খবরের কাগজের পাতা নাড়াচাড়া করিতেছিল। উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার নজর পড়িল 'কর্ম্মখালি' বিজ্ঞাপনের উপর। একটা পর একটা করিয়া সে চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল।

প্রায় শেষাশেষি তাহার দৃষ্টি পড়িল একটি বিজ্ঞাপনের উপর। লেখা রহিয়াছে—

"ম্যাটিকিউলেশনের ক্যান্‌ডিডেটকে সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা করিয়া ইংরাজী শিখাইবার জন্য একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক চাই। বেতন যোগ্যতা অনুসারে।"

ম্যাটিকিউলেশন্ ক্লাসের ইংরাজী। এক ঘণ্টা করিয়া। নিশ্চয় মাহিনা পনের টাকার কম হইবে না। মনের মত হইলে তাহার হাত-খরচা বেশ স্বচ্ছলভাবেই চলিয়া যাইবে। আবার কি?

ভাবিল, তৎক্ষণাৎ রওনা হওয়াই ভাল। শুভস্য শীঘ্রং। যত বেলা হইবে, তত বেশী লোকের চোখে পড়িবে। ততই ক্যান্‌ডিডেটের সংখ্যা বাড়িবে। নেহাৎ কাগজে ছাপা তাই। তাহা না হইলে গ্যাসপোষ্টে আঁটা বিজ্ঞাপন হইলে সে হয় তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিত, না হয় অন্ততঃ ঠিকানাটা রবার দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া তুলিয়া দিত।

অনিল আন্‌লা হইতে সার্টটা টানিয়া মাথায় গলাইতে গলাইতেই মেসের বাহির হইয়া পড়িল। ভাবিল, ভগবানের কৃপায় কাজটা লাগিয়া গেলে হয়।

* * *

সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে ঠিকানায় গিয়া পৌছিল।

বাড়ীটি ছোট হইলেও বেশ সৌখীন ধরণের। সাম্‌নে একটী গেট্। গেট্ পার হইয়া অল্প খোলা জমি। তাহাতে যে ঘাস রহিয়াছে, তাহাও বেশ সযত্নে ছাঁটা। মধ্যে অল্প পরিসর কাঁকরের রাস্তা। তাহার দুইধারে সিজন ফ্লাওয়ারের গাছ। মোটের উপর বাড়ীটী সযত্ন রক্ষিত।

গেটের কাছে আসিতেই অনিল দেখিল একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক মার্ব্বেল পাথরের রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

অনিল সটান তাঁহার কাছে গিয়া একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনারা কি কাগজে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বিজ্ঞাপন দিয়েছি বটে। আমার নাতনীটির জন্যে। সে ত এখন নেই—এইমাত্র তার কাকার বাড়ী চলে গেল—তাকে নিতে তার কাকা গাড়ী পাঠিয়েছিল কি না।"

বৃদ্ধ খানিক ভাবিয়া আবার বলিতে সুরু করিলেন, "ইচ্ছে করেন তো শুধু কথাবার্ত্তা আজ কয়ে রাখ্‌তে পারি"—বলিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি অনিলকে বসাইলেন।

পরে ভৃত্যের উদ্দেশ্যে হাঁকিলেন, "ওরে রামখেলোয়ান, চা নিয়ে আয়, চা।"

বৃদ্ধের আপ্যায়িতে অনিল মুগ্ধ হইল। বলিল, "মাপ করবেন, এত বেলায় আর চা খাবো না।"

"তবে কিছু মিষ্টি। হ্যাঁ, মিষ্টি কিছু খেতেই হবে। অমনি ছাড়ছিনে"—বলিয়া বৃদ্ধ, ভৃত্য রামখেলোয়ানকে কেবল মিষ্ট আনিতেই বলিলেন।

অনিল সলজ্জভাবে চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামটি?"

"শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়।"

"কুলীন তা' হ'লে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নিবাস?"

"নবগ্রামে।"

নবগ্রামের নাম শুনিয়া বৃদ্ধ একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, "নবগ্রামের মুখুয্যে। আপনি ওখানকার অখিল মুখুয্যেকে চেনেন?"

"আজ্ঞে, আমি তাঁরই ছেলে।"

বৃদ্ধ লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "অখিলের ছেলে তুমি, এ্যাঁঃ! তোমার বাবা যে আমার বাল্যবন্ধু। আমরা সব একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। সে কি আজকের কথা!—তা', অখিল ভাল আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পেন্‌সন্ নিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

—"তা' তো হবেই। আমার বয়সই তো। ওরে রামখেলোয়ান, দেরী করছিস কেন?"

বলিতে বলিতেই রামখেলোয়ান এক রেকাবী মিষ্ট আনিয়া হাজির। অনিলকে লজ্জা করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "সে কি, লজ্জা কি হে? তুমি তো ঘরের ছেলে।"

অনিল দায়ে পড়িয়া মিষ্টগুলি গলধঃকরণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বলিল, "তুমি বসো, আমি ভেতর থেকে একবার আসি। তুমি সেই অখিলের ছেলে এ্যাঁঃ"—বলিতে বলিতে তিনি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

মিষ্টগুলি শেষান্তে জলের গেলাসটি খালি করিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে অনিল ভাবিতে লাগিল—তাই তো এ যে বড্ড জানাশোনা হয়ে গেল। বাবারও কাণে উঠবে। তিনি রাগ করবেন। বলবেন, "তোমার এত টাকা কিসের দরকার যে, অফিসে খেটে আবার টিউশানি করতে হবে?"

এদিকে সে চিন্তার জাল বুনিয়া যাইতেছিল, ওদিকে নাতনী রমার একটি নূতন ফটো লইয়া বৃদ্ধ রামকালীবাবু উপস্থিত হইলেন।

ফটোটি অনিলকে দেখিতে দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, গৃহস্থালী কাজ-কর্ম্ম, সেলাই-ফোঁড়াই, গান-বাজনা সবই কিছু কিছু জানে। খালি যা—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি অনিলের দিকে দেখিতে লাগিলেন।

অনিল ফটো হইতে চোখ তুলিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "খালি যা' কি বল্‌ছেন?"

"খালি যা' পড়া-শুনোর বেলায় বাঘ।"

অনিল একটু হাসিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "পড়তে পড়তে ও ভাবটা কিন্তু কেটে যাবে বলে মনে হয়।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কি জানো, ওই আমার একটি মাত্র নাতনী। বাড়ী-ঘর-দোর যা' দেখছো, সবই ওর। ছেলেবেলা থেকেই আমার কাছে মানুষ। একটু বেশী আদর করি। নিজের ইচ্ছেয় যেটুকু পড়াশোনা করে এই পর্য্যন্ত। এইবার ওকে পরের হাতে তুলে দিতে হবে।" তাঁহার গলা শেষের দিকে একটু ভারী হইয়া আসিল।

ঘড়িতে এগারোটা বাজিল। বেলা হইয়াছে দেখিয়া অনিল উঠিয়া পড়িয়া বিদায় চাহিল। বৃদ্ধ অনিলকে বিদায় দিবার সময় বলিলেন, ইতিমধ্যে তিনি তাহার বাবার সহিত কথা কহিবেন এই সম্বন্ধে।

* * *

সপ্তাহ কাল অতীত আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াও অনিল

যখন রামকালীবাবুর নিকট হইতে কোন খবর পাইল না, তখন তাহার অধীরতা আরও বাড়িয়া গেল।

ভাবিল, চিঠিটা বোধ হয় মেসে অন্য কাহারও হাতে পড়িয়াছে। বোধ হয় সে তাহাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছে বা হারাইয়া ফেলিয়াছে। রামকালীবাবু সে রকম লোকই নন্। চিঠি তিনি নিশ্চয়ই দিয়াছেন।

মেসের ঠাকুর চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকে অনিল জিজ্ঞাসা করিল, কেহ তাহার কোন চিঠি পাইয়াছে কি না। সবাই বলিল, পায় নাই।

আশায় উৎকণ্ঠায় আরও এক সপ্তাহ কাটিল, কিন্তু কোনও খবর আসিল না।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। তখন অনিল অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিল, বামুনের বরাত কি না! কোথায় ভাবিয়াছিল, টিউশনির এক মাসের বেতন পাইলে সে পাঁচটাকা খরচ করিয়া উদয়-শঙ্করের নাচ দেখিয়া আসিবে; তাহা নহে, সবই তাহার বরাতে আকাশ কুসুমে পরিণত হইল।

অনিল সাত-সতেরো অনেক ভাবিতেছে, এমন সময় টেলিগ্রাম আসিল—"বিবাহের ঠিক করিয়াছি। চিঠিতে সবিশেষ জানিতে পারিবে। ছুটির বন্দোবস্ত কর।"

অনিল বিশ্বাস করিতে পারিল না। কাহার বিবাহ? ছুটি লইতে কে কাহাকে বলিতেছে? পোষ্ট অফিসে নামের কিছু ভুল করে নাই তো? ঠিকানাটা ঠিক্ তো বটে?

কিন্তু না, এ যে সব ঠিক। তাহারই নাম-ঠিকানা, তলায় দাদার নাম। তাহা হইলে কি সত্য-সত্যই তাহারই বিবাহ?

পরদিন চিঠি আসিল। দাদা লিখিতেছেন—

"কল্যাণীয় অনিল,

তোমার বিবাহে মত হইয়াছে শুনিয়া বাবা মা বিশেষ আনন্দিত।

রামকালীবাবু আমাদের জানা ঘর। তা' ছাড়া, তিনি আমাদের গ্রামে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়া ইতিমধ্যে মেয়ে দেখার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মেয়ে যখন সকলের পছন্দ হইয়াছে, তখন আর দেরী করা উচিত নহে। সাম্নের সপ্তাহে বিবাহের স্থির হইয়াছে। ছুটির বন্দোবস্ত করিয়া শীঘ্র আসিবে।"

এ কি রকম হইল! সে গেল রামকালীবাবুর বাড়ীতে টিউশানির খোঁজে, আর দাদা দেশ হইতে এ সব কি লিখিতেছেন!

তবে কি বুড়ো রামকালীবাবুর কিছু কারসাজি ইহার ভিতর আছে? কিন্তু তিনি তো অতি সদাশয় লোক। তাঁহাকে এতটা হীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে মন উঠিতে চাহে না।

তবে কি সে নিজেই কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতে ভুল করিয়াছে?

তখন সে তাড়াতাড়ি পুরাতন কাগজের বাণ্ডিলটা টানিয়া বাহির করিয়া সেই তারিখের বিজ্ঞাপনের পাতা ওল্টাইতে লাগিল।

এই যাঃ!—ওই তারিখে একই রাস্তায় দুইটি বাড়ীর বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। একটি বিবাহের—সেটা বাইশ নম্বর বাড়ী; আর একটি গৃহ-শিক্ষকের—সেটা বারো নম্বর বাড়ী।

সে তাড়াতাড়িতে ভুল করিয়া বাইশকে বারো ভাবিয়া বাইশ নম্বরের বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

আলো ও ছায়া

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]
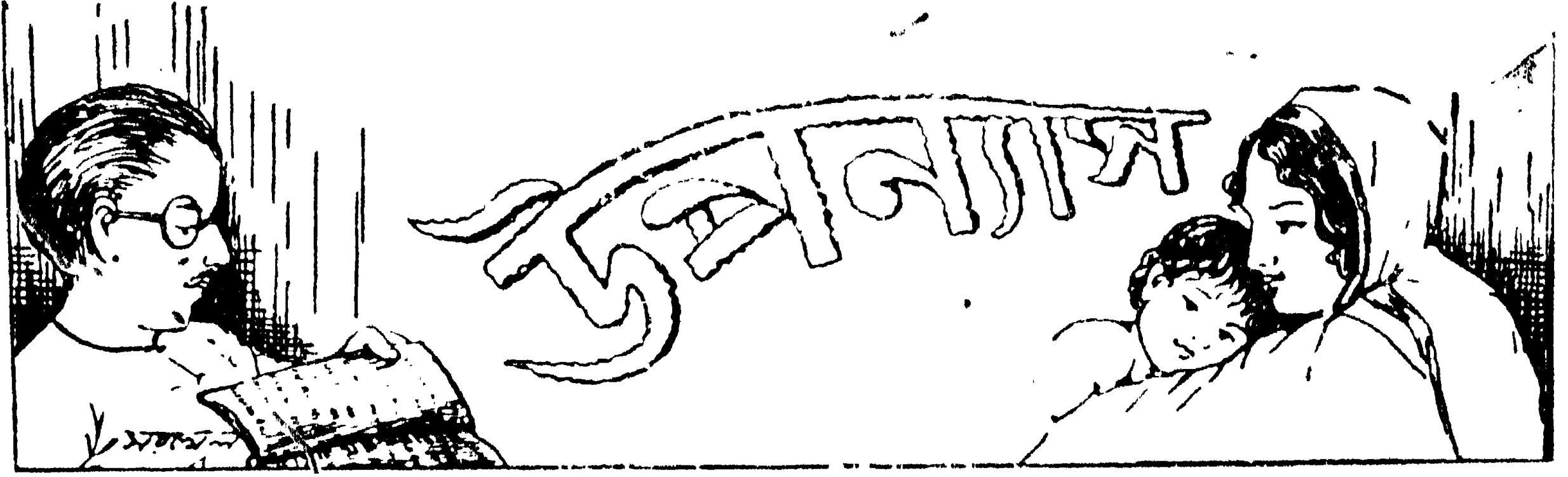
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেইশ

সূর্য্যের তেজ তখন অনেকটা প্রখর রূপ ধারণ করিয়াছে। অজয় বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে ডাকিল—সরযূ, ও সরযূ?

সরযূ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—বেশ লোক যা' হোক্! ভোরবেলা উঠে কোথায় গিয়েছিলে বলো ত?

—তা' যদি বল্‌তে পারিস, বুঝব মানুষ বটে! হুঁ, তা' আর বল্‌তে হয় না—বলিয়া বিজয়গর্ব্বে অজয় হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু কাহাকেও বলিতে হইল না, সরযূ দরজার দিকে চাহিতেই গালে হাত দিয়া বলিল—ব্যাপার কি অজয় দা', তোমার বাড়ী যজ্ঞি-টজ্ঞি আছে না কি, যে, এতবড় মাছ নিয়ে এসে হাজির করেছ?

—আমিও ত ওই কথাই ভাবছিলুম বোন্, কিন্তু হতভাগা লছমনটা সেই যে বায়না ধর্‌লে—টাট্‌কা মাছ বাবু, তার আর কিছুতে ছাড়ান-ছোড়ন নেই। কি করি, বুড়ো মানুষ—

লছমন প্রতিবাদ করিল না, কিন্তু তাহার মুখের হাসি সরযূর নিকট সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিল না।

সরযূ হাসিয়া বলিল—তা' বেশ করেছ, মাছটা টাট্‌কাই বটে।

—তাই ত নিলুম। নইলে এত বোকা পেয়েছিস্ যে, একটা ভূতের কথায় তাড়াতাড়ি ওটা নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌ব? তাও বলি—দাদার সংসারে এসে তোর খাওয়াই ত উঠে গেছে; তোর দিক্‌টাও ত দেখা উচিত।

—তা' উচিত বই কি—কিন্তু এমনই রোজ রোজ লছমনের জন্যে এনো না যেন—তা' হ'লে বুড়োর হয় ত লোভ বেড়ে যাবে; শেষে জোটান দায় হয়ে উঠ্‌বে।

এবার লছমন কথা কহিল। বলিল—তা' উঠ্‌ক মা, কিন্তু আজ একাদশীর দিন—

বাধা দিয়া অজয় লাফাইয়া উঠিল—তা' কি হবে, মহাপ্রভু খাবেন না বুঝি? কেনাই যে কালে হয়ে গেছে, সে কালে তোর জন্যে ফেলে দেব মনে করেছিস্? পাগল ভূত কোথাকার! কোট্‌ ত সরযূ, ও হতভাগাকে দিস্ নি যেন। এমনই পিত্তি গালিয়ে নিজে ত একাদশীর পারণ করে স্বর্গে যাচ্ছেই, আমাদেরও যাইয়ে ছাড়বে।

সরযূ আর কথা কহিল না, চোখের কয়েক ফোঁটা জল গোপন করিতেই বুঝি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বঁটিটা আনিয়া মাছ কুটিতে বসিয়া গেল।

অজয় তাহার খানিকটা দূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আজ কাকাবাবুর ওখানে গিয়েছিলুম সরযূ। বুড়ো মানুষ দেখ্‌তেই পান্ না, একেবারে চোখ খারাপ হয়ে ত গেছেই, দেখলুম—মাথারও ঠিক্ নেই।

হাতের মাছটা হাতেই রহিয়া গেল। সরযূ রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—তাই না কি!

—নয় ত কি বোন্, আমাকে চিন্‌তেই পারলেন না। তোর কথা বল্‌লুম—ভাল করে তাও বুঝলেন না যেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সরযূ বলিল—না বুঝুন, আমাদেরই বা তা'তে কি যায়-আসে দাদা!

সবিস্ময়ে অজয় বলিল—আসবা-যাবার কথা নয় সরযূ, এ অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে দূরে থাকা উচিত হবে কি না আমি তাই ভাবছিলুম।

সরযূ হাসিয়া বলিল—খুব হবে অজয় দা'! তাঁর বিশ্বনাথ আছেন, মিসিরজী আছেন, ভাবনার লোক অনেক আছেন, আমরা না ভাব্‌লেও চল্‌বে।

পিতার প্রতি কন্যার এই অনাসক্তি অজয়ের কেমন কেমন ঠেকিল। তবে সে সরযূকে সাধারণ পর্য্যায়ে কখন ধরে নাই, কাজেই আজও সে চিন্তা লইয়া মাথা ঘামাইল না। বরং সারা পথটা যে বিপরীত ভাবনায় অহেতুক উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিল, তাহার জন্য লজ্জানুভব করিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল, পিতার এ অবস্থার কথা শুনিয়া সরযূ হয় ত বিহ্বল হইয়া পড়িবে। হয় ত যে বাসা তাহারা অকস্মাৎ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, আবার ঘুরিয়া সেখানে গিয়াই উঠিতে হইবে। আরও কত কি। কিন্তু তাহার কিছুই করিতে হইল না দেখিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে অপলক-দৃষ্টিতে সরযূর মাছ কোটা দেখিতে লাগিল।

সরযূ হাসিয়া বলিল—ওঃ, কি রক্ত দেখেছ! এমনই আর একদিন মাছ কুটেছিলুম, না অজয় দা'?

অজয় বলিল—সেদিনও এমনই মাছের রক্ত ছুটেছিল ফিনিক দিয়ে, তার সঙ্গে যে মানুষের রক্তও কখন মিশে গেছে তা' কি জানি। যখন জান্‌লুম, তখনকার কথা তোর মনে আছে সরযূ? নেই, না রে? কিন্তু আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ভাস্‌ছে—অমরের চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়তে সুরু করেছে; আমি ত ডাক্তার-বাড়ীই গিয়ে হাজির হয়েছি!

সরযূ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আচ্ছা লজ্জায় ফেলেছিলে কিন্তু সেদিন। ডাক্তারবাবু ছোট্ট কাটাটুকু বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে মুখ টিপে হেসে যখন বল্‌লেন—আজকালকার মেয়েরা ও সব পারবে কেন মশায়, আপনারা দেখ্‌ছি একটা লোককে খুন করবেন। তখন মনে হচ্ছিল, মাথা খুঁড়ে এখনই প্রাণটা বের করে ফেলি। কোথায় একটু কি হয়েছে না হয়েছে, একেবারে ছুটেছ কি না ডাক্তার-বাড়ী। আর সে লোকটাও—

অজয় বলিল—তার দোষ কি বোন্, সে পর—বুঝ্‌বে কেমন করে যে, তোর একফোঁটা রক্ত আমাদের কাছে তেত্রিশ কোটি দেবতার সারা বুকের রক্তের চেয়েও বেশী!

—ফের? এখনই হাত কেটে ফেল্‌ব কিন্তু।

ভয়ে অজয়ের মুখ শুকাইয়া গেল।

সরযূ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—অমনি ভয় হয়ে গেল বুঝি? না গো না, এই দেখো, কোটা আমার শেষ হয়ে এসেছে।

—আসুক, তুই উঠে পড় ত বোন্! পিত্তি গলাবার ত আর ভয় নেই, ও লছমন হতভাগা খুব কুটে নিতে পারবে। না, কোন কথা নয়—ওঠ্, ওঠ্ বল্‌ছি।

অজয়ের ভীতি-বিহ্বল মুখখানির প্রতি চাহিয়া সত্যই সরযূকে উঠিয়া পড়িতে হইল। মুখে বলিল—বাবা, দাদা যেন কি!

অজয়ের সে কথা কাণে গেল না। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সেদিন থেকে মাছ খাওয়া কতদিন বন্ধ ছিল মনে আছে তোর? বড় মাছ ত আনিই নি জীবনে আর। হতভাগা লছমনটার কথায় ভুলে আজ কি ফ্যাসাদই না বাঁধিয়ে তুলেছিলুম।

—মনে নেই আবার, যেমনই দাদা, তার তেমনই ভগ্নীপোত! দু'টিতে মিলে একেবারে কলির প্রহ্লাদ হয়ে উঠেছিলে। বছরখানেক ত মাছ-মাংস ঢোকেই নি

বাড়ীতে—শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের খাওয়ার ইচ্ছের কথা তুল্‌তে তবে রক্ষে পাই।

অজয় বলিল—সে ত তোরই দোষ সরযূ। ঝি-চাকর সবই ত রাখ্‌তে চেয়েছিলুম আমরা, তুইই ত জোর করে রাখ্‌তে দিস্‌ নি। বল্‌লি—নিজের আনন্দের বখ্‌রা দেব বাইরের লোককে, এত বোকা পেয়েছ আমায়! না না, সতীন নিয়ে ঘর আমার পোষাবে না। তোমাদের সব কাজ আমি নিজের হাতে করব—ভাল হোক্‌, মন্দ হোক্‌, তাই মুখ বুজে সয়ে নিতে হবে। বলিস নি?

সরযূর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে বলিল—বলেই যদি থাকি, মিথ্যা বলি নি ত অজয় দা'। তোমাদের কি হ'লে চলে, কিসে তোমরা সুখী হবে, এ খবরও মাইনে করা লোকগুলো পাবে কোথায় বলো ত?

আনন্দের আতিশয্যে অজয়ের চোখ দুইটা বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। সে গাঢ়কণ্ঠে বলিল—ঠিক বলেছিস বোন্‌, তারা তা' পাবে কোথায়? তাই ত মাঝে মাঝে মনে হয়, বলুক যে যা' খুসী, আমাদের ছুটে যেতেই হবে। অমরের শরীরটার চেয়ে ত আমাদের অভিমানটা বড় নয়।

মুহূর্ত্তে সরযূর মুখখানি মলিন হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখ ভারী করিয়া কহিল—এবার কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে অজয় দা'। আর যাই হোক্‌, শেফালী আমারই ত বোন্‌, তাকে শুধু শুধু অপমান করছ কেন বলো ত? বালাই, ষাট্‌, সে বেঁচে থাক! তার অধিকার আমার চেয়ে কম কিসে!

অজয়ের মুখ লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। অপ্রস্তুত হইয়া সে কহিল—তার কথা আমার মনে পড়ে নি সরযূ, সত্যি বলছি, পড়লে ও কথা মুখ দিয়ে বেরুত না। তুই বরং—

সরযূ বলিল—আমি বরং কি বলছ অজয় দা', হলপ করিয়ে নেব যে, এরপর আর কখন ও কথা বল্‌বে না? তাই কর অজয় দা'। শুধু তুমি কেন, দুই ভাই-বোনে আজ প্রতিজ্ঞা করি এস, এরপর শুধু তাদের কারণে ছাড়া আমরা আর ও বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াব না। মনের মত অবিশ্বাসী শত্রু পৃথিবীতে আর দু'টি নেই; তার ছলনায় ভুলে হয় ত একদিন আমরা শেফার অকল্যাণ ক'রে বস্‌তে পারি। কাজ কি আমাদের সে ঝঞ্ঝাটে বলো ত?

অজয় একবার সরযূর পানে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাঢ়কণ্ঠে বলিল—তোর দ্বারা কারও কখন অকল্যাণ হবে না বোন্‌, বরং তোকে না পেলেই অকল্যাণ হ'তে পারে। তবু তোর যখন ইচ্ছা, তখন সেই প্রতিজ্ঞাই করলুম। কিন্তু—

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সরযূ বলিয়া উঠিল—আর কিন্তুতে কাজ নেই অজয় দা', ওই ছোট্ট কথাটা সৃষ্টি হওয়ার দিন থেকে মানুষকে জ্বালিয়ে মারতে সুরু করেছে। ওকে আমাদের ভুল্‌তেই হবে।

বাহিরে কাহারা ডাকিল—অজয়বাবু, বাড়ী আছেন?

সরযূ সবিস্ময়ে অজয়ের পানে চাহিল। ডাক্‌ শুনিয়াই অজয়ের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। লছমনকে দিয়া বাবুদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া দিয়া কোনরকমে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—এখানকারই লোক সরযূ। বাজারে আলাপ হ'ল, বড় মাছ কিন্‌ছি দেখে মস্ত জমীদার ঠাউরে এসে ধরলে—দুর্গত-ত্রাণ না কি এক সমিতি তাঁরা খুলেছেন, সাহায্য করতে হবে। যত বলি—হবে না, কোথায় পাব? ছাড়ে না কিছুতেই। বাধ্য হয়ে বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে আস্‌তে হ'ল। চিনেজোঁক! দেখো না, ঘণ্টা কাটতে সবুর সয় নি, এসে হাজির হয়েছে। কি করি বল্‌ ত?

সরযূ হাসিয়া বলিল—লছমন তোমাকে ফকির না ক'রে আর ছাড়বে না দেখছি! কি আর করবে অজয় দা', এসেছে যেকালে, কিছু দিয়েই ফেলো।

—তুই ত বল্‌লি দিয়েই ফেলো। শুধু দিয়েই কি ছাড়ান আছে না কি! হয় ত বল্‌বে—চলুন, একবার সমিতি-ঘর দেখে আসবেন। তাদের কি, তারা ত লোকের সুবিধা-অসুবিধা বুঝ্‌বে না, নিজের কাজ হলেই হ'ল।

—বেশ ত, ঘুরেই এস না অজয় দা', রান্না হতেও ত দেরী আছে।

অজয়ের মুখে যেন হাসি ফুটিয়া উঠিল। তথাপি সে

বলিল—লছমনকে দিয়েই বাইরে থেকে তাড়াতুম। তবে তুই যখন বল্‌ছিস্—

মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিয়া সরযূ কহিল—তাই বুঝি হয়, তাড়াতে আছে না কি কাউকে?

—খুব আছে। কিন্তু তাড়ালুম না তোর মনে কষ্ট হবে বলে। নইলে—

ঘরের মধ্য হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া আনিয়া অজয়ের পকেটে পূরিয়া দিতে দিতে সরযূ বলিল—নইলে কি করতে, পরে ফিরে এলে শুন্‌ব 'খন অজয় দা'। ওঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তুমি ঘুরে এস।

—লোকগুলো যাদু জানে দেখ্‌ছি, তোকেও এরই মধ্যে বশ করে নিয়েছে। যাই, ঘুরেই আসি—বলিয়া অজয় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

লছমন এতক্ষণে সরযূর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল—মা, দাদাবাবু তোমায় বড় ভয় করেন, না গো?

সরযূ হাসিয়া বলিল—ভয় কর্‌বেন কেন লছমন?

—কেন করেন জানি না মা। তবে ভয় যে করেন, এই কথাই বল্‌তে পারি। আজ সকালে উঠে বেরুন থেকে তোমাকে না বলে আসাটা যে কতবড় অন্যায় হয়েছে তাই বোঝাতে বোঝাতেই চলেছেন। একবার কবে বড় দাদাবাবু আর ছোট দাদাবাবু দু'জনে মিলে তোমাকে না জানিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন। ফিরতে রাত হয়ে গেছে। বাড়ীর দরজা বন্ধ, অথচ ডাকবার সাহস কারও হচ্ছে না। শেষে তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন, এমন সময় কেমন ক'রে জান্‌তে পেরে তুমি দরজা খুলে দিলে। বাড়ীতে ঢুক্‌লেন বটে, কিন্তু সারা রাত্রির মধ্যে সাধ্য-সাধনা করেও কেউ তোমাকে কথা বলাতে পারলেন না। তিন দিনের দিন শেষে রফা হ'ল না জানিয়ে আর কখন তাঁরা বেরোবেন না। যদি কেউ বেরোন, তার শাস্তি হবে সাত দিন কথা বন্ধ। একথা জানাতেও বাদ পড়ে নি।

সরযূ লজ্জারক্ত মুখে বলিল—তা' না পড়ুক, কিন্তু তুমি কেমন ক'রে এত সুন্দর বাংলা কইতে শিখ্‌লে লছমন? বাঙালীও যে এত ভাল ক'রে বল্‌তে পারে না।

লছমন হাসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—মার যেমন কথা! ভাল ক'রে কি মন্দ ক'রে জানি না, তবে ছেলেবেলায় কোলকাতা গিয়ে তোমাদেরই দোরে পড়েছিলুম মা। বাবুরা দয়া করতেন, মায়েরা দয়া করতেন, তাঁদেরই কাছে শিখেছিলুম যা' কিছু। শেষ বয়সে আর ভাল লাগ্‌ল না, বাবু মারা যেতে কাশীতে বাবার আশ্রয়ে এসে উঠেছি। যা' করেন বাবা বিশ্বনাথ।

সরযূ বলিল—বাবা বিশ্বনাথ তোমার ভালই করবেন লছমন।

—করবেন বই কি মা, নইলে তোমাদের মিলিয়ে দেবেন কেন? হ্যাঁ, কি বলছিলুম—বাবুর কিন্তু যত তাল শেষটা গিয়ে পড়ল আমার ওপর। বললেন—তোর জন্যেই ত যত ফ্যাসাদ ঘট্‌ল। আমি কিছু জানি না, তোর দিদিমণিকে তুই বোঝাবি হতভাগা। সকালবেলা উঠে সারা সহর প্রদক্ষিণ না করলে যেন ভাত হজম হচ্ছিল না। বল্‌লুম—আমার দোষ কি বাবু, আপনিই ত ভোরবেলা উঠে আমাকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

—বেরিয়ে পড়লুম। বলিস্ কি রে, কাজ থাক্‌লে বেরুতে হবে না? আচ্ছা বিপদে পড়েছি যা' হোক্! করতে করবে দোষ, মুখে বল্‌তেও পাব না। কেন, তোর মুখে কে হাত চাপা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল বল্ ত, যে, একবার দিদিমণিকে ডেকে বলে আসতেও পারলি না, কাজ আছে, দাদাবাবুকে নিয়ে চল্‌লুম একটু।

সরযূ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—তা' ত ঠিক বলেছেন উনি, তোমারই ত দোষ লছমন।

লছমন হাসিয়া বলিল—আগে সবটাই শোন মা, তারপর ত বল্‌বে কার দোষ, কার গুণ। বল্‌লুম—বা রে, আপনিই যে বল্‌লেন—তোর দিদিমণিকে ডাকিস্ নি, বেচারীর সারা রাতই হয় ত ঘুম হয় নি, একটু ঘুমুক।

—বলে থাক্‌লে কি মহা অন্যায় করে ফেলেছি—ভুঁড়ো ছাতুখোরের আর কত বুদ্ধি হবে! একটু শুতে জিরুতে না দিলে মানুষ বাঁচবে ক'দিন বল্ ত হতভাগা?

—দাদাবাবুকে বুঝতে আর বাকী রইল না মা। চুপ করে গেলুম। তিনি হেসে বললেন—তা' ছাড়া, এত ভয়ই বা তোর কিসের। এক রাশ দাল রুটি হজম করে এতবড়

শরীরটা তৈরী করতে যে কালে পেরেছিস্, দিদিমণির দু' দশটা বকুনি খুব হজম হয়ে যাবে। বুড়ো বয়সে আর মিথ্যা বলিস নি, বুঝ্লি? বোঝা ছাড়া আর উপায় কি। কিন্তু ওই বাবুদের সঙ্গে আলাপ হবার পর যদি ওর অবস্থা দেখ্তে, হলপ করে বল্তে পারি তুমিও হাসি সাম্লাতে পারতে না মা।

প্রাণপণে গম্ভীর হ'তে চাহিয়া সরযূ বলিল—কেন রে?

—গরীব দুঃখীদের জন্যে বাজার থেকে স্বদেশীবাবুরা দু'-এক পয়সা করে চাঁদা তুল্ছিলেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হতেই একেবারে আট আনা পয়সা আমায় দিতে বলে দিলেন। বল্লেন—আমার কাছে কিছু নেই। বাড়ী যাবেন, আমার বোন্ বড় দয়ালু, তিনি সাহায্য করবেন। সেই সময় আমিও সঙ্গে গিয়ে আপনাদের আশ্রম দেখে আস্ব। বাবুরা ত ঠিকানা নিয়ে চলে গেলেন। দাদাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখি একেবারে ছায়ের মত শাদা হয়ে গেছে। বল্লুম—কি হ'ল বাবু? বল্লেন—কিছু না, এখন আর বাড়ী যাব না লছমন, তুই গিয়ে বরং তোর দিদিমণিকে বলিস্—ফিরতে সন্ধ্যে হবে আমার। আর বাবুরা এলে—বাড়ী না যাবার কারণ বুঝতে পারলুম। বল্লুম—সে কি বাবু, তাও কি হয়।

—খুব হবে লছমন। তুই তোর দিদিমণিকে জানিস্ নি, ও বড় বদরাগীরে! নিজের উপায় করবার ক্ষমতা নেই, দাতব্য করতে খুব আছি বলে যদি রেগে যায়—না না, তুই ফিরে যা', বাবুদের বলিস—সুবিধা হবে না। সত্যিই ত হাতই যার—

অশ্রুপূর্ণ চোখ দুইটী অন্যদিকে ফিরাইয়া সরযূ বলিল—দাদার কথা শোন কেন লছমন! বোনের হাতে ঘর-সংসারের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে কি না, তাই অমন করে বলেছে। আসুক না একবার—

—দোহাই মা তোমার, বুড়োর নাম করো না যেন! আমাকে তা' হ'লে আর ঘর করতে হবে না—বলিয়া লছমন হাত দুইটি যোড় করিয়া সরযূর পানে চাহিল।

সরযূ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—অজয় দা' ঠিকই বলেছেন লছমন। চেহারাই আছে, মনে জোর নেই একটুও। বেশ বল্ব না কিছু, হ'ল ত?

লছমন হাসিয়া বলিল—হ'ল বই কি মা। ছোড় দাদাবাবুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি মিথ্যা বল্ব না। বুড়ো বয়সে শেষটা কি মিথ্যাবাদী হবো?

সরযূ সে কথার কোন উত্তর দিল না; মুখ টিপিয়া হাসিয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

চল্লিশ

অজয়ের আশঙ্কা অমূলক হইয়া বদরাগী সরযূর পরিবর্ত্তে লছমনের রাগ কিন্তু দিন দিন প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সেদিন সে স্পষ্টই বলিয়া বসিল—মাপ কর মা-ঠাক্রুণ, অমনভাবে কাজ আমার পোষাবে না। এর চেয়ে ছুটিই দাও বরং, চলে যেয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি!

সরযূ খাইতে বসিয়াছিল। বলিল—কি হ'ল, হঠাৎ ক্ষেপ্লে কেন লছমন? মা হই, বেশী কাজ হচ্ছে বলে আমায় ছেড়ে যেতে পারবে ত?

—ভারী ত কাজ! কাজের ভয়—তোমার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ থাকলে লছমন কোনকালে করে না মা। এই দেহে বলো না, ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারটা অবধি কাজ করতে রাজী আছি আমি, কিন্তু—

সরযূ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—কিন্তু কি লছমন?

লছমন ঘাড় নাড়িয়া বলিল—কাজ করতে শিখেছি, বাসন মাজা বলো, ঘর ঝাঁট দেওয়া বলো, জল তোলা বলো, সব জানি, করব—কিন্তু পোদ্দারের দোকানে যেতে আর পারব না আমি।

সরযূ একগাল ভাত মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল—ও মা, এই জন্যে রাগ! কিন্তু সে কথা ত ভেঙেই বলেছি তোমায়—পুরনো ধরণের গয়না আমার পছন্দ হয় না; নতুন করে গড়াব বলেই ত সব বিক্রী করে ফেল্ছি।

লছমন মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল—ফেলো মা, তোমার জিনিষ তুমি বিক্রী করে ফেলো, উড়িয়ে ফেলো, পুড়িয়ে ফেলো, আমার কি দায় যে, আমি বলতে যাব!

বাড়ীতে থাকলেই বল্‌তে হয়। বাড়ীতেই থাকব না আর আমি। ছোট দাদাবাবু বলেন—ছাতুখোর বেটার বুদ্ধি হবে কোথা থেকে! তুমি হয় ত তাই মনে মনে বিশ্বাস কর—নইলে এমন করে ঠকাতে পার আমায়?

সরযূ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—তোমায় আবার কখন ঠকালুম লছমন, কে বললে বুদ্ধি নেই তোমার?

—নেই মা, সত্যিই নেই। নইলে তোমার কথায় বিশ্বাস করে এই ক'মাসে এতগুলো গয়না বিক্রী করে এসেছি! যা' হয়ে গেছে হয়ে গেছে—আর না। দাদাবাবু ঠিকই বলেন—তোমার মুখখানা গড়বার সময় বিধাতা-পুরুষ ভুল করেছিলেন। দেখ্‌লে বিশ্বাস না করে থাকতে পারা যায় না।

সরযূ হাসিয়া বলিল—তাই বা সত্যি হচ্ছে কই, তুমিই ত বিশ্বাস কর্‌ছ না।

—করছি না মা সাধে, অনেক ঠকে মা, অনেক ঠকে! বেশ, এখনই তোমার কথা মাথা পেতে নেবো—এই ক'মাসে যতগুলো টাকা এনে দিয়েছি, বার কর দিকি। সব কেন, অর্দ্ধেক, সিকি টাকাই আন দিকি, মাথা হেঁট ক'রে তুমি যা' বল্‌বে করব।

—বারে, খরচা নেই না কি!

—কে বল্‌ছে নেই মা খরচা। কিন্তু দু' হাতে বিলুলে তুমি আমি কোন্ ছার, রাজার রাজাই যে চলে যায়। ছোট দাদাবাবু রোজ এসে তোমার কাছে টাকা চান, তুমি একদিনও ত বল্‌তে পার, কোথায় পাব আমি। তা' নয়, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ ক'রে ত তিন শ' চার শ' টাকাই এ ক'মাসে দান ক'রে ফেলেছ। তারপর?

সরযূ ভাতগুলা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল—তারপর তুমি আছ লছমন, মাকে ত আর ফেল্‌তে পারবে না?

লছমন হাসিয়া ফেলিল। বলিল—এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছ মা! কিন্তু যাই বলো, আর নয়—আজই ছোট দাদাবাবুকে বল্‌তে হবে। তুমি পারবে না যখন, তখন আমিই বল্‌ব। এমন ক'রে—

পাত হইতে হাত উঠিয়া গেল। উদ্বেগভরা-কণ্ঠে সরযূ বলিয়া উঠিল—অমন কাজও কর না লছমন, লক্ষ্মী বাবা আমার! তুমি জান না, কিন্তু আমি ত জানি—কত বড় করে একথা তাঁর বুকে গিয়ে বাজ্‌বে! সারা জীবন উনি দিয়েই এসেছেন, দিতেই জানেন, কোথা থেকে আস্‌ছে এ খবর কোনদিন নেন্ নি, আজও নিতে ভুলে গেছেন। যে কথা ওঁর ভগ্নীপোত কখন স্মরণ করিয়ে দেন নি, বোন্ হয়ে সে কথা আমি কেমন করে দেবো বলো ত?

লছমন হতভম্বের মত সরযূর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—কিন্তু সেদিন ত আস্‌বেই মা, তখন?

—তখন কি হবে জানি না। সেদিন যদি আসেই, কোন ক্ষোভ ত মনে রাখবার থাকবে না লছমন! অজয় দা' বড় দুঃখী, তার দুখিনী বোন্ সাধ্যমত চেষ্টা করছে তার মুখে হাসি দেখ্‌বার! সে সুখ থেকে বঞ্চিত করাই যদি ভগবানের অভিপ্রায় হয়, তবে কার কাছে অভিযোগ কর্‌ব বাবা! বলিতে বলিতে সরযূ চুপ করিল। কিন্তু বুকের ভিতর হইতে কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যে একরাশ জল চোখের কোণে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে কোনক্রমেই রোধ করিতে পারিল ন

লছমনের চোখের কোণেও জল টলমল করিয়া উঠিল। সে গাঢ়কণ্ঠে বলিল—আমি ভূত, জংলী মানুষ। খেতে বসিয়ে তোমার চোখে জল ফেলালুম। আমায় মাপ কর তুমি।

ধরাগলায় সরযূ বলিল—ছি, ও কথা বলো না! তোমার দোষ কি, তুমি আমায় মেয়ের মত ভালবাস, তাই ত সাবধান করতে চেয়েছ লছমন।

—ছাই চেয়েছি! এই নাকে কানে খৎ দিলুম মা, এরপর যদি কখন তোমার কথার ওপর কথা বলি। দাও, আজ কি বিক্রী করতে দেবে বল্‌ছিলে?

হাসিতে চাহিয়া সরযূ বলিল—বারে, আজ আবার কখন কি বিক্রী করতে দেব বল্‌লুম! ও, কাল রাত্রে অজয় দা' গোটা পঁচিশ টাকা চাচ্ছিল। কারা কোল্‌কাতা থেকে এখানে এসে জোচ্চোরের হাতে সব

খুইয়েছে। বাড়ী যাবার পয়সা নেই বল্‌ছিল। বিকেলে আমি দেবও বলেছি। তোমার ত সব দিকে কাণ আছে লছমন।

লছমন ভাল-মন্দ কোন উত্তর দিল না; গামছা দিয়া নিজের চোখ দুইটা ভাল করিয়া মুছিতে লাগিল।

* * *

সমিতির একখানি খাটিয়ায় বসিয়া দুইটী প্রাণী তখন তাহাদের হৃদয়ের ভাব বিনিময়ে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। অজয় হাসিয়া বলিল—তোমারও আচ্ছা সাহস ভাই, কাশীর গুণ্ডা জেনে-শুনেও কেমন করে একলা ধরতে গেলে বলো ত?

যুবকটী হাসিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। অজয় বলিল—সারা রাত্রি ঘুম হয় নি, তাই আজ সকাল সকাল খেয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমারই বোন্ ত শোনা থেকে ছট্‌ফট্ করছে। বল্‌লে—যাও দাদা, দেখে এস। বিদেশ বিভূঁই, আহা, কার বাছারে!

যুবকটী এবার কথা কহিল। বলিল—বিদেশ বিভূঁই আর কোথা রইল অজয় দা', আপনাদের যত্নে বাড়ীর কথাই ভুলে গেছি। কোথায় একটু চোট্ লেগেছে কি লাগে নি, ব্যাণ্ডেজ করে ছেড়ে দেওয়া দূরে থাক্, ডাক্তারবাবু ত বাড়ীতেই নিয়ে গিয়ে তুল্‌ছিলেন। বল্‌লুম—মাপ করবেন, মেয়েদের মধ্যে মরে গেলেও যাচ্ছি না। যদি কোন সমিতি-টমিতি থাকে বলুন, সেখানে দু'-একদিন পড়ে থাক্‌তে পারি বরং। যদিও বা এখানে এসে উঠ্‌লুম, আপনি বাড়ী থেকে খাবারের, বিছানারে, সব এনে হাজির করলেন।

—তা' খুব করলুম! বল্‌ছ বলে যাও, বাধা দেব না। কিন্তু মেয়েদের ওপর এমন সৃষ্টিছাড়া রাগ তোমার কোথা থেকে এল ভাই? এ সময় যে মেয়েদের সেবাই ছিল সব চেয়ে বড় দরকার।

যুবকটী মাথায় হাত ঠেকাইয়া কহিল—তাঁরা মাথায় থাকুন, এ বেশ আছি অজয় দা'। দেখুন না, কোল্‌কাতায় এলুম নতুন স্কুল খোলা হবে তার কতকগুলি জিনিষ-পত্র কিন্‌তে। কেনা যদিও বা হ'ল, মন গেল ফুট—কিন্তু নিজে বাড়ী আর ফিরতে পারলুম না। হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকে দেখি, সেইমাত্র গাড়ী ছেড়ে গেছে। তখন দু'ঘণ্টা কর্ম্মভোগ। ওয়েটিং-রুমে বসে থাক্‌তেই হবে। কি করি, সেখানেই ঢুক্‌লুম—তখন এক কোণে একটী মেয়ে আর একটী পুরুষে কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

অজয় উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল—তারপর?

—তারপর চেয়ারে বসে হয় ত একটু ঢুলও এসে থাক্‌বে। হঠাৎ মেয়েটীর কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। শুন্‌লুম মেয়েটী বল্‌ছে—কোথায় নিয়ে এলে আমায়? আমি যাব না। আমায় বাড়ী পৌঁছে দাও। পুরুষটী বোধ হয় চুপ করতে বল্‌লে। মেয়েটী চুপ করল না। বল্‌লে—চুপ করব না আমি, বলো কোথায় নিয়ে এলে আমায়?

—আর বসে থাকা সঙ্গত মনে করলুম না। এগিয়ে যেতে-না-যেতেই কিন্তু লোকটা কোথায় সড়ে পড়ল। মেয়েটীর মুখে শুন্‌লুম, তারা কাশীর লোক। ওই লোকটীর কথায় এখানে এসে পড়েছে। এখন কোন উপায়ে কাশী পৌঁছে দিলে তার জাত এবং মান দুই বাঁচে। তথাস্তু! লোকটার খোঁজ করতে চাইলুম; কিন্তু মেয়েটী তা' করতে দিলে না। বল্‌লে—গেছে যাক্, ওকে দেখ্‌লেও ভয় করে আমার।

—কাশীর গাড়ী তখনই ছাড়্‌বে। কোন কথা নয়, দু'খানা টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠে পড়্‌লুম। মেয়েটীকে একটী জেনানা গাড়ীতে তুলে দিতে চাইলুম, কিন্তু সে শুন্‌লে না। বল্‌লে—তা হ'লে লোকটা তাকে খুনই করে ফেল্‌বে হয় ত। একধারে তাকে বসিয়ে, নিজে অন্যধারে খানিকটা দূরে গিয়ে বস্‌লুম। গাড়ী চল্‌তে লাগ্‌ল।

—কাশীতে এসে পৌঁছন গেল। মেয়েটী বায়না ধর্‌লে বাবার শ্রীচরণে না পড়ে সে বাড়ী ঢুক্‌বে না। তাকে স্নান করিয়ে নিয়ে যেতে চাইলুম মন্দিরে। কিন্তু তার অনুরোধ হ'ল, আমাকেও স্নান করে বাবার কাছে প্রার্থনা করতে হবে— যাতে তার বাড়ীতে স্থান হয়।

—নিরুপায় হয়ে তাই করলুম। সে স্নান করে এসে দাঁড়ালে। বললে—যে চোরের উৎপাত! আমি দাঁড়াই, আপনি কাপড়চোপড় রেখে স্নান সেরে আসুন। তাই

করতে হ'ল। বেশ করে মাথা ঠাণ্ডা করে ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পেলুম না। শুধু কাপড়-চোপড় নয়, তার মধ্য থেকে শ'খানেক টাকাও উধাও হয়েছে। খানিক হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে লোককে জিজ্ঞাসা করতে জান্‌লুম—মেয়েটাই সেগুলো তুলে নিয়ে ওই দিকে চলে গেছে। আমার লোক জেনে তারা কিছু বলে নি। সেই দেখান পথ ধরে এগিয়ে চল্‌লুম—হঠাৎ দেখি খানিকটা দূরে মেয়েটার সঙ্গী পুরুষটা দাঁত বের করে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে। তাকে ধরতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তা' আর সম্ভব হ'ল না। আর একটী ভদ্রলোকের পকেট-কাটাকে ধরতে গিয়ে এখানে এসে পৌচেছি।

অজয় পরম আগ্রহে গল্পটা শুনিতেছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কিন্তু এরই জন্যে তুমি নারী বিদ্বেষী হয়ে উঠ্‌লে ভাই!

যুবক বলিল—এটা কি খুবই অস্বাভাবিক অজয় দা'?

অস্বাভাবিক না হতে পারে, কিন্তু অন্যায় যে, তা'তে ত ভুল নেই ভাই! কুসুমে কীট দু'-একটা হয় ত থাকে, তাই বলে সমস্ত ফুলকে বাগান থেকে কেটে বাদ দেবার মত যুক্তি যার মাথায় ঢোকে, তাকে পাঁচজনে কি বলে বলো ত?

—হয় ত পাগল বলে অজয় দা', কিন্তু অন্য গাছগুলা বাঁচাবার জন্যে—

অজয় বাধা দিয়া বলিল—প্রয়োজন হ'লে যে ফুলটায় পোকা ধরেছে, তাকে ফেলে দিতে পার বটে, কিন্তু তার চেয়ে দেখ্‌তে হবে গাছের ধার দিয়েও যাতে পোকা না আসে। পোকার ধর্ম্ম ফুল নষ্ট করা, কিন্তু ফুলের যে সতন্ত্র ধর্ম্ম ভাই!

যুবক কথা কহিল না। অজয় কহিল—তোমার কোথায় বেধেছে জানি না, তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বল্‌তে পারি—মেয়েদের অত সহজে বিচার করা সঙ্গত নয় ভাই! অন্য দূরের কথা, তাদের বাদ দিয়ে যে ধর্ম্ম আর্য্য জাতির গৌরব বলে পূজা পেয়ে এসেছে—তা' অসম্পূর্ণ, পঙ্গু! তাই আজ তাকে শুধু মেয়েদেরই করুণার ওপর অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়েছে।

যুবক বলিল—ধর্ম্মের তর্ক বহুধা, ওর মীমাংসাও কঠিন অজয় দা'। তার চেয়ে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে গল্প বলুন, তা'তে হয় ত ঢের বেশী শিখ্‌তে পারব আমি।

অজয় হাসিয়া বলিল—গল্প, তাই বলি ভাই। যদি বিশ্বাস হয়, এরপর থেকে মেয়েদের শ্রদ্ধা করতে শিখো। ষ্টেশন থেকেই আরম্ভ করা যাক্। তখনও গাড়ী ছাড়তে ঘণ্টাখানেক দেরী। দু'টী প্রাণী ক্রমে প্ল্যাটফর্ম্মে এসে দাঁড়াল। একটী স্ত্রীলোক, অপরটি পুরুষ। দু'জনের মুখেই কথা নেই। রাত্রি তখন সাড়ে ন'টা। অজস্র জনস্রোত এগিয়ে চলেছে। তারা দুটিতেই বোধ করি পথহারা।

—মেয়েটী প্রথম কথা কইলে—বল্‌লে কোথায় যাবে? টিকিট করবে না?

—ছেলেটী চম্‌কে উঠ্‌ল। শুধু দু'টি কথা, তা'তেই তার সমস্ত ধমনীতে তপ্ত রক্ত প্রবাহ বয়ে চলল। সে ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। দু'খানা টিকিট কিনে এনে বল্‌লে—চলো, সামনের গাড়ীতেই ওঠতে হবে আমাদের।

—মেয়েটী কোন কথা বল্‌লে না, এগিয়ে চল্‌ল।

—বিরাট বাষ্পীয় যান তার বাঁধা পথ দিয়ে ছুটে চল্‌ল। নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে যখন তারা নামল, তখন ভোর হয়ে গেছে। খানিকটা দূরের একটা কলের চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া উঠ্‌ছে। ছ'টার সিটি বেজে উঠ্‌ল।

—মেয়েটী এবার কথা কইলে। বল্‌লে—ষ্টেশনে কতকক্ষণ দাঁড়াব, ঘর ঠিক করবে না?

—দু'-একজনকে জিজ্ঞাসা করতে একখানা বাড়ী পাওয়া শক্ত হ'ল না। ভাড়া নাম মাত্র। সেখানে গিয়েই তারা দু'জনে উঠ্‌ল।

—তারপর সংসারের জিনিষ-পত্র কেনার হিড়িক পড়ে গেল। ছেলেটি সব কিনে কিনে আন্‌তে লাগল। মেয়েটী ফর্দ্দ মিলিয়ে মিলিয়ে ঘরে তুল্‌তে সুরু কর্‌লে। কেমন লাগ্‌ছে ভাই?

—রুদ্ধ নিশ্বাসে ছেলেটী বলিল—বেশ! তারপর?

—ছেলেটী থেতে একটু বেলাই হবে ভেবেছিল; কিন্তু তা' হ'ল না, ঠিক্ সময়েই মেয়েটী ভাত বেড়ে তাকে খেতে ডাক্‌লে। ছেলেটি অবাক হয়ে চেয়ে দেখ্‌লে—এরই

মধ্যে তার যতগুলি প্রিয় খাদ্য সবই রান্না হ'য়ে গেছে। মেয়েটী বল্‌লে—বসো, হয় ত খাবার সময় উতরেই গেল তোমার।

—না না, ঠিক্ সময়েই ত হয়েছে—বলে ছেলেটি খেতে বস্‌ল।

—পাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে মেয়েটী বল্‌লে—তুমি যে ঝিটাকে বাজার থেকে পাঠিয়েছিলে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কি হবে, দু'টো লোকের ভারী ত কাজ, তা' আর পার্‌ব না?

—ছেলেটি মুখ তুল্‌তে পার্‌লে না। চুপ করে বসে খেতে লাগল। মেয়েটী হেসে বল্‌লে—রান্না ভাল হয় নি বুঝি? যাই হোক্, কিছু ফেলে গেলে চল্‌বে না। কাল রাত্রে ত কিছুই খাওয়া হয় নি তোমার।

—খাওয়া হয়ে গেল। একটা চৌকীতে বিছানা পেতে দিয়ে মেয়েটী বল্‌লে—ঘুমোও। বিনা প্রতিবাদে ছেলেটী চুপ করে শুয়ে চোখ বুজল।

—বিকালে যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন মেয়েটী তার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। বল্‌লে—ডাক্‌ব ভাবছিলাম, ওঠো, বেলা নেই আর। রাত্রে কি খাবে বলো ত?

—ছেলেটি কথা বল্‌তে পার্‌লে না। মেয়েটি বল্‌লে—অনেকদিন থেকে সাধ ছিল, তোমার সংসারে দিনকতক গিন্নীপনা করবার। এ বেশ হ'ল! বৌ এলে ত আর ঢুকতে দিতে না! বারে, কই, কি খাবে বল্‌লে না যে বড়?

—ছেলেটি এবারও কথা বল্‌তে পার্‌লে না। চুপ করে মাথা নীচু করে বসে খানিক কি ভাবলে, তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—মেয়েটি তার চলা-পথের পানে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেল্‌লে। কিন্তু সেই এতটুকু বাতাস বায়ুস্তরে মিলিয়ে গেল না—কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে তাদের দু'জনের মাঝখানে একটা অভেদ্য ব্যবধানের মত হয়ে রইল।

—ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, মেয়েটি এত কাছে থেকেও যেন কতদূরে চলে গেছে। —দিন ও রাত্রির ক্রম বিবর্ত্তনের মধ্যে কত অলেখা ইতিহাস যে আত্মগোপন করলে, কে তার সংখ্যা রাখে!

—ছেলেটি একদিন বল্‌লে—চলো, ফিরে যাই আমরা।

—মেয়েটি হাস্‌লে। উত্তর দিলে না। ছেলেটি মাথা নীচু করে বল্‌লে—নইলে চল্‌বে কেমন করে, হাতে ত পয়সা নেই।

—মেয়েটির মুখে এবারও সেই হাসি। সে বল্‌লে—কিন্তু চলা ছাড়াও ত উপায় নেই।

—ছেলেটি আর কোন কথা বল্‌লে না। পরদিন মেয়েটি দেখ্‌লে—ভোর ছ'টার ভোঁর সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে চলেছে। কেমন লাগ্‌ছে ভাই?

—বেশ।

—কিন্তু এ ভাবে বেশীদিন চল্‌ল না। একদিন অনুতাপে দুঃখে উন্মত্ত হয়ে মেয়েটির স্বামীকে ছেলেটি তার অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা জানিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যে চিঠি লিখে দিলে। মেয়েটির স্বামী আর কেউ নয়, তারই বাল্যবন্ধু। ছেলেটীর বিশ্বাস ছিল—নিশ্চয়ই তার এই দুর্ব্বলতাটুকু বন্ধু ক্ষমা করবে। এ কথাও সে লিখ্‌তে ভুল্‌লে না যে, মেয়েটির কোন দোষ ছিল না, দোষী সে। নিজেই মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ভুলে সেদিন বায়স্কোপের শেষে তাকে নিয়ে এই দূর দেশে পালিয়ে এসেছে। ইত্যাদি। পোষ্টে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলে, কিন্তু কোনমতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারলে না। পরদিন কাজের সময় কি জানি কেমন করে তার দু'খানা হাতই কলের ভেতর চলে গেল।

ছেলেটি শিউরে উঠ্‌ল। অজয়ের পানে একবার ভাল করে চাইলে, কিন্তু কথা বল্‌লে না।

অজয় বল্‌তে লাগ্‌ল—যখন জ্ঞান হ'ল, তখন রাত্রি গভীর হয়ে উঠেছে। ডাক্তারেরা তার অকর্ম্মণ্য দু'খানা হাতের যে অংশ বাদ দেওয়া প্রয়োজন তা' দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে বল্‌লেন—ভয়ের বিশেষ কারণ নেই। তারপর শীগ্‌গির যাতে সে বাড়ী পৌঁছতে পারে, তার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

—বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যখন তাকে তুল্‌লে, মেয়েটি

তখন তারই প্রত্যাশায় আলো জ্বেলে বসে আছে। লোকগুলি তাকে নামিয়ে দিয়ে যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেল। ছেলেটির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। কেমন লাগ্‌ছে ভাই?

যুবকটীর গলা ধরিয়া আসিয়াছিল। বলিল—বেশ। কিন্তু বড় ট্র্যাজিক অজয় দা'!

অজয় হাসিয়া বলিল—কিন্তু ট্র্যাজিডি ওখানে নেই ভাই, ট্র্যাজিডি তার ওপরে।

—মেয়েটি তার হাত দু'টির পানে চেয়ে অচেতন হয়ে সেখানে লুটিয়ে পড়ল। যখন জ্ঞান হ'ল, আবার উঠে হাত দু'টির দিকে ভাল করে চেয়ে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—এতবড় সর্ব্বনাশ কেন তুমি করলে—কেন করলে!

—ছেলেটির মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—সর্ব্বনাশ নয়, এ আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার! তবু যদি জান্‌তাম —

—কি জান্‌তে ভালবাসি কি না? ও গো, আমি তোমায় বড় ভালবাসি! এত ভালবাসি, যা' তুমি কল্পনায়ও আন্‌তে পারবে না! তোমার ভালবাসা, ভালবাসা নয়—মোহ, তাই বিভ্রাট বাধিয়ে এসেছ। মিথ্যা বোন্ বলে তুমি একদিন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলে, কিন্তু সত্যকার বোনের দাবী নিয়ে আজও আমি বেঁচে আছি! নইলে আর কিছু না পারি, মরতেও কি পারতুম না মনে কর!

—ছেলেটি নির্ব্বাক বিস্ময়ে মেয়েটীর মুখের পানে চেয়ে রইল। মেয়েটি আপন-মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—মায়ের স্নেহ তুমি পাও নি, বোনের মমতা তোমার কাছে অজানা ছিল, তাই না আমি তোমার মায়ের অভাব, বোনের অভিযোগ মেটাতে এগিয়ে এসেছিলুম। যে ক্ষতি আমার হয়েছে তাও হাসিমুখে সহ্য করেছিলুম। কিন্তু আজকের এ ক্ষতি—

ছেলেটির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। সে বলে উঠল—এ ক্ষতি নয়, এ আমার চরম লাভ! অসহায় শিশুর মত এই হতভাগাকে মায়ের স্নেহ, বোনের ভালবাসা দিয়ে তোমায় টেনে নিয়ে যেতে হবে জীবন ভোর। যত বড় পাপই আমি করি না, প্রায়শ্চিত্ত যে তার এত মধুর হবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। সংসারের প্রথম পরীক্ষাতেই আমি অকৃতকার্য্য হলুম—কিন্তু তুমি এ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবে ত বোন্?

—মেয়েটি হাস্‌লে, কথা কইলে না।

—কিন্তু সে হাসি কত অ-বলা কথা যে বলে গেল, তা' ছেলেটির বুঝ্‌তে বাকী রইল না।

—ক'দিন পরে মেয়েটীর স্বামীর কাছ থেকে চিঠি এল—যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই কঠোর। কল্পনা-বিলাসী ছেলেটি এতে চম্‌কে উঠ্‌ল—কিন্তু মেয়েটির মুখে সেই হাসি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

—বন্ধুটি লিখেছে—সে আবার বিবাহ করেছে, কাজেই মেয়েটিকে গ্রহণ করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়।

—মেয়েটি বল্‌লে—বেশ হ'ল দাদা! ভাবনা কেন? ভগবানের ওপর ত কারও হাত নেই; তিনি যে আমার বোঝা তোমারই কাঁধে চাপিয়ে রেখেছেন—পারবে না বইতে? ভয় কি, ভাই-বোনের ধর্ম্মের সংসার আমাদের যেমন করে হোক্ চলে যাবে।

—ছেলেটি কথা বল্‌লে না।

অজয় এইবার খানিক থামিল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—কেমন লাগ্‌ছে ভাই?

—চমৎকার অজয় দা'! আমি আপনার কথা শুনছিলুম, আর ভাবছিলুম—জাতির মেরুদণ্ড যে সাহিত্য, সংযমের আদর্শ ছেড়ে আজ সে কোন্ পথে নেমে চলেছে! মহত্তর কল্পনা, বৃহত্তর জাতি গঠন ক্ষমতা সকলের থাকে না, সে জন্যে যা' সৎ, যা' পবিত্র, যা' আমাদের বৈশিষ্ট্য, তাকেও বাস্তবতার নাম নিয়ে হারাতে বসেছি। মা, বোন্, বৌদি' নিয়ে হীনতম ছবি আঁক্‌তেও আমাদের কলম ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে না। যাক্ সে কথা। দিদির কাছে আমায় নিয়ে যাবেন অজয় দা'? কথা কইতে চাই না, শুধু দূর থেকে তাঁর পায়ের ধুলো একটু মাথায় নিয়ে আস্‌ব।

অজয়ের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যুবকটি বলিল—ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় মানুষ যে কোথায় নেমে যেতে পারে অজয় দা', তা' আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জানি বলেই আপনার অবস্থা বুঝ্তে পারছি। দুঃখ কি, ভুল করা মানুষের ধর্ম্ম, আবার তা' সংশোধনের ভারও মানুষেরই হাতে। আপনি যে প্রাণপণে তার চেষ্টা করেছেন—তাই যথেষ্ট। চলুন, দিদির কাছ থেকে ঘুরে আসি। মেয়েদের ওপর যে অবিচার করেছি, তাঁর পায়ের ধুলোয় দেখি যদি তার কোন প্রায়শ্চিত্ত হয়!

অজয় যুবকটীকে বুকে টানিয়া লইল। বলিল—আশীর্ব্বাদ করি, মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা তোমার দিন দিন আরও গভীর হয়ে উঠুক! কিন্তু আজই কি হাঁটতে পারবে ভাই?

—খুব পারব অজয় দা'।

—চলো তবে—বলিয়া অজয় যুবকটীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

সরযূ তখন জানালায় বসিয়া আপন-মনে কি একখানা ইংরাজি বই পড়িতেছিল। অজয় যুবকটিকে লইয়া কখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে জানিতে পারে নাই।

অজয় ডাকিল—সরযূ।

'কি' বলিয়া উত্তর দিতে গিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই অজয়ের সহিত একটী অপরিচিত যুবককে দেখিয়া সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিল।

অজয় বলিল—কিছুতেই শুন্‌লে না বোন্, ছেলেটি তোমায় দেখ্‌বে বলে ছুটে এসেছে। বল্লুম—অমন আঘাত পেয়েছ ভাই, না হয় কালই আসতে, বোন্ ত আর আমার পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও—

সরযূ তথাপি ভাল-মন্দ কোন কথাই কহিতে পারিল না। যুবকটী হঠাৎ তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল—দিদি থাক্‌তে বিদেশে বিভূঁয়ে একলা মরব, এমনই বোকা পেয়েছেন—তা' হচ্ছে না।

অজয় হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল—ওরে বাবা, তোমার পেটে পেটে এত চালাকী! তবু যদি খানিক আগে বাবুর মেয়েদের ওপর রাগ দেখ্‌তিস। জান্‌লি সরযূ, মেয়েদের মুখ দেখ্‌বার ভয়ে ডাক্তারবাবুর বাসায় পর্য্যন্ত যান নি। এখন—

সরযূ এইবার কথা কহিল। বলিল—এরই মধ্যে এমন কি হ'ল অজয় দা', যে, ভাইয়ের আমার মত বদলে গেল।

অজয় হাসিয়া বলিল—তোর গল্পে দাদার বোন্ পাওয়ার কথা শুনেই ওর দিদি পাওয়ার সখ জেগে উঠেছেরে।

সরযূর মুখ ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—তোমার যেমন কথা অজয় দা'! পাশে দিদির বাড়ী থাক্‌তে ভাই কি কখন বাইরে থাকে না কি! বেশ করেছ এসে। বসো না ভাই।

যুবকটী অজয়ের চৌকীর উপর বসিতে বসিতে বলিল—কি বই পড়ছিলে দিদি?

সরযূ মুখ ঘুরাইয়া বইখানি লুকাইতে লুকাইতে কহিল—ও কিছু না ভাই, এমনই—

অজয় হাসিয়া কহিল—আর চল্‌ল না সরযূ, ধরা পড়ে গেছিস। গোর্কির 'মাদার' পড়ছে ভাই। বোন্‌টী আমার গুণে লক্ষ্মী, বিদ্যায় সরস্বতী। ওর ইংরাজী লেখা যদি দেখ্‌তে অবাক হয়ে যেতে।

যুবকটির চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল - আঃ, বাঁচলাম এতদিনে!

অজয় অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সরযূও কম আশ্চর্য্য হয় নাই। সেও একবার যুবকের পানে চাহিয়া মুখ নামাইয়া লইল।

যুবক হাসিয়া বলিল—দিদিকে আপনি একেবারে নিজস্ব করে নেবেন এ হতে পারে না অজয় দা', তাই ভগবান আমাকে এখানে এনে তুলেছেন। আমাদের গ্রামে পায়ের ধূলো দিতেই হবে আপনাদের!

অজয় তথাপি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। যুবকটী হাসিয়া বলিল—আপনি পাগল মনে করছেন, না অজয় দা'? কিন্তু যাই ভাবুন—যেতেই হবে আপনাদের। আমাদের গাঁয়ে মেয়েদের একটী স্কুল খুলেছি, কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর অভাবে মুস্কিলে পড়েছিলুম—দিদিকে নিয়ে গেলে আর ভাবনা থাকবে না। যাবে ত দিদি?

এমনই আচম্বিতে কথাটা উত্থাপিত হইল যে, সরযূ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না। থতাইয়া গিয়া বলিল—দরকার হলে যাব বই কি ভাই! কিন্তু আমায় দিয়ে কি কাজ হবে তোমাদের?

—খুব হবে দিদি, খুব হবে! তোমাদের পেলে গ্রাম আমাদের ধন্য হয়ে যাবে! অজয় দা' ছেলেদের দেখ্‌বেন, মেয়েদের দেখ্‌বেন আপনি। মাইনে দিতে পারব না সত্যি, হাত-খরচা হিসেবে গোটা চল্লিশ টাকা মাসে মাসে দিলে চল্‌বে না?

সরযূর চোখের কোণে জল আসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রাণপণে সে তাহা রোধ করিয়া বলিল—খুব চল্‌বে ভাই, কিন্তু—

কোন্ ফাঁকে লছমন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল—কি মা, কাল ত নিজেই বলছিলে—এখানে কেমন শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোমার।

অজয় চমকিয়া উঠিল। বলিল তাই না কি! কই, কিছু ত বল নি আমায় সরযূ?

সরযূ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত একবার লছমনের প্রতি চাহিয়া বলিল—ওর কথা শোন কেন অজয় দা'। বুড়ো মানুষ, কি শুন্‌তে কি শুনেছে, যত সব মিথ্যে—

জিব কাটিয়া লছমন বলিল—শুন্‌তে হয় ত ভুল হতে পারে মা, অস্বীকার যাব না। কিন্তু মাপ কর, আর যাই করি মিথ্যা বলতে পারব না আমি। ছোড় দাদাবাবুর কাছে প্রতিজ্ঞা করার পর থেকে একটিও মিথ্যা কথা বলি নি। শুধু শুধু ও অপবাদ দিও না আর।

সরযূ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—আচ্ছা আচ্ছা বাবু, আর অপবাদ দেব না। এখন যা' ত।

লছমন হাসিয়া বলিল—তা' যাচ্ছি মা, কিন্তু উনি যা' বল্‌ছেন তাই কর—কি বলে ইস্কুলের কাজটা নিয়ে নাও।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সরযূ বলিল—কেন লছমন, তোমার এত তাড়া কেন বলো ত? পরের পয়সায় রেল চাপ্‌বে ভেবেছ বুঝি? তা' যাইই যদি, তোমাকে কিন্তু নিয়ে যাব না।

—নাই বা নিয়ে গেলে। হাত পা আছে, যেতে ত জানি, আমি ঠিক সময়ে হাজির হবো 'খন—বলিয়া লছমন ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

সরযূ যুবকটীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তোমার নাম কি তা' ত বল্‌লে না ভাই।

যুবকটী ধীরকণ্ঠে বলিল—অপূর্ব্ব। অপা বল্‌তেও পার দিদি।

সরযূ কথা কহিল না, শুধু একটু হাসিল মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
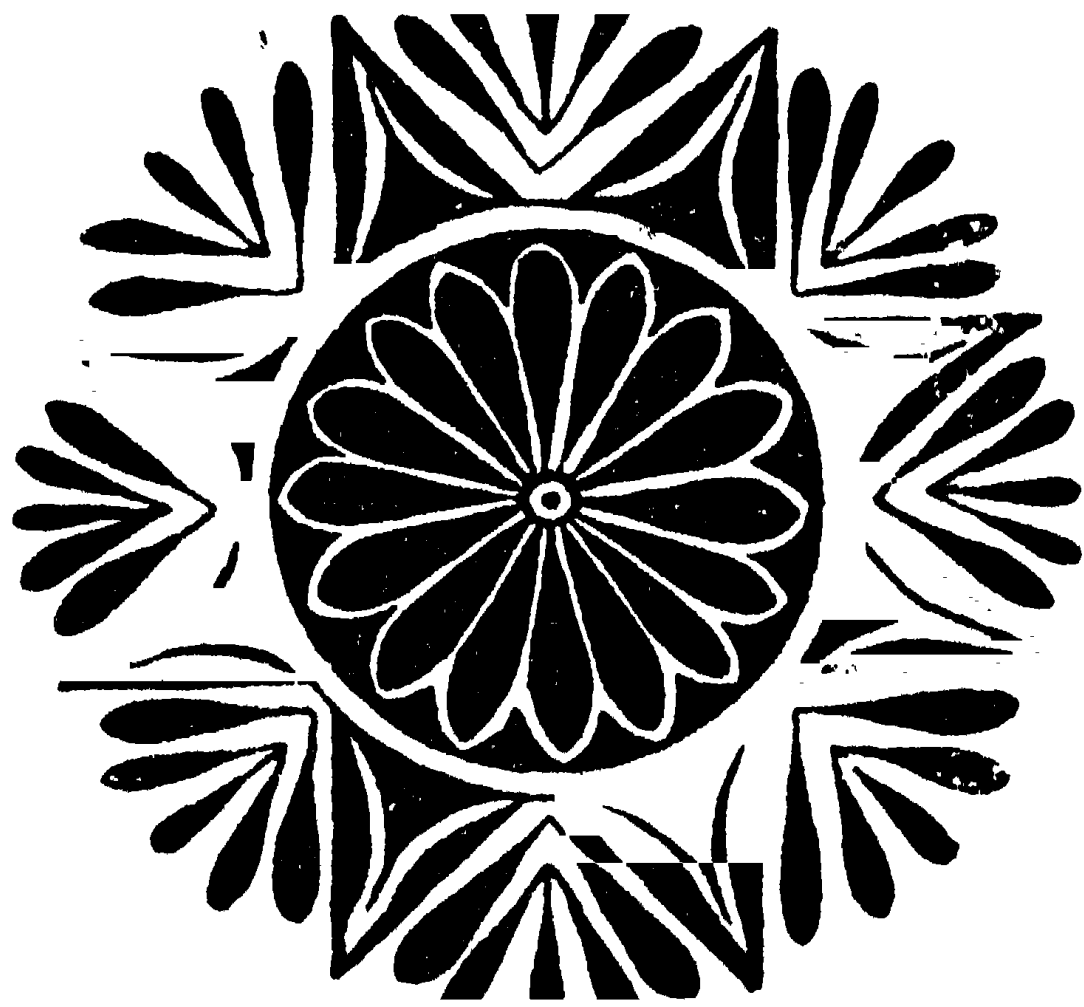
দক্ষিণ ভ্রমণ

পুরীধাম

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ভুবনেশ্বর সাধারণ লিঙ্গের ন্যায় নহেন। কৃষ্ণপ্রস্তর গঠিত বৃহৎ মূর্ত্তি। মূর্ত্তির শিরোদেশ শ্বেতরেখাযুক্ত। ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ অনাদি লিঙ্গ বলিয়া কথিত আছেন। পুরীর ন্যায় এইস্থানে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে। এক-দিকে ভগবতী মন্দির আছে, এই ভগবতীদেবীর নাম গোপালিনী; ইনি সিংহবাহিনী মূর্ত্তি। তাহার পর আমরা মুক্তেশ্বর ও রামেশ্বর দর্শন করিয়া অনন্ত বাসুদেব মূর্ত্তি দর্শনে চলিলাম। বাসুদেবের মন্দিরটী অতি সুন্দর। কিন্তু বোধ হইল বহুকাল এই সকল মন্দিরের সংস্কার হয় নাই। বাসুদেবের মন্দিরটিও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায়। সম্মুখে নাটমন্দির জগমোহন ও ভোগ মন্দির। এই মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত চিত্র সকল চমৎকার। একদিকে বিষ্ণুর বামন মূর্ত্তি আছে। এ মন্দিরটিও বৃহৎ। নাটমন্দিরে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। মন্দিরের ভিতরে বাসুদেব মূর্ত্তি। আমরা দর্শন ও প্রণাম করিয়া বাসায় আসিলাম।

এখানে জগন্নাথ প্রভুর মহাপ্রসাদের ন্যায় ভুবনেশ্বরেরও প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে। আমরা পাণ্ডা মহাশয়কে দু'টী টাকা দিলাম, তিনি প্রসাদ আনিয়া দিবেন বলিলেন, আমরা প্রভুর দর্শন পূজাদি সমাপন করিয়া পাণ্ডার বাসায় আসিলাম। সেখানে আসিয়া দেখি মহাপ্রসাদ পাণ্ডা মহাশয় লইয়া আসিয়াছেন। আমরা ভক্তিভরে ভুবনেশ্বরের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আর একবার ভুবনেশ্বর স্থানটি দেখিবার জন্য বাসা হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম রাস্তার ধারে ধারে ফলে ভারাবনত নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে আম্রবৃক্ষ ও ছায়াশীতল স্থানগুলি রমণীয়। কয়েকটী দীর্ঘিকা ও সুপ্রশস্ত জলাশয় আছে। এখানে বাজারটি ছোট। অনেক কাঁসা পিতলের বাসন, কাপড়ের দোকান, মিষ্টান্নের দোকান আছে। আমরা খানিকটা ঘুরিয়া বাসায় আসিলাম। পাণ্ডা আমাদের জন্য ভুবনেশ্বরের প্রসাদ আনিলেন। আমরা প্রসাদ খাইয়া বিশ্রাম করিলাম এবং সেইদিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে পুরী রওনা হইলাম। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; শীতল সান্ধ্য সমীরণে লতাপাতা দুলিতেছিল। রেলপথের উভয় পার্শ্বস্থ অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে পুরী আসিয়া পৌছিলাম।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে বৃক্ষের শাখায় শাখায় বসিয়া ময়ূর ময়ূরীগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, ও শ্যামল প্রান্তরটী সবুজ মখমলের ন্যায় শষ্পমণ্ডিত হইয়া কি সুন্দর দেখাইতেছে। প্রান্তর মধ্যে মৃগযূথ বিচরণ করিতেছে, তাহাদের বর্ণ বিচিত্র; কোথাও বা কৃষ্ণসার মৃগদল লম্ফ দিয়া বেড়াইতেছে। কোন স্থানে হরিণ শিশুসকল বিচরণ করিতেছে। আমার ছোট মেয়ে বীণা হরিণ শিশু ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, অমনি হরিণী দল গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া চকিত নয়নে ছুটিয়া পলাইল। আমি ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া হরিণী দলের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সমুদ্রসৈকত দিয়া দুই মাইল দক্ষিণ দিকে আসিলে এই প্রান্তর ভূমিতে আসা যায়। এই স্থানটী অতি নির্জ্জন ও নিভৃত, তবে প্রাতে ও বৈকালে ভ্রমণকারীর দল বেড়াইতে আসেন। মধ্যে মধ্যে সাহেবেরা বন্দুক লইয়া শীকারেও আসেন। আমরা একঘণ্টা বেড়াইয়া এই প্রান্তরের সন্নিহিত সুন্দর হ্রদের তীরে বসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম। এই সময় পূজার অবকাশে আমার জামাতা বারাণসী কাঁথি হইতে আসিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণনগর হইতে নাতজামাই নাতনীও আসিয়াছিলেন। আমরা প্রত্যহই দুইবেলা

তাহাদের সহ সমুদ্রকূলে ভ্রমণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতাম। কয়েকদিন বাদে জামাতা কাঁথি চলিয়া গেলেন। আমার নাতজামাই, নাতনী তুষারবালা আমার নিকটই রহিল। তখন কার্ত্তিক মাস, একটু শীতের আমেজ দিয়াছে। কিন্তু এখানে ত চির বসন্তানিল প্রবাহিত। এইরূপে আমাদের দিনগুলি একপ্রকার কাটিতেছিল—সহসা একদিন দেখিলাম সমুদ্রের ভীমকায় মূর্ত্তি। সেই বিশাল সাগরবক্ষে ঝড় উঠিয়াছে। সমস্ত দিন মেঘে অন্ধকার, তাহার সঙ্গে প্রবল বাতাস উঠিয়াছে। সমুদ্রপানে চাহিয়া দেখি দুরন্ত উর্ম্মিরাশি প্রকাণ্ড দৈত্যের ন্যায় সাগর সৈকতে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত দিন রাত্রি মেঘ অন্ধকার ঝড়বাতাস দেখিয়া সকল লোকেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। সমুদ্রতীরেই আমাদের ছোট বাংলাখানি। বেশী ঝড় হইলে কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি। সমস্ত দিন রাত্রি ঝড় বাতাস চলিল। পরদিন প্রাতে ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। আকাশ ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে পরিণত হইল। বেলা দুইটার সময় সমুদ্রতীরে একটী নিশান উড়িল যে, রাত্রি দশটায় 'সাইক্লোন' হইবে। পুরীবাসীগণ সতর্ক হও। এই কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ভীত হইলাম। আমার নাতনী তুষার ও বীণা ও কামনা সকলেই ভয়ে অভিভূত হইল। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল যে, ঝড় আমাদের বাংলাখানি উড়াইয়া লইয়া যাইবে। কোনরূপে খেচরান্ন পাক করিয়া সকলকে খাওয়াইলাম। কিন্তু ক্রমে যতই বেলা অবসান হইতে লাগিল, বাতাসের বেগ ততই বাড়িতে লাগিল। ঝড়ের গোঁ—গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। ক্রমেই পুরীবাসীগণ উদ্বেগে আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার প্রবল ঝড়ে প্রবল ভীম প্রভঞ্জন আসিয়া আমাদের গৃহের দরজা কপাটগুলি একে একে উড়াইয়া দিলেন। আমাদের হ্যারিকেন লণ্ঠন তিনটী নিবিয়া গেল—বাতাসের জোরে সমুদ্রের বালুকারাশি আসিয়া আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন আমরা ভয়ে অভিভূত হইয়া নাতনীদের হাত ধরিয়া নাতজামাই ও তুষার, বীণাকে সঙ্গে লইয়া বাংলো হইতে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইলাম, মনে হইল আর কিছুক্ষণ থাকিলে হয় ত গৃহখানি ভূমিসাৎ হইবে। তবে প্রাণগুলি এখন কোনমতে সকলের রক্ষা হওয়া চাই, এই ভাবিয়া বাটীর বাহির হইয়া আমরা সম্মুখের দ্বারে করাঘাত করিয়া চীৎকার করিলাম। গৃহস্বামীও বোধ হয় বিপন্নদের আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আমাদের সাড়া পাইয়া ক্ষিপ্রপদে দরজা খুলিয়া দিলেন। এ বাটীটি একজন ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের, তিনি ভাড়া দিয়া গিয়াছেন। বাড়ীটী মজবুত ও প্রস্তর গঠিত। বাড়ীর ভাড়াটিয়া অতি ভদ্রলোক। আমাদের সমাদর করিয়া স্থান দিলেন। ক্রমে ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া উঠিল। সময় সময় মনে হইল যেন ট্রেণের শব্দ হইতেছে। সহসা ভীমরবে ঐ বাটীর সিঁড়ির দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঝড়ের প্রবল বেগে ঝনঝন করিয়া দরজা কপাট পড়িতে লাগিল। আমরা মনে মনে ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তেই মনে হইল সমুদ্র যেন তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। বায়ুর গোঁ গোঁ শব্দ সমুদ্রের ভৈরব কল্লোলের সহ মিশিয়া একটা ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। যাইয়া দেখি সাগরের ফেনিল উর্ম্মিরাশি প্রকাণ্ড দৈত্যের ন্যায় এক একটা ঢেউ তুলিয়া সাগর সৈকতে আছড়াইয়া পড়িতেছে। সাগরের কি ভীষণ মূর্ত্তি! দেখিলে ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যায়। সমস্ত রাত্রি সাগর যেন তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছে। ভোর হইতে ঝড়ের বেগ একটু মন্দীভূত হইয়া আসিল। প্রলয়ের নৃত্য একটু থামিল। পুরীর লোক তখন বিপদ মুক্ত হইয়া পথে বাহির হইল। তখন বাহিরে আসিয়া দেখিলাম সাগরের প্রশান্ত ভাব। কিন্তু আমাদের বাংলোর ছাদ পর্য্যন্ত বালুকা রাশিতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। বড় বড় বৃক্ষ মহীরুহ পাদপ সব পতিত হইয়া রাস্তা সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহু গরু বাছুর ছাগল প্রভৃতি মারা গিয়াছে। অনেক গরীব লোক কুটীর চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। জীবনে কখন 'সাইক্লোন' দেখি নাই। এই দেখিলাম। প্রাতে আমরা কুলী মজুর ডাকিয়া বাংলো পরিষ্কার করিয়া আবার বাসায় আসিলাম। এই পুরীর সাইক্লোন চিরদিনই আমার মনে গাঁথা থাকিবে। কয়েকদিন পরেই—নাতজামাই নাতনী কৃষ্ণনগর চলিয়া গেল।

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

* 'ব্রহ্মবিদ্যা', পঞ্চদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল।

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

নৃপেনের গল্প বলার বেশ একটা ক্ষমতা ছিল। ঠাকুরমার অভাবে এখন সকলেই তাকে চেপে ধর্‌লে একটা গল্প বলার জন্য। সে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হেসে বল্‌লে—একটা গল্প বল্‌তে পারি, তবে তোমাদের তা' ভাল লাগ্‌লে হয়।

সুনীল তার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—একদম নীরস না হলেই ভাল লাগ্‌বে।

আকাশ ঘিরে মেঘের বসেছিল আসর। ঝুপঝুপ করে ঝর্‌ছিল অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা। আকাশ পরীদের সেদিন ছিল বোধ হয় কাঁদার পালা। অন্ধকার ঘরের মধ্যে সকলে মিলে জটলা পাকাচ্ছিলাম। রামরূপ একটা ট্রেতে করে চা নিয়ে এল। সকলেই হাত বাড়িয়ে এক-একটা পেয়ালা তুলে নিলে। অনিল চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বল্‌লে—এমন দিনে কি ইচ্ছা করে বলো ত?

অমিয় উদাসভাবে বল্‌লে—ভজার দোকানের গরম গরম পেঁজ ফুলুরী।

নৃপেন বল্‌লে—মারলিন ডিট্রিচ্‌য়ের কোন একখানা বই 'রূপবাণী' কিংবা 'চিত্রা'য়।

অনুপ বল্‌লে—তোমরা যে যাই বলো, ইচ্ছা করে এখন শুধু ঠাকুরমার রূপকথা শুন্‌তে।

তার কথায় সকলে হোহো করে হেসে উঠ্‌লো।

সুনীল বল্‌লে—তবে তাই হোক্! কিন্তু এখন ঠাকুরমা কোথায় পাই?

* * *

সে অনেকদিনের কথা। বিলাসপুরে ছিল চার বন্ধু। তাদের মধ্যে এত ভাব ছিল যে, একে অন্যকে না দেখে একটি মুহূর্ত্তও কাটাতে পারত না।

সোমেন বল্‌লে—তাদের কি নাম ছিল?

নৃপেন হেসে বল্‌লে—বিদ্যুৎ, সঞ্জয়, বিজয়, আর অজয়।

অমিয় বল্‌লে—ওদের কথায় কাণ দিস্ না নীপে, তুই বলে যা'। তারপর?

—"হাঁ, তারপর একদিন তাদের ইচ্ছা হলো তারা দেশ ভ্রমণে বেরুবে। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। একদিন রাত্রে চাঁদের আলোয় যখন সারা আকাশ হেসে উঠেছে, তখন চার বন্ধু জনকয়েক লোক নিয়ে একটা ডিঙা সাজিয়ে অজানার উদ্দেশে তাদের পাড়ি জমিয়ে দিলে। চাঁদের আলোয় জলের বুকে নাচতে নাচতে তাঁদের ডিঙা চল্‌তে লাগ্‌লো।

অনেক দেশ-দেশান্তর ঘুরে, অনেক ঝড়-ঝাপটার আড়াল হ'তে বাঁচিয়ে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপর নাচতে নাচতে তারা এক অজানা দ্বীপের ধারে এসে তাদের ডিঙা বাঁধলে।

* * *

সেই দ্বীপে থাকৃত একদল অসভ্য জাত। তাদের সেদিন ছিল কি একটা উৎসব। তারা সব জলে নেমে জলক্রীড়ায় মত্ত ছিল। তাদের চোখে পড়লো অদূরের ভাসমান ছোট ডিঙাখানির ওপর। সকলে মাছের মত সাঁতার দিয়ে নৌকার ধারে এসে জলের ভিতর নানা প্রকারের ক্রীড়া-কসরৎ দেখাতে লাগ্‌লো। সঞ্জয় তাদের সেই খেলা দেখে খুসী হয়ে ডিঙা হতে নানাপ্রকার জিনিষ জলের ভিতর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। তারাও সেগুলি মাছের মত ডুব দিয়ে দিয়ে মুখে করে তুল্‌তে লাগ্‌লো। বিজয় দিলে একখানা ছুরী ফেলে। সেই দলে ছিল সে দেশের রাজার কুমারী মেয়ে নিনা। সে সেটা ডুব দিয়ে গিয়ে ধরলে।

এমন সময় হঠাৎ কেমন করে ধাক্কা খেয়ে বিজয় গেল জলের ভিতর পড়ে। পড়ার সময় পায়ে বেঁধে গেল একটা দড়ি।

সবাই তখন ছিল আপন আপন ক্রীড়ায় মত্ত। সেই

অবসরে নীল আকাশের বুকখানা জুড়ে যে মেঘপুরীর কালো নিশানখানা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা' কেউ টের পায় নি। সহসা আকাশ বাতাস ওলট-পালট করে এলো ঝড়ো হাওয়া। বাজল প্রলয়ের বিষাণ জলে স্থলে। আরম্ভ হলো নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য।...

এদিকে জলে পড়ার সময় বিজয়ের পায়ে বেঁধেছিল দড়ি। সে কিছুতেই ভালভাবে সাঁতার দিতে পারে না। অসহায়ভাবে জলে উত্তাল তরঙ্গমালার সাথে যুঝ্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু কতটুকু তার শক্তি! শীঘ্রই সে হয়ে পড়লো শ্রান্ত।...এমন সময় কে যেন দিল তার পায়ের দড়ি কেটে। তারপর বাঁ হাতে পেলে তার স্পর্শ। তখন সে সেই হাতের উপর ভর দিয়ে কোনক্রমে এসে ডাঙায় উঠ্‌লো।

ঝড়ের প্রকোপ তখন অনেকটা কমে এসেছে। সাম্‌নের দিকে বিজয় চেয়ে দেখে অর্দ্ধনগ্ন এক অপরূপ সুন্দরী। তার ঠোঁটের কোণে একটুক্‌রো সাফল্যের হাসি। সে তার ভাষায় আবোলতাবোল কত কি বকে গেল। বিজয় তার কিছুই বুঝ্‌লে না। সে শুধালে তার নাম কি? সে বললে—নিনা।

তারপর আরো খানিকটা আবোলতাবোল বক্‌তে লাগ্‌ল।

* * *

বন্যদের রাজার নিকট হতে চার বন্ধুর এল নিমন্ত্রণ; কেন না, তারা তাদের বহু জিনিষ উপহার দিয়েছে। চার বন্ধু আমন্ত্রণ রক্ষা করতে দ্বীপে এসে নাম্‌ল। হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে। আশ-পাশে অসংখ্য ছোট ছোট কুটীর। ঘরগুলিতে একপ্রকার বুনো বাঁশ-পাতার ছাউনি। অনেকটা পথ ঘুরে-ফিরে তারা এসে পৌছাল একটা উন্মুক্ত ছায়া-শীতল জায়গায়। সেখানে অসংখ্য নরনারী অদ্ভুত বেশে হাত ধরাধরি করে নাচছে।

বিজয় দেখ্‌লে সেই আসরে তার প্রাণদাত্রী সেই সুন্দরীটীও নৃত্য করছে। কিন্তু সে একা। অন্যান্য সকলে যেমন দু'জন একত্র হয়ে নৃত্য কর্‌ছে, সে তা' নয়। তারপর তাদের আরো বহু প্রকারের আমোদ-প্রমোদ হলো। ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। ঝড়ের পর তখন একফালি চাঁদ নীল আকাশের গায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেঘস্তরের ভিতর হতে মুখখানি বার করে হাস্‌ছে।

সে রাত্রে বিজয়ের চোখে ঘুম ছিল না। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্রের জলে কে একখানি সোনার আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। মন্দ মন্দ হাওয়া ডিঙার পালগুলির গায়ে এসে লাগায় সেগুলি মৃদু মৃদু দুল্‌ছিল। মাথার উপর জোৎস্না-প্লাবিত আকাশের গায়ে একটা সাড়া দিয়ে নাম-না-জানা একটা পাখী সহসা 'টি টি' করতে করতে দ্বীপের দিকে উড়ে চলে গেল। হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে বিজয় ভাবছিল সেই সুন্দরীর কথা। কোথাও কেউ জেগে নেই। ডিঙার মাঝি-মাল্লারাও যে যার ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু নিস্তব্ধ রজনীর বক্ষ ভেদ করে পড়ছে চাঁদের গলিত আলোক ধারা।

ছোট ছোট ঢেউগুলি এসে ডিঙার গায়ে আছড়ে পড়ছিল—ছলছলাৎ, ছলছলাৎ! সহসা সেই বিরাট নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে এক প্রকার শব্দ বিজয়ের কাণে এল—হিস্‌-স্‌-সৃই। বিজয় চম্‌কে সাম্‌নের দিকে চাইলে। এমন সময় ঠিক তার সাম্‌নেই শব্দ হলো হিস্‌-স্‌! নীচু হয়ে সে দেখ্‌লে জলের বুকে ডিঙার কোল ঘেঁসে কার একটা মাথা জেগে আছে। যেমন নীচু হয়ে সে ভাল করে দেখ্‌তে যাবে, টুপ করে মাথাটা ডুবে গেল। আবার কিছুক্ষণ বাদে ভেসে উঠল। এবার চাঁদের আলোয় ভাল করে চেয়ে দেখে, এ সেই রাজার মেয়ে নিনা। নামটা সে ওদের মুখেই শুনেছিল। বিজয় ডাকলে—নিনা! মেয়েটি একটু হেসে ডুব দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠলো।

বিজয়ও গায়ের জামা খুলে জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিজয় যত নিনাকে ধরতে যায়, সে যায় তত এগিয়ে। অনেকক্ষণ পরে শ্রান্ত হয়ে নিনা ডাঙার দিকে সাঁতরে যেতে লাগ্‌লো। বিজয়ও তাকে অনুসরণ কর্‌লে।

মাটিতে পা দিয়ে বিজয় তাকে যেমন আলিঙ্গন করেছে,

অমনি সে ঈষৎ চমকে উঠে আপনাকে আলিঙ্গন পাশ হতে মুক্ত করে নিলে। বিজয় তার দিকে তাকাতেই নিনার চোখ দু'টি লজ্জায় নুয়ে এল। মাথার উপর দিয়ে একটা পাখী ডাক্‌তে ডাক্‌তে উড়ে গেল। তাদের দু'জনের মিলনের সাক্ষী রইল শুধু মাথার উপর চাঁদ, সেই অজানা পাখী, আর সমুদ্রের ফেনিল জলরাশি। প্রথম পুরুষের স্পর্শে নিনার নারী দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুতে যে মাদকতা এনে দিয়েছিল, তারই নেশায় ভরপুর হয়ে সে একপ্রকার পাগলের মতই টল্‌তে টল্‌তে সেই চাঁদের আলোয় সবুজ বনান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

পরদিন যাত্রাকালে বিজয়কে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সারাদিন অপেক্ষা করা সত্ত্বেও যখন সে ফিরে এলো না, তখন বন্ধুরা বাধ্য হয়ে তাদের ডিঙা ভাসিয়ে দিলে। একবারও তারা ভাবলে না, এই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ফেলে যাওয়া বিজয়ের অবস্থা।

* * *

দিন কারও জন্য বসে থাকে না—সে যেমন আসে, তেমনি চলে যায়। বিজয় সমুদ্রের ধারে একটা কুটীর বেঁধে বাস করতে লাগ্‌ল। দুপুর হ'লে নিনা তার কাছে আস্‌ত। তারপর দু'জনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে বনের ছায়ায়, কোনদিন বা সমুদ্রের বালুবেলার উপর দিয়ে পায়ে পায়ে বহুদূর চলে যেত। চল্‌তে চল্‌তে নিনা তাদের আপন ভাষায় অনর্গল কত কথা বলে যেত, আর মুগ্ধ বিস্ময়ে বিজয় তাই শুন্‌ত।

সেদিনও মহুয়া গাছের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে উপস্থিত হলো একটি ছায়াবহুল হিন্তাল গাছের নীচে। আকাশকে সেখানে কোন গাছ তার মাথা উঁচু করে বাধা দেয় নি। বহুদূর হতে দেখা যাচ্ছিল 'উলা'র আগ্নেয়গিরি। মস্তবড় একখণ্ড পাথরের উপর নিনা পা ঝুলিয়ে বস্‌লো, আর বিজয় বস্‌লে তার নীচে। কত কথা তাদের হৃদয়ের কোণে জমাট বেঁধেছিল—কিন্তু একটাও বলা হলো না। কোথায় দূরে একটা পাখী পত্রান্তরাল হতে আনমনে ডেকে ডেকে উঠছিল—বোধ হয় তার হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়ার জন্য।

বিজয়ের সাথে নিনার এই যে গোপন আলাপ এটা তার মা বাপের কাণে এতদিন উঠে নি—কিন্তু কথাটা বেশীদিন চাপা রইল না; একদিন তাঁরা জান্‌তে পার্‌লেন। সেদিন নিনার মা মেয়েকে ঘরে খুঁজে না পেয়ে তার বাবাকে এসে জানালেন—আজও বোধ হয় সে সেই বিদেশীর সাথে মিলিত হতে গেছে। নিনার বাপ তাঁর জনকয়েক বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে দু'জনকে একসঙ্গে দেখে আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌লেন। সহসা উভয়ের নীরব আলাপনকে ভেদ করে বাজের ন্যায় তীক্ষ্ণস্বর তাদের কাণে ভেসে এলো—নিনা!

দু'জনে চম্‌কে সাম্‌নের দিকে চাইলে। বিজয়কে অশ্রাব্য কি কতকগুলি বলে নিনার বাপ তাকে হিড়হিড় করে টান্‌তে টান্‌তে সেখান হতে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় নিনার চোখে জল দেখে বিজয়ের চোখ দু'টিও অশ্রুভারে কেঁপে উঠ্‌লো।...

* * * *

নিনা ছিল একজনের বাকদত্তা বধূ। তার ভাবী স্বামী পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপের তরুণ রাজা বিল্লা। নিনাকে নিয়ে গৃহে ফিরে তার বাপ দেখ্‌লেন বিল্লার নিকট হতে দূত এসেছে, যাতে করে শীঘ্রই তাঁদের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় সেই সংবাদ জানাতে।

আশু বিবাহের সম্ভাবনায় সারা গ্রামখানিতে আনন্দের স্রোত বইতে লাগ্‌লো। এঁদের নিয়ম ছিল—যাঁর সাথে বিবাহ, তাঁর দেশে মেয়ে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিয়ে আস্‌তে হয়। কিন্তু যার বিবাহের সম্ভাবনায় সবাই আনন্দে মেতে উঠেছিল, তারই শুধু মনে সুখ ছিল না। তার চোখের উপর কেবলই ভেসে উঠছিল বিজয়ের অশ্রু-আবিল চক্ষু দু'টি। নিনা লুকিয়ে একটি অনুচরীকে তার প্রিয়তমের নিকট পাঠিয়ে দিলে।

* * *

শুভদিনে শুভক্ষণে সমস্ত নগরবাসী রাজকুমারীর বিবাহ দিতে নৌকা চড়ে রওনা হয়ে গেল। এই কয়-দিনের প্রাণপাত পরিশ্রমে বিজয়ও একখানি নৌকা তৈরী করেছিল। সেও তাদের অনুসরণ কর্‌লে।

* * *

বিবাহ-উৎসবে চিরপ্রথামত নিনা নৃত্যে যোগ দিয়েছিল বটে, কিন্তু তার পা বারবার জড়িয়ে যাচ্ছিল। নর্ত্তক নরনারী যখন ভোজনে ব্যস্ত, বিজয় চুপিসাড়ে এসে তাদের দলে মিশে গেল। গভীর নিশীথে সে পা টিপে টিপে যেখানে নিনা বসে অশ্রুজলে বুক ভাসাচ্ছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হলো। পাশেই নিনার ভাবী স্বামী শুয়ে পড়ে মদের নেশায় নাক ডাকাচ্ছিলেন। বিজয় ধীরে ধীরে গিয়ে নিনার কাঁধে হাত রাখ্‌লে। চম্‌কে চেয়ে নিনা দেখ্‌লে—সাম্‌নে তার চির-বাঞ্ছিত উপস্থিত। একটুখানি চাঁদের আলো কুটীরের জানালা দিয়ে এসে নিনার অশ্রুসিক্ত নিটোল গালের উপর তার মধুর পরশ জানিয়ে গেল। বিজয় প্রেম-বিগলিত স্বরে ডাক্‌লে—নিনা!

নিনা বিজয়ের কাঁধে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌লো।

* * *

চাঁদের আলোয় গা ঢেলে দিয়ে সমুদ্র তখন ছিল ঘুমিয়ে। নিনা আর বিজয় এসে নৌকায় চেপে সেখানা জলে ভাসিয়ে দিলে। সাগর বুকে হেলে দুলে নৌকা চল্‌ল—না জানা কোন্ অচিন্ দেশে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিনার যখন ঘুম ভেঙে গেল, তখন সে দেখ্‌লে সুন্দর এক দ্বীপের বুকে এসে তাদের নৌকাখানি ভিড়েছে। সেখানে সেখানা বেঁধে দু'জনে হাত ধরাধরি করে ডাঙায় নেমে পড়লো।

* * *

দিনের পর দিন পরিশ্রম করে বিজয় ছোট্ট একটী কুটীর নির্ম্মাণ করলে তাদের বাসের জন্য। সারাটা দিন তারা বনে বনে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত, আর রাতের বেলা চাঁদের আলোয় যখন তাদের ছোট্ট কুটীরের দাওয়াখানি স্বপ্নময় হয়ে উঠতো, তখন বিজয়ের কোলে মাথা রেখে নিনা শিখ্‌তো বিজয়দের ভাষা।

প্রথম যেদিন সে 'বিজয়' বল্‌তে শিখ্‌লে, সেদিন তার কি আনন্দ! কারণে অকারণে খালি 'বিজয়, বিজয়' করে ডাকাই যেন তার কাজ হয়ে উঠ্‌লো। হয় ত বিজয় গাছে উঠেছে ফল পাড়তে, অন্য আর একটা গাছে উঠে আড়াল হতে নিনা ডেকে উঠ্‌ল—বিজয়!

বিজয় বল্‌লে—নিনা!

সেদিন বনে ঘুরতে ঘুরতে বিজয় দেখ্‌লে ছোট্ট একটী হরিণ শিশু। সে সেটি নিয়ে এসে নিনাকে উপহার দিলে। হরিণ শিশুটী ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগ্‌ল। নিনা তার নাম রেখেছিল বিজয়। যখন সে বিজয় বলে ডাকতো, হরিণটীও দৌড়ে সেখানে আস্‌তো। বিজয়ও হয় ত এসে হাজির হতো। আর অমনি নিনা হেসে লুটোপুটি খেয়ে সেখানে গড়িয়ে পড়তো। এমনি করেই তাদের দিনগুলি হাসি-খেলার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

* *

তাদের এত সুখ বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রেত ছিল না—তাই সহসা একদিন উলার বক্ষ ভেদ করে এল মহা প্রলয়ের বারতা। সারা বনভূমি উঠ্‌লো কেঁপে। নিনাদের দেশে একটা প্রবাদ ছিল—যদি কখনো তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তা'তে দেবতা হবেন অসন্তুষ্ট—আর সেই অসন্তোষের আগুন ছুটে আসবে উলার বক্ষ বিদারণ করে তাদের ধ্বংসের জন্য। তখন যদি সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে উলার গর্ভে নিক্ষেপ করা যায়, তবেই হবেন দেবতা তুষ্ট—নইলে আর কোন উপায়ই নাই।

নিনার পিতা তাঁর অনুচরদের আদেশ দিলেন—যেখান হতে পার নিনাকে ধরে নিয়ে এস—দেবতা রুষ্ট হয়েছেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সহস্র নৌকা সাজান হলো। রণভেরী উঠ্‌লো বেজে।..ওদিকে উলার বক্ষ ভেদ করে ভীষণ অগ্নিস্রোত, গলিত লাভা হুহু করে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো।...ভূমিকম্পে সারা বনভূমি কেঁপে উঠ্‌লো—থর-থর-থর!...

* * * *

দলে দলে নর-নারী কুটীর ছেড়ে বনে বনে ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগ্‌লো। চোখে তাদের আতঙ্কের দৃষ্টি, কণ্ঠে করুণ বিলাপ ধ্বনি।...ক্রুদ্ধ দেবতার দুর্জ্জয় আক্রোশ যেন ক্ষমাহীন অবোধ নর-নারীদের বিধ্বস্ত করতে মহা গর্জ্জনে এগিয়ে এল।...সারা আকাশের বুক চিরে মহা-প্রলয়ের বিজয় বারতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।...মা বসুন্ধরাও বুঝি তাদের চরম দুঃখে সহানুভূতির আবেগে চৌচির হয়ে ফেটে যেতে লাগ্‌লেন।...সাগরের জল উঠ্‌লো ক্ষেপে, পর্ব্বতের মত ঢেউ একটার পর একটা ক্রুদ্ধ সর্পের মত উন্মত্ত আবেগে ছুটে এসে আছড়ে পড়তে লাগ্‌লো বালু-বেলার বুকের 'পরে।...

* * * *

বিজয় গেছিল সেদিন সমিধ সংগ্রহ করতে দূর বনে; কেন না, কাছাকাছি কোথাও আর কাঠ ছিল না। একাকিনী নিনা আকুল হয়ে তার আগমন প্রতীক্ষায় একবার ঘর একবার বার করছিল—সহসা তার চোখ পড়লো ওই দূরে, সমুদ্র বক্ষে সহস্র নৌ-যানের দিকে—তারা যেন সেইদিকেই বেয়ে আস্‌ছে।

সত্যই তারা নিনাদের দ্বীপে এসে তাদের তরী ভেড়ালে। নিনা বুঝলে বিপদ তাদের এগিয়ে এসেছে। সে চীৎকার করে ডাকলে—বিজয়, বিজয়!

কোথায় বিজয়, প্রতিধ্বনি ফিরে এল—নাই, নাই, নাই!...

অভাগিনী পাগলিনী প্রায় ছুটাছুটী করতে লাগ্‌লো।

* * * *

সমিধ সংগ্রহান্তে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে পথেই বিজয় চীৎকার করে ডাক্‌লে—নিনা!

কিন্তু আজ তার ডাকে কেউ সাড়া দিলে না।...তার ডাকের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি গাছের পাতায় পাতায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে গেল। বিজয় ভাবলে হয় ত নিনা দুষ্টুমী করে কোথায় লুকিয়ে আছে। হঠাৎ

হয় ত বেরিয়ে এসে তাকে চম্‌কে দেবে বলে সাড়া দিচ্ছে না। হয় ত কোন অশোক বীথির আড়াল হতে অকস্মাৎ পিছন দিক্ দিয়ে গলাটী জড়িয়ে ধরে মধুর কণ্ঠে ডাকবে—বিজয় !

কুটীরে এসে সে দেখ্‌লে সেখানে কেউ নেই। শূন্য গৃহখানি খাঁখাঁ করছে। দরজার উপরেই নিনার সাধের হরিণটাকে একটা মস্ত বর্শা বিদ্ধ করে কে মেরে রেখে গেছে। সে দেখ্‌লে তাদের নির্জ্জন কুটীরখানি কাদের রূঢ় পদক্ষেপে এলোমেলো শ্রীহীন হয়ে পড়ে আছে। বিজয় ডাকলে—নিনা! তারপর পাগলের মত সে বনে বনে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থানই সে খুঁজলে, কিন্তু কোথাও মিল্‌ল না তার নিনাকে। ব্যর্থ হলো তার অনুসন্ধান। হঠাৎ তার মনে পড়লো—তবে কি নিনার দেশের লোকেরা এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সত্যই ত, এ কথা ত তার একবারও মনে হয় নি। সে পাগলের মত সমুদ্রের দিকে ছুটলো। সমুদ্রের ধারে এসে দেখে সেখানে বালুবেলায় অসংখ্য লোকের পায়ের ছাপ। তখন তার কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু কেমন ক'রে সে সেখানে যাবে? সহসা তার মনে পড়লো তার নিজের নৌকাখানির কথা। ছুটে গেল সেখানে, যেখানে সেটা পাড়ের উপর উপুড় করা ছিল। টেনে-টুনে বহুকষ্টে সে সেটা সাগর জলে ভাসিয়ে দিলে।

* * * *

গভীর নিশীথে বিজয় যখন নিনাদের গ্রামে এসে পৌঁছল, তখন সমস্ত গ্রামখানি ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌ল নিনাদের কুটীরের দিকে। যদিও আকাশে সেদিন চাঁদের আলোর অভাব ছিল না, কিন্তু পত্রবহুল বৃক্ষ ভেদ করে সে আলো যেন আসারই পথ পাচ্ছিল না। যেটুকু এদিক-ওদিক দিয়ে সেই অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, সেটুকুও যেন চোরের মত মিটিমিটি চাইছিল। রাতের আঁধারকে ভেদ করে উলার অগ্নিস্রাবের বিরাম ছিল না। বিজয় চোরের মত পা টিপে টিপে এগুতে লাগ্‌লো। সহসা একটা তীক্ষ্ণ বর্শা এসে বিজয়ের বাঁ কাঁধের উপর লাগ্‌লো। সে যন্ত্রণায় অব্যক্ত চীৎকার করে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো। নিনার পিতা জান্‌তেন বিজয় নিনার খোঁজে এখানে আসবে, তাই তিনি পূর্ব্বাহ্নেই তার শাস্তির আয়োজন করে রেখেছিলেন।

বিজয়ের যখন জ্ঞান হলো, সে চেয়ে দেখ্‌লে, একটা সরু কাঠের সাথে তার হাত দুটো বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর তার পাশেই নিনাও সেই অবস্থায় রয়েছে। সে কি নিদারুণ দৃশ্য! অতি বড় পাষাণেরও বোধ করি চোখ বেয়ে জল আসে।

বিজয় ডাকলে—নিনা!

—বিজয়!

—আমারই জন্য তোমার এই বিপদ হলো নিনা, আমি যদি এখানে না আসতাম!

—ও কথা বলো না বিজয়! তুমি আমার প্রাণে যে নব জীবনের আস্বাদ জাগিয়েছ, মৃত্যুর ওপারে গিয়েও হয় ত সে কথা আমি ভুলতে পারব না! তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার জীবনের শেষ হয়ে যাবে—এর চেয়ে সুখের কথা আমি যে কল্পনাতেও কোনদিন ভাবতে পারি নি প্রিয়তম! আমার আর কোন দুঃখ নেই বিজয়! আজ মরতে বসেছি, তবু মনে হচ্ছে—আমার মত সুখী জগতে বোধ হয় আর কেউ নেই!

হতভাগিনীর চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো।

—নিনা, তুমি কেঁদো না! তোমার চোখে জল দেখ্‌লে, আমি পাগল হয়ে যাই! মরি তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু এই বিদেশে স্বজনহীন মৃত্যু! তবুও আমার সান্ত্বনা যে, তুমি থাকবে আমার পাশে!...

এমন সময় একদল লোক পৈশাচিক নৃত্য করতে করতে এগিয়ে এলো। তাদের দু'জনকে কাঁধে নিয়ে তারা এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের কাছে এসে দাঁড়াল।

সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর তারা নিনা আর বিজয়কে চেপে চেপে ধরতে লাগ্‌লো। তারা ঠিক্ করেছিল উভয়কেই উলার গর্ভে নিক্ষেপ করবে।

বিজয়কে একাকী সেই দ্বীপে ফেলে যাওয়ায় তার বন্ধুদের প্রাণে আদৌ শান্তি ছিল না। তারা একদিন সেখানে ফিরে এল বিজয়ের সন্ধানে। তারা যখন দ্বীপে নাম্‌ল, তখন সেখানে চল্‌ছে জ্ঞানহারা নিনা আর বিজয়ের উপর অমানুষিক অত্যাচার। রাগে বিদ্যুতের চোখ দুটো জলে উঠ্‌লো। প্রথমেই যে বিজয়কে নিয়ে এগিয়ে আস্‌ছিল, সে তাকে করলে গুলি। বনস্থল কম্পিত করে, বন্যদের পৈশাচিক চীৎকারকে ডুবিয়ে দিয়ে বন্দুক গর্জ্জে উঠ্‌লো—দুড়ুম্!

সবাই চম্‌কে চাইলে—কিসের শব্দ! তারপরই আর একবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আর দু'জন ধরাশায়ী হলো। তখন সকলে নিনা আর বিজয়কে ফেলে যে যার এদিক-ওদিকে

পালাল। তারপর নিনা আর বিজয়কে বন্ধনমুক্ত করে বন্ধুরা যখন নৌকায় ফিরে এল, তখন রাত্রি গভীর।

*　　*　　*

নিনার তেমন কিছুই ক্ষতি হয় নি। যা' হয়েছিল তা' বিজয়েরই। সে জ্ঞানহারা হয়ে শুয়েছিল নৌকার ভিতর। নিনা এসে কম্পিত পদে দাঁড়ালো তার সাম্‌নে। ধীরে ধীরে সে বিজয়ের বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তার চুলের উপর তার স্নেহময় হস্ত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো।—বিজয়, ও গো বন্ধু, ভগবান তোমায় নিরাময় করুন!...

বাইরে চাঁদের আলোয় তিন বন্ধুতে মিলে গল্প করছিল। সহসা তাদের চোখ পড়লো অদূরে দশ-বারখানা ছিপের প্রতি। সেগুলা তাদের দিকেই এগিয়ে আস্‌ছিল। সকলে উঠে দাঁড়াল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছিপ্‌গুলা নৌকার গায়ে এসে ভিড়লো। বন্ধরা তাদের ভাষায় কি বল্‌লে কিছুই বোঝা গেল না। এমন সময় বিদ্যুৎ পিছন ফিরে দেখ্‌লে, নিনা দাঁড়িয়ে। বিদ্যুৎ নিনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তারা কি চায়?

নিনা বললে—ওরা আমাকে চায়—উলার গর্ভে আমায় নিক্ষেপ কর্‌বে।

তিন বন্ধু সমস্বরে বলে উঠ্‌লো—কখনো না! আমরা তোমাকে ছাড়বো না, তুমি আমাদের দেশে চলো।

নিনা মাথা নাড়লে। কাতর কণ্ঠে বল্‌লে—তা' হয় না বন্ধু—আমায় যেতেই হবে—আমি আমার জন্মভূমির এ ডাক অগ্রাহ্য করতে পারি না! ..

তার চক্ষু দু'টী জলে ভরে এল।

—কিন্তু নিনা, তুমি কি বিজয়ের কথা একবারও ভাবছ না!

—ভাবছি বই কি বন্ধু!...তারপর সে নিজের ভাষায় তার দেশের লোকদের কি যেন জানিয়ে বিদ্যুতের দিকে ফিরে বল্‌লে—আমি যাই, বিজয়ের কাছ হতে শেষ-বিদায় নিয়ে আসি!...

জ্ঞানহারা বিজয়ের ললাটে স্নেহভরে একটী প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দিয়ে নিনা অস্পষ্ট স্বরে বল্‌লে—বিদায় বন্ধু, বিদায়!...তুমি আমার জন্য দুঃখ করো না প্রিয়তম, তোমার নিনা ওপারে গিয়ে তোমারই অপেক্ষায় থাকবে!...

চোখের জলে তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এলো।...সে এক পা এক পা করে ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

তারপর বাইরে এসে বল্‌লে—বিজয় যদি আমায় খোঁজে, তাকে বুঝিয়ে বলো—নীল আকাশের এককোণে বসে তারই আশায় আমি একটির পর একটী দিন গুন্‌ছি! ..

বল্‌তে বল্‌তে সে নৌকা হতে নেমে গিয়ে ছিপের উপর দাঁড়াল।

নৃপেন চুপ কর্‌লে।

অনুপ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তারপর?

নৃপেন বল্‌লে—তারপর! তারপর আর নেই ভাই!

সহসা এক ঝলক জলো হাওয়া হুহু করে এসে একটা শিহরণ দিয়ে গেল। মনে হলো—এ বোধ হয় সেই নিনার চোখের জলে ভেজা নীল আকাশের কোণ হতে প্রেরিত বিজয়ের উদ্দেশে একটী দীর্ঘশ্বাস!...ঘরের সব ক'টি প্রাণীই তখন সেই অজানা কুমারীর ব্যথায় ম্রিয়মান হয়ে উঠ্‌ল।

বাইরে প্রকৃতির বুক বেয়ে তখনও বৃষ্টি ঝর্‌ছিল টিপ্‌—টিপ্‌—টিপ্‌।*

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

* বিদেশী ছায়াচিত্র অবলম্বনে

ভ্রম-সংশোধন—৭৩৩ পৃষ্ঠার শেষ প্যারার প্রথম লাইনে 'জেনারেল অফিসার লিখেছেন—' এইরূপ হইবে এবং তৃতীয় লাইনের 'লিখেছেন—' কথাটী উঠিয়া যাইবে।　　সম্পাদক

চলচ্চিত্রের মায়াপুরী

নেল্‌সন্‌ এডি

শ্রীমতী প্রতিভারাণী শীল

কথাচিত্রে সুকণ্ঠের জন্য যে কয়জন নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে নেল্‌সন্‌ এডির নাম উপস্থিত অনেক উচ্চে অবস্থিত। নিজের প্রবল অধ্যবসায়ের জোরেই কিন্তু তিনি আপনাকে এতখানি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার জীবন-চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম জীবনে এডি ছিলেন সংবাদ-পত্রের একজন রিপোর্টার। গান-বাজনা শিখিবার প্রবল ঝোঁক থাকিলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাহা কার্য্যে তিনি পরিণত করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে একটী গ্রামোফোন্‌ এবং কয়েকখানি বিখ্যাত গানের রেকর্ড কিনিয়া তিনি গানের সহিত স্বরসাধন করিতে আরম্ভ করেন। রহস্যের দিক্‌ দিয়া ঠিকমতো ধরিতে গেলে, এডির প্রথম গুরু হইয়াছিলেন য়্যামেরিকার বিখ্যাত গায়ক স্কটি, ক্যাম্পানারি ইত্যাদি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী।

এডির পিতা ছিলেন একটী জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার এবং মাতা ছিলেন একটী বিখ্যাত গায়িকা। কাজেই এই প্রখর স্বরসাধনায় তাঁর মাতা ছিলেন শ্রেষ্ঠ সহায়। ধরিতে গেলে মাতার প্রচণ্ড উৎসাহেই এডি সঙ্গীত-জগতে নিজেকে অতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অবশ্য একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এডি ভগবান প্রদত্ত সুকণ্ঠ এবং স্বীয় অধ্যবসায়েরও যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার সুকণ্ঠ অনেকের নিকট ধরা পড়িয়াছিল এবং তিনি স্কুলের নানাবিধ উৎসবে বহুবার সঙ্গীত এবং আবৃত্তির জন্য বহু ভূমিকায় অবতার্ণ হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ড্রয়িং (অঙ্কন বিদ্যা) শিখিতে আরম্ভ করেন। এদিক দিয়াও তাঁহার নৈপুণ্য বড় কম ছিল না। অবসর সময় বন্ধুবান্ধবদের ছবির স্কেচ করিয়া উপহাসছলে তিনি তাহা উপহার পাঠাইতেন। এই প্রসঙ্গে আমরা চিত্রামোদীদের নিকট আর একজন পরলোকগত শ্রেষ্ঠ গায়কের নাম উল্লেখ করা অশোভন হইবে না বলিয়া মনে করি। তিনি ছিলেন য়্যামেরিকার বিখ্যাত গায়ক এনরিকো ক্রুসো। তাঁরও ঠিক্‌ এডির মতো ছবি আঁকিয়া উপহাস করার সখ ছিল।

হাস্যরসিক অভিনেতা লুইলার ও উল্‌সি

ড্রয়িং ত্যাগ করিয়া এডির হঠাৎ খেয়াল হয় ডাক্তারী শিখিবেন। তাঁর এই হঠাৎ খেয়ালটী যেমন অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, তার কারণটী তদপেক্ষা বেশী অদ্ভুত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। একদিন স্কুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে এডি দেখিলেন, একজন চিকিৎসক পুলিশ য়্যাম্বুলেন্সে করিয়া একটী দুর্ঘটনা (য়্যাক্সিডেণ্ট) তদন্ত করিতে উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছেন। ইহাতে যথেষ্ট 'থ্রিল' আছে কল্পনা করিয়াই তিনি উল্লসিত হইয়া উঠেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইয়া তাঁর সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি সসম্মানে ও দুরাশা পরিহার করেন।

১৯১৫ অব্দে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথম কর্ম্মজীবনে অবতীর্ণ হন। একটী অর্কেষ্ট্রাদলে তিনি 'ড্রামারে'র কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেও প্রথমে তাঁকে টেলিফোনের কার্য্যে বহাল করা হয়। তাহাতে তিনি ভয়ানক নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহার দু'-চারদিন পরেই একজন 'ড্রামার' অসুস্থ হইলে তিনি সেই কার্য্য করিবার সুযোগ পান এবং নিজের দক্ষতা দেখাইয়া পাকাপাকিভাবে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন।

রেডিওর বিখ্যাত অভিনেত্রী, জিঞ্জার রজার্স

এই কার্য্য করিবার সময় মাঝে মাঝে তিনি গান গাহিতেন। একদিন ঘটনাচক্রে সেই গানের আসরে বিখ্যাত 'ব্যারিটোন' ডেভিড্ বিশাম (David Bisham) উপস্থিত হন্। তিনি এডির সুকণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের অল্পকাল পরেই বিশাম মারা যান। অগত্যা গুরু পরিবর্ত্তন করিতে শেষ পর্য্যন্ত এডি, ভিলোন্যাটের (Vilonat) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন শিক্ষার পরেই যথার্থ সুকণ্ঠ-যুক্ত বলিয়া আবিষ্কৃত হন্।

১৯২২ অব্দে তিনি 'ম্যারেজ ট্যাক্স' নামক একখানি অপেরা পুস্তকে একটী বাজে ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য অবতীর্ণ হন এবং খুব নাম করেন। ইহার একবৎসর পরে ফিলাডেলফিয়ায় একটী গানের জলসায় শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২৪ অব্দে 'মেট্রোপলিটন অপেরা হাউসে' গান করিয়া তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে জাহির করেন। এইভাবে আরো কয়েক বৎসর নানা স্থানে অভিনয়, গান ইত্যাদি করিয়া ১৯৩৩ অব্দের শেষভাগে তিনি 'মেট্রো' কোম্পানীর ষ্টুডিওয় আসিয়া উপস্থিত হন্। সেখানে তাঁর কণ্ঠ পরীক্ষা করিয়াই তাঁহাকে সাত বৎসরের অঙ্গীকারে চুক্তিবদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। 'মেট্রো'তে তিনি 'নটি মেরিয়্যাটা' পুস্তকে বিখ্যাত গায়িকা জেনেট্ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সহিত অভিনয় করিয়া নিজের সুনাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই সুকণ্ঠ অভিনেতাটি আরো বেশী নাম করিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী প্রতিভারাণী শীল